বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৬—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা,

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

ষাণ্মাসিক সূচী

অঙ্কুর—শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৯৬
র পেটের ভাই—শ্রীআশীষ গুপ্ত ৪১৪
কমলার মণি (কবিতা)—
শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী ৪৫৩
র জীবনসঙ্গীত—শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ... ৪৮০
(কবিতা)—মৌলবী মোতাহের হোসেন ... ৮৪০
(গল্প)—পূজারী ৫৫৮
(কবিতা)—কুমারী মমতা মিত্র ৭২৩
(কবিতা)—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী ৯৯
সন্ধি (উপন্যাস)—শ্রীনাগেশচন্দ্র চৌধুরী ... ৩১
২২৮, ৪০৬, ৫১২, ৬৩০, ৭৮৬
যৌবন-শেষে (কবিতা)—শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত ... ১৪১
াগ (গল্প)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ৬৪৬
াচি—প্রাচীন ও আধুনিক—
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৫২
রঙ্গি-ফটো (গল্প)—শ্রী...চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১২৪
রোমের স্থাপত্য বৈভব—শ্রীহরিহর শেঠ ৪২
রোবাইয়াৎ-হাফেজিয়ানা—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ... ৩০৫
লাভের কড়ি—শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী ৩৬৮
শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ... ৩৪০
শিকারী (গল্প)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ২৬১
শীত-প্রাতে—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় ৪৬৫
শেষের কবিতা—শ্রীনবেন্দু বসু ১৯০
শেষ দান (গল্প)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫৩৭
শ্বেত পরী (কবিতা)—শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ... ৬১০
সঙ্গীতের জন্মকথা—শ্রীমণিলাল সেন ৮৩৩
সত্যাসত্য (উপন্যাস)—শ্রীনীলাম্বর রায় ২১,
২২০, ৩৮৮, ৫৯৯
স্বপ্নমায়া (নাটিকা)—শ্রীনীরদবরণ দাশগুপ্ত ... ৪৯৪
সম্বল (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দত্ত ৯৬
সমর্পণ (কবিতা)—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৭৩৬
স্বরলিপি—
শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত ১০০
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ১০২
শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত ৩৫৭
ঐ ৪৮৫
ঐ ৬৯২
ঐ ৮১৮
সাংখ্যমতে ঈশ্বরের পুরুষত্ব—
শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ... ১৫
সাধনার ধন (কবিতা)—
শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ৫৭
স্বামীতীর্থ (গল্প)—শ্রীআশীষ গুপ্ত ৬৭
সিমলায় শিবি মেলা—শ্রীসুনীলকুমার ধর ... ৫৮
সীমানা—শ্রীনীলিমা দাস ৮১
হিন্দুসঙ্গীতের মাধুর্য্য—শ্রীমণিলাল সেন ৫

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ চিত্রের নাম)

গৃহ-লক্ষ্মী (ত্রিবর্ণ)—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু	...	...	৬৫২
অসহায়—আর, কে, পাল	...	...	৯৬
কেয়াফুল—শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত	...	...	৩৪৪
ঝরাপাতা—স্যার জন এভারেষ্ট মিলে	...	...	২২০
On the Alert—জে, এম, সোয়ান	...	...	৫৪৮
লর্ড কারমাইকেলের শিকার-শিবির—ডি, দত্ত	...		৫০০
শিবপার্ব্বতী—শ্রীদুর্গেশচন্দ্র সিংহ	...	...	২৯৭
জননী—শ্রীপঞ্চানন কর্ম্মকার	...	...	১৪৯
বৃথাই খোঁজা বন্ধু তোমার (দ্বিতিন)—শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৭২
দি মিরর অব ভিনাস—বার্ণ জোন্স	...	...	৩৯২
পাঠরতা (ত্রিবর্ণ)—শ্রীভবানীচরণ লাহা		...	৮২৮
সরিৎ—শ্রীমণিকা গুপ্ত	...	...	১
মহাত্মা গান্ধী (একবর্ণ)—	...	...	৬৭৬
বুদ্ধের জন্ম (ত্রিবর্ণ)—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ		...	৫৯৭
বুদ্ধের জন্ম (ত্রিবর্ণ)—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ		...	৭৪১
স্নানার্থিনী—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৪৪৫
সাথী (ত্রিবর্ণ)—শ্রীহরিপদ বসু মল্লিক	...	...	১৯৬

বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৩৬

সরিৎ

শিল্পী—শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত

[চিত্রাধিকারী ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের সৌজন্যে]

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড	পৌষ, ১৩৩৬	প্রথম সংখ্যা

নবজীবনের দীক্ষা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁর দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক উৎসব। তাই আজ তাঁর সেই দীক্ষাদিনের ইতিহাসকে স্মরণ করব।

তার কিছু পূর্ব্বেই তাঁর জীবনে মৃত্যুর আগুন জ্বলেছিল। তারই আলোতে তিনি আপনাকে আর জগৎটাকে একবার দেখ্‌লেন। এ একেবারে নতুন দেখা। এতই নতুন যে স্পূর্ণ বুঝতে পারা যায় না, কেবল বেদনা বোধ হয়। কিসের দনা? বেদনা এই জন্যে যে, সেই পুরাতন পরিচয় এই তন জীবনের পথ দেখাতে পারে না, এর মানে বুঝিয়ে দিতে র না।

কিন্তু তিনি এই যে বৈরাগ্যের আঘাতে জেগে উঠলেন ক শূন্যতার মধ্যেই জাগ্‌লেন? তাঁর পূর্ব্বজীবনের পর্দা ছিন্ন হয়ে গেল তখন সাম্‌নে তাঁর কি মৃত্যুরই গহ্বর াশ পেলে? তা নয়, পূর্ব্বে তিনি ছিলেন বেড়ার মাঝ-ন, এখন সেই বেড়া ভেঙে যেতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন থর মধ্যে।

মানুষ যতদিন বেড়ার মধ্যে থাকে ততদিন তার ?র ানো গম্যস্থান আছে, একথা কেউ তাকে বলে না। সব দেয়ালগুলোই বলে, এইখানেই আশ্রয়, এইখানেই বিশ্রাম। কিন্তু পথে বাহির হলেই পথ কেবলি বলে, এইখানেই স্থিতি নয়; চল্‌তে হবে, জান্‌তে হবে, পেতে হবে।

একেবারেই উল্টো কথা। বেড়ার কথা থেকে রাস্তার কথা। সংসারের মানেটাই বদ্‌লে গেল। আগেকার জীবনের সঙ্গে আগেকার অভ্যাসের মিল ছিল, এখনকার জীবনে তার কোন মূল্যই রইল না; শুধু তাই নয়, অ বাধা হয়ে উঠল। সেই জন্যেই আরম্ভে এমন বিষম ব্যাকুলতা—কেননা আহ্বান সামনের দিকে কিন্তু বন্ধন পিছনের দিকে।

বন্ধন যতক্ষণ স্থিতির পক্ষে সহায়তা করেছিল ততক্ষণ তা আশ্রয়। কিন্তু পথের ডাক শুনেই বোঝা গেল সেটা মিথ্যা, সেটা একটা আপদ।

সাংসারিক আমি, ছোট আমি, আপনার আরাম নিয়ে, ধনজনমান নিয়ে, অহঙ্কার নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছিল—তার আয়োজনের তার উপকরণের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর আঘাতমাত্রেই সে সমস্ত একেবারে শূন্য হয়ে গেল।

এই কুয়াশা যখন কেটে গেল তখন সূর্য্যকে কি পাওয়া যাবে না? সংসারের ছোট আমিটা মৃত্যুর কাছে যখন আর আত্মসমর্থন করতে পারলে না তখন কি শূন্যতারই চরম জয়

হয় ? চির জীবনের বড় আমি যে আত্মা সে কি মৃত্যুর সমস্ত রিক্ততা পরিপূর্ণ ক'রে দিয়ে দেখা দিল না ?

মহর্ষি সেই পরিপূর্ণতার আভাস পেলেন ব'লেই বেড়ার জীবনটা ফেলে দিয়ে পথের জীবন সুরু ক'রে দিলেন। তিনি ভোগের আয়োজন ফেলে দিয়ে সন্ধানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। ক্ষোভের মাথায় মানুষ যাই বলুক, শূন্যতাকে কখনই সে বিশ্বাস করতে পারে না—সেইজন্যেই যখন হরণের দুর্যোগ আসে তখনি মানুষের পূরণের দিন আসন্ন হয়।

এতদিন তাঁর ধন ঐশ্বর্য অত্যন্ত বাস্তবরূপে তাঁর সমস্ত জীবন পূর্ণ ক'রে ছিল; যেই সে-সমস্ত মৃত্যুর স্পর্শে ছায়া হয়ে গেল, অমনি তিনি বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠলেন, "এই যে আমি !" এমন কিছুকে সেদিন তিনি স্পষ্ট ক'রে অনুভব করলেন মৃত্যু যাকে সরিয়ে দিতে পারে নি।

কিন্তু সেই আমি সত্য হয়েচে কার মধ্যে ? তার জগৎ কোথায় ? এইটি জানতে না পারলে এই জাগ্রত আমির দুঃখ কিছুতেই আর মিটতে পারে না। এতদিন উপকরণ দিয়ে যাকে ভোলানো গিয়েছিল এ ত সে নয়। ধন দিয়ে মান দিয়ে এর প্রশ্নের উত্তর দেবে কি ক'রে ? এ যে দারিদ্র্যকে স্বীকার করতে উদ্যত, এ যে অপমানকে বহন করতে উৎসুক।

এই যে আমি সমস্ত সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চলেইচে, এর গতি কোথায়, এর আশ্রয় কোথায়, এর আনন্দ কোথায় এই সন্ধানে তিনি বেরলেন। সেই সন্ধান মিলল একটি বাণীর মধ্যে :—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

পূর্ব্বেকার জীবনে তাঁর জগৎকে আচ্ছন্ন দেখেছিলেন তাঁর ক্ষুদ্র আপনাকে দিয়ে। তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাইরের ধনের দিকে ছিল, সে আকাঙ্ক্ষার বিরাম ছিল না। এই মন্ত্রে তাঁকে ব'লে দিলে জগতে যা কিছু চল্‌চে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখ, এবং জান যে তিনি তোমার জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যেই আপনাকেই দান করচেন; তাঁর সেই দানই অন্তরে গ্রহণ কর, বাইরের ধনের প্রতি লোভ কোরো না।

এই মন্ত্রে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর আশ্রয়ের ভিৎ বদলাতে হবে, শুধু এর মেরামৎ নয়; নিজেকে যে সিংহাসনে বসিয়েছেন সেই সিংহাসনে তাঁকে বসাতে হবে। আপনাকে দিয়েই সংসারের সকল জিনিষের মূল্য যাচাই না ক'রে পরম সত্যকে দিয়ে করতে হবে এবং বাইরের ধন-লাভকে দিয়ে ভোগকে না মেপে অন্তরের প্রেমকে দিয়ে তাকে মাপতে হবে।

মৃত্যু আসে, ক্ষণকালের জন্য আমাদের বৈরাগ্য আনে; কিন্তু আমাদের অভ্যাসের প্রাচীর এমন মজবুত যে, সামান্য একটু ছিদ্র পতন ক'রে সে ছিদ্র দেখতে দেখতে আবার বুজে যায়। তাই আমরা সহজে এমন দীক্ষা গ্রহণ করিনে যে দীক্ষা আপনার জায়গায় সত্যকে, ধনের জায়গায় প্রেমকে স্বীকার করায়। বৈরাগ্যের পরম মুক্তি অন্ধকারে বিদ্যুতের মত আসে, সূর্য্যের মত উদিত হয় না।

শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতির জীবনেও মৃত্যুর আঘাত এসে পৌঁছয়, দীর্ঘকাল যে ব্যবস্থা চলছিল সে ব্যবস্থা টেঁকে না, যে অর্থ জমছিল সে সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে যায়, উন্নতির যে পথ শ্রদ্ধা লাভ করেছিল সে পথের উপর অবিশ্বাস জন্মে। তখন সমস্ত জাতির মধ্যে একটা বৈরাগ্যের দিন আসে। এই বৈরাগ্যের আলোকে নিরাসক্তভাবে সত্যকে দেখবার ইচ্ছা যদি বা মনে আসে তবু তার বাধা সহজে দূর হ'তে চায় না। তাই নূতন জীবনের দীক্ষা সহজ হয়ে ওঠে না,—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" এ বাণী দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয়, কিন্তু অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পায় না।

আজকের দিনে য়ুরোপ ধন মান প্রতাপ ও বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই য়ুরোপের আসন আজ

...র আঘাতে যেমন ক'রে ট'লে উঠেচে ইতিহাসে এমন ...য় দেখা যায় না। বাইরের সেই টলার সঙ্গে তার অন্তর ট'লে ওঠেনি তা নয়—জীবনসমস্যা আর একবার চিন্তা ...রে দেখতে সে প্রবৃত্ত হয়েচে। কিন্তু নূতন জীবনের দীক্ষা ...ওয়া ছাড়া তার কি আর কোনো পথ আছে?

য়ুরোপে একদিন ফ্যুডাল তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। সেই তন্ত্রে ...খানকার নিম্নস্তরের জনসাধারণ উচ্চস্তরের শাসনকর্ত্তাদের ...র্থভার বহন ক'রে এসেচে—একদলের দাসত্বের উপর আর ...কদলের প্রভুত্ব নির্ভর করেচে। তার পরে আজ সেখানে ...মক্রেসির প্রাদুর্ভাব। এই ডিমক্রেসির প্রভাবে সেখানকার ...মাজে অন্য ভেদরেখা ক্ষীণ হ'য়ে এসে ধনীনির্ধনের ভেদরেখা ...পুল হ'য়ে উঠেচে। এখন সেখানে অনেকদিন থেকেই ...নিকের স্বার্থ কর্ম্মিকেরা বহন ক'রে এসেচে। এই ধনিকের ...র্থজাল আজ সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করেচে।

এই স্বার্থ যতই বিপুল হয়ে উঠেচে, এই স্বার্থের সংঘাতও ...তই ভয়ঙ্কর হয়েচে। সেই সংঘাতের ভীষণ রূপ আমরা ...দখচি। এই ভীষণতা বিজ্ঞানের সহায়তায় ভাবী কালে ...মারো যে বিরাট মূর্ত্তি ধরবে তার আর সন্দেহ নেই।

য়ুরোপে আজ তাই সমাজকে গ'ড়ে তোলবার কাজে ...ার একবার হাত লাগাবার কথা হচ্চে। কিন্তু "তেন ...্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং" একথা এখনো স্পষ্ট ...'রে মনে উঠ্‌চে না। পূর্ব্বে যে স্বার্থের এক মহল দুর্গ ...ছল তার জন্যে আজ সাতমহল দুর্গ বানিয়ে তাকে নিরাপদ ...রবার ইচ্ছা য়ুরোপে জেগে উঠেচে। একথা বুঝেও বুঝচে না ..., স্বার্থ কখনো বিরোধ মেটাতে পারে না। তাই একদিকে ...স্তির কথা চল্‌চে আর একদিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্রও ...নিত হচ্চে। সেখানকার সমাজে বণিকের বেশে যে স্বার্থ ...দীতে ব'সে আছে, রাজার বেশে যে স্বার্থ সিংহাসনে,—তারা ...জের বাহ্যবেশ অদলবদল বদ্‌লাতে রাজি আছে, কিন্তু কি ...পায়ে তাদের গদী তাদের সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী হয় ...চিন্তা কিছুতে তাদের মন থেকে ঘুচতে চায় না।

কিন্তু হয় নবজীবনের দীক্ষা নিতে হবে, নয় বারে বারে ...ত্যুর পরে মৃত্যু এসে সমস্ত লোপ ক'রে দেবে; এর মাঝখানে কোন রফা নিষ্পত্তির কথা চল্‌বে না। নিজেকেই ঈশ্বর ক'রে এই চলমান জগতের সমস্ত চলাকে নিজের প্রয়োজনের দ্বারা চিরকাল অবরুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে সৌভাগ্যক্রমে এমন ক্ষমতা বিশ্বে কারো নেই। বাঁধ ভাঙবেই; সে বাঁধ আরো বড় ক'রে বাঁধতে গেলে আরো বড় রকমের প্রলয়ের মধ্যেই ভাঙবে। তাই বলচি, সত্যকে অন্তরের মধ্যে না পেয়ে মিথ্যাকে বিধিবিধানের জোরে বাইরের দিকে ঠেকাবার চেষ্টা বড় অপঘাতের দ্বারা মরবারই চেষ্টা—সেই অপঘাত হঠাৎ আস্‌বে, তাকে কেউ সামলাতে পারবে না। য়ুরোপে আজ ভাবুক দলের কেউ কেউ বল্‌চেন—"এত দুঃখ ব্যর্থ হল, স্বার্থ প্রবলতর হয়ে উঠল, মন কঠিনতর হ'য়ে উঠেচে, পাপ সমূলে উৎপাটিত হল না; আবার মার খেতে হবে, আবার মরতে হবে, সেই আরো দুঃখের দিন আস্‌চে, দীক্ষার দিন এখনও এল না।"

নবজীবনের দীক্ষা যে-কেউ গ্রহণ করে, সমস্ত মানুষের হয়েই সে গ্রহণ করে, এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সত্য যেখানেই প্রকাশ পায় সেখানেই সমস্ত মানুষের জন্যই সে সঞ্চিত হয়, সমস্ত মানুষেরই প্রাণশক্তির সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ হয়। সমস্ত মানুষের হয়ে সত্য দীক্ষা 'গ্রহণ' করবার অধিকার আমাদেরও আছে। দুঃখপীড়িত জগতের মাঝখানে ব'সে আজ আমাদের পক্ষে এই কথা গভীরভাবে ভাববার দিন। মানুষকে তার অহমিকা থেকে নড়িয়ে দিয়ে তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার যে দীক্ষামন্ত্র, সেই মন্ত্র আমাদের প্রত্যেকের হোক্।

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

এই বাইরের জগতে যা কিছু চল্‌চে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত ক'রে জানবে এবং অন্তরের জগতে যা কিছু ভোগ করি সে সমস্তকে তাঁরই দান ব'লে গ্রহণ করবে, বাইরের ধনে লোভ করবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচীন ভারতে কুরুবংশ

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা,এম্‌-এ, বি এল,পি-এইচ্‌-ডি

২

বৈদিক নির্ঘণ্টের (Vedic Index) গ্রন্থকারেরা মনে করেন যে, যে সব আর্য্যপ্রবাহে ভারতবর্ষ প্লাবিত হয় কুরুরা তাহাদের অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী প্রবাহেরই প্রতিনিধি। তাহারা বলেন, "কুরু পঞ্চালের ভৌগলিক অবস্থান হইতেই মনে হয় যে তাহারা কোশল-বিদেহ, কাশী প্রভৃতি স্থানের আর্য্যদের পরে ভারতে আগমন করে এবং পশ্চিম হইতে আগত এই নূতন আর্য্য ঔপনিবেশিকদের চাপেই কোশল-বিদেহ অথবা কাশীর আর্য্যেরা পূর্ব্ব দিকের প্রদেশ সমূহে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের আগমনের সময় এবং যাঁহারা তাঁহাদের পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিবেশী ছিলেন তাঁহাদের আগমনের সময়—এই উভয় সময় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না।" (Vedic Index, Vol. I., pp. 168-169)।

কুরুদের ভারতে আগমন

পপঞ্চসুদনীতে কুরুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটি এই—মহা মন্ধাতা জম্বুদ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন; (তাঁহার এই চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণের কারণ,তাঁহার অধিকারে একটি চক্র রতণ ছিল। এই চক্রের সাহায্যে তিনি যদৃচ্ছা গমন করিতে পারিতেন। এবং যেহেতু তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা সেই হেতু তিনি যে কোনও স্থানে গমন করিতে পারিতেন। তিনি পূর্ব্ব-বিদেহ, অপর-গোয়ান, উত্তর কুরু জয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেব লোকও জয় করেন। উত্তর-কুরু হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই প্রদেশের বহু লোক মহামান্ধাতার অনুসরণ করিয়া জম্বুদ্বীপে আগমন করে। জম্বুদ্বীপের যে প্রদেশগ্রাম এবং নগর প্রভৃতিতে এই লোকগুলি বাস করিতে থাকে তাহাই কুরুরাষ্ট্র নামে পরিচিত হয়। এই অর্থেই কুরুসু এই শব্দটি পালিবৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে। (Papancasudani pp. 225-226)

কুরুদের আগমন সম্পর্কে বৌদ্ধ বিবরণ

কুরুদের প্রাচীন রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর। হস্তিনাপুর যুক্তপ্রদেশের মিরাট জেলায় গঙ্গার উপর অবস্থিত। তাহাদের দ্বিতীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীর কাছে বর্ত্তমানে ইন্দ্রপট নামে পরিচিত। মহাভারতের বিবরণ অনুসারে, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার উপরে প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুরে থাকিয়াই যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চ পাণ্ডবকে যমুনার উপরে একটি জেলা দান করেন। সেইখানে পাণ্ডবদের দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা হয়। (Rapson, Ancient India, p. 173) কুরুদের প্রাচীন রাজধানী কবে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু পাণ্ডবেরা যে নূতন রাজধানী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার গৌরব আজ পর্য্যন্তও ম্লান হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই খানেই ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে আরও নূতন জীবন দান করিয়াছেন। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ভাষ্যে উল্লিখিত প্রাকৃত বিবরণ অনুসারে কুরুরাজ্যে ইসুকার (প্রাকৃতে উসুয়ার অথবা ইসুয়ার) নামে একটি সমৃদ্ধশালী বিখ্যাত নগর ছিল। নগরটি স্বর্গের ন্যায় সুন্দর ছিল। (Jainasutras, pt II, p. 62. n.) বুদ্ধ যে সময় জীবিত ছিলেন তখন কুরুরাজ্যে যে আরও বহু নগর ছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্যুক্ত নিকায়ে কুরু নগর কম্মাস ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। এই নগরটিকে কম্মাসদম্ম নামেও অভিহিত করা হইত। ইহার এইরূপ নামের কারণ বোধিসত্ত্ব যখন পঞ্চাল রাজ জয়দ্দিনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি কম্মাসকে জয় করিয়াছিলেন। (Papancasudani, pp. 226-227)

কুরু নগর

কম্মাসদম্ম থেরী নন্দুওরেরও জন্মভূমি ছিল। এই নন্দুওরের গল্প পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কম্মাসর গল্পের বিবরণ জয়দ্দিস জাতকে পাওয়া যায়। গল্পটি এইরূপ। বোধিসত্ত্ব পঞ্চাল-রাজ জয়দ্দিসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজার একটি পুত্রকে এক যক্ষিনী হরণ করিয়া লইয়া গিয়া পালন করে। যক্ষিনীরা বৌদ্ধ-সাহিত্যে নর-মাংসাশী রূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুত্রটিও যক্ষিনীর সঙ্গে থাকিতে থাকিতে গোরস্থান হইতে নরদেহ তুলিয়া ভক্ষণে অভ্যস্ত হয়। রাজাকে এই ব্যাপার জানানো হইল, এবং রাজা তাহাকে বন্দী কবিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজপুত্র যক্ষস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাকে বন্দী করা গেল না সে পলায়ন করিল। অতঃপর সে বনে গিয়া আত্মগোপন করে। সেইখান হইতে কখনও গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে হত্যা করিয়া সে ভোজন করিত, কখনও বা যাহারা বন-পথে গমন করিত তাহাদিগকে হত্যা করিত। বোধিসত্ত্বই অবশেষে তাহাকে জয় করেন। ইহার এক পায়ে একটি স্ফোটক থাকায় পাটি স্ফীত ছিল বলিয়া এই যক্ষটির নাম কম্মাস হইয়াছিল। (Fausfoll, Jataka, vol. p. 21 foll) এ গল্পটি যে পৌরাণিক গল্প কল্মাসপাদেরই রূপান্তর মাত্র তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুরুদের আদিম রাজাদের সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতের যুগে ভীমসেনের দ্বারা সম্রাট জরাসন্ধের নিধনের পর যখন রাজগৃহের মগধ সাম্রাজ্যের পতন হয় তখনই কুরুরা উত্তর ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে কুরুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যযাতি এবং বৃষপর্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র এবং নহুষের পৌত্র পুরু, পুরুরবা হইতে পঞ্চম পুরুষ। মানব বংশের পিতা মনুর দুহিতার নাম ইলা পুরুরবা এই ইলারই পুত্র। যযাতি পুত্র পুরুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক যোগসাধনা করিতে থাকেন এবং তাহার পুর স্বর্গে গমন করেন। এই পুরু হইতে যে বংশের উদ্ভব হয় তাহাই পৌরব বংশ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। (আদিপর্ব্ব-বঙ্গবাসী সংস্করণ ৭৫ অধ্যায়, পৃঃ ৮৬-৮৮; অধ্যায় ৮৫, পৃঃ ৯৬)

পুরুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতের এবং পুরাণের বিবরণ

সম্বরণ পুরু হইতে দশম পুরুষ। যখন পঞ্চালরাজ তাঁহার রাজ্য জয় করেন তখন সম্বরণ স্ত্রী, পুত্র এবং মন্ত্রীদের সহ সিন্ধুতীরে অরণ্যমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি দীর্ঘদিন বাসও করেন। অতঃপর পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্যে তিনি রাজ্য ফিরিয়া পান। রাজ্য প্রাপ্তির পর সূর্য্য তনয়া তপতির গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রণ করে। এই পুত্রের নামই কুরু। কুরুর বহু গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া প্রজারা তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। তাঁহার নাম হইতেই রাজ্যটির নাম কুরুক্ষেত্র অথবা কুরুদের বাসভূমিরূপে বিখ্যাত হয়। (Adiparva, Ch. 94, p. 104) কুরুর বংশধরের নাম শান্তনু। শান্তনুর ঔরসে এবং ধীবরের পালিতা কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম। এই বিচিত্রবীর্য্য সন্তানহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। বিচিত্রবীর্য্যের মাতার অনুরোধে তাঁহার পত্নীর গর্ভে ব্যাসদেব দুইটি পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন। এই দুইটি পুত্রের এক জনের নাম ধৃতরাষ্ট্র এবং আর এক জনের নাম পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র গন্ধার রাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই গান্ধারীর গর্ভেই দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ শতপুত্রের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রেরাই কুরু অথবা কৌরব নামে পরিচিত (Adiparva, Ch. 105, p. 95)

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ, বিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বংশানুক্রম পাওয়া যায়:—

কুরু
|
জনহ্নু
|
সুরথ
|
বিদূরথ
|
সার্ব্বভৌম
|
জয়সেন
|
আরাবী
|

আয়ুতায়ু
|
অক্রোধন
|
দেবতিথি
|
ঋক্ষ
|
ভীমসেন
|
দিলীপ
|
প্রতীপ
|
দেবাপি—শান্তনু—বল্‌হিক
|
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য ভীষ্ম
|
পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র
|
দুর্য্যোধন

ভবিষ্য পুরাণে নিম্নলিখিত বংশানুক্রম প্রদত্ত হইয়াছে:—

হস্তি
|
অজামীল্‌
|
রক্ষপাল
|
সুশারুম্‌
|
কুরু
|
জনহু
|
সুরথ
|
বিদুরথ
|
সর্ব্বভৌম
|
জয়সেন
|
অর্ণব
|
চতুঃসাতোরগামী
|
অযুতায়ু
|
অক্রোধন
|

ঋক্ষ
|
ভীমসেন
|
দিলীপ
|
প্রতীপ
|
শান্তনু
|
বিচিত্র বীর্য্য
|
পাণ্ডু

ভাগবত পুরাণে (৯ম স্কন্ধ, অধ্যায় ২২) নিম্নলিখিত রূপ বংশানুক্রম পাওয়া যায়:—

শান্তনু
|
বিচিত্রবীর্য্য
|
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু

মহাভারত এবং পুরাণে, যযাতি পুরুদের আদিপুরুষ এবং কুরুরা পুরুদেরই একটি শাখা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যযাতি অনেকগুলি যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধে তিনি দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু পুত্রের ভিতর বয়ঃজ্যেষ্ঠ যাঁহারা তাঁহাদিগকে অবাধ্যতার জন্য তিনি পরিত্যাগ করেন এবং বনে গমনের সময় কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। (Mahabharata, Dronaparva ch. 16 p 1035) যাঁহার নাম হইতে সমগ্র ভারত ভারতবর্ষ নাম লাভ করিয়াছে সেই ভরতের জন্ম বিবরণ মহাভারতে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসও অভিজ্ঞান শকুন্তলায় এই স্মরণীয় ঘটনার একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ছোট খাট দুই একটি ব্যাপারে মহাভারতের বিবরণ হইতে কালিদাসের বিবরণ অনুরূপ হইলেও মূল ব্যাপারগুলিতে উভয় বিবরণে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। মহাভারতে দেখা যায় যে পুরুর বংশধর রাজা দুষ্মন্তের ভরত নামে এক পুত্র ছিল। তিনি তাঁহার মাতা শকুন্তলার দ্বারা অরণ্যে প্রতিপালিত হন। তাঁহার শরীরে অসীম শক্তি ছিল। বনের দুর্দ্দান্ত পশুদিগকেও তিনি বলে পরাজিত করিতেন। তিনি যমুনার তীরে

কুরুবংশের আদি নরপতি সমূহ

অনেকগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋষি কণ্বকে বহু ধন রত্ন এবং ব্রাহ্মণদিগকে হস্তী, রথ, উষ্ট্র, ছাগ, দাস দাসী, গাভী, গ্রাম, গৃহ এবং বেশভূষা প্রভৃতি তিনি অকাতরে দান করেন। (Dronaparva-ch. 66, p. 1037)

ভারতের বংশধর প্রতীপ একজন কৌরব নৃপতি। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রপিতামহ। তাঁহার যশ সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ন্যায় এবং ধর্ম্মের সহিত তিনি রাজ্য শাসন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্রের নাম—দেবাপি, বাহ্লীক, শান্তনু ইঁহাদের ভিতর দেবাপি ছিলেন কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত। তিনি অত্যন্ত সাধু-চরিত্র ও জন প্রিয় ছিলেন। তিন ভ্রাতার ভিতর সুনিবিড় সৌহার্দ্দ ছিল। কুরু রাজ্যের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং অধিবাসীরা কুষ্ঠ ব্যাধির জন্য বাধা প্রদান করায় রাজা প্রতাপ দেবাপিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দেবাপি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহ্লীক তাঁহার মাতুলালয়ে গমন করেন। প্রতীকের মৃত্যুর পর বাহ্লীকের অনুমতি অনুসারে শান্তনু কুরু সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। (Udyogaparva, ch. 149 p. 771)

শান্তনুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য এবং পৌত্রদ্বয় পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র কুরুসিংহাসনে আরোহন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্য্যোধন। মন্ত্রের প্রভাবে দুর্য্যোধন অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ক্ষমতা ছিল, মাটি বা পাহাড় ধ্বসিয়া গেলে তিনি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন, ঝড় বা শিলা বৃষ্টি পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারিতেন। জল প্রবাহকে বন্ধ করিবার তাঁহার এরূপ শক্তি ছিল যে রথ, পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি অনায়াসে তাহার উপর দিয়া গমন করিতে পারিত। দেবতা ও দানবের চিত্ত-বৃত্তিকে তিনি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন। উদ্যোগ পর্ব্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অধ্যায় ৬১, পৃঃ ৭০৭) কলিঙ্গের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বরের সময় তিনি কলিঙ্গ-রাজধানী শ্রীরাজপুরে গমন করেন। রাজকুমারী যখন দুর্য্যোধনকেও অতিক্রম করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের সাহায্যে এবং নিজের পরাক্রমে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া রথে স্থাপন করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন। (শান্তিপর্ব্ব, অধ্যায় ৪, পৃঃ ১৩৭৮) এই দুর্য্যোধনের সময়েই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মহাভারতের বিষয়বস্তু কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের উল্লেখ না করিয়া কুরুদের সম্পর্কে কোন বিবরণই সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে না। দুই লক্ষ শ্লোকের দ্বারা সম্পূর্ণ এই মহাকাব্যখানির কেবলমাত্র মূল কথাটা লইয়াই যদি আলোচনা করা যায় অর্থাৎ আমাদের আলোচনা

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ

যদি কেবলমাত্র যুদ্ধ এবং তাহার কারণের ভিতরেই নিবদ্ধ থাকে, যদি কেবলমাত্র মূল বিষয়গুলিরও চুম্বক দিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহাও সহজ কাজ বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আমরা এখানে এই যুদ্ধের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।

পণ্ডিতদের কেহ কেহ মনে করেন, এই মহাকাব্যে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধই বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা

কুরু পরিবারের দুই শাখার ভিতর বিপদ

একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থের বিষয় কুরু-পঞ্চালের যুদ্ধ নহে, তাহার বিষয় কুরুরাজ পরিবারের দুই শাখার ভিতর যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহারই আলোচনা। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্মের ইতিহাস পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। সুতরাং বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডুই শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এ পর্য্যন্ত ব্যাপারটার ভিতর জটিলতার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় ভ্রাতার ঔরসে পুত্র জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই জটিলতা জট পাকাইতে সুরু করে। তাহার পর যে সন্দেহজনক অবস্থায় পাণ্ডবদের পঞ্চভ্রাতা (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব) রাজধানী হইতে স্থানান্তরে নীত হন, তাহার দ্বারা সমস্যা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠে। পিতার সহযোগে এবং দুর্য্যোধনের নেতৃত্বে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, পাণ্ডবেরা যখন বালক ছিল তখনই তাঁহাদিগকে

করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্ধুদের সাহায্যে পাণ্ডবেরা এই সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহাদের পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ যাচ্‌ঞা করেন। পাণ্ডবদের পক্ষে জনমত অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে একটা মিটমাটের সত্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর পাণ্ডু পুত্রেরা অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক নিজেদের পরাক্রমে রাজ্যজয় করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে তাঁহারা বিশেষ সাফল্যও অর্জ্জন করেন। ভারতবর্ষের নৃপতিদের ভিতর তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় স্বরূপ তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। দূরবর্ত্তী দেশের লোকের কাছেও তাঁহার ধন-সম্পদের খ্যাতি সুবিদিত ছিল। ময়দানব তাহার সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তাঁহার ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যের কথা শুনিয়া দুর্য্যোধনের মনে ঈর্ষার বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। তিনি খলস্বভাব মাতুল শকুনীকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ পরিদর্শনের জন্য গমন করেন। অবশেষে শকুনীর মন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করা হয়। তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়দের ভিতর দ্যূতক্রীড়া সম্মানের বস্তু ছিল এবং দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান অস্বীকার করা অপেক্ষাও অপমানকর ছিল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা সম্ভবপর হইল না এবং শকুনী অসাধু উপায় অবলম্বন করায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। খেলার সর্ত্ত অনুসারে ভ্রাতাদের সহ এবং পত্নী দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরকে বনে গমন করিতে হইল। পাণ্ডবেরা ক্রমাগত বার বৎসর সস্ত্রীক বনে বাস করেন। ১২ বৎসর বনবাসের পর একবৎসর অজ্ঞাত-বাসের সর্ত্ত ছিল। এই অজ্ঞাত বাসের বৎসর তাঁহাদের বিরাট রাজার রাজ্য মৎস্য দেশে অতিবাহিত হয়। নির্ব্বাসন সময়ের অন্তে তাঁহারা তাঁহাদের পরিচয় আবার জন-সমাজে ব্যক্ত করিলেন।

ত্রিগর্ত্ত এবং কুরুরা বিরাটের গাভীদল হরণ করিবার জন্য গমন করেন। পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে মৎস্যরাজ বিরাট এবং তাঁহার প্রজা-সাধারণের শ্রদ্ধা যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতাদের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। বিরাটের সহিত পাণ্ডবদের প্রীতির এই বন্ধন, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত বিরাটের কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আরও দৃঢ় করা হয়। তাহা ছাড়া তাঁহাদের আত্মীয় পঞ্চালেরাও যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিলেন। সুতরাং যে রাজ্য পাশা খেলায় পাণ্ডবেরা হারাইয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করার একটা চেষ্টা আবার আরম্ভ হইল। কৌশলে, যে রাজ্য দুর্য্যোধন অধিকার করিয়াছেন তাহা সে স্বেচ্ছায় ফিরাইয়া দিবে না এই কথা মনে করিয়া পঞ্চালরাজ দ্রুপদ যুদ্ধের দ্বারা তাহা জয় করিয়া লইবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। দ্রুপদের পরামর্শ আরও অনেকের সমর্থনলাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যজয় ব্যাপারে পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিবেশী রাজারাও নিমন্ত্রিত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা এবং সেই উদ্দেশ্যেই যদুপতি কৃষ্ণ বাসুদেবকে কুরুদের সভায় প্রেরণ করা হইল। দুর্য্যোধন তাঁহাকে বলিলেন —"যতক্ষণ আমার দেহে জীবন আছে ততক্ষণ আমি পাণ্ডব-দিগকে সূক্ষ্ম সূচের মাথায় যতটুকু মাটি ধরে ততটুকু মাটিও দান করিব না। যে রাজ্য কখনও দেওয়া সঙ্গত ছিল না আমি পরের উপর নির্ভর করায় সেই সেই রাজ্যই তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডু পুনরায় সে রাজ্য এখন আর কিছুতেই লাভ করিতে পারিবেন না।" (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব বঙ্গবাসী সংস্করণ, Chap., 127)

শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য

হস্তিনাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুরুরা যাহা বলিয়াছে কৃষ্ণ বাসুদেব তাহা পাণ্ডবদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। দূরে এবং কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হইতে মিত্রেরা নিমন্ত্রিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজারাও তাঁহাদের সাহায্য প্রেরণ করিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি তখন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা সকলেই দুই পক্ষের কোনও-না-কোনও পক্ষে আসিয়া সমবেত হইলেন। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব— ১৬৩ অধ্যায়)।

দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতন, ভীমসেন—এই সাতজন পাণ্ডব সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, অধ্যায় ১৫১) ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, অধ্যায় ১৬৩) পাণ্ডব পক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন অর্জ্জুন। পাণ্ডব পক্ষের সকলেরই ধারণা ছিল যে, তাঁহার ব্যক্তিগত বীরত্বের উপরেই এই মহাযুদ্ধের ফলাফল প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কৃষ্ণ বাসুদেব এই অর্জ্জুনের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁহার বন্ধু, উপদেষ্টা ও পরিচালক। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাই কৃষ্ণ বাসুদেব, "সঙ্কর্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অসাধারণ বুদ্ধিমান জনার্দ্দন" বন্ধুর রথে সারথ্য করিবার ভার গ্রহণ করেন।

উভয় পক্ষের বলাবল

তখনকার দিনে এবং পরবর্ত্তী যুগেও ভারতীয় সৈন্যের চারিটি বিভাগ ছিল—পদাতিক, হস্তী, রথ এবং অশ্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে উপনীত হইয়া পরাক্রমশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধভূমির পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সমন পতঞ্চক নামক প্রদেশের পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সহস্র সহস্র শিবির সন্নিবেশিত হইল। খাদ্য, বস্ত্র এবং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ সরবরাহের জন্য রসদ বিভাগ বিশেষ অবহিত হইলেন। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব,অধ্যায় ১৯৮) দুর্য্যোধন যে সেনাবল সংগ্রহ করিয়াছিলেন পাণ্ডব এবং তাঁহাদের মিত্র সৈন্যদের অপেক্ষা সংখ্যায় তাহা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। অনুপাতে পাণ্ডবদের সৈন্যবল সাতগুণ হইলে কৌরবদের সৈন্যবল ছিল এগারো গুণ। Ibid, Ch. 151 and Ibid, Ch. 154) অর্থাৎ যে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য এই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের এগার অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক ছিলেন দুর্য্যোধন আর সাত অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক ছিলেন পাণ্ডবেরা। ব্যক্তিগত বীরত্বের হিসাবেও বাহ্যতঃ দুর্য্যোধনের সৈন্য-বলই শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এমন তিনজন বীর ছিলেন শৌর্য্যে যাঁহারা মহাবীর অর্জ্জুনেরই সমকক্ষ। গদা পরিচালনায় তিনি নিজেও ভীমের অপেক্ষা পরাক্রমে হীন ছিলেন না। কিন্তু বিবেকের কশাঘাতই মানুষকে ভীরু করিয়া তুলে। তাই জয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও যুদ্ধের পূর্ব্বে কৌরবদের চিত্তে সংশয়ের অন্ত ছিল না। অথচ পাণ্ডবেরা ন্যায়ের বলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভেও তাঁহারা উৎফুল্ল, হৃষ্ট ও আনন্দিত ছিলেন। তখনকার দিনে ভীষ্মের মত বীর ভূভারতে আর একটিও ছিল না এবং কৌরব সৈন্যের মত এত বড় সৈন্য-সমাবেশও পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। দুর্য্যোধন তাঁহার বিপুল সৈন্যের নেতৃত্বের ভার এই পলিত কেশ ভীষ্মের উপরেই অর্পণ করিলেন। দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃগণ সহ রথীদের সম্মুখ ভাগ অধিকার করিতে দ্বিধা করিলেন না। গদা এবং অসি যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার মিত্র রাজা ভোজাধিপতি কৃতবর্ম্মণ একজন অতিরথ ছিলেন। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদের নিকট আত্মীয় হইলেও দুর্য্যোধনই তাঁহাকে হস্তগত করিয়াছিলেন। বিপুল বাহিনী লইয়া ভাগিনীয় পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষই অবলম্বন করেন। এই শল্যেরও একজন অতিরথ বলিয়া খ্যাতি ছিল।

প্রথমে ভারদ্বাজের নেতৃত্বে অবন্তীর যুবরাজদ্বয় বিন্দ, অরবিন্দ এবং বাহ্লীকের সহিত কেকয়েরা আগমন করিলেন। তাহার পর আসিলেন অশ্বত্থমা, ভীষ্ম, সিন্ধু প্রদেশের জয়দ্রথ এবং সেই সব নৃপতি দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন। গান্ধার রাজ শকুনি এবং আর যাঁহারা পূর্ব্ব এবং উত্তর প্রদেশ সমূহ হইতে আগমন করিয়া ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহাদের পরে গমন করিলেন শক, কিরাত, যবন, শিবি এবং বসাতি প্রমুখ বৈদেশিক রাজন্যগণ। ইঁহারা সকলে নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা মহারথগণকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন এবং মহারথগণ সৈন্যদের দ্বিতীয় ভাগ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের পর সসৈন্যে কৃতবর্ম্মা, মহারথী ত্রিগর্ত্ত এবং ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন আগমন করিলেন। শল্য এবং কোশলরাজ বৃহদ্বল সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের এই অনুচরেরা কুরুক্ষেত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে আপনাদিগকে স্থাপনা করিল। দুর্যোধনের শিবির এমন ভাবে গঠিত হইল যে দেখিতে তাহা দ্বিতীয় হস্তিনাপুরের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। এই সব শিবিরে একশত জন অশ্বারোহীর দ্বারা গঠিত এক একটি দলের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। যুদ্ধের সময় যাহাতে চেনা যায় সেজন্য প্রত্যেক দলকে তিনি পৃথক নাম এবং চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিলেন। দূর হইতে যুধিষ্ঠিরের ধ্বজদণ্ডের শীর্ষদেশ দেখিতে পাইয়া পাণ্ডবদের সম্মুখ ভাগে তিনি স্বীয় সৈন্যকে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় সমাজ চিরন্তন কাল হইতে যুদ্ধের যে সব নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, কুরু-পাণ্ডবেরাও তাহাই পালন করিয়া যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। স্থির হইল, কোনরূপ অসৎ উপায় অবলম্বন না করিয়া সমতুল্য ব্যক্তিরাই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবেন; প্রতিদ্বন্দীদের একই রকমের অস্ত্রের দ্বারা ভূষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে; যাহারা সমর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না; পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে না; এবং অস্ত্রহীন ব্যক্তির দেহে আঘাত করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, হস্তীপৃষ্ঠারোহী সৈনিক হস্তীপৃষ্ঠারোহী সৈনিকের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ব্যক্তিগত যুদ্ধে নিরত যোদ্ধাকে, আশ্রয়প্রার্থী, পলায়নপর, ভগ্নাস্ত্র এবং বর্ম্মহীন ব্যক্তিকে আঘাত করা হইবে না। সারথী, অস্ত্রবাহক, দামামা অথবা শঙ্খবাদক প্রমুখ ব্যক্তি যাহারা সমরক্ষেত্রে যুদ্ধনিরত নহে তাহাদিগকেও আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, অধ্যায় ১)

ন্যায় যুদ্ধের-নিয়ম

দুই সৈন্যের ভিতর এইগুলিই যুদ্ধের বিশেষ সর্ত্ত ছিল এবং বিশেষ অবস্থা ছাড়া কেহই এগুলিকে লঙ্ঘন করেন নাই। যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল সে দিন চন্দ্র মঘা নক্ষত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং জ্বলন্ত অগ্নির আকার ধারণ করিয়া সাতটি বৃহৎ গ্রহকেও আকাশে উদিত হইতে দেখা গেল।

ভীষ্মের নেতৃত্বে কুরুসৈন্যই প্রথমে অগ্রসর হইলেন, তাহার পর আসিলেন ভীমসেনের নেতৃত্বে পাণ্ডব সৈন্য। উচ্চ চীৎকার এবং বীরদের শঙ্খ নিনাদের ভিতর দিয়া উভয় সৈন্য পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। দশদিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধের পর অর্জ্জুন এবং শিখণ্ডীর বাণে বিদ্ধ হইয়া ভীষ্মদেবের পতন হইল। পূর্ব্বদিকে মাথা রাখিয়া শর-শয্যায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীষ্মের পতন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহার সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ দিলেন। কুরুদিগকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যও সমর ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপে উভয় সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বারা দশম দিনের যুদ্ধ শেষ হইল।

ভীষ্মের মৃত্যু

ভীষ্মের মৃত্যুর পর দ্রোণ কুরুসৈন্যের সেনাপতির পদে বৃত হইলেন। কর্ণ কুরুসৈন্যের সম্মুখভাগ এবং অর্জ্জুন পাণ্ডব সৈন্যের সম্মুখভাগ অধিকার করিলেন। যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইল। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্য আক্রমণ করায় যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিল। দ্রোণ সেদিন চক্রব্যূহ গঠন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। সৈন্য শ্রেণীর সম্মুখ ভাগে কুরুরাজন্যবর্গকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মধ্যদেশ রক্ষার ভার দুর্য্যোধন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত দুঃশাসনের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই তরুণ বীরের কাছে দুঃশাসন ও কর্ণ পরাজিত হইলেন। ইহার পর দুর্যোধন আসিয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণের জন্য তাঁহাদের ভিতরেও ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে অভিমন্যুর শরে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্যোধন সমর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর কোশলরাজ বৃহদ্বলের সহিত অভিমন্যুর বল পরীক্ষা সুরু হইয়া গেল। অভিমন্যুর বাণে বিদীর্ণ বক্ষ হইয়া তিনি ভূপতিত হইলেন। অতঃপর অভিমন্যু সুবলের পুত্র কালিকেয়কে দমন করিয়া গান্ধার জাতির সাতাত্তর জন অনুচরকে ধ্বংস করিলেন। ইহার পর কৌরব পক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা একত্রে মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে ন্যায় যুদ্ধের নিয়ম সমূহ কৌরবদের দ্বারা লঙ্ঘিত হইল। কৌরব সেনানায়কদের মিলিত আক্রমণ অভিমন্যু

অভিমন্যুর মৃত্যু

যখন ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন দুঃশাসনের পুত্র তখনই তাঁহার মস্তকে গদাঘাত করেন। এইরূপে এই অসম যুদ্ধের ক্লান্তিতে এবং গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অভিমন্যু ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল। উভয়পক্ষের সৈন্যেরাও রাত্রির বিশ্রামের জন্য শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

দ্রোণ তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সবেগে দ্রোণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কুরু পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

দ্রোণের মৃত্যু

করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। অতঃপর দ্রোণকে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদে দ্রোণ যখন শোকাভিভূত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে ধ্যান করিতেছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন তখনই এই ব্রাহ্মণ বীরের দেহে নির্ম্মম অস্ত্রাঘাত করিলেন। ন্যায় যুদ্ধের নিয়ম আবার লঙ্ঘিত হইল। মুখখানি ঈষৎ নমিত করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ধর্ম্মচিন্তা করিতে করিতে এবং মনে মনে ওঁ মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু মহাবীর দ্রোণ স্বর্গে প্রয়াণ করিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্য্যোধন এবং তাঁহার মিত্র রাজন্যবর্গ কর্ণকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ দুইদিন অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের

কর্ণের মৃত্যু

হস্তে নিহত হইলেন। কর্ণের মৃত্যুতে কুরু সৈন্য ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল।

কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরবদের প্রধান সেনাপতির পদে শল্যকে বরণ করা হইল। যুধিষ্ঠির তখন পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি। এবার দুই সেনাপতিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পাণ্ডবরাজ এরূপ একটি ভল্ল গ্রহণ করিলেন

শল্যের মৃত্যু

যাহার হাতল সুবর্ণ মণ্ডিত এবং মণি মাণিক্য ভূষিত। অতঃপর এই ভল্লটিকে মন্ত্রপূতঃ করিয়া এবং তাহাতে বজ্র বেগ সংযোগ করিয়া যুধিষ্ঠির তাহা শল্যের ধ্বংসের জন্য নিক্ষেপ করিলেন। চীৎকার করিয়া দেহের সমস্ত শক্তির দ্বারা শল্য সেই ভল্ল প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। ভল্ল তাঁহার মর্ম্মপ্রদেশ এবং বিশাল বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। বাহু প্রসারিত করিয়া শল্য প্রাণহীন দেহে ভূমিতলে পতিত হইলেন। এই যুদ্ধে শল্যের অনুচরেরাও ধ্বংস হইলেন। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত কতকগুলি সৈন্যসমষ্টিতে পরিণত হওয়ায় কুরু সৈন্যে আর শৃঙ্খলার চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট রহিল না।

অতঃপর সহদেব শকুনিকে কহিলেন—"সেই কপট পাশা খেলার সময় যে সমস্ত দুষ্ট লোক আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই ধ্বংস হইয়াছে—অবশিষ্ট আছ কেবল তুমি এবং দুর্য্যোধন।

শকুনির মৃত্যু

অদ্য আমি তোমার জীবনলীলার শেষ করিব।" এই বলিয়া সহদেব দশবানে শকুনিকে এবং চারি বানে তাহার অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শকুনির ছত্র, পতাকা এবং কার্ম্মুকও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তূণ নিঃশেষ হওয়ায় সুবর্ণ মণ্ডিত একটি ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক শকুনি সহদেবের অভিমুখে বেগে অগ্রসর হইলেন। সহদেবের নিক্ষিপ্ত তিনটি শরে এই উদ্যত ভল্লও খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর সুবর্ণ পালক ভূষিত উৎকৃষ্ট ইস্পাতে প্রস্তুত একটি তীরের দ্বারা সহদেব তাঁহার শত্রুর দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মস্তকশূন্য শকুনির প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

শকুনির মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এইবার পাণ্ডবদের অস্ত্রে কৌরবদের এই অবশিষ্ট সৈন্যদলও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইরূপে যে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কৌরব-

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

দের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল পৃথিবীর বক্ষ হইতে তাহাদের জীবনের চিহ্ন মুছিয়া গেল। চারিদিকে তাকাইয়া দুর্য্যোধন দেখিতে পাইলেন যে, দ্রোণের বীর পুত্র অশ্বত্থমা, কৃপ এবং কৃতবর্ম্মা ছাড়া তাঁহার বিপুল সৈন্যের আর কেহই অবশিষ্ট নাই। ইহার পর তিনি পলায়ন করিয়া একটি হ্রদের ভিতর আশ্রয়-গ্রহণ গ্রহণ করিলেন। শিকারীদের নিকট হইতে এই গুপ্ত স্থানের সন্ধান পাইয়া পাণ্ডবেরা হ্রদের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গুপ্ত স্থান হইতে [illegible]

হইয়া আসিতে বাধা করিলেন। ইহার পর উভয়ের ভিতর একটি বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বাক্‌যুদ্ধ অবশেষে ভীমসেনের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিকট চীৎকার করিয়া ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুদেশে ভীষণ বলে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। দুর্য্যোধনের দেহের উর্দ্ধাংশ শিলার মত শক্ত ছিল। অমিত শক্তিশালী বীরের গদাঘাতও এই অংশের কোনও ক্ষতি করিতে পারিত না। তাই ভীমসেন তাঁহার উরুদেশে আঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বজ্রের মত দুর্জ্জয় আঘাতে ভগ্নউরু হইয়া দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইলেন। যে কয়েকজন কৌরব যোদ্ধা জীবিত ছিল তাঁহারা তাঁহাদের শক্তিমান নৃপতিকে এই ভাবে ভূপতিত হইতে দেখিয়া গভীর শোকে অভিভূত হইল। মৃত্যুর ছায়া দুর্য্যোধনের উপর দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতেছিল এই অকাল মৃত্যুর জন্য শোক করিতে করিতে সমর ক্ষেত্রেই দুর্য্যোধন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লক্ষ্মীকে জিনিয়া লইলেন। কিন্তু এই জয়লাভ করিতে তাঁহাদেরও প্রায় সমস্ত সৈন্যই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্তি

এই মহাযুদ্ধের অবসানে, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মৃত্যুতে, ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা যে কৌরব বংশের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

ছিন্নপত্র

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম্‌-এ

টেনিসন-জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন,"কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।... কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্ম্মে, উভয়েই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহার জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"

"ছিন্নপত্র" পাঠান্তে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবন কাব্য, এবং তিনি সেই ক্ষণজন্মা ব্যক্তি যিনি কাব্যে এবং জীবনের সকল কর্ম্মে নিজের প্রতিভা বিকাশ করেচেন। তাই এই পত্রগুলির স্বচ্ছ মুকুরে প্রতি-বিম্বিত তাঁর জীবনের সহিত তাঁর কাব্যকে মিলিয়ে দেখলে যেন তার অর্থের বিস্তৃতি এবং ভাবের নিবিড়তা নূতন ক'রে উপলব্ধি করি।

একথা শোনা যায় যে, জীবনকে কাব্য ক'রে তুলতে গেলে জীবনে কাব্যের উপকরণ থাকা চাই। দৈন্যপীড়িত, সংসারভারজর্জ্জরিত কবির অসুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে কাব্যের উপকরণ কোথায়? "শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি" প্রাত্যহিক জীবনকে যেখানে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, জীবনে ও কাব্যে সঙ্গতি আশা করা সেখানে অন্যায়। এ কথার মধ্যে হয়ত কিছু সত্য আছে, কিন্তু অত্যুক্তিও অনেকটা আছে। প্রতিদিনের ক্ষুধাতৃষ্ণা, চারিদিকের প্রীতিহীন জনতার ঔদাসীন্য যে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ও আচরণে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে বাধা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধা আছে, এই কথাটাই হল সবার বড়? বাধা দূরের কথা কি মনেও আসবে না? আর আবেষ্টন অনুকূল হলেই বা ক'জন তার সুযোগ নিই, কেই-বা আমরা সাড়া দিই আমাদের চারিপাশের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডাকে?

এই চিঠি গুলি জীবনে ও কাব্যে এক পরমাশ্চর্য্য সংমিশ্রণের কাহিনী। যে-জীবনের আভাস আমরা এতে পাই সে-জীবনে প্রতিদিনের তুচ্ছতা, ছোট কাজ ছোট কথা, স্বার্থজড়িত শত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার স্থান নেই। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব, আকস্মিক ঘটনার দাসত্ব,"পীড়িত জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক সকল অশান্তি"—কবি এ সকল থেকে মুক্তিলাভ করেচেন। যা চিরকালের এবং চিরনূতন কবির চিত্ত তাতেই নিমগ্ন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস প্রায় দশ বৎসর ধ'রে আমরা কবির চিন্তা ও কর্ম্মের যে-ইতিহাস এ চিঠিগুলিতে পাই তাতে সর্ব্বত্রই দেখি বৃহতের প্রতি মহতের প্রতি তাঁর সহজ আকর্ষণ, এবং সমস্ত বিশ্ব-হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর আনন্দপূর্ণ যোগ।

প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেজে চলেচে সকল কাজের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে একান্ত বিস্ময়কর এই কবির সৌন্দর্য্যবোধ। এর তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সৌন্দর্য্য উপভোগের যে-আয়োজন ছিল সেটি মনোরম, কিন্তু তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাবও হয়ত কেউ দেখবেন। অথচ বছরের পর বছর প্রতিদিন দেখি কবির চিত্ত চারিদিকের রূপরসে কানায় কানায় পূর্ণ, এবং এত বড় দানের প্রাচুর্য্যে কৃতজ্ঞতায় বিনম্র। বাংলা দেশের নির্জ্জন প্রান্তে নদীতীর, বালুচর, উন্মুক্ত আকাশ, দিক্‌রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ বা ধানের ক্ষেত, ছায়াঘন ছোট ছোট গ্রাম, পল্লীর অনাড়ম্বর জীবন, শান্তিপ্রিয় সরলবিশ্বাসী পরমসহিষ্ণু গ্রামবাসী—এরই মধ্যে একটি অপরূপ, বিমুগ্ধ কবিচিত্ত, চারিদিকের জল স্থল আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মানুষের মনের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে প্রতিদিন নূতন ক'রে বিস্মিত, শিশুর মত পুলকিত।

* প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত।

যারা নিজে অশান্ত, চঞ্চল, এবং বাহিরেও প্রত্যক্ষগোচর গতিচাঞ্চল্য সর্ব্বদাই চায়, তাদের কাছে কবির এ-জীবন একান্ত এক ঘেয়ে, এবং এই জীবনে তাঁর এত আনন্দ অবোধ্য। কারণ, এখানে দিনরাত্রি, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত এই সবই একমাত্র ঘটনা, পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু ধরণীর ও আকাশের রূপে, মেঘে রৌদ্রে ঋতুতে ঋতুতে। কিন্তু এ যে কত বড় ঘটনা, এ পরিবর্ত্তনে যে কি অশেষ বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা, কবি তা নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেচেন :—

"এই যে ছোট নদীর ধারে, শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য্য প্রতি দিন অস্ত যাচ্চে, এবং এই অনন্তধূসর নির্জ্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্চে, জগৎসংসারে এ কি একটা আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা। সূর্য্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব্বদিক থেকে কি এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্চে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্চে সেই বা কি আশ্চর্য্য লিখন—আর এই ক্ষীণ-পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কি বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা।"

আমাদের ব্যক্তিজীবনের পুঞ্জীভূত তুচ্ছতা, স্বার্থের শত ক্ষুদ্র দাবী, এই সুগম্ভীর সুবৃহৎ ঘটনাকে আমাদের চোখের আড়াল ক'রে দেয়। চিরাগত অভ্যাস বা তত্ত্বের ঠুলি প'রে আমরা বাইরের প্রকৃতি বা মানবজীবনকে দেখবার চেষ্টা করি—সবই বিকৃত, ঝাপসা ক'রে দেখি, কিছুই নিতে পারি না, নিরানন্দ অন্ধকারে শুধু হাতড়ে বেড়াই। জীবনকে জটিল ক'রে, অসাড় মন নিয়ে আমরা দিনাতিপাত ক'রে চ'লে যাই, একবার সহজ চোখে চারিদিকে চেয়েও দেখি না, বুঝি না যে, কতবড় অমূল্য সম্পদ হেলায় হারাচ্চি।

"এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্যপরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলচে। কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর আমাদের ভিতর ভাল ক'রে তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা ক'রে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরো লক্ষ যোজন দূরে! রঙীন সকাল এবং রঙীন সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধুর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খ'সে প'ড়ে যাচ্চে. আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না।"

ঘুরে ফিরে বারে বারে চিঠির পর চিঠিতে এই কথা কবি কত নব নব রূপে বলেছেন। চারিদিকেই তাঁর একান্ত আত্মীয়ের ছড়াছড়ি, তাদের সবার সঙ্গে তাঁর শত সহস্র আনন্দ-বন্ধন—স্থলে জলে তিনি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে। লিখতে গেলেই তাদের কথা। কবে বর্ষণমুক্ত আকাশের সোনার আলো তাঁর রক্তের মধ্যে প্রবেশ করচে, কোন্‌দিন প্রকৃতি যেন স্নানের পর বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে প্রসন্নমুখে ভিজে চুল মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্চেন, কবে ঝড়ে বাগানের সমস্ত গাছপালা শিকলী-বাঁধা জটায়ুপক্ষীর মত ডানা আছড়ে ঝটপট করেচে, কবে সূর্য্যাস্তের সময় দিগন্তের শেষ প্রান্তে নীলেতে লালেতে মিশে মায়াময় আবছায়া হয়ে এল—এ সব খবর দেওয়াই চাই, কারণ এই সবই ত তাঁর "পার্সোনাল খবর", আর চিঠিতে ত পার্সোনাল খবরই দিতে হয়। বাস্তবিক এই চিঠিগুলিতে কবি তাঁর হৃদয়ের অন্তরতম কথাই বলেচেন, তাঁর চিত্তদুয়ার আমাদের কাছে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েচেন, তাঁর গভীরতম জীবনের, তাঁর নিবিড়তম উপলব্ধির প্রকাশ আমাদের সামনে ধরেচেন। এই ত তাঁর আসল জীবন; সেই আসল জীবনের, সমস্ত বহিরাবরণের অন্তরালবর্ত্তী গোপন মানুষটির অতি নিকট পরিচয় আমরা এই "ছিন্নপত্রে" পাই। সুতরাং পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যে দুঃখ করেছিলেন যে, কবি এই পত্রগুলি ছাপবার সময় তাঁর দৈনিক জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ বা তাঁর পরিচিত আত্মীয় বন্ধুর কথা ছেঁটে বাদ দিয়েচেন এবং তাতে ক'রে এই চিঠিতে ব্যক্তিগত রসটি আর নেই, সে দুঃখে এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করার কারণ দেখি না। নিজের গভীর অনুভূতি এবং উপলব্ধির এরূপ পরিশুদ্ধ, সমুজ্জ্বল প্রকাশেও যদি ব্যক্তিগত রস না থাকে ত কিসে আছে জানিনা। তাঁর যথাযথ রূপটিই যে এখানে আমরা পাই তা তাঁর নিজের কথা দিয়েই প্রমাণ করা যেতে পারে। একটি চিঠিতে তিনি লিখচেন, "নির্জ্জনে আমাদের সমস্ত গোপন

অংশ, গভীর অংশ বাহির হয়ে আসে, সুতরাং সেই সময় মানুষ বড় বেশি নিজেরই মত...হয়।" এবং অন্যত্র, "জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্ব্বদা মৌন এবং সর্ব্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।" তাই শান্তিপ্রিয়, করুণাভরা, সৌন্দর্য্য-পিপাসী, সর্ব্বভূতের কুটুম্ব যে আসল ব্যক্তি অন্যসময়ে বা অন্যস্থানে মৌন বা গুপ্ত থাকে আমরা তাঁরই সন্ধান এই চিঠিতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় আপন পরিচয় পূর্ণভাবেই দিয়েচেন, তাঁর মনের নিভৃত কথা কিছুই বলতে বাকি রাখেন নি মনে হয়। তবু ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা কবিতাতেও এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে কখনও বলেন নি, তখন পর্য্যন্ত ত নয়ই। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবিচ্ছিন্ন ঐক্যবন্ধনে থাকার সুযোগও কবি তাঁর জীবনে আর কোন সময়ে পেয়েচেন কিনা সন্দেহ। এই-যে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণে নৌকাবাসের জীবন, এতে একদিকে যেমন বাংলা দেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'তে লাগল, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর একান্ত যোগ সাধিত হ'ল। নদী, গাছপালা, মাঠ, আকাশ, সকলকে তিনি স্বজন ব'লে জানলেন। পদ্মাকে তিনি "একটি স্বতন্ত্র মানুষের মত" কতরূপে দেখলেন, কখনো সে উন্মাদিনী দিশাহারা, ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে পড়েচে, নৃত্য করচে, ভাঙচে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেচে; কখনো সে স্বচ্ছ, কৃশকায়, একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মত, সুন্দর ভঙ্গীতে চ'লে যাচ্চে, আর শাড়িটি গায়ের গতির সঙ্গে বেঁকে বেঁকে যাচ্চে। সন্ধ্যাতারা যেন তাঁর বহুকালের আপনার লোক। সারাদিন কাজের পর যখন সায়াহ্নে নৌকায় নদী পার হন, তখন ওই সন্ধ্যাতারা দেখে মনে হয় যেন তাঁর এই নদীকূলের ঘর-সংসারের সেই গৃহলক্ষ্মী, তাঁর বাড়ী ফেরার প্রতীক্ষায় সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে ব'সে আছে। ভোরের বেলায় চোখ মেলেই তাঁর বহুপরিচিত সহাস্য সহচরী শুকতারাটিকে যখন দেখেন তখন মনে হয় যেন তাঁর নিদ্রিত মুখের উপর চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মত সারারাত্রি সে প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করেছিল। সন্ধ্যা নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর সুগভীর ভালবাসায় নত হয়ে পড়ে। যে প্রকাণ্ড পৃথিবী চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে তাকে তিনি এত ভালবাসেন যে, তার এই গাছপালা, নদী মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত সন্ধ্যা, সমস্তটা শুদ্ধ দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বলেন, "এই যে", সেও বলে "এই যে!" তার পর দুজনে পাশাপাশি ব'সে থাকেন। এই বৃহৎ, ধরণীর প্রতি তাঁর নাড়ীর টান, দুজনে মুখোমুখি বসলেই তাঁদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। পৃথিবী তাঁর অনেক জন্মের ভালবাসার লোকের মতন।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, ক'ব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে!
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

"প্রবাসী" নামক কবিতায় এই পৃথিবীর সঙ্গে কবির গভীর এবং চিরদিনের চেনা শোনার ভাবটি তাঁর একটি চিঠিতে অপূর্ব্ব প্রকাশ লাভ করেচে:—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তির অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত, তাই যেন

খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত, মুকুলিত, পুলকিত, সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপচে।"

আর একটা চিঠিতে :—

"আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মত একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুট্‌ত এবং নব পল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠ্‌ত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি......আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' প'রে ঐ নদীতীরে শস্যক্ষেত্রে ব'সে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়চি।"

জগৎপ্রাণের সঙ্গে আপন চিত্তের চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধের এই সহজ অনায়াস উপলব্ধি আধুনিক জগতের আর কোনো কবি এরূপ অপূর্ব্ব ভাবে প্রকাশ করেছেন ব'লে ত জানি না। শুধু মনে হয় ইংরাজ মহাকবি * Wordsworthএর মুখে কখনও কখনও এই সুরই যেন শুনতে পাই, যেমন :—

I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man

এখানে Wordsworth-ও সূর্য্য নক্ষত্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে মানুষের জীবনকে একটি বৃহৎ প্রাণসূত্রে গ্রথিত দেখেছেন ; সৌন্দর্য্যবিলাসী কবিদের মত প্রকৃতি তাঁর কাছে কতকগুলি রমণীয় দৃশ্যের সমাবেশ মাত্র নয়। অত সহজে, অত স্পষ্ট ক'রে না হলেও তিনিও রবীন্দ্রনাথের মত প্রকৃতির মধ্যে একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত দেখেছেন। তিনিও জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক ও বর্ণের একতানের মধ্যে "the still sad music of humanity" শুনেছেন, যাকে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে বলেছেন "পৃথিবীর বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও বিষাদের......হা হা ধ্বনি।"

বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত মন জগতের আনন্দকে আপন চৈতন্যের ভিতর কি নিবিড় ভাবে অনুভব করে, সে অপূর্ব্ব ইতিহাসের পরমাশ্চর্য্য লিখন এই "ছিন্নপত্রে" আমরা পাই। এইটেই এ চিঠি সম্বন্ধে প্রধান কথা, এবং এই কথায় আবার ফিরে আসা যাবে ; কিন্তু আপাতত দেখা যাক এই পত্রগুলিতে আর কি আছে।

প্রথম শ্রেণীর কবি গদ্যলেখক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত গদ্যে ও পদ্যে, যেদিকে প্রতিভা

* আশ্বিন মাসের "বিচিত্রায়" "শারদোৎসব" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—"যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন (বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের) বাধা পায় নি সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন ক'রে বাজে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ "Three Years She Grew" নামক কবিতায় অপূর্ব্ব সুন্দর ক'রে বলেছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে লুসির দেহমন কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে গ'ড়ে উঠবে তারি বর্ণনা উপলক্ষ্যে কবি লিখেছেন : "প্রকৃতির নির্ব্বাক ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাই এই বালিকার মধ্যে নিঃশ্বসিত হবে।......নিশীথরাত্রির তারাগুলি হবে তার ভালবাসার ধন ; আর, যে-সকল নিভৃত নিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হয়ে নেচে চলে সেইখানে কান পেতে থাকতে থাকতে কলধ্বনির মাধুর্য্যটি তার মুখশ্রীর উপর ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকবে।

রচালিত হয়েচে সেই দিকেই, সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি য়েচেন, অনেক সময় সাহিত্যের এই ছুটি বাহনকেই ড়িতে সমান তালে চালিয়েচেন, এমন লেখক জগতে কমই স্নেচেন।

পাদ্রী টম্‌সন্ যাঁর কাছ থেকে শুনে তাঁর বইয়ে লিখেচেন য "these Torn Letters contain some of the best prose that he ever wrote", তিনি বিচারশক্তিরই পরিচয় দিয়েচেন। ভাষার মধ্যে এত স্বচ্ছতা, এত নমনীয়তা, ভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণবৈচিত্র্য প্রকাশে এমন উপযোগিতা, সহজ অনাড়ম্বর সুষমার সঙ্গে এমন শক্তির সমন্বয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও কম দেখা যায়। ভাষার স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য অবশ্য বাহিরের ছাঁচে-ঢালা জিনিষ নয়, বা তা অলঙ্কারের মত কেউ প'রে নিতে পারে না; ও হচ্ছে ভাবের স্বচ্ছতা এবং চিত্তের সৌকুমার্য্যেরই পরিচায়ক। তবু মনে হয় কবির চিত্তের সঙ্গে যে তাঁর প্রকাশের এই সহজ সামঞ্জস্য সংঘটিত হ'ল তার একটা কারণ এই যে, চিঠিতে তিনি দ্বিধামাত্র না ক'রে আমাদের প্রতিদিনের মুখের ভাষা ব্যবহার করেচেন, কৃত্রিম সাধুভাষায় তাঁর নিবিড় অনুভূতি ও অন্তরঙ্গ মনোভাব প্রকাশ করতে যান নি। এগুলি যদি চিঠি না হ'ত তাহ'লে হয়ত এসব কথা তিনি সাধুভাষাতেই লিখতেন,—সে আজ চল্লিশ বছরের কথা, যখন বঙ্গসাহিত্য ছিল সাধুভাষারই মুলুক,—তা' সে-ভাষার জোর থাক আর না-থাক। যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সাধুভাষার বহিষ্করণে ছিলেন অগ্রণী, চলতি-ভাষার সেই বিজয়ী সেনাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন যে, সাধুভাষা হচ্চে ধোপ-দুরস্ত, তার একটুও রং নেই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে তা স্বতঃই ফুলেও ওঠে এবং খড়্‌খড়ও করে। যেখানে বলার কিছু নেই, লেখার উদ্দেশ্য শুধু শূন্যকে ফাঁপিয়ে তোলা, সেখানে ঐ শব্দায়মান, স্বতঃস্ফীত আভরণকে অঙ্গীকার করাই অবশ্য বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু বলবার কথা যেখানে গভীর অথচ একান্ত সরল সেখানে আমাদের চলতি ভাষা যে কতদূর উপযোগী এবং গুণীর হাতে তা কত সুরে বাজে তা এই চিঠিগুলি থেকে বুঝি।

একটা চিঠিতে পাই, "ঐ চিত্রবিদ্যা ব'লে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতি আমি হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি," কিন্তু রং ও তুলি দিয়ে ছবি আঁকুন আর নাই আঁকুন, কথায় রবীন্দ্রনাথ যে চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা দেখিয়েচেন তা বিস্ময়কর। যে ক্ষমতা তাঁর গল্পে পরিস্ফুট, তার পরিচয় আমরা এই চিঠিতেও বড় কম পাই না। সাজাদপুরে কবি তাঁর খোলা জানলা থেকে নৌকাশ্রেণী, ওপারের গ্রাম, লোকালয়ের কর্ম্মপ্রবাহ দেখে লিখচেন, আর আমাদের সামনে একটি স্নিগ্ধ বিরল-রেখা চিত্র ফুটে উঠ্‌চে।

"পাড়াগাঁয়ের কর্ম্মস্রোত খুব বেশী তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে চলেচে। খেয়ানৌকো পারাপার করচে, পান্থরা ছাতা হাতে ক'রে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেচে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় ক'রে হাটে আস্‌চে, দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙ্গি উল্টে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করচে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটিকতক গরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহারপূর্ব্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর প'ড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে, এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর ব'সে যখন বড় বেশি বিরক্ত করচে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্চে। এখানকার এই দুই একটা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ ঠুক্ ঠাক্ শব্দ, ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিনাদস্বর, সমস্ত কর্ম্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখীর ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্চে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময়, স্বপ্নময়, করুণামাখা একটা বড় সঙ্গীতের অন্তর্গত—খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা।"

আর একটি ছবি দেখাই, এবার এক জনহীন, তৃণহীন বালুচরে:—

"দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করচে, তাতে না আছে গাছ, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের কাছে চিরাভ্যস্ত, তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি না,—কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশী শূন্য মনে হয়। কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বৈচিত্র্য নেই; যেখানে ফলে শস্যে তৃণে পশু

পল্লীতে ভ'রে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নেই,—কেবল একটা উদাস, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা। ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চ'লে যাচ্ছে, ওপারে ঘাট, বাঁধানৌকা, স্নানের লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান, অপরাহ্ণে নদীর ধারের হাটের কলধ্বনি —দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা—কোথাও গাঢ়নীল, কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে সাদা। সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের সময় এই চরের উপর আর কিছুই নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা।"

পাতা উল্টে গেলেই এমন কত চিত্র চোখে পড়ে, দুচারটি আঁচড়ে আমাদের সম্মুখে সেগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। কবি দুচোখ ভ'রে চারিদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখে নিচ্চেন, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করচেন, এবং সেই বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত যে মানব-প্রকৃতি তাতে কৌতূহলী হচ্চেন। ছায়া-সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলির পল্লবঘন আম্রকানন আর স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল যেমন দেখচেন, তেমনি দুঃখপীড়িত অসহায় গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাও তাঁকে আকৃষ্ট করচে। তাদের প্রতি সমবেদনায় তাঁর মন আর্দ্র হয়ে উঠচে; এই নিতান্ত নিরুপায় নির্ভরপরায়ণ চাষীদের আপনার লোক মনে ক'রে তিনি তৃপ্তিলাভ করচেন। তাদের স্বচ্ছ সরলতাকে তিনি পুণ্যতোয়া গঙ্গার সঙ্গে তুলনা ক'রে বলচেন তাতে অবগাহন ক'রে সংসারের তাপ দূর হয়। তাঁর কোন অনুগত বৃদ্ধ প্রজার জরাগ্রস্ত রোগশীর্ণ দেহখানির মধ্যে তিনি একটি শুভ্র সরল কোমল মন দেখে নিজের চেয়ে তাকে কত বড় ব'লে মানচেন। অতিবর্ষণে ক্লিষ্ট চাষীরা যখন কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে আসচে তখন নিয়তির সে নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যথা এই শত শত অভাগার হয়ে তিনি নিজের অন্তরে অনুভব করচেন। মানুষের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য ঘেরা গ্রামগুলি যেই তাঁর মনকে টানল, সহস্র রকমের গল্প তাঁর কল্পনায় তৈরী হতে লাগল, মানবজীবনের ঘটনা প্রকৃতির বেষ্টনের মধ্যে সরস্ সজীব হ'য়ে উঠল। তাঁর গল্পের কত বীজ দেখি এই পত্রগুলির মধ্যে ছড়ানো, কত বিশ্ববিখ্যাত গল্পের দেখি এইখানে আরম্ভ। একটা চিঠিতে লিখচেন তাঁর একটা "হ্যাপি থট্" এসেচে, তিনি বিশ্বের হিতসাধনের আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দেবেন, তার চেয়ে বরং যা পারেন তাই করবেন, অর্থাৎ গল্প লিখবেন। তাই সেইদিনই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে তাঁর কল্পনারাজ্যে নামালেন। এমনি, আমাদের নিতান্ত পরিচিত আরো কয়েকটি চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা "ছিন্নপত্রে" পাই, যেমন পোষ্টমাষ্টার, মৃণ্ময়ী, ফটিক। অনেকগুলি চিঠি থেকেই, এবং বিশেষ ক'রে "পোষ্টমাষ্টার" রচনা সম্বন্ধীয় চিঠিখানা থেকে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের একটা প্রধান বিশেষত্ব আমরা ধরতে শিখি। দেখি যে তিনি যখন গল্প লেখেন তখন তিনি নিজের চতুর্দ্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে মনের মত একটা কিছু রচনা ক'রে চলেন, বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলো, বর্ণ, ধ্বনি তাঁর কল্পলোকের মানুষের জীবনে মিশে যায়, সকল ঘটনার একটা আকাশ সৃজন করে। এর ফলে, প্রথমত, তাঁর গল্প অনেক সময় গীতি-কবিতার এই লক্ষণ পায় যে তা কবিচিত্তের একটি বিশেষ ভাব বা mood দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বিশিষ্ট হয়েও তাদের ব্যক্তিজীবনের-পাঁচিলে-ঘেরা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জীবমাত্র থাকেনা, চারিদিকের আলো বাতাস ও তরুশাখার কম্পনের সঙ্গে তারাও উদ্ভাসিত বা হিল্লোলিত হতে থাকে, এবং এক বিশাল বিশ্ব, যার মধ্যে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই বিধৃত, তারই অভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়। টম্‌সন্ এটা বুঝতে পেরেচেন তাই বলেচেন, "No poet that ever lived has shown such power of merging not only himself but his figures with the landscape."

এই চিঠিগুলি "সাধনার" যুগে লিখিত। কবির জীবনে সে এক আশ্চর্য্য সময়। শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে তিনি যে শক্তি ও আনন্দ সঞ্চয় করছিলেন তা তিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ রাখেন নি, মুক্তহস্তে "বিশ্বজনারে" বিলিয়ে দিলেন। তাঁর এসময়কার সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কবিতায়, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে, চিঠিতে তিনি নিজের প্রকাশ-

ব্যাকুলতা যেন নিঃশেষ করতে পারছিলেন না, নিজের অন্ত যেন নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একটা চিঠিতে লিখচেন, "আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্ব্বত্রই আপনার জলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়।" নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে চারিদিককার রূপরসগন্ধ একদিকে আহৃত হল, আর একদিকে আরম্ভ হল নূতন গড়বার পালা। চিঠিতে বা ডায়ারীতে হাল্কা ভাবে, সাবলীল অনায়াস প্রকাশ হল প্রথমে, তারপর মনের ভাবটি ধরা দিল ছন্দের বন্ধনে বা গানের সুরে। "চৈতালী"র "মধ্যাহ্ন", "প্রভাত", "ধরাতল", "ইছামতী নদী", "শুশ্রূষা", "আশিষ-গ্রহণ", "বিদায়", "পদ্মা", "চিত্রা"র "পূর্ণিমা", "স্বর্গ হইতে বিদায়"—এইরূপ কত কবিতার গন্ধরূপ এই ছিন্নপত্রে পাই। মূল অনুভূতির এই বিচিত্র প্রকাশ একসঙ্গে মিলিয়ে দেখায় বড় আনন্দ আছে। নীরব কবির আলোচনা প্রসঙ্গে একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন যে, কবির পরিচয় তার গঠনশক্তিতে। ভাষা বা অনুভাব থাকলেই হয়না, তা দিয়ে নূতন সৃষ্টি করার শক্তি থাকা চাই। ভাবুকে আর স্রষ্টার প্রভেদ এইখানে। ভাবের বীজ যে কি ভাবে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে, সেই সৃষ্টিপ্রণালী বড়ই চিত্তাকর্ষক। একটি ভাবের এই বিভিন্ন প্রকাশ মিলিয়ে দেখায় যেন সেই সৃজনপ্রণালীর একটা আভাস পাই, শিল্পীহৃদয়ের অসীম রহস্য যেন কিছু কিছু ভেদ করা যায়।

এই শান্তিময় জীবন, যেখানে দ্বন্দ্ববিরোধ নেই, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘর্ষ নেই, তা' দেখি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হতে চলেচে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের একটা চিঠিতে কবি লিখচেন, বিচিত্র রকমের কাজ তিনি হাতে নিচ্চেন এবং অনুভব করচেন যে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার আবেগ এই সময়ে কবির চিত্তকে ব্যাকুল করতে থাকে, চিঠিতে তার সুর লেগেচে। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে লিখচেন, তাঁর "জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই যেন নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্চে।" এই আভাস পাচ্চেন যে, "সেই তাঁর সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু, তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা।" সেই নূতন সত্যের সন্ধানে পূর্ব্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠেচে পরের চিঠিতে: "কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলচে,—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুনতে প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন ক'রে তুলচে?"

জীবনে এক অধ্যায়ে এইখানে দাঁড়ি। নির্জ্জন, সুন্দর লোকান্তরালের গভীর শান্তি এবং পরিপূর্ণ আনন্দ ছেড়ে কবি কর্ম্মজীবনের সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর জীবনতরী প্রকৃতির নিভৃত মাধুর্য্যস্রোত বেয়ে মহামানবের সাগরে গিয়ে পড়ল।

পূর্ব্বেই বলেচি "ছিন্নপত্রে"র মূল সুর কি। উন্মুক্ত আকাশের আলো থেকে, নদীজল কল্লোল থেকে, দিগন্ত-প্রসারিত শ্যামল ধরণী থেকে কবির পুলকিত চিত্ত যে অমৃত গ্রহণ করেচে, এ চিঠিতে আমরা তারই আস্বাদ পাই। সহজবোধ দিয়ে তিনি সুন্দরকে উপলব্ধি করেচেন, মনের দ্বার খুলে রেখে তিনি আলোকে গগনে তরুলতায় সেই সুন্দরের বাণী শুনেচেন। হাটের হট্টগোলে এই বোধশক্তি যখনই ক্ষীণ হয়েচে, নদীতীরে, ঊষার আলোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, তারাখচিত আকাশের তলে তাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেচেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আনন্দিত অন্তরে তিনি পৃথিবীকে চেয়ে দেখেচেন, আর সেই আনন্দের কথা বারে বারে ব'লেও মনে করেচেন বলা বুঝি কিছু হয়নি:

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখে

দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী—
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ঐ একা ছায়াবটে,
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীর তলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
চলেছে মাঠের ধারে ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

* * * *

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখী কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি!
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

মনের মতন

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

তুমি যদি বসিতে সম্মুখে
হে আমার মনের মতন!
হেরিতাম তোরি চোখে মুখে
আমার এ পরাণ কেমন।

আধ ভয়ে আধেক বিস্ময়ে
চাহিতে না নয়নে আমার!
নীরব ভাবার মাঝে র'য়ে
তুলিত কি প্রাণ-পারাবার?

গগনে ছায়ার রঙে খেলা—
তুমি রঙ, আমি সেই ছায়া!
তা'রি মাঝে ভাসাইয়া ভেলা
ধরিতাম মায়াবীর মায়া!

তা' ত হায় হ'ল না জীবনে
হে আমার মনের মতন!
'কা'র ঘরে, র'লে কা'র মনে—'
কোথা রঙ, কোথা হায় মন?

সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

১

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গেলে সুধী তার বন্ধু বাদলের পিতার কাছে গিয়া কহিল, "মেসোমশাই, মান্দ্রাজ থেকে ফরাসী জাহাজ পাচ্ছি, আমি একাই তবে রওয়ানা হই, বাদলকে লণ্ডনে রিসিভ্ করবো।"

মেসোমশাই আপিস্ থেকে ফিরিয়া আরাম কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সকালের কাগজখানা হইতে চোখ না তুলিয়া কহিলেন, "সবুর করো হে। বি-এ পাস্ করলে, বিয়ে পাস্ তো করোনি, অর্দ্ধেক কোয়ালিফিকেশন নিয়ে বিলেত যাবে কি ক'রে?"

সুধী যদিও স্বভাবত গম্ভীর তবু মেসোমশাইয়ের পাল্লায় পড়িয়া রসিকতার অ-আ-ক-খ শিখিয়াছে। যথাসম্ভব সংকোচ বজায় রাখিয়া কহিল, "বাকীটা ওদেশে কম্প্লিট্ করতেপ বারা যায়।"

কাগজখানা নামাইয়া রাখিয়া মেসোমশাই একবার আড়ামোড়া সারিয়া লইলেন। তারপরে পার্শ্বে রক্ষিত সিগ্রেটের কেস্ খুলিয়া সুধী'র দিকে বাড়াইয়া দিলেন। "হ্যাভ্ ওয়ান্, ইয়ং ম্যান্।" সুধী ঘাড় নাড়িলে নিজে একটি লইয়া ঠোঁটে চাপিলেন।

"ওহে, বিলেত যাবার আগে একবার কাঁটা চামচের রিহার্স্যল্ দিলে না, টেবিলে অপদস্থ হবে। আর ভাখো, নন্-স্মোকার হয়ে ক'দিন চালাতে পারবে? জেন্টল্-ম্যানের পক্ষে এটাও তো একটা এ্যাকম্প্লিশ্মেণ্ট্।" এই বলিয়া কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে চিন্তামগ্ন রহিলেন; সুধী খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

হঠাৎ কহিলেন, "ভাখো সুধী, বাদলের বিয়েতে তুমি থাকছো না, বড় আফশোষের বিষয়। অত বড় বন্ধু, ভাই বল্লেও চলে। কিন্তু ইয়ং ম্যান্, তোমার উৎসাহে আমি বাধা দেবো না। আচ্ছা সেই কথাই রইলো। তুমি আগে যাও, গিয়ে সব দেখে শুনে ঠিক্ করো। চিঠি লিখো। বাদ্লাকে আমি জাহাজবন্দী ক'রে c/o মিষ্টার সুধীন্ চক্রবর্ত্তী লণ্ডন, এই ঠিকানায় যথাকালে ডেস্প্যাচ্ ক'রে দেবো।" এই বলিয়া আরেকটা সিগ্রেট্ ধরাইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে মানুষ মানুষের কাছে থাকিলেও একাকী বোধ করে। দু'জনের কথাবার্ত্তা দু'জনের স্বগতোক্তির মতো শোনায়। মেসোমশাই গাঢ় কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাবা সুধী, ঐটি আমার সব, ওছাড়া আমার কেউ নেই। ওর মা'র ইচ্ছা ছিল ব'লেই ওকে বিলেত পাঠানো। নইলে দেশে প'ড়েও কি উন্নতি হয় না? আশু মুখুজ্যের চেয়েও কি কেউ আরো উন্নতি চাইতে পারে? বাবা, তোমাকে না বল্লেও চলে, তুমি ওর দাদার মতো, তুমি কি এবার থেকে ওর বাবার মতো হবে না? ওর বাবার মতো ওকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে বুকে ক'রে রাখবে না?" কহিতে কহিতে তাঁর গলা ধরিয়া আসিল।

সুধী কোমল সুরে কহিল, "কেন, মেসোমশাই, এক বছর পরে ফার্লো নিয়ে আপনিও তো বিলেত আস্ছেন একটা বছর দেখ্তে দেখ্তে কেটে যাবে।"

মেসোমশাই চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। সিগ্রেটে টান দিয়া দেখিলেন কখন নিবিয়া গেছে। ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "হাঁ হে, আমিও আস্বো, বৌমাও আস্বেন আমরা বিলেত যাত্রী ক' ভাই, সাহেব সাজ্বো সবাই কলিযুগের তীর্থশ্রেষ্ঠ ইংলণ্ড পরিক্রমা না ক'রে এবে পরলোকে দূরে থাক্ ইহলোকেও সদ্গতি হবে না, শে পর্য্যন্ত এই প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস্ থেকে পেন্সন নিতে হবে তা তুমি পথ প্রদর্শন করো, ফরাসী জাহাজেই রওয়ানা হও মনে করো ওটা তোমার পাইলট্ বোট্। তারপরে বাদ্লার মেল্ ষ্টীমার। অবশেষে আমাদের গাধা বোট্। কেমন

উপমা কালিদাসস্ত কি না ?" এই বলিয়া কিছুক্ষণ হাসিয়া লইলেন। হাসিতে হাসিতে বার কয়েক কাশিয়াও ফেলিলেন। তারপরে ভৃত্যকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, "বত্তী লে আও।"

২

বাদলের বিবাহ পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়াই ছিল। কথা ছিল বাদল ইংরেজী ও বাংলা দুটো পাস্ একসঙ্গেই করিবে, অতঃপর ইংলণ্ডে গিয়া আই-সি-এস্, ট্রাইপস্ ও ব্যারিষ্টারী এ তিনটে পাস্ও ক্রমান্বয়ে করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। পাকা দাবা খেলোয়াড়ের মতো বাদলের পিতা বাদলের অদৃষ্টের ছকে মনে মনে অনেকগুলো চাল চালিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্তানের ভাগ্যবিধাতা হইবার পিতৃ সুলভ লালসা ছাড়া আরো দুটো কারণও ছিল এর। একটা তো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুক্তি:—বৌ না রেখে বিলেত গেলে ছেলে বৌ নিয়ে দেশে ফিরবে। আরেকটা এই যে, বিপত্নীক হইয়া অবধি ভদ্রলোক একটি গৃহলক্ষ্মীর অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছিলেন। নেহাৎ একমাত্র পুত্রের মুখ চাহিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। ঘটকদিগকে হাঁকাইয়া দিবার মতো মনের জোর তাঁর শেষ পর্য্যন্ত ছিল, এত বড় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ্ দেওয়া উচিত; তা না দিয়া অন্য কোন বীরত্বের জন্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে দিলেন রায় বাহাদুর উপাধি। কিন্তু পত্নীহীন গৃহ যদি বা তাঁর সহনীয় হইয়াছিল পুত্রহীন গৃহ আরো অসহনীয় হইবে, এই ভাবিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার পূর্ব্বাহ্নে পুত্রবধূকে পুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন। কেউ একজন তাঁকে "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া তাঁর কান ও প্রাণ জুড়াইবে, এই ছিল তাঁর অতি বড় আকাঙ্ক্ষা।

এ বিষয়ে বাদলেরও যে কিছু ভাবিবার থাকিতে পারে ইহা লইয়া তিনি ভাবিত হন নাই। ছেলেমানুষ, এই তো সেদিন উহার জন্ম, বইয়ের ভিতরে ডুবিয়া থাকে, সংসারের ও কী বোঝে! নিজের কাপড়খানা কোথায় রাখিয়াছে জানে না, খাইতে বসিয়া অর্দ্ধেক ভাত ছড়ায় ও একচতুর্থাংশ পাতে ফেলিয়া উঠে, তিনবার না ডাকিয়া পাঠাইলে পড়ার ঘর হইতে খাবার ঘরে আসিতে ভুলিয়া যায়—ওটা একটা মানুষ! উহার বিবাহের জন্য উহার মতামত লইতে হইবে! হাঁ, সুধী একটা মানুষ বটে, নাবালক নয়, প্র্যাক্টিক্যাল্। সুধী'র পিতা হইলে সুধী'র মতামত তাঁকে লইতেই হইত এবং লইয়া তিনি সুখও পাইতেন।

রায় বাহাদুর স্নেহী প্রকৃতির লোক, রসিক ও উদারচেতা। তবু নিজের ঐটুকু ছেলের যে বিবাহের মতো গুরুতর বিষয়ে নিজস্ব মতামত থাকিতে পারে এতটা সত্যই তাঁর মনে হয় নাই। হাঁ, আরেকটু বেশী বয়সে যারা বিবাহ করে তাদের পক্ষে ডায়ার্কী মন্দ নয়। অর্থাৎ পিতামাতার নির্ব্বন্ধের উপরে দু'চারটে কথা বলিবার, চাইকি নিষ্ফল প্রতিবাদ করিবার অধিকারটা তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে একবার ভাবী বধূর বিদ্যার পরীক্ষা লওয়া, তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলেন কি না পর্য্যবেক্ষণ করা, ইত্যাদি ট্রান্সফার্ড সাব্জেক্ট্গুলো তাদের হাতে আসুক ক্ষতি নাই। এই পর্য্যন্ত রায় বাহাদুরের সামাজিক আধুনিকতা। তা বলিয়া সাংসারিক আধুনিকতায় যে তিনি কোনো রায় বাহাদুরের চেয়ে ব্যাক্ওয়ার্ড এমন অপবাদ আমি দিতেছি না। আত্মীয় স্বজনকেও তিনি ইংরেজী ভাষায় চিঠি লিখিয়া থাকেন, যদিও লেখার ধাঁচ্ টা খাঁটি বাংলা। এবং মুখস্থ-করা ইডিয়মগুলো চিনির বলদের মতো যে-সব ভাব-সম্পদ বহন করে সে সব আমাদের ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিদের প্রণীত সনাতন হিন্দু সভ্যতার বাছা বাছা কথা। রায় বাহাদুর বাঙালীদের জন্য কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থও ছাপাইয়াছেন; তাহা পড়িয়া বাঙালীদের জন্য যারা ইংরেজী সংবাদপত্র লেখে সে সব বাঙালীরা রায় বাহাদুরের ইংরেজীর ভূয়সী প্রশংসা ছাপিয়াছে। তারপর রায় বাহাদুরের বাড়ী ইংরেজী ধরণে—অর্থাৎ ফিরিঙ্গী ধরণে—সজ্জিত। রায় বাহাদুর ইংরেজী খানা—অর্থাৎ ফিরিঙ্গী

নারও—একজন সমঝদার। রায় বাহাদুর ইংরেজী পাষাকের উপরে মুসলমানী পাগড়ী—হিন্দুত্বের ধ্বজা—রিয়া পার্টিতে যাইয়া থাকেন এবং পার্টি দেওয়াতেও তিনি কহস্ত।

কবে ছেলেবেলায় বাদল তার মনের কথা সকলের াগে তার পিতাকেই বলিত। কিন্তু একটা বিশেষ য়সের পরে বালকমাত্রের মনের কথা বালক ছাড়া আর হ শুনিতে পায় না। বাদলের আবাল্য বন্ধু সুধীই ছিল দলের মনের কথার ভাণ্ডারী। সুধী বয়সে বড়, কিন্তু খর বুদ্ধির জোরে ডবল প্রমোসন পাইতে পাইতে বাদল ধীর সহপাঠীতে পরিণত হয়। তখন হইতে তারা এক ঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে বেড়ায়, প্রায়ই একসঙ্গে খায় ও একসঙ্গে শায় পর্য্যন্ত। মিত্রপক্ষের ছেলেরা সুখ্যাতি করিয়া বলে, যমজ বন্ধু।" শত্রুপক্ষের ছেলেরা বিদ্রূপ করিয়া বলে, "দম্পতী"। তবে শত্রু তাদের অল্পই ছিল, কারণ সুধী ছিল স্বভাবত মৌনী, আর বাদল যে বুদ্ধিবিদ্যায় অপরাজেয় এটা কলেই মানিয়া লইয়াছিল।

মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, বাদল যে আসলে কী তাহা এক সুধী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। ভালো ছেলে, আগাগোড়া ফার্ষ্ট, এই তার চরম পরিচয়। পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর বাইরে কতদূর যে তার গতিবিধি, আধুনিক চিন্তা রাজ্যের সে নিজেই যে একজন রাজ্যপ্রার্থী, অপরে বই পড়ে নম্বর পাইবার জন্য—বড় জোর জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য—কিন্তু বাদল যে পড়ে গ্রন্থকারের সর্ব্বস্ব লইয়া গ্রন্থকারকে অতিক্রম করিবার জন্য, একদিন গ্রন্থকারেরও পাঠ্যপুস্তক লিখিবার জন্য, একথা একমাত্র সুধীই জানিত ও বিশ্বাস করিত। বাদলের পিতা তাঁর পুত্রকে চিনিতেন না।

বস্তুত পিতাপুত্রের মনের মাঝখানে এক জেনারেশনের ব্যবধান। কেবল যে বাদল সম্বন্ধে তার পিতাই অজ্ঞ তাহা নহে, পিতা সম্বন্ধে বাদলও অজ্ঞ। তবে বাদলের দিক থেকে এ রকম একটা বক্তব্য খাড়া করা যায় যে, পিতা সম্বন্ধে যাই হোক পিতৃবয়সী বিশ্বভাবুকদের সম্বন্ধে তো বাদল খবর রাখে, কিন্তু পুত্রবয়সী অত্যাধুনিকদের সম্বন্ধে তার পিতা—শুধু তার পিতা কেন, কোনো পিতাই—কি কোনো আগ্রহ দেখান; কেবল দেহটার সংবাদ লইয়াই তাঁরা খালাস, ছেলের মাথা ব্যথা করিলে ডাক্তার কবিরাজ ডাকাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম, কিন্তু ছেলের মন ব্যথা করিল কি না, সে ব্যথা কোনোরূপ সৃষ্টিতে ব্যক্ত হইল কি না, এ সম্বন্ধে পিতৃজাতির কোনো দায়িত্ব নাই।

৩

বৈঠকখানা হইতে বিদায় লইয়া সুধী পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। বাদল একমনে চিঠি লিখিতেছিল। সুধীকে দেখিয়া বলিল, "এই যে সুধী দা, তোমা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি লেখা।"

সুধী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া জমাইয়া বসিল কৌতূহল প্রকাশ করিল না।

বাদল বলিয়া যাইতে লাগিল, "ভাখো দেখি সুধী দা কী ভয়ানক চক্রান্ত! বলাই, পরেশ, হেমেন্ ইত্যাদির যে এক জ্ঞাতি-বোন আছেন, কী এক বিশ্রী আর্কেইক্ তাঁর নাম—বগলা, না, রুক্মিণী। নাঃ—টু বি প্রিসাইজ, উজ্জয়িনী। এই তাঁকেই চিঠি লিখছি।"

এই অসংবদ্ধ উক্তির অর্থ না করিতে পারিয়া সু বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"উজ্জয়িনীকে ওরা তোমার আমার মাঝখানে wedg করতে চায়, আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে ঘটিয়ে। আমাদে বন্ধুত্ব ওদের চক্ষুঃশূল, দি মিস্‌চীফ্‌মেকার্স! উজ্জয়িনীে আমি লিখলুম, বিয়ে করতে হয় তো দুই বন্ধুকে একস বিয়ে করতে হবে, নয় তো কারুকেই না। সুধীদা-ে বাদ দিয়ে আমি একলা কিছু করতে পারিনে। ভা কথা, সুধী দা, মাদ্রাজে একটা ফরাসী জাহাজ ছুটে একটা ডবল বার্থ ক্যাবিনের জন্যে তার ক'রে দিই?"

সুধী শুধু বলিল, "মেসো মশাইয়ের মত অন্তরকম বাদলের মনে আঘাত দিতে তার মুখ বোঝা হা যাইতেছিল।

বাদল বাধা পাইয়া অধৈর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করি "হাও ডু ইউ মীন্?"

সুধী উত্তর করিল, "ফরাসী জাহাজে আমি একাই যাচ্ছি, বিয়ের পরে পি-এণ্ড-ও'তে তুমি যাবে, তোমাকে আমি লণ্ডনে রিসিভ্ করবো।"

বাদল কিছুক্ষণ থ' হইয়া রহিল। কি ভাবিয়া বলিল, "তোমার কথার প্রতিধ্বনি করছি সুধী-দা। ফরাসী জাহাজে আমিই যাচ্ছি, বিয়ের পরে পি-এণ্ড্-ও'তে তুমিই যেয়ো, তোমাকেই আমি লণ্ডনে রিসিভ্ করবো।"

সুধী'র গাম্ভীর্য্য রাখা দায় হইল। করুণ হাসিয়া বলিল, "বিয়ে না করলে তোর বাবা তোকে যেতেই দেবেন না যে। আর বিয়ে করলে যদি আমাদের বন্ধুত্বে ফাট ধরে, তবে তেমন ঠুন্‌কো বন্ধুত্বকে কতকাল আমরা আগ্‌লে থাক্‌বো?"

বাদল বলিল, "তবু, যাঁকে ভালোবাসিনি তাঁকে বিয়ে করতে আমার প্রিন্সিপ্লে বাধ্‌বে, হয় তো তাঁরও।"

সুধী স্বল্পভাষী মানুষ,—কিন্তু বাদলের সঙ্গে তর্ক করা তার সহিয়া গিয়াছে। বলিল, "বিয়ের আগেই যে ভালো-বাস্‌তে হবে, এই পাশ্চাত্য কুসংস্কারটা তোর মতো ভাবুকেরও আছে! বিয়ের এক আধ দিন পরে ভালোবাস্‌লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

"বিয়ে ক'রে যদি না ভালোবাসি তবে অশুদ্ধ হয় বৈ কি।"

"তা যদি বলো, ভালোবেসে বিয়ে ক'রেও অনেকে দেখে ভালোবাসা উবে গেছে। তখন?"

"তখন বিবাহের করোলারী, বিবাহচ্ছেদ।"

"তা যতদিন চলিত হয়নি ততদিন সকলে যেমন বিয়ে করে ও পস্তায়, তুমিও তাই করো।"

"সকলে তাই করলে ডিভোর্স্ কোনোদিন চলিত হবার সুযোগ পাবে না। আগে ডিভোর্সে'র পথঘাট খোলা রেখে তারপরে বিয়ে করতে হয় করো। করতেই যে হবে এটাও একটা কুসংস্কার।"

সুধী চুপ করিয়া থাকিল দেখিয়া বাদল তার বক্তব্যটাকে আরেকটু বাড়াইয়া দিল। "অবশ্য আমি প্লেটোর দলে নই, সুধীদা। আমি—এই ধরো—গোটের দলে।"

সুধী হাসিয়া কহিল, "তা হলে উজ্জয়িনীর মতো মেয়েকে কোনো কালে পাবে না।"

বাদল তার স্বভাবসিদ্ধ আর্নেষ্টনেসের সহিত কহিল, "নাই বা পেলুম। কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী। আমার নারীকে আমি কোনোদিন কোনো দেশে পাবোই। পরের কাছ থেকেও ছিনিয়ে আনবো—কারো বিবাহকেই আমি বৈধ মনে করিনে, অন্ততঃ অচ্ছেদ্য মনে করিনে, সুধীদা।"

বাদলকে দিয়া কোনো কাজ করাইয়া লইবার সংকেত সুধী জানিত। কোনো একটা প্রিন্সিপ্লের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া দিলে বাদলকে দিয়া যা-খুসী করানো যায়। সুধী মৃদু হাসিয়া কহিল, "চ্যারিটী বিগিন্‌স্ এ্যাট্ হোম। নিজে বিবাহ ক'রে প্রমাণ করে দাও যে বিবাহ বলতে কিছুই বোঝায় না। 'কা তব কান্তা'—এই প্রাচীন মটোটা নিয়ে নতুন মায়াবাদ প্রচার করতে নেমে পড়ো।"

বাদল উৎসাহের সহিত কহিল, "তথাস্তু। উজ্জয়িনী হবেন আমার প্রথম শিষ্যা, আমার যশোধারা। তাকে বিয়ের বিরুদ্ধে দীক্ষিত করবার একমাত্র উপায় তাঁকে বিয়ে করা। তাই ব'লে তাঁকে ভালোবাস্‌বার বা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাক্‌বার তাগিদ্ আমার নেই। উই ম্যারী টু ডাইভোর্স্।"

সুধী তার পিঠ্ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

তখন বাদল তার চিঠিখানাকে শেষ করিতে বসিল। ইওর্স্ সিন্‌সিয়ার্লী বি, সি সেন পর্য্যন্ত লিখিয়া থামিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

জর্জ্জর

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রাচীনকালে কোন 'রূপক' (drama) অভিনয় করিবার পূর্ব্বে কুশীলবগণ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত একপ্রকার মাঙ্গলিক উৎসব করিতেন—উহার নাম 'জর্জ্জরোৎসব'। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

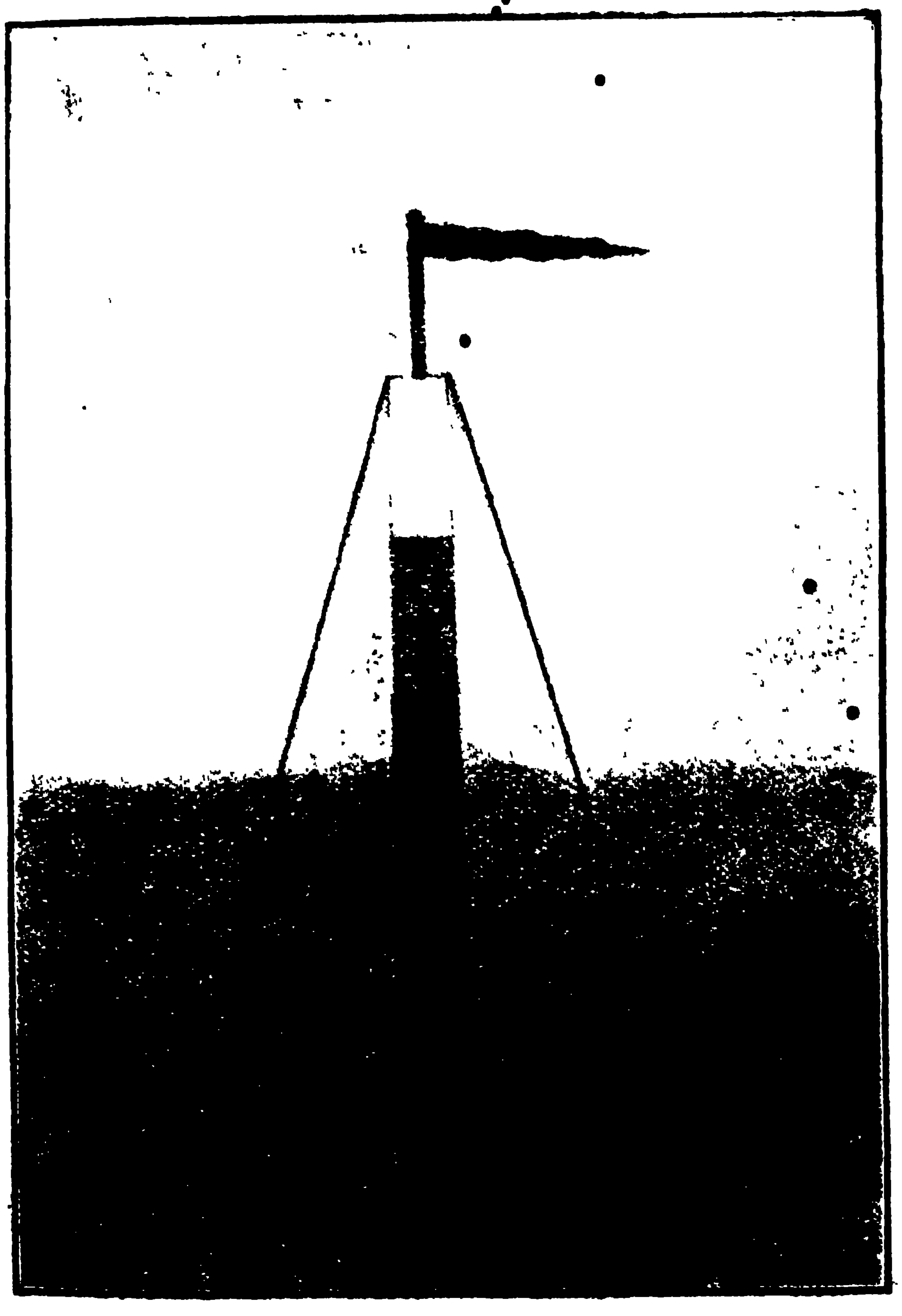

জর্জ্জর দণ্ড

জর্জ্জরোৎসবের ইতিহাস জানিবার পূর্ব্বে নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা দুই চারিটি জানা থাকা আবশ্যক। অতএব, নিম্নে এই ভূমিকার অবতারণা।

১

পুরাকালে একদিন মহর্ষি ভরত জপ শেষ করিয়া একশত পুত্রের সহিত বসিয়াছিলেন। সেদিন অনধ্যায়—বেদপাঠ ছিল না। এমন সময় উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আত্রেয় প্রমুখ ঋষিগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—

"চতুর্ব্বেদের সমকক্ষ (১) নাট্যবেদ নামে যে গ্রন্থ আপনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে ও কাহার নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইয়াছিল? ইহা ছাড়া নাট্যের কয়টি অঙ্গ, কি প্রমাণ (২), ও রঙ্গমঞ্চে উহার প্রয়োগ কিরূপে হইয়া থাকে—এসকল বিষয়ও আপনি যথাযথভাবে আমাদের বুঝাইয়া দিন।"

ভরত একে একে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

নাট্যবেদ ব্রহ্মার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা অনাদি। 'স্বায়ম্ভুব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বৈবস্বত' (৩) পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্বন্তরেরই ত্রেতাযুগে নাট্যবেদ পিতামহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া

(১) 'বেদসম্মিতঃ'=বেদতুল্য; 'বেদসম্মতঃ' পাঠও আছে।

(২) 'কিংপ্রমাণঃ'=কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ; অথবা—নাট্যের বিভিন্ন অঙ্গের সংখ্যা কত—এরূপ অর্থও করা চলে।

(৩) মনুগণের নাম—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি, ও (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

এক একজন মনুর অধিকার যতদিন থাকে, ততদিন এক 'মন্বন্তর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে কলিযুগ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগ। ৭১ দিব্যযুগে এক মন্বন্তর; ১০০০ দিব্যযুগে এক কল্প বা ব্রহ্মার একদিন। অতএব, ১৪ মন্বন্তর ব্রহ্মার একদিনের সমান।

আসিতেছে ; কখনও কোন সত্যযুগে নাট্যবেদ প্রচারিত হয় নাই (৪)।

আদি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সত্যযুগ ও তাহার সন্ধিকাল অতীত হইবার পর—ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে—দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, মহানাগ প্রভৃতি দ্বারা সমাক্রান্ত—লোকপাল প্রতিষ্ঠিত—কর্ম্মভূমি জম্বুদ্বীপে প্রজাগণ গ্রাম্যধর্ম্মে প্রবৃত্ত—কাম ও লোভের বশীভূত—ঈর্ষা, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিমূঢ় হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

"পিতামহ ! আমরা এমন একটি খেলার জিনিষ (৫) চাই যাহা দৃশ্য ও শ্রাব্য (শ্রব্য) উভয়ই বটে। শূদ্রজাতিগুলির পক্ষে বেদপাঠ-শ্রবণের কোন বিধি নাই ; অতএব, আপনি কৃপা করিয়া সকলবর্ণের শ্রবণযোগ্য একটি সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন।"

ব্রহ্মা "তাহাই হইবে" বলিয়া দেবরাজকে তখনকার মত বিদায় দিলেন। পরে তত্ত্ববিৎ পিতামহ যোগবলে চতুর্ব্বেদের স্মরণ করিলেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল—"আমি নাট্যাখ্য এমন এক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিব, যাহা ধর্ম্মবৃদ্ধির অনুকূল—অর্থপ্রদ (অথবা, হৃদ্য-প্রয়োজনীয়)—যশস্য—নানাউপদেশপূর্ণ (অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গের উপায় প্রবর্ত্তক)—চতুর্ব্বেদের সংগ্রহ স্বরূপ (digest)—সর্ব্বশাস্ত্রের সারার্থযুক্ত সর্ব্বপ্রকার শিল্পের প্রবর্ত্তক ও ইতিহাস সংযুক্ত হইবে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের অঙ্গসম্ভূত নাট্যবেদ প্রণয়ন করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিলেন উহার পাঠ্যাংশ—সামবেদ হইতে গীত—যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ববেদ হইতে লইলেন রস। এইরূপে সর্ব্ববেদবিৎ পিতামহ কর্ত্তৃক চতুর্ব্বেদ ও (আয়ুর্ব্বেদাদি) উপবেদসমূহের সহিত সম্বন্ধ নাট্যবেদ সৃষ্ট হইল।

নাট্যবেদ উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মা সুরেশ্বর ইন্দ্রকে বলিলেন—"ইতিহাস (দশরূপক) ত আমি সৃষ্টি করিলাম ; এখন দেবগণের মধ্যে তুমি উহা প্রচারিত কর। যাঁহারা কুশল (৬), বিদগ্ধ (৭), প্রগলভ (৮) ও জিতশ্রম—তাঁহাদের মধ্যে এই নাট্যসংজ্ঞক বেদ তুমি সংক্রামিত কর।"

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—"হে ভগবন্ ! নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ, জ্ঞান (৯), প্রয়োগ (১০) ও অন্যান্য পরিশ্রমসাপেক্ষ নাট্যকর্ম্মে (সুখাভ্যস্ত) দেবগণ অসমর্থ। বেদের রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, সেই সকল কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয়, ব্রতনিয়মপরায়ণ ঋষিই নাট্যবেদ শিক্ষা ও প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্র।"

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া পদ্মযোনি পিতামহ ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমিই একশত পুত্র লইয়া এই নাট্যবেদের প্রথম প্রয়োগ কর।"

অতঃপর ভরত ব্রহ্মার নিকট যথাবিধি নাট্যবেদ অধ্যয়ন করিয়া শতপুত্রকে যথাযথভাবে নাট্যশিক্ষা প্রদান করিলেন। যিনি যে ভূমিকার উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই ভূমিকা প্রদান করা হইল। ভারতী, সাত্বতী ও আরভটি এই তিনটি বৃত্তি (১১) অবলম্বন করিয়া ভরত নাট্যপ্রয়োগ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় ব্রহ্মা উহাতে কৈশিকী বৃত্তিও (১২) যোজিত করিতে আদেশ দিলেন। ভরত বলিলেন—"কৈশিকী-প্রয়োগের উপযুক্ত উপকরণ (দ্রব্য) আমাকে দিতে হইবে।"

---

(৪) "সর্ব্বেষ্বেব মন্বন্তরেষু ত্রেতাবসরে ব্রহ্মণা নাট্যবেদঃ প্রবর্ত্তিতঃ, কৃতযুগে তু নেতি তাৎপর্য্যম্"—অভিনব ভারতী (বরোদা সং, পৃ, ১)

(৫) "ক্রীড়নীয়কম্"—যাহা দ্বারা চিত্ত ক্রীড়িত বা বিক্ষিপ্ত হয় এরূপ জিনিষ ; অথবা ক্রীড়ার পক্ষে হিতকর।

(৬) কুশল=গ্রহণ (গুরুমুখ হইতে শিক্ষা) ও ধারণের (মনে রাখা) উপযুক্ত।

(৭) বিদগ্ধ=ঊহাপোহ বিচার করিতে সমর্থ।

(৮) প্রগল্ভ=পরিষদে বা লোকসমাজে যে ভীত (nervous) হয় না।

(৯) জ্ঞান=ঊহাপোহ বিচার।

(১০) প্রয়োগ=রঙ্গমঞ্চে অভিনয়।

(১১) বৃত্তি=Style in composition. বৃত্তি চারিপ্রকার ; ইহাদিগকে 'সর্ব্বনাট্যের মাতৃকা' বলা হয়।

ভারতী=সংস্কৃতবহুল নটাশ্রিত বাগ্ব্যাপার। সাধারণতঃ এই ভারতী বৃত্তিই নাট্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাত্বতী=বীররসে ব্যবহার্য্য, সত্ত্ব, শৌর্য্য, ত্যাগ, দয়া, ঋজুতা প্রদর্শনের উপযোগী—শোক বা শৃঙ্গার বর্ণনার অনুপযুক্ত।

আরভটী=রৌদ্র ও বীভৎস রসে ব্যবহার্য্য ; মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা, বধ, বন্ধন দেখাইতে ইহার আবশ্যক হয়।

(১২) কৈশিকী=শৃঙ্গার-প্রতিপাদিকা।

কৈশিকী বৃত্তি নৃত্ত ও অঙ্গহার সম্পন্ন (১৩), রসভাবক্রিয়াত্মক (১৪), শ্লক্ষ্ণ নেপথ্যযুক্ত (১৫) ও শৃঙ্গাররসসম্ভূত ইহা আমি ভগবান্ শঙ্করের নৃত্য হইতে দেখিয়াছি। একমাত্র 'পরিপূর্ণানন্দনির্ভরীভূতদেহ সুন্দরাকার' শঙ্কর ব্যতীত অপর কোন পুরুষের পক্ষে কৈশিকী প্রয়োগ করা সম্ভব নহে—এ নিমিত্ত অভিনেত্রীর প্রয়োজন।"

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা মন হইতে নাট্যালঙ্কারচতুর (১৬) অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিলেন। অপ্সরা ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি—অযোনিজা।

তাহার পর সশিষ্য 'স্বাতি' নামক ঋষি (বাদ্য) 'ভাণ্ডে'র অধিকারে ও নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ 'গানযোগে' (১৭) নিয়োজিত হইলেন। ইহাই হইল আদিম বাদিত্রসমবায় (orchestra)।

এইরূপে শতপুত্র, অপ্সরোবৃন্দ, সশিষ্য স্বাতি ও নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ সহ পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নাট্যশিক্ষা ত আমাদের হইল, এখন কি করা যায়?"

পিতামহ উত্তর দিলেন—"নাট্যপ্রয়োগের সময় ত এই উপস্থিত। মহেন্দ্রের 'ধ্বজমহোৎসব' প্রবৃত্ত প্রায়। উহাতে এই নাট্যবেদের প্রয়োগ কর।"

দেবগণের সহিত যুদ্ধে অসুর ও দানবগণ নিহত হওয়ায় মহেন্দ্রের বিজয়স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত প্রহৃষ্ট অমরগণ একত্র মিলিত হইয়া সেই ধ্বজমহের আয়োজন করিয়াছিলেন। উহাতে অভিনয়ের পূর্ব্বে ভরত প্রথমে নান্দীরচনা করিলেন। 'নান্দী' আশীর্ব্বচনঘটিত—বিচিত্র—দেবনির্ম্মিত (১৮) ও অষ্টাঙ্গ-পদসংযুক্ত (১৯)। তাহার পরে, যে ভাবে দৈত্যগণ সুরগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন—তাহার অনুকরণে ঠিক তদনুরূপ ঘটনার সন্নিবেশ নাট্যে করা হইল।

ব্রহ্মাদিদেবগণ অভিনয়ের আয়োজন দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া ভরতের পুত্রগণকে সর্ব্বপ্রকার উপকরণ প্রদান করিলেন। প্রথমেই শক্র প্রীত হইয়া দিলেন তাঁহার মঙ্গলকর 'ধ্বজ'। ব্রহ্মা দিলেন বিদূষকের ব্যবহার্য্য 'কুটিলক' (বক্র দণ্ড), বরুণ দিলেন পারিপার্শ্বিকের উপযোগী ভৃঙ্গার, সূর্য্য—ছত্র (বিতান-চাঁদোয়া), শিব—দৈবী ও মানুষী সিদ্ধি, বায়ু—ব্যজন, বিষ্ণু—সিংহাসন ইত্যাদি।

তারপর দৈত্যদানবনাশের অভিনয় আরম্ভ হইল। উহা দেখিয়া যে সকল দৈত্য তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা কুভিতচিত্তে বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বিঘ্নগণের সহিত পরামর্শ করিল—"এরূপ ধরণের অভিনয় আমরা পছন্দ করি না।" অতঃপর অসুর ও বিঘ্নগণ মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া নর্ত্তকগণের বাক্য, শারীরিক চেষ্টা ও স্মৃতি স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। সহসা সূত্রধারকে এইরূপে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া দেবরাজ—"এ কি! কোথা হইতে অভিনয়ের এ বৈষম্য উপস্থিত?"—বলিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধ্যানবলে দেখিতে পাইলেন যে, বিঘ্নগণ অদৃশ্যভাবে মণ্ডপটি ছাইয়া ফেলিয়াছে ও সূত্রধার (অপর নটগণসহ) তাহাদেরই প্রভাবে নষ্টসংজ্ঞ ও জড়ীকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন ইন্দ্র সত্বর উঠিয়া নিজের ধ্বজ তুলিয়া লইলেন। তাঁহার দেহ নানারত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বল ও চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে আঘূর্ণিত। তিনি রঙ্গপীঠগত বিঘ্ন ও অসুরগণকে সেই ধ্বজপ্রহারে জর্জ্জরীকৃত করিয়া ফেলিলেন। বিঘ্ন ও অসুরগণের মধ্যে কেহ কেহ নিহত ও অপরে পলায়নপর হইলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে বলিতে

---

(১৩) নৃত্ত=নর্ত্তন, অঙ্গোপাঙ্গগণের বিলাস (শোভা) ময় বিক্ষেপ। অঙ্গহার=অঙ্গগুলির অক্রটিতরূপে সমুচিত স্থান প্রাপণ।

(১৪) রসভাবক্রিয়াত্মক=রসসমূহের যে ভাব (ভাবনা)—কবি, নট ও সামাজিকগণের হৃদয়ে ব্যাপ্তি;—তাহার যে ক্রিয়া—ইতিকর্ত্তব্যতা;—তাহাই আত্মা—স্বভাব যাহার—সেই বৃত্তির নাম কৈশিকী।

(১৫) শ্লক্ষ্ণনেপথ্য—ঢিলা পোষাক—deshabille গোছের অনেকটা।

(১৬) নাট্যালঙ্কার—(১) নাট্যের প্রধান অলঙ্কারস্বরূপ কৈশিকী-বৃত্তি; অথবা, (২) সপ্তদশ নাট্যালঙ্কার (নাট্যশাস্ত্র, ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(১৭) গানযোগ—গীতাধিকার নহে। 'গান'শব্দের অর্থ 'তত' (তারের যন্ত্র—Stringed musical instrument) ও 'সুষির' (wind instrument) প্রভৃতি।

(১৮) দেবসম্মতা—দেবসজ্জিতা—বেদসম্মিতা—বেদনির্ম্মিতা—দেবতাস্তুতিসম্মতা - দেবতাস্তুতিসংশ্রয়া—ইত্যাদি নানারূপ পাঠ আছে

(১৯) যাহাতে আটটি পদ অন্তর্ভূত। 'পদ'শব্দের অ
অভিনব গুপ্ত—'সুবন্ততিঙন্ত'পদ অথবা 'অবান্তর বাক্য'—এই উভ
প্রকারই করিয়াছেন।

লাগিলেন—"হে দেবরাজ! অদ্ভুত এই দিব্য প্রহরণ যাহার সাহায্যে তুমি দানবগণের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরীকৃত করিয়া দিলে! যেহেতু উহার দ্বারা বিঘ্ন ও অসুরগণ জর্জ্জরীকৃত হইয়াছে—অতএব, অদ্য হইতে উহার নাম হইল "জর্জ্জর"। অবশিষ্ট যে সকল হিংসক নাট্যহিংসার জন্য উদ্যুক্ত হইবে—এই জর্জ্জর দেখিলে তাহারা আর পলাইবার পথ পাইবে না।"

ইন্দ্র বলিলেন—"তাহাই হউক! অদ্য হইতে অভিনেতৃবৃন্দের রক্ষকস্বরূপ হইবে এই জর্জ্জর।"

ইহার পর ধ্বজমহোৎসব আবার জমিয়া উঠিলে অভিনয় আরম্ভ হইবার সময় অবশিষ্ট বিঘ্নগণ নর্ত্তকদিগের ভয় জন্মাইতে লাগিল। তখন ভরত ব্রহ্মাকে বলিলেন—"যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বিঘ্নগণ নাট্যবিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। অতএব, আপনি ইহার রক্ষাবিধান করুন।"

ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন দুর্ভেদ্য নাট্যগৃহ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। অচিরে গৃহ নির্ম্মিত হইলে পিতামহ দেবগণকে বলিলেন—"তোমরা জনে জনে নাট্যগৃহের বিভিন্ন অংশ রক্ষা করিবার ভার লও।" সকলেই সম্মত হইলেন। মণ্ডপরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন চন্দ্র, নেপথ্য রক্ষার ভার পড়িল মিত্রের উপর—এইরূপে এক একজন দেবতা এক এক অংশের রক্ষার্থ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

দৈত্যনাশক বজ্র জর্জ্জরে নিক্ষিপ্ত হইল, ও উহার এক একটি পর্ব্বে অমিততেজাঃ দেবগণ অধিষ্ঠান করিলেন। সকলের উচ্চে শিরঃপর্ব্বে বসিলেন ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শঙ্কর, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে স্কন্দ ও পঞ্চমে—শেষ, বাসুকি, তক্ষক—এই তিন মহানাগ। নায়কের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন—ইন্দ্র, ও নায়িকার রক্ষার ভার লইলেন স্বয়ং দেবী সরস্বতী।

তাহার পর দেবগণের অনুরোধে, বিঘ্নগণের সহিত বিবাদ আপোষে মিটাইবার নিমিত্ত, ব্রহ্মা তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, কেন তোমরা অভিনয় নষ্ট করিতে এত চেষ্টা পাইতেছ?"

তখন বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বিঘ্নগণ কিছু নরম হইয়া বলিল—"দেবগণের কথামত আপনি যে নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য কি কেবল আমাদিগকে লোক চক্ষুতে হীন প্রতিপাদন করা? দেবতাই বলুন, আর দৈত্যই বলুন—সবই আপনার সৃষ্টি। আপনার নিকট আমরা সকলেই সমান। তবে এ পক্ষপাত কেন করিলেন?"

ব্রহ্মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা ক্রোধ ও বিষাদ পরিত্যাগ কর। কেবল তোমাদেরই পরিভব দেখাইবার নিমিত্ত নাট্যবেদ সৃষ্ট হয় নাই। সমস্ত ত্রৈলোক্যেরই উহা ভাবানুকীর্ত্তন-স্বরূপ সপ্তদ্বীপের মধ্যে যেখানে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে—অথবা দেব, দানব, রাজা, ঋষি—যাহার যেরূপ স্বভাব দেখা গিয়াছে তাহার হুবহু অনুকরণ হইতেছে এই নাট্য। অতএব, তোমাদের ইহাতে ক্রোধ বা ক্ষোভের কোন কারণই থাকিতে পারে না।"

এইরূপে সামপ্রয়োগে বিঘ্নগণকে শান্ত করিয়া পিতামহ দেবগণকে বলিলেন, "আজ তোমরা নাট্যমণ্ডপে বিধিবৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর। মন্ত্রপাঠ করিয়া ওষধি (বচা, বলা, ব্রীহি প্রভৃতি) দ্বারা আহুতি দাও। মোদকাদি ভক্ষ্য ও ক্ষীর-ইক্ষু-দ্রাক্ষারস-পায়স প্রভৃতি পানীয়ের দ্বারা বলি প্রদান কর। তোমাদের দেখিয়া মর্ত্ত্যের অধিবাসিগণ এই শুভ পূজাবিধি শিখিতে পারিবে।"

২

পূজাবিধি (সংক্ষেপে):—সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন শুভ নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর, তথায় সপ্তাহকাল গাভী ও রক্ষোঘ্নমন্ত্রজাপক ব্রাহ্মণগণের বাস করা প্রয়োজন। তা'র পর নাট্যগৃহে ও রঙ্গপীঠে রঙ্গদেবতাদিগের অধিবাস। দীক্ষিত, প্রযত, শুচি, অখণ্ড বস্ত্র পরিহিত নায়ক (অর্থাৎ নাট্যাচার্য্য) নিশাগমে মন্ত্রপূত জলে আপনার সর্ব্বাঙ্গ প্রোক্ষিত করিয়া ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গুহ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি দেবদেবীর আবাহন ও একত্র পূজা করিবেন। পরে 'কুতপ'সম্প্রয়োগ সহকারে (২০) জর্জ্জরের আবাহন। আবাহন-মন্ত্র যথা—

(২০) কুতপ—বাদ্যবিশেষ; অভিনব গুপ্ত অর্থ করিয়াছেন—"চতুর্ব্বিধ আতোদ্য ও ভাণ্ড (ঢক্কাজাতীয় বাদ্য)"—(অর্থাৎ এক কথায় Orchestra)

"তুমি মহেন্দ্রের প্রহরণ—সকল দানবের নিহন্তা। সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তুমি সর্ব্ব বিঘ্ন নিবারণ করিয়া থাক। নৃপের বিজয়, রিপুগণের পরাজয়, গোব্রাহ্মণের মঙ্গল ও নাট্যের উন্নতি তুমি সূচনা করিয়া দাও।"

ইহার পর নাট্যমণ্ডপে উপাসনার বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

রজনী প্রভাত হইলে পূজার প্রারম্ভ। আর্দ্রা, মঘা, ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্লেষা অথবা মূলানক্ষত্রে রঙ্গপূজা কর্ত্তব্য। শুচি ও দীক্ষিত আচার্য্যের সহযোগে এই পূজাকার্য্য সম্পাদনীয়।

দিনান্তে দারুণ ঘোর যে 'ভূতমুহূর্ত্ত' (যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 'রাক্ষসী বেলা' বলি)—সেই সময়ে যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক দেবতা সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। রক্তসূত্রের গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কণ (প্রতিসর), রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, যব, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ), লাজ (খই), অক্ষত (আলোচাল), শালিধান্যের তণ্ডুল, নাগপুষ্পের (চম্পক অথবা পুন্নাগ) (২১) মূল, প্রিয়ঙ্গু (২২) প্রভৃতি পূজার উপকরণ।

প্রথমে রঙ্গপীঠের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে ষোড়শ হস্ত পরিমাণ (২৩) মণ্ডল অঙ্কন করিতে হইবে। উহার চারিদিকে চারিটি দ্বার। মধ্যে উত্তরদক্ষিণে ও পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটি রেখা (—ইহাতে মণ্ডলটি চারিটি ঘরে বিভক্ত হইল)। কেন্দ্রস্থলে পদ্মোপরি ব্রহ্মার স্থান। চারিদিকে ও চারিকোণে মহাদেব, নারায়ণ, মহেন্দ্র, স্কন্দ, সূর্য্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চন্দ্র, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শ্রদ্ধা, মেধা প্রভৃতি দেবগণ, পিতৃগণ মায় ভূত, প্রেত, পিশাচ, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতিরও নিবেশের ব্যবস্থা দেখা যায়। দেবতা সন্নিবেশের পর প্রকৃত কর্ম্ম। দেবগণের উদ্দেশে শ্বেতপুষ্প, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দন প্রদানের বিধি। পক্ষান্তরে গন্ধর্ব্বাদি, অগ্নি ও সূর্য্যের প্রিয় রক্তপুষ্প, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন। ইহা ছাড়া ধূপাদি দানেরও বিধি আছে। অতঃপর বলিপ্রদান। বিভিন্ন প্রকার বলি বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে দিবার কথা আছে। ব্রহ্মার প্রিয় মধুপর্ক—সরস্বতীর পায়স। শিব, বিষ্ণু ও মহেন্দ্রাদি দেবগণের তৃপ্তি মোদকে। অগ্নির উপহার ঘৃতাক্ত অন্ন, চন্দ্র ও সূর্য্যের গুড়মিশ্রিত অন্ন। বিশ্বদেব, গন্ধর্ব্ব মুনিগণ মধু ও পায়স ভালবাসেন। যম ও মিত্রের উদ্দেশে অপূপ ও মোদক বলি দিবার বিধি। এইরূপে যিনি যেমন দেবতা তাঁহার সেইরূপ নৈবেদ্যের বিধান আছে। প্রত্যেকের উদ্দেশে বলি প্রদানের সময় বিশেষ বিশেষ মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নহে।

রঙ্গপীঠের উপর জলপূর্ণ, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত কুম্ভ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কুম্ভ মধ্যে স্বর্ণ দেওয়া থাকিত।

এইরূপে যথাক্রমে সকল দেবতার পূজা শেষ করিয়া জর্জ্জরের পূজা আরম্ভ করিতে হয়; তাহা হইলে বিঘ্ন জর্জ্জরিত হইয়া থাকে।

জর্জ্জরের পাঁচটি পর্ব্ব। উপর দিক হইতে প্রথম পর্ব্বে ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শঙ্কর, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে কুমার ও পঞ্চমে মহানাগগণ অধিষ্ঠিত—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মাথার পর্ব্বটি শ্বেতবস্ত্রে, রৌদ্র (অর্থাৎ রুদ্র কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দ্বিতীয়) পর্ব্ব নীলবস্ত্রে, বিষ্ণুপর্ব্ব (তৃতীয়) পীতবস্ত্রে, স্কন্দের (চতুর্থ) পর্ব্ব রক্তবস্ত্রে, ও মূলপর্ব্ব বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রে মণ্ডিত থাকে। প্রতি পর্ব্বের উদ্দেশে অনুরূপ ধূপ, মাল্য ও গন্ধ দিতে হয়। বাদ্যযন্ত্রগুলিকেও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গন্ধ, মাল্য ধূপ ও ভোজ্য দিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। এইবার বিঘ্নজর্জ্জর করিবার নিমিত্ত জর্জ্জরের অভিমন্ত্রণ। মন্ত্র, যথা—

"এ স্থলে বিঘ্নবিনাশার্থ, বজ্রসার, মহাবীর্য্য, মহাতনু তুমি পিতামহ প্রমুখ সুর শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছ।

---

(২১) নাগপুষ্প—নাগকেশরও হইতে পারে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন নাগদন্ত (একপ্রকার সূর্য্যমুখী) অথবা নাগরঙ্গ (? নাগরঙ্গ—কমলালেবু)।

(২২) প্রিয়ঙ্গু—একপ্রকার পুষ্প—স্ত্রীলোকের স্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়; অথবা জাফ্‌রাণ (কুঙ্কুম)।

(২৩) অভিনব গুপ্ত বলেন, মণ্ডলের মোট দৈর্ঘ্য ষোল হাত; অতএব, উহার প্রতি পার্শ্ব (side) চারিহাত করিয়া সমচতুরস্র (Square) মণ্ডল।

সর্ব্বদেবগণসহ ব্রহ্মা তোমার শিরোদেশ রক্ষা করুন; দ্বিতীয় (পর্ব্ব) রক্ষা করুন হর; তৃতীয়—জনার্দ্দন; চতুর্থ—কুমার ও পঞ্চম—পন্নগশ্রেষ্ঠগণ। সকলে নিত্য তোমাকে রক্ষা করুন ও তুমি মঙ্গলপ্রদ হও। হে অরিসূদন! শ্রেষ্ঠ অভিজিৎ নক্ষত্রে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাজার জয় ও অভ্যুদয় তুমি সূচনা করিয়া দাও।"

বলিপ্রদান ও জর্জ্জর পূজার পর হোম। পরে প্রদীপ্ত উল্কার সাহায্যে বাদ্যসহযোগে নৃপতি ও নর্ত্তকীগণের দীপ্তির অভিবর্দ্ধন। অতঃপর মন্ত্রপূত জলে তাঁহাদের অভ্যুক্ষণ ও আশীর্ব্বাদ।

তাহার পর নাট্যাচার্য্য পূর্ব্বস্থাপিত কুম্ভটি ভাঙ্গিয়া দিবেন। কুম্ভ যদি অভিন্ন থাকে তবে স্বামীর শত্রুভয় হইয়া থাকে। আর ভগ্ন হইলে শত্রুনাশ ঘটে। কুম্ভভেদের পর নাট্যাচার্য্য দীপ্তা দীপিকার সাহায্যে সমস্ত রঙ্গস্থল প্রদীপিত করিবেন (অনেকটা আরত্রিকের মত)। সেই প্রদীপ্ত উল্কা সশব্দে ঘুরাইবার সময় শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, প্রণব প্রভৃতি বাদ্য সকল বাজিতে থাকিবে। পরে রঙ্গযুদ্ধ (mockfight)। ইহাতে শুভ নিমিত্ত দেখা যাইলে স্বামীর শুভ বুঝিতে হইবে। অন্যথায় জনপদ, নৃপ ও নাট্যের অশুভ সূচনা বুঝা যাইবে।

ইহাই হইল সংক্ষেপে রঙ্গদেবতাগণের পূজাপদ্ধতি।

রঙ্গপূজা না করিয়া কদাপি অভিনয় আরম্ভ করা উচিত নহে। করিলে অভিনয় নিষ্ফল হয় ও তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, রঙ্গপূজাদ্বারা অভিষ্টসিদ্ধি ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।

[মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় 'পঞ্চপুষ্পে' (আষাঢ়, ১৩৩৬) 'ভারতের নাট্যশাস্ত্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আছে—

"জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত…।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, জর্জর যে 'একটা ছেঁচা বাঁশ'—ইহা আমরা কোথাও পাইলাম না। উল্টে—জর্জরের দ্বারা ইন্দ্র বিঘ্ন ও অসুরদের গতর ছেঁচিয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রিয় ধ্বজদণ্ডের নাম হইল 'জর্জর'। এই ধ্বজদণ্ডটি বাঁশ, কি কাঠ, কি ধাতুদ্রব্যে তৈয়ারী তাহারও উল্লেখ আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই।

আর 'ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব'ও মিলাইতে পারিলাম না। আমরা মোটে পাঁচটা পাবের সন্ধান পাইয়াছি। পাঠকগণ প্রবন্ধ পড়িলেই দেখিতে পাইবেন। অবশ্য আমাদের ভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এই বৎসর কলিকাতায় 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র সভ্যবৃন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণের সভাপতিত্বে যে জর্জ্জরোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন—তাহাতেও পাঁচটি পাবই দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় যদি তাঁহার প্রবন্ধের সমর্থক বচন 'নাট্যশাস্ত্র' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেন—তাহা হইলে পাঠক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবে।]

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি সি-এস্

তৃতীয় স্তবক

হালম্যালো

১

বাণী

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিলেন।

লোকটার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। দীর্ঘকাল সামুদ্রিক আবহাওয়ায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার ললাটের চর্ম্ম রৌদ্রদগ্ধ হল্‌দেপানা হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি একটু বিশেষ রকমের যেন কৃষকের বিস্ফারিত অক্ষি গোলকে নাবিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। দাঁতগুলি সে দুই হাতে সজোরে ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে কোন উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছিল না।

তাহার কটিবন্ধে একটি ছোরা, দুইটি পিস্তল এবং একটি জপমালা।

"তুমি কে?" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এই মাত্র তো বল্‌লাম।"

"কি চাও তুমি?"

নাবিক দাঁড় রাখিয়া হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, "আপনাকে বধ করতে চাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "যেমন তোমার অভিরুচি।"

সে বলিল, "প্রস্তুত হউন।"

"কিসের জন্য?"

"মরবার জন্য।"

"কেন?"

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—যেন এই প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর বলিল, "আমি ত বল্‌ছি, আপনাকে বধ করাই আমার মতলব।"

"আর আমিও জিজ্ঞেস কর্চ্ছি, কি জন্য?"

নাবিকের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। "কারণ, আপনি আমার ভাইকে বধ করেছেন।"

সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি গোড়ায় তার জীবন রক্ষা করেছিলাম।"

"তা সত্য। আপনি আগে তাকে বাঁচান, তারপর তাকে হত্যা করেন।"

"আমি তাকে হত্যা করি নি।"

"তা হ'লে কে করেছে?"

"তার নিজের ত্রুটি।"

নাবিক হাঁ করিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চোখে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর তাহার ভ্রূযুগ ভয়ঙ্করভাবে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"হালম্যালো। কিন্তু আমার হাতে প্রাণ দেবার জন্যে আমার নাম জান্‌বার তো আপনার কোন প্রয়োজন দেখ্‌ছি না।"

এই মুহূর্ত্তে সূর্য্যোদয় হইল। অরুণ-কিরণ সম্পাতে নাবিকের হিংস্র বদনমণ্ডল রাঙা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ অভিনিবেশ সহকারে তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কামান এখনো থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। দিক্‌প্রান্তে পুঞ্জিত ধূমরাশি, দাঁড়ী আর নৌকা বাহিতেছিল না, উহা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

নাবিক তাহার কটিবন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তে একটি পিস্তল আর বাম হস্তে জপমালা লইল।

বৃদ্ধ আপনার দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?"

নাবিক অঙ্গুলিদ্বারা শূন্যে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া উত্তর দিল, "আমাদের স্বর্গস্থ পরমপিতা।"

"তোমার মা আছে?"

"হ্যাঁ।"

নাবিক দ্বিতীয়বার ক্রুশ্‌চিহ্নের সঙ্কেত করিল। তারপর বলিল, "সব তো বলা-কওয়া হ'ল। মাইলর্ড, আপনাকে আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে পিস্তলের ঘোড়া উঠাইল।

"আমাকে 'মাইলর্ড' ব'লে সম্বোধন করলে কেন?"

"কারণ, আপনি একজন লর্ড, এ ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।"

"তোমার কেউ লর্ড আছেন কি?"

"আছেন। আমাদের জমীদার খুব মস্ত লর্ড। লর্ড ছাড়া আবার লোক থাকতে পারে নাকি?"

"তিনি কোথায়?"

"জানি না। তিনি এই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর নাম হচ্চে—মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক্ ভাইকাউন্ট ডি ফন্টেনয়, ব্রিটেনীর প্রিন্স্। তিনি সপ্তারণ্যের অধিস্বামী। আমি তাঁকে কখনো দেখিনি; কিন্তু তা'হলেও তিনি আমার মুনিব তো বটেন!"

"তাঁ'র সাথে যদি তোমার দেখা হয়, তাহ'লে তুমি তাঁকে মান্‌বে?"

"নিশ্চয়। তাঁকে না মান্‌লে, আমার পাপ হবে। প্রথমে পরমেশ্বর, তারপর রাজা—যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ, তারপর জমীদার—যিনি রাজার প্রতিনিধি, তাঁকে ভক্তি কর্‌তে হয়। কিন্তু এসব কথা কেন? আপনি আমার ভাইকে মেরেছেন, আমি আপনাকে মারব—সোজা কথা।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"স্বীকার কচ্চি, তোমার ভাইকে আমি মেরেচি। কিন্তু মেরে আমি ভালই করেছি।"

নাবিক আপনার হাতের মুঠার পিস্তলটি আরও দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিল। বলিল, "আসুন।"

বৃদ্ধ বলিল, "তাই হোক।" তারপর ধীর-প্রশান্তভাবে আবার বলিলেন, "পাদ্রী কোথায়?"

নাবিক বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "পাদ্রী?"

"হ্যাঁ, পাদ্রী। তোমার ভাইএর জন্যে অন্তিমকালে আমি একজন পাদ্রী দিয়েছিলেম। তোমারও আমাকে একজন পাদ্রী দেওয়া উচিত।"

"আমার এখানে তো পাদ্রী নেই। সমুদ্রে কি পাদ্রী পাওয়া যায়?"

দূরে—বহুদূরে কামান গর্জ্জন শ্রুত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "যারা ওখানে মরছে তা'দের চরম-গতির জন্য পাদ্রী আছে।"

"তা' সত্য" অস্ফুটস্বরে নাবিক বলিল। "সেখানে চ্যাপ্‌লেন আছেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি আমার আত্মাকে নরকে ডুবাতে চাও—এতো বড় গুরুতর কথা।"

নাবিক চিন্তিতভাবে মাথা নত করিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "আর আমার আত্মাকে নিরয়গামী কর্‌লে তোমার আত্মারও অধঃপতন ঘট্‌বে। শোন, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্চে। আমার কি? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তোমার ভাইএর জীবন রক্ষা ক'রে আবার তা'কে বধ ক'রে আমি শুধু আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি; এখন আবার তোমার আত্মাকেও রক্ষা করতে চেষ্টা ক'রেও আমি আমার কর্ত্তব্যই কচ্চি। এ তোমার কথা, তুমিই ভেবে চিন্তে দেখ। ঐ তোপধ্বনি শুনতে পাচ্ছ?—কত স্বামী আর তা'দের স্ত্রীকে দেখ্‌তে পাবে না; কত পিতা আর তা'দের ছেলেদের দেখ্‌তে পাবে না; কত ভাই, তোমার মতন আর তাদের ভাইকে দেখ্‌তে পাবে না। কিন্তু কা'র দোষে? তোমার ভাইএর—তোমার। তুমি বিশ্বাস কর, একজন ঈশ্বর আছেন,—নয়? ভাল, ভেবে দেখ এই মুহূর্ত্তে তিনি কত বেদনা অনুভব কর্চ্ছেন। শিশুর মতোই তাঁর পুত্রস্বরূপ ফ্রান্সের শিশুরাজা এখন টেম্পলদুর্গে অবরুদ্ধ। এই ব্রিটেনী প্রদেশে গির্জ্জা সকল বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত, অপমানিত; পবিত্র প্রার্থনাগৃহ সকল কলুষিত, ধর্ম্মযাজকগণ নিহত। ঐ যে জাহাজটি নষ্ট হচ্ছে, ওটি নিয়ে আমরা কি কর্‌তে চেয়েছিলেম? আমরা পরমেশ্বরের সন্ততিদের সাহায্যের জন্যে যাচ্ছিলাম। তোমার ভাই যদি বুদ্ধিমান্ সতর্ক লোকের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে তার কর্ত্তব্যপালন কর্‌ত তা'হলে এসব দুর্ঘটনা ঘট্‌ত না। এতক্ষণে আমরা—নির্ভীক সৈন্য ও নাবিকের দল—ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ কর্‌তাম, এবং তরবারি হস্তে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে হর্ষোৎফুল্লমুখে

ভেণ্ডীর সাহসী কৃষকদিগকে সাহায্য কর্‌তে, ফ্রান্স্‌কে রক্ষা কর্‌তে, আমাদের রাজাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হতাম। তা'হলে আমাদের ভগবানের কাজ করা হ'ত। আর সেটাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল। আমাদের মধ্যে এখন আমিই একমাত্র অবশিষ্ট, কিন্তু তুমি তা'তেও বাধা জন্মাচ্ছ। এই পাপীর দল ও ধর্ম্মাত্মা যাজকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, এই রাজহন্তা সকল ও রাজার মধ্যে সংগ্রামে, এই পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের যুদ্ধঘোষণায় তুমি শয়তানের পক্ষ অবলম্বন করেছ। তোমার ভাই ছিল শয়তানের প্রথম সহকারী— তুমি হচ্ছ দ্বিতীয়। সে আরম্ভ করেছিল, তুমি সমাপ্ত কর্‌ছ। ভগবানের হাত থেকে তুমি শেষ উপায় কেড়ে নিচ্ছ। কারণ, আমি রাজপ্রতিনিধি, আমি না থাক্‌লে গ্রাম জ্বল্‌তে থাক্‌বে, বাড়ীতে বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, ধর্ম্মযাজকগণের শোনিতে ধরণী সিক্ত হবে; ব্রিটেনীর দুঃখ-ভোগ চল্‌বে, রাজা কারারুদ্ধ থাক্‌বেন, যীশু খ্রীষ্টের বেদনার আর অবসান হ'বে না। এর জন্যে কে দায়ী হ'বে? তুমি। যা ইচ্ছা হয় কর। তোমার বুঝ্ তুমি বুঝ্‌বে।

"হাঁ ঠিক কথা, আমি তোমার ভাইকে হত্যা করেচি। তোমার ভাই সাহস দেখিয়েছিল, আমি তার পুরস্কার দিয়েছি। সে দোষ করেছিল, আমি তার সাজা দিয়েছি। সে তা'র কর্ত্তব্যপালন করে নি, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। যা একবার করেছি, আবশ্যক হ'লে তা' আবার করব। আর একথা আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, আমার ছেলেও যদি এরূপ করত, তাকেও এম্‌নি তোমার ভাইএর মতোই গুলি ক'রে মারতাম্। এখন তোমার হাতে পড়েছি, যা খুসি কর্‌তে পার। কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, তোমার জন্যে আমার অনুকম্পা হচ্ছে। তুমি তোমার কাপ্তেনের নিকট মিথ্যা কথা বলেছ! তুমি একজন খ্রীষ্টান, অথচ তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস নেই; তুমি একজন ব্রিটেনীর অধিবাসী, অথচ তোমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নেই। বিশ্বাস ক'রে তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিল, আর তুমি কর্‌চ বিশ্বাসঘাতকতা ও যা'র জীবনরক্ষার জন্যে তুমি নিযুক্ত হয়েছ, তাকেই তুমি হত্যা কর্‌চ। জানো, এ হত্যা কা'কে করা হচ্ছে? তোমার নিজেকে। রাজার কার্য্যে উৎসৃষ্ট আমার জীবন, সেই জীবন রাজার হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছ,—আর তৎপরিবর্ত্তে তোমার নিজের জন্য অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা কর্‌ছ। বেশ, তাই কর। নিজের স্বর্গবাসের দাবীটুকু কত সস্তায়ই বিকিয়ে দিচ্ছ বন্ধু!

"সাবাস তোমাকে! তোমারই জন্যে শয়তান জয়ী হবে; তোমারই জন্যে ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া ধরাশায়ী হবে; তোমারই জন্যে যে গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনিতে মানুষের আত্মাকে পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হত, অধার্ম্মিকের দল সেই ঘণ্টা গালিয়ে কামানের গোলা তৈরী করবে, এবং তা দিয়ে নরহত্যা করবে। হয়তো এই মুহূর্ত্তে, যে ঘণ্টার মধুর ধ্বনি তোমার জন্মানুষ্ঠানের শুভসূচনা করেছিল—সেই ঘণ্টা, গুলি হ'য়ে তোমার জননীকে হত্যা করছে। হাঁ, তোমার ভাইকে আমি সাজা দিয়েছি, কিন্তু আমি দণ্ডদাতা বিধাতার হাতের যন্ত্রমাত্র। তুমি কি বিধাতার কার্য্যের বিচার করবার স্পর্দ্ধা রাখ? আকাশের বজ্রের সমালোচনা করতে চাও? সাবধান! তোমার এবং আমার এই দুইটি আত্মার নরকভোগের জন্যে তুমি দায়ী হবে। আমরা একাকী অতলস্পর্শ গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শেষ করে' দাও। আমি বৃদ্ধ, তুমি যুবা, আমি নিরস্ত্র, তুমি সশস্ত্র। কর, আমাকে হত্যা কর।"

সাগরকল্লোল হইতেও গম্ভীরতর স্বরে উচ্চারিত বৃদ্ধের এই কথাগুলি শুনিয়া নাবিকের বদনমণ্ডল রক্তহীন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। তাহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল; এবং তাহার দেহ বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। সে বারংবার তাহার জপমালা চুম্বন করিতেছিল। বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র সে হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, "দয়া করুন, মাই লর্ড, আমাকে মার্জ্জনা করুন। আপনার কথা আমার নিকট ঈশ্বরের বাণীর মতোই মনে হচ্ছে। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার ভাই অপরাধ করেছে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। আদেশ করুন, আমি পালন করব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

২

কৃষকের স্মরণশক্তি ও কাপ্তেনের যুদ্ধবিজ্ঞান

পলাতকদ্বয়কে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। নতুবা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। উপকূলে পৌঁছিতে তাহাদের ছত্রিশ ঘণ্টা লাগিল। একরাত্রি সমুদ্রে কাটিল। তবে রাত্রি খুব পরিষ্কার ছিল, বরং জ্যোৎস্না আর একটু কম হইলেই তাহাদের পক্ষে ভাল হইত।

গহনবনে শিকারীগণের হস্তে নিহত হইবার সময় সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় তাহারা করভেট্টির তলাইয়া যাইবার ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর সব নিঃশব্দ হইল।

'ক্লেমোর' 'এভেঞ্জার' রণতরীর মতোই বীরত্বের সহিত যুঝিয়া প্রাণ দিল। কিন্তু সেই গৌরব তাহার হইল না। স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেহ বীরত্বের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে না।

হাল্‌ম্যালো খুব সুচতুর নাবিক। এই নৌকা পরিচালনে তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। মগ্নশৈলমালার ফাঁকে ফাঁকে তরঙ্গের আঘাত বাঁচাইয়া, শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে নৌকাটিকে ফ্রান্সের কূলে একটি নির্জ্জন বেলাভূমিতে আনিয়া ভিড়াইল। সে বলিল, "মনসেইনিয়র, আমরা কুইনন্ নদীর মোহনায় আসিয়াছি। আমাদের ডাইনে বুভয়, বামে হুইস্‌নেস্, সম্মুখে আঁদ্রুনের ঘণ্টা স্তম্ভ।"

বৃদ্ধ মুইয়া একটি বিস্কুট তুলিয়া পকেটে রাখিল এবং হাল্‌ম্যালোকে বলিল, "বাকীগুলি তুমি নাও।"

হাল্‌ম্যালো সেগুলি তাদের থলেতে রাখিয়া থলেটি কাঁধের উপর ঝুলাইল। তারপর বলিল, 'মন্‌সেইনিয়র, আমি কি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, না আপনার পিছু-পিছু যাব?"

"কোনটাই নয়?"

বিস্মিত হাল্‌ম্যালো বৃদ্ধর মুখের দিকে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "হাল্‌ম্যালো, আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'তে হবে। দু'জন এক সঙ্গে গেলে কোন সুবিধে হবে না। হাজার লোক চাই, আর তা' নৈলে একলাই ভাল।"

তারপর একটু ভাবিয়া তিনি পকেট হইতে একটি সবুজ রেশমীফিতার বন্ধনী ("বো") বাহির করিলেন। তাহার মধ্যস্থলে ফ্লোর্-দ্য-লিস্ (ফ্রান্সের রাজচিহ্ন কুমুদকলি) অঙ্কিত। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি পড়্‌তে জানো?"

"না।"

"সেটা ভালোই। পড়্‌তে-পারা লোক নিয়ে অনেক সময় মুস্কিল হয়। তোমার স্মরণশক্তি বেশ ভালোতো?

"আজ্ঞে, তা মন্দ নয়।"

"উত্তম। শোন, হাল্‌ম্যালো। তুমি যাবে ডানদিকে, আমি যাব বাঁদিকে। তোমার থলেটি নিয়ে যাও, এতে তোমাকে ঠিক কৃষকের মতোই দেখায়। অস্ত্রশস্ত্র সব লুকিয়ে রাখ্‌বে। জঙ্গল থেকে একটা লাঠি কেটে নিও। সর্ষে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে গুড়ি মেরে বেড়াটেড়া ডিঙ্গিয়ে সোজা মাঠ পার হ'য়ে চ'লে যাবে। রাস্তা, পুল এড়িয়ে চল্‌বে। লোকজনের দিকে ঘেঁস্‌বে না। কিন্তু তোমাকে তো কুইনন্ নদী পার হতে হবে। তার উপায় কি কর্‌বে?"

"সাঁত্‌রে যাব।"

"তাই ঠিক। একটা জায়গা আছে, সেখানে জল গভীর নয়—তুমি জানো সেটা?"

"আজ্ঞে, আন্‌সে এবং ভুবিলের মধ্যে।"

"ঠিক বলেছ। দেখ্‌ছি, তুমি এই অঞ্চলের লোকই বট।"

"কিন্তু রাত হ'য়ে এল। মন্‌সেইনিয়র্ কোথায় থাক্‌বেন।"

"আমার যোগাড় আমি করতে পারব। কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় রাত কাটাবে?"

"আজ্ঞে, জঙ্গলে জায়গায় বৃক্ষ-কোটরের অভাব নাই। নাবিক হওয়ার আগে আমি কৃষক ছিলাম।"

"তোমার নাবিকের টুপীটা ফেলে দাও, নৈলে ধরা প'ড়ে যাবে। একটা পশমী টুপী যোগাড় করা কঠিন হবে না।"

"তা' পারব।"

"বেশ। এখন শোন, বনজঙ্গল গুলির অবস্থা তোমার জানা আছে ?"

"খুব।"

"সেগুলির নাম জান ?"

"ইস্তক নরমন্‌টিয়ার লাগায়েৎ লাভেল্ এর মধ্যে যত অরণ্য আছে তাদের নাম, অবস্থা, যা' কিছু জান্‌বার আমি সবই জানি।"

"কিছু ভুল হবে না ?"

"না।"

"উত্তম। একদিনে কয় মাইল তুমি চল্‌তে পার ?"

"ত্রিশ-চল্লিশ, আবশ্যক হইলে ষাট পর্য্যন্ত।"

"তা' আবশ্যক হবে। আমি এখন যা' বল্‌ব, খুব মন দিয়ে শোনো। একটুও যেন ভুল না হয়। সেণ্ট্ রিউল্ এবং লিভিয়াকের মাঝামাঝি খাদের পাশে একটা খুব বড় বাদাম গাছ আছে। সেইখানে গিয়ে তুমি থাক্‌বে। তুমি সেখানে কাউকে দেখ্‌তে পাবে না।"

"আমি দেখ্‌তে না পেলেও অপর লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব হ'বে না। বুঝ্‌লাম।"

"তুমি সঙ্কেতসূচক শব্দ ক'রে ডাক্‌বে। সেটা কিরূপে করতে হয় জানো ?"

হাল্‌ম্যালো গাল ফুলাইয়া সাগরের দিকে ফিরিয়া পেচকের মত তীব্রস্বরে শিস্ দিল—"টু-হুইটু—টু-হু-উ-উ।"

মনে হইল যেন নৈশান্ধকারে পরিব্যাপ্ত অরণ্যের নিভৃত অন্তর প্রদেশ হইতে সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উত্তম; তুমি বেশ পারো, দেখ্‌চি।"

তারপর সবুজ "বো"টি হাল্‌ম্যালোর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই আমার আদেশ চিহ্ন। আমার নাম গোপন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু পরিচয়ের পক্ষে এই"বো"টিই যথেষ্ট। টেম্পল্ কারাগারে ফ্রান্সের রাজ্ঞীর হাতে-তৈরি এই ফ্লোর-ডি-লিস্।"

হাল্‌ম্যালো নতজানু হইয়া কম্পিত বক্ষে ফুল-তোলা "বো"টি গ্রহণ করিল, কিন্তু সেটি ওষ্ঠপুটের নিকটে আনিয়াও সাহস করিয়া চুম্বন করিতে পারিল না। থামিয়া অনুমতি চাহিল, "পারি কি ?"

"হ্যাঁ, তুমি ত ক্রুশও চুম্বন ক'রে থাক।"

হাল্‌ম্যালো ফ্লোর-ডি-লিস্‌টি চুম্বন করিল।

তারপর বৃদ্ধের কথায় উঠিয়া বক্ষবস্ত্রে "বো"টি লুকাইয়া রাখিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "মনোযোগ দিয়ে শোন; এই হচ্চে আদেশ, 'উঠ, জাগো, বিদ্রোহে যোগ দাও! কাউকে দয়া কর্‌বে না!' সেণ্ট-অবিনের অরণ্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে' তুমি সঙ্কেত ধ্বনিতে তিনবার ডাক্‌বে। দেখ্‌বে তৃতীয়বারের ডাকেই একজন লোক মাটি থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ছে।"

"গাছের গোড়ায় একটা গর্ত্ত থেকে—তা' আমি জানি।"

"এই লোকটি হচ্ছে প্লান্‌চেনল্ট্। তা'কে তুমি এই "বো"টি দেখাবে। সে বুঝতে পারবে। তারপর তুমি অষ্টিলের অরণ্যে যাবে; সেখানে একজন খঞ্জকে দেখতে পাবে। লোকে তার নাম দিয়েছে মুস্‌কেটন্—সে কাউকেও অনুকম্পা দেখায় না। তা'কে বল্‌বে যে আমি তা'কে ভালবাসি—সে যেন গ্রামগুলিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সেখান থেকে কুশ্‌বনের অরণ্যে গিয়ে পেচকের ডাক ডাক্‌বে; একটা লোক গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আস্‌বে। তা'কে বল্‌বে সে যেন কুশ বনের দুর্গ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখে। এই দুর্গটি পলায়িত মার্কুইস্ ডিগারের সম্পত্তি। বেশ সুবিধের জায়গা, এখানে সেখানে জঙ্গল, খাদ, গর্ত্ত, গহ্বর, জমি অসমতল। সেখান থেকে যাবে তুমি গুয়েন্-লাণ্টায়। সেখানে জিন্ চোয়ান্‌কে সব বল্‌বে। আমি এই লোকটাকে আসল সর্দ্দার মনে করি। তারপর ভিল্ এংগ্নয়ের অরণ্যে তোমাকে যেতে হবে। ওখানে গিটারের (লোকে যাকে সেণ্ট মার্টিন্ বলে) তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তাকে বল্‌বে কুরমেস্‌নিল ব'লে একটা লোকের উপর নজর রাখ্‌তে। সে লোকটা হচ্ছে আর্জেণ্টাইন অঞ্চলের জেকোবিন্ দলের নেতা। যা' যা' বল্‌লাম বেশ ক'রে মনে রেখো। কিছুই লিখে দিলাম না। লিখে দেওয়াটা ঠিক নয়। লা রোয়ারি লিষ্টি ক'রে দিয়েছিল, তা'তে সব প্লান নষ্ট হয়ে যায়।"

একটু থামিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "তুমি লা টুর্গ্‌ চেন ?"

"লাটুর্গ্‌ দুর্গ চিনি কিনা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌চেন ? আমি লাটুর্গেরই লোক।"

"কিরূপে ?"

"আমি তো পেরিগণের অধিবাসী।"

"তা বটে। লাটুর্গ পেরিগণেরই নিকটে।"

"কি বল্লেন লাটুর্গ জানি কিনা ! সে বৃহৎ গোলাকার দুর্গ, যা আমার লর্ডের সম্পত্তি। এর নূতন অংশ ও পুরাতন অংশের মধ্যে একটা লৌহদ্বার আছে, কামানের গোলাতেও সেটা খুল্‌বে না। সেন্ট্‌ বার্থোলোমিয়ো'র সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুস্তকটা নূতন দালানে আছে—সেখানে কত লোক সেটা দেখ্‌তে যায়। গড়ের মধ্যে ঢের ব্যাঙ্‌ আছে। ছেলেবেলায় আমি সেগুলোকে ভারী উত্যক্ত কর্‌তাম। আর সেই মাটির নীচেকার সুড়ঙ্গপথ! আমি সেটা জানি। আর জানা লোক বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই।"

"সুড়ঙ্গপথ কি বল্‌ছ। আমি বুঝতে পারছিনে।"

"অতি প্রাচীনকালে লাটুর্গ্‌ যখন অবরুদ্ধ হয় তখন এটা তৈরি হয়েছিল। ভেতরের লোকে ঐ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অরণ্যে চ'লে যেতে পার্‌ত।"

"ঐ রকম মাটির নীচ দিয়ে পথ জুপেলিয়ারি দুর্গে এবং চেম্পিয়ন্‌ টাওয়ারে আছে ব'লে জানি, কিন্তু লাটুর্গে তেমন কিছু নেই।"

"আছে, মনসেইনিয়র, নিশ্চয়ই আছে। মনসেইনিয়র যে গুলোর কথা বল্লেন তা আমি জানিনে। আমি কেবল লাটুর্গের কথাই জানি, এবং আর কেউ সেটা জানে না। এটার কথা বলা বারণ ছিল, কারণ মুসো ডি রোহান্সের যুদ্ধকালে ওটা ব্যবহৃত হয়। আমার বাবা সেটা জান্‌ত, আর আমাকে দেখিয়েছিল। কিরূপে ভিতরে ঢুকতে হয় আর কিরূপে বেরুতে হয় সবই আমি জানি। বন থেকে আমি টাওয়ারের ভিতর যেতে পারি, আবার টাওয়ার থেকে বেরিয়ে বনে চ'লে যেতেও পারি; অথচ কেউ কিছু দেখ্‌তেও পাবে না। শত্রু এসে প্রবেশ করলে দুর্গের মধ্যে কাউকে দেখ্‌তে পাবে না। আমি খুবই জানি।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তোমার ভুল হয়েছে। এমন গোপন পথ থাক্‌লে আমি সেটা জান্‌তে পারতাম।"

"মনসেইনিয়র, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। একটা পাথর আছে, সেটা ঘুরে যায়।"

"বেশ বেশ, তোমরা চাষারা বিশ্বাস কর—পাথর কব্জের উপর ঘোরে, পাথর গান গায়, পাথর রাত্তিরে চ'লে গিয়ে নিকটবর্ত্তী ঝরণা থেকে জল খায়—গাঁজাখুরি আর কি !"

"কিন্তু আমি নিজেই সেই পাথরটা ঘুরিয়েছি।"

বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "যেমন অন্যেরা পাথরকে গান গাইতে শুনেছে। মিত্র লাটুর্গের দুর্গ খুব দুর্ভেদ্য এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে তা রক্ষা করা সহজ। এই মাত্র। কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে আস্‌বার জন্য ভূগর্ভস্থ পথের উপর ভরসা রাখ্‌লে নিতান্তই বোকামি হবে।"

"কিন্তু মনসেইনিয়র—"

বৃদ্ধ অসহিষ্ণুভাবে স্কন্ধ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। কাজের কথা বলা যাক্‌।"

এই প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে হাল্‌ম্যালো চুপ করিল।

অতঃপর আরও কোথায় কোথায় যাইতে হইবে বৃদ্ধ হাল্‌ম্যালোকে তাহা বলিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল, যে কার্য্য সাধনের জন্য হাল্‌ম্যালো প্রেরিত হইতেছে তাহাতে অর্থের প্রয়োজন হইবে। তিনি পকেট হইতে একটি তোড়া ও পকেট বুক বাহির করিয়া হাল্‌ম্যালোর হাতে দিলেন। বলিলেন, "পকেট বুকে প্রায় ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট্‌, আর তোড়াটিতে শত স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমার যা' ছিল সবই তোমাকে দিলাম। এখানে আমার কিছুরই অভাব হবে না। আর ধরা পড়্‌লে আমার নিকট টাকা পয়সা না পাওয়া গেলেই ভাল। যা' যা' বল্লেম, সব মনে রাখ্‌তে পার্‌বে তো ?"

"ইষ্টমন্ত্রের মতোই আমার মনে থাকবে।"

"আর দেখ, তুমি এদের সঙ্গেও দেখা কোরো;—সেন্ট ব্রিয়েনে মুর্সো ডুবয়, মর‍্যানেঁতে মুর্সো ডি টুর্নপিন্‌, আর শেটো গাঁথিয়ারে প্রিন্স ডি ট্যাল্‌মণ্ট্‌।"

"প্রিন্স ? তিনি আমার সঙ্গে কথা কইবেন ?"

"কইবেন বৈ কি, যখন আমিও কইচি।"

হ্বাল্ম্যালো মাথা হইতে টুপী নামাইল।

"মাদামের 'ফ্লোর-ডি-লিস্' যখন কাছে আছে, তুমি সর্ব্বত্রই আদৃত হবে। ভুলো না যেন, তুমি পার্ব্বত্য ও গ্রাম্য জনপদে যাচ্চ। ছদ্মবেশ ধারণ করবে—তোমাকে যেন না চিনতে পারে। সেটা খুব কঠিন নয়। এই সাধারণ তন্ত্রের লোকগুলো বড় বোকা। একটা নীল কোট, একটা তিনকোণা টুপী, এবং সেই টুপীর উপর একটা তে-রঙা ফিতের ফাঁস—ব্যস্, এই হ'লে তুমি যেখানে খুসি চ'লে যেতে পারবে। তুমি এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র যাবে—সব্বাইকে সঙ্কেতবার্ত্তা জানাবে, 'ওঠ, জাগো, বিদ্রোহে যোগ দাও! দয়া করো না, ক্ষমা করো না।' সর্দ্দার ও নেতাদের প্রত্যেককে রাজ্ঞীর রিবন দেখাবে। তারা চিনতে পারবে। আমার নাম ক'রে তাদের বলবে—'সময় হয়েছে, এখন বড় বড় যুদ্ধ ও ছোট ছোট লড়াই সব তাতেই যোগ দিতে হ'বে। বড় যুদ্ধে কোলাহল বেশী, কিন্তু ছোট যুদ্ধে কাজ হয় বেশী—লোকক্ষয় করা যায় বেশী। ভেণ্ডির সংগ্রাম—উত্তম; কিন্তু চোয়ানদের লড়াই—তার চেয়েও ভাল। অন্তর্বিপ্লবে যা' সব চেয়ে কঠোর, তাই সবচেয়ে ভাল। ক্ষতির পরিমাণ দিয়েই যুদ্ধের সফলতা বিবেচিত হয়।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"হ্বালম্যালো, তোমাকে যা' বলছি, কথাগুলো হয়ত তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছ। তুমি যেরূপ ভাবে ডিঙ্গিটি চালিয়ে নিয়ে এসেছ তাই দেখে তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে। তুমি জ্যামিতি জান না, অথচ সামুদ্রিক নৌ পরিচালনায় আশ্চর্য্য তোমার কৃতিত্ব। যে এরূপভাবে নৌকা চালাতে পারে, সে একটা বিদ্রোহও চালাতে পারে। তুমি আমার আদেশ তামিল করতে পারবে তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সর্দ্দারদের তুমি তোমার নিজের কথায় সব বুঝিয়ে বলবে। তুমি সেটা খুব ভাল্ ক'রেই পারবে। সমতল ভূমির যুদ্ধাপেক্ষা আমি অরণ্য যুদ্ধ অধিক পছন্দ করি। লক্ষ লক্ষ কৃষককে নিয়ে মাত্র শত্রুর কামান ও বন্দুকের সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড় করানো, ও আমার মোটেই ইচ্ছে করে না। আমি চাই একমাসের ভেতরে আমাদের পাঁচ লক্ষ লক্ষ্য-ভেদ-কুশল বন্দুকধারী এই মহারণ্যের ঝোপে ঝোপে লুক্কায়িত থাকবে, আর সাধারণ তন্ত্রের সৈন্য হবে আমাদের শিকার। সম্মুখ যুদ্ধের চেয়ে এরূপ গোপন আক্রমণের উপরই আমি বেশী ভরসা রাখি। দয়া নাই, গোপন আক্রমণ সর্ব্বত্র—এই কথাটা বেশ ক'রে মনে রাখবে। আরও বলবে ইংরেজরা আমাদের পক্ষে। সাধারণ তন্ত্রকে আমরা দুই আগুনের মধ্যে ফেলে পোড়াব। ইউরোপ আমাদের সহায়। রাষ্ট্র-বিপ্লবটাকে এবার নিকেশ ক'রে ফেলতে হবে। রাজারা রাজ্য নিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমরা প্রথম গ্রাম জনপদ নিয়ে লড়ব। এ সব কথা বলবে—বুঝেছ ?"

"হ্যাঁ। বন্দুক ও তরবারিতে সবাইকে বিনাশ করা।"

"ঠিক।"

"কাউকেও দয়া নেই।"

"একজনকেও নয়। ঠিক।"

"আমি সব জায়গায়ই যাব।"

"আর খুব সাবধানে থাকবে। এ দেশে প্রাণ হারানটা খুব সহজ।"

"মৃত্যুভয় আমার নেই। একবার যে এগিয়ে আসবে, তাই তার শেষ যাত্রা হবে।"

"তুমি বেশ সাহসী।"

"মনসেইনিয়রের নাম যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে।"

"আমার নাম এখানে প্রকাশ পেলে চলবে না। তুমি বলবে, তুমি জান না। সেটা সত্য বলাই হবে।"

"মনসেইনিয়রের সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে ?"

"যেখানে আমি থাকব।"

"কিরূপে আমি জানতে পারব ?"

"পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানতে পারবে। আজ থেকে আট দিনের মধ্যে সর্ব্বত্রই আমার সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আমার কার্য্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে। ধর্ম্ম ও রাজার অপমানের শোধ আমি নেব। তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে, আমার কথাই সকলে বলছে।"

"বুঝলাম।"

"কিছু ভুলো না।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"এখন যেতে পার, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।"

"আমি যাচ্ছি। যা বল্লেন আমি সব বল্‌ব। আপনার আদেশ মত সব করব, সব চালাব।"

"উত্তম।"

"যদি আমি কৃতকার্য্য হই—"

"তোমাকে সেণ্ট লুইয়ের নাইট্‌ উপাধি দোবো।"

"যেমন আমার ভাইকে দিয়েছিলেন। আর যদি আমি অকৃতকার্য্য হই, তাহ'লে আপনার আদেশে বন্দুকের গুলিতে আমার প্রাণ যাবে।"

"তোমার ভাইএরই মতো।"

"বুঝ্‌লাম, মন্‌সেইনিয়র্‌।"

বৃদ্ধ মস্তক নত করিয়া গভীর ভাবনায় মগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন চোখ তুলিয়া চাহিলেন তখন তিনি একাকী। দূরে দিগন্তে হ্বাল্‌ম্যালোর মূর্ত্তি একটি কালো দাগের মত মিলাইয়া যাইতেছিল।

সূর্য্য এইমাত্র অস্ত গেল। শ্যামায়মান সাগরবক্ষ হইতে পাখীর দল তীরে নীড়ের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

আসন্ন রাত্রির একটা ব্যাকুল অস্বচ্ছন্দতা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। ভেকের কর্কশ কণ্ঠ জাগিয়া উঠিয়াছে; মাছরাঙাগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া ডোবা হইতে উড়িয়া যাইতেছে; সিন্ধু-শকুন ও দাঁড়কাকের কোলাহলে সান্ধ্যগগন মুখরিত। তীরের পাখীর কলরব শোনা যাইতেছে—কিন্তু কোনরূপ মনুষ্য কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে না। নিস্তব্ধতা একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ। খাঁড়িতে একটিও পাল নাই; মাঠে একজনও কৃষক নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, জনশূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। প্রদোষের দীপ্তিহীন মলিন আকাশ বেলাভূমির উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। দূরে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ডোবাগুলির জল-তল জমির উপর আস্তৃত দস্তার পাতের মতো দেখাইতেছে। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ সমুদ্রের বিশাল কূলে ভাসিয়া আসিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

তুখাররাজ্যে হিন্দুসভ্যতা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

মহাভারতে আমরা দেখি যে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় তুখার বলিয়া এক জাতি চীনের নানাবিধ দ্রব্য সম্ভার লইয়া বাণিজ্যার্থে আসিয়াছিল। এই তুখার জাতি ছিল মধ্য-এশিয়াবাসী; মধ্যএশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে ইহাদের যথেষ্ট হাত ছিল। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানা গিয়াছে সম্প্রতি, মধ্য এশিয়ায় আধুনিক প্রাত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে। ইহার পূর্ব্বে গ্রীক ও লাটিন ঐতিহাসিকগণের সামান্য উল্লেখ হইতে এইটুকু জানা যাইত যে, তুখার নামে এক জাতি Bactria হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহারা শকজাতির শাখা বিশেষ। ইহা ভিন্ন তাহাদের ভাষা বা অপর কোন বিষয়েই জানা যায় নাই।

মধ্যএশিয়ায় ষ্টাইন, পেলিও, লি-কক্ (Le-coq) প্রভৃতি মনীষীদিগের আবিষ্কারের ফলে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি পাওয়া যায়, সেগুলি সম্বন্ধে নানা দেশীয় বুধমণ্ডলী গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। অধ্যাপক লয়ম্যান (Leumann) প্রথমে নির্দ্দেশ করেন যে, খোটান ও তন্নিকটবর্ত্তী মরুস্থান হইতে আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে দুইটি অপরিচিত ভাষা দেখা যায়। ভাষা দুইটি ইন্দোজার্মাণ শাখার অন্তর্গত বলিয়া তিনি অনুমান করেন।

দ্বিতীয় ভাষাটি লয়ম্যান Nordarische (উত্তর আর্য্যভাষা) এই আখ্যা দিয়াছেন। অধ্যাপক ষ্টেন্-কোনো (Sten-Konow) ইহাকে বলিয়াছেন খোটানী। যাহা হউক্, ইহার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। প্রথম ভাষাটি সম্বন্ধে জার্মাণ পণ্ডিত অধ্যাপক Sieg ও Dr Siegling আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ ভাষায় লেখা পুঁথিগুলির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। তাঁহারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ ভাষাটি Centum বর্গের অন্তর্গত ইন্দো-জার্মাণ ভাষা। এই ভাষায় লিখিত মৈত্রেয়-সমিতি নামক পুঁথির কিয়দংশ তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

F. W. K. Miller এই মৈত্রেয়-সমিতি বইখানির উইগুর ভাষায় অনূদিত সংস্করণটির কিছু কিছু অংশ প্রকাশ (publish) করিয়াছেন। পুঁথিটির শেষ ভাগে দেখা যায় যে, বৈভাষিক আর্য্যচন্দ্র ভারতীয় একটি ভাষা হইতে Toxri ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তারপর আচার্য্য প্রজ্ঞারক্ষিত আবার Toxri ভাষা হইতে তুর্কী উইগুর ভাষায় উহা ভাষান্তরিত করেন। এই Toxri ভাষা হইল Miller এর মতে তুখার জাতির প্রাচীন ভাষা। Seig ও Seigling ও এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু এই ভাষাটিকে তুখারীয় ভাষা বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রফেসর লেভী দেখাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় (B) ভাষাটি কুচায় রাজভাষারূপে (Official language of administration) প্রচলিত ছিল, এবং প্রথম ভাষাটি ছিল Karashar এ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কুচার ইতিহাস ও দলিলপত্র অনুসন্ধান করিয়া কুচার সহিত তুখারীয় ভাষার কোনও যোগ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

ক্রমশ জানা গিয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর ভাষাটির আসল নাম ছিল **Arsi**। এই **Arsi** ও **Toxri** দুইটি শব্দ Trogus নামক জনৈক লাটিন গ্রন্থকারের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থকার হইলেন Livy র সমসাময়িক। তাঁহার গ্রন্থের নাম হইল Historiae Philipicae-an Universal History.

এই গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তিনি বলিয়াছেন যে, তুখারদিগের রাজাদের সাধারণত বলা হইত Asiani, এবং Arsi ও Toxri—এই দুইটি শব্দেই তুখারীয় ভাষাকে বুঝাইত।

Arsi শব্দের উৎপত্তি হইল তুখার রাজাদিগের নাম Asiani হইতে, এবং Toxri শব্দটি সমগ্র তুখার জাতির নাম হইতেই আসে।

কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাটিকে **Arsi** বলিয়া কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। লেভী ইহাকে বলিয়াছেন কুচিয়ান্; কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত ইহাতে আপত্তি করেন, কারণ কুচিয়ান্ হইতে তুর্কান পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানে এই ভাষায় লিখিত পুঁথি ও তাম্রপাত্রে লিখিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝা যায় যে, কুচায় ত বটেই, কুচার পূর্ব্বদিকের স্থানসমূহেও এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আরও দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর ভাষায় লিখিত একটি পুঁথির মধ্যে ব্যাখ্যা ও টীকা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষায়; আবার আর দুইটি প্রথম শ্রেণীর ভাষায় লিখিত পুঁথির নাম রহিয়াছে দ্বিতীয় ভাষায়। আর একটি বর্ণমালা তালিকাগ্রন্থে কিয়দংশ প্রথম ভাষায়, কিয়দংশ দ্বিতীয় ভাষায় লেখা। এই সকল প্রমাণ হেতু জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, তুর্কীস্থানের ঐ সকল অংশের প্রাদেশিক ভাষা ছিল দ্বিতীয়টি, আর প্রথমটি কোনও বিদেশী ভাষা; ক্রমশ সাহিত্যের মধ্য দিয়া ঐ সকল দেশে আসিয়া প্রচলিত হইয়া যায়। কিন্তু কোন্ দেশের অধিবাসীগণ যে এই ভাষা আমদানী করিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

চীনা ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, Ta-hia বা Ta-ha বলিয়া এক জাতি Bactriaতে বাস করিত; ইহাদেরই আর একদল বাস করিত Kausuতে। হুয়েন সাঙ চীন সাম্রাজ্যের সন্নিকটে Tu-ho-lo নামক একটি প্রাচীন উপনিবেশের উল্লেখ করিয়াছেন। Marquart বলেন যে, গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারগণ যাহাদিগকে Tochari বলিয়াছেন তাহারাই চীনা ইতিহাসে উল্লিখিত Tahia জাতি। এই দুইটি শব্দ একই ধাতুগত। Franke এই Tahia জাতি সম্বন্ধে চীনা ইতিহাস হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনিও, Marquartএর সহিত একমত; প্রাচীনকালে চীনবাসীগণ বিদেশী নামগুলি সাধারণত ছোট করিয়া লিখিত; তুখারেরই সংক্ষিপ্ত আকার হইল Taha। হুয়েনসাঙ্ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ আকারে **Tu-ho-lo** লিখিয়াছেন।

Bactriaর অধিবাসী পশ্চিমা Ta-hia জাতিদের সম্বন্ধেই গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারগণ Tochari বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Kausuতে পূর্ব দেশী যে দল ছিল, হুয়েনসাঙ্ তাহাদিগকে Tu-ho-lo বলিয়া গিয়াছেন।

এখন চীনা ইতিহাস ও গ্রীক লাটিন সাহিত্য হইতেও নানা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ব দেশীয় দলটি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া Bactriaতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ Tuch-chiদিগের আক্রমণ হইতে পলায়ন করিয়াই তাহারা তাহাদের অপর দলের সহিত যোগদান করে। তাহার কিছুকাল পরে সম্ভবতঃ ঐ মিলিত তুখার জাতির একদল উত্তর পূর্ব পথ দিয়া কুচায় প্রবেশ করে, আর একদল দক্ষিণ দিক্ দিয়া Karasharএ যায়।

এখন আমরা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, কুচায় যে দলটি গিয়াছিল তাহাদের ভাষা হইল দ্বিতীয়টি, এবং তুর্কান-করাশর প্রভৃতি স্থানে যে দল গেল, তাহাদের ভাষা হইল প্রথমটি। প্রথম ভাষাভাষী পূর্ব্বদেশীয় তুখারদিগকেই **Arsi** বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। Trogus যে সময় তাঁহার ইতিহাসে (Universal History) এই Arsi বা Asianiদের উল্লেখ করিয়াছেন, খুবই সম্ভব সেই সময় ইহারা অপর দলটিকে পরাস্ত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব এখন হইতে তুখারজাতি বলিতে প্রথম, দ্বিতীয়—দুইটি ভাষাভাষী দুইটি স্থানের তুখারদিগকেই আমরা বুঝাইব।

তুখার-ভাষা হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষা সমূহেরই অন্তর্গত। আর্য্যভাষাগুলির পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি বিভাগের সহিতই ইহার যথেষ্ট যোগ দেখা যায়। Meillet এই ভাষাকে পাশ্চাত্য Italo-Celtic এবং প্রাচ্য Slavonic ও আর্মেনীয় ভাষার মধ্যবর্ত্তী একটি ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের সহিতই ইহার যোগ বেশী। অধ্যাপক লেভী উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়াছেন যে, "চীনা তুর্কীস্থানের একেবারে মধ্যস্থলে, চীন ও তুর্কীরাজ্যের ঠিক সীমান্তে যে একটি আর্য্য উপনিবেশ থাকিতে পারে, কে

তাহা পূর্বে কল্পনা করিতে পারিত। অবশ্য ভাষা হইতেই এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়াছে যে ঐ জাতি ছিল আর্য্য। সেখানে পিতার প্রতিশব্দ দেখা যায় Pátar, মাতার Mátar ; অশ্বের প্রতিশব্দ **Yakur** (লাটিনে aquns), অষ্ট হইল **Okt** (লাটিন ও গ্রীক Octo) ; সে হয়, he is—ইহার প্রতিশব্দ **ste** (লাটিন **est**) ইত্যাদি।"

আর্য্যভাষা সমূহের **Kentum** বর্গের অন্তর্গত হইল তুখারভাষা। যদিও ইহার মধ্যে অনেক শব্দের বর্ত্তমান আকার হইতে সহজে তাহাদের ধাতুগত সাদৃশ্য বাহির করা কঠিন, তথাপি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে বহু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলির সহিত লাটিন, গ্রীক ও সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। দুই একটি নমুনা এখানে দিতেছি :—

প্রথম শ্রেণীর ভাষায় তুখার শব্দ—Kant

দ্বিতীয় শ্রেণীর তুখার শব্দ —Kante

লাটিন —Centum

গ্রীক —E´xato´v

সংস্কৃত —শতম্।

আবার—

তুখার (প্রথম)—Knán

জার্ম্মাণ —Kennen

স্লাভোনিক —Znati

আর্মেনীয় —Caneay

সংস্কৃত —Jña, Jñána (জানা)।

সংস্কৃত শব্দ হইতেই যে সমস্ত তুখারীয় (প্রথম) শব্দ হইয়াছে তাহাদের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল :—

তুখারীয়		সংস্কৃত
Avis	=	অবীচি
Dvip	=	দ্বীপ
Sri	=	শ্রী
Kaliyuk	=	কলিযুগ
Urn	=	ঊর্ণা
Purnake	=	পূর্ণক
Rup	=	রূপ
Sutar	=	সূত্র
A´ñcályi	=	অঞ্জলি
A´más	=	অমাত্য
Cakkár	=	চক্র
Campák	=	চম্পক
Gañk	=	গঙ্গা
Jambunat	=	জম্বুনদ
Markapalam	=	মার্গফলম্
Bodhisat	=	বোধিসত্ত্ব
Sámudram	=	সমুদ্রম্
Raksatsássi	=	রাক্ষসী
Yaksá	=	যক্ষ
Cindámani	=	চিন্তামণি
Kalpavrksa	=	কল্পবৃক্ষ
A´bhidharm	=	অভিধর্ম

ইত্যাদি।

তুখারীয় জাতক সমূহে রামায়ণের বীরদিগের অবিকল উল্লেখ রহিয়াছে :—Ráma, Lyákman, Wartsyas, Dasagrive, Vibhisane, Lánk, Lankesvaram ইত্যাদি। তুখারীয় (প্রথম) সংখ্যা সমূহের সহিত সংস্কৃতের মিল কিরূপ তাহাও দুই একটি সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

এক	—	Sa	কুড়ি	—	বিংক
দ্বি	—	We	ত্রিশ	—	তব্যাক
ত্রি	—	Tri	চল্লিশ	—	শত্বরাক
চতুঃ	—	Stwar	পঞ্চাশ	—	পঞ্চক
পঞ্চ	—	Paña	ষাট	—	ষক্কক
ষট্	—	Sak	সত্তর	—	সপ্তক
সপ্ত	—	Spadh	আশী	—	অক্তুক
আট	—	Okadh	নব্বই	—	মুব
নয়	—	মু	শত	—	কন্ধ্
দশ	—	শাক			ইত্যাদি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধাময়ী দেবী

রোমের স্থাপত্য বৈভব

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

ধরণীবক্ষে যে সকল প্রাচীন জনপদ সভ্যতা ও সমৃদ্ধির জন্য আজিও জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে রোম নগরী অন্যতম। ইহার শৌর্য্য বীর্য্য ও পূর্ব্ব গৌরব কথা গল্পের মত। সে সকলের সহিত তুলনা হইতে পারে,—কি পুরাতন কি নূতন এমন দেশ যদি থাকে তাহা খুবই অল্প। ইতিহাসের পাঠক এসব কথাই অবগত আছেন। এখানে যে বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহা রোমের স্থাপত্য সম্পদ। এ কথা খুব জোর করিয়াই বলা যায়, এ সম্পদে সম্পদশালী—একটি রাজধানীর মধ্যে এতগুলি সুবৃহৎ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় ও মনোরম সৌধাদি আর কোন একটি প্রাচীন স্থানে এক সঙ্গে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এই প্রবন্ধে সেই সকলের কতকগুলি চিত্র ও তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। কোন কোন স্থলে চিত্রগুলির ইটালিয় ভাষায় প্রচলিত নামই ব্যবহৃত হইবে।

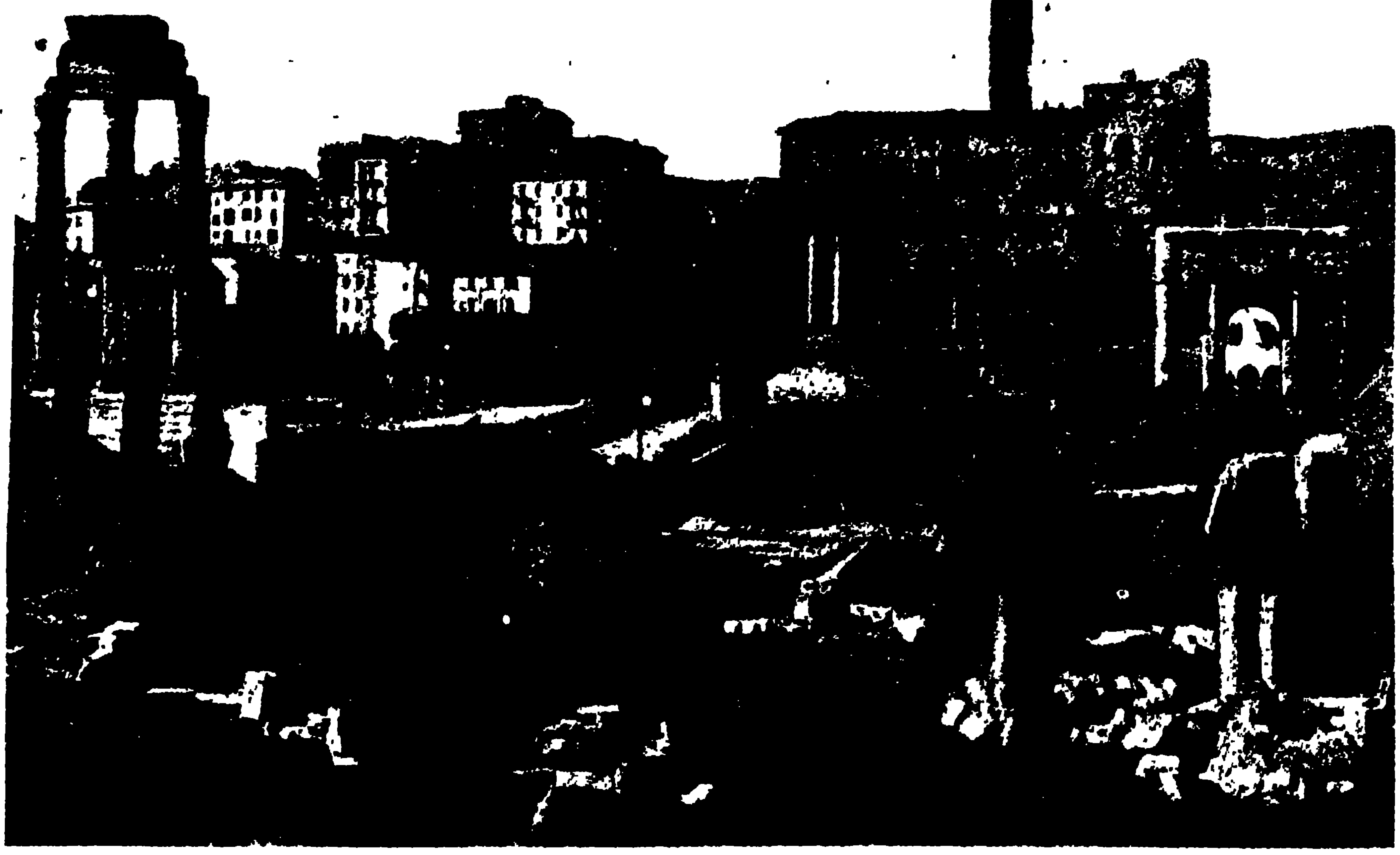

সুপ্রসিদ্ধ ফোরম্

ফোরমের দৃশ্য।—প্রাচীন রোমে ফোরম অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এই স্থানেই রোমকদের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র ছিল। এই স্থানেই তাহাদের সভা সমিতি আনন্দ উৎসব বিদ্রোহ সমস্তই সাধিত হইত। এখানে সকল যুগের বহু মন্দির স্মৃতিস্তম্ভ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। সে সবই এখন ধ্বংস পথে গিয়াছে। পূর্ব্ব স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য মৃত্তিকা খনন করিয়া স্তম্ভ মন্দিরাদির চিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ছবিখানি দেখিলেই বুঝা যায়।

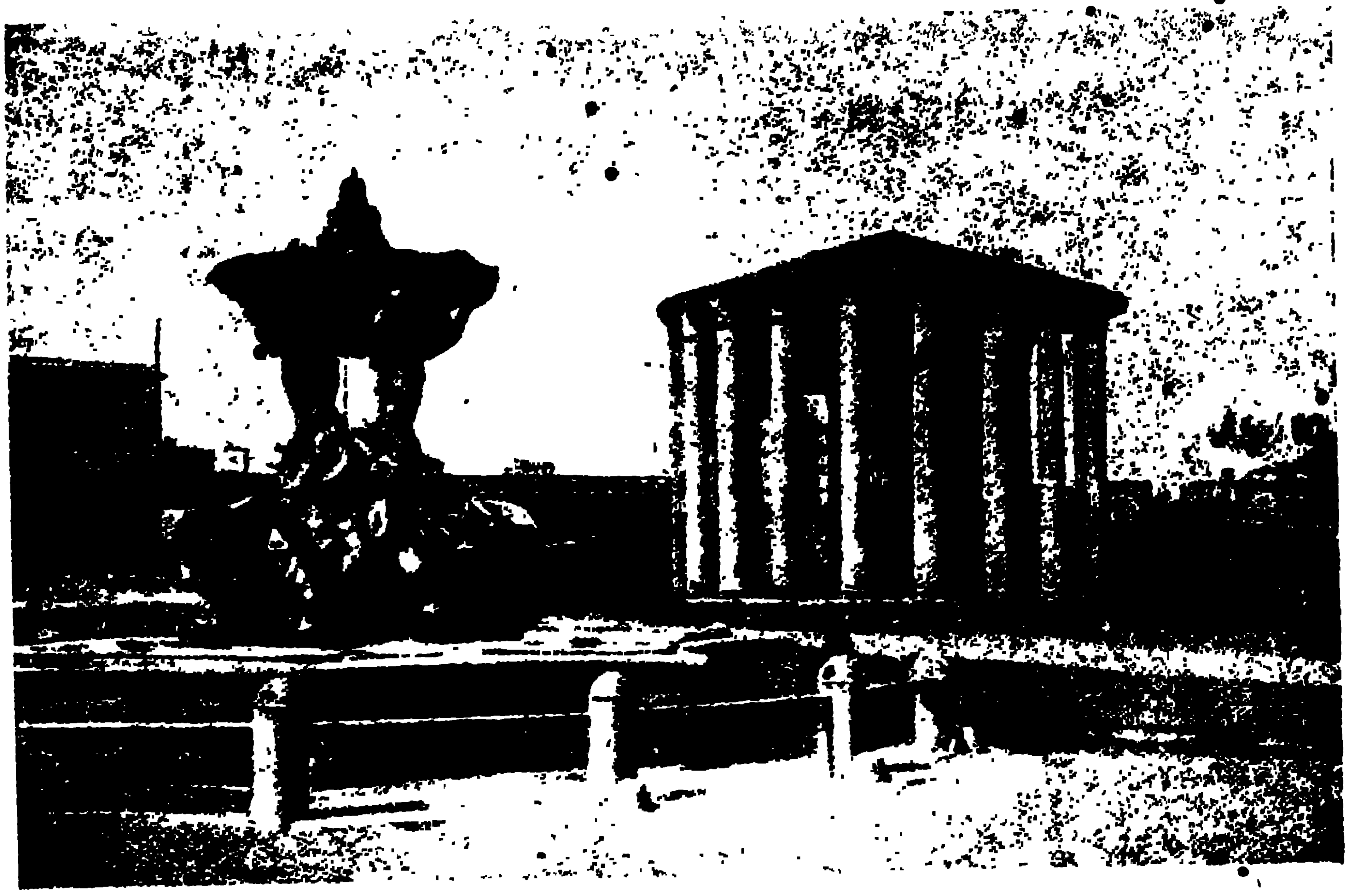

ভেস্তার মন্দির

এই সুপ্রাচীন মন্দিরটি আকারে খুব বড় না হইলেও বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ। ইহার পার্শ্বের শ্বেতমর্ম্মরময় বড় বড় করিয়েন্থেন স্তম্ভগুলি মনোরম।

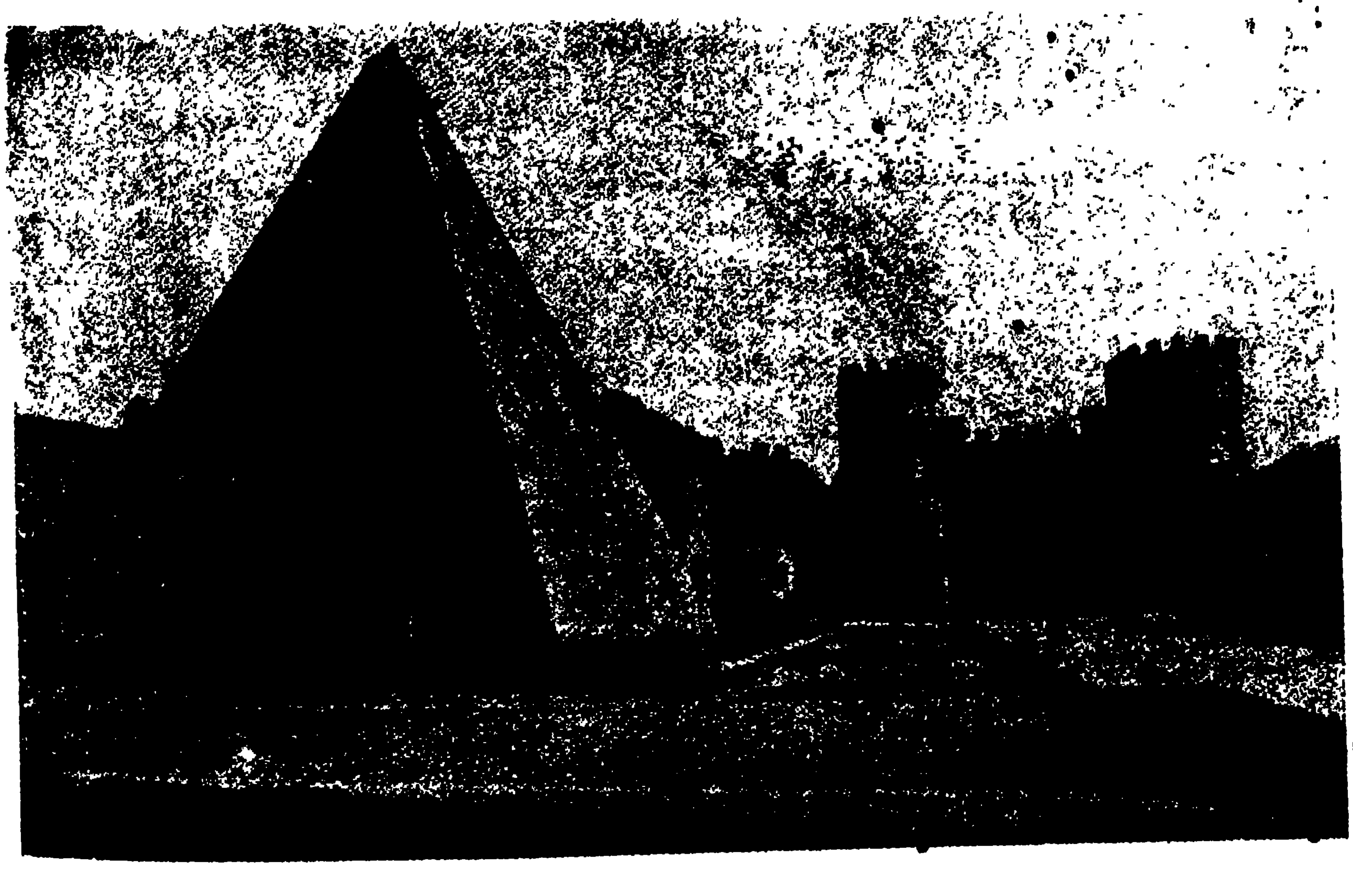

কেইও সেস্টিনোর পিরামিড

ইহা পিরামিড্ আকারের একটি সমাধি মন্দির। কেইও সেস্টিনোর শেষ ইচ্ছামত ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে তাহার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

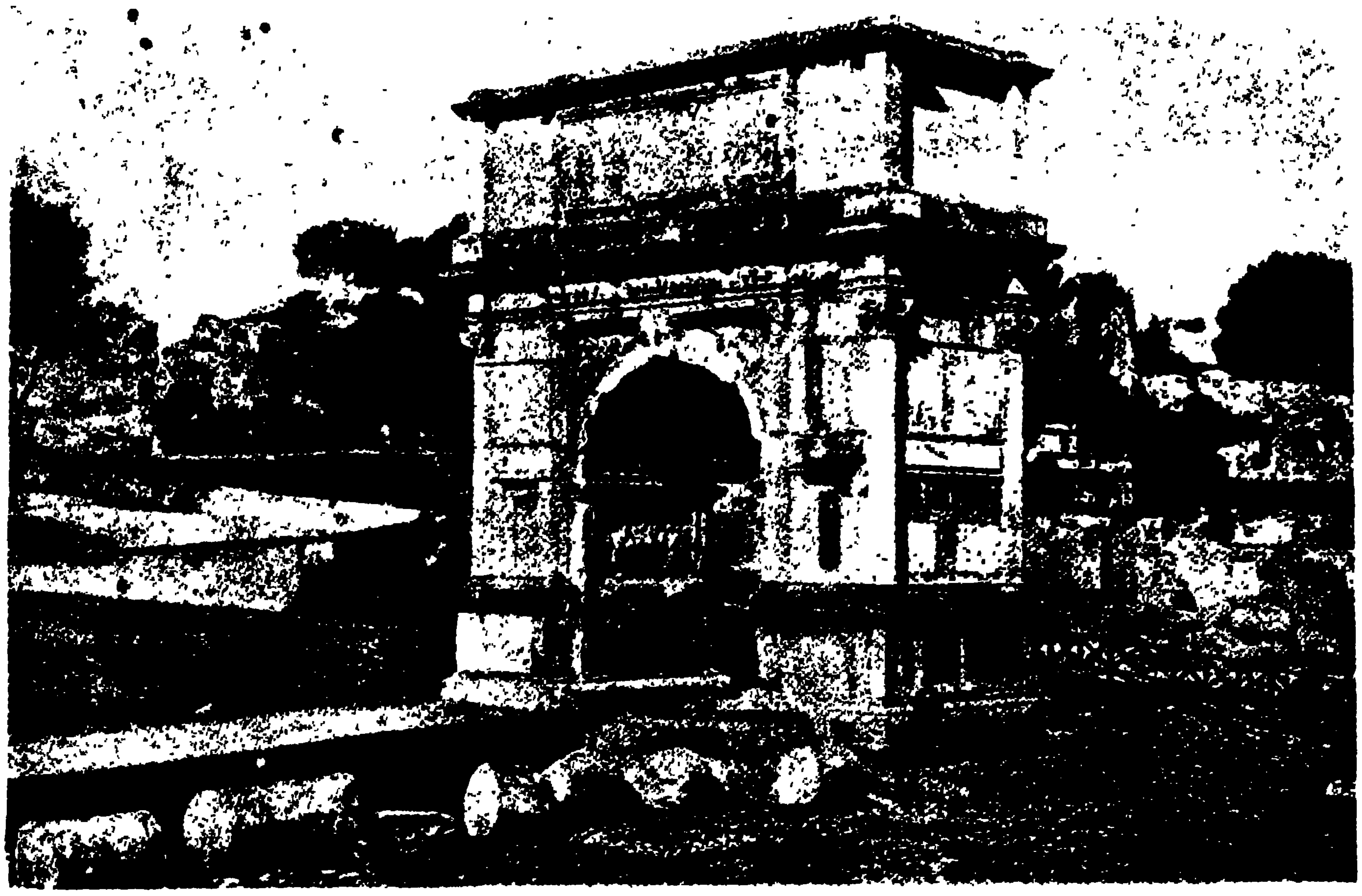

টিটো স্মৃতিতোরণ

টিটোর জেরুজিলাম বিজয়ের স্মৃতিতোরণ রোমবাসী ও সিনেটের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই তোরণগাত্রে যে সব উৎকীর্ণ চিত্র আছে তন্মধ্যে টিটোর জয়োৎসবের একখানি চিত্র আছে।

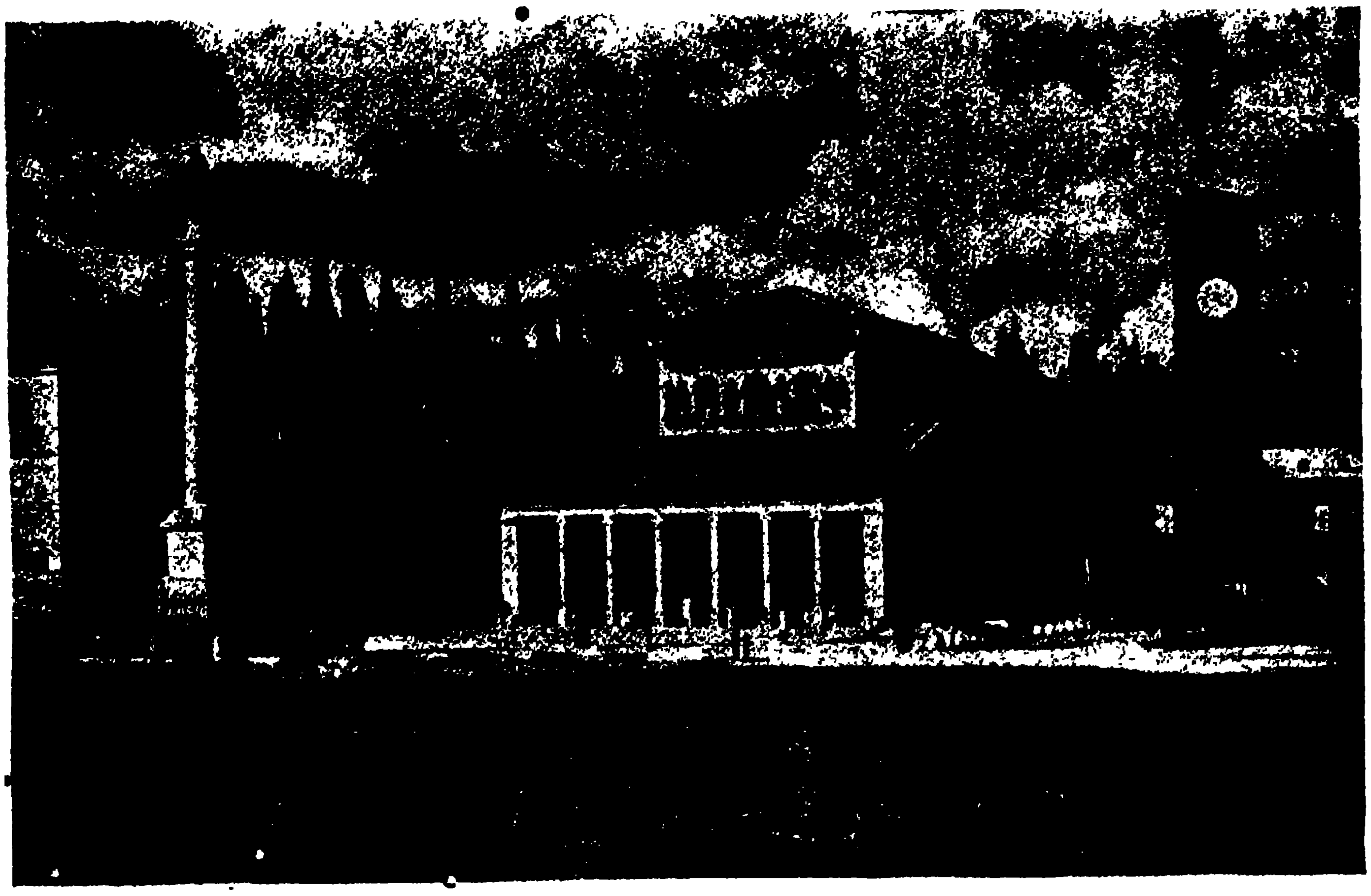

সেণ্ট লোরেঞ্জ

সেণ্ট লোরেঞ্জ সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত। মুক্ত আকাশের তলে বৃক্ষশ্রেণীর কোলে ইহা অতি নয়নমনোহন। কন্‌ষ্টান্টিনোর আদেশে ইহা নির্ম্মিত হইয়া পরে তৃতীয় সিক্টো তৃতীয় অনারিও প্রভৃতির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার মধ্যে [illegible]

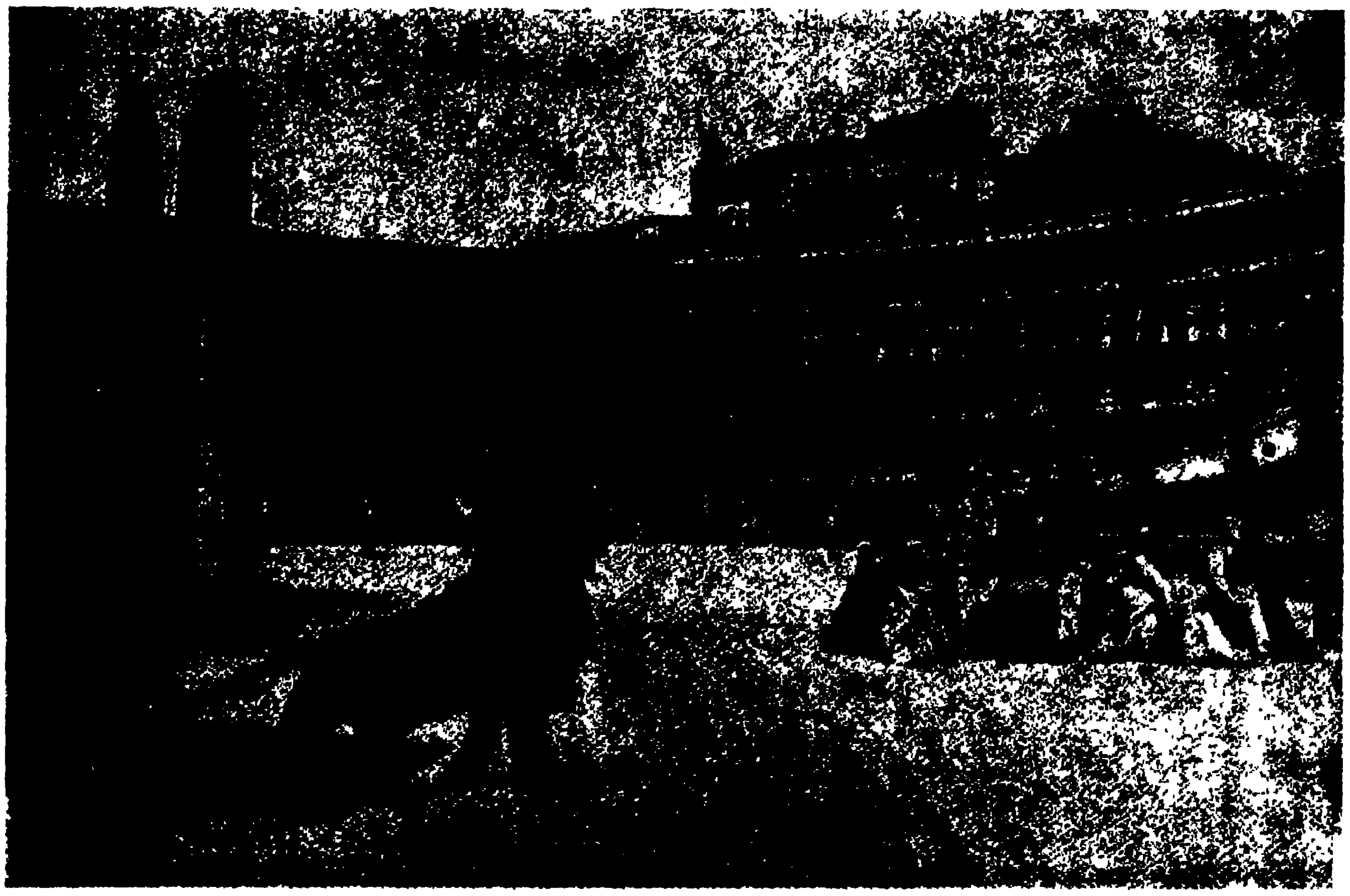

মেসিমো সার্কাস

বেলভেডিয়ারের প্রান্তে ইহা অবস্থিত। টারকুইনাস পৃস্কাস্ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয় এবং সিজার কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার মধ্যে দুই লক্ষ দর্শকের স্থান আছে। পূর্ব্বে রোমানরা এ স্থানটি খ্রীষ্টানদের বধ্যস্থানরূপে ব্যবহার করিত।

ক্যাম্পি ড্যালিও

ইহা একটি বৈচিত্র্যময় অট্টালিকা উচ্চ থামালের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বহু সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে কাণ্টোর এবং পোলুসের মর্ম্মরমূর্ত্তি এবং নিম্নে দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ মূর্ত্তি আছে। এই বাটীর উভয় পার্শ্বে যাদুঘর কন্‌জারভেটরি প্রভৃতি আছে।

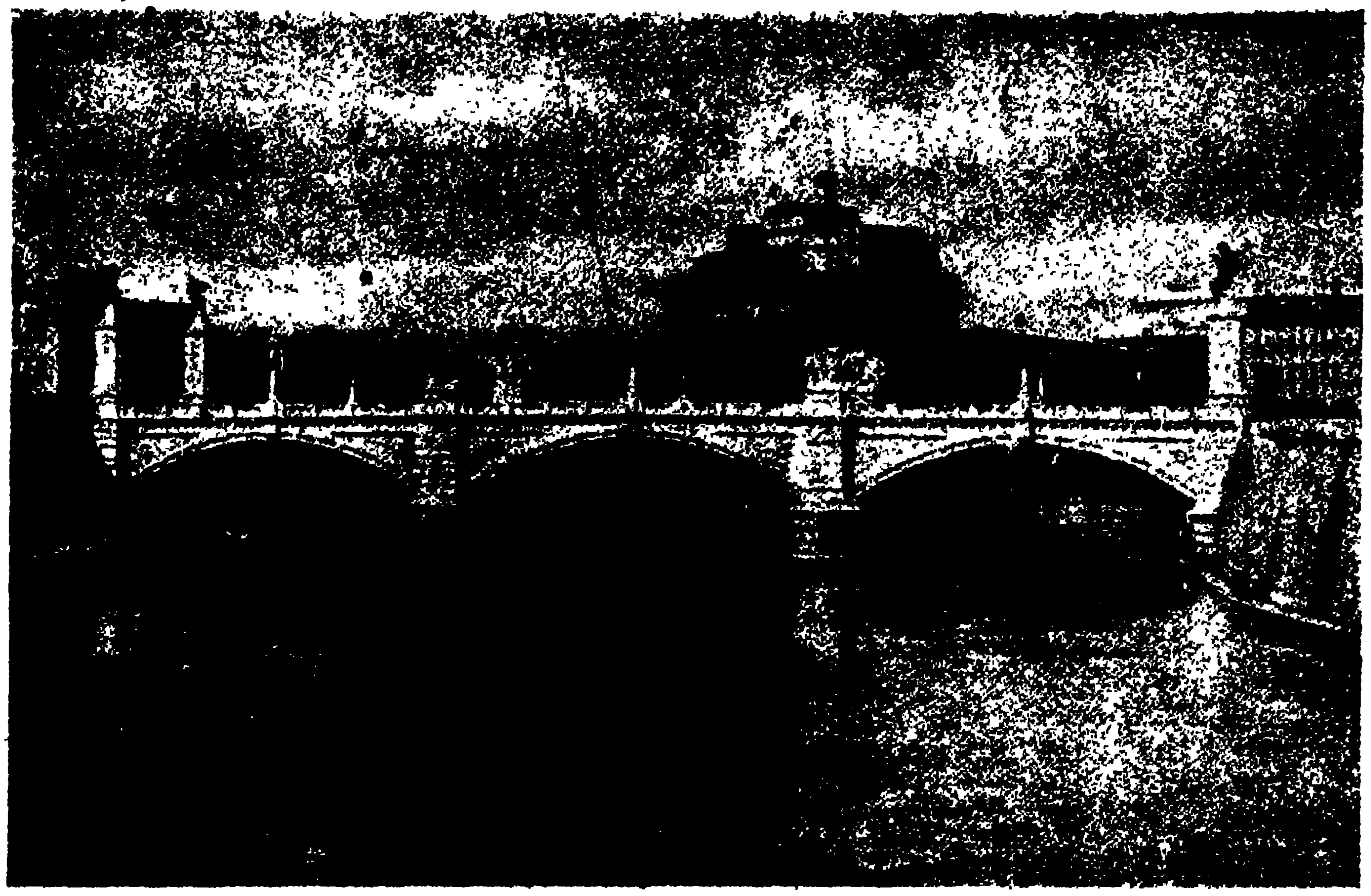

ভিক্টর ইমানুয়েল সেতু

ইহা একটি আধুনিক নির্ম্মিত সেতু ১৯১১ অব্দে খোলা হয়। ভিক্টর ইমানুয়েলের নামে ইহার নাম দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে কয়েক স্থানে অনেকগুলি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

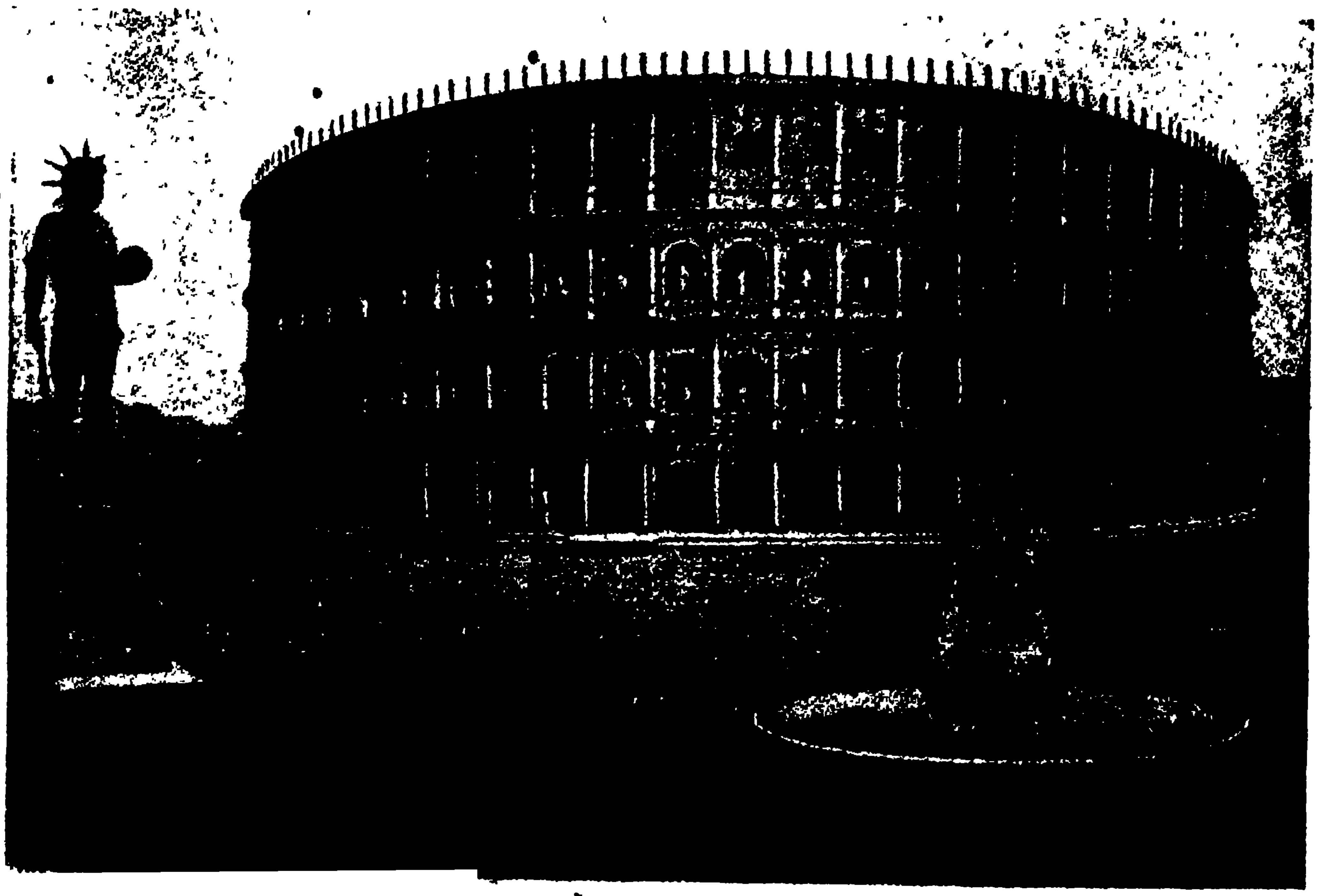

কলোসিয়ম্

কলোসিয়ম্ রোমের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। সম্রাট ভেস্পাসিয়ানো দ্বারা আরম্ভ হইয়া ৭৯ অব্দে উহার পুত্র টিটোর দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়। এই গোলাবৃত্তি অপূর্ব্ব সৌধের পরিধি প্রায় ৫৬৯ মিটার। টিটোর রাজ্যাভিষেকের সময় এখানে বিস্তর পশুবলি দেওয়া হইয়াছিল এবং এখানে অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। এখানে অসি ক্রীড়ার জন্ত যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে ৮০,০০০ [illegible]

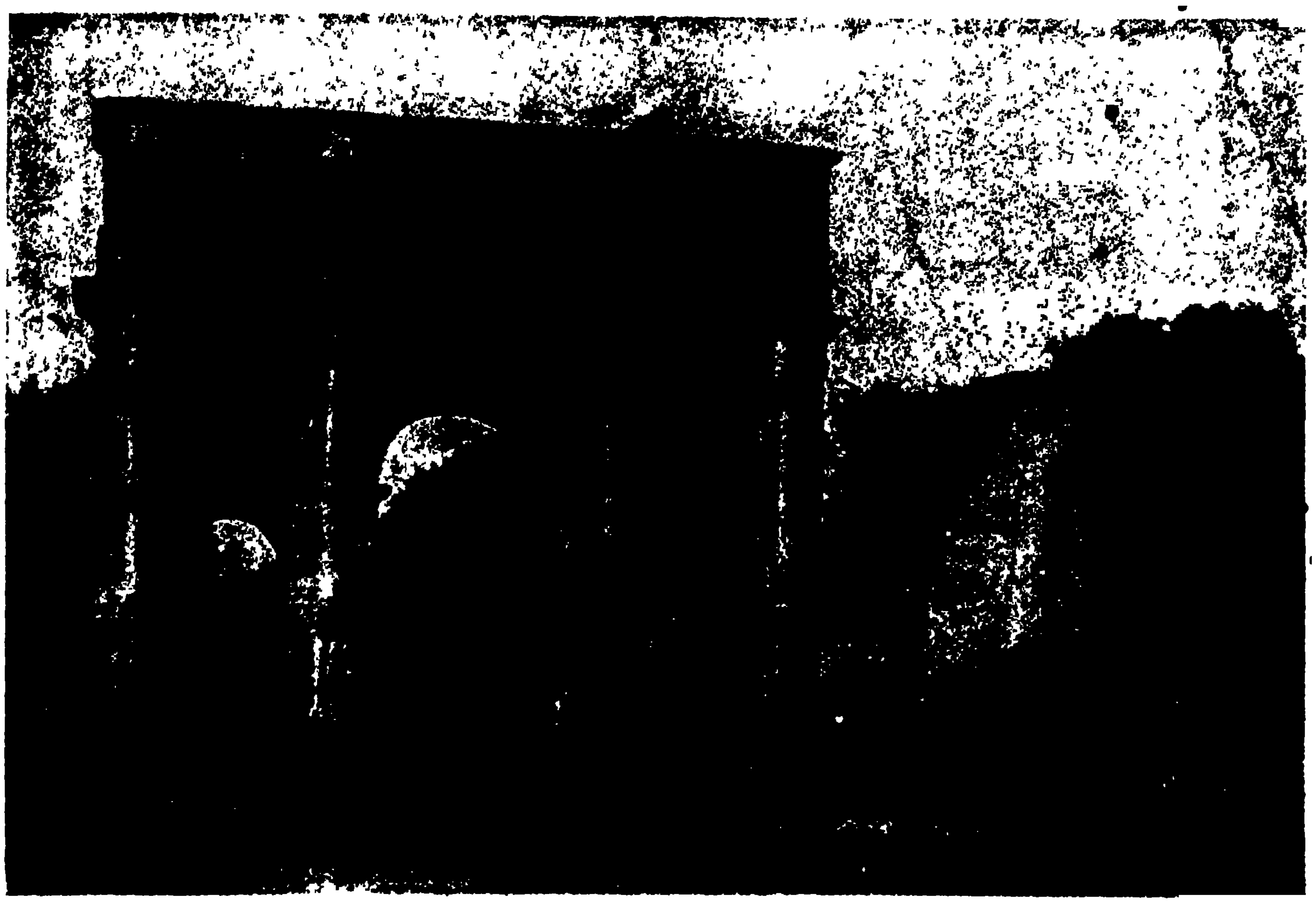

কনস্‌ট্যান্‌টিনো তোরণ

রোমের অধিবাসী ও সেনেটের দ্বারা কনষ্টানটিনো কর্ত্তৃক শত্রুবিজয়ের সম্মানার্থ ৩১১ অব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বহু প্রাচীন হইলেও এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে।

শ্রীহরিহর শেঠ

কর্ত্তার কানমলা

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস্

স্থান—বাংলার যে কোনও স্থান

কাল—বর্ত্তমান

পাত্র ও পাত্রী—হাঁড়ীবদন, গিন্নী, নন্দন, লতা, প্রতিবেশিগণ,

টাউটগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

(খুসিরামের বাটীর সম্মুখে ফুলবাগানের ধারে রাস্তা)

প্রতিবেশিগণ

প্রথম প্রতিবেশী

ধান গাছে পোকা লাগে,
প্রাণে মোর ডর জাগে;
রুশিয়ায় হবে নাকি
ডিম খাওয়া বন্ধ।

দ্বিতীয় প্রতিবেশী

রেঙ্গুনে ফুঙ্গীগণ
করে সবে অনশন;
তেল তিসি মসিনার
দর বড় মন্দ।

তৃতীয় প্রতিবেশী

ও পাড়ার রাম শুঁড়ী
ঘড়ি তার গেছে চুরি,—
সবে বলে এটা কোনও
মাতালেরই কাণ্ড।

চতুর্থ প্রতিবেশী

দেখ ভায়া, আজকাল
পথ-চলা জঞ্জাল,
"চাঁদা দিন" ব'লে ধরে
খাতাটি প্রকাণ্ড।

[হাঁড়িবদনের প্রবেশ]

হাঁড়িবদন

বাজে কথা বলাটাই—
পৃথিবীর কি বালাই!
করিয়াছি আমি তাই
বাজে কথা বন্ধ।

অন্যান্য সকলে

নাই তায় সন্ধ।

হাঁড়ীবদন

ছেলে মোর, শোনো আর,
একেবারে জানোয়ার!
খুসিরাম তনয়ার
প্রেমে পড়ে নন্দ!

অন্যান্য সকলে

একথা শুনিলে হয় বাজে কথা বন্ধ!
ছেলে তব, শোনো আর,
একেবারে জানোয়ার!
খুসিরাম-তনয়ার
প্রেমে পড়ে নন্দ!

হাঁড়ীবদন

শিখায়েছি ধাঁচাধ্যাচ্
হিসাবের মার প্যাঁচ,—
বুঝে নাক' এই ম্যাচ্
নহে তার যোগ্য—
বিবাহের বাজারের
দাম আমি জানি ঢের;
খুসিরাম পকেটের
বড় বড় যোগ্ গো!

অন্যান্য সকলে

বিবাহের বাজারের
দাম তুমি জান ঢের—
খুসিরাম পকেটের
বড় বড় যোগ্ গো!
তবু বলি তোমাকেও
বিবাহের ব্যাপারেও
অর্থের চাইতেও
প্রেম হয় ভোগ্য।

হাঁড়ীবদন

প্রেম হয় ভোগ্য!
ভাব কি যে নহি আমি প্রেমিকের যোগ্য!
চাউলের কলে আর মহাজনী ফলে হে,
জমায়েছি কিছু টাকা নানা কৌশলে হে!
হিসাবের খাতা হাতে ভ্রমি দিবারাত্র,
ভাবিওনা তবু আমি অপ্রেমিক পাত্র!

অন্যান্য সকলে

ছুঁয়ে তব গাত্র
বলিতেছি মাত্র,
ভাবি নাক' কভু তুমি অপ্রেমিক পাত্র।

হাঁড়ীবদন

চাউলের মহাজন এতই কি রসহীন?

অন্যান্য সকলে

চাউল যোগায় রস, নহিলে যে তনুক্ষীণ।

হাঁড়ীবদন

চাউলেতে ভাত হয়—

অন্যান্য সকলে

ভাতে বাড়ে বুদ্ধি।

হাঁড়ীবদন

বুদ্ধি বাড়িলে হয়—

অন্যান্য সকলে

অন্তর শুদ্ধি।

হাঁড়ীবদন

হিসাবের খাতাটির
পিছনের পাতাটির
একটুও ফাঁক নাই
সব গেছে ভরিয়া—
কাজ হ'তে ফাঁক পেলে
গান বাঁধি অবহেলে
নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া!

অন্যান্য সকলে

এত বড় মরিয়া!
তোমার ভিতরে আছে
এত বড় দরিয়া!

হাঁড়ীবদন

নন্দের জননীর
বপু অতি পুষ্ট

অন্যান্য সকলে

চাউলের গুণ তব!
হয়োনাক রুষ্ট।

হাঁড়ীবদন

নন্দের জননীর
পদ যেন রম্ভা!

অন্যান্য সকলে

বেরীবেরী-আশ্রয়ী
কোন্ দিন হন্ বা

হাঁড়ীবদন

পড়ে দেখ খাতাখানা
আছে এতে বর্ণনা—
বরবপু বন্দনা
করিয়াছি লম্বা।

অন্যান্য সকলে

[খাতা দেখিতে দেখিতে]

দেখি দেখি খাতাখানা!
আছে বটে বর্ণনা—
বরবপু বন্দনা
করিয়াছ লম্বা।
হায় হায়! চালময়
বেরীবেরী আশ্রয়,—
তাই যেন মনে হয়
পদ তাঁর রম্ভা!

একজন প্রতিবেশী

[গান]

এমন অবাক মোরে কেমনে করিলে গো—
কহিতে রসনা না জুয়ায়
হিসাবের খাতাটির একধারে লিখা গো—
কত ধানে কত চাল হয়!

অন্যান্য সকলে

আহা, কত ধানে কত চাল হয়!

ঐ প্রতিবেশী

এ পাশেতে খুলি দেখি, বিশ্বাস না হয় গো—
একি কথা অপরূপ বাবু!
এযে মহাজন-মেঘদূত, মুদিজন মিল্টন
কালিদাস হয়ে গেল কাবু!

অন্যান্য সকলে

এযে মহাজন-মিল্টন, মুদিকবি কালিদাস
রবিবাবু হয়ে গেল কাবু!

ঐ প্রতিবেশী

চাউলের ভরা ঘরে বসিয়ে যাহার গো—
হৃদয়ে কেবলই পায় ক্ষুধা—
দুনিয়ার সেরা কবি সেই, ওগো সেই গো—
তাহার কবিতা শুধু সুধা!

অন্যান্য সকলে

আহা, দুনিয়ার সেরা কবি এই ওগো এই গো—
ইহার কবিতা শুধু সুধা!

ঐ প্রতিবেশী

শুধু কবিতার সুধা নয়, শুধাই তোমারে গো—
খেয়েছ পাচন কিবা কহ—
অগ্নিমান্দ্য যাহে আমল না পায় গো—
নিয়ত ক্ষুধিত হ'য়ে রহ।

অন্যান্য সকলে

[হাঁড়াবদনের পকেট ইত্যাদি খুঁজিতে খুঁজিতে]

কোন্ সেই পিল্ আহা, কাহার দোকানে গো—
কিনেছ খুলিয়া সবে কহ—
অগ্নিমান্দ্য যাহে আমল না পায় গো—
নিয়ত ক্ষুধিত হ'য়ে রহ।

ঐ প্রতিবেশী

মুছে যাবে ধরা হতে রতি উর্ব্বশী নাম
শকুন্তলাও হবে যা' তা'!
আজি হ'তে নায়িকার শিরোমণি অবিরাম
চল্লিশী নন্দেরই মাতা!

অন্যান্য সকলে

[দ্রুত তালে]

মুছে যাবে ধরা হতে রতি উর্ব্বশী নাম
শকুন্তলাও হবে যা' তা'
আজি হ'তে নায়িকার শিরোমণি অবিরাম
চল্লিশী—চল্লিশী নন্দেরই মাতা!

[হাঁড়িবদনেকে একজন স্কন্ধে তুলিয়া লইল ও
অন্যান্য সকলে চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল]

(হাঁড়ীবদন ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান)

হাঁড়ীবদন

নন্দ করিল দিক্ !
হিসাবের নাহি ঠিক্ ;
ফস্ ক'রে একেবারে
প্রেমে দিল ঝম্প !
বিয়ে নাই, প্রেম হ'ল !
গাছ নাই, কাঁধি এল !
শুনে মোর থর থর
ওঠে হৃৎকম্প !
খুসিরাম, জানি আমি
ভাঁড়ে রাখে মা ভবানী !
কত আর দেবে থোবে ?—
দেবে নবডঙ্কা !
মেয়ে তার—দুর্ব্বার !
ফাজিলের সর্দ্দার !
মুখে মাখে পাউডার,
দেখে লাগে শঙ্কা !

(ক্রন্দনের স্বরে)

বিয়ে হ'লে খরচের
অন্তের নাহি জের !
পাউডার পমেডের
দাম দিতে ঘাম্‌ব।
এর চেয়ে বার ষোলো
ডুবে মরা ঢের ভালো !
বিয়ে আমি নন্দের
ভাঙবই ভাঙ্‌ব !

(অদূরে নন্দকে আসিতে দেখিয়া)

নন্দটা এ দিকেই
আসছে যে, আড়ালেই
থাকি আমি লুকিয়েই
দেখি ছোঁড়া করে কি !

(অন্তরালে যাইয়া)

খুসিরাম তনয়ার
খোঁজে আসে এর আর
ভুল নাই, এইবার
দেখি ছোঁড়া মরে কি !

[নন্দের প্রবেশ। নন্দ হাঁড়ীবদনকে দেখিতে পাইল না]

নন্দ

শুনিয়াছি প্রেমে যারা প'ড়ে যায় বিল্‌কুল
হজমের গোলমাল হয়, তার নাহি ভুল।

[নেপথ্য হইতে]

হাঁড়ীবদন

অতগুলা চীনা বাদামের কারি শ্রাদ্ধ
হবে না'ক বদ্‌হজম ? হ'তে ও যে বাধ্য !

নন্দ

প্রেমে প'ড়ে বিবেচনা শক্তি কি যায় গো !

(পকেট হাতড়াইয়া)

লিখে, পরে চিঠিখানা ফেলে এনু হায় গো !

[চিঠি খুঁজিতে লাগিল]

(নেপথ্য হইতে)

হাঁড়ীবদন

পড়িয়াছি হোমোপাথী, ভুলি নাই একদম্—
এ তো হয় ঠিক নাক্সভমিকার সিম্‌টম্।

নন্দ

পিচ্ছল প্রেমপথ, পিচ্ছল হরদম
ঠিক যেন—

(নেপথ্য হইতে)

হাঁড়ীবদন

বর্ষায় পল্লীর কর্দ্দম !

নন্দ

প্রেমে এত সুধা আছে, প্রাণভরা তৃপ্তি !
পরিণয়ে বাধা দেয় কার এত শক্তি !
বাবা মোর বাধা দেয়, বাজে বুকে লাখ্ শেল,
শুনিবনা কথা তার !

[নেপথ্যে]

হাঁড়ীবদন

ওরে বেটা রাস্‌কেল !

নন্দ

(খুসিরামের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া)

কোথা তুমি, কোথা লতা, দাও মোরে দর্শন—

(লতার প্রবেশ)

আসিয়াছ ? হ'ল যেন সুধাসার বর্ষণ।
জানি মোরে ভুল নাই, তুমি দেবী ধন্যা—
নারী নহ, তুমি যে গো অমরার কন্যা !

(লতার হাত ধরিয়া)

লতা

ছাড় হাত, হেথা কেউ পাবে না ত লখিতে ?
কি যে হবে, কেহ যদি আসি পড়ে চকিতে !

[নেপথ্যে হাঁড়ীবদনের মুর্চ্ছার উপক্রম]

নন্দ

কেহ নাই, কেহ নাই, শুধু তুমি আমি আর !
এস লতা, দাও মুখে চুম্বন সুরাসার।
তুমি মোর, তুমি মোর, ছাড়িবনা তোমারে—
কনে তুমি, আমি বর—এস হৃদি মাঝারে।

[নেপথ্যে]

হাঁড়ীবদন

নন্দের জননীরে এই কথা অবিকল
বলিয়াছি কতদিন, মনে পড়ে সে সকল !
কিন্তু সে আমাদের বিবাহের আগে নয়।
এযে দেখি বিপরীত ! সৃষ্টি কি হল লয় ?

নন্দ

(গীত)

ওগো সুন্দরী, মম প্রিয়ে—
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে !
দিবারাতি সখি, তব ধ্যানে আছি মগ্ন,
তোমারে হারালে মোর হৃদি হবে ভগ্ন !
এ ধরায় আছে যত সুন্দরী কন্যা,
সবাকার রাণী তুমি, গৌরবে ধন্যা !
সুন্দরী মম প্রিয়ে।
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে !
কতবার ভাবি কেন হেরিলাম তোমারে !
আগুন জ্বালালে চিতে পুড়ালে গো আমারে।
তবু ওগো তবু দেবী, ভাগ্যটা মানি গো—
তোমারে পেয়েছি তাই ধন্য যে আমি গো—
সুন্দরী মম প্রিয়ে—
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে।

[নেপথ্যে হাঁড়ীবদন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা]

লতা

এত ভালবাস সখা, এযে মোর সহে না !
যোগ্য ত নহি আমি, সুখ মোর রহে না।

নন্দ

দেবী,
আমি তব সেবকের সম নই, জানি তা'ও
তবু মোর মন ধায় তোমা পানে, মানি তা'ও
বশ মোর হবে তুমি, বিবাহের বাঁধনে
এই হিয়া বেঁধে লও, সফলিয়া সাধনে।

লতা

তোমারেই পূজা মোর নিবেদিব, অতিথি !

নন্দ

মধুময়, মধুময়, ভগবান, প্রণতি !

[হাঁড়ীবদন লম্ফ ঝম্প করিতে করিতে আসিলেন]

হাঁড়ীবদন।

(নন্দের প্রতি)

হতভাগা নচ্ছার
পাজী, ছুঁচো ভূত, আর—
যত সব গাল, তার
তুই ঠিক যোগ্য !

[লতার প্রতি]

তুমি বাছা বেয়াড়াও,
এত কথা কোথা পাও ?
ছোঁড়াটার মাথাটাও
হ'ল তব ভোগ্য ?

(নন্দের প্রতি)

চ'লে আয় নন্দা—
হতভাগা বান্দা—!
কান ম'লে রোগ তোর
করিব আরোগ্য !

(লতার প্রতি)

তুমি বাছা খিঙ্গী
যেন ধেড়ে সিঙ্গী !
পিতা তব হিং খাঁ
খান কত নিত্য ?
নন্দের বরপণ
দিয়ে তিনি কথা কন্ !
জানা আছে অগণন
কত তাঁর বিত্ত !

নন্দ

আমারে যা বক ঝক, করিব তা সহ্য—।
লতারে যা কহ তাহ,—শুধু অগ্রাহ্য।
(হাঁড়ীবদনের বিকট মুখভঙ্গী)

লতা

ছেলে দেওয়া টাকা নেওয়া সে ত ছেলে বিক্রী,—
বিবাহ কি মামলা, ও বরপণ ডিক্রি ?

হাঁড়ীবদন

(অর্দ্ধস্বগত)

মেয়ে বড় দুর্ব্বার
ফাজিলের সর্দ্দার !
মুখে মাখে পাউডার
দেখে লাগে শঙ্কা !
খুসিরাম, জানি আমি
ভাঁড়ে রাখে মা ভবানী !
কত আর দেবে গোবে
দেবে নব ডঙ্কা ।

লতা

বাবা আমার গরীব ব'লে
হন কি অবহেয় ?

নন্দ

কভু নন।

লতা

কন্যাদানে অর্থ টাকি
একমাত্র দেয় ?

নন্দ

বিলক্ষণ !

হাঁড়ীবদন

নিশ্চয় !

লতা

(নন্দের প্রতি)

পুরুষ তুমি, মানুষ তুমি, তুমিই আমার আশা !
বল্‌ছ তুমি, আমার তরেই তোমার ভালবাসা ।

নন্দ

সত্য লতা, সত্য ।

লতা

সত্য ভালবাস যদি, ওগো আমার প্রিয়,—
পরাণ তোমার উজাড় ক'রে আমার তরেই দিও

নন্দ

তাই দেব গো, তাই দেব গো, রাণী আমার প্রিয়
হৃদয় আমার উজাড় ক'রে পূজব সকল দিয়া ।
[হাঁড়ীবদন হতবুদ্ধিভাবে দণ্ডায়মান]

লতা

আকাশ বায়ু সাক্ষ্য ক'রে কর আমায় বিয়ে—;
পরের কথায় কান দিও না, চল আমায় নিয়ে ।
[হাঁড়ীবদন বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন]

নন্দ

আকাশ বায়ু সাক্ষ্য ক'রে এই হল্ মোর বিয়ে-
হাঁড়ীবদন বাবা আমার, যাও বারতা নিয়ে ।

হাঁড়ীবদন

(ক্রোধে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া) আস্‌বি না ?

নন্দ

আস্‌ব না ।

হাঁড়ীবদন

শুন্‌বি না ?

নন্দ

শুন্‌ব না ।

হাঁড়ীবদন

যাচ্ছি তবে এই বারতা দিয়ে—

নন্দ

ত্যাজ্য পুত্র করবে, এই ত ?—তবু করব বিয়ে।

হাঁড়ীবদন

হতচ্ছাড়া পাজী !

নন্দ

তুমি অতি ঝাঁজী।

হাঁড়ীবদন

দেখব তুমি কেমন ক'রে পালন কর বধূ—

নন্দ

কথায় তোমার ভরা আছে সর্ষেফুলের মধু।

হাঁড়ীবদন

(ক্রন্দনগদগদকণ্ঠে নন্দকে আলিঙ্গনোদ্যতভাবে)

পিতৃভক্তি নেই কি রে তোর মোটে—
'নইলে কি হয় এমন রক্তারক্তি !

নন্দ

পিতৃভক্তি যথেষ্ট মোর বটে—,
নেইক পিতার সিন্ধুকেতে ভক্তি।

লতা

একটি কথা বলব ঠাকুর, যেও নাক চ'টে—
এখন এটা একাল, জেনো নেইক সেকাল মোটে।
ব্রজেশ্বর আর প্রফুল্লদের সেকাল গেছে ঘুচে—
এখন তোমার রাগ অভিমান ট্যাঁকের খুটে গুঁজে
চাউল কলে যাওগো ঠাকুর চ'লে—
শেষে আবার ফুঁসবে ক্ষোভে
হিসেব তোমার বাদ পড়িল ব'লে !

হাঁড়ীবদন

বাপের কথায় ওঠে বসে, বাপের কথায় চলে,—
এ সব ছেলেই বংশে আলো, সকলেই ত বলে !

লতা

পিতার সুবোধ পুত্র হওয়ার সব আকাঙ্ক্ষা ফেলে
সবল মানুষ হ'তেই চাহে একালের সব ছেলে।
এই কথাটি যদি তোমার হিসেবের ঐ পাতে
রাখ লিখে, বাঁচবে অনেক দুঃখ-অভিঘাতে।

এখন চাউল কলে
যাওগো ঠাকুর চ'লে ;
শেষে আবার ফুঁসবে ক্ষোভে
হিসেব তোমার বাদ পড়িল ব'লে ?

[হাঁড়ীবদনের গজ্ গজ্ করিতে করিতে প্রস্থান

হাঁড়ীবদন

মেয়ে বড় দুর্বার—,
ফাজিলের সর্দ্দার—!
মুখে মাখে পাউডার
দেখে লাগে শঙ্কা—
বিয়ে হলে খরচের
অন্তের নাহি জের।
বাপ তার বরপণ
দেবে নব ডঙ্কা।

গীত

নন্দ

এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয়া !

লতা

গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া।

নন্দ

জোচ্ছনাতে আকাশ সাথে
ধরার পরাণ যখন মাতে,
সেই মাতনের সুরটি দোলায়—
এই গানেরই হিয়া।

লতা

গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া !

নন্দ

মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি নন্দিনী মোর প্রিয়া।

লতা

এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয় !

নন্দ

গাও গো বঁধু, করব জীবন পরম রমণীয়।

লতা

ফাগুন বনে আগুন লাগায়—
যে বাতাসে পুলক জাগায় –
সেই বাতাসের গন্ধে আকুল
(এই) গানের উত্তরীয়।

নন্দ

গাও গো বঁধু, করব জীবন পরম রমণীয়।

লতা

মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি নন্দন মোর প্রিয়।

নন্দ

এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয়া--

লতা

গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া।

নন্দ

হৃদয় নুয়ে হৃদয় সাথে
চুম্বনেতে যখন মাতে,
সেই মাতনে মাতাল করা
এই গানেরই হিয়া।

লতা

গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া!

নন্দ

মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি, নন্দিনা মোর প্রিয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক

হাঁড়ীবদনের গৃহের অভ্যন্তর

খাতা হস্তে হাঁড়ীবদন

হাঁড়ীবদন

কম্বল সম্বল বুক ভরা অম্বল,
তাহাতেও খুসীরাম করে সদা দম্ভ!
জলভরা কলসীর রূপখানি স্থির ধীর,
খন্ খন্ বাজে সেই যাতে নেই অন্ত।

ছেলেগুলো জঞ্জাল, করে শুধু গোলমাল,
বাপ পিতামহে নাই ভক্তি
শুধু পাড়াপড়শীর ক্ষীণ দেহা ষোড়শীর
গায়ে প'ড়ে করে অনুরক্তি।
ঘর বাড়ী ইট কাঠ, ফসলের কত মাঠ
করিয়াছি অর্জ্জন বহু মাথা খাটায়ে,
সে সবে যেমন রাখি তাহারা তেমনি থাকে,
ছেলে হওয়া কত বড় ল্যাঠা এ!
বাজারে খাটিছে টাকা, সে সবের সুদপাকা,
দিন রাত ভোগে আসে নাহি ভুল।
ছেলে বেটা দুর্জ্জন, মাটিহল মূলধন,
সুদ হ'ল আসলের প্রতিকূল!
বড়আশা ছিল চিতে, বিবাহের বাজারেতে
নীলামে ডাকিব দর উচ্চে—
"দশহাজার এক,—যায়, যায় বড় সস্তায়"—
দশহাজার বাঁধি লব পুচ্ছে।
বাজারেতে রাম পাখী বেচা কেনা হয় দেখি,
সেই কেনে দর যার উচ্চ।
ছেলেটাও তানাত' কি? বিবাহের রাম পাখী।
একথা শুনিলে তবে কেন যাও মুচ্ছো?

[কান হইতে কলম খুলিয়া খাতা দেখিতে বসিলেন—
কিছুক্ষণ খাতা দেখার পর উঠিয়া কহিলেন;

গিন্নীরই যত দোষ
ছেলেটার মাথা চোষ্!
এত বড় আপ্‌শোষ্
যাব বুঝি মূর্চ্ছা।
এখনি ডাকিয়া তাঁকে
কপালে যাহা না থাকে
ব'লে দিব সাফ্ সাফ্
ছেলেটির কুচ্ছা।
তবে এক কথা এটু,
গোলমালে কাজ নেই;
গিন্নী-মেজাজ হয়
অতিশয় রুক্ষ।

তাই একবার কেশে—
বার দুই মৃদু হেসে,
চালিবারে হবে শেষে
চাল অতি সূক্ষ্ম !

[গিন্নীর প্রবেশ]

ফেলে দাও খাতা তব করিও না জ্বালাতন্
হাড় গেল, মাস গেল, প্রাণ আর কতখন্ !
বামুনের জর হ'ল মাসীটার তিনদিন
মুখে আর কথা নাই, করে শুধু ঘিন্ ঘিন্ ।
ভাল লোক চ'লে গেল, এল দেশে বজ্জাত,
জানেনাক' কাজ কিছু শুধু গেলে ডাল ভাত ।
তবু সব স'য়ে থাকি মুখবুজে বার বার ;
ন্যাকামিটা কর্ত্তার সহি বল কত আর !

হাঁড়ীবদন

(এ সকল কথা কানে না তুলিয়া গান ধরিলেন)

(গান)

এই যে আসিছে আহা, নন্দেরই মাতা !
এমন সোনার বপু গিন্নী, তোমার গো -
(চশমা চোখে লাগাইয়া) দেখিয়া নয়ন না জুড়ায় ।
রাংতায় মোড়া যেন এক খিলি পান গো -
কাশীর জরদা দেওয়া তায় ।
এমন চিকণ নাসা, এমন কাঁদাল গো—
ইঁদুরের গর্ত্তটি যেন,
নিদ্রার আবেশেতে সদাই গরজে গো –
শ্যামের বাঁশরী ধ্বনি হেন ।
এমন সুঠাম ঠোঁট, এমন কাঁপন গো,-
সদাই কূজন করে তাহা,—
কোকিল কূজন তাহে আমল না পায় গো–
মেঘের ডমরু যেন আহা !
এমন নিবিড় তব চিকুর কলাপ গো,--
এমন নয়ন মনোলোভা ।
আসল হইলে তাহা সদাই করিত গো—
(ঐ) টাকপড়া মাথাটির শোভা ।

গিন্নী

ফেলে দাও খাতা তব, করিও না জ্বালাতন ;
হাড় গেল, মাস গেল, প্রাণ আর কতখন্ ।

হাঁড়ীবদন

(গান)

এমন্ মেজাজ্ তব, মত্ত মধুপ গো—
হার মানে তব গুঞ্জনে,
(আমি) প্রাণ দিতে পারিতাম, দিলাম না শুধু গো—
(তুমি) বিধবা হইবে ভাবি মনে ।

গিন্নী

তবু সব স'য়ে আছি মুখবুজে বার বার ;
ন্যাকামিটা কর্ত্তার সহি বল কত আর !

হাঁড়ীবদন

দিনরাত খাটুনিতে
ঘুরে মরা এ ঘানিতে,
বোঝে নাক একবার
চক্ষেরি পাতা--
আহা, খেটে খেটে সারা হ'ল
নন্দেরই মাতা ।

গিন্নী

কেন এত খোসামোদ ?
আছে কিছু রোক্ শোধ,—
এত কাঁচা মেয়ে নয়
নন্দেরই জননী ।
নহিক সহজ নারী,
আমিও বলিতে পারি,
ভেবো না বচন তব
সহিব গো অমনি ।

(গানের সুরে)

ভুঁড়ি তব যোগী যেন চর্ব্বির ধ্যানে ভোর
যেন গোল জয়ঢাক, তানপুরা বড় জোর ।

চোখে তব ছানি পড়ে, প্রেমে পড়ে আরসুলা—
চামড়া ঝুলিয়া পড়ে, দুই কানে পড়ে তুলা
চোখে তব হরদম চশমার রোশনাই ;
মুখে উঠি অবিরাম আফিমের বাষ্প হাই ।
প্রাণ তব ছট্‌ফট্‌ ঝোঁকে যেন নুন তাই,
গোঁফ্‌ তব শতমুখী, গড়ে যেন গড়্‌খাই ।
তুমি যেন দেহ আর আমি তাহে বুদ্ধি—
তুমি যেন চাপরাসী, আমি তাহে উর্দ্দি ।
তুমি যেন কেরাণীটি, আমি বড় সা'ব হই
তুমি সও দুখব্যথা, আমি সুখে করি সই ।
তুমি মোর পেস্কার, আমি তব মুন্সেফ
আমি করি অর্ডার, তুমি তাহা পাল' স্রেফ ।

হাঁড়ীবদন

আহা আহা, গিন্নীগো, বাঁধা তব আঁচলে,
আমারে জিনেছ তুমি নাহি জানি কি ছলে ।
এস একবার মোর চল্লিশী প্রিয়াটি,
অনুভব করি তব প্রেমভরা হিয়াটি ।

[হিসাবের খাতা হাতে লইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন]

গিন্নী

বুড়ো এই বয়সেতে করিওনা রঙ্গ,
ঢঙ দেখে ম'রে যাই যেন এক সঙ্‌গো !

হাঁড়ীবদন

আহা, রাগ হবেই ত !
কড়া কথা কবেই ত—
খেটে খেটে গিন্নীর
মেজাজের দোষ কি ?
ওরে ওরে, পাখা কর,
গিন্নীর পায়ে ধর,
(নিজেই পায়ে ধরিয়া)
বল বল প্রিয়তমে,
হ'ল পরিতোষ কি ?

গিন্নী

বুড়া বয়সের ঢঙ্‌ দেখে পায় হাস্য
পুরুষ হইয়ে কর স্ত্রীলোকের দাস্য !

৮

হাঁড়ীবদন

বুড়া বয়সেও মোর প্রেমে নাই অকুলান
আমি হই বটিকাটি, তুমি তার অনুপান ।
গিন্নীগো, মোর পরে হয়ো নাক' রুষ্ট
বল দিব নাকে খত করিবারে তুষ্ট ?
তুমি এবে চল্লিশী, মোর হল—পঞ্চাশ ।
কিন্তু এ প্রেমে মোর কমে নাই উচ্ছ্বাস !

গিন্নী

প্রমাণ ?
(হিসাবের খাতা লইয়া)

হাঁড়ীবদন

হিসাবের খাতাটির
পিছনের পাতাটির
একটুকু ফাঁক নাই,
সব গেছে ভরিয়া ।
কাজ হতে ফাঁক পেলে
গান বাঁধি অবহেলে
নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া ।
ওরে ওরে, পাখা কর—
গিন্নীর পায়ে ধর ।
কেহ যদি নাহি ধরে
আমি তবে ধরি গো !
যে পথে চলিয়ে যাও সেই পথে হরদম
পারি শুয়ে পড়িবারে হোক না সে কর্দ্দম ।
ভুঁড়ি আর দাড়ি গোঁফে বাড়ে তব কষ্ট
আজ হ'তে দাড়ী গোঁফ্‌ করি দিব নষ্ট ।
ভুঁড়িখানি উপবাসে চুপসায় নিশ্চয়,
প্রাণ দিতে পারি আমি, ভুঁড়ি দিতে কিবা ভয় !
বাতাস করিব কিগো বেছে দেব পাকাচুল
সাজাব কি পাকা পাকা তুলি শিমুলের ফুল ?
যাহা বল তাহা আমি করিবই করিব,—
আজ তব শ্রীচরণ ধরিবই ধরিব ।
(চরণ ধরিতে উদ্যত)

গিন্নী

জ্ব'লে যায় হাড় মোর শুনে তব রঙ্গ—

হাঁড়ীবদন

ডাকিয়াছি ব্রিগেডেরে হবে নাক long গো !

গিন্নী

আহা মরি রসিকতা,
মহিষের ঘণ্টা !

(অর্দ্ধ স্বগত)

তাও বলি কর্ত্তার
স্নেহটুকু অনিবার
প্রাণ করে তোল পাড়,
খুসি করে মনটা।
এত লোক আসে যায়—
সে সবার পানে হায়
তাকাবার ইচ্ছাও
হয় নাকো কখনো,
আমার যেমন আছে
সদা ঘোরে কাছে কাছে,
বকি ঝকি গাল দিই
হাসি মুখ তখনো !

হাঁড়ীবদন

(স্বগত)

এই বার গিন্নীর খুসি আছে মনটা—
সেই কথা বলিবার ঠিক এই ক্ষণটা।

(প্রকাশ্যে)

ছেলেগুলো আজকাল
হল বড় জঞ্জাল।
বাপমায় হরতাল
এত বড় মন্দ।

গিন্নী

খুলে বল হয়েছে কি
ভণিতার কথা রাখি,—
নিজ মনে বুঝে দেখি
করেছে কি নন্দ ?

হাঁড়ীবদন

ছেলে তব, শোনো আর—
একেবারে জানোয়ার—
খুসিরাম তনয়ার
লভে পড়ে নন্দ।

গিন্নী

ওমা, কিসে পড়ে নন্দ ?

হাঁড়ীবদন

খুসিরাম তনয়ার
প্রেমে পড়ে নন্দ !

গিন্নী

আহা তাই যদি হয়, সে ত বড় ভাল কথা—
সন্দেশ খাওয়াইব শুনাইলে এ বারতা।

হাঁড়ীবদন

ধুত্তোর সন্দেশ, ধুত্তোর নিকুচির—

গিন্নী

ক'রো নাকো বাড়াবাড়ি, সন্তান দুখিনীর।

হাঁড়ীবদন

তুমি দেছ আস্কারা—
সবে করে মস্করা !
এবে তার মাসহারা
করে দেব বন্ধ।

গিন্নী

তুমি অতি নিদারুণ
নাই তার সন্ধ,—
আজ হ'তে পিণ্ডীর
রন্ধন বন্ধ !

হাঁড়ীবদন

রন্ধন বন্ধ !
খাওয়া দাওয়া বন্ধ !

(নন্দকে আসিতে দেখিয়া)—

ঐ আসে নন্দ।

(নন্দ ও লতার প্রবেশ)

নন্দ

আজি অন্তর ভরি পুলকের হিল্লোল !
আনিয়াছি বধূ মাগো, এরে তুই ঘরে তোল।
জানি যদি সংসার ত্যাগ করে আমারে—
তুই মাগো ছাড়িবি না, ফেলিবি না পাথারে।

হাঁড়ীবদন

গিন্নী গো, গিন্নী গো, দূর কর এখনি !
মেয়েটাও আসিয়াছে, সাহসেরে বাখানি !

লতা

আসিয়াছি জননী গো, দাও পদধূলি দাও !
মমতায় করুণায় সেবিকার পানে চাও।
নারী তুমি বুঝিবে মা, তনয়ার মনে গো !
স্বামী সহ লহ বরি' এই শুভক্ষণে গো।

হাঁড়ীবদন

স্বামী সহ ! বলে কি গো ?
কবে বিয়ে হল ওগো ?
জানিনা ত কিছু আমি,
বুঝি নাক সাত পাঁচ !
বিয়ে টিয়ে মিছে সব !
গিন্নী গো, টপাটপ্—
দূর কর দুটোকেই
মারি ঝাঁটা বার পাঁচ।

নন্দ

করিয়াছি পরিণয় পুরোহিত মন্ত্রে—
হইয়াছে সাতপাক হিন্দুর তন্ত্রে।

হাঁড়ীবদন

(পতনের উপক্রম করিয়া)
হায় হায় গিন্নী গো—গিন্নী গো, ধর ধর !
পড়িলাম একি চক্রান্তের মন্ত্রে !

লতা

এ বাড়ী তোমার মাগো, আসিয়াছি সেবিকার
বেশে হেথা, নাই মোর গৃহে কোনো অধিকার।
তাড়াইয়া দিতে চাও, বল তাহা স্পষ্ট।
স্বামী সহ তরুতল কি তাহে মা, কষ্ট ?

গিন্নী

আশীষ করি গো তোরে, তুই মোর কন্যা।
হেন বধূ লভি' আমি হইলাম ধন্যা।
আশীষ করি মা দোঁহে, নত হও দুজনে
(উভয়ে প্রণাম করিল)
ক'রো নাকো দুঃখ মা,
কি-না বলে কুজনে।
(হাঁড়ীবদন গজ্‌গজ্ করিতে লাগিলেন—
"মেয়ে বড় দুর্বার, ফাজিলের সর্দার" ইত্যাদি)

গিন্নী

যথা আমি কর্ত্তায় বাঁধিয়াছি আঁচলে
তেমনি স্বামীরে বাঁধ দৃঢ় করে সবলে।
এই তব ঘরদ্বার, তুমি যে মা লক্ষ্মী—

হাঁড়ীবদন

হায় হায়, গিন্নী গো, সয়ো না এ ঝক্কি !
শিখেছ ত ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ
হিসাবের মারপ্যাঁচ,
বুঝ নাক এই ম্যাচ
নহে ওর যোগ্য !
বিবাহের বাজারের
দাম আমি জানি ঢের।
খুসিরাম পকেটের
বড় বড় যোগ্‌গে

গিন্নী

গিন্নীর সংসার চালকল নহে গো—
ব্যবসা করি না জুয়াচুরীতে--
তুমি যদি বেগড়াও, ছেলে বউ সাথে নিয়ে
চ'লে যাব চাটগাঁ কি পুরীতে।

হাঁড়ীবদন

(স্বগত)
ভাল কথা দিয়ে আজ সুফল না হব রে !
ভাল কথা ঠাঁই নাহি পায় আজ
বিনা পণে বিয়ে কভু নীরবে না সব রে !
(এখন) রুদ্রের মূর্ত্তির ধরি সাজ।

(প্রকাশ্যে)

পুরুষ হইয়ে আমি জনম নিয়েছি গো—
রাগ নাই দেহে মোর ভাব কি ?
দয়ার শরীর ব'লে ক্ষমা করি অপরাধ,
তাই বলে সব স'য়ে যাব কি ?
শোনও তবে, শোনও মোর কথাটা
দুম্‌দাম্‌, তছ্‌নছ্‌—

গিন্নী

কাটিবে কি মাথাটা ?

হাঁড়ীবদন

একবার পারি যদি উড়িতে !

গিন্নী

কাজ নেই, কাজ নেই, বাধা পাবে ভুঁড়িতে !

হাঁড়ীবদন

লাফ্‌ দিব ঘাড় পরে এখনি !

গিন্নী

ঘুঘু শুধু দেখিয়াছ, ফাঁদ কভু দেখনি !

হাঁড়ীবদন

নন্দার গায়ে দেব ঝাঁকানি
(তথা করণ)

গিন্নী

চেপে যাও, চেপে যাও, বাড়াবে কি হাঁপানি।

হাঁড়ীবদন

কল ঘরে কল দিব খুলিয়া।
(কল ঘরের দিকে যাইতে উদ্যত)

গিন্নী

দেবে দাও, দাম নিতে বাহিরিবে ছলিয়া।

হাঁড়ীবদন

(তার স্বরে)
পুলিশ ডাকিব আমি এখনি !

গিন্নী

(তত্তোধিক তার স্বরে)
ঝাঁটিয়ে বিদায় দেব তখনি।

হাঁড়ীবদন

হাকিমের কাছে যাবো ছুটিয়া—
কর্ত্তা কি নহি আমি, আমি বুঝি মুটিয়া !

গিন্নী

কর্ত্তাগো ধর ধর,
ভয়ে কাঁপি থর থর !
শরীরেতে রাগ ধর
পুরুষের সিংহ !
এস নিয়ে কোদালিটা
কেটে দাও গর্ত্তটা ;
(আমি) লুকোবার জায়গার
নাহি পাই চিহ্ন।

হাঁড়ীবদন

ঠাট্টা ও চালাকিতে হব নাক তুষ্ট
দেখিছ না আমি এবে ঘোরতর রুষ্ট !
(আস্ফালন)

গিন্নী

কর্ত্তাগো ধর ধর,
ভয়ে কাঁপি থর থর !
শরীরেতে রাগ ধর
পুরুষের সিংহ
এস নিয়ে কোদালিটা
কেটে দাও গর্ত্তটা ;
লুকোবার জায়গার
নাহি পাই চিহ্ন।

হাঁড়ীবদন

ঠাট্টা ও চালাকীতে হব নাক' তুষ্ট
দেখিছ না আমি এবে কি ভীষণ রুষ্ট !

গিন্নী

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি

হাঁড়ীবদন

উনানের ছাই আর শুণ্ঠীর পিণ্ড ! (আস্ফালন
উষ্ট্রের রব আর শূকরের মুণ্ড !

গিন্নী

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি।

হাঁড়ীবদন

শুনিবে না কথা মোর, বেশ ত গো, বেশ ত!

আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত!

গিন্নী

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি।

[কর্ত্তা ও গিন্নী উভয়ে একসঙ্গে]

কর্ত্তা

"উনানের ছাই আর"—ইত্যাদি।

গিন্নী

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি।

(কলহ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

আদালতের বহির্ভাগ

হাঁড়ীবদন ও টাউটগণ

হাঁড়ীবদন

শুনিল না কথা মোর,—বেশ ত গো! বেশ ত!

আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত।

[প্রবেশ]

একজন টাউট

কে তুমি আসিছ আহা, ক্রোধভরে ব্যস্ত!

(অপর টাউটকে)

এ:তে আর ভুল নাই, শীকার এ মস্ত!

হাঁড়ীবদন

হঠ্ যাও, ছোড়ো পথ,

চল্ যাগা আদালত—

দেখিছনা হিন্দীর

কর্‌ছি বাপান্ত!

টাউটগণ

হিন্দী ধরেছ যবে

রাগ তব খুব হবে।

মোরা আছি, ভয় কি গো।

হও এবে শান্ত।

হাঁড়ীবদন

শান্তির মুখে ছাই!

জাজ্‌মেণ্ট কিসে পাই

জোচ্চোর শত্রুর

শান্তিরে নাশিতে।

টাউটগণ

রাগিয়াছ? বাপ্! বাপ্!

কেউটা গোখুরা সাপ—

পার যদি আমাদেরই

লটকাও ফাঁসীতে।

হাঁড়ীবদন

ফাঁসি? সেত ঢের ভালো।

গিন্নীর রঙ কালো

ঠিক যেন পাহারালো

গোঁফ্ শুধ নাই গো।

টাউটগণ

গোঁফ নাই, ভাবনা কি?

ক্ষুর নিয়ে যাবো না কি?

গোঁফ্‌হীন পাহারালো

দেখ্‌তে ত পাই গো!

হাঁড়ীবদন

খেটে খুটে আনি আমি

গিন্নীরে করি রাণী

সেই গিন্নীই হায়,

দেয় এত যন্ত্রণা!

(ক্রন্দন)

টাউটগণ

(ক্রন্দনের সুরে)

শোকে তব, আঁখিনীর

হু হু ধায়, শোনও ধীর,

গিন্নীরে আঁটিবার

দেব মোরা মন্ত্রণা।

হাঁড়ীবদন

হিসাবের খাতটির
পিছনের পাতাটির
একটুও ফাঁক নাই
সব গেছে ভরিয়া—
কাজ হ'তে ফাঁক পেলে
গান বাঁধি অবহেলে
নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া।

টাউটগণ

এত বড় প্রেম বল দেখিয়াছে কারা গো ?
এত বড় প্রেমিকের কীর্ত্তি !
চালকল মাঝে বয় অমিয়ার ধারা গো—
এঞ্জিন ভেদি বয় স্ফূর্ত্তি !

হাঁড়ীবদন

গিন্নীটা ছেলেটার
মাথাটারে একেবার
বিগড়ায়ে দেছে, তার
নাহিক পদার্থ।

টাউটগণ

একথা বলেছ ঠিক্
গিন্নীরে শতধিক্ !
স্বামীরে করিল দিক্
এত অপদার্থ !

হাঁড়ীবদন

তবু গিন্নীরে ছাড়ি
কোথায় থাকিতে পারি !
গিন্নী নহিলে মোর
চলে নাক একদিন।

টাউটগণ

একথা বলেছ, ভায়া,
তিনি প্রাণ তুমি কায়া।
প্রাণ গেলে কায়াটি যে—
ক্রমে ক্রমে হবে ক্ষীণ।

হাঁড়ীবদন

এবার বুঝেছি ঠিক্
বিয়ে করা বড় দিক্।
এ কথাটা তোমরাও
বোঝ ভাল করিয়া।

টাউটগণ

বোঝ সবে, বোঝ ওহে
বিয়ে করা ঠিক নহে।
বিবাহ করেছ যেই,
সেই গেছ মরিয়া।

হাঁড়ীবদন

"বংশানুক্রমেতেই
আইবড় থাকিবেই"
—কর পণ সকলেই
হ'য়ো নাক পিছুপা।

টাউটগণ

"বংশানুক্রমেতেই
আইবড় থাকিবই"
করি পণ সকলেই,
হব নাক পিছুপা।

হাঁড়ীবদন

পরাণে আনিলে মোর আজি বড় শান্তি
এবার হইল মোর কিছু ক্রোধ ক্ষান্তি।
চিরকাল আইবড় থাক যদি সবে গো—
না রহিবে বাধা দিতে গিন্নী—

টাউটগণ

ওগো, না রহিবে বাধা দিতে গিন্নী !

হাঁড়ীবদন

ছেলে নিয়ে যাহা খুসি করিতে পারিবে গো—
টাকা নাহি হবে ছিনিমিনি।

টাউটগণ

ওগো, টাকা নাহি হবে ছিনিমিনি !

হাঁড়ীবদন

ছেলেদের বরপণ যত খুসি পাবে গো—
সোণা রূপা যত কিছু কাম্য—

টাউটগণ

ওগো, সোণা রূপা যত কিছু কাম্য।

হাঁড়ীবদন

থলি ভরা টাকাকড়ি শাল দামী বালাপোষ–
তার পরে গোলা ভরা ধান্য!

টাউটগণ

আহা, তার পরে গোলা ভরা ধান্য।

হাঁড়ীবদন

ছেলে মোর, শোনো আর—
একেবারে জানোয়ার।
খুসীরাম তনয়ার
লভে পড়ে নন্দ!
করেছে বিবাহ তায়—
মোরে নাহি মানে হায়!
নিলে নাক' যৌতুক
এ বিষম দন্দ্ব!

টাউটগণ

করেছে বিবাহ তায়?
বিশ্বাস নাহি হয়।
এ বিবাহ নিশ্চয়—
আইনেতে বন্ধ।
সাক্ষী কে বিবাহের?
পুরোহিত কেবা এর?
ঘুষ দিয়ে জিতে নেব
নাই এতে সন্ধ।

হাঁড়ীবদন

বিবাহ করেছে ঠিক।
করিও না মিছে দিক
এ বিবাহে কভু নাই
বে-আইনি গন্ধ।

টাউটগণ

তবে বল কোন্ ছলে
নালিশিয়া অবহেলে
নিতে পারি জাজ্মেণ্ট্
তোমারই স্বপক্ষে।

হাঁড়ীবদন

কথা এই, সে আমার
ছেলে গত অধিকার।
"প্রপার্টি" কি নহে মোর
আইনের চক্ষে?
বিবাহ ত আইনত
বিক্রী কোবালা মত,—
মোর ছিল, চ'লে গেল
শ্বশুরের পক্ষে।

টাউটগণ

নিশ্চয়, নিশ্চয়
এতে আর ভুল হয়?
যে তাহারে কিনে নেবে
দাম দিতে বাধ্য!

হাঁড়ীবদন

দাও তবে কনসেণ্ট্
পাব আমি জাজ্মেণ্ট?

টাউটগণ

নিশ্চয়, নিশ্চয়
রোখে কার সাধ্য!

হাঁড়ীবদন

কথা তব শুনে মোর ধড়ে এল প্রাণটা।
এতক্ষণ হাঁকু পাঁকু করছিল জান্টা।

টাউটগণ

ভয় নাই, ভয় নাই, মোরা তব মিত্র
মাম্লা জিতায়ে দেব, দিও কিছু বিত্ত।

হাঁড়ীবদন

তোমাদের বল কি বা কৌশল?

টাউটগণ

নিবেদিব তব কাছে অবিকল।

একজন টাউট

মামলার আমি "তদ্বিরকার"
পরহিতব্রত মোর গলহার।

অন্যান্য টাউটগণ

ওগো, পরহিতব্রত এর গলহার।

ঐ টাউট

মামলা সাজাই আমি গুছায়ে—
সত্যের শেষ লেশ মুছায়ে।
উকীলের বাড়ী দিই ধর্ণা—
মক্কেলই মোর ঘরকর্ণা।

অন্যান্য টাউটগণ

ওগো, মক্কেলই এর ঘরকর্ণা।

ঐ টাউট

জানি বড় উকীলের সন্ধান।
কেহ যমদূত, কেহ ক্রূর Hun!
মক্কেলে কালঘাম ছুটিয়ে—
ঘটি বাটি সবই লই লুটিয়ে।
মক্কেল কুসুমেরে ফুটিয়ে—
পান করি মধু আমি ভৃঙ্গ—
বাক্‌যুদ্ধের আমি জিঙ্গো!

হাঁড়ীবদন

নমি তব পদতলে লুটায়ে—
মক্কেল কুসুমেরে ফুটায়ে—
পান কর মধু তুমি ভৃঙ্গ—
বাকযুদ্ধের তুমি জিঙ্গো।

অন্য একজন টাউট

আমি দলিলের বিশ্বকর্মা—
হাত মোর সেট্, যেন ঠিক রবিবর্ম্মা।

অন্যান্য টাউটগণ

ওগো, হাত এর সেট্, যেন ঠিক রবিবর্ম্মা।

ঐ টাউট

করি আমি দলিলের সৃষ্টি,
হার মানে হাকিমের দৃষ্টি।

অন্যান্য টাউটগণ

হার মানে হাকিমের ছানি পড়া দৃষ্টি।

ঐ টাউট

রাবণেরও স্পেসিমেন সই মোর আছে গো—
সকলের সই জাল হয় মোর কাছে গো।
বল কিবা দলিলের দরকার,
Contract, gift? কিবা will কার?
ষ্টীলপেন, বাঁশপেন, হাঁসপেন কিবা চাই?
লাল কালী, নীল কালী, ভূষী কালী দিব তাই।

অন্যান্য টাউটগণ

(হাঁড়ীবদনকে)

ষ্টীলপেন, বাঁশপেন, হাঁসপেন কিবা চাই?
লাল কালী, নীল কালী, ভূষী কালী দেবে তাই।

হাঁড়ীবদন

নমি দলিলের বিশ্বকর্ম্মা
হাত তব সেট্ যেন ঠিক রবিবর্ম্মা
কর তুমি দলিলের সৃষ্টি,—
হার মানে হাকিমের ছানিপড়া দৃষ্টি।

তৃতীয় টাউট

আমি পেশাদারি সাক্ষ্য—
সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য।

অন্যান্য টাউটগণ

(হাঁড়ীবদনকে)

ওগো, সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য।

ঐ টাউট

আমি থাকি ঘটনারই স্থলে ভাই
বহু দূরে ছিনু তায় ক্ষতি নাই।
স্মৃতি মোর যেন ঠিক খুরধার
জেরাতেও মানিনেক কভু হার!

নাম মোর আছে বিশ গণ্ডা—
জোনাবালি, কভু হই পণ্ডা।
যতবার কাঠ্‌রায় উঠে যাই
ততবার নাম মোর বদ্‌লাই।
খাটিয়াছি জেল দুই একবার—

হাঁড়ীবদন

(সন্ত্রস্তে) জেল!

ঐ টাউট

জেল নয়, জেল নয়, সে ত মোর মণিহার!

অন্যান্য টাউটগণ

(হাঁড়িবদনকে)

ওগো, জেল নয়, জেল নয়, সেত এর মণিহার।

ঐ টাউট

ধূলা নয়, ধূলি নয়, গোপীপদ রেণুকা।

অন্যান্য টাউটগণ

ওগো ধূলা নয়, ধূলি নয়,
গোপীপদ রেণুকা।

হাঁড়ীবদন

নমি পেশাদারি সাক্ষ্য!
সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য!
খাটিয়াছ জেল দুই একবার
জেল নয়, সে ত তব মণিহার।

টাউটগণ

চল তবে আদালতে এখনি!
ক্রোধ ভরে কাঁপাইয়া অবনী!

হাঁড়ীবদন

উনানের ছাই আর শুণ্ঠীর পিণ্ড!
উষ্ট্রের রব আর শূকরের মুণ্ড!
শুনিল না কথা মোর, বেশ ত গো বেশ ত!
আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত!

[জজের পিয়াদার প্রবেশ]

পিয়াদা

হিজিবিজী হা—জীর
হিজিবিজী হা—জীর!
ধুত্তোর পাজীর
দেখা নাই, কত আর মরি বল চেঁচিয়ে।
হিজিবিজী হা—জীর
হিজিবিজী হা—জীর!
আজো গরহাজির?
জেনে রেখো যেতে হবে ভিটে মাটি বেচিয়ে।

[প্রস্থান।

[সেসনজজ্‌, ব্যারিষ্টার ও উকীলগণের প্রবেশ]

সেসনজজ্‌

সেসন জজের আদালতের আমিই সেসনজজ্‌!
আইনের ফাউণ্টেন, নথী-দিগ্‌গজ।

উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ

তুমি আইনের ফাউণ্টেন, নথী-দিগ্‌গজ।

সেসনজজ্‌

(হাঁড়িবদন প্রভৃতিকে দেখিয়া)

নত হও, নত হও, মান রাখ মান্তে—
নত হও, নত হও, আদালত সাম্‌নে।

উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ

আইনের মর্য্যাদা দেখে কর শঙ্কা
বাজাও বাজাও জোরে দামামা ও ডঙ্কা!

(দামামা ও ডঙ্কানাদ)

সেসনজজ্‌

লজিকের যুক্তি ও মানুষের বুদ্ধি—
ইতিহাস গবেষণা দিয়ে ক'রে শুদ্ধি—
সব কটি গুণ নিয়ে রচনা এ আইনের—
ঠিক যেন সুধাসার ইটালীর ভাইনের!

উকীল ব্যারিষ্টারগণ

সব কটি গুণ দিয়ে রচনা এ আইনের—
ঠিক যেন সুধাসার ইটালীর ভাইনের।
তুমি হও আইনের নির্ঝর ঝর্ঝর,
মোরা থাকি তলদেশে প্রস্তর মর্ম্মর।
আইন কেতাব লয়ে মোরা করি আরতি,
Oracle ব'লে মানি যবে শুনি ভারতী।

বিচারেতে ড্যানিয়েল ওগো আইনজ্ঞ,
বিচারের গুরুভার তোমারই যে যোগ্য।

সকলে

(হাঁড়িবদনকে জোর করিয়া নত করাইয়া)

সেলাম সেলাম জজ্ মোরা হই তাঁবেদার—
গোস্তাকি মাফ্ হয় যত সব বান্দার।

জজ, উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ

নত হও, নত হও মান রাখ মান্যে—
নত হও, নত হও আদালত সামনে।
আইনের মর্য্যাদা দেখে কর শঙ্কা—
বাজাও বাজাও জোরে দামামাও ডঙ্কা।

(ডঙ্কানিনাদের মধ্যে সেসনজজ্ উকীল ও ব্যারিষ্টারদিগের প্রস্থান)

(জনৈক কয়েদীকে বাঁধিয়া লইয়া জেলারের প্রবেশ)

জেলার

রাজকীয় অতিথিরে করি আমি দেখা শুনা—
চামড়াটা দেগে দিই, কারে করি তুলা-ধুনা।
চোখে ঠুলি বেঁধে কারে ঘানি গাছে লটকাই,
মাথার উপরে কারো কাঁচা বাঁশ ফট্‌কাই।

(হাঁড়িবদনের দিকে সকোপে দৃষ্টি করিয়া)

পাপ করি পৃথিবীতে কেহ নাহি ফাঁক পায়—
জেলখানা যমালয়, পাপীদের আটকায়।

(কয়েদীকে টানিতে টানিতে জেলারের প্রস্থান)

হাঁড়ীবদন

প্রাণ করে ছম্ ছম্, কাজ নাই মাম্‌লায়—
ফাঁফরেতে পড়ি যদি, তখন কে সামলায়?

টাউটগণ

সে কি কথা? এত করি রণে দিবে ভঙ্গ?
শিশু নাকি? ভয় নাই। ছাড় এই ঢং গো।

(বিরাট হুঙ্কার দিয়া ফাঁসীদারের প্রবেশ। হস্তে ফাঁসীর দড়ি)

(ফাঁসীদারকে দেখিয়া হাঁড়ীবদন প্রায় মূর্চ্ছিত হইলেন)

ফাঁসীদার

আইনের জুজুবুড়ী, আমি হই ফাঁসীদার।
ফাঁসীকাঠে লটকাই হয়ে খুব হুঁসিয়ার!
যতটুকু দম থাকে টিপে টিপে নিঙাড়ি—
প্রাণহীন লাসখানা ফেলে দিই আছাড়ি!

(হাঁড়ীবদনের পতন ও মূর্চ্ছা, ফাঁসীদারের প্রস্থান।
টাউটগণ হাঁড়ীবদনের চেতনা সম্পাদন করিল)

হাঁড়ীবদন

আদালত জায়গাটা ভাল নয়, ভাল নয়!—
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, আর পালাতে বাসনা হয়।

টাউটগণ

পালাতে বাসনা হয়! ঘোচ্চোর সর্দ্দার!
পাওনাটা আমাদের দিয়ে তবে নিস্তার।

হাঁড়ীবদন

কি সে হ'ল পাওনাটা? করিয়াছ কিবা মোর?

টাউটগণ

শুধু বেটা ঘাগী নয়, বেটা হ'ল পাকা চোর!

হাঁড়ীবদন

আদালতে আসিয়াছি, করিনি ত মাম্‌লায়—

টাউটগণ

টাকা দিয়ে কথা কও!

হাঁড়ীবদন

এখন কে সামলায়!

(টাউটগণ হাঁড়ীবদনকে ঘেরিয়া ফেলিল। হাঁড়ীবদন অসহায়ভাবে চেঁচাইতে লাগিলেন, এমন সময় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত এক রমণী আসিয়া সটান হাঁড়ীবদনের কর্ণাকর্ষণ করিলেন। টাউটগণ দূরে সরিয়া গেল)

(গান)

হাঁড়ীবদন

মেঘের আড়ালে চন্দ্র যেমন লুকালেও চিনা যায় গো
গোঁফের আড়ালে সন্দেশ,
সাড়ীর আড়ালে ঢাকা মুখ তব, নথখানি দেখি হায় গো -
সব সন্দেহ হয় শেষ।
মানিতেছি ঘাট, আহা মরি ঘাট্!
কত বাধা প্রাণে পাই গো,
এবে ভালয় ভালয় ঘরে যাই।
শুধু রাগ ক'রে আসিয়াছি হেথা,
আর মনে কিছু নাই গো।
আহা, কান টানিও না অত ছাই!

(একধারে গিন্নী কর্ত্তার এক কান টানিতে লাগিলেন,—অন্যধারে টাউটগণ কর্ত্তার আর এক কান টানিতে লাগিলেন।)

টাউটগণ

আদালতে আসি কর নাই-কর মামলায়—
টাকা দিতে হ'বে পুরো ; দেখি কেবা সামলায় !

হাঁড়ীবদন

(গান)

এবে ধেনু চলে গোঠে ফিরে ধীরে,
ঐ রাখালে বাজাল বাঁশী !
কুলায়ে ফিরিছে তিতি আঁখিনীরে
পাখী এই পরবাসী ।

টাউটগণ

পাওনাটা দিলে তবে কর্ণটি ছাড়িব ।
নাহি দিলে জামা জুতা সব মোরা কাড়িব ।

হাঁড়ীবদন

(গান)

ওগো, দেখ কত জোরে গৃহ টানে মোর প্রাণে,
গিন্নীর হাতখানি আরো জোরে টানে কাণে—!
আদালতে যাওয়া তবে আর হল কই গো ?
উপায় কি আছে গৃহে ফিরে যাওয়া বই গো ?

টাউটগণ

কেড়ে নাও মেরজাই, কেড়ে নাও চাদরে
কেড়ে নাও যাহা পাও, ছাড়িওনা বাঁদরে ।

(টাউটগণ ক্ষিপ্রগতিতে হাঁড়ীবদনের জামা চাদর চশমা প্রভৃতি কাড়িয়া লইল)

হাঁড়ীবদন

(গান)

ওরা কেড়ে নিল সব যাহা ছিল মোর ঠাঁই—
প্রাণ নিয়ে এবে পালালে বাঁচিয়া যাই ।
তবু মনে হয় ফাঁড়ার নাহিক শেষ—
বাড়ী গিয়ে মোরে হ'তে হবে একশেষ ।
(গিন্নীর প্রতি) ওগো শঙ্কাহরণ, শঙ্খ বাজাও—
বল ক্ষমিয়াছ দোষ,
যেই করে এবে টানিতেছ কান,
সে করে নিভাও রোষ ।
ধেনু চলে এবে গোঠে ফিরে, রাখাল বাজাল বাঁশী ;
উড়ে চলে যেন পাখী নীড়ে, কুঁড়ে পানে যেন চাষী ।

[হাঁড়ীবদন ও গিন্নীর প্রস্থান]

টাউটগণ

টাকা বাজে ঝম্ ঝম্, মেরজাই ভারী রে !
খুসী হ'য়ে টেনে সাফ্ এক লাফ মারি রে !

যবনিকা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

নববুদ্ধ

শ্রীলীলা দেবী

শুভ্র অমল সহস্রদল,
এসো বসন্ত দান ।
এসো হে ছন্দ, মহা আনন্দ—
এসো অনন্ত গান ।
এসো রসঘন শান্তাদ্বৈত,
লীলা সুছন্দ বিভাতি-ভাসিত,
জন্ম-মৃত্যু-বিনাশ-অতীত
অপরূপ সন্তান !

চির সুন্দর ! হে ভারতপতি !
বেদ, নিরুক্ত, ছন্দ, মূরতি,
জ্যোতি মণ্ডল, ও আপন জ্যোতি
এসো হে নবীন প্রাণ !
নব অবতার ! হে বিশাল মন !
কমল লোচন ! আর্ত্ত শরণ !
এসো ভগবান্ ! এসো নারায়ণ !
এসো ধরিত্রীত্রাণ !

ক্ষরের পঞ্চপান পাত্র

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

পুষ্পধন্বা মদনের পঞ্চশর ভুবনজয়ী ব্রহ্মাস্ত্র। তাহার অব্যর্থ সন্ধানে নিখিলের চিত্তে উতরোল কল্লোল জাগিতেছে, যৌবনের দখিন হাওয়ায় তরুণ-তরুণীর পুষ্পিত দেহলতায় চারু-মর্ম্মর ধ্বনিতেছে। কচি হাত তার বটে, হাতেও ফুলশর, অবহেলায় বুঝি বা বলিয়া ফেলা যায় ফুলের ঘায় সে কি করিতে পারে। যে এতই কুসুমকোমল সে ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া, ফুলের রেণু উড়াইয়া, সুবাস ছড়াইয়া কি সমর করিবে? এ সংসারে সমরকুশলীরা ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া আজ মেশিনগানের ধ্বনিতে Poison gasএর ধূম্রজাল বুনিয়া চৌদিকে ধান্দা লাগাইতেছে, কাইজার প্রমুখ বীরভদ্রদের দেখিয়া মনসিজ কি আপনার তূণীর গুটাইয়া ফুলশর ফেলিয়া পলায়নের পথ খুঁজিবে? জার্ম্মাণ সমর-নায়ক পিঁজা তুলার মত গুলিবারুদ দিয়া সংসার ঢাকিতে বসিয়াছিল, কিন্তু কামদেব তাহার উপরও জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া টেক্কা দিয়াছে। কাইজার য়ুরোপকে কত পাক খাওয়াইয়া বিপাকে ফেলিয়াছিল, প্রেমের দেবতা তাহাকেও সাতপাক খাওয়াইল ভুর্ণ কাসেলে,

> প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
> কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?

মদন বীরসমাজে বীরশ্রেষ্ঠ,—আপনার কপালে জয়তিলক আঁকিয়া চিরনবকিশোর সাজে মদন সংসারকে ফুলশরের ঘায়ে নুয়াইয়া বীরদর্পে ফিরিতেছে! তাহার সহিত লড়ে কাহার সাধ্য? শত্রু যদি বিপক্ষ-দুর্গে ঢুকিয়া পড়ে তবে শিবাজীর হস্তে সায়েস্তা খাঁর যে অবস্থা, সকলেরই সেই ছত্রভঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া আর ব্যবস্থা কি? মদনকে পরাজিত করা কত অসম্ভব! তাহার নামেই সেই পরিচয় চিরদিন লেখা আছে! সে কি কখনো বাহিরে থাকিবার? তাহার আসন হইতেছে মনে—মনের শতদলে বিরাজ করে তাই ইনি মনসিজ। একেবারে মনেতে জন্ম—ব্রহ্ম যেমন স্বয়ম্ভু, মদন মনোভূ। মন হইতে আপনার মানুষের আর কি আছে? সেই মনে ইহার বসতি। সুতরাং সে মানুষের যতটা আপনার ততটা আপনার আর কি আছে? ইহার অনুশাসনও তেমনি অমোঘ। মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের যে অপরাজেয় প্রতাপ, মনের আড়ালেও মনসিজের তেমনি অপ্রতিরোধণীয় প্রভাব; তাই বয়সের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মদন বিনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের মীড় খেলাইতে থাকে, আর অমনি

> মনে হয় যেন যুগ যুগ দূরে
> বহিয়া কাহারে এনেছি অন্তরে;
> মন্দিরে শুধু তারি ছবি জ্বালা,
> কণ্ঠে ফিরে সে রাগিণীর সুরে,
> কর্ণ ভরিয়া বাজে রিনিঝিনি
> অশ্রুত তার কিঙ্কিণীর।

এমনি করিয়া একখানি জাল বুনিতে থাকে, যাহাকে বেদান্ত মায়া বলিয়া এক নিমেষে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, কিন্তু তরুণের মনে সে কথা বেদান্তের কচ্‌কচিরূপে পরিণত হয়। সে ইতি উতি চায় কোন্‌খানে এমন একখানি মধুর মুখ থাকিতে পারে—

> বিপুল আলোকে নাহি তার ছবি,
> তাহারে ফুটাতে পারেনিক রবি,
> কল্প-আলোকে গড়িল সে কবি,
> মূর্ত্তি তাহার মানসীর।
> অন্তর ভরি উঠে সে স্বর গুঞ্জরি
> কে গো সেই অন্তরতমা সুন্দরী?

মনসিজ এমনি করিয়া একটি মানসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়া তরুণের প্রাণে ফুলশর হানিতে থাকে। প্রেমের ফাগ হানিয়া তরুণ তরুণীকে এমনি বিবশ করিয়া ফেলে যে, কামদেব অভিন্নসত্তায় সকলের মনে আপন আসন পাতিয়া বসে। তাই ইনি মনসিজ।

মনের সিংহাসনে রাজসাজে বসিয়া মনসিজ সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আপনার অব্যর্থ ফুলশর হানিয়াছে, তাহার তূণীরে পঞ্চশর—বহু নহে শুধু পাঁচটি। ফুলধনুতে জ্যা যোজন করিয়া চক্ষুর পলকের উপর চোখা রূপ-শর ছাড়িয়াছে—আর অমনি মধুমুখ দেখিবার রূপতৃষ্ণা চোখের কোণে জাগিয়া উঠিল, নাসিকার উপর গন্ধবান সন্ধান করিল—আর সঙ্গে সঙ্গে—

কুন্তলফুল গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে।

খোঁপার ফুলের নেশায় নাসিকা ক্ষুধাতুর হইল। কর্ণে শব্দশর বিদ্ধ করিল, অমৃতসিক্ত কণ্ঠস্বরের আশায় শ্রোত্র তৃষ্ণার্ত্ত হইল। জিহ্বায় রসাস্ত্র ক্ষেপ করিল—মধুমুখের অধররসস্পৃহা জমাট বাঁধিল। আর স্পর্শ? অঙ্গহীন হইয়া অনঙ্গ এমনি স্পর্শশর হানিল যে—

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

এই ভাবে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিয়া কামদেব মনকে বিলোল লালসার সায়রে ভাসাইয়া দিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিমলিন হইবার যে আখ্যান দিয়াছেন তাহার সহিত পুষ্পধন্বার কুসুমসমরের কি সুন্দর মিল!

ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—

দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ

শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন—দেবাঃ শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতা......বিষয়াসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্য তম আত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় এব। ইন্দ্রিয়ের যাহাতে অপব্যবহার ঘটে তৎপ্রতি অসুরের লক্ষ্য, তাই যখন

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসঞ্চক্রিরে, তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ; পাপ্মনা হি এষ বিদ্ধঃ।

যখন উদ্গীথানুষ্ঠানে নাসিকা বৃত হইয়াছিল তখন ব্রহ্ম-সাধনার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য ইহাকে আসুরিক শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করা হইল, গন্ধবানে মদন ইহাকে সম্মোহন করার কথা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। এইভাবে উজ্জ্বল ইন্দ্রিয়টিকে পাপবিদ্ধ করা হইল। চক্ষুরও তদ্রূপ পতন ঘটাইল—ফলে দাঁড়াইল—"তস্মাত্তেন উভয়ং পশ্যতি—দর্শনীয়ঞ্চ অদর্শনীয়ঞ্চ—পাপ্মনাহি এতদ্বিদ্ধম্।" তাই সুন্দরী দেখিতে নয়ন পলকশূন্য হয়—রূপতৃষ্ণায় চক্ষু-কোণ ফাটে ফাটে মনে হয়। সুন্দরীকে লইয়া চক্ষু যতই ভরপুর হয়—সত্যম্ সুন্দরম্ ততই চক্ষুর অগোচর হয়। কর্ণও যখন ব্রহ্ম-সাধনায় নিযুক্ত হইল ইহার প্রতিও অসুরের আক্রমণ ঘটিল; ফলে হইল—তেন উভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চ অশ্রবণীয়ঞ্চ, সুতরাং ইহারও পতন ঘটিল, পাপ্মনা হি এতদ্ বিদ্ধম্। তাই কর্ণে প্রেমালাপ যে মধু বর্ষণ করে তাহার শতাংশের একাংশও শাস্ত্র-শ্রবণে সহজে ঘটিতে চায় না। ব্রহ্মের সকল দ্বারীর পতন ঘটিল, মনকেও তেমনি সম্মোহন বাণে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অক্ষরের প্রতিহারী অক্ষরের সন্ধান ভুলিয়া নেশায় চুর হইয়া গেল।

মন্মথের ফুলশর রূপরসগন্ধস্পর্শে ভরা। শ্রীকৃষ্ণ রূপের অক্ষয়-কৌটা খুলিয়া চির-সুন্দরের যে লাবণ্য গীতার অক্ষরে অক্ষরে ফুটাইতেছেন, সেখানে নবকিশোর ভগবান্ ফুলশরের তূণীর দগ্ধ করিবার জন্য কত না সঙ্কেত করিতেছেন; কামের উচ্ছেদ করিয়া কামদেবকে নিরস্ত্র নিরর্থক করিতে কত না প্রয়াস পাইতেছেন।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধিয়তে
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।

যদি কোন ইন্দ্রিয় মন্মথের শরাহত হয় এবং মন সেই ইন্দ্রিয়ের লোলুপতায় নিজেও লুব্ধ হয় তখনি সব ডুবিল, ললাম ললনার চাঁদপানা মুখ দেখিয়া গোবিন্দলালের ন্যায় সহসা চক্ষু স্পন্দন হারাইতে পারে,—কিন্তু মন যদি তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে তবেই সে মানুষ। আর যদি মনও উড়ো পাখী হইয়া গোবিন্দলালের ন্যায় রোহিণীর সহিত উধাও হইয়া যায়, তবে সব ডুবিল। প্রবল বায়ুর চাপে নৌকা যেমন উল্টাইয়া ডুবিয়া যায়, এ ফুলেশরের আঘাতেও তেমনি মনের সকল দিব্যশক্তির খেলা একেবারে তলাইয়া যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ মন্মথশরের প্রতিষেধক মন্ত্র ধ্বনিত করিতেছেন—

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ছান্দোগ্যের আসুরী মায়া যখন দীপ্ত ইন্দ্রিয়কে তিমিরাবরণে ঢাকিয়া দিতে আসে, মন্মথ ফুলশর হানিয়া ইন্দ্রিয়কে মোহান্ধ করিয়া ফেলিতে চায়, তখন মনকে ছিনাইয়া ইহার দিব্যশক্তিতে অটুট রাখিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়গণের পতনের কাহিনী বলা হইল, "অভিনায়ক অক্ষরে" দ্যুতিশীল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যদি ইহারা আলোকের লহর হইয়া থাকে—আত্মভূ হইয়া থাকে, তবে উৎপত্তি স্থলকে কেন দেখে না? এ প্রশ্নের উত্তর ছান্দোগ্যের মন্ত্রে স্পষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য—এইটুকু আত্মা হইতে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ইহারা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে—একথা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু মনসিজের পঞ্চশর আসিল কোথা হইতে? রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের অভ্যুদয় ঘটিল কেমন করিয়া? ইহারা কখনো আত্মা হইতে আসিতে পারে না—আত্মার স্বভাব-ধর্ম্ম নির্গুণ, ইহারা গুণান্তর্গত। সাংখ্যে দেখা যায় ইহাদের উৎপত্তি স্থল মুখ্যতঃ প্রকৃতি—এ তত্ত্ব বর্ত্তমানে নহে। এখানে ছান্দোগ্যের ক্রম অনুসারে আমরা রূপরসাদির ক্রমিক অভ্যুদয় আলোচনা করিব।

"ক্ষর ও অক্ষরে" আমরা ক্ষরের ভাণ্ডটি লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে ক্ষর-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া পঞ্চশরের এক একটি উৎপন্ন হইল তাহা অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব। ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন তখন "তেজোহসৃজত"—এখানে প্রথমেই তেজ সৃষ্টির উল্লেখ করা হইল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু র্বায়ু রগ্নির রগ্নেরাপোহদ্ভ্যঃ পৃথিবী......

এমনি করিয়া দেহের উপাদান পঞ্চভূতের উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে দেখা যায় প্রথম দুইটিকে অনুক্ত রাখিয়া তৃতীয়টির উল্লেখ সর্ব্বাদৌ করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রুতিবিরোধ ঘটে নাই, তবে ছান্দোগ্যের ভঙ্গিটি বজায় রাখিতে এমনি ভাবে হিসাবের প্রয়োজন আছে। ইহা পরে দেখিতে পাইব। ছান্দোগ্য ক্ষর-দেহ-ভাণ্ডটির উপাদান প্রথমতঃ নির্ণয় করিয়া একটু পরেই উপাদানান্তর্গত সূক্ষ্ম শক্তি রূপরসাদির আবিষ্কার করিয়াছেন। সে আবিষ্কার পর্য্যালোচনাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রয়োজন।

"ইমা তিস্রো দেবতা" তেজ, জল ও পৃথিবী এই শরীরের উপাদান তিনটি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম স্থির করিলেন "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি।" ত্রিবৃৎকরণ পন্থায় দেহজ ভূতাদির একত্র সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইল। ত্রিবৃৎকরণ এক জটিল ব্যাপার ইহার আলোচনা দ্বারা বিষয়টিকে জটিল করিতে চাই না এবং ইহাকে বিশদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। তবে রূপক ভাবে ত্রিবৃৎকরণকে সমুদ্রমন্থনের ন্যায় আমরা একটা কিছু ধরিয়া লইতে পারি। সমুদ্র মথিত হইয়া যেমন অমৃত ও গরলের উৎপত্তিকারক হইয়াছিল, তদ্রূপ ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা অমৃতের উৎপত্তি ঘটে না—গরলেরই ছড়াছড়ি হয়। দুর্নিবার দুঃখময় সৃষ্টিপারাবার ইহা হইতেই নিঃসৃত।

ত্রিবৃৎকরণ বোধক ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪।৪ মন্ত্রটি শঙ্করাচার্য্য যে ভাবে আপন ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পঞ্চশরের নিটোল বিবৃতি আমরা লাভ করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষর-দেহের উপাদান নির্ণয় শেষ করিয়া ইহাদের অন্তর্গত সূক্ষ্মশক্তির আবিষ্কার করা হয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ উহা তেজের, যাহা শুক্ল তাহা জলের এবং যাহা কৃষ্ণ তাহা পৃথিবীর—প্রত্যুত বিদ্যুৎ বলিয়া পৃথক্ কোন পদার্থ নাই। শঙ্কর বলেন, এই উদাহরণ দ্বারা "অগ্ন্যাদিভিস্ত্রিবৃৎকরণং দর্শিতং নাবন্নয়োরুদাহরণং দর্শিতং ত্রিবৃৎকরণে" ত্রিবৃৎকরণে শুধু অগ্নি বা তেজেরই উদাহরণ স্বীকৃত হইয়াছে, বাকী দুইটি অপ (বা জল) এবং অন্নের (বা পৃথিবীর) মূল-অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরে বলিতেছেন, "নৈষ দোষঃ......তেজস উদাহরণম্ উপলক্ষণার্থম্।"

এখানে আমাদিগকে ধীরমনে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তেজের উদাহরণ ভিন্ন জল ও পৃথিবীর উদাহরণ দেওয়া হয় নাই,—এ কথার কি অর্থ? তেজের উদাহরণ

তাহাকে বলে? তেজের অন্তর্গত সূক্ষ্ম শক্তি কি? রূপ। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তে শুধু রূপেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহাই তেজ। এইরূপে পঞ্চশরের একটিকে পাইলাম। যদি তেজের স্বগুণ হয় রূপ, তবে জল ও পৃথিবীর স্বগুণ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেগুলি কি কি? শঙ্কর বলিতেছেন—"অবন্নয়োঃ রূপবতো রসগন্ধান্তর্ভাব ইতি।" জলের অন্তর্ভাব হইতেছে রস, পৃথিবীর অন্তর্ভাব হইতেছে গন্ধ। ছান্দোগ্যে প্রথমে তেজের উল্লেখ থাকার হেতু বুঝা যাইতেছে—তেজের অন্তর্ভাব হইতেছে রূপ, তেজ হইতে যাবতীয় পদার্থের আকার লাভ হইয়া থাকে। তেজ হইতে আকার প্রাপ্ত হইল জল, কাজেই জলের রূপ তেজঃসম্ভূত; তেমনি ভাবে পৃথিবীর রূপও তেজ হইতে জাত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য মন্ত্রে বিদ্যুতের যে ত্রিরূপ উন্মোচিত হইয়াছে উহা প্রত্যুত তেজেরই অভিব্যক্তি, তাই শঙ্কর আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বিদ্যুৎ-দৃষ্টান্তে শুধু তেজের অন্তর্ভাব "রূপ"ই আলোচিত হইয়াছে, পরন্তু জল ও পৃথিবীর অন্তর্ভাব "রস ও গন্ধের" আলোচনা মোটেই হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ইহাকে এইরূপে সমাধান করিলেন—তেজের ত্রিবৃৎকরণ যেরূপে প্রদর্শিত হইল ঠিক সেইরূপে যে কোন রূপসম্পন্ন পদার্থে রস ও গন্ধেরও ত্রিবৃৎকরণ সম্পন্ন হইয়াই আছে। কারণ রূপ-সম্পন্ন পদার্থকেই আশ্রয় করিয়া গন্ধ ও রস বর্ত্তিয়া থাকে—"রূপবদ্দ্রব্যে সর্ব্বস্ত দর্শনাৎ"—সুতরাং রূপসম্পন্ন জলেও পৃথিবীতে গন্ধ ও রস অন্তর্ভাব রূপে বিদ্যমান আছে। ঠিক তেমনি "তেজসি তাবদ্ রূপবতি শব্দস্পর্শয়োরপি উপলম্ভাৎ বায়ু-অন্তরীক্ষয়োস্তত্র স্পর্শ শব্দগুণবতোঃ সম্ভাবোহনুমীয়তে।" রূপসম্পন্ন পদার্থে শব্দ এবং স্পর্শেরও ত্রিবৃৎকরণ সমাধান করা হইয়াছে। কারণ যে-কোন পদার্থ আমরা দেখি না কেন, উহা যেমন রূপবিশিষ্ট হইতে বাধ্য, উহাতে তেমনি তৈত্তিরীয়ের "আত্মন আকাশ সম্ভূত, আকাশাদ্ বায়ু"—এই দুই উপাদানও থাকা অবশ্যম্ভাবী এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের অন্তর্ভাব শব্দ ও স্পর্শ থাকিবেই থাকিবে। ত্রিবৃৎকরণ এখানে পঞ্চীকরণেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ছান্দোগ্যের তিনটি মাত্র ভূত লইয়া ত্রিবৃৎকরণ আরম্ভ হইয়াছিল, তৈত্তিরীয়ের আকাশ ও বায়ু ধরিলে পঞ্চভূতই হইল। সুতরাং ত্রি পঞ্চীকরণে পরিণত হইল।

মূল কথা বলা শেষ হইল। আমরা দেখিতে পাইলাম ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয় সৃষ্টিক্রমের পুনরুক্তি করেন নাই; ছান্দোগ্য নূতন আবিষ্কারের সন্ধান দিয়াছেন। পঞ্চশরের ক্রমিক উদ্ভব এবং ইহাদের পরস্পর সম্ভাব দেখাইবার উদ্দেশে প্রথমেই তেজ হইতে সুরু করিয়াছেন, যেন রূপসম্পন্ন আকৃতির মূল-ভিত্তি জানিতে পারি—কারণ তেজ হইতেই বিশ্বসংসার আকৃতিমান হইয়াছে। আমরা এমন কোন জিনিস জানি না যাহার আকৃতি নাই—আকৃতিমৎ বস্তুতে তেজের অন্তর্ভাব রূপই আকৃতির কারণ। এ সংসারই নামরূপাত্মক, যাহার রূপ আছে তাহারই নাম আছে, এ রূপও তেজসম্ভূত। যাহার রূপ আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সকলি নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় মিশিয়া আছে।

মানুষের শরীর পঞ্চভূতাত্মক; এই পঞ্চভূতের খোলসে ব্রহ্ম "জীবেন আত্মনা" হইয়া প্রবেশ করিলেন, তখন "নবদ্বারে পুরে" দ্বারযুক্ত এই দেহরূপপুরে থাকিয়া আপন রশ্মিজাল এক এক দ্বারে কি ভাবে বিন্যস্ত করিলেন, সে কথা "অভিনায়ক অক্ষরে" পাইয়াছি। অক্ষরের রশ্মিই হইল "দেবাঃ শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ"। সুতরাং দেহের ইন্দ্রিয়গুলি আসিতেছে অক্ষর আত্মন হইতে আর দেহের উপাদান পঞ্চভূত হইতে আসিতেছে দর্শনশাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্মাত্র রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। সুতরাং মানুষের ভিতরে দুই ধারা—আত্ম-নিঃসৃত ইন্দ্রিয় সমূহ এবং দেহ-নিঃসৃত পঞ্চতন্মাত্র, মানুষকে চলিতে হয় দুই বিপরীত জিনিস একত্র মিশাইয়া—matter and soul "দধনীব সর্পিঃ"—দধির অভ্যন্তরে যেমন ঘৃত নিহিত থাকে তেমনি Hercules এর Poisoned Shirt এর ন্যায় পঞ্চভূতের শরীর ধারণ করিলেই অন্তর্নিহিত তন্মাত্রগুলির প্রভাব আসিয়া দিব্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে সংযুক্ত হয়। এই তন্মাত্রগুলির প্রভাব যদি বাড়িয়া উঠিয়া দিব্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলিকে তমসায় মলিন করিতে পারে তখনই উহারা তম আত্মিকা হইয়া অসুর হইয়া বসে। পঞ্চতন্মাত্রই কবির ভাষায় ফুলশর এবং পঞ্চতন্মাত্রের একত্রীকরণ দ্বারা যে জিনিস উৎপন্ন হয় তাহাই কাম—উহা যাহার স্বরূপ

তাহারই নাম কামদেব। তাহার আসন মনে, তাই ইনি মনোভূ মনসিজ। মানুষ জন্মায় কাম হইতে, যে বীজ হইতে যে বৃক্ষের উৎপত্তি সে বৃক্ষের ফলে আবার সেই বীজেরই পুনরাবির্ভাব হয়। যে শিশু কাম হইতে জন্মিল সেই শিশু যৌবনোদ্গমে যখন মুকুলিত হয় তখন সেই মুকুলের অঙ্কে কামফুল ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া কামদেবের অনুশাসন তাহার চিন্তনে মননে গভীরতর ভাবে ছাইয়া যায়। মনসিজ মনের সিংহাসনে বসিয়া তরুণ তরুণীর মুখে রূপরগন্ধের পানপাত্র তুলিয়া ধরে, পাত্রে পাত্রে ফেনায়িত গরল ঢালিয়া দেয়— মদিরার উৎসের ন্যায় এ গরল উপ্‌চাইয়া পড়িয়া যাইতে চায় আর অমনি তৃষাতুর তৃষাতুরা অমৃতজ্ঞানে এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া পাত্র খালি করিতে চায়। কিন্তু এ পানপাত্র কি কখনো খালি হইবার? মনসিজ অফুরন্ত রূপ-নেশায় পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া দিয়াছে, কিন্তু পানের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র আপনি ভরিয়া উঠে এমনি তাহার লীলা!

শ্রীকৃষ্ণ মনসিজের চাতুরী ব্যর্থ করিতে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার আলোচনা আমরা প্রারম্ভে করিয়াছি। কিন্তু তাহার চাতুরী ব্যর্থ করা যেমন-তেমন ব্যাপার নয়, মজ্ঝিম নিকায়ে বুদ্ধদেব কহিতেছেন, "যৌবনের কচি সুষমায় যখন আমার অঙ্গ-লাবণি ঢল ঢল করিতেছিল, কাজল কালচুলে মাথা ঢাকিয়াছিল, আমি চুল কাটিয়া ফেলিলাম চীবরধারী হইয়া গৃহস্থ-সুখে জলাঞ্জলি দিলাম।" মারকে এইরূপে নিরস্ত্র করিলেন। মদন ও মার একই জিনিস।

মনসিজ পানপাত্র মুখে তুলিয়া ধরিলে যদি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করা যায়, এবং দিব্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে দিব্য মনের দ্বারা বিধৃত করিয়া মন্মথের প্রতিকূলতা করা হয়, তবেই সাধন আরম্ভ হইল। এ সাধনের পরিণতি হইবে, তখন, যখন দিব্য মনের দ্যোতনে মনসিজের আসনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মদন দগ্ধ হইবে। আমরা জানি মদন-ভস্ম সাধন করিয়াছিলেন মহাদেব। মহাদেবের মনে মদন টিকিবে কি করিয়া, তাই ভস্ম হইয়া গেল; কিন্তু তাই বলিয়া মদন একেবারে ভস্ম হইয়া গেল না—ক্ষুদ্র দুর্ব্বলের মনে আসন লাভ করিয়া মদন সৃষ্টিতে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সাধককে মহাদেব সাজিয়া মদন ভস্ম করিতে অগ্নি বাঁশী বাজাইয়াছেন। মদন-ভস্মকে পৌরাণিক আখ্যানে পৌরাণিক ব্যাখ্যায় শুধু বুঝিতে চাহিলে ইহার চরম সত্য আমাদের জীবনে পৌঁছিবে না—ইহার সার্থকতা হইবে সত্যকার মদন-ভস্ম সাধনে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—বৃথাই খোঁজা ? বন্ধু, তোমার পেয়ালাটুকুর মাঝে
তন্বী সাকীর কটাক্ষেতে বিরল মধুর সাঁঝে—
কিছুই কি নাই ? জীবন-সুরা অশ্রু দিয়ে মেশা ?
প্রণয় মিলন—আর কিছু নয়—মুহূর্ত্তেকের নেশা ?

শিল্পী—শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[[illegible]]

বিজয়িনী

—গল্প— —শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

—এক—

জীবনে সে এসেছিল—দুদিন। চ'লে গেছে—চিরদিনের মতো। রেখে গেছে—শুধু সেই একখানি সুর। সগু-ফোটা রজনীগন্ধার বুকের গন্ধ যেমন কোরে বাতাসকে তার চারপাশে ঘিরে রাখে তেমনি কোরে সেই সুরখানি আমায় ঘিরে রেখেছে।

কোন দিন তাকে চোখে দেখিনি; দু'একবার গান-শেষে জান্‌লার প্রান্ত হোতে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে তার চকিত পলায়ন-খানি দেখেছি; এর-বেশী পূর্ণ রূপে কোন দিনও না।

কিন্তু নাই বা হোল—তার কণ্ঠের সেই অনুপম সুর-রেশ আমায় ঘিরে যে ইন্দ্রজাল সৃজন করেছে সে তো একান্ত আমারই; সেই সুর-উতল মুহূর্ত্ত-খানি আমার অমর!

তারপর, বছর দুই ধ'রে কত দেশ ঘুরে এলাম; কত রাত নিঃসঙ্গ জনহীন প্রান্তরের বুকে শুয়ে কাটালাম—উদার আকাশের নক্ষত্র-লোক থেকে সেই সুরের রেশই ভেসে এসেছে; কম্পিত তারকার প্রণয়-ইঙ্গিতের পিছনে তারই গানের কম্প্র মূর্চ্ছনা উঁকি দিয়েছে।

কোন নারীকেই একান্ত রূপে পাবার কল্পনা কোন দিনই করিনি—না পাওয়ার বেদনা-মধুর তীব্র আনন্দই জীবন বোপে উপভোগ করব—এই ছিল আমার চরম ব্রত।

পাওয়ার সার্থকতার উজ্জ্বল রূপ দুদিনেই শীর্ণ মলিন হয়ে যায়; তারপর আর জীবনের প্রসারতা বেশী দূর অগ্রসর হোতে পারে না—পঙ্গু হোয়ে পড়ে; মানবাত্মার সত্যকার রূপটি চিরদিন অদেখাই রয়ে যায়।

ঈপ্সিত-বস্তু না পাওয়ার ট্র্যাজিডির মধ্যে দিয়েই জীবনের চরম এবং সত্যকার উপলব্ধি!

জানি, সে সুর মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে আমার জীবনে কোন দিন ঝঙ্কৃত হবে না, তবু তারই প্রত্যাশায় সারা জীবন অপেক্ষা কোরে কাটিয়ে দেবার মধ্যে যে সুগোপন বিপুল সুখ—আয়ত্তাতীত প্রিয়ার জন্য জীবনব্যাপি যে মধুর বিরহ-স্বপ্ন—তাকেই উপভোগ ক'রে আমার পথচলা! বেদনানুভূতির নিবিড়তার মাঝে যে উদার বৈরাগ্য, নিষ্ফলতার নৈরাশ্যের অন্তরালে যে পরম পরিতৃপ্তি—তাকেই অবলম্বন কোরে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছি।

কত নারী পাত্র ভ'রে তাদের বিচিত্র রূপের অঞ্জলি নিয়ে আমার মন্দিরের বুভুক্ষু দেবতার পায়ে অর্চ্চনা জানিয়ে গেল—তবুও সেই সুর-খানি তো ভুলতে পারলাম না! ও যে অহর্নিশি আমার জাগ্রততন্দ্রায়, আমার ঘুমের মধ্যেও ওর রাগিণী বাজিয়ে যায়; আমার নীরস জীবনের সকল কর্ম্মে ও অবকাশে গুঞ্জন কোরে ফেরে—!

সম্বল-হীনের পরম ঐশ্বর্য্য!

—দুই—

সিলোনের সেন্ট-ম্যালবানা পাহাড়ের মাথা থেকে সূর্য্যাস্ত উপভোগ কোরে দিনকয়েক হ'ল পুরীতে এসেছি। ভারত মহাসাগরের উপর অস্ত-যাওয়া সূর্য্যের বঙ্গোপসাগরের উপর উদয়! নিঃসীম অম্বুধির মাঝে ওই অস্তোদয়ের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে মিলিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

কতবারই তো এসেছি, কিন্তু সাগর-উত্থিতা পুরীর যে এমনি-তর একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, এর পূর্ব্বে তা কোন দিন মুগ্ধ চোখে ধরা দেয় নি।

সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছি। সূর্য্য অস্ত গেছে। চারিদিকে নিবিড় পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। মৌন প্রকৃতির সান্ধ্য-তপোবনে

একটা বিরাট প্রশান্তি বিরাজ করছে। মাথার উপর নীল আকাশ তন্দ্রালু!

অদূরে বেলাভূমির উপর একটি তরুণী ব'সে আছে; দখিনা বাতাসে শাড়ির আঁচল-খানির সঙ্গে ওর চূর্ণ-কুন্তল গুলি দুলে দুলে উঠ্‌ছে: শরতের স্বচ্ছ নীলাকাশে অস্ফুট সন্ধ্যাতারার মতো ওকে দেখেই মনে হল—ও যেন যুগ-যুগান্তের বিরহিণী যক্ষ-কান্তা, সেই অপরিচিত রহস্য-পুরীর ও যেন শাশ্বত ইভা—যুগ যুগ ধ'রে এমনি ভাবেই অপেক্ষায় ব'সে আছে!

আলাপ করতে ভারী ইচ্ছে হ'ল; এগিয়ে গিয়ে বল্লাম—"আজকের সন্ধ্যাটা বাস্তবিক কি সুন্দর···!" চমকে উঠে চোখদুটি ফেরাতেই দুজনের দৃষ্টির সংঘাত হ'ল।

সহসা ওর মুখখানা পশ্চিম আকাশের মতোই টক্‌টকে লাল হোয়ে উঠ্‌ল; উঠে দাঁড়াল—যেন একটি উর্দ্ধায়িত অগ্নিশিখা! পরিপূর্ণদৃষ্টিতে একবার আমার পানে তাকিয়ে চলতে লাগল।

ওর ওই নীলাম্বুর মতো আনীল মৌন চোখের গভীর ভাষা পড়তে পারলাম না। সে কি বিরক্তি, না সংকোচ, না···?

চলার লীলায়িত ভঙ্গীটির প্রতি চেয়ে রইলাম—কবিতার ছন্দের মতো ললিত গতির প্রতিটি চরণক্ষেপে নিখিলের মূর্চ্ছিত অন্তর যেন আনন্দে কেঁপে উঠ্‌ছে!

—তিন—

দিন কয়েক পরের কথা। সূর্য্যোদয় দেখতে বেরিয়েছি। সাগর-সৈকতের অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা অসংখ্য নর-নারীর কলকণ্ঠে মুখর হোয়ে উঠেছে।

চল্‌তে চল্‌তে সহসা সম্মুখে কিছুদূরে ছাত্রজীবনের পরিচিত প্রিয় অধ্যাপকের শুভ্র মূর্ত্তি দেখতে পেলাম; তাঁর পাশে আসছেন—সে দিনের দেখা সেই অপরিচিতা মেয়েটি!

ক্লাসের মধ্যে যাঁর সুখ্যাতির পক্ষপাতিত্বে অন্য ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হোয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, আজ চার পাঁচ বছর পরে তিনি আমায় ঠিক পূর্ব্বেকার প্রিয় ছাত্রটি ব'লে চিনতে পারবেন কিনা—এই সন্দেহ মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল। বিশেষ কোরে, সঙ্গে রয়েছেন সুন্দরী তরুণী। সে অবস্থায় অতি পরিচয়ের ব্যগ্রতা দেখানোর অন্তরালে লোকে অন্য কোন নিগূঢ় অভিসন্ধির সন্ধান পায়। তাই, পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ফল হ'ল না; পরিচিত কণ্ঠের ডাক এল—"ওহে নীরেন, শোন, শোন; কেমন, ভাল আছ?"

বাধ্য হোয়ে মুখ ফিরিয়ে যুক্ত করে প্রণাম কোরে বল্লাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ···"

—"বেশ বেশ; এখন কি করছ? কদ্দিন পুরীতে এসেছ? ওঃ, কতদিন পরে তোমায় দেখলাম। চল, চল। তোমাদের দেখলেও আনন্দ হয়। চল একসঙ্গেই বেড়ান যাক। এ আমার মেয়ে; অলকা, যার কথা তোমার কাছে বলতাম—এ সেই নীরেন...।" একটা প্রশান্ত হাসির বিস্তারে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হোয়ে উঠ্‌ল।

অলকা আমার দিকে চেয়ে তার হাতদুখানি কপালে ঠেকিয়ে একটি ছোট্ট নমস্কার জানালে।

নমস্কারটা আগে এসে পৌছল, না ওর ওষ্ঠ-প্রান্তের ক্ষীণ-হাসির রেখাটুকু?

দেববাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চলতে লাগ্‌লাম।

দেখলাম তাঁর প্রৌঢ় বয়সের শিক্ষকতার গাম্ভীর্য্য আজ বৃদ্ধ বয়সে পা দিয়ে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত সারল্যে পরিণত হয়েছে।

—"তোমার সে লেখাটা আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে—ইস্‌থেটিক এক্সপিরিয়েন্স্‌ অফ শেলী! কী সুন্দরই লিখেছিল!"

তারপর, আপন খেয়ালে কত কি ব'কে চল্লেন।

নিজের প্রশংসা শোনবার সমস্ত লজ্জার অন্তরালে যে একটা নিগূঢ় মোহ লুকিয়ে থাকে—জীবনে আজ তা প্রথম অনুভব করলাম। তরুণী নারীর সম্মুখে আত্মপ্রশংসার গর্ব্বে অন্তরের সে কী উদ্দাম আনন্দ চঞ্চলতা!

বললাম—"আপনার পায়ের তলায় বসে যা কিছু শিখতে পেরেছি…"

"ও কথা বোল না, আমি কি শেখাতে পারি; নিজেই সব শিখতে পারিনি আজ পর্য্যন্ত। তোমাদের সঙ্গে নিজের জ্ঞানটাকেও একটু বাড়িয়ে নিতাম বৈ ত না। তোমার রচনার মধ্যে অন্ততঃ একটি কথাও নতুন কোরে শুন্‌লাম—সুখের মধ্যে, সার্থকতার মধ্যে জীবনের সকল অধ্যায়গুলোর পূর্ণ-বিকাশ হয় না; বেদনা—ব্যর্থতা—ট্র্যাজিডির মধ্যে দিয়েই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ; রক্ত ঝরা মর্ম্ম দিয়ে যে কবি এই চরম সত্য উপলব্ধি করেছিল, তার কলম দিয়েই জীবন-বেদের সেই পরম বাণী বার হ'য়েছিল—

"...Our sincerest laughter
With some pain is frought,
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought..."

দেববাবু নিজের ভাবে বিভোর হোয়ে এগিয়ে চল্লেন।

সেই অবসরে আমি অলকার কাছে গিয়ে বল্লাম—"সেদিনকার আচরণ যদি রূঢ় হোয়ে থাকে—তার জন্যে আমায় মাপ করতে হবে।"

উত্তরে আমার পানে তাকিয়ে অলকা শুধু একটু হাসলে।

সময় সময় মুখের কথা যে কত খাটো হোয়ে পড়ে, ওর ওই মৃদু হাসিটুকু সে খবর জানিয়ে দিয়ে গেল।

জীবনের মণি-কোঠায়-রাখা সেই সুরের রেশের পাশে ওই হাসির চিকৃমিকিটুকু ধ'রে রাখতে ইচ্ছে করে।

—চার—

কি জানি কেন, সেদিন সারা রাত চোখের পাতা নাম্‌লো না; খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বিছানার উপর উঠে ব'সে পূব-দিকের জান্‌লাটা খুলে দিলাম।

আকুল নিশীথ বাতাস যেন কার পরশ আতুর হোয়ে উঠেছে; নিজের দেহ দিয়ে তার সেই উদ্দামতা অনুভব করতে লাগ্‌লাম……

উন্মুক্ত জান্‌লা দিয়ে অসীম অম্বুধির অশ্রান্ত কল্লোল ভেসে আসছে।

শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হল, ওই বিরামহীন গর্জ্জন যেন অসীমের লক্ষ-বর্ষ বিরহী আত্মার ক্ষুব্ধ আক্ষেপ; আত্মঘাতীতের জন্য ওর ওই মর্ম্ম-গাথা বুঝি কোন দিন শেষ হবে না।

সহসা মনে হল যেন সমুদ্রের কলরোল ধীরে ধীরে ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হোয়ে শেষে নীরব হোয়ে গেল, আর সেই মূর্চ্ছিত মহাসিন্ধুর ওপার থেকে স্নিগ্ধ সঙ্গীতের একটা অতি করুণ স্বচ্ছ সুর ভেসে আসতে লাগল। তন্ময় হোয়ে শুন্‌তে লাগলাম!

কিন্তু একি! যে মধুর সুরের কোমল মূর্চ্ছনায় ক্ষুব্ধ সিন্ধু শান্ত হোয়ে পড়ল—সে যে আমারই গোপন রাজ্যের অধিবাসিনী সুর-সুন্দরী; সে আজ কেমন করে নিজেকে অসীমের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে! পরম বিস্ময়ে জান্‌লার ধারে উঠে এসে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম……

ক্রমে ভোর হোয়ে এল; পূবের উদয়াচলে রঙের খেলা আরম্ভ হবার সূচনা দেখা গেল। পরিপূর্ণ অন্তরে বিরাট অসীমের সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র সত্ত্বার একটা পরম ঐক্য অনুভব কোরে ধন্য হলাম। মনে মনে ওকে একটা প্রণতি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হেঁটে চলেছি। কখন ভোর হোয়ে গেছে খেয়াল নেই। সহসা পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ফিরে দেখি—অলকা। আজ যেন ওকে নতুন কোরে দেখলাম—

নবীন সবিতার মুগ্ধ রশ্মিচ্ছটা ওর পেলব তনুলতার উপর ছড়িয়ে পড়েছে; চোখদুটি স্বপ্নাতুর—তখনো সেখানে গাঢ় তন্দ্রার ঘোর লেগে রয়েছে; চুলের মিষ্টি বাসি গন্ধে আশ-পাশের লুব্ধ বাতাস আকুল হোয়ে বার বার তাদের দুলিয়ে দিচ্ছে—বিশ্ব-শিল্পীর ও যেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-কল্পনা!

—"বাবাঃ, কি বিভোর হোয়েই হেঁটে চলেছেন! কত বার ডাকছি খেয়ালই নেই। ঢের ঢের কবি দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো বেহুঁস কবি জন্মে দেখিনি।"

হেসে বল্লাম—"বাস্তবিকই আপনার ডাক শুন্‌তে না পাওয়া নেহাৎ অকবির কাজ; কিন্তু যদিও আমি কবি নই আমায় মাপ করবেন।"

অলকা আমার পাশে এসে চলতে লাগল।

একটা প্রসঙ্গ থেকে নিমেষে অন্য প্রসঙ্গে চ'লে যাচ্ছি। সকল-কিছুতেই সহজ জ্ঞানের কি সুন্দর পরিচয়ই ও দিয়ে যাচ্ছে!

কথায় কথায় বল্লে—"কালকের রাত্রের কথা বল্‌ছেন, বাস্তবিক কাল রাতটা কী সুন্দরই ছিল; সারা রাত মোটে ঘুম হয় নি; এমন কবিত্ব পেল—মনে করুন, চার পাঁচখানা গানই গেয়ে ফেল্লাম।"

মনে মনে চমকিত হোয়ে উঠলাম; বল্লাম—"তার একখানা নমুনা এখন মেলে না?"

ব'লেই মনে হল, কথাটা না বল্‌লেই ছিল ভাল; কারুর কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত কোন বস্তু তো চেয়ে নিইনি; না-চাইতে পাওয়াটাই তো সত্যিকারের পাওয়া; চেয়ে নেওয়া বস্তুর কোন মূল্য আছে নাকি?

অলকা মাথাটা দুলিয়ে উত্তর দিলে—"তা কখনো মেলে? কবিত্ব যে ফরমাস মতো আসে না—তা কি আর আপনি জানেন না! আপনাকে যদি এখুনি একটা কবিতা লিখে ফেলতে বলি—পারেন?"

ওকে একটু বিব্রত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না; ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লাম, "যে কোনদিনই ওকাজ করেনি—এমন অবস্থায় সেও পারে।"

মুখটা লাল কোরে অলকা বল্লে, "আপনার কম্‌প্লিমেন্টের জন্যে ধন্যবাদ; কিন্তু এখন আমি···"

"বেশতো, আর একদিন শুনবো'খন; গান শোনা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

—পাঁচ—

দু পাঁচ দিনের বেণী সাগর-তট-চুম্বী পুরী তার অতুল সৌন্দর্য্য দিয়ে আমাকে বশীভূত কোরে রাখতে পারলে না; সহসা ভিতরকার চির-দুরন্ত যাযাবর অস্থির হোয়ে উঠ্‌ল। তার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা কোনদিনই রোধ ক'রে রাখতে পারিনি, আজও পারব না। কবে তার পথ চলার আকুল পিপাসা নিঃশেষে মিটে যাবে—কে জানে? অন্তরের মাঝে তার রুদ্ধ আহ্বান শুন্‌তে পেতে লাগলাম—

ডাক দিয়েছে অসীম তোরে আর বদ্ধ ঘরে নয়···

ঠিক করলাম—দিন দুই-এর ভিতরেই বেরিয়ে পড়ব।

* * *

চ'লে যাবার কথাটা শুনে অবধি আজ দুদিন ধ'রে অলকার চোখে মুখে একটা অপরিসীম ব্যাকুলতার ভাব লক্ষ্য করছি—

কিসের কথা যেন ও আমাকে বলতে চাইছে, পারছে না। তবুও বিদ্রোহী ঠোঁটের কোণ বার বার উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ছে।

বিদায় বেলায় শিপ্রা, রেবা, নীরা যে অশ্রু আমার পায়ে উজাড় কোরে দিয়ে আমার যাত্রাপথ পিছল কোরে দিয়েছিল—অলকাও হয়ত তাদের সঙ্গে নিজের দু'ফোঁটাও মিশিয়ে দিতে চায়! দিক; বিশেষ কিছু যাবে আসবে না; স্মৃতি-মুখর নিরালা উপভোগ করবার সময় ওদের কথা আমায় আত্ম-প্রসাদের তৃপ্তি এনে দেবে মাত্র;—সীমাহীন কাজের মধ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য বিপদের মুখে বুকের মধ্যে দুর্জ্জয় সাহস এনে দেবে, অফুরন্ত প্রেরণা যোগাবে—আমার সেই ক্ষণিকের-শোনা সুর!

সেই কথাটাই সেদিন অলকাকে বললাম। নির্জ্জন বালুচরে গোধূলির আরক্ত সন্ধ্যায় দুজনে বসেছিলাম; আমার অতীতের বিষয়ে বারবার ওর কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তরে, একটির পর একটি কোরে ছিন্ন সূত্রগুলি গেঁথে দিয়ে বল্লাম, "যে কটা দিনের অস্তিত্বকে অন্য সকল গুলোর চেয়ে মূল্যবান মনে করি, তাদের ছবিটাই বড় কোরে আপনার সামনে ধরলাম। মেসের দুঃসহ জীবনটা অমন কোরে হেলায় কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম, শুধু সেই সুরের

প্রেরণায় ; জীবন-ব্যাপী নিরানন্দের নিষ্করুণ দারিদ্র্য প্রতি সকাল সন্ধ্যায় সেই অনুপম সুর-ধারার পরমৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হোয়ে উঠ্‌ত ; জীবনে একমাত্র তাকেই ভালবেসেছি !"

কথার ফাঁকে মাঝে মাঝে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম ; কিন্তু ঈর্ষার দাহর পরিবর্ত্তে সেখানে কিসের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির আভাষ—বুঝতে পারলাম না !

কথা শেষ হ'তেই অলকা হেসে উঠল—"কি সেন্টি-মেন্টাল আপনারা ! কোথাকার কে ; দেখা নেই শোনা নেই ; খালি গান শুনেই......" ওর উচ্ছসিত হাসির রেশটুকু অসীমের বুকে লীন হোয়ে গেল ।

খানিক পরেই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, আপনার সেই অদেখা সঙ্গীত-রূপিণীর কোন্ গানখানা আপনার সকলের চেয়ে ভাল লাগত ?"

নারীর কৌতূহল কখন্ কোন্ ধারা বেয়ে চলে তার ঠিক-ঠিকানা পাইনে এখনো ; বল্লাম—তা শুনে আপনার কি লাভ ?"

—"এমনি শুনবো ; বলুন না..." কণ্ঠস্বরে সে কী আকস্মিক আকুলতা !

বল্লাম, "গানের কথাগুলো তো সব সময়ে শুন্‌তে পেতাম না ; তার কোমল কণ্ঠের সেই মধুর সুরের রেশই আমার অন্তর-বীণায় ঝঙ্কৃত হোতে থাকত ; কেবল একখানা গান, যেখানা সে প্রায়ই গাইত, তারই একটা ভাঙা-চোরা লাইন মনে আছে—

...তোমার চরণ-ধ্বনি বেজেছে হৃদয়ে মোর
আকুল করেছে মন প্রাণ......

—চলুন, চলুন, রাত আটটা বাজে ; সারা রাত ধ'রে এখানে ব'সে আপনার কবিত্ব শুনবো নাকি !" সহসা ওর অকারণ কলহাস্যে জন-বিরল সাগরসৈকত মুখরিত হোয়ে উঠ্‌ল...!

—ছয়—

তার পরের দিন। দেখা কোরে বল্লাম, "মানুষের সুখ-দুঃখের অতীত যে কতকগুলো নিবিড় মুহূর্ত্ত থাকে—আপনাদের সঙ্গে কাটান দিনগুলো আমার তাই ; একটা দিন জীবনে যে আনন্দ পেয়েছি, তার স্মৃতি চিরদিনই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করব। আর, আমার আচরণে যদি কোন দিন কোন অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়ে থাকে, যাবার বেলায় তার জন্যে—"

অলকা মাঝখানেই ব'লে উঠ্‌ল—"কবে যাবেন ?"

—"কালই।"

"কালই !" সহসা ও নির্ব্বাক হোয়ে গেল ।

হয়ত কিছু বলবার চেষ্টা করছে। বিদায়-বেলায় ওর মুখ থেকে কিছু শোনবার লোভে অন্তর উৎসুক হোয়ে উঠ্‌ল ; বললাম, "কিছু বলবেন ?"

—"না, হ্যাঁ ; এই আজকে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়িতে আসবেন ? বিশেষ কিছু না, এমনি ; একটু চা-টা খাওয়া যাবে। আসবেন তো ?"

বললাম—"যাব বৈকি ; নিশ্চয় যাব।"

যাবার পূর্ব্বে, আমায় ক্ষণিকের তৃপ্তি দিয়ে, তারই স্মৃকুতিটুও আমায় পাথেয় স্বরূপ উপহার দিতে চায়। বেশ ত' !

* * *

সন্ধ্যার সময় অলকার বাড়ি গেলাম। অলকার সঙ্গে দেখা হ'ল না ; দেববাবুর সঙ্গে ব'সে কথা কইতে লাগলাম।

বিচিত্র ! এমনি খেয়ালী ওরা ! সকালে অত আকুতি-পূর্ণ অনুরোধ, সন্ধ্যায় আর দেখাই নেই ! যখন স্বেচ্ছায় ও আজ আসে নি তখন দেববাবুর কাছ থেকে ওর সন্ধান জান্‌তেও ইচ্ছে হ'ল না। দেববাবুর সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা চলতে লাগলো।

সহসা চকিত হোয়ে উঠ্‌লাম ! যে সুর এতদিন আমার নিভৃত অন্তরে গুঞ্জরণ কোরে ফিরছিল, তারই উদাত্ত রেশ দক্ষিণের জান্‌লা দিয়ে ভেসে এসে আমার অন্তর স্পন্দিত কোরে তুল্‌ল ! সেই কণ্ঠ, সেই সুর, সেই গান ! আশ্চর্য্য !!

বোধ করি আমার তন্ময়তা দেখে দেববাবু বিস্মিত হোয়ে গিছলেন; বললেন, "অলকা গান গাইছে; শরীর খারাপ ব'লে নীচে এলো না।"

এমন অভাবনীয় পরমাশ্চর্য্য মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনে বেশী আসে না; তড়িত-রেখার মতো অসংখ্য অনুভূতির বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হোয়ে তাদের উৎস থেকে তখন একটা কথাই উৎসারিত হোতে লাগলো বারবার—অলকা, অলকা, অলকা! ওই তিনটে আখরের ত্রিধারার ভিতর বিশ্বের অমৃত-মধু যেন এত কাল ধ'রে সঞ্চিত হোয়ে উঠেছিল; আজ তার শত-ধারায় আমার সমস্ত সত্তা আপ্লুত হোয়ে গেল।

অন্তরায় সুরের হিল্লোল তখন উত্তাল হোয়ে চলেছে—

'তোমার চরণ ধ্বনি বেজেছে পরাণে মোর
আকুল করেছে মন প্রাণ!'

আজ ওর সপ্তস্বরার ভিতর পরিপূর্ণতার একটা নিবিড় সুর শুনতে পেলাম—দু'বছর আগেকার অসম্পূর্ণতা আজ ভরাট হ'য়ে গেছে,—ও যেন আজ সফল সার্থক!

গান কখন থেমে গেছে জানিনা; ফিরে দেখি, দেব বাবু আমাকে একলা রেখে কখন প্রস্থান করেছেন; নিঃসঙ্গতা পূর্ব্বে কখনো এতখানি নিবিড়তা বহন ক'রে আনেনি।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই দেখি, ও ধারের পরদা ঠেলে অলকা ঘরে ঢুকছে। ওর লাজারুণ মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, ওমুখ যেন যুগ-যুগান্তর ধ'রে চেনা; নিখিল বিশ্বের নারীর প্রতীক রূপে অমর কালের মানসী আজ যেন মূর্ত্তিমতী হোয়ে নেমে এল।

ওর সজল-স্নিগ্ধ দুটি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টির মৌন বাণী শব্দহীন সুরে আমার অন্তর ছেয়ে দিল—

'তোমার চরণ ধ্বনি বেজেছে পরাণে মোর···!'

মুখ দিয়ে শুধু বার হ'ল—"তুমি!"

কথাটা নিজের কানেই অপরূপ হ'য়ে বাজ্‌ল; ওই কথাটাই বলবার জন্যে বুঝি সারা প্রাণ এতদিন উন্মুখ হ'য়ে ছিল।

মনে করেছিলাম—বাস্তবের সংঘাতে অন্তর-বাসী গোপন আদর্শের অমল রূপ বুঝি ম্লান হ'য়ে পড়বে; সারা জীবনে এইটেই ছিল নিদারুণ শঙ্কা। গর্ব্বমিশ্রিত সে ভয় আজ লজ্জায় পরিণত হ'ল।

অলকা আমায় প্রণাম করবার জন্য নীচু হ'তেই ওর হাত দু'খানি ধ'রে নিয়ে বললাম, "না, না, তুমি আমার অনেক ওপরে অলকা! তোমার ওই বিশ্ব-জয়ী শক্তি নিয়ে তোমার মাথা মানুষের পায়ে লুটিয়ে দিও না; তুমি আমায় জয় করেছ!"

নিজের স্পর্শাতুর পেলব করতল আমার দুই তপ্ত হাতের ভিতর ছেড়ে দিয়ে অলকা চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইল—দু'জনের মুখের কথা তখন নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে অন্তরের ভাষা আত্ম-প্রকাশের জন্য উন্মুখ হোয়ে উঠেছে!

ভাষা-হারা ভাব-মুখর পরম মুহূর্ত্তখানিকে মনে মনে দুজনেই প্রণাম করলাম।

সহসা দরজার বাইরে দেববাবুর আসার সাড়া পেয়ে অলকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্র পদে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

দেববাবু ঘরে ঢুকলেন। ওঁর মুখের প্রদীপ্ত প্রসন্নতা আমার অন্তরের সকল সংশয় নিমেষে দূর ক'রে দিলে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

আশৈশব দানের মাহাত্ম্যের কথাই শুনিয়া আসিতেছি। দাতা যিনি, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শত বৎসর জীবন্ত থাকুন। দান করিলে স্বর্গে গতি হয়। যে সত্যকার দাতা সে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতে বসে না। সূর্য্যদেব আঁস্তাকুড়েও তাঁহার কিরণ দান করেন, আবার সেই কিরণেই ফুল্ল নলিনী ফুটিয়া টলমল্ করে। দাতা চির-ধন্য!

ধনীর ধনের শ্রেষ্ঠ গৌরবই দানে। যে নিজের অসামান্য চেষ্টায় ধনী হইয়া উঠে তাহার শত দোষ-ত্রুটি মানুষ ক্ষমা

উপকৃত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত এণ্ড্রু কার্ণেগী

করে। এক রজত চন্দ্রেই ঘন অন্ধকার দূর করে। ধনীর হাতে টাকা না থাকিলে হয়ত একদিন তাজের পরিকল্পনাও সম্ভব হইত না।

তবুও সেদিন মনে বিষম খট্‌কা লাগিল, দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগীর একটা রূঢ় কৃপণতার গল্প শুনিয়া। কার্ণেগী! যিনি মুক্ত হস্তে সৎকর্ম্মে দান করিয়া নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছিলেন, তিনি? বুকার ওয়াসিংটনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন? নীগ্রোবীর বুকারকে?

অনেকের হয়তো জানা আছে, তবুও বলি গল্পটি!

নীগ্রো জাতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য বুকার কার্ণেগীকে ধরিয়াছিলেন। উত্তরে শুনিলেন, না; রূঢ়, কর্কশ, ক্ষিপ্র কিন্তু মর্ম্মভেদী, না!

বুকারের হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল, তাইতো, এত বড় মহাপুরুষের মনে জাতি-বিদ্বেষ! কিন্তু একথা কিছুতেই বুকারের বিশ্বাস হয় না। তবে? আবার চেষ্টা, আবার চেষ্টা! বুকারও ছাড়িবার পাত্র নহেন্।

একবার সামান্য যৎকিঞ্চিৎ, কিছু আসিল। বুকারের হৃদয় নাচিয়া উঠে; টাকা পাইয়া নয়; মহাপুরুষকে মহৎ করিয়া মনে করিবার এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ফাঁকটি পাইয়া!

বুকার সেই অর্থের কাণা কড়িটির পর্য্যন্ত হিসাব রাখিয়া একটি রিপোর্ট দেখাইলেন যে, অর্থের কোন অসদ্ব্যয় তো হয়ই নাই, পরন্তু ঐ অর্থে প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উপকার হইয়াছে।

এবার কার্ণেগী দিলেন, "ছাপ্পর ফুঁড়িয়া", আশাতীত কল্পনাতীত! মানুষ সহজে তেমন দেয় না, দিতে পারে না!

গল্পটি ছোট, কিন্তু বুকটি ফুলিয়া উঠে - ইহার ভিতরকার নিহিত সুতা সুবিচারের তীক্ষ্ণ স্পর্শে; মনে হয় ন্যায় বিচারে কার্ণেগী বোধ করি সূর্য্যের চেয়ে বড়!

সত্যই কি দানে বিচার থাকিবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর সমাজের অবস্থা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। নিশ্চেষ্ট মানুষের হাতে অধিক অর্থের সমাগম হইলে সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ ঘটিয়া বসে। টাকা যে অর্জ্জন করিয়া বড় হয় সে টাকার মর্ম্ম বুঝে; কিন্তু যাহার হাতে জমা টাকা ভাগ্যবশে কিম্বা অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে সে হয় অত্যন্ত কৃপণ হয়, নচেৎ বহুবিধ গর্হিত উপায়ে ঐ অর্থ নিঃশেষে ব্যয় করিয়া সমাজকে বিধ্বস্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। উত্তরাধিকার সূত্রে টাকা পাওয়ার

এই একটি পরম দোষ। বহু ধনীর পুত্রকে নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করিয়া পশুরও অধম হইয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃপণ ধনীর অর্থও বেশী দিন দাঁড়ায় না।

নিশ্চেষ্টতা, নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ! চেষ্টারই বলে কার্ণেগীর মত অতি হীন অবস্থা হইতে মানুষ ধনকুবের হইতে পারে। আবার চেষ্টার অভাবে অসামান্য সম্পন্ন অবস্থা হইতে মানুষকে কাঙ্গাল হইতে দেখা যায়।

কার্ণেগী মানুষের নিশ্চেষ্টতাকে কিছুতেই পছন্দ করিতেন না; তাই যে পর্য্যন্ত না বুকারের ঐকান্তিক চেষ্টার পরিচয় পাইয়াছিলেন—সেই পর্য্যন্ত এই দানবীরের মুষ্টি বজ্রের মতই কঠিন ছিল। কিন্তু যখন সত্য পরিচয় মিলিল, তখন সেই হস্ত গঙ্গার মত অবাধ—অব্যাহত হইয়া গেল।

সূর্য্যের কিরণের সহিত অর্থের তুলনার মধ্যে একটা বেয়াড়া অসঙ্গতি কোথায় যেন থাকিয়া যায়। দাতার স্তব-গান, ভিক্ষুক-হৃদয়ের কাব্যপ্রচেষ্টা—তাহার মধ্যে সত্য নিজেকে ক্ষুণ্ণ করিয়া মিথ্যার মোহন ছন্দে যে অভিনয় করে তাহাতে দাতার হৃদয় স্পর্শ করা স্বাভাবিক; কিন্তু সত্যান্বেষীর মন কিছুতেই তুষ্টি লাভ করে না।

কার্ণেগীর শেষ জীবনটি একটা প্রকাণ্ড দান-যজ্ঞ। তাহার কথা কে না জানে? কিন্তু এই রিক্ত-নিঃসহায়, একদিন-কপর্দ্দকহীন মানুষটি কোথা হইতে এত অর্থ আনিল? কার্ণেগীর দৈন্যের সহিত যুদ্ধের কথা পৃথিবীর মহা-যুদ্ধের কথার চেয়ে হয়তো অধিক মূল্যবান। সেই কথাই বলা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য; দানের ব্যাপারটা খাটো করিয়া বলিলে বোধ করি তত ক্ষতি হইবে না।

দরিদ্রের সন্তান, নিজের পুরুষকার বলে অপরিমিত ধনী হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা আমরা জানি, বিশ্বাস করি; কিন্তু সে কেমন করিয়া? কোন্ বন্ধুর, কণ্টকের পথে, জীবনের প্রভাতে, এই মানব শিশুটি পা ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কেমন করিয়া সেই চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল? দারিদ্র্যের অরণ্যে কোথায় তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত দেখা হইয়াছিল—এই, কেমন করিয়া? কবে? কোথায়? এই প্রশ্নের শেষ নাই মানুষের মনে।

মানুষের জীবনের বাহিরের সত্যগুলি যেন আমাদের সব জানা হইয়া গেছে; কিন্তু তাহার অন্তর-নিহিত সত্যগুলি, যাহা পরম নির্জ্জনে গোপনে অসাধ্য সাধনের মধ্যে মানুষের কপালে সাফল্যের টীকা আঁকিয়া দেয়, যাহা জানিলে মানুষের জীবনের নিগূঢ় সত্যের সন্ধান মেলে, যাহা জানিলে এই ভাগ্য-এবং দৈব ভূত-এবং ভগবান-পীড়িত দুঃখের জীবনেও পরম আশার কথাই জাগিয়া উঠে—যাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের সত্য স্বরূপের হদিস মেলে—তাহারই জন্য আমাদের মন নিত্য লোলুপ।

কার্ণেগীর ধন-সম্পদের ইয়ত্তার কথা, ছোট কথা। কার্ণেগীর মনুষ্যত্ব-সম্পদের ইতিকথাই—তাঁহার জীবনের মূল কথা! তিনি আশৈশব কেমন ছিলেন তাহা জানিলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে।

মানুষের সত্য স্বরূপ জানিবার জন্য মনের যে ব্যাকুলতা আছে —তাহা পরম কামনার জিনিষ- তাহারই গর্ভে মনুষ্যত্বের বীজ প্রাণবান হইয়া উঠিবার অধৈর্য্যে উদ্দাম এবং ব্যথাতুর!

পরিণত বয়সে কার্ণেগী মানুষটি কেমন ছিলেন, জানিতে পারিলে তাঁহার সত্যস্বরূপটি জানিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হইতে পারে মনে করিয়া এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি:—

বর্ত্তমান সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তখন রাজ সিংহাসনে বসেন নাই। কার্ণেগীর অর্থ তখন দেশ বিদেশে পাঠাগার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হইয়া দেশর অজ্ঞান-অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য অপূর্ব্ব গৌরবে ভাস্বর। যুবরাজ আসিয়াছিলেন, একটি গ্রন্থাগার খোলার উৎসবে ষ্টেপনিতে নেতৃত্ব করিতে। ভূতপূর্ব্ব নৌ-বিভাগের সেনাপতির সহজ সতর্কতা ত্যাগ করিয়া যুবরাজ কার্ণেগীকে একটা অপ্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত করিয়া ফেলিলেন; আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া যুবরাজ বলিলেন--মানুষ এখন ক্রমেই বুঝতে পারছে, রাজতন্ত্রের কত বড় সুবিধা……এতে নির্ব্বাচনের ফ্যাসাদ না থাকায় মানুষ নিশ্চিন্ত শান্তিতে জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারে; নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে, এর পর কে আবার রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করে, এই যে অনিশ্চয়ের দুর্ভাবনা, এতে তা মোটেই নেই……

"জয়যুক্ত প্রজাতন্ত্রে"র (Triumphant Democracy) গ্রন্থকার, বৃদ্ধ কার্ণেগী ঈষৎ হাস্য করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন, স্যর্, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে জর্জ্জ ওয়াসিংটন থেকেআরম্ভ ক'রে এব্রাহাম লিংকলন্ পর্য্যন্ত যাঁরা ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের ছবিগুলি দেখেন, আর ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজাদের ছবিগুলিও দেখেন তো আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে আমেরিকার লোকদের এই নির্ব্বাচন পদ্ধতির জন্য তিলমাত্র দুঃখ করার কোন কারণই নেই!

যুবরাজের মন্তব্যের উত্তর এমন দৃঢ়তা অথচ গম্ভীর বিনয়ের সহিত দিবার মত লোক এ জগতে হয়ত অল্পই আছে। বংশগত রাজতন্ত্রের প্রাধান্যের অবতারণা, নিজের উত্তর-অধিকার মনে রাখিয়াও যুবরাজের পক্ষে শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে, অশোভন হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই বলিয়াছিলেন, এবং কার্ণেগীর উত্তরটি সকলের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা জাগাইয়াছিল।

১৮৩৫ সালের ২৫শে নভেম্বর কার্ণেগী জন্মগ্রহণ করেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন, তাহার উপর বংশের মর্য্যাদার ভূত তাঁহাদের স্কন্ধে ছিল। দরিদ্রের দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টার মধ্যে হয় তো উপহাস করিবার অনেক কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার একটি জিনিষ সকল মানুষের শ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত। দরিদ্র যখন আত্ম-সম্মান দূর করিয়া ভিক্ষুকের ভূমিতে অবতীর্ণ হয় তখন বোধ করি সর্ব্বংসহা বসুমতীও লজ্জায় শিহরিয়া উঠেন। মানুষের মধ্যে একটি বোধ থাকে যে, সে ছোট নয়, হেয় নয়, পরের অপমান ও লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধেই তাহার স্থান; এই যে আত্ম-সম্মান জ্ঞান ইহা জীবন-যাত্রার পথে, জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার প্রয়াসের ভিত্তি স্বরূপ। ইহা যাহার নাই, সেই এই পৃথিবীতে সত্যই দীন, সত্যই মানুষের কৃপার পাত্র!

বালক এণ্ড্রু পিতামাতার নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে বোধ হয় ইহাই যাহা কিছু পাইয়াছিলেন। আত্ম-সম্মানের দৃঢ় ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে উপার্জ্জন করিবার অদম্য ইচ্ছা গড়িয়া উঠিতেছিল।

পিতা হাতের তাঁত বুনিতেন; কিন্তু সেদিন যন্ত্র-যুগ সমাগত তাই কল কব্জার কাছে হাত পরাভব স্বীকার করিয়াছে; পথে পথে কাজের জন্য ঘুরিয়া শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া ঘরে ফিরিতেন। মার ছোট দোকানের আয়ে সকলের পেট চলা একেবারে অসম্ভব। দিনের পর দিন এই নিদারুণ ব্যাপার বালকের চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া চলিয়াছে!

কার্ণেগীর জীবনী-লেখক বলিয়াছেন যে, এই সময়েই তাঁহার মনে বিপুল ধন উপার্জ্জনের প্রবল ইচ্ছা জন্মলাভ করে। হয়ত এ কথা সত্য; কিন্তু কার্ণেগী আর একটি কথা বলিয়াছেন, সেইটিই বোধ হয় স্বাভাবিক এবং অধিকতর সম্ভব।

এই সময়ে তাঁহার মনে যে-কোন উপায়ে পরিবারের যে-কোন কাজে লাগিয়া তাহার ভারটা লঘু করিবার তীব্র ইচ্ছাই জাগিয়া উঠে! তুচ্ছ কয়েকটি টাকা, তিনি যেদিন প্রথম তাঁহার মাতার হাতে আনিয়া দিতে পারিয়াছিলেন সেদিনের আনন্দের কথা তিনি আজীবন মনে রাখিয়াছিলেন। পরে, কোটি কোটি মুদ্রা ঘরে আনিয়াও সেদিনের আত্ম-প্রসাদ আর লাভ করিতে পারেন নাই। সে আনন্দ, সে তৃপ্তির তুলনা হয় না—এই কথাই তিনি বার বার বলিয়াছিলেন।

দুঃখী পরিবারে বালকেরও দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার সাধ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর একটা দুশ্চিন্তাই যেন লাগিয়া আছে, কবে সে আর সকলের মত বড় হইয়া কার্য্যক্ষম হইবে, কবে সে সংসারের কাজে লাগিবে!

বয়স তের বৎসর পুরিবার পূর্ব্বেই কার্ণেগী সংসারের জন্য রীতিমত কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন; তাহার পূর্ব্বে পথে পথে কবিতার আবৃত্তি করিয়াও কিছু কিছু অর্থাগম হইত। কার্ণেগী দৈনিক পাঁচআনা হারের মজুরি আরম্ভ করিয়া চুয়ান্ন বৎসর ধরিয়া উপায় করেন; এবং ১৯০১ সালে উপার্জ্জন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন্। অবসর লইবার কালে তাঁহার সম্পত্তির মূল্য মোট একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা।

পাঁচ আনা দরের সেদিনের বাবন্-বালক! মানুষের অসাধ্য কিছু কি আছে, এই পৃথিবীতে?

টাকার হিসাবটা আর একটু বিশদ করিয়া বলা যাক্ এইখানেই। মোট দেড়শত কোটি হইতে স্কুল, লাইব্রেরী, পাঠাগার, পেন্‌সন-ফণ্ড ইত্যাদিতে খরচ হয় সাড়ে বিরাশী কোটি টাকা আর মৃত্যুর পর হাতে থাকে মাত্র সাড়ে সাত কোটি। বাকি ষাট কোটির হিসাব নির্ণয় করা একটু কঠিন, বোধ করি গৃহ-নির্ম্মাণ, পার্ক খরিদ ইত্যাদি কাজে লাগিয়া যায়!

কার্ণেগীর অর্থগৃধ্নুতা ছিল না। এটি, মানুষের জীবনে একটা অত্যন্ত সাধারণ দুর্ব্বলতা। লোকে অভাবে পড়িয়াই উপার্জ্জন করিতে চাহে; কারণ টাকা হইলেই তো সবই বুকের জীর্ণ হাড় ক'খানি চূর্ণ হইয়া যায়! এইরূপ কৃপণ কোন দেশেই বিরল নহে!

১৯০১ সালে অর্থাৎ ছেষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে ধীরে ধীরে একটি কথা কার্ণেগীর মনকে ক্রমেই অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। কথাগুলি তাঁহার যেমন করিয়া মনের মধ্যে আসিয়াছিল—সেটি তাঁহার নিজের কথায় বলি:—

মানুষের জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সর্ব্ব প্রথমে নিজেকে স্বাধীন এবং সক্ষম করিয়া তোলা। কিন্তু এইখানেই তাহার জীবনের সকল কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। চতুর্দ্দিকের দরিদ্র-প্রতিবেশীদের জন্য কিছু করিয়া যাওয়াও তাহার কর্ত্তব্য... পৃথিবীকে উন্নতির পথে কিছু অগ্রসর করিয়া দেওয়ার আদর্শটিও জীবনের একটি খুবই বড় উদ্দেশ্য।......কোটিপতি অবশেষে তাহার অর্থেরই দাস হইয়া পড়ে। সে টাকা পায় না; টাকাই তাহাকে পাইয়া বসে!

ডন্‌ফার্মলিন কটেজ—এই সামান্য গৃহখানিতে কার্ণেগীর জন্ম হইয়াছিল

জীবনের এই গুরুতর সন্ধিক্ষণে কার্ণেগী অর্থোপার্জ্জনের বেশাতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিলেন। আজীবন চেষ্টার ফলে অর্থাগমের ধারা যখন সহস্রমুখী হইয়া অজস্র প্রবাহে বহিতেছে, তখন তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য যে কতখানি মনের জোরের দরকার তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। এইরূপ নিরোধের দৃষ্টান্ত জগতে কি একান্ত বিরল নহে?

হয়। যার টাকার অভাব নাই সে সুখ চাহিলেই সুখ পাইবে। কিন্তু টাকা দিয়া সুখ খরিদ করিতে হয়, নিজস্ব কোন রস-কষ নাই! টাকা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হায়! কত মানুষ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া টাকার এমনি মোহে পড়ে যে, একটি পয়সা খরচ করিতে তাহার যেন

কার্ণেগীর শৈশবের যুগে স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোক একটি সুখ-স্বপ্নে ক্রমেই বিভোর হইয়া উঠিতেছিল। তখনই আমেরিকায় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে এক দেশ যেখানে পা দিলেই মানুষের সকল দুঃখের নিমেষে অবসান এই স্বপ্ন দেখিলে মানুষের মন আর ঘরের কোণে অসাড়-পঙ্গু

হইয়া থাকিতে চাহে না! পা দু'টি চঞ্চল হইয়া উঠে।

আত্মীয় স্বজন আগে চলিয়া গেছে;—কেবল সমুদ্র যাত্রার অর্থ নাই এই দরিদ্র পরিবারের, নহিলে কিসের বাধা, কে মানে সে বাধাকে?

মানুষের দুঃখের সমুদ্রে ডুবিয়া পার হইবার কড়িও জোটে! ঋণ করিয়া কোন রকমে ওপারে পঁহুছিবার টাকা লইয়া একদিন কার্ণেগী-রাও যাত্রা করিলেন। মনে আশা, সে ঋণ শোধ করিতেও দেরি নাই; আর দৈন্য, অভাব? সে আর কতদিন!

হায়! আশা মানুষের! সেই সুখ স্বপ্নের দেশে গিয়াও যে তিমির সেই তিমিরই রহিয়া গেল। পিতার তাঁতের গতি তেমনি মন্থর, মাতার দোকানটি প্রায় অচল। এদিকে মাসে মাসে পঁচিশ ডলার নহিলে সংসার কিছুতেই চলে না। ববিনে কাজ করিয়া দিনে পাঁচ আনা উপায় করিয়া বালক দুশ্চিন্তায় রাত্রে চক্ষের পলক ফেলিতে পারে না!

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি! সেই শক্তি ধীরে ধীরে বালকের মধ্যে সঞ্চিত হইতে লাগিল। সাধারণ সংসারের একটি তের চৌদ্দ বছরের ছেলে কি খবর রাখে সে সংসারের? সময়ে খাইতে না পাইলে সে রাগে অন্ধ হয়; সন্ধ্যা হইতে না হইতে বই মুখে করিয়া হয়ত ঢুলিতে থাকে; কোথা দিয়া রাত্রি কাবার হয়, কে রাখে তাহার খোঁজ-খবর?

কাজ পাইবার চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিয়া, অবশেষে একটি কাজ জুটিল। মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টার কাছে বোধ করি বিশ্ব-শক্তি অবনত হইয়া বলে, কে তোমাকে রোধ করে, হে মানুষের অদম্য প্রচেষ্টা?

'ভবিষ্যতের সৌভাগ্যের বীজ এই অতি সামান্য কাজটির মধ্যে নিহিত ছিল,' এই কথা মনে করার অভ্যাস আমাদের মনে সংস্কারের মত দৃঢ়মূল; কিন্তু যাঁহারা বিন্দু হইতে নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মত বড় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, দৈব শুধু কাপুরুষতার আবরণ মাত্র—আত্মহীন মনের অলস ছলনা। কার্ণেগীর সম্বন্ধে একথা পরম সত্য। সৌভাগ্যকে তিনি নিজের দুই অক্লান্ত হাত দিয়া গড়িয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যকে তিনি দুই পায়ে দলিয়া গিয়াছেন!

টেলিগ্রাম বিলি করার ছোট্ট কাজ! কিন্তু কার্ণেগী জীবনে একদিনের জন্যও কোন কাজকে ছোট মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন নাই; তাহাতে বিন্দুমাত্র আলস্য, কি অবহেলা করিবার মানুষই তিনি ছিলেন না।

এই সামান্য কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার কি অসম্ভব চেষ্টাই না তাঁহার ভিতর জাগ্রত হইয়া উঠিল। তখনকার দিনে যে তারটি পাইবে মাত্র তাহার নামই খামের উপর লেখা থাকিত, ঠিকানার কোন বাহুল্যই নাই। অতএব যে বিলি করিবে তাহারই উপর ঠিকানার দায়িত্ব। কার্ণেগী তাই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন; যদি কোনক্রমে তাঁহারই অজ্ঞতা কিম্বা ভুলে যথাসময়ে যথাস্থানে 'তার' না পৌঁছে, তাহা হইলে এ চাকরিতো নিশ্চয়ই যাইবে।

তাই বালক তার আপিসের কাজ আরম্ভ হইবার আগেই অতি প্রত্যূষে এবং কাজ শেষ হইলে রাত্রেও সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোকানপাট চিনিয়া এবং নগরবাসীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া কাজে অল্পদিনের মধ্যে পাকা হইয়া উঠিল। মনোযোগ এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করাতে এণ্ডি অল্পদিনের মধ্যে সকলের প্রিয়পাত্র এবং আস্থা-ভাজন হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিল, এই ছেলেটির কর্ত্তব্যবোধের তুলনা হয় না।

একদিন বড় একটা মজার ঘটনা ঘটিল। সেদিন সপ্তাহের শেষে বেতন বাঁটা হইতেছিল। হরকরা বালকের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ হুকুম হইল এণ্ডি, তুমি দূরে একপাশে গিয়া দাঁড়াও, এবং সকলের শেষে আসিবে।

বালকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। একপাশে দাঁড়াইয়া সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে গাঢ় অন্ধকার। কাজ ভাল না করিতে পারার জন্য নিশ্চয় তাহার চাকুরি গিয়াছে;—তাহার পর কি হইবে তাহার পিতামাতার, ভাইবোনের?

অবশেষে ম্যানেজার ডাকিলেন, এণ্ডি, এদিকে এসো; ...বলিলেন, যতগুলি বালককে বিদায় করলাম—এই সবগুলি

একত্রে হ'য়েও তোমার মত কাজ করতে পারেনি; তাই, এই নেও তোমার বেতন, এই নেও তোমার পুরস্কার! দুই ডলার পঁচিশ সেণ্ট।

এণ্ডির ইহা ছিল কল্পনার অতীত অর্থ। সে আনন্দে আর পা ফেলিতে পারে না; কি যে করিবে তা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না!

অবশেষে সে বাড়ী পৌঁছিল; কিন্তু এই টাকার কথাটা হঠাৎ ফাঁস্ না করিবার সংকল্প লইয়া। খাইবার সময় টেবিলে কি গাম্ভীর্য্য! এত বড় ব্যাপার চাপিয়া রাখাও দায়, পেট ফাটে আর কি!

মাতার এই কথাগুলি কার্ণেগী জীবনে বিস্মৃত হন নাই এবং একদিন জননীর বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন স্বদেশে প্রাসাদ-নিন্দিত স্কিবো কাস্‌ল নির্ম্মাণ করিয়া। এই বাড়ীখানিকে সুন্দর করিয়া তুলিতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। আকাশ-চুম্বী এই গৃহটি একটি দর্শনীয় জিনিষ!

টেলিগ্রাফ আপিসের একজন কর্ম্মচারীর আলস্যের ফাঁকে ঐ বিদ্যাটিকে কার্ণেগী সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগত করিয়া লইলেন।

মানুষের দোষ-ত্রুটি নীরবে বিনা আহ্বানে যে পূরণ করিয়া দিতে থাকে, বিপদের দিনে যে সন্ত-জাগ্রত থাকিয়া নিরলস হাত দুইখানি দিয়া সেই বিপদকে নিবারণ করে, তাহাকে চিনিয়া লইতে কাহারও এক মুহূর্ত্ত দেরি হয় না; তাই একদিন এমন হইল যে, বালক এণ্ডু নহিলে আপিস আর চলে না। ধীরে ধীরে হরকরার কাজ হইতে ক্রমেই কার্ণেগী উপরে উঠিতে লাগিলেন।

স্কিবো কাস্‌ল—স্কট্‌ল্যাণ্ডে এই ঐশ্বর্য্যময় প্রাসাদটি কার্ণেগী ধনী হইয়া ক্রয় করেন

রাত্রি কাটিল আকাশ-কুসুম রচনায়, ইংরাজিতে বলে বেশ কথাটি, আকাশে কেল্লা বানাইয়া! সে রাত্রে মনে মনে স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রাসাদ খরিদ হইল—কার্ণেগী পরিবারের জন্য অক্ষয়-ভাণ্ডার একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। রাত আর কাটে না! সকাল হইতে না হইতে এই সংবাদ বাড়ির চারিদিকে ছুটিয়া গেল! চায়ের টেবিলে জয়ধ্বনি, সাবাস্ এণ্ডি!

তারপর মাতাপুত্রের একান্ত আলাপ :—

পু। মা, এই টাকায় তুমি মনের সুখে গাড়ী চড় মা,—

জননী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কে আর চেনে আমাকে এখানে? যদি স্কট্‌ল্যাণ্ড হ'তো তো......

এক সময় বালকের উপর সমস্ত আপিসের কর্ম্মচারীদিগকে বেতন বাঁটিয়া দিবার গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই শক্ত কাজটি মাথা ঠিক রাখিয়া করা একজন বয়স্ক পরিপক লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।

পরীক্ষার দিন আসিল। একটা প্রকাণ্ড চেক্ এবং নোটের বাণ্ডিল লইয়া কার্ণেগীকে অন্য ষ্টেশনে যাইতে হইতেছিল। গাড়িতে স্থানাভাব, অগত্যা ইঞ্জিনের ফুট-বোর্ডে স্থান করিয়া লইতে হইল।

বালক-সুলভ কৌতূহলে মন ইঞ্জিনের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য ধাবিত হইল। এদিকে কখন্ সেই

বাণ্ডিলটি আমার নীচে বুক হইতে পড়িয়া গেছে। বিনা বেতনে সমস্ত জীবন কাজ করিয়াও কোম্পানির সে টাকা শোধ করা যায় না। বালক শান্ত দৃঢ় মনে চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিয়া ফেলিল। ড্রাইভারকে বলিতেই ড্রাইভার গাড়ি থামাইয়া তাহাকে ঘোর কাঁটা বনের মধ্যে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এণ্ড্রু সেই দুর্গম পথে মাইল দুই তিন ছুটিয়া সেই বাণ্ডিলটি উদ্ধার করিল।

একটি সাধারণ বালক হইলে সে কি করিত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া সে বাড়ি ফিরিত এবং আজীবন লোকের অবহেলা ও সন্দেহে বিড়ম্বিত হইয়া লাঞ্ছনার দুর্ভর জীবন যাপন করাই তাহার একমাত্র পথ ছিল।

এমনি করিয়া কার্ণেগী বিপদের মধ্যে অটল থাকিয়া, নিজের কর্ত্তব্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী কাজ করিয়া, একদিন আপিসের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর দক্ষিণ-হস্তের অপেক্ষা কর্ম্ম-কুশল হইয়া উঠিলেন। কর্ম্মচারীটি ছিলেন একটু ঢিলা-প্রকৃতির লোক। সময়ে আপিসে আসা তাঁহার ধাতে কুলাইত না।

একদিন অতি প্রত্যুষে আপিসে আসিয়া কার্ণেগী জানিতে পারিলেন যে, রাত্রে রেলে একটা জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু মিঃ স্কট্ ছাড়া নূতন ব্যবস্থা করিবার অধিকার আর কাহারও নাই। স্কট্ বেলায় আসিবেন, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে কোম্পানির ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। কার্ণেগী নিমেষে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন, এবং সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে গাড়ি চালাইবার হুকুম পাঠাইতে লাগিলেন।

বেলায় মিঃ স্কট্ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, এণ্ডি, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, আমারই দোষে আজ কোম্পানি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো; আমার আলস্য......

এণ্ডি হাসিয়া বলিল, মশাই, আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না; কোম্পানির কোন ক্ষতি হয়নি; সকল ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে।

বিস্ময়ে স্কটের দুই চক্ষু কতখানি বিস্ফারিত হইয়াছিল, অনুমান করা সহজ; তিনি বলিলেন, 'সাবাস্।' বলিহারি, সাহস আর দৃঢ়-চিত্ততা—তোমার......

এই ঘটনায় কার্ণেগীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্কট্ বুঝিলেন, এণ্ডিকে বাদ দিয়া কোন কাজ আর তাঁহার দ্বারা চলিতে পারে না।

রেলে দুর্ঘটনা হইলে তাহার তদন্ত স্কটকেই করিতে হইত। কিন্তু কার্য্যত সেকাজ কার্ণেগী করিতে লাগিলেন। তাঁহার Empire of Business পুস্তকে এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিনা প্রয়োজনে কার্ণেগীকে দিনের পর দিন বাহিরে থাকিয়া, বহুরাত্রি একটুও না ঘুমাইয়া স্কটের কাজই করিতে হইত।

জীবনে বড় হইতে হইলে কি করিয়া অক্লান্ত ভাবে কাজের পিছনে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, কেমন করিয়া নিরলস নিত্য-প্রবুদ্ধ মনটি-কে কাজের প্রেরণায় প্রাণময় করিয়া রাখিতে হয়—তাহার দৃষ্টান্তে কার্ণেগীর জীবন পূর্ণ। মানুষের প্রতিভা, বিধাতাপুরুষ একটি মণি-কৌটায় পুরিয়া মানুষের সঙ্গে দেন না। নিজের প্রতিভা তো আর কিছুই নহে, নিজের নিহিত শক্তিকে অমিত শ্রম এবং অধ্যবসায়ের বলে জাগ্রত প্রদীপ্ত করিয়া তোলা! এই দুর্লভ শক্তি মুহূর্ত্তের হেলায় মানুষ হারাইয়া ফেলিয়া চিরদিনের জন্য বিধাতার উপর দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার বৃথা চেষ্টা করে।

যে আগে যাইতে চাহে, আগের পথও তাহার কাছে ক্রমেই যেন নিজেই উন্মুক্ত হইতে থাকে। চাকরির নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার সুযোগ একদিন আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। কার্ণেগী সেই সুযোগকে হেলায় বহিয়া যাইতে দেন নাই।

একজন গ্রাম্যলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে কার্ণেগী জানিতে পারেন যে লোকটি একটি Sleeping Car-এর সুন্দর মডেল প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু তাহার মূলধন না থাকায় কোন উপায় করিতে পারে নাই। নমুনাটি

দেখিয়া কার্ণেগীর আশায় উৎসাহে মন নাচিয়া উঠিল; এই তো চায় আমেরিকা আজ, এই কথা বলিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন।

ঘণ্টাকয়েকের চেষ্টায় একটি কোম্পানি গঠিত হইল। এই কোম্পানি পেন্‌সিলভেনিয়া রেলে ঐ মডেলের গাড়ি সরবরাহ করিতে প্রস্তুত হইল।

একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত পূর্ব্বেই তাঁহার পরিচয় ছিল, তাঁহাকে গিয়া কার্ণেগী ধরিয়া বসিলেন টাকা দিতেই হইবে।

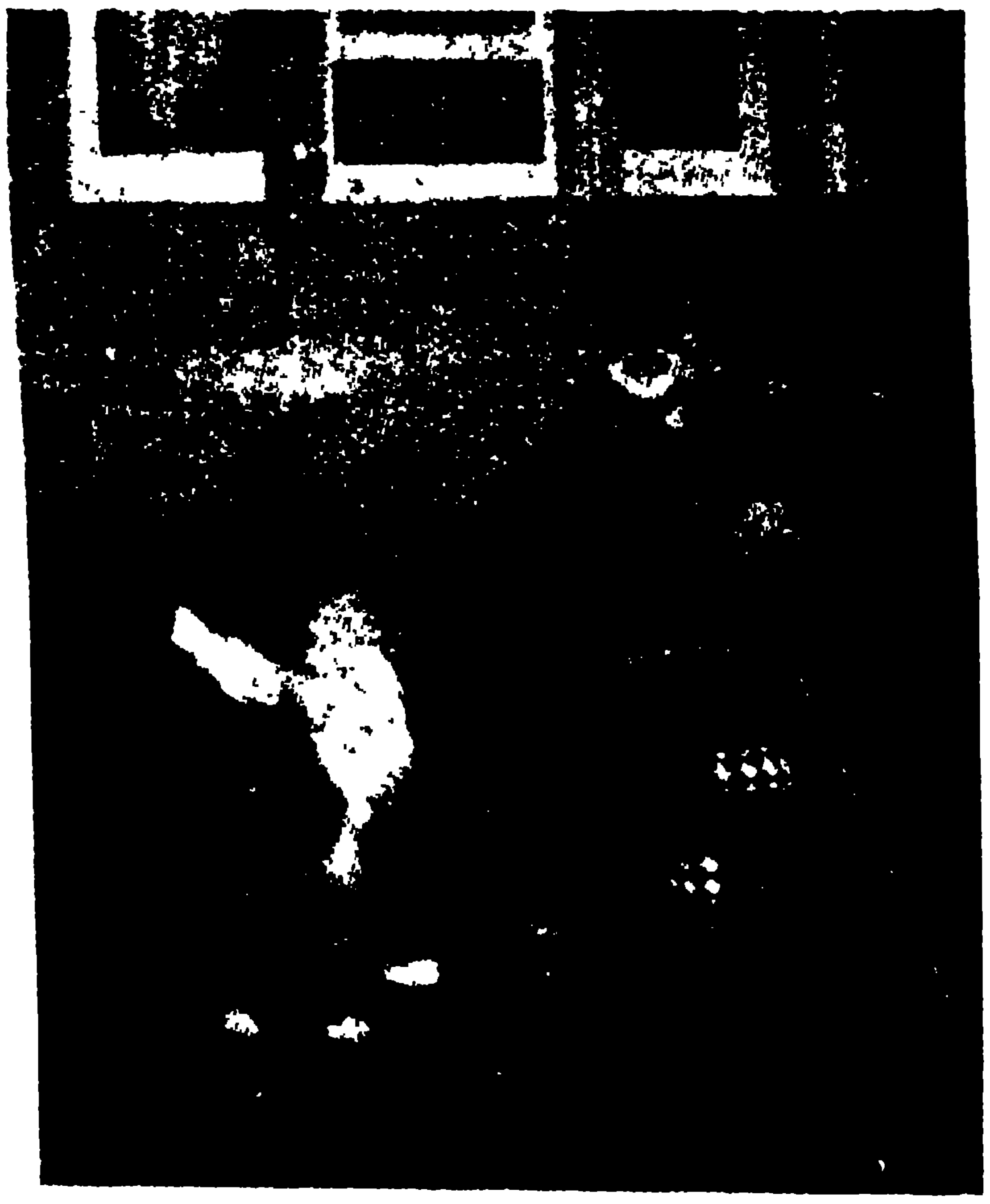

তাঁহার প্রিয় কুকুরটির সহিত স্কিবো কাস্‌লে কার্ণেগী

চরিত্রের সাধুতা এবং দৃঢ়তার জন্য কার্ণেগীকে সকলেই চিনিত, শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত; তাই, ম্যানেজার এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না; তিনি বিশেষ করিয়া জানিতেন যে যে-কোম্পানিতে কার্ণেগী সংশ্লিষ্ট তাহার ফেল হইবার ভয় ত নাই বরং সাফল্য অনিবার্য্য।

এমনি করিয়া উন্নতির পথে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই অক্লান্তকর্ম্মা মানুষটি এই সময় আর একদিকে কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন। তখন রেলের সকল কাজই ঢালাই-লোহায় হইত; ইস্পাতের পরীক্ষা কার্ণেগী নিজেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ইস্পাতের যুগের অব্যর্থ জয়ের কথা যেন নিঃসন্দেহে জানিয়া বসিয়াছিলেন।

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সভাগণ কিন্তু সহজে ইস্পাতের গুণপনা স্বীকার করিতে চাহিতেন না, কার্ণেগীও আশা ত্যাগ করিলেন না। তিনি অবসরে অনবসরে তাঁহাদের বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদিন একজন মেম্বরের গাড়ি একটা ল্যাম্প পোষ্টের সহিত ধাক্কা খাইতে পোষ্টটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। কার্ণেগী দেখাইয়া দিলেন যে, একটা ষ্টীলের পোষ্ট ঐরূপ আঘাতে অটুট দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। মেম্বরটিকে একথা স্বীকার করিতে হইল। সুখের বিষয়, ইনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিরোধী এবং ইঁহার কথাই সভায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলিত।

ক্রমে রেলে লোহার বদলে ইস্পাতের প্রবর্ত্তন সুরু হইয়া গেল। ইস্পাত সম্বন্ধে কার্ণেগীর নিজের কথা কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দি।

১৮৬৪ সালে লোহার রাজত্বের অবসান, এবং ইস্পাতের দিন আসিল; তার আগে নয়। এই সালেই আমরা "বেস্‌সিমার ষ্টীল" (Bessemer Steel) প্রথমে করতে পারি। এর আগে এক পাউণ্ড ষ্টীলের দাম ছিল পাঁচ-ছ সেণ্ট কিন্তু আমরা একপাউণ্ডের দাম একসেণ্টের নীচে নামিয়ে দিতে পেরেছিলুম......

ইস্পাতের কারবার হইতে কার্ণেগীর ভাগ্য ফিরিয়া গেল; অবশ্য, তাহার পর তিনি খনিজতেলের ব্যবসায় হইতেও প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠেন। একবৎসর তেলের ব্যবসায় হইতে তাঁহার দেড়কোটিরও বেশী টাকা হাতে আসে।

ইহার পর, কল্পনার সাহায্যে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কি করিয়া এই নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন মানুষটি অসীম ধনের মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন। জীবন যাহার সকল দিকের রিক্ততা লইয়া সুরু হইয়াছিল; যে কোনদিন বিদ্যা-শিক্ষার অবসর পর্য্যন্ত পায় নাই; তাহাকে পরিপূর্ণতা দান করিল কিসে? কোথা হইতে সে বিদ্যা বুদ্ধি সঞ্চয় করিল, কোথ

হইতে তাহার অসামান্য সংকল্প আসিল; কোন্ নিভৃত সাধনায় বসিয়া সে নিজের চরিত্রকে পর্ব্বতের মত দৃঢ় করিয়া তুলিল। এই সকল কথা চিন্তা করিলে একদিকে যেমন বিস্ময়ের শেষ থাকে না; অন্যদিকে তেমনি অদম্য আশা উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়, এ জগতে মানুষের কিছুই দুর্লভ নয়; যে দৃঢ়তার সহিত মনন করিতে জানে—তাহাকে কোন শক্তি আর পরাহত করিতে পারে না। সত্যই নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন:—ঐ "অসম্ভব" কথাটাকে অভিধান থেকে দূর ক'রে দাও... ..

কার্ণেগীর দান-যজ্ঞের কথা আগেই বলিয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে একটি পুস্তক লিখিতে হয়, এই সীমাবদ্ধ প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে; তবে কয়েকটির কথা বাছিয়া বলা যাইতে পারে যাহাতে এই মহাপুরুষের চরিত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি পরিস্ফুট হইতে পারে।

১৯০১ সালে কার্ণেগী আপনাকে উপার্জ্জন হইতে কি মনে করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন সে কথাও বলা হইয়া গেছে। সেই সময়ে তাঁহার হাতে আসিল মোট দেড়শত কোটি টাকা।

১৯০৩ সালে তিনি হেগের Palace of Peace নির্ম্মাণ বাবদে দান করেন ৭৫,০০০০০ পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হউক, এ কথা মুখে অনেকেই বলেন; কিন্তু কার্য্যত সেদিকে অগ্রসর হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। ইউরোপের মহাযুদ্ধ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, অন্তত ঐ দেশের মানুষেরা শান্তির চেয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেই ভালবাসে; বিশেষ করিয়া সে কথা আরো প্রমাণ হয় যখন যুদ্ধের বিরোধী হইয়া ফ্রান্স রোঁমারোঁল্যাকে আর দেশে স্থান দিল না।

কার্ণেগী তখনো জীবিত; যাঁহাদের জীবন বিফলতার ভিত্তির উপর গড়া—তাঁহারা সময়ের চঞ্চল তরঙ্গের ক্ষণিক বিক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠেন না। শান্তি অমূল্য, তাই জগতকে বহু-সংঘর্ষের ভিতর দিয়া তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে; লক্ষকোটি টাকা দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলেই যদি শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত—তাহা হইলে মানুষের ভাবনা থাকিত না। কার্ণেগী জানিতেন, ইউরোপ একদিন নিজের ভুল নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে।

সাময়িক উত্তেজনায়, কি কল্পনার স্বপ্নে ভুলিয়া কাজ করিবার মানুষ তিনি ছিলেন না। শিশুকালেই তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দেখিয়া লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল "ভয়ানক ছেলে।" এই বালকের সহিত কেহই তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এক সময়ে কার্ণেগীকে প্রশ্ন করা হইল, শ্রমশিল্পে, মূলধন, শ্রম কিম্বা বুদ্ধি—কোনটি সব চেয়ে বড়? একতিল চিন্তা না করিয়া তিনি বলিলেন, একটা তে-পায়া টুলের কোন পাটা সব চেয়ে দরকারি? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা চালাইবার ব্যাপারে তিনি কোনদিন, ইহার মধ্যে কোন একটিকে বড় করিয়া দেখার ভুল করেন নাই। এই তিনের অদ্ভুত সামঞ্জস্য করিবার বিশেষত্বে ছিল তাঁহার প্রতিভা। নিজের মতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি বিরোধের কারণটি দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। পরস্পরকে ঠিক করিয়া না বোঝাই হইল সকল কলহের মূল। একবার তাঁহার ম্যানেজার তাঁহার নির্দ্দেশ ঠিক করিয়া না বুঝিয়া বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন; কিন্তু কার্ণেগীর তাহা মিটাইয়া দিতে দেরি হইল না। শ্রমিকেরা বলিত, একটু রূঢ়তা দোষ আমাদের "এণ্ডি"র থাক্‌তে পারে; কিন্তু তাঁর হাতে সুবিচারের কোন দিন অভাব হবে না।

জীবনে বহু সৎ-কর্ম্ম তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু একটির কথা মনে করিয়া তিনি সব চেয়ে বেশী গর্ব্ব অনুভব করিতেন, সব চেয়ে বেশী আত্ম-প্রসাদ, সব চেয়ে তৃপ্তি!

কি সে কাজ? না জানি কত বড় সে কাজটি!

উত্তরে শুনি, পিটেন্‌ক্রীফ্‌ গ্লেন্ (সানু, দুইটি পাহাড়ের মধ্যের নীচু ভূমি) তাঁহার দেশবাসীর জন্য খরিদ করিয়া তিনি সব চেয়ে নিজেকে বিজয়ী মনে করিতেন। এটি সাধারণ পার্করূপে এখন ব্যবহৃত হয়।

গোড়ায় একটু বিস্ময় আসে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সানু দেশের বাগানটির জন্য কার্ণেগী পরিবার জমিদারের সহিত বহুবার লড়াইএ প্রবৃত্ত

হইয়াছে; বালক কতদিন ইহার পাশে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়াছে; কিন্তু ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। হয়তো তাঁহার মগ্নচেতনার মধ্যে যেমন বড় হইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, তাহার সঙ্গে এইটিও হয়তো তেমনি দৃঢ়ভাবে লীন ছিল। শৈশবের উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা সফল হইলে কোন্ বয়স্ক লোক অপরিসীম তৃপ্তি এবং গর্ব্ব অনুভব না করেন?

১৯১৯ সালে মানবজীবনের দুঃখ-সুখের এই পরিপক্ক-মধুর ফলটি লোকান্তরের পথে আবার যাত্রা করিয়াছেন। এ জীবনে পথের উপর যে পায়ের দাগগুলি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, পরবর্ত্তী মানুষের অক্ষয় সম্পদ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দিল খুসা

শ্রীযুক্ত অমরকুমার দত্ত

দিল দরিয়া খুস্ খেয়ালী
বাদশা সে কোন কোন্ ক্ষণে,
দিল খুসার এ স্বপ্ন-মহল
আঁকলে রঙিণ অঙ্কনে?
পাষাণ সৌধ, ফুল বাগিচা
তাইত সেদিন স্ফূর্ত্তিতে,
উঠল ফুটে হাজার রঙের
কল্প-কলার মূর্ত্তিতে।

উঠ্‌ল ফুটে গোলাব শত
কোমল কর চুম্বনে,
বুলবুলেরি কণ্ঠসুধায়
জাগল কারা ঘুম্‌বনে?
হামাম্ যত পূর্ণ হ'ল
চপল্ হাসির হাস্যতে,
মদির হিয়া মাতাল হ'ল
বেগম্ শতের লাস্যতে।

হায়রে সেদিন কোথায় গেল
সেই অলকার স্বপ্নটি,
ভোগ সায়রে জনম পাওয়া—
আসমানি সেই রত্নটি?
থামল হাসি থামল বীণা
চটুল-চরণ কিঙ্কিণি,
রক্ত হোরির মাতলামিতে
বাজল অসির ঝিন্‌ঝিনি।

সেই কালিমা কলঙ্ক আজ
রইল জেগে রইলরে,
অনেক সাধের স্বপনঘেরা
পাষাণ হিয়ার অন্তরে।
আজকে সেথা ফুল ফোটে না
বীণ্ বাজে না রাত্রিতে,
ঝিঁঝিঁর সাথে গান গেয়ে যায়
দীর্ণ-হিয়া যাত্রীতে।

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

কলিকাতার আমোদ প্রমোদ

এবার কলিকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে আমার যাহা স্মৃতি তাহাই বলিতেছি। যতদূর স্মরণ হয় ইংরাজী ১৮৯১ সালে আমি আমার মাতার সহিত প্রথম থিয়েটার দেখিতে যাই। তখন আমি অতি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র, সেই কারণে আমি আমার মাতার পার্শ্বে ত্রিতলে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসনে স্থান পাইয়াছিলাম। এখনও যেমন, তখনও তেমনি স্ত্রীলোকদিগের আসনের সম্মুখভাগ তারের জালদ্বারা ঢাকা থাকিত। প্রথম যে থিয়েটার দেখি তাহার বিষয় ছিল রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "প্রহ্লাদ চরিত্র," এবং রঙ্গালয়ের নাম রয়েল্ বেঙ্গল্ থিয়েটার। বিডন ষ্ট্রীটে এক্ষণে যে বাটিতে পোষ্ট আফিস রহিয়াছে উক্ত রঙ্গালয় সেই স্থানেই অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান পোষ্ট আফিস বাটি সেই রঙ্গালয় ভগ্ন করিয়া আর একটি যে নূতন রঙ্গালয় নির্ম্মিত হয় তাহারই একাংশ। এই নূতন রঙ্গালয় বাটি আজ হইতে দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া স্মরণ হয়। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের একটি বা দুইটি দৃশ্য এখনও মনে আছে, যথা—গুরুমহাশয় যেখানে ছাত্রদের পড়াইতেছেন ও বেত মারিতেছেন, সাপুড়ে "সাপে বানরে খেলা করে ওগো নয়া নয়া সাপ" এই গান করিতেছে ও সাপ খেলাইতেছে, টিনের চতুষ্কোণ স্তম্ভমধ্য হইতে নৃসিংহ অবতার বহির্গত হিরণ্যকশিপু বধ করিতেছেন। গানের মধ্যে মাত্র একটি করুণরসাত্মক গান মনে আছে, সেটি এই—'আহা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে, বিশাল ললাট মাঝারে।'

এই থিয়েটার বাটির প্রায় সাম্‌না সাম্‌নি আর একটি থিয়েটার ছিল তাহার নাম "এমারাল্ড থিয়েটার।" এই থিয়েটারের কোন অভিনয় দেখার কথা স্মরণ নাই। এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার সেই স্থানটি সে সময় একটি খোলা মাঠ ছিল। স্মরণ হয় উক্ত মাঠে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একটি আমোদ উপভোগ করিতে গিয়াছিলাম। একটি বৃহৎ তাঁবুর মধ্যে তাঁবুর আচ্ছাদনের নিম্ন হইতে অনেকগুলি শিক ঝুলান ছিল এবং প্রত্যেক শিকের নিম্নে এক একটি কাষ্ঠের ঘোড়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। এই ঘোড়াগুলির উপর বালক বালিকারা বসিত এবং তাহাদিগকে ঘুরপাক খাওয়ান হইত, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রও বাজিত। মাতার সহিত দ্বিতীয় অভিনয় যাহা দেখি তাহা "বিল্বমঙ্গল" ও "তাজ্জব ব্যাপার." রঙ্গালয়ের নাম "ষ্টার থিয়েটার।" এক্ষণে হাতিবাগানে যে বাটি "ষ্টার থিয়েটার" নামে পরিচিত, স্মরণ হয় সেই বাটিতেই থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলাম। "তাজ্জব ব্যাপার" রঙ্গচিত্রের মাত্র একটি দৃশ্যের কথা মনে আছে—যেখানে পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালী নৃত্য সহিত গান করে। নৃত্যকারী অভিনেতা বিখ্যাত গায়ক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইহার শেষ অভিনয় আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখিত "খাস দখল" নামক রঙ্গনাট্য ইংরাজী ১৯১২ সালে। এখনকার থিয়েটারগুলিতে যে নৃত্যবাহুল্য দেখা যায় তাহার ক্ষীণ অভিব্যক্তি সম্ভবতঃ এই "তাজ্জব ব্যাপার" হইতেই আরম্ভ।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে গানের সহিত বেহালা বাজান হইত। টেবল হার্ম্মোনিয়ম্, বাঁশী ও পিয়ানো পরবর্ত্তী কালে রঙ্গগৃহে প্রবর্ত্তিত হয়।

ইহার পরে যে থিয়েটার দেখি তাহা ইংরাজী ১৮৯৬ সালে বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের সাবেক বাটিতে। সেই সাবেক বাটি অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর খুব সম্প্রতি নূতন করিয়া এখনকার বাটি নির্ম্মিত হইয়াছে। সাবেক মিনার্ভা থিয়েটার বাটিতে যে অভিনয় দেখি তাহা নাটকাকারে

পরিবর্ত্তিত „ বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ।" এই আনন্দমঠ নাটকাভিনয়েই হৃদয়োন্মাদকারী বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" প্রথম শ্রবণ করি। মিনার্ভা থিয়েটারে আমি দ্বিতীয় অভিনয় যাহা দেখি তাহা সম্ভবতঃ ঐ বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী।" এই নাটকে আয়েষার ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে এবং ওসমানের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবুকে আমি প্রথম দেখি। উভয়েরই অভিনয় উত্তেজনাপূর্ণ। দানীবাবুর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে কর্কশ ও গম্ভীর বলিয়া লাগিয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী"র অভিনয় দেখি। এই অভিনয়ে গিরিজায়ার ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী হরিসুন্দরী বা ব্ল্যাকিকে দেখি। পর বৎসরে এই মিনার্ভা থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকের অভিনয়ে যোগেশের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে দেখি। আধময়লা ছোট একখানি কাপড় পরিয়া নগ্নগাত্রে বাম হস্তখানি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঈষৎ বক্রভাবে রাখিয়া যোগেশ যখন করুণ ও হতাশকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" তখন দর্শকবৃন্দ কাতরোক্তি সহ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আমার বালকবুদ্ধিতে সে অশ্রুবিসর্জ্জনের মর্ম্ম আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। স্মরণ হয় এই অভিনয় রাত্রে "প্রোগ্রাম্" "প্রোগ্রাম্" শব্দে প্রেক্ষাগৃহে বিষম হট্টগোল উপস্থিত হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সে সময়ে থিয়েটারে প্রোগ্রাম ও গান মুদ্রিত হইয়া দর্শকগণকে বিনামূল্যে থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিতরিত হইত। এখনকার থিয়েটারে ইংরাজী থিয়েটারের অনুকরণে প্রোগাম দর্শকগণকে বিক্রয় করা হয়। যাহা হউক, রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বস্থ দরজা হইতে মুস্তফী মহাশয় বাহির হইয়া প্রোগ্রাম অতি সত্বরই বিতরিত হইবে জানাইয়া বিক্ষুব্ধ দর্শকগণকে শান্ত করিলেন।

এখানে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার কথিত সময়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রায় অর্দ্ধাংশ গ্যালারী, এক চতুর্থাংশ পীট এবং বক্রী অংশ দুই টাকা ও তিন টাকার চেয়ারে বিভক্ত থাকিত। গ্যালারী ও পীটের প্রবেশ মূল্য যথাক্রমে আট আনা ও এক টাকা। এই শেষোক্ত উভয় স্থানেই বসিবার আসন বেঞ্চ। এই উভয় স্থানের দর্শকগণের মধ্যে বসিবার স্থান লইয়া প্রায়ই কলহ এবং সময় সময় হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইত। গ্যালারীর দর্শকগণ আর এক বিষয়ে সে সময়ে যথেষ্ট অখ্যাতি অর্জ্জন করিতেন। অভিনয়-কলার প্রশংসাজ্ঞাপক "ক্যাপিট্যাল" কথাটি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে শীষ্ দিয়া এবং হাস্যজনক উক্তি করিয়া অন্য দর্শকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতেন।

১৮৯৮ সালে এই মিনার্ভা থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাসের অভিনয় দেখি। তখন মিনার্ভা থিয়েটার নূতন কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে আসিয়াছে এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ইহার ম্যানেজার। রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রকে বোধ হয় আমি এই প্রথম দেখি। সীতারামের ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীর ভূমিকায় তাঁহারি প্রিয় শিষ্যা বিখ্যাত অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী। গাছের ডালে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া দিয়া শ্রী গ্রামবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল—"মার্ মার্, দেশের শত্রু মার্, হিন্দুর শত্রু মার্" ইত্যাদি।

এই অভিনয়ে দুই একটি ঘটনায় গিরিশচন্দ্রের কোপন স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম। একটি টানা সিন্ সরাইতে না পারাতে রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গিরিশচন্দ্র সিন্-সিফ্‌টারকে গালি দেন, এবং ওলন্দাজদিগের কামানদাগা শব্দজ্ঞাপক ভুঁই পটোকার শব্দ অতিরিক্ত হইতেছে মনে করিয়া দর্শকগণ সমক্ষেই "থাক্ থাক্ ঢের হ'য়েছে, আর না" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন।

এই বৎসরেই ষ্টার থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের অভিনয় দেখি। চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অমৃতনাথ মিত্র, দলনী বেগমের ভূমিকায় নরসুন্দরী এবং শৈবলিনীর ননদিনী ও নাপিতানীর ভূমিকায় রাণীসুন্দরী, এবং সাহেব লরেন্স ফষ্টারের ভূমিকায় ভুনিবাবু অর্থাৎ অমৃতলাল বসু মহাশয় দর্শকগণকে অভিবাদন করেন। "আজু কাঁহা মেরী হৃদয়কি রাজা" এই গানে দলনী বেগম দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। শৈবলিনীর সহিত রাণীসুন্দরী যখন রঙ্গমঞ্চে আসিলেন তখন রাণীসুন্দরীর মোটা শরীর দেখিয়া সকলেই

হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং গ্যালারী হইতে "ষ্টীম্ রোলার হইতে সাবধান হও" এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভীমা পুষ্করিণীতে নামিয়া যখন "নাচে তালে তালে কাল জল" এই গান উভয়ে ধরিলেন তখন রঙ্গগৃহের চাঞ্চল্য থামিয়া গেল। মিত্র মহাশয়ের অভিনয় যেমন সরল সহজ ও স্বাভাবিক, ভূনিবাবুর অভিনয় তেমনি পাকা সাহেবের মত।

সম্ভবতঃ এই বৎসরেই বঙ্গীয় নাট্যগগনে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়, একজন অভিনেতা ও অন্যজন নাটক রচয়িতা। অভিনেতার নাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নাট্যকারের নাম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার সর্ব্বপ্রথম গীতনাট্য হইতেছে আলিবাবা। বিডন ষ্ট্রীটে এমারাল্ড থিয়েটার বাটিতে আলিবাবার প্রথম অভিনয় হয়। তখন ঐ থিয়েটারের নাম রাখা হয় ক্লাসিক থিয়েটার। এই গীতিনাট্যেই অত্যধিক নাচ গান ও ক্লারিওনেট বাঁশী প্রবর্ত্তিত হয়। বংশীবাদকের নাম হাবু দত্ত, নৃত্য শিক্ষকের নাম নেপা বোস্ অর্থাৎ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, এবং নৃত্যপটিয়সী অভিনেত্রীর নাম কুসী বা কুসুমকুমারী। শেষোক্ত দুইজনে যথাক্রমে আবদাল্লা ও মর্জ্জিনা সাজিতেন। মর্জ্জিনা ময়ূরপুচ্ছের দুইটি ঝাঁটা দুই হস্তে লইয়া ঝাঁট দিতে দিতে "ছি ছি এতা জঞ্জাল" গান যখন করিত তখন সকলেই মর্জ্জিনার সেই গান নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিত। মুখে কালি ঝুলি মাখিয়া নিগ্রোবেশী আব্দাল্লা রঙ্গমঞ্চে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া যখন নৃত্য শেষে বেঁটে হইয়া ও নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া অন্তরালে যাইত তখন রঙ্গগৃহ হাস্যরবে মুখরিত হইত। অমর দত্ত নিজে হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। মর্জ্জিনার সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার সলজ্জ ও আড়ষ্ট ভাব সকলের মনোরঞ্জন করিত।

ক্লাসিক থিয়েটারে মোশন মাষ্টার ছিলেন পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য। ইনি আলিবাবার ভ্রাতা কাসেমের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। আলিবাবার গান সে সময়ে কলিকাতা ও মফঃস্বলের পথে ঘাটে সর্ব্বত্র গীত হইত। "লেও সাকি দেও ভর্ পিয়ালা পিলাও দারু ফির্" এই গানটি সহরের ঘোড়ার গাড়ীর ও গরুর গাড়ীর চালকেরা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছিল। অমর দত্তের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দিবার প্রতিভা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ভাল কাগজে নানা রঙ্গে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের চিত্র সম্বলিত এই সকল বিজ্ঞাপন এমন সুন্দররূপে মুদ্রিত হইত যে, রাস্তার লোকে বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিল লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। এখনকার কালে সেরূপ চটক্দার হ্যাণ্ডবিল আর মোটেই দেখা যায় না।

বিদ্যাবিনোদের দ্বিতীয় গীতিনাট্যের নাম "প্রমোদরঞ্জন।" ইহা আলিবাবার ন্যায় তত আদৃত হয় নাই। এই সময় হইতে প্রায় আট বৎসর ধরিয়া ক্লাসিক থিয়েটার সাধারণের খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই কয় বৎসরের মধ্যে উক্ত থিয়েটারে ভ্রমর অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তের উইল, সরলা অর্থাৎ তারকনাথ গাঙ্গুলির স্বর্ণলতা, হরিরাজ প্রভৃতি অভিনীত হইত। ভ্রমর, সরলা ইত্যাদির ভূমিকায় কুসুমকুমারী এবং গোবিন্দলাল,—বিধুভূষণ ও হরিরাজের ভূমিকায় অমরদত্ত যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেন। শুভ্রবর্ণের অতি সুন্দর একটি সজীব ঘোড়ায় চড়িয়া গোবিন্দলাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। রোহিণীর ভূমিকায় প্রমদাসুন্দরী যে উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ অভিনয় পরবর্ত্তী কালে আর দেখিতে পাই নাই। হরিরাজে শ্রীলেখার ভূমিকাতেও প্রমদা সুন্দর অভিনয় করিতেন। ভ্রমরের পিতা, নিশাকর ও সোণা নামক উড়িয়া মালীর ভূমিকায় যথাক্রমে পণ্ডিত হরিভূষণ, মনমোহন গোস্বামী ও হাস্যার্ণব অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী দর্শক সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "গডাচর" চন্দ্রের ভূমিকায় দানীবাবু ও নীলকমলের ভূমিকায় হাস্যার্ণব "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব" এই গানে নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা দর্শকগণকে হাসাইয়া তুলিতেন।

যে কারণেই হউক ১৯০৬—৭ সাল নাগাদ ক্লাসিক থিয়েটার অবনতির মুখে চলিয়াছিল। ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১২ সাল তক্ মিনার্ভা থিয়েটার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নূতন কয়েকখানি নাটক অভিনয় করিয়া জাঁকিয়া উঠে। সাজাহান, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, এই

কয়খানি নাটক রচনা করিয়া ডি, এল্, রায় নাট্যসাহিত্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন,সেইরূপ ঐ নাটকগুলি থিয়েটারে অভিনীত হইয়া নাট্যামোদী জনসাধারণের মনে সদ্ভাব ও স্বদেশ-হিতৈষণা উদ্দীপিত করিয়াছিল। "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা," "সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির" "আবার তোরা মানুষ হ" "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ," প্রভৃতি গান শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে বহুল ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। গানের সুর সংযোজনা স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল করিয়া দিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকগুলির মূল অভিনেতা রূপে দানীবাবুর যশঃ-সৌরভ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ঔরঙ্গজেব, রাণ প্রতাপ, দুর্গাদাস, চাণক্য প্রভৃতির ভূমিকায় দানীবাবু যে তেজ ও বীরত্বব্যঞ্জক অভিনয় করিতেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় ছিল। এক বৎসর পূর্ব্বেও "বঙ্গেবর্গী" নাটকের ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয় দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বেকার জ্বালাময় অগ্নিস্ফুরণ ক্ষুণ্ণভাবেই প্রকট হইয়াছিল। জাহানারার ভূমিকায় তারাসুন্দরী যেরূপ দর্প ও দম্ভের সহিত অভিনয় চাতুর্য্য দেখাইতেন তাহা অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না। নায়িকার ভূমিকায় গীতকলায় নিপুণা সুশীলাসুন্দরী যেরূপ দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিতেন তাহা আধুনিক কালে এক আশ্চর্য্যময়ী ও মিস্ কঙ্কাবতী ছাড়া আর কেহই পারেন না। আর একটি অভিনেত্রী এই সময় যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহার নাম প্রকাশমণি।

মিনার্ভা থিয়েটারে এই সময় আর একজন শক্তিশালী লেখকের রঙ্গনাট্য অভিনীত হইত। তাঁহার নাম অতুলচন্দ্র মিত্র। শিরী ফরহাদ, ঠিকে ভুল, পাষাণে প্রেম প্রভৃতি প্রহসনগুলি সকলেরই আনন্দদায়ক হইয়াছিল। সামাজিক নাটকের অভিনয়ে দানীবাবুর গুণপণার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকের করুণাময় বোসের ভূমিকায় প্রথম দেখি ও সম্প্রতি "পথের শেষে" নাটকে দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় শেষ দেখি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশেষে রচিত "পরপারে" নাটক ষ্টার থিয়েটারে সম্ভবত ১৯১১ সালে অভিনীত হয়। তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। সুশীলাসুন্দরীও এই সময় ষ্টারে অভিনয় করিতেন। পরপারে নাটকের ঠাকুর্দ্দার ভূমিকায় অমর দত্তের অভিনয় সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। ১৯১২ সালে "ষ্টার থিয়েটারে" অমৃতলাল বসুর "খাস দখল" নাটকে স্বয়ং গ্রন্থকার নিতাই-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং গিরিবালার ভূমিকায় সুশীলাসুন্দরী গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

বছর দশেক হইল এখনকার নাট্যমন্দিরের সুযোগ্য অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্-এ মহাশয় রঙ্গমঞ্চে নবভাবের সৃষ্টি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন। বঙ্গীয় নাট্যকলায় ইঁহার সমকক্ষ এক্ষণে কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া রঙ্গমঞ্চকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করা সম্বন্ধে ইনি দ্বিতীয়। তৎপূর্ব্বে মনোমোহন গোস্বামী বি-এ ছিলেন প্রথম।

ইংরাজী ১৯০৮ সালে কলিকাতার "এম্পায়ার থিয়েটার" ব্যাণ্ডম্যান সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার বৎসর দুই পরে "গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস" বাটি নির্ম্মিত হয়। এই উভ থিয়েটারে সেক্সপিয়ারের কয়েকখানি নাটকের অভিন দেখিয়াছিলাম, যথা— ওথেলো, হ্যাম্লেট্, জুলিয়াস্-সিজার মার্চ্চেণ্ট্-অফ্-ভেনিস্, রোমিও জুলিয়েট্। খাস লণ্ডন সহ হইতে এই নাটকগুলি অভিনয় করিবার জন্য অভিনেতা দল আনান হইত।

কলিকাতা সহরে সর্ব্বপ্রথমে প্রতি বৎসর শীতকা গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলিয়া বায়স্কোপ দেখান হইত। জে এফ্, ম্যাডেনের এলফিনষ্টোন বায়স্কোপও এই ভাবে দেখা হইত। আমার বেশ স্মরণ আছে যে ১৯১১ সালে ডিসেম্ব মাসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হওয়ার সংবাদ মাঠে অবস্থি ম্যাডানের বায়স্কোপ স্ক্রীণে বা পর্দ্দায় দর্শকগণকে জান হয়। তাহার পরে ক্রমশঃ সহরের নানাস্থানে বায়স্কো বাটি নির্ম্মিত হইয়া ১৯২১ সালে "ম্যাডান থিয়েটা লিমিটেড্" নামক কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পা

বঙ্গীয় উপন্যাসাদি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গীয় অভিনেতার দ্বারা অভিনয় করাইয়া চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করেন। বঙ্গদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইঁহারাই অগ্রণী।

কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথমে যে সার্কাস দেখি তাহা ১৮৯৩ সালে উইলসন অথবা ফিলিস সাহেবের সার্কাস। গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলিয়া শীতকালে এই সার্কাস দেখান হইত। তাহার কয়েক বৎসর পরে হার্ম্মষ্টন্ সাহেবের সার্কাস কলিকাতায় আসিত। এই হার্ম্মষ্টন্ সার্কাসে দুইজন বাঙ্গালী খুব যোগ্যতার সহিত ট্রিপল্ বারে খেলা দেখাইতেন। বাঙ্গালী দুইজনের মধ্যে একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বসাক্ ও অন্যের নাম পান্নালাল বর্দ্ধন। হার্ম্মষ্টন্ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে এই দল বহুকাল যাবৎ কলিকাতায় আসে নাই। ১৯২৪ সালের শীতকালে হার্ম্মষ্টনের পুত্র ছোট হার্ম্মষ্টন্ সাহেব নবগঠিত দল লইয়া কলিকাতায় খেলা দেখাইয়া যান। ১৯০৯ কি ১৯১০ সালে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত সার্কাসদলের নাম প্রফেসার বোসের সার্কাস। তাহার পর বৎসরে কেল্কার ও কার্লেকার্ সার্কাস ভারতবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া খেলা দেখাইয়া যায়। এই শেষোক্ত দুইটি দল এখনও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া থাকে।

ফুটবল খেলা কলিকাতায় এখন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। ১৮৯৭ সালে ডালহাউসি দল শীল্ড্ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই দলের লিণ্ডসে ভ্রাতাদ্বয় খুব ভাল খেলিতেন। ঐ প্রতিযোগিতায় তখন কেবলমাত্র দুইটি বাঙ্গালীর দল খেলিতে পাইতেন, যথা—টাউন ক্লাব ও শোভাবাজার ক্লাব। মেট্রোপলিটেন কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল্ সারদারঞ্জন রায় টাউন ক্লাবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি ক্রিকেট খেলাতেও খুব পরিপক্ক ছিলেন। আবার এদিকে অঙ্কশাস্ত্রে ও সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সময় ট্রেড্স্কাপ প্রতিযোগিতায় ন্যাস্নাল্ ক্লাব এখনকার মোহনবাগান ক্লাবের তুল্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং স্মরণ হয় এক কি দুই বৎসর তাঁহারা উপরি উপরি ট্রেড্স্কাপ অধিকার করিয়াছিলেন। এই ক্লাবের তিনটি নামজাদা খেলোয়াড়ের নাম আমার এখনও মনে আছে যথা—হুইলার্ সাহেব, জিতেন দাশগুপ্ত ও দুঃখীরাম বাবু। এই দল হকি খেলাতেও বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ মোহনবাগান দলের অভ্যুত্থান হয়। ১৯১১ সালে ঐ দল শীল্ড্ অধিকার করেন। এই দলের ভাদুড়ী ভ্রাতাদ্বয় খেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও অনেকগুলি বাঙ্গালীর দল, যথা—আরিয়ান্, ইষ্ট্ বেঙ্গল, হাওড়া ইউনিয়ান, প্রভৃতি এক্ষণে শীল্ড্ প্রতিযোগিতায় খেলিতেছেন। খেলার মাঠের চতুর্দ্দিকে দর্শকগণের বসিবার চেয়ার ও ষ্টাণ্ড্ বা গ্যালারী আবির্ভাবের বয়সকাল এখন হইতে সাত আট বৎসরের অধিক হইবে না। তৎপূর্ব্বে একমাত্র ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠেই ঐ ক্লাবের সভ্যদিগের জন্য ষ্টাণ্ড থাকিত। উক্ত মাঠের ও অন্যান্য মাঠের তিন দিকে পাঁচ ছয় সারি লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। এবং তাহাদের পশ্চাতে মুসলমানেরা টুল, টেবিল, ও প্যাকিং কেস্ সাজাইয়া পয়সা লইয়া তাহার উপরে লোককে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে দিত।

কলিকাতার পূজা পার্ব্বণ

কলিকাতায় দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আমার সর্ব্ব প্রথম স্মৃতি হইতেছে ১৮৯৩ সালে। মহাষ্টমীর দিন প্রাতে আমাদের ভৃত্যের সহিত বহুবাজারের বাঙ্গারাম অক্রুরের গলিতে দুর্গাচরণ জেলের বাড়ীতে মহিষ বলি দেখিতে যাই। ঠাকুর দালানে বৃহৎ দুর্গা প্রতিমার আরতি হইবার পর নীচে উঠানে প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ পোঁতা হইল। একটি মহিষকে আনিয়া প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তাহার ঘাড়ে ঘৃত মালিশ করা হইল। ছোট খাট একটি বাচ্চা মহিষ নহে, শিংওয়ালা একটি প্রকাণ্ড এই মহিষ। প্রায় দশজন লোকে বহু ধস্তাধস্তির পর মহিষের গলা হাড়িকাঠের মধ্যে বসাইল এবং কয়েকটি লোকে মহিষের সম্মুখের পা দুইটি হাঁটুগাড়া অবস্থায় রাখিয়া পশ্চাতের পা ধরিয়া রহিল, যাহাতে মহিষ পা ছুড়িতে না পারে। সিঁদুর মাখানো প্রকাণ্ড খাঁড়া লইয়া কামার যখন হাড়িকাঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল তখন গললগ্নীকৃতবাসে

দণ্ডায়মান দুর্গাচরণের ও সমবেত জনগণের মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত "মা মা" শব্দে এবং ঢাকের বাদ্যে প্রাঙ্গণ শব্দায়মান। খাঁড়াখানির দৈর্ঘ্য দুই হাতের উপর হইবে এবং প্রস্থ এক বিঘত্ বা ছয় ইঞ্চি। উচ্চরোলে যখন ঢাক বাজিতে লাগিল সেই সময় বলশালী কামার এই বিশাল খাঁড়া লইয়া এক কোপে মহিষ কাটিয়া ফেলিল। মৃত্তিকা মধ্য হইতে খাঁড়াখানি ধীরে ধীরে বাহির করিয়া কামার খাঁড়াখানি হাড়িকাঠের গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিল, এবং মহিষের প্রকাণ্ড মাথাটি মাথায় করিয়া উঠানময় নাচিতে লাগিল ও লোকের গায়ে রক্ত ছিটাইতে লাগিল। ইহার নৃত্য দেখিয়া দুর্গাচরণ ও তাহার আত্মীয়গণ দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। দুর্গাচরণের স্থূল, ভীমসদৃশ দেহটি ভুঁড়ি দুলাইয়া যখন থপ্ থপ্ করিয়া নাচিতে লাগিল তখন মহিষ বলির বীভৎস ব্যাপারে সন্ত্রস্ত আমার মুখে হাসি দেখা দিল। আমার ভৃত্য আমাকে বলিল যে, মুচিগণ বলির মহিষকে লইয়া গিয়া রন্ধন করিয়া খাইবে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আমার শেষ স্মৃতি সম্পন্ন বন্ধু গৃহে ১৯২৬ সালের নিমন্ত্রণে। দেখিলাম পশু বলির পরিবর্ত্তে ইক্ষুবলি ও দেশী কুমড়া বলি হইল। দেবীর ভোগও দেখিলাম মৎস্য মাংস বর্জ্জিত সম্পূর্ণ নিরামিষ।

দর্জ্জিপাড়ার ছিদাম্ মুদীর লেনে রামানন্দ পালের বাটির পশ্চিমাংশে আমার মাতুলালয়। আমার মাতুল প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সহরের তখনকার বিখ্যাত চিত্রকর। ১৮৯২ সালে আমরা সিমলা শৈল হইতে মাতুলালয়ে আসিয়া নামি। যে ঘরে আমি শয়ন করিতাম সেই ঘরের একটি দরজা খুলিলে রামানন্দ পালের বহির্বাটির দ্বিতলের বারাণ্ডায় যাওয়া যাইত। প্রত্যহ ভোরের বেলা এই বারাণ্ডা দিয়া—"লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, ভাল আছি প্রাণে প্রাণে। কোথায় কুশল তব আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।"—এই গানটি গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ রামানন্দ পাল নীচে নামিয়া যাইতেন্। একদিন এই দ্বিতলের বারাণ্ডায় যাইয়া দেখি যে নীচের উঠানে ও বারাণ্ডায় অনেকগুলি বড় বড় রঙ্গিন পুতুল সাজান রহিয়াছে। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, রাস উপলক্ষে পালবাটিতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন। বৈকালে দেখিলাম পালের সদর দরজার সম্মুখস্থ মাঠে এবং রাস্তায় অনেক দোকান পসার বসিয়াছে। নানারূপ খেলনা ও শোলার প্রস্তুত পাখী প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে এবং রাস্তাতেও খুব ভিড় হইয়াছে। রামানন্দের বাটির উঠানে যাইয়া দেখিলাম, উঠানের চতুর্দ্দিকের বারাণ্ডায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক নানারূপ পুতুল সাজান রহিয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম সমস্ত পুতুলই কৃষ্ণনগরের শিল্পী আনাইয়া প্রস্তুত করা হয়। বৃদ্ধ রামানন্দ পাল অনেকদিন গত হইয়াছেন। তাঁহার বাটিতে এই রাসোৎসব এখনও হইয়া থাকে।

বহুবাজারের সারপেণ্টাইন লেনে শিবতলা নামক স্থানে একটি শিবের মন্দির আছে। প্রতি বৎসর চড়কের সময় ঘটা করিয়া এই শিবের পূজা হইত। গাজনের সন্ন্যাসীগণ সন্ধ্যাকালে এই মন্দিরে বসিয়া অনবরত ঘাড় নাড়িতে থাকে যতক্ষণ না শিবের মাথা হইতে ফুল পড়ে। ১৮৯৭ সালে চড়ক পূজা উপলক্ষে কাঁটাঝাঁপ ও বঁটিঝাঁপ আমি দেখিয়াছিলাম, এই শিবমন্দিরের উত্তরদিকে চণ্ডী বর্দ্ধনের স্কুলের সম্মুখের মাঠে। দুইখানি লম্বা বাঁশ পুঁতিয়া এড়োভাবে আর তিনখানি বাঁশ এই দুইখানি বাঁশের সহিত বাঁধিয়া একটি ভারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত বাঁশ তিনখানি নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চে তফাতে তফাতে বাঁধা ছিল। এই ভারার সম্মুখে কয়েকটি লোকে দড়ির বড় জাল পাতিয়া ধরিয়া রহিল। কাঁটা ঝাঁপের দিন এই জালের উপর পাতা সহিত কাঁটা গাছ রাখা হইয়াছিল, এবং বঁটি ঝাঁপের দিন কয়েকখানি ছোট ও নূতন কিন্তু ভোঁতা বঁটি এই জালের উপর রাখিয়া কয়েক আটি নিমপাতার দ্বারা বঁটির লৌহাংশ ঢাকিয়া ফেলা হইল। গাজনের সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ সাহস অনুযায়ী উপরোক্ত ভারার প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় এড়ো বাঁশের উপর দাঁড়াইয়া জালের উপর ঝাঁপ খাইতে লাগিল। ভারা হইতে পড়িবার সময় জালের দিকে পিছন ফিরিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া চিৎ হইয়া পড়িত। এই ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে বা কাহাকেও আঘাত পাইতে

দেখি নাই। শিবমন্দিরের পূর্ব্বদিকে অল্প ফাঁকা জায়গায় একদিন দেখিলাম যে একজন গাজনের সন্ন্যাসী একটি বাঁশের ডারায় নিজের পা বাঁধিয়া নিম্ন দিকে মুখ করিয়া ঝুলিতেছে, এবং ঠিক তাহার মাথার প্রায় একহাত নীচে মাটিতে জ্বলন্ত অগ্নিতে অন্য একজন সন্ন্যাসী এক এক মুঠা ধুনা ফেলিয়া দিতেছে। ধুনা ফেলিবামাত্র দপ্‌ করিয়া যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিত অমনি নিম্নমুখে অবস্থিত লোকটিকে দোল দেওয়া হইত। এইরূপ এক একবার আগুনে ধুনা ফেলিতে লাগিল ও উহাকে দোল খাওয়াইতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কারণ দৃশ্যটি অতি কঠোর বলিয়া মনে হওয়াতে আমি শীঘ্রই সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম।

আষাঢ় মাসে রথ ও উল্টারথের দিন জানবাজারের মাড়েদের বাটি হইতে ঘটা করিয়া সেই সময়েও রূপার রথ বাহির করা হইত। এই রথ টানিয়া নেবুতলায় আনা হইত। এই রথ টানিবার জন্য ওয়েলিংটন উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে এত ভিড় হইত যে,রাস্তায় ট্রাম ও গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যাইত। বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুর তানলয়ে গান করিতে করিতে গায়কের দল এই রথের সম্মুখভাগে চলিত। প্রত্যেক গায়কের গলায় এক এক গাছি ফুলের মালা। এই রথোৎসব এখনও হইয়া থাকে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন জেলে পাড়ার সং বাল্যকালে দেখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহাও উল্লেখযোগ্য। কয়েকখানি মহিষ ও গরুর গাড়ীর উপর বাঁশের মঞ্চ বা ঘর বাঁধিয়া বাদ্যযন্ত্র সহিত এক একটি ছোটখাট যাত্রার দল বাহির হইত। অভিনেতারা সকলেই রং মাখিয়া পরচুলা পরিয়া যাত্রার ন্যায় সজ্জিত অবস্থায় ঐরূপ মঞ্চ হইতে হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিত। স্মরণ হয় রামায়ণ ও পৌরানিক গল্পই এই সকল অভিনয়ের বিষয় ছিল। রামের ধনুক, রাবণের দশটি মাথা, হনুমানের অঙ্গভঙ্গী আমার বালক হৃদয়ে প্রচুর আনন্দদান করিত। বৃদ্ধ এক মুনি চুরুট খাইতে গিয়া তাহার লম্বা দাড়ি ও গোঁফ পুড়াইয়া ফেলিয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখনও মনে আছে। মুসলমান ভিস্তির গান—"কি দুর্গা দেখলাম নানী। এক মাগী সিংহীর পরে, অসুরের টিহি ধ'রে"—ইত্যাদি লোকে বারংবার শুনিতে চাহিত। বড় বড় খরতাল খচমচ ভাবে বাজাইয়া "দাসের পোঁ কঁড় খাঁউচি" উড়িয়াদিগের এই গান, বাল্‌টি ও ঝাঁটা হস্তে এবং বাল্‌টি মাথায় মেথর মেথরাণীদিগের গানও যথেষ্ট উপভোগ্য ছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষেও বড়দিনের দিন প্রাতে গরিব সাহেব বা ফিরিঙ্গী বাঁশী অথবা ব্যাণ্ড্‌ বাজাইয়া হিন্দু পল্লীতে ভিক্ষা করিতে আসিত। ঐ দিন দুপুরে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীর রাস্তায় কেল্লার গোরা বা মানোয়ারী গোরা মত্ত অবস্থায় একা বা দলবদ্ধ হইয়া কমলালেবু খাইতে খাইতে "ক্রীস্‌মাস্‌ কাম্‌স্‌ বাট্‌ ওয়ানস্‌ এ ইয়ার্‌" এই গান করিয়া বেড়াইত। এখনও এ দৃশ্য যে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন নহে। বড়দিন ও ছোটদিন উপলক্ষে সাহেবদিগকে ফুল ও ফলের "ডালি" দেওয়ার যে প্রথা ছিল তাহা বোধ হয় এখনও অল্পবিস্তর আছে। বড়দিনের দিন বৈকালে সার্কাস তাঁবুতে ভাল ভাল খেলা দেখিয়া আমাদের বালক হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিত। এখন যেমন প্রত্যহ দুইবার করিয়া খেলা দেখান হয় তখন সে ব্যবস্থা ছিল না। তখন বিশেষ বিশেষ দিনে বৈকালে খেলা দেখান হইলে রাত্রে আর দেখান হইত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্বল

শ্রীরাধারাণী দত্ত

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্য-পাত্র মম
লইয়াছি ভরি,
অন্তরের হাসি তাই অশ্রু-যূথি রূপে প্রিয়তম,
পড়ে আজি ঝরি!
ক্রন্দন—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলক-নীর নেত্রে মোর করে টলমল,
বেদনা হয়েছে সোনা—দুঃখ হলো পরম নির্ম্মল
বক্ষে তারে ধরি।

জীবন অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি,
দীর্ঘ পথ বাকী,
হে মোর পরম রম্য! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি
চলেছি একাকী।
জানি জানি, জানি বন্ধু—দিক্‌হারা এ পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি বনপথ পরে,
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম সমাদরে
গৃহে লবে ডাকি।

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়,
ফুটায়েছে ফুল;
বিথারি সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মধু সিঞ্চিয়াছো প্রাণে প্রাণে মোর
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর,
বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন করি ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি প্রাণ-কূল!

আমার বসন্ত ওগো! জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে,
মুঞ্জরি তুলেছো তুমি হিমশীর্ণ বিশুষ্ক বনানী,
দক্ষিণার বেশে।
আনন্দ-পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি কলকণ্ঠী কপোতীর মত,
নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত,
অপার্থিব হেসে।

আমার এ রিক্ত প্রাণে পরম পূর্ণতা বন্ধু, তাই
আমি সর্ব্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছো ভালো, আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী!
তুমি বাসিয়াছো ভালো, তুমি ভালোবাসিয়াছো বঁধু,
যত স্মরি তত প্রাণে উছলি উথলি ওঠে মধু,
বিরহ বেদনা মোর গন্ধ-ধূপ হয়ে তাই শুধু
ঊর্দ্ধ-অভিমুখী!

অসহায়

পৌষ, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আর, কে, পাল

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ডি-এস-সি (প্যারি)

১৯২৮ ও ১৯২৯ সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ যথাক্রমে ডব্লু, ও, রিচার্ডসন ও ডিউক দ্য ব্রগলি পাইয়াছেন। রিচার্ডসন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দ্য ব্রগলি যদিও প্যারিসের সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু ইনি

Prof. W. O. Richardson F. R. S.

গবেষণাকর্ম্ম বেশীর ভাগ নিজের বাড়ীর ল্যাবরটরিতে করিয়া থাকেন। এ দুই মনীষী যে-যে বিষয়ে গবেষণার জন্য এই জগদ্বিখ্যাত পুরস্কার পাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে সহজ ভাষায় নীচে বলিতেছি।

ইলেকট্রন বা বিদ্যুতিনের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। জড়ের যেমন পরমাণু তাহার অবিভাজ্য কণা, বিদ্যুতের বিদ্যুতিন তেমনি অবিভাজ্য কণা মাত্র। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্যুতিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যখন বৈজ্ঞানিক মহলে বিদ্যুতিনের প্রকৃতি লইয়া খুব গবেষণা সুরু হইয়াছে, সেই সময়ে আমেরিকায় এডিসন তাঁর বিজলীবাতি আবিষ্কারে ব্যস্ত। এডিসন বাতি লইয়া পরীক্ষার সময় একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করেন। বিজলী বাতির বাল্বের ভিতর জ্বলন্ত ফিলামেণ্টের কাছে যদি একটা ধাতু পাত রাখা যায় তবে দেখা যায় যে, ধাতুর সঙ্গে ফিলামেণ্টের কোনও যোগ না থাকা সত্ত্বেও ধাতুর পাত হইতে ফিলামেণ্টে বিদ্যুত প্রবাহ চলিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্টো দিকে অর্থাৎ ফিলামেণ্ট হইতে ধাতুর পাতে কিছুতেই বিদ্যুত প্রবাহ চালান যায় না। এই ব্যাপারের নাম Edison Effect। এডিসন তখন বিজলীবাতি লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং এই আবিষ্কারের তথ্য নিরাকরণে তিনি মন দিতে পারেন নাই। ব্যাপারটা কিছুদিন চাপা পড়িয়াছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে রিচার্ডসন Edison Effect লইয়া গবেষণা সুরু করেন। রিচার্ডসনের গবেষণায় প্রকাশ পাইল যে, ধাতু মাত্রকেই উত্তপ্ত করিলে ধাতু হইতে বিদ্যুতিন বাহির হয়—জল গরম করিলে জলের অণু যেমন বাষ্পের আকারে জল হইতে ছুটিয়া বাহির হয় কতকটা সেই রকম। এডিসন বিজলীবাতিতে যে বিদ্যুত প্রবাহ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, ফিলামেণ্টটা যখন গরম করা হয় তখন ফিলামেণ্ট হইতে বিদ্যুতিন বাহির হইতে থাকে। বিদ্যুতিনগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুত কণা মাত্র। সেইজন্য ঋণ-বিদ্যুত প্রবাহ শুধু ফিলামেণ্ট হইতে ধাতুর পাতে যাইতে পারে, উল্টা দিকে যাইতে পারে না। রিচার্ডসনের গবেষণার ফলে আমরা উত্তপ্ত ধাতু হইতে বিদ্যুতিনের বাহির হওয়ার নিয়ম

জানিতে পারিয়াছি। ধাতুর মধ্যে কত বিদ্যুতিন রহিয়াছে, কি রকম উত্তাপে কত বিদ্যুতিন বাহির হইবে, বিদ্যুতিনগুলি বাহির হইয়া কি নিয়মে ছুটাছুটি করিবে এ সমস্তই রিচার্ডসনের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজকাল বেতার ব্রডকাষ্টিং-এ যে valve ব্যবহৃত হয়, তাহার আবিষ্কারও রিচার্ডসনের গবেষণা কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী।

ফ্রান্সের এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ডিউক পরিবারে দ্য ব্রগলির জন্ম। ইঁহার এক ভাই আছেন। তিনিও বৈজ্ঞানিক। X'ray সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহারা দুই ভাই-ই নিজেদের বাড়ীতে ল্যাবরাটেরি তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন ও অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাজ কর্ম্ম করেন। দ্য ব্রগলি গবেষণার বিদ্যুতিনের স্বরূপ কি তাহা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। ১৯২২ সালে প্যারিসে প্রবন্ধ লেখক ও তাঁহার ছাত্রস্থানীয় ৺হীরেন্দ্রলাল মিত্রের (সার বি, এল, মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র) দ্য ব্রগলির সহিত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হইয়াছিল। দ্য ব্রগলি সেই সময়ে তাঁহার গবেষণার কতক বিষয় আমাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। দ্য ব্রগলির মতে Electron বা বিদ্যুতিন আকাশে এক টুক্‌রা অতি ক্ষুদ্র ঢেউএর সমষ্টি মাত্র। দ্য ব্রগলির মতবাদ গোড়ায় গোড়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজ ততটা গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি জর্ম্মাণীতে অধ্যাপক স্রডিংগার (Schrodinger) দ্য ব্রগলির মতবাদের অনেক প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। দ্য ব্রগলির মতবাদের পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণও কিছু পাওয়া গিয়াছে। ঢেউ সমষ্টির একটা ধর্ম্ম এই যে, ছোট ছিদ্রপথে চলিবার সময় তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকায় অধ্যাপক ডেভিসন ও গার্মার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিদ্যুতিনও যদি খুব ছোট ছিদ্রপথে চলে (যেমন পাত্‌লা ধাতু পাতে অণু পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে যে সব ছিদ্র আছে সেই পথে) তবে বিদ্যুতিনের ঢেউও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতিনের স্বরূপ সম্বন্ধে এই নূতন মতবাদ পদার্থ বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

যাত্রী

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

তখন সন্ধ্যার আলো স্নিগ্ধ মোহচ্ছটা
দিয়েছিল ছড়াইয়া, কবে নব ঘটা,
মত্ত হয়ে বয়েছিল দক্ষিণের বায়
দিকে দিকে দোলা দিয়ে বনের শাখায়।

প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমি বুঝিনু সে দিন
আসে যায় নিত্য হয়ে অনন্ত নবীন।
আমি সেই নূতনের নূতন খেলায়
গিয়েছিনু মগ্ন হয়ে সাগর বেলায়।

সহসা কখন মোরে কে যে নিল টেনে,
বিদ্যুৎ দেখাল পথ দূরে বজ্র হেনে,
চকিতে চাহিয়া দেখি এ কী মত্ত স্রোতে
আমারে ভাসায়ে দেছে কোন দিক হ'তে,
অন্ধকারে বহুদূরে জানিনা কোথায়;
পাশে শুধু তরঙ্গের শব্দ শোনা যায়।

যেখানে দাঁড়ায়ে থাকি তাহা ছাড়া আর
যে দিকে ফিরাই আঁখি সমস্ত আঁধার।
যে মুহূর্ত্ত গত হয় মোর চিত্তময়
শুধু তারি স্মৃতিখানি লেখা হয়ে রয়।

ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে বুকে জাগে ভয়
তোমারে লভিনু পাশে এমন সময়,
অন্ধকরা অন্ধকারে তরঙ্গ উছলে
আমারে আনিয়া দিল তব বক্ষতলে।

সঙ্কট সমুদ্রে মাঝে নিভে গেল ভয়
ক্ষণিক বিশ্রাম তরে মিলিয়া আশ্রয়,
তোমার বিশাল বাহু মোর চারিদিকে
মোহন স্নেহের গণ্ডি দিল লিখে লিখে।
কাঁপে উত্তরীয় মোর, মুক্ত কেশপাশ,
ক্ষণে ক্ষণে লাগে তব সঘন নিঃশ্বাস।

আকুল আনন্দ মোর বেদনা বিহীন
অকূল অম্বর তলে রহিল বিলীন।
এত ক্ষণিকের তরে দূরে দেখা যায়,
বিশাল তরঙ্গ আসে পাগলের প্রায়,
এখনি মুহূর্ত্ত মাঝে তোমারে আমারে
দুই দিকে টেনে নেবে ঘন অন্ধকারে।

দুজনার মধ্যখানে সেই কালো জল
হাসিবে পূর্ব্বের মত লুটায়ে অঞ্চল।

চেতব্‌নী*

নিত প্রভাত ভব্‌তিবি্‌র ছুটৈ,
অন্তর তিবি্‌র ছুটত নাহী।
সত্যরূপ প্রেমরূপ রবি,
(প্রভু) পৈঠহু অন্তর মাহী॥
-"রবিদাস"—

অ = অ ও আ'র মাঝামাঝি, ইংরাজী U
ঐ = অয় ; ব্‌ = ওঅ, ইংরাজী W

কথা ও সুর সংগ্রহ—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শাস্ত্রী

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত

মিশ্র ভৈরোঁ—দাদ্‌রা

\+   ২   \+   ২
II মা মণা ণা । ণদা -া -া I পা -া -া । -পদা -পমা -গমা I
নি ত প্র ভা ॰ ॰ ত ॰ ॰ ॰॰ ॰॰ ॰

I মা মা মা । গমা মা মপা I গমা -পণা -দপা । -মপা -মগা -মগা I
ভ ব্‌ তি বিঁ র ছু ॰ টৈ ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

I মা মণা ণা । পদা -া -া I -া পা -া । -া -া -া I
নি ত প্র ভা ॰ ॰ ॰ ত ॰ ॰ ॰ ॰

---

* চেতব্‌নী অর্থ জাগরণী। রজনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্তদের মুখে এইরূপ চেতব্‌ণী সঙ্গীত গীত হয়। গানখানির ভাবার্থ—নিত্যই প্রভাতে প্রাকৃতিক জগতের অন্ধকার বিদূরিত হয়, কিন্তু আমার অন্তর তিমির ঘুচিল না। হে সত্যরূপ, প্রেমরূপ রবি হে প্রভু, তুমি আমার অন্তরে প্রবেশ কর।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

I পা -র্সনা র্সা । র্সঋা র্সনা নদা I পা -া -া । -া -া -া I
অ ০ ন্ ত র তি বি র ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পদা -নর্সা র্সা । ঋনা নদা দা I পা -া -া । -া দা -মা I
অ ০ ন্ ত র ০ তি ০ বি র ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা । মা মা -পা I গমা -পণা -দপা । -মপা -মগা -মগা II
ছু ০ ট ত না ০ হাঁ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

II পা -র্সনা র্সা । র্সঋা -র্সঋা র্সা I না -র্সা না । না -দনা র্সনা I
স ০০ ত্য রূ ০ ০০ প প্রে ০ ম রূ ০০ প০

I নদা পা -া । -া -া -া I পা -র্সনা র্সা । র্সঋা -র্সঋা র্সা I
র বি ০ ০ ০ ০ স ০০ ত্য রূ ০ ০০ প

I না -র্সা না । না -দনা র্সনা I নদা পা -া । -া মা মগা I
প্রে ০ ম রূ ০০ প০ র বি ০ ০ প্র ভু

I মা -মণা দা । পা -া -া I -পদা -মা -া । -া মা মগা I
পৈ ০ ঠ হু ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্র ভু

I মা -মণা দা । পা -া -দমা I মা -া মা । মা মা পা I
পৈ ০ ঠ হু ০ ০০ অ ন্ ত ০ র মা

I গমা -পণা -দপা । -মপা -মগা -মগা II II
হাঁ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

গজল

বিহারী—কাহারবা

মানসবনে ফুল ফোটালে
কে গো, তুমি কে গো !
সুপ্ত হিয়ার ঘুম টুটালে
কে গো, তুমি কে গো !
দৃষ্টি সুধায় বিলালে সুধা,
হৃদয়-প্রাণের মিটালে ক্ষুধা,
জোৎস্নাধারায় স্নান করালে
কে গো, তুমি কে গো।

মায়া তুলিকার পরশ দিয়ে
শুষ্ক হিয়া মুঞ্জরিলে,
মোহন সুরের জাল বুনিয়ে
গোপন প্রাণে গুঞ্জরিলে।
প্রাণ-দুলানো, মন-ভুলানো
মরমিয়া মোর, বুক-জুড়ানো—
মরু-সাহারায় সরসী তুমি
কেমনে এলে এ-প্রাণে গো॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

I -া না না না । না -র্সা র্সা -া I -া পধা -ণা ণা । ণা -া ণধা -পা I
• মা ন স ব • নে • • ফু • ল্ ফো টা • লে• •

I -া পধা পমগা -সা । -া -া রা গা I রগাঃ -রঃ সা -া । -া -া -া -া I
• কে • গো•• • • • তু মি কে • গো • • • • •

I { -া জ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞা -রা জ্ঞা -সা I I -া জ্ঞরা -পা মা । গা -রা
• সু • প্ত হি • য়া র্ • ঘু • ম্ টু টা •

I -া -া সা -রা । সরা -গা -মা -া I -া -া গা গা । রগাঃ -রঃ সা -া II
• • কে • গো • • • • • • তু মি কে • গো •

II { -া না -া না । না -া না -র্সা I -া র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
• দৃ • ষ্টি সু • ধা য় • বি লা লে সু • ধা •

I -া পা পা ধা । র্সর্রা -র্গা র্গা -া I -া র্সা র্সা ণা । পধা -া পা -া } I
হৃ দ য় প্রা • • ণে র্ • মি টা লে ক্ষু • ধা •

I -া না -া না । র্সা র্সা -া -া I -া পধা -ণা ণা । ণা -া ণধা -পা I
০ জো ৎ স্না ধা রা ০ য় ০ স্না ০ ন্ ক রা ০ লে ০ ০

I -া পধা পমগা -সা । -া -া রা গা I রগাঃ -রঃ সা -া । -া -া -া -া II
০ কে ০ গো ০ ০ ০ ০ তু মি কে ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

II {-া ন্া ন্া ন্া । সা -া সা জ্ঞা I -া জ্ঞা জ্ঞা রা । জ্ঞাঃ -রঃ জ্ঞা -সা I
০ মা য়া তু লি ০ কা র্ ০ প র শ ০ দি ০ য়ে ০

I -া সা -া রা । রা -পা মা -া I -া গা -া গা । রগা -া রসা -া } I
০ শু ০ ভ্র ছি ০ য়া ০ ০ মু ০ গ্ধ রি ০ ০ লে ০

I -া সা রা মা । পা -ধা ণা -া I -া ণা -া ণা । পধা -া পা -া I
০ মো হ ন স্ব ০ রে র্ ০ জা ল্ বু নি ০ য়ে ০

I -া রা রা রা । রা -পা মা -া I -া গা -া গা । রগা -া রসা -া II
০ গো প ন প্রা ০ ণে ০ ০ গু ০ ঞ্জ রি ০ লে ০

II {-া না -না না । না -া না -র্সা I -া র্সা -া র্সা । র্সা -া র্সা -া I
০ প্রা ণ্ দো লা ০ নো ০ ০ ম ন্ ভু লা ০ নো ০

I -া পা ধা র্সা । র্রা -র্গা র্গা -া I -া র্সা -া ণা । পধা -া পা -া } I
০ ম র মি য়া ০ মো র্ ০ বু ক্ জু ড়া ০ নো ০

I {-া না না না । র্সা -া র্সা -া I -া পা ধা ণা । ণা -া ণধা -পা
০ ম রু সা হা ০ রা য় ০ স র সী তু ০ মি ০ ০

I -া পা ধা পা । পা -মা সরা -গমা I -া গা -া গা । রগা -া রসা -া } II II
০ কে ম নে এ ০ লে ০ ০ ০ এ ০ প্রা ণে ০ গো ০

ছেঁড়া-ডায়রী

—গল্প—

—শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

জীবনের সুধাপাত্র নিঃশেষিত! শূন্য! সে আজ চ'লে গেছে—সত্যই চ'লে গেছে! পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ সব নিঃশেষে মুছে নিয়ে, আঁধার জীবনে ক্ষণিকের পুলকদীপ্তিটুকু নিমেষে নিভিয়ে দিয়ে,—আলেয়ার তীব্র আলোর ধাঁধায় অভাগা নিশীথ-পথিককে মূঢ় দিক্‌ভ্রান্ত ক'রে সে চ'লে গেছে; চিরদিনের জন্য।

হায় রে! যদি দূর, সুদূর আকাশে আছে জেনেও, তাকে হাত বাড়িয়ে ধ'রে রাখতে পারতুম! ওরে অভাগা! মূঢ়! এ তোর কেমন দুরাশা? কেমন ভ্রান্তি? সর্ব্বহারা, রিক্ত, মরণপথ যাত্রীকে সে অযাচিতে এসে যে অমূল্য পাথেয়টুকু দিয়ে গেছে—তাই কি যথেষ্ট নয়! তার দেওয়া সেই ক্ষীণ আলোটুকু তোর অন্ধকার জীবনে ধ্রুবতারার স্থির জ্যোতি বিকাশ ক'রে অচিন দেশের অজানা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে নাকি?

* * *

বর্ষার সূর্য্য সারাদিন প্রচ্ছন্ন থেকেও যেমন বিদায় বেলায়, সজল কাজল মেঘের বুকে রামধনুর বিচিত্র রং ছড়িয়ে যায়, তেমনি,—ঠিক তেমনি ক'রেই এ আশাহতের তিমিরঘন প্রাণে সোনার রং ফলিয়ে সে চলে গেছে। আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সেই মাসখানেক আগের একটি চিরস্মরণীয় মধুর ছবি! সেদিন যে চিকিৎসক চেন্‌জে যাবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তাঁকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারিনি। 'চেঞ্জে' না এলে, শুধু সাহারায় এই অমৃতের আস্বাদ পেতুম কেমন ক'রে? যাক, এই মরণাহতের বুকে, নন্দনের স্বপ্ন সৃষ্টি করে তার সকল দৈন্য সকল রিক্ততা পরিপূর্ণ সার্থক ক'রে তুলেছে! তারিখটা ঠিক মনে আছে ২রা আষাঢ়। কাঠের ঝুল-বারান্দা-ঘেরা যে দোতলার একপ্রান্তে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমি ছিলুম, তার অন্যদিকটা—অর্থাৎ বাড়ীখানার বেশীর ভাগই খালি পড়েছিল। সেদিন রাত্রে লোকজনের কথাবার্ত্তা, আসবাবপত্র তোলারাখার গোলমাল শুনে বুঝতে পারলুম বাড়ীর শূন্য অংশটায় ভাড়াটে এসেছে। ওদিককার সঙ্গে এদিককার সংশ্রব ছিল অল্পই; তবু যারা এসেছে তারা যে বাঙালী, তা বেশ বোঝা গেল।

* * *

সকালে উঠে সেই পূবের খোলা বারান্দায় এসে বসতুম,—প্রভাতের তাজা বাতাসটুকু উপভোগ করবার জন্য। সেদিন ঘুম ভেঙ্গে নিত্যকার মত এসে দেখি আমার ঘরের সামনেটুকু বাদ দিয়ে বারান্দায় সারি সারি 'চিক' ফেলা। উভয় পক্ষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য মাঝামাঝিও একখানা মোটা চিক্ টাঙিয়ে 'পর্দ্দা' করা হয়েছে। কারা এল—জানবার জন্যে মনের মধ্যে অকারণে একটা কৌতূহল হচ্ছিল। বাঙালার স্বজাতি প্রীতির আকর্ষণ কত প্রবল প্রবাসেই তা' ভাল বোঝা যায়।

আকাশে যে রকম মেঘের ঘটা আজ আর বেরুতে দেবে না দেখছি। বর্ষাকালে পাহাড়ে বৃষ্টির তো সময় অসময় নেই, যখন হোক এলেই হ'ল। প্রাতঃস্নান সেরে একখানা গল্পের বই নিয়ে চুপ ক'রে ব'সেছিলুম—পড়াতে মন লাগছিল না। আমার নিঃসঙ্গ, উদাসী চিত্ত তখন সেই মেঘাচ্ছন্ন ধূসর আকাশপথে—কি জানি কোন্ অদৃশ্য লোকে উধাও হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। সামনের পাহাড়ে মেঘের ছায়া ঘোর হয়ে ঘনিয়ে এসেছে—তার উন্নত শিখরে স্থির, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মস্ত বড় একখণ্ড কালো মেঘ; দলভ্রষ্ট, পথহারা হয়ে সে কি জানি কোন সময় অতর্কিতে নেমে পড়েছে। আমার মনে হল সে মেঘ নয়—নির্ব্বাসিত যক্ষ! কাতর বাহু দুখানি তুলে করুণ বিলাপে দরদী মেঘদূতকে সে তার প্রিয়াবিরহবিধুর-প্রাণের আকুল উচ্ছ্বসিত বেদনা

নিবেদন করছে। নির্ব্বাসিত, অভিশপ্ত হলেও তার ঘর আছে; তার ব্যথা জানবার লোক আছে; কিন্তু আমার? হা ভগবান! অভাগাকে এই জীবন-প্রভাতেই ইহলোকের সকল সুখে বঞ্চিত করেছ কি পাপে? একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী জীবনের একটি সাথী,—একটি ব্যথার ব্যথী,—কেউ নেই;—না দেশে—না প্রবাসে!

সামনের পথ দিয়ে একজন হিন্দুস্থানী পথিক নব বর্ষার স্নিগ্ধ বাতাসে উৎফুল্ল হয়ে কাজরী সুরে গান গেয়ে গেল—"ক্যায়সি বদরিয়া কারি ছায়ি—পিয়া বিনু বরখা ঋত্ আয়ি!" বড় মধুর লাগ্‌ল সেই বাদল দিনের মল্লার গান। সুরের রেশটুকু বাদলার উতলা বাতাসে মিশিয়ে যেতে না যেতে, কাঠের বারান্দা কার মৃদু পায়ের চাপে কেঁপে উঠল,—চাপা গলায় শিশুকণ্ঠে কে বল্লে, "বারে মজা! লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে কি দেখা হচ্ছে, দিদি!"

সচকিত হয়ে ফিরে দেখি মাঝখানে সেই চিকের পর্দ্দার অন্তরালে, অনিমেষ হয়ে চেয়ে আছে এক জোড়া অতল গভীর কৌতূহলী চক্ষু। আর, সে চোখের অধিকারিণী যে কেমন, তা কি করে বলব? কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীতা, সে যেন এক স্বপ্নময়ী মাধুরী প্রতিমা!

ভাল ক'রে দেখ্‌বার আগেই সে চিকের কাছ থেকে খুস ক'রে স'রে গিয়ে অতি মৃদু অস্ফুট স্বরে র্ভৎসনা ক'রে বল্‌লে—"চুপ কর্ ভাই! লক্ষ্মীটি, দেখ্‌ছিস্ না একজন ভদ্রলোক। কি মনে করবেন বল দেখি!"

"ও...তাই লুকুচ্ছিলে? তা, চলো না, ওর সঙ্গে আমরা ভাব ক'রে আসি......"

চিকের ফাঁক থেকে দেখ্‌তে পেলুম বালকটি তার লজ্জিতা দিদির হাত ধ'রে টানাটানি আরম্ভ করেছে!

"পাগল হয়েছিস্ সোনা? চেনা নেই, শোনা নেই, ভাব করতে হয় তুই করুগে যা। আমাকে কেন?" বলেই মেয়েটি ভাইয়ের আবদার থেকে মুক্তিলাভের আশায় তাড়াতাড়ি তার হাত ছাড়িয়ে খস্ ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। যাবার সময় আর একবার বনহরিণীর মত তার সরল, স্বচ্ছ, কালো চোখদুটিতে আমাকে...হায় রে সে চক্ষু,—সেই বিস্ময়-করুণামাখা চকিত চাহনি—শুধু এ জীবনেই নয়; জীবনের পরপারে গিয়েও কখনো ভুলতে পারব কি?

ছেলেটি দিদির দিক থেকে নিরাশ হয়ে আমার কাছে আস্‌বার ইচ্ছায় উঁকিঝুঁকি মারছে দেখে ডেকে বল্লুম—"তুমি এধারে এসো না খোকা!"

হাস্‌তে হাস্‌তে সে আমার কাছে এসে বল্‌লে—"আমি খোকা নই,—আমার নাম শ্রীমান্ স্বর্ণেন্দুবিকাশ ঘোষ। কিন্তু, ও নামে কেউ ডাকে না। সবাই আমাকে "সোনা" বলে।"

বালকের সরলতা ও মিষ্ট বচনে তুষ্ট হয়ে তাকে কাছে বসিয়ে আদর ক'রে বল্লুম, "আচ্ছা আমিও তোমাকে সোনা ব'লে ডাকব;—শুধু সোনা নয়, লক্ষ্মী-সোনা..."

"না না; আমি লক্ষ্মী মোটেই নই। দিদি আমাকে কি বলে জানেন?...দুষ্টুর শিরোমণি!"

"তুমি এখনি যাঁর হাত ধরে টানাটানি করছিলে,—উনিই তোমার দিদি বুঝি?"

"হ্যাঁ, আপনি বুঝি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন? আমি দিদিকে আপনার কাছেই আন্‌ছিলুম, তা কিছুতে এল না। ওর ভারি লজ্জা। এই আমিত আমার নাম বল্লুম,—দিদিকে জিজ্ঞাসা করলে কিছুতেই নাম বল্‌বে না। দিদির নামটা কিন্তু আমার চেয়ে ভালো। কি নাম জানেন? রেখা! কত ছোট নাম; আমার নামের মতন ওতে বানান ভুল যায় না।"

এমনি ক'রে হাসি ও গল্পের মধ্যে বালক আপন মনে গল্‌গল্ ক'রে, কত কথাই ব'লে গেল। তার বাবার নাম, শ্রীযুক্ত বাবু সুপ্রকাশ ঘোষ, লাহোরে ডি, এ, ভি কলেজের একজন প্রফেসার। তাদের মাতৃবিয়োগ হয়েছে প্রায় ছ মাস। তাই গরমের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দিদির বয়স হলেও, পর হবার ভয়ে বিয়ে দিতে পারছেন না। কিন্তু আর না দিলেও চলে না, রেখার সম্বন্ধ হচ্ছে; ঠিক হয়ে গেলেই তাঁর বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর সোনা একলা পড়্‌বে আর কি! দিদিকে ছেড়ে থাকা তারপক্ষে কিন্তু বড়ই কষ্টকর হবে......

কথাগুলো বল্‌বার সময় সোনার কচি মুখখানি কখনো

হাসি, কখনো বিষাদে বর্ষাবেলার আলোছায়ার মত ক্ষণে ক্ষণে করুণ মধুর হয়ে উঠছিল। দিব্যি ছেলেটি! প্রথম দেখাতেই কেমন মায়া প'ড়ে গেল।

প্রথম আষাঢ়ের নবীন মেঘমালা লাজময়ী তরুণী বিরহিণীর মত সারাদিন গুম্‌রে গুম্‌রে ছিল—সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই বুকভরা রুদ্ধ অশ্রু-প্রস্রবণ অযুত-ধারায়-ঝ'রে পড়্‌ল;—ঝম্‌, ঝম্‌, ঝম্‌!

আমার স্তব্ধপ্রাণে সেদিন সাহানার বাঁশী বাজ্‌ছিল! শুষ্ক শূন্য হৃদয়পেয়ালাখানি কি এক অপরূপ, অনাস্বাদিত মধুর রসে ভ'রে গিয়ে যেন টলমল্‌, ছলছল্‌ করছিল! এ আবেগ এ উচ্ছ্বাস কিসের? কিসের এ নেশা? যা আমাকে আজ মাতালের মত বিহ্বল-বিবশ ক'রে তুলেছে?

অন্ধকার বারান্দায় কতক্ষণ একলাটি চুপ ক'রে কান পেতে বসেছিলুম। বাদল ধারায় অশ্রান্ত রিমঝিম্‌ রাগিণীতে মধুর মূর্চ্ছনা জাগিয়ে সোনাদের ঘর থেকে এক একবার হাসির হিল্লোল ছুটে আস্‌ছিল—তাদের ভাইবোনের মিষ্ট আলাপও কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল। রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনো পড়ছে।

ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম; কিন্তু চোখে ঘুম আর আসে না। আমার তখন কী হয়েছিল জানি না। তবে নিজেকে যেন নিজের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারছিলুম না—চেষ্টা সত্বেও।

হার্টের দুর্ব্বলতার জন্য গান বাজনা অনেকদিনই বারণ। কিন্তু আজকের এই নিভৃতে, বাদ্‌লা রাতে অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগতরঙ্গ—আর রোধ কর্ত্তে না পেরে, বহুদিনের তুলে-রাখা সাধের এস্রাজ্‌টি বার করে, প্রাণের আবেগ ঢেলে বাজিয়ে চল্‌লুম।

পরদিন ৩রা আষাঢ়। সকালে ঘুম ভেঙ্গেই দেখি সোনা তার প্রভাতঅরুণের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি নিয়ে কখন এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে—আমার মুখটির পানে চেয়ে! আমাকে চোখ খুল্‌তে দেখেই সে হেসে বল্‌লে, "আপনি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছেন যে?"

আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে ব'সে বল্‌লুম,—"রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম হয়নি কিনা?"

"ওঃ তাই বুঝি ব'সে ব'সে এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন?"

"তুমি শুনেছিলে নাকি?

"রাম! আমার যে তখন অর্দ্ধেক রাত্তির! দিদি বল্‌ছিল, আপনি নাকি ভারি সুন্দর বাজাচ্ছিলেন– আপনার যন্ত্রটা যতক্ষণ বাজ্‌ছিল, দিদি ঘুমুতে পারেনি।"

বুকের ভেতর অকারণে দ্রুত পুলককম্পন জেগে উঠ্‌ল। মনে হল এস্রাজ বাজানো আমার ধন্য, সার্থক হয়ে গেছে! মনের সে চাঞ্চল্য গোপন ক'রে সহজভাবেই বল্‌লুম, "তাই নাকি? তাহ'লে না জেনে একটা মস্ত বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি দেখ্‌ছি..."

"বারে! কিসের অপরাধ?"

"এই কারুর ঘুমে ব্যাঘাত দেওয়া..."

"না, না,--আপনি বুঝতে পারেন নি, আমার কথা। দিদি এস্রাজ শুন্‌তে বড্ড ভালবাসে; দিদির নিজেরও একটা এস্রাজ আছে—সেটা বাড়ীতে ফেলে এসেছে—"

আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার দিদি গান বাজনা জানেন নাকি?"

"হ্যাঁ একটু একটু। ভাল পারে না। আপনাআপনি যেটুকু শিখেছে। শেখাবার লোক কেউ নেই তো?"

সোনার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে, মধুর নারীকণ্ঠে ডাক এলো, "সোনা ও সোনা! কোথায় গেলি, ভাই?..."

এ সেই স্বর যে স্বর বিশ্বের আনন্দে বঞ্চিত অভাগাকেও নন্দনের স্বপ্নলোকে নিয়ে যেতে পারে! হায় ভগবান! মরণোন্মুখ হতাশ জীবনে এ অমৃতধারা বর্ষণ কেন? আজ যে আমার বাঁচবার-সাধ নূতন ক'রে প্রবল হয়ে উঠ্‌ল!

এমনি ক'রে বালক সোনার মধ্যস্থতায় সেই অন্তরাল-বর্ত্তিনীর অন্তরের পরিচয় দিনে দিনে একটু একটু ক'রে পাচ্ছিলুম। যতই পাচ্ছিলুম, পাবার আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল,—সুরাপায়ীর সুরাপানের নেশার মত!

এক বাড়ীতে থাকায় তার সঙ্গে চোখাচোখি অতর্কিতে ঘটে যেতে—প্রায়ই। তার প্রভাত পদ্মের মত সুন্দর মুখখানিতে তখন উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাসের যে গাঢ় লালিমা চকিতে ফুটে উঠ্‌ত, সেই অরুণিমাটুকু যেন হোলীর পিচকারীর মত ছুটে এসে আমার কালো প্রাণটাকে আবিরের রক্তরাগে ছুপিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যেত!

. .

সোণার দৌত্যে ক্রমশঃ গৃহকর্ত্তার সঙ্গেও সাক্ষাৎপরিচয় হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি শুধু অমায়িক নন, রীতিমত পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে আলাপ ও সাহিত্য চর্চ্চা ক'রে বাস্তবিক বড় একটা আনন্দ আর তৃপ্তি অনুভব করলুম। আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি কত আপশোষ করলেন। দেখলুম, ঐ ছেলেমেয়ে দুটিই তাঁর সঙ্গীহারা জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—আনন্দের উৎস।

রেখার সঙ্গে এখন কেবল চোখের দেখাই নয়,—দুএকটি কথাবার্ত্তাও হতে লাগ্‌ল; কিন্তু অতি সংক্ষেপে, অতি সংযত ভাবে, সসঙ্কোচে। আমার সব-হারানো জীবনে সেইটুকু পাওয়াই কি যথেষ্ট নয়?

দিনগুলো স্বপ্নের মত কোথা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, তা বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু ঘোরটা জম্‌তে না জমতেই, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল; বড় অতর্কিতে, বাজের অধিক বেদনা দিয়ে। স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গবেই, এতো জানা কথা—তবে এ মর্ম্মান্তিক ব্যথা কেন? এ কেন'র উত্তর—সেই অন্তর্যামিই দিতে পারেন।

রেখার সম্বন্ধ হচ্ছিল; পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখ্‌তে আসছেন টেলিগ্রামে সেই খবর পেয়েই, ওঁরা তাড়াতাড়ি হঠাৎ চ'লে গেলেন। ভাল ক'রে বিদায় নেবার অবকাশও ঘটে উঠ্‌ল না। যাবার বেলায় সোনা হাসি মুখে, ছল্‌ছল্ চোখে বল্‌লে, "দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন করলে, আপনি যাবেন তো, অমিয়বাবু?" আর রেখা, শুধু একটি ছোট্ট নমস্কার ক'রে—ব্যথাভরা ম্লান চক্ষের করুণ দৃষ্টিতে,—কাতর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, নীরবে চ'লে গেল। সে দৃষ্টি যে এখনো আমার অন্তরের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধে আছে। তবে এ কাঁটার আঘাতে শুধু ব্যথাই নয়,—সুখও আছে।

কে জান্‌ত অভাগার জীবনের শেষ দিকটা, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!

তার দেহের সৌরভ মাখা, তার স্মৃতিতে ভরা শূন্য বাড়ীখানায় কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে শ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়্‌লুম। তখন বুকে পিঠে কেমন একটা ফিক্-বেদনার মত লাগ্‌ছিল। সমস্ত গা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছিল—কিসের এ অবসাদ? শরীর না মনের?

* * *

১২ই শ্রাবণ। এ কদিন আর লেখ্‌বার শক্তি ছিল না। জ্বরটা আবার চেপে ধরল দেখছি। রোগের পুনরাক্রমণ,—সাংঘাতিক হওয়াই সম্ভব। ডাক্তার বিশেষ আশা ভরসা দিতে পারছেন না। আমি নিজের অবস্থা নিজেই বুঝতে পারছি; বুঝতে পারছি আমার মুক্তির দিন এবার ঘনিয়ে আস্‌ছে! আর দেরী নেই……এই শেষের কটি দিন যদি তাকে আরো……আঃ! মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার আর অন্ত নেই দেখ্‌ছি!

২০শে শ্রাবণ। সময় সংক্ষেপ। ডাক্তার ভাসা-ভাসা বক্তৃতার ঠারে ঠোরে একরকম জবাবই দিয়ে গেছেন। জানালার দিকে মুখ ক'রে চোখ বুজে শুয়েছিলুম। ভোরের বাতাস ঝির ঝির ক'রে এসে গায়ে লাগছিল; তারই মৃদু স্নিগ্ধ সুরভি-নিশ্বাসের মত। বাহিরে বোধ হয় সামনের বাড়ীতে আপন মনে কে গান করছিল, ভোরের বনে জেগে ওঠা পাখীটির মত!

ম্যাঁয় উও চিরাগ্ সুবা হুঁ,—তুম্‌নে জিসে বুতা দিয়া,
ম্যাঁয় উও কিসি কি য়্যাদ হুঁ, তুম্‌নে জিসে ভুলা দিয়া॥

বড় মধুর লাগছিল—ভোরের বাতাসে সেই উদাস সুর—

আমি চুপটি ক'রে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম। সে অন্তরাটুকু সুর চড়িয়ে গাইতে লাগ্‌ল!

"কিস্‌নে অঁধেরি রাত্‌মে
লেকর্‌ চিরাগ্‌ হাতমে্‌
মেরি শিকস্তা গোর্‌ পর্‌ দো-চার গুল্‌ চঢ়া দিয়া!"

আহা! মরি! একি গান? না অশ্রুর মুক্তাঝুরি!

* * *

২৫শে শ্রাবণ। লেখার শক্তি আর নেই বল্লেই হয়। শুয়ে শুয়ে খালি ঘড়ির কাঁটা দেখচি; আর শুন্‌চি তার টক্‌ টক্‌ ধ্বনি, তাললয়ে বাঁধা! রাত বারটা বেজে গেছে! কি অন্ধকার, নিস্তব্ধ রাত্রি! শ্রাবণের আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন! দুটি একটি তারা সঞ্চরমান মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে কচিৎ উঁকি মাচ্ছে!—তারি সেই সলাজ মধুর, চকিত নয়নের মত! সে আজ কোথায়? কোন্‌ দূর, দূরান্তরে। জীবনের এই মুহূর্ত্তটিকে মধুময়, সার্থক করতে সে কি একবার……। নাঃ, আর তো পারা যায় না। বুকের বেদনাটা যে ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠ্‌চে। হাত পা সব শিথিল হয়ে আস্‌চে! ক্রমে বিশ্বের আলো যেন নিভে আস্‌চে। বৈতরণীর রুদ্র কল্লোল ক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে কানে লাগ্‌চে!

বুকের ভিতর ছিন্ন-মর্ম্মতন্ত্রীতে বাজ্‌ছিল শুধু সেদিনকার শোনা গানটির দুটি ছত্র—

"কিস্‌নে অঁধেরি রাত মে, লেকর চিরাগ হাতমে
মেরি শিকস্তা গোর পর্‌ দো-চার গুল চঢ়া দিয়া!"

আসবে কি! ওগো, আমার জ্যোতির্ম্ময়ি, জীবনের এই তামসী মহানিশায়—অভাগার জীর্ণ সমাধির পরে গোপন তোমার চরণ ফেলে তোমার অন্তরের মণিদীপটি চুপি-চুপি জ্বেলে, তোমার ফুলের নিঃশ্বাসে মধু-গন্ধ ঢেলে···

* * *

উঃ! আর যে পারি না। বুকে কে যেন হাতুড়ীর ঘা দিচ্ছে—একটা অসাড় আচ্ছন্নতায়, হাতের পেনসিল খ'সে পড়চে! ডাক্তার!……

* * *

সেবার পূজার ছুটিতে মসুরি পাহাড় বেড়াতে গিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর আবর্জ্জনার মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—কোন হতভাগ্য, মর্ম্মাহতের ছেঁড়া ডায়েরীর এই পাতা ক'খানি! জানিনা সে কে। যেই হ'ক,—তার অতৃপ্ত আত্মার শান্তি একান্ত মনে কামনা করচি।

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

আমি সেই উষার প্রদীপ, তুমি যারে দিয়েছ নিভায়ে,
আমি সেই বিস্মৃতের স্মৃতি, তুমি যারে দিয়েছ ভুলায়ে।
কে গো! এ আঁধার রাতে দীপখানি লয়ে হাতে
অভাগার জীর্ণভাঙা সমাধির' পরে দুটি ফুল দিয়েছ ছড়ায়ে।
লেখিকা কর্ত্তৃক অনুদিত। বিঃ সম্পাদক।

কবি ইকবাল *

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম-এ

ইকবালকে জানিবার জন্য আমাদের মধ্যে একটা আগ্রহ জাগিয়াছে। ইকবাল ভারতের কবি, অথচ তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা অভারতীয় ভাষায় লিখিত। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ পারস্যভাষায় রচিত। আজ আমরা তাঁহার আসরার-ই-খুদীর পরিচয় প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব। অধ্যাপক নিকলসন সাহেব আসরার-ই-খুদীর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, উহাকে অবলম্বন করিয়া ইকবালের কাব্যের অন্তররহস্যের সন্ধান করিব। ইকবালের কাব্যের মূলমন্ত্র জানিতে হইলে ইকবালকে জানা প্রয়োজন; এবং এইজন্য কাব্যের সঙ্গে সংসৃষ্ট না হইলেও তাঁহার জীবনের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতে হইবে।

ইকবাল জাতিতে মুসলমান, সুতরাং মুসলমান জীবনের ও আদর্শের ও স্বপ্নের ছবি যে তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিবে তাহা বিচিত্র নহে। কাজেই ইকবালের কাব্য লক্ষ্মীর অঙ্গে যদি এই মুসলমানী রঙ দেখিতে পাই, যদি তাহার অন্তর মুসলমানী ভাবে saturate হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা যেন রুষ্ট না হইয়া উঠি। কেননা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও মনোজাগতিক প্রভাব চিরদিন কাব্যে ধরা পড়িয়াছে। কাব্যের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখিতে পাই উহা যুগধর্ম্ম ও দেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাপূর্ণ অভিব্যক্তি। মানুষের মন দেশ ও কাল হইতে যে শক্তিসুধা সঞ্চিত করে উহা সম্প্রসারিত হইয়া কবির কাব্যাকারে দেখা যায়। যাহা হউক, ইকবালের মধ্যে এই দিকটা বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই এই কথাগুলি বলা দরকার মনে করি।

ইকবাল পারস্য ভাষায় আসরার-ই-খুদী রচনা করিয়াছেন এবং পারস্য সূফী সম্প্রদায়ের অবলম্বিত পথ চরণ করিয়া তিনি আত্মার রহস্যের—আসরার-ই-খুদীর সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এইস্থানে একটি কথা বিশেষভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মলয়ধর্ম্মাবলম্বী সূফীগণকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র বিদ্বেষ। বিশেষ করিয়া হাফেজের জীবন-যুদ্ধে—অবজ্ঞা উদ্দীপক গজলগুলির প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাহীন। তিনি হাফেজের স্থলে সূফী আচার্য্য মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা পারস্য সাহিত্য অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন হাফিজ ও রুমীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। হাফিজ জীবন হইতে দূরে রহিয়াছেন, জীবনকে পরিত্যাগ করিতে উৎসুক, এককথায় আত্ম পরিবর্ত্তনের ভাব বেশী। প্রত্যুত রুমীর মধ্যে জীবনকে সাধনার পথে জয়দীপ্ত গৌরবমহিমান্বিত করিবার আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎ পাই। হাফেজের মধ্যে শুধু মেয়েলী কান্না যেন অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে, উহার মধ্যে শক্তি নাই, জীবন নাই, আস্থা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, শুধু নিরাশা শুধু হাহাকার, শুধু ব্যথাভরা; অন্যপক্ষে রুমীর মধ্যে আমরা জীবনের গান শ্রবণ করি, তিনি ধ্বংস করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। রুমী ও হাফেজের মধ্যে এই যে বৈষম্য, এই অসামঞ্জস্য, ইহাই ইকবালের আসরার-ই-খুদীর মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ইকবাল শুধু সূফী আদর্শেই উদ্বুদ্ধ নহেন, প্রত্যুত প্রতীচ্যের দর্শনও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং সূফী দর্শনের সৃজনীশক্তিসম্পন্ন ধারা এবং পশ্চিমের দর্শনের জড়বাদী ভাবধারা ইকবালের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এইজন্য ইকবাল সূফীপন্থী হইলেও এইস্থলে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি পশ্চিমের দর্শন আত্মস্থ করিয়া পূর্ব্বদেশের সাধনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন

---

* The Secrets of the Self. By Muhammad Iqbal M. A. D. Litt. Kt. Translated from original Persian by Professor R. A. Nicholson. (Macmillan & Co.)

করিয়াছেন। এতৎব্যতীত ইকবাল অসাধারণ পণ্ডিত। ইকবালের মত শিক্ষিত কবির দৃষ্টান্ত বিরল। ইকবালের অলোকসামান্য অধীতি, জাতিগত সুফীপন্থানুগতি এবং পশ্চিমের জড়বাদী দর্শনের ভুক্তি মিলিত হইয়া আসরার-ই-খুদীতে আত্মপ্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য অনেকের পক্ষে আসরার-ই-খুদী দুর্ব্বোধ্য ও জটিল। আত্মার রহস্যের সন্ধানের পূর্ব্বে আমাদিগকে এই স্বতঃসিদ্ধগুলি মানিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলেই 'আসরার-ই-খুদীর' আত্মার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিব।

ইকবাল জীবনের গান গাহিয়াছেন। এই গানের ধুয়া হইতেছে খুদী—Ego। এই খুদী অহংকে তিনি নূতনভাবে দর্শন করিয়াছেন। তিনি এই অহংকে উদ্বোধিত হইতে, জাগ্রত হইতে গান করিতেছেন, নিরলস নিঃসংশয় হইয়া জীবন যুদ্ধে জয়ী হইতে উৎসাহিত করিতেছেন। এই দিক হইতে ইকবালের এই বাণী সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তিনি অহংকে পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন নাই, বরং অহংকে সম্প্রসারিত করিতে বলিতেছেন। তিনি আসরার-ই-খুদীর ভূমিকায় বলিতেছেন,

The moral and religious ideal of man is not self-negation but self-affirmation, but he attains to this ideal by becoming more and more individual, more and more unique……It is individual : its highest form, so far, the Ego (khudi) is concerned in which the individual becomes a selfcontained exclusive centre. Physically as well as spiritually man is not self-contained centre, but he is not yet a complete individual. The greatest his distance from God, the less his individuality. He who comes nearest to God is the completest person. Not that he is finally absorbed in God. On the contrary he absorbs God into himself.

ইহাই হইল ইকবালের আসরার-ই-খুদীর মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র শিখিয়া লইয়া আমরা "আত্মার রহস্য" দর্শনে সহযাত্রী হইব।

ইকবাল বলিতেছেন,

"The self rises, kindles, falls, glows breathes
Burns, shines, walks and flies
The spaciousness of time is its arena
Heaven is billow of the dust"

এই যে খুদী, এই খুদীকে তিনি নূতন আলোতে দর্শন করিতেছেন। এইজন্য তিনি বলিতেছেন,

"The Life gathers strength from the Self
The river of life expands into an ocean"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই খুদী কোথা হইতে উৎপত্তি লাভ করে এবং কোথা হইতে শক্তি সঞ্চার করে? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন,

Life is preserved by purpose :
Because of the goal its caravan bell tinkles.
Life is latent in seeking,
Its origin is hidden in desire.
Keep desire alive in thy heart,
Lest thy little dust become a tomb
Desire is the soul of this world of hue
and scent,
The nature of everything is faithful to desire.
Desire sets the heart dancing in the breast,
And by its glow the breast is made
bright as mirror.

এই খুদীর মৃত্যু হইতেছে আকাঙ্ক্ষাহীনতায়, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। আমাদের এই বৈরাগ্য-নিপীড়িত দেশে ইকবালের বাণী অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্যই কি ইহা অদ্ভুত? জীবন হইতে পলায়নই মৃত্যু। জীবনকে গ্রহণ করিয়া জয়যুক্ত করাতেই গৌরব। যাহারা ভীরু, যাহারা কাপুরুষ, তাহারা জীবনের সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না, তাহারাই জীবনযুদ্ধ হইতে পলাতক হয়। জীবনে যখন আশা নাই, ইচ্ছা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই তখনই ত আমরা মৃত। তাই কবি ইকবাল বলিতেছেন,

When it refrains from forming wishes,
Its pinion breaks and it cannot soar.

Desire is the emotion of the Self.
It is a restless wave of the Self's sea.
Desire is the noose for hunting the ideals,
A binder of book of deeds.
Negation of desire is death.

সুতরাং ইকবাল জীবনে আকাঙ্ক্ষা ও কামনাকে খুব বড় করিয়া দেখিতেছেন। আকাঙ্ক্ষাহীনতাকে তিনি মৃত্যুর অপর নামে উল্লেখ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন, "আকাঙ্ক্ষাকে বড় কর"। শুধু তাহাই নহে, তিনি বলিতেছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"।

এই যে বাঁচিবার আশা, এই যে পৃথিবীকে ভালবাসা ইহাই ইকবালের কাব্যের ভিতরকার রহস্য। জীবনের পরিবর্জ্জনেই মৃত্যু, জীবন হইতে বিরাগী হইয়া আমরা যে মুক্তি, যে অমরত্ব লাভ করিতে চাই উহার প্রতি ইকবালের আস্থা নাই, তিনি উহাকে জীবনের মৃত্যু মনে করেন। রবীন্দ্রনাথও উদাত্ত সুরে জীবনের জয়গান গাহিয়াছেন; এই বৈরাগ্যক্লিষ্ট দেশে তিনি নূতন সুরে যন্ত্র বাঁধিয়াছেন; তিনি গাহিতেছেন,

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পরিবর্জ্জন না করিয়া, জীবন হইতে পলাতক না হইয়া জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে চাহিতেছেন, এবং এই জীবনে যে অসংখ্য বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে উহার মধ্য দিয়াই তিনি আমাদের মুক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট। ইকবালের আসরার-ই-খুদীর কেন্দ্রীয় ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবধারা হুবহু মিলিয়া যাইতেছে এবং রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকছত্রে ইকবালের সমগ্র কাব্যখানির অন্তর্বাণী উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইকবাল একান্তভাবে জীবনের কবি, জীবনের জয়গান তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তিনি বার বার তাঁহার গানের ধুয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন

It is desire that enriches life,
And the intellect is a child of its womb.

তিনি সকল জিনিষের ভিতর এই আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,

What are social organisations,
customs and laws?
What is the secret of the novelties of science?
A desire which broke forth from the heart
and took shape."

তিনি বলিতেছেন, এই আকাঙ্ক্ষার মূলে রহিয়াছে আদর্শের বেদনা, কেননা আদর্শই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে;

"We live by forming ideals
We glow with the sunbeams of desire!"

এই যে আত্মা-খুদী-কে বাঁচিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতে উদ্বোধিত করা হইতেছে, এই আকাঙ্ক্ষার মূল উৎস কোথায়? আকাঙ্ক্ষা কিসের দ্বারা বল লাভ করিবে? তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন,

"By love it is made more lasting,
More living, more burning, more glowing.
From love proceeds the radiance of its being
And the development of its unknown
potentialities.
Its nature gather from love
Love instructs it to illumine the world,
Love fears neither sword nor dagger,
Love is not born of water and air and earth,
Love makes peace and war in the world,
The fountain of life is Love's flashing sword,
The hardest rocks are shivered by Love's glance
Love of God at last becomes wholly God,

ভালবাসার এই যে অপূর্ব্ব বাণী ইকবালের কবিতায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই আমাদিগকে বিস্মিত ও আনন্দাপ্লুত করিয়া দেয়। ভালবাসার মহিমা গান এমন করিয়া কেহ গাহিয়াছেন কিনা জানিনা। আর ইকবাল যে ভালবাসার গানে আত্মবিহ্বল উহার কারণ তিনি সূফীপন্থী

কবি, এবং সূফীদের ধর্ম্মই হইতেছে ভালবাসা, অন্য কোন ধর্ম্ম তাহাদের নাই। সত্যই সূফী-গৌরব রুমী বলিয়াছেন, "মা মুরিদানে ইশ্‌ক" (আমরা ভালবাসার শিষ্য) এবং হাফিজ "মজাহামে ইশ্‌ক অস্তে" (ভালবাসা আমাদের ধর্ম্ম)।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, ভালবাসাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে বন্ধন রহিয়াছে, যে যোগাযোগ রহিয়াছে উহা ভালবাসা বই আর কিছুই নহে; সুতরাং মানুষ যদি আপনার অন্তস্থলে সন্ধান করিয়া দেখে তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে যে, বাহিরের ধর্ম্ম লইয়া যতই যুদ্ধ বিগ্রহ করুক না কেন, ভালবাসাই তাহার অন্তরের একমাত্র ধর্ম্ম।

এইজন্য ইকবাল বলিতেছেন,

"Learn thou to love, and seek to be loved"

এই কথা সত্যই অদ্ভুত ও নূতন লাগে। কিন্তু সত্যই কি তাই? রবীন্দ্রনাথও এই পন্থী। তিনি বলিতেছেন,

"বাতাস জল আকাশ আলো,
সবারে কবে বাসিব ভাল
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হ'বে খুসী,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।"

জ্ঞানপন্থী ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতে বীজগণিতের ফরমূলার মত পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন,

"Seek not ka'aba rather seek heart
Thousand kaabas equal not one heart"

এই কথার প্রতিধ্বনি কি আমরা চণ্ডীদাসে পাই না?

"শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।"

সুতরাং ভালবাসার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমাদিগকে যাত্রা সুরু করিতে ইঙ্গিত করিতেছে।

কিন্তু কথা হইতেছে ভালবাসিব কাহাকে? ইহার উত্তরে ইকবাল বলিতেছেন,

"There is a beloved hidden within thine heart"

বাংলার বাউল যাহাকে "মনের মানুষ" বলিতেছেন এবং যাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এই মানুষের মধ্যে মানুষ আছে ডাকলে কথা কয়" তাহাকেই ইকবাল Beloved hidden বলিতেছেন। মানুষের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা বাউলের সুরে ধরা দিয়াছে, ইকবালের শিক্ষিত প্রাণের গানে আমরা তাকেই ঠিক প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। এই মানুষের মধ্যে যে "সোনার মানুষ" আছে তাহার সন্ধানই মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে আপনাকে জানিবার জন্য যে আগ্রহ উহা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে; তাহার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিয়াছে,

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সে মানুষে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে।"

এই কথাটি নহে, প্রত্যুত নিজেকে ভালবাসার মূল কেন্দ্র করিতে হইবে, নিজেকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে,— "আত্মানং বিদ্ধি।"

সূফী কবি রুমী কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন,

"বে তদ্‌বীরে মুসলমানান কে মান খোদরা নমিদানম।"

(ওগো মুসলমান বন্ধুগণ, আমার কি হইবে? আমি যে আমাকে জানিনা।)

এইজন্য ইকবাল আপনাকে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত, আপনাকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আপনার খুদীর উপর তিনি ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। তিনি খুদীকে বিষবোধে পরিবর্জ্জন করিতেছেন না। খুদীকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন। এবং বার বার বলিতেছেন, ভালবাস। এই ভালবাসার জালে আল্লাকে বন্দী কর! কী অদ্ভুত ও অসমসাহসিক প্রচেষ্টা! আল্লার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিওনা, আল্লাই তোমার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। (He absorts God into himself) তাঁহার নিজের কথায়ই বলা যাউক,

Be a lover constant in devotion to thy beloved,
That thou mayst cast noose and capture God.

Sojourn for a while on the Hira of heart,
Abandon self and flee to God.
Strengthened by God, return to thy self.

ইহাই হইতেছে ইকবালের দর্শনের ওপেন-সিসেম মন্ত্র।

তিনি ভালবাসাকে নূতন চক্ষে দর্শন করিতেছেন। ভালবাসা যে আমাদিগকে দুর্ব্বল না করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই ইকবাল আমাদিগের নিকট গাহিতেছেন,

"When the self is made strong by Love
Its power rules the whole world."

ইক্‌বাল আমাদিগকে ভালবাসার নূতন মন্ত্রে উদ্বোধিত করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে বাসনাবিহীন বিরাগী সাজিতে বলিতেছেন না প্রত্যুত আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে বলিতেছেন। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। এই আকাঙ্ক্ষাকে ভালবাসার ও সৌন্দর্য্যের দিকে নিয়োজিত করিতে বলিতেছেন,—কেননা

"Life is the hunter and desire the snare,
Desire is Love's message to Beauty."

তিনি সৌন্দর্য্যের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে সজাগ করিয়া দিতেছেন,

"Beauty is the creator of desire's springtide,
Desire is nourished by the display of beauty."

সৌন্দর্য্যকে তিনি জীবনে অতি গৌরবজনক স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার মূল উৎস বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

জীবনের জন্য যাহা আমাদের প্রয়োজন খুদীর উপলব্ধির জন্য যে পন্থা অবলম্বন আবশ্যক তৎসম্বন্ধে ইকবাল আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন। খুদীকে তিনি জানিবার জন্য বলিতেছেন, খুদীতে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন, খুদীর পরিবর্জ্জন আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। খুদীকে জীবিত রাখিতে হইলে ভালবাসার প্রয়োজন, ভালবাসা হইতে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রাখিতে হইবে, আকাঙ্ক্ষার প্রধান আহার্য্য সৌন্দর্য্য, এই সৌন্দর্য্য চিন্ময় স্রষ্টার অভিব্যক্তি। এক কথায়—গ্রহণেই খুদীর জীবন, পরিবর্জ্জনেই মৃত্যু।

সুতরাং এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে কি কি নিয়ম-কানুন অবলম্বন করিতে হইবে? ইকবাল বলিতেছেন আত্ম উপলব্ধির জন্য 'obedience' এবং 'self-control', কাজেই কর্ত্তব্যের কঠোর নিগূঢ়-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—কেননা

"Liberty is the fruit of compulsion

* * *

The wind is enthralled by the fragrant rose;
The perfume is confined in the navel of the musk deer,
The star moves towards its goal
With a head bowed in surrender to a law.
The grass springs up in obedience to the law of growth.
When it abandons that, it is trodden underfoot"

কাজেই obedienceএর প্রয়োজন। কথা উঠিতে পারে আইনের সম্মুখে মাথা নত করিব কেন? তদুত্তরে ইকবাল বলিতেছেন,

Since Law makes everything strong within,
Why dost thou neglect this source of strength.

সুতরাং

Adorn thy feet once more with the same fine silver chain.

আত্মার রহস্য সন্ধানে যাহারা বাহির হইয়াছে কর্ত্তব্যের গুরু বন্ধনে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত হইতেই হইবে, শুধু তাহাই নয় সংযমের শুচিতা রক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা আত্মার রহস্য জানিতে সক্ষম হইব এবং আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব। আমরা অমৃতের উত্তরাধিকারী—আল্লার খলিফা—তাহা জানিতে পারিব।

আত্মসংযম সম্বন্ধে কবি অতি সুন্দর ভাবে বলিতেছেন,

"Man wins territory by prowess in battle
But his brightest jewel is the mastery of himself"

এতদ্ব্যতীত,

If thou wouldst drink clear wine from thine
own grapes
Thou must needs wield authority over thine
own earth.

সুতরাং সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে আত্মসংযমী হইতে হইবে। নিজের উপর নিজের প্রভুত্ব রাখিতে হইবে।

এই মাটির মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতে পারে তাহার কথাও ইকবাল উদাত্ত সুরে ঘোষণা করিতেছেন। মাটির দেহে একটা নূতন জগত সৃষ্টি করিবার জন্য অনুপ্রেরণা দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,

To become earth is the creed of a moth;
Be a conqueror of earth; that alone is worthy
of a man
Thou art soft as a rose. Become hard as a stone,
That thou mayst be the foundation of the wall
of the garden!
Build thy clay into a man!
Build thy man into a World!"

আবার তোরা মানুষ হ, বলিয়া কবি যে উদ্বোধন গান গাহিয়াছেন, ইকবালে যেন আমরা তাহার বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাই। আমরা মানুষ হইব কোন পথে? ইকবাল তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন,

The pith of life is contained in action,
To delight in creation is the law of life.
Arise and create a new world.

জীবনের স্ফুর্ত্তিই ত কর্ম্মে। রবীন্দ্রনাথও এই কথাটি কি চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন।

গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার
গর্ব্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।

কর্ম্মের যে নীরব শঙ্খ অবহেলায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছে, এইবার সে আমাকে কর্ম্মের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলুক। শুধু তাহাই নহে, নীরব রুদ্ধ দেবালয়ের অন্ধকার কোণে যাহারা ভজন পূজন সাধন করিতেছেন তাহাদিগের সকলই ব্যর্থ, কেননা সে স্থানে "দেবতা নাই যে ঘরে।" রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করচে চাষা চাষ, —
পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ,
খাটচে বারোমাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার পরে।

* * *

রাখরে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

এই কর্ম্মযোগের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। ইকবালও এই কর্ম্মযোগের গান গাহিয়াছেন। এই কর্ম্মযোগে খুদীর চরম বিকাশ, এই কর্ম্মের মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধি করিতে হইবে। কর্ম্মবিরাগী পূজারীর ভজন পূজন একেবারে ব্যর্থ, কেননা তাহাতে জীবনের লীলার বিকাশের স্থান নাই। আল্লা যে সকল শক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন উহার যথার্থ ব্যবহার কর্ম্মহীন পূজাতে সফলতা লাভ করিতে পারে না। আল্লা বিরাট কর্ম্মীপুরুষ, তাঁহার কর্ম্মের অপূর্ব্ব ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ এই ধরণীর যাবতীয় সামগ্রী, তাঁহার সহিত আমাদের নিজেদের সৃজনীশক্তির যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে, তবে আমরা সত্যভাবে আমাদিগকে চিনিতে পারিব আমাদের সম্বন্ধে আমরা সজাগ হইতে পারিব, আমাদের অন্তরতম প্রদেশে খুদীকে জানিতে পারিব। তখনই এ প্রশ্নের সমাধান হইবে,

"আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে?"

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

পর গাছা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

এক

বড় জাহাজের পিছনে ছোট বোটটি বাঁধা থাকার মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু কিছু নেই।

তেমনই ধনী-গৃহে, আত্মীয়, অনাত্মীয় দু'চারজন পোষা থাকার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না।

কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকা মাত্র হলেও, পোতবিহারীদের নিকট তার মূল্য যেমন কম নয়, তেমনই কেশবচন্দ্রের প্রয়োজনীয়তাও ধনী আত্মীয় গৃহে ছিল খুব বেশী ; যদিও সুবৃহৎ অর্ণবপোতের জাঁকজমকে বোটটি যেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সেও তেমনই চাপা প'ড়ে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ থেকে শিশুটির পর্য্যন্ত আবশ্যক তাকে, কিন্তু সকলেই তাকে কৃপার চক্ষে দেখতেও ত্রুটী করত না।

বেচারার বাড়ী বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে। সহরে চাকুরী ক'রে। সামান্য যা' বেতন পায়, তা'তে মেসের খরচ কুলিয়ে বাড়ীর ভার বহন করতে পারে না, তাই প'ড়ে আছে এই ধনী আত্মীয়ের গৃহে।

সকালে উঠেই বাজারে গিয়ে কর্ত্তার জন্য কিনতে হয় সেরা পাকা পোনা মাছ, সুপক্ক ফল আর টাটকা শাক সব্জী।

বাজারের দূরত্ব বড় কম নয়, অফিসও বেরুতে হয় সাড়ে ন'টায়, তাই সময় হয়ে যায় দেখতে দেখতেই। বলে "ঠাকুর মশাই, ভাত। দেরী হয়ে গেল!"

গিন্নীর মুখ ভার হয়। বলেন, "আমার কোন কাজ ক'রে আর দরকার নেই। যে যার কোলেই ঝোল খায়।"

অফিস থেকে ফেরবার সময় বড়ছেলের জন্য প্রতিদিন কিনতে হয় Kellner-এর দোকান থেকে এক বোতল ক'রে whisky।

বোতলটা হাতে করতে কেশবের গা ঘিন ঘিন করে। ভয়ে, সন্তর্পণে সেটা লুকিয়ে নিতে হয় চাদরের তলায়—পাছে পরিচিত কেউ দেখতে পায়। অস্বস্তিতে মন তার ভ'রে ওঠে, তবু নীরবে সব সহ্য ক'রে নেয়, পাছে বড় ছেলে চ'টে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে বিনা খরচার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাটা মারা যায়।

কিন্তু এত ক'রেও বেচারা সামলাতে পারে না। অসংস্কৃত বৃহৎ অট্টালিকার ছিদ্রও যেমন অসংখ্য থাকে, তেমনই এই উচ্ছৃঙ্খল বাড়ীটির সহস্র ফাঁকে তাল দিয়ে চলা তার মত সামান্য কেরাণীর পক্ষে দিন দিনই অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছিল। মোটমাট হিসাব করলে ঘুষ তাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিমাসে যা দিতে হত, তার পরিমাণটা স্বতন্ত্র ভাবে থাকার খরচার চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়।

তবু কেশব ছিল—বোধ করি ভবিষ্যতের আশায়।

সন্ধ্যার সময় কেশব হয়ত বেড়াতে বেরুবার উদ্যোগ করছে, কর্ত্তা ডাক দিয়ে বলেন, "ভাল আম যদি উঠে থাকে—"

নীরবে সম্মতি জানিয়ে কেশব দু পদ অগ্রসর হতেই গিন্নী ফরমাস করেন, "অমনি একবার আমার ছোটবোন কাত্যায়নীর বাড়ীটা ঘুরে এস। কালকে সে যেন আসে—"

'আম যদি উঠে থাকে'—অনিশ্চিত,—ছোটভগ্নির বাড়ী যেতে সামান্য কয়েক পয়সা ট্রাম ভাড়া—তাই কেশব চাইতে পারে না।

নীরবে বাইরে বেরিয়ে আসে।

ফটকের সামনে বড়ছেলে ঘন ঘন পদচারণ করছিলেন ; বললেন, "কেশব, ট্যাক্সি একটা দেখত।"

মোটরে উঠে ব'সে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোন্ দিকে যাবে? অনর্থক হাঁটবে কেন? মাঝখানে নেমে পড়লেই হবে। এস।"

ক্লান্ত পদকে একটু বিশ্রাম দেবার আশাতেই বেচারা বোধকরি মোটরে উঠে বসে।

পথচারীদের নিজের আভিজাত্যের হুঙ্কার শোনাতে শোনাতে মোটর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চ'লে।

সহসা বিপরীত দিক হ'তে আর একটা মোটর ছুটে আসে। একটী বিদেশী সাজে সজ্জিত পুরুষের পাশে, সন্ধ্যা-তারার মত একটী তরুণীর কমনীয় মুখ ফুটে ওঠে।

তাঁরা হাত তুলে ডাকেন, "বিরজাবাবু, বিরজাবাবু!"

"রোক্কো, রোক্কো" ব'লে বিরজাবাবু উঠে প'ড়ে বলেন, "কেশব, মিটার দেখে ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে তুমি এখানেই নেমে পড়।"

কেশব বাধার ক্ষুদ্র চেষ্টা ক'রে বলে, "আমার কাছে ত বেশী—"

ফিরে তাকিয়ে "ছিঃ ভদ্রলোকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন" ব'লে বিরজা বাবু চক্ষের নিমেষে ও মোটরে উঠে পড়েন।

হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে মোটর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিন বাজারে প্রচুর আম থাকা স'ত্বেও কর্ত্তার আশা পূরণ হয় না, গিন্নীর ভগ্নির বাড়ীও যাওয়া ঘটে না।

কর্ত্তা শুনে ব'লে উঠেন, "পয়সা না থাকলে নিয়ে গেলেই পারতে। তুমিই ত রোজগার ক'রে আমায় খাওয়াচ্ছনা।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দেন, "মাগো, কি ছোট নজর! চামার! দু'আনা পয়সার জন্যে কি না—এ দিকে শোর পেটে যে গিলচেন কুটচেন! তাও আমায় দান করতে বলিনি—কি না—"

সব তিরস্কার মাথা পেতে নিয়ে কেশবচন্দ্র তার ঘরে ঢুকে প'ড়ল।

দুই

মাস কাবার।

এক মাসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে সামান্য যে ক'টা টাকা কেশব পেয়েছিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে সেগুলো নিয়ে সে বাড়ীতে ফিরল।

তারপর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ভিতর পকেট থেকে নোট আর টাকা বার ক'রে গুণতে সুরু ক'রল। একবার দু'বার তিনবার, তৃপ্তি আর যেন তার হয় না। এই ত সামান্য পুঁজি, অথচ এর থেকে কত কাজই না তার করতে হবে।

নিজের জামা নেই, জুতা নেই, বাড়ীতে পাঠাতে হবে, দেনাতে কিছু দিতে হবে, লাইফ্ ইনসিওর আছে; তবু ত খরচ বাঁচাবার জন্য তাকে হেঁটেই এই সুদীর্ঘ পথ আফিসে যেতে হয়।

কাগজ পেন্সিল নিয়ে সে হিসাব করতে বসল কোনটা কত কমিয়ে বা বাড়িয়ে সবদিক বজায় রাখতে পারে।

আফিসের ফেরত জামা কাপড় পর্য্যন্ত ছাড়তে ভুলে গেল। কারণ এ বাড়ীতে যতক্ষণ টাকা থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কা—কোন্ দিককার কোন ফাঁকে যে তা হাতের তল দিয়ে গ'লে যাবে!

সহসা দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত শুনে কেশব চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি টাকাগুলোর উপর মাথার বালিশটা চাপা দিয়ে উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল।

দমকা হাওয়ার মত ঘরে প্রবেশ ক'রে বড় ছেলে বিরজা বাবু দ্রুতকণ্ঠে বললেন, "গোটা পঁচিশ টাকা এখনই দিতে পার কেশব? বড্ড দরকার, শিগ্গীর।"

গোটা পঁচিশ! কেশব ঘাড় নেড়ে বলল"কোথায় পাব?"

অবশ দেহে তার বিছানার উপর ব'সে প'ড়ে বিরজাবাবু বললেন, "দিতে পার না? মাইনে টাইনে পাওনি নাকি হে?"

কেশবের বুকের ভিতর ছাঁৎ ক'রে উঠল। কিন্তু মিথ্যা কথাটাই বা কি ক'রে বলে। অন্তরের ভিতর দ্বন্দ্বে সে উস্খুস্ করতে লাগল।

তাকে নীরব থাকতে দেখে বিরজাবাবু হতাশ সুরে বললেন, "ঘড়িটাই তাহ'লে বাঁধা দিতে হবে দেখছি। যাও দেখি, শিগ্গীর গিয়ে ঘড়িটা বাঁধা দিয়ে পঁচিশটা টাকা নিয়ে এস দেখি।

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে তিনি কাত হ'য়ে শুয়ে পড়বার উপক্রম করতেই খুচরা

টাকাগুলো ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিল।

শব্দ শুনে সে দিকে তাকাতেই বিরজাবাবুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। ব'লে উঠ্‌লেন, "এই যে ক'টা টাকা —বাঃ! নোটও ত রয়েছে দেখছি। ওঃ! আজ বুঝি ভায়া মাইনে পেয়েছ? তা আমার কাছে লুকোবার কি দরকার। আমাদের কি সুদখোর পাওনাদার পেয়েছ। এঁ্যা—আচ্ছা পঁচিশ নিলুম।" ছুখানা নোট এবং খুচরা পাচটা টাকা নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

কেশব প্রথমটা গোপন করার লজ্জায় অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল। এখন সত্য সত্যই তাকে টাকা নিয়ে যেতে উদ্যত দেখে আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "দোহাই বড়দা, নেবেন না। আপনার ছ'টি পায়ে পড়ি। কালকে না পাঠালে বাড়ীতে সব খেতে পাবে না; Insure-এর premium না দিলে forfeit হ'য়ে যাবে—"

বিরজাবাবু দ্বার পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। ফিরে বললেন "আচ্ছা, আচ্ছা, কালকেই দিয়ে দেব'খন।"

তিনি ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন।

কেশব সেই স্থানে প্রাণহীন শবের মত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটা স্পন্দনও আর দেখা গেল না।

বহুভাবের সমন্বয়ে তার মাথার ভেতর সব যেন পাথর হ'য়ে গিয়েছিল।

তিন

পরের সারা দিনটা কেশব প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর মত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা ক'রে রইল—যদি বড়বাবু টাকা দেন। কিন্তু চাইবার সাহস তার হ'ল না।

যতবারই বিরজাবাবুকে সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখেছে মনে হয়েছে একবার মুখ ফুটে চায়, কিন্তু ততবারই একটা দুর্ব্বলতা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে, যখন দেবেন ব'লেছেন হয়ত একটু পরেই—

সন্ধ্যাবেলা বেশভূষা ক'রে বড়বাবু বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কেশব কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে গিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে বল্‌লে, "টাকাগুলো এখন দেবেন কি বড়দা?"

দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে বিরজাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন, "তোমার কি কটা টাকার জন্য ঘুম হ'চ্ছে না। সময় নেই, অসময় নেই;—দেখ্‌ছ বেরুচ্ছি, পেছু ডাকলে।"

কেশবের সমস্ত আশা উৎসাহ-বহ্নির মুখে কে যেন জল ঢেলে দিল। স্পৃষ্ট কেন্নুই-এর মত গুটিয়ে পড়া ভাবে বল্‌লে, "বড্ড দরকার ছিল তাই একটু—"

হাতের ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বড়বাবু অপেক্ষাকৃত নরমকণ্ঠে বললেন, "সুবিধে হ'লেই দিয়ে দেব তোমার আর তাগাদা করতে হ'বে না। তুমি শিগ্‌গীর ক'রে একটা ট্যাক্সি দেখ দেখি—"

তারপর দিন চার আর কোন উচ্চ বাচা নেই; কেশবও সাহস ক'রে আর তাগাদা দিতে পারে নি।

সেদিন হাত ঘড়িটা বাঁধা দিয়ে Insure Companyর premium দিয়ে দিতে হয়েছে। শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত পাঠিয়েছে বাড়ীতে।

শত ছিন্ন কাপড় এবং জামাটা শেলাই করতে ব'সে কেশবের কেবল এই কথাগুলোই মনে আস্‌ছিল। জামা তৈরী করা, কাপড় কেনা কিছুই হ'ল না। ছোট ভগ্নির বিবাহে যে দেনা করা হ'য়েছিল, তার সুদের তাগাদা অনবরতই আসছে। অথচ হাত পা বাঁধা, অসহায় জীবের মত সে সব দেখছে শুনছে সহ্য করছে! প্রতিকারের কোন উপায়ই নেই, যতক্ষণ না বড় বাবু টাকা ক'টা দিয়ে দেন।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা কেশব আফিস থেকে ফিরে দেশ হ'তে লেখা পিতার হাতের একখানা পত্র পেল।

ছোট ভাই মুরারির কঠিন পীড়া,—বাঁচবার আশা কম। বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন, অর্থের আবশ্যক। তাই চেয়েছেন।

তার মুখ শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। পরিশ্রান্ত দেহ অবশ হয়ে আসতেই সে বিছানায় শিথিল অঙ্গে ব'সে পড়্‌ল।

সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং সুন্দর দেখতে ব'লে এই ভাইটি বাড়ীর সকলের অত্যন্ত প্রিয়। সে যখন বাড়ী যায়, মুরারি মুহূর্ত্তমাত্রও তাকে ছেড়ে থাকতে চাইত না। তারই কঠিন অসুখ, বাঁচবার আশা নাই, চিকিৎসার জন্য টাকা চাইই; অথচ কোথায় পায় সে। হাঁ! সে চাইবে জোর করবে; পীড়াপাড়ি ক'রে হোক, যেমন ক'রে হোক টাকা চাইই।

বন্দী অসহায় অন্তরাত্মা কেশবের পিঞ্জরের ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল।

আফিসের পোষাকেই সে বাড়ীর ভিতর চল্‌ল বড়বাবুর সন্ধানে, কিন্তু তিনি বহুপূর্ব্বেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণত তিনি ফেরেন কখন তা জানতে কেশবের বাকি ছিল না, তাই ভরাক্রান্ত মনে অবশ পা দুটো কোন রকমে টানতে টানতে ঘরে এসে সে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা বিরজাবাবু শয্যাত্যাগ ক'রে উঠ্‌তেই কেশব বিমর্ষ মুখে চিঠিখানা তার সম্মুখে ফেলে দিয়ে নতমুখে দাঁড়াল।

বিরজাবাবু বিস্মিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে চিঠিখানা তুলে নিলেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাই তুলে আলস্য ভেঙ্গে বললেন, "তাইত, খুব বেশী অসুখ বোধ হয়?"

কেশব নীরবে মাথা নেড়ে বল্‌ল, "হাঁ! টাকা ক'টা যদি দিয়ে দেন ত আজ পাঠাই, নইলে চিকিৎসা হবে না।" ব্যথায় বেচারার স্বর কেঁপে গেল, কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল।

বিরজাবাবু ইতস্তত ক'রে বললেন, "তাইত কেশব— হাতে ত এখন কিছুই নেই। যা ছিল, রেসে সব দিয়েছি। এখন কোথাও থেকে হাওলাত বরাত ক'রে পাঠাও গে, আস্‌ছে শনিবার নাগাদ ঠিক দিয়ে দেব।"

কেশব বিনীত কণ্ঠে বল্‌ল, "ধার আমাকে শুধু হাতে এখানে কে দেবে বলুন?"

মুখ ধুতে ধুতে উঠে প'ড়ে বিরজা বাবু বললেন, "আচ্ছা দেখি কোথাও থেকে যোগাড় যন্তর ক'রে উঠ্‌তে পারি কিনা।"

ফিরে আসবার সময় কেশব কুণ্ঠিতস্বরে আর একবার আবেদন জানাল, "একটু শিগ্‌গীর ক'রে দেবেন বড়দা, যেন আজকের ডাকেই পাঠাতে পারি।"

কিন্তু টাকা পাওয়া ত দূরের কথা, দিন দুই কেশব বড় বাবুকে আর দেখতেই পেল না। অত্যধিক বিলম্বে মন তার অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌ছিল; অথচ কার কাছে কোথায় টাকা পায় এই মানব সাগরে।

সকাল বেলা অসুস্থ দেহ এবং বিমর্ষ মন নিয়ে কেশব শয্যাত্যাগ করলে।

কর্ত্তা ডাক দিয়ে বললেন, "মার্কেট থেকে মাংস নিয়ে এস দেখি শীঘ্র ক'রে।"

কেশব নীরবে টাকা ক'টা কুড়িয়ে নিল। হিসাব ক'রে দেখ্‌লে বড় জোর ফরমাস মত দ্রব্য হ'তে পারে, কিন্তু মার্কেটের দূরত্ব বাড়ী থেকে বড় কম নয়, এবং আফিসের সময়ও সংক্ষেপ।

একবার মনে হ'ল ট্রাম ভাড়া চায় কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। গুম হ'য়ে সে পথে পড়্‌ল। হাতে তার একটিও পয়সা ছিল না, অগত্যা হেঁটেই চল্‌ল।

ক্রীত দ্রব্য নিয়ে যখন সে বাড়ী ফিরল, তখন আফিসের সময় উত্তীর্ণ প্রায়। তাড়াতাড়ি মাংসের পুঁটুলিটা রকের উপর নামিয়ে, অস্নাত, অভুক্ত অবস্থাতেই আফিস চল্‌ল; কেহ ডেকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা ক'রলে না।

দুপুর বেলা অসহ্য ক্ষুধায় তার সর্ব্ব দেহ ঝিমঝিম করতে লাগ্‌ল। চোখের সামনে বড় বড় খাতাগুলোর লেখা যেন সব ধোঁয়ার মত ক্রমাগতই কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল।

কাছে এমন একটাও পয়সা নেই যে একমুঠো মুড়ি কিনেও জল খায়। হয়ত কোন সহকর্ম্মীর নিকট হ'তে দু' এক পয়সা নিয়ে জলযোগ করতে পারে—কিন্তু কথাটা মনে উঠ্‌তেই ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ক্ষণেকের জন্য সে ক্ষুধার জ্বালাও ভুলে গেল।

একটু মুক্ত বায়ুর জন্য সে হাতের কলমটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

কার্য্যান্তে বহু দিনের রুগ্ন ব্যক্তির মত কম্পিত পদে যখন সে বাড়ীতে ফিরে এল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়।

নিজের ছোট ঘরখানার মধ্যে ঢুকে সে শয্যার উপর

সটান শুয়ে পড়্‌ল। দাঁড়াবার বা কথা বলবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত ছিল না তার।

আজ বড় ক'রে মনে হ'চ্ছিল—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, দেশের কথা। তাঁদের পাশে ছুটে যাবার জন্য মন তার ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ছিল। রুগ্ন ভ্রাতা; কতদিন তাকে দেখেনি। হয়ত একবার দাদাকে দেখ্‌বার জন্য একবার তার কোলে উঠবার জন্য মুরারি কত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। সেই ভাই আজ তার মৃত্যু শয্যায়। তাকে দেখ্‌তে যাওয়া ত দূরের কথা, চিকিৎসার জন্য সামান্য কয়েকটা টাকাও পাঠাতে পারছে না।

উত্তেজনায় আবেগে কেশব শয্যার উপর উঠে বসল। বড় বাবুর কাছে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বে।

শ্লথ কম্পিত পদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রে বড়বাবুর ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

বিরজাবাবু তখন সস্ত্রীক থিয়েটারে যাবার জন্য প্রস্তত হ'চ্ছিলেন।

কেশব দ্বারের পাশ থেকে কুণ্ঠিত নম্র কণ্ঠে আহ্বান করলে, "বড়বাবু!"

বিরজাবাবু তখন কতকটা হেয়ার-লোসন মাথায় ঢালছিলেন। আহ্বান শুনে ফিরে তাকিয়ে কেশবকে দেখে ঈষৎ তপ্ত কণ্ঠে বললেন, "কে? ও কেশব! তা এখন?"

কেশব সঙ্কুচিত স্বরে বল্‌লে, "টাকাগুলো কি আজ দেবেন?"

বিরজাবাবু উষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, "তুমি যে কাবলিওয়ালার বাবা হে! সময় অসময় নেই, স্থান অস্থান নেই, কেবল তাগাদা!—

কেশব ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে, বাধা দিয়ে বল্‌ল, "দোহাই বড়দা, এখনও টাকা না পাঠালে ভাইটা হয়ত বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। আমি কি কম বিপদে পড়ে আপনার কাছে টাকা চাইছি।" কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

বিরজাবাবুর স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কিসের টাকা?"

বিরজাবাবু দ্রুত হস্তে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে, কথাটা যেন বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, এমন ভাবে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, "এই দেখনা, টাকা একদিন হাতে না থাকায়, বড্ড দরকারে প'ড়ে পঁচিশটা টাকা নিয়েছিলুম। তা বলব কি সেই থেকে তাগাদার ঠেলায় উদ্বাস্ত! নাও চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

কেশব অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমার ছোট ভাইএর বড্ড অসুখ। বাড়ীতে টাকা না পাঠালেই নয়, তাই চাইছিলুম বৌদি; নইলে আপনাদের খেয়ে—"

সুহাসিনী দ্বারের পাশে স'রে এসে কোমল কণ্ঠে কেশবকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "আজ রাত্রে টাকা ত আর পাঠান যাবে না। কাল পেলে কি চলবে ঠাকুরপো?"

কেশব সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বল্‌লে, "হাঁ, চল্‌বে।"

তারপর সে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মনে আহারান্বেষণে চল্‌ল।

খেতে ব'সে অন্নের উপকরণ যখন ডাল ব্যতীত অন্য কিছু মিলল না, তখন কেশবের আহারের রুচি আর রইল না। জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুর মশাই, আর কিছু নেই?"

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে মনের প্রচ্ছন্ন বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললে, "আজ মাংস হয়েচে ব'লে অন্য কিছু ত রান্না হয়নি। তা বড় বাবুর এক দঙ্গল বন্ধু মিলে বিকাল বেলা চেঁচে খেয়ে গেছে।"

মুখের গ্রাসটা কেশবের আবার পাতের উপর নেমে এল। ক্ষোভে, দুঃখে, অশ্রুসজল চোখে কেশব অভুক্ত অবস্থাতেই ঘরে ফিরে এল।

বাড়ীর ভিতরের দূষিত বাষ্পে তার যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে ব্যথায় আত্মগ্লানিতে।

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কেশব এত দৌর্ব্বল্য অনুভব করছিল যে, আফিস যাবার তার প্রবৃত্তি হ'ল না। অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানাতেই প'ড়ে রইল। তা ছাড়া টাকা যে আজ তার চাইই।

বহুক্ষণ পর সে শয্যা ছেড়ে উঠে ব'সল। তৃষ্ণায় ক্ষুধায় মন বিকৃত।

মাতালের মত টলতে টলতে সে উঠে দাঁড়াল।

মাথার ভিতর দারুণ বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে অকথ্য যন্ত্রণা। সে ভেবেই পাচ্ছিল না একটা দিন আর রাতে মানুষের দেহ ও মনের অবস্থা এতটা শোচনীয় হ'য়ে উঠে কি ক'রে।

কোন রকমে নিজেকে টেনে তুলে সে দ্বারের পাশে এসে দাঁড়াল; কিন্তু মাথাটা ঘুরে উঠ্‌তেই ধপ্‌ ক'রে মেঝের উপর ব'সে পড়ল।

এমন সময় পিয়ন একটা পোষ্টকার্ড ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেল।

তার চিঠি! অজ্ঞাত আশঙ্কায় হাতড়াতে হাতড়াতে সে কার্ডখানা তুলে নিল।

চোখে যেন সব ঝাপসা হ'য়ে আসছে। মাথাটা নিচু ক'রে চোখের অতি সন্নিকটে কার্ডখানা ধ'রে সে লেখা পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু অক্ষরগুলো যেন সব জট্ পাকিয়ে, বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে একতালে নাচতে সুরু করেছে।

অত্যধিক আশঙ্কায় উত্তেজনায় তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

প্রাণপণ আত্মদমন ক'রে সে মাথাটা আরও নামিয়ে এনে পড়তে লাগল :--

মুরারি গত পরশু সন্ধ্যায় মারা গেছে। তোমার এমন প্রবৃত্তি হ'ল না, তার চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ গোটাকত টাকা পাঠাও। ফূর্ত্তিটাই বড় হ'ল—"

একটা অস্ফুট অব্যক্ত আর্ত্তনাদ! কেশবের চোখ ক্রমশঃই বিস্ফারিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ভূমিকম্পে কম্পিত অট্টালিকার মত তার সর্ব্বাঙ্গে গোটাকতক কম্পন ব'য়ে গেল, তারপর শিথিল হাত থেকে স্খলিত পত্রখানার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাও মেঝের উপর নেমে এল।

কতক্ষণই এমনই সংজ্ঞাহীনের মত কেটে গেল।

সহসা তার নামে অহ্বান শুনে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল বাড়ীর একজন দাসী।

কেশবকে তাকাতে দেখে সে বলল, "বড় বৌদি এই হার ছড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, বাঁধা দিয়ে তোমার টাকা দিতে বলেছেন—"

কেশবের কানে যেন কোন কথা পৌঁছায় নি এমনই ভাবে বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর সহসা একটা প্রবল ধাক্কায় হৃতচেতনা যেন ফিরে পেয়ে উদাসকণ্ঠে বলল, "বৌদির স্নেহের দান মাথা পেতে নিলুম, কিন্তু এই চিঠিটা তাঁকে দিয়ে বল যে আর আমার টাকার দরকার নেই ;—"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা ঝিয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আর একবার সে লুটিয়ে পড়ল কঠিন শীতল মেঝের উপর।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

আধুনিকতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ এম-এ

সমাজ-জীবনের ইতিহাসে অধুনা ক্রমশঃই প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। প্রতি যুগেই সমাজের কতগুলি চিন্তা ও আদর্শ আছে যাহা তাহার পৈত্রিক—ইতিহাস-লব্ধ, আবার তেমনি কতগুলি আদর্শ ও ব্যবস্থা আছে যাহা তাহার নিজস্ব—তাহার আধুনিক সাধনার ফল। কাজেই এক হিসাবে প্রতিযুগেরই একটা আধুনিকতা আছে—প্রতি যুগেই নর-নারীর মনের চেহারার মধ্যে খানিকটা অংশ আছে যাহাতে ঐ যুগেরই বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,ইহা নাকি বিশেষভাবে এবং বহু পরিমাণে আধুনিক। এমনকি কেহ কেহ এই আধুনিকতা কথাটা সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান জীবনের ছবি সম্বন্ধেই ব্যবহার করেন। ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কারণ বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের ভিতর সমাজের চিন্তা ও আদর্শ এত বদ্‌লাইয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ যুগে আধুনিক যেমন প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে আর এরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। কাজেই বর্ত্তমান জীবন বহু পরিমাণে আধুনিক জীবন।

এই আধুনিকতার লক্ষণ এত বহু ও বিচিত্র যে তাহার সন্ধান করা বৃথা। Eucken বর্ত্তমান জীবনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

The speed of life has accelarated to an appalling extent ; more and more people are crowding into our great cities and world-capitals ; nothing is listened to that is not self-assertive, loud nay, shrieking ; attention is only paid to that which is new, exciting and unheard of. The new is valued because it is new, however empty or foolish it may be in itself. At the sametime we perceive no endless amount of vain appearance, a dislike of all that is earnest and deep in life, a delight in more bold negation, as a whole, a wretched pseudo-culture.

Eucken এই উদ্ধৃতিতে আধুনিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকিলেও ইহাতে যে আধুনিক জীবনের স্থূল লক্ষণগুলি স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আধুনিক মনের প্রধান লক্ষণ বিশ্ব-প্রগতিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং সেই পরিমাণে অতীতের সকল প্রতিষ্ঠিত মত ও আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস—অন্ততঃ ঘোরতর সন্দেহ। আধুনিক মন যৌক্তিক মন নহে—সন্দেহবাদীও নহে, তবে ইহা একান্ত জ্ঞান-নির্ভর এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাহীন। বর্ত্তমান জীবনের বিচিত্র আয়োজন ও প্রয়োজনে নর-নারীর মন আচ্ছন্ন হইয়াছে—জীবন-যাত্রার প্রশান্ততা ও জীবনে আত্ম-দৃষ্টির স্পষ্টতা লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই আধুনিক জীবনে জ্ঞান-চর্চ্চার পর্য্যাপ্তি আছে কিন্তু আদর্শের প্রতিষ্ঠা নাই। সত্যের আজ আর কোন চিরন্তন মাপ-কাঠি নাই—গণতান্ত্রিক সাধনার ফলে জনতা আজ সত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই যাহা কিছু অভিনব, যাহা কিছু জনতাকে উন্মত্ত করিতে পারে তাহারই একমাত্র মূল্য। আজ পণ্ডিত হইতে খেলোয়াড়ের আদর বেশী, লেখক হইতে অভিনেত্রীর মূল্য অধিক, কলঙ্কীর নাম বিশ্ব-বিশ্রুত কিন্তু সাধকের নাম গণ্ডী-বদ্ধ। সত্যের বাহন আজ চিন্তা নহে—ধী নহে, সত্যের বাহন আজ publicity, propaganda। আধুনিক মনের সব চাইতে প্রশংসিত গুণ ইহার বহির্মুখতা বা চিন্তাহীনতা ; আধুনিক প্রতিভার সব চাইতে বড় লক্ষণ ইহার একান্ত-উগ্র ইচ্ছা-শক্তি, এবং কাজেই ইহার বিকাশ ততটা সত্যের

আবিষ্কারে নয়, যতটা সংগঠন-ক্ষমতায়। সংযম, যাহা উন্নত মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিচয়, আধুনিক নর-নারীর চরিত্রে তাহার প্রশংসা নাই। বর্ত্তমান সমাজে ভদ্রতার আতিশয্য আছে কিন্তু বিনয়ের লেশ নাই, আত্ম-শ্লাঘায় লজ্জা নাই, অহঙ্কারে কুণ্ঠা মাত্র নাই। চিন্তায় এবং আদর্শে, কার্য্যে এবং ব্যবহারে ইহাই আধুনিকতার যথার্থ চিত্র।

ইহার তাৎপর্য্য কি? আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান জীবনের এই বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে আমরা ইহার লক্ষ্যচ্যুতিরই পরিচয় পাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মানুষের জীবন-যাত্রার আয়োজন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, মানুষের জ্ঞানের প্রসার এত বেশী বিস্তার লাভ করিতেছে যে, আধুনিক নর-নারী জীবনের এই আকস্মিক বৈচিত্র্যে এবং জ্ঞানের এই আকস্মিক বিস্তৃতিতে আপনার যথার্থ স্থানটি এখনো খুঁজিয়া লইতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা যেন কক্ষ-চ্যুত জ্যোতিষ্কের নিরুদ্দেশ অভিসার। তাই আধুনিক সাধনা সকল দিক হইতে জীবনে ও জ্ঞানে একটি নিবিড় ঐক্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। A.C.Bradelyর মতে

The modern dislike of church-going, the modern incapacity to write a long coherent poem, the modern passion for music and for realism, even sordid realism, all spring from the same roots, for the thirst for an infinite harmony.

আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ঐক্যের সন্ধানে আধুনিক সাধনা শুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেপথুমান হইয়া ঘুরিতেছে এবং আধুনিক জীবনের সঙ্কটকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

আধুনিক জীবন-চিত্রের তাৎপর্য্য যাহাই হোক না কেন, আধুনিক সাধনার দিক দিয়া তাহার একটা ইতিহাস ও উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিকতা বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি আমাদের বিশ্বাস তাহার গোড়াপত্তন Theory of Evolution হইতে। প্রাণি তত্ত্বের ক্ষেত্রে Darwin যে সৃষ্টি-প্রগতির সূত্র ধরিয়া দিলেন তাহাতে আধুনিক জগতের এক নূতন নেত্র খুলিয়া গেল। জ্ঞানের প্রতি-ক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ অভিব্যক্তির ধারা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জীবন হইতে আদর্শের প্রভাব চলিয়া যাইতে লাগিল—কারণ প্রাণি-জগৎ যেমন ক্রম-অভিব্যক্ত, মানুষের চিন্তা জগৎকে তেমনি অবসান-হীন অভিব্যক্তির ক্ষেত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল। ইহাতে চিরন্তন আদর্শের স্থান কোথায়! তাই Ethics-এর জায়গায় আসিল Evolutionary Ethics, Rationalistic Political Philosophyর স্থান লইল Historical Jurisprudence। এক কথায় আধুনিক জগত জানিল সত্য কখন স্থির নহে—জগৎ-সৃষ্টির একমাত্র ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন, চঞ্চলতা।

আধুনিক সাধনার ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি-বাদের একান্ত তীব্রতার প্রথম ফল হইল, চিন্তা জগতের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ঐক্য প্রতিপাদ-চেষ্টা। Herbert Spencer-এর Synthetic Philosophy হইতে আরম্ভ করিয়া Bertrand Russel-এর দর্শন-সংজ্ঞা 'whole story of everything'-এর মধ্যে আমরা একই প্রয়াস লক্ষ্য করিতে পাই। আধুনিক সাধনা জীবনে যে ঐক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই ঐক্যের ব্যর্থ সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। এই চেষ্টাতে আধুনিক সাধনা শুধু ব্যর্থ হয় নাই, ভ্রান্ত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিত চিন্তার ক্ষেত্রে এক সর্ব্বব্যাপী সমন্বয় খুঁজিতে যাইয়া তথ্য ও তত্ত্বের, জ্ঞান ও আদর্শের মধ্যে যে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবধান রেখা তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন। Neitzsche সমাজ-জীবনে Survival of the fittest-বাদ খাটাইতে যাইয়া দয়া-দাক্ষিণ্যকে জীবন হইতে নির্ব্বাসন দিতে চাহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বস্তু-নিষ্ঠা আদর্শ-বাদকে পরাহত করিয়াছে। আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া জ্ঞান-চর্চ্চা আর জীবনের মূল্য-নিয়ামকরূপে গণিত হইতে লাগিল না—জ্ঞান-সাধনা নিজেই নিজের সিদ্ধির স্থান গ্রহণ করিল অভিব্যক্তি-বাদের দ্বিতীয় ফল হইল এই যে, মানব-মনে বিচার (reason) অপেক্ষা ইচ্ছা-শক্তিই (will) উগ্রতর বলিয়া প্রচার করা হইল। William James Will to believ গ্রন্থে ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন। Schopenhaeur Wil to live-ই মানুষের চিরন্তন জীবনী-শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্তে আসিলেন। Neitzcheর Cult of Efficiency বা যোগ্যতা

বাদের ভিতরকার কথাও এই—মানুষ তাহার বুদ্ধির দাস নহে, তাহার একান্ত-উগ্র ইচ্ছা-শক্তির নিয়ন্তা।

আধুনিক সাধনার এই নূতন প্রকাশ বিশেষ করিয়া আমরা দেখিতে পাই বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসায় ও বর্ত্তমান বাস্তব সাহিত্যে। বস্তুনিষ্ঠা আদর্শ-বাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দর্শনের পরিবর্ত্তে মনোবিজ্ঞানের আলোচনাতেই আধুনিক জগতের উৎসাহ ও অনুরাগ বেশী। Abnormal Psychology, Psychology of Sex, Criminology প্রভৃতি ব্যাপারে যে আধুনিক পণ্ডিতগণ ও পাঠকেরা অত্যধিক আকৃষ্ট হন, তাহারি একমাত্র কারণ আধুনিক নর-নারীর বস্তু-নিষ্ঠ মন। বস্তুকে যুক্তি বা আদর্শের তাপে উষ্ণ ও বিকৃত না করিয়া অনাবৃতভাবে সমস্ত অবয়ব-বিকৃতি সহ পরিবীক্ষণে আধুনিক বস্তু-সেবী নর-নারীর অপার আগ্রহ। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যেও ইহার চরিতার্থতার অত বিপুল আয়োজন। সাহিত্যে আজ যে শুচিতা-অশুচিতার সমস্যা উঠিয়াছে, সে সমস্যা সাহিত্যের নয়, তাহা সমগ্র আধুনিক বাস্তব সাধনার। সে সমস্যা বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে Cafe কিংবা Cinema House এ সৃষ্টি হয় নাই, তাহার মূল Darwin শিষ্যদের চিন্তাধারায়—Spencer-এর দর্শনে, Jamesর মনোবিজ্ঞানে, Neitzche-এর রাষ্ট্রনীতিতে।

আধুনিক সাধনা বস্তু-স্বাদী হইলেও একথা ঠিক ইহার অন্তরালে একটি প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি কাজ করিতেছে। আধুনিকতা মানুষের ইচ্ছা-শক্তিকে উগ্রতম স্বীকার করিয়া একদিকে যেমন সংযমকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, প্রবৃত্তিমাত্রের চরিতার্থতাকে অনিন্দনীয় বলিয়া জানাইয়াছে, অপরদিকে সেবা ও ত্যাগের এক সুমহান বীরোচিত আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যুগে ও কয় বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণপাত করিল তাহার অন্তরালে কি প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির পরিচয়। জন-সেবা, শিশু ও মাতৃ-মঙ্গলের জন্য আজ সমস্ত জগৎব্যাপী কি বিরাট প্রচেষ্টা—কত পুরুষ, কত সংখ্যাহীন মহিলা এই সেবা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। F. M. Stawel নামক একজন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক বর্ত্তমান জগতের এই মঙ্গল-কর্ম্মপরায়ণতা, এই ত্যাগ-বীর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন Modern Renascence। আধুনিক সাধনা শক্তির প্রকাশেই সত্যের একমাত্র পরিচয় পাইতে চায়—আত্মার নিষ্ক্রিয় সাধনায় নহে। তাই আধুনিক বীর্য্যের আদর্শ James Conrad-এর Typhon গ্রন্থের Captain MacWhirr জাহাজ নিমজ্জমান, তবু কাপ্তান অবিচলিত ভাবে কর্ম্মাবধানী। বর্ত্তমান জীবনের ইহা আর এক চিত্র।

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

রেডি-ফটো

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

"কি হে ডাক্তার, ক'দ্দূর যাচ্ছ এবার?"

ডাক্তার সুরের সহিত গাহিয়া উত্তর দিল, "বহু-দূর যা—না হৈ।"...

"তবু ক'দ্দূর শুনি।"

কণ্ঠ আরও একটু উচ্চগ্রামে তুলিয়া ডাক্তার তেমনি সুর সংযোগে মৃদু হাস্যের সহিত পুনরায় গাহিল, "আরে, বহুদূর যানা হৈ, ভৈয়া, বহুদূর যানা হৈ......"

তখন সকলে তাহার গন্তব্যস্থানের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া উল্লসিত ভাবে তবলা বিহনে নিজ নিজ তালবোধ অনুযায়ী টেবিল চাপড়াইয়া ডাক্তারের গানে উৎসাহ দিতে লাগিয়া গেল।

মেসের মধ্যে নির্ম্মল ডাক্তারের রসিক এবং আমোদপ্রিয় বলিয়া বেশ একটা খ্যাতি ছিল। হাসির বা মজার কথা লইয়া থাকিতেই সে ভালবাসিত। বাস্তবিক স্তূপের পর স্তূপ জমাট বাঁধা আঁধার করা কালো কয়লা রাশির আশে পাশে যাহারা ছিল, তাহাদের মনে সে আনন্দের হীরকখণ্ড হইয়া জ্যোতি বিকীরণ করিত।

তিন বৎসর হইল 'বাঘদাঘি' Colliery (কয়লার খনি) তে নির্ম্মলচন্দ্র হুগলী জেলার কোন গ্রাম হইতে ডাক্তার হইয়া আসিয়াছে এবং নিজের মধুর স্বভাবে সকলেরই প্রিয় হইয়াছে। সারা বছরের এই একঘেয়ে কলিয়ারী জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আনিবার জন্য প্রতি বৎসরই পূজার সময় কয়েকদিনের ছুটী বেশী লইয়া ডাক্তার একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসে। তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা একটি ফটো ক্যামেরা থাকিত; এটি তাহার সখের জিনিষ—নিজে জার্ম্মানী হইতে আনাইয়াছে। সাধারণ ক্যামেরা হইতে ইহার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার দ্বারা ইচ্ছানুসারে মাত্র এক মিনিটে সুন্দর রূপে যে কোন ফটো প্রস্তুত করা যায়—কোনরূপ অন্ধকার ঘর প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না; কেবলমাত্র ফটো গ্রহণ করার এক মিনিট মধ্যে Ready made Photo (সদ্য প্রস্তুত ফটো ছবি) পাওয়া যায়।

গানের বেগ প্রশমিত হইলে ডাক্তার আপনিই উত্তর দিল "এবার মনে কচ্ছি যাব একবার মেজ শালাজের কাছে।"

২

গোটা দুই বড় বড় কেস্ হাতে থাকায় সুকুমার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কমলার বিবাহের সময় উপস্থিত হ'তে পারে নাই। তারপর বছর আড়াই কেটে গেছে কিন্তু শালা ভগিনীপতিতে আজও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সুকুমার কানপুরে সপরিবারে থাকিয়া ওকালতি করে; ন'মাসে ছ'মাসে হয়ত একবার বাড়ী আসে। আর ভগিনীপতি নির্ম্মলচন্দ্রও ঝরিয়ার কোন্ এক কয়লার খনিতে ডাক্তারি করে। কাজেই আড়াই বৎসরের মধ্যে দু'জনের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ডাক্তার বাড়ী আসে ত উকীল দেশে থাকে না; আবার উকীল দেশে আসে ত ডাক্তার হাজির থাকে না।

কমলার শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় এবার তাহার দাদার সহিত সে কানপুরে চলিল। কিছুদিন এখন সেখানে থাকিবে। কমলা তাহার বৌদির অপেক্ষা বছর চার পাঁচের ছোট। শোভা একাই কানপুরে থাকে; এখন তাহার ঠাকুরঝি কমলাকে এই নির্ব্বান্ধবপুরীতে কিছুদিনের জন্য সঙ্গীরূপে পাইয়া তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে তাহার বড় ভাল লাগিত।

শোভার স্বভাব একটু গম্ভীর প্রকৃতির; বয়সের চঞ্চলতা তাহার নাই। কোমল বর্ণের সুঠাম কমনীয় দেহখানি

মাধুর্য্য ও সরলতায় মণ্ডিত। আয়ত চক্ষুদ্বয় অতি শান্ত; তাহাতে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ নাই, কুটিলতা-শূন্য সরল দৃষ্টি। কমলার কৃশ তনুখানি লালিত্যে শোভার অপেক্ষা কিছু উজ্জ্বলতর; তবে দেহায়তনে ও মুখাবয়বে এখনও বালিকা ভাব। তাহার ক্ষুদ্র ললাটের উপর শ্রাবণ-ঘন ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সযত্নে বিন্যস্ত। বঙ্কিম ভ্রূযুগের কোলে অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার চঞ্চল চক্ষু সদাই যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। গোলাপী ওষ্ঠে হাসির ঝঙ্কার ভরিয়া নিজের চঞ্চলতায় অপরকে সদাই অস্থির করিয়া তোলে।

৩

শান্তিপুরের কালা পেড়ে ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবী চড়াইয়া চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধান চসমা পরিয়া নির্ম্মল ডাক্তার কাঁধে কেসের মধ্যে ফটো ক্যামেরা ঝুলাইয়া নিয়মিত শারদভ্রমণে বাহির হইল।

যথা সময়ে কানপুরে নামিয়া গ্রামের মধ্যে কিছুদূর গিয়া "ফোকাসিং স্ক্রীন্" (মুড়ী দিয়া দেখিবার কালো কাপড়) -টিকে বাহির করিয়া পিঠে বাঁধিয়া লইল। তাহার উপরে লেখা ছিল:—

PHOTO FINE ART

Full Figure

READY-MADE PHOTO

in one minute

Rs. 2/8/- each Copy.

পূর্ণাবয়ব

সদ্য প্রস্তুত ফটো ছবি

এক মিনিটেই পাইবেন

আড়াই টাকায় একখানি

এই অভিনব বেশে সজীব বিজ্ঞাপন সাজিয়া নির্ম্মলচন্দ্র পথে পথে হাঁটিয়া চলিলেন। রাস্তায় বালকদল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল, আর যুবকদল অবাক হইয়া নিজ নিজ মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

একস্থলে জন আষ্টেক-দশ বাঙ্গালী যুবক বসিয়া বোধ করি ছুটীর দিনের 'গট্‌রা' করিতেছিল। এই অদ্ভুতদর্শন ফটোগ্রাফারকে দেখিয়া তাহাদের কৌতূহল জন্মিল। একজন ডাকিল, "ও মশাই, শুনছেন?"

ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ডটীকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নির্ম্মলচন্দ্র তাহাদের সন্নিকটস্থ হইলে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ম'শায়ের কি ফটো তোলা হয়?"

ফটোগ্রাফার পিঠের বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে, পরিচয় পত্র ত পিঠে বাঁধাই রয়েছে।"

"ছবি কি এখনই পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়ই। দেখছেন না in one minute (মাত্র এক মিনিটে)।"

"তবে আমাদের একটা group (দলের ছবি) তুলে দিন না।"

ফটোগ্রাফার তখন তাহাদিগকে ঠিকমত বসিতে বলিয়া ক্যামেরা খাটাইতে লাগিয়া গেল। তারপর ছবি তুলিয়া তাহাদিগকে বারো কপি দিয়া ত্রিশ টাকা 'বউনি' করিল। ফটোগ্রাফার ভাবিল, যাত্রা শুভ।

তাহারা ছবি পাইয়া বেশ খুসী হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ম'শায় এখানে কোথায় থাকেন?"

থাকি না ত এখানে। এই কি জানেন, বেরিয়েছি বেড়াতে; যা রোজগার হয়। দেশ বেড়ানও হবে, গাঁটের পয়সাও খরচ হবেনা; বুঝলেন কিনা। তবে হাঁ, সুকুমার বাবু ব'লে একজন উকীল এখানে থাকেন তাঁর বাসায় হয়ত একবার যেতেও পারি।"

"উকীল সুকুমার? সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"Here you are! এই ত সে রয়েছে এখানেই। এই সুকুমার শোন্, শোন্। চিনিস্ এই ভদ্রলোককে?"

একটী ছিপ্‌ছিপে গড়নের গৌরকান্তি যুবা জিজ্ঞাসু নয়নে আগন্তুক ফটোগ্রাফারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার একটু ইতস্ততঃ অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া নির্ম্মল কহিল,

"না ; উনি আমাকে চিনবেন না। ওঁর দাদা বিনয়বাবুর সঙ্গে আমি এক অফিসেই কাজ করি ; তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ। তিনিই আপনার নাম ক'রে বললেন যে, কানপুরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলে নতুন যায়গার বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।"

সুকুমার তখন অপেক্ষাকৃত সপ্রতিভভাবে বলিল, "ও, দাদার কাছ থেকে আসছেন। তা' বাসায় চলুন। এখন কয়েক দিন এখানে থাকছেন ত ?"

"হাঁ, দিন কয়েক থাকবো বৈকি। কিন্তু আপনার বাসায় গেলে আপনার কোন অসুবিধা কিছু"—

"কি আশ্চর্য্য! চলুন চলুন। অসুবিধা আবার কিসের ?"

সঙ্গীদের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "যান যান ; হাঁ, অসুবিধা আবার কিসের। আর দেখ সুকুমার, এই সুযোগে একখানা Pair (যুগলমূর্ত্তি) তুলিয়ে আমাদের নয়ন সার্থক করিয়ো হে।"

৪

ফটোগ্রাফারের জন্য বহির্বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। দাদার বন্ধু বলিয়া যথেষ্ট খাতির আপ্যায়নও হইল। এইরূপ সুযোগ পাইয়া সুদূর বিদেশে কাহার না ফটো তোলাইতে সাধ হয়। সুকুমারের একখানি নিজের, একখানি তাহার প্রণয়িনী শোভার, একখানি দু'জনের Pair, একখানি ভগিনী কমলার এবং একখানি কমলা ও শোভার একত্রে এই পাঁচখানি ছবির ফরমায়েস্ হইল। নির্ম্মল ত ইহাই চাহিতেছিল।

মেয়েদের ফটো তুলিবার সময় সুকুমারের উপস্থিতিতে অধিক লজ্জাবশতঃ জড়সড় ভাবের জন্য পাছে ছবি মন্দ হইয়া যায় সে জন্য তাহার না থাকাই স্থিরীকৃত হইল।

বেশ-বিন্যাস করিয়া একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী ফটো তোলাইবার জন্য দুয়ারের বাহিরে আসিতেই ফটোগ্রাফারকে দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষে একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহার বিস্মিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "এঁ্যা, তু-মি ?"

নিম্নস্বরে নির্ম্মল তাড়াতাড়ি কহিল, "চুপ্ চুপ্। কা'কেও যেন কিছু বোলো না।"

সুচতুরা কমলা একমুহূর্ত্তেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। সে স্বামীর মতই আমোদপ্রিয়, এবং এইরূপ হাসি তামাসা লইয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। মৃদু হাস্যের সহিত ইসারায় সে স্বামীর কথার সমর্থন করিল।

দুই একটি ছোট কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া তাহার ফটো তোলা শেষ করিয়া নির্ম্মল অস্ফুটস্বরে কহিল, "যাও দিকিন, এবার তোমার বৌদি'কে সঙ্গে নিয়ে এস।"

"হঁ্যা যাই", বলিয়া কমলা তাহার বৌদিদি শোভাকে ধরিয়া আনিতে চলিল। শোভা একেই একটু লাজুক। সে সহজে আসিতে রাজী হয় না ; বলে আমার লজ্জা করে। কমলা হাসিয়া টানাটানি লাগাইয়া দিল ; বলিল, "সব-তা'তেই তোমার লজ্জা। কি মেয়ে মা! খালি লজ্জা আর লজ্জা। রাজ্যের লজ্জা সবই কি ভগবান তোমাকে দিয়েছেন ?"

কিছুক্ষণ এইরূপ পীড়াপীড়ির পর কমলা তাহাকে লইয়া হাসিতে হাসিতে বসন্তহিল্লোলের মত ফটোস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাগ্যে শোভা নিজের লজ্জায় নিজেকে সামলাইতেই ব্যস্ত ছিল ; নচেৎ কমলার হাস্যরঞ্জিত মুখখানি এবং ফটোগ্রাফার নির্ম্মলের মুখের হাসি লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা তাহার দৃষ্টিগোচর হইলে অনর্থ ঘটিত।

কমলার পৃথক একটি ফটো তোলার পর নির্ম্মল কহিল, "আপনারা দুজনে বসুন তা'হলে ঠিক হয়ে এবার।"

কমলা কৃত্রিম লজ্জার সহিত মুখ ঈষৎ নত করিয়া বলিল, "কেমন ক'রে বসলে ভাল হবে, জানিনা ত। আপনিই ঠিক ক'রে বসিয়ে দিন না।" তারপর বৌদি'র পানে মুখ তুলিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "নিজেরা বসলে হয়ত ঠিক মানান সই হবে না। কি বল বৌদি ?"

কমলার হাতটা কাছের দিকে একটু টানিয়া শোভা ঠোঁট ফাঁক না করিয়াই ছোট্ট করিয়া উত্তর দিল, "হুঁ।"

তখন নির্ম্মল বলিল, "দেখুন, উনি ঐ চেয়ারে বসুন, আর আপনি পেছন দিকে একটু বাঁ পাশে আপনার ডান হাতখানা ওঁর বাঁ কাঁধের ওপর রেখে দাঁড়ান। তা'হলে

বেশ সুন্দর মানাবে'খন।" বলিয়াই নির্ম্মল ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ফটোগ্রাফারের নির্দ্দেশ মত তাহারা দাঁড়াইলে পর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নির্ম্মল শোভাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনার মুখটা অত নীচু ক'রে থাকলে ত হবে না; আর একটু তুলতে হবে যে।"

শোভা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাহার চোখ দুটাকে বন্ধ করিয়া দিল।

নির্ম্মল যেন হাল ছাড়িয়া দিয়া হাত দুখানি হতাশ ভাবে দুইদিকে প্রসারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বা রে; চোখ বুজে থাকলে কি ছাই ছবি হবে?" বলিয়া হাসি লুকাইবার জন্য Focussing Screen এর মধ্যে মাথা পুরিল। ফটোগ্রাফারের মুখটা নিজের চোখের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইতে দেখিয়া শোভা অনেকটা সহজ অবস্থায় আসিল এবং চক্ষুপল্লব দুইটী ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। বাস্তবিক তাহার সেই সরমকুণ্ঠিত লজ্জানম্র দৃষ্টির সহিত অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভার মিলনে তাহাকে তখন অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাইতেছিল।

নির্ম্মল ফোকাসিং স্ক্রীন হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, "হাঁ, ঠিক ঐভাবে থাকবেন। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।"

ব্যস্, আর কি! অনেক কষ্টে শোভা লজ্জা কাটাইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু আবার নিজের রূপের এই নির্লজ্জ প্রশংসা শুনিয়া পশ্চিমাকাশের সমস্ত রক্তিমাটুকু আসিয়া তাহার দুই গণ্ডে আশ্রয় লইল। ইহার উপর প্রগলভা তড়িত-চকিত-নয়না কমলা গ্রীবাটী ঈষন্মাত্র হেলাইয়া চোখের তারা দুইটি কোণের দিকে টানিয়া বিলোল কটাক্ষে স্মিত-বিকশিত নয়নে বলিয়া উঠিল, "আর আমাকে?"

নির্ম্মল এমন সুযোগ ত্যাগ করিল না; কল টিপিয়া দিল। তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের এই অপরূপ মূর্ত্তির ছবি তোলা হইয়া গেল। কল টিপিয়া দিয়া নির্ম্মল হাসিতে হাসিতে কমলার কথার উত্তর দিল, "আপনাকেও চমৎকার মানিয়েছে।"

শোভা নিরতিশয় লজ্জায় ও বিরক্তিতে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল এবং মনে মনে কমলার মুণ্ডুপাত করিতে লাগিল। তাহার অস্থিরতা অনুভব করিয়া ফটোগ্রাফার বলিল, "আচ্ছা, আপনারা এবার তা'হলে যেতে পারেন—ছবি তোলা হয়ে গেছে।"

কমলা অগ্রসর হইয়া বলিল, "কই. কখন ছবি তোলা হল? বাঃ।"

"এই যে" বলিয়া নির্ম্মল একখানি ছবি বাহির করিয়া সন্দিগ্ধা কমলার হস্তে দিল। ছবি দেখিয়া কমলা একটু বিস্মিত হইল এবং বৌদি'কে ছবিখানি দেখাইবার জন্য পিছন ফিরিতে দেখিল শোভা ইতিমধ্যে কখন পলাইয়া গিয়াছে। কেহ নাই দেখিয়া কমলা আরও কাছে আসিয়া কহিল, "বৌদি' কিন্তু ভারী রেগেছে। ছি ছি। কি ছবি হ'ল বেহায়ার মত! দাদা দেখলে কি বলবে বল দিকিন! মা গো মা—কি দুষ্টু তুমি!"

৫

ফটো লইয়া বৌদি'র সম্মুখে উপস্থিত হইতেই শোভা তিরস্কারের স্বরে কহিল, "ছি ঠাকুরঝি, ওর সামনে অমন বেহায়ার মত হাসি তামাসা করা তোমার মোটেই ভাল হয়নি।"

কমলা একটু অপ্রস্তুতের ভাব দেখাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর কাপড়ের ভিতর হইতে ফটো বাহির করিয়া বৌদিকে দেখাইল।

প্রথমটা বোধ করি নিজের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখার অস্ফুট আভাষ ফুটিয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই হয়ত কমলার হাস্যমুখী লীলাময়ী ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে মৃদুহাস্যরেখা অন্তর্হিত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে যেন ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর কমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, কি ঢং-এর ছবিই হয়েছে তোমার। এ ছবি আমি কিছুতেই রাখবো না; ছিঁড়ে ফেলি", বলিয়া ফটোখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

"আহা—হা! কর কি বৌদি! ছিঁড়ো না," ছিঁড়ো

না। আমার ছবিটাই না হয় একটু থিয়েটারী ঢংএ দেখাচ্ছে। তেমনি তোমার ছবিটি দেখ্ দিকিন কেমন লজ্জানত বধূটির মত হয়েছে। সত্যি বৌদি তোমার ছবিটি বড় সুন্দর হয়েছে। ও ফটোওয়ালা মিন্সে বড় মিছে বলেনি তখন।"

"ও মিন্সেটাও কিন্তু বড় বদ। গেরস্তর ঘরের বৌঝিদের মুখের পানে অমন বেহায়ার মত চেয়ে এমন বিশ্রীভাবে হাসে!"

বৌদি'কে একটু রাগাইবার অভিপ্রায়েই কমলা হাসি চাপিয়া বলিল, "তা যাই বল। ও লোকটাকে দেখতে কিন্তু বেশ। নয় বৌদি?"

গ্রীবা বাঁকাইয়া যথার্থ ক্রোধের সহিত শোভা বলিল, "ও লোকটাকে দেখতে ভাল কি মন্দ, তাতে আমাদের কি? ও ছোটলোক। দেখছ না দুষ্টুমি ক'রে কি বিশ্রী ছবি তুলেছে তোমার। এ ছবি আমি কিছুতেই রাখবো না।" বলিয়া কমলাকে আর কোনরূপ সুযোগ না দিয়া হাতের ছবিখানি একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কমলাও ক্রোধের ভাব দেখাইয়া চঞ্চল চরণক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা ফটোগ্রাফারের নিকট হইতে আর একখানি ঐ ছবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বৌদিকে পরাজয় স্বীকার করায়।

৬

দেখা মিলিল বাগানে। কমলার মুখে শোভার ছবি ছেঁড়ার কথা শুনিয়া নির্ম্মল হাসিয়া আকুল হইল। বলিল, "তবে এখন ব'স এখানে, একটু আলাপ করি। বৌদি রাগ করেছে, এখন ত আসবার ভয় নেই।"

"ভরসাও বিশেষ নেই" বলিয়া কমলা হাসিয়া স্বামীর পার্শ্বে বেঞ্চের উপর বসিল। তারপর আরম্ভ হইল তাহাদের কতদিনের জমা হওয়া কত সে প্রাণের কথা। ক্রমে স্থান কাল ভুলিয়া তাহাদের বিশ্রম্ভালাপ জমিয়া উঠিল। কথা কহিতে কহিতে কখন যে কমলার কোমল হাত দু'খানি নির্ম্মলের হাতের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কাহারও খেয়াল ছিল না। এমনই সুখের কথায় যখন তাহারা বিভোর হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠবিনিসৃত "ঠাকুরঝি" ডাকে উভয়েই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ক্রোধকম্পিত-কলেবর শোভা তাহার অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নযুগল তাহাদের দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া অতি দ্রুত পদক্ষেপে বাগান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়া যাইবার পর কমলা সহজ সুরে বলিল, "আমি ত ব'লেই ছিলাম। এখন দেখলে ত। যাই আবার রাগভঞ্জন করিগে।" বলিয়া কমলাও বাহির হইয়া গেল।

* * *

রাগটা প্রশমিত হইলে কমলাকে তিরস্কার করার জন্য শোভা একটু ক্ষুণ্ণ হইল। ভাবিল ছবিখানা না ছিঁড়িলেও হইত। তাহার পর কমলাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সারা বাড়ী খুঁজিয়া বাগানের দিকে আসিতেই অবাক বিস্ময়ে দেখিল কমলা ও সেই ফটোওয়ালা দু'জনে মুখোমুখী বেঞ্চে বসিয়া সহাস্যবদনে গভীর গল্পে নিমগ্ন এবং কমলার হাত দু'খানি তাহার হাতের মধ্যে বদ্ধ। শোভার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে "ঠাকুরঝি" বলিয়া ডাক দিয়া দ্রুতবেগে বাগান ছাড়িয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কমলা, যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহার এই কাজ! ক্ষোভে ও দুঃখে শোভার চোখ ফাটিয়া জলের ধারা নামিল।

রাত্রে স্বামীকে কহিল, "ঠাকুরঝিকে তুমি এবার পাঠিয়ে দাও।"

সুকুমার একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

শোভা তখন ফটোগ্রাফার ও কমলা সংক্রান্ত সকল কথা বলিল। কিন্তু বাগানে হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া গল্প করার কথাটা বলিয়া উঠিতে পারিল না; বোধ করি দুর্ব্বলতারই জন্য।

সুকুমার বলিল, "এই কথা? এ আর এমন অন্যায় কি? এই সামান্য অপরাধের জন্য এত বড় দণ্ড দেওয়া কি উচিত? এ যে দেখ্‌ছি বড় কড়া হাকিম।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া শোভা বলিল, "জানিনা বাপু। এমন ফোক্কড়ের বংশ! যেমন ভাই, তার তেমনি বোন।"

৭

মুখখানি ম্লান করিয়া শোভার ঘরে ঢুকিয়া কমলা বলিল, "হ্যাঁ, বৌদি, তুমি নাকি দাদাকে ব'লে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

কমলাকে সত্যই শোভা প্রাণের সহিত ভালবাসে; একথা শুনিয়া এবং কমলার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া দুঃখে ও স্নেহাভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিল, "কেন ভাই, তুমি ওর সঙ্গে অমন বেয়াল্লাপনা করলে? ওটা কি তোমার ভাল হয়েছে?"

শোভা কোন কথার জবাব না দিয়া নতমুখে প্রকাশ্যে ভালমানুষ সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু মনে মনে নিজের দুষ্টামিতে নিজেই হাসিতেছিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শোভা ভাবিল হয়ত নিজের অন্যায়ে কমলা আজ লজ্জিত। তাই সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আমি নিজের চোখে দেখ্‌লাম তুমি সেই লোকটার হাতের"—

কমলা আর হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার কথার অনুবর্ত্তন করিয়া হাসিয়া কহিল, "হাতের মধ্যে হাত দিয়ে ব'সে আলাপ করছিলাম—এই ত? তবু ত ভাই গলা জড়িয়ে ধরিনি।"

শোভা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুরঝি, তোমার হয়েছে কি, পাগলের মত কি বক্‌ছো?"

কমলা নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দুর্ব্বোধ্য ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

পরক্ষণেই শোভা কি জানি কি মনে ভাবিয়া কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, ও কে?"

হাসিতে হাসিতেই কমলা উত্তর দিল, "বা রে। কে আবার?"

"না না, সত্যি ক'রে বল্‌ত ও কে?"

"ও সে।"

"কে লো? ঠাকুরজামাই নাকি?"

"ঠাকুরজামাই, কি ঠাকুরমশাই, কিম্বা ঠাকুরদাদা, তা জানিনা। তবে যার গলা জড়িয়ে ধ'রে এই আড়ালে— একটা চুমু খেলেও দোষ হয় না——ও সে।"

"ওমা সেকি কথা! তা' এতদিন বলতে নেই? এত রঙ্গও তোমরা জান!"

৮

শোভার কথা সুকুমার তখন হাসিয়া উড়াইয়া দিল বটে কিন্তু মনে তাহার একটা খটকা লাগিয়া রহিল। লোকটির হাব ভাব তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল; তাহার রুচির সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছিল না। তবে নাকি দাদার বন্ধু এবং কয়েকদিনের জন্য মাত্র তাহার অতিথি, সেইজন্য কোনরূপ রূঢ় কথা বলা বা অসদ্ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। শোভাকে কিছু না বলিলেও নিজের মনে সারারাত্রি ধরিয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর তাহাকে চলিয়া যাইবার জন্য ভাল কথায় কোন ছলে অনুরোধ করিবে স্থির করিল।

পরদিন সুযোগমত বাহিরের ঘরে গিয়া সুকুমার বলিয়া ফেলিল, "কি মশাই—কবে যাচ্ছেন?"

"সেকি কথা হে? কাজের সময় রাজী আর কাজ ফুরুলেই পাজী। তোমার ফটোগুলো হয়ে গেল আর এখন বল ফিরে যাও।" শেষের কথা কয়টি নির্ম্মল স্বভাব-সুলভ রসিকতায় সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল। "শেষে আবার না ব'লে ব'স যে 'ছল করে অবলা মজাও'।" পূর্ব্বের ন্যায় ইহার শেষ পদকয়টিও সুরে গাহিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই জন্যই কি ডেকে এনেছিলে নাকি?"

সুকুমার একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ। তাহার মুখে কোন জবাব যোগাইল না। সে আদৌ মনে করে নাই যে তাহার দাদার বন্ধু ফটোগ্রাফার এতটা নির্লজ্জের মত কথা কহিবে। রাগে, ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "কি জানেন, ঘর দোরের একটু অসুবিধে—"

"বটে; এইজন্যে ত আমি আগেই বলেছিলাম মশাই, ভেবে চিন্তে দেখুন।"

"হাঁ; অসুবিধে মানে অনাটন হয় নি। মেয়েরা complain (নালিশ) করছিল যে তারা একলা থাকে সেইজন্যে আপনার থাকাতে তারা কিছু অসুবিধে বোধ করে—এই আর কি।"

ঠিক এই সময় তদ্দেশীয়া একজন পরিচারিকা আসিয়া নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "মাঈজী আপ্‌কো অন্দরপর বোলাতে হেঁ।"

নির্ম্মল এবং সুকুমার দু'জনেই বিস্ময়ান্বিত ভাবে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিল। সুকুমার সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে রে? আমাকে?"

"নেহি বাবুজী, আপ্‌কো নেহি; এ তসবীরওয়ালা বাবুকো অন্দরপর মাঈলোক বোলায়া।"

নির্ম্মল বলিল, "শুনুন মশায়—একেবারে অন্তঃপুরে ডাক। এই আপনি বল্‌ছিলেন না যে, মেয়েরা complain করে। কিন্তু এ নিমন্ত্রণ এসেছে মেয়েদেরই কাছ থেকে।"

বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত সুকুমার বলিল, "হয়ত দাসী ভুল করেছে।"

হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল কহিল, "বেশ ত; দেখেই আসি ভুল করেছে কি-না।"

পরিচারিকা নির্ম্মলকে যে ঘরে লইয়া গেল সেখানে শোভা এবং কমলা দু'জনেই উপস্থিত ছিল। নির্ম্মল ঘরে ঢুকিতেই শোভা যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বলিল, "একি আপনি এখানে কেন?"

নির্ম্মল ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিয়াছিল হয়ত কথাটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন ত-তাহাদের ভাবে সেরূপ বোধ হইতেছে না। সে একটু অপ্রস্তত হইয়া পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "আপনার দাসীই ত আমাকে ডেকে আন্‌লে।"

শোভা বলিল, "আঃ, এই নতুন দাসীটার জ্বালায় অস্থির। কোন কথা যদি ঠিক বুঝতে পারে। আপনিই বা কি রকম ভদ্রলোক মশা'য়? একটু বিবেচনা করলেই বুঝতে পারতেন যে, জানা নেই শুনা নেই একেবারে অন্দরমহলে ডাক পড়াটা সম্ভব নয়। অন্তত আগে একটু খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। শুনলুম আপনি নাকি আমার ভাসুরের সঙ্গে এক আফিসে কাজ করেন। আমার ভাসুর ত কল্‌কাতায় কি একটা আফিসে করেন, আপনার এই ভূতের মতন চেহারার লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার আছে কিনা জানি না; বড় জোর কয়লার খনিতে এই কেলেভূতের আশ্রয় মিলতে পারে। আচ্ছা আপনার নামটি কি?"

শোভার মুখে এক সঙ্গে এত কথা শুনিয়া এবং কমলার হাসি হাসি মুখ দেখিয়া নির্ম্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, শোভার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। সে গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার নাম? আমার নাম হচ্ছে সত্যপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়।"

শোভা প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ'তেই পারে না। যে এতটা মিথ্যা অভিনয় করতে পারে তার নাম সত্যপ্রিয়? অসম্ভব। বরং মিথ্যাপ্রিয় হ'লেও হ'তে পারে।"

"মিথ্যাপ্রিয়ের মিথ্যা অভিনয়? তার প্রমাণ?"

"এই প্রমাণ" বলিয়া শোভা কমলার কাঁধ ধরিয়া তাহাকে সামনের দিকে আগাইয়া আনিল। কমলাও বেশ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নির্ম্মল যথাসম্ভব হাসি চাপিয়া বলিল, "হ্যাঁ—এ খুব চমৎকার প্রমাণ—এ প্রমাণের কাছে আমি পরাস্ত।"

পায়ে পায়ে সুকুমার ঘরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহারও কিছু বুঝিতে বাকী ছিল না। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ওরে জোচ্চোর! তোমার এই কীর্ত্তি!"

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দু'টি কালো আঁখি

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আসন্ন সন্ধ্যার আধোআলো অন্ধকারে—
হেরিলাম দুটি কালো আঁখি ;
চঞ্চল খঞ্জন সম উড়ে যেতে চায় বারেবারে,
তাহাদের তাই ঢেকে রাখি
আমারি অন্তর-শিলাতলে ;
তবু মোর মনে হয় যেন প্রতি পলে—
বাহিরিবে মেলি লঘু ডানা,
বাতাসের বুক-চিরে আকাশের পানে দিবে হানা,
পাশাপাশি দুটি ছোট পাখী,
—দুটি কালো আঁখি !

দু'টি কালো আঁখি—
ঘনপক্ষ্ম তাহাদের দু'টি তীরই ফেলিয়াছে ঢাকি !
একটি চপল দৃষ্টি তারা মোরে দিল উপহার,
ঠাঁই নাহি খুঁজে পাই সুগোপনে যাহা রাখিবার ;
কেমনে লুকায়ে রাখি তায়—
সারাবিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে যে চায় !
আমি চাই তারে শুধু আমাতে একাকী,
যারে দিল দু'টি কালো আঁখি !

চিত্র ও বৈচিত্র্য

সুইজারল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ সন্তরণালয়।
শূন্যমার্গে দুইটি পুরুষ ও একটি নারীর বিচিত্র গতি।

জেনেভা হ্রদের উপর
একটি ঝম্পপ্রদানের মঞ্চ।

দাড়ি-ওয়ালা পাঁচ ভাই। ইহারা কৃত্রিম মুখোস পরে
নাই—হঠাৎ দেখিলে যেমন মনে হয়।

ইয়োরোপের রাজপথে ভারতীয় পরিচ্ছদে মুক্তি
ফৌজের শোভা-যাত্রা।

অদ্ভুত মুখোস এবং সজ্জা পরিহিত নিগ্রোদের নৃত্য।

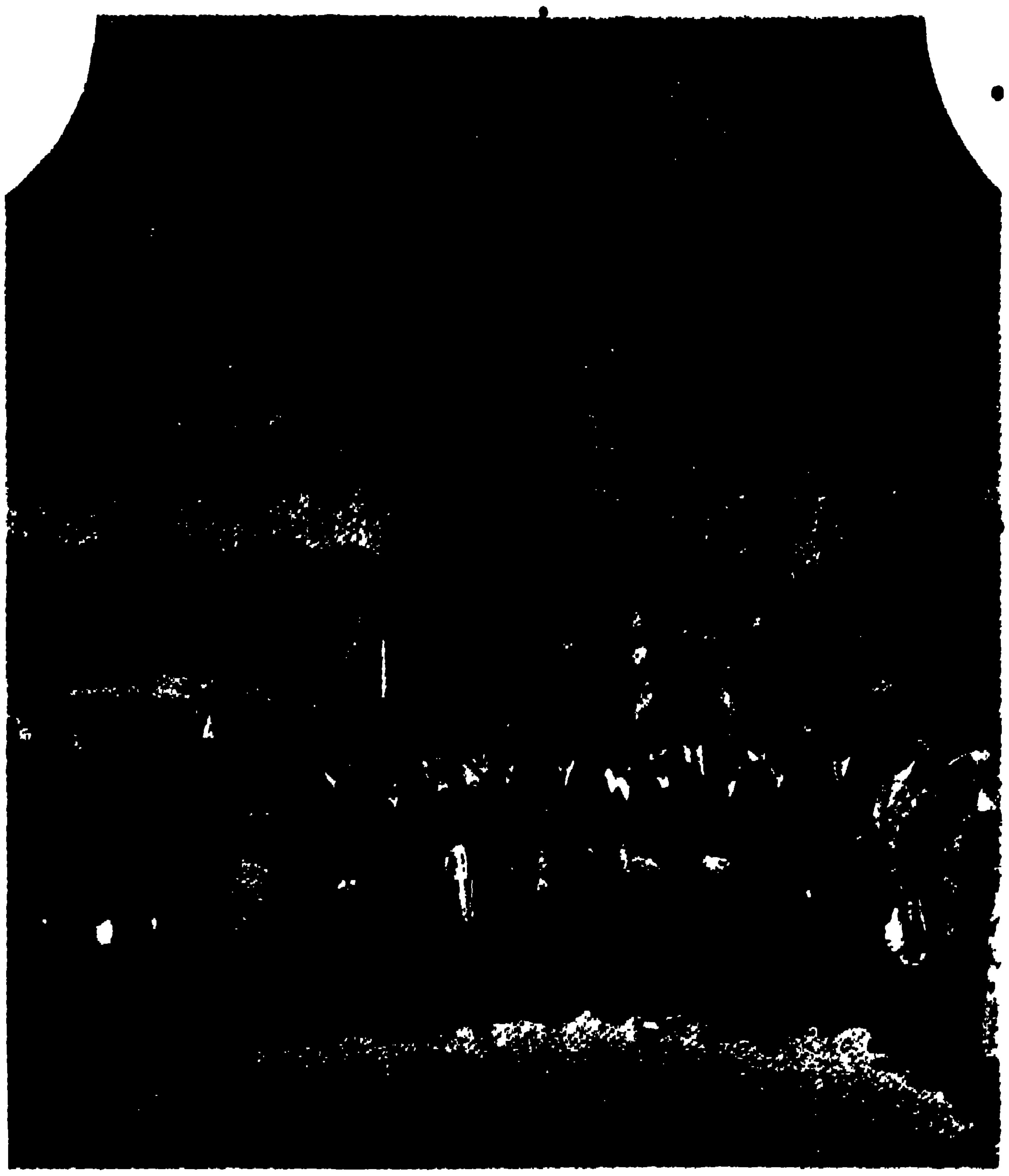

সেণ্ট্ গট্হার্ড পাহাড়ের উপর সুইস্ বিমানপোত-চালক
আদ্রিয়ঁ গ্যো-র স্মৃতি স্তম্ভ।

বিবিধ সংগ্রহ

উত্তরক্যানাডার জলপথ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর আমেরিকার মধ্যে ক্যানাডা যে শুধু একটি সুবৃহৎ দেশ তাহা নহে, প্রকৃতি ইহাকে নানা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত

করিয়াছেন। পৃথিবীর সুবৃহৎ হ্রদগুলির মধ্যে কয়েকটি এই দেশেই অবস্থিত, তাহা ছাড়া কয়েকটি বড় বড় নদীও এই দেশের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। ক্যানাডার উত্তরাংশে বহু সহস্র একর জমি এখনও সম্পূর্ণ অনাবাদী অবস্থায় পতিত আছে, ইউরোপের জনবহুল দেশগুলি হইতে উৎসাহী ও সাহসী লোকেরা উত্তর কানাডার নানাস্থানে গিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া বসবাস করিতেছে।

ক্যানাডার জলপথগুলি বিচিত্র সৌন্দর্য্যময়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ক্যানাডার পশুলোম ব্যবসায়ের প্রথম পত্তন হয়। তখন রেল ষ্টীমার ছিল না, এই জলপথগুলিতে ডোঙা চালাইয়া ইউরোপীয় বণিকদল এই বিস্তৃত দেশের নানা অজানা ও অনাবিষ্কৃত পথে যাইয়া আদিম অধিবাসীগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সদ্ভাব স্থাপন করেন ও তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া ধীরে ধীরে এই বিস্তৃত পশুলোম ব্যবস্থায় গড়িয়া তুলিতে থাকেন। হডসন্ নদীর উত্তর তীর তখন জনমানব শূন্য ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল, দুর্দ্দান্ত ইণ্ডিয়ান জাতির বিভিন্ন শাখা বর্শা ও ধনুর্ব্বাণ হস্তে নদীর নানা ঘাটিতে বিদেশী শত্রুর বক্ষে লক্ষ্যভেদ করিবার আগ্রহে ওৎ পাতিয়া থাকিত—কিন্তু উক্ত বণিকদল তাহাতে ভয় খাইয়া পিছাইয়া যায় নাই—সকল বিপদ, সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা

উত্তরে হড্‌সন্ উপসাগর ও উত্তর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সকল ভূভাগেই পশুলোম সংগ্রহ করিবার কুঠী ও

আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। কালে বিখ্যাত "হড্‌সন্ বে কোম্পানী" এইভাবেই গড়িয়া উঠে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবার কথা বটে কিন্তু ইহা সত্য যে, উত্তর ক্যানাডার জলপথ সমূহে ডোঙায় চড়িয়া মেকেঞ্জি নদীর মুখ হইতে উত্তর মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে চারি হাজার মাইল একাদিক্রমে যাওয়া চলে।

রেলপথ নির্ম্মিত হইবার পরে ডোঙায় চড়িবার সুবিধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, কারণ বড় বড় নদীগুলির ধারের সহরগুলির সব প্রায় রেলপথের ধারে অবস্থিত। কেহ যদি ডোঙায় চড়িয়া উত্তর ক্যানাডার জলপথগুলির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বৃহৎ হ্রদগুলির নীরব শান্তি ও জনমানবহীন পাইন অরণ্যের রহস্য উপভোগ করিতে চান, তবে যে-কোন সহরে রেল হইতে নামিয়া নদীপথ ধরিতে পারেন। যাঁহার সময় সংক্ষেপ, তিনি চার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি ভ্রমণ শেষ করিতে পারেন, কিন্তু সবটা খুঁটিনাটি ভাবে দেখিতে গেলে দুই তিন মাসের কমে হইবার কথা নহে। পূর্ব্বে কোনো একটা বিশেষ পথ ধরিবার পূর্ব্বে একশত দেড়শত মাইল ডোঙা বাহিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত, কিন্তু

আজকাল ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের পূর্ব্ব বা উত্তরাংশে যে-কোন সহর হইতে রওনা হইবার কয়েকঘণ্টা মধ্যেই ভ্রমণকারী অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া ডোঙা-ভ্রমণ সুরু করিতে পারেন।

ম্যানিটোবা প্রদেশের উত্তরার্দ্ধ হইতে হডসন্ উপসাগর পর্য্যন্ত ভূভাগেই জলপথ সমূহের সুবিধা বেশী থাকায় এই অংশই ডোঙা ভ্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ইহা প্রায়ই পর্ব্বতসঙ্কুল ও অরণ্যময়, সমুদ্রগর্ভ হইতে এই অংশের উচ্চতা প্রায় বারোশত ফুট, স্থানে স্থানে আরও বেশী। বড় বড় নদীগুলির অধিকাংশই এই প্রদেশে অবস্থিত, মাঝে মাঝে

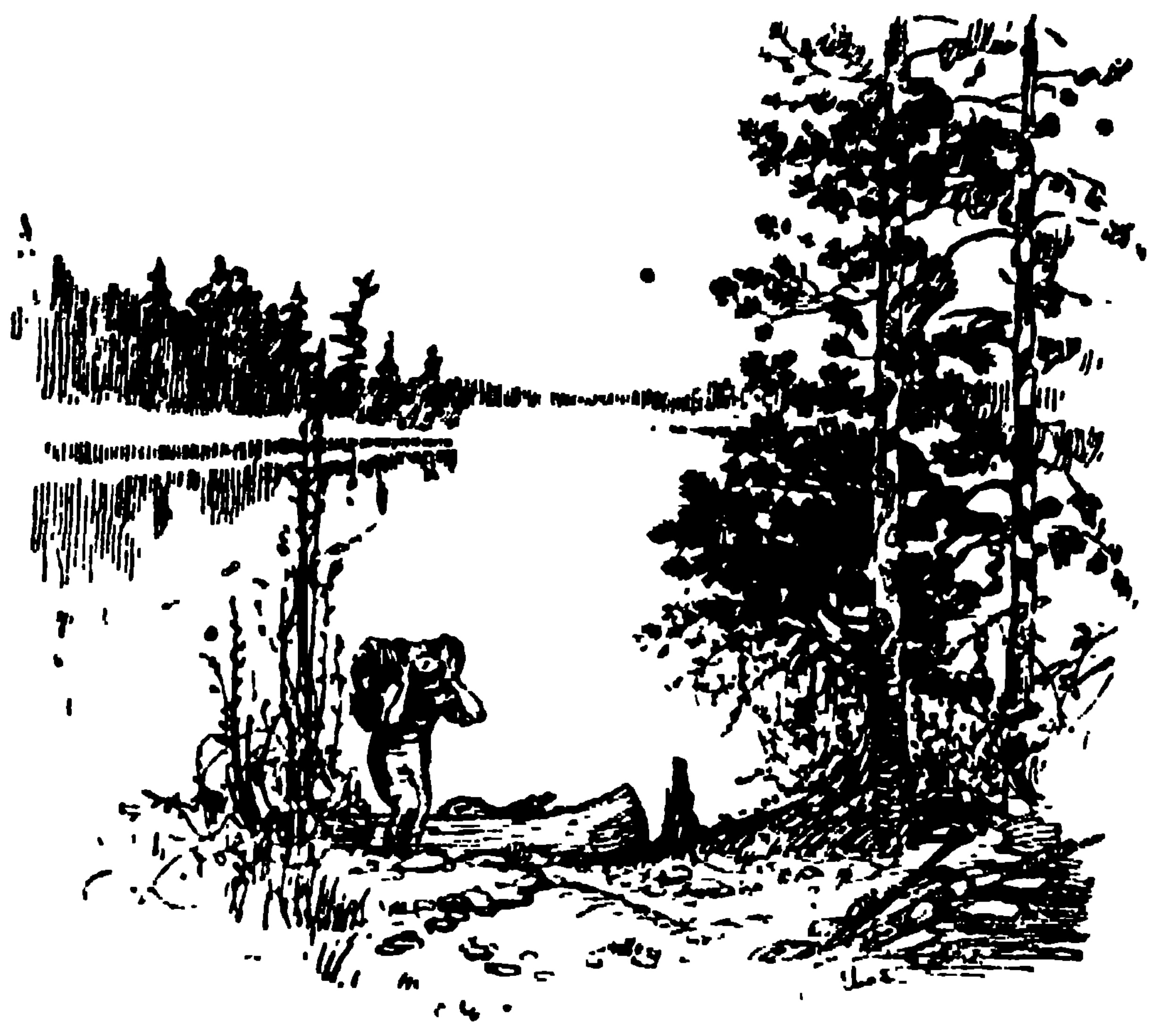

বড় ছোট নানা আকারের হ্রদ আছে। নদীর তীরে ঘন অরণ্য, যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতমালা—অপূর্ব্ব রহস্যে আচ্ছন্ন বিচিত্র অরণ্য ভূভাগ। এই প্রদেশের অধিকাংশ কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত নয় বলিয়া অনেকস্থলে আদৌ মনুষ্য-বসতি নাই—দিনের পর দিন ডোঙায় চড়িয়া গেলেও হয়ত কোনো কোনো অংশে একটিও মানুষ চোখে পড়ে না। নদীর এ বাঁকে ও বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে চোখে পড়িতে থাকে, কোথাও স্বচ্ছসলিল হ্রদ, গম্ভীরনাদী জলপ্রপাত, ছোট বড় দ্বীপ, পাইন ও সরল গাছের বন। বেশী পশ্চিম ঘেঁসিয়া যাওয়া চলে না কারণ এই অংশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়, অনেক বাধা-বিপত্তি ও মাঝে মাঝে প্রস্তরসঙ্কুল rapid থাকার দরুণ এইদিকের নদীগুলিতে ডোঙা চালানো একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই অংশেরই প্রাকৃতিক দৃশ্যই আবার সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়।

ক্যানাডার নদীপথগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের সৌন্দর্য্য কখনও একঘেয়ে হইয়া যায় না। কখনো হ্রদবক্ষের

শান্তি, কখনো সুবাসিত পাইন অরণ্যের ঘন ছায়া, কখনো নৃত্যশীল জলপ্রপাত, কখনো উচ্চাবচ ভূমি, কখনো বা রুক্ষ গ্রানাইটশিলার বন্ধুর সৌন্দর্য্য, মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলিয়া রাত্রি কাটাইবার উপযুক্ত মনোরম দ্বীপ। Rapidগুলি কিছু বিপজ্জনক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকিলে এ পথে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই। তবে নিতান্ত যেখানে ডোঙা চালানো অসম্ভব, সে সকল স্থানে ডোঙা জল হইতে উঠাইয়া লইয়া অরণ্যের ভিতরকার পথ ধরিতে হয়—পথ প্রদর্শকেরা এই সকল পথ চিনে বা জানে। ভ্রমণের সময়

ডোঙাগুলিতে বেশী বোঝাই না লওয়াই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ডোঙা উঠাইয়া অরণ্য-পথে বহিয়া লইয়া যাইবার সময় বোঝাই বেশী থাকিলে বড় অসুবিধা ঘটে, সব সময় বাহক মেলে না।

ক্যানাডার উত্তরতম প্রদেশগুলিতে এখনও রেল যায় নাই, ডোঙায় চড়িয়াই সে সব স্থানে পৌছিতে হয়। রেলে পৌছানো যায় না বলিয়াই এই প্রদেশের সৌন্দর্য্য আরও বেশী, রহস্য আরও বিচিত্র। ইণ্ডিয়ান্ জাতিদের গাছের ছালের তৈয়ারি ডোঙাই এই দেশে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল, অবশ্য আজকাল ভ্রমণকারীগণ নানারূপ উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত ডোঙা ব্যবহার করিতেছেন না এমন নহে। কিন্তু এদেশের জলপথগুলি যে ধরণের, তাহাতে ইণ্ডিয়ান্দের গাছের ছালের ডোঙাই এদেশের পক্ষে বেশী উপযোগী। নদী ও হ্রদগুলি মৎস্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যাঁহারা মাছ ধরিতে জানেন বা ভালবাসেন ভ্রমণকালে তাঁহারা নিছক ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া শিকারের আনন্দও উপভোগ করিয়া থাকেন, খাদ্যবস্তুরও অভাব হয় না।

কিন্তু যাঁহারা পরগাছা সংগ্রহ করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের আনন্দই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবার কথা—কারণ এই প্রদেশের অরণ্যগুলিতে নানা অদ্ভুত ধরণের পরগাছা আছে। নদীপথগুলি হইতে কিছুদূরে নিবিড় অরণ্য মধ্যে খোঁজ করিলে বৈজ্ঞানিকগণের অজ্ঞাত নানা শ্রেণীর পরগাছা পাওয়া যায়—ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিশেষজ্ঞগণ মাঝে মাঝে ইহার সন্ধানে আসেন ও সময়ে সময়ে জীবনকে

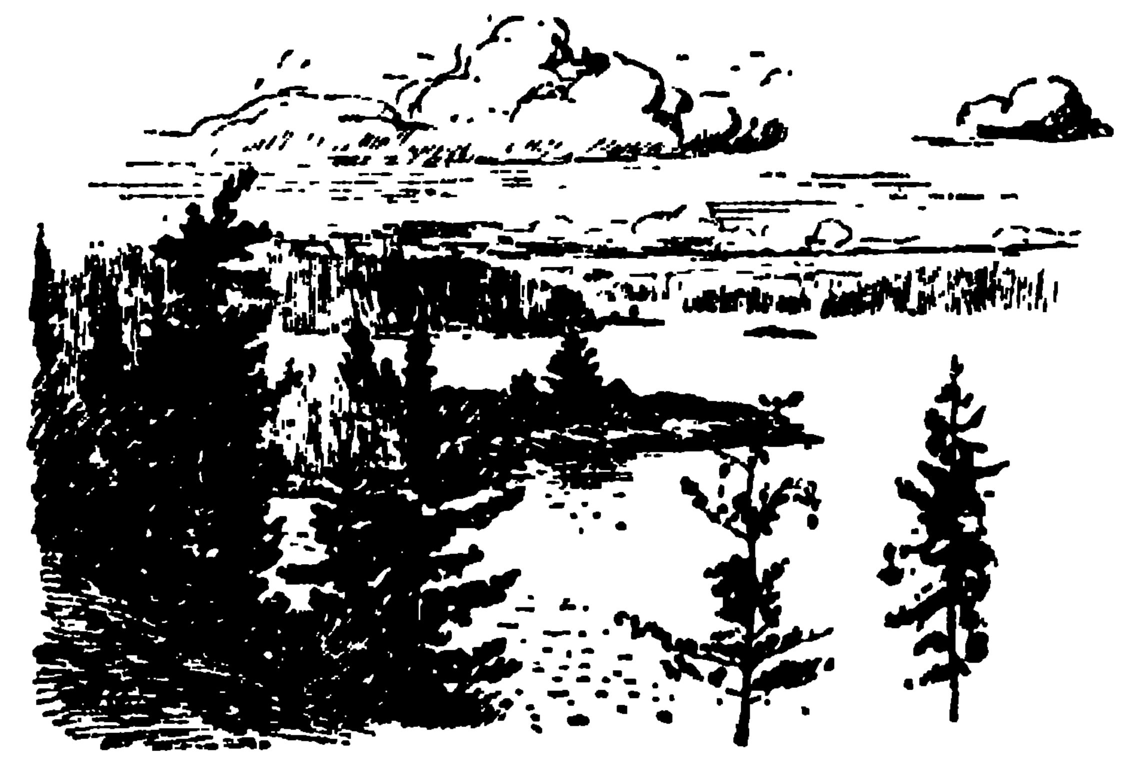

বিপন্ন করিয়াও নতুন ধরণের পরগাছা ও অন্যান্য গাছপালা লইয়া যান।

যাঁহারা জনবহুল নগরগুলির কর্ম্ম-কোলাহল হইতে কিছুদিন অবসর লইতে চান, প্রাণের শান্তি ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করেন, এই নির্জ্জন ভূভাগের শান্ত বনরাজি, স্তব্ধ রাত্রির মহনীয় সৌন্দর্য্য, মুক্ত প্রকৃতির অবাধ লীলারঙ্গ তাঁহাদের ক্লান্ত দেহ মনকে নূতন আয়ু দান করিবে সন্দেহ নাই।

তবে খুব বেশীদিন এ প্রদেশ এরূপ থাকিবে কি না বলা যায় না। পশুচর্ম্ম ব্যবসায় যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে

ও নদীপথগুলির উত্তর পার্শ্বের কুঠীগুলির সংখ্যা বৎসরে বৎসরে যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে বোধ হয় দশ পনেরো বৎসরের মধ্যেই এই সকল অরণ্য জনপদে পরিণত হইবে। বড় বড় বন কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইজারা করিয়া লইতেছে ও মৎস্য-ব্যবসায়ীগণও করের জাল প্রভৃতি লইয়া ষ্টীমার ও নৌকা আমদানী সুরু করিয়া দিয়াছে; তাহা ছাড়া দক্ষিণ ক্যানাডাতে জমি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিক হইতে লোকজন কৃষিকার্য্যের জন্য জমি খুঁজিতে আসিয়া ছোটখাট উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শোণিত প্রবাহের কথা

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

মানব শুধু বর্ত্তমান বিষয়ে কখনও সন্তুষ্ট নয়। সর্ব্বদাই অতীতের ইতিহাস বা ভবিষ্যতের অজ্ঞাত বিষয় জানতে ভালবাসে। অতীত যুগের বস্তুতে স্রষ্টার অভিপ্রায় ও ভবিষ্যতে ভগবানের মহান উদ্দেশ্যের পরিচয় পায়। তখন অতি সামান্য পদার্থও অসীম মহিমাময় হয়ে ওঠে। মানব শরীরে শিরা ও ধমনীর ভিতর দিয়ে অহর্নিশি যে রক্তস্রোত চল্ছে তার সম্বন্ধে ভাবলে মন বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারে না।

বিবর্ত্তনবাদে রক্তের আদি উৎস কি? পৃথিবীর উপরিভাগ যখন কঠিন হয়ে পড়্ল, সে সময় থেকে রক্তের উদ্ভব দেখা যায়। রক্ত ঘনীভূত (নানা ধাতু মিশ্রিত) জল ব্যতীত আর কিছু নয়। সেই পূর্ব্ব যুগের আগ্নেয় গিরির বাষ্প থেকে জলের উৎপত্তি। ঐ ঘনীভূত বাষ্প নিস্রব (লাভা) পূর্ণ ক্রম-নিম্ন প্রদেশে ছোট ঝর্‌ণার আকারে বয়ে যাবার সময় পর্ব্বত থেকে বিবিধ খনিজ পদার্থ গলিয়ে আকরিক ক্ষারে (mineral salts) পূর্ণ হয়ে ওঠে।

উত্তপ্ত খনিজ উৎস থেকে রক্তের উৎপত্তি। প্রকৃতি পাহাড় থেকে—এমন কি জলন্ত পাষাণখণ্ড থেকে রক্ত টেনে বার করেছে এটা কিছু বাড়িয়ে বলা নয়—শুধু বৈজ্ঞানিকের কাল্পনিক ব্যাখ্যা। ঝর্ণা থেকে স্রোত, স্রোত থেকে নদী, নদী থেকে সাগর। সাগরেই সর্ব্বপ্রথম জৈবিক পদার্থের (living organism) আবির্ভাব। লোণাজল-ক্ষারময় খাদ্য দিয়ে, বায়ুশোধিত অক্সিজেন দিয়ে তাদের পুষ্ট ও সতেজ করেছিল—ঠিক যেরূপ শিরার রক্ত দেহের অনুকোষ (Tissues) সমূহ পুষ্ট করে। কিন্তু খনিজ খাদ্যেই জীব পুষ্ট হয় না—প্রাণময় কোষের (Protoplasm বা living cells) জন্য 'প্রটিন' ও কার্ব্ব হাইড্রেট প্রয়োজন। বিজ্ঞানে দেখা যায় Ultra-violetরশ্মি কোন কোন তরল ক্ষারে পড়লে সমুদ্রে এই সব বস্তু উৎপন্ন হয়। এই সব থেকে বোঝা যায় সাগর জলই রক্তের মূল। এই রক্ত এত পুষ্টিকর যে শীঘ্রই সাগর জল অসংখ্য সজীব পদার্থে পূর্ণ হয়েছিল। তাদের বৃদ্ধি এত অপরিমেয় ভাবে হয়েছিল যে বর্ত্তমানের সমুদয় পর্ব্বত তাদের কঙ্কাল থেকে হয়েছে বলা যায়—বস্তুত তাদের শিলীভূত দেহই পর্ব্বত।

প্রাগ্ শম্বুক-যুগে (Pre-cambrian) সাগরে আদি জীবের উৎপত্তি হয়। তখন সাগরজলের তাপ রক্তের তাপের সমান ছিল। স্তন্যপায়ী জীবরক্তের ন্যায় একইরূপ উপাদানে গঠিত ছিল। কালে সাগর বেশী লোণা ও ঠাণ্ডা হয়েছে—কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবরক্তের আদিম আকরিক অবস্থা ও

তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। দেহের জৈবিক কোষগুলি তরলীকৃত হল্‌দে সাগরজলে ধৌত হয়েছে—শিরার ভিতরে সে যুগের আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে রক্তধারা চলছে আর ঐ আগ্নেয়গিরিনির্গত কর্দ্দমে সমস্ত শিরা পূর্ণ।

এখন আর রক্ত সাগরজল থেকে হয় না। আহার্য্য পদার্থ থেকে সেই একই উপাদানে তৈরী হয়। এত অভিন্ন যে স্তন্যপায়ী জীবের শিরায় জল দেওয়া চলে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে তরলীকৃত সাগরজল রক্তের কাজ করে। কুকুরের শরীর থেকে রক্ত বাহির করে গরম সাগরজলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা গেছে।

অণুবীক্ষণ দ্বারা স্তন্যপায়ী জীবরক্তে তিনপ্রকার ভাসমান অণু (cell) দেখা যায়। শ্বেত কণিকা, লাল-কণিকা ও

এই প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম phagocytosis। শ্বেতকণিকা সব বস্তু গ্রাস করে ব'লে তার নাম হচ্ছে অণুজীবনাশক (phagocyte)।

গত শতাব্দীর আবিষ্কৃত এই আশ্চর্য্য ব্যাপার। খোলা-বিশিষ্ট জীবে (mollusc) নীলেরগুঁড়া ইন্‌জেক্ট (Inject) করে দেখা গেল যে শ্বেতকণিকাগুলি সব গ্রাস করে—আবার বহু জীবাণু (microbes) শিরার গা দিয়ে বেরিয়ে সমস্ত দেহে ঘুরবার শক্তি রাখে। Metchnicoff starfishএর স্বচ্ছ কীটশিশুর (larva) গায়ে গোলাপ কাঁটা দিয়ে দেখেন, শ্বেতকণিকাগুলি সংগ্রামার্থে কাঁটা ঘিরে ফেলে। আর ছোট বীজাণু (spores) সহ কঠিনাবরণ বস্তু (crustion) অনুপ্রবেশ করে দেখা গেল শ্বেতকণিকা তা

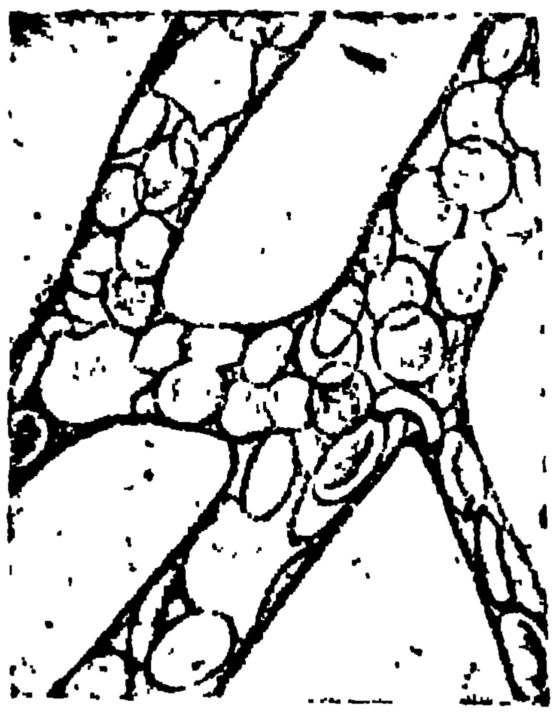
লাল ও শ্বেত কণিকা

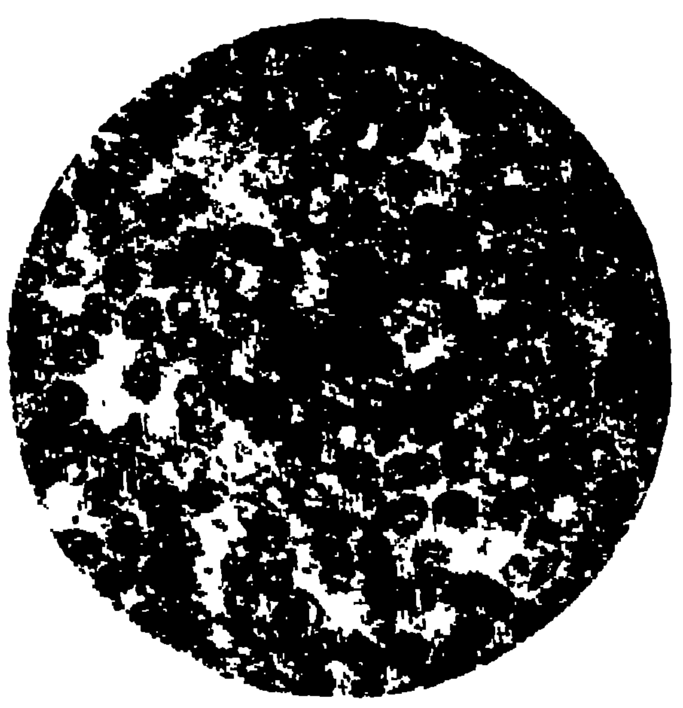
শ্বেত ও লাল কণিকার আলোকচিত্র

শ্বেত কণিকা বিজাতীয় অণু গ্রাস করে ফেলছে

রক্তের চাপ (Platelet)। শ্বেত কণিকা আকারে এক ইঞ্চির ২৫০০ অংশ। এক ফোঁটা রক্তে অসংখ্য কণিকা থাকে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জৈবিক পদার্থ। রক্তও প্রাচীনকালের সাগরের মত জল-জীবে পূর্ণ। শ্বেতকণিকা পরাণুপুষ্ট জীব (parasite), রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে,—আর রোগ-বীজাণুর প্রতিষেধক পদার্থ উৎপন্ন ক'রে ঐ বীজাণু ধ্বংস করে। শিরার বাইরে রোগ-বীজাণু থাকলে শ্বেতকণিকার দল অদ্ভুতভাবে শিরার গাত্র বেয়ে বাইরে এসে তাদের আক্রমণ করে। অসংখ্য কণিকা সংগ্রামে মারা পড়ে। তাদের মৃতদেহ থেকে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই পুঁজ (Pus)। এরা হাড় নির্ম্মাণে সহায়তা করে। রক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নূতন কোন অণু দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে ঘিরে শোষণ করে।

গ্রাস কল্লে। তিনি প্রমাণ করলেন শ্বেতকণিকা anthrax ও অন্যান্য রোগের বীজাণু গিলে ফেলে। লর্ড লিষ্টারের মতে phagocytesর ইতিহাস রোগনিদানশাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শ্বেতকণিকাকে দেহরক্ষাকারী কেনা বলা যায়। উহা অণুকোষের (Tissue) রক্তে পাহারা দেয়। রক্ত হ'তে বিজাতীয় পদার্থ দূর করে। অস্থিনির্ম্মাণে চূণ যোগায়। এ বিষয়ে এরা বিশেষ উপকারী। কিন্তু বার্দ্ধক্যে এরাই শরীর ধ্বংসের কারণ হয়, চুল পাকিয়ে দেয়; অস্থির চূণ খেয়ে তাকে ভঙ্গুর করে। এরা স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) অধিকারের বাহিরে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার—কি করে এরা জান্‌তে পারে যে কখন খাওয়া

দরকার, আর কখন বা সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে। অসংখ্য লালরক্তকণিকা ও রক্তের চাপ (platelet) আছে, তাদের কাউকেও খায়না। কিন্তু বিজাতীয় বীজাণু (cell) ঢুকলে তার ঘাড়ে প'ড়ে খেয়ে ফেলে। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ইহারা আকৃষ্ট হয়। আবার কতক পদার্থদ্বারা প্রতিহত হয়। শ্বেতকণিকার এই ব্যবহার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ব'লে ধরা হয়।

লালকণিকার ক্রমোন্নতির ইতিহাস অজ্ঞাত। সমস্ত সরীসৃপ, পক্ষী, উভচর ও মৎস্যে লালকণিকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আরো নিম্নশ্রেণীর জীবে কচিৎ দেখা যায়। কীটে নেই। হিমোগ্লোবিণ (Haemoglobin) লালকণিকার লাল রক্তের উপাদান। এর কাজ ফুসফুস, ফুল্‌কো বা অন্যান্য নিশ্বাসপ্রশ্বাসের অঙ্গ থেকে দেহকোষে অক্সিজেন বহন করা। শুধু রক্ত যত অক্সিজেন বহন করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী বহিতে এ সক্ষম। এ-যে কি বস্তু তা স্থির হয় নি। ইহার অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। নিম্নশ্রেণী জীবশরীরে অক্সিজেন বহনকারী এই পদার্থের অভাব। কিন্তু অনেক জীবের অণুকোষে, এমন কি আলুতে এই জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এর নাম cytochrome। এরই সাহায্যে রক্তে লালিমার অভাব সত্ত্বেও অক্সিজেন বহনের কাজ হয়। এতে লোহা আছে ব'লে এর রং লাল। জৈবিক পদার্থে লোহা থাকে। উদ্ভিদের যে হরিৎ রং (chlorophyll) তার কারণ লোহা। "Chlorophyll, the green colouring matter of plants, also owes its colour to iron ; had nature forgotten to put a little iron on her palette it would have been a dull and drab world indeed ! It would also have been a dead world, for without chlorophyll and hæmoglobin life could not be. It is the chlorophyll of the plants that enables its leaves, with the aid of the sun, to break down carbon-dioxide and build up the starch which is the foundation of animal energy ; while it is oxygen carried by the hæmoglobin or cytochrome that renders the energy available. The hæmoglobin and the chlorophyll work together weaving red and green into the wonderful woof of life, and the little red blood cells are the vestal virgins of the vital flames. !"

লালকণিকা রক্তে জন্মায় না। রক্তে তারা মৃতবৎ বা মুমূর্ষু অবস্থায় থাকে। তারা হাড়ের মজ্জায় জন্মায়। প্লীহায় লোহার অংশ পায়। পরে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত জীবন ধ'রে এরা দেহের প্রতি কোষে, শিরা ও ধমনী দিয়ে অক্সিজেন বহন করে। এরই অভাবে শরীর পাণ্ডুর হয়। এর প্রাচুর্যেই স্বাস্থ্য।

রক্তের চাপ (Platelet) লালকণিকার চেয়ে ঢের আকারে ছোট। এদের বিশেষ ব্যবহার এ পর্য্যন্ত জানা

হৃৎপিণ্ড

যায় নি। কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধাতে এরা সহায়তা করে।

রক্তে বিষপ্রতিরোধক শক্তি (anti-toxin) আছে, যে শক্তি বিজাতীয় বা ভিন্ন বীজাণু বা রোগজনক কীটাণুকে ধ্বংস করে। সবার চেয়ে সেরা হ'চ্ছে যেটা ডিপথিরিয়ার বিষনাশক। এ থেকে anti-toxin এর চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন জীবের দেহে ডিপথিরিয়ার বিষ অনুপ্রবেশ করালে জীবের রক্তে anti-toxin জন্মায়। অন্য জীব-শরীরে তা 'ইনজেক্ট' করলে সে ডিপথিরিয়ার বিষ থেকে মুক্তি পায়। যখন যে বিষ শরীরে প্রকাশ পায়, শুধু সে বিষেরই প্রতিরোধক বিষ জন্মায়। এ-ও আশ্চর্য্য, যে রোগ কখনও

হয়নি তাঁর প্রতিরোধক উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে।

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী বিন্যাস

বিভিন্ন জাতীয় রক্তের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পার্থক্য আছে। একজীবের রক্ত অন্যজীবের শরীরে সঞ্চারিত করার ফলে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই রক্ত-সঞ্চারণের (Transfusion) ফলে মনুষ্যজাতি চার প্রকার শোণিতের অধিকারী চতুর্বর্গে বিভক্ত হয়েছে। এই অদ্ভুত আবিষ্কার নূতন গবেষণার দ্বার খুলেছে।

যে শক্তিতে রক্ত সঞ্চারণ হচ্চে সেই শক্তি দিন দিন বৎসর বৎসর ধ'রে শিরা ধমনী ও জটিল কৈশিক নালী (Capillary) দিয়ে রহস্যময় রক্তধারা প্রবাহিত করছে। এই শক্তি হৃৎপিণ্ড থেকে আস্‌ছে। ইহা ওজনে ৮ আউন্স। ইহার শক্তি অসাধারণ। সক্ষম ব্যক্তিকে ১ ঘণ্টায় ২০০০ ফিট উঠাতে পারে। এই হৃৎপিণ্ড শত বৎসর ধ'রে কাজ করে। প্রতি ফোঁটা রক্ত সমস্ত দেহ ঘুরে হৃৎপিণ্ডে আস্‌তে ৪৫ সেকেণ্ড লাগে। ১ ফোঁটা রক্ত সমস্ত দিনে ১ মাইল, সমস্ত জীবনে (৭০ বৎসরে) ২৫০০০ মাইল প্রবাহিত হয়। প্রতি ফোঁটা রক্ত একই পথে খুব কমই যায়। কারণ কৈশিকনালী গোলোকধাঁধার জালের মত, যে নালীটা খুব ছোট তাও আকারে খুব দীর্ঘ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

যৌবন শেষে

শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত

যেদিন তোমারে ভাল বেসেছিনু সেদিন সকল হিয়া
রহিয়া রহিয়া শিহরিল শুধু—যৌবন জাগনিয়া।
আকাশ চাহিল সহাস নয়নে জ্যোৎস্না মমতা মাখি;
তারায় তারায় জাগিল সে গান যে নামে তোমারে ডাকি।
ধরণী আমারে আদর করিয়া একধারে দিল ঠাঁই
যেদিন তোমারে ভালবেসেছিনু প্রথম জীবনে ভাই।
যে রাঙা রাখীটি বেঁধেছিনু হাতে, সে রাখীর ডোর দিয়া—
অবাক হেরিনু বাঁধিয়াছি আমি সারা বিশ্বের হিয়া।

তারপরে কত পূর্ণিমা রাতে একা একা ব'সে ভাবি
বিশ্বের আমি বিশ্বামিত্র, শাশ্বত মোর দাবী;
বিশ্বেরে আমি ভালো বাসিয়াছি তোমারে বেসেছি ব'লে,
সারা বিশ্বের স্পন্দন জাগে আমারি বুকের তলে;
ব্যথায়, দৈন্যে, দুঃখে, অভাবে এ ধরণী ভরপুর
তারি সাথে আমি মিলায়ে লইনু আমার প্রাণের সুর;—
আজ যবে হায়, যৌবন শেষে ক্লান্ত নয়নে চাই—
ধরণী আমার রয়েছে তেমনি, তুমি শুধু নাই, নাই।

পুস্তক সমালোচনা

ZAKA ULLAH OF DELHI

By C. F. Andrews. Price 7/6d. W. Heffer & Sons Ltd. Cambridge, 1929.

আমাদের দেশে যখন আমরা মানুষের সঙ্গে সত্যিকার সম্বন্ধের কথা ভুলে গিয়ে হিংস্রভাবে পরস্পরের রক্তপাত করছি, তখন আমাদের দেশেরই একজন মিলনপ্রয়াসী সাধু-আত্মার জীবনী নিয়ে মানব-প্রেমিক এণ্ড্রুজ সাহেব উপস্থিত। চণ্ডীদাসের যে মানবপ্রীতি কবিতায় ধরা পড়েছিল, জাকাউল্লার দৈনন্দিন জীবনে তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল।

আমরা এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে এই সময়োপযোগী বই-খানির জন্য অত্যন্ত ঋণী। কেননা তিনি যদি এই বই রচনায় হাত না দিতেন তা হ'লে অন্য কারু হাত দিয়ে এমন ভাবে বের হ'ত না। বইখানি জাকাউল্লার জীবনী হ'লেও এতে আরও এমন সব কথা আছে যা ভারতবাসীর জানা দরকার। বিশেষ ক'রে আলিগড় আন্দোলনের কথা গ্রন্থকার অতি চমৎকার ক'রে বলেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

জাকাউল্লা একজন শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। উর্দ্দু সাহিত্যে তাঁর স্থান অতুলনীয়। শিব্‌লী, জাকাউল্লা, আজাদ, আহম্মদ প্রভৃতি মনীষিগণ আপ্রাণ সাধনায় উর্দ্দু গদ্য সাহিত্যের যে সৌকার্য্য সাধন করেছেন, আমাদের বাঙলা গদ্যের ভাগ্যে তা ঘ'টে উঠে নি। উর্দ্দু ভাষায় অনেক গুলি বিজ্ঞান গ্রন্থ লিখেছেন। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির তিনি একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহার গ্রন্থ গুলির যথেষ্ট সমাদর করেন ও প্রকাশ করতে সাহায্য করেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক লোক।

এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁর এই বই খানা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও দানপত্রীদের নামে উৎসর্গ করেছেন; এবং এর আয় শান্তিনিকেতনে দেওয়া হবে।

সুতরাং আশা করি প্রত্যেক বাঙালী পাঠক একখানা ক'রে এই মূল্যবান বই সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

জসীম উদ্দীন

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক— রঞ্জন প্রকাশালয় ২০৬নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"পথের পাঁচালী" ধারাবাহিক ভাবে বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট এ উপন্যাস খানির পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই; তাহা ছাড়া যে মাসিক পত্রে কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয় সাধারণতঃ সে মাসিকে সে উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। এ রীতির মূলে বিশেষ কোনো যুক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না—কিন্তু থাকিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা তাহার ব্যতিক্রম করিলাম, কারণ সমালোচ্য উপন্যাসখানি এমন অনন্যসাধারণ খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে যে, তদ্বিষয়ে নীরব থাকিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়।

উপন্যাসখানির প্রথম অংশ পড়িতে পড়িতে আমরা সহসা পল্লীজীবনের সরলতা এবং শতবিধ মাধুর্য্যের মধ্যে উপনীত হই,—পল্লীজীবন হইতে বিচ্যুত কোনো ব্যক্তি নগরের গৃহকারাগারের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পল্লীজীবনের স্বপ্ন দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করে, এ বইখানি পড়িতে পড়িতে আমরা সেইরূপ একটা আনন্দ পাই। চায়ের টেবিল্, টেনিস্ কোর্ট্, কাফে এবং সিনেমা হাউস্, উদ্বোধিত জীবনী-শক্তির জটিল মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নিপীড়িত অতিআধুনিক কথা-সাহিত্যের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া আমরা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। মনে হয় ফেনায়িত সুবর্ণকান্তি মদিরাপাত্রের মধ্যে যত শক্তিই থাক্ না কেন, তাহার মধ্যে শ্বেত-পাথরের বাটিতে রক্ষিত মিছরি-পানার স্নিগ্ধতা নাই।

"পথের পাঁচালী" একটি নূতন সুর, তাহাতে সন্দেহ নাই,—ক্ল্যারিওনেট্, পিক্ল্, কর্ণেট্ প্রভৃতির অসগোত্র—বাঁশের বাঁশী।

মহাভারতম্

পণ্ডিত শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত। আদিপর্ব্ব প্রথম খণ্ড। মূল্য গ্রাহক পক্ষে—১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ৪১ নং, সুরি লেন, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই ভাবে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতখানি সম্পূর্ণ হইলে একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নীলকণ্ঠ কৃত টীকা, স্বরচিত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। প্রতি মাসে ইহার এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের ভারতকৌমুদী নামক টীকা সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বঙ্গানুবাদও সরস এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। পুস্তকখানির কাগজ ভাল এবং ছাপা ঝর্ ঝরে।

এই বইখানির পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়।

রূপহীনার রূপ

শ্রীমতী লীলা দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"কিশলয়ের" কবি শ্রীমতী লীলা দেবীর নাম বাংলা পাঠক সমাজে সুপরিচিত। তিনি যে উপন্যাস রচনাতেও খ্যাতিলাভ করেছেন, তা যাঁরা তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস "ধ্রুবা" প'ড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার ক'রবেন। "রূপহীনার রূপ" তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস এবং ইহা ব্যর্থপ্রয়াস নয়। শ্রীমতী লীলা দেবীর উপন্যাসের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, বাস্তবতার ভিতর দিয়ে একটা মহান্ সুর তাঁর পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আনন্দকিশোর আদর্শচরিত্র এবং তাঁর উদ্দেশে নায়িকা রূপার নিরুদ্দেশ যাত্রার পদধ্বনি পাঠকের হৃদয়েও একটা সম্ভ্রম-বিস্ময়-জড়িত প্রতিধ্বনি না তুলে পারে না। শিল্পী অরুণের চরিত্র এত নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে যাতে একথা স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে গ্রন্থকর্ত্রী একজন উচ্চদরের চরিত্র শিল্পী। দু'এক জায়গায় সামান্য একটু আধটু ত্রুটি থাকলেও (যেমন রূপার সঙ্গে আনন্দকিশোরের ঘনিষ্ঠতার আরম্ভটা একটু যেন আকস্মিক ব'লে মনে হয়) গ্রন্থখানি বাংলা পাঠকের কাছে আদৃত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পথের বাঁশী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বড়াল, ২০নং, দুর্গা পিতুরী লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

এই স্বরলিপির বই খানিতে ৩২টি গানের স্বরলিপি আছে। সমস্ত গান গুলিই গ্রন্থকার প্রণীত। আমরা গানগুলি বাজাইয়া দেখিয়াছি;—গান গুলির পদ লালিত্যে এবং সুরের মাধুর্য্যে অধিকাংশ গানই আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। এ বই খানির সাহায্যে সঙ্গীতশিক্ষার্থিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রায় নির্ম্মল বাবুর একটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিটি বাজাইয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন শ্রুতিমধুর গীত রচনায় এবং তাহাতে সুললিত সুর-সংযোজনে নির্ম্মলবাবুর ক্ষমতা সামান্য নহে।

দাম্পত্য-রহস্য

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৪৪নং, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের পর নবদম্পতি একটা নূতন পথে যাত্রা আরম্ভ করে। সে পথ কতকটা অনুমিত, অনেকখানি অজ্ঞাত এবং নানাবিধ সমস্যা-সঙ্কটে বন্ধুর—সুতরাং অনেক সময়ে পথ-চলা ক্লেশকর এবং বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এই বইখানি হাতে করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলে পথের অনেক বাধা বিঘ্ন অপসৃত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। বই খানিতে নানা উপকারী জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

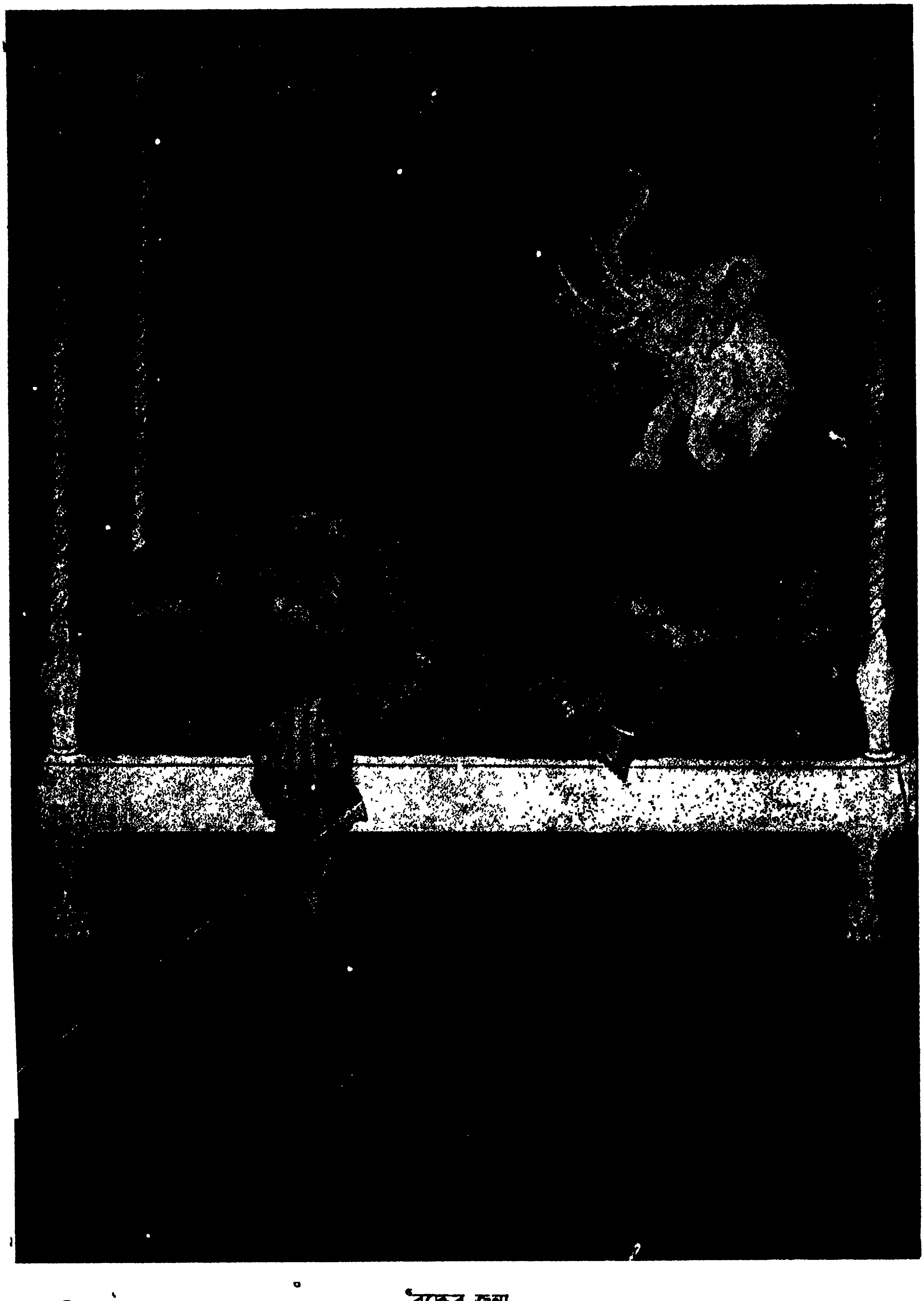

বুদ্ধের জন্ম

বিচিত্রা

বৈশাখ, ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৭ | পঞ্চম সংখ্যা

নববর্ষ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ নববৎসরের নবোদিত সূর্য্য আমাদের কাছে তার অভিবাদন পাঠিয়েচে। সমস্ত আকাশকে পূর্ণ ক'রে এবং অতিক্রম ক'রে একটি আনন্দ পৃথিবীকে স্পর্শ করেচে। পৃথিবীর সমস্ত তৃণে তৃণে, গাছে পালায়, পাখীর কণ্ঠে কণ্ঠে, জীবনবীণার সমস্ত তারে তারে সাড়া উঠেচে। সেই আনন্দ মানুষকেও স্পর্শ করেচে। কিন্তু মানুষ বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ সাড়া মেলা ত সহজ ব্যাপার নয়। সেই সাড়া যে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তার জ্ঞান, তার প্রেম, তার শক্তি ত অল্প নয়। তার জাগরণ ত ফুলের পাপ্‌ড়ি খোলা এবং পাখীর পাখা-মেলার মত নয়। প্রভাতের আলোকের মধ্যে যে একটি সহাস্য প্রশ্ন আছে, "ফুল কি ফুটেচে," পৃথিবীর বনে বনে ঘাসে ঘাসে কত রঙে কত গন্ধে তার উত্তর উঠ্‌ল, "হাঁ, ফুটেচে ফুটেচে!" তেমনি ক'রেই একটি জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি লোকালয়ের দ্বারে দ্বারে এই প্রশ্ন তুলেচে, "কে জাগ্‌ল? কে জাগ্‌ল? কোন্ মানুষ জাগ্‌ল?" সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যাস্তে এই দৃষ্টি তার বেদনা নিয়ে যুগে যুগে ফিরে যাচ্চে, বল্‌চে, "পরিপূর্ণ মানুষ জাগ্‌ল না।" সেই পরিপূর্ণ মানুষেরই জাগ্রত দৃষ্টিই আকাশের চির-নবীন আলোকের প্রত্যুত্তর।

এই পূর্ণ মানুষটি যে আছে, এ যে বিশ্বের চির-প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করবে না, মানুষের ইতিহাসে সেই আশা কি কখনো সফল হয়ে দেখা দেয় নি? দিয়েচে বৈ কি? মাঝে মাঝে মানুষের পরমা শক্তির পরম প্রেমের জাগ্রত রূপ আমরা যে দেখেচি। আমরা দেখেচি মানুষ কি আনন্দে দুঃখকে বহন করেচে, মৃত্যুকে স্বীকার করেচে। মানুষ তার সমস্ত সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন ক'রে আপন পূর্ণতাকে কি বিশুদ্ধ ক'রেই দেখিয়েচে। মানুষের মধ্যে যখন এই পূর্ণতার উদ্বোধন হয় তখন সে ত একদিন ফু'টে তার পরের দিন ঝ'রে পড়ে না। এর বাণী অমর হয়ে রইল; এর শক্তি যুগের পর যুগ নূতন নূতন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে চল্‌ল। এখন থেকে সে চিরদিনই মহাকালের ললাটে ধ্রুবতারার মত, পথিক মানুষকে তার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে, নির্নিমেষ হয়ে রইল, যে পথ মানুষের স্বার্থ এবং নিজের সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখের বক্ষ ভেদ ক'রে অমৃতলোকের দিকে চ'লে গিয়েচে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই পরিপূর্ণ মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে। নববর্ষের আলোকের মধ্যে যখন তার সন্ধান জেগে উঠ্‌ল তখন কি আমাদের অন্তর-রুদ্ধ সেই বন্দী-আত্মার বেদনা আমরা অনুভব করব না? তখনো কি আমাদের এই সংসারের, এই মৃত্যুলোকের প্রতিদিনের তুচ্ছতাকেই একান্ত ক'রে দেখব? আমাদের পদ্মবীজ কেবল কি তার পঙ্ককেই জান্‌বে, আর মুক্ত আকাশে

সূর্য্যালোকে বিকাশোৎসুক তার ফুলটিকে ইচ্ছাও করবেনা ?

বিশ্বব্যাপী আনন্দের সঙ্গে আমাদের আত্মার আনন্দ সম্মিলিত হবে, এই জন্যেই ত ইতিহাসে দেখ্‌তে পাচ্চি নানা রকমে মানুষ আপনার জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে এই বিরাট বিশ্বের অভিমুখে কেবলই বৃহত্তর ক'রে উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করচে। তার সমস্ত বিপ্লব রক্তপাত সমস্ত সমৃদ্ধি ও পতনের মধ্যে এই চেষ্টারই জয়পরাজয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ হচ্চে। সেই বিরাটের সঙ্গে মানবাত্মার পূর্ণ সামঞ্জস্যে বাধা দিচ্চে কিসে? মানুষের স্বার্থ, মানুষের অহঙ্কার। যতই মানুষ আপন লক্ষ্যকে ভুলে আপন স্বার্থকে আপন অহঙ্কারকেই একান্ত ক'রে তুল্‌চে ততই বারে বারে সেই স্বার্থে সেই অহঙ্কারে ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী রক্তাক্ত হয়ে উঠচে। ততই যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষ ঝোড়ো হাওয়ার মুখে গাছভরা আমের বোলের মত অকৃতার্থ হয়ে মাটিতে প'ড়ে যাচ্চে। এই যে আমার সামনে ঐ বালকগুলি ব'সে আছে ওদের প্রত্যেকেরই মধ্যে যে অসীমকালের আকাঙ্ক্ষার ধন নিহিত হয়ে রয়েচে—তার কি আশ্চর্য্য শক্তি, কি অসীম মূল্য! কিন্তু সেই ধনের জন্যে চারিদিকের সমাজে দাবী জাগেনি—তাই সেই অপরিসীম সম্পদ প্রচ্ছন্ন রেখেই এমন কত মানুষ আপনাকে কি দীনতার মধ্যে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে চ'লে যাচ্চে। বিধাতার বর বহন ক'রে এই যে শিশুরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে আসচে এদের সামনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা কত ছোট হয়ে কি ছোট অঞ্জলিই পেতে ধরেছে। তাই ত এরা ভুলে গেল যে, এরা অমৃতস্য পুত্রাঃ।

কেবল মানুষের সীমানার মধ্যেই মানুষ আপন পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রেখেচে, এইটেই আমরা অন্যান্য দেশে দেখতে পাই। কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চেয়েচে। ভারতবর্ষ বলে, মানুষ এই বিশ্বের মধ্যে জ'ন্মে তাকে আপন চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ক'রে জানবার জন্যে ইচ্ছা করেছে, এবং সেই জানাই তার নিজেকে বড় ক'রে জানা এটা যে সত্য কথা। মানুষের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি নিতান্ত একটা বাহুল্য জিনিষ হ'ত তাহলে তার ইন্দ্রিয় এবং মন একেবারে একে দেখতে ও জানতেই পারত না। কিন্তু গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বিশ্ব এই যে মানুষকে ঘিরে রয়েচে মানুষের আত্মার সঙ্গে তার গভীর যোগ আছে ব'লেই সে এমন ক'রে প্রকাশমান। তাই ভারতবর্ষ বল্‌চে, কাছে ও দূরে যা-কিছু মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনের গোচরে আছে আত্মার দ্বারা তার সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হ'লে তবেই আত্মার ধর্ম্ম বিশ্বের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে। বিশ্বের অধিকারকে সকল দিকে ছেঁটে ফেলে কেবল একটা কোন ছোট গর্ত্তের মধ্যে জীর্ণ হয়ে অন্ধ হয়ে বদ্ধ হয়ে থাকা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সে কথা সমস্ত বিশ্ব তাকে বল্‌চে। সে যদি কেবল আপন ছোট সংসারের কীট হ'ত, তাহলে ছোট সংসার তাকে একেবারে নিঃশেষে পরিপাক ক'রে ফেলত। কিন্তু তার জানালা খুলে যায়, সে বাইরের দিকে তাকায়, আর কিসের জন্যে তার মন কেমন করে? মন এমনই করে, যে, যা কিছুকে সে সুখ ও ঐশ্বর্য্য ব'লে জানে সে সমস্ত ফেলে দিয়ে তার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। তখন সে বলে, সুখের চেয়ে মুক্তি বড়। সেই মুক্তি, যাতে আপনার থেকে মুক্তি—যাতে বিরাটের মধ্যে অনন্তের সঙ্গে মিলন। তখন সে বলে, "আমার প্রবৃত্তি যত প্রবল হোক, আসক্তি যত দৃঢ় হোক, আমার পক্ষে এরাই সত্য নয়। আমার পক্ষে সত্য যিনি তিনি ভূমা। এই জন্যে তিনি আমার কাছ থেকে কোনো অংশ চান না, তিনি আমার সমস্তকে চান; কোনো পূজার উপকরণ কোনো মন্ত্র নয়, আমার বিশ্বকে পূর্ণ ক'রে যে আমি, সেই পরিপূর্ণ আমাকে চান। তিনি বলচেন, "তোমার ক্ষুদ্র বাসনার দরজা খোলো; আমি যে বিরাট মন্দিরে বসেছি, সেইখানে তোমার স্থান আমার পাশে।" ঐ স্থানটি আমরা পাব, আমাদের আশ্রম এই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিক। বড় বড় রাজ্যসাম্রাজ্যের সিংহদ্বারের বাইরে দিয়ে যে পথ গিয়েচে সেই পথ দিয়েই আমরা নির্ভয়ে চল্লুম। সংসারের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ বিশ্বের পথ, ধনমানের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ মুক্তির পথ। সেই পথে তুমি অসত্য থেকে আমাদের সত্যে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

১২

জাহাজের সিঁড়িতে এক পা দিয়া ভারতবর্ষের মাটি হইতে আরেক পা তুলিয়া লইবার সময় বাদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। রেলপথ বন্যায় ভাসিয়া যায় নাই, ট্রেন বিলম্বে বম্বে পৌঁছায় নাই, জাহাজ ইতিমধ্যে ছাড়িয়া দেয় নাই। এবার জাহাজডুবি না হইলেই সে নির্ঘাত ইউরোপে পৌঁছিয়া যাইবে। আপাততঃ এই জাহাজ তো ইংলণ্ড।

জাহাজটাকে একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে উপরতলে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার ক্যাবিন 'E' ডেকে। ক্যাবিনে ঢুকিয়া দেখিল একটি প্রিয়দর্শন গুজরাটী তরুণ কুলীর কাছে জিনিষ গুণিয়া লইতেছে। বাদলকে ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যালো সেন, তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছে? বড়ো আশ্চর্য্য তো!"

বাদল আরো আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিল, "আপনাকে আমি চিনি ব'লে তো মনে হচ্ছে না?"

"আরে তোমাকে তো আমি ডেক-চেয়ার কিন্‌তে দেখেছি। তখন থেকেই ভাবছি এর সঙ্গে কতক্ষণে বন্ধুতা হয় দেখা যাক্—এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা। এখনো তিন ঘণ্টা হয় নি, এই ছাখো ঘড়ি।"

"নাম কী ক'রে জান্‌লেন?"

"তোমার সুট্‌কেস্‌ই জানালে। আমার নাম কিন্তু বেশ একটু বড়ো ব'লে পুরো লিখিনি। 'কুবের ভাই' আমার নাম।"

"এখন আসি তবে, কুবের ভাই। জাহাজ ছাড়বার আগে ভারতবর্ষকে কেমন দেখায় দেখ্‌তে চল্লুম।"

"ডেকের কোন্ পাশে তোমার চেয়ার? ষ্টার বোর্ড, না পোর্ট?"

"পোর্ট।"

"বেশ। তোমাকে খুঁজে বা'র করবো।"

উপরে যাইবার সময় হঠাৎ একটা ক্যাবিন হইতে আওয়াজ আসিল—"মিষ্টার সেন! মিষ্টার সেন!" বাদল থামিল।

একটি যুবক বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্‌তে পারেন?"

"বড়ো দুঃখিত হলুম।"

"আমি নওলকিশোর প্রসাদ। পাটনার ছেলে।"

"বলেন কি? পাটনা থেকে আস্‌ছেন? লণ্ডন, না কেম্ব্রিজ, না অক্সফোর্ড—কোথায় পড়বেন?"

যুবকটি লজ্জার সহিত বলিল, "আমি শুধু একজনকে তুলে দিতে এসেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে এঁকে দেখেন-শোনেন। মিষ্টার বাদলচন্দর সেন—মিসেস মিথিলেশ-কুমারী দেবী।"

বাদল bow-পূর্ব্বক "হাউ ডু ইউ ডু" করিল। মহিলাটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে সু-উচ্চারিত ইংরাজীতে প্রতিধ্বনি করিলেন।

বাদল যেন নিজের লোক পাইয়া গেল। বলিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুসী হলুম।"

"আমিও।"

"জাহাজে আর কারো সঙ্গে ভাব আছে কি?"

"না। একমাত্র আপনার সঙ্গেই।"

বাদলের ভারি ফূর্ত্তি লাগিতেছিল। একে ইউরোপে চলিয়াছে, তায় ইতিমধ্যেই একটি মেয়ের বন্ধু ও মুরুব্বি। কিছু উপদেশ দিয়া ফেলিল।—

"দেখুন, আপনার সী-সিক্‌নেস্ হ'তে পারে। এই বেলা কিছু কলা খেয়ে নিন্। আমার কিছু উদ্বৃত্ত আছে।"

"কই, কোথাও তো একথা শুনিনি যে কলা খেলে সী-সিক্‌নেস্ ছাড়ে?"

"শুন্‌বেন কি ক'রে? ও যে আমাদের পেটেণ্ট

দাওয়াই। আমার এক প্রোফেসারের প্রেস্‌ক্রিপশন্।"

জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে বাহিরের লোককে নামিয়া যাইবার সংকেত করিয়া ঘণ্টা বাজিল। নওলকিশোরকে নামাইয়া দিবার জন্য বাদলের সহিত মিথিলেশকুমারী সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেলেন। নওলকিশোর দুইজনের সহিত করমর্দ্দন করিয়া শুভেচ্ছা জানাইয়া নামিয়া যাইবার পরে যতক্ষণ জাহাজ দাঁড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ নীচে হইতে মিথিলেশকুমারীর দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবার ফলেই হউক কি বিদায়-বেদনাতেই হউক নওলকিশোরের চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিল। চোখে রুমাল দিলে পাছে বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার মেয়াদটুকু সংকীর্ণ হইয়া যায় এই মনে করিয়া নওলকিশোর রুমাল বাহির করিল না। তার গণ্ড বাহিয়া জলের স্রোত বহিয়া গেল।

কে কার দিকে তাকায়!—সকলেরই অনুরূপ অবস্থা। যেমন জাহাজের উপরে, তেমনি জাহাজ-ঘাটে। এমন কি বাদলকে যিনি তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন সেই ডাক্তার মিত্র পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ এড়াইতে না পারিয়া ছলছল চোখে বাদলের উদ্দেশে রুমাল নাড়িতেছিলেন।

সিঁড়ি সরাইয়া লইল। ঘাটের উপর যে দু' একটা চিঠির বস্তা তখনও পড়িয়া ছিল সেগুলিকেও উঠানো হইল।

জাহাজ খানিকটা চলিয়া একটু থামিল। তারপর মোড় ফিরিল। তখন বাদলের সহিত মিথিলেশকুমারী জাহাজের অন্য পাশে যাইয়া আবার তীরের দিকে চাহিলেন। নওলকিশোর চোখ মুছিয়া রুমাল নাড়িতেছে। বাদলের চাকর বাবুলাল বারবার সেলাম জানাইতেছে। মিত্র তাকে পিছু পিছু আসিতে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

বাদল মিথিলেশকুমারীর অনুমতি লইয়া নিজের চেয়ারে গিয়া গা এলাইয়া দিল। গেট্‌ওয়ে অব ইণ্ডিয়া দেখা যাইতেছে—ওটা কেবল আসিবার দ্বার নয় যাইবারও দ্বার। ভারতবর্ষের সিংহদ্বারকে বাদল মনে মনে প্রণাম জানাইল। হয় তো ফিরিয়া আসিবে,—হয় তো বিদেশে মরিবে। বিদায়!—যে দেশ তাকে বিশ বছর কোল দিয়াছে, বিদায় তার কাছে, বিদায়!

"হ্যালো সেন! লাঞ্চের ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। খেতে আস্‌বে না?" এই বলিয়া কুবের ভাই বাদলের পিঠের দিকে দাঁড়াইল। বাদল ঘাড় না ঘুরাইয়া কহিল, "না, ধন্যবাদ। গা বমি-বমি করছে।"—বাদল জাহাজে উঠিবার প্রাক্কালে পেট ভরিয়া শুধু কলা-ই খাইয়াছিল!

"তবে ওঠো,—আমার হাত ধরো। ক্যাবিনে নিয়ে যাই। শুয়ে থাকাই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র দাওয়াই।"

কুবের ভাই বাদলকে উত্তর দিবার অবকাশ দিল না, টানিয়া লইয়া গেল। ক্যাবিনে শুয়াইয়া ফ্যান্ খুলিয়া দিল। বলিল, "ক্ষিধে পেলেই হাত বাড়িয়ে বেল্ টিপে দিও। ষ্টুয়ার্ড এলে তাকে হুকুম কোরো। আমি চল্লুম—খেয়ে খানিকটে দৌড়াদৌড়ি করতে।"

"তাতে তোমার অসুখ করবে না?"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—আমার সী-সিক্‌নেস্? শুয়ে থাক্‌লেই আমার অসুখ করে, ঘুরে বেড়ালে করে না। কতবার জাহাজে চড়েছ তুমি?"

"আমার এই প্রথম।"

"তুমি বাঙালী,—না?"

"কায়ায় বাঙালী—মনোবাক্যে ইংরেজ।"

"বলো কী! যাদের আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি তুমি তাদের দলে?—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

"কেন ঘৃণা করো?"

"একশো কারণ। ওরা শুধু আমাদের নয় সমগ্র জগতের বুকের উপর ব'সে রক্ত শুষছে। ওরা মাংস খায়—"

"তুমি বুঝি নিরামিষাশী?"

"নিশ্চয়। নিরমিষ খাওয়াটা একটা সিম্বলিজম্ ছাড়া আর কী! আমরা ভারতবর্ষের লোক কারো মাংস খাইনে, রক্ত চুষিনে।"

বাদলের মাথা ঘুরিতেছিল। সে তর্ক করিল না। কুবের ভাই বুঝিতে পারিয়া কহিল, "আমি কী নির্ব্বোধ! তুমি শোও, শোও। আমি আসছি।"

আয়নায় একবার টাই-টা ঠিক করিয়া লইয়া কুবের ভাই বাহির হইয়া গেল।

১৩

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়া তিন দিন তিন রাত কাটিয়া গেল। বাদল সারাক্ষণ বিছানায় পড়িয়া। ষ্টুয়ার্ড তাকে দু'তিন ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া দেখা দিয়া ডেকের গল্প বলিয়া গেছে ও রাতের বেলা তার খাতিরে অধিক রাত্রি করিয়া ফিরিয়াছে।

রাত্রি একটার সময় বাদল দেখে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। "কে? কুবের ভাই?"

"হ্যালো সেন?—এখনো জেগে?"

"ঘুম আস্‌ছে না যতই চেষ্টা করছি।"

"একপাল ভেড়া একটির পর একটি যাচ্ছে—চোখ বুজে এই ধ্যান করো দেখি! কেমন ঘুম না হয় দেখবো।"

বাদল অনেক কষ্টে হাসিয়া বলে, "কতবার ভেড়া গুণেছি, গোলোকধাঁধার কেন্দ্র খুঁজেছি, মানসাঙ্ক কষেছি, আরো কত কী করেছি। মাঝখান থেকে আমার স্মরণ-শক্তি বেড়ে গেল, যা পড়ি তাই মনে থাকে—কিন্তু ঘুম আর হ'লো না!"

কুবের ভাই এমন মানুষ এর আগে দেখে নাই। বিস্ময়ের সহিত রসিকতা মিশাইয়া কহিল, "আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে আমার উপর নজর রাখো। ভাখো—কেমন ক'রে আমি পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ি। দেখলে শিক্ষা হবে।"

কুবের ভাই সত্যসত্যই কথা রাখিল। এক ঘরে অন্যের সহিত শুইতে বাদলের বিশ্রী লাগে। ঘুম তো আসেই না, তিল পরিমাণ নাকের শব্দ তাল পরিমাণ শোনায়।

পরদিন কুবের ভাই রাত্রি দুইটার পরে আসিল। বেশ বুঝিল—বাদলের ঘুম আসে নাই। তবু তাকে জাগাইবার ভয়ে আলো না জ্বালাইয়া নিঃশব্দে কাপড় ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল। বাদল ভাবিতেছিল, কী ভাগ্যবান এই কুবের ভাই—নিদ্রাদেবী এর ইচ্ছাদাসী!

তিন দিন তিন রাত্রির পর কুবের ভাই বলিল, "তোমার অসুখ অমন করলে সারবে না, সেন! এসো আমার সঙ্গে খেতে ও খেল্‌তে। জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে ও একবার ওদিকে হেল্‌তে পারো যদি, তবে কিছুতেই গা-বমিবমি করবে না। সাইকেল চড়তে জানো তো?"

"খুব জানি।"

"তবে আর কী! ব্যালান্সের ঐ একই প্রিন্সিপ্‌ল্‌।"

প্রিন্সিপ্লের নাম শুনিয়া বাদল লাফ দিয়া উঠিল। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া দেখিল—চোখ বসিয়া গেছে, গাল বসিয়া গেছে, নোনা হাওয়া লাগিয়া মুখমণ্ডল চট্‌চট্‌ করিতেছে, স্নান না করায় চুলের চেহারা পুরোনো কম্বলের মতো। কুবের ভাই তাকে ধরাধরি করিয়া স্নানের ঘরে পৌঁছাইয়া দিল, কিছুক্ষণ পরে লইয়া আসিল।

জাহাজে এই প্রথম বাদল খাইবার ঘরে বসিয়া ব্রেকফাস্ট খাইল। কোথায় মিথিলেশকুমারী?—বাদলের চোখ একে একে সব ক'টা টেবিল খানতল্লাস করিল। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছুরী-কাঁটা-চামচ সমান বেগে চালাইতেছে, তাদের পেয়ালা ও প্লেট হইতে টুং-টাং ধ্বনি উঠিতেছে। ওয়েটারদের চাঞ্চল্যে সমস্ত ঘরটা তোলপাড়। একজন আসিয়া বাদলের হাতে একখানা মেনু বাড়াইয়া দিল।

কুবের ভাই বলিল, "মেনুতে নেই এমন অনেক জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। চাও তো ডাল-ভাত ও নিরামিষ তরকারি দিয়ে যাবে। বল্‌বো?"

কুবের ভাই নিজের জন্য তাই আনিতে দিল। বাদল বলিল, "তিন-বেলা ঐ খেতে রুচি হবে না; সব-রকম দেশী খাবার যদি না পাই, তবে সব-রকম বিদেশী খাবারই আমার পছন্দ!" এই বলিয়া 'পরিজ' ইত্যাদি ফরমাস করিল।

ব্রেকফাস্টের পরে কুবের ভাই তাকে বসিবার ঘরে লইয়া যাইতে চায়। বাদল বলে, "একজনের সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার। এতদিন তাঁর খবর নেওয়া হয় নি।" তখন কুবের ভাই বলে, "আমি আস্‌তে পারি?" বাদল অনিচ্ছাসত্ত্বে বলে, "আস্‌তে পারো।"

মিথিলেশকুমারীর ঘরে টোকা মারিতেই ভিতর হইতে অনুমতি আসিল, "আসুন।"

বাদল বলিল, "গুড্‌ মর্ণিং, মিসেস্‌—"

মিথিলেশকুমারী বলিলেন, "গুড্‌ মর্ণিং।—ইনি?"

বাদল পরিচয় করাইয়া দিল, "মিষ্টার কুবের ভাই—মিসেস্ মিথিলেশকুমারী দেবী।"

যথারীতি অভিবাদনের পর মিথিলেশকুমারী কহিলেন, "মরেছি কি বেঁচে আছি একবার খবরও নিলেন না! কোথায় ছিলেন এতদিন?—এ যে একটা যুগ!"

বাদল উত্তর করিল, "অপরাধ হ'য়ে গেছে, ক্ষমা কর্‌বেন। আমি নিজেই শয্যাগত ছিলুম।"

"তাই বলুন! তারপর আপনি কেমন ছিলেন?"

কুবের ভাই কহিল, "আনন্দে ছিলুম।—ধন্যবাদ!"

"ভাগ্যবান।"

মিথিলেশকুমারী সেদিন বেশ সুস্থ-ই ছিলেন। কেবল ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিতেছিলেন না। তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীটি তাঁকে টানাটানি করিয়া নড়াইতে পারেন নাই। ছোটো-খাটো হস্তিনী বিশেষ! কিন্তু দুটি যুবকের অনুরোধ তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকের উপরে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

জাহাজের ভিতরে কেমন এক-রকম গন্ধ। ডেকে ও-গন্ধ নেই। প্রচুর বাতাস। বাদল বুঝিল, গা-বমিবমির প্রধান কারণ ঐ জাহাজী গন্ধটা—এবং তার প্রধান প্রতিষেধক সমস্ত আকাশের রাশীকৃত নিঃশ্বাসের মতো হু-হু-করা বাতাস। মরি মরি—কী আকাশ! একটা বৃহৎ গোলাকার dome যেন সমুদ্রকে ভিত্তি করিয়া জাহাজকে ভিতরে রাখিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গেছে। 'দশ দিক' বলিয়া একটা কথা আছে বটে,—তার মধ্যে একটা দিক সমুদ্র। বাকী নয়টা দিক যে কোথায় তা বাদল ভাবিয়া পাইল না।

ডেকের উপর ইতিমধ্যে বেশ জনসমাগম হইয়াছে। কা'রা ডেক-টেনিস্ খেলিতেছে, কা'রা দড়ির চাকতি ছুঁড়িয়া একটা বিশেষ বৃত্তের ভিতর ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে; নিজ নিজ চেয়ারে বসিয়া অনেকেই কিছু পড়িতেছে বা সেলাই করিতেছে। বেশীর ভাগ লোক পায়চারি করিতে করিতে এখানে-ওখানে ভিড়িয়া যাইতেছে,—রেলিঙের উপর ভর দিয়া সমুদ্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যেন কী একটা জরুরি কাজে যাইতেছে—হয়তো 'উড়ুকু-মাছ' দেখিতে।

বাদলের ইচ্ছা করিল—তাদের দু'একটির পথরোধ করিয়া বাহু মেলিয়া দাঁড়ায়; বলে, থামো থামো! আমাকে তোমাদের সঙ্গী কর্‌বে না? কুবের ভাইকে কানে-কানে জিজ্ঞাসা করিল, "একটিকে আটকাবো?"

কুবের ভাই আতঙ্কিত হইয়া বলিল, "কক্ষনো ও-কর্ম্ম কোরো না। ওদের বাপ-মা'রা ঘ্যাঁক্ ক'রে তেড়ে আস্‌বে। কিম্বা ভাব্‌বে আমাদের বাচ্চাদের একটি পুরুষ-আয়া জুটেছে। সাদাতে কালোতে এত মাখামাখি কিসের!"

বাদল ভাবিল, কুবের ভাইয়ের বড় ছোট মন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ পিছাইয়া দিল।

মিথিলেশকুমারী রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া ফেণ-লীলা দেখিতেছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি যুবক।

সকলে মিলিয়া আলাপ-পরিচয় হইল। মিস্ জাকারিয়া (দেশী খৃষ্টান)—মিষ্টার আচারিয়া (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ)। নাম শুনিয়া কুবের ভাই রসিকতা করিয়া কহিল, "Rhyming couplets।" সকলে হাসিয়া উঠিল।

মিস্ জাকারিয়া বলিলেন, "বাঃ মিসেস্ দেবী! ডেক্-এ আস্‌তে এত সাধলুম, তখন এলেন না!"

মিসেস্ দেবী মৃদু হাসিলেন। তারপরে কিছুকাল ধরিয়া খোসগল্প চলিল। জাহাজে কোন্ কোন্ স্যর ও লেডী যাচ্ছেন, কোথাকার মহারাজা ও মহাজন, কার ক'দিন অসুখ করেছিল, ব্রেকফাষ্টে কী খেতে দিয়েছিল ইত্যাদি। বাদল কখন সরিয়া গিয়া লাউঞ্জে বসিল।

১৪

লাউঞ্জ তখন কিছু কম জনাকীর্ণ। জনকয়েক বসিয়া চিঠি লিখিতেছে, জনকয়েক ব্রিজ খেলিতেছে ও lemon squash খাইতেছে। একটি কোণে গ্রামোফোনে গোটা-কয়েক রেকর্ড ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছে:

—Because I love you

—Blue bird, sing me a song

—Ramona

বাদল একটা গদী-মোড়া চেয়ারে বসিবামাত্র তলাইয়া গেল। করিবার মতো কাজ তো চাই। ঘরের দেয়ালে খানকয়েক ছবি আঁটা ছিল, তাতেই মনোনিবেশ করিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল কে জানে। হঠাৎ কুবের ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে তার তন্দ্রা ভাঙিল।

"হ্যালো সেন, তোমাকে আমি সর্ব্বত্র খুঁজেছি—এই বৃহৎ চেয়ারটাতে গা-ঢাকা দিয়েছো? কেন, শরীর ভাল নেই?"

"ভালো আছে, ধন্যবাদ। ব'সে ব'সে ছবি দেখছিলুম।"

কুবের ভাই একখানা ছোট চেয়ার টানিয়া লইয়া বাদলের কাছে বসিল। বলিল, "ঐ যে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখ্ছ ওর ব্যাপার জানো?"

"এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান না কি?"

"খুব বেশী নয়। ওর সবাই ইংরেজ, কেবল ঠাকু'মা না দিদিমা মাদ্রাজী।"

"তারপর?"

"তারপর ও তো মাদ্রাজ থেকে পাস ক'রে বিলেতে পড়তে যাচ্ছে মাষ্টারি। কিন্তু শিকারী-স্বভাব যায় কোথা? একজনকে তাক্ ক'রে পুষ্পবাণ ছেড়েছে—"

"থামাও ও কথা।"

"শোনোই না। তারপর সেই যে ইংরেজ পুরুষটি সে তোমাদের কল্‌কাতার না কোথাকার বেনে। ঐ যে বেঁটে-মতন মোটাসোটা গোলগাল মানুষটি হে—মাথায় খুব কম চুল; প্লাস্ ফোর্স পরে।"

"হুঁ।"

"এখন সে পড়েছে কিনা আরেক জনের পাল্লায়। সেটি হচ্ছে খাঁটি ইংরেজ মেয়ে। দুঃখের বিষয় তার একটি স্বামী আছে—তোমাদেরই কল্‌কাতায় না কোথায়। স্বামীকে রেখে দেশে যাচ্ছে। তা একলাটি যাচ্ছে, পথে একটি সাথীর দরকার—পাকড়েছে আমাদের প্লাস্ ফোর্স'ওয়ালাকে।"

কুবের ভাই ছাড়িবার পাত্র নয়। শ্রোতা পাইয়াছে, গল্প বলিবেই। "তারপর মহাযুদ্ধ বেধে গেছে!"

বাদল চমকিয়া শুধাইল, "কি রকম?"

"একদিকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস্, অন্যদিকে ইংরেজ মিসেস্। চোখে চোখে ঝগড়া চল্‌ছে।"

"তুমি এত কথা জান্‌লে কেমন্ ক'রে?"

"আমি কী না জানি? জান্‌তে চাও তো তোমাদের মিথিলেশকুমারীর ইতিহাস বল্‌তে পারি।"

বাদল আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "আমি শুন্‌তে চাইনে।"

"কিন্তু আমি শোনাতে চাই। সেই যে ছেলেটি ওঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল সেটি তাঁর স্বামী নয়।"

"তবে কী!"

"চটো কেন? তোমার বন্ধুকে তুমি যখন চেনো না তখন আমার কর্ত্তব্য চিনিয়ে দেওয়া। সেটি একটি বিবাহিত যুবক। এটি একটি বালবিধবা।"

"শুনে আমি খুসীই হলুম, কুবের ভাই। আমি ফ্রি-লভ্‌কে শ্রদ্ধা করি।"

"তা তুমি যখন ছদ্মবেশী ইউরোপীয়ান তুমি কর্‌বেই তো। আমি কিন্তু ঘৃণা করি।"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা কর্‌তে তোমার ঘেন্না করে না?"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা কী! মানুষ আমরা, সামাজিক জীব—আমরা দশজনের খবর রাখবো না? আমি কারো রাস্তায় কাঁটা দিচ্ছিনে। আমি পুরোদস্তুর অহিংস।—আমি জৈন।"

বাদল বলিল, "এসো অন্য কথা পাড়ি। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা বলো। অবিশ্যি আমার মতে তাঁকে মহাত্মা না ব'লে মান্ধাতা বল্লে যথার্থ বলা হয়।"

কুবের ভাই ও বাদল বহুক্ষণ ঐ লইয়া তর্কাতর্কি করিল। তর্কের মাঝখানে লাঞ্চের ঘণ্টা পড়িল। দু'জনে উঠিতেই কুবের ভাই বলিল, "আমার অভিলাষ কী তোমাকে বল্‌বো সেন?"

"বলো।"

"আইন প'ড়ে এসে পূর্ব্ব আফ্রিকায় বস্‌বো। ওখানে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ কয়েক বছর পরে বাধবেই। তখন সত্যাগ্রহের চালকের দরকার হবে। তুমিও এসো না, সেন?"

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে যাইতে বাদল বলিল, "আমার অন্য কাজ। ইংলণ্ডকে আমি ভালবেসেছি। দেখতে চাই ইংলণ্ড আমাকে ভালবাসবে কি না।"

কুবের ভাই ও বাদল মতবিরোধ সত্ত্বেও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিল। তাদের কথাবার্ত্তা অপরাহ্নেও ফুরাইল না। ডিনারের পরে তারা ডেকে গিয়া বসিল। সেখানে মিসেস্ দেবী ও মিস্ জাকারিয়াকে ঘিরিয়া একদল ভারতীয় যুবক জড় হইয়াছে। তারা বলিতেছে, "মিসেস্ দেবী ও মিস্ জাকারিয়ার যখন হুকুম তখন আমরা প্রত্যেকেই সাধ্যমতো কিছু গাইতে চেষ্টা করবোই। কিন্তু আমাদের হুকুম নয়, অনুরোধ এই যে, তাঁরাও যেন আমাদের উৎসাহিত করেন।"

সিন্ধী, উর্দ্দু, মালয়ালম গানের পরে মিসেস্ দেবী উৎসাহিত করিলেন। গাইলেন একটি হিন্দী গান। ললিত-মধুর কণ্ঠস্বর।

বাদল চুপি চুপি কহিল, "কুবের ভাই, আমি ভেবেছিলুম আমি এই মেয়েটির একমাত্র বন্ধু। কিন্তু নিজগুণে ইনি দেদার বন্ধু পেয়েছেন। এতে আমার অভিমান হচ্ছে, ঈর্ষাও।"

কুবের ভাই তাকে সভাস্থল হইতে টানিয়া লইয়া গেল। বলিল, "বন্ধু তাঁর একটি মাত্রই। কিন্তু তুমি নও। ঐ যে মোসাহেবদের দেখছো ওরা এ জাহাজে কোনো ইংরেজ মেয়ের কাছে আমল পায় নি ব'লে এঁদের খুসী ক'রে খুসী হচ্ছে।...এসো, তোমাকে দাবা খেলা শিখিয়ে দিই।"

১৫

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়িতেই ভয়ঙ্কর গরম পড়িল। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা কুবের ভাই দেশী পোষাক পরিয়া ডেক্-এর উপর জুটিল। সে ভাবিয়াছিল ইংরেজরা তার এই বেশ দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে, কিন্তু ইংরেজরা অনেকেই তাকে লক্ষ্য করিল না, যারা লক্ষ্য করিল তারা চমৎকৃত হইল। এদিকে ভারতীয়দের মাঝখানে সোরগোল পড়িয়া গেল। লক্ষ্য তো তাকে সকলেই করিল, জনকয়েক গায়ে পড়িয়া তার সৎসাহসের প্রশংসা ও বাড়াবাড়ির নিন্দা করিয়া গেল। ফলে তার আলাপী-সংখ্যা বাড়িল এবং তার দেখাদেখি কেহ কেহ দেশী পোষাক বাহির করিয়া পরিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার-টেবিলে বাদল দেখে কুবের ভাই অনুপস্থিত। কী হইল তার! বাদল তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করিয়া কুবের ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইল। দেখিল সে ডেক্-এর এক কোণে মুখ শুকাইয়া বসিয়া আছে। "কী হয়েছে কুবের ভাই? অসুখ করেছে?"

কুবের ভাই বলিল, "বসো।"

পীড়াপীড়ির পর সে যা বলিল তার মর্ম্ম এই।—সে ডিনার খাইবার জন্য খাইবার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে এমন সময় প্রধান ষ্টুয়ার্ড্ তাকে আটকাইয়া বলিল, "একটা কোট গায়ে দিয়ে আস্তে পারেন না?" সে বলিল, "এই বা মন্দ কী!" ষ্টুয়ার্ড্ বলিল, "না, না। ওটা একটা উত্তম প্রাচীন প্রথা। ওর ব্যতিক্রম কেন হবে তার কারণ দেখ ছি নে।" কুবের ভাই বলিল, "বেশ্। তবে আমি ডিনার খাবো না আজ।" এই বলিয়া ডেক্-এ আসিয়া বসিয়াছে। এই তার সত্যাগ্রহ।

বাদল বলিল, "ভাখো, ইংরেজের জাহাজে যখন যাচ্ছো ইংরেজী কায়দা মান্‌তে হয়। লোকটা তোমাকে হিংসা ক'রে বাধা দেয় নি, কর্ত্তব্যবোধে বাধা দিয়েছে।"

কুবের ভাই তর্ক করিল। "ভারতীয়দের দেশে ওরা ভারতীয় কায়দা ভারি মানে কি না!"

"ওকথা পরে হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমার জঠর জ্ব'লে যাচ্ছে।—তারই আঁচ লেগে মনও। আমার সঙ্গে এসো।"

বাদল তাকে ক্যাবিনে লইয়া গিয়া নিজের ফলের ঝুড়িটি উপহার দিল। বলিল, "আমার বাবা সঙ্গে দিয়েছিলেন। এতদিন মনে ছিল না। এঁ্যা, প'চে গেছে?"

"সবটা প'চে যায় নি। চমৎকার কমলা লেবু তো? টাকায় ক'টা ক'রে?"

"আমি কি জানি!"

"বা রে ছেলে!...নাও, তুমিও চালাও।"

কুবের ভাই আহার করিয়া ঠাণ্ডা হইল। তখন ডেক্-এ যাইয়া তর্কটা নূতন করিয়া সুরু করিল। "তুমি লক্ষ্য করেছো কি না জানি নে, এ জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝখানে জাতিভেদ আছে। খাবার টেবিল ওদের আলাদা, আমাদের আলাদা।"

"সেটা কি খুব দোষের কথা, কুবের ভাই? গোরুখোরদের কাছে ব'সে তুমি খেতে রাজি হ'তে?"

"তা যদি বলো, আমার পাশের লোকটি মুসলমান। সে রোজ গো-মাংস চেয়ে নেয়। কই, তাকে তো সাদা গোরুখোরদের সঙ্গে বস্তে বলে না?"

"তার কারণ সে শুধু গোরু খায় না, ভারতীয় খাবার ভালোবাসে—ডাল ভাত কারি।"

"তা বুঝি সাদা মহাপ্রভুরা খান না? একবার খবর নাও না? ওঁরা সর্ব্বভুক্। হিন্দুর গোরু, মুসলমানের শূওর, সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু অখাদ্য-কুখাদ্য কোনোটাতেই ওঁদের অরুচি নেই।"

"যাক্, মিস্ জাকারিয়াকে আমি তাদের টেবিলে খেতে দেখেছি।"

"ঐসব উচ্ছিষ্টভুক্ বিশ্বাসঘাতকের জন্যেই তো ভারতবর্ষের এই দশা। উনি ভাবেন ওঁর নামটা ও ধর্ম্মটা বিদেশী ব'লে উনিও বিদেশিনী।"

এই সময় পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবকটি আসিয়া বলিলেন, "আমাকে মাফ্ করবেন, আমি মিসেস্ দেবী ও মিস্ জাকারিয়ার কাছ থেকে আস্ছি। আপনারা কি দয়া ক'রে আমার সঙ্গে আস্বেন?"

বাদল ও কুবের ভাই গিয়া দেখিল মিসেস্ ও মিস্ তাঁদের পারিষদ্গণকে লইয়া সভা করিতেছেন। মিসেস্ অনুযোগ করিয়া কহিলেন, "আপনারা দু'জনে কোথায় হারিয়ে গেছ্লেন? আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আজও কি গান চল্ছে না কি?"

"না, আজ অভিনয় ও আবৃত্তি। মিষ্টার আলী নিয়েছেন শাইলকের ভূমিকা। মিষ্টার আচারিয়া তাঁর স্বরচিত সনেট শোনাবেন। আপনারাও যোগ দেবেন কি?"

বাদল লাজুক মানুষ। চুপ করিয়া রহিল। কুবের ভাই বলিল, "উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজীতে বাক্যালাপ করতে হয়—এই যথেষ্ট লজ্জা! এর উপর আমি পরের ভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি ক'রে পরকে হাসাবো না।—মাফ করবেন!"

সকলে অপ্রস্তুত ও আহত হইল। আনন্দের সভায় নিরানন্দ। মিসেস্ দেবী বলিলেন, "তবে আপনি নীরব শ্রোতাই হবেন—কেমন? আর আপনি?"

"আমিও।" বাদল বলিল।

আচারিয়ার কবিসুলভ চেহারা—ঝাঁকড়া চুল, রিবন্-এর মতো করিয়া বাঁধা টাই, সোনার শিকল-বাঁধা রিম্-লেস্ চশমা, চশমার নীচে হইতে তার চোখের মিটিমিটি চাহনি দেখা যায়। কবি হইতে হইলে যত-কিছু তোড়জোড় থাকা দরকার আচারিয়ার সমস্ত আছে। হাত উঠাইয়া নামাইয়া বুকে রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গদ-গদ ভাবে আচারিয়া সনেটগুলি রহিয়া রহিয়া পড়েন, আর বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বারম্বার বাহবা দেয়।

আলীর শাইলক হইল আর এক-কাটি সরেস! সে কখনো খেঁকী কুকুরের মতো গর্গর্ করে, কখনো মাথায় চোট্ লাগা মানুষের মতো নির্ব্বাক বেদনায় টলিয়া পড়ে, পর মুহূর্ত্তে দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসে। "এন্কোর" "এন্কোর" করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলে আলী সবিনয়ে bow করে ও আবার সুরু করে। শাইলকের ভূমিকা নেহাৎ শেষ হইয়া গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে সে মার্ক্ এ্যান্টনীর ভূমিকা লইল।

কুবের ভাই ও বাদল সকলের অগোচরে কখন এক-সময় উঠিয়া গেল। কুবের ভাই কহিল, "এই তো আমাদের ভারতীয়দের আমোদপ্রমোদের নমুনা। এবার চলো ইংরেজদের দলে ভিড়ি।"

ডেক্-এর একাংশে নাচ চলিয়াছে। দর্শকই বেশী। কাছে এক জায়গায় একদল লোক পিয়ানো ও ড্রাম্ বাজাইতেছে,—বেহালাও একজনের কাঁধে। একটুক্ষণ বাজ্না থামে তো নাচও থামে, যারা নাচিতেছিল তারা বিশ্রাম করে, বাক্যালাপের সুর উঁচু হয়। তারপর আবার বাজ্না, আবার নাচ। এক দফা নাচ হইয়া গেলে আর এক

দফার উদ্যোগ। এবার কার সঙ্গে কে নাচিবে—পুরুষরা মেয়েদের কাছে গিয়া প্রস্তাব করে। কুবের ভাই বলিল,"ঐ ত্যাখো, আমাদের বন্ধু কল্‌কাতার সওদাগর। ' তিনি এতক্ষণ মিসেসের সঙ্গে নাচ্‌ছিলেন ব'লে মিস্ গোসা করেছেন। অনুরোধ শুনে মাথা নাড়্‌ছেন। বল্‌ছেন, আরেকজনের সঙ্গে ওঁর নাচের এন্‌গেজ্‌মেন্ট্ হ'য়ে গেছে। আরেকজনটিকে চিনে রাখো, সেন! আধ-পাগলা বুড়ো—কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে না ব'লে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছিল একদিন। ইংরেজের মুরুব্বিয়ানা আমার হাতে স্বর্গ এনে দেয় না, তাই তার হাতে এক পেগ্ হুইস্কি ধরিয়ে দিয়ে ছুটি নিলুম।"

আর এক দফা নাচ আরম্ভ হইল। কুবের ভাই বলিল, "এবার ত্যাখো মিস্ ও মিসেস্ নাচে ব্যস্ত থেকেও পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হান্‌ছেন। পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে "sorry" বল্‌ছেন পর্য্যন্ত। কিন্তু সব চেয়ে ভালো নাচ্‌ছেন আমাদের ঐ মিশ্‌কালো গোয়ানিজটি। তিনি অবশ্য পর্টুগীজ সিটিজ্‌ন্—ভারতবর্ষের কেউ নন।"

বাদল বলিল, "আজ আমার ঘুম পাচ্ছে কুবের ভাই; আমাকে ছুটি দাও।"

"তার মানে তোমার অনিদ্রা সেরে গেছে?—খুসী হলুম; এসো তোমাকে ক্যাবিনে রেখে আসি।"

১৬

জাহাজের জীবন এমন যে, পায়ের তলায় সমুদ্র আছে না মাটি আছে তা-ও কারো মনে থাকে না। এবং জাহাজটা যে চলিতেছে এ-কথা মনে হয় জাহাজ যখন একটা না একটা বন্দরে দাঁড়ায়। বাদলের মন হইতে দেশ তো মুছিয়া গেল-ই, তার বদলে বিদেশও জাজ্বল্যমান হইল না। বাদল জাহাজী সুখদুঃখ, দলাদলি ও পরচর্চ্চাতে মাতিয়া গেল। আলী, আচারিয়া, কিষণলাল, নবাব সিং ইত্যাদি তাকে লুফিয়া লইল। এদিকে কুবের ভাই ইংরেজদের সঙ্গে দু'বেলা খেলিতেছে ফিরিতেছে সাঁতার কাটিতেছে; তা লইয়া ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ভাগ্যবান বলিয়া তাকে ঈর্ষাও করিল। কেহ কেহ ব'লল, "ও কি যে-সে লোক না কি?—গবর্ণমেণ্টের সি-আই-ডি!"

একদিন আলী বলিল, "মিষ্টার সেন, কেম্ব্রিজে যদি আপনি পড়েন তবে আমার একটু উপকার করতে হবে। আমি ইণ্ডিয়ান মজ্‌লিশের সেক্রেটারী-পদের জন্যে দাঁড়াবো, আপনার ভোট্ আজ থেকে আমার। রাজী?"

বাদল হাসিয়া বলিল, "কেম্ব্রিজে এ বছর জায়গা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমার।—নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমারো নেই; তবু দৈব ব'লে তো একটা কথা আছে? দৈবাৎ যদি আমরা দু'জনেই কেম্ব্রিজে জায়গা পাই তবে আপনার ভোট আমার। কেমন?

"বেশ!" দৈব কথাটা শুনিয়া বাদলের গা জ্বালা করিতেছিল। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান—ভারতবর্ষের লোকগুলো দৈবের মুখ চাহিয়া অসম্ভব কল্পনার পথে অধঃপাতে গেল। আল্‌নস্করের মতো উদ্ভট স্বপ্ন দেখা তাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিষণলাল সম্প্রতি টিকি কাটিয়াছে, তার চুল দেখিলে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দী বলে বলিয়া মিথিলেশ-কুমারীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেছে। প্রায়ই ফরমাস খাটিয়া বেড়ায়। মুখের ভাবটা যেন সর্ব্বদা বিরক্ত হইয়া আছে। বাদলকে ক্ষেপাইবার জন্য বলে, "বাঙালী বাবু, চিংড়ি মাছের সের কত?" বাদল জবাব দেয়, "বলেন কেন! মাছের দর দেখে ছাতু ধরেছি। ছাতু খাই আর ভজন গাই, আর হনুমানজীর আখ্‌ড়ায় মুগুর ভাঁজি।"

"সেই জন্যেই তো অমন ফড়িঙের মতো চেহারা!" এই বলিয়া সে বাদলকে ধরিয়া কাঁধে তুলিতে যায়। বলে, "গায়ে জোর নেই বাঙালী বাবু, চালাবেন কি ক'রে?"

"গায়ের জোরওয়ালা দারোয়ান রাখ্‌বো, বেয়ারা রাখ্‌বো। তা ব'লে একটা ভাবরাজ্যের ঝাঁকামুটে হবো কী করতে!"

"ইস্! বাঙালী বাবুর intellectual arrogance কত! হবেন তো কেরাণী কিম্বা ইস্কুলমাষ্টার!"

"যেমন জগদীশ কিম্বা রবীন্দ্রনাথ! যাঁদের দেশের লোক

ব'লে বিদেশে আপনি মান পাবেন, মিষ্টার কুলী !"

পোর্ট সৈয়দে জাহাজ দাঁড়াইতেই অধিকাংশ যাত্রী-যাত্রিণী শহর দেখিতে নামিয়া গেল। মিথিলেশকুমারীর বাহনগুলি বাদলকে ডাকিল। বাদল মাথা নাড়িল। সে ইউরোপের অভিসারে চলিয়াছে—আফ্রিকার আকর্ষণ তার একনিষ্ঠতার অন্তরায়।

আর একটা কারণও ছিল। এতদিনে সুধীদা'র চিঠি পাইয়াছে—ফেলিয়া রাখিবার মতো ধৈর্য্য তার নাই। ডেক্-এর উপর বসিয়া একবার করিয়া সুধীদা'র চিঠিতে মন দেয় একবার করিয়া লোকজনের ওঠা-নামা দেখে। অগভীর জলে শতসংখ্যক নৌকা কিল্‌বিল্ করিতেছে—কোনোটাতে সরকারী কর্ম্মচারীরা জাহাজের দিকে আসিতেছে, কোনোটাতে কার্পেটওয়ালা কার্পেট দেখাইয়া দর হাঁকিতেছে। বিশ্রী হট্টগোল !

সুধীদা লিখিয়াছে, "লণ্ডনের বাইরে হেন্‌ডনে আছি। ফাঁকা জায়গা, সেইজন্য আমার পছন্দ। দোষের মধ্যে সময়ে অসময়ে এরোপ্লেনের উচ্চ গুঞ্জন। তোর জন্যে এই বাড়ীর একটা ঘর রাখ্‌তে বলেছি। তোর যদি না পোষায় ছেড়ে দিস্। আমি কিন্তু এইখানেই থেকে যাবো, আমার তো কিছুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।"

বাদলের মন এইবার লণ্ডনের মাটিতে গিয়া পড়িল। জাহাজ তার অসহ্য বোধ হইল। সমুদ্র তার দুস্তর বোধ হইল। সুধীদা ভাগ্যবান, সে লণ্ডনে পৌঁছাইয়া গেছে, বাদলের এখনো অনেক বাধা। বাদল অধৈর্য্য হইলে জোরে পায়চারি করিয়া থাকে। জাহাজটাকে সে চষিয়া বেড়াইল।

পোর্ট সৈয়দে ইউরোপের হাওয়া গায়ে লাগিল। দূর থেকে সহরটিকে দেখিয়া মনে হইল—মাটি আফ্রিকা হইলেও মাটির উপরটা ইউরোপ। ঐ যে সব বড় বড় বাড়ী, ওগুলি ইউরোপীয় ধরণে তৈরী ইউরোপীয় কোম্পানীদের বাড়ী। শত শত জাহাজ—খানকয়েক জাপানী জাহাজ ছাড়া সবই তো অষ্টাদশভুজা ইউরোপার অঙ্গুলি। এমন ঐশ্বর্য্যময়ী তার ইউরোপা! বাদলের জাহাজ যখন আবার নোঙর তুলিল তখন বাদল তার ডান হাত তুলিয়া কপালে ঠেকাইল। "—বন্দে প্রিয়াম্ !"

বাদল কোনোদিন কোনো নারীকে ভালোবাসে নাই—বাসিয়াছে একটি ধ্যানমূর্ত্তিকে। তার মানসসুন্দরীর নাম ইউরোপা। ভূমধ্য সাগরের হাওয়া যখন তার গায়ে লাগিল তখন তার মনে হইল যেন ইউরোপ তাকে চুম্বন পাঠাইয়া দিয়াছে।

ইতিমধ্যে দুটি একটি ইংরেজ-শিশুর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে। একজনকে একটা ছবি আঁকিয়া দিয়াছে,—আরেকজনকে ছবির বই দেখাইয়াছে। এইবার তাদের একজন তার ঋণ শোধ করিল। জাহাজ যখন সিসিলী ও ইটালীর মাঝখান দিয়া চলিতে লাগিল বাদল দেখিল একটি বালক দুরবীণ দিয়া কী নিরীক্ষণ করিতেছে। বাদল তার কাছে দাঁড়াইতেই সে কহিল, "দেখুন, দেখুন, আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া !—ঐ কি ষ্ট্রম্বোলী ?" এই বলিয়া বাদলের দিকে তার ছোট্ট দুরবীণটি বাড়াইয়া দিল।

ইউরোপের সঙ্গে প্রথম দেখা—শুভদৃষ্টি ! বাদল মুগ্ধ হইয়া গেল, মত্ত হইয়া গেল।

ছেলেটি শুধাইল, "বলুন না, ঐ কি ষ্ট্রম্বোলী ?"

বাদল কহিল, "এঁ্যা ! কী বল্‌ছো ? ষ্ট্রম্বোলী ? আমি তো বল্‌তে পার্‌ছিনে ?"

"তবে দিন্, আমাকে দিন্।"

বাদল দুরবীণটি ফেরৎ দিয়া কহিল, "বোধ হয় এট্‌না ; ষ্ট্রম্বোলীর দেরি আছে।"

এক পাশে ইটালীর পার্ব্বত্য তটভূমি, অন্য পাশে সিসিলীর। বাদলের দুই চোখ দুই দিকে ছুটিতে চায়। বাদল একবার ডেক্-এর এ পাশে দাঁড়ায়, একবার ডেক্-এর ও পাশে।

জাহাজ আবার তটহীন সমুদ্রে পড়িল। তখন দেখা গেল একটা পাহাড় সমুদ্র ফুঁড়িয়া মৈনাকের মতো মাথা তুলিয়াছে। তার তালু ভেদ করিয়া ধূম উদ্‌গত হইয়া আকাশে মিশাইতেছে। ছেলেটি আসিয়া খবর দিয়া গেল, "ষ্ট্রম্বোলী এসেছে !"

"এসেছে ?"

"এই দেখুন না ?—নিন্।"

"ধন্যবাদ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়.

নবীন ভারত ও প্রাচ্যগৌরব বুদ্ধদেব

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ বি-এ

পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া ভারত যখন নিজ জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থাহীন হইতেছিল, তখন যে-সকল শক্তি তাহার আত্মসম্বিৎকে জাগ্রত করিবার সাহায্য করিয়াছে ভগবান্ বুদ্ধের জীবন ও বাণী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন—'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর'। এই কথা স্মরণ করিয়া

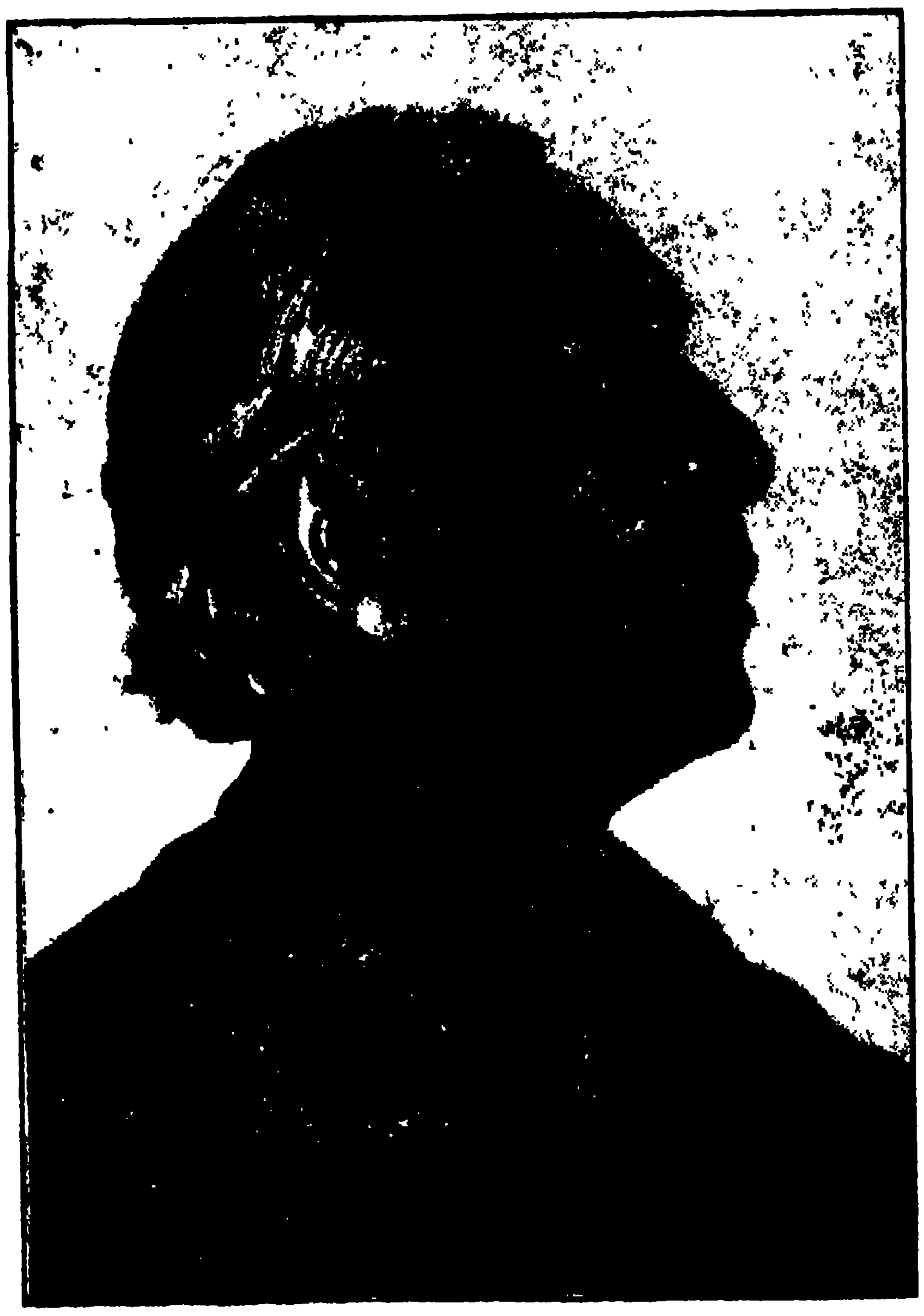

অনগারিক ধর্ম্মপাল

ভারতবাসী যে তাহার লুপ্তাবশিষ্ট আত্মসম্মানকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ইহাই বুদ্ধের জীবন ও বাণীর চরম দান নহে। নবীন ভারতকে জগাইবার সাহায্য করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হইবে না। চীন, জাপান, কোরিয়া, আনাম, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাবা, বালি, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতি দেশের সভ্যতাবর্দ্ধনে ভারতের শিক্ষা যে কি সহায়তা করিয়াছে তাহা দেখিয়া যুবক-ভারত একদিকে যেমন তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবে, অপরদিকে তেমনই ভবিষ্যৎ-ভারতের বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মটি (Divine mission) কি তাহাও ধরিতে পারিবে। বর্ত্তমানের ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব যে-সভ্যতা পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের দ্বারা পৃথিবীকে অবিরত অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সকল জাতিই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আজ অন্তরে অন্তরে শান্তির জন্য একান্তভাবে উৎসুক; অন্যকে সংহার করা বা অন্যের হস্তে সংহার হওয়া, এ দুইটি আজ কাহারও প্রাণের কথা নহে; কিন্তু ভবিষ্যৎ জগৎ-শান্তির বাণী আসিবে কোথা হইতে? এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁহার বাণী সেই ভবিষ্যৎ-শান্তির উদ্বোধন করিতে পারে?

সেই ব্যক্তি, সেই মহাপুরুষ—ভগবান্ বুদ্ধ, যাঁহার শান্তিময় উপদেশ এককালে ভারতের ভৌগোলিক চতুঃসীমাকে লঙ্ঘন করিয়া সুদূর জনপদবাসী পৃথক জাতিগোত্রসম্ভূত জনগণকে এক পরম ঐক্য ও বন্ধুত্বসূত্রে গাঁথিয়াছিল। আজিকার দিনে ভবিষ্যৎ-মহাশান্তিকে গড়িবার আয়োজনের শুভমুহূর্ত্তে একমাত্র ভগবান বুদ্ধই আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দিতে সমর্থ। তাই আজ শুভ বৈশাখের বুদ্ধজন্মতিথিতে আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।

স্থূলদর্শী ঐতিহাসিকেরা কহিয়া থাকেন যে বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্ম ভারত হইতে নিষ্কাশিত, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম বাহ্যিক রূপ লইয়া ভারতে বর্ত্তমানে নাই বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের আপামর জনসাধারণকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহারই ফলে আমাদের

দেশের তথাকথিত অজ্ঞ ও নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যে এক চমৎকার সাধুতা ও ধর্ম্মভাব বিরাজ করিতেছে। আজিকার দিনে গান্ধী ভারতকে যে অহিংসার পথে রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভে অগ্রসর করিতে পারিবেন ভরসা করিতেছেন তাহারও পশ্চাতে রহিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্মের উদার শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত হিন্দুরা যে ভগবান্ বুদ্ধকে তাহাদের দশ-অবতারের এক অবতার করিয়া লইয়াছেন, তাহা নাই বলিলাম। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম যে তাহার বাহ্যিক রূপ লইয়া ভারতে তেমন ভাবে বিরাজিত নাই, তাহাতে আমরা একটু লজ্জা অনুভব করি। যে দেশে একসময় শত শত বিহার ও সংঘারাম প্রভৃতি ছিল, এবং সহস্র সহস্র ভিক্ষু বুদ্ধের জীবন্ত বাণীরূপে আপামর সাধারণের মধ্যে পঞ্চশীল ও অষ্ট-আর্য্যসত্যের বাণী বিতরণ করিয়া বেড়াইত সে দেশে আজ বিহার অথবা ভিক্ষু দেখিতে পাওয়া যাইবে না ইহা কি কম দুঃখের কথা! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, নবীন ভারতে এই দিকের অভাব দূরীভূত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে এবং এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমরা সিংহলের কৃতী সন্তান মহাত্মা অনগারিক ধর্ম্মপালের নিকট ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর প্রাগ্ভাগে এশিয়ায় যে কয়জন কর্ম্মী-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনগারিক ধর্ম্মপাল তাঁহাদেরই একজন। সুবিখ্যাত শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সহ উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যখন অনগারিক ধর্ম্মপালের প্রসঙ্গ উঠিত তখনই তিনি তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত স্মরণ করিতেন। এই অনগারিক ধর্ম্মপালের জন্ম সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত ধনী-পরিবারে। কিন্তু বিধির নির্দ্দেশক্রমে ঐহিক উন্নতির পথে না গিয়া তিনি যৌবন হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পৃষ্ট লোকসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারই পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফলে আজ সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। ভারতের মহাবোধিসমিতি তাঁহারই অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। ইংরাজী ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহা গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নানাদিকে চমৎকার কাজ করিতেছে। এই সকল কাজের মধ্যে বাংলাদেশের ধর্ম্ম-রাজিক চৈত্যবিহার স্থাপন, সারনাথ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ ও লণ্ডনে মহাবোধির শাখাসমিতি স্থাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মহাবোধিসমিতি হইতে 'মহাবোধি জার্ণাল' নামক একখানি ইংরাজি মাসিক নিয়মিতভাবে বাহির হয়। ইহাতে বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হয়।

ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত এই মহাবোধিসমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় ৪এ কলেজ-স্কোয়ারে যে বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে তাহা ভারত-ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এখানে কোন ভগ্ন বৌদ্ধ স্তূপ হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহাস্থি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তাহারই ফলে এখানে পবিত্র বুদ্ধস্মৃতিচিহ্ন-দর্শনমানসে চীন, জাপান, শ্যাম ইত্যাদি দূর দূরান্তর হইতে বুদ্ধের গৃহী-ভক্ত ও ভিক্ষু এবং স্থবিরগণ সমাগত হয়েন। বাংলা দেশে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিপুল প্রচার ছিল, তাই বঙ্গদেশবাসী এই দৃশ্যে বিশেষ গৌরব অনুভব করেন। এতদ্ব্যতীত অনগারিক ধর্ম্মপালের প্রেরণায় প্রতি বৎসর কিয়ৎ-সংখ্যক সিংহলী গৃহী-বৌদ্ধ ও ভিক্ষু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নার্থে বাংলা দেশে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভিক্ষু শরণংকর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা ভারতের সহিত বাহিরের সম্পর্ক বিশেষভাবে বলবান হইবে। কিন্তু এই যোগসাধনের কৃতিত্ব ও বৌদ্ধধর্ম্মের এবং বিশেষভাবে সিংহলের নব-জাগরণের কর্ত্তা অনগারিক ধর্ম্মপালের। এ বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা যে নানা দিক দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাঁহার সমগ্র চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধের বাণী প্রচার দ্বারা লোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-সাধন। নানা বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে অবিরত নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে প্রকাশিত বুদ্ধের উপদেশ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ইহাদের অন্যতম। এই পুস্তিকাখানি হইতে অতি সহজেই বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়সকল বিশেষ পরিষ্কারভাবে অবগত হওয়া যায়। মহাবোধিসমিতি

সম্প্রতি এই পুস্তিকাখানির বঙ্গানুবাদ বাহির করিয়াছেন (১)। অনুবাদটির স্থানে স্থানে কিছু ত্রুটি থাকিলেও উহা পাঠে বাঙালী মাত্রেই অতি সহজে সদ্ধর্ম্মের বিমল আভা অন্তরে অনুভব করিবেন। বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বৃহৎ পুস্তক দুই-একখানি থাকিলেও এরূপ একখানি পুস্তিকার প্রয়োজন ছিল। মহাবোধি এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন দেশ-ভাষায় এই পুস্তিকাখানির অনুবাদ হইলে নবীন ভারতে বুদ্ধের বাণী ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে ভারতবাসী ভবিষ্যৎ জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় এক মহতী প্রেরণা অনুভব করিবে।

(১) বুদ্ধদেবের উপদেশ—মহাত্মা অনগারিক ধর্ম্মপাল প্রণীত—ফুলস্কাপ অষ্টাংশিত ৭০ পৃঃ। মূল্য ।৵০। প্রাপ্তিস্থান—মহাবোধি বুক-এজেন্সী, ৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শ্বেত পরী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্বেত পরী যায়, ওগো, শ্বেত পরী যায়,
জ্যোতি তার লেগে আছে জোছনার গায়।
যূঁই ফুলে ওই তার হাসি উথলে,
অঞ্চল দুলে তার শেফালিতলে।
দুধে তার সুবিমল সোহাগ ঝরে,
স্বপন ফুটেছে ওই তুষার-'পরে।
বেল আর কুন্দের ফুলশয্যায়,
নীরবে বসিয়া একা ক্ষণিক জিরায়।
স্বেদজলকণা তার মুকুতা ফলায়,—
শ্বেত পরী যায়, ওই শ্বেত পরী যায়।
শ্বেত শতদলদুটি করে সে ধরে,
চামর ঢুলায় কাশ দেহের 'পরে।
নিশ্বাসে কর্পূরবাস উথলায়,—
শ্বেত পরী যায়, ওই শ্বেত পরী যায়।
মরালের রথে চড়ি' চলে ত্বরিতে,
কোনো কালে কেহ তারে নারে ধরিতে!

ক্ষরের অহমাকার বা অহঙ্কার

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

মায়ার কেতন উড়াইয়া ক্ষরের রাজত্ব। যতদিন ভিতরে মায়া অটুট আছে ততদিন ক্ষরের জোয়ারে ভাটা ধরিবার কিছুই নাই। মায়ার কৌটা যদি তপস্যার ঠাটে খুলিয়া দেওয়া যায় তবে ক্ষরের রাজত্বে চমক জাগিবে—তপস্যার দ্যুতি যত বাড়িবে মায়ার কৌটা তত উবিয়া যাইবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষরের প্রভাবখানি স্তিমিতাভ হইয়া নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম করিবে। ক্ষরের নির্ব্বাণ ঘটাইবার জন্যই না বুদ্ধদেবের কঠোর তপস্যার হোমানল-শিখা আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল। মেঘ কেমন করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে, সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে আমরা জানি, কিন্তু মায়া কেমন করিয়া আমাদের অন্তরাকাশের সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া আছে আমরা সে অনুসন্ধান জানি না; মেঘ কি উপায়ে এ-আকার প্রাপ্ত হয় তাহা আমরা জানি—মায়া কেমন করিয়া তাহার অদেখা-অচিন কান্তিময়ী হয় তাহা "মায়ী অক্ষরে" কথঞ্চিৎ দেখিয়াছি। কিন্তু মেঘ কবে হইতে প্রথম উৎপন্ন হইল,—এ খোঁজে যেমন একটা সন-তারিখের Chronology বা Archaelogyর দপ্তর কাহারো ভাণ্ডারে জমায়েৎ নাই, তেমনি মায়া কবে প্রথম রূপ ধরিয়া দাঁড়াইল ইহারও তিথি লগ্ন দর্শনশাস্ত্রের এলাকায় মিলে না। সুতরাং আকাশ থাকিলে মেঘও ইহাতে সসজ্জ থাকিবে—এ কথা যেমন আমাদের নিকট অতি স্পষ্ট, নামরূপ ধরিয়া আমরাও যতদিন বিরাজমান থাকিব ততদিন অন্তরাকাশে মায়ার মেঘ-পট জমাটবাঁধা থাকিবে, ইহাও তেমনি সুনিশ্চয়। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ইহার যে অবস্থা আমাদের গোচর হয়, আমাদের অন্তরাকাশের সূর্য্যও মায়াচ্ছন্ন হইয়া তেমনি আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাই উপনিষদে মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে:—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়েতি

এই মায়াই তমোময়ী—সেই জন্যে তমসা হইতে জ্যোতিতে পৌছিতে ঋষির ঐকান্তিক চেষ্টা—মায়াই জন্মজন্মান্তরের তূণীর। মেঘ যেমন জলগর্ভ, মায়ারূপ মেঘও তেমনি জলগর্ভ;—মেঘ থাকিলেই উহার ক্রিয়া বর্ষণে, তাই মেঘ বারিদ;—আর মায়া থাকিলেই উহার ক্রিয়া নামরূপ-সৃজনে, সেই হেতু ইহা জন্মদা। যেখনে জন্মের পুঁজি সেখানে মৃত্যুর খাতা খরচের জন্য সাদা উন্মুক্ত—তাই মায়া মৃত্যুর খনি বিশেষ। "মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়" ঋষি-কণ্ঠের এই ধ্বনি মৃত্যুময়ী মায়াকে এড়াইবার জন্য।

মায়ার নামধামের পরিচয়-পত্র আমরা 'মায়ী অক্ষরে' পাইয়াছি—সেখানে উষালোকের ন্যায় মায়ার প্রথম রেখাপাত জাগিয়াছে। বর্ত্তমানে আরও একটু অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতে চাই। বিষয়টিকে স্থির-ধীরভাবে অনুভূতি-আলোকে যত উজ্জ্বল করিতে পারা যায় ততই এ প্রসঙ্গের আলোচনায় লাভ,—চন্দ্রের সব চাইতে বড় লাভ যে তাহার মধ্যে সূর্য্যের সকল আলোক প্রবেশ করিয়া তাহাকে রূপের দীপান্বিতায় ভাসাইয়া দিয়াছে; তেমনি সূর্য্যের শীর্ষ-অর্ঘ্য আমাদের নিকট প্রাপ্য এই জন্যে যে সূর্য্য পুরুষোত্তমের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছেন—

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি
যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।

আমাদেরও এ প্রসঙ্গালোচনায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সূর্য্যাধারে সেই পরমপুরুষের যে নিরঞ্জনদ্যুতি জল্ জল্

করিতেছে তাহা যেন আমাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করিতে পারি। নতুবা শুষ্ক জ্ঞানের শুষ্ক পঙ্কলে আমরা শুধু তৃষ্ণায় ছটফটই করিব, এক বিন্দু জলও পাইব না।

গীতার অক্ষরই সাংখ্যে "পুরুষ", শ্রুতির 'অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ'—সাংখ্যে 'অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ'। যে পুরুষ নিঃসঙ্গ তাঁহার সম্বন্ধে সকল বাক্য ত ঐখানেই নিরস্ত হইল। তাঁহাকে লইয়া প্রশ্নের উদয় ঘটিত না যদি তিনি অদর্শন থাকিয়া এই বহুরূপিণী সৃষ্টিকে প্রবর্তিত না করিতেন। বৃহদারণ্যক সেই পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

আত্মৈবেদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।

বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ আপনা হইতে অন্য কিছু দেখিতে পান নাই। কিন্তু সৃষ্টি-পারাবার প্রবহমান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈত জাগিয়া উঠিল এবং তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা কঠিন প্রশ্নের অভ্যুদয় ঘটিতে লাগিল। 'ক্ষর ও অক্ষরে' আমরা প্রথম জীবসৃষ্টির ধারা লক্ষ্য করিয়াছি, 'অভিনায়ক অক্ষরে' দেহস্থ ইন্দ্রিয়-উৎপত্তি এবং 'ক্ষরের পঞ্চপানপাত্রে' পঞ্চতন্মাত্রের সঞ্চার দ্বারা কিরূপে দেবাসুর-সংগ্রামবৎ দিব্য-ইন্দ্রিয়গুলির কামলোলুপতা জাগিল, দেখিয়াছি। 'মায়ী অক্ষরে' সেই পতনের সঙ্গে-সঙ্গে মায়ার আবরণ কিরূপে অন্তর্লোককে ছাইয়া গেল, দেখা গিয়াছে। মায়ার মেঘময় পটে ঢাকা হইয়াই জীবের ব্রহ্মাত্মতায় আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ-বিকার-ঘেরা হইয়া স্বতন্ত্র দ্বৈততত্ত্বে আপনার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। এইখান হইতেই আমাদের বর্ত্তমান কাহিনী সুরু হইল।

মেঘাচ্ছাদনের ভিতর দিয়া অনাচ্ছাদিত সূর্য্য যেরূপ আপনার কিরণজাল বিস্তার করে, মায়ার আচ্ছাদনের ভিতর দিয়াও অক্ষর আত্মনের রশ্মিরূপী শ্রোত্রবাঙ্‌মনাদি-ইন্দ্রিয় দেহমণ্ডল আলোকিত করে। মেঘ যত জমাট বাঁধুক সূর্য্যকে সত্য সত্য ঢাকিতে পারে না; 'তাঁহার' কিরণকে মলিন করিতে পারে ঠিক তেমনি মায়া—অক্ষরকে ঢাকিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার দিব্যইন্দ্রিয়-রশ্মিকে শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে। মায়ার ভিতর দিয়া যখন অক্ষরালোক আসিতে থাকে, মায়া তখন ইহাকে আপনার কামকজ্জলে রাঙাইয়া কামের কানমন্ত্র ইহার কানে কানে কহিয়া দেয়, আর অমনি জীব আত্মবিস্মরণ হইয়া কামের সহিত অভিন্নাত্মক হইয়া যায়। "বুদ্ধিপরিকল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যঃ বিকারসংস্থানোপপত্তেঃ", ভ্রমের বুদ্ধিকল্পিত পঞ্চভূতাত্মক দেহে অন্তর্ভাবরূপে যে রূপরসাদি রহিয়াছে তাহাতে জীবের অসংযত সম্বন্ধস্থাপন হইতেই মায়ার উৎপত্তি হইয়াছে—'মায়ী অক্ষরে' আমরা মায়ার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভ্যুদয় লক্ষ্য করিয়াছি। মায়া যে প্রাণবস্তু জিনিস নয় তাহা সহজেই অনুমেয়, গুরুভার মাটির আঁশ ও অপামস্রণ ছাড়াইবার জন্য ইহাকে ছাঁকিতে-ছাকিতে যেমন নবনীতকোমল চন্দনসম অতি লঘু পঙ্কে পরিণত করা যায়, তেমনি গুরুভার এই দেহের উপভোগ দ্বারা ছানিতে-ছানিতে যে লঘুতম পঙ্কের সঞ্চয় ঘটে—উহাই মায়া। সুতরাং মায়াকেও দেহই বলা যায়, সে কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আত্মার অভাবে দেহ যেরূপ নির্জীব, মায়াও তদ্রূপ অপ্রাণ। মায়া যে জীবকে আপনার প্রভাবে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে ইহাতে প্রাণশক্তির বিকাশ দেখিতে হইবে না। সাংখ্যকার অতি সুন্দর উপমা দ্বারা মায়ার অপ্রাণতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।

চুম্বক যেরূপ নিজে উদাসীন থাকিয়া লৌহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ অক্ষর ভিতরে থাকিয়া কামাত্মক প্রকৃতিকে শক্তিদানে উহাকে প্রাণশীল করিয়া রাখিয়াছেন। বিষবীজ যেমন মাটির উত্তাপে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়, তদ্রূপ আত্মার তেজে অহঙ্কাররূপী কামাত্মক জড়মন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে পরিণত হইয়া কামোপভোগাধার এই দেহে দ্বৈত-সংসার সৃজন করে। পুরুষ নিজে অ-বস্তু হইয়া জড়ময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন—

প্রকৃতি বাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। ২,৫।

প্রকৃতি বস্তু—matter, অ-জড় অক্ষর উহাতে আপন রশ্মি ফেলিয়াছেন। মেঘের মধ্যে সূর্য্যের যে অধ্যাস,

প্রকৃতির মধ্যেও অক্ষরের তদ্বৎ অধ্যাস। প্রকৃতি গুণাত্মক—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। ১, ৬১।

ত্রিগুণের আধার মন, মন না থাকিলে গুণ-ক্রিয়া হইবে কাহার উপর? ইন্দ্রিয়াধিপ মনই হইতেছে জীবের মধ্যবিন্দু। মনের শক্তি কি?—বুদ্ধি। এই মন যখন অক্ষর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কামের লোল কটাক্ষে ভুলিল তখনই মায়ার সৃজন; এবং মায়ার ছাঁচ লাগিয়া সেই নির্গুণ মন গুণাক্রান্ত হইয়া অক্ষর হইতে স্ব-তন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল—তখনই নবসৃষ্টি আরম্ভ হইল। ছিল এক, হইল দুই। জীব ছিল নির্গুণ, হইল ত্রিগুণ। অতঃপর আসিল—

প্রকৃতের্ম্মহান্।

জীব যখন ত্রিগুণ সাজিয়া বসিল তখন তাহার শুদ্ধমুক্ত স্বরূপ মুছিয়া গিয়া হইল মহত্তত্ত্ব—বা জড়াত্মক চৈতন্য। অতঃপর—

মহতোঽহঙ্কারঃ।

যাহার জড়-চৈতন্য সম্বল দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিকট সব চাইতে স্ফুট হইবে 'আমিত্ব'—অহম্ আকার; 'আমি' এই আকার যাহার জ্ঞানকে বেষ্টন করিয়া আছে সে প্রত্যুতঃ ভাবিবে 'অহম্ করোমি'। এ না হইয়া উপায় কি? যাহার চৈতন্য বিশ্বকে গ্রাস করিয়া বিশ্বম্ভরের সহিত অ-ভিন্ন হইয়া আছে সে কেন মনে করিবে 'অহম্ করোমি'—তাহার মনে হইবে 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তৎ করোমি', কেন না বৃহদারণ্যক কহিতেছেন:—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি···ইতর ইতরং মনুতে। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ···জিঘ্রেৎ···মন্বীত।

'সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ' হইলে অহংকার আসিবার পন্থা কি, কারণ তখন 'অহম্' এই ক্ষুদ্র আকারই থাকিবে না, আর 'অহম্ করোমি' এ অভিমান হইবে কোথা হইতে? কিন্তু ত্রিগুণাত্মক জীব 'অহম্'-এর খোসায় আবদ্ধ, তাহার পক্ষে সেই বিশ্বম্ভর পুরুষের কর্তৃত্ব ত সম্ভব নয়, তাই তাহার পক্ষে

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ। ৬, ৫৪ (সাংখ্য)।

সুতরাং মায়াচ্ছন্ন জীবের কর্তৃত্বাভিমান আসিয়া উপজাত হইল—অহঙ্কার। যে মুহূর্ত্ত হইতে জীবের মন ত্রিগুণময় হইয়াছে অর্থাৎ ত্রিগুণের সহিত 'অপৃথগভূতে চ' একেবারে অভিন্নাত্মক হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ইহা যে আত্মার বর্ত্ম ছাড়িয়া দেহের কাম-সোপানে ধাঁ ধাঁ করিয়া ছুটিতেছে, ইহা জীব বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। Mesmerism দ্বারা যেমন অজ্ঞাতসারে যাদু-অভিভূত লোকটি যাদুকরের সর্ব্ব-ইচ্ছার বশ হয় ঠিক তেমনি গুণত্রয়ের mesmerism-এ জীব অজানিত ভাবে মায়াবিনী প্রকৃতির ইচ্ছার বশীভূত হইয়াছে। গুণত্রয়ের সহিত যখন তাহার অপৃথক সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল তখন গুণত্রয়ের সহিত যাহা যাহা অপৃথক রূপে যুক্ত সেই-গুলিও তাহার নিতান্ত আপনার ঠেকিল। ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ—এক-কথায় কাম, জীবের 'অহম্ আকারে'র সহিত অপৃথক রূপে যখন দাঁড়াইল তখন জীব দেখিতে পাইল এইগুলি ছাড়া তাহার গতি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং

অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রানি উভয়মিন্দ্রিয়ং।

'অহম্ আকারের' জ্ঞানটি কেবল যে পঞ্চতন্মাত্র লইয়া ব্যস্ত হইল তাহা নহে, ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) ও কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ)—এতদুভয়কে বেড়িয়া রহিল। প্রত্যুতঃ রূপরস-আদিকে আপনার বলিয়া অভিনন্দন করিলে, চক্ষুকর্ণাদিকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না—কেন না ইন্দ্রিয়গুলিকে বাদ দিলে পঞ্চতন্মাত্রের তিষ্ঠান অসম্ভব। তন্মাত্রগুলি হইল এক একটি পাত্র, আর ইন্দ্রিয়গুলি উপভোক্তা। কেবল পাত্রে মদিরা ফেনায়িত হইলে হইবে কি, পান করিবার জন্য মুখ চাই;—সেইরূপ, শুধু রূপরসের পানপাত্রে কেন সব ফুরাইবে, উহাতে মুখের চুমুক লাগাইতে হইবে। ত্রিগুণাত্মক মন সকল ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খুলিয়া দেহের কাম-সুধা পান করে,—কখনো মুখে কখনো চোখে কখনো বা কানে, এইরূপ। সর্ব্বত্রই উপভোক্তা মন,—কারণ মনই জীবের মধ্যবিন্দু; মন যেখানে অচেতন সেখানে অপরাপর ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়।

'অভিনায়ক অক্ষরে' এই সব দিব্য-ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি দেখিয়াছি—আর 'ক্ষরের পানপাত্রে' ইহাদের পতন দেখিয়াছি। এখানে সেই পতনের ফলাফল-বিচার চলিতেছে। এ-কথাটা নিশ্চয় দাঁড়াইতেছে যে মায়াবিনী প্রকৃতির যাদুতে জীব অক্ষরের আলোকমার্গে ছাড়িয়া, ক্ষর-দেহের কামময় ভোগ-পথের স্বাদ পাইয়া আসল পথ হারাইয়া বসিয়াছে।

'তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি'—

পঞ্চভূতের অন্তর্গত যে পঞ্চতন্মাত্র তাহা আমরা 'ক্ষরের পঞ্চ পানপাত্রে' দেখিয়াছি। সুতরাং জীবের যে মন ত্রিগুণাক্রান্ত হইল, সে মন ত্রিগুণের সহিত অপৃথগীভূত হইয়া তন্মাত্র পর্য্যন্ত আসিল এবং তন্মাত্র যে পঞ্চভূতাত্মক দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন সেই দেহকে 'অহম্ আকারের' সর্ব্বব্যাপক সংজ্ঞা বলিয়া জানিল। কারণ দেহের মধ্যেই সকল স্তর বিধৃত রহিয়াছে। দেহই কামসুধাসমুদ্র—দেহকে মন্থন করিয়া কামী অমৃত লাভ করিয়া থাকে যদিচ তাহা মৃত্যুরই নামান্তর। অতএব দেহকেই 'অহম্ আকার' জানিয়া, ত্রিগুণাত্মক মন সর্ব্বানর্থকারক একটা 'আমির' উদ্ভব ঘটাইয়া বসিল—দেহসুধা-পানে তাহার মন আকুল হইল।• কিন্তু বৃহদারণ্যক কহিয়াছেন,—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ,
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ।

যাঁহার আত্মদর্শন হয় তিনি কেন শরীরকে 'আমি' জ্ঞান করিয়া ইহার অনুগামী হইবেন? যিনি অক্ষর পুরুষকে আপনার স্বরূপ বলিয়া জানিবেন তিনি ত কখনো দেহের কাম-সোপানে পদার্পণ করিবেন না! এ পর্য্যন্ত আমরা সাংখ্যের যে ক্রমটি পাইলাম তাহা এক হইতে অন্যের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ঠিক নয়, তবে একের অন্তর্ভুক্ত অপর, এই স্তর-পরম্পরা দেখান হইয়াছে। এই সূত্রটির পরের সূত্রদ্বারা মায়াবিনী প্রকৃতির hypnootism স্পষ্ট প্রতীত হয়। উভয় ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র কাহার অন্তর্গত?—

অহঙ্কারস্য।

অহঙ্কার কাহার অন্তর্গত?—তেন অন্তঃকরণস্য। ১, ৬৪। ইহা প্রত্যুতঃ জড়-চৈতন্যাত্মক মহত্তত্ত্বের। আর জড়-চৈতন্যের ঠাঁই কোথায়?—ততঃ প্রকৃতেঃ। প্রকৃতি হইতেই যে দেহাত্মিকা মতির প্রথম সূত্রপাত ইহা এখানে পরিষ্কার ধরা যায়। এইভাবে আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম প্রকৃতির ত্রিগুণ-শরাহত হইয়া জীবের নির্গুণ নির্ব্বিকার মনে প্রথম বিকার সমুদ্ভূত হয়—এই বিকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটি মিথ্যা 'অহম্ আকার' জাগিয়া উঠে এবং সত্যকার 'অক্ষর আকার' তিরোহিত হয়। 'অভিনায়ক অক্ষরে' আমরা বাঙ্‌মন-শ্রোত্রাদির উৎপত্তিস্থান অক্ষর-আত্মনে দেখিয়াছি—এখানে ইহাদের জনয়িত্রী হইতেছে প্রকৃতি। যাদুমুগ্ধের যাবতীয় ক্রিয়া যেরূপ যাদুকরের ইচ্ছানিঃসৃত, তদ্রূপ hypnotised জীবের পৃথক সত্তারও উৎপত্তিস্থল পুরুষ নহে—পরন্তু প্রকৃতি।

এ-বিশ্ব সৃষ্টির বনিয়াদ—মনে; জীবন্মুক্ত ও ভোগোন্মত্তের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাহার লক্ষণ কখনো অঙ্গে লেখা নাই—লেখা আছে মনের জগতে। একজনের মন তপোবন,—সেখানে তপস্যার হোমানল জ্বলিতেছে; আর একজনের মন উপবন,—সেখানে ভোগের কামানল মনো-মন্দির কালো করিয়া ফেলিতেছে। নির্গুণ মনের মুক্ত-মুকুরে বিশ্বন্তরের রূপ সদা ঝলসাইতেছে, আর ত্রিগুণ মনের বদ্ধ আঙিনায় কেবলি সহজ সুখ-দুঃখের, প্রেম-বিরহের, বিচ্ছেদ-মিলনের বিপণি সদ-সজ্জিত আছে। এইটি ক্ষরের সংসার, আর ঐটি অক্ষরের অমরধাম। যে নির্গুণ মনে হোমানল জ্বলিত, প্রকৃতির ত্রিগুণরূপী শরে উহা বিদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত-জীবের অক্ষরত্ব ঘুচিয়া ইহা হইয়া পড়িল বদ্ধজীব অর্থাৎ ক্ষর। বদ্ধজীব জন্মিতেছে-মরিতেছে কবে হইতে, ইহার সন্ধান জানা নাই। তবে ত্রিগুণ-পাশে বদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সে মৃত্যুর নিকট দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে ইহা নিশ্চয়। গীতা বলিতেছেন,—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥

পুরুষের প্রকৃতিতে অধ্যাস আমরা ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি—জীবের নির্গুণ মন ত্রিগুণাচ্ছন্ন হওয়ার সঙ্গে-

সঙ্গেই বদ্ধ হইয়া গিয়াছে—যাবৎ গুণাচ্ছন্ন থাকিবে তাবৎ জন্মের পর জন্ম তাহার অনিবার্য্য। এ জন্ম-পারাবারের নিরোধ ততদিন হইবে না যতদিন প্রকৃতির hypnotism তাহাকে ঘেরিয়া রহিবে। অতএব প্রকৃতির hypnotism ভাঙা অর্থে ত্রিগুণপাশ হইতে মনকে নির্গুণ করা। গীতার অধ্যায়ে শ্রীভগবান কহিতেছেন,—

গুণানেতান্ অতীত্য ত্রীণ্ দেহী দেহসমুদ্ভবান
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।২০।

যখন জীব ত্রিগুণাতীত হইবে তখনি পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে—যাদু ভাঙিবে এবং অক্ষরের সহিত পুনর্মিলন ঘটিবে। যদি ফলের সম্ভাবনা রহিত করিতে হয় তবে বৃক্ষের ডাল কাটিয়া কি হইবে, ইহার বীজের ধ্বংস প্রয়োজন। তেমনি জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির অত্যন্ত নিবৃত্তি চাহিলে ইহারা যে বীজের ফলস্বরূপ সেই বীজকে বিনষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং গুণ যাহার শাখাপ্রশাখা, তাহার (গুণের) উচ্ছেদ পর্য্যন্ত তপস্যার সীমা নহে, ইহা বীজরূপা প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রসারিত।

প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চভূতের শেষ স্তর পর্য্যন্ত যে 'অহম্' রূপের ছাপ দেখিয়াছি, উহাই প্রত্যুতঃ ক্ষরের অহমাকার। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'ক্ষেত্র' শব্দ দ্বারা যে ব্যাপকতা ফুটান হইয়াছে উহা যে উপরি-উক্ত ক্ষরেরই 'আমিত্ব', তাহা একটু অনুধাবনার সঙ্গেই ধরিতে পারা যায়।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬।

প্রকৃতির hypnotism এমনি যে জীব 'ক্ষেত্রের' সহিত অভিন্নাত্মক হইয়া যায়। ইহাকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিলে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হইতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ কহিতেছেন,—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদবিদঃ ॥১

যতক্ষণ মন ত্রিগুণাতীত হইতে না পারিয়াছে ততক্ষণ স্বয়ং ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া ক্ষেত্রকে জানার সুযোগ কই? কারণ যাবৎ মন গুণময় হইয়া আছে তাবৎ ক্ষেত্র তাহার 'আমিত্ব'কে ক্ষেত্রেরই সহিত মিশাইয়া রাখিবে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫।

এই বন্ধনদশা না ঘুচিলে বদ্ধ-জীবরূপে বাস না করিয়া গত্যন্তর কি? অহমাকারের বুদ্বুদ একবার হইবে আবরি কাটিবে। প্রকৃতির সম্মোহনঅস্ত্র বা ত্রিগুণশর নির্গুণ মনের উপর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহত্তত্ত্ব বা জড়-চৈতন্যের স্ফুরণ হয়। মহত্তত্ত্বের মধ্যেই যে অহঙ্কারের প্রথম অঙ্কুর উপ্ত হয় তাহা একাদিক্রমে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি সাংখ্য দর্শনের সূত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়—

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ১, ৭১।

'মহত্তত্ত্ব' কথাটি পারিভাষিকতার দরুন সহসা সুবোধ্য না হইলেও ইহা যে মনেরই ক্রিয়া তাহা এখানে বুঝা যায়। ইহার পরের সূত্রটি—'চরমোঽহঙ্কারঃ।' এ সূত্রদ্বারা মনের ও মহত্তত্ত্বের একার্থতাই লক্ষিত হইতেছে। আসল কথা প্রকৃতির ত্রিগুণ-শর বিদ্ধ হইয়া নির্গুণ মনটির অবস্থান্তরে দাঁড়াইল মহত্তত্ত্ব,—নির্গুণ মন হইল colourless mind, আর এ হইল coloured mind। ইহাকেই শঙ্করের বাক্যে বলা যায়—'কামাদি বৃত্তিমৎ মনঃ'; আমাদের সাদা কথায় বলিতে পারি জড়-মন। এ জড়-মন আঁকড়াইয়া জড়-দেহ যে 'আমি' সংজ্ঞা লাভ করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাই সাংখ্যকার অহঙ্কারের অভ্যুদয় দেখাইয়া সমগ্র 'ক্ষেত্র'টির দিকে অঙ্গুলি-হেলন করিয়া স্বল্প কথায় বলিলেন,—

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্।

অহমাকারের boundary-line সমগ্র দেহটিকে চিহ্নিত করিয়া বলিল—'এই এতখানি আমি'। জড়ের উপর অহঙ্কার আপনার ছাপ মারিয়া দিল।

বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যে (4. 4. 19.) পুরুষ ও জীবের ব্যবধানবিরচয়িত্রী সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—ইয়মাবৃত্তির্মে যমালেব জীবদৃষ্টিগতৈব [illegible] ন তু ব্রহ্মগতা।

আমরা পূর্ব্বে এ-কথার উল্লেখ করিয়াছি—মেঘ সূর্য্য-কিরণকে আচ্ছাদন করিতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না; ঠিক তেমনি মায়ার আবরণ জীবের অক্ষরাভিমুখী দৃষ্টিকে ঢাকিয়া রাখে কারণ ইহা মধ্যপথ রোধ করিয়া আছে, কিন্তু ইহা কখনও অক্ষরকে ঢাকিতে পারে না। এ-আবরণের এ-দিক ক্ষর ও দিক অক্ষর। সূর্য্য-কিরণের মেঘাচ্ছাদন যেমন সর্ব্বত্র একপ্রকার নহে পরন্তু বহুবিধ, তদ্বৎ মায়ার আচ্ছাদনজনিত জীবের যে ত্রৈগুণ্য তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে—কোথাও সত্ত্বাধিক্য, কোথাও রজোগুণের প্রাবল্য, কোথাও বা তমোমালিন্য,—এ যেন মেঘাচ্ছাদিত হইয়া কোথাও সূর্য্যকিরণ ঈষৎ স্তিমিতাভ, কোথাও বা অর্দ্ধস্ফুট, আর কোথাও বা গাঢ়তমিস্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে সূর্য্য যেমন অবিকৃত এক, তাঁহার বিকারগত কিরণরাশি বহু, তদ্রূপ অক্ষর এক পরন্তু তাঁহার বিকারগত দ্যুতিরাশি বহু—উহারাই ক্ষর। কাযেই দাঁড়াইতেছে এই অক্ষরের একত্ব এবং ক্ষরের বহুত্ব। সাংখ্য দর্শনের সূত্র এইরূপ :—

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্। ১, ১৪৯।

জন্মাদি ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষের বহুত্ব নিশ্চয়রূপে প্রতীত হয়। এ পুরুষ অবশ্য প্রকৃতিস্থ পুরুষ—অর্থাৎ জীব। গীতার মন্ত্র পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'। এ পুরুষ যে অক্ষর নহে ইহা সহজেই জানা যায়, কারণ অক্ষর কখনো গুণসহবাস করেও না এবং 'ভুঙ্‌ক্তে'র ফলস্বরূপ সদসৎ জন্মও লয় না। এ অজ। ক্ষর যদিচ আপন আপন অহমাকার লইয়া সংসার-আঙিনা ভরিয়া বসিয়াছে, তথাপি ক্ষর আসলে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" ;—মেঘ সংশ্লিষ্ট সূর্য্যকিরণ যত মলিনই হউক না উহা 'ভবগবতঃ শ্রীসূর্য্যস্য' বলিয়া 'সূর্য্য' নামে দাবী রাখিতে পারে, তেমনি ক্ষর গুণসম্মোহিত হইয়া যত বিকৃতই হউক না কেন, 'পুরুষ' নামের দাবী ইহার থাকিবেই থাকিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ধন ও অর্থ সম্বন্ধে দু'টি কথা

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত এম-এ

বড়লোক বলিলেই আমরা সাধারণতঃ টাকাপয়সাওয়ালা লোককে বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ, টাকাপয়সা যে ধন-ঐশ্বর্য্যের একটা অনিবার্য্য লক্ষণ, এ সম্বন্ধে কোন্ প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু প্রশ্ন তুলিলে ব্যাপারটা অত সহজ মনে হইবে না।

প্রথমতঃ, 'টাকাপয়সা' বলিতে সিকি, দু'য়ানী প্রভৃতি বাদ দিয়া আমরা যে শুধু 'টাকা' ও 'পয়সা'ই বুঝি, এমন নহে; টাকাপয়সা-জাতীয় সমস্ত জিনিষকেই আমরা সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিতে চাই। কিন্তু 'সমস্ত' বলিলে কি কি বুঝায়, এবং কি কি বুঝায় না, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিয়া নেওয়া উচিত।

টাকা, পয়সা অথবা যে-কোন মুদ্রা দ্বারা সাংসারিক ব্যাপারে যে-সব কাজ হয়, নোট, ব্যাঙ্কের চেক ইত্যাদিতেও ঠিক সেই সব কাজই হইয়া থাকে। অর্থজগতে ইহাদের সকলেরই মূল্য সমান; সুতরাং ইহারা এক জাতীয়, ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারাই অর্থজগতে ক্রয়বিক্রয় এবং দেনাপাওনার কাজ সমানভাবে চলে। ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া যাক্—'অর্থ' (money); অর্থ বলিলে এই সকলগুলিকেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু শুধু ক্রয়বিক্রয় এবং দেনা-পাওনার কাজ করে বলিয়াই যে ইহাদিগকে অর্থ বলা হইল, এমন নহে। ধাতু আকারে সোনা, রূপা (অর্থাৎ, সোনারূপার মুদ্রা নয়), হুণ্ডি, এবং গ্রামে ধান দ্বারাও অনেক সময় এই সব কাজ চলে; তবু ইহাদিগকে অর্থের কোঠা হইতে বাদ দেওয়া হইল। কারণ, আমাদের অভিহিত অর্থের আরো একটি গুণ আছে, যাহা ইহাদের নাই। সেই গুণটি হইতেছে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অবাধ-প্রচলন এবং নির্ব্বিবাদে গ্রহণ। সকল রকমের মুদ্রা এবং নোট পাওনা চুকাইবার জন্য দিলে লোকে যে কেবল নিরাপত্তিতে গ্রহণ করে, এমন নয়; গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে আইন অনুসারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্যও করা যায়। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যাঙ্কের নোট ও চেক সম্বন্ধে এই আইনের জোর না খাটিলেও এইগুলি গ্রহণ করিতে লোকে সাধারণতঃ ইতস্ততঃ করে না। অর্থাৎ, মুদ্রা, নোট ও চেক অবাধে লোকসমাজে চলাচল করে। এইজন্যই শুধু ইহাদিগকে অর্থ বলা হইল এবং ক্রয়বিক্রয়ের অন্যান্য উপায়-বস্তুকে বাদ দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ঐশ্বর্য্য বা ধন (wealth) বলিলে কি বুঝায় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। যাহাদিগকে আমরা বড়লোক, ঐশ্বর্য্যশালী বা ধনী ব্যক্তি বলিয়া থাকি, তাহাদের প্রচুর অর্থ, অর্থাৎ, নগদ টাকা, পয়সা, নোট ইত্যাদি আছে বলিয়াই কি ঐরূপ বলি? আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ মনে হইলেও ইহা সত্য নয়। কারণ, যাহাদের নগদ টাকাকড়ি বেশী নাই, অথচ, প্রচুর জমিজমা, ধানের গোলা, গরু-মহিষ ইত্যাদি আছে, তাহাদিগকেও ত আমরা ধনী বলিয়া থাকি। অতএব দেখা যাইতেছে, 'অর্থ'ই ধন বা ঐশ্বর্য্য নয়; অর্থের অধিকারী ছাড়াও ধনী হইতে পারেন। আসলে, অর্থের অধিকারীকে আমরা ধনী বলি এই জন্য যে, তিনিও ইচ্ছা করিলেই তাঁর অর্থ দ্বারা জমিজমা, ধানের গোলা, কাপড়চোপড়, বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর ইত্যাদি যে-কোন জিনিস এবং ঠাকুর চাকর দরোয়ান প্রভৃতির কাজ করায়ত্ত করিতে পারেন। এই যে সমস্ত জিনিস এবং কাজ পাইতে গেলে পয়সা খরচ করিতে হয়, মোটামুটিভাবে ইহাদিগকেই 'ধন' বলা যাইতে পারে। বৃষ্টি, জল, বাতাস প্রভৃতিকে সাধারণতঃ ধনবিজ্ঞানের ধনের সংজ্ঞা হইতে বাদ দেওয়া হয়, কারণ, এই সবের জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় না। অবশ্য যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি

প্রভৃতি হইতে জল-সরবরাহের জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় এবং বাতাসের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের ব্যয় আছে, সেখানে 'জল'ও 'বাতাস'কে ধন বলিতেই হইবে। সে যাহা হোক—অর্থ দ্বারা এই ধনলাভের ক্ষমতা পাওয়া যায় বলিয়াই যাঁর অর্থ আছে তাঁহাকে ধনী বলা হইয়া থাকে; আর যাঁর জমিজমা ইত্যাদি প্রচুর ধনই অধিকারে আছে, তিনি ত ধনী বটেই, সুতরাং অর্থ—ধন নয়, ধন-অধিকারের ক্ষমতা।

অবশ্য সাধারণভাবে, ধন-অধিকারের ক্ষমতা বা অর্থকে ধনের লক্ষণ অথবা মাপকাটি হিসাবে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। যার যত অর্থ আছে, সে ততই ধনী, অর্থাৎ, সাংসারিক সুখভোগের অধিকারী। রামের আয় যদি ৫০০৲ হইতে ১০০০৲ হইয়া যায়, তবে তার ধনও দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে, তার পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের ক্ষমতা দ্বিগুণ হইয়া যাইবে।

কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নাও হইতে পারে এবং তাহা হইতেই ধন ও অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রামের অর্থবৃদ্ধি দ্বিগুণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের সমস্ত লোকের অর্থও ঠিক একই পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তবে রামের ধনবৃদ্ধি কিছুই হইবে না। কারণ, অন্যান্য সকলের অর্থবৃদ্ধি হওয়া মানেই রামের ব্যয়ও দ্বিগুণ হওয়া। সকলেই আগের দ্বিগুণ এখন পাইতেছে, তাই রামের যা নিত্যনৈমিত্তিক খরচ, রামের কাছে লোকের যাহা নিত্যনৈমিত্তিক পাওনা, তাহাও ডবল হইয়া গেল। ফলে, অর্থ দ্বিগুণ বাড়া সত্ত্বেও রামের প্রকৃত লাভ কিছুই হইল না। অন্যান্য সকলের অর্থের পরিমাণ না বাড়িলে, অথবা রামের চেয়ে কম বাড়িলেই, শুধু রামের অর্থবৃদ্ধিতে লাভ।

জাতিগত হিসাবে ধন ও অর্থের সংজ্ঞা পৃথকভাবে রাখা আরো বিশেষ দরকার। নতুবা ধন ও অর্থকে একার্থ-বোধক করিয়া ফেলিলে অনেক ভ্রান্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। দেশের অর্থবৃদ্ধি করিলেই ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হইবে না; অথচ, এই সম্বন্ধে অনেকেরই খুব পরিষ্কার ধারণা নাই। আজ যদি টাঁকশাল হইতে কোটি কোটি টাকা তৈরী করিয়া দেশে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে দেশের ধন তাহাতে মোটেই বাড়িবে না। তাহা যদি হইত, তবে গবর্ণমেণ্ট-ছাপাখানা হইতে অজস্র নোট ছাপিয়া এবং টাঁকশাল হইতে ইচ্ছামত টাকা তৈরী করিয়া অতি সহজেই দেশকে ধনী করিয়া তোলা যাইত; দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কল, কারখানা, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য কোন কিছুর দিকেই নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অথচ, এই সমস্তই দেশের প্রকৃত ধন; খাওয়াপরা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য-ভোগের বিভিন্ন উপাদান ইহারাই যোগাইয়া থাকে। দেশে সোনারূপা, টাকাপয়সার পাহাড় তৈরী করিয়া ফেলিলেও তাহাতে লোকের অভাবঅনটন কমিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য একতিলও বাড়িবে না। সুতরাং শুধু অর্থবৃদ্ধি করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি তাহাতে কিছুই হইবে না; ধনবৃদ্ধির সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ অতি যৎসামান্য। দেশের আর্থিক উন্নতির পক্ষে ধনই আসল জিনিস, অর্থের মূল্য তার তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

অনেকেরই ধারণা, ভারতবর্ষ হইতে যদি বহু পরিমাণে জিনিস বিদেশে রপ্তানী করিয়া কোটি কোটি টাকা দেশে আনা যায় এবং বিদেশের জিনিস যদি এক পয়সারও আমরা না কিনি, তবে দু'দিনেই আমরা ঐশ্বর্য্যশালী জাতি হইয়া উঠিব। ইহা যে কত ভ্রান্ত-ধারণা, এখন অতি সহজেই তাহা বুঝা যাইবে। অর্থ অজস্র পরিমাণে দেশে আসিলেই ত দেশ ধনী হইবে না। কারণ, অর্থ উপভোগের জিনিস নয়, ইহা উপভোগের উপায় মাত্র। আজ হোক, কাল হোক, উহা দ্বারা নানা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া উপভোগ করিলেই অর্থের সার্থকতা হয়, সুতরাং আমরা যদি বিদেশ হইতে অর্থ না আনিয়া সে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন জিনিষ আমদানী করি, তবেই দেশের ধনবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য এই সব আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যায় আরো নানা জটিল প্রশ্নের কথা তোলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে ইহা সত্য যে, বিদেশ হইতে টাকা না আনিয়া জিনিস আনিলে আমাদের প্রকৃত লাভ হইবে।

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ধনবিজ্ঞানে অর্থ মোটেই লক্ষ্যের বিষয় নয়। অর্থের মাপকাটিতে ধন পরিমাপ করা যায়, অর্থাৎ, টাকাপয়সা দ্বারাই ধনের

হ্রাসবৃদ্ধি, আদান-প্রদান ইত্যাদির হিসাব রাখা হয় বলিয়াই অর্থ-তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। অর্থের আবরণ ভেদ করিয়া তার অন্তরালে ধনের গতিবিধি লক্ষ্য করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

তবে কি অর্থের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই? টাকা, পয়সা, সিকি, ডলার, পাউণ্ড, শিলিং, মার্ক, ইয়েন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা, এবং নোট, চেক ইত্যাদি সমস্তই যদি একেবারে অনাবশ্যক হইত, তবে তাহাদের উদ্ভবই বা হইল কেন? মানবসমাজের ইতিহাসে নোট, চেক ইত্যাদি দূরের কথা, কোন রকম মুদ্রাই যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। আমাদের দেশেও দৈনন্দিন বাজারহাট যে 'কড়ি' দিয়া চলিত, ইহা খুব পুরাতন ব্যাপার নয়। কেহ প্রমাণ চাহিলে, 'কড়ি দিয়ে কিনলুম, দড়ি দিয়ে বাঁধলুম' প্রভৃতি ছড়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, এখনও এই বিংশ শতাব্দীর ব্যাঙ্কব্যবস্থার যুগে কলিকাতার মত অত বড় উন্নত বাণিজ্যকেন্দ্রেও পুরাতন কাপড়ের বিনিময়ে বাসনপত্র, চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি কিনিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আজকালকার জগতে অর্থের বিনিময়ে জিনিস ক্রয় করাই সাধারণ নিয়ম; জিনিসের বিনিময়ে এরূপ জিনিস ক্রয়বিক্রয় তার তুলনায় অতি নগণ্য। মুদ্রা-আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই বিনিময়-ব্যবস্থা (system of barter) দ্বারাই আদান-প্রদান, ক্রয়বিক্রয় এবং দেনা-পাওনার সমস্ত কাজ চলিত। কিন্তু ঐ ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধা ছিল এবং উহা দূর করিবার নানা চেষ্টার ফলেই ক্রমে ক্রমে মুদ্রার আবিষ্কার ও প্রচলন হয়, এবং অর্থজগতের নানা জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নোট, চেক প্রভৃতি মুদ্রিত কাগজও এখন ধাতব মুদ্রার সহচর ও সহকর্ম্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমতঃ, বিনিময়-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ-ঐক্যের অভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ক্রেতার অভাব ও বিক্রেতার বাহুল্য, এবং সেইসঙ্গে প্রথমোক্তের বাহুল্য ও শেষোক্তের অভাব—এই দুইয়ের ঐক্য, অর্থাৎ, হুবহু মিল না হইলে ক্রয়বিক্রয় সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু ঐরূপ ঐক্যলাভও সহজসাধ্য ছিল না। রামের হয় ত প্রচুর ধান আছে, তার কিয়দংশের বিনিময়ে সে একটা গরু কিনিতে চায়। তাহা হইলে, তাহাকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যে শুধু একটা গরু বিক্রী করিতেই প্রস্তুত, এমন নহে, সেই সঙ্গে ধান কেনাও যার দরকার। কিন্তু এরূপ সংযোগসাধন কখনও সুলভ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় মুস্কিল ছিল মূল্যনিরূপণের মাপকাটি নিয়া। আজকাল টাকার অঙ্কেই আমরা প্রত্যেক জিনিসের মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকি। কিন্তু বিনিময়ব্যবস্থায় সে সুবিধা না থাকায়, এক জিনিসের মাপকাটিতে অন্য জিনিসের মূল্য নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল। ধানের সঙ্গে গরুর বিনিময় কি হারে এবং কি মূল্যে হইবে সাব্যস্ত করা সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, ভগ্নাংশের অসুবিধাও কম ছিল না। একটা গরু বিক্রী করিয়া ধান, কাপড়, তেল প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভবই ছিল। গরুটাকে ভাগ করিয়া বিভিন্ন লোকের কাছে বিক্রী করা ত সম্ভবপর ছিল না!

এই সমস্ত নানা অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাটের তাড়নায় উত্যক্ত হইয়া কখন যে মানববুদ্ধিতে মুদ্রা ও অর্থের ধারণা প্রথম জন্মিয়াছিল এবং কিরূপে দেশে দেশে তার প্রচলন সুরু হইল, ইতিহাসে তার কোন বিস্তৃত বিবরণ নাই সত্য; কিন্তু বিনিময়ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করিতেই যে অর্থের আবিষ্কার সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

অর্থজগতে এই অর্থের কাজ প্রধানতঃ দ্বিবিধ:—

(১) দ্রব্যবিনিময়ের উপায়সাধন—ধানের পরিবর্ত্তে গরু অথবা অন্য যে-কোন জিনিস কিনিতে হইলে প্রথমে ধান বিক্রী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয় এবং পরে সেই অর্থদ্বারা অতি সহজেই ইচ্ছামত জিনিস কেনা যাইতে পারে। এইরূপে অর্থের মধ্যস্থতায় ধানের বিনিময়ে গরু ক্রয় করার উপায় সহজসাধ্য হইয়াছে।

(২) মূল্যনিরূপণের মাপকাটি যোগান—বিনিময়-ব্যবস্থায় মূল্যনিরূপণ কিরূপ দুর্ঘট ছিল, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অর্থের প্রচলন হওয়াতে সে অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর

হইয়া আজকাল টাকার মাপকাটিতে বা অঙ্কে প্রত্যেক জিনিসের দর সাব্যস্ত করা এবং তাহা হইতে এক জিনিসের সঙ্গে আর এক জিনিসের বিনিময়-হার স্থির করা এখন মোটেই গণ্ডগোলের ব্যাপার নয়।

অবশ্য অর্থের আরো নানা গৌণ অথচ প্রয়োজনীয় কাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে ইহাই অর্থের যথার্থ পরিচয়। ধনবিজ্ঞানের (Economics) ক্ষেত্রে অর্থ মূলতঃ লক্ষ্যের বিষয় নয়; তার পশ্চাতে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, কল-কারখানা প্রভৃতি দেশের প্রকৃত ধনের উন্নতি-অবনতি এবং হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনা করার জন্য অর্থের সাহায্য যতটুকু নেওয়া প্রয়োজন, অর্থ শুধু ততটুকুই আমাদের লক্ষ্য ও মনোযোগের বিষয়। অর্থ ধন-পরিমাপের উপায় মাত্র। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাকে যদি একটা প্রকাণ্ড কারখানা বলিয়া মনে করা যায়, যার উদ্দেশ্য ধনসৃষ্টি, ধনবৃদ্ধি এবং ধনবিতরণ, তবে অর্থ সেই কারখানার একটি অত্যাবশ্যক কলকব্জার বেশী কিছুই নয়। অবশ্য কব্জা নষ্ট হইয়া গেলে, অথবা, ঠিক উপযোগী না হইলে সমস্ত কারখানাই ওলট্‌পালট্‌ হইয়া যাইতে পারে। তাই কব্জা সম্বন্ধেও নিপুণতা ও বিচক্ষণ দৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু তবু উহা কব্জা বই কিছুই নয়। ধনবিজ্ঞানে অর্থতত্ত্ব অত্যাবশ্যক হইলেও অর্থ ধন-পরিমাপের উপায় মাত্রই এবং এই উপায় ও উপলক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ যাহাতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া না যায়, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সব সময়েই প্রয়োজন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

বকুল-বনের গান

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

চলার পথে সবার চেয়ে সুখ—
আকুল হ'য়ে বকুল-বনে চলা !
লজ্জাভয়ে কাঁপ্‌বে নাক' বুক,
পথের ধূলা ধূলায় হবে দলা !
পথের ধূলা ধূলায় সারা দেহ ;
রাতের পথে রইবে নাক' কেহ—
মনের মাঝে দুল্‌বে শুধু দুখ,
নেত্র দু'টি অশ্রু-ছলছলা—
বকুল-বনে দেখ্‌বে কেবা মুখ—
ব্যাকুল হ'য়ে মনের মোহে চলা !

আঁধার রাতি, বকুল-বীথিকায়
রইবে নাক' রইবে নাক' কেহ—
গন্ধ-মৃদু শিশির শিহরায়,
শিহর কভু বইবে নাক' দেহ !
লাগ্‌বে মনে ঘন সুখের দোলা ;
ক্ষণদুখের অশ্রু রবে তোলা !
মনের তলে যে মন বাহিরায়
সেই যে মিতা, নাই ত সন্দেহ !
মিথ্যা মিতা কাঁদিয়া ফিরে যায়—
মনের বনে রইবে নাক' কেহ !

হায়রে সাথী, হায়রে মোর সাথী,
সাথীর রাতি বিজন বনভূমে—
মনের রাতি ?—তাই ত তারা-পাঁতি
আমার শিরে তোমার শিরে চুমে !
সে চুমাগুলি জাগিছে নীলাকাশে,
তরুরে চুমি' জাগিছে চুমা ঘাসে ;
মনেরে চুমে, তাই ত জাগে ভাতি—
তারার পাঁতি ঢুলিয়া পড়ে ঘুমে !
চলার পথে নাইরে দুখ-সাথী—
সাথীর রাতি বিজন বনভূমে !

বহিবে বায়ু, গহন হবে আঁধি—
অদূর-দূর লাগিবে নাক' চোখে !
মধু-মাছির শব্দে প্রাণ বাঁধি—
মধুর গান-গুঞ্জ মধু-লোকে !
পাগল হাওয়া নারিকেলের বনে,
পাগল হওয়া কেবলি মনে মনে !
অকারণের তানটিরে যে সাধি
কুড়ানো-ফুল-আকুল মম শ্লোকে—
কুড়ানো ফুলে কে যায় আজি কাঁদি,
কান্না-হাসি-পান্না শোভে চোখে !

বকুল-বন ব্যাকুল করি' গানে,
স্তব্ধ মূঢ় রহিবে তরু-সারি !
হাজারো যুগ মাটির রস-পানে,
হাজারো যুগ ঝরেছে শিরে বারি !
এ গান তারা শোনেনি কভু জানি,
পাতার ফাঁকে করেছে কানাকানি ;
জড় তরুরে চেতনা-ব্যথা-দানে
আমার গান ঢালিবে প্রাণ-ঝারি !
বকুল-বন ব্যাকুল হবে গানে,
নয় গো তরু,—আকুল নর-নারী !

একদা কবে শিশির-ধোয়া প্রাতে
শিশির-আঁখি জাগিয়াছিল মনে ;

একদা কবে হাতের 'পরে হাতে,
শিহর-লাগা কাঁকণ-রোল সনে
চূর্ণালক-স্বপ্ন জাগে চিতে—
চূর্ণ তারা চলিছে চারিভিতে ;
ঝরিয়া-পড়া বকুল-ফুল সাথে
ঝরিয়া তারা উড়িল বনে বনে !
একদা কবে শিশির-ধোয়া প্রাতে
শিশির-আঁখি জাগিয়াছিল মনে !

হায়রে কবি, চিরকালের কবি,
সে আঁখি দু'টি আজিও ভুলিলে না ?—
তারার গেহে দেখিলে যার ছবি,
ধরার গেহে তারে ত ধরিলে না !
যে মূক মাটি তৃণ-কুসুমে কাঁদে,
তারে কি তুমি ধরিলে কথা-ছাঁদে ?
কথার শেষে শেষ-গানেরে লভি'
মনের বনে ফুটাও কিগো হেনা ?
তারার গেহে দেখিলে যার ছবি,
ধরার গেহে তারে ত ধরিলে না !

করবী-বনে যে গানখানি মোর
রক্ত হ'য়ে ফুটিয়া উঠে ফুলে,
তাহারে ল'য়ে বাঁধিয়া দিব ডোর,
না জানি কার আকুল এলোচুলে !
যৌবনেরি পরম ব্যথা-ভরে,
কাঁপিয়া সে কি পড়িয়া যাবে ঝ'রে ?
তাই ত করি' আঁধার রাতি ভোর
গান গাহিনু কোন্ পরাণ-ভুলে ?
পথের শেষে মহুয়া-বন মোর—
মৌন মন মরিছে বিষ-ফুলে !

মহুয়া, তোর ফুলরেণুতে ভরি'
পরাণখানি পরাগ মাখি রবে,—
পারাবতের ধূসর পাখা মরি
পরাগধূলি উড়া'বে বায় নভে !
আকাশে যেথা আলোক-নিবাসিনী
আঁচল মেলি' বাজায় কিঙ্কিণী,
সোনালি সুর মনেরি 'পরে ঝরি'
মব ভুবন স্বজন হবে যবে,—
মহুয়া, তোর কুসুম-শাখা মরি
দুলিবে ঘন কবির প্রাণ-রবে !

যে কথা হায়, হয় নি কভু বলা,
সে কথা আজি বলিয়া দিব তারে—
মহুয়া-নেশা নয়ক' অবিভলা—
আনে সে দোলা ভোলা প্রাণেরি দ্বারে !
সে কথা তার কহিব কানে কানে,
বলিব,—ভালো লাগিয়াছিল প্রাণে ;
ভালো-লাগা সে করুণা অচপলা
আনিবে সুর আঁখি-বীণারি তারে—
ঘুমের ঘোরে নমিবে চঞ্চলা,
স্বপনরাশি নামিবে ভারে ভারে !

স্বপনরাশি—সুধা স্বপনরাশি
বাজায় বাঁশি আমার মন-তলে !
সে বাঁশি-সুরে চলিব ভাসি' ভাসি'
ভাসার স্রোতে ভালোবাসারি বলে !
আমার সুর চলিবে সেই সনে
ব্যাকুল সেই বকুল-বনে বনে !
ঘুমের দেশে উঠিবে বালা হাসি',
বলিবে,—বাঁশি এত কি ভাষা বলে ?
বাঁশির রাণী, তাই ত ভয় বাসি
আমার ভাষা তোমার লাগি চলে !

আমার ভাষা গন্ধ-মেশা সখি,
তুমি কি তারে কেশের 'পরে রাখ' ?
মালতী-মালা, তোমায় ভুলিব কি ?—
তাহারি ডোরে আমার ঘোর ঢাক' !

ঢাক' গো তারে শীতল স্নেহ-নীরে!—
ঢাক' গো আজি মুখর কবিটিরে!
মৌন নদী, মিলিছে চখাচখী,
রাতের তারা ফুটিছে লাখ' লাখ'—
আমার ভাষা গন্ধ-মেশা সখি,
তুমি কি তারে কেশের 'পরে রাখ'?

রাখ' গো তারে কেশের 'পরে আজি,
বুকের মাঝে দাও গো তারে রেখে,
দুঃখ-সুখ-দ্বন্দ্ব মাঝামাঝি—
নবনী-সুখে অবনী মাঝে ঢেকে!
দাও গো তারে ক্ষণদুখের দোলা.
ক্ষণসুখের অশ্রু রবে তোলা,
ঝলসি' যবে উঠিবে গান বাজি'
মনোনলিন-পরাগরেণু মেখে,
ভরিয়া রেখো তব পূজার সাজি—
বুকের মাঝে দিও গো তারে রেখে!

বকুল-বনে ডেকেছে আজি সে কে
আঁধার-ঘন মাঠের পরপারে?
পরবাসী সে বায়ু যে বলে হেঁকে—
বনের নীল টুটিবে একেবারে!
আঁচলখানি যাবে কি তার দেখা?
নয়নে তার কাজল-ঘন রেখা
পড়িবে চোখে? কি বাণী কবি শেখে,—
হারায় তারে কেন গো বারে বারে?
আলো ও ছায়া-মায়ারে দেখে দেখে
মুগ্ধ কবি নিখিল পারাবারে!

আজিকে শুধু দাঁড়াও ক্ষণকাল
চোখের আগে বিজলী-বিভা সম—
স্তব্ধ আজি রহিবে মহাকাল—
নহে সে ধ্যান, নেশা সে অনুপম!
সোনালি রোদে কনকতনুখানি—
ঝলসি' উঠে কনক-কম পাণি—
ধরায় আজি ঘনাবে মায়াজাল,
কহিবে কানে,—প্রিয় গো, প্রিয়তম!
স্তব্ধ রবে প্রবীণ মহাকাল—
ধরার কবি ধরিবে মনোরম!

আকুল হবে সকল দেহ মোর,
গানের বাণী বাঁধিবে রাখী হাতে
নয়নে শুধু ঘনাবে মোহ-ঘোর—
ব্যাকুল পাখী মরিবে দখিণাতে
বহিবে বায়ু বকুল-বন ঘিরে—
যৌবনেরি মক্ষী-রাণীটিরে
ধরিবে কবি; খুলিয়া যাবে ডোর—
ব্যাকুল পাখী মরিবে দখিণাতে!
আকুল হ'বে সকল দেহ মোর
গানের বাণী বাঁধিবে রাখী হাতে!

জানিব মনে চলার মাঝে সুখ—
ব্যাকুল হ'য়ে বকুল-বনে চলা!
লজ্জাভয়ে কাঁপ্‌বে নাক' বুক
পথের ধূলা ধূলায় হবে দলা!
পথের ধূলা ধূলায় সারা দেহ—
রাতের পথে রইবে নাক' কেহ—
মনের মাঝে দুল্‌বে শুধু দুখ,
নেত্র দু'টি অশ্রু-ছলছলা!
বকুল-বনে দেখ্‌বে কেবা মুখ—
ব্যাকুল হ'য়ে মনের মোহে চলা!

বিশ্ব-সাহিত্যের রোজনাম্‌চা

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

আমাদের দেশের কথাসাহিত্যের উপর Continental সাহিত্যের যে প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুদূর পাশ্চাত্যের যে-সকল মনীষীদের চিন্তা-ধারা আজ জগতের কথা-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাঁহাদের বিষয় জানিবার জন্য মন স্বতই উন্মুখ হইয়া ওঠে।

নিম্নে, জীবিত এবং বিশ্ব-বিশ্রুত বর্ত্তমান Continental কথা-সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইংলণ্ড্ এবং য়্যামেরিকার সাহিত্যের খবর আমরা নিয়ত সহজেই পাইয়া থাকি; সেই জন্য বাহুল্য-বোধে সেখানকার কথা-শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হইতে বিরত রহিলাম।

—নরওয়ে

—জোহান বোয়ার (১৮৭২)*

জগতের মধ্যে নরউইজিয়ান কথা-সাহিত্যই বোধ করি বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়।

ন্যুট হামসুন এবং সিগ্রিড্ উন্‌ডেষ্ট্—নরওয়ের এই দুই কথা-শিল্পীর পরিচয় আজ আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—বর্ত্তমানে যে-কয়জন কথা-সাহিত্যিক জগতের ভাব-ধারার উপর দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, হামসুন এবং উন্‌ডেষ্টের আসন তাঁহাদের পুরোভাগে। নরওয়ের এই দুই আশ্চর্য্য প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক-লেখিকা ব্যতীত আরও একজনের খ্যাতি আজ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার নাম—জোহান বোয়ার।

বোয়ার নরওয়ের অন্তর্গত ওর্‌কেডাল্‌শোভান্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

* লেখকদের নামের পাশে তাঁহারা যে যে বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেই বৎসর উল্লিখিত হইল।

শৈশব এবং কৈশোরের বেশী সময় তিনি তাঁহার জন্মস্থানের অরণ্য-বহুল পল্লীগ্রামেই অতিবাহিত করেন।

যৌবনে রাষ্ট্র-আন্দোলনে যোগদান করিয়া, রাষ্ট্রীয়-জীবন হইতেই বোয়ার তাঁহার প্রথম উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

"পরম ক্ষুধা", "তীর্থ-পথ", "মিথ্যার শক্তি" প্রভৃতির লেখকের নাম আজ জগতের সকল সুধীবৃন্দের পরিচিত।

—সুইডেন

—সেল্‌মা লেগারলফ্ (১৮৫৮)

সুইডেন্-এর অন্তর্গত ওয়ার্থ-ল্যাণ্ডের জমিদার-কন্যা সেল্‌মা বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য-অনুরাগিণী ছিলেন।

প্রথম যৌবনে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হন; পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সকল সময় সাহিত্য-সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত করেন।

১৯০৯ সালে তিনি নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ১৯১৪ সালে সুইডিশ্-বিদ্যাপীঠের প্রথম নারী-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। প্রায় সকল ভাষাতেই সেলমার গ্রন্থরাজি অনূদিত হইয়াছে।

লেগারলফের "জাতিচ্যুত" উপন্যাসখানি জগতের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসাবলীর ভিতর স্থান লাভ করিয়াছে।

—ভার্‌নার হিডেন্‌ষ্ট্যাম্ (১৮৫৯)

ষ্ট্রিন্‌বার্গ এবং লেগারলফের পর সুইডিশ্-সাহিত্যে যে সকল নবীন লেখকগণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হিডেন্‌ষ্ট্যাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় লেখক দেশে আর একজনও ছিল কি না সন্দেহ। ১৮৮৮ সালে একখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিডেন্‌ষ্ট্যাম তাঁহার সাহিত্যিক-জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

দেশে বস্তুতন্ত্রবাদের যে প্রবল ঢেউ বহিয়াছিল হিন্ডেন-ষ্টামই সর্ব্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। সেই জন্যই তাঁহার রচনার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাব-প্রাধান্য-বাদের স্রোত প্রবহমান।

—জার্ম্মানী

—জেকব ওয়াসারম্যান (১৮৭৩)

ওয়াসারম্যান (বা, বাসারম্যান) ব্যাভেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যাযাবরের জীবন যাপন করেন। কিছুদিন ভ্রাম্যমান অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া তিনি অষ্ট্রিয়ায় গমন করেন এবং সেইখানেই তাঁহার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবন প্রথম গতির স্পন্দন অনুভব করে।

এ পর্য্যন্ত তিনি যতগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন প্রত্যেক-খানিই অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বিশ্বের মায়া (worlds Illusion) তাঁহার একখানি সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যে সকল সমালোচক এতাবৎ তাঁহার প্রতিভা স্বীকার করে নাই, এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে, ওয়াসারম্যানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিবার মতো সাহসী সমালোচক জার্ম্মানীতে একান্ত বিরল।

—টমাসম্যান (১৮৭৫)

টমাসম্যান-এর বাল্য-জীবন এবং প্রথম-যৌবনের ইতিহাস পাঠ করিলে কিছুতেই এ ধারণা করা যায় না, যে ভবিষ্যতে তিনি জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক বলিয়া অভিনন্দিত হইবেন।

টমাসম্যান লিউবেক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনারম্ভে মিউনক্-এ গমন করিয়া তথায় এক ফায়ার-ইন্‌সিয়োরেন্স্-কোম্পানির আপিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ লুক্কায়িত ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাহিত্যকে তাঁহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া চাকুরী পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বৎসর নোবেল-প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়া টমাসম্যান জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। Budden brooks এবং Magic Mountain—তাঁহার এই দুইখানি উপন্যাস বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

—আর্থার স্নিৎস্লার (১৮৬২)

সমসাময়িক জার্ম্মান লেখকগণের মধ্যে স্নিৎস্লার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন; নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার নাম আজ বিশ্ব-বিশ্রুত।

স্নিৎস্লার ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া কিছুদিন যাবৎ চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

অতি শিশুকাল হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা, গল্প প্রভৃতি রচনা করিতেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তিনি অনেকগুলি ছোট নাটক রচনা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্য তাঁহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিয়া আনে এবং তাঁহার খ্যাতির উৎস খুলিয়া দেয়।

Grillpazer Prize নামে জার্ম্মানীর বিখ্যাত সাহিত্যিক-পুরস্কার ১৯০৮ সালে তাঁহাকে প্রদান করা হয়, এবং তাহার পর হইতেই দিন দিন তাঁহার খ্যাতি প্রসারিত হইতে থাকে।

অন্যান্য নাটক-উপন্যাস ব্যতীত "Masks and Miracles" নামে তাঁহার একখানি চমৎকার গল্পগ্রন্থ আছে।

—রাশিয়া

—ম্যাক্সিম্ গর্কি (১৮৬৮)

গর্কির আসল নাম অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ্ পেশ্‌কভ্। নয় বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া গর্কি এক জুতার দোকানে শিক্ষানবিশী করিতে আরম্ভ করেন। মনিব কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া একদিন তিনি সেখান হইতে পলায়ন করেন, এবং দেশের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ান। ভ্রাম্যমান অবস্থায় যুবক গর্কি অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করেন। নানা দেশ ঘুরিয়া

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহিত মিশিয়া গর্কি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাঁহার সেই বিপুল অভিজ্ঞতা উত্তরকালে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করে।

গর্কির গল্পগুলি একাধারে যেমন প্রচণ্ড তেমনি করুণ, যেমন স্নিগ্ধ তেমনি তীব্র। "মা" এবং "আগে যারা মানুষ ছিল" (Creatures that once were men)—এই দুইখানি উপন্যাস গর্কি-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। Lower Depths নামে তাঁহার একখানি অভিনব নাটক আছে।

সমাজ-চ্যুত, উপদ্রুত, অবমানিত নর-নারীদের লইয়াই গর্কির সাহিত্য-সৃষ্টি।

বর্ত্তমান রাশিয়ায় Sovietism নামে যে নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে গর্কি তাহার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী।

—ফিডর সোলোগাব্ (১৮৬৩)

সোলোগাব এক অতি দরিদ্র দর্জ্জি-পিতার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতা এক ধনীর গৃহে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং দয়ালু মনিব সোলোগাবের শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করেন।

কিছুদিন পরে সোলোগাব একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ে নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষকের কার্য্য সংগ্রহ করেন এবং পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন।

১৯০৭ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস "খুদে রাক্ষস" (Little Demon) প্রকাশিত হয়। পাঁচ বৎসর ধরিয়া উপন্যাসখানি রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালাগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধমূল্যে (সময় সময় সিকি মূল্যে) বিক্রীত হইতে থাকে। পাঁচ বৎসর পরে সহসা এক অপ্রকাশ-নামা সমালোচক "পেগান ম্যাগাজিন"-এ উপন্যাসখানির এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

রূপক-রচনায় সোলোগাব-এর সমকক্ষ শিল্পী জগতে আর একজন মাত্র আছেন। তাঁর নাম—মরিস মেটারলিঙ্ক্। বয়সে মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার এক বৎসরের ছোট।

—অ্যালেক্জ্যাণ্ডার কুপ্রিন (১৮৭০)

গর্কি-সাহিত্যের অনুকারক রূপেই কুপ্রিনের সাহিত্যিক-ব্রত উদ্বোধিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই সমালোচকগণ তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আভাস পাইয়াছিলেন যথেষ্ট, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে কুপ্রিনের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

কুপ্রিন যৌবনে সেনা-বিভাগে যুদ্ধ-বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন; সেই জন্য তাহার প্রথম গল্পগুলি সামরিক-জীবনের কাহিনী লইয়াই রচিত।

রুষ-সাহিত্যে বস্তু-তন্ত্র-বাদের যে প্রবল তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার প্রভাব বিশ্বের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া আমাদের দেশেও বিস্তারলাভ করিয়াছে, কুপ্রিন সেই অতি-আধুনিক রিয়্যালিজ্‌ম্-এর অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তক।

—ইটালী

—গ্যাব্রিয়েল ড য়্যানান্‌ৎসিও (১৮৬৩)

ষোলো বৎসর বয়সের সময় য়্যানান্‌ৎসিওর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমালোচকগণ সেই অপরিণত তরুণের প্রথম কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই উন্মেষ-উন্মুখ বিরাট প্রতিভার সন্ধান পাইয়া বিস্মিত হইয়া যান।

ছাব্বিশ বছর বয়সে যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় তখন শক্তিমান কবি হিসাবে য়্যানান্‌ৎসিওর নাম সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে, তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক বলিয়া সর্ব্ব-জন-পরিচিত।

য়্যানান্‌ৎসিওর ছোট গল্পগুলি গ্রামের চাষা-ভুষোদের জীবনের জীবন্ত ছবি। কুটীর-ঘেরা গ্রামের শান্ত দৃশ্যগুলিও যেমন তাঁহার তুলিকায় প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে, প্রগতিশীল নবযুগের অতি-সভ্যতা-দুষ্ট সহরের চিত্রও তেমনি অনবদ্য শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত তাঁহার লেখনী মুখে প্রতিফলিত হয়। য়্যানান্‌ৎসিওর Flames of Life নামক উপন্যাসখানি জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

—লুইগি পিরানডেল্লো (১৮৬৭)

বর্ত্তমানে যদিও পিরানডেল্লো জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়াই পরিচিত, তথাপি অন্য অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের ন্যায় তিনিও ছোট গল্প লেখার মধ্য দিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক-জীবন আরম্ভ করেন।

তীব্র বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং স্থূল হাস্যরস তাঁহার ছোট গল্পগুলিকে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে।

"A mere formality" পিরানডেল্লোর একটি বিখ্যাত গল্প। মানব-জীবন যে নিছক ভাঁড়ামো —"Life is a sad piece buffoonery"—উক্ত গল্পের মধ্য দিয়া লেখক তাঁহার এই দর্শন-বাদ প্রচার করিয়াছেন।

সমসাময়িক ইতালীয় সাহিত্যিকদিগের মধ্যে লুইগি পিরানডেল্লোর আসন দ্যানান্‌ৎসিওর পার্শ্বে এবং অন্য সকলের উপরে।

—ম্যাসিমো বন্‌টেম্‌পেল্লি (১৮৭৮)

ইটালীর নবীন কথা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বনটেম্‌পেল্লি একজন প্রথিতযশা শিল্পী।

অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদের ন্যায় তিনিও তাঁহার সাহিত্যিক-জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রায় সকল প্রকার সাহিত্যই রচনা করেন—কাব্য, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ। বর্ত্তমানে, ছোট গল্পেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি।

গত দশ বৎসরে তাঁহার পাঁচখানি গল্প-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, এবং শুনা যায় জগতে অন্য কোন গল্প-গ্রন্থই বাণিজ্য-সাফল্যে তাহাদের সমকক্ষ হয় নাই

রোম হইতে প্রকাশিত "৯০০" নামে জগদ্বিখ্যাত মাসিক-পত্রের বন্‌টেমপেল্লি অন্যতম প্রধান সম্পাদক।

—গ্রেজিয়া দেলেদ্দা (১৮৭২)

গ্রেজিয়া (বা গ্রাৎসিয়া) সারডিনায় জন্মগ্রহণ করেন।

১৯২৭ সালে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার বিষয় আমরা বিশদভাবে জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলি জন্মভূমির দরিদ্র কৃষি-জীবীদের লইয়াই লিখিত।

উপন্যাস-রচনায় গ্রেজিয়া বাহিরের ঘটনার উপর লক্ষ্য দেন না মোটেই; অন্তরের আঘাত এবং প্রতিঘাতের সংঘর্ষে যে বেদনা ঘনাইয়া ওঠে তাহাকে লইয়া দেলেদ্দা তাঁহার প্লট রচনা করেন।

"মা" নাম্নী তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাসখানি ১৯২৭ সালের নোবেল পুরস্কার-বিচারকগণ কর্ত্তৃক বৎসরের শ্রেষ্ঠতম রচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

—ইডিশ্ (Yiddish)

—শোলোম য়্যাশ (Sholom Asch)
(১৮৮০)

য়্যাশ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের নবীন লেখকদের মধ্যে য়্যাশের স্থান বহু ঊর্দ্ধে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নাটক, উপন্যাস এবং ছোট গল্পের মধ্যে সমান দক্ষতার সহিত সঞ্চারিত হইয়াছে।

God of Vengeance নামে য়্যাশের সুপ্রসিদ্ধ নাটকখানি বহু রাত্রি ধরিয়া বিলাতে অভিনীত হইয়াছে—যদিও আমেরিকায় তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বস্তুতন্ত্রের সুদক্ষ ব্যাখ্যাতা শোলোম য়্যাশের গল্পগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীন উদারতা এবং নিবিড় মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। "পেগান" নামক সুবিখ্যাত মাসিকে তাঁহার গল্পগুলি প্রকাশিত হয়; য়্যাশের বহুবিধ গল্পের মধ্যে "পরিত্যক্ত" এবং "ইহুদির ছেলে" এই দুইটি গল্প নিখিল-বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

—ডেভিড্ পিন্‌স্কি (১৮৭২)

নাট্যকাররূপে খ্যাতি লাভ করিলেও ছোট গল্প দিয়াই পিন্‌স্কির সাহিত্যিক জীবন সূচিত হয়। তিনি তাঁহার দেশের ছোট গল্পের রূপ এবং রচনা-রীতির অপরিমিত উৎকর্ষ সাধন করেন।

দেশের Proletariat (শ্রমিক) দিগের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার গল্প এবং নাটকের মূল উপাদানরূপে সেগুলিকে রূপ-রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

পিন্‌স্কির ছোট গল্পের ভিতর মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

"প্রলোভন" (Temptations) নামে তাঁহার বহুল-আলোচিত গল্প-গ্রন্থখানি দুর্নীতিমূলক-বোধে আমেরিকায় অননুমোদিত হইয়াছে। প্রলোভনের প্রত্যেকটি গল্প

পিন্স্কির অনন্যসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। "কালো বেড়াল" এবং "নারীর ক্রোধ" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গল্প দুটিও উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

—জোসেফ্ ওপাটোশু (১৮৮৭)

ওপাটোশু ১৯০৭ সালে আমেরিকায় গমন করেন এবং সেখানে পূর্ত্তবিদ্যায় (Engineering) বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

১৯১০ সালে তাঁহার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়, এবং তাহার সুনামে উৎসাহিত হইয়া তিনি ক্রমে সাহিত্যিক-জীবন গ্রহণ করেন।

১৯১১ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস "ঘোড়া-চোরের প্রেম" (Romance of a horse-thief) প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ওপাটোশু আধুনিক ইডিশ লেখকদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলিয়া অভিনন্দিত হন।

তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস "অরণ্য" (Forest) প্রায় সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে। অনেক সমালোচক উপন্যাসখানিকে "নোবেল-পুরস্কার" পাইবার যোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

—হাঙ্গেরি

—এটিয়েনি বারসনি (Etienne Barsony) (১৮৫৫)

মরাস জোকেই এবং কোলোম্যান মিক্স্জাথের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্যন্ত হাঙ্গেরিরর কথা-সাহিত্য স্রোতহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

হাঙ্গেরির আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ফেরেঙ্ক মোলনার, এটিয়েনি বারসনি এবং লুই বিরো'র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বারসনি মিক্স্জাথের শিষ্য। কৃষি-জীবন এবং পশু-চরিত্রই বারসনির গল্প-সাহিত্যের প্রধান উপাদান।

"নাচুনে ভালুক" (The dancing bear) নামে তাঁহার যে সুন্দর গল্পটি আছে, লিখন-ভঙ্গী এবং টেক্নিকের দিক দিয়া তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

—লুই বিরো (১৮৮০)

শক্তিমান নাট্যকাররূপে বিরোর খ্যাতি দেশবিশ্রুত হইলেও তিনি কয়েকখানি চমৎকার ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্যে বিরো অতি-আধুনিক; তাঁহার রচনার ভিতর একটা উদার বিশ্ব-জনীনতার ছাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। সমসাময়িক লেখকদের ন্যায় তাঁহার লেখার মধ্যেও একটা নিগূঢ় জীবন-বিদ্বেষ এবং দুঃখবাদের পরিচয় পাই। লেখার মধ্যে মানব-জীবনের প্রতি বিরোর এই বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

"ঘনায়মান ছায়া" (Darkening shadows) নামে তাঁহার বিখ্যাত ছোট গল্পটির মধ্যে লেখকের মনের এই দিকটির ছবি গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ফ্রান্স

—পল মোরাদঁ (১৮৮৮)

জগতের মধ্যে ফরাসী কথাসাহিত্য শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষ লাভ করিলেও, আজ তাহার গতি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দোদে, জোলা, রিশেপিন, মোপাসাঁর পর তাঁহাদের সমকক্ষ শিল্পী বর্ত্তমান ফ্রান্সে একজনও আছেন কি না সন্দেহ।

অধুনা ফরাসী-সাহিত্যে যে Impression-ism-এর যুগ আসিয়া পড়িয়াছে পল মোরাদঁ তাহার অন্যতম প্রধান পুরোধা।

ভাষার তির্য্যক গতি এবং প্রচ্ছন্ন কৌতুক-প্রবাহের সংমিশ্রণে তাঁহার রচনা একটি অভিনব বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। "গেঙ্গিস্-খাঁর ঘোড়া" মোরাদঁর একটি চমৎকার কৌতুকাবহ গল্প।

—বেল্জিয়াম

—মরিস মেতারলিঙ্ক্ (১৮৬২)

মরিস ঘেণ্ট্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আইন অধ্যয়ন করেন, এবং পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আইন ব্যবসায়ী-রূপে প্যারীতে গমন করেন।

রূপক-সাহিত্য-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ লেখক জগতে অতি বিরল; কেবল মাত্র রাশিয়ার বিখ্যাত রূপক-রচয়িতা মোলোগাব-এর সহিত তাঁহার রচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কয়েকটি গল্প ছাড়া মেতারলিঙ্ক বহুবিধ রূপক-নাটক এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ব-জনাদৃত নীলপাখীর স্বর-লহরী বিশ্বের সকল সাহিত্য-নিকুঞ্জেই ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

—জেকো শ্লোভেকিয়া

—কারেল ক্যাপেক্ (১৮৯০)

জেক্ সাহিত্যে যে অতি-আধুনিক যুগ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার আলোচনায় ক্যাপেক্-এর নামই সবার পূর্ব্বে মনে আসে।

জ্যান নেরুদা এবং সাটোপ্লাক-সেঁক্-এর পর জেক্ কথা-সাহিত্যে যে নবীন লেখকগণ শক্তির পরিচয় দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ক্যাপেক-এর আসন তাঁহাদের কাহারো নীচে নয়; নাট্যকার রূপে ক্যাপেক আজ বিশ্ব-বন্দিত।

প্রথমে তিনি সাময়িক-পত্র-সম্পাদনা কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন; "জাতীয় পত্রিকা," এবং "জাতীয় পত্রিকা"—এই দুইখানি সংবাদপত্রে ক্যাপেক ১৯১৯ সাল অবধি কার্য্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে, প্রেগ ভিনোরেডি নাট্যমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে তাঁহাদের রঙ্গালয়ের নাট্য-সমালোচক এবং মন্ত্রণা-পরিষদের প্রধান সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন।

ক্যাপেক সর্ব্বশুদ্ধ ছয়খানি উপন্যাস এবং খানদুই গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি উপন্যাস এবং প্রত্যেকটি গল্প নব নব ভাব-সম্পদ এবং ঘটনা-বিন্যাসে অভিনব এবং অপূর্ব্ব।

"প্রদীপ্ত অন্তঃস্তর" (Glowing Depths) নামে তাঁহার যে বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ আছে তাহার প্রত্যেকটি গল্প লেখকের পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ-আকাঙ্ক্ষায় অনুরঞ্জিত। বইখানিকে অনেক সমালোচক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

—হল্যাণ্ড

—ফ্রেডারিক ভন ঈডেন (১৮৬০)

বিখ্যাত নাট্যকার হারমান হিজারম্যান (১৮৬৪-১৯২৪)-এর পর দশীয় কথা-সাহিত্যে ঈডেন-এর নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য।

ছাত্র-জীবন অতিক্রম করিয়া ঈডেন য়্যাথাষ্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন যাবৎ চিকিৎসা-বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন।

হল্যাণ্ডের একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রের মধ্য দিয়া যে সাহিত্যিক দলটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, ১৮৮৫ সালে, ঈডেন সেই দলে যোগদান করেন এবং সেই মাসিক-পত্রেই Little Johannes নামে তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাসখানি প্রকাশ করেন।

ঈডেন-এর সাহিত্যরচনায় জাতীয় জীবনের ছবি সুনিপুণ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

—জুগোশ্লেভিয়া

—ফ্রানসিস্ মেস্কো (১৮৭৪)

দেশীয় কথা-সাহিত্যে মেসকো নব-যুগের প্রবর্ত্তক;—তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্লোভিন সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাস রচনা করেন।

মেস্কোর গল্পগুলিতে প্লটের বিশেষ আড়ম্বর থাকে না; অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবিই তাঁহার লেখায় উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠে। সর্ব্বোপরি একটা বিস্তীর্ণ দুঃখবাদ তাঁহার সকল রচনাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

মানুষ অদৃষ্টকে এড়াইয়া যাইতে পারে না, এবং অদৃষ্টের ফেরে মানুষ কেমন করিয়া আঘাতের পর আঘাত পাইয়া নিম্নতম স্তরে নামিয়া যায়—মানব-জীবনের এই করুণ চিত্রই মেসকোর লেখনী-মুখে অসামান্য ক্ষমতার সহিত ফুটিয়া উঠে।

"The man with the magged soul"—মেস্কোর এই অনবদ্য নিপুণ গল্পটি তাঁহার সকল রচনার প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

তৃতীয় স্তবক

কন্‌ভেন্‌সন্

১

কন্‌ভেন্‌সনের স্বরূপ

ক

আমরা এখন কন্‌ভেন্‌সন্ বা জাতীয় মহাসমিতির মহীয়সী উচ্চতার সম্মুখীন হইতেছি।

মানবজাতির দৃষ্টিসীমায় এতদপেক্ষা উচ্চতর দৃশ্য আর কখনো আবির্ভূত হয় নাই। এই উচ্চতার সান্নিধ্যে দৃষ্টি আপনা হইতেই সংযত হইয়া আইসে।

হিমালয় জগতে একটিই আছে। কন্‌ভেন্‌সনেরও আর দ্বিতীয় নাই।

ইতিহাসের উচ্চতম শীর্ষ এই কন্‌ভেন্‌সন্।

ইহার জীবদ্দশায় (কন্‌ভেন্‌সনেরও জীবন ছিল) লোকে এটাকে ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সমসাময়িকগণ ইহার প্রতাপে অতিমাত্র ভীত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাহা কিছু বিরাট, তাহাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভীতিরও উদ্রেক করে। যাহার বিশেষত্ব আমাদের ধারণাতীত নহে—যেমন সামান্য শৈলমালা—তাহার প্রশংসা করা সহজ। কিন্তু যাহা কিছু অত্যুন্নত—তাহা প্রতিভাই হউক, কি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গই হউক—কোন পরিষৎই হউক, কিংবা চারুকলার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনই হউক—তাহার আত্যন্তিক নৈকট্য আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। একটা অপরিমেয় উচ্চতাকে নিতান্ত বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। ইহার চড়াইয়ে দম আটকাইয়া আসে, উৎরাইয়ে গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, খাড়াইয়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়; ঝরণার সফেন তরঙ্গ খদের গভীরতা প্রকাশ করে; চূড়াগুলি চির-মেঘাবৃত। নিতান্ত খাড়া পর্ব্বতে আরোহণ, তথা হইতে পতনের মতোই ভয়াবহ। সুতরাং ভীতিবিহ্বল চিত্ত তাহার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিবার আর অবকাশ পায় না। ফলে, ভাবটা হয় অদ্ভুত রকমের—বিরাটের প্রতি বিরক্তি। গভীর গহ্বর-দর্শনে আতঙ্কিত-হৃদয় ব্যক্তির চক্ষে পর্ব্বতের মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি আর প্রতিভাত হয় না। বৃহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব মুগ্ধ বিস্ময়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

কন্‌ভেন্‌সনের সম্বন্ধে লোকের ধারণা প্রথমে এইরূপই ছিল। ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া যাহার পরিমাপ করা উচিত ছিল, তাহা পরিমিত হইল অর্দ্ধান্ধের ক্ষীণ দৃষ্টি দ্বারা।

আজ আমরা কন্‌ভেন্‌সনকে তাহার উপযুক্ত পারিপ্রেক্ষিকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। সুদূর গভীর নীলাকাশের ভিতর দিয়া প্রশান্ত বিষাদময় পৃষ্ঠ-পটের উপর উহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বিরাট মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

খ

১৪ই জুলাইএ মুক্তি।

১০ই আগষ্টে বজ্র-নির্ঘোষ।

২১শে সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা।

২১শে সেপ্টেম্বর সমদিবারাত্রি—শক্তি-সাম্যের পুণ্যাহ।

তুলাদণ্ড সাম্যও নায়কের চিহ্ন। তুলারাশিতেই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কন্‌ভেন্‌সন্ জনসাধারণের প্রথম অবতার। কন্‌ভেন্‌সন্ হইতেই ইতিহাসের উজ্জ্বল নূতন পৃষ্ঠার আরম্ভ—কন্‌ভেন্‌সনেই মহান্ ভবিষ্যতের উদ্বোধন।

'আইডিয়া' মাত্রেরই দর্শনযোগ্য পরিচ্ছদ চাই। মত মাত্রেরই আবাস-স্থলের প্রয়োজন। গির্জ্জা, প্রাচীরচতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বর। প্রতি ধর্ম্মমতই মন্দির-মধ্যে

সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কন্‌ভেন্‌সন যখন একটি বাস্তব সত্তায় পরিণত হইল, তখনই সমস্যা দাঁড়াইল, ইহার ভবন হইবে কোথায় ?

প্রথমতঃ 'ম্যানেজ' ক্লাব-গৃহ, তৎপর টুইলারিস্ উদ্যান-বাটিকা এতদর্থে নির্ব্বাচিত হয়। মঞ্চ প্রস্তুত হইল, দৃশ্যাবলী সংযোজিত হইল, সারি সারি বেঞ্চ সজ্জিত হইল। একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ—তথায় দাঁড়াইয়া বক্তারা বক্তৃতা করিত। হলটি কতকগুলি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। তাহাতে দর্শকদের ভিড় হইত। রোমীয় চন্দ্রাতপ ও গ্রীসীয় পর্দ্দা খাটানো হইল।

এই সব সমকোণ ও সরল রেখার মধ্যে কন্‌ভেন্‌সন প্রতিষ্ঠিত হইল—জ্যামিতিক নক্সার মধ্যে ঝটিকাকে অবরুদ্ধ করা হইল।

বক্তৃতামঞ্চে লাল টুপী ধূসরাভ করিয়া অঙ্কিত হইল। এই রক্ত-ধূসর টুপী, এই থিয়েটারের হল, এই পিজবোর্ডের স্মৃতিস্তম্ভ, এই কাগজের মন্দির, এই কাদামাটির দেবায়তন—এই সব লইয়া রাজপক্ষীয়েরা হাসিঠাট্টা করিত। কত শীঘ্রই না এইগুলির বিলোপ হইবে!—পিপের তক্তায় তৈরী স্তম্ভ, প্যাকিং বাক্সের কাঠের খিলান, খড়িমাটির প্রতিমূর্ত্তি, চিত্রিত মার্ব্বেল, আর ক্যান্‌ভাসের দেয়াল! এই অস্থায়ী আশ্রয়স্থলকে ফ্রান্স চিরন্তন আবাস-ভবনে পরিণত করিয়াছে।

রাইডিং স্কুলে কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন তাহার প্রাচীরগুলি প্ল্যাকার্ডে আবৃত থাকিত। প্যারিস তখন ঐ রকম প্ল্যাকার্ডে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এটা হচ্চে ভ্যারেনিস্ হইতে রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরে।

একটা প্ল্যাকার্ডে এই কথাগুলি ছিল :—

রাজা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়া উল্লাসধ্বনি করিবে, সে প্রহৃত হইবে; যে রাজার অপমান করিবে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হইবে।

আর একটাতে :—চুপ, চুপ! মাথার টুপী খুলিও না। সে তাহার বিচারকদের সম্মুখ দিয়া এখনই চলিয়া যাইবে।

আর একটাতে :—রাজা দেশের লোকের উপর বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। এখন দেশের লোকদের পালা।

আর একটাতে :—আইন! আইন!

ঐ দেয়ালগুলির মধ্যেই ষোড়শ লুইএর বিচারের জন্য কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইয়াছিল।

১৭৯৩ অব্দের ১০ই মে তারিখ হইতে টুইলারিসে কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইতে লাগিল। উহার নাম হইল "জাতীয় প্রাসাদ।" "ঐক্য-ভবন", ও "স্বাধীনতা-ভবনের" মধ্যবর্ত্তী সমুদয় স্থান কন্‌ভেন্‌সনের মিটিংএর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। "সাম্য-ভবন"ও একটি ছিল। কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইত দ্বিতলে। নিম্নতল বহুসংখ্যক ক্যাম্পখাট, বিছানাপত্র ও আসবাবে পূর্ণ ছিল। 'কন্‌ভেন্‌সনের' রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র সৈনিকগণ তথায় পাহারা দিত। কন্‌ভেন্‌সনের একদল 'গার্ড-অব-অনার' ছিল। তাহারা কন্‌ভেন্‌সনের "গ্রেনেডিয়ার্স" নামে অভিহিত হইত।

প্রাসাদে এসেম্ব্লির অধিবেশন হইত। তৎসংলগ্ন উদ্যানে জনসাধারণ যাতায়াত করিতে পারিত। একটি ত্রিবর্ণের রিবন দ্বারা উভয়ের ব্যবধান চিহ্নিত ছিল।

গ

এখন অধিবেশন-হলটির বর্ণনা দেওয়া যাক্। এই ভয়ানক স্থানের প্রত্যেকটি জিনিষই কৌতূহলপূর্ণ।

হলে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই চোখে পড়ে দুইটি প্রশস্ত জানালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত 'স্বাধীনতা' দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফুট, প্রস্থে ৩৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৭ ফুট। রাজার এই রঙ্গভূমি, পরে রাষ্ট্রবিপ্লবের রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। রাজপারিষদগণের জন্য নির্ম্মিত এই সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ হল '৯৩ সালে কাষ্ঠমঞ্চে ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই সব কাষ্ঠমঞ্চে জনসাধারণ উপবেশন করিত।

যে কাঠামোর উপর এই সব মঞ্চ তৈরী হইয়াছিল তাহা ৩২.১/২ ফুট পরিধির একটি মাত্র কাষ্ঠস্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান ছিল। বহু বর্ষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরুভার এই স্তম্ভটি বহন করিয়াছে। প্রশংসার করতালি, উৎসাহের উদ্দীপনা, ধৃষ্টতার চীৎকার, কলহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিরুদ্ধদলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা—ইহার উপর দিয়া কতই

ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও ইহা ভাঙিয়া পড়ে নাই। কনভেন্‌সনের পর ইহা কাউন্সিল-অব-দি-এ্যানসেন্ট-কেও (প্রবীণগণের পরিষৎ) দেখিল। অবশেষে ১৮ই ব্রুমেয়ার ইহার খাটুনীর অবসান হয়। তখন কাষ্ঠস্তম্ভের পরিবর্ত্তে মর্ম্মরস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হয়। কিন্তু সেগুলি এরূপ স্থায়ী হয় নাই।

এই সমান্তরাল ক্ষেত্রের মতো হলটির এক পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড বৃত্তার্দ্ধ। তাহাতে ক্রমোচ্চ উনবিংশ সারি বেঞ্চ অর্দ্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। এইগুলিই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের আসন।

আসনগুলির সম্মুখে উচ্চ মঞ্চ। মঞ্চের সম্মুখভাগে লেপেল্‌টিয়ার সেণ্ট্‌ ফার্গুর আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি, পশ্চাদ্ভাগে প্রেসিডেন্টের চেয়ার। মঞ্চের পাদমূলে দৌবারিকগণের স্থান। মঞ্চের একপার্শ্বে কালো কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই ৯ ফুট লম্বা একটা প্ল্যাকার্ড দেওয়ালে টাঙানো। তাহাতে "মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব" সম্বন্ধীয় ঘোষণা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মঞ্চের উপরিভাগে বক্তার মাথার উপর দিয়া তিনটি প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণের পতাকা উড্ডীন ছিল। পতাকাগুলি একটি বেদীর উপর স্থাপিত। উক্ত বেদীতে "আইন" এই কথাটি লিখিত ছিল। প্রেসিডেন্টের দক্ষিণে লাইকার্গাস এবং বামে সোলোন—প্রাচীন স্পার্টা ও এথেন্সের এই দুই ইতিহাসবিখ্যাত বিধি-ব্যবস্থাপকের প্রস্তরমূর্ত্তি।

হলের এক এক পার্শ্বে দশটি করিয়া সাধারণ মঞ্চ ও দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড ঘেরা জায়গা ছিল। মোটের উপর চব্বিশটি আসন। এইগুলিতে জনতার মহা ভিড় হইত। কনভেনসনের হলে দুই হাজার লোকের সহজেই স্থান হইত। নগরবাসীদের বিদ্রোহের দিন তথায় ৩০০০ হাজার লোক সমাবেত হইয়াছিল।

প্রত্যহ দুইবার্ করিয়া কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশন হইত—দিনের বেলায় একবার এবং সন্ধ্যাকালে একবার।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ বঙ্কিম ও সোনালী কীলকমণ্ডিত। টেবিলটা পক্ষযুক্ত একপদ রাক্ষসমূর্ত্তি-চতুষ্টয় কর্ত্তৃক ধৃত। টেবিলের উপর একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা, বেল, একটা বৃহৎ মসীপাত্র এবং পার্চ্চমেণ্ট্‌ কাগজের তাড়া—সরকারী রিপোর্টের বই।

বর্শাগ্রে বাহিত সদ্য-ছিন্ন শির হইতে অনেকবার এই টেবিলের উপর রক্তবিন্দু সিঞ্চিত হইয়াছে।

মঞ্চের দুইপার্শ্বে দুইটি দ্বাদশ ফিট উচ্চ দীপদান। তাহার প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া ল্যাম্প্‌। প্রতি সাধারণমঞ্চে একটি করিয়া এরূপ বাতিদান ছিল।

গবাক্ষপথের স্তিমিতালোকে দিনের বেলায়ও কক্ষের অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হইত না। সন্ধ্যাসমাগমে যখন ল্যাম্প্‌গুলি প্রজ্বলিত হইত তখন তাহাদের ক্ষীণালোকে স্থানটা রহস্যময় নৈশদৃশ্যের আকার ধারণ করিত। তাহাদের মলিন রশ্মি সান্ধ্য-ছায়াকে যেন আরো গাঢ়তর করিয়া তুলিত এবং সান্ধ্য অধিবেশনগুলি কেমন নিরানন্দ ও ভীতি-জনক হইয়া উঠিত।

ইহার সমস্ত পারিপার্শ্বিকই অদ্ভুত ও কোমলতাবর্জ্জিত,—কিন্তু যথাযথ। বর্ব্বরতার মধ্যে শৃঙ্খলা,—বিপ্লবেরই একটা দিক। কন্‌ভেন্‌সনের হলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন শিল্পীগণ মনে করিত—যাহা রীতি-বিন্যস্ত, পরস্পর-সদৃশ-অংশ-বিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। এইভাবের আতিশয্য ক্রমে মহিমাকে শ্রীহীনতায় এবং পবিত্রতাকে হাস্যকর অযৌক্তিকতায় পরিণত করে। স্থাপত্যেরও শুচিবাই আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণ-পারিপাট্য ও গঠন-সৌষ্ঠবের চোখ্‌ঝলসানো মহোৎসবের পর আর্ট যেন একেবারে উপবাসের ব্যবস্থা করিল এবং শুধু সরলরেখার মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিল। ইহার পরিণাম—শ্রীহীনতা। কলা-লক্ষ্মী কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা হইয়া রহিলেন। এরূপ বুদ্ধি ও কৃচ্ছ্রতার দোষ এই যে গঠন-পদ্ধতি ক্রমে কঠোর হইতে হইতে সর্ব্ব-প্রকার বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইয়া একেবারে নগণ্য হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রনৈতিক ভাবপ্রাবল্য বাদ দিলেও এই হলের গঠনের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাহাতে বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিত।

আপনা হইতেই লোকের মনে জাগিয়া উঠিত, অতীত দিনের স্মৃতি—পুষ্পমাল্য-বিভূষিত আসন-শ্রেণী, কক্ষের নীল-লোহিত ছাদ, বহু-ডাল-সমন্বিত হীরকজ্যোতি ঝাড় ও ঝাড়ের কলম হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মি-রেখা, কাম ও রতির চিত্রশোভিত মূল্যবান্ পর্দ্দাসকলের উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্র্য,—চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে সর্ব্বত্র কেবল মধুরভাবের বিকাশ, যাহাতে এই বিষণ্ণ-গম্ভীর হলটিকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া রাখিত। আর এখন যেদিকে চাওয়া যায়, কেবল কঠোর সরলরেখা ও সমকোণ—ইস্পাতের তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ও তুষার-শীতল!

ঘ

কিন্তু "মহাসমিতির" দিকে চাহিয়া হলের কথা আর লোকের স্মরণ থাকিত না। অভিনয়দর্শনে মন দিলে কি রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবিবার আর অবসর হয়? এই জনসভার মতো বিচিত্র, বিশৃঙ্খল, অথচ মহিমময় জগতে আর কিছু দেখা যায় নাই। অগণিত বীর ও সংখ্যাতীত কাপুরুষের অদ্ভুত সমবায়! পর্ব্বতে ক্রীড়াশীল মৃগ, জলাভূমিতে ভীষণ সর্প;—বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ঠেলাঠেলি, দলাদলি, রেষারেষি, বাক্‌বিতণ্ডায় সভা গম্‌গম্ করিত। আজ সেই সব লোক ছায়ামূর্ত্তি মাত্র।

এ যেন অতিকায় দৈত্যগণের মহা সম্মিলন! দক্ষিণে 'গিরণ্ডি' নামে প্রসিদ্ধ নরমপন্থীগণ—চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ; বামে 'পর্ব্বত' অভিধেয় চরমপন্থীগণ—শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সম্পদশালী।

একদিকে—সেই সাংঘাতিক গডেট। টুইলারিস্ প্রাসাদে রাণী নিদ্রিত শিশুযুবরাজকে দেখাইয়া দিলে গডেট তাহার ললাট-চুম্বন করে, আবার সেই শিশুর পিতৃমস্তক-পতনের উদ্যোক্তাও ছিল সে-ই। মাথাপাগলা সেলেজ—যে অষ্ট্রীয়ার সহিত অন্তরঙ্গতার জন্য চরমপন্থীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে। লস্ ডুপারেট,—একজন সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাকে 'বদমাস্' বলিয়া গালি দিলে ডুপারেট উক্ত পত্রসম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দেয় এবং বলে, "আমি জানি, 'বদমাস' কথাদ্বারা আপনি কেবল সেই সব লোককে বুঝাইতে চান, যাহারা আপনার সঙ্গে একমত নহে।" কুইনেট—ষোড়শ লুইর পতন যাহারা ঘটায়, তাহাদেরই একজন। গাস্ত্রী লুকে—যে ক্যামিল্ ডেস্‌মুলিন্‌সের সহযোগে ১৪ই জুলাই সংঘটিত করে। জ্যাকব ডুপণ্ট যে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে, "আমি নাস্তিক;" তদুত্তরে রবসপীয়র বলে, "নাস্তিকতা বড়মানুষী বটে।" রেবেকি—রবসপীয়রকে তখনো গিলোটিনে দেওয়া হয় নাই বলিয়া যে পদত্যাগ করে। লা সোর্স—যে গিলোটিনে প্রাণ দেওয়ার সময় বলিয়াছিল, "আমাদের প্রাণ যাচ্ছে, কারণ দেশ এখনো নিদ্রিত; তোমাদের প্রাণ যাবে, যখন দেশ জেগে উঠ্‌বে।" "প্যারিস-চিত্র" গ্রন্থের গ্রন্থকার মার্সিয়ার—যে বলিয়াছিল, "২১শে জানুয়ারী তারিখে সকল রাজাই একবার নিজ নিজ 'ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখেছিল।" পিটিয়ন—যাহার ভাগ্যে ১৭৯২ সালে দেশের লোকের পূজা লাভ—"জনসাধারণের পিতা" বলিয়া খ্যাতি—আর ১৭৯৪ সালে দেশবিতাড়িত হইয়া অরণ্যে ব্যাঘ্রকবলে জীবনদান। এইরূপ আরো কত কত ব্যক্তি।

অপরদিকে, ত্রয়োবিংশবর্ষীয় সেণ্ট্ জাষ্ট—জার্ম্মানরা যাহার নাম দিয়াছিল, "আগুনে শয়তান।" মার্লিন-ডি-ডুয়ে—"সন্দিগ্ধদের সম্বন্ধীয় আইনের" ব্যবস্থাপক। ফেবর ডি ইগ্‌লেণ্টাইন—সাধারণতন্ত্রীয় পঞ্জিকার প্রবর্ত্তক। ব্যাগট—জেলখানার বন্দীদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোনো কোনো লোক তাহার নিকট অভিযোগ করিলে সে জবাব দেয়, "কারাগারই' তো প্রস্তরময় পরিচ্ছদ।" এ্যামার—যে বলিয়াছিল, "সমস্ত পৃথিবী ষোড়শ লুইকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আপীল করবে তবে কার কাছে? গ্রহনক্ষত্রের নিকটে?" রুজার—যাহার উক্তি "রাজার শিরশ্ছেদে অপর সাধারণের শিরশ্ছেদের চেয়ে বেশী হৈচৈ কেন হবে?"—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। লেকয়েণ্ট পুইরাভো—যে ম্যারাটাক উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করে। লিণ্ডেট—সেই শয়তানি-মন্ত্রের সৃষ্টিকারী, যাহার মাথা হইতেছে কমিটি-অব-জেনারেল-সেফ্‌টি, এবং যাহার একবিংশসহস্র বাহু "বৈপ্লবিক সমিতি" নামে সমগ্র ফ্রান্সকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। চার্লিয়ার—যে প্রস্তাব করে যে, অভিজাতগণের সম্বোধনেও "তুমি"

শব্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত। এই সম্প্রদায়ের শিরোদেশে ছিল একজন নূতন মিরাবো—তাহার নাম ড্যান্টন।

দুই দলের বাহিরে, দুই দলেরই ভীতি উদ্রেক করিয়া রব্‌স্‌পীয়রের অভ্যুত্থান।

ঙ

বীরত্ব, কর্ত্তব্যানুরাগ, দেশপ্রীতি ও উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত এই দুই সম্প্রদায়ের নিম্নে ভীত, আশঙ্কিত, নামহীন, খ্যাতিহীন জনসাধারণের মৌন গড্ডলিকা-প্রবাহ। যাহারা সন্দেহ করে, যাহারা দ্বিধায় আন্দোলিত হয়, যাহারা অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া আইসে, যাহারা সমস্যার আশু-সমাধান না করিয়া সময়ের উপরে বরাত দিয়া ফেলিয়া রাখে, যাহারা কেবল অপেক্ষা করে, যাহারা কাহারও না কাহারও ভয়ে ভীত—সেইরূপ লোকে এই দল পুষ্ট ছিল। চরমপন্থীদের 'পর্ব্বত' নামের অনুসারে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'সমতল'। "চরম" এবং "নরম" উভয় দলই বাছাবাছা লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু এই "সমতল" ছিল জনতার খিচুড়ী, আর তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল—সাইয়ে।

কোনো কোনো মনের গতি অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। সাইয়ে ছিল সেই রকমের লোক 'তৃতীয় সম্প্রদায়' পর্য্যন্ত আসিয়া সে থামিয়া গেল; তারপর জনগণের সহিত আর সে অগ্রসর হইতে পারিল না। সাইয়ে রব্‌স্‌পীয়রের নাম দিয়াছিল "শার্দ্দূল," আর রব্‌স্‌পীয়র তাহাকে বলিত "ছুঁচো"। এই দার্শনিক যে মধ্যপথে থামিয়া গেল তাহা বিজ্ঞ বিবেচনার ফলে নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত-সংস্কারের প্রণোদনে। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সৌখীন সহচর, কিন্তু বিশ্বস্ত সেবক ছিল না। সে সকলকেই কর্ম্মতৎপর হইতে উপদেশ দিত, কিন্তু কর্ম্মের আহ্বানে সে নিজে কখনো সাড়া দেয় নাই। কণ্ডর্সেট, ভার্জ্জিনড, ক্যামিল ডেস্‌মুলিন্‌স্‌, ড্যান্টন—ইহারা চিন্তাশীল অথচ বীরপুরুষ। আর সাইয়ে ছিল সেই রকম চিন্তাশীল ব্যক্তি যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে আত্মরক্ষা।

"সমতলের" নিম্নেও এক স্তর ছিল—তাহা জলাভূমি—আত্মম্ভরিতায় দূষিত, বদ্ধ, পঙ্কিল বারিরাশিতে পূর্ণ। হীন কাপুরুষতা, গুপ্ত ক্রোধ, দাসত্বের বিদ্রোহ—এ সকলের অদ্ভুত মিশ্রণ। নরম দলের মতামত তাহাদের নিকট ভাল বোধ হইত, কিন্তু সাহায্য করিত তাহারা গরম দলকে। শেষ মীমাংসা তাহাদের ভোটের উপরই সর্ব্বদা নির্ভর করিত। আর তাহারা দলে দলে বিজয়ী পক্ষেই যোগদান করিত। তাহারাই ষোড়শ লুইকে ভার্জ্জিনডের হস্তে, ভার্জ্জিনডকে রবসপীয়রের হস্তে এবং রবসপীয়রকে ট্যালিয়েনের হস্তে সমর্পণ করে। জীবিতাবস্থায় তাহারা ম্যারাটকে তীব্র শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে তাহারা তাহাকে দেবতার আসনে স্থান দেয়। কাল পর্য্যন্ত যাহা তাহারা সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারা অনায়াসেই তাহা উল্টাইয়া দিতে পারে। পতনোন্মুখ পদার্থকে শেষ ঠেলা দিবার একটা প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে যেন অন্তর্নিহিত ছিল। তাহারাই ছিল সংখ্যা, সুতরাং তাহারাই শক্তি, এবং তাহাদিগকেই ভয়। ঘৃণ্য দুঃসাহসিকতা তাহাদেরই। ৩১শে মে, ১১ই টার্মিনেল এবং ৯ই থার্মিডরের ট্র্যাজিডির জটিল গ্রন্থি—যাহা অসাধারণ মনীষী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার উন্মোচন হইল এই স্বল্পবুদ্ধি বালখিল্যগণের দ্বারা।

চ

এই সব উত্তেজনাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আবার অনেক কল্পনা-প্রবণ লোকও ছিল। তাহারা সর্ব্বপ্রকার আদর্শ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিত। কোনো কাল্পনিক রাষ্ট্র যুদ্ধপরায়ণ—তাহাতে বধ্যমঞ্চের বিধান ছিল; কোনটি বা শান্তিপ্রিয়, তাহাতে প্রাণদণ্ডের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্ণটের মস্তিষ্ক চতুর্দ্দশ সেনাদলের সংগঠনে নিযুক্ত ছিল; ওদিকে ঝ্যাডেব্রির প্রতিভা বিশ্ব-গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত। একদল যেমন সংগ্রামে প্রমত্ত ছিল, আর একদল তেমনি সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। কাহারও মাথায় যুদ্ধ, কাহারও মাথায় শান্তির খেয়াল।

প্রচণ্ড বক্তৃতা এবং তীব্র চীৎকার ও কোলাহলের মধ্যেও এমন কেহ কেহ ছিল যাহারা চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু

তাহাদের চিন্তাশীল মন পরিণামে ফলপ্রসূ হইত। লাকান্তাল কোনো দিন বক্তৃতা করে নাই, কিন্তু সাধারণ জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি তাহারই চিন্তার ফল। ল্যান্‌থেনাস্ নির্ব্বাক থাকিত,—প্রাইমারী স্কুলগুলির সৃষ্টি তাহারই। রেভেলিয়র লেপোঁ আর একজন, যাহার নির্ব্বাক্ কল্পনা দর্শনকে ধর্ম্মের মর্য্যাদায় উন্নীত করে। আরো কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। গাইটন মরভোঁ হাস্‌পাতালগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবার উপায়চিন্তনে রত ছিল; মেয়ারে বাধ্যতামূলক "বেগার"-প্রথার উচ্ছেদে যত্নবান হয়। 'ঋণের জন্য কারাদণ্ডের প্রথা' যাহাতে উঠিয়া যায় তজ্জন্য সেণ্ট্ আন্দ্রে চেষ্টা করে।

আর্ট সম্বন্ধেও বাতিকগ্রস্ত ক্ষ্যাপার দল ছিল। ২১শে জানুয়ারী, যেদিন বৈপ্লবিকগণ কর্ত্তৃক ফ্রান্সের রাজমস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়—সেদিনও বেজাড নামক একজন প্রতিনিধি রিউবেনের আঁকা একটি ছবি দেখিবার জন্য প্যারিসের এক ক্ষুদ্র গলিতে গমন করিয়াছিল।

কলাবিৎ, বাগ্মী, ভবিষ্যদ্বক্তা, ড্যাণ্টনের মতো শক্তিশালী পুরুষবর্গ, ক্লুটসের মতো শিশুমতি জনগণ, যোদ্ধা, দার্শনিক—সকলেরই লক্ষ্য এক "উন্নতি, উন্নতি।" কিছুতেই তাহারা পশ্চাৎপদ কিম্বা হতোৎসাহ হইত না। "অসম্ভব" কথার মধ্যে সত্যতা কতদূর, সেটা নিঃশেষে পরীক্ষা করিয়া দেখা—ইহাই ছিল কন্‌ভেন্‌সনের একটা বিশেষত্ব। উহার একপ্রান্তে আইনের উপর ন্যস্তদৃষ্টি রব্‌স্‌পীয়র; অপর প্রান্তে কর্ত্তব্যের উপর স্থির-দৃষ্টি কণ্ডর্সে'ট। কণ্ডর্সে'ট সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল; রব্‌স্‌পীয়র কার্য্যতৎপর।

রাষ্ট্রবিপ্লবের দুই স্রোত—জোয়ার এবং ভাঁটা। এই স্রোতদ্বয়ের নানা অংশে নানা ঋতু বর্ত্তমান—চিরতুষার হইতে কুসুমিত বসন্ত পর্য্যন্ত। প্রতি অংশে সেই সেই ঋতুর উপযোগী লোকই জন্মিয়া থাকে—কেহ কেহ উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে ভাসিয়া বেড়ায়, আর কেহ কেহ বা মুহুর্মুহু বজ্রপাতের কন্দুকক্রীড়ার মধ্যে নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে।

ছ

কনভেনসনের যে-কোন অধিবেশন দেখিতে গেলেই শেষ ক্যাপেটের (ষোড়শ লুই) শোচনীয় বিচার-ব্যাপারটা নূতন করিয়া চোখে ভাসিত, এবং মনে হইত তাঁহার বধ্যমঞ্চের কৃষ্ণছায়ায় হলের অভ্যন্তর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ২১শে জানুয়ারীর মর্ম্মান্তিক কাহিনী কন্‌ভেন্‌সনের সকল কার্য্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। আঠার শত বৎসর ধরিয়া প্রজ্জ্বলিত রাজতন্ত্রের অতি প্রাচীন বহ্নিশিখা যাহাদের ভীষণ ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হয়, সেই সকল লোকের নিদারুণ শ্বাস-প্রশ্বাসে এই প্রবলপ্রতাপ জাতীয় মহাসমিতির বিশাল কক্ষ সর্ব্বদাই পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। এই এক রাজার বিচারে যেন ইউরোপের রাজন্যবর্গের সকলের শেষ-বিচার হইয়া গেল, এবং অতীতের বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল সেইদিন হইতে তাহার গতি নূতন পথে পরিবর্ত্তিত হইল। সেদিন ক্রুদ্ধ উত্তেজিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যাহাদের মুখ হইতে বাক্যের অগ্নিঝলক উদ্গারিত হইয়া অসহায় রাজতন্ত্রকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়াছিল, দর্শকগণ তাহাদিগকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিত। 'গ্যারোনে' ডিষ্ট্রিক্টের সাত জন প্রতিনিধিকে যখন ষোড়শ লুইর সম্বন্ধে 'রায়' দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, তখন তাহারা পরপর এইরূপ উত্তর দেয়:—

মেল্‌হে	—	"মৃত্যু"
ডেল্‌মাস্	—	"মৃত্যু"
প্রোজিয়েন	—	"মৃত্যু"
কালে	—	"মৃত্যু"
আইরল	—	"মৃত্যু"
জুলিয়েন্	—	"মৃত্যু"
ডেসাবি	—	"মৃত্যু"

ল্যাগানেল্ বলিল—"মৃত্যু!—রাজা দেশের কাজে লাগিতে পারে কেবল মৃত্যুদ্বারা।" মিলড—"মৃত্যু বলিয়া কিছু না থাকিলে তাহা আবিষ্কারের প্রয়োজন হইত।" বৃদ্ধ রাফোঁ ড্য টুইলেট—"আশু মৃত্যু।" গুপিলো—"বধ্যমঞ্চে এক্ষুণি, বিলম্বে কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়ানো হইবে।"

সাইয়ের উক্তি শেষকৃত্যের মতোই সংক্ষিপ্ত—"মৃত্যু।" থুরিয়ো—যে জনসাধারণের নিকট লুইএর আপীল করিবার প্রস্তাব এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে—"কি! প্রাথমিক সমিতির নিকট আপীল! চল্লিশ হাজার বিচার-আদালত! মোকদ্দমার যে আর শেষ হইবে না। ষোড়শ লুইয়ের মস্তক যে পতনের আগেই শুভ্র হইয়া যাইবে।" রব্‌স্পীয়রের ভ্রাতা আগষ্টিন্ রব্‌স্পীয়র বলিল, "যে মানব-প্রেম জনসাধারণকে হত্যা করে আর অত্যাচারীকে ক্ষমা করে—আমি তার ধার ধারিনে। মৃত্যু!" কুসিঁভর—"নররক্তপাতে আমার আতঙ্ক হয়—কিন্তু রাজার রক্ত তো আর মানুষের রক্ত নয়—মৃত্যু।" সেন্ট্ আন্দ্রে—"অত্যাচারীকে বধ না করিয়া কোনো জাতি কখনো স্বাধীন হইতে পারে না।" লেভিকণ্টারি—"অত্যাচারীর বাঁচিয়া থাকার মানে স্বাধীনতার শ্বাস-রোধ—মৃত্যু।"

তারপর "নরম" দল। জেটিল—যে বলিয়াছিল, "আমার ভোট কারাদণ্ডের পক্ষে। লুইকে প্রথম-চার্লস্ ক'রে তোলা মানে আবার ক্রমোয়েলের সৃষ্টি করা।" বাক্কাল—"নির্ব্বাসন। আমি দেখ্‌তে চাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা পেটের দায়ে ব্যবসা ক'রে খাচ্ছে।" এ্যালবয়—"নির্ব্বাসন। এই জীবন্ত প্রেতাত্মা যত রাজসিংহাসনের আশে-পাশে ঘুরে' বেড়াক্।" জোলিয়া কমি—"কারাদণ্ড। ক্যাপেট বেঁচে থাকুক্—সে লোকের জুজু হ'য়ে উঠ্‌বে।" চ্যালন—"তাকে বাঁচতে দাও। মৃত্যুর পর যে লোকে তাকে দেবতা ক'রে তুল্‌বে, সেটা আমি ইচ্ছা করিনে।" আর পীড়িত রোলাণ্ড—তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে তাহাকে রোগশয্যায় শয়ান অবস্থাতেই এসেমব্লিতে বহিয়া আনা হয়—এবং রাজার জীবনরক্ষার জন্য ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ইহজীবনের অবসান হয়। ম্যারাট তাহাতে বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই।

দর্শকগণের চক্ষু আরও একজনকে সেই হলের মধ্যে অনুসন্ধান করিত—ইতিহাস আজ যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, যে সেই সাঁইত্রিশ ঘণ্টাব্যাপী অধিবেশনে ক্লান্ত হইয়া বেঞ্চের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং ভোটের সময় তাহাকে জাগাইয়া দিলে ঈষদুন্মীলিত-নেত্রে "মৃত্যু" এই কথা বলিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়ে।

নির্দ্দয় ওষ্ঠপুটের মধ্য হইতে এই সব দণ্ডাজ্ঞা বাহির হইয়া যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন বিচারালয়ের বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা, বুক-কাটা জামা পরিহিতা রমণীগণ হাতের তালিকায় পিনের খোঁচা দিয়া দিয়া ভোট গণনা করিতেছিল।

ষোড়শ লুইএর দণ্ডাদেশের পর রব্‌স্পীয়র আর আঠারো মাস বাঁচিয়াছিল; ড্যান্টন, পনেরো মাস; ভার্জ্জিনড, নয় মাস; ম্যারাট, পাঁচ মাস তিন সপ্তাহ; লেপেন্‌টিয়র সেন্ট ফার্গো, একদিন।

মনুষ্যের মুখ হইতে দ্রুতনির্গত কি প্রবল ও সাংঘাতিক ফুৎকার!

৩

এই 'মহাসমিতি' যেমন বিপ্লব-বহ্নির বিস্তারসাধিনী, তেমনি আবার ইহা সভ্যতারও জননী। ইহা চুল্লীও বটে, কারখানাও বটে। ইহার বিরাট কটাহের ফুটন্ত বিভীষিকার মধ্যেই ভবিষ্যৎ উন্নতির পরমান্ন সুসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এই প্রলয়ের তিমিরগর্ভ হইতে, এই ঝটিকাতাড়িত মেঘপুঞ্জের কৃষ্ণ যবনিকান্তরাল হইতে নৈসর্গিক নিয়মের মতোই সর্ব্বকালোপযোগী বিধিব্যবস্থার সহস্র কিরণ-রেখা দেশকে আলোকিত করিয়া তোলে। মানবসভ্যতার মহাকাশ এই-সকল কিরণমালায় চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়, পরমতসহিষ্ণুতা, সাধুতা, সত্য, অধিকার-সাম্য এবং উদার জন-প্রীতি, এইগুলিই সেই কিরণ-রেখা। সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার মূল সূত্রটুকু কন্‌ভেন্‌সনের এই ঘোষণার মধ্যে ধৃত রহিয়াছে:—"প্রত্যেক সামাজিক মনুষ্যের স্বাধীনতার শেষ সেইখানে, যেখানে অপর একজনের স্বাধীনতার আরম্ভ।"

দারিদ্র্য অপরাধ নহে—ইহা কন্‌ভেন্‌সনেরই ঘোষণা। অন্ধ ও মূকবধিরগণের প্রতিপালন, পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি পাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ষ্টেটের কর্ত্তব্য—এই মত কন্‌ভেন্‌সনে বিধিবদ্ধ হয়। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, অবৈতনিক জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা—প্রতি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাইমারী

স্কুল, প্রতি বৃহৎ নগরে সেণ্ট্রাল স্কুল, এবং প্যারিশে নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন, সঙ্গীতসমাজ এবং মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বত্র এক আইনের এবং এক প্রকার ওজন-পরিমাপের প্রচলন, দশমিক প্রণালীনুসারে সকল প্রকার গণনার সমীকরণ —এই সবই কন্‌ভেনসনের কার্য্য। রাজ-শাসনে দেশ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল, কনভেনসন তাহার অর্থসমস্যাকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আবার বিশ্বাস জন্মাইতে কৃতকার্য্য হয়। কন্‌ভেন্‌সন্ নিরুপায় বার্দ্ধক্যের জন্য অনাথাশ্রম, পীড়িতের জন্য হাসপাতাল, লোকশিক্ষার জন্য বিবিধ শিল্প-বিদ্যালয় এবং জ্ঞানবিস্তারের জন্য ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করে।

এই মহাসমিতি জাতীয় হইলেও বিশ্বমানবের হিতের প্রতি অন্ধ ছিল না। ইহার এগার হাজার দুই শত দশটি নির্দ্ধারণের মধ্যে তৃতীয়াংশ মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট, বাকী দুই-তৃতীয়াংশেরই উদ্দেশ্য মানব-সাধারণের কল্যাণ।

স্কন্ধের উপর ব্যাঘ্রবৎ ইউরোপীয় নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ এবং অন্তরে মধ্যে ভেণ্ডি-মহাসর্পের দংশন—এতৎসত্ত্বেও কন্‌ভেন্‌সন এই সকল মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ঘ

কি বিচিত্র এবং বিপুল জনগণ-সমারোহ! কন্‌ভেনসনে সকল রকমের লোকই ছিল—মানুষ, অমানুষ, অতিমানুষ। বিরুদ্ধমতের একেবারে জগন্নাথক্ষেত্র। ইহা একাধারে খ্যাতিমান্ প্রবীণগণের সম্মিলন এবং জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খল মজলিস, মন্ত্রণাগৃহ, এবং চৌরাস্তা, বিচারালয় এবং আসামী। গডেট্ সেন্ট-জাষ্টকে বিদ্রূপ করিতেছে, ভার্জিনড ড্যাণ্টনকে অবজ্ঞা করিতেছে, লুভেট রবসপীয়রকে আক্রমণ করিতেছে, বুজো ইপোলিটের উপর দোষারোপ করিতেছে—আর সকলেই ম্যারাটকে অভিসম্পাত দিতেছে। রবসপীয়রের বন্ধু আরমন্‌ভিল্ শক্তি-সাম্যসংস্থাপনার্থ, ষোড়শ লুইএর পরে রবসপীয়রকেও গিলোটিনে দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এই সভাতে সময় সময় এমন সব বাক্য উচ্চারিত হইত যাহাতে বক্তার অজ্ঞাতসারে, বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণীর সুর বাজিয়া উঠিত। এই সকল কথার পরেই এমন সব ব্যাপার ঘটিত যাহাতে মনে হইত ঘটনাস্রোত যেন উক্ত কথাতেই ঘূর্ণীপাক খাইয়া ক্ষুব্ধ এবং দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতের উপরিস্থিত তুষার-শৈল কখনো কখনো একটিমাত্র কথার বায়ু-তরঙ্গাভিঘাতে সঞ্চালিত হয়। একটি বেশী কথার চাঞ্চল্যে সময় সময় পর্ব্বত-চূড়া ধ্বসিয়া যায়। কেহ কথা না বলিলে হয় ত এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। ঘটনারও ক্রোধ আছে, বলা যায়।

কন্‌ভেন্‌সনে কথার অমিতাচার যেন লোকের স্বাভাবিক অধিকারে পরিণত হইয়াছিল। দাবানলের অসংখ্য ফুল্‌কির মতো ক্রুদ্ধ বাক্যাংশগুলি পরস্পর কাটাকাটি করিয়া ছড়াইয়া পড়িত। এস্থলে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

পিটিয়ন।—"রবসপীয়র, এখন আসল কথাটা বল।"

রবসপীয়র।—"আসল কথাটা হচ্চে,তুমি পিটিয়ন। তা'ই ত বল্‌তে যাচ্চি—দেখতেই পাবে।"

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "ম্যারাটের মৃত্যু চাই।"

ম্যারাট।—"ম্যারাট যেদিন মরবে, সেদিন প্যারিস আর থাকবে না। আর যেদিন প্যারিস মরবে, সেদিন সাধারণ-তন্ত্রেরও শেষ।"

বিলড ভ্যারেনিস যেই বলিতে আরম্ভ করিল, "আমাদের ইচ্ছা—" অমনি ব্যারিয়ার তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যে বড় রাজার মতো বহুবচন ব্যবহার করচ?"

লেকয়ণ্টার।—"সাঁদে বৌটের পাদ্রীর নালিশ, বিশপ ফচেট তাকে বিয়ে কর্ত্তে বারণ কচ্ছে।"

জনৈক লোক।—"ফচেটের তো একাধিক উপপত্নী, তবে সে আর-একজনকে পত্নী-গ্রহণে বাধা দিচ্চে কেন? এটা তো মোটেই বুঝতে পারলেম না।"

অপর একজন।—"পাদ্রী, বিয়ে কর।"

গ্যালারিতে উপবিষ্ট দর্শকেরাও এরূপভাবে সভ্যগণের কথাবার্ত্তায় যোগ দিত।

একদিন রবসপীয়র দুই ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করে। বলিবার সময় সে মাঝে মাঝে ড্যাণ্টনের চোখে চোখে চাহিতেছিল—সেই দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। কখনো কখনো বা তাহার

দিকে আড়চোখে তাকাইতেছিল—সে চাহনি আরো মারাত্মক। সাংঘাতিক ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় রবসপীয়র তাহার ক্রুদ্ধ বক্তৃতা শেষ করিয়া আনিল—"ষড়যন্ত্রীদের আমরা জানি, বিশ্বাসঘাতকদের আমরা চিনি, উৎকোচদাতা ও ঘুষখোরেরা আমাদের অপরিচিত নহে। তারা এই সভাতেই রয়েচে। তারা আমাদের কথা শুনচে, আমরা তা'দের দেখতে পাচ্ছি; তা'দের থেকে আমাদের দৃষ্টি অপসারিত হয়নি। উপরের দিকে চাইলে তারা দেখতে পাবে তাদের মাথার উপরে আইনের তরবারি ঝুলচে; আর অন্তর-মধ্যে চাইলে তারা দেখতে পাবে, সেখানে নিজেদেরই কলঙ্কিত মূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে। এখনো তাদের সতর্ক ক'রে দিচ্চি।—সময় থাকতে সাবধান!"

রবসপীয়র বসিয়া পড়িলে ড্যান্টন ছাদের দিকে চাহিয়া আসনে হেলান দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতার আবৃত্তি করিল।

এই সব লোক যেন বাষ্পের রাশি—উচ্ছৃঙ্খল বায়ুবেগে দিকে দিকে বিধূনিত হইতেছিল।

এ

কিন্তু এই বাত্যাটি ছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

কনভেনসনের এক একজন সদস্য মহাসমুদ্রের এক একটি উর্ম্মি মাত্র। একথা সদস্যগণের মধ্যে অতিমাত্র ক্ষমতাশালীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে শক্তিতে এই মহাসভা পরিচালিত হইত তাহা অপার্থিব। কনভেনসনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি সকল সদস্যের ইচ্ছার সমষ্টি বটে, কিন্তু ইহা কোন একজনের বিশেষ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নহে। সেই ইচ্ছাশক্তির সমষ্টি একটা দুর্দ্দম্য এবং অমিতপরাক্রম 'আইডিয়া'—যদ্দ্বারা দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইত। ইহারই নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। এই আইডিয়ার প্রভাবে কাহারও মহাপতন, কাহারও বা উন্নয়ন সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রবাহের প্রবল বেগ কাহাকেও ফেনপুঞ্জের মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইত, কেহ বা মগ্ন শৈলে আহত হইয়া নিমজ্জিত হইত। এই রাষ্ট্রবিপ্লবকে মানুষের উপর আরোপ করা, আর মহাসমুদ্রের প্রবহমান স্রোতকে তরঙ্গের উপর আরোপ করা একই কথা।

মানুষের পরিমিত জ্ঞান সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত যে মহাশক্তির ধারণা করিতে পারে না, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সেই মহাশক্তির কার্য্য। ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে ইহাকে ভাল বলিতে হয়, অতীতের দিকে চাহিলে ইহাকে মন্দ বলিতে হয়। কিন্তু ভালই বলি, আর মন্দই বলি—ইহা যে ভূমারই বিকৃতি তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্য বলিয়া বোধ হইলেও রাষ্ট্রবিপ্লবটা বস্তুতঃ ঘটনাসমষ্টির ফল। বিধান করে ঘটনায়, আর তার ফল ভোগ করে মানুষে। আদেশ দেয় ঘটনায়, মানুষ সুধু তাহাতে স্বাক্ষর করে। ১৪ই জুলাইএ ক্যামিল-ডেস্‌মুলিনের স্বাক্ষর; ১০ই আগষ্টে ড্যান্টনের স্বাক্ষর; ২রা সেপ্টেম্বরে ম্যারাটের স্বাক্ষর; ২১শে সেপ্টেম্বরে গ্রেগয়রের স্বাক্ষর; ২১শে জানুয়ারিতে রব্‌স্পীয়রের স্বাক্ষর। কিন্তু ডেস্‌মুলিন, ড্যান্টন, ম্যারাট, গ্রেগয়র এবং রব্‌স্পীয়র—ইহারা লিপিকর মাত্র। মানবীয় জ্ঞানের অতীত যে বিরাট পুরুষ আসলে এই মহাগ্রন্থের অদ্ভুত পৃষ্ঠাগুলির লেখক তাঁহার নাম বিধাতা এবং নিয়তি তাঁহারই মুখোস। রব্‌স্পীয়র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত।—হাঁ, ঠিকই ত।

বিপ্লবটা একটা চিরন্তন ব্যাপার—যাকে আমরা 'প্রয়োজনের তাগিদ' বলি। ইহা হইতেই জগতের সুখদুঃখের রহস্যময় জটিল সমস্যা। ইতিহাসের "কেন"র উত্তরও এইখানেই।

সভ্যতাবিধ্বংসী অথচ সভ্যতার পুনরুজ্জীবনকারী এই সকল গভীর সমস্যাপূর্ণ যুগপরিবর্ত্তনসংসাধক ঘটনাপুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া চুলচেরা সমালোচনা করিতে স্বতঃই দ্বিধা উপস্থিত হয়। এই মহাবিপ্লবের ফলাফলের জন্য মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা করা, যোগফলের জন্য সংখ্যাগুলিকে দায়ী করারই অনুরূপ হইবে। যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। যে ঝটিকা বহিয়া যাওয়া উচিত, তাহাই বহিয়া যায়—তাহাতে গৌরীশঙ্করের অটল গাম্ভীর্য্য এবং চিরশান্তি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না।

পৃথিবীর ঝড়-ঝঞ্ঝার বহু ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত আকাশ যেমন সর্ব্বদাই ঝল্‌মল্ করে, শত রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায়ের জ্যোতি তেমনই চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

কনভেনসন বাতাসের সম্মুখে সর্ব্বদাই অবনত হইত। কিন্তু সেই বাতাস প্রকটিত হইত জনগণের মুখ হইতে এবং তাহা বহুবক্ত্র ভগবানেরই নিঃশ্বাস। আজ যদিও বহু বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে তবু কনভেনসনের কথা মনে উদিত হইলেই কি ঐতিহাসিক কি দার্শনিক সকলকেই চুপ করিয়া ভাবিতে হয়। সেই সব ছায়ামূর্ত্তির বিরাট বাহিনীর সম্মুখে অবহিতচিত্তে স্তব্ধ হইয়া না থাকা অসম্ভব।

কনভেনসন ছিল এইরূপ—অমিত এবং অপরিমেয়। ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

২

কন্‌ভেন্‌সনে ম্যারাট্

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, রু দ্য প্যাঁওর পানাগার হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ম্যরাট সাইমন এভ্‌রার্ডকে জানাইয়া যায় যে পরদিন তাহাকে কন্‌ভেন্‌সনে যাইতে হইবে। তদনুসারে পরদিন পূর্ব্বাহ্নেই ম্যারাট কনভেনসনে উপস্থিত হইল।

লুই ডি মণ্টাউট নামে ম্যারাটের পক্ষাবলম্বী একজন মার্ক্‌ইস্ কন্‌ভেন্‌সনের সদস্য ছিলেন। ইনিই পরে ম্যারাটের আবক্ষ প্রতিকৃতিশোভিত একটি দশমিক পদ্ধতির ঘড়ী কন্‌ভেন্‌সন্‌কে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ম্যারাট যখন কন্‌ভেন্‌সনে প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময়ে চ্যাবট, ডি মণ্টাউটের সমীপস্থ হইয়া বলিতেছিল—"ওহে ভূতপূর্ব্ব—"

মণ্টাউট চোখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, "আমাকে 'ভূতপূর্ব্ব' ব'লে সম্বোধন করচ্ কেন?

"কারণ, তুমি তাই।"

"আমি?"

"তুমি ইতিপূর্ব্বে একজন মার্ক্‌ইস্ ছিলে না?"

"কখনই না।"

"বাঃ!"

"আমার পিতা ছিলেন সৈনিক পুরুষ, আর আমার পিতামহ ছিলেন তন্তুবায়।"

"এ আবার কোন্ পালার অভিনয় হচ্ছে, মণ্টাউট?

"আমার নাম তো মণ্টাউট নয়।"

"তবে কি?"

"ম্যারিবন।"

"তা' যাই হোক, আমার কাছে সবই সমান।" —চ্যাবট বলিল। তার পর আপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "দেখ্‌চি, লোকটা কিছুতেই নিজেকে মার্ক্‌ইস্ ব'লে স্বীকার করবে না।"

ম্যারাট বাম দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উভয়কে লক্ষ্য করিতেছিল।

ম্যারাট যখনই কন্‌ভেনসনগৃহে প্রবেশ করিত তখনই সদস্য ও দর্শকগণের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ হইত—তবে সেটা প্রায়ই একটু দূরে হইত। তাহার আশেপাশে লোকে চুপ করিয়াই থাকিত। ম্যারাট ইহাতে কান দিত না। খানাডোবার ভেকের মক্‌মক্কানি সে গ্রাহ্য করিত না।

অন্ধকারময় নিম্নসারির বেঞ্চে উপবিষ্ট কতিপয় দর্শক ম্যারাটকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলাবলি করিতেছিল।

"দেখ্‌চ,—ম্যারাট!"

"তা' হ'লে তা'র অসুখ করেনি?"

"অসুখই বটে, দেখ্‌চ না ড্রেসিং গাউন প'রে এসেছে।"

"ড্রেসিং গাউন্ প'রে?"

"তাই তো দেখচি!"

"বড্ড তো বাড়াবাড়ি!"

"ড্রেসিং গাউন্ প'রে কন্‌ভেন্‌সনে আস্‌তে তার সাহস হয়?

"একদিন যখন সে পাতার মুকুট মাথায় দিয়ে আস্‌তে পেরেছিল, তখন আর একদিন ড্রেসিং গাউন প'রে আস্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

ধৃষ্টতার চূড়ান্ত।"

অন্যান্য বেঞ্চে উপবিষ্ট লোকেরা ম্যারাটের দিকে তাকাইল না—তাহারা তখন তাহাকে দেখিতেই পায় নাই। তাহারা অন্যবিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল।

ব্যারিয়ার (ষোড়শ লুইর বিচারকালে যিনি প্রেসিডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন) একটা রিপোর্ট পাঠ করিতেছিল। রিপোর্টটা ভেণ্ডি সম্বন্ধে। মর্‌বিহানের নয় শত লোক কামান লইয়া নেণ্টিজের সাহায্যার্থ রওয়ানা হইয়াছে। রেডন কৃষকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। প্যামবুফ আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রমণ-প্রতিরোধার্থ নৌবাহিনী মেইন্‌ড্রিনের নিকটে পাহারা দিতেছে। লয়ের নদীর সমগ্র বামকূল রাজপক্ষের কামান-বন্দুক-সঙ্গীনে কণ্টকিত। তিন হাজার কৃষক পর্ণিক দখল করিয়াছে। মুখে তাহাদের জয়ধ্বনি—"ইংরাজ দীর্ঘজীবী হোক্!" সাণ্টারে কন্‌ভেন্‌সনের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে ব্যারিয়ার তাহাই পাঠ করিতেছিল। চিঠির সমাপ্তিটা এইরূপ—

"সাত হাজার কৃষক ভ্যানেস আক্রমণ করে। আমরা তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছি এবং তাহাদের চারিটা কামান আমাদের হস্তগত হইয়াছে—"

কে একজন বলিয়া উঠিল, "আর বন্দী কয়জন?"

ব্যারিয়ার পড়িয়া গেল, "পুনশ্চ—আমাদের কোন বন্দী নাই, কারণ এখন আর আমরা বন্দী করি না।"

ম্যারাট নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় নাই, কারণ বিষয়ান্তরের ভাবনায় পূর্ব্ব হইতেই সে অন্যমনস্ক ছিল।

চ্যাবট এবং মণ্টাউট যেখানে কথোপকথন করিতেছিল, ম্যারাট ধীরে ধীরে সেখানে উপনীত হইল। তাহারা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

চ্যাবট বলিতেছিল, "ম্যারিবন, কিংবা মণ্টাউট, শোনো। আমি এই মাত্র 'কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি' থেকে আসচি।"

"কি হচ্চে সেখানে?"

"একজন অভিজাতের উপর নজর রাখবার জন্যে তারা একজন পাদ্রীকে পাঠাচ্চে।"

"হুঁ।"

"তোমার মতো একজন অভিজাত—"

বাধা দিয়া মণ্টাউট বলিল, "আমি অভিজাত নই।"

"পাদ্রীর নজরবন্দী হ'লে—"

"তোমার মতো পাদ্রী!"

"আমি পাদ্রী নই।"—চ্যাবট বলিল।

দুইজনই তখন হাসিয়া উঠিল।

মণ্টাউট বলিল, "কথাটা খোলসা কর।"

"বলচি। সিমুর্‌দান্ নামে একজন পাদ্রী পূর্ণ ক্ষমতাসহ গভেন নামে একজন ভাই-কাউণ্টের নিকট প্রেরিত হচ্চে। এই ভাই-কাউণ্ট উপকূলরক্ষী সৈন্যদলের তল্লাসী বিভাগের অধ্যক্ষ। সম্ভ্রান্ত-বংশীয়টি কোনো চালাকি খেলতে না পারেন এবং পাদ্রীটি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা না করেন—এইটিই সমস্যা।"

মণ্টাউট উত্তর করিল, "এ তো খুব সহজ। এই ব্যাপারের মধ্যে শুধু মৃত্যুকে নিয়ে এলেই হয়।"

এই সময়ে ম্যারাট বলিয়া উঠিল, "আমি তা'র জন্যেই এসেছি।"

তাহারা দুইজনেই ফিরিয়া চাহিল।

চ্যাবট বলিল, "গুডমর্ণিং, ম্যারাট। তোমাকে তো আমাদের সভায় আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।"

ম্যারাট উত্তর করিল, "ডাক্তার যে আমার স্নান-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেচ।"

চ্যাবট বলিল, "স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সেনেকার * মৃত্যু তাতেই ঘটে।"

ম্যারাট ঈষৎ হাস্য করিল। বলিল, "চ্যাবট, এখানে তো কোন নীরো নেই।"

কর্কশকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "আছে বই কি, তুমিই তো রয়েচ।"

---

* সেনেকা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রোম-সম্রাট নীরোর শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। পরে কুসঙ্গীদের প্ররোচনায় নীরো সেনেকার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির করিলে সেনেকা আত্মহত্যা করে। সহজে মৃত্যু হইতেছিল না দেখিয়া সেনেকা অবশেষে এক উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ স্নানাগারে গমন করে এবং তথায় শ্বাসবদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

এই বক্তা ড্যান্টন। তাহাদের পাশ কাটাইয়া সে তাহার উপবেশন-মঞ্চে আরোহণ করিল। ম্যারাট ফিরিয়াও চাহিল না। মণ্টাউট এবং চ্যাবটের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া সে বলিল, "শোনো, আমি একটা খুব গুরুতর বিষয়ের জন্যে এসেছি। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে আজ কনভেনসনে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করতে হবে।"

"আমি পারব না—" মণ্টাউট বলিল, "আমার কথা কেউই শোনে না। আমি যে একজন মার্কুইস।"

"আর আমি,—" চ্যাবট বলিল, "আমার কথাও তো কেউ শোনে না। আমি যে একজন পাদ্রী।"

ম্যারাট বলিল, "আমার কথাও তো কেউ শোনে না। যেহেতু আমি ম্যারাট।"

সকলেই চুপ করিল।

চিন্তামগ্ন ম্যারাটকে প্রশ্ন করা নিরাপদ ছিল না। তবু মণ্টাউট সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যারাট, প্রস্তাবটা কি, যা তুমি পাস করিয়ে নিতে চাও?"

"কোনো সেনাপতি যদি বিদ্রোহী বন্দীকে পালিয়ে যেতে দেয়, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে—এই প্রস্তাব।"

চ্যাবট বাধা দিয়া বলিল, "এ আইন যে পূর্ব্বেই রয়েছে। এপ্রিল মাসে এটা পাশ হয়েছিল।"

"তা হ'লে ওটা না থাকারই সামিল—" ম্যারাট বলিল, "সর্ব্বত্র, সারা ভেণ্ডিময় যা'র খুসী বন্দীদের পালাবার সহায়তা করচে এবং তাদের আশ্রয় দিচ্চে—অথচ তাতে কারু কোন সাজা হচ্চে না।"

"ম্যারাট্, কি হয়েছে, জানো?—ও হুকুমট চলতি নেই।"

"চ্যাবট, এটাকে আবার নূতন করে চালাতেই হবে।"

"নিঃসন্দেহ।"

"আর তা করতে হ'লে কন্‌ভেন্‌সনে বক্তৃতা করতে হবে।"

"ম্যারাট্, কনভেনসনের তো কোন আবশ্যক নেই, 'কমিটি-অব-পাব্লিক্-সেফ্‌টি' হ'লেই যথেষ্ট হবে।"

মণ্টাউট বলিল, "কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি যদি এই হুকুমের ইস্তাহার ভেণ্ডির গ্রামে গ্রামে জারী করে, আর দু'তিনটে কেসে ভালরকম সাজা দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তা হ'লেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।"

চ্যাবট বলিল, "উচ্চপদস্থ লোকের—সেনাপতি-শ্রেণীর লোকের সাজা দেওয়া চাই।"

ম্যারাট বলিল, "হাঁ, তাতে হ'তে পারে।"

চ্যাবট বলিল, "ম্যারাট, তুমি নিজেই যাও; কমিটি-অব-পাব্লিক্-সেফ্‌টিতে গিয়ে এই কথা বল।"

ম্যারাট সোজাসুজি তাহার চোখের দিকে চাহিল। চ্যাবটের পক্ষেও সে দৃষ্টি সহ্য করা কঠিন।

"কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি রব্‌স্‌পীয়রের বাড়ীতে বসে; আমি তো সেখানে যাইনে।"

"আমিই যাব।"—মণ্টাউট্ বলিল।

ম্যারাট বলিল, "উত্তম।"

পরদিন প্রভাতেই 'কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফ্‌টি'র হুকুম ভেণ্ডির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞাপিত হইল,—বিদ্রোহী বন্দীদের পলায়নে যে-কেহ সহায়তা করিবে তাহারই প্রাণ-দণ্ড হইবে। এই হুকুম তো মোটে আরম্ভ। কন্‌ভেন্‌সনকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে দ্বিতীয় বর্ষের ১১ই ব্রুমেয়র তারিখে (অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) ল্যাভাল সহর যখন নগর-তোরণ উন্মুক্ত করিয়া পলায়িত ভেণ্ডিয়ানদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল তখন কন্‌ভেন্‌সন এই হুকুম পাশ করে যে, যে কোনও নগর বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিবে তাহা বিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইবে। ওদিকে ইউরোপের রাজন্যগণের পক্ষ হইতে ডিউক-অব-ব্রান্‌স্‌উইক ঘোষণা করে যে, যে কোন ফরাসী অস্ত্র সহ ধৃত হইবে তাহাকেই গুলি করিয়া মারা হইবে এবং রাজার মাথার একটি কেশও বিচ্যুত হইলে প্যারিসকে সমভূমি করা হইবে।

একদিকে বর্ব্বরতা, অপরদিকে নিষ্ঠুরতা!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রাঁচী—প্রাচীন ও আধুনিক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-ইডি

১

সভ্যতার দোহাই দিয়া আবহমান কাল ধরিয়া জগতে কত যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে আর এখনও হইতেছে তাহার সাক্ষ্য প্রতিদেশের ইতিহাসেই বর্ত্তমান। যে জাতি আপনাকে যতটা সভ্য বলিয়া মনে করিয়াছে সেই জাতি অপর জাতির উপর সেই পরিমাণে অত্যাচার করিয়াছে কিম্বা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং ততোধিক ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকের নিকট জগতে দুই জাতি ছিল, এক গ্রীক্—সভ্য; অপর যাহারা গ্রীক্ নয়—অসভ্য, বর্ব্বর। রোমানরাও যাহারা রোমান নয় তাহাদের ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যেরাও অনার্য্যের উপর কম অত্যাচার করে নাই।—অনার্য্যেরা তাঁহাদের চক্ষে—বর্ব্বর, দস্যু, যবন, ম্লেচ্ছ এবং ঘৃণ্য ছিল। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে দাসব্যবসায়ও এই সত্যেরই প্রমাণ।

Might is right—এই মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক জাতি আপনাদের স্বেচ্ছাচারিতার পূজা করিয়া আসিয়াছে। এই বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ যদিও এই বাক্য মিথ্যা এবং Right is might এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে তবুও কেহই অন্তরে অন্তরে একথা মানিতে প্রস্তুত নয়। তাহা না হইলে প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব ক্ষমতার বৃদ্ধি করিবার জন্য এত উদ্যোগ এত পরিশ্রম করিত না।

এখনও দেখি কলিকাতায় যাঁহারা বরাবর বাস করেন (বিশেষতঃ বাঙালী) তাঁহাদের কেহ কেহ (আশা করি কলিকাতাবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না) আপনাদিগকে অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নতশ্রেণীর মনে করেন। কলিকাতা ব্যতীত অন্যস্থান তাঁহাদের চক্ষে 'পাড়াগাঁ' কিম্বা 'জঙ্গল' এবং তাহাদের অধিবাসীগণ 'পাড়াগেঁয়ে' বা 'জঙ্গলী'—সুতরাং অসভ্য! তাঁহাদের কেহ কেহ রাঁচী আসিলে, রাঁচী সহরের মধ্যে না হোক্, আশে পাশে দিনের বেলাতেও রাজপথে প্রকাণ্ড "হায়না" অথবা "বাঘ" এবং গাছতলায় বসিয়া প্রকাণ্ড "পাইথন" জাতীয় বৃহৎ সর্প দেখিয়াই ক্ষান্ত হন না,—তীরধনুকধারী, মাথায় পালক গোঁজা, প্রায় উলঙ্গ 'বুনো'দের দেখিয়াও ভয়ে আঁতকাইয়া উঠেন। রাঁচী যে একেবারে 'জঙ্গলী' এবং তাহার অধিবাসীগণ (উরাঁও মুণ্ডা প্রভৃতি) নরভোজী (Cannibals) না হইলেও যে নিতান্ত অসভ্য, তাহাই প্রচার করিয়া সকলের মনে বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার করিয়া দেওয়ার মধ্যেও যে প্রাচীন গ্রীকের "Barbarians, helots" এবং ভারতীয় আর্য্যদের 'দস্যু ম্লেচ্ছ যবন" ইত্যাদি ঘৃণাসূচক উক্তিরই প্রতিধ্বনি আছে তাহা অবশ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এ দেশের 'বুনো' অর্থাৎ উরাঁও মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য্য-জাতি যে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও নিতান্ত বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল না, তাহাদের মধ্যেও যে উন্নতপ্রণালীর প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি এবং কৃষিকার্য্য একেবারে অজ্ঞাত ছিল না—এবং তাহা অতি প্রাচীন আর্য্যদিগের অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। আধুনিক সময়েও যে তাহাদের মধ্যে বেশ কার্য্যক্ষম, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তির অভাব একেবারেই নাই তাহাও অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তবে প্রাচীন কালে এবং ইংরাজরাজত্ব আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও, অরণ্য-সমাকুল বলিয়া, বাহিরের সভ্যতা এস্থানে প্রবেশ করে নাই, এবং ফলে এ অঞ্চলের লোকেরা আপনাদের সভ্যতা সম্বন্ধে উন্নতিশীল ছিল না।

এই অঞ্চল পূর্ব্বে 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ অরণ্যসমাকীর্ণ স্থান নামে পরিচিত ছিল। এ স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে 'উরাঁও' ও 'মুণ্ডা'ই প্রধান ছিল। অন্যান্য অনার্য্যেরা (রাঁচীর) প্রায় সকলেই এই দুই জাতিরই শাখা-প্রশাখা। উরাঁও অথবা 'কুরুখ' জাতি দাক্ষিণাত্যের তামিল তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড় জাতির সহিত একই শ্রেণীভুক্ত। মুণ্ডারা, সাঁওতাল হো প্রভৃতি জাতির মত কোল'-শ্রেণীর। ইহারা যে কোন্ সময়ে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে তাহার সঠিক নির্ণয় এখনও হয় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে Pliny ও Ptolemyর সময়েও মুণ্ডারা এস্থানে বাস করিত। Pliny ও Ptolemyর বর্ণিত ইতিহাসে উরাঁওদের নাম নাই, সেইজন্য মনে হয় যে মুণ্ডারা এস্থানে উরাঁওদের পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছে। মুণ্ডাদের কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে মুণ্ডারা এস্থানে আসিবার পূর্ব্ব হইতে 'সাবর' নামক এক জাতি এখানে বাস করিত। তাহাদের বংশধরেরা এখনও এখানে বর্ত্তমান। Plinyর বর্ণিত Monedes এবং Sauri এবং Ptolemy বর্ণিত Maudalai এবং Sutrarai জাতি Palibothra (বর্ত্তমান পাটনা)-র দক্ষিণে বনভূমির অন্তর্গত স্থানসমূহে বাস করিত। চীন পরিব্রাজক হিউএন্ট্-সাং-এর টীকাকার শ্রীযুক্ত Cunninghumএর মতে বর্ত্তমান রাঁচী জেলা Kie-lo-na Su-fa-lo-na অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আবার কর্ণসুবর্ণ অনেকের মতে সুবর্ণরেখা নদীর উৎপত্তি স্থল ও তাহার আশে-পাশের অঞ্চল সমূহে বিস্তৃত ছিল। এই Monedes ও Sauri জাতিই বোধহয় আধুনিক "মুণ্ডা"ও "সাবর" জাতি।

উরাঁওদের কিংবদন্তী হিসাবে, তাহারা এ অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে "রোহতাস গড়ে" ছিল এবং তৎপূর্ব্বে করুখ-দেশ অর্থাৎ মগধের পূর্ব্বভাগে ছিল। এই রোহতাস গড় হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন তাহারা পালামৌ জেলার ভিতর দিয়া রাঁচীর উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া এই স্থানে প্রবেশ করে, তখন এ অঞ্চলে মুণ্ডারা বাস করিতেছিল। উরাঁওরা মুণ্ডাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত ছিল এবং উন্নতপ্রণালীর কৃষিকার্য্য জানিত। এই দুই জাতির কিংবদন্তী হইতে এমন কোনও আভাস পাওয়া যায় না যে এই দুই জাতির মধ্যে কোনও যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। উরাঁওরা বলে, যে এ অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিত, কিন্তু মুণ্ডারা তাহাদিগকে এই সর্ত্তে এখানে থাকিতে দেয়, যে তাহারা যজ্ঞসূত্র ও আচার-বিচার ছাড়িয়া দিবে এবং উরাঁওরা উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া সেই সর্ত্তেই এস্থানে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় থাকিতে স্বীকৃত হয়। উরাঁওদের উত্তর-পশ্চিমাংশ ছাড়িয়া দিয়া মুণ্ডারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়। এখনও রাঁচী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে উরাঁও এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে মুণ্ডার সংখ্যা অধিক। এই দুই জাতির সভ্যতার আদানপ্রদানে এখানে এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিল এবং এই দুই জাতি জঙ্গল-বন পরিষ্কার করিয়া গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

২

প্রাচীন সময়ে যখন উরাঁও মুণ্ডারা ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, কিল্লী বা গোত্রে বিভক্ত ছিল। আবার এক একটি কিল্লীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার থাকিত। এই পরিবার এক এক অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বা 'হাতু' প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক পরিবার তাহাদের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সমষ্টিগত-ভাবে অধিকারী ছিল। এইরূপে যে-পরিবার প্রথম গ্রাম স্থাপন করে তাহাদের "খুঁটকাট্টীদার" এবং তাহাদের স্থাপিত প্রথম গ্রামকে "খুঁটকাট্টীহাতু" বলা হইত। ক্রমশঃ যেমন এক একটি গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তেমনই নিকটস্থ জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া নূতন নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু নূতন নূতন গ্রামের স্থাপয়িতারা "খুঁটকাট্টীহাতু" ও খুঁটকাট্টীদার"কেই প্রধান বলিয়া মানিত এবং সাধ্যপক্ষে তাহাদের পূজাপার্ব্বণ ও মৃতদেহের সংকার "খুঁটকাট্টীহাতু"তেই করিত; কিন্তু

কালক্রমে সুবিধের জন্যই হোক অথবা সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিয়াই হোক্, নূতন গ্রামগুলিতেও 'সর্ণা' (জঙ্গলের একটি ক্ষুদ্র অংশ যেখানে তাহাদের দেবতা—দেও ভূতাদির পূজা করা হয়) ও 'মসনা' (মৃতদেহ সৎকার করিবার স্থান) স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বকালের আর্য্যজাতির মত ইহাদেরও প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে পরিবারবর্গের শান্তি-সুখের জন্য দেবতার পূজা ও আরাধনা, এবং সামাজিক সমস্ত কার্য্য, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি সবই করিতে হইত। ক্রমশঃ গ্রামস্থাপনের পর সমস্ত গ্রামের জন্য সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল কার্য্য করিবার ভার "খুঁটকাট্টীদার"এর কর্ত্তার উপর পড়িল। 'পাহান' নামে তাহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য করিতে হইত এবং সামাজিক নেতা হিসাবে গ্রামের পঞ্চায়েতের (বা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগের সভার) সভাপতিত্ব করিতে হইত। "পাহান" হিসাবে তাহার কার্য্য ছিল পর্ব্বত, প্রস্তর, বৃক্ষ ও ক্ষেত্রাদির অধিপতি ভূত বা দেওএর পূজা করিয়া সমস্ত গ্রামের জন্য মঙ্গল কামনা করা—গ্রামকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য দেওএর প্রার্থনা করা। (ক) গ্রামের পঞ্চায়েৎ বা জনসভার সভাপতি হিসাবে সামাজিক সমস্ত সমস্যার সমাধান—গ্রামের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতির বিচার, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধগামীর শাস্তিবিধান ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত।

যেমন একই স্থানে স্থিরভাবে শান্তিতে বসবাস করিতে করিতে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অভাব ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইতে লাগিল—তেমনই সেই সমস্ত অভাব ও সমস্যার সমাধন করা একই লোক অথবা পরিবারের পক্ষেও ক্রমশঃ অধিকতর কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য নূতন নূতন সম্প্রদায়ও গঠিত হইয়া উঠিল। এইরূপে এক এক শ্রেণীর কার্য্যের জন্য যে দল বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিল তাহারা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে একই কার্য্য করিতে করিতে অবশেষে একটি পৃথক জাতিরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। এমন কি কালক্রমে তাহাদের ভাষা এবং আচার-ব্যবহারে পর্য্যন্ত কতক কতক পার্থক্য আসিয়া পড়িল।

এদিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নূতন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তেমনই নূতন স্থানের অধিষ্ঠাত্রী অপদেবতা ও উপদেবতার সন্তুষ্টির জন্য নূতন নূতন ভাবে ও পদ্ধতিতে পূজারও আবশ্যকতা হইল। সুতরাং একই লোকের পক্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক সমস্ত কার্য্য করাও অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িতে লাগিল; ফলতঃ সামাজিক কার্য্যের জন্য এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নেতৃত্বের জন্য পৃথক লোকের ব্যবস্থা করিতে হইল। এই পঞ্চায়েতের নূতন সভাপতির নাম হইল মুণ্ডা এবং এই মুণ্ডা নাম হইতে শেষে সমস্ত জাতির নাম মুণ্ডা হইল। প্রথম প্রথম মুণ্ডা পাহানের সরকারীরূপে তাহার অধীনে কার্য্য করিত কিন্তু অবশেষে মুণ্ডা স্বাধীন নেতৃত্বই অধিকার করিয়া বসিল।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলেও জানা যায় যে প্রথমে তাহাদের দেশের রাষ্ট্রীয় নেতাকে প্রধান পুরোহিতের অধীনে থাকিত হইত। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যেও ব্রাহ্মণের পদ রাজার অপেক্ষা উন্নত ছিল। প্রাচীন ইয়ুরোপেও পোপের অঙ্গুলি-সঞ্চালনে রাজাকেও রাজ্যচ্যুত হইতে হইত। কিন্তু পরে এই সমস্ত জাতির মধ্যে রাজার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নেতার ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিয়াছিল। তেমনি বোধ হয় কালক্রমে এই মুণ্ডা উরাঁও জাতির মধ্যেও পাহানের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছিল।

পাহান বা মুণ্ডার পদ সাধারণতঃ উত্তরাধিকারী-সূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইত এবং এই উভয়-বিধ নেতৃত্ব খুঁটকাট্টীদার পরিবারের লোকেই পাইত। কিন্তু কোনও পাহান বা মুণ্ডা অযোগ্য বিবেচিত হইলে গ্রামের জনসাধারণ মিলিয়া অন্য পাহান বা মুণ্ডা নির্ব্বাচিত করিত। তবে সম্ভব পক্ষে খুঁটকাট্টীদার পরিবারের মধ্য হইতেই এই নির্ব্বাচনও হইত। পাহান বা মুণ্ডার ক্ষমতা প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত ভাবে খুঁটকাট্টীদার অপেক্ষা অধিক ছিল না।

যখন একই পরিবারের লোক নূতন নূতন গ্রাম

(ক) ইহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করা হইবে।

স্থাপিত করিল এবং প্রতি গ্রামেই ভিন্ন ভিন্ন পাহান ও মুণ্ডা নিযুক্ত হইল, তখন এইরূপে প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলি খুঁট-কাট্টী-হাতুর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না করিয়া একই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমষ্টি লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করিল। এই গ্রামসমষ্টির নাম হইল "পট্টি বা পাড়হা"। যেমন গ্রামের পঞ্চায়েতের নেতারূপে মুণ্ডাকে গ্রামের সামাজিক সমস্যাদির সমাধান করিতে হইত, তেমনি সমস্ত পাড়হার জন্যও এক জন সভাপতির আবশ্যকতা হইল। সমস্ত গ্রামের মুণ্ডা ও পাহান মিলিয়া যে পঞ্চায়েৎ গঠিত হইল সেই পঞ্চায়েতের সভাপতিও একজন নির্ব্বাচিত হইল এবং তাহার নাম হইল মানকি। মানকির পদেও সাধারণতঃ খুঁটকাট্টীদার বংশেরই কেহ নির্ব্বাচিত হইত। কিম্বা খুঁটকাট্টী-হাতুর মুণ্ডাই এই পদে নির্ব্বাচিত হইত। এই মানকিও উত্তরাধিকার-সূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রই হইত। কিন্তু অযোগ্য বিবেচিত হইলে অন্য লোকও এই পদে নিযুক্ত হইত।

উরাঁওরা যখন এ দেশে আসে তখন মুণ্ডা-রাজত্ব এইরূপেই বিভক্ত ছিল। উরাঁওদের অনেকে মুণ্ডা ও পাহানের অধীনেই বাস করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ নূতন গ্রাম এবং পাড়হাও স্থাপিত করিল। উরাঁওদের পাড়হার নেতাকে পাড়হারাজা বলিত। কোনও কোনও উরাঁও-গ্রামে এখনও মুণ্ডাজাতীয় পাহান আছে। বোধ হয় মুণ্ডাদের দেশে মুণ্ডাদের "ভূত-প্রেতাদি"কে সন্তুষ্ট করিতে মুণ্ডারাই সক্ষম এই বিশ্বাসে মুণ্ডাজাতীয় পাহান নিযুক্ত হইত।

এই উভয় জাতির কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে বহুদিন এইরূপ বসবাসের পর তাহারা বুঝিতে পারিল যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়হায় বিভক্ত থাকিলে বাহিরের শত্রু হইতে অথবা পাড়হার অত্যাচার হইতে নিরাপদ থাকা কঠিন। এই জন্য ইহারা স্থির করিল যে, সমস্ত উরাঁও ও মুণ্ডা জাতির মধ্যে একজন নেতা থাকা ভাল। এই স্থির করিয়া সমস্ত পাড়হারাজা ও মানকির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে তাহারা নিজেদের নেতা নির্ব্বাচিত করিল। এইরূপে প্রথম নেতা—প্রধান মানকি নির্ব্বাচিত হইল রাঁচীর দশ মাইল দূরের সুতিয়াম্বা নামক স্থানের মানকি—'মাদ্রা'।

ছোটনাগপুরের বর্ত্তমান রাজাদের বংশ-ইতিহাস হইতে জানা যায় যে 'মাদ্রা'র রাজত্ব খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিল।

প্রথম প্রথম পাড়হারাজা বা মানকির কার্য্য ও দায়িত্ব পাড়হা সম্বন্ধে যেরূপ ছিল, প্রধান মানকির কার্য্য, সমস্ত উরাঁও ও মুণ্ডা রাজ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপই ছিল। যখন একাধিক পাড়হার মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ হইত তখনই মানকি ও পাড়হারাজাদের সভা বসিত, ও এই সভার সভাপতি হিসাবে প্রধান মানকিকে বিচার করিতে হইত; আবশ্যক হইলে পাড়হারাজা বা মানকিকে প্রধান মানকির নিকট সৈন্যসাহায্য এবং সেই সমস্ত সৈন্যের জন্য আহার্য্যও পাঠাইতে হইত। অপর কেহ কখনও প্রধান মানকির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে স্বেচ্ছায় নিজ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া আসিত। কিন্তু কালক্রমে যেমন প্রধান মানকির ক্ষমতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মানকি সত্য সত্যই রাজা হইয়া দাঁড়াইল। স্বেচ্ছায় উপঢৌকন বাধ্যতার রাজস্ব হইয়া দাঁড়াইল। সৈন্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়াইল, এবং যাহাদের নিকট হইতে সাহায্য লওয়া হইত না তাহাদের বৎসরের কোনও সময়ে আসিয়া প্রধান মানকির জমিতে বা বাড়ীতে কাজ করিয়া যাইতে হইত। ইহাই শেষে 'বেগারী' নামে নানা অশান্তির কারণ হইয়াছিল। অপর, প্রধান মানকির দেখাদেখি পাড়হারাজা বা মানকিরাও প্রত্যেক গ্রাম হইতে রাজস্ব ও বেগারী আদায় করিতে লাগিল। ফলতঃ প্রধান মানকি একটি ক্ষুদ্র সম্রাট এবং পাড়হারাজা ও মানকিরা তাহার অধীনে সামন্ত রাজার মত হইয়া উঠিল।

তবে এই পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই এবং এই মুণ্ডাদের রাজত্ব-সময়েও হয় নাই। যখন ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজারা প্রধান মানকির স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখনই এইরূপ বাধ্যতামূলক রাজস্ব-প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল—তাহাও প্রথম প্রথম মুদ্রা-রূপে দেওয়া হইত না। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন হইল ও কেন হইল তাহা ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাগ

জার্ম্মান লেখক—পল হেসী

-গল্প—

অনুবাদক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

["গত যুগের জার্ম্মান লেখকদিগের মধ্যে Paul Heyse বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং সমালোচক Heyse ছোট-গল্পের মধ্যেও নূতন প্রকাশ-রীতি এবং শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। 'The fury'—জার্ম্মান কথাসাহিত্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়া বিবেচিত হয়।"]

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। ভিসুভিয়াসের উপর দিয়া দিগন্তের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত কুয়াসার ঘন আস্তরণ বিস্তীর্ণ।—সাগর-তীরের ছোট ছোট গ্রামগুলি স্তব্ধ, আচ্ছন্ন। ঘুমন্ত শিশুর মত নিঃসীম অম্বুধি শান্ত, স্থির।

সমুদ্রের কিনারায় পাহাড়ের ধারে ধারে জেলের দল শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছে;—কেহ বা জাল টানিয়া তুলিতেছে, কেহ বা খেয়া-নৌকা ভাসাইয়া পার-যাত্রীর অপেক্ষা করিতেছে, কেহ বা নৌকা পরিষ্কার করিতেছে। ইহাদের কর্ম্ম-চঞ্চলতা নিঝুম প্রকৃতিকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

নগরের পুরোহিত আসিয়া মাঝি টোনিওর নৌকায় উঠিলেন;—

—"ভাই, আজকে কি আকাশ সারাদিন এমনি পরিষ্কার থাকবে?"

—"আজ্ঞে হাঁ; সূর্য্য উঠলেই কুয়াসার ঘোর কেটে যাবে। আপনার কোন চিন্তা নেই।"

পুরোহিত নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন—"তা হ'লে আর দেরী কি? যাত্রা করা হোক।"

টোনিও নৌকা ছাড়িতে ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া পাদ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিলম্ব কিসের?"

টোনিও সম্মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"আর একজন যাত্রী আসছে,—ক্যাপ্রি নগরে যাবে,—অবিশ্যি আপনার অনুমতি ছাড়া তাকে আমি নৌকায় নিতে পারবো না।—ওই যে—"

পুরোহিত সম্মুখে চাহিয়া বলিলেন—"এ যে লরেলা! ওর ক্যাপ্রিতে কি প্রয়োজন?"

টোনিও মাথা নাড়িল—সে জানে না।

ক্ষিপ্র-পদে একটি অনতি-যৌবনা ক্ষীণাঙ্গী তরুণী নৌকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পুরোহিত বলিলেন—"সুপ্রভাত লরেলা! তুমি কি আমাদের সঙ্গে ক্যাপ্রি যাবে?"

—"আজ্ঞে হাঁ; যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

—"টোনিওকে জিজ্ঞাসা কর। নৌকা ওর।"

—"আমার কাছে কিন্তু চারটির বেশী পয়সা নেই—এতে কি যাওয়া যাবে?"

—লরেলা পুরোহিতের প্রতি তাকাইয়া বলিল।

টোনিও বলিল—"ও আমার চাই না; ও তুমিই রেখে দাও।"

সে কতকগুলি কাঠের বাক্স সরাইয়া লরেলার বসিবার স্থান করিয়া দিল।

তরুণী ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমি অমনি যেতে চাই না।"

পুরোহিত বলিলেন—"এস এস লরেলা! টোনিও ছেলেটি খুব ভাল; না-হয় বিনি-পয়সায় তোমায় পার কোরে দিলে! এস, উঠে এস।"

তিনি লরেলার হাত ধরিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিয়া বলিলেন—"বোসো এইখানে;—দেখ এরই মধ্যে টোনিও ওর নতুন র‍্যাপারখানা তোমার জন্যে পেতে দিয়েছে।—না টোনিও, এতে লজ্জা পাবার কিছুই নেই; জগতের এই নিয়ম। আঠারো বছরের তরুণীর জন্যে একজন যুবক যে আত্মত্যাগ করতে পারবে, ততখানি সে আর কারুর জন্যেই পারবে না,—সৃষ্টির আদিম দিন থেকে এই স্বাভাবিক নিয়মই চ'লে আসছে........."

ততক্ষণে লরেলা নৌকায় উঠিয়া, টোনিওর র‍্যাপারখানা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া পাদ্রীর পাশে বসিয়া পড়িয়াছে।

টোনিও তাহা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর মুখে নৌকা চালাইয়া দিল।

পুরোহিত এবং তরুণীর মধ্যে তখন কথোপকথন চলিতে লাগিল:—

—"তোমার ছোট্ট পুঁটলিতে কি আছে লরেলা?"

—"শিল্ক্ এবং সুতো। ক্যাপ্রিতে দু'জন খদ্দের আছে; তাদের বিক্রি করব।"

—"সুতো কি তুমি নিজে কেটেছ?"

—"আজ্ঞে হাঁ।"

—"তোমার মা কেমন আছে?"

—"দিন-দিন খারাপের পথেই চলেছেন; জীবনের আশা নেই।"

অন্যান্য সাংসারিক কথাবার্ত্তার পর পুরোহিত বলিলেন—"তোমার বিবাহের কি হোলো? সে শিল্পীর কি আর কোন খবর নেই?—তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে কেন?"

লরেলা বলিল—"তা না করলে সে আমায় বিয়ে কোরে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত—হয় ত বা মেরেই ফেলতো।"

পুরোহিত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"না না, সে কি! কখনো ও-সব মন্দ চিন্তা মনে এনো না। জানো না—তুমি ভগবানের আশ্রিতা—তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারে না? তা-ছাড়া, আমি জানি, সে ছোকরা খুব সৎ এবং ভদ্র—"

লরেলা কতকটা আত্মগতভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমার স্বামীর দরকার নেই,—কোনও দিনই আমি বিয়ে করবনা—"

—"বিয়ে করবে না! এ জগতে তুমি একলা, রক্ষকহীন জীবন-যাপন করবে? তা কখন হয়! কেন বিবাহ করবে না?.........উত্তর দাও।"

লরেলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার কাছে বলতেও কি তোমার সঙ্কোচ বা আপত্তি আছে?"

লরেলা মাথা নাড়িল; এবং পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনমুখে পুরোহিতের প্রতি চাহিল। পুরোহিত বুঝিলেন—নৌকায় অন্য লোক থাকাতে লরেলা বলিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে। তিনি লরেলার নিকটে সরিয়া বসিলেন। লরেলা, তখন, অন্যে না শুনিতে পায় এইরূপ মৃদুকণ্ঠে তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল—

কেমন করিয়া তাহার পিতা প্রতি রাত্রে মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া মায়ের উপর অত্যাচার করিত; কেমন করিয়া মায়ের গোপন সঞ্চিত সামান্য অর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার প্রত্যেকটি অলঙ্কার, এমন কি ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ অবধি তাহার পিতা কাড়িয়া লইয়া যাইত; কেমন করিয়া তাহার মা নীরবে স্বামীর সকলপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া করিয়া ভিতরে ভিতরে ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন—

নারীর প্রতি পুরুষের নির্ম্মম নিপীড়নের সুদীর্ঘ, সকরুণ ইতিহাস!

কাহিনী শেষ করিয়া লরেলা বলিল—"বাবা মারা যাবার সময় মা তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিল বটে কিন্তু তার আচরণে সমস্ত পুরুষ-জাতটার ওপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে; মনে হয়, সকলের প্রকৃতিই অমনি নৃশংস। সেই জন্যেই ঠাকুর, আমি জীবনে কোন পুরুষের কবলে যেতে চাই না।"

নৌকা আসিয়া দ্বীপের ঘাটে লাগিল। পুরোহিত নৌকা হইতে নামিয়া লরেলাকে বলিলেন—"তুমি একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো।"

তারপর টোনিওকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আমি আজ আর বোধ হয় ফিরতে পারবো না; অবশ্য লরেলা

শীঘ্রই ফিরবে;—তুমি ওর জন্তে অপেক্ষা কোরো।"

—"আমি দুপুর অবধি থাকবো; এর মধ্যে যদি তুমি আস......"

লরেলা টোনিওর কথার কোন উত্তর না দিয়াই নগরের অভিমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর আসিয়া সে পথের বাঁকের মুখে পড়িল; ভিন্নদিকে যাইবার পূর্ব্বে পিছনের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, মুখের উপর অপরিসীম বেদনার ছায়া লইয়া টোনিও তাহার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

লরেলা যখন সমুদ্রতীরে ফিরিয়া আসিল তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।

টোনিও ইতিমধ্যে নগরের ভিতর গিয়া আহার সমাধা করিয়া আসিয়াছিল। সস্তাদরে গোটাকয়েক কমলা-লেবু কিনিয়া আনিয়া সেগুলি নৌকার একপাশে ছোট একটি কাঠের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়া সে লরেলার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল।

লরেলা আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকায় উঠিয়া বসিল। টোনিও মৌনমুখে নৌকা ভাসাইল।

লরেলা নৌকার অপরদিকে পাশ ফিরিয়া বসিয়াছিল। টোনিও তাহার মুখের একদিক মাত্র দেখিতে পাইতেছিল,—দ্বিপ্রহরের প্রখর উত্তাপে তাহা রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুকাল নীরবে নৌকা চালাইবার পর টোনিও দাঁড় বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিয়া লেবুর টুকরিটা বাহির করিল; লরেলার দিকে তাহা আগাইয়া দিয়া বলিল—"দু'একটা খাও, তেষ্টা ভাঙবে এখন; বড্ড গরম; আমাদের যেতে হবে বড় কমখানি তো নয়।"

—"তুমি খাও; আমার দরকার নেই।"

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া টোনিও বলিল—"তোমার মায়ের জন্তে গোটাকয়েক নিয়ে যেও; শুনলুম তাঁর বড্ড অসুখ।"

—"বাড়ীতে আমাদের লেবু আছে, আর বাজারও কাছেই; তা ছাড়া মা তো তোমায় চেনে না- যে, তোমার লেবু তাকে দেব।"

—"বেশ তো তুমি আমার পরিচয় দিয়ে দিও।"—টোনিও বলিল।

—"আমি? আমিও তো তোমায় চিনি না।"

টোনিও আর কোন কথা বলিল না;—রাগে, অপমানে, দুঃখে তাহার সর্ব্ব-শরীর জ্বালা করিয়া উঠিল।—লরেলা তাহাকে চেনে না? মিথ্যাবাদী! যতদিন তাহারা এইখানে আসিয়াছে ততদিন ধরিয়া টোনিও তাহার মনস্তুষ্টির জন্ত শত-সহস্র রূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, আর আজ লরেলা তাহাকে চেনে না? টোনিও নীরবে বসিয়া ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

অনুকূল বাতাসে নৌকা ভাসিয়া চলিল। চারিদিকে অটুট নিস্তব্ধতা। টোনিওর সবল হস্ত-নিক্ষিপ্ত দাঁড়ের শব্দ সেই নীরবতার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে কাটিয়া গেলে পর সহসা টোনিও দাঁড় বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আজ এর একটা নিষ্পত্তি কোরে ফেলতে চাই আমি, লরেলা! কিসের জন্ত তুমি আমায় চিনতে চাও না? কেন তুমি আমায় এতখানি অবহেলা কর? আমার মনের কথা অনেক দিন থেকেই তুমি জান, তবে কেন বারবার আমায় এমন জোরে অপমান কর?"

লরেলা স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিল—"অপমান কিছুই তোমায় করিনি কোনও দিন; কেবল জানিয়ে দিয়েছি, কোনও দিন আমি তোমায় স্বামিত্বের আসনে বরণ করে নিতে পারবো না;—কাকে কোনও দিনই পারবো না।"

—"কেন পারবে না?"

—"একথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার আছে ব'লে মনে করি না।"

—"অধিকার নেই ?......"

টৌনিওর কথার ভাবে লরেলা মনে মনে চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল একটা ক্রূর বিষাক্ত হাসিতে তাহা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষিপ্তকণ্ঠে টৌনিও বলিল—"আমার জীবনটাকে আমি কিছুতেই এমন কোরে ব্যর্থ হোতে দিতে পারবো না; আমি আজ এইখানে এই মুহূর্ত্তে আমার অধিকারের প্রতিষ্ঠা করব। তুমি এখন সম্পূর্ণ আমার মুঠোর মধ্যে, সেটা বোধ হয় তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না ?

লরেলা চকিত হইয়া টৌনিওর ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখের প্রতি তাকাইল; বুঝিল, শান্তশিষ্ট টৌনিওর ভিতর হইতে আজ সহসা যে উন্মত্ত পশু জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা তাহার পক্ষে হয় ত সহজ হইবে না।—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে নির্ভীককণ্ঠে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, জানি, এখন আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার কবলে, এখন তুমি আমায় ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতেও পারো; কিন্তু তবুও—"

—হ্যাঁ পারি। কোন কাজ অসম্পূর্ণভাবে করা আমার রীতি নয়। এ বিশাল সমুদ্রের মাঝে দু'জনের স্থান যথেষ্ট আছে—দু'জনে একসঙ্গে ওরই অতলে মায়াপুরীর সন্ধানে যাত্রা করব—আজ, এখুনি !"

টৌনিও ক্ষিপ্ত পশুর মত লাফাইয়া গিয়া লরেলার হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিল;—পরমুহূর্ত্তেই একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল;—তাহার ডানহাতের মণিবন্ধের কাছ হইতে ঘন রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।—লরেলা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ শক্তিতে টৌনিওর হাতের উপর দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল।

লরেলা বলিল—"তোমার অধিকারে আমি!—কোন দিন না।—"

নিমিষের মধ্যে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের জন্ম টৌনিওর বাহ্য-জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল; পরক্ষণেই সচেতন হইয়া উঠিয়া দেখিল—লরেলা তাহার দেহ ভাসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সাঁতার কাটিতেছে।

ক্ষিপ্র-হস্তে দাঁড় তুলিয়া লইয়া টৌনিও তাহার দিকে নৌকা চালাইয়া দিল; ক্ষতস্থান হইতে ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

লরেলার পাশে নৌকা লইয়া গিয়া টৌনিও কাতরকণ্ঠে বলিল—"ভগবানের দোহাই লরেলা, নৌকায় ওঠ! আমার মাথার ঠিক ছিল না তাই তোমায় অপমান করতে উদ্যত হয়েছিলুম। তার জন্যে আমায় ক্ষমা করতেও হবে না; শুধু নৌকায় উঠে এসে নিজের জীবন রক্ষা কর। এখান থেকে ঘাট অনেক দূরে; অমন কোরে পারবে না।—উঠে এস!"

লরেলা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; তারপর নৌকা ধরিল।

দুইজনে আবার নীরবে বসিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। লরেলা নৌকায় উঠিবার সময় নৌকা একপাশে হেলিয়া গিয়া টৌনিওর র‍্যাপারখানা জলে পড়িয়া গিয়াছিল; টৌনিওর দৃষ্টি এড়াইলেও লরেলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

গা মুছিতে মুছিতে সহসা নৌকার তলদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া লরেলা চমকিয়া উঠিল—কাঁচা-রক্তে সে স্থানটা লাল হইয়া উঠিয়াছে; পরক্ষণেই চোখ তুলিয়া টৌনিওর হাতের প্রতি তাকাইয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সহসা তাহার অন্তরের মধ্যে একটা তীব্র অনুশোচনা উঁকি মারিয়া গেল।

মাথায় বাঁধিবার যে বড় রুমালখানা দিয়া লরেলা গা-হাত মুছিতেছিল, সেখানা টৌনিওর দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল—"এইখানা নাও, হাতটা বাঁধ।"

টৌনিও ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লরেলা উঠিয়া আসিয়া রুমালখানা পাট করিয়া টৌনিওর হাতে বাঁধিয়া দিতে লাগিল। দুই-একবার

ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া টোনিও অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

নৌকা ততক্ষণে ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

টোনিও নিজের ঘরের খোলা জানালার ধারে বসিয়া ছিল। রাত্রিকাল। অদূরবর্ত্তী সমুদ্রের দিক হইতে শীকর-বাহী আর্দ্র বাতাস আসিয়া তাহার মাথার চুলের মধ্যে খেলা করিতেছিল। অবসাদ, নৈরাশ্য এবং যন্ত্রণা টোনিওর মুখের সমস্ত কমনীয়তা নিঃশেষে হরণ করিয়া লইয়াছিল।

শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সে সকালের ঘটনার কথাই ভাবিতেছিল—

"লরেলা ঠিকই বলেছে, আমি একটা জানোয়ার; আমার উপযুক্ত শাস্তিই হোয়েছে। কাল তার রুমাল ফিরিয়ে দেব;—আর কোনও দিনও সে আমায় তার সামনে দেখতে পাবে না......"

সে রুমালখানি সযত্নে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়াছিল।

সহসা বাড়ীর দরজায় কাহার পায়ের সাড়া পাইয়া টোনিও ফিরিয়া চাহিল; মুহূর্ত্ত-পরেই লরেলা আসিয়া তাহার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল।

টোনিও বলিল—"রুমাল নিতে এসেচো? কষ্ট কোরে আসবার দরকার ছিল না; কাল সকালেই আমি কারুকে দিয়ে নিশ্চয় পাঠিয়ে দিতুম।"

লরেলা অধীরকণ্ঠে বলিল—"না, না, রুমালের জন্যে নয়। পাহাড়ের ওপর থেকে বেদেদের দিয়ে এই সব পাতা নিয়ে এসেছি—এতে নিশ্চয় তোমার ঘা শীগ্‌গিরই সেরে যাবে। এই দেখ।"

সে তাহার হাতের চুবড়িটার ডালা খুলিয়া কতকগুলি গাছের পাতা বাহির করিল।

টোনিও স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—"এত কষ্ট স্বীকার করবার কি দরকার ছিল—আমি বেশ ভালই আছি; আর এ তো আমার উচিত পাওনাই পেয়েছি। এর জন্য এমন সময়ে তোমার আসবার কিছু দরকার ছিল না। একে তো লোকে না-জেনে কত কথাই বলে—"

—"বলুক, তাদের আমি গ্রাহ্য করি নে; আমি তোমার হাত দেখতে এসেছি আর এই পাতাগুলো তোমার হাতে লাগিয়ে দিতে এসেছি। বাঁহাত দিয়ে এ-গুলো ভাল কোরে লাগানো যায় না।"

—"কিছু দরকার নেই তো! হাত আমার ভালই আছে।"

—"কই দেখি তোমার হাত...ও মাগো! বলছ দরকার নেই? এ যে বড্ড ফুলে উঠেছে—"

—"না না বেশী কিছু নয়; ও-টুকু ফুলো দুদিনেই সেরে যাবে।"

লরেলা ততক্ষণে একটা পাত্রে জল ভরিয়া লইয়া টোনিওর কাছে আসিল; তারপর তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া নিজে তাহার সম্মুখে একটা নীচু চৌকিতে বসিয়া নিপুণা শুশ্রূষা-কারিণীর মত পরম যত্নে টোনিওর ক্ষতস্থান ধুইয়া দিতে লাগিল। টোনিও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্ত বালকের মত বসিয়া রহিল।

হাত বাঁধা হইয়া গেলে পর টোনিও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল—"তোমায় অনেক ধন্যবাদ লরেলা! আমার আর একটি দয়া কর—আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমি যা বলেছি, যা করেছি—দয়া কোরে ভুলে যাও। কেমন কোরে কি যে হোলো তা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারি নি;—কিন্তু তোমার যে কোন দোষ ছিল না—তা বেশ বুঝতে পার্‌ছি। যাই হোক, এর পর তুমি আমার মুখ থেকে বিরক্তিকর কোন কথাই শুনতে পাবে না। আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

টোনিওর কোমলকণ্ঠের ক্ষমা-প্রার্থনায় লরেলা অধীর হইয়া বলিল—"কেন তুমি অত কোরে বলছ—দোষ তো আমারই! আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তোমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার না করলে তো কিছুই

ঘট্‌ত না! তারপর তোমাকে অমন কোরে—"

টৌনিও বলিল—"নিজেকে বাঁচাবার জন্তে যা তুমি করেছিলে—সে ঠিকই করেছিলে। আমার পশুত্বকে বিনাশ করতে ঠিক অতখানিরই প্রয়োজন ছিল। ক্ষমা চাইবার কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তার জন্তে তোমায় ধন্তবাদ;—এই নাও তোমার রুমাল।"

টৌনিও উঠিয়া রুমালখানি পাট করিয়া লরেলার হাতে দিতে গেল; কিন্তু সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল;—তাহার মনের মধ্যে যেন কিসের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহাকে সে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—!

অবশেষে লরেলা কাপড়ের ভিতর হইতে একটি ছোট্ট সুন্দর রূপার ফুলদানি বাহির করিয়া বলিল—"আমার দোষে তোমার র‍্যাপারখানা গেছে। সেখানা তো এখন আমি দিতে পারবো না। তার বদলে তুমি এই ফুলদানিটি নাও—এটি আমার। এইটি বিক্রি কোরে—"

টৌনিও তাহার কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই ও আমি নেব না।"

—"কেন নেবে না? আমি তো তোমায় উপহার ব'লে কিছু দিচ্ছি না। আমি তো তোমার যা ক্ষতি করেছি, তারই পুরণ স্বরূপ—"

কিন্তু টৌনিওর বিহ্বল বেদনাতুর মুখের প্রতি চাহিয়া লরেলা তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না; নতমুখে মাটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণ, কোমলকণ্ঠে টৌনিও বলিল—"লরেলা, তুমি বাড়ী যাও, তুমি আজ আমার জন্তে যে কষ্ট স্বীকার করেছো সে কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব; কিন্তু তোমার জিনিষ আমি নিতে পারবো না। তুমি এখন বাড়ী যাও; জেনে যাও, আর কোনদিন টৌনিও তোমার বিরক্তি-উৎপাদন করতে তোমার সামনে……একি! লরেলা, তুমি কাঁদছ—?"

টৌনিও আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই লরেলা তাহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আমি যে আর সইতে পারছি না গো! কেন তুমি আমায় এমন ভাল কোরে বলছ! কেন আমায় চলে যেতে বলছ! আমি তোমার ওপর অন্তায় করেছি, আমি তোমায় যন্ত্রণা দিয়েছি;—তুমি আমায় শাস্তি দাও, আমায় পীড়ন কর, আমায় দলিত-মথিত কোরে উপযুক্ত দণ্ড দাও! আর, আর…" লরেলার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল—"যদি তুমি আমায় এখনো ভালবাস, তা হ'লে আমায় নাও, আমার ওপর তোমার যথেচ্ছ অধিকার বিস্তার কর,—শুধু এমন কোরে আমায় এখান থেকে চলে যেতে বোলো না—"

অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মুহূর্ত্তকাল টৌনিও বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর লরেলার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—"যদি তোমায় এখনো ভালবাসি! তুমি কি ভেবেছ লরেলা যে আমার এইটুকু ক্ষতের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের সমস্তটুকু রক্তই বার হোয়ে গেছে? কিন্তু লরেলা, এ কি সত্যি!"

অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি টৌনিওর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া লরেলা বলিল—"সত্যি! সত্যিই আমি তোমায় চিরদিন ধ'রেই ভালবাসি। তোমাকে দেখ্‌বামাত্রই মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা অনুভব করতুম ব'লেই তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতুম। কিন্তু এখন থেকে আর কখনো তোমায় দেখে অবহেলা ক'রে মুখ ফিরিয়ে নেব না। এখন থেকে তুমি আমার—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া লরেলা নিজের দুই কুসুম পেলব বাহুর বাঁধনে টৌনিওর গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল;—আবেশে তাহার দুই চোখ মুদিয়া আসিল।

টৌনিওর চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্বসংসার লুপ্ত হইয়া গেল। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়াকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া তাহার ফুল্ল অধরে আপনার ওষ্ঠাধর স্থাপন করিল……

চুব্‌ড়িটি তুলিয়া লইয়া লরেলা বলিল—"এখন আমি যাই, মা হয় ত কত ভাব্‌চেন। তুমি এইবার একটু ঘুমোও;—আর জেনে রাখ, লরেলা তার স্বামীকে ভিন্ন

অপর কারুকে চুমু দেবার অধিকার দেয় না।

ক্ষিপ্র-পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

টোনিও জানালার ধারে আসিয়া বহুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুদূর হইতে সাগরের অশ্রান্ত কল্লোল তাহার কানে কি এক অশ্রুত-পূর্ব্ব রাগিণীর আলাপ বহিয়া আনিতে লাগিল!—তাহারই মূর্চ্ছনার আকাশের প্রত্যেকটি তারকা যেন উদগ্রীব, নিষ্কম্প;—বিশ্ব-প্রকৃতি তন্দ্রালু!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচটি বছর পরের কথা

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আজকে অকারণে
পাঁচটি বছর পরের কথা উঠল জাগি মনে।
তুমি যেন চ'লেই গেছ কোন্ সে অচিন দেশ,
সেথায় তুমি বাসায় থাক—দিব্যি আছ বেশ;
"অফিস-বাবু" দশটা বেলায় যখন চলি' যান
তুমি তখন গাইতে বস' "ঘুমপাড়ানীর গান"।
নিশীথ-নির্জ্জনে
তোমরা দু'টি ব'সে থাক নিদ্রাবিহীন, মুক্ত বাতায়নে॥

যত কথাই বোনা—
সব কথারই গোড়ার কথা একরত্তি দুষ্টুছেলে সোনা!
দুইটি প্রাণের স্নেহের বাঁধন দাপাল ছেলে খোকা—
দুই বছরের দিব্য শিশু দুরন্ত একরোকা!
দুধ খাবে না "মিছলি খাবে", এমনি ধারা পণ,
চোখ বোজে না—তোমরা কথা কইবে যতক্ষণ।
দম্পতি-মাঝখানে
উঠছে বেড়ে এমনি শিশু অশান্ত সে বক্তৃতা না মানে॥

বেলা দুপুর বাজে
তুমি সেদিন ব্যস্ত ছিলে আপন গৃহ-কাজে।
ঘুমটি ভেঙে খোকা তখন হঠাৎ বসি' উঠে'
দুপাট ক'রে খানিকক্ষণেই বুদ্ধি তাহার ছুটে—
ঐ যে খাতা খাটের নীচে ধূলায় আছে ঘিরে'
"ওর ভিতরে কি মিছলি থাকে? দেখলে কি হয় ছিঁড়ে?
সেই যে তোমার "গান"—
এমনি ক'রে খোকা তাহা আজ দুপুরে ক'রলে শতখান্॥

"ক'রলি খোকা কিরে!"
ব'ললে তুমি—"সেই সে খাতা আজকে দিলি ছিঁড়ে'!"
—আমার দেওয়া "গানের খাতা" কীই বা দিত ফল!
আজকে কেন তাহার তরে চক্ষে তব জল!
প্রতি ছেঁড়া পাতার রেখা কইছে যেন কথা;—
আজকে কিসে তোমার বুকে জাগিয়ে দিল ব্যথা?
সুদূর স্মৃতি-কণা—
আজ দুপুরে ক'রলে তোমায় একান্ত উন্মনা॥

কোথায় তখন আমি?
হয় ত বা নাই; নয় ত আছি, ব্যথার পূজায় কাটছে দিবাযামি।
হয় ত বা মোর কাটছে জীবন যেমন-তেমন ক'রে
অখ্যাতা কোন্ পল্লী-মায়ের একটি কোণে প'ড়ে।
নয় ত বা নাই—মিলিয়ে গেছি হাওয়ার সমতুল,
কিন্তু তবু থাকব আমি; এ কথাটি নয়ক যেন ভুল!
সেই সে দুপুর বেলা,
দখিণ হাওয়া হঠাৎ এসে করবে তোমা অস্থিরা চঞ্চলা,
তখন বনে বনে—
তোমার পরশ-গন্ধ নিয়ে মত্ত পবন খেলবে আমার সনে॥

কুচবিহার শিকার-কাহিনী

শ্রীযুক্ত দামোদর দত্ত চৌধুরী

আসামের চিফ কমিশনার স্যর Archdale Earle াহেবের কলাবাড়ী শিকারের জের মিটিতে না মিটিতে দৃষ্টগুণে কুচবিহার হইতে মহারাজা বাহাদুরের (৺ াজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর) শিকারের নিমন্ত্রণপত্র গৌরীপুর াজা বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পত্র লখিয়াছেন,—বাঙলার লাট Lord Carmichæl বাহাদুর দলবলে আসিতেছেন। রাজা বাহাদুর এ সময় শিকারে যাগ দিলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন। 'চোর চায় ভাঙা বড়া',—আমরাও তাই চাই। আমারও মহাসুযোগ ঘটিল। াইকেলের "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায়: দূর তীর্থ-রশনে" কবিতা বাস্তবে ফলিয়া গেল।

যথা সময়ে কুচবিহার অভিমুখে রওনা হইয়া 'লালমণির াট' নামক ই, বি, রেলের ষ্টেশনে সন্ধ্যার পর পৌছান গল। আসাম লাইন খোলার পর এই ষ্টেশনের বহু উন্নতি ইয়াছে। অনেক অফিস বসিয়াছে; কয়েকটা 'ব্রাঞ্চ'লাইন ওয়াতে অল্পদিন মধ্যে ইহা উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের বিখ্যাত রল-ষ্টেশনে পরিণত হইয়াছে। এখান হইতেই কুচবিহার াইবার রেলপথ। ষ্টেশনেই কুচবিহার যাইবার জন্য 'রিজার্ভ' গাড়ী ছিল; রাত্রে যথাসময়ে কুচবিহার যাত্রীগাড়ীর সহিত যাগ করিয়া দিবে। আমরা নিশ্চিন্তমনে ষ্টেশনের এদিক-সদিক বেড়াইয়া ৮টার পর 'রিজার্ভ কারে' আসিলাম। ষ্টশন-প্ল্যাটফর্ম হইতে কিছুদূরে 'সাইড' লাইনে গাড়ী ছিল। সান্ধ্যভোজে ব্যাপৃত হইয়া আমরা আসন্ন শিকার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, এমন সময়ে একখানা রেলগাড়ী এঞ্জিনের ধূম উড়াইয়া ও বাঁশীর চীৎকার করিয়া আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া সুরেশ বাবু বলিলেন, 'ঐ যে কুচবিহারের গাড়ী চলিয়া যাইতেছে। আমাদের গাড়ী উহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিল না? সময় ত হইয়া গিয়াছে।' তিনি কুচবিহারের লোক, তাঁহার কথা শুনিয়া আমাদের ত চক্ষুস্থির। হতভম্ব হইয়া সেই চলন্ত গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম—ক্রমে গাড়ী অদৃশ্য হইল। গাড়ী ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে; বুঝিলাম, আমাদের ফেলিয়া গেল।

রাজা বাহাদুরকে লর্ড কারমাইকেলের নিমন্ত্রিত সভায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনে গিয়া রিপোর্ট করিলে ষ্টেশনমাষ্টার ত অবাক্; বলিলেন, "সে কি! রাজা বাহাদুরের গাড়ী attach করিয়া দেয় নাই?" লাট সাহেবের দরবারে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে শুনিয়া তাঁহাদের চাঞ্চল্য লাগিয়া গেল। কাহার দোষে এরূপ ঘটিল?—তখন ছুটোছুটি অনুসন্ধান চলিল। শেষে উপরি-ওয়ালা আসিয়া অর্ডার দিলেন—শীঘ্রই একখানা স্পেশাল এঞ্জিন লাগাইয়া আমাদের 'রিজার্ভ কার'কে যেন পূর্ব্বগামী গাড়ীর পাছে পাছে লইয়া গিয়া যথাসময়ে কুচবিহারে পৌছাইয়া দেয়। নহিলে ষ্টেশন-staffএর অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্নাম সম্বন্ধে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। ইহাকেই বলে—'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।' আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। অনতিবিলম্বে গাড়ী রওনা হইল। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে ব্রীজের উপর দিয়া যাইবার সময় ও ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় কয়েকটা আলোকরশ্মি দেখা গেল।

আজ যে কৌতুকজনক ব্যাপার ঘটিবে তাহার কথা ভাবিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। রাজা বাহাদুরকে কুচবিহারের গাড়ীতে ষ্টেশনে পৌছিতে না দেখিয়া মহারাজা বাহাদুর নিশ্চিতই দুঃখিত এবং বিস্মিত হইবেন, অথচ আমরা কিছু পরেই সেখানে উপস্থিত হইব।

পূর্ব্বগামী গাড়ীতে রাজা বাহাদুরকে না দেখিয়া অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণকে লইয়া তিনি রাজধানীতে রওনা হইয়াছেন। কিছু পরেই আমরাও গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহারাজার দু'একজন 'এ-ডি-কং' উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বিলম্বের কারণ অবগত হইয়া অবিলম্বে রাজা বাহাদুরকে লইয়া মহারাজার প্রাসাদে উপস্থিত করিলেন। উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার পর মহারাজা বাহাদুর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

রাজধানীতে তখন মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে। নগরী আলোকে উজ্জ্বল। উৎসবসজ্জায় পৌরবর্গ প্রফুল্ল। মুখর বাদ্য-সঙ্গীতে নৈশসমীরণ হিল্লোলিত। মধ্যে মধ্যে আতসবাজীর হাউই-এর চকিত উচ্ছ্বাস নৈশ আকাশমার্গে উল্কা-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

পরদিন রাজধানীর নানা দ্রষ্টব্য স্থান ও প্রাচীন চিহ্ন দেখিয়া কত পূর্ব্ব বৃত্তান্তই না মনে আসিল। রাজা নীলাম্বরের কামতাপুর রাজ্য ধ্বংসের পর কুচবিহার-প্রতিষ্ঠাতা শিশু বিশুর উৎপত্তি ও কার্য্যকলাপ, নরনারায়ণের সময়ে শিলারায়ের অসামান্য সৈনাপত্য ও রণকৌশল, বিজনী রাজ্যের উৎপত্তি, অহমারাজগণের সঙ্গে মিত্রতা, রাণী জয়মতীর কাহিনী, মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ, আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার, বড়পেটার দামোদরদেবের সত্র-কীর্ত্তি, কালাপাহাড়-কৃত কামাখ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস ও নরনারায়ণের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গৌড়ের বাদসাহগণের সহিত সন্ধি, মানসতীর হইতে করতোয়ার তট পর্য্যন্ত কুচবিহার রাজ্যের বিস্তার প্রভৃতি কত ঘটনাই বায়োস্কোপের দৃশ্যের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্মৃতিপটে ছায়াপাত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। কখন যে দিবা শেষ হইয়া আসিল বুঝিতে না বুঝিতে, বৈকালে শিকারভূমির উদ্দেশে মোটরে রওনা হওয়া গেল।

২

রায়ডাক নদীর পূর্ব্ব পারে শালবাড়ী নামক স্থানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারি সারি বিন্যস্ত সুসজ্জিত শ্বেত-পীত শিবিরশ্রেণী। বাসন্তী সন্ধ্যার ম্লান হৈমচ্ছটার বর্ণ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব মাধুরী। সান্ধ্যবায়ু শিবির-শিরে পত পত রবে পতাকা লইয়া খেলা করিতেছে। নদীবক্ষে উর্ম্মিমালার হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য। শিবিরের সম্মুখ দিয়া শ্যাম প্রান্তরে ধূসর পথ। শিবির-দ্বারে নীল-লাল পোষাকে সঙ্গিন ধরিয়া কুচবিহার পুলিস প্রহরা দিতেছে। ক্রমশঃ দেশী-বিদেশী শিকারী ও দর্শকবৃন্দ মোটর-যানে 'ক্যাম্পে' শুভাগমন করিতেছেন। ক্যাম্প-দ্বারে অমাত্যগণের সহিত স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর (Late Rajendranarayan Bhup) অভ্যাগতগণের সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন ও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীরা মহারাজার নির্দ্দেশমত পদোচিত মর্য্যাদাশীল অতিথিদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যাইতেছেন। শিবির-তোরণ দিয়া দূরে প্রকাণ্ড সামিয়ানা (Dining Tent) দেখা যাইতেছে। সম্মুখে সারি সারি বিজলীস্তম্ভে শোভিত প্রশস্ত পথ। উহার দুই ধারে সজ্জিত শিবির-কক্ষ। উত্তর ভাগ লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার সহযাত্রীবৃন্দের ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত সাহেব-মেমগণের জন্য রক্ষিত। দক্ষিণ ভাগ স্বয়ং মহারাজার, আত্মীয়গণের ও দেশীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দ্ধারিত। লর্ড কারমাইকেল ও মহারাজার ক্যাম্প ছাওয়া-কুটীরের (thatched cottage) আদর্শে নির্ম্মিত; ক্যাম্বিসের তাঁবু নহে। আসাম-শিকারে অভ্যস্ত শিকারীরা জানেন যে, ঝড়-বৃষ্টির সময় প্রায়ই তাঁবুগুলি প্রবল বাতাসে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু দেশীয় গোয়ালাদের তৃণ-কুটীর ঝড়ে ও বিষম ঝঞ্ঝায় প্রায়ই অব্যাহত থাকে। এইজন্য কুচবিহারের মহারাজা ও গৌরীপুরের রাজা বাহাদুর যেখানেই শিকার-শিবির স্থাপন করিয়াছেন সেখানেই উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। গৌরীপুর রাজা বাহাদুরের 'ক্যাম্প' কিছুদূরে উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত।

আমরা ক্যাম্পে পৌছিয়া কিছু বিশ্রাম ও জলযোগের পর একবার সমস্ত শিবির-শ্রেণী প্রদক্ষিণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলাম। কোথায় কোন্ শিবিরে কাহারা অবস্থিত হইয়াছেন অবগত হওয়া গেল। বহুদূর ব্যাপিয়া তাঁবুগুলি নদীকূলে বিস্তৃত। আমরা নদীতীরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফিরিলাম। ক্যাম্পে

বিজলী-বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সুদূর নদীতটে ঘন বনরাজি তমসাচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ অরণ্যানী!—একটি পক্ষীর কূজনও শোনা যাইতেছে না। নৈশ আকাশে সান্ধ্যরাগ ক্রমশঃ মিশাইয়া ২।১টি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। Dining Tentএ সান্ধ্যভোজনের 'ব্যাণ্ড' বাজিয়া উঠিল। আমরাও বাসায় ফিরিলাম।

৩

পরদিন ১৩ই এপ্রিল এগারটার সময় দলে দলে মোটরে সাহেব-মেমের দল শিকারভূমির উদ্দেশে রওনা হইলেন। বেলা ৯টার পূর্ব্বেই দার্জ্জিলিঙের বুড়া ফটোগ্রাফার Parr তাঁহার আসবাবপত্র লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে ঢুলিতে ঢুলিতে রওনা হইয়াছেন। আমরাও সজ্জিত হইলাম। ক্যাম্পের দু' মাইল উত্তরে ঘন-ছায়াবিশিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হওয়া গেল। সেখানে ৬৭টা হস্তী প্রস্তুত ছিল; তন্মধ্যে ১৬টির উপর হাওদা ছিল—যাঁহারা শিকার করিবেন তাঁহাদের জন্য। অবশিষ্ট সমস্ত হস্তীর পৃষ্ঠে গদি (Pad) দেওয়া ছিল—উহারা জঙ্গলে বাঘকে খেদাইয়া লইয়া যাইবে। শিকার করিবার হাওদাগুলি কাঠের ফ্রেমে বেতের দ্বারা নির্ম্মিত—হস্তীর পৃষ্ঠে পুরু গদির উপর স্থাপিত,—হাতীর গলদেশ ও লেজের নিম্নদেশের পাছায় কষিয়া বাঁধা। হাওদার ভিতরে সম্মুখ দিকে ফ্রেমের গায়ে কয়েকটা Waterproof apronএর মত আছে—তাহার কয়েকটা পকেটে কার্টিজ রাখিবার বন্দোবস্ত। ভিতরে মাঝখানে গদি-আঁটা বেঞ্চ—তাহার পশ্চাতে চওড়া শক্ত Strap পার্শ্ববর্ত্তী ফ্রেমের গাত্র হইতে লম্বিত ও আঁটা থাকায় হাওদা দু'ভাগে বিভক্ত। ইহাতে শিকারী খুব স্বচ্ছন্দে বসিয়া পশ্চাতে ঠেসান দিতে পারেন। হাওদার ফ্রেমের সম্মুখভাগে নীচের দিকে দুটি পার্শ্বে কিছু ফাঁকা থাকায় শিকারী পদদ্বয় বিস্তৃত করিতে পারেন। ফ্রেমের পার্শ্ববর্ত্তী গাত্রে কয়েকটা Rack থাকায় বন্দুক রাখিবার বিশেষ সুবিধা আছে; প্রয়োজনমত বন্দুক তুলিতে পারা যায়। 'র‍্যাক'গুলির সম্মুখ ভাগ চর্ম্ম দ্বারা জড়িত—তাহাতে বন্দুকের নলী বা চোঙ বেশ ভাল ভাবে রাখা যায় ও নীচে বাক্সের মত সবুজ কাপড়ে জড়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোকর থাকায় তাহাতে বন্দুকের নিম্নভাগ (কুঁদা) খুব ভাল থাকে। হাওদার ভিতরে পশ্চাৎ দিকে ঐ প্রকার আরো একটি বসিবার আসন—ইহাতে পা রাখিবার অপরিসর জায়গা আছে।

যখন আমরা শিকার-জঙ্গলের ধারে পৌছিলাম, তখন দেখি সাহেব ও মেমেরা হস্তীর হাওদার উপর কতক উঠিয়াছেন, কেহবা সিঁড়ি দিয়া হস্তীর উপর উঠিতেছেন। যাঁহারা শিকার করিবেন তাঁহাদের হাওদার পিছনে কেহ কেহ শিকার দেখিবার জন্য উঠিয়াছেন। প্রায় হস্তীতে হাওদার উপর সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট 'সিভিল' ও 'মিলিটারী' (Civil & Military) কর্ম্মচারীবৃন্দ লর্ড কারমাইকেলের হস্তীর পার্শ্বে সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা Stopএ থাকিবেন অর্থাৎ জঙ্গলের একপার্শ্বে কিছু দূরে দূরে লাইন করিয়া শিকার-প্রতীক্ষায় থাকিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত হস্তী লইয়া চালকেরা 'beat' করিয়া লাইনবন্দী হইয়া জঙ্গল খেদাইয়া বাঘকে তাঁহাদের সম্মুখে আগাইয়া দিবেন। প্রথমেই লাট সাহেব ও মহারাজা বাহাদুর এক লাইনে (single line, Indian file) সমস্ত হস্তী লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। দু'জন করিয়া প্রত্যেক হস্তীতে আরূঢ় হইয়া গত রাত্রে যেখানে বাঘ 'মউর' (kill) করিয়াছিল, সেই স্থানে রওনা হওয়া গেল। এখানে অল্প জঙ্গল, মাঝে মাঝে ফাঁকা। কখনও আবাদের পার্শ্ব দিয়া, কখনও ঘন নল-ঘাস-কাঁটাঝোপ-জঙ্গলপূর্ণ নালার ভিতর দিয়া, কখনও খানিকটা ফাঁকা জমিতে উঠিয়া শিকারীদল অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্রগামী হস্তীদল কখনও নলখাগড়া, বড় দলদল-ঘাস ভেদ করিয়া, কখনও ঝোপজঙ্গলের শাখা ভাঙিয়া, শক্ত শিকড় উপড়াইয়া রাস্তা করিয়া যাইতে লাগিল। হস্তীর চলনে দোলনে হাওদার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ও নলখাগড়া ভাঙার মড়্‌মড়্ ও ঘাসের সর সর শব্দ উঠিতে লাগিল।

কিছুদূরে আমরা যখন ঘন জঙ্গলের ধারে যাইতেছি তখন একটা হরিণ ভীত হইয়া লাইনের সম্মুখ দিয়া নিবিড় জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া পলাইতেছিল। হঠাৎ একজন সাহেব দূর হইতে হরিণটা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। হরিণ পলাইয়া গেল। এই শব্দ শুনিবামাত্র মহারাজা বাহাদুর দূর হইতেই

সেই সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "Do you know, game-laws? This is not a shooting-school"। বাঘ-শিকারের জঙ্গলে বাঘের পূর্ব্বেই অন্য কোন জন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ। সাহেব বোধ হয় এ কথা জানিতেন না।

এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ যাওয়ার পর সমস্ত Stopএর হস্তী লইয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী সেই দিকে লর্ড কারমাইকেলের দলকে লইয়া গেলেন। সেখানে কর্ম্মচারীর আদেশে হাতীরা ঘাসের জঙ্গল মাড়াইতে লাগিল, ছোট ছোট গাছ শিকড়শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। এক একটা এক ফুট মোটা গাছ হস্তী বিনা চেষ্টায় উৎপাটিত করিতে লাগিল। এইরূপে কতকটা পরিষ্কৃত জঙ্গলে লাট সাহেব বাঘ-শিকারের জন্য অবস্থিত রহিলেন। অন্য অন্য শিকার-হস্তীরা দূরে দূরে অবস্থিত হইল। অনেকটা ইংরাজী V অক্ষরের মত Stopএর স্থান, মধ্যভাগে লাট সাহেব।

আমাদের লাইনে স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর, গৌরীপুরের রাজা বাহাদুর ও সূর্য্য বাবু (Elephant Superintendent)। লাইনের মধ্যস্থলে মহারাজা ও এক পার্শ্বে গৌরীপুর ও অন্য পার্শ্বে সূর্য্য বাবু—এই তিন জনে সমগ্র হস্তীর লাইন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে লইয়া ব্যাঘ্রের সন্ধানে রওনা হইলেন। এই জঙ্গলটা মহারাজার 'রিজার্ভ ফরেষ্ট'—নানাবিধ গাছপালা, কাঁটাঝোপ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ঘাসের দলে পূর্ণ। এখানে আসামের জঙ্গলের মত তত নলখাগড়ার বেশী জঙ্গল দেখিলাম না।

বহুক্ষণ পরে ব্যাঘ্রের সন্ধান পাওয়া গেল। বাঁশীর দ্বারা সঙ্কেত করিয়া লাইন-চালকেরা বাঘকে ঘেরিবার জন্য লাইন কতকটা সঙ্কুচিত করিতে আদেশ দিলেন। যাহাতে বাঘ লাইন ভেদ (break) করিয়া না পালায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন। কিছু পরেই জঙ্গল প্রায় শেষ হইবার সময়ই আমরা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। পাছে বাঘ গুলি খাইয়া লাইনের মধ্য দিয়া পালায় এজন্য আমরা খুব কাছাকাছি হস্তী লইয়া খুব জোরে বাঘের দিকে ধাবমান হইলাম। আমার মাহুত বলিল, 'বাবু সাহেব, এই হাতীটা বড্ড ভয় পায়, বাঘ দেখিলেই বসিয়া পড়ে।' আমি ত শুনিয়া অবাক! বলিলাম, 'দেখিস, খুব সাবধানে চালাস, হাতী যেন বাঘকে 'সেলাম আলেকম' না করে,—খুব অঙ্কুশ মারিয়া চালা।' ১৩।১৪ হাত উঁচু 'হাতী'-ঘাসের নিবিড় খোবায় কিছুই সম্মুখে দেখা যায় না। ব্যাঘ্র যে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে তাহা বেশ বোঝা গেল। আমি নিরস্ত্র। সাংখ্যের নির্ব্বিকার পুরুষের মত স্থির থাকিতাম—কিন্তু যদি ব্যাঘ্রপ্রবর এক লম্ফে আমার হস্তীর উপর উঠে তবেই ত সমূহ বিপদ! বিশেষ গদীর হাতীতে (Pad Elephant) নিরস্ত্র আসা ঠিক নহে। তবে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমার হাতীটা যেন তাঁহার হাওদার কাছাকাছি রাখি, আর সাহেবদের গুলির Range থেকে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বলা বাহুল্য এই মূল্যবান উপদেশ বহু বৎসর ধরিয়া পালন করিতেছি। ব্যাঘ্র-শিকারের উৎকট উদ্দীপনায় মহাপ্রভুদের হস্তনিঃসৃত গুলির লক্ষ্যভেদ যেরূপ অব্যর্থ দেখিয়াছি তাহাতে সামান্য 'নেটিভে'র একটি ক্ষুদ্র প্রাণ যে বিনা বাক্যব্যয়ে বৃথা নষ্ট হইবে—সামান্য একটি পক্ষীর প্রাণের মূল্য অপেক্ষাও যে উহা অকিঞ্চিৎকর তাহা বিলক্ষণ জানা আছে। 'Mere accident'এর একটা নিরর্থক ফল না হইয়া যাহাতে অষ্টম গর্ভের পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা পায় তাহার জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিকারের তাণ্ডবলীলার সময় সর্ব্বত্র সে সাবধানতা রাখা অসম্ভব। তা ছাড়া এবারকার শিকারে একটি মাত্র ব্যাঘ্রপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় কেবল বড়লোকী (aristocratic) শিকার দেখার আগ্রহ ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বিশেষতঃ সম্প্রতি কয় মাস পূর্ব্বে আসামের চিফ কমিশনার Sir Archdale Earleএর 'কলাবাড়ী' শিকারে * এক পক্ষ মধ্যে ২২টা বাঘ শিকারে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া গিয়াছিল তাহার তুলনায় এই শিকার নগণ্য।

৪

হস্তীগুলিকে খুব জোরে চালাইয়া ব্যাঘ্রের গতিরোধ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ঘন তৃণগুচ্ছে কিছুই

* এই অপূর্ব্ব শিকারকাহিনী 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাগণকে শীঘ্রই উপহার দিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে।

দেখা যাইতেছিল না। দলদল-তৃণরাশিকে হাত দিয়া সরাইয়া ক্রমশঃ ফাঁকা জায়গায় আসিতেই সম্মুখে সারি সারি Stop-এর শিকারীবৃন্দের দর্শন পাইলাম। কিছু পূর্ব্বেই ৩।৪টা গুলির আওয়াজ কানে আসিয়াছিল। আমার সম্মুখেই কিছু বাম ধারে গৌরীপুরের রাজা বাহাদুরকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম একজন সাহেব রাজা বাহাদুরের পিছনে হাওদায় দাঁড়াইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে ঘন ঘন করাঘাত করিতেছেন। বোধ হইল রাজা বাহাদুর কিছু বিরক্ত হইয়াই তাঁহাকে বাংলায় 'থামরে বাবা' বলিয়া চীৎকার করিলেন। আমি দূর থেকেই তাঁকে 'কে বাঘ মেরেছে' বাংলায় জিজ্ঞাসা করাতেই তিনি একটু ইঙ্গিত করিলেন। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 'কে বাঘ মারিয়াছে। পরে জানিয়াছিলাম যে ঐ সাহেবটি ব্যারাকপুর রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন উইনটার (Capt. Winter)। রাজা বাহাদুরের ক্ষিপ্রকারিতা ও একটিমাত্র গুলি দ্বারা ছুটন্ত ব্যাঘ্রকে নিপাতিত করা সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া প্রশংসার বাহাদুরী দিতেছিলেন। চারিদিকেই সাহেব-মেমের দল বিস্মিতনেত্রে মৃত ব্যাঘ্রকে দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজা বাহাদুর পৌঁছিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার গুলিতে বাঘ পড়িয়াছে ?" লাট সাহেবের বাম ধারে Stop-এ যে সাহেবটি বন্দুক-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি মারিয়াছি।" অমনি ২।৩ জন সাহেব ও মেম সমস্বরে তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "না—না —তোমার গুলিতে ধূলি উড়িয়াছে। গৌরীপুর বাঘ মারিয়াছেন।" অবশ্য ইহার পূর্ব্বে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে রাজা বাহাদুরের আলাপ হয় নাই। তিনি মাত্র পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুঝিলাম রাজা বাহাদুরের introduction এই বাঘের দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। সমস্ত Stop-এর হস্তীই নিকটে আসিল। কেহ কেহ হাওদা হইতেই কেহ বা নীচে নামিয়া ফটো তুলিতে আরম্ভ করিলেন। লাট বাহাদুরও নীচে নামিয়া বাঘের নিকট আসিয়া কোথায় গুলি লাগিয়াছে দেখিতে লাগিলেন। বুড়া ফটোগ্রাফার Parr সাহেব এই সময় বড় full plate-এ লাটের সহিত বাঘের ফটো লইল। শেষে শোনা গেল লাট বাহাদুর বাঘ দেখিয়াই গুলি ছোড়েন—গুলিটা লেজের পার্শ্বে লাগিয়াছিল। ব্যাঘ্রশ্রেষ্ঠ আঘাত খাইয়াই গর্জ্জন করিয়া লাইন ভেদ করিত যদি না গৌরীপুরের লক্ষ্য অব্যর্থ থাকিত।

এই ব্যাঘ্র-শিকার কিরূপে হইল তাহা পাঠক-পাঠিকাগণকে সম্যকরূপে প্রণিধান করাইবার জন্য লাট সাহেবের দলস্থ Stop-এর কোন বর্ণনাকারীর কতক অংশ বাংলায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমরা Stop-এ লাট সাহেবের সহিত অর্দ্ধঘণ্টা থাকিবার পর বাঘ, খেদাইয়া আনিবার Beating line stop-এর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। এই অপেক্ষা করিবার সময় হস্তীকর্ণের আস্ফালন-শব্দ ও হস্তীর নিজ গাত্রে শুণ্ডোত্থিত ধূলি বর্ষণ দ্বারা কর্ণ-ঘর্ষণ শব্দ মধ্যে মধ্যে শোনা যাইতেছিল। কখনও বা ময়ূরের কেকা রব বা কোকিলের কুহু রব ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ দূরের চীৎকার ধ্বনি, যতই হস্তীবৃন্দ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ কোন হস্তীর তীক্ষ্ণ বৃংহণশব্দে বায়ু প্রকম্পিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লাইনের অন্যত্রও হস্তীর চীৎকার উঠিতেছিল। চীৎকারবৃদ্ধির সহিত যতই হস্তীব্যূহ ঘনীভূত ও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই স্পষ্ট বোঝা গেল ব্যাঘ্রশ্রেষ্ঠ আগে আগে আসিয়া নদীর দিকে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সেদিকে বাধা পাইল। যে হস্তীবৃন্দ দূরে মসীবিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া পর্ব্বতরন্ধ্র-নির্গত স্রোতের ন্যায় সশব্দে নিকটে আসিয়া V আকৃতি Stop-এর দূরবর্ত্তী দুই বাহুপার্শ্বে শিকারীদের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল। মধ্যকোণে লাট সাহেব অবস্থিত ছিলেন। মাঝে মাঝে হস্তীর চীৎকারে ব্যাঘ্রের নিকট অবস্থিতি বোঝা যাইতেছিল—কখনও জঙ্গলের একটু ফাঁকে ফাঁকে তাহার সলম্ফ অগ্রসর হওয়া দেখা যাইতেছিল।

"লাটপত্নীর হস্তীর বিশহাত দূর দিয়া ব্যাঘ্র যাইতেছিল, কিন্তু তিনি শিকারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—তবে ব্যাঘ্রকে প্রাকৃতিক অবস্থায় (on natural) দেখিলেন। অমনি লাট সাহেবের দুই গুলি উপর্য্যুপরি ছুটিল। ব্যাঘ্র কাৎ হইয়াই পশ্চাৎভাগে প্রায় ২০০ হাত দূরে হস্তী-রেখার দিকে দৌড় দিল। জেনারেল মেহন সাহেবের গুলির শব্দে এই দৌড় আরও বাড়িল। মেহন সাহেব লাট সাহেবের পার্শ্বে ছিলেন। ব্যাঘ্র হস্তীরেখার দিকে ধাবমান হইয়া কাছে যাইতেই সেখানে মহা কলরব পড়িয়া গেল—হস্তীবৃন্দ ভয়ে পলায়নের উদ্যোগ করিল। সৌভাগ্যক্রমে গৌরীপুর রাজা বাহাদুরের সুনিপুণ লক্ষ্যভেদে

'Lethal' গুলি ঘাড় বিদ্ধ হইয়া ব্যাঘ্র নিপতিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটা হস্তীকে উহা আক্রমণ করিতে যাইতেছিল। ব্যাঘ্রের আক্রমণ ও গুলির আওয়াজে সকলেই সেখানে উপস্থিত হইয়া বঙ্গ-বনভূমির পশুরাজকে দেখিতে লাগিলেন। কি সুন্দর মহান আকৃতি!"

নিহত বাঘটির ওজন ৪৯৫ পাউণ্ড। মাপ—লেজের ডগা হইতে নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত ৯ ফুট ২ ইঞ্চি। লাঙুল ব্যতীত ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। সম্মুখ বাহুর উপর বেষ্টনী (girth of the fore-arms) ২০ ইঞ্চি। পদতল হইতে স্কন্ধের উপরিতল (heights) ৩৮½ ইঞ্চি।

ব্যাঘ্র-শিকারের মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমাদের উত্তেজনার নিবৃত্তি হইল। আমরা ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। কিছু পরেই নিহত ব্যাঘ্রকে আনা হইল। তাহার ছাল ছাড়ান হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু চাষীরা বাঘের চর্ব্বি যাচ্ঞা করিতে লাগিল—উহা বাত রোগের বিশেষ ঔষধ।

শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী

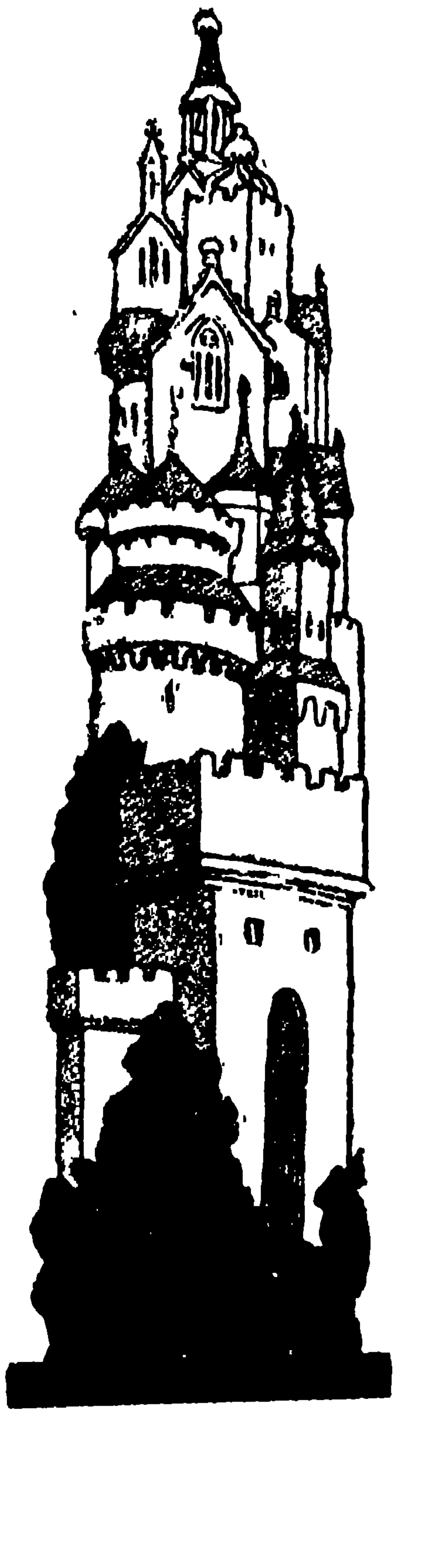

বিদেশের গল্প

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র এম-এ

ক

সম্প্রতি বিলেতের সাহিত্য সমাজে একটা মহৎ প্রশ্ন উপস্থিত;—"ইংরাজদের একটা national theatre প্রয়োজনীয় কি না।" জার্ম্মানির national theatre আছে, ফ্রান্সের আছে, বেল্‌জিয়ামের আছে এবং আছে আইসল্যাণ্ডের। বিলেতের কোনো দিন ছিল না, থাকা উচিত কি না এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সবচেয়ে অধিক মূল্যবান মত বার্ণার্ড শ'র। ইনি এক সভায় বলিলেন, "ভাই ইংরাজ! তোমাদের দেশে fine art-এর অর্থ লোহা এবং কয়লা। কেন এত অনর্থক বিবাদ? national theatre তোমাদের জন্য আমি চাই,—কারণ আর কোথাও আমার নাটকগুলি বরাবরই অভিনীত হইতে পারে না;—কিন্তু national theatre তোমাদের হইবে না।" এ সভায় আইসল্যাণ্ডের national theatre-এর এক অভিনেত্রী বলিলেন, "ইংরাজদের একটা নিজের জাতীয় নাটকালয় হ'ক—এ আমার শুভাকাঙ্ক্ষা।" ক্ষুদ্র একটা দেশের অভিনেত্রীর এমন অভিভাষণে বিশ্বজেতা ভাই ইংরাজের একটু লজ্জাবোধ হইল।

* *
*

খ

প্রতি দশ বৎসর পর, জার্ম্মানির Bavarian Alps-এর একটা গ্রামে এক অপূর্ব্ব নাটকাভিনয় হয়। নাটকের নাম —Passion Play; বিষয়—খ্রীষ্টের জীবনী; অভিনেতা-অভিনেত্রী—গ্রামের নরনারীগণ; সীন-সীনারী—বাস্তব প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই অভিনয়ে কোন কৃত্রিমতা নেই। রঙ্গমঞ্চ সুদীর্ঘ পর্ব্বতের কোলে মুক্ত আকাশের নীচে অবস্থিত। দর্শকের জন্য একটা প্রকাণ্ড হল। বৃষ্টি বাতাসের সময় দর্শকরা এখানে আশ্রয় পান,—কিন্তু অভিনয় হয় মুক্ত আকাশের নীচেই। সূর্য্যের আলোক এমন অভিনয়ে যত সহায়তা করে, তার চেয়ে বেশী সহায়তা করে

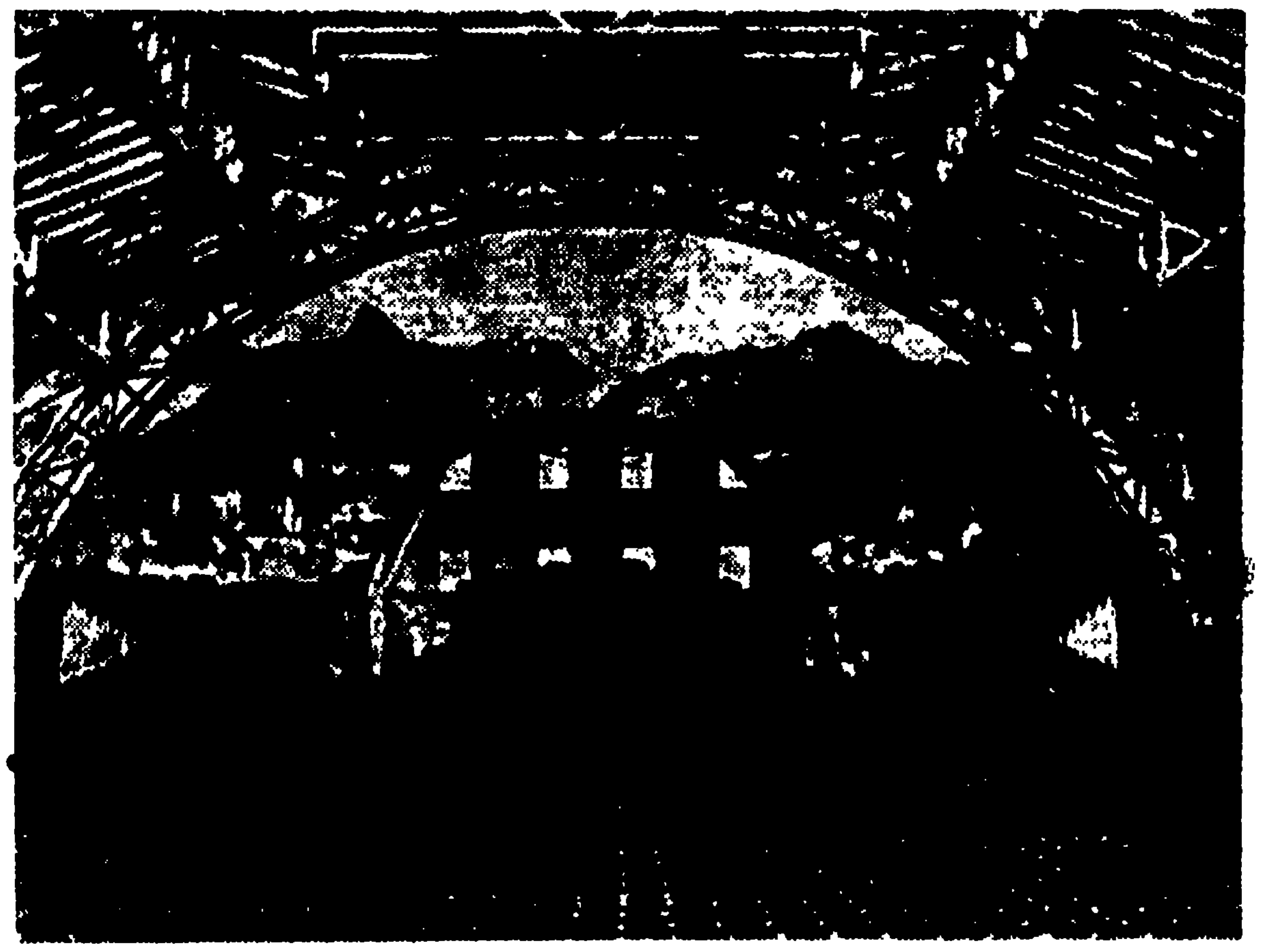

দূরে Passion Play-র ষ্টেজ

বৃষ্টির কলরব। জগতের Christians-দের নিকট এ অভিনয় পবিত্র, অভিনয়ের গ্রাম—পুণ্যতীর্থ।

* *
*

গ

সেদিন এখানে এক বিচিত্র উপন্যাস প্রকাশিত হইল। এ উপন্যাসে একটাও কথা নেই; আছে কেবল চিত্র—woodcuts। বই দেখলে—পড়লে বলা চলে না—অর্থ সহজেই বোঝা যায়। চিত্রকরের চাতুরীর এই এক প্রমাণ। বইএর সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইরকম:—তরুণ এবং দীন এক চিত্রকর দুঃখময় কিন্তু আদর্শপূর্ণ জীবন যাপন

করে—একাই। হঠাৎ একদিন এক অপরিচিত পুরুষ তাহার নিকট আসে এবং তাহার মনে মোহ সঞ্চার করে

Passion Playর প্রাকৃতিক দৃশ্য

টাকার—যশের। চিত্রকর তার মোহে পড়ে। তারপর খ্যাতি এবং সুবর্ণ, নারী এবং মদ। নারীর নিকট হইতে পালায় সে বিতৃষ্ণায়, মদ্যত্যাগ করে ক্লান্তিতে। তারপর সে ভালবাসে এক সুন্দরী পবিত্র নারীকে, এবং তার সঙ্গে বিবাহের পর—সুখময় সময় কাটায়। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ভয় হয়—সেই বন্ধু, অপরিচিত পুরুষ আবার যেন না আসে! একদিন অপরিচিত পুরুষ আসেই। সে হাসে; চিত্রকর হাঁফায়। তারপর অপরিচিত পুরুষ তার মুখাবরণ ফেলে দেয় দূরে, এবং হাসে আবার। চিত্রকরের বেদনা অসীম। তার বন্ধু—অপরিচিত পুরুষ—মৃত্যু; প্রাণহীন কঙ্কাল। সুখ, সুবর্ণ, খ্যাতির এমন নিদারুণ মূল্যের জন্য চিত্রকর বজ্রাহত! বইএর নাম God's man; দাম সাড়েসাত শিলিঙ, প্রাপ্তিস্থান Jonathan Cape, London।

* *
*

এখানকার সাধারণ নারীর উপর যত মানসিক অত্যাচার করা হয় তার জন্য অধিকাংশ স্থলে দায়ী অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীই। সম্প্রতি একটা বই প্রকাশিত হইল—"Ten Stratagems of getting your man or Fascinating Womanhood"। হতভাগা পুরুষদের দুর্ভাগ্যের আর শেষ নেই। নারীরা অতি-ব্যবহারিক ভাবে পুরুষদের উপর আক্রমণ করিবার শিক্ষা পান পুস্তক হইতে—ইহা হাস্যজনক, কিন্তু এমন শিক্ষায় তাঁরা নারীত্ব ত্যাগ করেন ইহাই শোচনীয়। পুরুষের দুর্ভাগ্য এ নয় যে নারীরা পুরুষ সাজিয়া উকীল মোক্তার ডাক্তার হইতেছেন,—কিন্তু এই যে, আর তাঁদের মধ্যে কল্যাণের উপচার রহিল না। কিছুদিন পরে নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক নারীর সহজ, স্বজাত হাস্যের মধ্যে পুরুষ

Lynd Ward
"God's Man"এর রচয়িতা

অস্বাভাবিক কুৎসিত ছলনার প্রতীক দেখিবে—অসবন্ধ হইতে তার Reaction, তার বিবেচনাশক্তি হইবে নষ্ট।

তখন নারী আবার তাঁর ভিতর স্বর্গের মন্দির গড়িয়া তুলিবেন।

উক্ত বই পাঠ করিয়া এখানকার একজন সুবিখ্যাত লেখক New Statesman নামের সাহিত্যিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"আমি Keyserlingএর কথায় আগে বিশ্বাস কর্‌তাম না, এখন করি।" আমি Keyserlingএর কথার আলোচনা বহুপূর্ব্বে "বিচিত্রা"র করিয়াছি। কথাটা এই—"Very soon from all countries of Europe except France, love will be extinct."

* *
*

৬

Times নামক দৈনিক পত্রের আত্মা নেই, আছে দেহ—দীর্ঘ এবং স্থূল। এ যেন "রক্তকরবী"র রাজা, শরীরের স্থূলতায় সকলকে ভয় দেখায় এবং নিজেও ভয় পায়। সেদিন ইহার একটা India supplement প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অসংখ্য facts, figuresএর সহিত "মোটা মোটা" লোকের নাম জড়িত। ইহার একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। প্রবন্ধের নাম The Vernaculor Literatures of India। প্রথমতঃ, ইহাতে হিন্দীসাহিত্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই; দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেও কোন কথা নাই; তৃতীয়তঃ, লেখকের attitude-patronizing। ইংরাজদের সহিত আমাদের বাহিরের সম্পর্ক ততদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে যতদিন না ভিতরের সম্বন্ধ পরিপুষ্ট হয়। ভিতরের সম্বন্ধ পরিপুষ্ট করার প্রধান উপায় আমাদিগকে জানা। আমরা ইহাদের জানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি সাহিত্য এবং ভাষার মধ্য দিয়া। ইহারা করিতেছে না। এ জন্য ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত, না আমরা, বলা কঠিন। কিন্তু যতদিন ইহারা সাহিত্য বাদ দিয়া legislative assemblyর রিপোর্ট পড়িবে, ততদিন ইহারা ভারতের হৃদয় পাইবে না; ততদিন ঠকাইবে নিজেকে এবং ভারতের অনেক অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভারতীয়কে। এখানে বাঙ্‌লা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ব্যাকরণ লিখিতে সকলেই উৎসুক। তদ্দ্বারা "ডাক্তার" হইতে পারা যায় যত সহজে, তত সহজেই সংগ্রহ করিতে পারা যায় পয়সা। কিন্তু সাহিত্য যে আছে এ কথা ইহাদের অবিদিত। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের নাম কেহ জানে না; রবীন্দ্রনাথের নাম জানিল Nobel Prize পাইবার পর।

শ্রীঅষ্টাবক্র

বাঞ্ছারামের বৈরাগ্য

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত

১

হরি নামই সত্য

"একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হ'লেও ব্যাস, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ বা চৈতন্যদেব হ'তেই বা দোষ কি? তাঁরাও মানুষ ছিলেন, আমিও মানুষ—কেনই বা পারবনা, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? অসার এই সংসার—হায়রে মূঢ় মন এতদিন এ কি খেলা খেলছ! জাননা কি সংসার তৈরী হয়েছে শুধু দুটি কথায়, 'সং' আর 'সার'—অর্থাৎ সং সাজা যেখানে সার সেই লীলাভূমির নামই সংসার—"

এইরূপ নানা চিন্তায় আপনাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিয়া শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমৎ বাঞ্ছারাম রায় সীতাগড় পাহাড়ের জঙ্গল হইতে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। সংসারের—বিশেষতঃ আই, এ পরীক্ষার যে দারুণ বোঝা তাঁহার মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, মুক্তির সন্ধান পাইয়া সে লাঞ্ছনা, এ নিদারুণ ব্যর্থ পরিশ্রম এক নিমিষে যে এতটা হাল্কা হইয়া যাইবে তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না।

জগতে হরিনামই সত্য—এই নামের গুণেই 'জলেতে ভাসিল শিলা',—হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্!

২

ভারতের ভাবী অবতার প্রস্তুত হইতেছেন

শ্রীমৎ বাঞ্ছারাম বাবুর একটু পূর্ব্বে পরিচয় জানাইতে হইল।

নিত্যানন্দ রায় মহাশয় বৃদ্ধবয়সে চাকুরি ছাড়িয়া স্বাস্থ্যান্বেষণে আজ কয়েক বৎসর হাজারিবাগে আসিয়া বাস করিতেছেন। ধনী এবং কৃপণ বলিয়া ইঁহার সুনাম ও দুর্ণাম দুইই ছিল।

নিত্যানন্দ বাবুর দুই পুত্র ও একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের বাঞ্ছারাম রায়, বয়স তেইশ-চব্বিশ; তৎপরে কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও কনিষ্ঠ পুত্র রাধাশ্যাম বা খোকা। কন্যাটির বহুকাল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। খোকা কলিকাতায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে; আমার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করে। আমাদের বাঞ্ছারাম বাবু হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বস্ কলেজে দুইবার আই, এ পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় 'টেষ্ট' পরীক্ষায় লজিক-প্রফেসর খড়্গ বাবুর খড়্গাধারে কাটা পড়িলেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রফেসর হেম বাবু কুড়ি মার্ক গ্রেস দিলেন কিন্তু ভারতের ভাবী অবতার তাহাতেও সফল হইতে পারিলেন না। কাজেই সেবারও তাঁহার আই, এ দেওয়া হইল না।

বলা বাহুল্য ইনি বিবাহিত—শ্বশুর মহাশয় ও শ্বশুরকন্যা হাজারিবাগেই থাকেন।

৩

আধ্যাত্মিক চিন্তা ও পাঁউরুটী ভক্ষণ

বিপদ বা দুঃখ ভিন্ন মানুষ ভগবানের সন্ধান করে না। সেই জন্যই বোধ হয় এলার্ম্ ঘড়ির মত ঘণ্টা বাজাইয়া দুঃখ আসিয়া মোহাচ্ছন্ন মানুষকে জাগাইয়া দেয়,—মানুষ ভগবানের কথা স্মরণ করে।

টেষ্ট পরীক্ষায় ফেল করিয়া বাঞ্ছারাম বাবু এবার মুক্তির সন্ধান পাইলেন। শনিবার সকালে কলেজের ছেলেরা ক্যানারীর জঙ্গলে বন-ভোজন করিতে গেল; এরূপ বন-ভোজন তাহাদের চিরন্তন প্রথা। বাঞ্ছারাম বাবু দলে যোগ না দিয়া একখানি পাঁউরুটী ও কিছু মাখন লইয়া বেলা নয়টার সময় সীতাগড় পাহাড়ে গিয়াছিলেন।

সারাদিন দুঃশ্চিন্তা, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ ও অশ্রুমোচন এবং থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান ও মধ্যে মধ্যে পাঁউরুটী ভক্ষণ করিয়া সন্ধ্যার সময় শান্ত-সমাহিত মনে তিনি গৃহে ফিরিলেন। জঙ্গলে শৃগালের দল তাঁহার বক্তৃতার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল।

৪

বাঞ্ছারাম বাবু কড়া নাড়িলেন

বাঞ্ছারাম বাবু এযাবৎকাল অতি নিয়মিতরূপে প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ী যাইতেন। তাঁহার পড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তাঁহার পিতা পুত্রবধূকে আজ ছয়মাস তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাঞ্ছারাম বাবুর বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী এ-পাড়া ও-পাড়া বলিলেই হয়—তা যাক্ সে সব কথা।

সেদিন শনিবার। শ্বশুরবাড়ীর পথ দিয়াই তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হয়—বাঞ্ছারাম বাবু অনেক ঘুরিয়া অন্য পথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, শ্বশুরবাড়ী আর যাওয়া হইল না।

"শ্বশুরবাড়ী?—কার শ্বশুরবাড়ী?—কে সে? কমলাই বা কে? ভুল, ভুল—মহাভুল!—কমলা আমার স্ত্রী নয়—ছিল হয় ত একদিন, তা ব'লে কি এই সোনার শিকল চিরকাল পায়ে জড়িয়ে থাকবে, উপরে উঠতে কি পারা যাবে না? না, কমলা এখন আর আমার স্ত্রী নয়, সে পরস্ত্রীর সমান, আমার ভগ্নীর মত।"

এইরূপ গবেষণা ও আলোচনায় যখন তিনি বাড়ী ফিরিয়া দরজার কড়া নাড়িলেন, একটি পঞ্চদশ কি ষোড়শ-বর্ষীয়া বালিকা আলো হাতে নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যে বড় ওখানে গেলেনা, কি ক'রে জানলে যে আমি আজ এখানে থাকব?"

সর্ব্বনাশ!—যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই কি সন্ধ্যা হয়! বাঞ্ছারাম বাবু নীরব—এই চপল ব্যবহারে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। কমলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "ওঃ! ভগবানের কি কঠোর পরীক্ষা!—সরুন, ভেতরে যাই।" তাঁহার মুখ রাত্রির মত অন্ধকার, অন্ধকারের মত গম্ভীর।

কমলা উত্তর না দিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বাঞ্ছারাম বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন; দরজা বন্ধ করিয়া কমলা চায়ের জল চড়াইতে গেল।

৫

বাঞ্ছারাম বাবু পান খাইলেন না

আপনার ঘরে বসিয়া বাঞ্ছারাম বাবু গুরুদাস লাইব্রেরীর বহু পুরাতন একখানি পুস্তকের তালিকা দেখিতেছিলেন ও কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তক আনাইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, চৈতন্যচরিতামৃত ও এইরূপ বইগুলির নাম ও দাম একখানি কাগজে লিখিয়া রাখিতেছিলেন এমন সময় কমলা চা ও কিছু জলখাবার লইয়া ঘরে আসিল।

একমনে বসিয়া গল্প পড়িতেছি হঠাৎ পাশে একটি সাপ আসিয়া ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইলে যেমন হয়, বাঞ্ছারাম বাবুর তেমনি হইল।

"বলি, আজ তোমার হয়েছে কি গো?"—কমলার এই কথাটির ভিতর কি বস্তু ছিল জানি না কিন্তু বাঞ্ছারাম বাবু একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, পুস্তক রাখিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, না এমন কিছু নয়—তবে শরীরটা খারাপ,—ও চা-টা খাব না আজ, আপনি নিয়ে যান।"

আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি স্ত্রীর মুখের দিকে তিনি চাহিয়া দেখেন নাই, তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইতেন কমলা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বাঞ্ছারাম বাবুকে এই ষোড়শ-বর্ষীয়া বালিকাটি যতটা চিনিয়াছে আপনারা ষড়বিংশ বৎসরেও ততটা চিনিতে পারিবেন না।

স্বামীর কথায় কমলা বলিল, "তা, চা যদি নাও খান এই জলখাবারটা খেয়ে ফেলুন না কেন, বন-ভোজনে যা খেয়েছেন তার চেয়ে এ ঢের ভাল লাগবে।" কমলা ভাবিয়াছিল স্বামী বন-ভোজনে ক্যানারীর জঙ্গলে গিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ পরস্ত্রীর এই প্রগল্‌ভতা বাঞ্ছারাম বাবুর ভাল লাগিল না কিন্তু পাছে কথায় কথা বাড়ে এই

আশঙ্কায় জলখাবারে তিনি মন দিলেন। কমলা পান আনিয়াছিল, কিন্তু বাঞ্ছারাম বাবু পান খাইলেন না।

৬

ঠাকুর মশায় শিহরিয়া উঠিলেন

রাত্রিতে আহারাদি সারিয়া বাঞ্ছারাম বাবু আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া মেঝের উপর একখানি কম্বল পাতিলেন। পালঙ্ক লইতে বালিস লইয়া রিডিং ল্যাম্পটি টেবিল হইতে নামাইয়া মাথার নিকটে রাখিলেন এবং অন্য একখানি ভাল কম্বল গায়ে দিয়া মেঝের উপর শুইয়া শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিলেন।

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ
কস্য ত্বং বা কুত—"

এমন সময় কমলা ধীরপদে ঘরের ভিতর আসিয়া দরজা বন্ধ করিল।

ক্ষণিকের জন্য বাঞ্ছারাম বাবু মোহমুদ্গর পাঠ বন্ধ করিয়া সেই রমণীর এই অসমসাহসিক কার্য্য দেখিয়া লইলেন—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ছারপোকায় কামড়াইল।

বোধ হয় মাথার বালিসে ছারপোকা ছিল কিন্তু তিনি তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। সেই অবসরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার হয়েছে কি? নীচে শুলে যে? উঠ, উপরে উঠে শোও।"

বাঞ্ছারাম বাবু উঠিয়া বসিলেন, বইখানির পাতা মুড়িয়া বন্ধ করিয়া কমলার পায়ের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আজ, আজ আপনাকে আমার কতকগুলি কথা বলবার আছে—যদি শোনেন ত বলি।"

কমলা উত্তর দিল না, একেবারে বাঞ্ছারাম বাবুর বিছানায় আসিয়া তাঁহার কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল। বাঞ্ছারাম বাবু শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন; সম্মুখে চেয়ার ছিল, চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আপনি আমার ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করবেন না,—যে কথা বলছিলাম তা শুনবেন কি?"

কমলা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এবার হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "কি বলছিলেন বলুন, ঐ চেয়ারখানাতে ব'সেই বলুন না।"

সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাঞ্ছারাম বাবু বলিতে লাগিলেন, "জানেন কি আমাদের দেশের আজ কি দুর্দ্দশা, কি অধঃপতন, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?"

কমলা উঠিয়া বসিল ও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমার দিদিমা, মাসিমা, বৌদি, দাদা, এঁরা সব ভাল আছেন ত?"

বাঞ্ছারাম বাবু বলিলেন, "না, না আমি আপনার ও আমার জন্মস্থান যাদবপুরের কথা বলছি না। আমাদের দেশ মানে এই বিশাল ও বিরাট ভারতবর্ষ;—একটুকু পল্লীগ্রাম যাদবপুরে কি হ'ল না হ'ল তার খোঁজ রাখতে চাই না। জানেন কি, এই ভারতে হিন্দুদের কি অধঃপতন হয়েছে?"

"তবু ভাল, আমি বলি বা যাদবপুরে প্লেগ বা কলেরা হ'চ্ছে বুঝি—গেল বছর যা হয়েছিল, বাবা!" এই বলিয়া কমলা আবার শুইয়া পড়িল।

"হিন্দুর স্লেচ্ছাচার—ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্লেগ-কলেরার চেয়েও নিন্দনীয়—ভয়াবহ, একথা কি আপনি অস্বীকার করেন?"

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না; কম্বল হইতে উঠিয়া বাঞ্ছারাম বাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা গো ঠাকুর মশায়, বিছানায় শোবে চল, তারপর যা বলবার বলবে এখন।"

ঠাকুর মশায় শিহরিয়া উঠিলেন—হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, পৃথিবীতে দু'দিনের জন্য আমাদের আসা মাত্র, জগতে কে কার, এ সংসারটা একটা মরীচিকা, আপনিও আমার স্ত্রী নন, আমিও আপনার স্বামী নই। পরস্ত্রী, আপনি কনিষ্ঠা ভগ্নীর সমান—বয়সে যদি বড় হতেন ত মা বলতাম। পরস্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া ভাল নয়, আমি নীচে এই কম্বলেই শোব।"

"ও সব বাজে কথা রাখ, যতবার পরীক্ষায় ফেল করবে ততবারই আমি অমনি পরস্ত্রী হ'য়ে যাব, না? বার বার

দু'বছর ত হয়েছি, আবার এখনও তোমায় রোগ কাটল না?"

"না, দেখুন, আমি অতি অন্ধ—ভগবান বার বার দু'বার আমাকে সংসারের অনিত্যতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমি সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছি—এবার আর নয়। আমি স্থির করেছি শীঘ্রই গৃহত্যাগ করব—আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—কিছুই নাই। আমি সেই—সেই—সচ্চিদানন্দোহং।—সেই মুক্ত, অবিনশ্বর আত্মা আমি!"

"তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না বাপু! যা ভাল বোঝ কর, দেখছি আর সবই তোমার আছে শুধু মাথাটাই নেই।" এই বলিয়া কমলা আর এক প্রস্থ বিছানা মেঝের উপর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

৭

বেয়ারিং পোষ্টে জ্ঞানীগুরু

পরদিন গুরুদাস লাইব্রেরীতে বাঞ্ছারাম বাবু জ্ঞানীগুরু প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তকের অর্ডার দিলেন। টিকিটওলা খাম বা পোষ্টকার্ড না থাকায় বেয়ারিং পোষ্টেই চিঠি লিখিলেন,—রবিবার টিকিট প্রভৃতি কোথায় পাইবেন?

এইরূপে বিনা খরচায় ধর্ম্মের সূত্রপাত করিয়া বাঞ্ছারাম বাবু একখানি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ও একটি লাল পেন্‌সিল লইয়া গৃহত্যাগ করিবার শুভদিন দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু কি বিভ্রাট! কাল সোমবারই ত ভাল দিন। আজ রবিবার, আর মোটে এই কয়েক ঘণ্টা, তারপরই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে? লাল পেন্‌সিল লইয়া বাঞ্ছারাম বাবু সোমবারের শীর্ষে দাগ দিলেন।

"না, কাল কি ক'রে যাওয়া হয়, বুদ্ধদেবও গৃহত্যাগ করবার সময় নিশ্চয় ভাল দিন দেখেছিলেন—তখনও কি গুপ্তপ্রেস পাঁজী ছিল? আশ্চর্য্য! তিনি যে ভাল দিন দেখেছিলেন ইতিহাস সে কথা না জানলেও আমি এখন প্রাণে প্রাণে তা বুঝতে পারছি।" পুনরায় বাঞ্ছারাম বাবু পাঁজী দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় দশ-বার' দিন পরে আবার একটা ভাল দিন পাওয়া গেল। বাঞ্ছারাম বাবু স্থির করিলেন, "হাঁ, এই ত চমৎকার দিন—শুক্রবার, পুষ্যানক্ষত্র, মাহেন্দ্রযোগ,—ব্যস, আর চাই কি—ততদিনে গুরুদাস বাবুর দোকান থেকে বইগুলাও এসে যাবে।" এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি পাঁজীতে সেই শুক্রবার দিনটা উত্তমরূপে দাগ দিয়া রাখিলেন।

৮

বাঞ্ছারাম বাবু টাইমটেবল ছিঁড়িলেন

ভারতের ভাবী অবতারকে গুরুদাস লাইব্রেরী সাহায্য করিল না। দেখিতে দেখিতে দশটা দিন পার হইয়া গেল, বই আসিল না, বেয়ারিং চিঠি ঘুরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ মাশুল আদায় করিল। বাঞ্ছারাম বাবু চিন্তিত হইলেন।

এই দশটা দিন যে তিনি কিরূপে কাটাইয়াছেন তাহা তিনিই জানেন; তাঁহার প্রাণের ভিতর যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে ঘর-বাড়ী যে দগ্ধ করে নাই এই যথেষ্ট।

কমলা এখন আর তাঁহার স্ত্রী নয়, নিত্যানন্দ বাবু তাঁহার পিতা নয়, কাত্যায়নী দেবী তাঁহার মাতা নয়—না, কেহই এখন তাঁহার কিছু নয়। এ সব শুধু মায়ার বন্ধন, অলীক মোহ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্যই বলিয়াছেন, "অবসাদ ও মোহ পরিত্যাগ ক'রে জাগ্রত হও অর্জ্জুন!"

স্বামীর ব্যাপার দেখিয়া কমলা পাঁচ-সাত দিন পূর্ব্বেই বাপের বাড়ী গিয়াছিল। তাহার বড় ভাই কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, সেই অছিলায় যাইবার সুবিধাও হইয়াছিল।

বই না আসায় বাঞ্ছারাম বাবু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু কর্ত্তব্য হইতে বিরত হইলেন না। এ কয়দিন যাবৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর একখানি টাইমটেবল্ দেখিতে-ছিলেন—কোন্ স্থানে গিয়া বসিলে মানুষ অচিরে যোগসিদ্ধ হইতে পারে, ম্যাপ প্রভৃতি হইতে তাহাই তিনি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু টাইম-টেবল্ তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিল না। উদরপরায়ণ

শ্রান্তির জন্য কোথায় হোটেল, ডাক-বাঙ্গলো, ধর্ম্মশালা আছে টাইমটেবলে এই সবই পাওয়া যায়, আত্মার আহার কোথায় মিলিবে টাইমটেবল্ তাহা জানে না।

"বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতিরা কি টাইমটেবল্ দেখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন? না। তবে আমারই বা প্রয়োজন কি?" এই ভাবিয়া বাঞ্ছারাম বাবু টাইমটেবল্ ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

৯

খোলস ছাড়িলেন

দেখিতে দেখিতে সেই লাল দাগ দেওয়া শুক্রবার লাল-পাগড়ী কনষ্টেবলের মত আসিয়া বাঞ্ছারাম বাবুর কান ধরিয়া সজাগ করিয়া তুলিল। তাঁহার শ্যালক বিধুভূষণ বাবু ও কমলাকেও ঠিক সেইদিনেই নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ীতে দেখা গেল।

বিধু বাবুর মুখে এতদিন পরে গৃহকর্ত্তা জানিতে পারিলেন যে, এ যাবৎকাল তাঁহার গৃহে তিনি দুধ-কলা খাওয়াইয়া অবতার পুষিতেছেন। রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া একপাটি অতি পুরাতন মিউজীয়মের উপযুক্ত ছেঁড়া চটি-জুতা লইয়া তিনি অবতারের সম্বর্দ্ধনা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিধু বাবু নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "দেখুন না আপনি, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, আপনারা শুধু চুপ ক'রে থাকুন যেন কিছুই জানেন না।"

উপরের ঘরে বাঞ্ছারাম বাবু কম্বলের উপর বসিয়া ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া নিবিষ্টমনে একখানি গীতা পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ কমলা গলায় কাপড় দিয়া বাঞ্ছারাম বাবুর পায়ের নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া হাত জোড় করিয়া বসিয়া রহিল।

বিধু বাবু অবিলম্বে আসিয়া পড়িলেন। ঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া একেবারে বাঞ্ছারাম বাবুর পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং "প্রভু উদ্ধার করুন—উদ্ধার করুন" বলিয়া কাতরাইতে লাগিলেন।

বাঞ্ছারাম বাবু স্তম্ভিত। আজ এ কি মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সিদ্ধি একেবারে পাকা বেলের মত হাতে আসিয়া পড়িল। বাঞ্ছারাম বাবু গম্ভীর হইলেন। আজ তিনি মুক্তপুরুষ; কামিনীকাঞ্চনের সোনার শিকল কাটিয়া আজ তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা এই পঙ্কিল, পুতিগন্ধময় পার্থিব ভোগলালসার অনেক—অনেক উপরে উঠিয়াছে। আঃ! কি বিশুদ্ধ শান্তি!!

ক্ষণকাল পরে ধীরগম্ভীর স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনারা?"

কমলা কাসিতে আরম্ভ করিল ও মুখে কাপড় চাপা দিল। বিধু বাবু বিনীতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমাদের চিন্‌বেন না; আমরা অতি হীন, অতি অপরাধী,—আমাদের মুক্তির উপায় ব'লে দিন।"

এবার কমলা সংযত হইয়া বলিতে লাগিল, "স্বামীজি, ইনি আমার বড় ভাই, কল্‌কাতায় থাকেন। ইনি কয়েক-দিন যাবৎ স্বপ্ন পাচ্ছেন যেন আপনি স্বামী রামানন্দজি ইঁহাকে অভয় দিচ্ছেন। দারুণ অম্বল-শূল রোগে ইনি ভুগ্‌ছিলেন, স্বপ্ন পাবার পর ইনি হঠাৎ একেবারে সেরে গেছেন, তাই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

বাঞ্ছারাম বাবু এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী রামানন্দজি কে?"

শশব্যস্তে বিধু বাবু উঠিয়া বসিলেন এবং হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আর ছলনা করেন কেন? আপনিই ত স্বামী রামানন্দজি।"

বাঞ্ছারাম বাবু হাসিমুখে বলিলেন, "না, আমি ত বাঞ্ছারাম।"

বিধু বাবু বলিলেন, "পূর্ব্বে তাই ছিলেন, কিন্তু এখন ঈশ্বরকৃপায় আপনি খোলস ছাড়িয়া স্বামী রামানন্দজি হইয়াছেন।"

১০

স্বামী কৈলাসানন্দ

শনিবার প্রভাতে আমাদের বাঞ্ছারাম বাবুকে কেহ দেখিতে পাইলেন না—সত্যই তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তবে পুষ্যা নক্ষত্রের পরিবর্ত্তে অশ্লেষা নক্ষত্রে তিনি বাটীর বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই লাল মোটরকোম্পানীর লরীতে প্রথমেই বিধু বাবুকে

দেখিতে পাইলেন।

"ওম্ নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া বিধু বাবু তাঁহাকে অভিভাষণ করিলেন। কি বলিতে হয় না জানায় স্বামীজি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কি যেন বলিলেন, বোধ হয় আশীর্বাদ করিলেন।

বিধু বাবু বলিলেন,"যদি কেউ 'ওম্ নমঃ নারায়ণায়' বলে তাকে তখন 'হরি ওম্' বলবেন, অবশ্য সে যদি গৃহী হয়। না হ'লে সমান অবস্থাপন্নকে সে যা বলবে আপনিও তাই বলবেন। এ কথাটা ভুলবেন না, কাজে লাগবে। তা এখন যাবেন কোথা ?"

স্বামীজি বলিলেন—"ভগবান জানেন।"

"তা বটে, তবে আমি বলি কি আপনি ক'লকাতায় যান, আমার রিটার্ণ টিকিটখানা নইলে নষ্ট হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া কালীঘাটে একজন খুব বড় সন্ন্যাসী এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে খুব ভাল হবে। তিনিই আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন।"

"কি রকম—কি রকম ?"

বিধু বাবু বলিলেন, "তাঁর নাম স্বামী কৈলাসানন্দ, কৈলাস পর্ব্বতে বরাবর থাকেন, শুধু আপনাকে প্রচার করবার জন্য তিনি এসেছেন। বিরাট চেহারা, বোধ হয় পাঁচ-সাতশ' বছরের লোক হবেন। আর কি অদ্ভুত ক্ষমতা ! পদ্মাসনে তিনি ব'সে আছেন অথচ মাটি থেকে ঠিক একহাত উঁচুতে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সাহেব-সুবোরা তাঁর পায়ে মাথা লুটোচ্ছে।"

স্বামীজি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা তিনি কি বল্লেন ?"

"হাঁ," বিধু বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমি যে দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'কেঁও বেটা তুম হামারা পাস আয়া, তুমহারা ঘরমে ত' রামজী আয়েহেঁ, যাও উনকো পুজো—উনিহিকো প্রচার করণেকো ওয়াস্তে হাম কল্‌কাত্তা আয়েহেঁ।' তারপর স্বপ্নে কৈলাসানন্দ স্বামী আমাকে বল্লেন যে, আপনি সমস্ত পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হেতু মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি ত্রেতায় রামচন্দ্র, দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ; গীতায় আপনিই বলেছিলেন, 'যদা, যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি—' সবটা মনেও নাই ছাই! কেমন—আপনার স্মরণ হয় কি ?"

স্বামী রামানন্দজি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ক'লকাতায় যাচ্ছি—আমার ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে। এই কৈলাসানন্দই দ্বাপরে যুধিষ্ঠির ছিলেন।"

বিস্মিত হইয়া বিধু বাবু চোখদুটা বাহির করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, তাই না কি ? আর দ্বাপরের অর্জ্জুন কোথায় প্রভু ?"

স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "আত্মবিস্মৃত অর্জ্জুন আমারই সম্মুখে, আপনিই দ্বাপরে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ছিলেন।"

১১

"ওরে আমার দ্রৌপদী রে—"

"আমিই অর্জ্জুন ছিলাম—অ্যাঁ, আমি ? তাইত, তাইত—হাঁ, মনে পড়েছে—গাণ্ডীব, গাণ্ডীব চ'লে এস।" এই বলিয়া বিধু বাবু মাটির উপর জল ফেলিতে লাগিলেন। গায়ে জোর করিয়া একলাফে বিধু বাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও হঠাৎ দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া উচৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, "ওরে আমার দ্রৌপদী রে—ওরে আমার সুভদ্রা রে—"

নদীর কাছে লোক জমিয়া গেল—সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি মশাই, ভোর বেলায় কান্নাকাটি করেন কেন ?"

"আত্মবিস্মৃত অর্জ্জুন আজ জাগিয়াছে—কোথায় গাণ্ডীব কোথায় ?" এই বলিয়া বিধু বাবু চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। লোকেরা তাঁহাকে পাগল স্থির করিয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অল্প পরে বিধু বাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং স্বামীজিকে তাঁহার রিটার্ণ টিকিটখানি দিলেন—একটি মোড়কে কি ছিল জানি না, স্বামীজির হাতে সেই মোড়কটি দিয়া তিনি বলিলেন, "স্বামী কৈলাসানন্দকে দাসের এ ক্ষুদ্র উপহার-

টুকু দয়া করিয়া দিবেন।" এই বলিয়া তিনি রামানন্দজিকে লরীর টিকিট কাটিয়া বিদায় দিলেন।

লরী চলিয়া গেলে বিধু বাবু হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন ও ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে কম্‌লি, তোর স্বামীজি এবার খুব জব্দ হবে। বেশি দূর না এগিয়ে আসানসোলেই যাতে যোগীবর হাতে হাতে ফল পান তার ব্যবস্থা আমি করেছি।"

কমলা বলিল, "ধন্যি দাদা, এমন গম্ভীর হ'য়ে কাল তুমি ওঁর পায়ের উপর শুয়ে পড়েছিলে—আমি ত মুখে কাপড় দিয়ে হেসেই খুন, এমন প্লে করতেও পার তুমি!"

"আরে কম্‌লি, এ আর কি দেখলি—তোর দাদা কমিক পার্ট নিয়ে যেই থিয়েটারে নামে অমনি হুলস্থূল প'ড়ে যায়; এই ক'রেই ত খেতে হয় বোন! সে যা হ'ক, আজ রাত্রের ট্রেনে তুই আমার সঙ্গে আসানসোল রওনা হবি, মনে থাকে যেন।"

১২

"ওটা আমার স্ত্রীর—"

মানুষের যদি পেটের জ্বালা না থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক লোকেই সিদ্ধপুরুষ হইতে পারিত। কামিনীকাঞ্চন বরং ত্যাগ করা সম্ভব কিন্তু অন্নচিন্তা ত্যাগ করা অসম্ভব।

স্বামী রামানন্দজি বিভ্রাটে পড়িলেন। হাজারিবাগ রোড ষ্টেসনে আসিতেই তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। সঙ্গে একটিও পয়সা আনেন নাই—ভক্তের আহার ভগবান জুটাইয়া থাকেন ধর্ম্মপুস্তকে এইরূপেই পড়া যায়, কিন্তু তাঁহার আহার জুটিল না কেন?- যাহা হউক এ ক্ষুধায় তিনি কাতর হইলেন না।

যথাসময়ে ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইন্টার ক্লাসের রিটার্ণ টিকিট থাকায় স্বামীজি একখানি ইন্টার ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিলেন; গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আসানসোল ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে একজন সাহেব আসিয়া সকলের টিকিট পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বামী রামানন্দজির টিকিট পরীক্ষা করিবার সময়ে সাহেব তাহার নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া কি দেখিল, তারপর কঠোরনেত্রে স্বামীজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ টিকিট তুমি কোথায় পেলে?"

স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

"সে কথা তুমি কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে শুনো, আপাততঃ আমার কথার জবাব দাও—এ টিকিট তুমি কোথায় পেলে?"

স্বামীজি বুঝিলেন ব্যাপার নিতান্ত সহজ নহে, গোল বাধিয়াছে, এবং নানা বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। শুষ্কমুখে বলিলেন, "হাজারিবাগে।"

"হাজারিবাগে?—এ টিকিট তা হ'লে তুমি কলকাতায় কেনো নি? অন্য লোকের ব্যবহার করা টিকিট ব্যবহার করছ?—কেমন?"

রামানন্দজি বিব্রত বোধ করিলেন। ধর্ম্মের পথে এত কণ্টকও আছে। সাধে কি মানুষ সংসার-নিরয়ে আবদ্ধ হইয়া পচিয়া মরে! ঝুলি হাতে লইয়া স্বামীজি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পথ ছাড়। আমি পদব্রজে যাব। সাধুসন্ন্যেসীদের পক্ষে যানবাহনাদির প্রয়োজন নেই।"

বজ্রমুষ্টিতে স্বামীজির হাত চাপিয়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিল, "মৎ ভাগো! হাজারিবাগসে টিকট্‌কা কিম্মৎ ঔর জরমানা দেও—নহি তো থানামে চলো!"

আতঙ্কে লজ্জায় ধীরে ধীরে বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া স্বামীজি বলিলেন, "আমি ফকির মানুষ, টাকাপয়সা কোথায় পাব সাহেব?"

সাহেব বলিল, "আলবৎ হায় তোমারা পাস—ঝোলি খোলো।"

স্বামীজি বিপদ-সাগরে যেন একগাছা তৃণ পাইলেন। আশা হইল, ঝুলিতে টাকাপয়সা না পাইলে সাহেব হয় ত ছাড়িয়া দিবে। তিনি ঝুলি খুলিয়া দ্রব্যাদি দেখাইতে লাগিলেন। ঝুলিতে বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল বিধু বাবুর সেই যোড়কটি ও খানকতক বই, একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, একটি দেশলাই ও কয়েকটি বিড়ি।

সাহেব মোড়কটি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কি সর্ব্বনাশ! এ কি ব্যাপার! গাড়ীর ভদ্রলোকেরা, যাঁহারা এতক্ষণ তামাসা দেখিতেছিলেন, তাঁহারা সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "চোর, চোর! থানায় চালান দাও সায়েব!"

মোড়কের মধ্যে একজোড়া সোনার দুল!

সর্ব্বনাশ! স্বামীজি কি করিবেন, একেবারে বামাল শুদ্ধ গ্রেপ্তার। কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "আমি চোর নই মশায়, ওটা আমার স্ত্রীর।"

ভদ্রলোকেরা বলিলেন, "বটে বদমাস, এই না একটু আগে বলছিলি আমার স্ত্রী নাই—বাপ নাই, আরও কত কি নাই; এখন আবার স্ত্রী এল কোত্থেকে? যাও, থানায় যাও।"

পুলিস আসিয়া স্বামীজিকে থানায় লইয়া গেল।

১৩

উপবাসমাহাত্ম্য

সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকিয়া স্বামীজির ভ্রম কাটিল। উপবাসের যে এতটা মহিমা, এতটা বৈজ্ঞানিক আবেদন স্বামীজি এবার তাহা বুঝিলেন, শুধুই যে বুঝিলেন তাহা নহে, হাড়ে হাড়ে জানিলেন।

জগতে অন্নচিন্তা যে কত বড়, পেটের জ্বালা যে কি ভীষণ সংসারের স্বচ্ছলতার ভিতর থাকিয়া তিনি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা ভাবিয়া এতদিন পরে তাঁহার কমলার কমল-মুখখানির কথা মনে পড়িল—নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। সংসারের সুখের কথা, কমলার সেবার কথা একে একে ভাবিতে লাগিলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায়, আবার সেই আগের অবস্থা যদি ফিরে পাই!"

উপবাসমাহাত্ম্যকে সকলে নমস্কার করুন।

১৪

স্বামীজির পরস্ত্রীগ্রহণ

পরদিন সকালে বেলা তখন সাতটা স্বামীজির হাজৎ-ঘরের সম্মুখে বিধু বাবু ও পুলিস সব-ইনস্পেক্টর দেখা দিলেন।

দারোগা বলিলেন, "কি স্বামীজি, আছেন কেমন?"

দারোগার পাশে বিধু বাবুকে দেখিতে পাইয়া সহসা সমস্ত কথা ভুলিয়া স্বামীজি সকাতরে বলিয়া উঠিলেন, "বিধু বাবু আমাকে বাঁচাও ভাই! বড় বিপদে পড়েছি।"

বিধু বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "আত্ম-বিস্মৃত হয়ে যা-তা কথা বল্‌বেন না প্রভু! বিধু বাবু কি? আমি যে দ্বাপরের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, সে কথা কি ভুলে যাচ্ছেন?" তারপর দারোগার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "আর এঁকে চিনতে পারছেন না প্রভু? ইনি হচ্চেন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন—কলিযুগে পুলিসের দারোগা ভবানী সেন হ'য়ে জন্মেছেন।"

লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে স্বামীজি মুখ নত করিলেন—চক্ষু যেন অশ্রু-সিক্ত।

ভবানী দারোগা বিধু বাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে—আর কষ্ট দিয়ো না। বাড়ী নিয়ে যাই চল।"

"চল।"

গেরুয়াপরিহিত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী রামানন্দজি বিধু বাবুর সহিত ভবানী বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

একরাশ খাবার ও তিন কপ চা খাওয়াইয়া দারোগা বাবু স্বামীজিকে বৈঠকখানার পাশের ঘরে বিশ্রাম করিতে পাঠাইলেন।

একখানি তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতা ছিল, স্বামীজি সেই বিছানায় বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন এমন সময় ভিতরের দিকের দরজা খুলিয়া কমলা প্রবেশ করিল। তার হাতে স্বামীজির গৃহী অবস্থার জামা-কাপড়।

কমলা হাসিতে হাসিতে যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রণাম হই স্বামীজি!"

কমলাও যে এখানে আসিয়াছে স্বামীজি তার কিছুই আভাস পান নাই। আনন্দের আবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া কমলাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

চকিতে কমলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "এ কি, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার!—পরস্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়া!"

স্বামীজি এবার কমলার পদস্পর্শ করিলেন; বলিলেন, "কমলা, মূর্খের মত খুব কাণ্ডটাই করেছি—আর লজ্জা দিয়ো না।"

কমলা নত হইয়া স্বামীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "মাগো! তোমার কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি? যখন নকল স্বামী সেজেছিলে তখনো যেমন, আসল স্বামী হ'য়ে এখনো তেমন? এবার এই সাদা জামা কাপড়গুলো প'রে মানুষ হও দেখি? খুব লোক হাসালে যা হ'ক!"

বিধু বাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ভায়া, এখন জিজ্ঞেস করতে পারি কি, 'কা তব কান্তা? কস্তে শ্যালক্?' 'শ্রীকমলা কান্তা, বিধু বাবু শ্যালক্'—এতে কি এখনো তোমার সন্দেহ বা আপত্তি আছে?"

স্বামী রামানন্দজি কোনো উত্তর দিলেন না—একবার বিধু বাবুর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীবাঞ্ছারামের বস্ত্রাদি লইয়া ভেক বদলাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত

নক্সী কাঁথার মাঠ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গলা ভাষার শ্রী উল্টিয়া গিয়াছে। যেমন আজকাল দুধে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, মধুতে ভেজাল, মেঠাইএ ভেজাল, তেমনই এখন সাহিত্যেও ভেজালের ছড়াছড়ি। এমন যে তিলোত্তমা, তাতেও না কি রেবেকার ভেজাল আছে। উর্ব্বশী পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এপিপসাইকিডিয়ান মনে পড়িয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্য—ইংরেজী সমাজ আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গলা সমাজের গায়ে যে দাগ দিয়া যাইতেছে, তাহা বড় স্পষ্ট এবং সময়ে সময়ে কলঙ্ক স্বরূপ।

কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গলা পল্লীর শ্রী আমরা একবার দেখিয়াছিলাম,—বাঙ্গালী সাধ্বীর মাথায় বড় সিন্দুরের টিপটি দেখিয়াছিলাম,—নববিবাহিতা কিশোরীর কাঁকণ ও নূপুরের রুণুঝুনু শুনিয়াছিলাম,—শুভ্র রজনী-গন্ধার ন্যায় শ্বেতবসনা বিধবার হোমাগ্নির মত উজ্জ্বল ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়াছিলাম;—সেই পল্লীর স্বর্ণ-শ্রী—যাহাতে বাঙ্গালীর ঘরকন্না ঝল্‌মল্ করিত, তাহা আর যেন তেমন ভাবে দেখিতে পাই না। বিদেশের আমদানী বাহিরের চাকচিক্যপূর্ণ নানা অনুকৃতি প্রাণহীন খেলনার মত মনে হয়,—এখন এসব আর চোখে লাগে না। পল্লীর তরুণ তরুর ছায়া ও শ্যামল দূর্ব্বা এখন সহরের প্রাসাদ হইতে ভাল লাগে। এ দেশকে কেহ ঐশ্বর্য্য দিয়া দীর্ঘকাল ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না,—এ যে মাধুর্য্যের দেশ।

তাই তাজ জসীমউদ্দিনের "নক্‌সী কাঁথার মাঠ" কাব্য-খানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম,—সেই পল্লীর পথ-ঘাট—এ যেন কত চেনা—হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লীরাখালের চোখজুড়ানো কাল রূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি—বাঙ্গলার বিবাহ-বাসর, গিন্নীর ঘর-কন্না—এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী-দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল—এখনও হয় ত কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়া-ছিলাম। এই হারানো জিনিষ নূতন পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীমউদ্দিন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। ইনি তরুণবয়স্ক কিন্তু বীর-বিক্রম। ইনি কবিতারাজ্যে যে পাঠশালা খুলিলেন, তাহা ইঁহার নিজের আবিষ্কার। জানিনা সহরে থাকিয়া কবি তাঁহার এই সবুজ প্রাণ, বঙ্গজীবনের অতুলনীয় গ্রাম্যসম্পদ—ঘরকন্নার এই সাঁঝের ভোগ হারাইয়া ফেলিবেন কি না। সর্ব্ব-গ্রাসী সহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্ত্তি বজায় রাখা বড় শক্ত।

আমরা কাব্যখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

১৪টি ছোট ছোট দৃশ্যপটে এই কাব্যচিত্র সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অঙ্কে বাঙ্গলার কুটীরগুলির এক একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উহা যেমনই পূর্ণ, তেমনই কবিত্বময়। এই কবিত্ব সংস্কৃত বা ইংরেজী হইতে ধার করা নহে। কবি একজন গ্রাজুয়েট, ইচ্ছা করিলে সেরূপ ধার পাইতেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা তাঁহার অপরিশোধনীয় পল্লীমাতৃকার ঋণ শোধ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন,—কাহারও কাছে দান পাওয়ার জন্য হাত বাড়ান নাই।

প্রথমাঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়,—একটি মাঠ দিয়া বিভক্ত-করা দুইটি পাশাপাশি গ্রাম; সেই মাঠটিই কালে "নক্‌সী

* নক্সী কাঁথার মাঠ—জসীমউদ্দিন প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৲ এক টাকা।

কাঁথার মাঠ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দুইটি গ্রাম দুইটি ভ্রাতার মত জড়াজড়ি করিয়া আছে—ইহাদের মধ্যে ভাব ও অসদ্ভাব—কিছুরই অভাব নাই ;—

"ও গাঁ'র বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন্ কখন্ দোলা তাহার এ গাঁ'য় এসেও লাগে।
এ গাঁ'র চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে
ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
এ-গাঁও হ'তে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁ'র মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামিশি কেবল সুরে সুরে,—
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে!"

এই ভাবের বিনিময় সত্ত্বেও সময়ে সময়ে সুরটা বেসুরো হইয়া বাজে :—

"এ-গাঁর লোকে কর্‌তে পরখ, ও-গাঁর লোকের বল।
অনেক বারই লাল করেছে জলীর-বিলের জল।"

দ্বিতীয় অঙ্কে কাব্য-নায়ক কিশোর-রূপার চিত্র। রূপা চাষার ছেলে—তাহার বর্ণটি কালো। এই কালো রূপে সে সমস্ত গ্রামটি আলো করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমান কবির চোখে এই কালো রংটি সকল রংএর সেরা—এখানে ইনি বৈষ্ণব কবির মত :—

"কালোয় যে জন আলো বানায় ভুলায় সবার মন,
তারির পদরজের লাগি' লুটায় বৃন্দাবন।"

রূপা শুধু কালো রং ও কিশোর মূর্ত্তি দিয়া সেই গ্রামটি মুগ্ধ করে নাই,—

"আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল সুন্দী বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।"

তৃতীয় অঙ্কে নায়িকা সাজুর কথা। কবি বলিতেছেন, এই রূপসী কিশোরী "তুলসীতলার প্রদীপ যেন জ্বল্‌ছে সাঁঝের বেলা।" সে যেন "দেবদেউলের ধূপ"; কিন্তু মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াও তিনি মুসলমানের গৃহের আঙিনার কথা ভুলিয়া যান নাই :—

সাজুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী"। সাজু হাঁড়ির উপর নানারূপ সুন্দর চিত্র আঁকিতে জানে, শিকোয় ফুল তুলিতে তাহার হাত অতি নিপুণ। "বিয়ের গানে ওরই সুরে সবার সুর কাঁদে; সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে বলে কি লোকে সাধে?"

ইহার পরে কয়েক অঙ্কে শ্যামল কিশোর নায়ক ও কিশোরী গৌরী সাজুর প্রেমের লুকাচুরি খেলা ;—এখানে যৌবনের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি, করস্পর্শে অঙ্গে বিদ্যুৎ ব'য়ে যাওয়া, রূপের ফাঁদে প্রেমিককে পাড়িয়া ফেলিয়া তাহার জীবনমরণ সমস্যার সৃষ্টি করা—এ সকল দুরন্ত অভিনয়ের কিছুই নাই। কিশোর-কিশোরী এখানে আদবেই খেলোয়াড় নহে—ইহারা ভালবাসার পাঠ নূতন শিখিতেছে। সাজু মেঘের পূজার মাগন চাহিতে চলিয়াছে—সঙ্গে চার জন খেলার সাথী। রূপার মা তাহাদিগকে এক সের ধান দিলেন। কিন্তু হঠাৎ সাজুকে দেখিয়া পরম উদ্যমে রূপা আসিয়া বলিল :—"এই দিলে মা থাকবে না আর মান", এবং আরও পাঁচ সের দিয়া তরুণহৃদয়ের অনুরাগের উৎসাহ ও আবেগ দেখাইল। রূপা বাঁশ কাটিতে গিয়াছে, সেখানে আবার সাজুকে দেখিতে পাইল ;—প্রাণে পুলক, তাহা ঢাকিতে পারিতেছে না,—দেখিবার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু লজ্জায় সাহস করিয়া চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না—কিশোরবয়সের এই সপ্রতিভ লাজুকতার চিত্র কবি এমন নিপুণ তুলিতে আঁকিয়াছেন—তাহার সমালোচনার চেষ্টা বৃথা মনে হয়—কেবল বলিতে ইচ্ছা করে "কি সুন্দর!" সাজুর মা রূপাকে আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন—রূপা যাহা খায় তাহারই প্রশংসা করিতেছে—সেই প্রশংসা শুনিয়া সাজুর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিতেছে—কারণ সেই ত রান্না করিয়াছে। তার পরে শত ছলে ও ছুতোয় রূপা কতবার সাজুদের বাড়ীতে যাইতেছে। সেই সকল ছলনা প্রায় ধরা পড়িয়া যাইতেছে। একদিন সে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে সাজুর মা জিজ্ঞাসা করিল—"অসময়ে এসেছ কেন বাবা?" সে বলিল "খালা মা, তোমার জ্বর হয়েছে শুনেছি, তাই তোমার খাবার জন্য আধ সের গজা কিনে এনেছি।" "কই, আমার তো জ্বর হয়নি! আর জ্বর হ'লে কি গজা খায় কেউ?" সাজুর মাএর উক্তিতে

বালকের অসতর্ক চাতুরী ধরা পড়িয়া গেল, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এরূপ লুকোচুরি খেলা অনেক আছে। "এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি তরুণ হিয়া, এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনি সুতে মালা দিয়া।"

কিন্তু এবার দুইজনেই কিশোরবয়সের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনের অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে। তখন যাহা সরল ও অনাবিল ছিল—তাহা জটিল সমস্যায় দাঁড়াইল। কৈশোরের উচ্ছল লীলাখেলা সংযমের বাধা মানিয়া চলিল—তথাপি বেলফুলের ন্যায় অতি নির্ম্মল দুইটি প্রাণের কথা লইয়া দুষ্ট প্রতিবেশীরা নির্ম্মম ভাবে টানা-হেঁচড়া করিতে ছাড়িল না;—তাহারা কলঙ্ক রটাইতে শুরু করিল, অকর্ম্মা সংবাদবাহী বুড়দের গ্রাম্য অবসরপূরণের বেশ একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। "টুনীর ফুপু আসিল হাতে ডলতে তামাক পাতা, এমন সময় ওই গাঁ হ'তে আসিল খেঁদির মাতা; ক'জনকে আর থামিয়ে রাখে?"—এই অযাচিত নিন্দা ও উপদেশে সন্ত্রস্ত হইয়া রূপার মা তাঁহার ছেলের সঙ্গে সাজুর বিবাহ স্থির করিয়া পাড়া-পড়শীর শাণিত জিহ্বা ভোতা করিয়া দিলেন। এই বিবাহের ঘটকালী হইতে বাসররজনীর শেষ পর্য্যন্ত কবি যে দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় কৃষকগৃহের একখানি নিখুঁৎ সামাজিক চিত্র। দুখাই ঘটক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সাজুর মায়ের কাছে যাইতেছে; কবি লিখিতেছেন:—

"দুখাই ঘটক নেচে চলে, নাচে তাহার দাড়ী,
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি' নাড়ি'।
ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া—ডাইনে ঘন পাট,
জলীর-বিলে নাও বাহিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।"

বিবাহের আসরের বর্ণনা খুব একটা জমকালো রকমের—

"বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ী,
কাছারী ঘর গুম্‌গুমাগুম্—লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছানা দিল পাতি',
বসল গাঁয়ের মোল্লা-মোড়ল গল্পগানে মাতি'।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ী,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি'।"

তার পরে মিঞারা কত কেচ্ছা শুনাইয়া সমবেত লোকদের মন-হরণ করিতেছেন,—হানিফের কথা, জয়গুণ বিবির কথা শুনিয়া লোকেরা মাতিয়া গিয়াছে,—হানিফের যুদ্ধ-বর্ণনায় খুব বাহাদুরী—

"কাতারে কাতারে সৈন্য কাটে যেন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়ছে যেন সুন্দর-বনির বাঘ।"

এদিকে আবার—

"উঠান'পরে হল্লা করে পাড়ার ছেলে-মেয়ে,
রঙীন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।"

পরের অঙ্কে রূপা ও সাজুর গৃহস্থালী। এইখানে বাঙ্গালী চাষী-জীবনের সুখ-দুঃখ ও জীবনের মূল সূত্রটি অতি স্পষ্ট রেখায় আঁকা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সাজু স্বামীর প্রেমের টিপ্ পরিয়া কত আহ্লাদে অবিশ্রান্ত গৃহ-কর্ম্ম করিতেছে; অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত ধানের মলন চলিতেছে—নবীনা কৃষাণী "ঢেকির পাড়াতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ী।" কোন কোন দিন হেমন্তের জ্যোৎস্নায় সাজু "ঘুমিয়া পড়িছে ঝাড়িতে ধান।" সারাদিনের শ্রান্তির পর দম্পতির সুখ-শয়ন। এক রাত্রির কথা এইরূপ:—

"সেদিন রাত্রে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমিয়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে।
তার পর খুলে' চুলের বেণীটি বার বার ক'রে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম ফুলেতে রাঙা পাওদু'টি দেখে আরো রাঙা করি',
মৃদু তালে তালে নিশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি'।
ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি' যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল।"

একাদশ অঙ্কে জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা। রূপা চাষার ছেলে—কিন্তু বাঙ্গালীর সন্তান—তার প্রাণের প্রেম ও হাতের লাঠি উভয়ই অতুলনীয়, তাহার হাতে বাঁশের বাঁশী ও বাঁশের লাঠি এ দুইই অনিবার্য্য—একদিকে সে ফুল-সম মৃদু মৃদু হিল্লোলে প্রেমের গান গাহিতেছে, অপরদিকে ঝগড়ার স্থলে সে দুর্দ্দান্ত পশুর মত। দুই দলে বিবাদ বাধিয়াছে—তরুণ রূপা এক দলের নেতা। মত্তহস্তী যেরূপ শতদলের বেষ্টনী হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, রূপা একমুহূর্ত্তে সাজুর কোমল আলিঙ্গন হইতে নিজকে বিমুক্ত করিয়া নির্ম্মম উৎসাহে রণভূমির দিকে চলিয়াছে:—

"আলী আলী আলী আলী রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি'
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে, কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে মাটি।
তারি সুরে সব লাঠেলে লাঠির 'পরে হান্‌ল লাঠি,
আলী আলী শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি'।
আগে আগে ছুটল রূপা, বোঁ বোঁ বোঁ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবড়ী-মাথায় চুল যে ওড়ে।
চল্‌ল পাছে হাজার লাঠেল আলী আলী শব্দ করি',
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধূলো আকাশ বুঝি ফেল্‌বে ভরি'।
চল্ল তারা মাঠ পেরিয়ে, চল্ল তারা বিল ডিঙিয়ে'
কখন্ ছুটে, কখন্ হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চল্ল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাটু মেঘের দল ছুটে যায়,
বাওকুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধূলি পথ ভরি' হায়।"

বর্ণনাগুলি এরূপ জীবন্ত, মনে হয় যেন আমরা রণ-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি এবং দুই দলের উন্মত্ত বীরমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

রূপা খুনের দায়ে পড়িয়া পুলিসের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য পলাইয়া গিয়াছে—

'ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্‌সী কাঁথা
সিলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায় খসখস করে, শুনে' কান খাড়া করে,
যারে চায় সে ত আসে নাক শুধু ভুল ক'রে ক'রে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে ভাল লাগে নাক তার,
আলো হাতে ল'য়ে দুর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।"

ইহা গ্রাম্য ভাষায় জয়দেবের "পততি পতত্রে, বিগলিত পত্রে"র অনুবাদ। সেই রাত্রে যখন আকাশের গায় শুকতারা ডুবু ডুবু—শেষরজনীর চাপা নিশ্বাস অতি ধীরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে বহিতেছে, চোখে পলক নাই, সাজু বসিয়া আছে। এমন সময় রূপা চোরের মতন ঘরে ঢুকিল। সুন্দরী গৃহিনীকে নিঃসহায় ভাবে ঘরে একেলা ফেলিয়া যাইতে যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট, তাহা অতি অল্প কথায় রূপা ব্যক্ত করিতেছে। রূপার মা মারা গিয়াছেন, সাজু সেই শূন্য ঘর একলাটি কিরূপে আগলাইয়া থাকিবে?" আজ শেষ, আর দেখা হইবে না—এই আলিঙ্গন শেষ আলিঙ্গন! রূপা অকূলে ঝাঁপ দিবে। সাজুর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-চক্ষে বলিল :—

"মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে
পাথর ভাসায় জলে
তোমায় আজিকে সঁপিয়া দিলাম
তাঁহার চরণ-তলে।"

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে পরম নৈরাশ্যের রেখা টানিয়া সে পুনরায় তাহাকে বলিল :—

"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
আর যদি সখি মোরে ভালবাস, মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া।"

ইহার পর শেষাঙ্ক। কত বৎসর ধরিয়া সাজু একখানি কাঁথার উপর গৃহসন্নিহিত মাঠটির ছবি নক্‌সা করিয়া সূতায় বুনট করিতেছিল। যেদিন এই নক্‌সী কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করে, তখন :—

"স্বামী ব'সে তার বাঁশী বাজায়েছে—সেলাই করছে সে যে,
গুন্ গুন্ ক'রে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।"

এই কাঁথা তৈরী করার সঙ্গে তাহার কত মধুর স্মৃতি জড়িত। সে-সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এবার কোমল হস্তে সে নক্‌সার শেষ রেখাটি টানিল—"খুব ধ'রে ধ'রে আঁকিল সে সাজু রূপার বিদায়-ছবি, খানিক যাইয়া ফিরে' ফিরে' আসা—আঁকিল সে তার সবি।"

কাঁথা আঁকার পালা এবার শেষ; কাঁথাখানি মেলিয়া সাজু নিজের বিছানার উপর ছড়াইয়া দিল—সেই শয্যাই তাহার মৃত্যুশয্যা; যখন চিরনিদ্রার ভরে চোখদুটি মুদিয়া আসিতে লাগিল, তখন সে পার্শ্ববর্ত্তিনী সোনা-মাকে বলিল :—

"সোনা-মা আমার, সত্যিই যদি তোরে দিয়া যাই ফাঁকি"
তবে

"এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর 'পরে
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝ'রে।

সে যদি আবার ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয় ত আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয় ত তাহারে কাঁদাইয়া আমি জাগিব অনেক রাতে।
একথা সে মাগো কেমনে সহিবে, ব'ল তারে ভাল ক'রে।
তার আঁখিজল ফেলে যেন এই নক্‌সী কাঁথার 'পরে।"

সাজুর মৃত্যুর পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে—রূপাকে গ্রামের সকলে ভুলিয়া গিয়াছে :—

"বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেতে
গভীর রাতের কালে
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী
বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল
সেই কবরের গায়
রোগপাণ্ডুর একটি বিদেশী
মরিয়া র'য়েছে হায়!
সারা গায়ে তার জড়িয়ে র'য়েছে
সেই সে নক্‌সী কাঁথা।—
আজও গাঁ'র লোকে বাঁশী বাজাইয়া
গায় এ করুণ গাথা।

নক্‌সী কঁথার মাঠে এমন অনেক কথা আছে, যাহা বাঙ্গলার আর কোন কবি এভাবে লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। গ্রামের মেয়েরা মেঘকে আবাহন করিতেছে—এই সকল মেঘ যে কত রূপে, কত লীলায় আকাশে বিচরণ করে, তাহা এদেশের কৃষকেরা লাঙ্গল ঘাড়ে ফেলিয়া উর্দ্ধমুখে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া দিয়াছে, পল্লীবালিকারা তাহাই আবৃত্তি করে। শিক্ষিত পাঠক পুষ্কর, আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘের 'ভুবনবিদিত' নাম অবশ্য জানেন, কালিদাসের কৃপায় তাহা মুখস্থ আছে; কিন্তু বাঙ্গলার চাষীরা মেঘকে আদর করিয়া যে কত নাম দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বালিকারা মেঘদর্শনে উল্লসিত হইয়া মেঘগুলিকে নাম ধরিয়া আহ্বান পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছে :—

'কালো মেঘা' নামো নামো, 'ফুল তোলা মেঘ' নামো,
'ধূলট মেঘা' 'তুলট মেঘা', তোমরা সবে ঘামো!
'কানা মেঘা' টল্‌মল্ বার মেঘার ভাই,
আরো 'ফুটিক' ঢলক দিলে চীনার ভাত খাই।
'কাজল মেঘা' নামো নামো, চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টীপ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া।
'আড়িয়া মেঘা' 'হাড়িয়া মেঘা' 'কুড়িয়া মেঘা'র নাতি,
নাকের নলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা-ভরা সিন্দুর দিব 'সিন্দুর মেঘা'র গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"

গ্রামের মুসলমান মেয়েরা এখনও বোধ হয় এই ভাবের একটা ছড়া গাহিয়া থাকে—কবি তাহা আধুনিক ছন্দে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে বাঁশের যত প্রকার শ্রেণীভেদ আছে—তাহারও একটা তালিকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে বোধ হয় তালিকা বলা ঠিক হইবে না,—নীরস শুষ্ক কথাগুলি কবির হাতে পড়িয়া বেশ কাব্যময় ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

নক্‌সী কাঁথার মাঠের কবি দেশের পুরাতন রত্নভাণ্ডারকে নূতন ভাবে উজ্জ্বল করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছেন। 'রাখালী' নামক কাব্যে ইহাঁর প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, নক্‌সী কাঁথার মাঠে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। বহু দিন হইল শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমি ভারতবর্ষে তাঁহার প্রথম অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম, আজ নক্‌সী কাঁথার মাঠের কবিকেও আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে কাব্যের পাঠ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কণিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন একটা মহাকাব্য রচনার তাঁহার সাধ ছিল, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মের কথা শত সুরে বাজিয়া উঠিল এবং মহাকাব্যের স্থান গীতিকবিতা অধিকার করিয়া বসিল। কবি হয় ত ইহা পরিহাস করিয়াই বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবির এই উক্তির পর বাঙ্গলার উদীয়মান কবিরা কবিতার উপাখ্যান রচনা ছাড়িয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর ধরণে মাঝে মাঝে ছোট

ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু অধুনা কাব্যের বাজার বড় মন্দা। জসীমউদ্দিনের এই বইখানি ছোট হইলেও ইহা একখানি কাব্য, ইহার উপাদান বাঙ্গালীর চিরঅভ্যস্ত গীতিকবিতার কতকগুলি সুর ও ছন্দ, কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটা বড় রাগিণী সৃষ্টি করার শিল্প-শক্তি ইঁহার আছে। নানা কুসুমের মালার মত খণ্ড কবিতা-গুলিকে একটা অখণ্ড রূপ দেওয়ার বিলক্ষণ শক্তি ইনি দেখাইয়াছেন; ইহাতে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রচুর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দেখা যায়। অবনীন্দ্র বাবু এই কাব্যের ভূমিকায় কতকটা দ্বিধার সঙ্গে পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দ্বিধার ভাব আমারও আছে, যেহেতু এক সময় যাহা বলিতাম ও লিখিতাম তাহার উপর আমার প্রচুর আস্থা ছিল, কিন্তু এখন প্রতিক্ষণে মনে হয় বাঙ্গলার নব আশা-আকাঙ্খাদৃপ্ত তরুণের নূতন জগৎ ঠিক আমার কথায় সায় নাও দিতে পারেন, হয় ত যে যুগ আসিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গেছি। তরুণের সঙ্গে প্রাচীনের পা' ফেলিয়া সমান তালে চলা শক্ত। তবে আমি আমার মনের কথা লিখিয়াছি—মনের শৈশব নাই, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই। মনের কথা বলিলে তাহার সম-মর্ম্মী শ্রোতা হয় ত জুটিয়া যাইতে পারে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

স্বামী-তীর্থ

শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

ছোট মেয়েটা সকাল হইতেই 'জুতা ক্রশ' খাওয়ার জন্ম বায়না ধরিয়াছিল। রাস্তা দিয়া কোন জিনিষই ডাকিয়া যাইবার জো নাই,—ভাঙা ঘটি বাটি সারানওয়ালা গলি দিয়া ডাকিয়া গেলে সে তাহাই খাইতে চাহিবে,—'চুড়ি চাই, বালা চাই' ডাকিলে তাহাও তাহার খাওয়া চাই,—মুচি যদি 'জুতা ক্রশ' বলিয়া হাঁকিয়া যায় তাহা হইলে দৌড়াইয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া নাছোড়বান্দা হইয়া বলে, "মা, 'জুতা ক্রশ' খাব।"—গলির মোড়ের রোয়াকটিতে বসিয়া বসিয়া দেখে একটা পরামাণিক হাতে বাক্স ঝুলাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়,—জিজ্ঞাসা করে,"তোমার হাতে ওটা কি ?" উত্তর পায়,"বাক্স।"—দৌড়াইয়া বাড়ীতে গিয়া বলে, "মা, বাক্স খাব।"

সমস্ত পৃথিবীর সহিত তাহার একটি সহজ সম্বন্ধ আছে এবং সেটা উদরের সম্বন্ধ,—ইহা ছাড়া আর কোন ধারণাই তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটিতে প্রবেশ করে না।...

কন্যার পিঠের উপর ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া মাতা কহিলেন, "পাজী মেয়ে, কেবলি 'খাই-খাই'—'জুতা ক্রশ খাব'—খেয়ো 'খন জুতা ক্রশ—আজ ভাল ক'রে খাওয়াব—"

শ্বশ্রুমাতা ঠাকুরাণীকে আসিতে দেখিয়া বধূর কন্যাকে শাসন করিবার স্পৃহা মুহূর্ত্তে বিলীন হইল,—জোরে জোরে মশলা বাটিতে লাগিল। মেয়ে পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "মা, মশলা খাব।"—হতাশ হইয়া মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু শাশুড়ীর চোখ এড়াইল না,—অগ্রসর হইয়া আসিয়া নাত্নীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "ছেলেমেয়ে আমাদেরও একদিন ছোট ছিল মেজ বউ, বায়না তারাও করত,—কিন্তু এ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে বাইরে ভালমানুষির ভড়ং করতে আমাদের বাপ-চোদ্দপুরুষও কখন পারত না।"

বধূ হেঁটমুখে নিজের কাজ করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

বড়লোকের ঘরের কন্যা,—অতএব অদিতির এই গৃহে পড়িবার খুব সঙ্গত কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সব সময়ে সকল জিনিষের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে, এবং এক্ষেত্রেও সেটা অনায়াসসাধ্য হইবে না।

মোটের উপর ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পিতার কন্যা অদিতি এই সর্ব্বপ্রকারে একান্ত দরিদ্রের গৃহে একদিন বধূবেশে প্রবেশ করিল এবং পিত্রালয়ে আর একদিনের জন্যও ফিরিল না।

কিন্তু দুঃখ সেজন্য নহে,—সর্ব্বপ্রকার অভাবের আব-হাওয়ার মাঝে নিজেকে মিশ খাওয়াইয়া লওয়ার মতন এমন একটি সুষ্ঠু মনের গতি মেয়েটির মধ্যে ছিল যে, কোনও পরিশ্রমেই তাহার মুখ কালো হইয়া উঠিত না। স্বামীর নাম বিশ্বতোষ—যদিও তুষ্ট সে বড় একটা কাহাকেও করে নাই, বিশ্ব ত ঢের দূরের কথা। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার চেহারা যেন অন্যরকম বলিয়া ঠেকিত। অদিতির পিতা পবিত্রকুমার বিশ্বতোষের বিনয়নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—তাঁহার মতে, আজকাল্কার দিনে এইরূপ চরিত্রের পাত্র পাওয়া না কি একান্ত দুর্ঘট ছিল। পিতার এই সিদ্ধান্তই অদিতিকে স্বামী-সৌভাগ্যবতী করিয়া তুলিল।—ইহা ছাড়া অদিতির এই গৃহে আগমনের আর কোন সহজ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

• • •

শ্বশুর এবং শাশুড়ীতে সেদিন দ্বিপ্রহরে তুমুল কলহ বাধিয়াছিল। শাশুড়ী কহিতেছিলেন, "কাল সকালে তুমি

যখন কলতলায় আঁচাচ্ছিলে তখন শকৃড়ি জল ছিট্‌কে এসে চৌবাচ্চার গায়ে লেগেছিল,—সেই চৌবাচ্চার জল দিয়ে আজ চান্ ক'রে এসে লেপ, তোষক, ছিষ্টি ছুঁয়ে দিলে ত! এই বিষ্টির দিনে এই সব ধুয়ে শুকোতে গা-গতরের কি অবস্থা হবে সেটুকুন বিবেচনাও কি এই বয়সে হ'ল না গা!—বুড়ো হ'য়ে মর্‌তে চল্‌লে, আক্কেল আর গজাবে কবে?"

বিছানাটা ভালো করিয়া পাতিয়া লইয়া,হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "আমি গরীব মানুষ,এসবলেপ-তোষক ধুয়ে বর্ষার দিনে পচতে দেবার মতন অবস্থা আমার নয়।"—বলিয়া হঠাৎ তিনি কি ভাবিয়া উঠিয়া বসিলেন, দ্রুতগতিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাকী সমস্ত বিছানাগুলা, কম্বল, বালিশ, কাঁথা, কাপড় প্রভৃতি হাত দিয়া স্পর্শ করিতে করিতে কহিলেন, "এই ত সমস্তই ছুঁয়ে দিলুম,—দেখি তুই কি করিস!"

রুদ্ধরোষে ফুলিতে ফুলিতে শাশুড়ী বলিলেন, "মর্ মিন্সে, তুই-তোকারি করিস্ কেন?"

শ্বশুর মহাশয় পরিতোষ বাবু তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আর কোন্ জিনিষস্পর্শ করিলে স্ত্রীকে বেশ খানিকটা জব্দ করা যাইবে তাহাই ভাবিতেছিলেন;—এক ধারে একটা পুরানো ষ্টীলট্রাঙ্ক ছিল,—হঠাৎ অগ্রসর হইয়া সেইটার উপরে হাত রাখিলেন, তাহার পরে দ্রুতপদে আসিয়া সহধর্ম্মিণী নয়নতারার চুলের গোছাটা শক্ত করিয়া ধরিলেন,—ভীষণ ভাবে হাসিয়া পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই ত তোকেও ছুঁয়ে দিলুম,—এইবার এই বাদ্‌লার দিনে আবার চান্ ক'রে মর্‌গে যা, হারামজাদী!"

এইবার নয়নতারার মুখ ছুটিল,—সে কি ভাষা! সে কি গালাগালি!

পরিতোষ বাবু বিছানায় গিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। নয়নতারার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ভাবে হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "তোর বাবার বিছানা?—এ সব তোর বাবার জিনিষ, যে তুই নষ্ট করবি?" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন, মিনিট খানেকের মধ্যেই তাঁহার সিংহনাদের ন্যায় নাসিকাগর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। নয়নতারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন,—কিন্তু ও-তরফ হইতে আর জবাব আসিল না।

এই ভাষা, এই আচরণ পূর্ব্বে অদিতিকে পলে পলে আঘাত করিত,—সে প্রাণপণ বলে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকিত। এখন সে নিয়ত মনে করিতে চেষ্টা করে যেন এ সকল ঘটনা, এ সকল কুৎসিত বাক্য তাহার গা-সহা হইয়া গেছে,—কিন্তু কোথা হইতে দুস্তর লজ্জা আসিয়া তাহার মাথা হেঁট করাইয়া দেয়।

শৈশবের সংস্কার মানুষের মনে যে শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তাহার বাঁধন কাটাইয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে কঠিন।—অদিতি মনে মনে বলে, আমি এ গৃহের বধূ, আমার এ ভদ্রতার এবং সুরুচির বিলাস কেন? আমিও ইহাদেরই একজন,—ইহাদের ভিতরে পৌঁছাইবার সহজ রাস্তাটি জানিতাম, অভিমন্যুর মতন ব্যূহ-প্রবেশে কোন বাধাই তাই হয় নাই,—কিন্তু এখান হইতে বাহির হইবার পথ এখনও জানি না;—সে মন্ত্র আজও শিখি নাই,—অতএব নীতির আড়ম্বর আমার সাজে না।

শাশুড়ী আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "আমি চান্ ক'রে এসেছি মেজ বউ—তুমি ও-ঘর থেকে বালিশ-বিছানাগুলো সব বা'র ক'রে নিয়ে এস দিকিনি বাছা,—প্যাঁট্‌রাটাও এনো,—শব্দ-টব্দ যেন না হয়, মিন্সের ঘুম ভেঙে গেলে আবার কেলেঙ্কারী বাধাবে।"

অদিতি বিনাবাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেই কাছে আসিয়া কহিলেন, "আর দেখ, অম্‌নি ওর মাথার বালিশটাও নিয়ে এস,—আস্তে আস্তে কোণটা ধ'রে টেনো, ওর ঘুম ভাঙবে না,—ও ত নাক-ডাকা নয় যমের ডাক,—এত লোক মরে, এ হতচ্ছাড়ার কি মরণ নেই গা,—আমার যে তা হ'লে হাড়ে বাতাস লাগে!"

ভীতকণ্ঠে অদিতি কহিল, "কাজ নেই মা ও-বালিশটা এনে,—যদি জেগে ওঠেন—"

তীব্রভাবে নয়নতারা বলিলেন, "নেকী!—যা বল্‌ছি কর্ মুখপুড়ী, নইলে শিলনোড়া দিয়ে খোতা মুখ ভোঁতা ক'রে দিব।"

অদিতি ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত বিছানা, বালিশ, কাপড়-চোপড়, বাক্স প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাহিরে আনিয়া রাখিল। শাশুড়ী আবার কহিলেন, "এইবার ওর মাথার বালিশটা নিয়ে এস মেজ বউ, ওর বিছানাগুলো ত আর এখন আনা যাবে না,—সে না হয় ও উঠ্‌লে পরে এক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে হবে।"

অদিতি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া নিদ্রিত শ্বশুরের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—দ্বারের কাছ হইতে ক্রমাগত হস্তেঙ্গিতে শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী কিন্তু তাহাকে শীঘ্র কাজ হাসিল করিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন, এবং অস্ফুটস্বরে যে সকল উক্তি করিতে লাগিলেন তাহাতেও অদিতির আনন্দিত হইবার মতন বিশেষ কিছু বোধ হয় ছিল না।

কোন প্রকারে সাহসে বুক বাঁধিয়া অদিতি অগ্রসর হইল, বালিশের একটা কোণ ধরিয়া আস্তে আস্তে টান্ দিতেই পরিতোষের নাসিকাধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল, দুই হাত দিয়া বালিশটা শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রাবিজড়িত-স্বরে মুদিতনেত্রেই কহিলেন, "কে?"

ভয়ে অদিতির হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল,—অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল। কহিল, "পারলাম না মা,—উনি টের পেয়ে গেলেন।"

নয়নতারা বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "কাঁড়ি কাঁড়ি গিল্‌বার বেলা ত পার বাছা, আর একটা কাজের কথা বল্‌লেই কি গতরে আগুন লেগে যায়!" বলিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, "একটা সেফ্‌টিপিন দাও দিকিনি, দেখি আমিই যদি আন্‌তে পারি।"

হাতের শাঁখাটাতে গোটা তিন-চার সেফ্‌টিপিন প্রায়ই আঁটা থাকে,—নিজের ছেলেমেয়েগুলার পোষাকপরিচ্ছদের হাঙ্গামা বড় বেশী নাই, এবং কখন-সখন যেসব ফুটা-ছেঁড়া কোনও ফ্রক্, ইজের, বডি, অথবা পেনি পরান হয় সেগুলারও বোতামের সন্ধান কদাচিৎ মেলে, অতএব সেফ্‌টিপিনের রসদ অদিতি হাতের কাছেই সংগ্রহ করিয়া রাখে। তাহারই ভিতর হইতে একটা খুলিয়া লইয়া শাশুড়ীর হাতে দিল।

নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বাঁ হাতে বালিশের একটা কোণ ধরিয়া সজোরে টান দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডান্ হাতের সেফ্‌টিপিনটা দিয়া বালিশের পাশটা খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিলেন, "ইস্, বালিশটা ফেটে একেবারে তুলো বেরিয়ে গেছে! যাই এটাকে এইবেলা সেলাই ক'রে রাখিগে, যেদিকে নিজে না দেখ্‌ব—"

বালিশটা হঠাৎ টানিয়া লওয়াতে পরিতোষের ঘুম চটিয়া গিয়াছিল, এবং মাথাটা বিছানার উপরে অতর্কিত ভাবে পড়ার জন্য তিনি কতকটা বিস্ময়বিমূঢ় ভাবেই নয়নতারার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু কোন প্রকারে বালিশটাকে বগলদাবা করিয়া নিজের মনে বকিতে বকিতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই নয়নতারা তখনকার মতন বাঁচিয়া যান্, অতএব তিনি আর পরিতোষের দিকে ফিরিয়া তাকানর প্রয়োজন অনুভব করিলেন না।

বাহিরে আসিয়া বালিশটা অদিতির দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রুষ্টমুখে তিনি কহিলেন, "নাও গো মহারাণী, এবার এটাকে দয়া ক'রে সেলাই ক'রে ধুয়ে দিতে পার কি না একবার দেখ,—এই ছিষ্টি আমায় দিয়ে ছোঁয়ালে ত—আর একবার চান্ করতে হবে, এই যা হ'ল লাভের মধ্যে।"

এক পুত্র, তিন কন্যা;—পুত্রটি বড়। দশটি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের প্লীহাপিলভার-পরিপূর্ণ চেহারা। কন্যা তিনটি আট, ছয় এবং চার বৎসরের পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে—রোগা সরু আকৃতি, হাত-পাগুলা কাঠি কাঠি, ঢাকাই জালার মতন পেটগুলা নানাবিধ অখাদ্য, কুখাদ্য এবং কুপথ্যে দিবারাত্র পূর্ণ থাকে।

বড় মা অনঙ্গমোহিনী নিজের এবং দেবরের পুত্র-কন্যাগুলিকে এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া বেলা দুইটার সময়ে এক ধামা মুড়ি খাওয়াইতেছিলেন। মুড়িগুলা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল!—ওই শীর্ণ-বিশীর্ণাকৃতি শিশুগুলার শরীরের কোন্ স্থানে যে অতগুলা জিনিষ কেমন

করিয়া স্থান পাইল সে কথা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। অনঙ্গমোহিনী অদিতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেজ বউ, সকালের ভাত-ডাল কিছু আছে?"

অদিতি কহিল, "আছে।"

"নিয়ে এস ত, ওদের এইবেলা খাইয়ে দিই।"

অদিতি এক গাম্লা ভাত আনিয়া কাছে রাখিল। দুই-তিন মিনিট পরে ডালের বাটিটা হাতে করিয়া আসিয়া দেখিল, এক গাম্লা ভাতের একটাও অবশিষ্ট নাই। বড় মা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "তোমার সব কাজেই বাপু আঠারো মাসে বচ্ছর—ক্ষিধের সময় বাছারা কতক্ষণ তোমার ডালের জন্যে পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে?"

অদিতি ফিরিতেছিল, অনঙ্গমোহিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"ডালটা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ যে বড়? তোমার রাগ দেখাবার জন্যে ওটা নিয়ে আস্‌তে বলেছিলাম না কি?—আক্কেলকেও বলিহারি যাই বাপু!"

অদিতি বাটিটা রাখিয়া দিল, তাহারই পুত্র শ্রীমান অমুতোষ সেটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া বিপুল শব্দে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল, অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলা সুউচ্চ কলরবে সমস্বরে কহিতে লাগিল, "আমাকে, আমাকে—" সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া হাত একই সময়ে বাটিটার চারিদিক শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল। অনঙ্গমোহিনী একপাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া অমুতোষের ভোজনে বাধা দিয়া কহিলেন, "সবটা খাস্‌নে যেন, ওদেরও একটু দিস্—"

রাশীকৃত বাসন পড়িয়া আছে সেগুলা মাজিতে হইবে,—বিছানা, বালিশ, লেপ, তোষক, বাক্স, মাদুর প্রভৃতি ধোয়া বাকী—অদিতি দ্রুতপদে কলতলায় চলিয়া গেল।—রান্নাঘরের বারান্দার উপরে একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া নয়নতারা তাহার কার্য্যের তদারক করিতে লাগিলেন,—"পাঁখাটা একটু তুলে' নাও মেজ বউ,—কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়?—দেখি, নিয়ে এস দিকিনি কড়াইটা, কেমন মাজা হ'ল,—ঘুরিয়ে ধর,—দেখি ওপাশটা, এসব দাগ কিসের?—চোখের মাথা কি খেয়েছ?—ফের ধুয়ে নাও।—এই যাঃ! ঝাঁটাগাছটা ছুঁল বুঝি!—" বলিয়া হঠাৎ নয়নতারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"চোখখাগী, দেমাকের চোটে কিছু দেখ্‌তে পাওনা, না? আজ আবার তোকে দিয়ে সমস্ত বাসন মাজাব তবে আমার নাম নয়নতারা! দেখি তুই কত বড় বদ্‌মাইস্!—এসব ইচ্ছে ক'রে নয়?—এসব আমাকে জব্দ করা নয়?"

অদিতি ঝাঁটাটার পানে চাহিল—দেওয়ালের গায়ে নিরীহভাবে দাঁড় করান আছে; কেমন করিয়া যে সেটাকে সে ছুঁইতে পারে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "আমি ত ওটা ছুঁইনি মা—"

"ফের চোপা! ওর ছায়াটা কোথায় পড়েছে একবার চোখ খুলে দেখ গো বাদ্‌শাজাদী,—আমরা যত মুখ্যু, কিছু ত আর বুঝিনে,—ওই ছায়াটার ওপর দিয়ে তুমি যাওনি? আমি মিথ্যেবাদী!—"

অদিতি কথা কহিল না,—স্তূপীকৃত বাসনের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত ভরসা যেন নিঃশেষ হইয়া গেল,—এই-গুলা আবার মাজিতে হইবে,—কতবারের বিপদ অতিক্রম করিয়া ইহাদের ঘরে তোলা যাইবে, তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায় না।

সমস্ত ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া, হাজার রকমের গালাগালি এবং পিতৃপুরুষদিগের অজস্র নিন্দাবাদ নিঃশব্দে হজম করিয়া অদিতি বাসন-মাজা পর্ব্ব শেষ করিল।

নয়নতারা কহিলেন, "এইবার চান্ ক'রে নাও মেজ বউ, তারপরে বিছানাগুলো কাচো।"

বিছানা কাচিবার সময় আবার তদারক চলিল।—

"আস্তে আস্তে আছ্‌ড়াও বাপু, পরের জিনিষ ব'লে কি অম্‌নি ক'রেই কাচ্‌তে হয়?—মেয়ে মানুষের অত জোর ভাল নয়,—দিন দিন খাচ্ছ আর হাতীটি হ'চ্ছ…"

অদিতি নিজের রিক্ত শীর্ণ হাত দুইটার পানে চাহিয়া ম্লান হাসিল।—

"দেয়ালের গায়ে ছিটকে গেল জলগুলো, চৌবাচ্চার গায়েও লেগেছে,—কলের জল্ দিয়ে কলের মাথাটা ধুয়ে দিয়ো, একটু গঙ্গাজল বার ক'রে দেব'খন, কলের ওপরে ছিটিয়ে দিয়ো,—দেয়ালগুলো ধুয়ে ফেলো মেজ বউ, চৌবাচ্চার জলটা ছেড়ে দিয়ো,—চৌবাচ্চার বাইরেটায় জল দিতে ভুলো না যেন,—"

কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা আসিয়া কহিল, "মা, ছেলেমেয়েগুলোর ক্ষিদে পেয়েছে, দাওনা গোটাকতক পয়সা, পকৌড়ি ডেকে যাচ্ছে, কিনে দিই—"

কন্যার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচু করিয়া নয়নতারা কহিলেন, "তোর বাপের পকেট থেকে চার আনা পয়সা ব'ার ক'রে নিগে যা সুশী,—তার ভেতরে চার্‌টে পয়সা কিন্তু আমার, আমায় দিয়ে যাস্ বাছা,—আর তিন আনার পকৌড়ি কিনে্গে যা।—"

সুশীলা অগ্রসর হইতেই, তাহাকে ডাকিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্বরে কহিলেন, "দুটি পকৌড়ি আমায় দিয়ে যাস্ সুশী,—অরুচির মুখে বেশ গরম গরম চিবুব 'খন—"

তেরোটা বৎসর এই গৃহে কাটিয়াছে,—অদিতি ভাবে, এক-আধটা মাস নহে, একটা-দুইটা বৎসর নহে, কেমন করিয়া কাটাইলাম?—বাপ-মা, ভাই-বোনের চেহারা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে,—ষোল বছরে আসিয়াছিলাম আজ উনত্রিশ বছর বয়স হইল,—বুড়া হইব আর কতদিন পরে?—আজ যদি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ তুলিয়া দাঁড়াই তাহা হইলে লোকে হাসিবে, বলিবে, এতগুলা বছর পরে আজ হঠাৎ ঢং করিতে বসিয়াছি। কিন্তু বয়স যে আমার হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না; আমার চুলে হয় ত আর কতকগুলা বছর পরে সাদার ছোপ লাগিবে, কিন্তু তবুও ত মনে হয় না আমার শৈশবের মন, আমার বাপমা-ভাইবোনের গৃহকোণকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম—"

হঠাৎ তাহার শ্বশুর মহাশয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাঁহার পকেট হইতে চার আনা পয়সা হারাইয়াছে, তাহারই জন্ত তিনি ঘুম থেকে উঠিয়াই চীৎকার করিতেছিলেন।

অদিতি শুনিল তাহার শাশুড়ী বলিতেছেন,—"তুমি ঘুমোবার পরে আমরা বাপু কেউ ওঘরে আর যাইনি,—কেবল মেজ বউ দু'একবার গিয়েছিল, তাকেই না হয় ডেকে কয়—"

কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা অদিতিকে যেন একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিল, আর কিছু শুনিবার সাহসও তাহার রহিল না। রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া ডালে কাঠি দিতে দিতে সে ভাবে, ইহাদের কাছ হইতে কি-কি পাওনা আর আমার বাকী রহিল?

কয়েকদিন ধরিয়া চিন্তা করিবার পরে অদিতি সেদিন স্থির করিয়া ফেলিল যে, তাহার কপালে যাহাই ঘটুক না কেন, সে তাহার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিজের হাতেই গ্রহণ করিবে।

পুত্র অমুতোষের বয়স হইয়াছে দশ, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে প্রথমভাগের গণ্ডী পার হইতে পারে নাই,—এক, দুই হইতে আরম্ভ করিয়া একশ' পর্য্যন্ত গণিয়া যাওয়াটাকে সে অনাবশ্যক পরিশ্রম বলিয়া মনে করে,—সেইজন্যই অদ্যাবধি সেকাজে হাত দেয় নাই। অদিতি তাহাকে দুই-একদিন লইয়া বসিয়া পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে যে গণ্ডগোলটা বাধিয়া উঠিয়াছিল, মোকদ্দমায় সর্ব্বস্ব হারিয়া অবশেষে হঠাৎ একদিন বিজয়ী পাওনাদারকে নিজের এলাকার মধ্যে পাইলেও বোধ হয় তেমনটি হয় না।

কেন জানি না, তিপ্পান্ন সংখ্যাটির উপরে অমুতোষের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত।—সেদিন অদিতি নিজে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিয়া ছেলেকে বলিল, "এইবার তুই ব'লে যা—"

অমুতোষ কহিল, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়,—তিপ্পান্ন—"

সংশোধন করিয়া দিয়া অদিতি কহিল, "তিপ্পান্ন নয়, সাত, আট, নয়, দশ—"

অমুতোষ দরজার দিকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল তাহার উদ্ধারকর্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ আসিতেছে কি না, কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "সাত, আট, নয়, দশ, তিপ্পান্ন—"

অদিতি আবার শোধরাইয়া দিয়া মিষ্টস্বরে কহিল, "তিপ্পান্ন নয় অমু,—বল এগার, বারো, তেরো, চোদ্দ, পনেরো—বল আমার সঙ্গে সঙ্গে—"

অমুতোষ অধিকতর ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, "এগারো, বারো,

তেরো,—তিপ্পান্ন—"

অদিতি অসন্তুষ্ট হইল,ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিল,"কেবল তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন কোরো না অনু,—আমি যা বল্‌ছি তাই বল—"

সুস্পষ্ট বিদ্রোহের সুরে অনুতোষ ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "বাঃ রে তিপ্পান্ন আস্‌বে না বুঝি ?"

"আস্‌বে, তার এখনও দেরী আছে,—আগে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত গুণতে শেখো, তার পরে একান্ন, বাহান্ন, শেষে হবে তিপ্পান্ন—"

দরজার কাছে বড় ননদ সুশীলা আসিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমান অনুতোষ পিসিকে দেখিয়াই ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সুশীলা মেয়েটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু মাতার নাম সে রাখিতে পারে এম্‌নি জিভের ধার। সে কহিল, "কি গো মাষ্টারনী,ছেলে-ঠেঙানো পাঠ চলছে বুঝি !—ও মা, দেখে যাও তোমার আদরের মেজ বউয়ের কীর্ত্তি,—হ্যাঁরে অনু, কি হয়েছে রে ?"

নির্ভয়ে অনুতোষ কহিল, "মা মেরেছে।"

মেয়ের ডাকে নয়নতারা ঘরের দরজার কাছে আসিয়া কহিলেন, "এ বাড়ীর কোন ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তুল্‌বার আগে বেশ ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে তুলো মেজ বউ—হাতখানা ভেঙে দিতে ত বেশী সময় লাগ্‌বে না বাছা,—আর তা ছাড়া ছেলেরা আমাদের লেখাপড়া শিখুক আর নাই শিখুক, ওদের বাপ-ঠাকুর্দ্দা, জ্যেঠা-খুড়োরা বেঁচে থাকতে ওদের কোনও নিগ্রহ আমি সইতে পার্‌ব না, এ আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি এবং সুশীলা উভয়ে অনুতোষকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু অদিতি তবুও ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।—

ইহার কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া রান্নাঘরের হ্যারিকেন্‌টা হাতে লইয়া অদিতি প্রথমভাগখানা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাপড়ের তলায় বইটাকে লুকাইয়া লইয়া অনুতোষকে কাছে ডাকিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,"আমার সঙ্গে ছাদে যাবি অনু ? তোর জন্যে দুপুর বেলা লজেঞ্চুস্ কিনে রেখেছিলাম, চল্ ছাদে গিয়ে তোকে দিই,—এখানে বা'র কর্‌লে অন্য সবাই চাইবে কি না,—যাবি বাবা ?—একটা গল্পও বল্‌ব 'খন।

নিজের ছেলের সহিত এই প্রবঞ্চনায়, এবং মিথ্যাছলেও সকলকে বঞ্চিত করিয়া একজনকে কিছু দেওয়ার কথা উচ্চারণ করিবার গ্লানিতে অদিতির সত্যসন্ধ মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—কিন্তু উপায় নাই, ইহাদের হাত হইতে নিজের সন্তানকে রক্ষা করিতে হইলে এই অসত্যের আশ্রয় না লইয়া কোনও উপায় নাই।

অনুতোষ কহিল, "কই আগে লেবেঞ্চুস্ দেখাও।"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ঠোঙা বাহির করিয়া অদিতি লজেন্স্ দেখাইল, অনুতোষ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া কহিল, "চল—"

মাতাপুত্রে নিঃশব্দপদে সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। শ্বশুর, শাশুড়ী, যা, ননদ এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলা তখন বিপুল কলরবে ঘরের ভিতরে সান্ধ্যবৈঠক বসাইয়াছে, শীঘ্র কাহারও ছাদে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অদিতি পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রথমভাগখানা বাহির করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুই যদি রোজ আমার কাছে একটু একটু পড়িস্ অনু, তা হ'লে তুই যা চাইবি তাই দেব—ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, গুলি সব পাবি,—কেমন পড়্‌বি ত ?

ক্রুদ্ধ অনুতোষ কহিল, "এই বুঝি তোমার লেবেঞ্চুস্ ? —আমি যাচ্ছি এখুনি ঠাকুরমাকে ব'লে দিতে।"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাঠ বাহির করিয়া অদিতি অকরুণ ভাবে বলিল, "আজ তোমাকে পড়্‌তেই হবে, নইলে এই কাঠ আমি তোমার পিঠে ভাঙব—দশদিন আগে তোমাকে পড়া দিয়েছিলাম, সে পড়া আজ আমার চাই-ই।"

নিরীহ মায়ের এ মূর্ত্তি অনুতোষের কাছে সম্পূর্ণ নূতন !—বিহ্বলভাবে সে শুধু কহিল, "কিন্তু, লেবেঞ্চুস্ ?—"

"দেব পড়া হ'য়ে গেলে পর—"

প্রথমভাগের একখানা পাতা খুলিয়া অদিতি বলিল, " 'জল' বানান কর্ ত।"

অনুতোষ চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেকে ভরসা দিয়া অদিতি কহিল, "ভুল হ'ক্, ভয় কি? তুমি বল্‌তে চেষ্টা কর অনু,—আমি বক্‌ব না, মার্‌ব না, কিছু বল্‌ব না।"

অনুতোষ তথাপি কোন শব্দ করিল না।

অদিতি কহিল, "বল 'জ'—"

দম দেওয়া গ্রামোফোনের মতন অনুতোষের গলা হইতে বাহির হইল, "জ—"

"হাঁা, তারপর ব'লে যাও,—বল জল বানান, লক্ষ্মী ছেলে বল, অমন চুপ ক'রে থাকে কি?"

কিন্তু নীরব অনুতোষের অটল নীরবতা ভঙ্গ হইল না।

অদিতি আবার বলিল, "জ আর ল, জল—"

অনুতোষ এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, "জ আর ল, জল—"

"কোন্ জ বল ত।"

অনুতোষ আবার মূক হইয়া গেল।

অদিতি এবার জিজ্ঞাসা করিল, "'পড়ে' বানান কর ত।"

অনুতোষের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া গেল না। অদিতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "প—"

অনুতোষ বলিল, "প—"

"তারপর?"

অনুতোষ আর কথা কহিল না।

অদিতি তাহাকে সাহায্য করিয়া বলিল, "ড়-য়ে একারে 'ড়ে', পড়ে—"

"ড়-য়ে একারে ড়ে, পড়ে।"

"কোন্ ড় বল দিকিনি।"

অনুতোষ নীরব,—অসন্তুষ্টভাবে অদিতি কহিল, "জবাব দাও অনু, 'পড়ে' লিখ্‌তে কোন্ ড় লাগে? বল, চুপ ক'রে থেকো না।"

কেন বলিতে পারি না হঠাৎ অনুতোষের সুবুদ্ধির উদয় হইল, কহিল, "মধ্যাহ্ন র—"

বিস্মিত হইয়া অদিতি কহিল, "কোন্ ড় বল্‌লে?"

"মধ্যাহ্ন র—"

"মূর্দ্ধণ্য'র?—সে আবার কি?"

হতাশভাবে বইখানা পাশে রাখিয়া দিয়া অদিতি ভাবিতে লাগিল। 'মূর্দ্ধণ্য র' জিনিষটা যেমন নূতন তেমনি অশ্রুত-পূর্ব্ব বস্তুর মতন ভাষাতত্ত্বের গবেষণা!

সিঁড়ির মাথায় কাহার মূর্ত্তি দেখা দিতেই অদিতি সচেতন হইয়া উঠিয়া বইটা কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ফেলিয়া কহিল, "গল্পটা শোন অনু,—দুর্ভিক্ষে তখন শ্রাবস্তী নগর ছেয়ে গেছে—" বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত মনটা নিজের প্রতি ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, কেন এই লুকোচুরি, এত ভয়ই বা কিসের জন্য,—ইহাদের প্রশ্রয় ত এতগুলা বছর ধরিয়াই দিয়া আসিল, ফল ত কিছুই হইল না, এখন একটু ভিন্ন সুরের সঙ্গীতই না হয় চলুক্ না। এই যে অসত্য, এই যে মিথ্যা আচরণ তাহাকে ছেলের সাম্‌নে করিতে হইতেছে ইহাতে ত ইহাদের কাছে এই কথাই স্বীকার করা হইতেছে যে তোমাদের অন্যায়ের কাছে হার মানিয়াছি। নিজের সন্তানের সম্মুখে এই যে অপমান সে নিজেই নিজেকে করিয়া বসিল ইহার পরে কি নিজের মনের তৃপ্তিটুকু তাহার অবশিষ্ট থাকিবে?

সিঁড়ির দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া, প্রথমভাগ-খানা পুনরায় বাহির করিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নকণ্ঠে অদিতি কহিল, "শোন অনু, এই মাস শেষ হ'তে আর আট দিন বাকী আছে, এই আট দিনের ভিতরে তোমাকে প্রথমভাগ শেষ কর্‌তে হবে এটা মনে থাকে যেন,—আজ কম ক'রে পড়া দিচ্ছি, এটা আমার কাল্‌কে চাই,—কাল থেকে তারপরে বেশীবেশী ক'রে পড়া দেব।"

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বড় বা' অনঙ্গমোহিনী একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ সংসারে বেমানান্ হয় নাই,—এই বাড়ীর লোকগুলার সকল গুণই তাঁহাতে ছিল, এবং তাঁহার বিবাহের পরে প্রথম প্রথম যখন তাঁহার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে দুইটা কথা শুনাইতেন, তখন তদুত্তরে অনঙ্গমোহিনী গণিয়া গণিয়া নয়নতারাকে দশটা কথা বলিতেন, আর এমন করিয়া বলিতেন যে নয়ন-তারা তাঁহাকে আর দ্বিতীয়বার ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। অদিতির জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে অনঙ্গমোহিনীর একটা বড় অংশ ছিল।—আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এই অতিসহিষ্ণু মেয়েটির কণ্ঠে অকুণ্ঠ তাচ্ছিল্যের সুর শুনিয়া তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। নিরীহ শান্ত মেষশাবকটি

নিঃশব্দে পড়িয়া মার খাইতে খাইতে অকস্মাৎ যদি ঘাড় ফিরাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয় না এমন প্রহারকর্ত্তা বোধ হয় বিরল।

অনঙ্গমোহিনীও বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কিগো অনুতোষের মা-জননী, তোমার ছেলের ওপর আমাদের দাবীদাওয়া আজ থেকে চুকল না কি?—তা বেশ ভালই মেজ বউ, আমাদের কাছে থাকলে ছেলে তোমার বিগড়ে যাবে বাপু, নিজেই লালনপালন কোরো,—নিজের পাঁঠা যখন, তখন লেজের দিক দিয়ে কাটাই ভাল।" বলিয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

অনুতোষ একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া জ্যেঠাইমার পিছনে পিছনে নামিয়া গেল।—অদিতি শঙ্কিত হইল, বুঝিল হঠাৎ এতটা সাহস দেখান ভাল হয় নাই। আজ যে অদৃষ্টে কি ঘটিবে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে পুনরায় রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনঙ্গমোহিনী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো মা, তোমাদের বাছুরের শিঙ্ গজিয়েছে গো, আজকাল মাথা নাড়ে—" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বড় ননদ সুনীলার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

একপাল ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েবাঘের সম্মুখে এক টুক্‌রা মাংস ফেলিয়া দিলে যেমন হয় তেমনিতর একটা নূতন মুখরোচক কিছুর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনায় ঘরসুদ্ধ সমস্ত লোকগুলা যেন হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গা, বড় বউ?"

অনঙ্গমোহিনী কহিলেন, "তোমার মাষ্টারণী মেজ বউ যে তার ছেলেমেয়ের ভার নিজের হাতে নিতে চাইছে গো,—আমরা মুখ্যু, গেঁয়ো চাষা, ছেলেপুলে মানুষ করতে আমরা জানিনে, একথা ত আমার মুখের ওপরেই আজ ব'লে দিলে—"

পশ্চাৎ হইতে অনুতোষ ফোড়ন দিয়া বলিল, "আমি পেরথমভাগ না পড়লে মা বলেছে আমার হাড় ভেঙে দেবে ঠাক্‌মা,—আর তোমাকে বলেছে দজ্জাল, বজ্জাৎ,—আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, ঠাক্‌মার কাছে খবরদার যাস্‌নি—"

শুক্‌না খড়ের গাদায় যেন আগুন পড়িল। শ্বশুর, শাশুড়ী, যা, ননদরা এবং ছেলেমেয়েগুলা মিলিয়া যে রকম চীৎকার এবং অসংযত ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিলেন, তাহা শুনিয়া রান্নাঘরে বসিয়া অদিতি কানে আঙুল দিয়া লজ্জায় এবং ঘৃণায় মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

নয়নতারা দুই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অদিতিকে রান্নাঘর হইতে হিড়্‌ হিড়্‌ করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, পাশের ঘরে লইয়া গিয়া গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে কহিলেন, "সুশী, খানিকটা সর্ষের তেল গরম ক'রে নিয়ে আয় ত,—অনুতোষ, চেলাকাঠ একটা আন্ দিকিনি—" বলিয়া একখানা কাপড় দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া অদিতিকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিলেন।

নিমেষমাত্র অদিতির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া অনুতোষ ঘুরিয়া দাঁড়াইল,—হাত দুইটা মুঠা করিয়া কি যেন একটা ভাবিয়া লইয়া অকস্মাৎ নয়নতারার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—পাগলের মতন কিল, চড়্‌ বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হারামজাদী রাক্‌সী, আন্‌ছি চেলা কাঠ,—হারামজাদী পেত্নী,—তোর পিঠে ভাঙব চেলা কাঠ—"

স্তম্ভিত নয়নতারা আত্মরক্ষা করিবারও অবকাশ পাইলেন না; সুনীলা, সুশীলা এবং অনঙ্গমোহিনী জোর করিয়া অনুতোষের হাত-পা ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া লইয়া চলিল।—অনুতোষ চীৎকার করিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নয়নতারা গালাগালির চোটে কড়ি-বরগা ফাটাইতে লাগিলেন। পাশের ঘরে অনুতোষকে বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার নিষ্ফল ক্রন্দন, নিষ্ফলতর আস্ফালনের শব্দ কানে আসে,—পাশের ঘরের রুদ্ধদ্বারের উপরে পদাঘাতে অতিপুরাতন বাড়ীটার এই ঘরের জীর্ণ দরজাটা অবধি যেন ঝন্ ঝন্ করিতেছে!

নয়নতারা কহিলেন, "হারামজাদা খুনে—"

গরম তেল আসিল, চেলা কাঠ আসিল,—দাঁতে দাঁত চাপিয়া অদিতি পড়িয়া রহিল, চোখ দিয়া একফোঁটা জলও বাহির হইল না।

ওঘর হইতে অনুতোষের কান্নার শব্দ অদিতির কানে ভাসিয়া আসে,—"আমার মাকে ওরা মেরে ফেল্‌লে গো!"

অদিতির বুকের ভিতরে বসিয়া অনুতোষের জননী কহিলেন, "হায় অভাগা—"

কাঠটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সুশীলা কহিল, "কি শক্ত হাড় বাবা, আমার হাতে ফোস্কা প'ড়ে গেল, তবু ত হারামজাদীর চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরোল না!"

হাতের পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নয়নতারা কহিলেন, "বেড়ালের প্রাণ!...আসুক্ আজ বিশে,—ও কতবড় শয়তান, আমি একবার দেখ্‌ব।"

হাত, পিঠ, কপালের রক্তগুলা ধুইতে ধুইতে অদিতি হাসিল, নিজের মনেই কহিল, শৈশবে মাতার কাছে শিবপূজা করিতে শিখিয়াছিলাম,—ভবিষ্যৎ শ্বশুরবংশের কল্যাণের জন্য, শাশুড়ী, ননদ, যা, দেবর প্রভৃতির জন্য কত প্রার্থনাই না করিয়াছি,—সকলই সার্থক হইয়াছে! মায়ের কাছে বধূর কর্ত্তব্য, গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কত উপদেশই না পাইয়াছিলাম, সে সকলও কাজে লাগাইতেছি! বাবার নিকট হইতে সন্তানপালন সম্বন্ধে কত কথাই না শুনিয়াছি, কত দৃষ্টান্তই না দেখিয়াছি, সকলই সফল হইয়াছে!

মাথায় জলপটি বাঁধিয়া অদিতি আবার আসিয়া রান্না করিতে বসিল। মনে মনে ভাবিল, ইহাদের পাশবশক্তি তাহাকে কতখানি আঘাত করিতে পারে? ইহাদের রুচি, ইহাদের ভাষা, ইহাদের কুৎসিত আচরণ, ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী এই সকল তাহাকে যত ব্যথা দিল, গায়ের ফোস্কা, শরীরের রক্ত তাহার কাছে কিছুই নয়।

যে পবিত্রতার ভিতর হইতে সে তাহার শুভ্র-শুচি মন, কুমারী-হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা লইয়া আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেছে। দেবপূজার জন্য তাহার সমস্ত আয়োজন কুকুরের উচ্ছিষ্টে পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রথম প্রভাতের শুভ্র জীবন,—এ জন্মে আর তাহাতে ফিরিয়া যাইবার কোন পথই আর খোলা নাই।—এতক্ষণ পরে অদিতির চোখে জল দেখা দিল। জীবনের ভাগ্যপরীক্ষায় সে ঠকিয়াছে, মাণিকের সন্ধানে বাহির হইয়া মাটির ঘড়া লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। তেরো বৎসরের স্বামিগৃহবাসের অনেক পুরস্কারের চিহ্নই ত সর্ব্ব অঙ্গে আঁকা আছে,—চিতার আগুনে এই দেহটা যেদিন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে ওই দাগও মিলাইবে সেই দিন। কিন্তু সে সকলের জন্য অদিতি সর্ব্বান্তঃকরণে এই পশুধর্ম্মী মানবগুলাকে ক্ষমা করিতে পারে। কিন্তু তাহার সেই মন, সেই হৃদয়, যাহার প্রসারকে ইহারা বাধা দিল, প্রতি কার্য্যে প্রতি আচরণে প্রতি পলে পরিপূর্ণ অপমান যাহারা সেই হৃদয়টিকে করিল, সে অসম্মানের ডালি যাহারা অগ্রসর করিয়া দিল, তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করিবার কথা যেন সে মনেও আনিতে পারে না। তাহার অন্তরস্থ ক্রন্দন জাগিয়া রহিল,—গায়ের ব্যথা, প্রহারের দুঃখ তাহার তুলনায় ম্লান হইয়া গেল।

দেবর ভবতোষ রান্নাঘরের ভিতর আসিয়া কহিল, "বৌদির আজকাল রাঁধ্‌তে বড্ডই পরিশ্রম হয় ব'লে মনে হচ্ছে,—পষ্ট ক'রে বল্‌লে তোমারও কষ্ট বাঁচে আমাদেরও সুবিধে হয়।" একটু থামিয়া বলিল, "বৌদির চেহারা দিনদিন বেশ পাকিয়ে উঠ্‌ছে যে,—যেন শেওড়াতলার শাঁকচুন্নী!" বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বোধ হয় ভাবিল, রসিকতা খুব জোরাল হইয়াছে। পূর্ণদৃষ্টিতে ভবতোষের পানে চাহিয়া অদিতি কহিল, "আপনাদের ঘরের বউ হ'য়ে যখন এসেছি, তখন আপনাদের গৌরবের যাতে বিন্দুমাত্রও হানি না হয় সেদিকে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাক্‌বে।"

শ্লেষটা ভবতোষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না,—কিন্তু একটা কোনও উত্তর দেওয়া প্রয়োজন অনুভব করিয়া সে কহিল, "তা বটেই ত, তা বটেই"—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রিতে বিশ্বতোষ বাড়ী ফিরিলে নয়নতারা কহিলেন, "তোর বউয়ের মুখে খ্যাংরা মেরে বাড়ী থেকে যদি না আজ দূর করিস্ বিশে, তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

বিশ্বতোষ কহিল, "হারামজাদী ফের তোমায় গাল দিয়েছে বুঝি?"

নয়নতারা বলিলেন, "গাল?—শুধু গাল দিয়েছে বুঝি? কেবল মারতে বাকী রেখেছে!—বিশ্বাস না হয় বরং জিজ্ঞেস কর্ তোর ছেলেকে—"

বিশ্বতোষের আর শুনিবার প্রয়োজন হইল না, ছুটিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেছে, পতি-দেবতার ভাত ঢাকা দিয়া একপাশে বসিয়া অদিতি বহুকাল পরে পিতাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল,—স্বামীর সাড়া পাওয়া মাত্র দেয়াত-কলম-কাগজ একটা বাটির তলায় লুকাইয়া ফেলিল,—বিশ্বতোষ ঘরে ঢুকিতেই স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কাঠখানা এনে দিই, নইলে তোমার হাতে ব্যথা লাগ্‌তে পারে কি বল?—"

লাফাইয়া গিয়া বিশ্বতোষ অদিতির ঘাড় ধরিল, মাথাটা নীচু করিয়া মুখটা মাটির উপর ঘসিয়া দিতে দিতে কহিল, "তোর মুখখানা আজ ছেঁচে দিয়ে তবে জলগ্রহণ করব।"

দাড়ি দুইটা কাটিয়া রক্তের ধারায় ঘর ভাসিয়া যায়,—বিস্মিত অদিতি ভাবে, এই ক্ষীণ শরীরে এত রক্ত কেমন করিয়াই বা ছিল!

পবিত্রকুমার অদিতির পত্র পাইলেন, কন্যা লিখিয়াছে—

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি। এই গৃহে আস্‌বার পূর্ব্বে তোমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম সমাধানের জন্যে,—আজ্‌কে আমার মনে আবার সন্দেহ জেগেছে, তার উত্তর তুমিই দিয়ো,—কারণ, তোমার কথা ছাড়া আমি আর কারও কথাই মেনে চল্‌ব না।—আমি আত্মহত্যা করব, না তোমার কোলে আবার ফিরে যাব?—পৃথিবীর ব্যপার দেখে ভয় পেয়ে যে মরতে চাইছি এত ভীরু আমি নই,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, এর আমূল পরিবর্ত্তন দরকার—কিন্তু কেমন ক'রে যে সেটা সম্ভব হ'তে পারে তা আমি জানিনে,—সেইজন্যেই তোমাকে লিখ্‌লাম।—আমার কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্মকে ফাঁকি দিয়ে আমি এড়াতে চাইনে,—পৃথিবীর বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যদি আমার ডাক আসে তা হ'লে আমি কোনও শক্তির ভয়েই পিছিয়ে দাঁড়াব না।—এদের কাছে থেকে যা পেলাম তা-ও আমার জমা রইল,—তার জন্যে আমি কাউকেই দায়ী করব না।—তেরো বৎসরের জীবন মস্তবড় জীবন, অথচ সেটাকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতন আজ ত্যাগ ক'রে যেতে পারি কারও জন্যেই বিন্দুমাত্র দুঃখ অথবা সহানুভূতি অনুভব না ক'রে—এই কথা মনে হ'লেই কষ্ট হয়।—তুমি আমার জানিয়ো আমি আত্মহত্যা করব, না তোমার কোলে ফিরে যাব?—

তোমার দিতু"

পবিত্রকুমার সমস্তই বুঝিলেন। তাঁহার কন্যা যে কত দুঃখে তাঁহার নিকটে এরূপ পত্র লিখিতে পারে তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিল না। পত্রোত্তরে তিনি লিখিলেন—

"মা দিতু,

তোমার চিঠি পাইলাম,—আমি নিজকে অপরাধী না মনে করিয়া পারিতেছি না। দূরদর্শিতার গর্ব্ব যাহার যত অধিক সে-ই তত বেশী ক্ষীণদৃষ্টির পরিচয় দেয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমি নিজে। নিজের কন্যাকে নিজের হাতে বলি দিয়াছি এ কথা যখন মনে পড়ে,তখন আর আমি আপনাকে সংবরণ করিতে পারি না। তোমাকে যে লাভ করিল, অথচ মর্য্যাদা দিল না, সে যে কতবড় দুর্ভাগা তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

আত্মহত্যার কথা মনেও আনিয়োনা। যদি বলি ইহা পাপ, তাহা হইলে কোনও নূতন কথা বলিলাম না; যদি বলি যে-জীবন তুমি দান করিতে পার না সে জীবন গ্রহণ করিবার অধিকারীও তুমি নও, তাহা হইলেও মৌলিক কিছু বলি না;—কিন্তু দুইটা উক্তিই সত্য। এ জীবনে উহাদের ঘর করা ছাড়াও অন্য কাজ আছে, পৃথিবীর সেই কাজেই আমি তোমাকে লাগাইয়া যাইতে চাই।—ভুল একবার করিয়াছি, আবারও ভুল করিব কি না বুঝিতে পারিনা; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক হইয়াছি। তোমার আত্মহত্যা করা যদি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম, যদি মনে করিতাম তোমাকে দিয়া এ জগতের আর কিছুই করাইবার নাই, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে বলিতাম, দ্বিধা করিতাম না। কিন্তু আমি আমার মা'কে চিনি, সেই জন্যই সহজে যে হারাইতে চাহি না। তুমি তোমার

পিতামাতার ভাইবোনের ভালবাসার ভিতরে পূর্ণ মর্য্যাদায় ফিরিয়া এস,—জীবনের এই ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে তুমি যে পরাজিত হও নাই তাহা আমি জানি। তেরো বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা এবং যত্ন তুমি করিয়াছ তাহা আমি মনে মনে বুঝি,—সেইজন্যই আজ পাষাণ ভেদ করিয়া গৈরিক নিঃস্রাব যদি বা ছুটিয়া বাহির হইতে চায় আমি তাহাতে বাধা দিব না।"—পড়িতে পড়িতে অদিতি চোখের জল মুছিল। সংসারের সকলে সংবাদ জ্ঞাপন করিবার পরে পবিত্রকুমার যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া শিশুপুত্রের সহস্র কৌতুক দেখিয়া জননী যেমন সুপ্রসন্ন হাস্যে তাহাকে অভিনন্দিত করেন তেমনি করিয়া হাসিল,—আপন মনে কহিল, "ঠিক আগের মতনই আছেন,—একটুও বদ্‌লাননি!"

পবিত্রকুমার নিজে অধ্যাপক; সত্যের সহজ পথ ধরিয়া সারল্যের অনাড়ম্বরতায় তিনি চলিতে অভ্যস্ত। মারপ্যাঁচ কিছু বোঝেন না এবং সহ্যও করিতে পারেন না। তবে, সময়ে অসময়ে, যত্র তত্র নিজের অধ্যাপনাবৃত্তির অপর্য্যাপ্ত লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না বলিয়া অদিতির অনেক সস্নেহ অনুযোগই তাঁহাকে পূর্ব্বে শুনিতে হইয়াছে। তাঁহার আচার্য্যত্বের পরিচয় তাঁহার পত্রের শেষে ছিল; পবিত্রকুমার লিখিয়াছিলেন—

"তোমার চিঠি পাইয়া আমার আর একটা কথা খুব বেশী করিয়া মনে হইতেছে,—প্র্যাক্‌টিক্যাল এডুকেশন বলিয়া কোন পদার্থ এ পৃথিবীতে নাই, যাহা আছে তাহা হইতেছে প্র্যাক্‌টিক্যাল নলেজ্‌ এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল এক্স্‌পি-রিয়েন্স্‌; কারণ যে মুহূর্ত্তে কোন জিনিষ পুঁথি-কেতাব পড়িয়া মাষ্টারের কাছে শিখিতে যাইতে হয়, অথবা কাহারও উপদেশানুসারে হাতে-কলমে করিতে হয়, তখনি সেটা থিওরেটিক্যাল হইয়া ওঠে। আর সে স্থলে যাহা কিছু শিখান হয় তাহা আর যাহাই হউক্‌ প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ এডুকেশান যে নয় সে কথাটা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। প্র্যাক্‌টিক্যাল এডুকেশান শিখাইতে গিয়া যখনই আমরা মনে করি যে ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে, তখনি ঐ প্র্যাক্‌টিক্যালিটির আত্ম-বোধ আমাদিগকে এতটা থিওরেটিক্যাল করিয়া তোলে, যে, মনে হয়, আমরা যদি ইহার বিপরীত জিনিষটা শিখাইতে আসিতাম তাহা হইলে হয় ত আত্মজ্ঞানের অভাবের দরুণ সেইটাই বেশী প্র্যাক্‌টিক্যাল হইত। ইহার প্রমাণ দিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, তথাকথিত প্রাক্‌টিক্যাল এডুকেশান পাইয়া যে-সকল পণ্ডিতব্যক্তি জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মাষ্টারি-উপদেশানুসারে লব্ধ এবং বহুকষ্টে অর্জ্জিত প্র্যাক্‌টিক্যাল এডুকেশান এবং প্র্যাক্‌টিক্যালিটির মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান,—তখন তাহাদের এক হয় সমস্ত অধীত বিদ্যা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল এডুকেশান ভুলিয়া যাইতে হইয়াছে, আর না হয় ত সেইটাকে আবার নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে একথা বলাও যা, আর সোনার পাতর-বাটিতে কাঁঠালের আমসত্ব গুলিয়া খাইতেছি বলাও তা। কোনও বিদ্যালয়েরই সাধ্য নাই যে কার্য্যকরী বিদ্যা শিখায়,—ওটা শিখিতে হয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে,—তবে সেইটাকে যদি কেহ কবিত্ব করিয়া পাঠশালা বলেন তাহা হইলে আমার আপত্তি করিবার কিছু নাই।"—অদিতি হাসিল, আপন মনে কহিল, "ঠিক্‌ বাবার মতন!"—নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনার কাহিনীও পিতার প্র্যাক্‌টিক্যাল-এডুকেশান-থিওরীর বাহন হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে কৌতুক অনুভব না করিয়া পারিল না।

পবিত্রকুমার শেষে লিখিয়াছিলেন যে কন্যাকে তিনি আগামী রবিবার দিন আসিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন।

একটা কথা বলা হয় নাই।—বিশ্বতোষের নাম ছিল বিশ্বতোষ, যদিও সে তুষ্ট বড় একটা কাহাকেও করে নাই,—কিন্তু একেবারে কেহই তাহার উপর প্রীত ছিল না একথা বলিলেও অতিশয়োক্তির অপরাধ ঘটিবে। পাড়ার মোড়ে একটা দোকান আছে, তাহারই সম্মুখে একখানা কালো রঙের কাঠের উপরে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, "শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায়, লাইসেন্‌ প্রাপ্ত গাঁজা বিক্রেতা"—তাহারই নীচের লাইনে লেখা, "এখানে সস্তায় ভাল জিনিষ পাইবেন।"—এই হরকুমার বিশ্বতোষের উপর যে-রকম

তুষ্ট ছিল সে-রকমটি কলিকালে বড় একটা দেখা যায় না। হরকুমারকে বিশ্বের প্রতীক্ বলিয়া মনে করিয়া লইলে বিশ্বতোষের নামের সার্থকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কেহ তুলিতে সাহস করিবে না,—দুইজনে এমনি ভালবাসা।

উভয়ের গভীর প্রীতির ফলে বিশ্বতোষের যেন-তেন-প্রকারেণ-রূপ যাহা কিছু আয়ের বেশীর ভাগ হরকুমারের বাক্সয় গিয়া উঠিত; এবং বিশ্বতোষের চোখ দুইটাও উত্তরোত্তর রক্তবর্ণ ধারণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

সেইদিন রাত্রি বারোটার সময় বিশ্বতোষ কতকগুলা কাগজ-হাতে চোখ লাল করিয়া আসিয়া কহিল, "ওগো মাষ্টারণী, এই চিঠি ক'খানা লিখে ফেল দিকিনি, দেখি একবার বিদ্যের বহর—"একটা কাগজ বাহির করিয়া কয়েকটা লোকের নাম-ঠিকানা দেখাইয়া পুনরায় বলিল, "দশটা চিঠি চাই, দশটা কপি—"পকেট হইতে একটা খবরের কাগজ টানিয়া তুলিয়া, লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখাইয়া সে কহিল, "প'ড়ে দেখো মাষ্টারণী!—"এইবার নিজের বুকে হাত দিয়া বিশ্বতোষ বলিল, "শর্ম্মা হেঁজিপেঁজি নয়,—ইচ্ছে করলে সব করতে পারি!—চিঠিটা কে লিখেছে জানিস্?—গণেশ,—সেই শুঁড়-ওলা গণেশ নয়,—মাই ফ্রেণ্ড, আমার বন্ধু—গণেশ,—বই লেখে, এবার ছাপ্‌তে দেবে,—কেমন লিখেছে একবার দেখিস্—" বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"দশখানা চিঠি কাল সকালে আমার চাই-ই, নইলে মজাটা টের পাইয়ে দেব বাবা, হ্যাঁ!"—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। কাগজ-পত্রগুলা হাতে করিয়া অদিতি ভাবিল, ব্যাপারখানা কি?—রান্নাঘরটা ধুইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, ততক্ষণে শুকাইয়া গেছে,—হারিকেনে খানিকটা তেল ভরিয়া দোয়াতকলম লইয়া সেইখানে গিয়া বসিল।

বাড়ীটা একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে, সেই গলিটার ভিতরে সেইটাই শেষ বাড়ী এবং গলিটায় ঢুকিবার মাত্র একটা রাস্তা। গলির মোড়ের একটা গ্যাসের আলোতে গলিটা রাত্রিকালে সামান্য একটু আলো এবং যথেষ্ট পরিমাণ অন্ধকারের ভিতরে বাস করে। সেই গলিতে কোন কোনও দিন গভীর রাত্রিতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বিশ্বতোষ তাহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত গাঁজা খাইত। তেরো বৎসরের বিবাহিতজীবনে ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীর কোনও সংবাদ জানিবার জন্য অদিতির বিন্দুমাত্র কৌতূহলের পরিবর্ত্তে অসহ্য ঘৃণা বর্ত্তমান্ ছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ কি মনে হইল,—সে নিঃশব্দপদে অগ্রসর হইয়া সদর দরজাটা একটুখানি খুলিতেই দেখিতে পাইল, একজন বড় দাড়ী-ওয়ালা লোক বলিতেছে, "আমি কিন্তু ভাই মন্দোদরী সাজ্‌ব—"আর একটা লোক ফস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বল্‌ত মন্দোদরীরা ক' ভাই?—"

হঠাৎ ছাড়া-পাওয়া চাপা স্প্রিং-এর মতন আর একটা লোক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বিভীষণ, মন্দোদরী, হনুমান, শিশুপাল, সুগ্রীব, সূর্পনখা—হাহা, হূহূ—" বলিতে বলিতে তাহার মাথার ভিতর গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, সে বেপরোয়া-ভাবে কহিয়া চলিল, "অযোধ্যা, বারাণসী, বৃন্দাবন, ক্যাব্‌লা, কল্‌কাতা, তালগাছ, আমি, গণ্‌শা, চিঁড়িয়াখানা, মরা সোসাইটি, ভেট্‌কীমাছ, বিশে—" বিশ্বতোষের নাম করিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া নিজেই ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—অদিতি দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া নিঃশব্দপদে আবার রান্নাঘরে আসিয়া বসিল, খবরের কাগজটা তুলিয়া লইতেই লাল পেন্সিলে চিহ্নিত অংশটুকু চোখে পড়িল—

সত্বর হউন্ সত্বর হউন্

আর চাকুরীর জন্য ভাবিতে হইবে না,—পয়সার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আমরা বহু চেষ্টায়, দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় বেকারসমস্যা-সমাধানের যে উপায় স্থির করিয়াছি তাহা যেমন নূতন তেমনি অব্যর্থ। মাত্র পনের টাকা খরচ করিলেই আমরা আমাদের বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল আপনাদের গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিব। একবার ভাবিয়া দেখুন, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করুন,—মাত্র পঞ্চদশটি মুদ্রা ব্যয় করিলেই আপনাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে। বিলম্ব করিবেন না, আজই আমা-

দিগের নিকট টাকা পাঠাইয়া দিন, অথবা আমাদিগের 'উপদেশ' ভিঃ পিঃ করিতে আদেশ দিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মাত্র নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোককে আমাদের 'উপদেশ' বিতরণ করা হইবে। অতএব বিলম্ব করিলে আমাদের একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আমরা আপনাদিগকে হতাশ করিতে বাধ্য হইব।

সত্বর হউন্ সত্বর হউন্

এই সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

—নীচে বিশ্বতোষের নাম, এবং খুব সম্ভবতঃ তাহার ফ্রেণ্ড্, অর্থাৎ বন্ধু গণেশের ঠিকানা দেওয়া আছে।

অদিতি এইবার তাহাদের "উপদেশ" পড়িতে লাগিল, সেইটারই দশখানা নকল তাহাকে করিতে হইবে।—

বেকার সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পনের টাকা পাইয়াছি। আমাদের 'উপদেশ'-গ্রহণ সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনাকে আমাদের প্রতিশ্রুত 'উপদেশ' পাঠান যাইতেছে,—অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নিজেই ইহা ব্যবহার করিবেন,—ইহার সম্বন্ধে অপর কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না, এবং আমাদের লিখিত পত্র অনুগ্রহপূর্ব্বক কাহাকেও দেখাইবেন না। মনে রাখিবেন এ সম্বন্ধে আপনি আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেহ কিছু জানিতে চাহিলে দয়া করিয়া আমাদিগের নাম এবং ঠিকানা তাঁহাকে দিয়া দিবেন এবং পনের টাকা পাঠাইয়া সকল সংবাদ জানিতে বলিবেন।

'উপদেশ'

আজকালকার দিনে চাকুরী-টাকুরীর আশা ছাড়িয়া দিন, ব্যবসা করুন,—Business।

শ্যামবাজার ট্রামের ডিপো হইতে হাঁটিতে আরম্ভ করুন কালীঘাট ট্রামডিপো পর্য্যন্ত।—একটা নোট্‌বুক সঙ্গে রাখিবেন, আর একটা ফাউণ্টেন পেন এবং এক বোতল অথবা এক শিশি কালি,—আর তাহা যদি না পারেন তাহা হইলে গোটাকয়েক পেন্সিল এবং একটা ছুরি সঙ্গে থাকা চাই,—শুধু নোট্‌বুকে কাজ হইবে না। এইবার পূর্ব্বদিকের ফুটপাথের উপরকার সমস্ত দোকানগুলার জিনিষের নাম লিখিতে লিখিতে অগ্রসর হউন।—হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারখানা, ছবি, বৃহৎ জ্যোতিষ-কার্য্যালয়, হিন্দু হোটেল,—ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান,—লিখিয়া যান,—থামিবেন না।—সোজা চলিয়া যান্ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া, কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়াইয়া, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া ধর্ম্মতলায় গিয়া পড়ুন। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণদিকের ফুটপাথ ধরিয়া আগাইয়া যান। এইবার চৌরঙ্গীর পূর্ব্ব ফুটপাথ দিয়া অগ্রসর হউন—তাহার পরে আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, তাহার পরে রসা রোড—এইবার পশ্চিম ফুটপাথ দিয়া ঐ প্রকার নোট করিতে করিতে ফিরিয়া আসুন, কেবল চৌরঙ্গীতে চলিবার সময় পূর্ব্বফুটপাথের উপরে আসিবেন,—দোকানগুলা আবার দেখিবেন,—রিভিশানের কাজ হইবে,—কারণ চৌরঙ্গীর পশ্চিম পাশে কোন দোকান নাই। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া আসিবার সময় উত্তর ফুটপাথে থাকুন,—ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পড়িয়া আবার পশ্চিম ফুটপাথ ধরুন, এইবার সিধা চলিয়া যান শ্যামবাজার।—তখন বাড়ী ফিরুন,—নোটবুকটা রাখিয়া দিন্, স্নান করিয়া, খাইয়া, একটু বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। এইবার খাতাটা খুলিয়া এক এক ধরণের জিনিষগুলার আলাদা আলাদা লিষ্ট্ করুন, তাহার পরে গণিতে আরম্ভ করুন,—দেখিবেন যোগে ভুল করিবেন না যেন। যে জিনিষের দোকান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আছে, "দুর্গা" বলিয়া সেই জিনিষেরই একটা দোকান কালবিলম্ব না করিয়া খুলিয়া ফেলুন,—যদি লাভ না হয় তবে কি বলিয়াছি!—

এ সম্বন্ধে আরও কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে আমাদের বড়বাজার-প্যাম্ফ্লেট পাঠকরা আবশ্যক। আমাদের দ্বিতীয়সংখ্যক পুস্তিকায় তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার জন্য বিশেষ মূল্য নির্দ্ধারিত আছে। সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে এক আনার ডাকটিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

বিনীত

বেকার-সমস্যাসমাধান সমিতির পরিচালকবর্গ

—সমস্তটা পড়িয়া অদিতি মনে মনে বিশ্বতোষের ফ্রেণ্ড্

গণেশের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, ইহা প্রবঞ্চনা, কতকগুলা অভাবগ্রস্ত লোকের অসহায়তার সুবিধা গ্রহণ করিয়া নিজেদের পেট ভরাইবার হীন ফন্দী ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। এই প্রবঞ্চনায় সে কোন সাহায্যই করিতে পারে না,—তা সে সাহায্য যত কিছুই হউক না কেন। বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা কোন সহানুভূতিই যদি সে এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইবে।

কালিকলম কাগজপত্র পড়িয়া রহিল,—হারিকেনটা নিবাইয়া দিয়া আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পিতামাতা, ভাই-বোনদের কথা ভাবিতে ভাবিতে অদিতি ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পরের দিন সকালবেলা যে কাণ্ডটা ঘটিল তাহাকে ঠিক কুরুক্ষেত্রই বোধ হয় বলা চলে।

অদিতি বলিয়াছিল, "আমি চিঠি লিখিনি।"

স্ত্রীর ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহসের বহর দেখিয়া ক্রোধে বিশ্বতোষ মিনিট দুয়েক কথা কহিতে পারিল না, পরে বলিল, "তার মানে?"

অদিতি কাগজপত্রগুলা বাহির করিয়া দিয়া জবাব দিল, "এটা প্রবঞ্চনা,—আমি এ কাজে সামান্য একখানা চিঠি নকল ক'রে দিয়েও তোমাদের সাহায্য করতে পারিনে,—তুমি যেন কিছু মনে কোরো না।"

বিশ্বতোষের মনে হইল, অদিতির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গেছে, তাহা না হইলে এই রকম কথা কোন প্রকৃতিস্থ লোকে কহিতে পারে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "প্রবঞ্চনা! তার অর্থ, এই রকম করলে লোকের ঘরে টাকা আসবে না?"

অদিতি কহিল, "আসতে পারে, না-ও আসতে পারে,—তবুও আমার মনে হয়েছে এটা ঠিক নয়। আমি মন খুলে তোমাদের একাজে কোনও উপকারই করতে পারিনে।—কাগজগুলো নাও, তোমার একটু দেরী হ'য়ে গেল, তা আর কি করবে—"

তাহার পরে যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।—নাক, মুখ, মাথা, কপাল এবং বুক ও পিঠের রক্তে যখন সমস্ত কাপড় লাল হইয়া গেল, তখন সেই নিশ্চল দেহের পানে চাহিয়া শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, "হারামজাদী ম'রে গেল না কি?—"

তাহার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা,—নয়নতারা তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষের সহিত চীৎকার এবং গালাগালির মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সন্তোষ সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার জন্য একটা সিল্কের পাঞ্জাবী কাহার নিকট হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। কাহার না কাহার পাঞ্জাবী, কোন্ ছোটজাতের কে জানে? অতএব সেটাকে পবিত্র করিবার জন্য নয়নতারা একফাঁকে আসিয়া পাঞ্জাবীটার উপরে গোবরজল ঢালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন,—ভরসা ছিল রাত্রির অন্ধকারে দাগটা সন্তোষের চোখে পড়িবে না,—কিন্তু মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া যাওয়াতে জিনিষটার সুগন্ধ সন্তোষের নাকে ধরা পড়িয়া গিয়া মুস্কিল বাধাইল।

অদিতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল,—সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। তাহার দেহের ভিতরে সূঁচ ফুটাইয়া যেন তাহার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা চলিতেছে। অদিতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে মনে মনে কহিল, "এ গৃহ আজই আমাকে ছাড়িতে হইবে; বাবা লিখিয়াছেন রবিবার দিন আসিয়া লইয়া যাইবেন, কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না,—তেরো বৎসর আমার সহিয়াছে, কিন্তু আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমার সহিবে না।" সে দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া বসিল, দেয়াল ধরিয়াই ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভাবে বোধ হইল যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে। বাহিরের দিকে চাহিয়া অদিতি দেয়ালে পিঠ রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেইদিন-কার সকালের 'পরে যে কয়টা দিন কাটিয়াছে সে ধারণা তাহার ছিল না। দিনের আলো তখন যাই-যাই করিতেছে। হাত-আয়নাটা লইয়া জানালার নিকটে আসিয়া নিজের মুখের পানে চাহিয়া অদিতি মৃদু হাসিল,—কপালে, গালে, চিবুকে, নাকে রক্তগুলা শুকাইয়া রহিয়াছে। নিজের

কাপড় এবং সেমিজের পানে চাহিয়া অদিতি আবার ম্লান হাসিল।

নয়নতারা তখন ওঘরে সান্ধ্যবৈঠক বসাইয়াছেন। অদিতি উঁকি মারিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া সে কলতলায় আসিল। নাকের মুখের রক্তগুলা ধুইয়া লইয়া ঘরে ফিরিল; কাপড়-সেমিজ ছাড়িয়া আর একটা কাপড় পরিল,—তাহার পরে পা টিপিয়া টিপিয়া সদর দরজার নিকটে আসিতেই শুনিতে পাইল, সুশীলা কহিতেছে, "দুদিনে ওটা ম'রে গেল কি না কে জানে! একবার দেখে আস্‌ব মা?"

নয়নতারা কহিলেন, "চামারের ঘরের মেয়ে অত সহজে মরে না লো,—তোর আর বেশী সোহাগে কাজ নেই বাছা।"

নিঃশব্দে দুয়ার খুলিয়া অদিতি বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে বসিয়া অদিতি অনুভব করিতে লাগিল, তাহার হাতের শাঁখা, তাহার কপালের সিঁদুর যেন তাহাকে গভীর নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে,—মনে হইল, যে জীবনকে পাপ মনে করিয়া, অন্যায় বিবেচনা করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আসিল, সেই জীবনের জয়ধ্বজা সে নিজের অঙ্গেই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে!...কথাটা স্মরণ হইতেই সে কাপড়ের আঁচল দিয়া কপালের সিঁদুর মুছিয়া ফেলিল, হাত দুইটা দিয়া পাগলের মতন ব্যস্তভাবে সিঁথির সিঁদুর ঘসিয়া ঘসিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। গাড়ীর জানালার উপরে আছড়াইয়া আছড়াইয়া শাঁখা দুইটা ভাঙিতে গিয়া হাত কাটিয়া গেল,—কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মতন অবসর যেন তাহার তখন ছিল না। ওই সিঁদুরে যেন তাহার কপাল পুড়িয়া যাইতেছিল,—ওই শাঁখাতে যেন তাহার হাত জ্বলিতেছিল। তাহার নবজীবনের প্রভাতে ইহারা যেন তাহাকে মাথা তুলিতে দিবে না, তেরো বৎসরের দুঃস্বপ্ন-শেষে তাহার প্রথম জীবনে ফিরিবার পথে ওই শাঁখা-সিঁদুর যেন প্রহরী!

পথ যেন আর শেষ হয় না—এলগিন্ রোড আর কতদূর! শ্রান্ত অদিতি জানালার উপরে মাথা রাখিয়া মনে মনে কহিল, "আজ চলিলাম, ফিরিয়া চলিলাম,—রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া যাইব, জীবনটাকে আবার ঢালিয়া সাজিব।"

গেটের ভিতর দিয়া বাহিরের বাগান পার হইয়া গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া গাড়ী থামিল,—কুমারী অদিতি ত্রয়োদশ বর্ষ পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে তাহার দেহের ব্যথা, সকল দুঃখ, সকল অপমান ভুলিয়া গেল।—এই তাহার পিতার গৃহ, তাহার মাতার সংসার, তাহার ভাইবোনদের সুখনীড়, তাহার শৈশব ও কৈশোরের স্বর্গ। দোতলায় উঠিতে উঠিতে সে বার বার সিঁড়ির ধূলাগুলা গায়ে মাথায় মাখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, "আমার পিতৃভবন, আমার শৈশবের খেলাঘর, আমার নিজের ভিটা,—তোমার কোল ছাড়িয়া দুইদিনের খেলা খেলিয়া আসিলাম, পিছনের জঞ্জাল পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি,—পায়ে পায়ে আর কোনও আবর্জ্জনাই জড়াইব না,— তোমায় ফেলিয়া থাকিতে পারিলাম না, পরের ঘরের দুঃখ বহিয়া তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিলাম,— তোমার কাছ হইতে আর সরাইয়া দিয়ো না,—শেষ নিশ্বাস যেন তোমার বুকে থাকিয়াই ফেলিতে পারি।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

অ = অ ও আ'র মাঝামাঝি, ইংরেজী U

ঐ = অয়্ ; ঔ = অও

ব = ওঅ, ইংরেজি W

য = ইঅ

কথা ও সুর সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত

১

পিলু মিশ্র—কার্ফা (মধ্যগতি)

\+ ২

II সা সা -ন্সা -রজ্ঞা । জ্ঞা -া -া -া I -জ্ঞরা -সন্া -সরা -মজ্ঞা । -জ্ঞরা -জ্ঞা রা সা I

সু নী • • • • মৈঁ • • • • • • • • • • • • • হ রি

I ন্সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা -ন্া I সা -া -া -া । -া -া সা গা I

আ • • ব ন্ • • • কী • আ ব্‌া • • • জ্‌ • হ রি

I গা -মা মা -া । মা -া মা -া I গমা -পমা -গা -মা । -মজ্ঞা -রসা সরা ন্া I

আ • ধ্ ন্ কী • আ • ব্‌া • • • • • • • জ্ হ • রি

I ন্সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা -ন্া I I সা -া -া -া । -া -া -া -া I

• আ • • ব্ ন্ • • • কী • আঁ ব্‌া • • • জ • • •

I ন্‌া সা গা মা । পা -া পা পা I I পধা -পা -মা মা । -া গা গা মা I
ম হ ল চ ঢ়ি ০ চ ঢ়ি জো০ উঁ ০ মো ০ রি স জ

I গমা -পধা -ণর্সা -ণা । -ধা -পা পা ধপা I
নী০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ক ব০

I পমা -া গা -া । -া -া গা গা I I গমা -া -া -া । -া -া মা পা I
আ ০ বৈ০ ০ ০ ০ ম হা রা০ ০ ০ ০ ০ জ্‌ হ রি

I মা -পা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -জ্ঞা । -রসা -া সরা ন্‌া I
আ ০ ব্‌ ন্‌ কী ০ আ ০ ব্য০ ০০ ০ ০ ০জ্‌ ০হ০ রি

ন্‌সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা ন্‌া I I সা -া -া -া । -া -া -া -া II
আ০০ ব্‌ ন ০০ ০কী০ আ ব্য ০ ০ ০ জ্‌ ০ ০ ০

II ন্‌া -সা গা মা । পা -া পা -া I I পা ধা পধা -র্সা । ণা -ধা র্সণা -ধপা I
দা ০ হু র মো ০ র ০ প পী হা০ ০ বো ০ লৈ০ ০০

I পা -ধা পা -া । মা মা গা -া I I গমা -পমা -গা -মা । -া -া মা পা I
কো ০ ই ল্‌ ম ধু রে ০ সা০ ০০ ০ ০ ০ জ্‌ হ রি

I মা -পা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I I রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -জ্ঞা । -রসা -া সরা ন্‌া I
আ ০ ব্‌ ন্‌ কী ০০ আ ০ ব্য০ ০০ ০ ০ ০জ্‌ ০হ০ রি

I ন্‌সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা ন্‌া I I সা -া -া -া । -া -া -া -া II
আ০ ০ ব্‌ ন্‌ ০০ ০কী০ আ ব্য ০ ০ ০ ০ জ্‌ ০ ০ ০

II ন্‌া সা ন্‌সা -গমা । -পা -া -া -া I   পা পা -া পা । পমা -া -া -া I
গ র জে• •• • • • •   ব দ • র ব্‌া• • • •

I পধা -ণা ণা -া । ণা -ধা র্সণা -ধপা I
মে• • ঘা • বো • নৈ• ••

I পা -ধা পমা -া । -গা -া গা মা I   গমা -পমা -গা -মা । -া -া মা পা I
দা • মি• ন্ • • ছো ড়ী   লা• •• • • • জ্ হ রি

I মা -পা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I   রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা জ্ঞা । -রসা -া সরা ন্‌া I
আ • ব্ ন্ কী • আ •   ব্‌া• •• • • •জ্ • হ• রি

I ন্‌সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা ন্‌া I   সা -া -া -া । -া -া -া -া II
আ• • ব্ ন্ •• • কী• আ   ব্‌া• • • • জ্ • • •

II { সা সা ন্‌সা -রজ্ঞা । -া জ্ঞা -রা জ্ঞা I   জ্ঞা জ্ঞা -া জ্ঞা । রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -সা I
ধ র তী• •• • রূ • প   ন ব্‌া • ন ব্‌া• •• • •

I -া জ্ঞরা -সা ন্‌া । সা -া -া -া I
• ধ• • রি স্না • • •

I সা -মা মা জ্ঞা । জ্ঞা রা সা -রা I   ন্‌া -সা -া -া । -া -া -া -া } I
ক ং ত মি র্ন ন কে •   কা • • • জ্ • • •

I মা -পা পা -া । পা -া পা পমা I   পা পধা -ণা ণা । ণা -ধা র্সণা -ধপা
মী • রা • কী • চি ত•   মী রা• • ন ম্না • নৈ• ••

I পা -া -ধা পা । মগা -া গা গা I গা -মা -া -া । -া -া মা প্রা I
বে ০ গ্ মি লো ০ ০ ম হা রা ০ ০ ০ ০ জ্ হ রি

I মা -পা ম্রা -জ্ঞা । জ্ঞা -া জ্ঞা -া I রজ্ঞা -মজ্ঞা -রা -জ্ঞা । -রসা -া সরা ন্‌া I
আ ০ ব্ ন্ কী ০ আ ০ ব্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জ্ ০ হ ০ রি

I ন্‌সা -মা জ্ঞা -া । -রসা -া সরা ন্‌া I সা -া -া -া । -া -া -া -া II II
আ ০ ০ ব্ ০ ০ ০ ০ কী ০ আ ব্ ০ ০ ০ জ্ ০ ০ ০

২

পিলু-ভীমপলশ্রী মিশ্র—কার্ফা (মধ্যগতি)

মগা মা I
চি ০ ত

II পা -া পদা পা । পদা পা মগমা -া I পদা -দপা -মা -পমা । -গা -া মগা মা I
ন ন্ দ ০ ন বি ০ ল মা ০ ০ ঈ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ চি ০ ত

I পা -া পদা পা । পদা পা মগমা -া I পদা -দপা -মা -পমা । -গা -া -া -া I
ন ন্ দ ০ ন বি ০ ল মা ০ ০ ঈ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মগা -া -মগা মা । মণদা -া -পা মা I গমা -পমা -গমা -গা । গঋা -া -সা -া I
বা ০ ০ ০ দ রা ০ ০ ০ নে ঘে ০ ০ ০ ০ ০ ০ রী ০ ০ ০

I ণ্সা -গমা -পদা -দপা । মপমা -গা গা মা II
মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঈ ০ ০ চি ত

II { -া মপা পা পা । মপা মজ্ঞা জ্ঞমা -জ্ঞমা I -া পনা না নর্সা । র্সা র্সা নর্সর্রা -র্সনর্সা I
০ ইত ঘ ন গ ০ র ০ জে ০ ০০ ০ উত ঘ ন ০ ল র জে০০ ০০০

I -া নর্সা র্রা র্রা । র্সর্রা -র্মজ্ঞা র্রা র্সা I নর্সা র্রর্রা র্সনা -র্সা । -া -া -া -া } I
চ ম ক ত বি ০ ০জ্ ভু স ব্যা ০ ০ ০ ঈ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা গমপা পা পা । পা পা পা পা I -া পধা পধা -ণর্সা । র্সা -া ণর্সা -ণধা I
উ ম্ঁ০০ ড় ঘু ম্ঁ ড় চ হুঁ ০ দিস সে০ ০০ আ ০ য়া০ ০০

I ধা ণা ধণা ধা । পা পা পা পা I -া পধা পধা -ণর্সা । র্সা -া ণর্সা -ণধপা I
উ ম্ঁ ড়০ ঘু ম্ঁ ড় চ হুঁ ০ দিস সে০ ০০ আ ০ য়া০ ০০০

I পা মপা পা পা । মপা -া পদা পা I মগমা -া পদা -দপা । -মপমা -গা গা মা II
প ব্০ ন চ লে০ ০ পু০ র ব্যা ০ ০ ঈ০ ০০ ০০০ ০ চি ত

II { -া মপা পা পা । মা -জ্ঞা জ্ঞমা -জ্ঞমা I পা -না না না । নর্সা র্সা নর্সর্রা -র্সনর্সা I
০ বির হ ন মে ০ রো০ ০০ প্রা ০ ণ জ ল ত হৈ০০ ০০০

I -া র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞর্রমা -জ্ঞর্রা র্সা র্সা I নর্সা -র্রর্রা র্সনা -র্সা । -া -া -া -া } I
০ দ০ গ ধ বে০০ ০ লী সিঁ চা০ ০০ ঈ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা গমপা পা পা । পা পা পা পা I -া পধা ণা র্সা । ণা -ধা র্সণা -ধা I
প্রা ০০০ ণ র হ ত মো কো ০ দর স র দী ০ জো০ ০

I ধা -ণধা ণধা পা । পা পা পা পা I -া পধা ণা র্সা । ণা -ধা র্সণা -ধপা I
প্রা ০০ ণ০ র হ ত মো কো ০ দর স ন দী ০জো০ ০০

I পা -মপা পা পা । মপা -া পদা পা I •মগমা -া পদা -দপা । -মপমা -গা গা মা II
প্রা • ণ র খৌ• • চ • র ণা ০ • ঈ • • • • • • • চি ত

II { -া মপা পা পা । মা -জ্ঞা জ্ঞমা -জ্ঞমা I পা না না -র্সা । র্সা -া নর্সর্রা -র্সনর্সা I
• দা • ছু র মো • র ০ • • প পী হা • বো • লৈ •• • • •

I -া র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞর্রর্মা -জ্ঞর্রা র্সা র্সা I নর্সা -র্রর্রা র্সনা -র্সা । -া -া -া -া } I
কো • ম ল স • • ব্ দ স্থ না • • • ঈ • • • • • •

I মা -গমপা পা -া । পা -া পা -া I -া পধা ণা র্সা । ণা -ধা র্সণা -ধা I
মী • • • রা • দা • সী • • চ র ণ উ পা • সী • • •

I ধা -ণধা ণধা -পা । পা -া পা -া I -া পধা ণা র্সা । ণা -ধা র্সণা -ধপা I
মী • • রা • • দা • সী • • চ র ণ উ পা • সী • • •

I পা মপা পা পা । মপা পা পদা পা I মগমা -া পদা -দপা । -মপমা -গা গা মা II I
চ র ণ ক ম ল চি • ত লা • ঈ • • • • • • • চি ত

এই দুইটি গানের স্বরলিপি গত মাসে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত 'মীরার জীবনসঙ্গীত' প্রবন্ধের অন্তর্গত। উক্ত প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'ষট্ কমল' নামক ছয়টি প্রসিদ্ধ গানের স্বরলিপি করিয়াছেন প্রতিভাবান তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীমান্ হিমাংশুকুমার দত্ত। সেই ছয়টি স্বরলিপির মধ্যে বিচিত্রায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি, দুইটি বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল এবং বাকি দুইটি প্রকাশিত হইবে পর সংখ্যায়।

অনাবশ্যক বোধে এখানে গানের কথাগুলি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইল না, স্বরলিপির সহিত অবশ্য রহিল। প্রয়োজন হইলে গত সংখ্যার ৪৮২পৃষ্ঠা দেখিয়া লইলে চলিবে। বিঃ সঃ

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ

শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চৌধুরী বি-ই

অভিনয়ধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়শালার গঠনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু এই কথাটা আমাদের দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কেন না আমাদের দেশে রঙ্গালয়ের ইতিহাস বড় বেশীদিনের নয় এবং এই অল্প

New Empire Theatre—কলিকাতা

সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন যা কিছু ঘটেছে তা প্রধানতঃ অভিনয়ের ধারায়, রঙ্গালয়ের গঠন সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে নি; ফলে ত্রিশ বৎসর আগেও রঙ্গালয়ের যে আকৃতি ছিল এখনও সে আকারের রূপান্তর ঘটে নি এবং বাংলা রঙ্গালয়ের যে-সকল নতুন প্রেক্ষাগার নির্ম্মিত হয়েছে তাও সেই সাবেকি ধাঁচে। এবিষয়ে শব্দ-বিজ্ঞান, তাপ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোন জ্ঞানেরই সাহায্য নেওয়া হয় নি। চলচ্চিত্রাগারে নির্ব্বিচারে অভিনয় চলছে, সভাসমিতির উপযুক্ত প্রশস্ত কক্ষে অকুতোভয়ে অভিনয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষভাবে অভিনয়ের জন্য নির্ম্মিত হয়, এবং অপেরা ও গম্ভীর নাটকের অভিনয়ের জন্য রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা বিভিন্ন করা প্রয়োজন, এমন ধারণার আমাদের দেশে নিতান্ত অভাব। অবশ্য অনেক সময় আদর্শের অভাবে একটা জিনিষের উন্নতি হয় না এবং এ ক্ষেত্রে এ কারণ যে না ছিল তাও নয়। এতদিন আধুনিক প্রথা-মত নির্ম্মিত রঙ্গালয় কলিকাতায় একটিও ছিল না। সম্প্রতি "নিউ এম্পায়ার" থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চটি এই অভাব দূর করল। বর্ত্তমান সময়ে লণ্ডনে যে আদর্শে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হচ্ছে, নিউ এম্পায়ার ঠিক সেই আদর্শে পরিকল্পিত, কেন না এই সৌধটির পরিকল্পয়িতা Stanley Hamp F. R. I. B. A. বিলাতে আজকালকার দিনে রঙ্গমঞ্চ-নির্ম্মাণ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ স্থপতি এবং এঁর তত্ত্বাবধানে লণ্ডনে অনেকগুলি রঙ্গালয় নির্ম্মিত হয়েছে। Hamp অবশ্য এদেশে আসেন নি, তিনি শুধু সৌধটির নক্সাটি পাঠিয়েছিলেন। এখানে তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি ছিল—B. Mathews ও Sudlow Ballardie & Thomson. এদেশের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের জন্য যতটুকু অসুবিধা তা বাদ দিয়ে একথা বেশ জোর ক'রে বলা যায় যে দর্শকদের বসবার আসনাদি, অভিনয়কালে প্রেক্ষাগারের বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা এবং

Schanspielhans—বার্লিন

কিছুই বলা হয় না, সে একেবারে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। প্রচলিত কোনো নিয়মের গণ্ডীতে তাকে বাঁধা যায় না। এই অপরূপ প্রযোজনার জন্য রঙ্গপীঠের পরিকল্পনাও একেবারে নতুন ভাবে কর্ত্তে হয়েছে। এই রঙ্গপীঠে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে প্রসিনিয়ামের ব্যবধান প্রায় নেই বল্লেই চলে। দর্শক ও অভিনেতা উভয়ে মিলে অভিনয়টিকে যাতে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের দেশের যাত্রার আসরের মত। তুলনা অবশ্য ঠিক হ'ল না, কেননা Reinhardtএর কল্পনা ও আমাদের দেশের

Kapitol Theatre—ভিতরের দৃশ্য

রঙ্গপীঠে দৃশ্যপট-পরিবর্ত্তনের প্রণালী সম্পূর্ণ সন্তোষজনক এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত। ফলে দৃশ্যান্তরের জন্য অনর্থক দীর্ঘ সময় ব্যয় ক'রে অভিনয়ের তাল-ভঙ্গ হয় না এবং দর্শকরা তাঁদের আসনে ব'সে থাম বা পাথার জন্য দেখবার অসুবিধা ও দূরত্বের জন্য অভিনয় শুনতে না পাওয়ার অসুবিধা ভোগ করেন না।

এদেশে অবশ্য এই ব্যবস্থা এই প্রথম কিন্তু ইউরোপে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে বহুদিন। এইখানে একটা কথা বলি—ইউরোপ বলতে যেন ইংলণ্ডকেই আদর্শ ব'লে ভুল না করি। সত্য বলতে কি, এসব ব্যাপারে ইংলণ্ডের ততটা নাম নেই, কেন না দেশটা অত্যন্ত রক্ষণশীল—নতুন একটা কিছু প্রবর্ত্তন সেখানে বড় সহজে স্থান পায় না। সেইজন্য Gordon Craigএর মত প্রতিভাশালী প্রযোজক ইংলণ্ডে অনাদৃত হ'য়ে সমাদৃত হলেন জার্ম্মানীতে। তার কারণ এ-বিষয়ে জার্ম্মানীই সবচেয়ে অগ্রণী। এবং এই অগ্রগতির অধিনায়ক হচ্ছেন Max Reinhardt। অভিনয় সম্বন্ধে Reinhardtএর ধারণা শুধু নতুন বল্লে

যাত্রার আসরের ব্যবস্থায় প্রভেদ বিস্তর তবুও যে তুলনা করলাম তার কারণ উভয়েরই মূলগত ধারণা—দর্শক ও অভিনেতার একতা—প্রায় একরকম। Reinhardtএর পরিকল্পনা-অনুযায়ী একটি রঙ্গমঞ্চ গঠন করা অত্যন্ত শক্ত; কিন্তু এই অতি-কঠিন ধারণার বাস্তব রূপ দিয়ে তাঁকে প্রীত করেছেন Hams Poelzig—বার্লিনের একজন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-বিশারদ। Reinherdtএর জন্য নির্মিত এই রঙ্গমঞ্চের নাম—Schanspielhans। প্রেক্ষাগারের মধ্যে রঙ্গপীঠটি যে ভাবে অবস্থিত তাতে এটিকে হঠাৎ একটা সার্কাসের ক্রীড়ামঞ্চ ব'লে মনে হওয়া কোন্‌টি তা বলা নিতান্ত শক্ত, কেন না এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন রঙ্গপীঠের দৃশ্যপট হবে একেবারে স্বাভাবিক; আবার কেউ বলেন রঙ্গমঞ্চের প্রধান কথা হচ্ছে "To make believe", এবং সে উদ্দেশ্য যে-উপায়ে সাধন করা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়- সে রঙচঙে দৃশ্যপট দিয়েই হোক আর সাদা পর্দায় সাদা-কালো ছায়ার ছবি ফেলেই হোক লোককে ভোলাতে পারলেই হ'ল। এই মতদ্বৈধতার জন্য দিন দিন রঙ্গমঞ্চ একটি যন্ত্রাগার হ'য়ে উঠছে। দৃশ্যান্তরের সময়-সংক্ষেপের জন্য Revolving Stage, Sliding Stage, Swinging Stage প্রভৃতির

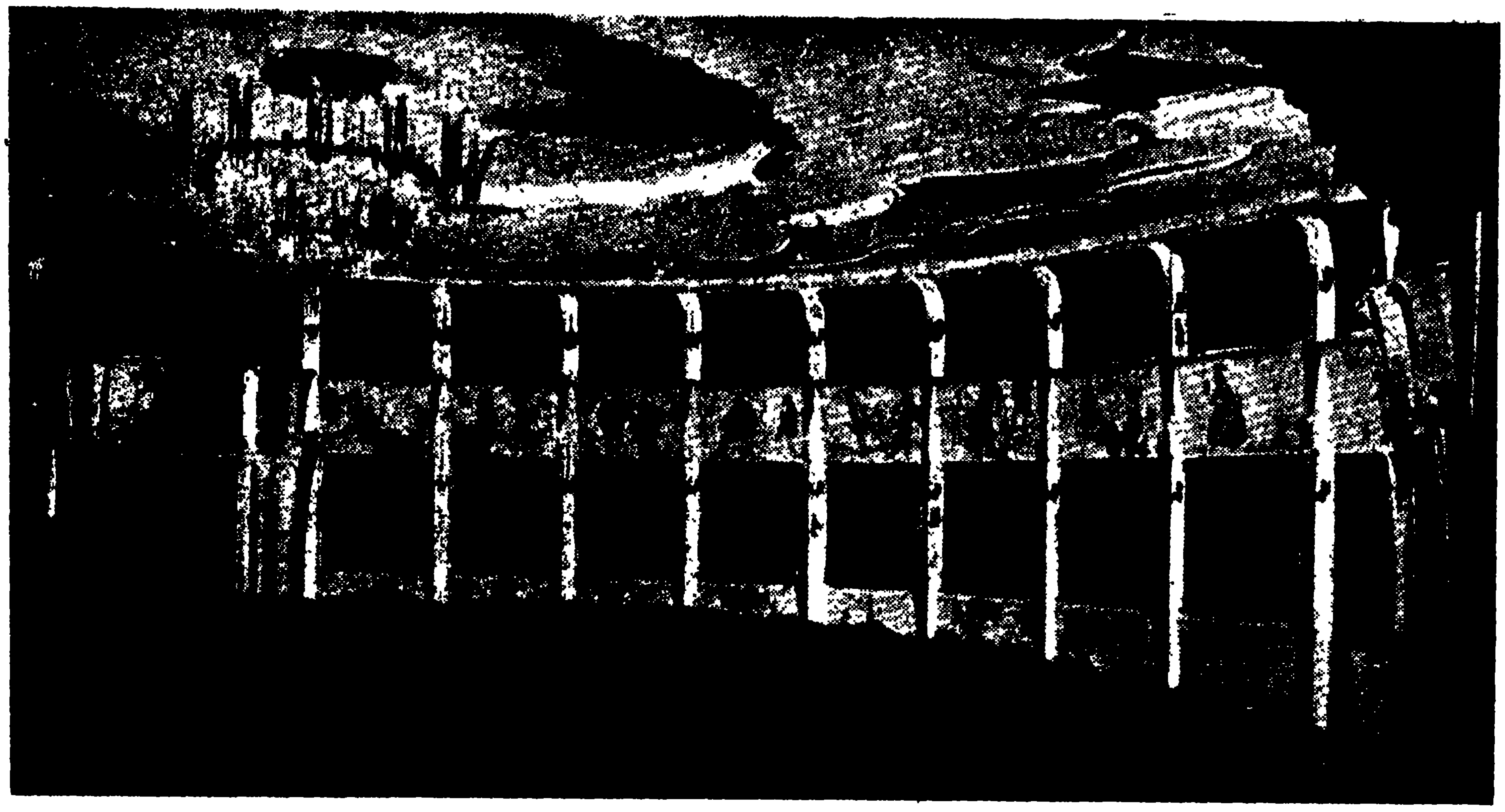

Komodie Theatre—বার্লিন

বিচিত্র নয়, কিন্তু কী শিল্পে কী সুচারু ব্যবস্থায়, কী বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুষ্ঠানে সকল দিক থেকেই এটি একটি বিস্ময়ের জিনিষ। Poelzigএর শিল্পসাধনার অমৃত-ফল এই Schanspielhans জার্ম্মানীর একটি গৌরব।

অপরূপত্বের জন্য সর্ব্বপ্রথমে Schanspielhansএর নাম করলাম ব'লে একথা মনে করলে ভুল করা হবে—জার্ম্মানীর সর্ব্বত্রই এই ধরণের রঙ্গপীঠের ব্যবস্থা। ইতিহাস-সম্মত রঙীন দৃশ্য-পট-সমন্বিত সনাতন রঙ্গপীঠের ক্রমোন্নত অবস্থার উদাহরণের অভাব নেই; তবে সব চেয়ে উন্নত অবস্থা যে ব্যবস্থায় রঙ্গমঞ্চ কণ্টকিত। রঙ্গপীঠকে কী ক'রে একেবারে বাস্তবের প্রতিরূপ ক'রে তোলা যায় সেই চেষ্টায় এই সব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন; কিন্তু এত রকমের জটিল ব্যবস্থার প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপ আর এক ধরণের রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে যার দৃশ্যাদির ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি রকমের। প্যারীর Vieux Columbierএর ব্যবস্থা এই শেষোক্ত প্রণালীর। প্রেক্ষাগারের স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে এর রঙ্গপীঠ পরিকল্পিত এবং আলোকসম্পাত-কৌশলে তার মধ্যে বাস্তব রূপচ্ছায়া প্রতিফলিত।

রঙ্গমঞ্চ-গঠনের এই সকল বিভিন্ন আদর্শের পরিকল্পনায়ও জার্ম্মানীর স্থান সকলের উপরে এবং এই সকল বিভিন্নমুখী রঙ্গমঞ্চ-গঠনের প্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ Hans Poeligএর আর একটি সৃষ্টির উল্লেখ করছি—সেটি বার্লিনের Kapitol Theatre। Schanspielhansএর গঠনের সঙ্গে এর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এখানে সনাতন নিয়ম অনুযায়ী Prosceiniumও আছে, রঙিন দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থাও বর্ত্তমান, কিন্তু এই সাধারণ ব্যবস্থাও Poelzigএর মনীষা-প্রভাবে একটা অসামান্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উজ্জ্বল। প্রেক্ষাগার ও মঞ্চপীঠের মধ্যে এখানেও একটা ভাব-সাম্য বর্ত্তমান। নানা বর্ণ-সমাবেশে যেন রঙের একটি অখণ্ড রাগিণী সৃষ্ট হয়েছে—সে বর্ণ কোথাও উজ্জ্বল স্বর্ণাভ, কোথাও বা আবার গাঢ় শৈবালবর্ণ তারপর গভীর নীলের স্নিগ্ধতায় তার সমাপ্তি। Prosceiniumএর খিলান সোনালী নীলের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। যবনিকার রঙ ক্লারেট—সেই পর্দ্দার অন্তরালে নীল আলোর আভা। এই উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ রঙের প্রভায় যে অপূর্ব্বতা রচিত হয়েছে তা poelzig-প্রতিভার এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই সৃষ্টিনৈপুণ্য শুধু যে এক poelzig-এই বর্ত্তমান তা নয়। জার্ম্মানী বিশেষ গৌরব বোধ করে এই সৃজন-শক্তিতে,—তার স্থান যে সর্ব্বাগ্রে তার কারণ একই সময়ে আরও একজন প্রতিভাশালী স্থপতি তাঁর মনীষার নানা বিচিত্র সৃষ্টিতে জার্ম্মানীকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। তিনি হচ্ছেন—Oskar Kaufmann। কল্পনা-বৈচিত্র্যে, বর্ণসমাবেশে, অলঙ্করণ-শিল্পে এঁর সৃষ্টিও অপূর্ব্বতার দাবী করে। Kaufmannএর পরিকল্পনায়ও পীঠ ও প্রেক্ষার মধ্যে একটা ঐক্যবিধানের চেষ্টা দেখা যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা মেনে ও আইন-কানুন রক্ষা ক'রে তাঁর আদর্শকে রূপদান করার জন্য Kaufmannকে নানা প্রকারের বক্ররেখা, অলঙ্কার ও অপ্রয়োজনীয় বাতায়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়েছে, এবং এই ব্যবস্থা তাঁর মত শক্তিমানের পরিকল্পিত ব'লেই এর মধ্যেই একটা সৌন্দর্য্য-জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বার্লিনের "Komodie" থিয়েটারের কথা ধরা যেতে পারে। Kaufmannএর তত্ত্বাবধানে এই রঙ্গমঞ্চটি গঠিত হয়েছে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। আয়তনের হিসাবে একে একটি বৃহৎ বৈঠকখানার চেয়ে বড় বলা

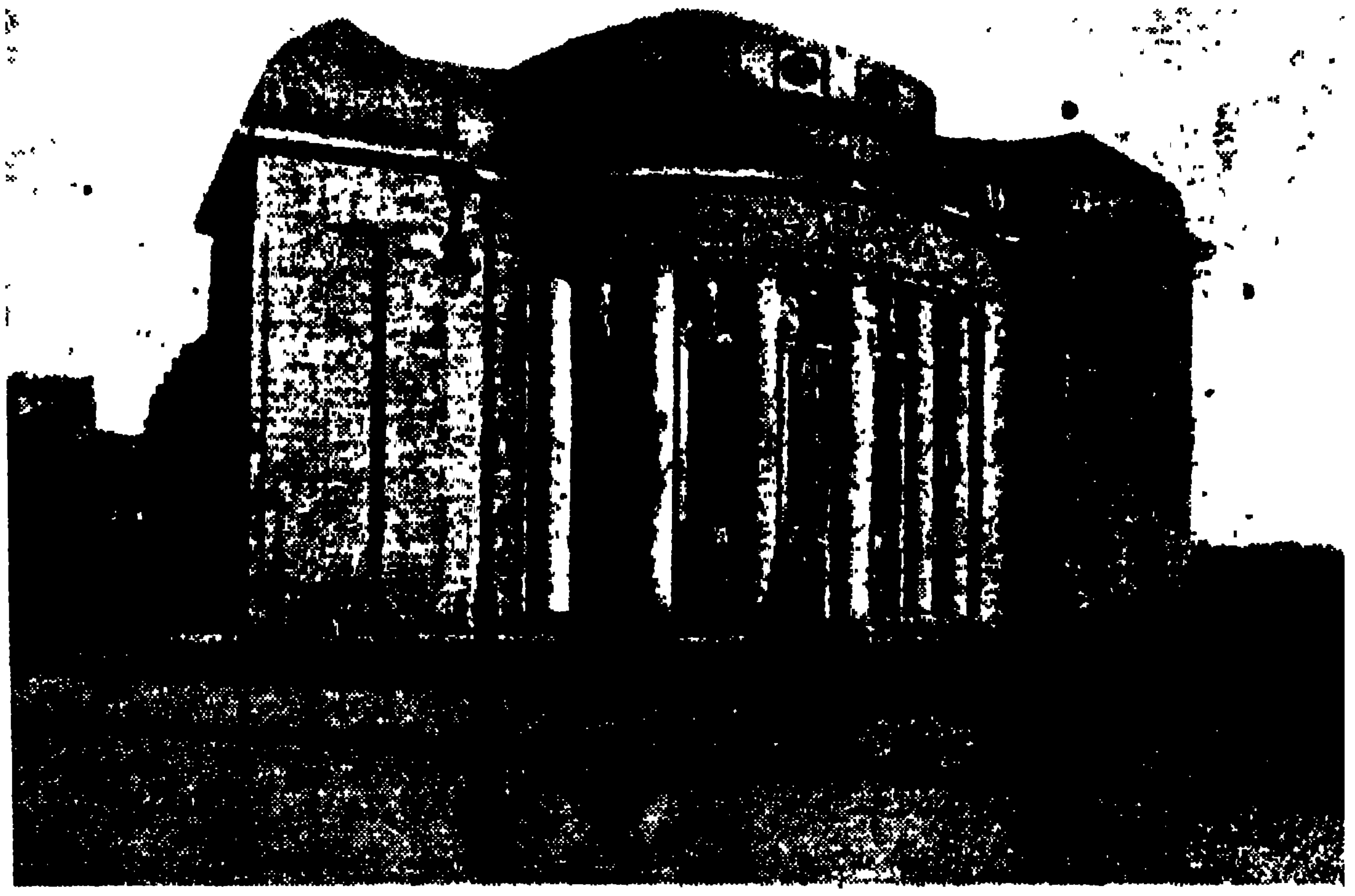

Volksbuhne রঙ্গমঞ্চ

চলে না; মাত্র কয়েকটি বক্স ও ষ্টলের আসনে এর প্রেক্ষাগার অলঙ্কৃত। কিন্তু এই সব বসবার আসনগুলির ব্যবস্থা এমনই বিচিত্র যে মঞ্চপীঠটিকে প্রেক্ষাগারের অন্তর্গত ব'লেই মনে হয়। প্রেক্ষাগৃহের প্রাচীরে অসংখ্য বাতায়ন; কিন্তু তবুও তার মধ্যেই একটা সুরক্ষিত কক্ষের ছাপ মনে আসে। প্রাচীরের মাঝে মাঝে চমৎকার পঙ্খের কাজ; অলঙ্কার যা ব্যবহৃত হয়েছে তা খুব সাদাসিধা হ'লেও তার একটা সৌন্দর্য্যই আলাদা; মঞ্চপীঠ ও প্রেক্ষাগৃহে নানা বর্ণ সমাবেশিত হয়েছে। জরদা রঙের পর্দ্দা, ক্লারেট রঙের আসন এবং প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্র, এবং এদের ওপর এমনই ভাবে আলোর সমাবেশ যে তা

মানুষের চোখে আঘাত না ক'রেও একটা দীপ্তিতে ঝলমল। সমগ্রভাবে দেখলে মনে হয় এর মধ্যে যেন আনন্দের একটি নিত্য-উৎস উৎসারিত হচ্ছে।

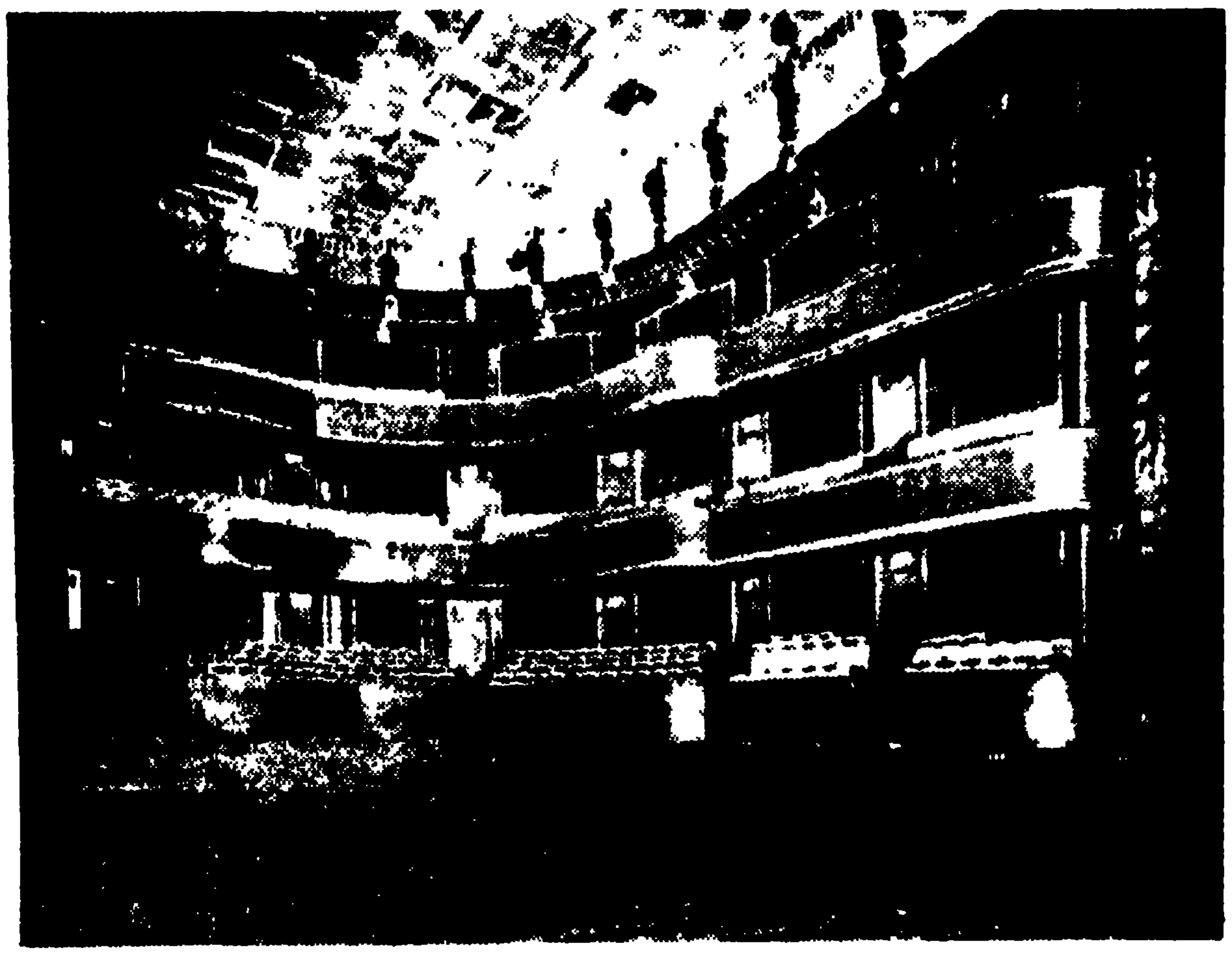

Volksbuhne থিয়েটার—ভিতরের দৃশ্য

Kaufmannএর এই রঙ্গমঞ্চটির সঙ্গে আর একটি রঙ্গমঞ্চের নাম করা যেতে পারে। সেটি নির্ম্মিত হয়েছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ষোল বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত এই সৌধটির পরিকল্পনায়ও সেই মূল সুরের ধারা—দর্শক ও অভিনেতার ভাব-ঐক্য-সাধনের চেষ্টা বর্ত্তমান। আয়তনে এই রঙ্গমঞ্চ সুবৃহৎ; প্রথম দৃষ্টিতে এর বহিঃসৌন্দর্য্য দেখেই মুগ্ধ হ'তে হয়। বনেদী রীতিতে গঠিত সুউচ্চ স্তম্ভ এবং আর্কিট্রেভয়ে আলঙ্কারিক শিল্প, তার ওপরে (স্থাপত্যের ভাষায় ফ্রিজ বলা যেতে পারে) অতি সুন্দর ভাবে আক্ষরিক পরিচয়—একটি সুন্দর অলঙ্কার। প্রশস্ত দ্বারদেশের ললাটে জয়মাল্য এবং বাতায়নের শির-শোভায় নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি। অর্দ্ধচক্র প্রবেশ-সোপানের দুই পার্শ্বে দুটি প্রাচীর উচ্চ ও অলঙ্কারবর্জ্জিত—যেন একটি দুর্গপ্রাকারের গাম্ভীর্য্যে দণ্ডায়মান। কিন্তু শুধু এই বহিঃ-সৌন্দর্য্যই যে এর বিশেষত্ব তা নয়; এর অন্তঃ-সৌন্দর্য্যও একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ।

Komodieতে যা ক্ষুদ্রভাবে সজ্জিত এখানে তারই বৃহৎ সংস্করণ। তার ওপর এর মঞ্চ আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ও আলোক-বিজ্ঞানের পীঠস্থান বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

এইবার এর প্রেক্ষাগারের কথা। এর বসিবার আসনের এমন একটি বক্রগতি আছে যে মঞ্চপীঠের প্রসিনিয়ামের প্রশস্ততা সঙ্কুচিত হ'লেও সেজন্য দৃষ্টিশক্তি কোথাও ব্যাহত হবে না। বর্ণসমাবেশে ও চিত্রালঙ্কারেও এর প্রেক্ষাগার অপূর্ব্ব। Kaufmannএর শক্তির অসামান্যতার পরিচয় এই Volksbuhne। সম্পূর্ণতার দিক থেকে এতবড় রঙ্গমঞ্চ জার্ম্মানীতে আর নাই।

এই সঙ্গে জার্ম্মানীর আর দুটি রঙ্গমঞ্চের নাম না করলে Kaufmann তথা জার্ম্মানীর আধুনিক রঙ্গমঞ্চের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটির নাম "Kurfurstendamm" ও অপরটির নাম

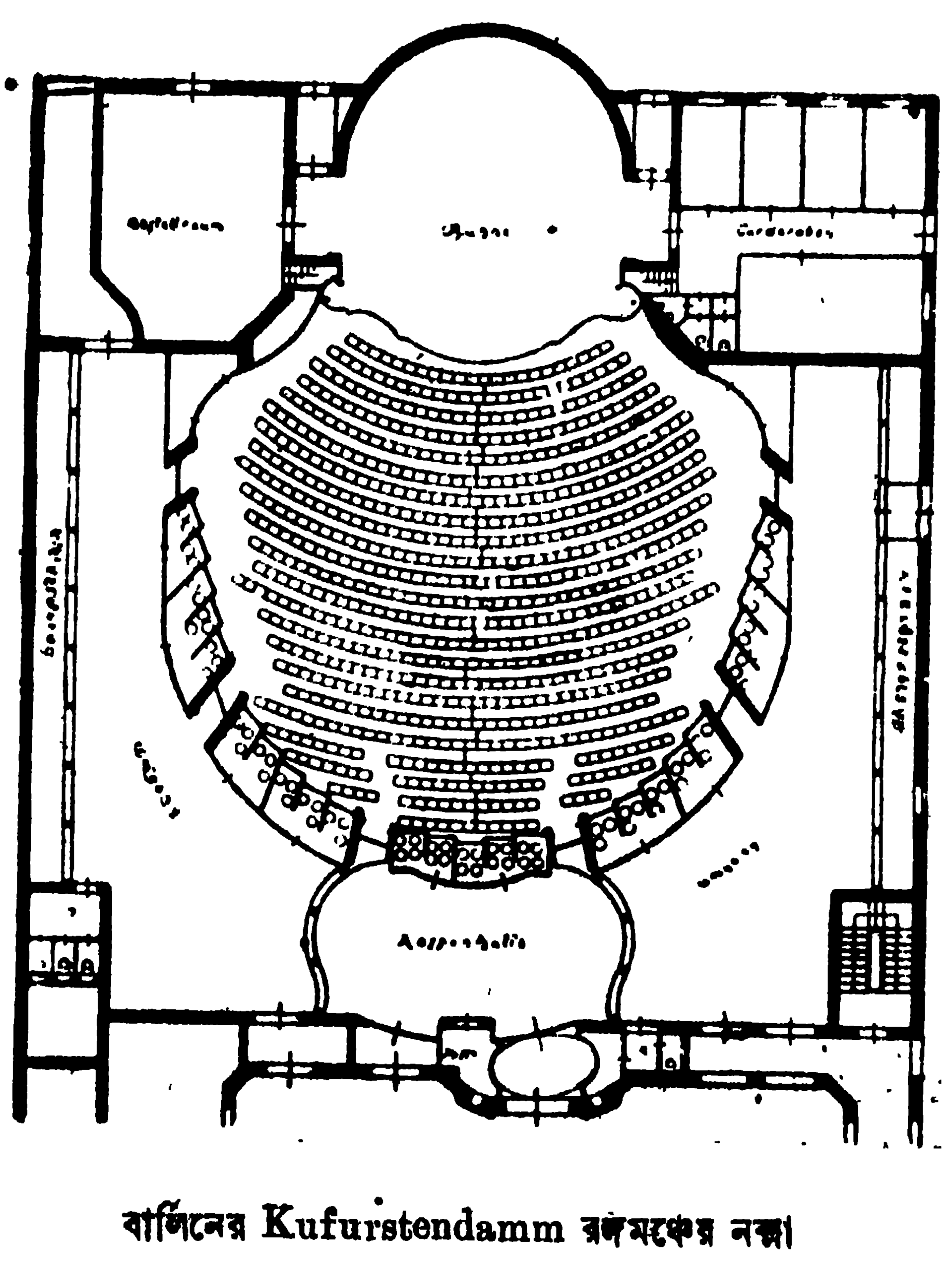

বার্লিনের Kufurstendamm রঙ্গমঞ্চের নক্সা

"Kroll" Opera ।" প্রথম-উক্ত রঙ্গমঞ্চটি গঠিত হয়েছে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। এই রঙ্গমঞ্চটির পরিকল্পনার মধ্যে বাহাদুরি এই যে অনেক বিধিনিষেধ পালন ক'রে তবে একে রূপ দিতে হয়েছে। স্থানটি ছিল সম-চতুষ্কোণ; কিন্তু সেই চতুষ্কোণ ভূমির উপর যথাসম্ভব বৃহৎ ভাবে প্রেক্ষা ও মঞ্চ নির্ম্মাণ করতে হয়েছে। বক্স, প্রবেশদ্বার ও প্রসিনিয়াম এমন কৌশলে রচিত হয়েছে যে পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী-ভাবের ব্যাঘাত ঘটে নি। এখানে আছে রঙের খেলা যেমন বিচিত্র তেমনই মনোহারী। রূপালী যবনিকার সুর ধ্বনিত হচ্ছে—Oskar Kaufmannএর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের এমনই ক্ষমতা।

জার্ম্মানীর আধুনিক রঙ্গমঞ্চের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি মাত্র চার-পাঁচটির নাম উল্লেখ করেছি মাত্র, কিন্তু এই সঙ্গে একথা ভাবলে ভুল হবে যে জার্ম্মানীতে আর রঙ্গমঞ্চগুলি আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের মত। সত্য বলতে কি, জার্ম্মানীতে আরও অনেক ভাল রঙ্গমঞ্চ আছে, তবে সেগুলি, যাদের পরিচয় দিলাম তাদের সমকক্ষ না হ'তে পারে, এবং আরও অনেক সুদক্ষ স্থপতি আছেন

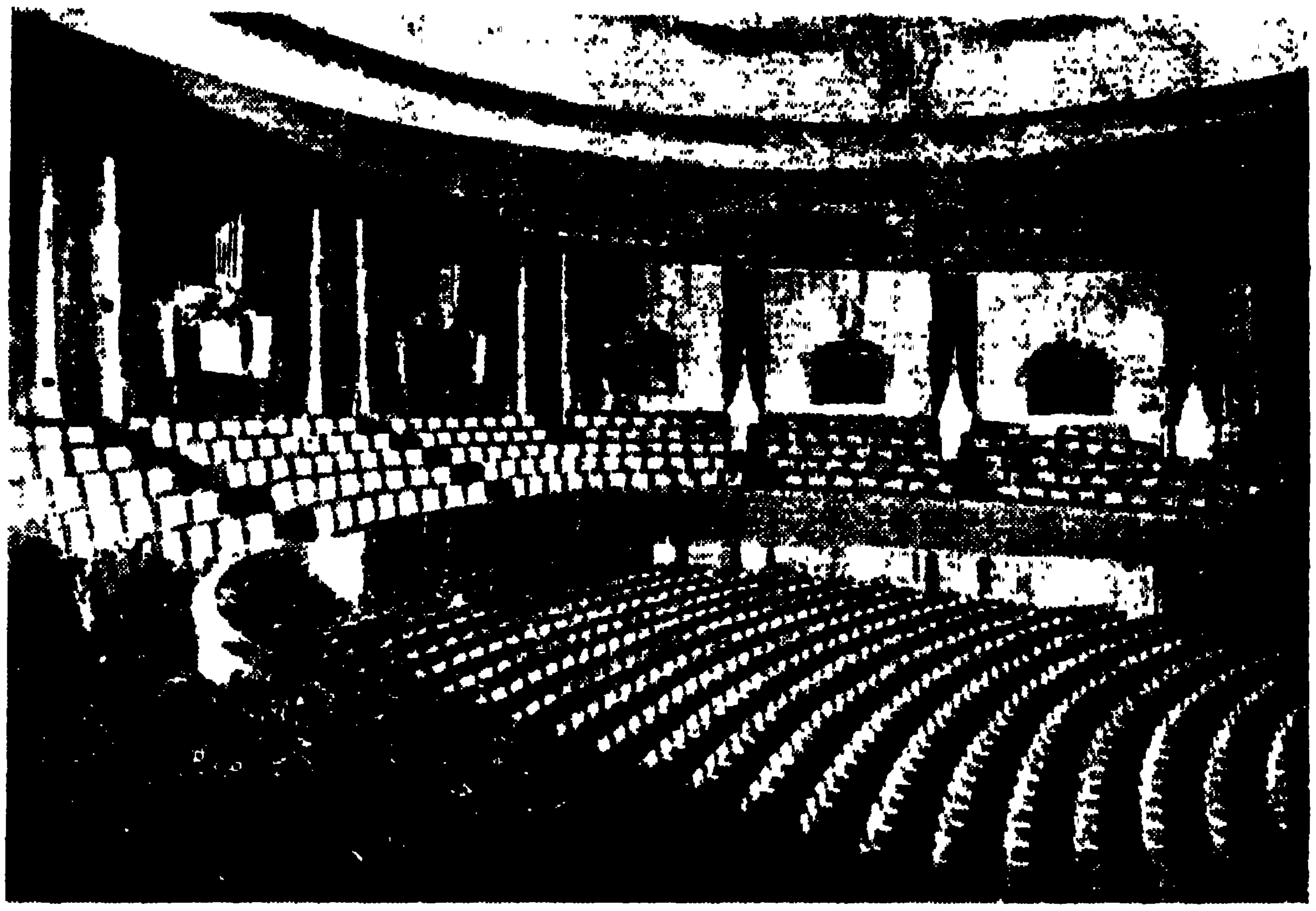

Kroll Opera—বার্লিন্

সম্মুখে ষ্ট্রবেরী রঙের আসন—একটি সুন্দর বর্ণসমাবেশের নিদর্শন। এর তুলনায় Kroll Operaর গঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটি সৌধকে পরিবর্ত্তিত ক'রে এই "অপেরা"-গৃহটি নির্ম্মিত হয়েছে কিন্তু সেজন্য প্রেক্ষাগার হিসাবে এর কোন ত্রুটি নেই। কয়েকটি বক্ররেখার আশ্রয়ে বক্স, গ্যালারী, প্রবেশ-দ্বার ও প্রসিনিয়াম এমনই ভাবে রচিত যে মনে হয় যেন পরস্পরের সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এর মধ্যে অসঙ্গতির কোনও স্থান নেই। কী প্রাচীর ও ছাদের অলঙ্কারে, কী বর্ণসুষমায় সর্ব্বত্রই যেন একটি ঐক্যতানিক যাঁরা Poelzig বা Kaufmannএর সমকক্ষ না হ'লেও অন্য দেশের গৌরব হ'তে পারতেন।

এখানে আমি Max Littmannএর পরিকল্পিত Kunfler Theatreএর একটি চিত্র দিলাম। সুসঙ্গত ব্যবস্থায়, সজ্জাকৌশলে এটিও কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। এই রঙ্গমঞ্চটি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ম্যুন্‌সেনে রচিত।

জার্ম্মানীর রঙ্গমঞ্চগুলি তার গৌরব। সেগুলির উৎকর্ষের প্রধান কারণ, যে স্থপতি রঙ্গমঞ্চনির্ম্মাণে অভিজ্ঞ পরিকল্পনার জন্য তাঁরই সাহায্য নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞকে

তাঁর যোগ্য সমাদর করা হয়। আমাদের দেশে কিন্তু এ ব্যবস্থা নয়। যিনি আজীবন ছোটখাট বাসগৃহ নির্ম্মাণ ক'রে এলেন তিনিই হয় ত একটা রঙ্গমঞ্চগঠনের ভার পেলেন। ফলে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলির দশা এমনই নিতে হবে। এজন্য কার্পণ্য করলে চলবে না। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় এসব ব্যয়বাহুল্যের কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু সকল দিক থেকে চিন্তা করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে প্রথমে অভিজ্ঞের সাহায্য নেওয়ার জন্য যেটুকু ব্যয় হবে

Kunfler Theatre

হয়েছে যে তাতে সুবিধা আছে না অভিনেতার না দর্শকের। দর্শক হয় ত সুষ্ঠুভাবে দেখতে পান না এবং সমগ্রভাবে শ্রবণ করার সুযোগও তাঁর হয় না, অথচ অভিনেতা হয় ত আপ্রাণ উচ্চস্বরে চীৎকার ক'রে যাচ্ছেন। এ সমস্ত অসুবিধা দূর করতে হ'লে আমাদের দেশে অভিজ্ঞদের সাহায্য পরে দর্শকরাই তাঁদের অসুবিধা দূর হওয়ার জন্য এই ব্যয়-বাহুল্যের শতগুণ দর্শনী দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। লোকে চায় সুখ ও সুবিধা, এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্ম-কর্ত্তাদের উচিত সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা।

শ্রীভূপতিনাথ চৌধুরী

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

১২

কালী দা'র সঙ্গে মিলন—বিজলীর বিয়ের ঠিক—ভাল ডাক্তারের ওষুধ—এই সব ক'টিই মেঘনাদকে বেঁচে ওঠার পথে টেনে নিয়ে চল্‌লো। বহুদিন পরে তাঁর শীর্ণ মুখে হাসির রেখা দেখা দিলে। বিজলীর পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন, "মা, আমি জানি তুই সুখী হবি—তুই আর মনে কোনো 'কিন্তু' রাখিস্‌নে। তুই যখন খুব ছোট, শৈলর সাধ ছিল কালী দা'র ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়; আজ মায়ের আশীর্ব্বাদ তোর ওপরে রোয়েচে, একথা ভুলে যাসনি।"

মেঘনাদ সেরে উঠ্‌লেন, ফাল্গুনের এক গোধূলি-লগ্নে বিয়ে ঠিক হোল। বিজলীর ভাবনা—কাজলকে ও কেমন ক'রে ছেড়ে থাক্‌বে? কাজল বড় হোয়েচে—এখন আর সে যখন তখন এসে আবদার করে না, ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে না, তবু বিজলী ভাবে ও বড় ছেলেমানুষ—ওকে কে বুঝাবে? ওর মনটি যে এখনো ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার মত ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বিজলী ওর বোনটিকে যতই ছোট ভাবুক, ভিতরে ভিতরে সে অনেকখানি বড় হোয়ে উঠেছে—তার শান্ত স্বভাব, সংযত ব্যবহার, ও অকারণ ভাবনা ভরা মন দেখ্‌লে কেউ আর ওকে ছোট ভাবতে পারে না।—কান কিছুতেই সে অধীর হয় না, এক দিদি ছাড়া কারো কাছেই কিছু বল্‌তে চায় না। বিজলী ছোট বোনটিকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে "কাজ্‌লি, তোর কি দুঃখ ব'লেও কিছু নেই?—আমি চ'লে যাচ্ছি, তবু তুই একটু কাঁদলিনে পর্য্যন্ত—"

কাজলের চোখের কূলে কূলে জল ভ'রে এল, বল্‌লে, "আমি যদি দুঃখ পাই সে তো আমারই দুঃখ দিদি! সে কি কাউকে বলবার? কাউকে দেখাবার?"

বিজলী ভাবনায় মরে, এই চাপা সংযত মেয়েটা—একে কার কাছে রেখে যাবে?

বিয়ের দিন কাজলী সমস্তক্ষণ দিদির পাশে পাশে ঘুরলে—যেন দিদিকে ওর কালো চোখের ছায়ার মধ্যে ধ'রে রেখে দেবে—যেন ওকে হারাবার ভয় নেই।

সন্ধ্যা হোয়ে এল—মিলনের সুরে নহবৎ বাজছিলো, পিসিমা একবার রান্নাবাড়ী একবার নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা ক'রে ব্যস্ত হোয়ে ঘুরছিলেন। বধূবেশে সজ্জিতা বিজলী এক পাশে ব'সে ছিল—কাজল তার কাছে গিয়ে বস্‌লে। বহুক্ষণ দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল—চোখের পাতাও যেন পড়ল না। নিমন্ত্রিতদের ভেতর তখন মৃদু গুঞ্জনে কথা চল্‌ছিল। কেউ বলছিল, "দেখেছিস্ ওর চোখে কি রকম সর্ব্বহারা ভাব—?" কেউ বা বলছিল, "মাথা বোধ হয় খারাপ হোয়ে যাবে—আহা দিদিঅন্ত প্রাণ—"কেউ সংশোধন ক'রে বলছিল, "কবিতে লেখে কবিতে—তাই অমন দৃষ্টি!"

কাজল উঠে গেল আস্তে আস্তে—ওদের শোবার ঘরের পেছনে যে একটু কোণ বের করা বারন্দা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। দিদির হাতে পোঁতা টবের গাছে আধ-ফুটন্ত বেল আর জুঁই যেন পরম বন্ধুর মত ওর মুখের দিকে চাইলে। সন্ধ্যে হোয়ে আসছিল; এখুনি হয় তো বর এসে পড়বে—গোলমালে কাজলের যেতেও ইচ্ছে করে না, না গিয়েও পারে না—এমন সময় কে এসে ওর চোখ টিপে ধরলে।

কোনো নামই যখন মনে এল না, হাত ছেড়ে প্রদীপ সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। ছেলে বেলায় প্রদীপ ওর খেলার সাথী ছিল কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজল নিজেকে সবার কাছ হোতে দূরে রাখতে চাইত—সহজে কেউ ওর কাছে আস্‌তে সাহস পেত না। কতদিন কাজল

দেখেছে প্রদীপ ওদের বাড়ীর জানলায় সকরুণ ছুটি চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে; ইচ্ছে হোয়েচে—ওকে ডেকে দুটো কথা বলে; কিন্তু মনের ভেতর তেমন তাগিদ জাগেনি তাই আস্তে আস্তে দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গেছে।—ওর বোন মালবীর কাছে শুনেছিল প্রদীপ ওর নামে কবিতা লেখে; শুনে আশ্চর্য্য হোয়ে ভেবেছে—আমার কথা ও মনে রাখে কেন? আমি তো ওকে একটুও চাইনে। সেই প্রদীপ আজ বিয়ে-বাড়ীব সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বল্লে, "কাজলি—"

"কি প্রদীপ?"

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বল না কেন?"—ছোট বেলার মত অভিমান ক'রে ও বল্লে।

কাজল উত্তর দিলে, "কি কথা কইব? তুমি আমার খেলার সাথী ছিলে—খেলার দিন এখন গেছে, তাই তোমাকে ডাকবার কথা আমার মনে আসে না।"

প্রদীপ ব্যথা পেয়ে বল্লে "তবু আমার ইচ্ছে করে আবার আমরা বন্ধু হই—খেলার দিন যদি আর নাই থাকে, দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো তো করতে পারি।"

কাজল জানে প্রদীপের সাহিত্যের ওপর কত অনুরাগ—একটি ভাল কবিতা নিয়ে ও মত্ত হোয়ে থাকতে পারে। বল্লে, "বেশ ত প্রদীপ, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমায় প'ড়ে শুনিও। দিদি চ'লে গেলে একা পড়ব—তুমি এলে ভাল লাগবে।"

প্রদীপ শিশুর মত খুসী হোয়ে উঠে বল্লে, "আজকের এই মুহূর্ত্তটি কখনো ভুলবনা কাজলী, আর কিছু ব'লে এর মাধুর্য্য নষ্ট করব না।"—ও চলে গেল।

কাজলের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগল না—সে আবার এল দিদির কাছে। ঘর শূন্য—সকলেই বর আসবার সম্ভাবনায় ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল বিজলী নত হোয়ে পিঁড়ির ওপর ব'সে আছে। কাজলীর শুকনো মুখ দেখে বিজলী বল্লে, "ভাল লাগছেনা?"

"সত্যিই ভাল লাগছে না দিদি, ইচ্ছে হচ্ছে খুব কাঁদি এবার—"

বিজলী ওকে আদর ক'রে বল্লে, "তোর জামাইবাবু নিশ্চয় তোকে ঐ বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।"

কাজল মাথা নেড়ে বল্লে, "সে আমি যাব না দিদি। বাবা একা পড়বেন। বড়মা বুড়ো হোয়েছেন, কিছু কাজ করতে পারেন না—বাবাকে কে দেখবে?"

'তাও তো বটে'—বিজলী যেন কোথাও কূল পায় না।

"কাজল তোর মিহিরকে মনে আছে?"

"ভালো মনে নেই—তবু ভুলে যাইনি দিদি, বাবার ঘরে যে ছবিটা আছে দেখলে মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

"তাকে তুই আমার বিয়ের খবরটা দিবি কাজল—?"

"আমার লজ্জা করে, বাবাকে বলব।"

"আচ্ছা তাই বলিস, কিন্তু লজ্জা কি ভাই, ও তো তোর দাদার মত।"

বাইরে কলরব উঠলো—ঘন ঘন শাঁখের শব্দ জানিয়ে দিলে বর এসে পৌঁছেচে। কাজলী বর-বেশী সুবোধকে দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

১৩

বিজলী চ'লে যাবার পর কাজল মেঘনাদের সেবায় সমস্ত মন অর্পণ করলে। বিজলীর অভাব সে বাবাকে কিছুতেই জানতে দেবে না এই তার পণ।

মেঘনাদ বিজুর বাড়ী গিয়ে বলেন, "ও যে কী মেয়ে হোয়েছে মা, দিনরাত্তির আমায় সামলে বেড়ায়—"

বিজলী চোখের জল মুছে বলে, "আহা, তাই যেন পারে—তোমার সেবায় আমার কথা যেন ভুলে থাকতে পারে। এখানে এত আদর ভালবাসা—তবু ওর কাছেই আমার সমস্ত মন প'ড়ে থাকে।"

কাজল দেখলে বাবার নষ্টস্বাস্থ্য কোলকাতায় ফিরবে না। বড়মা'র কাছে গিয়ে বল্লে, "বাবাকে দিদিদের সঙ্গে দারজিলিং পাঠিয়ে দিই বড়মা?"

"বেশ তো তোরা দুজনে বেড়িয়ে আয়—আমিও একটু আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ থেকে ঘুরে আসি; শৈল যাবার পর অবসর তো আমার হয়নি—কতকাল যাইনি তার ঠিক নেই—"

"বাবা দিদিদের সঙ্গে যান, আমি তোমার সঙ্গে যাব বড়মা" !

সে কি কথা বাছা ? সে কি যাবার জায়গা যে যাবি ? গণ্ডগ্রাম তোরা জন্মেও তেমন দেখিসনি—"

"সেইজন্যেই তো দেখ্‌তে ইচ্ছে করে; দারজীলিং এ দুবার গিয়েছি আরো হয়তো কতবার যাব—কিন্তু পাড়াগাঁ দেখা কি রোজ রোজ ঘটবে ?"

অগত্যা পিসি রাজী হলেন, কিন্তু বল্‌লেন, "যা না মেঘকে গিয়ে বল্—ও ক্ষেপে উঠবে।"

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মেঘনাদ কিছু ক্ষেপ্‌লেন না—এক-কথায় রাজী হোলেন। তিনি তাঁর ছোট মেয়েটিকে ভাল ক'রেই জানতেন—পর্ব্বতের মত দৃঢ় ওর সংকল্প !

ও বেশী কথা বলে না—কিন্তু নিজের মতও ছাড়ে না। বল্‌লেন, "বেশ্ মা, যা ক'দিন ঘুরে আয়—ভাল যদি না লাগে তা হ'লেই চলে আসিস্ কেউ তো ধরে রাখ্‌বে না ?"

কিন্তু বিজলীকে রাজী করাই মুস্কিল হোল—সে কেঁদে কেটে অনর্থ করলে। কাজল ওকে চুপি চুপি বললে, "আমি বড়মা'র কাছে শুনেছি তোর খোকা হবে—এখন বোনের ভাবনা অত ভাব্‌তে হবে না।"

বিজলীর সুন্দর মুখখানা নব মাতৃত্বের কল্পনায় ভ'রে উঠ্‌লো—তবু তর্ক করতেও ছাড়লেনা। অবশেষে নিরুপায় হোয়ে বল্‌লে, "তবে শপথ ক'রে বল্, ঠিক পনেরো দিন পরে চ'লে আস্‌বি, আমি ওঁকে পাঠিয়ে দেব।"

'আচ্ছা' ব'লে কাজল রেহাই পেলে। তখন আর অপর পক্ষের কিছুই বলবার রইল না—চোখের জল মুছে বাক্স গুছোতে গেল।

১৪

মেঘনাদ বিজলীদের সঙ্গে যখন রওনা হোয়ে গেলেন তখন কাজলের আর কোনো কাজ রইল না। বাপের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ সে নিজে হাতে করত,—এখন অনন্ত অবসর ওকে ঘিরে ধরলে। শূন্য গৃহে মন হু হু ক'রে ওঠে—পিসিকে গিয়ে বল্‌লে, "কবে যাবে বড়মা দেশে ?"

পিসি ভাইঝির মন বুঝ্‌লেন, বল্‌লেন, "কাল দুপুরের গাড়ীতেই তো রওনা হব মা! আমি এ ধারের গুছিয়ে ফেলি, তুই প্রদীপদের বাড়ী দেখা ক'রে আয়—কাল তো সময় পাবিনে।"

কাজল আপত্তি করলে না—যাবার আগে প্রদীপের সঙ্গে দেখা করাও সঙ্গত ভাব্‌লে।

মালবী ওকে দেখে ভারি খুসী—বল্‌লে, "চল্, দাদার ঘরে গিয়ে বসি।"

"কবির ধ্যান-ভঙ্গ করব ?"

মালু ওকে চিম্‌টি কেটে বল্‌লে, "তুই তো মূর্ত্তিমতী কবিতা।"

প্রদীপ নিজের ঘরে তক্তাপোষের ওপর চিৎপাৎ হোয়ে প'ড়ে বোধকরি কড়িকাঠ গুণ্‌ছিল; ওদের দেখে ব্যস্ত হোয়ে উঠে বস্‌লো। কাজল যখন ওকে বিদায়-বাণী জানালে যে, সে কালকেই প্রস্থান করছে, তখন প্রদীপ মুখে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও মনে মনে ভারী দ'মে গেল। জানালার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে ও কাজলকে দেখ্‌তে পেত—ওর গলার সুর শুন্‌তে পেত—তাই নিয়েই নিভৃত ঘরে ব'সে সে কাব্য রচনা করত, বিধাতা তাও বাদ্ সাধ্‌লেন।—

মালু বল্‌লে, "কাজল, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে, আমি মাকে ব'লে আসি ?"

কাজল আপত্তি করলে না—মালু চ'লে গেল।

ঘরের চারিদিকে এলো-মেলো বই ছড়ানো—কাজল একখানা হাতে তুলে নিলে, "বেশ আছ প্রদীপ, কবিতা আর কাব্যগ্রন্থ !"

প্রদীপ বল্‌লে, "তারপর কলেজ খুল্‌লে পড়া আর পড়া—একঘেয়ে জীবনযাত্রা; ছুটিটা বেশ আনন্দে ভরা—স্বপ্ন দেখে কাটানো যায়। কিন্তু তুমি বেশী দিন থাকৃতে পারবে না কাজলী—"

"হুকুম না কি ?"

"না, ক্ষুদ্র অনুরোধ।"

কাজল হাসলে, "আমি অনেকদিন থাকব—এক বছর।"

প্রদীপ ওর পরিহাস বুঝলে, বললে, "তবে ঠিকানাটা দিয়ে যাও—আমায় তো ছুটতে হবে!"

কাজল ঠিকানা দিলে।

প্রদীপ বললে, "কাল সন্ধ্যাবেলা তুমি যখন ছাদে বেড়াচ্ছিলে তখন তোমার একটি নতুন নাম দিয়েছি—"

"ভূতিনী কিম্বা পেত্নী বোধহয়? তাদেরই তো অন্ধকারে ঘোরা—"

"সে নামটি সন্ধ্যামণি—একটা কবিতাও লিখেছি, শুনবে?"

কাজল মুখে বললে 'পড়,' কিন্তু মনে মনে ভারী অস্বস্তি বোধ করলে, কিন্তু ওকে উদ্ধার করলে প্রদীপের ছোট ভাই বুন্টু—সে দৌড়ে এল—"কাজলদি—"

"কি ভাই বুন্টু?"

"তুমি যেতে পাবে না—"

"কেন বল ত?"

"দাদা আমায় যে রূপকথা বলে, তার রাজকন্যা না কি তুমি—তোমাকে দেখে দেখে ও গল্প তৈরী করে—তুমি চ'লে গেলে ও গল্প বলবে না।"

"খুব বলবে,—সত্যিই তো আমি রাজকন্যা নই।"

প্রদীপ বললে, "না, এবার তুমি মাটির ঘরের মেয়ে হবে—কিন্তু দুঃখ এই যে আমি তারি প্রদীপ হোতে পারব না।"

কাজল বুন্টুর হাত ধ'রে মালবীর খোঁজে গেল—উত্তর দিলে না।

১৫

পাড়াগাঁয় তিন রাত্রি বাস করবার পরই কাজল বুঝলে এটা কোলকাতা নয়, এখানে যা খুসি করবার জো নেই। মনে মনে হাঁপিয়ে উঠলো। পিসিকে বললে, "বড়মা, আমি কি সং না পুতুল যে দিন-রাত্তির লোকে ভীড় ক'রে আমায় দেখবে? নির্জ্জনে থাকব ব'লে এলাম, এখন দেখছি না এলেই ভাল হোত—"

পিসিমা বললেন, "ওরা তো তোদের মত জামা-জুতো পরা আইবুড়ো মেয়ে দেখেনি—তাই অমন হাঁ করে থাকে; দুদিনেই স'য়ে যাবে।"

পিসির দেওরপো-বউ ওরই সমানবয়সী; ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে নিজের ঘরে। বললে, "শাশুড়ীদের সামনে তো কথা বলতে পারিনে, এসো একটু গল্প করি—"

এই ঘোমটাঢাকা পাড়াগেঁয়ে বউয়ের সঙ্গে সে কি কথা বলবে ভেবে পেলেনা, তবু একটু হেসে বসলো। বউ বললে, "জ্যাঠাইমা তোমায় সঙ্গে ক'রে এনেছে কেন, ভাবছ বুঝতে পারিনি?—"

কাজলের চোখে কৌতুক ফুটে উঠলো, "কেন বল ত?"

"ঠাকুরপোর সঙ্গে যে তোমার বে' দেবে—"

কাজল সভয়ে ভাবলে, কি সর্ব্বনাশ! সেই গেঁয়ো ভূত—চালচুলোহীন। দেখলেই দাঁত বার ক'রে হাসে। তার সঙ্গে বিয়ে!

বউ বললে, "চুপ করে আছ যে? মনে ধরেছে তো আমার দেওরকে?"

কাজল বললে, "কি তুমি যা-তা বলছ ভাই—"

"ওমা যা-তা বলব কি? এতো দৈবির ঘটনা নয়, এ যে সব তৈরী-করা ব্যাপার—সব আগে থেকেই ঠিক আছে। তোমার বাপ ঠাকুরপোকে এত এত টাকা দেবে—গাড়ী দেবে, বাড়ী দেবে;—নামেই যা হবে ভাই, ঘর তো করবে না?"—বউ একটি নিশ্বাস ফেললে।

কাজল তো অবাক—"তুমি মিছি মিছি বলছ নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গে কেন আমার বিয়ে হবে?"

বউ চোখ কপালে তুলে বললে, "মিছি মিছি? কাগ-পক্ষী জানে এ কথা? তোমার বড়মা'ই তো ঠাকুরপোকে ডেকে বলেছে—আমি তার মুখ থেকেই শুনলুম।"

বলতে বলতে বউয়ের দেওর ঘরে ঢুকলে, "কি বৌঠান, পান-টান আছে—"

কাজল উঠে পালাতে গেল—বলু অথবা বলাইচাঁদ দাঁত বের ক'রে বললে, "পালাও কেন? আমি কি বাঘ যে খেয়ে ফেলব—"

বউ ওর আঁচল ধরলে—অনিচ্ছায় কাজলকে আবার বসতে হোল।

বলু আর কাজলের মুখ থেকে চোখ নামায়না—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। ওর বৌঠান ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "কি ঠাকুরপো, তুমি যে দৃষ্টি দিয়ে গিল্‌ছ—"

আবার পান-খাওয়া বত্রিশ পাটি দাঁত একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল—"খাসা দেখ্‌তে—একবার মুখটা ঘোরাতে বল না বউঠান—"

কাজল এবার জোর ক'রে পালালো। বড়মা'র উপরে রাগে অভিমানে ওর চোখে জল এল। এখুনি গিয়ে যে একটা মীমাংসা করবে তার জো নেই—এখানে তাঁর দেখা পাওয়াই মুস্কিল—সকল জায়গায় কাজলের অবাধগতি নিষেধ। হয় তিনি দেওরের সঙ্গে বিষয় নিয়ে বচসা করছেন, নয় ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন—জা, ননদ, শাশুড়ী, সই, আত্মীয়বন্ধুর আর অভাব নেই। রাত্রে তিনি যখন শুতে আসেন তখন কাজলীর অর্দ্ধেক রাত—। ভোরবেলা আবার কখন যে ওঠেন কাজল জানতেই পারে না তো কথা কইবে কখন? আর সবার সামনে বলবার মত কথাও নয়! একখানা চিঠি লেখবার মত নির্জ্জন জায়গাও খুঁজে পায় না—তাই নিজের মনে নিজেই রেগে মরে, কোন প্রতিকার হয় না।

এম্‌নি অবস্থায় একদিন পিসি চ'লে গেলেন পাশের গাঁয়ে তাঁর খুড়শ্বশুরের বাড়ী—সেখানে কার জলবসন্ত হোয়েচে তাই কাজলকে সঙ্গে নিলেন না, দেওরপো-বউএর জিম্মায় রেখে গেলেন। যাবার আগে কাজলের সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলবার সুযোগও পেলেন না—সময়ও না।

আরো কদিন কাট্‌লো—। বলুর অসভ্য রসিকতায় ত্যক্তবিরক্ত হোয়ে কাজল একদিন বউকে গিয়ে বল্‌লে, "তোমার দেওরকে আমার সাম্‌নে আসতে মানা ক'রে দিও—"

বউ খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো, "কেন লো, শুভদৃষ্টি না হয় রোজ রোজ হবে—"

কাজল কাকে বোঝাবে?—ওরা নিজেদের রসিকতা নিয়েই মত্ত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আকাশে মেঘ ঘন হোয়ে উঠলো—গ্রামের বউঝিরা সকাল সকাল জল নিয়ে বাড়ী ফিরলে—পথ, জনশূন্য, পুকুরঘাট নির্জ্জন—কাজল সবার অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

গুমোট গরম, বাতাস বন্ধ হোয়ে আছে, পুকুরের জল স্থির, গাছের পাতাটি নড়েনা—। হটাৎ মনে হোল আজ ওর জন্মদিন—এমন দিনে বাবা, দিদি, সকলের কাছ থেকে দূরে আছে মনে ক'রে ওর মনটা বেদনায় ভ'রে উঠল।—পুকুরঘাটে ব'সে আঁচলে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ কাঁদলে।

তারপর কি মনে ক'রে উঠে গ্রামের পথ ধ'রে ষ্টেশনের দিকে চললো। আঁধার গাঢ় হয়ে টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বিষ্টি পড়তে সুরু হয়েচে—বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি ওর বুকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। কেন যে যাচ্ছে—কোথায় যে যাচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে হয়তো সঠিক উত্তর দিতে পারে না—। বহুক্ষণ চোখের জলবর্ষণের পর ওর মনে তখন ঘূর্ণী হাওয়া লেগেছে—ওকে আর স্থির থাকতে দেবে না।

বিদ্যুতের আলোয় দেখ্‌লে সামনে কে ছাতামাথায় এগিয়ে আস্‌চে—লোকটা একেবারে ওর ঘাড়ের ওপর পড়লো। "আহা কে—দেখতে পাইনি"—অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু গলার সুরে কাজল চম্‌কে উঠলো। আবার বিদ্যুৎ চম্‌কাতেই ছাতাধারী ব'লে উঠ্‌লো, "এ কি! এ যে কাজলী!"

"তুমি প্রদীপ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"যেখানে দু চোখ যায়—কিন্তু তুমি এসেছ কেন?"

আজ যে তোমার জন্মদিন কাজলী—অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই দূরে থাক্‌তে পারলাম না—একবার দেখা দিতে এসেছি—যদি রাগ কর এখুনি চলে যাব—"

"আচ্ছা যাও, কিন্তু আমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল—"

"এ কি বলছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—"

"বুঝবে পরে; উপস্থিত আমার বিষম বিপদ—তার থেকে রক্ষা পাওয়া চাই। সব কথা বলবার সময় নেই, বড়মা এখানে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন—বর আমার পছন্দ নয়—কাল সে বড়মার অবর্ত্তমানে আমার জোর

ক'রে বিয়ে করবে। তার আগে আমি পালাতে চাই—"

"জোর করে বিয়ে করবে? বড়মা কই?"

"তিনি গেছেন পাশের গাঁয়ে—"

প্রদীপ এবার ভাব্‌নায় পড়লে।—"তবে তোমার সত্যি বিপদ বটে! আমি তোমার রক্ষা করব—কিন্তু আগে বড়মা'র কাছে যাওয়া চাই। তাঁর ঠিকানা জান?—"

"জানি, আল্‌তাগাঁয়ে রামলাল ঘোষালের বাড়ী।"

"এসো কাজলী, ষ্টেশন বেশী দূরে নয়—একটা গরুর গাড়ী নিব—তারপর দুজনে আলতাগাঁয়ে গিয়ে বড়মা'র কাছে ব্যাপারটা শুনব। আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোনো ভুল হোয়েচে!"

কাজল আর কিছু বল্লে না, ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো। একধারে ডোবা পুকুর, একধারে ঝোপ, মাঝখানে সরু আলের মত পথ—দুজনে পাশাপাশি একটি ছাতার তলে তলে এগিয়ে চললো। ছাতার গা বেয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল প'ড়ে ওদের চুল, বসনপ্রান্ত ভিজিয়ে দিলে। পথেই গরুর গাড়ী মিলে গেল—আলতাগাঁ গাড়োয়ানের অজানা নয়—বকশীষের লোভ দেখিয়ে প্রদীপ বল্লে, যত শীগগির পারিস্‌ পৌঁছে দে।"

গ্রামের পথ ধ'রে ষ্টেশন ছাড়িয়ে গাড়ী চলতে লাগলো। ক্রমে বৃষ্টি বন্ধ হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে দু'একটি তারা ও ক্ষীণ চাঁদ উঁকি মারলে। ওরা ছাউনির তল থেকে বাইরে এসে বসলো—হাওয়ায় ওদের কাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল।

কাজল এতক্ষণ অবসন্নের মত ব'সে ছিল, প্রদীপও ওকে বিরক্ত করেনি। হাওয়ায় যখন ওর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, ক্লান্তস্বরে বল্লে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে প্রদীপ, এখানে একটু শুই—"

প্রদীপ আপত্তি করলেনা—অল্পক্ষণ পরে শিশুর মত নির্ভাবনায় কাজল ঘুমিয়ে পড়লো। প্রদীপ ওর মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে রইল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—আজকের রাতটি তার জীবন-চক্রে প্রদীপের মত জ্বলতে থাকবে। কাজলীর প্রতি ওর মন সম্ভ্রমে নুয়ে পড়েছে—ওর জীবন ধন্য হোয়ে গেছে।

রাত্রি গভীর হোল, গরুর গাড়ী অপেক্ষাকৃত চওড়া পথ ধ'রে এক মোড়ের মাথায় এসে থাম্‌লো। গাড়োয়ান বল্লে, "ঐ যে ওধারের কোঠা বাড়ী—ওটাই রামলাল বাবুর ঘর।"

গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বরে কাজল ধড়মড় ক'রে উঠে বস্‌লো—সে যে এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা' দেখে নিজেই আশ্চর্য্য বোধ করলে!—ওরা গাড়ী থেকে নেমে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। বহুক্ষণ ঠ্যালাঠেলির পর কে এসে দরজা খুললে—"কে গা, রাত দুপুরে ডাকাত না কি?"—তারপর বাতির আলোয় কাজলকে দেখে বল্লে, "ওমা এ যে মেয়েলোক—দাঁড়াও বাছা গিন্নিকে খবর দিই—"

কাজল বল্লে, "শ্রীযুক্তা নিভাননী দেবীকে আমার দরকার; তিনি কি এখানে—"

প্রদীপধারিণী বল্লে, "কি বল্‌ছ বাছা ভাল বুঝ্‌তে পারছিনে—গিন্নিকে ডাকি।"

গোলমালে সকলেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু নিশুত রাত্রে কি বিপদের সম্ভাবনা মনে ক'রে চোখ খুলতেও সাহস পাচ্ছিলেন না—এখন সকলেই বেরিয়ে এলেন।

পিসিকে দেখেই কাজল দৌড়ে গেল—"বড়মা!"

"ওমা কাজল, তুই?—কি সর্ব্বনাশ!"

ও পিসিকে একধারে টেনে নিয়ে গেল, "বড়মা, বলুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছ?—"

বড়মা আকাশ থেকে পড়লেন, "ওরে তুই কি পাগল হয়েছিস্‌, না আমার রাত্রিশেষের দুঃস্বপ্ন—"

কাজল আদ্যোপান্ত পিসিকে বল্লে।

শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন!

কাজল বললে, "তুমি চ'লে যাবার পর ওরা বিষম বাড়াবাড়ি করছিল—ভয়ে আমার গায় কাঁটা দিয়ে থাকৃত—কালকেই দোর বন্ধ ক'রে পুরুৎ ডেকে আমার বিয়ে করবে বলেছিল—"

পিসি চোখে অন্ধকার দেখ্‌লেন, "কার সঙ্গে এলি তুই?—"

"প্রদীপের সঙ্গে—সে আস্‌ছিল আমার জন্মদিনে ভালবাসা জানাতে—পথেই দেখা—তার সঙ্গেই কোলকাতা যাচ্ছি—"

পিসি এবার অন্ধকারে আলোর রেখা দেখলেন—"চল্ চল্, ওকে এখুনি ব'লে তোকে পাঠিয়ে দিই।"

"তাই বল বড়মা,—ও তোমার মত্ না পেলে আমায় নিয়ে যাবে না!"

পিসি-ভাইঝির ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলা দেখে বাড়ীর সকলে অদম্য কৌতূহলও দমন ক'রে শুতে চ'লে গিয়েছিল, কেবল গিন্নি একপাশে কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিলেন। পিসি তার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, "ছোট খুড়ি, শোও গিয়ে—তোমার আবার বুকে ব্যথা ধরবে—আমি ভাইঝির একটা ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।"

খুড়ী চোখ কপালে তুলে বললেন, "হোয়েচে কি?—"

"জামাই নিতে এসেছে—মেয়ে পাঠাচ্ছি।"

"এত রাত্তিরে? তা' একটু জল টল থাক্—কর্ত্তাকে ডাকি—"

পিসি বাধা দিয়ে বললেন, "তা হবার জো নেই খুড়ি,—জামায়ের বাপের ব্যারাম, এক্ষুণি যেতে হবে।"

পাড়াগাঁয়ে এই মিথ্যেটুকু ব'লে সব দিক রক্ষে করলেন।

বাইরে প্রদীপ উৎকণ্ঠিত হোয়ে অপেক্ষা করছিল।—পিসি বললেন, "বাবা, মেয়ে আমার কাণ্ড ক'রে ঘর থেকে বেরোলেন, এখন শেষ রক্ষা কর তুই,—ওকে সঙ্গে ক'রে কোলকাতা নিয়ে যা। পৌঁছে মেজকে তার ক'রে দিস্, সুবোধ এসে নিয়ে যাবে।"

প্রদীপ মন্ত্রমুগ্ধের মত বললে, "তা হ'লে এখুনি রওনা হই পিসিমা,—রাত চারটেতে একটা গাড়ী আছে—"

"হ্যাঁ তবে সেইটেতেই যা"—তারপর কাজলকে একবার বুকের কাছে টেনে বললেন, "আজ মনে হচ্ছে তুমি শৈলর মেয়েই বটে। সে ওমনি মুখবোজা শান্ত ছিল—কিন্তু বিপদ এলে যে-ক'রে-হোক্ নিজেকে রক্ষে করত। ভগবান আজ প্রদীপকে যেমন জুটিয়ে দিলেন—তেমনি তুইও তার চিরদিন মর্য্যাদা রাখিস।"—তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, আজকের পরে প্রদীপের সঙ্গে কাজলের বিয়ে না হোলে চলবেই না—ওদের মিলন ভগবানেরই চক্রান্ত!

গাড়োয়ান তাড়া দিতে পিসি তেত্রিশ কোটি দেবতা স্মরণ ক'রে ওদের গাড়ীতে তুলে দিলেন।

নিদ্রিত গরু দুটো লাঠির তাড়া খেয়ে আবার গাড়ীটা টেনে নিয়ে চললো—নিস্তব্ধ প্রান্তরে চাকার কাঁচ ক্যাঁচ শব্দ প্রতিধ্বনি হোয়ে উঠলো—। শেষ রাত্রের কনকনে হাওয়ায় কাজল কেঁপে কেঁপে উঠছিল—প্রদীপ নিজের চাদর খুলে ওকে জড়িয়ে দিলে। তারপর একটু অপরাধের সুরে বললে, "জান কাজলী, পিসিমা ব্যস্ত হবেন ব'লে বল্লাম না—বাড়ীতে আমাদের কেউ নেই, বাবা-মা'রা রাঁচি গেছেন, আমি কেবল একা আছি—"

নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে কাজল বললে, "ভালই তো, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না—এসব ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করতে ঘেন্না ধ'রে যায়। শঙ্কর আছে, সে ঘর খুলে দেবে—একদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঐ করবে। তারপর রাত্রের ট্রেনে তুমি আমায় দারজিলিং পৌঁছে দিতে পারবে না?—দিদিদের ব্যস্ত করতে ভাল লাগে না।"

ওর এই নির্ভরতাটুকু প্রদীপের এমন ভাল লাগলো—আনন্দ তখন ওর বুকের কানায় কানায় উপচে পড়ছে—নীরবে সম্মতি জানালো—নিজের কণ্ঠকেও যেন বিশ্বাস নেই—।

কাজল বললে, "কিন্তু টাকা?—"

"কোনো ভাবনা কোর' না, আমার কাছে যথেষ্ট আছে।"

তারপর দুজনে নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল—রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে তখন পূব আকাশে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমা দেবী

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে কলিকাতাবাসীর যে-সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার প্রধান হইল খাদ্যদ্রব্যের অত্যধিক দুর্ম্মূল্যতা। উৎকৃষ্ট চাউলের মূল্য বার টাকা মণ, আটা-ময়দার মূল্য এগার টাকা মণ, এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ অনুপাতে অন্য খাদ্যসামগ্রীরও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিলাতী বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ—ল্যাঙ্কেসায়ারের বস্ত্রকলের সক্ষম পুরুষ কুলী-মজুররা সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল এবং স্ত্রীলোক মজুরদিগের দ্বারা গোলা-গুলি-বারুদ প্রস্তুত করান হইতেছিল। ইহার ফলে ভারতে রপ্তানী করিবার জন্য বস্ত্র অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছিল। দ্বিতীয় কারণ, জার্ম্মানীর সাব্‌মেরীন্ বা ডুবো জাহাজ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় ব্রিটিশ পণ্যবাহী পোতের সমুদ্রে গতায়াত প্রতিহত হইয়াছিল। কাজেই বিলাত হইতে ভারতে তুলাজাত দ্রব্যের আমদানী বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রাদি দেশীয় লোকের অভাবপূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল বটে কিন্তু দেশীয় কলওয়ালারা সুযোগ বুঝিয়া বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর গলা কাটিতে লাগিলেন।

কলিকাতার বাজারে যে-সকল কৃষক তরীতরকারী বিক্রয় করিতে আসিত তাহারা অধিক মূল্যে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় তরীতরকারীর মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়। এদিকে জাহাজের অভাবে পাট রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় পাটের মূল্য একেবারে নামিয়া যাওয়ায় পাট-উৎপন্নকারী কৃষকের ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিল। কৃষকের এই বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতার পাটের কলওয়ালা বিদেশীয় বণিকগণ সুবিধা বুঝিয়া অল্পমূল্যে পাট কিনিয়া লইয়া তাহা চটের বস্তারূপে পরিণত করিয়া চড়াদরে বিলাত, ফ্রান্স, আমেরিকায় পাঠাইতে লাগিল। যুদ্ধের সময় এই থলিয়া বা বস্তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, যথা—বস্তার ভরিয়া সৈন্যদের রসদ একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া এবং বস্তা বালুকায় পূর্ণ করিয়া উপরি-উপরি সাজাইয়া বস্তার প্রাচীরের দ্বারা শত্রুপক্ষের গুলি হইতে আত্মরক্ষা করা।

ইরাক্ বা মেশোপটেমিয়া দেশে সৈন্যগণের রসদ যোগাইবার জন্য ভারত হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হওয়ায় ভারতে ঐ সকল দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়া পড়ে। পরিধেয় বস্ত্রের দুর্ম্মূল্যতা-নিবারণ উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বস্ত্র সম্বন্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এত আউন্স বস্ত্রের মূল্য এত হইবে এইরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে এইরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত হইলে যে দেশবাসীর উপকার হইত তাহা নিশ্চিত, কিন্তু এইরূপ কোন নিয়ম করা হয় নাই। গম, চাউল, ডাল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের মূল্য রপ্তানীর অভাবে পাটের ন্যায় নামিয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু লোভী ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারে ঐ সকল দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া জনসাধারণ উৎপীড়িত হইয়াছিল।

বিদেশ হইতে কড়ি, বরোগা, লোহা-লক্কড় প্রভৃতির আমদানী বন্ধ হওয়ায় এখানকার ঐ প্রকার সঞ্চিত মাল বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া লোহাবিক্রেতা ব্যবসায়ীর বিপুল ধনাগম হইল।

ব্যবসায়ী-শ্রেণীর এরূপ ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের সমস্ত টাকা গভর্ণমেণ্টের কারেন্সি হইতে সোনার মোহরে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিকানীর ইত্যাদি নিজদেশে চালান দিতে লাগিল এই আশঙ্কায় যে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব আর বেশী দিন টিকিবে না। মোহরের চাহিদা বা টান এমন হইল যে, শেষটা গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিতে বাধ্য হইলেন কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী মোহর আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

মোহর যখন পাইল না, তখন ব্যবসায়ী তাহার সঞ্চিত অর্থে কলিকাতার জমি ও বাড়ি ইত্যাদি খরিদ করিয়া নিরাপদে রাখিতে লাগিল। সুতরাং কলিকাতার জমির উপর অত্যধিক টান হওয়াতে জমির মূল্য অভাবনীয় রূপে বর্দ্ধিত হইল। ইহাই হইল কলিকাতার "ল্যাণ্ড্ বুম্"।

রেলের লাইন ও রেলের গাড়ী যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রী-গাড়ীর সংখ্যা বহু পরিমাণে কমাইয়া দিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর বোম্বাই ও পাঞ্জাব মেল মিলিত অবস্থায় হাওড়া ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে যাইয়া দ্বিধাবিভক্ত হইত। বোম্বাই ও পাঞ্জাব হইতে আসিবার সময়ও এইরূপ অবস্থা, অর্থাৎ বোম্বাই ও পাঞ্জাব হইতে উক্ত দুইটি গাড়ী পৃথক ভাবে আসিয়া এলাহাবাদে মিলিত হইত। ১৯১৬ সাল হইতে গুড্ফ্রাইডে, দুর্গাপূজা, বড়দিন উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে অন্যত্র অল্প ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা বা কন্শেসন্ রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। এইরূপ নানা-প্রকারে রেলযাত্রীর বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সময়ে একটি বাঙালী সৈন্যদল গঠিত হয়। এই সৈন্যদলের নাম দেওয়া হইয়াছিল পঁয়তাল্লিশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট। এই দলের প্রত্যেক সৈনিকের বেতন মাসিক এগার টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। অনেক বঙ্গীয় যুবক এই দলে যোগদান করিয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই দল-গঠন বিষয়ে ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই দলে যোগদান করিবার জন্য যে সকল বিজ্ঞাপন বা হ্যাণ্ডবিল সহরে বিতরিত হইত তাহার একখানি আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

যুদ্ধ-সংক্রান্ত টাকা তুলিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি 'যুদ্ধঋণ' খোলা হয়। সাধারণকে এই ঋণে টাকা দিবার জন্য সহরের নানা স্থানে প্রাচীরগাত্রে অনুরোধসূচক প্ল্যাকার্ড আঁটিয়া দেওয়া হইত এবং নানা স্থানে এ সম্বন্ধে সভাসমিতি হইত।

কলিকাতা সহরের অন্যান্য কথা

১৯১১ সাল হইতে কলিকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত হয়। ইহার ফলে সহরের নানা-স্থানে নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হওয়াতে যেমন বহু পুরাতন অধিবাসী গৃহশূন্য হইয়াছেন তেমনি নব নব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নির্ম্মাণে সহরের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে। সহরের দক্ষিণ বিভাগে রসা রোড নামক রাস্তার প্রস্থের বৃদ্ধি হওয়াতে "জলটুঙ্গি" অদৃশ্য হইয়াছে ও ভবানীপুর নামক স্থানের অত্যন্ত উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ট্রাষ্ট্ কর্ত্তৃক সহরের নানা স্থানে পার্ক বা উদ্যান নির্ম্মিত হওয়াতে পল্লীস্থ অধিবাসীর এবং বালকবৃন্দের বায়ুসেবনের ও ক্রীড়া-কৌতুকাদির উন্মুক্ত স্থান লাভ হইয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বহু পল্লী ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক ফাঁকা হইয়া যে কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছে সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ এই যে, ইঁহারা অনেকটা ব্যবসায়ীর পথ অবলম্বন করিয়া অনাবশ্যক স্থলেও জমি স্বল্পমূল্যে অধিকার করিয়া সেই জমি উচ্চমূল্যে সাধারণকে বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভবান হইতেছেন। তাঁহাদের এইরূপ কার্য্য আইনতঃ তাঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বলিয়াই সাধারণের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে এই ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ট্রাষ্ট-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নির্ম্মিত নূতন রাস্তায় গাছ পুঁতিয়া ও সিমেণ্ট দিয়া ফুটপাথ বাঁধাইয়া দিয়া এবং ইলেকট্রিক আলো আনিয়া সহরের নানাস্থানে যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র সাহেবপল্লীতেই দেখা যাইত। ধর্ম্মতলা হইতে বিডন ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নামক রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া ট্রাষ্ট যে আবর্জ্জনাপূর্ণ বহু স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। সহরের মধ্য দিয়া উত্তর কলিকাতা হইতে দক্ষিণ কলিকাতায় যাইবার অন্যান্য পথের গাড়ী-ঘোড়া, ট্যাক্সি, বাস্, লরী, প্রভৃতির ভিড় অনেকটা কমিয়া যে নূতন পথে চালিত হইতেছে ইহাও সাধারণের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে হয়।

১৯০০ অথবা ১৯০১ সালে এ্যাণ্ড্রু ইউল্ নামক সাহেব কোম্পানী বিনামূল্যে কাগজের ঠোঙায় করিয়া রাস্তার

প্রতি মোড়ে মোড়ে চা বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে বিনামূল্যে গরম তৈয়ারী চা ইতরভদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলকে বিতরিত হয়। সাহেব সওদাগর অফিসের কেরাণী বাবুগণকে বৈকালে বিনামূল্যে তৈয়ারী চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে সাহেবগণ কর্ত্তৃক চা খাইবার অভ্যাস জনসাধারণের মধ্যে সুচের আকারে প্রবিষ্ট হইয়া এক্ষণে ফাল্ হইয়া বাহির হইয়াছে। ইহার ফলে মুটে-মজুর, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া ভদ্র ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে-বুড়ো বালক-বালিকা সকলের মধ্যেই চা খাইবার অভ্যাস কায়েমী ভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছে। চা খাইবার এই ইচ্ছা অন্য নেশার ন্যায় সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া অজীর্ণাদি নানা রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমন সংক্রামক ব্যাধিরূপে দেখা দিয়াছে যে, মনে হয় সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়া চা খাইতে পাইলে সন্তুষ্ট হইবে।

চা যখন আসিল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুট, কেক্, টোষ্ট, পাঁউরুটি, চপ্, কাট্‌লেট্, ডিম্, ডেবিল্ প্রভৃতি সাহেবীয়ানা খাদ্য অতি দ্রুত আসিয়া পড়িল। ইহার ফলে অলিগলিতে চায়ের দোকান, চপ্-কাটলেটের দোকান কলিকাতাময় এক্ষণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অনাচার-দুষ্ট খাদ্য গৃহে রন্ধন করিয়া খাইলে ততটা স্বাস্থ্যের হানি হইত না, কিন্তু হোটেলের পর্য্যুসিত দ্রব্য খাওয়ার ফলে হিন্দু যুবকদিগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ অতি ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির খাদ্যপরীক্ষক এই সকল চায়ের দোকান ও রেস্তোরাঁতে নিয়মিতভাবে পদার্পণ করেন কি না তাহা অবগত নহি, তবে এই সকল খাদ্য আহার করায় যে বিষময় ফল ফলিতেছে তা নিঃসন্দেহ।

খাদ্যদ্রব্যের কথা যখন তুলিলাম তখন খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঘৃতে সাপের চর্ব্বি, তৈলে কুসুমবিচি ও পাকৃড়া প্রভৃতি ভেজাল মিশাইয়া ঘৃত ও তৈলের সারাংশ একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। মিউনিসিপ্যাল ডাক্তারের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলেও ব্যবসায়ীর জুয়াচুরি-বুদ্ধির নিকট তাঁহাদিগকে হার মানিতে হইয়াছে। ভেজালদ্রব্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থে ধনবান হইয়া কোন তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেই ব্যবসাজনিত সকল পাপ হইতে মুক্ত হইলেন বলিয়া ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করেন। এক্ষণে ভেজিটেবল বা উদ্ভিজ্জ ঘৃতরূপ মহা অনিষ্টকর পদার্থের আমদানী হইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। ঘৃতের ভেজাল-নিবারণকল্পে সরকার কর্ত্তৃক "ঘি আইন" বিধিবদ্ধ হইয়াও বিশেষ কোন ফলোদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

১৮৯৯ সালে যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন গঠিত হয় তাহাতে সরকারী গৃহাদির ট্যাক্স দিতে হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আটাশ জন কমিশনার বা সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। এই উপলক্ষ্যে অমৃতলালে বসু মহাশয়ের রসময়ী লেখনী হইতে "সাবাস্ আটাশ" নামক প্রহসন নিঃসৃত হয়। চব্বিশ বৎসর পরে ১৯২৩ সালে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া মিউনিসিপ্যাল শাসনযন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। পুরাতন আইনের শেষ অবস্থায় একজন দেশীয় লোক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। নূতন আইনমতে এক্ষণে সহরে মেয়র মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অধীনে প্রধান কর্ম্মচারী এবং আরও কয়েকজন কর্ম্মচারী মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায় স্বরাজ্য বা স্বায়ত্ত-শাসন একরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাপিও কলিকাতাবাসী করদাতাগণ সুখের মুখ দেখিতে পান না। করভার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই এবং বৎসরের পর বৎসর বাসগৃহাদির মূল্য যেরূপভাবে বর্দ্ধিত হারে মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে সামান্য অবস্থার গৃহস্থ করভারে প্রপীড়িত হইয়া কলিকাতাবাস উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। যাহা হউক এই স্বায়ত্তশাসন-দানের মূল কর্ত্তা হইলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই মন্ত্রিত্বকালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে টালার আকাশমার্গে জলের

চৌবাচ্চা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই চৌবাচ্চা হইতে মোটা পাইপের দ্বারা সহরের সর্ব্বত্র জল সরবরাহ করা হয়। এই জল ফিলটার্ড অর্থাৎ পরিস্কৃত জল। শৌচাগার প্রভৃতিতে অপরিস্কৃত গঙ্গাজল দেওয়া হয়। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই দুই প্রকার জল কলিকাতার অধিবাসিগণকে দেওয়া হইতেছে। কাহারও কাহারও মতে স্বাস্থ্যের দিক হইতে অপরিস্কৃত জল দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের জন্য পরিস্কৃত জল দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বোম্বাই সহরে এই একপ্রকার জলেরই ব্যবস্থা আছে।

কলিকাতার আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা প্রভৃতি সহরতলী ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনবলে এক্ষণে সহরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সহরের আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে এবং অত্যধিক জলের ব্যবহারবশতঃ জলনির্গমনের পথ অর্থাৎ ড্রেনের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত ড্রেনে যে-পরিমাণ জল-নিকাশের ব্যবস্থা ছিল এক্ষণে সেই জলের পরিমাণ বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ায় অপ্রশস্ত পুরাতন ড্রেনের দ্বারা এই জল-নির্গমন হওয়া কষ্টসাধ্য হইয়াছে। তাহার ফলে এই অবস্থা ঘটিয়াছে যে, অল্প বৃষ্টি হইলেই রাস্তায় জল দাঁড়ায় এবং গৃহস্থদের বাড়ীর উঠানও জলপূর্ণ হইয়া পড়ে। এদিকে আবার কলিকাতার ড্রেনের জল যে-নদীতে গিয়া পড়ে, অর্থাৎ বিদ্যাধরী নদী, তাহা ক্রমশঃ বুজিয়া গিয়া ময়লা জল নির্গমনের পথ বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

কালীঘাটে কালীমন্দিরের সন্নিকটস্থ স্থান যেরূপভাবে ফাঁকা করিয়া পরিস্কৃত করা হইয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীঘাটে চার-পাঁচ বৎসর হইল একটি পাকা ধর্ম্মশালা-বাটী নির্ম্মিত হইয়া বিদেশীয় যাত্রিগণের থাকার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যাত্রিগণ খড়ের অথবা টিনের ছাউনি মাটির গৃহ ভাড়া লইয়া অতিকষ্টে তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিত। এইরূপ বাসগৃহ এখনও অনেক রহিয়াছে; সেগুলি যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। কালীঘাটে আসিয়া পাণ্ডাদের দ্বারা 'নীলকমল' যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ অভিনয় বা অত্যাচার নিরক্ষর গ্রাম্য অধিবাসীদিগের উপর যে এখনও হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিনে কালীমন্দিরে যে অসাধারণ ভিড় হইয়া থাকে সেই ভিড়কে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে পুলিশের সহিত দেশীয় যুবক ভলান্টিয়ারগণের সহযোগিতা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। এই ভলান্টিয়ারগণ স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে আবির্ভূত হইয়া অর্দ্ধোদয় যোগ, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের জন্য সমাগত বহু যাত্রীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের অশেষ উপকার করিয়াছেন। ভিড়ের মধ্যে কেহ হারাইয়া গেলে ভলান্টিয়ারগণ তাঁহার আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করিয়া দিতেন, কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহাকে ঔষধ দিতেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। এইরূপ নানা জনহিতকর কার্য্যে পাল-পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ভলান্টিয়ারগণ ব্যাপৃত থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দৈব

কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় কমিসেরিয়েটে চাকরি ক'রে, যে ভাবেই হ'ক, অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। কলিকাতায় তিন চার খানা বাড়ী, সুন্দরবনে কিছু জমিজমা, আর বিস্তর টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁর ছিল। এত টাকার মানুষ হলেও দান ধ্যান তাঁর ছিল না—বড়মানুষী ত মোটেই নয়; কমিসেরিয়েটে গোমস্তাগিরি করবার সময় যে সাধাসিধে চাল তিনি অবলম্বন করেছিলেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তার ব্যতিক্রম করেন নি। কেউ কিছু বললে তিনি বলতেন, 'চাল মোটাই ভাল, তা ধানেরই বল, আর মানেরই বল; বেশী পালিস্ করলে ও দুটো জিনিসই অমঙ্গলের হেতু হয়ে দাঁড়ায়।'

হরিমোহনের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার জীবদ্দশাতেই একটি পুত্র আর একটি কন্যা রেখে মারা যান। তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বেই পরলোকগত হয়েছিলেন। অপর পুত্র-দুটি না শিখ্‌ল লেখাপড়া, না শিখ্‌ল ভদ্রতা। তারা ছিল দূরদর্শী,—পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হবে এই ভরসায় পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তারা এমন সব কার্য্যকলাপ আরম্ভ ক'রে দিলে যা পিতার মৃত্যুর পর করলেও পিতার শূন্যচারী আত্মা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ত। বৃদ্ধ চাটুজ্যে মশায় পুত্রদের সংশোধনের অন্য কোনো উপায় না দেখে এরূপ স্থলে অনেক লোকে যা ক'রে থাকে তাই করলেন,—অর্থাৎ ছেলে দুটির বিয়ে দিলেন। কিন্তু এই সনাতন প্রতিকার-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হ'ল না,—ঘরে লক্ষ্মীর প্রবেশ সত্ত্বেও লক্ষ্মীছাড়া দুটি ভাইয়ের কোনো উন্নতি দেখা গেল না, লাভের মধ্যে দুটি নূতন প্রাণীকে অবলম্বন ক'রে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বেড়ে গেল।

বিবাহের পর হরিমোহন ছেলেদুটির কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন, বেগতিক দেখে তা বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হল না, যে টাকা বন্ধ হ'ল তার চতুর্গুণ আস্‌তে লাগ্‌ল হ্যাণ্ডনোট কাটার ফলে। মহাজনেরা জানে হরিমোহনের মৃত্যুর পূর্ব্বে টাকা ফেরৎ পাবার কোনো আশা নেই, তাই তারা তিন শ' টাকা দিয়ে পাঁচ শ' টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেয়, সুদের হার চড়িয়ে দেয় বার্ষিক শতকড়া কুড়ি পঁচিশ টাকা। বড়লোকের ছেলেদের জন্যে কলকাতা সহরে এ শ্রেণীর মহাজনের অভাব নেই।

কথাটা চাটুয্যে মহাশয়ের অগোচর রইল না। তিনি বুঝ্‌লেন গুণধর পুত্রদুটি বিষয়ের অঙ্গে যেরূপ দেনার আগুন লাগিয়েছে তাতে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বিষয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একই সঙ্গে হবে। সুতরাং তিনি শেষ উপায় অবলম্বন করলেন,—অর্থাৎ উইল করলেন। এই উইলের দ্বারা তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নানারূপ সর্ত্তে এবং নানারূপ অংশে তাঁর স্ত্রী, পৌত্র, পৌত্রী এবং দুই পুত্রবধূর মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন; পুত্রদ্বয়কে বিষয় হ'তে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করলেন, এমন কি তাদের ভরণ পোষণেরও কোনো ব্যবস্থা করলেন না। উইলের মর্ম্ম অবগত হয়ে পুত্রদ্বয় ভাবনায় অধীর হয়ে উঠ্‌ল, পিতার মৃত্যুর পর তাদের যে ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হবে সে কথা স্মরণ ক'রে ক্রোধভরে পিতার মৃত্যু কামনা করতেও তাদের ভরসা হল না।

কিন্তু এই উইল লেখাপড়া এবং যথারীতি রেজেষ্টারী হবার মাস তিনেক পরেই হরিমোহন বাবু পরলোকগত হলেন, এবং উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাঁর স্ত্রী সমস্ত বিষয় সম্পত্তিতে দখিলকারিণী হলেন। পুত্রদ্বয় নিরাশ হ'য়ে উইল জাল প্রমাণ করবার চেষ্টা করল, এ যে তাদের মায়েরই কৌশল, সে কথাও বলতে ছাড়ল না। কিন্তু আদালতের বিচারে হরিমোহন চাটুয্যের উইল টিঁকে গেল।

বিফলমনোরথ হ'য়ে ছেলেরা তখন নানাপ্রকারে মাতার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রপুত্রীর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। চাটুয্যেগৃহিণী তাঁর পিতৃমাতৃহীন কিশোর নাতি অজিতমোহন ও নাতনী সুষমাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সমস্ত স্নেহমমতা পুত্রদ্বয় হ'তে অপসৃত হ'য়ে এই নাতি-নাতনীতেই আশ্রয় লাভ করলে।

ছেলেদের সঙ্গে একত্র বাস করা নিরাপদ নয় বুঝ্‌তে পেরে গৃহিণী তাদের পৃথক ক'রে দিলেন। যে কয়টা বাড়ি ছিল তারই একটার ভাড়াটে তুলে দিয়ে দুই ছেলেকে বাস করবার অনুমতি দিলেন এবং দুই বৌমার জন্য যথাযোগ্য মাসিক খরচের ব্যবস্থা করলেন।

২

কয়েক বৎসর পরের কথা। ঠাকুমার প্রাণঢালা স্নেহ-যত্নে অজিত ও সুষমা প্রতিপালিত হচ্চে। অজিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ পড়ছিল। সুষমারও বাড়ীতে লেখাপড়া শিখবার ভালরূপ বন্দোবস্ত ঠাকুরমা ক'রে দিয়েছেন।

কলেজ থেকে এসে জলযোগ ক'রে অজিত ঠাকুমার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্‌লে, "ঠাকুমা, তোমাকে সেদিন সুষীর জন্যে যে পাত্রটির কথা বলেছিলাম আজ খোঁজ নিয়ে জানলাম মাস দুই হ'ল তার বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

অজিতের কথা শুনে ঠাকুরমা হাস্‌তে লাগলেন; বল্‌লেন, "ফোকাই ভাই, পাত্রের বিয়ে হয়েচে কি-না এবার থেকে প্রথমে সেই খোঁজ নিয়ে তারপর আমাকে খবর দিস্। এই নিয়ে এ-রকম তিনটে হোল।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে হ'য়ে সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ অজিত, আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এসব মিছিমিছি চালাকি করছিস্ নে ত?"

অজিত হাসিমুখে বল্‌ল, "তোমাকে একা আমি ভুলিয়ে রাখব কতদিন ঠাকুমা? ঘটক-ঘটকীরা ত আর ভুলিয়ে রাখবে না। কিন্তু সত্যি ঠাকুমা, সুষী ত' এই সবে বারো বছরে পড়েছে—এরি মধ্যে তুমি তার বিয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে কেন?"

ঠাকুরমার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল; এক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা ক'রে বল্‌লেন, "কেন ব্যস্ত হয়েচি তা আমি বেঁচে থাক্‌তে বুঝ্‌তে পারবিনে ভাই,—হঠাৎ যদি মারা যাই তা হ'লে বুঝ্‌বি। যে হাত দিয়ে তোদের সাম্‌লে রেখেচি সে হাতে যে কত চোট্ পড়্‌ছে তা'ত তোরা জানিসনে। তুই পুরুষ মানুষ, তোর জন্যে তত ভাবিনে, কিন্তু আমি ম'রে গেলে সুষীর ভাল বিয়ে হবে না তা নিশ্চয় জানিস। তোদের দুই কাকা, তারা ত তোদের মহা শত্রু। তারা মনে করে তোদের জন্যেই তারা বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েচে। তারা তোদের কোনো রকম সাহায্য ত' করবেই না, অনিষ্ট যাতে হয় তারই চেষ্টা করবে।"

কথাটা যে একেবারে কল্পনা নয় তা অজিত বিশেষ কোনো কথা না জেনেও জান্‌ত। হঠাৎ কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে কাকাদের মুখে চক্ষে যে ভাবটা প্রকাশ পায় তার উৎপত্তি যে অন্তরের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে নয় তার জন্যে অজিতের কোনো প্রমাণের আবশ্যকতা হয় না। তা ছাড়া, সুষমার বিবাহের কথায় বাধা দিতে গেলে ঠাকুরমা সারদাসুন্দরীকে ক্ষুণ্ণ করা হবে বুঝ্‌তে পেরে অজিত বল্‌লে, "আচ্ছা ঠাকুমা, আমি এখন থেকে ভাল ক'রে পাত্রের সন্ধান করব, কিন্তু তোমার ফরমাস্ মত পাত্র পাওয়া যে সহজ হবে, তা কিছুতেই মনে হয় না। রূপে, গুণে, স্বাস্থ্যে, বিত্তে একেবারে চূড়ান্ত হবে অথচ বাড়ী কলকাতায় না হ'লে চল্‌বে না—এমন পাত্র বাংলাদেশে বেশী জন্মায় নি।"

সারদাসুন্দরী বল্‌লেন, "আমি ত বেশী চাচ্চিনে দাদা, আমি একটিই চাচ্চি। তার জন্যে যদি পনেরো হাজার কি বিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয় তা'তে আমি কাতর হবো না।"

সারদাসুন্দরীর কথা শুনে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অজিত বল্‌লে, "বল কি ঠাকুমা! বিশ হাজার টাকা একটা বিয়েতে খরচ করবে?—তুমি কাতর না হও—আমরা যে কাতর হব!"

সারদাসুন্দরী বল্‌লেন, "তোমাদের কাতর হবার দরকার নেই ভাই। তোমাদের সম্পত্তি থেকে সুধীর বিয়েতে আমি এক পয়সাও খরচ করব না—তোমার পাঁচ আনা অংশ থেকেও নয়, সুধীর তিন আনা অংশ থেকেও নয়। তোর দাদা মশাই তোদের এই সম্পত্তির উপর নির্ভর করবার অবস্থায় আমাকে রেখে যান নি। তিনি যখন চাকরি করতেন তখন থেকেই যেমন নিজে জমাতেন, বিষয়-আশয় করতেন, তেম্‌নি আমার হাতেও কিছু কিছু দিতেন। সেই টাকা আমি সুধীর বিয়েতে খরচ করব।"

অজিত হাসিমুখে বল্‌লে, "কিন্তু সব টাকাই যে আসলে তোমার ঠাক্‌মা—তা পাঁচ আনারই বল, আর তিন আনারই বল। বিশ হাজার যেখান থেকেই খরচ কর না কেন, তা তোমার টাকাই খরচ করা হবে।"

সারদাসুন্দরী মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "তা নয়রে—দাদা, তা নয়। আমি যে তোদের সম্পত্তির ম্যানেজার—আমার কি যা-খুসি খরচ করবার যো আছে? তোদের সম্পত্তির পাই পয়সার পর্য্যন্ত হিসাব রাখা হচ্চে। তোদের একটা পয়সাও আমি নেবো না, যদিও আইন মতে সুধীর বিয়ের সমস্ত খরচই সম্পত্তি থেকে হ'তে পারে।"

অজিত বল্‌লে, "রেখে দাও তোমার আইন আর রেখে দাও তোমার হিসেব ঠাক্‌মা। তুমি যা করবে তাই আইন আর তুমি যা বল্‌বে তাই হিসেব। আমরা অন্য আইন আর অন্য হিসেব মানিনে। কিন্তু এ-সব বাজে কথা থাক্‌, এবার আমি সুধীর জন্যে পাত্রের সন্ধান করব।"

৩

এর পর রীতিমত ঘটক-ঘটকীর আনাগোনা আরম্ভ হ'য়ে গেল। এমন দিন যায় না যেদিন একটা না একটা পাত্রের সংবাদ আসে। বিবরণ শুনে সারদাসুন্দরী অধিকাংশই জবাব দিয়ে দেন। যে' দু'চারটে পছন্দ-সই ঠেকে, খোঁজ-তল্লাস নেবার পর টেঁকে না;—কোথাও লক্ষীর সহিত সরস্বতীর বিবাদ, কোথাও সরস্বতীর সহিত লক্ষীর; দৈবাৎ কোথাও যদি দুইয়ের সম্মিলন হয় ত' পাত্রের আকৃতি নিয়ে গোল বেধে যায়, অথবা পাত্রের জননীর প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট কমনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশ হ'য়ে সারদাসুন্দরী বলেন, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, সময় না হ'লে হাজার চেষ্টাতেও কিছু হবে না।" অজিত বলে, "সেই সময়ের জন্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে অপেক্ষা ক'রে থাক না ঠাক্‌মা। সময় হ'লে সুধীর বর আপনি এসে উপস্থিত হবে।" সারদাসুন্দরী মুখে অজিতের কথার সমর্থন করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ ভবিতব্যের অনতিবর্ত্তনীয়তার উপর নির্ভর করতে পারেন না, পরদিনই আবার নূতন ক'রে ঘটকী লাগান, এবং অজিতকে লেখাপড়া বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে ছুটতে হয়, আজ গড়পার, কাল ভবানীপুর, পরদিন শ্যামপুকুর। কিন্তু কিছুতেই মন ওঠে না—একটা না একটা ত্রুটি সমস্ত নষ্ট ক'রে দেয়।

কিন্তু একদিন সত্যি-সত্যিই সুষমার পাত্র জুটে গেল। ভবানীপুরের পরলোকগত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র নরেশচন্দ্র সারদাসুন্দরীর পছন্দ-সই হ'ল। নরেশচন্দ্রের ভবানীপুরে খুব বড় একখানি বাড়ী, আর লাখ দুই টাকার কোম্পানীর কাগজ। সে এম-এ পাশ ক'রে বি-এল পড়ছে আর তার মামার এটর্ণির আফিসে আর্টিকেল্‌ড্‌ আছে। পাত্রের মাকেও সারদা-সুন্দরীর খুব ভাল লেগেছে। দেনা-পাওনার কথা তুলতে তিনি হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন, "মাপ করবেন, আমার কাছে আপনার যখন এক পয়সার দেনা নেই তখন আমার পাওনা কিসের? আমি অমন চাঁদের মত বউমা পাচ্ছি সেই আমার একমাত্র পাওনা।" শুনে হর্ষে আনন্দে সারদাসুন্দরীর চোখে জল এসেছিল। তিনি আর কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে বিবাহ স্থির ক'রে ফেল্‌লেন, এবং তার পরদিন বিবাহের দিনক্ষণও স্থির হ'য়ে গেল।

উভয়পক্ষের পাকা দেখায় যা খরচ হ'ল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বিবাহরাত্রেও তত হয় না। বিবাহের তিন দিন আগে পাত্রপক্ষ থেকে খুব জমকালো রকমের গায়ে হলুদের তত্ত্ব এল। সাজ-সজ্জা, অলঙ্কার, নানা রকমের প্রসাধনদ্রব্য, খুব ভারি কাজ করা একটা রূপার পাত্রে ক'রে তেল-হলুদ, আধমণি জুটো পাকা রুই মাছ, দই, ক্ষীর, মিষ্টান্ন, আরো

কত রকমের কত কি সামগ্রী! তত্ত্ব দেখে সারদাসুন্দরীর মুখে হাসি ধরে না,—আত্মীয়স্বজনকে ডেকে ডেকে বলেন, 'দেখ, কেমন ঘরে আমার সুষীর বিয়ে দিচ্ছি।'

সুষমার কাকাদের মুখ ঈর্ষায় লাল হ'য়ে ওঠে—তারা জিনিষ দেখে দেখে খুঁৎ ধরে, তাজা মাছ দুটোর কাছে নাক নিয়ে গিয়ে বলে, 'তিন দিনের চালান, পচা গন্ধ ছাড়চে!'

৪

গায়ে হলুদের দিন রাত্রে নরেশের জ্বর হ'ল। আত্মীয়-স্বজনেরা বললেন, ও শ্রম-জ্বর, অনিয়মের জন্ম হয়েচে, একটু বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে। কিন্তু বিশ্রাম এবং ঔষধ-পত্র সত্বেও জ্বরটা দু'দিন প্রায় একই ভাবে লেগে রইল। বিবাহের দিন সকালে দেখা গেল জ্বর ছেড়ে গেছে, তখন সকলে নিশ্চিন্ত মনে বিবাহের কার্য্যে যোগ দিল।

সমস্ত দিন নরেশ বেশ সুস্থ রইল, এমন কি সন্ধ্যার পর যখন সে বিবাহের জন্ম যাত্রা করল তখনো। কিন্তু ভবানীপুরের সীমা ছাড়িয়ে শোভাযাত্রা যখন কন্যার বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল তখন হঠাৎ নরেশ বিশেষভাবে অসুস্থ বোধ করতে লাগল। তখন আর বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়—কাজেই সে মোটরের পিছনের গদীতে হেলান দিয়ে কোনো প্রকারে ব'সে রইল। কন্যার বাড়ীর সম্মুখে যখন নরেশ উপস্থিত হ'ল তখন একটা দুঃসহ কম্পনে তার সমস্ত দেহ বিকল হ'য়ে গেছে—আর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড একটা ভয়াবহ ছন্দে নাচতে আরম্ভ করেচে। গাড়ি থেকে নামবার জন্ম নরেশ একবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না, বিবর্ণমুখে মোটরের পিঠে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন তার দুজন বন্ধু মিলে তাকে ধরাধরি ক'রে নামিয়ে নিলে। নরেশের এটর্ণি মামা বললেন, "লগ্ন যখন হয়েচে তখন আর বরকে আসরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, একেবারে সম্প্রদানের স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক্। ও ম্যালেরিয়া জ্বর—ওর জন্যে ভয় নেই। শুভকর্ম্ম সেরে ফেলা ভাল।"

কিন্তু কার শুভকর্ম্ম কে করে! বরকে যখন ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে সম্প্রদান-স্থানে বসানো হোলো তখন তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েচে। চারিদিকে হাহাকার উঠল। নরেশের সংজ্ঞাহীন দেহ বরের আসন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। ডাক্তার ডাকতে লোক ছুটল। নরেশের মাকে সংবাদ দেবার জন্যে মোটর পাঠান হ'ল। নহবৎ গেল থেমে, শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি বিকট আতঙ্কে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হ'য়ে বিবাহবাড়ির উৎসব-আনন্দ ভস্মীভূত হ'ল।

ডাক্তার যখন রোগীর পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন তখন রোগীর মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত উঠল। তারপর একবার মুখ বিকৃত ক'রে একবারে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে রোগী স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ডাক্তার রোগীকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে বিষণ্ণ মুখে বললেন, "সব শেষ হ'য়ে গেছে।"

ডাক্তারের কথাগুলি উৎকণ্ঠিত জনতাকে বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে অসাড় ক'রে দিলে। ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক এবং নিদারুণ যে সহসা কারো মুখ দিয়ে একটা বিলাপের ধ্বনি পর্য্যন্ত নির্গত হল না। সংবাদটা অন্দরমহলে প্রবেশ করবার পর একটা সকরুণ ক্রন্দনের রোল উত্থিত হ'ল।

দু' তিন ঘণ্টা পরে বরযাত্রীরা শ্মশান-যাত্রী হলেন। হরিধ্বনি ক'রে নরেশচন্দ্রের শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। তখনো নরেশের পরিধানে বরের বেশ, গলায় ফুলের মালা।

৫

বাহিরে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশান-যাত্রার আয়োজন যখন প্রায় শেষ হয়েচে তখন বাড়ির ভিতর এক জীবিত দেহের শ্মশান-যাত্রা নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। সুষমার দুই কাকা এবং তাঁদের দলের লোকেরা বললে সুষমাকে শ্মশানে গিয়ে নরেশের মুখাগ্নি করতে হবে।

কে একজন প্রশ্ন করলে, "কেন? সুষমা মুখাগ্নি করবে কেন?"

সুষমার ছোটকাকা বল্‌লে, "যে বিপদ হ'য়ে গেল সে দুঃখের ত শেষ নেই—কিন্তু এখন যাতে জামাই বাবাজীর সদ্গতি হয় তার ব্যবস্থা ত করতেই হবে। সম্প্রদান যখন হ'য়ে গেছে তখন সুষমাকেই ও কাজ করতে হবে বৈ-কি।"

অজিত অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে নিকটে এসে উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে, "মিথ্যা কথা বোলনা ছোটকাকা! সম্প্রদান কখন হ'ল? বরকে আসনে বসাতেই সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে,—সম্প্রদান হয় নি। পুরুত মশাইকেই জিজ্ঞাসা কর না।"

পুরুত মশায়ের সঙ্গে সুষমার কাকাদের একটা বোঝাপড়া ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় হ'য়ে গিয়েছিল, সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্‌লেন, "তা সে একরকম ইয়ে—তা সে একরকম ইয়ে—"

অজিতের সন্ধানে নরেশের এক বন্ধু নির্ম্মলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। সে পুরোহিতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "বল কি ঠাকুর! বরেতে কনেতে দেখাসাক্ষাৎই হ'ল না, আর তুমি বলছ, তা সে একরকম ইয়ে?"

পুরোহিত নির্ম্মলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "শাস্ত্রের বিধি আছে, আরব্ধ কার্য্য যদি দৈববশে শেষ না হয় তা হ'লে তার ফলাফল কার্য্য শেষ হ'লে যা হ'ত ঠিক সেই রকম হবে।"

নির্ম্মল বল্‌লে, "এমন অন্যায় বিধান তোমার কোন ন্যায়-শাস্ত্রে আছে তা তুমিই জান, কিন্তু আরম্ভই বা কি হ'য়েছিল শুনি? নরেশকে যে দুজন ধ'রে আসনের উপর এনেছিল তার মধ্যে আমি একজন। তাকে আমরা আসনে বসাতেই পারলাম না, সে তখন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ছিল, আর আপনি বলছেন, একরকম ইয়ে?—ব্রাহ্মণ হ'য়ে এমন একটা ঘৃণিত মিথ্যা কথা বলতে আপনার মুখে আটকাচ্ছে না?"

অজিতের ছোট কাকা বিপিন আস্তিন গুটিয়ে নির্ম্মলের দিকে রুখে এসে বল্‌লে, "কোথাকার বেল্লিক লোক তুমি হে—অন্দরমহলে ঢুকে হাঙ্গামা করছ? বেরোও এখান থেকে!"

বিপিনের উদ্যত হাত দুটি এক হাতে চেপে ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে নির্ম্মল স্থির কণ্ঠে বল্‌লে, "বেরুবো—কিন্তু একটি নিরীহ বালিকার সর্ব্বনাশ করবার যে চক্রান্ত আপনারা করেছেন তা ব্যর্থ করবার পাকা বন্দোবস্ত ক'রে তারপর।" তারপর বিপিনের হাত ছেড়ে দিয়ে অজিতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "দেখুন অজিত বাবু, কিছুতেই আপনার বোনকে শ্মশানে যেতে দেবেন না, তাঁর সঙ্গে নরেশের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।"

নির্ম্মলের দৈহিক শক্তির পরিমাণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে বিপিন হাত আষ্টেক পেছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "মেজদা, আমাদের পবিত্র কুলে এই রকম একটা অনাচার হ'য়ে কলঙ্ক পড়বে তা তুমি সহ্য করবে?"

গভীর স্বরে রাম ব'লে উঠ্‌ল, "কখনো না!"

বিপিন এবং রামের দলের লোকেরা সোৎসাহে কলরব করতে লাগ্‌ল।

এমন সময়ে সারদাসুন্দরী পাগলিনীর মত সেখানে এসে আছড়ে প'ড়ে বল্‌লেন, "ওরে রাম, ওরে বিপিন, এমন শত্রুতা করিস্‌নে, ধর্ম্মে সইবে না! কোথায় তোরা খুঁজে-পেতে পাত্র বার ক'রে এই লগ্নে যাতে সুষমার বিয়ে হয় তাই করবি, তা না—চিরজন্মের মত তার সর্ব্বনাশ ক'রে দিতে চেষ্টা করচিস?" তারপর পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "নিতাই, সামান্য কিছু পয়সার লোভে ধর্ম্ম পরিত্যাগ কোরো না। মনে রেখো তুমি আমাদের কুল-পুরুত।" অবশেষে নির্ম্মলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "তুমি কে বাবা?—এমন দুঃখের দিনে আমাদের বন্ধুরূপে দেখা দিয়েচ?"

নির্ম্মল এগিয়ে এসে সারদাসুন্দরীকে প্রণাম ক'রে বল্‌লে, "মা, আমি নরেশের একজন বন্ধু—তার মত বন্ধু আর আমার দ্বিতীয় কেউ নেই। যে গোলযোগের সৃষ্টি ক'রে সে চ'লে গেল তার সমাধান আমি যদি যথাসাধ্য না করি তা হ'লে পরলোকেও সে আমাকে ক্ষমা করবে না।"

সাগ্রহে নির্ম্মলের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সারদাসুন্দরী বল্‌লেন, "তুমি কি সমাধান করবে বাবা?"

"সম্প্রদান যে আরম্ভও হয়নি আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী,

যেখানে যার বিরুদ্ধে দরকার হয় আমি সে সাক্ষ্য দেব। তা ছাড়া, আমি যে বলচি, সম্প্রদানের কোন ক্রিয়া আরম্ভ হয় নি, তার প্রমাণ স্বরূপ আমি আপনার নাতনীটিকে এই লগ্নেই বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি, যদি না আপনারা আমার চেয়ে যোগ্য পাত্র জোটাতে পারেন।"

সারদাসুন্দরী হর্ষে আনন্দে অধীর হ'য়ে বল্‌লেন, "অদৃষ্ট যে আমার এত মন্দ হ'য়েও এত ভাল তা জানতাম না বাবা! তোমার চেয়ে যোগ্য পাত্র আমার দরকার নেই—তোমার হাতে সুধীকে দান ক'রে আমি ধন্য হই। কিন্তু তোমরা কোন্ গোত্র?"

"তা'তে আটকাবে না, আমরা মুখুয্যে। কিন্তু শুধু মুখুয্যে হ'লেই ত' হবে না—আপনি আমার অন্য পরিচয় নিন। বরযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আমাকে জানেন—আমি গিয়ে দু'চার জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উচ্চস্বরে বল্‌লে, "কাউকে পাঠাতে হবে না—আমি তোমার পরিচয় দিচ্ছি নির্ম্মল। নির্ম্মল এবার এম-এস-সি ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েচে, আর নির্ম্মলের সম্পত্তি চার-পাঁচ লক্ষ টাকার কম নয়।"

রাম এগিয়ে এসে বল্লে, "তা হ'লে তুমি বিধবার বিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েচ মা?"

সারদাসুন্দরী আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, "ওরে রাম, অমন অলক্ষণে কথা কেমন ক'রে মুখ দিয়ে বার করলি! সুধীর তুই কাকা হোস্ সে-কথা কি একেবারে ভুলে গেচিস?"

দূর থেকে বিপিন বল্‌লে, "কাকা ব'লেই ত' তাকে অধর্ম্ম থেকে আমরা রক্ষা করব।"

নির্ম্মলের দুই চক্ষু ক্রোধে জ'লে উঠ্‌ল। সে গভীর দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি এ বিষয়ে আর বেশি কথা বল্‌তে চাইনে। শুনুন রাম বাবু আর বিপিন বাবু, আমি একবার গিয়ে এ জন্মের মত নরেশকে দেখে আস্‌ব—তারপর সম্প্রদানের আসনে গিয়ে বস্‌ব। আপনারা দুজনে শান্ত ছেলের মত বিয়ের ঘরে ব'সে বিয়ে দেখ্‌বেন, তারপর বিয়ে হ'য়ে গেলে পাত পেড়ে আহার ক'রে বাড়ী যাবেন। এ আমার আপনাদের দুজনের উপর হুকুম রইল। এ হুকুম যদি অমান্য করেন তা হ'লে আমি আপনাদের পিঠমোড়া ক'রে ধ'রে এনে বিবাহস্থলে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্‌ব। শেষ রাত্রে একটা লগ্ন আছে—সুতরাং সময়ের অভাব হবে না।"

ভীড়ের মধ্য থেকে সেই পূর্ব্ব কণ্ঠস্বর উচ্চস্বরে বল্‌লে, "নির্ম্মলের আর একটা পরিচয় দিই। কলকাতা সহরে বাঙালীদের মধ্যে নির্ম্মলের চেয়ে বড় কুস্তিবাজ আর কেউ আছে ব'লে আমি জানিনে।"

রাম বা বিপিনের পক্ষ থেকে নির্ম্মলের কথায় কোনো প্রতিবাদ শোনা গেল না। তখন পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নির্ম্মল বল্‌লে, "আপনি সব গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকুন। বিয়ে আপনাকে দিতে হবে। কেমন রাজী ত?"

পুরোহিত ব্যগ্রভাবে মাথা নেড়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজী বই কি।"

রাজপথে মৃদুস্বরে হরিধ্বনি শোনা গেল; নির্ম্মল আর কোনো কথা না ব'লে তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে গেল।

৬

তখন রাত প্রায় তিনটে। বাসরের দীপ নেভানো। নানাপ্রকার উৎকট চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে সবে মাত্র নির্ম্মলের একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময়ে পার্শ্বস্থিতা বধূ হঠাৎ ব্যগ্রভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলে। চমকিত হ'য়ে জেগে উঠে নির্ম্মল বললে, "ভয় পেয়েছ সুষমা?"

ভীতি-কম্পিত মৃদুস্বরে সুষমা বললে, "কে খস্‌খস্ ক'রে ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে!"

"কে আবার বেড়াবে?—ও অন্য কিছুর শব্দ শুনেছ।"

অল্পক্ষণ পরেই আবার শয্যার এক পাশে খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হ'ল কে যেন শয্যার কাছ থেকে দূরে স'রে গেল।

সুষমা নির্ম্মলকে আর একটু জোরে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "ঐ!"

সাহসী এবং বলিষ্ঠ নির্ম্মলেরও মনে একটা যেন সংশয় দেখা দিল। সে সুষমাকে একটু নাড়া দিয়ে বললে, "তুমি

একমুহূর্ত্ত একলা থাক্‌তে পারবে সুষমা, আমি সুইচটা খুলে দিয়ে আসি।”

সুষমা অস্ফুটস্বরে বললে, “না।”

“আচ্ছা, তা হ’লে আমার সঙ্গে চল, সুইচবোর্ডটা কোথায় আছে আমার ঠিক আন্দাজও নেই।”

যাবার সময় ঠিক পায়ের কাছে আবার খস্‌ ক’রে শব্দ হ’ল। সুষমা ‘মা গো!’ ব’লে চীৎকার ক’রে উঠ্‌ল।

সুষমাকে সবলে বাহুপাশে জড়িয়ে ধ’রে নির্ম্মল তাড়াতাড়ি সুইচ খুলে দিলে। ঘর আলোকিত হ’তেই দেখ্‌লে একটা লাল রংএর কাগজ খস্‌ ক’রে স’রে গেল। নির্ম্মল হেসে বললে, “এই দেখ সুষমা, তোমার মানুষ!” তারপর কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখ্‌লে অপর দিকে একটা কবিতা ছাপা—শিরোদেশে বড় বড় অক্ষরে লেখা ‘শ্রীমান নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী সুষমা দেবীর শুভপরিণয়ে প্রীতি-উপহার।’

প্রথম দু’তিন ছত্র প’ড়ে নির্ম্মল কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে একটা কাগজ-চাপা চেপে দিলে।

সুষমা বললে, “ও-টা ঘরের বাইরে ফেলে দাও।”

“কেন, আর ত’ উড়ে পড়বার ভয় নেই।”

“তা হোক!” সুষমার কণ্ঠস্বরে মিনতির কাতরতা।

নির্ম্মল বল্‌লে, “আচ্ছা, তাই দিচ্ছি।” ব’লে জানলার ধারে এসে বাইরে কাগজখানা উড়িয়ে দিলে। সুষমাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন বাতাস বচ্ছিল একটু জোরে,—সেই বাতাসে কাগজখানা উড়ে চল্‌ল উল্টে পাল্টে, কখনো উপর দিকে উঠতে উঠ্‌তে, কখনো নীচের দিকে নামতে নামতে। শিউলি গাছের আগ্‌ডালে একবার আটুকে গিয়ে আবার উঁচু দিকে উড়ে চলল—তারপর রান্নাবাড়ির ছাদ পেরিয়ে পিছনের গলি পার হ’য়ে প্রতিবেশীর গৃহের মধ্যে অদৃশ্য হ’য়ে গেল।

স্তব্ধ হ’য়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নির্ম্মল বল্‌লে, “চল সুষমা, এবার শোবে চল।”

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শেষ হ'লে
পবন হিল্লোল তোলে,
সোনালি কিরণ ঢালে মেঘমুক্ত রবি,
তাদের মিলিতহাসি
দেয় শূন্যে পরকাশি'
আকাশের কক্ষতলে নব নীল ছবি।

মনে মনে হাসি হায়,
এ কি হেরি পুনরায়!
কে গড়িছে স্মৃতিস্তম্ভ, এ কি রে আমার!
গর্ভ হ'তে শিশুসম,
সমাধির প্রেতসম
জাগি আমি, ভাঙি গড়ি কত শত বার!

কুমারী মমতা মিত্র

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হে রংএর কবি,
তুলির কবিতা তব রসময় ছবি—
কত ভাব কত ছন্দ কত রূপরাশি
উঠিছে উদ্ভাসি'
ও কমল-করে
শুভ্র পট' পরে।

তুচ্ছকারী পশ্চিমের চিত্ররীতি সব—
অস্থিবিদ্যা, ভঙ্গী, অবয়ব;
তুমি চলি' ভারতীয় পথে
কল্পনার রথে,
ফুটাইলে রঙীন স্বপন
নয়ন-লোভন।

ভারতের পর্ব্বত-গুহায়
যে সাধনা যে সম্পদ ছিল লুপ্তপ্রায়,
তারা আজি মূর্ত্তি লভি' তব তুলিকায়
লভিল সম্মান বিশ্ব-গুণীর সভায়।

ভারত-ভারতী—
লভিল তোমার করে রংএর আরতি।
রূপের সাধনামগ্ন ওগো রূপকার
লহ মোর হৃদয়ের শ্রদ্ধা-নমস্কার।

বিবিধ সংগ্রহ

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় অনাবিষ্কৃত ভূভাগ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ার মত সুবৃহৎ দেশের কোথায় কি আছে এখনও পর্য্যন্ত সমুদয় আবিষ্কৃত হয় নাই বা সভ্য মানুষও সকল স্থানে এখনও বসতি স্থাপন করে নাই। বিশেষ করিয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় এখনও সভ্য মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প; পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার এই অংশে একটিও সভ্য লোকের বাস ছিল না, এখনও যে খুব বেশী তাহা নহে, সর্ব্বশুদ্ধ সাত হাজার লোকের উপর ইহাদের সংখ্যা হইবে না। অবশ্য একদিক হইতে দেখিতে গেলে খুব অল্পদিনেই লোকসংখ্যা এত বাড়িয়াছে, কারণ ১৮৬৩ সালে এই অংশে রোবাক্ উপসাগরের উপকূলে (Roebuck Bay) সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তখনও এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই অজ্ঞাত ছিল—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত দেশ-আবিষ্কারক ও পর্য্যটক সার জন্ ফরেষ্ট্ এদিকে অনেক দিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উপকূল হইতে বহুদূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে ঢুকিয়া গিয়া তিনি ইহার ম্যাপ তৈয়ারী করেন। কয়েক বৎসর পরেই খনিবিদ্ হল্ ও শ্ল্যাটারি যখন এদেশে সোনার খনি আবিষ্কার করিলেন তখন হইতেই হু হু করিয়া লোকসংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিল।

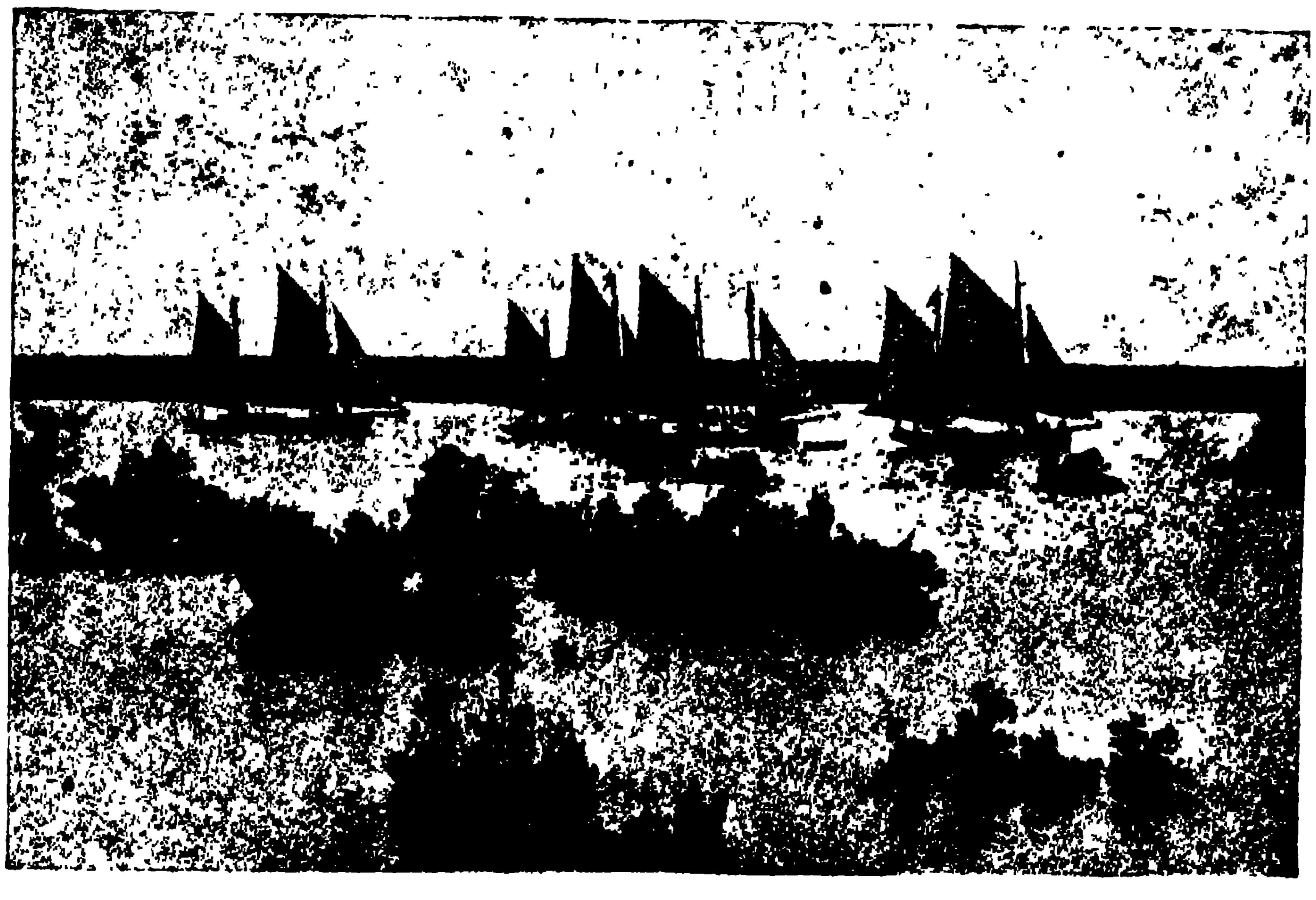

মুক্তান্বেষী নৌকাশ্রেণী

অষ্ট্রেলিয়ার এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার—যাহারা বারো মাস ঘরে বসিয়া কাটান, তাঁহারা পৃথিবীর এই সব অপূর্ব্ব দেশের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করিতে পারিবেন না।

উপসাগরের কূলে কূলে সর্ব্বত্রই ম্যানগ্রোভ গাছের বন। এ ধরণের গাছ কেবল লোনা জলের সোঁতার ধারে জন্মিয়া

থাকে—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নদী যেখানে আসিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে, এমন স্থানে কর্দ্দমাক্ত উপকূলভাগে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যান্‌গ্রোভ গাছের বনের ধারে এ সব অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যাইবে—কতক নীলবর্ণ, কিন্তু বেশীর ভাগই টক্‌টকে লাল। কতকগুলি কাঁকড়া হলুদ রংয়েরও আছে, তবে এগুলি আরও বড় বড়—এক এক দলে দুই তিন শত থাকে, উত্যক্ত হইলে মানুষকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসে।

অষ্ট্রেলিয়ার এ অংশে নদীর মুখেও সমুদ্রে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। তাদের একপ্রকার ফাঁদ পাতিয়া মাছ ধরিবার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত আছে। নদী ও খালের মুখে একটা ফাঁদ মাছে ভরিয়া গিয়াছে। এই দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভ হইতে দশ বৎসরে এগারো লক্ষ ডলারের ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশ বর্গ-মাইল জুড়িয়া প্রবালভূমি

চিলি ক্রীক্

ভাঁটার সময় তাদের তৈয়ারী ফাঁদগুলি পাতিয়া রাখা হয়, জোয়ারের সময় মাছ ঢুকিয়া পড়ে কিন্তু আর বাহির হইতে পারে না—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে দেখা যায় এক

রোবাক উপসাগর হইতে কিং সাউণ্ড পর্য্যন্ত প্রায় এগারো শত মাইল উপকূলভাগ আজকাল মুক্তা-উত্তোলন কারী ব্যবসায়ীগণের উপনিবেশে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সমগ্র

পৃথিবীতে বৎসরে যত ঝিনুক ও মুক্তা সংগৃহীত হয়, তাহার তিন-চতুর্থাংশ এখান হইতে পাওয়া যায়। মুক্তা-ব্যবসায়ীগণ যে ডুবুরী নিযুক্ত করে, তাহাদের অধিকাংশ এশিয়াবাসী কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ জাতি। অষ্ট্রেলিয়ার আইনানুসারে তথায়

লড়িয়ে কাঁকড়া—বেশি উত্যক্ত হইলে ইহারা আক্রমণ করে।

ইহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ; কেবলমাত্র মুক্তা-উত্তোলনের কার্য্যে ইহাদের লাগানো যাইতে পারে—আইনের একটি বিশেষ ধারা অনুসারে।

তিমির মত দেখিতে, অবশ্য তিমি অপেক্ষা অনেক ছোট। ডুগংএর গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত মোটা ও দুর্ভেদ্য। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ অনেক সময় ছোট ছোট ভেলায় করিয়া ডুগং শিকার করিতে যাইয়া থাকে—তাহাদের অস্ত্রের মধ্যে বর্শা সম্বল—কিন্তু বর্শা দ্বারা ডুগং প্রায়ই মারা পড়ে না—অনেক বর্শা ভাঙিবার পরে হয়তো কাহারও ভাগ্যে একটা জুটিয়া যায়। ডুগংএর মাংস খাইতে সুস্বাদু—সভ্য ও অসভ্য তাবৎ লোকেই খুব আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। চর্ব্বি হইতে এক-প্রকার মূল্যবান তৈল পাওয়া যায়, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ইহার মূল্য খুব বেশী। তিমি-শিকারের ব্যবসায় যেরূপ লাভজনক, ডুগং-শিকার তাহার অপেক্ষা কম লাভের নহে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্রই আজকাল এ ব্যবসায় ছাড়াইয়া পড়িতেছে।

উপকূল হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর ঘন অরণ্য। এই সকল অরণ্যে নানা মূল্যবান কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তবে এখনও পর্য্যন্ত কাষ্ঠের ব্যবসায়ের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে

চিলি ক্রীকের ধারে অসংখ্য কাঁকড়ার দল

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলভাগ প্রবালের ঝাড়ে পরিপূর্ণ। অত্যন্ত সাবধান হইয়া জাহাজ না চালাইলে এই-সকল স্থানে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা খুব বেশী। স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে জাহাজ একেবারেই চলে না।

ডুগং নামক সামুদ্রিক জন্তু এ অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ডুগং (Dugong) স্তন্যপায়ী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—অনেকটা

নাই। নদীর মুখে নৌকা চালাইয়া যাওয়া অনেক সময় বিপজ্জনক, কারণ এই সকল স্থান বড় বড় কুমীরে পরিপূর্ণ, তাহারা এত হিংস্র যে অনেক সময় নৌকায় উঠিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। মুক্তা-ব্যবসায়ীগণ আজকাল মোটর-বোট ব্যবহার করে, মোটর-বোটের শব্দে ইহারা ভয় পাইয়া তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না।

স্থানীয় আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা নিজেদের পিঠ বা বুকে একপ্রকার ঝিনুক দিয়া চামড়ার উপর লম্বা লম্বা দাগ কাটে, পরে কোনো লতার রস মাখাইয়া তাহা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করে, কোনো কোনো স্থলে ম্যান্‌গ্রোভ দেশের তলাকার কর্দ্দমও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এক এক জাতীয় চিহ্ন এক এক রূপ—কেহ পিঠে গোল দাগ কাটে, কেহ কেহ কতকগুলি সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করে—পিঠের ও বুকের এই চিহ্ন দেখিয়া কে কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহা ধরিতে পারা যায়।

কয়েকটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক এ অঞ্চলে ফলের চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। তাঁহাদের বাগানে উষ্ণমণ্ডলের নানাবিধ ফুলফল পাওয়া যায়। ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ভেড়া ও ছাগল পোষাও এ অঞ্চলের একটি লাভজনক কারবার।

এই প্রদেশের আদিম অধিবাসীগণ ভারী দুর্দ্দান্ত ও কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে মালয়-রক্ত আছে, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে মুক্তাসংগ্রহের লোভে

একদল কচ্ছপের বাচ্চা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রজলাভিমুখে চলিয়াছে

রাত্রিবাসের পর স্ত্রী-কচ্ছপেরা বালুকার উপর তাহাদের পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছে

মালয়ের অধিবাসীরা এ সকল অঞ্চলে আসিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্ম কয়েকটি পাদ্রি তাঁহাদের মিশন স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পোর্ট জর্জ্জ মিশন খুব ভাল করিতেছে। এই মিশনের কর্ত্তা মিঃ উইলসন সস্ত্রীক এখানে বাস করেন।

একপ্রকারের সামুদ্রিক সাপকে প্রায়ই জলের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সকল সাপ অত্যন্ত বিষধর, দৈর্ঘ্যে এক একটা বারো তেরো ফিটের কম নহে।

নেপিয়ার উপসাগরের উপকূলে স্পেনীয়দিগের আর একটি মিশন আছে—ইহা প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। এ স্থানটি খুবই নির্জ্জন, সারা বৎসরের মধ্যে হয়তো একবার কোনো সভ্য মানুষ এদিকে আসে। খাইবার দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, মিশনের নিজেদের ছোট জাহাজে করিয়া দুইশত মাইল দূর ক্রুম্ নামক ছোট সহর হইতে জিনিসপত্র আনিতে হয়। তবে আজকাল মিশনবাড়ীর চারিপাশের জমিতে ইঁহারা ধান ও তামাকের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ উপসাগরে লাক্রোস নামে একটি ছোট বসতিশূন্য দ্বীপ আছে—এই দ্বীপের কূলে বড় বড় সামুদ্রিক কচ্ছপের আড্ডা। শুধু মাত্র চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিলেই কচ্ছপেরা আর নড়িতে পারে না—এই উপায়ে একবার একরাত্রের মধ্যে জনৈক শিকারী তিরাশিটি কচ্ছপ ধরিয়াছিল। এই সকল কচ্ছপ এত বড় যে মানুষকে পিঠে অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। মিঃ জ্যাক্সন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এই সকল সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এখানে বাস করিতেছেন।

ফরেষ্ট্ নদীর ধারে আর একটি মিশন স্থাপিত হইয়াছে—ফরেষ্ট্ নদীর তীরবর্ত্তী অসভ্য জাতিগণের মধ্যে সভ্যতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই এই মিশনের প্রতিষ্ঠা। ইঁহারাও সম্প্রতি কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ কেহ গরু ও ভেড়ার ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন। তবে যাতায়াতের ভাল রাস্তা নাই, দেশ শুধু জঙ্গল ও পাহাড়ে ভরা, অভ্যন্তর-ভাগের অধিকাংশই ঊষর বালুকাময় মরুভূমি—এই সব অসুবিধার জন্য এখনও বিস্তৃতভাবে সভ্যজাতির উপনিবেশ এদেশে গড়িয়া উঠে নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবার

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কয়েক বৎসরের মধ্যে রবার শিল্পে ও বাণিজ্যে যুগান্তর এনেছে। বর্ত্তমান যুগে রবারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু বলা চলে। ছেলেদের খেলানা, চশমার ফ্রেম, গাড়ীর 'টায়ার'-'টিউব,' বর্ষাতি, ব্যায়ামের সামগ্রী প্রভৃতি কত অসংখ্য বস্তু এদেশে তৈরী হ'চ্ছে তার সংখ্যা নেই। রবারের জন্য বিজলী-তার নিরাপদে নাড়াচাড়া করা চলে। রাস্তা-তৈরী কাজে রবার ব্যবহৃত হ'চ্ছে। পেট্রোলিয়ম ব্যবসায়ে রবার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, হয় ত রবার না থাকলে সে ব্যবসা তত বেশি চলত না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কেউ কখনো স্বপ্নেও মনে করতে পারেনি যে রবার জীবনের কোন প্রয়োজনীয় ব্যবহারে আসবে—আজ সেই রবার বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

রবার-আবিষ্কারের খ্যাতি স্পেনবাসীদের প্রাপ্য। তারাই ক্রমে মেক্সিকোতে গিয়ে দেখতে পায়—তথাকার অধিবাসীরা এক রকম কাল রঙের বল নিয়ে খেলছে, যা

মাটিতে পড়লে লাফিয়ে উঠে। কৌতূহলী হ'য়ে তারা এ সম্বন্ধে বিশেষ খবর নিয়ে জান্‌তে পারলে যে এ বস্তু Ulaquhuil নামক গাছের রঞ্জনের মত আটা হ'তে তৈরী। তাদের কাছে এ পদার্থ সম্পূর্ণ নূতন রূপে ধারণা হওয়ায় তারা ইউরোপে নিয়ে যায়। কিন্তু তখন রবার কাজের ব্যবহারে আসে নি, যদিও তথাকার অধিবাসীরা এ দিয়ে কি ক'রে চামড়ার বস্তুকে জল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে তা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিল। ১৭০৫ খ্রীঃ অঃ-এ La Condamine অবিশুদ্ধ (crude) আটা ইউরোপে নিয়ে যান—কিন্তু তখনও রবার বিক্রয়যোগ্য হয় নি।

রবার চাষের একটি নর্সারি—এখান থেকে চারাগুলি নিয়ে নূতন রবার ক্ষেত্রে বসানো হয়।

মালয়ে একটি নূতন রবার ক্ষেত্রের দৃশ্য

পরে Pristley নামক কোন রসায়নবিদ পণ্ডিত রবারের পেন-সিলের দাগ তুলবার গুণ বার করেন—তা থেকে এর চলিত নাম হয় রবার (Rubber)। আরো অনেক পরীক্ষার পর জামার বহির্ভাগ 'ওয়াটার-প্রুফ' করবার বার্নিশ করার পদ্ধতি বার হয়। কিন্তু এই বার্নিশ থেকে এমন একটা উৎকট গন্ধ বেরুত—যে, রবার দ্বারা নির্ম্মিত পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তিকেলোকে যথাসাধ্য দূরে পরিহার ক'রে চলত।

ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় রসায়নবিদ পণ্ডিতরা রবারেরজল-শোষণ নিরোধ করার গুণ উদ্ভাবন ক'রে দেখাতে ব্যবসার সামগ্রী হিসাবে বাজারে এর দাম খুব বেড়ে গেল। সাধারণ (raw) অবস্থায় রবারে কোন কাজ হয় না—আবার রবারকে শক্ত করতে গেলে এর স্বাভাবিক গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। ১৮৩০ অব্দে Goodyear নামক একজন আমেরিকান ও Hancock নামা এক ইংরেজ একসঙ্গে 'Vulcanise' করবার উপায় উদ্ভাবন করেন—এর দ্বারা রবারের স্বাভাবিক গুণ বজায় থাকে।

প্রথম প্রথম রবারের বস্তু-নির্ম্মাতারা বেশী রবার সংগ্রহ করতে পারত না। তখন শুধু মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যজাত বৃক্ষ থেকে রবার পাওয়া যেত। সেই রবার অপরিষ্কার, আটাল ও নিকৃষ্ট ধরণের। বড় বড় বৃক্ষ হ'তে

প্রাপ্ত রবারের মধ্যে 'প্যারা' (Para) রবার বাজারে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য। এ জাতীয় বৃক্ষ আমেজন নদীর উপত্যকায়, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। সিংহলে ও মালয় দ্বীপেও এ জাতীয় গাছের খুব ভাল চাষ হ'চ্ছে। 'সিয়ারা'

তিন বছরের নূতন রবার ক্ষেত্র—আরও বছর দুই না গেলে খাঁজ কেটে রস বার করা চল্‌বে না

(Ceara) জাতীয় রবার ব্রেজিলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়— অন্যান্য স্থানেও এর বেশ চাষ হ'চ্ছে। এর 'আটা' সংগ্রহ করা শক্ত—সহজে বার হয় না। বাজার-দর 'প্যারা' রবারের চেয়ে কম। 'Ule' জাতীয় রবার মধ্য আমেরিকা ও ব্রিটিশ Hondurasএ জন্মায়—মেক্সিকোয় প্রচুর হয়। এ রবার বড় কাল (dark) ও অতিশয় অপরিষ্কৃত। গুণে প্যারা জাতীয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট—দামেও কম। আসামের রংবং (Rambang) জাতীয় বৃক্ষ ইণ্ডিয়া-রবার ব'লে গণ্য। এ গাছ ইউরোপে গৃহসজ্জার জন্য চাষ হয়। এসিয়াই এর আদিম জন্মস্থান—আকারে খুব প্রকাণ্ড। ভারত, সুমাত্রা ও যাভা দেশের অধিকাংশ রবার এই জাতীয়। এ রবার খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় হওয়া সত্ত্বেও অশিক্ষিত মজুরদের দ্বারা সংগ্রহ করার দোষে ময়লা হয়—এ জন্য প্যারা রবারের চেয়ে দাম কম। আফ্রিকা দেশীয় 'সাগোস' (Sagos) জাতীয় রবার উগাণ্ডা (Uganda) থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্য্যন্ত স্থানে জন্মায়। এর বীজে রেশমের মত আঁশ থাকায় এ জাতীয় রবার 'সিল্ক-রবার' ব'লে খ্যাত। এ জাতীয় রবার ভাল জাতের হ'লেও সংগ্রহ ও তৈরী করার দোষে নিকৃষ্ট-শ্রেণীর হয়। এতদ্ব্যতীত আরো লতাজাতীয় গাছ আছে—যা থেকেও রবার পাওয়া যায়।

আমেজান নদীর উপত্যকা থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশে প্যারা রবারের চাষের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। আজ যে এইবৃক্ষের চাষ থেকে ইংরেজের বিশেষ ধনবৃদ্ধি হ'চ্ছে—তার মূল Sir Henry Wickhamএর আন্তরিক

রবার গাছে খাঁজ কেটে নির্য্যাস সংগ্রহ করা হচ্ছে

চেষ্টা। ব্রেজিলে নানাবিধ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত 'ট্রপিক্যাল' স্থানে রবার-বীজ রোপণ করবার

মতলব তাঁর মাথায় ঢোকে। এ দু' স্থানের জলবায়ু অনেকটা একরূপ ব'লে এ স্থান রবার-চাষের অনুকূল ব'লে তাঁর ধারণা হয়। কিন্তু এই অভিপ্রায় পূর্ণ করতে তাঁকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রথমতঃ ব্রেজিলবাসীরা বীজ দিতে অনিচ্ছুক ছিল—দ্বিতীয়তঃ জলবায়ুর পরিবর্ত্তন বীজের উর্ব্বরাশক্তি কমিয়ে দিত। তা ছাড়া ব্রেজিল থেকে বীজ এনে রোপণ করতে বিশেষ সময়ও লাগত। স্যর হেনুরি ব্রেজিল থেকে বীজ এনে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কিউ (Kew) উদ্যানের ডিরেক্টরকে দেন। এখানে রবার-বীজ থেকে সবল চারা তৈরী ক'রে ভারতে পাঠান হয়। প্লাণ্টাররা নতুন কিছু চাষের চেষ্টা করছিল—ঠিক সেই সুযোগে নতুন একটা চাষের বস্তু পাওয়ায় সিংহলে রবার-চাষের প্রবর্ত্তন সহজেই হ'য়ে গেল। সিংহল থেকে ক্রমশঃ সিঙ্গাপুরে এ চাষ নীত হয়। এখনো তথাকার বোটানিকাল গার্ডেনে—প্রথম গাছের কয়েকটা দেখা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ মালয়, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি স্থানে ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রবারচাষ প্রসার লাভ করে।

রবার সংগ্রহের জন্য 'রবার গাছ কেটে (tapping) রস নিষ্কর্ষণ করতে হয়। এরূপ উপায়ে দুধের মত সাদা তরল পদার্থ (latex) পাওয়া যায়। এই

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি রবারের রস বার ক'রে নেওয়া হচ্চে—বায়ু গরম হয়ে গেলে রস জ'মে যাবে

সে সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট নতুন স্কীমে (পরীক্ষায়) অর্থব্যয় করতে রাজী না থাকায়, চারাগুলি সিংহলের বোটানিকাল গার্ডেনে পাঠানো হয়। সিংহলের বর্ত্তমান রবার চাষের মূলই হ'চ্চে এই। ভারত দুর্ভাগ্যক্রমে লাভজনক রবার চাষ থেকে বঞ্চিত হ'ল।

রবারচাষের প্রবর্ত্তনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্ব থেকে এর প্রকৃত চাষ আরম্ভ হয়েছে। সিংহলে কফি-চাষে পোকা ধ'রে বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় তথাকার latex ও বৃক্ষের রস (sap) এক পদার্থ নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন। চাষজাত রবারের চেয়ে অরণ্যজাত রবারের কাঠিন্য গুণ (tension) বেশী থাকায় অরণ্যজাত রবারকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে ধরা হয়। রবারগাছ 'কাটা'র নানাবিধ উপায় আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উপায় হচ্ছে—গাছের গোড়া থেকে প্রায় ৬ ফীট উঁচুতে বৃক্ষের চারিধারে ইংরাজি Vর আকারে খাঁজ কাটা। এই কাটার কোণে পাত্র রেখে রস সংগ্রহ করা হয়।

আর একটি পদ্ধতির নাম—Herring-bone system। এ উপায়ে খাড়াভাবে কতকগুলি খাঁজ কেটে পার্শ্বদেশ থেকে কোণাকুণি ভাবে এক ফুট অন্তর খাঁজ কাটা হয়। খাড়া খাঁজের শেষে রক্ষিত পাত্রে রবার সংগৃহীত হয়।

ক্রেপিং মেশিনের ভিতর দিয়ে রবার চালনা করা হচ্ছে

নতুন একটা পদ্ধতির এখনও পরীক্ষা চল্‌ছে—এর নাম Spiral system। এতে সমুদয় কাণ্ডদেশের চারদিক বেষ্টন ক'রে খাঁজ কাটা হয়। এতে গুঁড়ির সমস্ত অংশ থেকে রস পাওয়া যায়। V-system সব চেয়ে পুরাতন। সাধারণতঃ Herring-bone systemই বেশী অবলম্বিত হয়। ব্রেজিলে দেশীয় প্রণালী-মত রস নিষ্কর্ষণ করা হয়—কিন্তু এতে গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। এখন পর্য্যন্ত এমন কোন উপায় বার হয় নি যাতে বেশী পরিমাণে রবার পাওয়া যায় অথচ গাছের কোন ক্ষতি হয় না।

রবার ক্ষেত্র ধ্বংসকারী জীব ছুটির পরিণতি

রবার গাছের তরল পদার্থ বড় পাত্রে রেখে নানাবিধ উপায়ে জমাট বাঁধান হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় বৃক্ষের রস একটা হাতায় ডুবিয়ে palm-nutএর জ্বলন্ত তেলের ধোঁয়ায় রেখে তৈরী করা হয়। কিন্তু চাষে প্রাপ্ত রসে 'এসেটিক এসিড' বা 'লাইমজুস' দিলে রবার স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। অগার-পাত্রে ঢেলে রবার-নির্য্যাসকে পাতলা কেকের আকার দেওয়া হয়। তখন এর নাম হয় biscuit। তারপর ধৌত ও শুক্‌নো ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটা হয়—পরে খাঁজকাটা রোলারে পিষে 'সীট' (Sheet), 'রিবন' (ribbon), বা 'ক্রেপ' (crepe)' আকারে পরিণত করা হয়। অবশেষে Hot air chambers বা Vacuum driesএ রবার সম্পূর্ণরূপে জলশূন্য করা হয়।

মালয়ে ও সিংহলে ভাল রবার জন্মায়। মালয়ে রবার চাষ করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের নিকট থেকে নাম মাত্র সেলামি দিয়ে জঙ্গলপূর্ণ জমি নিতে হয়। এক একর জমি জঙ্গলশূন্য ক'রে রবার চারা লাগাতে ১৫০ ডলার লাগে। ছোট ছোট রবার-চারা টমেটো-চারার ন্যায় দেখ্‌তে, প্রতি চারা ১৫।২০ ফীট অন্তর বসাতে হয়। একবার চারা লেগে গেলে জমি আগাছাশূন্য করা ছাড়া আর বেশী কিছু দরকার হয় না। এর জন্য ২৫ ডলার একর-প্রতি খরচ

হয়। চারা যখন নিষ্কর্ষণের উপযুক্ত হয়—তখন প্রতি একরে ২২৫।২৫০ ডলার পাওয়া যায়। কিন্তু সিংহলের প্রতি একর জমি জঙ্গলশূন্য করতে ও চারা লাগাতে ১০০৲ টাকা লাগে, আর যে পর্য্যন্ত চারা রবার-প্রদানে সমর্থ না হয় ততদিন প্রতি বৎসরে প্রতি একরে ২০।৩০ টাকার বেশী খরচ হয় না। তারপর দশ বৎসর ধ'রে উৎপাদনের শক্তি বাড়তে থাকে—১৬ বৎসর অবধি এক রকম থাকে—তারপর উৎপাদন-শক্তি ক'মে আসে। সাধারণতঃ প্রতি একরে ৩৫০ পাউণ্ড রবার পাওয়া যায়। মালয় প্রদেশ রবারচাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল—এখানকার প্রধান আয় রবার থেকে। চতুর্দ্দিক থেকে রবার এখানে পরিস্কৃত হ'তে আসে ব'লে মালয় রবার-কেন্দ্র হ'য়ে আছে।

রবার দক্ষিণ বা মধ্য আমেরিকা, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন-বস্তু হ'লেও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ও ইউরোপে রবার শিল্প কার্য্যে সমধিক ব্যবহৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ জগতের উৎপন্ন রবারের ২/৩ ভাগ নিয়ে থাকে—যদিও তথায় রবার কিছুমাত্র উৎপন্ন হয় না। ১৯১৩ সাল অবধি ব্রেজিল রবার-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল—তারপর থেকে অন্যান্য স্থানে রবার উৎপন্ন হ'চ্ছে। আমেরিকায় একটা কোম্পানী আছে—এরা শুধু রবার থেকে ৩০,০০০ রকম বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন করে। এখানে রবারের ৪/৫ অংশ টায়ার ও টিউব নির্ম্মাণে ব্যবহার হয়। রবার-শিল্প খুব নতুন—এর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। রবারের চাহিদা এত বেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে অনেকে মনে করেন ১৯৩২ সালে জগতে রবারের বিশেষ টান পড়বে। কারণ, নতুন ক'রে রবার উৎপন্ন করতে সময় লাগবে। যে ভাবে রবারের চাহিদা বেড়ে চলেছে তাতে বোধ হয় যে, আগামী ১৯৩২ সালে ১,০০০,০০০ টনের দরকার হবে—কিন্তু এখন প্রতি বৎসরে উৎপন্ন রবারের পরিমাণ ৮০০,০০০ টন মাত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

সমর্পণ

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

সেদিন শুধু তুমিই ছিলে
শুন্‌তে আমার গান,
তোমার দ্বারে যেতাম ব'য়ে
ব্যথায় ভরা প্রাণ ;
সবার থেকে অনেক দূরে
ডাক্‌তে অমর মিলন-পুরে,
বাহুর ডোরে ভুলিয়ে দিতে
প্রেমের অভিমান।

আজকে তুমি কোথায়, প্রিয়,
কার কাছে আজ যাই !
সংসারে এই ভিড়ের ঘোরে
কোন্‌খানে মোর ঠাঁই ?
আজও তো প্রাণ কেঁদে ওঠে,
তোমার পানে হৃদয় ছোটে,
সন্ধ্যারাতে মিলন-তারায়
কার মুখে আজ চাই ?

এখন হ'তে কান্না আমার
সুখের স্মরণ দিয়ে
বিশ্বভুবন মাঝে তোমায়
জানিয়ে যাব, প্রিয়ে।
আমার তুমি যেথাই থাকো
এ গান কোথাও বাজ্‌বে নাকো ?
তখন তোমার সইবে কি আর
মিথ্যে আড়াল দিয়ে ?

ভারতসমুদ্র
১৯৩০

নাম না জানা ফুল

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী

নাম না জানা ফুলে মাঠের বুকখানি ওই ছাওয়া,
আজ্‌কে আমার হবে না ভাই ওই পথেতে যাওয়া।
শীতের হাওয়া শেষ হলো আজ নূতন বসন্তে,
প্রাণের কমল আনন্দে ওই দুল্‌ছে অনন্তে !
সেই প্রাণেরি পরশ লভি উঠ্‌ল ওরা জাগি ;
একটুখানি বুকের মধু কাঁপ্‌ছে কি ধন মাগি !
নূতন মেলা দলগুলি ওই রোদ্ শিশিরে মাখা,
বিদায় ক্ষণের সজল চো'খে সোনার স্বপন আঁকা।

হয়ত হবে দিনেক লাগি ওদের জীবন দান,
এর-ই মাঝে শেষ হবে সব দুঃখ সুখের গান !
হয়ত হবে এই শুভখন্, ওদের মধু-মাস ;
প্রিয়ার ঠোঁটে প্রিয়ের লাগি ফুট্‌ছে মধুর হাস !
বিশ্বরূপের রূপের হাটে ওদের বেচা-কেনা,
হয়ত আজই সব ফুরোবে—প্রাণের লেনা-দেনা ?
আজকে পথিক পথ চলোনা—লাগ্‌বে কোমল গায়ে,
দাও নিরালা দুল্‌তে ওদের মন্দ মধুর বায়ে।
গণ্ডগোল আজ থামারে ভাই—চুপ্‌টি ক'রে শুনি,
অস্ফুট ওই ছন্দে গীতে ভাবের মালা বুনি !

ফুলের বিলাপ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

মোরা ফুল, মোরা মেদুর, পেলব, বর্ণ উজল কম্র তনু,
পুষ্পে করিয়া সায়ক হানিছে মীনকেতনের বক্র ধনু !
নির্ম্মম ভাবে হিয়া কাটে কীট, প্রজাপতি যায় গণ্ড ছুঁয়ে,
ঊর্ণনাভের লালসায় সুধা, বিষ হয়ে ওঠে দণ্ড দু'য়ে !
কেহ মধু-সুধা, কেহ লয় বিষ, মুগ্ধ নয়নে চাহে যা কেহ,
শত প্রলোভনে সফল করিতে কেহ বা বিফলে জ্বালায় দেহ ।
ফুলের জীবন দু'দিনের তরে, জানি তাহা জানি ক্ষণেক পরে,
খসিবে বৃন্ত, দলগুলি ঝরে' শুকিয়ে মু'খানি যাবে সে ম'রে ।
তবু মধু ধরে বুকের পেয়ালে, হৃদয় তথাপি সুবাস পোরা,
আতুর আসিলে সেবা অকাতরে প্রদানি মুক্ত হস্তে মোরা ।
সকালে সমীর হাতছানি দেয় ; কহে, "পালা, পালা" দুপুর বেলা,
চাহি অপাঙ্গে, সায়াহ্নে হাসে, রজনীতে বসে হাসির মেলা !
ফুলের জীবনে কোন ব্যথা নাই, হাসি দেখি হায় ভাবিছ সবে,
কাঁটার উপরে জীবন কাটায়, গোলাপের জ্বালা জানে কে কবে ?
কেহ ভালবাসে, কেহ বা বাসে না, ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে পথের মাঝে,
পথে পড়ি ফুল, কাঁদিয়া আকুল, ধূলিতে কালিতে মরে সে লাজে !
ঠাকুরের পায়, বধূর খোপায়, শোভা পায় যারা ভাগ্যবতী,—
ললাটে পরিয়া জয়টিকা, করে ঘরে মন্দিরে, পুণ্যারতি ;
তাহাদের নাই সুখের তুলনা, দেবাশিস্ বারি পড়িছে শিরে !
তাহারা চাহিছে এ মর জগৎ অমর করিয়া গড়িতে ফিরে ;
পঙ্ক কাজলে লিপ্ত ধরণী, লুপ্ত হইত সুপ্তি মাঝে,
তাদেরি সুরভি নিশ্বাসে শুধু এখনো মরেনি জাগিয়া আছে ।

নানাকথা

রবীন্দ্রনাথ

২৫-এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ১২৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কবি সম্প্রতি প্রবাসে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার জন্মদিন অগতপ্রায়, আমরা তদুপলক্ষে একান্তচিত্তে তাঁহার দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছি।

*   *   *

দীপালি-সঙ্ঘ

ঢাকার দীপালি-সঙ্ঘের সম্পাদিকা কর্ত্তৃক প্রেরিত ১৯২৯ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তনের কালে মহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি জাতীয় প্রগতি বিষয়ে যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলার নারী-সমাজ ইহার দ্বারা যদি কিছু প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন ও কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা হইলে দীপালি-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ১২ জন সভ্য লইয়া দীপালি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের কয়েকটি সহরে প্রতিষ্ঠিত দীপালি-সঙ্ঘের সভ্য ছাড়া একমাত্র ঢাকা সহরেই ইহার পাঁচ শতাধিক সভ্য আছেন। ইহা হইতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দীপালি কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন, শিল্প-শিক্ষা, সঙ্গীত-শিক্ষা, চিত্রাঙ্কণ, ব্যায়াম-শিক্ষা প্রভৃতি উপকারী বিষয়ে দীপালির নিয়মিত ব্যবস্থা আছে, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বক্তৃতাদি প্রদানও হইয়া থাকে।

ঢাকার মত অত বড় একটি সহরে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই। এমন কি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। দীপালি-সঙ্ঘ দুঃস্থ উপেক্ষিত বালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

১৯২৬ সালে কয়েকটি বালিকা লইয়া অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে উয়ারি, বক্সীবাজার, জিন্দাবাজার, কয়েৎটুলি, ও ঠাটারীবাজারে প্রায় আড়াই শত বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে। দীপালি-সঙ্ঘের পক্ষে এই ব্যাপারটি কম কৃতিত্বের কথা নয়।

প্রায় দুই বৎসর হইল দীপালির অন্তর্গত একটি ছাত্রী-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ২২শে ডিসেম্বর জগন্নাথ হলে রমনায় দীপালি-ছাত্রী-সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রায় ১০০০ মহিলা পুরুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত উৎসবে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সভাপতির কার্য্য করেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করি—এবং ইহার উন্নতি-বিধানে দীপালির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ এম-এ এবং তাঁহার সহকর্ম্মিণীগণ যে পরিশ্রম করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

*   *   *

জয়শ্রী

আগামী আষাঢ় মাস হইতে জয়শ্রী নামে একটি মাসিক-পত্রিকা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগ এম-এ এই পত্রিকার সম্পাদিকা এবং শ্রীযুক্তা শকুন্তলা দেবী কর্ম্মকর্ত্রী হইয়াছেন।

পত্রিকার যে অনুষ্ঠান-পত্র পাইয়াছি তাহার প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—"বর্ত্তমানের গঠন ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, এই দুই কার্য্যে পুরুষের স্থায় নারীরও চিন্তনীয় ও করণীয় অনেক কিছুই রহিয়াছে। নারী ও পুরুষের চিন্তাধারার সমন্বয়ে যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে উভয়ের পক্ষে স্বাভাবিক ও দুইয়ের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই নরনারীর চিন্তাধারা মূর্ত্ত হইয়া সমাজ ও জাতিকে গঠন করে। বাংলার শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা একান্ত কম না হইলেও তাঁহাদের মতামত প্রকাশের মুখপত্র স্বরূপ কোন পত্রিকা নাই। এই অভাব আংশিক ভাবে দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া আমরা এই পত্রিকাখানির সূচনা করিয়াছি।"

এই উক্তি হইতে পত্রিকাখানির যে উদ্দেশ্য সূচিত হইতেছে তাহা যে সদুদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় প্রগতিতে পুরুষ এবং নারী মানুষের দুইটি পদের সহিত তুলনীয়, সুতরাং তাহাদের উভয়ের কর্ম্মপরায়ণতাও মানুষের দুইটি পায়ের অনুরূপ হওয়া উচিত। দক্ষিণ পদের এবং বাম পদের ক্রিয়া যদি ঠিক একই হয়, অর্থাৎ ভূমির যে বিশেষ খণ্ডে দক্ষিণ পদ পড়িল ঠিক সেই ভূমিখণ্ডেই যদি বাম পদ পড়ে, তাহা হইলে গতি স্খলিত হয়, এবং তাহার ফলে পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়।

এই কথাটাই সম্পাদিকা মহাশয়া ব্যক্ত করিয়াছেন "নারী ও পুরুষের চিন্তাধারার সমন্বয়ে" কথাগুলির মধ্যে। এই সমন্বয় কথাটি ইংরাজি harmony কথার সমার্থ-বাচক। বিভিন্ন খণ্ডাংশ যখন পরস্পর মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড একত্ব স্থাপিত করে তখনি আমরা পাই harmony অর্থাৎ সমন্বয়,—তা সে সঙ্গীতেই হোক, মানুষের চিন্তাধারাতেই হোক, আর কর্ম্মপরায়ণাতেই হোক। আশা করি এই কথাটি মনে রাখিয়া সম্পাদিকা মহাশয়া তাঁহার পত্রিকা পরিচালিত করিবেন। নচেৎ পুরুষ ও নারীর অধিকার-বিরোধের অসার বাখিতণ্ডায় পরিণত হইলে পত্রিকাখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে।

পত্রিকাখানির পরিচালনার ভার মহিলারা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ৪৷৷৹ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি, দেশ-বিদেশের নারীপ্রগতির তথ্য, গল্প, কবিতাদি প্রকাশিত হইবে।

আমরা একান্তচিত্তে পত্রিকাখানির সাফল্য কামনা করি।

* *

রামায়ণ

গোরখপুর 'কল্যাণ' কার্য্যালয় ইহতে বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি রামায়ণের একটি বিশিষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়া তজ্জন্য উপকরণাদি সংগ্রহার্থে কল্যাণের সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বিচিত্রার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে 'কল্যাণ' প্রকাশক-সমিতিকে সাহায্য করিতে পারিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

We shall be very grateful if gentlemen interested in the Ramayana will kindly intimate to us the sources from which we can get useful information for an original and exhaustive literary work on the Ramayana we intend to soon bring out. Communications regarding original manuscripts, photos, pictures, paintings or any other rare material calculated to be useful will be thankfully received and acknowledged. Charges for any material, if required, shall also be paid which must be settled beforehand through correspondence.

(Baba) Raghavadas
Hanuman Prasad Poddar
'KALYAN' OFFICE, GORAKHPUR.

* * *

Students' welfare Scheme

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত উক্ত সমিতির স্বাস্থ্যপরীক্ষা বিভাগের ১৯২৮ সালের বার্ষিক বিবরণী আমরা পাইয়াছি। উক্ত বিবরণী পাঠ করিলে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিতে পারা যায়।

বিবরণীতে গত ৯ বৎসর স্বাস্থ্যপরীক্ষার ফল তিন বৎসর করিয়া তিন বারে দেওয়া হইয়াছে। সেই তিন বারের ফলাফল তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় কয়েক বিষয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে কিন্তু অপর কয়েকটি বিষয়ে একই প্রকারে থাকিয়া গিয়াছে। আকৃতি, ছাতির বেড় এবং দৈর্ঘ্যে মোটের উপর কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ওজন, কব্জির শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

নির্দ্দোষ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। দন্ত, চর্ম্ম এবং হৃৎপিণ্ড বিষয়েও ছাত্রদের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার বিষয়ে দেখা যায় শতকরা ৩২ জন ছাত্র ব্যায়াম করে এবং শতকরা ২৫·৩ জন ক্রীড়াদিতে যোগ দেয়।

বিগত ১৯২৬ হইতে ১৯২৮ সালে তিন বৎসরে মোটের উপর ৫৯৪৮ ছাত্রকে স্বাস্থ্যপরীক্ষকগণ পরীক্ষা করেন—তন্মধ্যে শতকরা ৬৪·৫ জন খাড়া এবং শতকরা ৩৫·৫ জন ঝোঁকা। ১৯২০-১৯২২ এই তিন বৎসরের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল শতকরা ৫৯·৩ জন খাড়া এবং বাকি ঝোঁকা। সুতরাং আকৃতি বিষয়ে ছাত্রগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিবরণীটিতে এত বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফলের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা Students' Welfare Scheme কমিটির কার্য্য-সাফল্যে সুখী হইয়াছি। আশা করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে কলেজগুলিকে অর্থসাহায্যের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সমধিক উন্নতি বিধান করিবেন।

* * *

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত 'স্বপ্নমায়া' নামক রূপ-নাটিকার লেখক শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, কিন্তু ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত নীরদবরণ দাশগুপ্ত বলিয়া ছাপা হইয়াছে। নীরদবাবু বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমাজে, বিশেষতঃ বিচিত্রার পাঠক-সমাজে, সুপরিচিত; নাটিকা-রচনায় সফলতা লাভ করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং এ ভুল অনেকেরই নিকট এমনই ধরা পড়িয়াছে। তথাপি সাধারণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা ভ্রম সংশোধিত করিলাম।

এই অনবধানতাজনিত ত্রুটির জন্য আমরা নীরদ বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

Printed at the Susil Printiug Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

মেঘ

(শেলি)

কুমারী মমতা মিত্র

তৃষিত ফুলের তরে
আনি আমি স্নেহভরে
সাগর তটিনী হ'তে সুশীতল বারি,
পত্রদল তরে আনি
শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াখানি,
দিবাস্বপ্নে লীন সবে কী মায়া বিথারি' !

হিমবিন্দু অনুপম
পক্ষ হ'তে ঝ'রে মম
চেতনা জাগায়ে দেয় পেলব মুকুলে,
দোলে যবে বৃন্ত'পরে
শিশুসম মাতৃক্রোড়ে
রবির কিরণে তা'র অঙ্গ উঠে দুলে' ।

বর্ষিয়া করকারাশি
ভূমে চেয়ে দেখি হাসি'
শুভ্র হ'য়ে গেছে সব হরিত কানন,
গ'লে যাই পুনরায়
বারিধারা-পশলায়,
বজ্ররবে হাসি আমি, করি বিচরণ ।

তুষার থরে বিথরে
বিছাই শৈলের 'পরে
আর্ত্ত ক্লিষ্ট দেবদারু কাঁপে গিরিতলে,
হিমশুভ্র সেই স্থান
করি' মম উপাধান
সারারাত নিদ্রা যাই ঝঞ্ঝাবাত-কোলে ।

কি মহান উচ্চাসনে
আকাশের কুঞ্জবনে
থাকে শুয়ে ক্ষণপ্রভা কর্ণধার মোর,
গুহামাঝে সে তিমিরে
কুলিশ কাঁদিয়া ফিরে,
বন্দী যেন ক্ষণে ক্ষণে গর্জ্জি' উঠে ঘোর !

কভু ধরণীর কোলে
সুনীল জলধিতলে
সারথি চালায় মোর বিদ্যুতের রথ,
সেথা কোন্ সাগরিকা
গগনের নীহারিকা
মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে তা'রি আশাপথ ।

নীল অতলের কূলে,
মেঘশ্যাম শৈলমূলে
প্রেয়সী সেথায় তা'র রহে যে জাগিয়া,
বিভুর সুনীল হাসি
অঙ্গে মোর পড়ে আসি'
বারিরাশি মাঝে যবে যায় সে ভাঙিয়া ।

রক্তবর্ণ সূর্য্যোদয়
উল্কাসম চেয়ে রয়,
জলন্ত শিখাটি তা'র দিগন্তে হারায়,
আমার দোলার 'পরে
হর্ষভরে নৃত্য করে,
প্রভাতের তারা হয় পাণ্ডু—মৃতপ্রায় ।

আবার কখনো হেরি
আলোকিত সিন্ধু ঘেরি'
অস্তরবি ফেলে শ্বাস বিদায়ের কালে,
অস্ফুট প্রেমের বাণী
বিরলেতে কানাকানি—
লজ্জারুণ স্পর্শ কার আঁকা তা'র ভালে।

কুসুম-অঞ্চলখানি
বক্ষপরে ল'য়ে টানি'
স্বরগের পথ দিয়ে সন্ধ্যা নামে ধীরে;
মম পক্ষ-সঞ্চালন
বন্ধ করি' সেইক্ষণ
নিশ্চল কপোত সম ব'সে থাকি নীড়ে।

ক্রমে ভেসে আসে ধীরে
মম শুভ্র হর্ম্ম্যশিরে
পূর্ণশশী জগতের আনন্দবর্দ্ধন;
অশ্রুত তাহার বাণী
চরণের ধ্বনিখানি
অমরীর কানে পশি' জাগায় চেতন।

সে আলোকে স্তরে স্তরে
ছিন্নভিন্ন নীলাম্বরে
নৃত্যচ্ছন্দে উঁকি মারে তারকার দল;
তাদের চলার রাগে
মোর চিত্তে দোলা লাগে,
মধুকর গুঞ্জে যেন অলক্ষ্য চঞ্চল।

পুনঃ আমি সেইক্ষণ
খুলে দিই আবরণ
তারায় তারায় রচা সে নীল বসন,
শুধু ক্ষণেকের তরে
হ্রদ নদী সরোবরে
খণ্ড খণ্ড স্বর্গলোক করি যে সৃজন।

জলন্ত মেখলা আনি'
ঘিরি রবিরথখানি,
মুক্তামালা দিয়ে গড়ি চাঁদের আসন;
অগ্নিগিরি ম্লানশিখা,
নৃত্য করে নীহারিকা,
খুলে গো পতাকা মোর দৃপ্ত প্রভঞ্জন।

দিকে দিকে জাগে প্রাণ,
গর্জ্জে সিন্ধু জয়গান,
রবিকর পশে নাক অন্তরে আমার;
বিজয়তোরণ-তলে
চলি যবে, সাথে চলে
ঝঞ্ঝাবায়ু, হুতাশন, শীতল তুষার।

আকাশের শক্তি যত
হতমান, পদানত,
শৃঙ্খলিত রথচক্রে কার্ম্মুক আমার
রঙ্গে রঙ্গে উঠে জ্বলে
অগ্নিমণ্ডলের তলে,
আর্দ্র ধরা হেসে উঠে চায় চারিধার।

কন্যা আমি পৃথিবীর,
সীমাহীন জলধির,
দুগ্ধপোষ্য শিশু আমি আকাশ-মাতার;
রন্ধ্রপথে চ'লে যাই,
ভেদি সিন্ধু, বাধা নাই,
ত্যজি রূপ, নাহি কিন্তু বিনাশ আমার।

বিচিত্রা জননী

মাঘ, ১৩৩৬ শিল্পী—শ্রীপঞ্চানন কর্ম্মকার

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৩৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মনোবিকাশের ছন্দ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বের কোনো ব্যাপারই একেবারে একটানা নয়। সর্ব্বত্রই সংকোচন সম্প্রসারণ, উত্থান পতন, হ্রাস বৃদ্ধি বহির্গম অন্তর্গম, অর্জ্জন বর্জ্জন, আবির্ভাব তিরোভাবের ছন্দ আছে। এই ছন্দ অনেক সময় আমরা চোখে দেখ্‌তে পাই নে, এবং এই ছন্দের নিয়মও অনেক সময় আমাদের কাছে ধরা পড়ে না—কিন্তু এ রকম পর্য্যাবৃত্তি (Periodicity) যেমন আছে, সেই রকম পর্য্যাবৃত্তির নিয়মও নিশ্চয় আছে।

আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র পড়াতে গিয়ে আমি অনেক দিন হ'তে লক্ষ্য করেচি, ছেলেদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা স্বাভাবিক জোয়ারভাঁটা আছে। এর নিয়ম জানা এবং নিয়ম মানা শিক্ষাব্যবহারে অত্যাবশ্যক। ছেলেটা আগে মনোযোগী ছিল এখন অমনোযোগী হয়েচে ব'লে আমরা অনেক সময় তর্জ্জন করি এবং শাস্তি দিই; কিন্তু স্বভাবের নিয়মের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়। তা'ছাড়া বুদ্ধির হ্রাস সম্বন্ধে বালকদের মনে নৈরাশ্য জন্মে দেওয়া অনিষ্টজনক।

এই মানসিক জোয়ার ভাঁটা সম্বন্ধে আমাদের কোনো কোনো শিক্ষকের সহিত আলোচনা করেছিলাম—তাঁরাও পরে এটা লক্ষ্য করেচেন। এই চিত্তশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি কি নিয়মে পর্য্যাবর্ত্তন করে তা বিচার ক'রে দেখ্‌বার জন্যে শিক্ষকদিগকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তির রাস্তা দুর্গম, এবং মনস্তত্ত্বের পর্য্যালোচনা বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে, এই জন্যে যে-ব্যাপারটাকে আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেচি আজ পর্য্যন্ত তাকে সুস্পষ্ট ক'রে তুল্‌তে পারি নি।

অল্পকাল হ'ল য়ুরোপে Experimental Education অর্থাৎ পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ব'লে একটা বিশেষ উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ পুরাতন প্রথার পথ ছেড়ে শিক্ষাকার্য্যকে পরীক্ষাসাধ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা চল্‌চে। এ পর্য্যন্ত শিক্ষকেরা যে-কথাগুলোকে নিজের বিশেষ অভিজ্ঞতালব্ধ ব'লে চালিয়েচেন সেগুলি প্রমাণহীন কাঁচা কথা, তাঁদের নিজেদের স্বভাব, সংস্কার, অভ্যাস এবং মানসিক আলস্যের উপরেই সেই সকল অভিজ্ঞতার প্রধান নির্ভর। এই জন্যেই শিক্ষাতত্ত্বের নিয়ম-

গুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কারের জন্য উৎসাহ দেখা দিয়েচে। এ সম্বন্ধে বই এবং মাসিক পত্র প্রকাশ হ'তে সুরু করেচে।

ছেলেদের মানসশক্তির হ্রাসবৃদ্ধির ছন্দ সম্বন্ধে শিক্ষাতত্ত্ব-পরীক্ষাকারীরা আলোচনা করচেন দেখে আমাদের সেই আলোচনার কথা মনে প'ড়ে গেল। রাস্ক্ সাহেব লিখ্চেন, "শিশুদের সাধারণ মনোবিকাশের মতই এ একটা ছন্দ মেনে অগ্রসর হয়; এবং এই মনোবিকাশের বৈচিত্র্যগুলি অনেকটা পরিমাণে তাদের শরীরবিকাশের সমসূত্রে চলে। বয়সের যে অংশে শিশুদের দেহের বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়, সেই অংশে তাদের মনোবিকাশও মন্দগতি হ'য়ে থাকে।" ছেলেদের পক্ষে এগারো বছর বয়সটি এঁদের মতে বুদ্ধিবিকাশের বিশেষ প্রতিকূল সময়। মেয়েদের পক্ষে জাতি বা দেশ অনুসারে এই বয়সটি বারো, তেরো, বা চোদ্দ। আমার "ছুটি" গল্পটিতে হতভাগ্য ফটিকেরও বয়স এগারো। কিন্তু বিনা প্রমাণে ঠিক ক'রে বল্তে পারি নে আমাদের দেশের ছেলের পক্ষেও এগারো বছর বয়সটি বিশেষ মন্দবেগ কিনা।

ইনি বলেন একই বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শরীরের দৈর্ঘ্যলাভ ও ওজনবৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। এঁদের মধ্যে দেহের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সময় ফেব্রুয়ারি হ'তে আগষ্ট পর্য্যন্ত; আর প্রতিকূল সময় সেপ্টেম্বর হ'তে জানুয়ারি। এদিকে ফেব্রুয়ারি হ'তে জুন পর্য্যন্ত ওজনবৃদ্ধিতে বাধা পড়ে, এবং জুলাই হতে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সেই বৃদ্ধির অনুকূল সময়।

নিঃসন্দেহই বিলাতের এই ঋতুর সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। কিন্তু দৈহিক জোয়ার ভাঁটার যে একটা ঋতু আছে এটা ভাল ক'রে জানা চাই। আমাদের আশ্রমে ছেলেদের নিয়মিত ওজন করা হয়। এক একবার সকল ছেলেরই ওজনবৃদ্ধিতে বাধা বা হ্রাস ঘটেচে, আমাদের ডাক্তার এবং আমরা উদ্বেগ বোধ করেচি—এর ঋতুগত কারণ থাকার সম্ভাবনা আমরা বিচার করি নি।

দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে মনোযোগের তারতম্য ঘটে একথা আমরা মোটামুটিভাবে জানি—কিন্তু প্রমাণ ও পরিমাণমূলক পরীক্ষার দ্বারা এ আমরা স্পষ্ট ক'রে জান্তে পারি নি। সাধারণত এইটুকুই জানি, সকাল বেলায় মনোযোগ তীক্ষ্ণ থাকে।

ঋতু অনুসারে মনের সচেষ্টতা ও নিশ্চেষ্টতা হয় ত ব্যক্তি বিশেষে ভিন্নতা লাভ করে। আমি জানি কাব্য গান প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু আমার পক্ষে অনুকূল। সম্ভবত গ্রীষ্ম অন্যের পক্ষে বাধাজনক হ'তে পারে। শীতের সময়ে আমার অন্য কাজে উৎসাহ হয়, গদ্য প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা দেওয়া তখন আমার পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু রসসাহিত্য রচনার উৎসাহ সে সময়ে দুর্ব্বল থাকে। বোধ হয় এই কারণেই আমেরিকায় ইংলণ্ডে আমি বক্তৃতা প্রভৃতি লিখেচি কিন্তু কখনো কাব্য লিখি নি, লেখ্বার ইচ্ছা মনেও উদিত হয় নি।

অতএব ঋতু অনুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে একথা বিচার কর্বার সময়ে মনে রাখা উচিত যে, মন জিনিষটা জটিল, এর নানাদিক, নানা প্রকাশ আছে। বিশেষকালে মনোবৃত্তির বিশেষ একটা শক্তি খর্ব্ব হ'য়ে বিশেষ অন্য কোনো শক্তির বল বৃদ্ধি হয় কিনা তা হিসাব ক'রে দেখা চাই। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন দেখা যায় বসন্তে ফুল ফোট্বার উদ্যম প্রবল বটে কিন্তু শরতে ফসল ফল্বার উদ্যম তেমনি প্রবল; যেমন দেখি বিশেষ ফুল বিশেষ ফল বিশেষ ঋতুতে জোর পেয়ে থাকে, তেম্নি মানসিক ঋতুতেও মনের বিশেষ ফুল ফল ফসলের সময় আসে, কোনো সময়েই মনের উৎপাদনশক্তি সম্পূর্ণ নিদ্রিত

হয় না, এ সম্ভবত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হবে। কি জানি, সাহিত্যশিক্ষা, গণিতশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ বিশেষ চাতুর্মাস্য আছে কিনা—একই ঋতুতে এক সঙ্গে নানা বিচিত্র বিষয় শিক্ষা মনের পক্ষে অজীর্ণজনক ও ক্লান্তিকর কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

ঋতুর বিচার যদি ছেড়েও দিই তথাপি আমার মনে হয় একই দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া যে কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণ আছে। কেহ কেহ বলেন বৈচিত্র্য মনকে বিশ্রাম দেয়, সে কথা যেমন অংশত সত্য, তেমনি একথাও সত্য হঠাৎ একটা বিষয় হ'তে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির আরেকটা বিষয়ে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষণ ক'রে নেওয়া মনের পক্ষে ক্লেশকর ও ক্লান্তিকর। মন যেমন খানিকটা চেষ্টার তাড়নায় চলে, তেমনি খানিকটা গতির বেগেও চলে। সেই গতির বেগকে একদিকে থামিয়ে দিয়ে আবার আরেক দিকে চালনা কর্‌বার সময় মনের একটা সহজ শক্তির অপব্যয় ঘটে।

অতএব বৈচিত্র্য মনকে যে তেজ দেয় এবং গতির বেগ মনকে যে শক্তি দেয় এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। একই বিষয়ের বিচিত্র দিক আছে—সাহিত্যের গদ্য আছে, পদ্য আছে, প্রবন্ধরচনা আছে, আবৃত্তি আছে, তাছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসকেও এক শ্রেণীভুক্ত ক'রে রাখা চলে। এমনি ক'রেই বৈচিত্র্যের দ্বারা মনকে পূর্ণ করা সম্ভব। অঙ্ককেও অন্তত দুই বড় ভাগে বিভক্ত করা চলে। একটা গণিত অঙ্ক, আরেকটা ফলিত অঙ্ক। অঙ্ক জিনিষটা যে ব্যবহারের জিনিষ, খাতায় আঁক ক'ষে ক'ষে ছেলেরা সে কথাটা ভুলে যায়। এইজন্যই অঙ্কের পরে অনেক ছেলের বিতৃষ্ণা জন্মে। খাতায় যেটা কষ্‌ল ছেলেরা সেটাকেই যদি বিচিত্র ক'রে বস্তুর দ্বারা কষে, তবে অঙ্ক তাদের কাছে সজীব হ'য়ে ওঠে। গণিতের নিয়মে কৃত্রিম দোকান রাখা, কাঠের ইঁট দিয়ে কৃত্রিম ঘর তৈরি, স্কুল ঘরের দরজা কড়ি বরগার পরিমাপ, এমন কি চড়িভাতির আহার্য্যের উপকরণের হিসাব ঠিক করা প্রভৃতি অঙ্ককে হাজার রকমের খেলায় ও হাতের কাজে পরিণত করা যায়। সাধারণত অঙ্ক শেখার জন্য যেটুকু সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে তাতে অঙ্ককে এমন সত্য ক'রে তোলবার উপায় থাকে না।

যাই হোক আমার প্রবন্ধের শেষ দিকটাতে কিছু অবান্তর কথা বল্‌লাম বটে, কিন্তু আমার মতে কথাটা গভীরভাবে ভেবে দেখ্‌বার যোগ্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাংখ্যমতে ঈশ্বরের পুরুষত্ব

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ ডি (লণ্ডন)

ঈশ্বরের পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্ব (personality) সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্ব অর্থে কি বুঝায় তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। পুরুষত্বের বা ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ দুইটি, অথবা একটি লক্ষণই দুইভাবে প্রকাশ যোগ্য। সেই দুইটির মধ্যে একটি (১) আত্ম-প্রতীতি বা আত্মজ্ঞান (self-consiousness), এবং দ্বিতীয়টি (২) ইচ্ছা (will) বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, সেই সর্ব্বচেষ্টা বা উদ্যমের সজ্ঞান শক্তি-কেন্দ্র (a self-conscious centre of activity or effort)। সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিত্বের এই দুইটিই সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণ। কিন্তু আত্মজ্ঞান কোনও সারভূত পদার্থের অভেদ বা অখণ্ড একত্ব (a simple or undifferentiated unity of an essence or substance) নহে, পরন্তু একটি সুব্যবস্থিত সমষ্টির বা প্রপঞ্চের সভেদ একত্ব (a complex or differentiated unity of a 'system' or 'world')—বহুত্বের মধ্যে একত্ব (unity-in-multiplicity); এবং এইরূপ একত্ব সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ বা নির্দ্দোষ নহে, একমাত্র ঈশ্বরেই ইহা এইরূপ নির্দ্দোষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং, যেহেতু কেবল একমাত্র ঈশ্বরই অখণ্ড আত্মজ্ঞান স্বরূপ (perfect unity of self-consciousness), অতএব ন্যায্যরূপে তাঁহাকে অধিপুরুষ (super person) বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, আমরা যখন বলি যে ঈশ্বর সকল কার্য্য বা চেষ্টার একীভূত কেন্দ্র তখন সেই এক বস্তুই বুঝি; উহা কেবল ভাষার পার্থক্য মাত্র। অথবা, সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ঈশ্বরই পূর্ণ-জ্ঞান ও পূর্ণ ইচ্ছা-শক্তি। এই দুইটি ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের পুরুষত্বের বা ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হয় তবে সাংখ্য কি ঈশ্বরের উপর এই দুইটি ধর্ম্ম আরোপ করেন? উত্তর যদি 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমতে ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া ধরিতেই হইবে; পক্ষান্তরে উত্তর যদি 'না' হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে পুরুষত্ব বা ব্যক্তিত্ববিহীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। দেখা যাউক্ এই দুইটির মধ্যে সাংখ্যের যথার্থ মত কোনটি।

সাংখ্য পুরুষের লক্ষণ সাধারণ ভাবে করিয়াছে। সেই লক্ষণটি আমাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। সাংখ্য-কারিকাতে পুরুষের এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে:—"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রম্ ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তং" ॥১০॥ "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্" ॥১১॥ অস্যার্থ, "ব্যক্ত হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ (বা বিশেষণযুক্ত), সাবয়ব ও পরতন্ত্র; অব্যক্ত ইহার বিপরীত" ॥১০॥ "ব্যক্ত ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী; ব্যক্তের সদৃশ প্রধান; পুরুষ এই সকল বিষয়ে তাহার বিপরীত ও অসদৃশ" ॥১১॥ "তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্"—ইহার এইরূপও অর্থ করা যাইতে পারে—"সর্ব্ববিষয়েই বিপরীত, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে একরূপ বলিয়াও প্রতীয়মান হয়"। এই সূত্র দুইটি হইতে আমরা পুরুষের এই গুণগুলি পাই—পুরুষ অজ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অপরিবর্ত্তনীয়, এক, স্বাধীন, অবিভাজ্য, অসঙ্গ (অসংশ্লিষ্ট) ও স্বতন্ত্র। এই সকল বিষয়ে পুরুষ প্রকৃতির সদৃশ; কিন্তু পুরুষের আরও গুণ আছে যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সেগুলি এই—ত্রিগুণবর্জ্জিত, বিবেকী, কর্ত্তা (subjective), বিশিষ্ট বা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, চেতন ও অপ্রসবধর্ম্মা। ইহার সহিত আমাদিগকে ১৯ কারিকাটিও বিবেচনা করিতে হইবে। সেই কারিকাটি এই—"তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাধ্যস্থং

[অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার, এম-এ লিখিত ইংরাজী হইতে শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) কর্ত্তৃক অনূদিত]

দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ," অর্থাৎ, "সেই বিপর্য্যয় (যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) হইতেই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।" সাংখ্য-সূত্রে আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষের নিম্নলিখিত গুণগুলি স্বীকৃত হইয়াছে; যথা—পুরুষ নিত্য, সর্ব্বব্যাপী (১ অঃ, ১২ সূঃ), অসঙ্গ (ঐ, ১৫ সূঃ), নিত্যশুদ্ধ বা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্তস্বভাব (ঐ, ১৯ সূঃ)। পুরুষের গুণ সম্বন্ধে সাংখ্যের অন্যান্য গ্রন্থও সাংখ্য-কারিকা হইতে বিন্দুমাত্রও ভিন্ন মত পোষণ করে না। সুতরাং, সাংখ্য-কারিকাতে পুরুষের গুণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাই আমরা শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এক্ষণে পুরুষের উপরোক্ত গুণগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করা যাউক। পুরুষ (অর্থাৎ পরম পুরুষ) সচেতন, ধীমান্ (প্রধী), নিত্যবুদ্ধ; সুতরাং তিনি একজন আত্মজ্ঞানযুক্ত (self-conscious) পুরুষ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে আত্মজ্ঞান একটি অভেদ একত্ব (bare unity) নহে,পরন্তু ইহা একটি স্বগতভেদযুক্ত সমষ্টি (system or whole), অথবা যাহাকে বহুত্বের মধ্যে একত্ব বলে তাহাই। পুরুষ কি একটি নিরবচ্ছিন্ন একত্ব (bare unity), অথবা একটি সমষ্টির একত্ব (unity of a system)? এস্থানে আর দুইটি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে—পুরুষকে কর্ত্তা (subject) ও প্রকৃতিকে বিষয় (object) বলা হইয়াছে। সুতরাং, পুরুষ হইতেছেন আত্মজ্ঞানযুক্ত কর্ত্তা এবং প্রকৃতি তাঁহার বিষয়। কিন্তু কেবল ইহার দ্বারাই পুরুষের বহুত্বে একত্ব প্রতিপন্ন হয় না; প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তাঁহার বহির্ভূত হইতে পারে: সে ক্ষেত্রে যদিও পুরুষ প্রকৃতিকে জানিতে পারেন বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতি পুরুষের অন্তর্গত হইবে না। সুতরাং, পুরুষ একেবারে বিষয়শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ একত্বে পরিণত হইবেন, এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থকে আপনার মধ্যে ধারণ করিবে। সুতরাং, পুরুষকে একটি বহুর সমষ্টি বা বিশ্বাধার করিতে হইলে যে কোনও প্রকারে প্রকৃতিকে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সেইজন্যই সাংখ্য 'সর্ব্বব্যাপী' এই অতিরিক্ত বিশেষণটী যোগ করিয়াছে। পুরুষ যে কেবল আত্মজ্ঞানযুক্ত কর্ত্তা তাহা নহেন, পরন্তু তিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বা কর্ত্তা, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায় যে পুরুষ একটি সর্ব্বব্যাপী আত্মজ্ঞানযুক্ত সমষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ড (an all-pervading self-conscious system or world)—প্রকৃতি যাহার একটা অংশ বা তন্মাত্র (element)। অন্য কথায়, পুরুষ বিষয় ও বিষয়ীর (subject and object), আত্মা ও অনাত্মার (self and not-self) একটি অবিভাজ্য সমবায় (organic synthesis)—সংক্ষেপে, তিনিই বিষয়-বিষয়ী (subject-object)। প্রকৃতিকেও সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি হইতেছে সর্ব্বব্যাপী বিষয় বা অনাত্মা (all-pervading object or not-self)। একটি সর্ব্বব্যাপী বিষয়ী (subject) থাকিলে তাহার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ একটি সর্ব্বব্যাপী বিষয়ও (object) থাকিবে, এবং এই উভয়কে লইয়া যে এক পূর্ণ-আত্মা, ইহাদের সহিত তাঁহার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। এই মতের যুক্তিসঙ্গত ফল (logical consequence) কি হইবে তাহা আমরা পরে দেখিব।

ইত্যবসরে আমরা কতকগুলি কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিব। পুরুষকে অসঙ্গ ও নিত্যমুক্তও বলা হইয়াছে। প্রকৃতি যদি পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে কিরূপে এই বিশেষণগুলি পুরুষে প্রযুক্ত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, এই বিশেষণগুলি প্রযোজ্য, কারণ ইহাতে পুরুষের কেবল একটা দিক্ অথবা অংশকে প্রকাশ করা হইতেছে, পুরুষের সমস্ত স্বরূপকে নহে। পুরুষ কেবল প্রকৃতির মধ্যে যে অনুস্যূত (immanent) তাহা নহে, তিনি প্রকৃতির অতীতও (transcendent) বটে। কোন সচেতন কর্ত্তার বিষয় কেবল যে তাঁহার নিজের অন্তর্গত তাহা নহে, কিন্তু তিনি আবার তাঁহার এই বিষয় হইতে পৃথক এবং ইহার অতীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের ভাব, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি আমাদিগের আত্মার অন্তর্গত হইলেও কেবল এইগুলিই তাহার সর্ব্বস্ব নহে। পুরুষ প্রকৃতির অতীত বলিয়া তিনি নিত্যমুক্ত, অর্থাৎ প্রকৃতি বা অনাত্মার প্রভাব তাঁহার উপর নাই; এবং তিনি উহার সঙ্গ বা সম্পর্ক হইতে

মুক্তও বটে। কেবল এই অর্থেই শ্রুতিতে পুরুষকে নিত্যমুক্ত ও প্রকৃতিসঙ্গরহিত বলা হইয়াছে। একথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাংখ্যে পুরুষের যেরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রুত্যুক্ত পুরুষের লক্ষণ হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। এবং যাঁহারা শ্রুতির সহিত পরিচিত তাঁহারা বিশেষরূপেই জানেন যে, নিম্বার্ক ও রামানুজের মতে ঐ গুণগুলি ব্রহ্মের বা পরমপুরুষের নির্গুণত্বের প্রকাশক। এইরূপ আরও গুণ আছে, যথা—নিষ্ক্রিয়ত্ব, অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব, অপ্রসবধর্ম্মিত্ব, বিশিষ্টত্ব—এগুলিও পুরুষের নির্গুণত্বের প্রকাশক। কিন্তু আবার পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত বলিয়া ব্যক্ত প্রকৃতির ক্রিয়াশীলত্ব, প্রসবধর্ম্মিত্ব, পরিণামিত্ব, ইত্যাদি গুণগুলিও তাঁহার মধ্যে থাকিতেই হইবে। সুতরাং, পরমপুরুষের পূর্ণত্বে পরস্পর আপাত-বিরুদ্ধ দুই প্রকার গুণাবলী দেখা যায়—একশ্রেণী তাঁহার নির্গুণত্বের পরিচায়ক, অপর তাঁহার সগুণত্ব প্রকাশক। অথবা এই বিষয়টিই আমরা অন্যভাবে প্রকাশ করিতে পারি। পরমপুরুষ তাঁহার পূর্ণত্বরূপে নিত্যমুক্ত, কারণ তাঁহার বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে; তথাপি একক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজের প্রকৃতির অধীন, অর্থাৎ তিনি নিজের দ্বারাই নিজে বদ্ধ (self-bound) কিন্তু এই নিজের দ্বারা নিজের বদ্ধতা বা অধীনতার নামই স্বাধীনতা। তিনি অসঙ্গ, কারণ তাঁহার বহির্ভূত এমন কিছুই নাই যাহার সহিত তিনি সংযুক্ত হইতে পারেন। তিনি নিষ্ক্রিয়, কারণ সম্পূর্ণতা হেতু তাঁহার কোনও অভাব পূর্ণ হইবার নাই, অথবা কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নাই। অতএব মানবের সকল কার্য্যের মূলে যে ইচ্ছা নিহিত থাকে তাহা তাঁহার নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, কারণ তাঁহার বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে; সুতরাং তাঁহার পূর্ণরূপে তিনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি অপ্রসবধর্ম্মী, কারণ উৎপাদনমাত্রেই পরিবর্ত্তন বুঝায়, কিন্তু তিনি নিত্য পরিপূর্ণ। তিনি ব্যক্তি, কারণ ব্যষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে পূর্ণ সমষ্টি তাহাই প্রকৃত ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু অংশগুলি অর্থাৎ জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই বহুধা প্রকাশ—তাঁহারই নিজ শক্তির এক একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মও তাঁহাতে বর্ত্তমান। এই কথাই 'তথা চ পুমান্' (অর্থাৎ, পুরুষ সর্ব্বতোভাবে ব্যক্তিরই সদৃশ)—এই বাক্যের দ্বারা বুঝাইতেছে। পরমপুরুষ যে কেবল পূর্ণধী তাহা নহে, তিনি পরিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তিও বটেন, যে ইচ্ছাশক্তি শব্দে আমরা একটি পরিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত সক্রিয় মূলতত্ত্বকে (a perfectly spontaneous active principle) বুঝি। এই অর্থে পরমপুরুষ সক্রিয়, কিন্তু তাঁহার সক্রিয়ত্বে কোনও অভাব, উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাজনিত প্রকৃতি নাই, উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। সাংখ্যতেই আরও অনেক প্রমাণ আছে যে, যদিও পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন, তথাপি তাহারা একটি স্বাধীন সমগ্রের (one absolute whole) অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ (inseparable elements), বা একটি উচ্চতর সংযোগ বা সমষ্টির (higher synthesis) নিত্যানুবন্ধী (correlative) দুইটি রূপ বা ভাব (aspect)। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি বিবেচনা করা যাউক—

(১) "প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেৎ তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্," (সাংখ্য-সূত্রম্, ১ অঃ, ১৮সূঃ), অর্থাৎ, "পুরুষের বন্ধন প্রকৃতিজন্য নহে, কারণ প্রকৃতিই পুরুষের অধীন।" এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি পুরুষের অনধীন নহে, পরন্তু সম্পূর্ণভাবেই তাঁহার অধীন। এই উক্তি পরিষ্কার রূপে দেখাইতেছে যে পুরুষ এবং প্রকৃতি দুইটি স্বাধীন সত্তা নহে, পরন্তু প্রকৃতি পুরুষেরই অংশ, কারণ দুইটি বস্তু পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইলে একটি অপরটির সম্পূর্ণ অধীন হইতে পারে না।

(২) "ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবস্য তদ্‌যোগ স্তদ্‌যোগাদৃতে" (ঐ, ১৯ সূঃ), অর্থাৎ "প্রকৃতিসংযোগ ব্যতীত পুরুষে বন্ধনযোগ হইতে পারে না, কারণ পুরুষ স্বভাবতই নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব।" পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি সাক্ষাৎভাবে বন্ধনের কারণ নহে; এইস্থানে বলা হইতেছে যে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগই বন্ধনের মুখ্য কারণ। এইখানে স্বতই প্রশ্ন হইতে পারে—পুরুষ ও প্রকৃতির এই সংযোগের কারণ কি? প্রকৃতি ইহার কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বাক্যটির সহিত ইহা

অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। আবার পুরুষও কারণ হইতে পারেন না, কারণ তিনি নিত্যমুক্ত বলিয়া নিজেকে বদ্ধ করিতে পারেন না। সাংখ্য বলিতেছেন যে পুরুষের 'অবিবেকই, অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতি হইতে পার্থক্য-জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই প্রকৃত কারণ। কিন্তু একথা একেবারেই অসম্ভব (অসঙ্গত), কারণ ঈশ্বর নিত্যবুদ্ধ, তাহাতে অবিবেক আসিতেই পারে না। প্রকৃত উত্তর এই যে—এই সংযোগ নিত্য, এবং নিত্য হওয়ায় ইহার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই সংযোগ একটি সিদ্ধবস্তু (ultimate fact), যেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি একটি সমগ্রের (whole) অবিচ্ছেদ্য অংশ, অনাদি হইতে একত্র অবস্থিত। সুতরাং ইহার কারণ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব এই সংযোগ নিত্য বা অনাদি হওয়াতে বন্ধনও নিত্য বা অনাদি, অর্থাৎ পরমপুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্যবদ্ধ। তাহা হইলে মুক্তি কি? বন্ধন যেরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব জ্ঞানের ফল, মুক্তিও সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের ফল। মুক্তি অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বুঝায় না, কারণ তাহা অসম্ভব। সাংখ্যের মত তাহা নহে। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বর বা পরমপুরুষ নিত্যবদ্ধও বটেন নিত্যমুক্তও বটেন। কিন্তু তিনি কোনও বাহিরের বস্তুর দ্বারা বদ্ধ নহেন, তিনি তাঁহার নিজের বস্তুর দ্বারাই বদ্ধ, অর্থাৎ যতদূর তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত ততদূর তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্মক। তিনি মুক্ত, কারণ তিনি প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ তিনি জানেন যে তিনি এই সকল হইতে পৃথক্ এবং ইহারাও তাঁহার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের বা পরমপুরুষের বন্ধন ও মুক্তি নিত্য (অনাদি অনন্ত)—তাঁহার প্রকৃতিরই (স্বভাবেরই) দুইটি অখণ্ড দিক্। অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তাঁহার বন্ধনই তাঁহার মুক্তি, কারণ বন্ধন তাঁহার নিজের স্বভাবান্তর্গত, সুতরাং উহা তাঁহার স্বাধীনতাই। কিন্তু জীবাত্মা সম্বন্ধে এই বন্ধন ও মুক্তির অর্থ ভিন্ন।

(৩) "তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ," (ঐ, ৯৬ সূঃ), অর্থাৎ "প্রকৃতির কর্তৃত্ব ঈশ্বরসান্নিধ্য হেতু, যেরূপ অয়স্কান্ত-মণির পক্ষে।" এই সূত্রটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করা যাউক্। যেরূপ একখণ্ড লৌহ অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্য হেতু আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও ঈশ্বরসান্নিধ্য হেতু সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়। এখানে সান্নিধ্যকে এইরূপ শক্তিলাভ করিবার একটি বিশেষ কারণরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তুলনাটি অসম্পূর্ণ ও ভ্রমোৎপাদক (প্রমাদজনক)। সান্নিধ্য একপ্রকার স্থান-সম্বন্ধ (space-relation); ইহা অয়স্কান্তমণি ও লৌহের মধ্যে থাকিতে পারে, কারণ তাহারা উভয়েই স্থানে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে কিরূপে থাকিতে পারে? প্রথমতঃ, সান্নিধ্য বলিতে দুইটি বস্তুর মধ্যস্থিত একটু অন্তরাল—তাহা যতই কেন কম হউক্ না—বুঝায়; কিন্তু ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে এরূপ কোনও অন্তর বা দূরত্ব থাকিতে পারে না, কারণ উভয়েই সর্ব্বব্যাপক ও পরস্পর অনুস্যূত। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বস্তু স্থানে বর্ত্তমান, তাহার মধ্যেই সান্নিধ্য সম্ভবপর, কিন্তু ইহা স্বীকৃত যে ঈশ্বর স্থানাতীত (১৩সূঃ দেখ)। এইরূপে দেখা যায় যে যদিও এই উপমাটি উপযুক্ত নহে, তথাপি ইহার মধ্যে একটি আবশ্যক সত্য নিহিত আছে। একখণ্ড লৌহ ইহার আকর্ষণী শক্তি অয়স্কান্তমণি হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং অয়স্কান্তমণিও তাহার আকর্ষণী শক্তিটি লৌহেতে সংক্রমিত করিয়া দিবার পূর্ব্বে নিজের মধ্যে তাহা ধারণ করে; সেইরূপ প্রকৃতি যে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি শক্তি লাভ করে সেই সৃষ্টি শক্তি প্রকৃতিকে দিবার পূর্ব্ব হইতেই অবশ্যই সেই ঈশ্বরেরও থাকিবে। এইরূপে এই সূত্রে স্বীকৃত হইতেছে যে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু তিনি এই শক্তি নিজে ব্যবহার না করিয়া প্রকৃতিতে ন্যস্ত করেন। ৯৯ সূত্রেও এই প্রকার একটি উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। সূত্রটি এই—"অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্", অর্থাৎ, "লৌহের ন্যায় প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব অন্তঃকরণেরই যেহেতু ইহা পরমপুরুষ বা ঈশ্বর কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত বা প্রবোধিত হওয়াতে বুদ্ধ।" এখানেও তুলনার বিষয় এই যে অন্তঃকরণ ইহার সৃষ্টিশক্তি ঈশ্বরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়। যেরূপ লৌহ অগ্নি হইতেই দাহিকাশক্তি লাভ করে; সুতরাং অগ্নির যেরূপ দাহিকাশক্তি আছে সেইরূপ ঈশ্বরেরও সৃষ্টিশক্তি আছে। যদি অগ্নির দাহিকাশক্তি না থাকিত তাহা হইলে

লৌহ তাহা পাইতে পারিত না, সেইরূপ ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি যদি না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃকরণও এরূপ শক্তি লাভ করিতে পারিত না। পুনশ্চ, এই সূত্রটিও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক্—"উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ।" (১৬৪ সূঃ)। এখানেও বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির কর্তৃত্ব ঈশ্বরের উপরাগ হইতেই লব্ধ হইয়াছে,—এই উপরাগ আবার চেতন পুরুষের সহিত তাহার সন্নিকর্ষ বশতঃই ঘটিয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৫১ সূত্রে ("কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধান চেষ্টা গর্ভদাসবৎ") প্রকৃতিকে পুরুষের 'গর্ভদাস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আরও অনেক সূত্রে এই এক কথাই বলা হইয়াছে,এবং এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই।

কথনও কখনও 'সংযোগ' এই শব্দটি পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়; এই সংযোগ হইতেই প্রকৃতি পুরুষ হইতে সৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়। সাংখ্যকারিকাতে এইরূপ আছে—পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।" (২১ কাঃ)। অর্থাৎ "পুরুষের দর্শনার্থ, কৈবল্যার্থ, তথা প্রধানেরও পঙ্গু অন্ধবৎ উভয়ের সংযোগ, তাহা হইতে সৃষ্টি।" ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ সম্বন্ধটি বুঝাইবার নিমিত্ত সাংখ্য-কারিকা কেবলমাত্র 'সংযোগ' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছে, এবং সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র 'সান্নিধ্য' এই শব্দটি ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু 'সংযোগ' শব্দটিই শেষোক্ত 'সান্নিধ্য' শব্দটি অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, উপরি উদ্ধৃত সূত্রটিতে একটি বিশেষ উক্তির প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পুরুষকে পঙ্গু ও প্রকৃতিকে অন্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং সৃষ্টিকার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকেই অপরটি ব্যতীত সম্পূর্ণ অসহায়। কিন্তু সাংখ্যমতে সৃষ্টি (সর্গ) নিত্য, সুতরাং পুরুষ প্রকৃতির যোগও নিত্য, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্যযুক্ত, সুতরাং ইহারা একটি উচ্চতর সত্তারই (higher synthesis) দুইটি নিত্যাভিসম্বন্ধ (enternally correlated) ভাব। এ বিষয়টি আমরা অন্যভাবে পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে দুইটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সে বিশেষণ দুইটি এই—(তাহারা) 'স্বাধীন' ও 'স্বতন্ত্র'। (সাংখ্য-কারিকার ১০ ও ১১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতি যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে কিরূপে পুরুষের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে? কিন্তু অপরপক্ষে আমরা অনেক সাংখ্যবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পুরুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ ও এক উচ্চতর সত্তার দুইটি নিত্যাভিসম্বদ্ধ ভাব। তাহা হইলে এই দুইটি আপাততঃ বিরোধী বাক্যের কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন করা যাইতে পারে? এ বিষয়ে একটু প্রণিধান করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে ইহার মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। আমরা প্রকৃতিকে দুইভাবে দেখিতে পারি—পুরুষের কতকগুলি গুণ প্রকৃতিরও আছে, আবার কতকগুলি গুণ প্রকৃতির আছে যাহাতে সে পুরুষ হইতে ভিন্ন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতিতে মিলও আছে পার্থক্যও আছে। যতদূর তাহা অভিন্ন ঠিক সেই অংশেই তাহারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, সুতরাং ততদূরই পরস্পরের মুখাপেক্ষী; আবার যতদূর তাহারা ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী, ততদূরই তাহা অসম্বদ্ধ, সুতরাং পরস্পর নিরপেক্ষ। অতএব একটি বিশেষ দিক হইতে দেখিলে প্রকৃতি আপেক্ষিকভাবে (relatively) স্বাধীন, কারণ পূর্ণ স্বাধীনতা একেবারেই অসম্ভব। বাস্তবিকই যদি প্রকৃতির এরূপ স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষের বহির্ভূত হইয়া পড়িত ও পুরুষকে সীমাবদ্ধ করিয়া অসীম ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিত। দুইটি বস্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন, তথাপি সদৃশ ও সর্ব্বব্যাপী—এই উক্তি স্ববিরোধী। সুতরাং প্রকৃতিকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন বলাই উচিত। আবার প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রও বলা হইয়াছে; কিন্তু স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন একার্থেরই প্রকাশক। সুতরাং প্রকৃতি একেবারে স্বাধীন নহে, আপেক্ষিভাবে স্বতন্ত্র। এতদ্দ্বারা অন্যান্য সমস্যারও মীমাংসা হইয়া যাইতেছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাংখ্যের প্রধান ভাবই পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ ও বিরোধটি অধিক করিয়া এবং পুরুষপ্রকৃতির

সম্বন্ধটি যতদূর সম্ভব কম করিয়া দেখান। যাঁহারা সাংখ্যদর্শন বিশেষ সাবধানতার সহিত পাঠ না করিবেন তাঁহাদিগের নিকট সাংখ্য ঘোর বহুবাদী বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু যাঁহারা একটু প্রণিধান করিয়া ইহা পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে মোটের উপর সাংখ্য আপেক্ষিকভাবে বহুবাদী, ইহার বহুস্থানে বহুত্বের পশ্চাতে এক ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে— যদিও তত স্পষ্টভাবে নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক্ যোগ-সূত্র ঈশ্বরের পুরুষত্ব সম্বন্ধে কি মত পোষণ করে। নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে পতঞ্জলি প্রধানত ঈশ্বরের প্রকৃতিরই আলোচনা করিয়াছেন। (১) "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা।" (২) "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" (৩) "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (৪) "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।" (সমাধিপাদ, ২৩—২৬ সূঃ)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ দুইটি—পূর্ণ আত্মজ্ঞান বা সকল বিষয়ে একটি জ্ঞানকেন্দ্র এবং পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি বা জাগতিক সকল ক্রিয়ার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ উদ্যমকেন্দ্র। অথবা, অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ঈশ্বরের পুরুষত্ব পূর্ণজ্ঞান ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি। আমি দেখাইব যে উপরি উক্ত সূত্রগুলিতেও এই দুইটি লক্ষণের কথা আছে। তৃতীয় সূত্রটিতে ("তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং") বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞবীজ তাহার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্ণজ্ঞান বা পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ বলা হইয়াছে। চতুর্থ সূত্রে ("পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ") যখন ঈশ্বরকে ব্রহ্মাপ্রভৃতি আদিভূত গুরুদিগেরও আদিগুরু বলা হইয়াছে তখন এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। এই সূত্রটির অর্থ এই যে, ঈশ্বর সকল জ্ঞান ও সত্যের মূল কারণ। এতদ্বারা এই বাক্যেরই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল জ্ঞান ও সত্যের মূল উৎস। ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতেই তাঁহার নিত্যত্ব ও অসীমত্ব আসিয়া পড়ে, কারণ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ স্থান ও কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না; সেইরূপ হইলে তিনি সকল বিষয় জানিতে পারিতেন না; তাঁহার সীমার বহির্ভূত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার হইত না, কাজেই তিনি সর্ব্বজ্ঞও হইতে পারিতেন না। ঈশ্বর কি পূর্ণ ইচ্ছাস্বরূপও বটেন? দ্বিতীয় সূত্রে ("ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ") ঈশ্বরকে দুঃখ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও তাহা হইতে উৎপন্ন ইচ্ছা হইতে নিত্যমুক্ত এক বিশেষ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে তাঁহাকে কর্ম্ম ও ইচ্ছা বর্জ্জিত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ আমরা সাধারণত ইচ্ছা বলিতে যাহা বুঝি তিনি তদ্বর্জ্জিত। এই সূত্রের ব্যাসদেব যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করা হউক্।—"অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ; কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি; তৎফলং বিপাকঃ; তদনুগুণা বাসনা আশয়ঃ। তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে, স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি; যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যোহ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ; তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী; যথা মুক্তস্য পূর্ব্বাবন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে, নৈবমীশ্বরস্য। যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরাবন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য; স তু সদৈবমুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি।" অস্যার্থ—"ক্লেশ অবিদ্যাদি; কর্ম্ম কুশল ও অকুশল (পাপ ও পুণ্য); বিপাক কর্ম্মফল; আশয় তদনুগুণ বাসনা। যেরূপ জয়পরাজয় প্রকৃত প্রস্তাবে যোদ্ধাদিগের, কিন্তু সাধারণত তাহা প্রভুর উপরেই আরোপিত হয়, সেইরূপ যদিও তাহারা (ক্লেশাদি) মনের ধর্ম্ম, তথাপি তাহাদিগকে পুরুষের ধর্ম্ম বলা হয় কারণ তিনিই তাহাদের ফলের ভোক্তা। যিনি এই সকল ফলের ভোগ হইতে মুক্ত সেই পুরুষ বিশেষকে ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু আরও বহু পুরুষ আছেন যাঁহাদিগকে 'কেবলী' বলা হয়, তাঁহারাও কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা তিন প্রকার বন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ ত্রিবিধ বন্ধনের সহিত কোনও সম্বন্ধ পূর্ব্বেও ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না; যেহেতু 'মুক্ত' অর্থে যেরূপ বুঝায় যে পূর্ব্বে অসংখ্য বন্ধন ছিল, ঈশ্বরের পক্ষে সেরূপ কথা খাটে না। অথবা

যেরূপ প্রকৃতিলীনদিগের অসংখ্য ভবিষ্যৎ বন্ধনের সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের পক্ষে তাহা হইবে না; কারণ, তিনি নিত্য-মুক্ত ও নিত্যই ঈশ্বর।"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর সকলপ্রকার পাপ ও পুণ্য হইতে এবং তজ্জনিত সকল বাসনা হইতে নিত্যমুক্ত। কর্ম্ম বা ক্রিয়া অর্থে কর্ম্মপ্রবৃত্তি-মূলক বাসনাকেও বুঝায়, কিন্তু বাসনা ও কর্ম্ম ইচ্ছার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং, দেখা যায় যে ঈশ্বরের কোনও ইচ্ছাই নাই। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে, কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

(১) প্রথম সূত্রে ("ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা") স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর যোগীদিগকে অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধি ও তৎফললাভে সমর্থ করাইয়া তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্। "প্রণিধানাৎ ভক্তি-বিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ; তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতম সমাধিলাভ ফলঞ্চ ভবতীতি।" অর্থাৎ, "যোগী যখন বিশিষ্ট ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যান করেন তখন তাহার সেই ধ্যানের মুহূর্ত্তে ঈশ্বর তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন এবং সেই ধ্যানের ফলে যোগীর সমাধি ও তৎফলপ্রাপ্তি আসন্নতম হয় অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ঘটে।" তৎপরে চতুর্থ সূত্রটি দেখা যাউক্— "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।" এই সূত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রথমজাত ব্রহ্মাপ্রভৃতি সকল গুরুর আদিগুরু, কারণ তিনি কালাতীত, আর ইঁহারা কালেতে জাত, এবং পরমায়ু বিশিষ্ট। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নহেন, কারণ তিনি সকল জ্ঞান ও সত্যের চরম (প্রধান বা একমাত্র) উপদেষ্টা। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্"—এই তৃতীয় সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সহিত উক্ত হইয়াছে। ব্যাসদেব বলেন—"তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্,জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয় মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধারয়িষ্যামীতি। তথাবোক্তং 'আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণ-চিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ' ইতি।" অন্বার্থ—"যদিও ঈশ্বরের নিজের কোনও অনুগ্রহাপেক্ষা (বা অভাব) নাই, তথাপি জীবের মঙ্গলসাধনকল্পে তাঁহার অভাব আছে। তাঁহার সেই প্রয়োজন এইরূপ—কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের সময় আমি বদ্ধজীবদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দ্বারা মুক্ত করিব। এইরূপ উক্তও হইয়াছে—'আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পরমঋষি পরচিত্তে অধিষ্ঠান করিয়া কপিলরূপে জীবগণের প্রতি করুণাবশত তত্ত্বজিজ্ঞাসু আসুরিকে নিয়মিতভাবে সাংখ্য-তত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন।" ইহা হইতে নিশ্চিতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যোগসূত্রে ঈশ্বরকে একেবারে নিষ্ক্রিয়-রূপে কল্পনা করা হয় নাই।

(২) সুতরাং, এই শেষোক্ত বচনটির সহিত পূর্ব্বোক্ত বচনটির সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? দ্বিতীয় সূত্রে ("ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ") বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর কর্ম্ম ও তাহার বাসনারূপ আনুষঙ্গিক ফল হইতে নিত্যমুক্ত। অন্যান্য সূত্রে (যথা ১, ৩ ও ৪) বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর একেবারে নিষ্ক্রিয় ও বাসনাশূন্য নহেন। তিনি কিছু কিছু কর্ম্ম করেন ও কিছু কিছু বাসনাও তাঁহার আছে। এই দুইটি বাক্যের কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটে? আমার মনে হয় যে ইহার সামঞ্জস্য-বিধান অতীব সহজ ব্যাপার। যখন ঈশ্বরকে কর্ম্ম ও বাসনা হইতে নিত্যমুক্ত বলা হয়, তখন এই কর্ম্মের দ্বারা সৎ ও অসৎ, পুণ্যময় ও পাপজনক কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হয়; এবং 'বাসনা' অর্থেও তৎকর্ম্মজনিত বাসনাকেই লক্ষ্য করা হয়। এখন ঐরূপ কর্ম্ম ও ঐসকল বাসনা কেবল মানবের পক্ষেই সম্ভব। সৎ ও অসৎ, পুণ্য ও পাপ—এই বিশেষণগুলি ঈশ্বরের কর্ম্মে প্রযোজ্য নহে, কারণ তিনি পাপ ও পুণ্যের অতীত। যেহেতু কর্ত্তব্যজ্ঞান যুক্তি (reason) ও প্রবৃত্তির (inclinations) সংগ্রাম হইতেই উত্থিত হয়, এবং পুণ্য (virtue) এই কর্ত্তব্যকর্ম্মের আচরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ঈশ্বরে এরূপ কোনও সংগ্রাম সম্ভব নহে, কারণ মানবের শারীরিক ক্ষুধা ও অভাব হইতে যে সকল ইচ্ছা ও বাসনার উদ্ভব ঘটে, ঈশ্বরের সেরূপ কিছুই নাই। ঈশ্বর চিন্ময় ও পূর্ণ পুরুষ, সুতরাং মানবীয় কর্ম্ম প্রভৃতিকে যেরূপ অর্থে (সৎ বা অসৎ), কুশল বা অকুশল,

পুণ্যময় বা পাপময় আখ্যা দেওয়া যায়, ঈশ্বরের কর্ম্মে সেরূপ কোনও আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল বিশেষণ ঈশ্বরের কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ইহাদ্বারা সিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নহেন, পরন্তু তিনি ক্রিয়াশীল এবং তাঁহার কর্ম্মকে কুশল বা অকুশল, *পাপ বা পুণ্যময় বলা উচিত নহে; সুতরাং যে সকল কর্ম্মে* ঐ সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে তিনি কেবল সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতেই নিত্যমুক্ত। আবার বাসনা, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় ও প্রয়োজন বলিতে সাধারণত যাহা বুঝা যায় ঈশ্বরের কর্ম্ম সে সকলের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে; কারণ এইরূপ বাসনা প্রভৃতি মানবীয় অবস্থা হইতেই উদ্ভূত হয়—ঈশ্বরে এ সকল অবর্ত্তমান। তাঁহার কর্ম্ম স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বাসনা সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অবশ্য ঈশ্বরের বাসনা আছে, কিন্তু এই বাসনা সমূহ কুশল বা অকুশল কর্ম্মের দ্বারা নিরূপিত বা অনুগত নহে; কারণ তিনি এরূপ কর্ম্ম হইতে নিত্যমুক্ত। তাঁহার কর্ম্মের ন্যায় তাঁহার বাসনাও সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং ইহা কোনও অভাবের দ্বারা নিরূপিত হয় না। সংক্ষেপতঃ, ঈশ্বরের কর্ম্ম, বাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। মুনি ঋষিদিগের অত্যুন্নত জীবনে ইহারই একটি অতিশয় অপূর্ণ সাদৃশ্য বা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আপাত-অসঙ্গত উক্তি দুইটি বস্তুত অসঙ্গত নহে; উভয়ই আংশিক সত্য। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যোগদর্শনের মতে ঈশ্বর পূর্ণ ইচ্ছাস্বরূপ (perfect will)। আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, যোগদর্শনের মতে ঈশ্বর পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ বা পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ (perfect self-consiousness or intellect); সুতরাং তিনি পূর্ণ জ্ঞানও বটেন আবার পূর্ণ ইচ্ছাস্বরূপও বটেন। অতএব ঈশ্বর পুরুষ বা পুরুষবিশেষ (Super-person)।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহা হইতে অনুমিত হয়, যে ঈশ্বর কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন, তিনি ইচ্ছাস্বরূপও বটেন, অর্থাৎ একটি সক্রিয় সত্তা বা কারণ। যথা—"দিবসান্তে গুণানেতান-ভ্যেত্যৈকোঽবতিষ্ঠতে। রশ্মিজালমিবাদিত্যস্তত্তৎকালে নিযচ্ছতি॥ এবমেষাহসকৃৎ সর্ব্বং ক্রীড়ার্থমভিমন্যতে। আত্ম-রূপগুণানেতান্ বিবিধান্ হৃদয়প্রিয়ান্॥ এবমেতাং চিকুর্ব্বাণঃ সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণীম্। ক্রিয়াং ক্রিয়াপথে রক্তস্ত্রিগুণাং ত্রিগুণাধিপঃ॥ (৩০৩ অঃ. ৩১-৩৩ শ্লো) অর্থাৎ, "মহাপ্রলয়ের সময় আসিলে সমস্ত বস্তু ও গুণ পরমাত্মার দ্বারা সংহৃত হয়; *দিবসান্তে সূর্য্য যেরূপ সমুদায় রশ্মিজাল আপনার মধ্যে* সংহৃত করিয়া অবস্থান করেন, তিনিও তখন সেইরূপ একাকী অবস্থান করেন। সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে তিনি আবার রশ্মিজালবিস্তারী প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় সৃষ্টি করেন এবং তাহাদের পুনরায় বিস্তার সাধন করেন। এইরূপে পরমাত্মা লীলাচ্ছলে নিজেকে এই সকল উপাধিযুক্ত মনে করেন; সেই সকল উপাধি তাঁহার নিজেরই সংখ্যাতীত মনোমত রূপ ও গুণ। এইরূপেই পরমাত্মা বস্তুতঃ গুণাতীত হইয়াও কর্ম্মবর্ত্মে নিবদ্ধ হইয়া পড়েন ও পরিবর্ত্তন দ্বারা জন্ম ও মরণ-ধর্ম্মা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন, এবং এই প্রকৃতিও তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণ-বিশেষিত সকল কর্ম্ম ও ধর্ম্মের দ্বারা আপন্ন হয়।" পুনশ্চ— "স লিঙ্গান্তরমাসাদ্য প্রাকৃতং লিঙ্গমব্রণম্। ব্রণদ্বারাণ্যধিষ্ঠায় কর্ম্মণাত্মনি মন্যতে"। (ঐ, ৮ শ্লো) অর্থাৎ, "যদিও পরমাত্মা কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনের অধীন নহেন, এবং প্রকৃতিকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার প্রধান কারণ, তথাপি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত একটি দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের ঐ সকল কর্ম্মকে নিজের বলিয়াই বিবেচনা করেন"। অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তমগুণং প্রাহুরীশ্বরম্। নির্গুণঞ্চেশ্বরম্ নিত্যমধিষ্ঠাতারমেবচ"। (৩০৫ অঃ, ৩২ শ্লো) অর্থাৎ, "পরমপুরুষ তাঁহাকেই বলা হয়। যিনি অজ্ঞানোপাধির অতীত, যিনি অব্যক্ত ও অগুণ, যিনি 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত, যিনি সমস্ত বস্তুর নিয়ামক, যিনি নিত্য ও অব্যয় (immutable) এবং যিনি প্রকৃতি ও তদ্‌গুণ সকলের অধিষ্ঠাতা।" আবার আরও আছে—"সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম। একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ যদাসৃজৎ। এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞানকোবিদৈঃ। অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্যাপ্যেত ন্নিদর্শনম্। একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরর্থতত্ত্বতঃ॥ একত্বংপ্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্ত্তনাৎ। বহুধাত্মা প্রকুর্ব্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাং॥ তচ্চ ক্ষেত্রং

মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি। অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ॥ অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্। ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে॥ অব্যক্তিকে প্রবিশতি পুরুষশ্চেতি কথ্যতে।...”॥ (৩০৬ অঃ, ৩৩-৩৭ শ্লো)। অর্থাৎ, “হে নৃপসত্তম, এইরূপেই প্রকৃতির সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে; মহাপ্রলয় ঘটিলে কেবল এক পরমাত্মাই থাকেন, এবং তিনিই সৃষ্টিকালে নানারূপ ধারণ করেন। হে রাজেন্দ্র, জ্ঞানী-ব্যক্তিগণেরও এইরূপই বেদিতব্য। প্রকৃতিই অধিষ্ঠাতা পুরুষকে বহুরূপ ধারণ করান ও পুনরায় একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করান। প্রকৃতির নিজেরও ঐ একই চিহ্নগুলি আছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে প্রকৃতিও ঐ একইরূপ বহুত্ব ও একত্ব প্রাপ্ত হ’ন, কারণ, প্রলয়কালে প্রকৃতি একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে বহুরূপ ধারণ করে। আত্মা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন, এবং প্রকৃতির মধ্যেই জন্ম (প্রসব) ও বৃদ্ধির বীজ নিহিত আছে এবং তিনিই বহুরূপ ধারণ করেন। প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলা হয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উপরে আত্মা বিদ্যমান, তিনিই মহান্। তিনি এই প্রকৃতি বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং হে রাজেন্দ্র, যতীন্দ্রেরা বলেন যে আত্মাই অধিষ্ঠাতা। অবশ্য আমরা শুনিয়াছি যে সমুদায় ক্ষেত্রের উপরে অধিষ্ঠান করায় তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হয়। এবং আত্মা অব্যক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করেন বলিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়।”

যাজ্ঞবল্ক্য জনকের সহিত কথোপকথন কালে এই একই তথ্য আরও অবধারিতরূপে ঘোষণা করিয়াছেন:— “অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা। শতধা সহস্রধা চৈব তথা শত সহস্রধা। কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা॥” (৩১৪ অঃ, ২ শ্লো)। অর্থাৎ “অব্যক্ত ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মাকে নিজের দ্বারা শত সহস্র ও কোটি কোটি রূপে পরিণত করেন।” পুনশ্চ—“কর্ত্তৃত্বা-চ্চাপিতত্ত্বানাং তত্ত্বধর্ম্মা তথোচ্যতে। ‘কর্ত্তৃত্বাচ্চাপি ’সর্গাণাং সর্গধর্ম্মা তথোচ্যতে। কর্ত্তৃত্বাচ্চাপি যোগানাং যোগধর্ম্মা তথোচ্যতে॥ কর্ত্তৃত্বাৎ প্রকৃতীনাঞ্চ তথা প্রকৃতিধর্ম্মিতা। কর্ত্তৃত্বাচ্চাপি বীজানাং বীজধর্ম্মা তথোচ্যতে॥ গুণানাং প্রসবত্বাচ্চ প্রলয়ত্বাত্তথৈব চ।”......॥ (৩১৫ অঃ, ৭-৯ শ্লো।) অর্থাৎ, “পরমাত্মার তত্ত্বসমূহের উপর প্রাধান্যহেতু তাঁহাকে তত্ত্বধর্ম্মা বলা হয়; আবার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাকে প্রসবধর্ম্মা বলা হয়। যোগ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাকে যোগধর্ম্মী বলা হয়। প্রকৃতি নামে অভিহিত বিশেষ বিশেষ কারণের বা ধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রাধান্যহেতু তাঁহার প্রকৃতিধর্ম্মিতা আছে বলা হয়। বীজসৃষ্টি বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাকে বীজধর্ম্মা বলা হয়। এবং যেহেতু তিনি বিভিন্ন গুণের জন্মদাতা ও প্রলয়কর্ত্তা, এজন্য তাঁহাকে প্রসবপ্রলয়ধর্ম্মাও বলা হয়।”

এইসূত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। যদিও উপরি উক্ত শ্লোকগুলিতে নিশ্চিত ও পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর বা পরমাত্মাই ব্যক্ত জগতের প্রকৃত কারণ, তথাপি অপর কয়েকটি শ্লোকে বিপরীত মত পোষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বিবেচনা করা যাউক্—“ন শক্যো নির্গুণস্তাত গুণীকর্ত্তুং বিশাম্পতে। গুণসংশ্চাপ্য-গুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধসে॥ গুণৈর্হি গুণবানেব নির্গুণশ্চাগুণস্তথা। প্রাহুরেবং মহাত্মানো মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ।” (৩১৫ অঃ, ১-২ শ্লো)। অর্থাৎ, “হে প্রিয় নরনাথ, যাহা গুণবর্জ্জিত তাহাকে গুণী করা যায় না। যাহা হউক্, কোন্ বস্তু গুণবান ও কোন বস্তু গুণবর্জ্জিত তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞানী মুনিরা বলেন যে, রক্তপুষ্পের বিম্বগ্রাহী স্ফটিকের ন্যায় আত্মা যখন গুণদিগকে ধারণ করেন তখন তাঁহাকে গুণবিশিষ্ট বা সগুণ বলা হইয়া থাকে; কিন্তু বিম্বমুক্ত স্ফটিকের ন্যায় তিনি যখন ঐ সমুদায় হইতে প্রমুক্ত হ’ন তখন তাঁহাকে তাঁহার সর্ব্বগুণাতীত প্রকৃত স্বরূপেই দেখা যায়।” পুনশ্চ— “উপেক্ষ্যত্বাদমন্যত্বাদভিমানাচ্চ কেবলং। মন্যন্তে যতয়ঃ সিদ্ধা অধ্যাত্মজ্ঞা গতজ্বরাঃ।” (ঐ, ৯ শ্লো)। অর্থাৎ “তিনি প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষীস্বরূপ হওয়ায়, এবং তিনি ব্যতীত আর কিছু না থাকায়, ও তাঁহার প্রকৃতির সহিত তাঁহার একাত্মতার জ্ঞান থাকা হেতু, অধ্যাত্মজ্ঞ ও গতজ্বরা সিদ্ধ যতিরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করেন।” কিন্তু আমরা যদি উপরি উক্ত শ্লোকগুলি সাবধানে পরীক্ষা করি তাহা হইলে

তাহাতে কোনও বিরোধীভাব দেখিতে পাই না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাংখ্য সর্ব্বদাই পুরুষ সম্বন্ধে দুইটি বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছে। সাংখ্য বলে পুরুষের দুইটি দিক আছে—নির্গুণ ও সগুণ। যে পরিমাণে পুরুষ ব্যক্ত জগতে ওতপ্রোত (immanent) সেই পরিমাণে তিনি সগুণ বা ত্রিগুণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ অসংখ্য সসীম রূপধারী। আবার যে পরিমাণে তিনি ব্যক্ত জগতের অতীত (transcendent) সেই পরিমাণে তিনি নির্গুণ অথবা ত্রিগুণ বর্জ্জিত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। এই রূপভেদের যৌক্তিকতা আমরা বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে ইহাতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

ভগবদ্ গীতাতেও আমরা এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাই। কখনও পরমাত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে আবার কখনও বা সগুণ বলা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক্—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" (১৩ অঃ, ১৪ শ্লো)। "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং। ভূতভর্ত্তৃ চ যজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" (ঐ, ১৬ শ্লোক)। "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" (ঐ, ২৬ শ্লোক)। "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" (ঐ, ২৯ শ্লো)। "যদা ভূতপৃথগ্‌ভাব মেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" (ঐ, ৩০ শ্লো)। অস্যার্থ, "যদিও পরমাত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, তথাপি তিনি তাহাদের কর্ম্মেই নিযুক্ত বলিয়া আভাত হ'ন। যদিও তিনি অসক্ত, তথাপি তিনি সর্ব্বভৃৎ, এবং যদিও তিনি নির্গুণ, তথাপি তিনি সকল গুণের ভোক্তা। স্বয়ং পরিপূর্ণ ও অবিভক্ত হইয়াও তিনি সকল বস্তুতে যেন বিভক্তরূপেই বিদ্যমান। তাঁহাকে সকল বস্তুর স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। প্রকৃতিকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কারণ বলা হয়, এবং পুরুষকে সুখ-দুঃখানুভূতির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। হে ভরতর্ষভ, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মিলন বা সংযোগকেই জড় ও চেতন সকল বস্তুর প্রকৃত কারণ বলিয়া জানিবে। তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা যিনি সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মকে প্রকৃতি দ্বারাই অনুষ্ঠিত দেখেন, এবং পুরুষকে নিষ্ক্রিয় ও অকর্ত্তারূপে দেখিতে পান। জীবাত্মা যখন দেখিতে পায় যে, সকল জীবই এক আত্মাতে স্থিতি করিতেছে এবং বুঝিতে পারে যে, এই এক পরমাত্মা হইতেই এই বিস্তার সাধিত হইয়াছে, তখনই সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেও আমরা এইরূপ কথাই দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোক-কয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্।—"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্। কর্ম্মষু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং। ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥ কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখ-দুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥" (৩ স্কন্দ, ২৬ অঃ, ৬-৮ শ্লো)। "প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ। স এষ যর্হি প্রকৃতে গুর্ণেষ্বভিবিষজ্জতে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (ঐ, ২৭ অঃ, ১ শ্লো)। "প্রকৃতের্গুণসামাস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ॥ দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনোপরঃ পুমান্। আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং॥" (২৬ অঃ, ১৬ ও ১৮ শ্লো)। "মহত্তত্ত্বাদ্‌-কুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্য সম্ভবাৎ। ক্রিয়াশক্তি রহঙ্কারাস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যতে॥" (ঐ, ২২ শ্লো)। অস্যার্থ—"এইপ্রকারে আপনাকে প্রকৃতির সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া পুরুষ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচরিত কর্ম্মগুলির কর্ত্তা নিজেকেই মনে করেন। সেইজন্য যদিও পুরুষ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় (অকর্ত্তা) ঈশ্বর, সাক্ষী ও পূর্ণানন্দ, তথাপি এই একত্ব জ্ঞানহেতুই তাঁহার সংসৃতি (জন্মজন্মান্তর), বন্ধন ও পারতন্ত্র্য। প্রকৃতিকে দেহের ও ইন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া জানেন (পণ্ডিতগণ), আর পুরুষ, যিনি প্রকৃতির অতীত তিনি সুখ-দুঃখানুভূতির কারণ। প্রকৃতির মধ্যে বাস করিলেও পুরুষ তাঁহার অবিকারিত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও নির্গুণত্ব হেতু জল মধ্যস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় গুণের দ্বারা লিপ্ত

নহেন। কিন্তু যখন সেই পুরুষ তাহাদিগের সহিত যুক্ত বা লিপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হইয়া আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন'। হে রমণীগণ, তিনি কালনামা ঈশ্বর; তিনি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। যখন পরমাত্মা অথবা ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্মের প্রভাবের দ্বারা উত্তেজিতা প্রকৃতির গর্ভে (চৈতন্যরূপ) বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন তখন প্রকৃতি বহুরূপপ্রসব মহত্তত্ত্বের (বুদ্ধির) জন্মদান করিলেন। এইরূপে পুরুষের বীর্য্যসম্ভূত মহত্তত্ত্বের যখন পরিবর্ত্তন ঘটিল তখন ইহা কার্য্যক্ষম তিনপ্রকার অহঙ্কারের জন্মদান করিলেন।

এক্ষণে ব্রহ্মসূত্রে আমাদিগের ঈশ্বর ও প্রকৃতির পরস্পর নির্ভরশীলত্ব ও পরস্পরান্তর্গতত্ব-রূপ প্রতিপাদ্য বিষয়ের আপাত-বিরোধী কতকগুলি যে উক্তি আছে সেইগুলিতে আসা যাউক্। নিম্নলিখিত সূত্রগুলি পরীক্ষণীয়:—(১) "তদধীনত্বদর্থবৎ" (১ অঃ, ৪ পাদ, ৩ সূঃ), অর্থাৎ, "প্রকৃতি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সৃষ্টিকার্য্যরূপ উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থা।" নিম্বার্ক ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"উপনিষদং প্রধানং পরমকারণাধীনত্বা-দর্থবদানর্থক্যং পরাভিমতস্য তস্যেতি ভেদঃ।" অর্থাৎ, "উপনিষদে বর্ণিত প্রধান বা প্রকৃতি পরমকারণ ঈশ্বরের অধীন হওয়ায় উদ্দেশ্যযুক্ত সৃষ্টিরূপ কার্য্যে সমর্থ; পক্ষান্তরে সাংখ্যবর্ণিত প্রধান পুরুষের অধীন না হওয়ায় সেরূপ হইতে পারে না। ইহাই পার্থক্য।" এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে সাংখ্যমতে প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন নহে। বুঝা কঠিন যে কোথা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত আসিল। আমি বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিঃসন্দেহ বা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছি যে সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর-অন্তর্গত ও নিত্যযুক্ত; সাংখ্যমতেও যেরূপ, উপনিষদের মতেও অবিকল সেইভাবেই প্রকৃতি পুরুষের এক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঐ ব্যাখ্যা যে অদ্ভুত ও ভ্রমাত্মক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।' (২) "ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ", (২ অঃ, ২ পাদ, ৪ সূঃ), অর্থাৎ, "প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত এরূপ অপর কিছুই নাই যাহা প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে; পুরুষ নিত্য অনপেক্ষ।" ইহা নিম্বার্কের ব্যাখ্যা—"প্রাজ্ঞেনাধিষ্ঠিতং প্রধানং ন জগৎকারণং, কুতঃ? তদ্ব্যতিরিক্তস্য সহকার্য্যন্তরস্যানবস্থিতের্ষতস্তব তদনপেক্ষত্বাৎ", অর্থাৎ, "প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না, কারণ, ইহা চেতন পুরুষের দ্বারা চালিত হয় না; কেন? প্রধান স্বাধীন বা নিরপেক্ষ হওয়ায় ইহার আপন ব্যতীত আর কোনও সহকারী নাই।" এস্থানেও এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে যে সাংখ্যমতে প্রধান পুরুষ নিরপেক্ষ বা পুরুষের অনধীন; কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বেই সম্যক্ প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কৌতূহলের বিষয় যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতৃরূপে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, সাংখ্যমতে প্রধান ঈশ্বরের অনধীন বা নিরপেক্ষ, আবার যোগসূত্রের ভাষ্যকাররূপে তিনিই বলিতেছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক্ (অত্যন্তাসংকীর্ণ) নহে, প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত তিনটির সংমিশ্রণজাত চিত্তের মধ্যে ব্রহ্ম প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন, এবং বুদ্ধিসত্ত্বের (শুদ্ধবুদ্ধির) দ্বারা জগতের যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পুরুষের জ্ঞানের সহিত এক। (সাধনাপাদের ২০ সূঃ, সমাধিপাদের ৪ সূঃ, কৈবল্যপাদের ২২ ও ২৩ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ব্যাসদেব তাঁহার মত সম্ভবতঃ উপনিষদ্ হইতেই লইয়াছেন; সুতরাং উপনিষদের সেই উদ্দিষ্ট বাক্যগুলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অনেকগুলি উপনিষদেই প্রকৃতি ও তাহার পরিণামগুলির কথা নানা সূত্রেই বলা হইয়াছে; কিন্তু বিশিষ্টভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধটি অধিকতর স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বাক্যগুলি এই—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মনাবীশতে দেবঃ একঃ। তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥" ১০॥ "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাপাপহানিঃ, ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে,বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥" ১১॥ "এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং, নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা,সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" ১২॥ (১ম অঃ)। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,

জ্ঞাত্বোনাং ভুক্তভোগাদমজোহন্তঃ ॥" ৫ ॥ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বদ্বত্তি, নাশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" ৬ ॥ "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো, অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য, মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥" ৭ ॥ "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" ১০ ॥ (৪র্থ অঃ)। অন্যার্থ—"প্রকৃতি ক্ষর বা পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ঈশ্বর অক্ষর বা অপরিবর্ত্তনীয় ও অমর; সেই এক ঈশ্বর আপনার প্রকাশ দ্বারা ঐ পরিবর্ত্তনশীল প্রধান ও সমুদায় জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন। জীবকুল ঈশ্বরের অনবরত ধ্যান করিয়াও তাঁহাকে নিজেদের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া বিশ্বমায়া হইতে নিজদিগকে মুক্ত করে ॥ ১০ ॥ যদি কেহ ঈশ্বরকে জানে তবে সে জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন করে; সুতরাং সেই জ্ঞানীর অবিদ্যাজনিত সকল ক্লেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তার লাভ করেন। ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা সেই জ্ঞানী পুরুষ শরীরের ধ্বংসের পর ঈশ্বরের সেই তৃতীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হ'ন যাহা জগতে অব্যক্ত ও জগতের অতীত, এবং তাহা দ্বারা তিনি বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'ন ও সম্পূর্ণভাবে আপ্তকাম ও নির্গুণাতীত হ'ন ॥ ১১ ॥ এই আত্মসংস্থ ব্রহ্মই কেবল একমাত্র জানিবার বিষয়; ইনি ব্যতীত আর কোনও বস্তু বেদিতব্য নহে। এই ব্রহ্মই ভোক্তাজীব, ভোগ্যজগৎ ও তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা ও পরিচালক ঈশ্বর। তাঁহার এই তিন প্রকার রূপ আছে, এবং কেবল এই রূপেই তাঁহার ধ্যান করিতে হয় ॥১২॥ এক নিত্য (জীবাত্মা লোহিতশুক্লকৃষ্ণা অর্থাৎ সত্ত্বরজঃতমোরূপত্রিগুণময়ী ও স্ব-স্বরূপা বহু প্রজার সৃষ্টিকারিণী অপরা এক সমভাবেই নিত্যকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) উপভোগ করিতে করিতে তাহাতে যুক্ত বা অনুশয়িত থাকে; আর অপর এক নিত্য (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) জীবাত্মার উপভোগের সামগ্রীর সংগ্রহীত্রী প্রকৃতির সহিত অনাসক্ত হইয়াই অবস্থান করেন ॥ (৪র্থ অঃ, ৫ সূঃ)॥ দুইটি বন্ধুভাবাপন্ন পক্ষী (জীব শরীররূপ) একটি বৃক্ষে বাস করে। তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সেই বৃক্ষের ফলগুলিকে সুস্বাদু মনে করিয়া আস্বাদন করে, আর অপরটি (ঈশ্বর) সে ফলগুলিকে আস্বাদন না করিয়া কেবল সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকে ॥ ৬ ॥ সেই একই বৃক্ষে জীবনামা পক্ষীটি বাস করিয়া তাহার সহিত (আসক্ত বা) জড়ীভূত হইয়া পড়ে, এবং নিজেকে বন্ধনমুক্ত করিতে অক্ষম হইয়া দুঃখ করিতেই থাকে। তাহার পর যখন ইহা ঈশ্বর নামক অপর পক্ষীটির মহত্ব বুঝিতে পারে তখন ইহার মুক্তি হয় ॥ ৭ ॥ ত্রিগুণময়ী ও জগতের উপাদান কারণস্বরূপা প্রকৃতিকে ব্রহ্মের মায়া বা শক্তি-রূপেই জানিতে হইবে, এবং ব্রহ্মকে সেই শক্তির অধিকারী বা উৎস বলিয়াই জানিতে হইবে। বিশ্ব সেই মায়াখ্য-শক্তির অসংখ্য বিভিন্ন প্রকাশের (অভিব্যক্তির) দ্বারা ওতপ্রোত, পরিব্যাপ্ত।"

উপরিউক্ত শ্লোকগুলিতে পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এবং তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধটি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে আমাদিগের ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধটিরই প্রয়োজন। এই সম্বন্ধটি এই বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে প্রকৃতি ব্রহ্মের একটি শক্তি বা অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং ফলতঃ তাহা হইতে স্বতন্ত্র বা তাঁহার অনধীন নহে। সাধারণতঃ সাংখ্যের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয় তাহাতে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম হইতে স্বাধীন বলা হইয়াছে। এই জন্য সাংখ্যকে বেদান্ত হইতে সাবধানে পৃথক্ করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাও বলেন যে, যদিও সাংখ্য-পরিভাষা উপনিষদের বহু স্থানেই বর্ত্তমান, কিন্তু ইহা ভিন্ন বস্তু সমূহকে বুঝায়, এবং ওগুলি সাংখ্যদর্শন হইতে কখনও গৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ আবার সন্দেহ করেন যে, বরং সাংখ্যই উপনিষদ্ হইতে ইহার পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজের বিশেষ প্রয়োজনে ও অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। কৌতূহলের বিষয় এই যে, কপিলের নামও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লিখিত আছে। যথা—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ," (৫ অঃ, ২ শ্লো), অর্থাৎ, "সেই ব্যক্তি তিনিই, যিনি সর্ব্বপ্রথমজাত সর্ব্বজ্ঞ কপিলের জন্ম দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে জ্ঞানদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।" একথা সত্য যে কোনও নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ করা যায় না যে, সাংখ্যই উপনিষদ্ হইতে এই পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছিল অথবা উপনিষদই

সাংখ্য হইতে লইয়াছিল। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে যে আপাত-বিরোধী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইতেই এক্ষেত্রে এই সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিয়াছি যে সাংখ্য প্রকৃতিকে একেবারে পুরুষ হইতে স্বাধীন বলে না; বরং ইহা স্পষ্টই বলিয়াছে যে প্রকৃতি পুরুষেরই অংশ। অধিকন্তু, আমরা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কয়েকটি অতিশয় অর্থপূর্ণ শ্লোক দেখিতে পাই, তাহাতে পরিষ্কার রূপে ও দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, বেদের মধ্যে যাহা কিছু জ্ঞান আমরা দেখি তাহা সাংখ্য হইতেই গৃহীত। সেই শ্লোকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা যাউক—"অমূর্ত্তস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি-শ্রুতিঃ। অভিজ্ঞানানি তস্যাহুর্মতংহি ভরতর্ষভ॥ জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র। যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে। জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতঃ তচ্চ মহন্মহাত্মন্॥" (মভা, শা, ৩০১ অঃ)। অস্যার্থ—"হে কৌন্তেয়, শ্রুতি কহেন যে সাংখ্য সেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি। হে ভরতর্ষভ, সাংখ্য যে জ্ঞানের উপদেশ দান করে তাহা সেই ব্রহ্ম-উপদিষ্ট জ্ঞানই। হে রাজন্, যে মহৎ জ্ঞান ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আছে ও যাহা বেদে আছে এবং যাহা অন্যান্য শাস্ত্রেতেও দেখিতে পাওয়া যায়; এবং যাহা যোগে ও বিভিন্ন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, হে নরেন্দ্র, সে সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে। হে রাজন্, যে জ্ঞানের কথা ইতিহাসে শিষ্টজনসেবিত অর্থশাস্ত্রে আছে এবং আর যাহা কিছু জ্ঞান ইহলোকে আছে—হে মহাত্মন্, সে সমস্তই সাংখ্য-নিহিত মহৎ জ্ঞান হইতেই অবগত"। এইস্থানে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যই সকল সত্য ও উচ্চজ্ঞানের উৎপত্তি স্থান, এবং চতুর্ব্বেদসহ জ্ঞানের যত কিছু শাখা প্রশাখা আছে তৎসমুদায়ই সাংখ্য হইতে তাহাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে ইহা আরও দূরীকৃত হয়।—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং তাবুভাবেকচর্য্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ (৩১৬ অঃ ২ শ্লোঃ)। অর্থাৎ, "সাংখ্যের সমান আর জ্ঞান নাই, যোগের সমান আর বল নাই। এই দুইটি একই অভ্যাসের উপদেশ করে এবং এই উভয়ই অমর বা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া স্মৃত।" এইস্থানে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সকল শ্রেষ্ঠ ঋষিদের নাম উপনিষদে আছে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগেরই অন্যতম এবং তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার কথোপোকথনটি বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি অত্যাবশ্যক অংশ। পুনশ্চ "সাংখ্য রাজন্মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিং। জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ তত্র তে সংশয়ো মা ভূজ্ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতং। অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম-সনাতনং॥" (৩০১ অঃ, ১০০ ও ১০১ শ্লো)॥ অর্থাৎ—"হে রাজন্,সাংখ্যেরা মহাপ্রাজ্ঞ; এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহারা পরমাগতি প্রাপ্ত হ'ন্। হে কৌন্তেয়, এই জ্ঞানের তুল্য আর কোনও জ্ঞান নাই, এই বিষয়ে তোমার মনে কোন সন্দেহ যেন না থাকে; সাংখ্য যে জ্ঞানের উপদেশ করে তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করা হয়। সেই জ্ঞানকে অক্ষর,ধ্রুব ও পূর্ণ ব্রহ্মই বলা হয়।" ভগবদ্গীতাতেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পরীক্ষণীয়।—"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং।" অর্থাৎ "কেবল বালকেরাই সাংখ্য যোগকে (কর্ম্মযোগকে) পরস্পর পৃথক বলিয়া মনে করে। কিন্তু জ্ঞানীরা সে সব মনে করেন না। কারণ মনুষ্য ইহাদিগের মধ্যে যে-কোনটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উভয়েরই ফললাভ করেন।"আবার"যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে। এবং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"। অর্থাৎ "সাংখ্যেরা যে স্থান (অর্থাৎ মুক্তি) লাভ করেন কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং যিনি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে এক বা অভিন্নরূপেই দেখেন, তিনিই সত্যকে দেখেন"। (৫ অঃ, ৪ ও ৫ শ্লো)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'যোগ' এই শব্দটির দ্বারা পতঞ্জলির যোগদর্শন বুঝায় না, ব্রহ্মসূত্রে যে কর্ম্মযোগের কথা আছে তাহাকেই বুঝাইতেছে। (ঐ একই অধ্যায়ের ১০ ও ১১ শ্লো, দ্রষ্টব্য)। এই সকল সুন্দর ও সুস্পষ্ট প্রমাণগুলি অবশ্যই দেখাইতেছে যে প্রকৃতির সহিত জীব ও পরম পুরুষের

য় সম্পর্ক যে সম্বন্ধেও সাংখ্য উপনিষদের মধ্যে কোনও অনৈক্য বা অসংলগ্নতা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাভারত প্রণেতা ব্যাসদেব এই সকল তথ্য সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও লিখিয়াছেন যে, উপনিষদের প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, তিনি যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার সময় নিজেই নিজ মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন (বা নিজ মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন)।

আমরা এক্ষণে উপসংহার করিতে পারি। সাংখ্য উপদেশ দেন যে, এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষই বিদ্যমান্, তিনি পরম চেতন আত্মা অথবা ঈশ্বর; তিনি প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণতাঘটক অঙ্গরূপে নিজের মধ্যেই ধারণ করেন, এবং নিজেকে বিশ্বাঙ্গস্বরূপ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রকাশ করিবার জন্য সেই প্রকৃতিকে উপায়স্বরূপ ব্যবহার (প্রয়োগ) করেন; এবং এইরূপে তিনি একটি পরিপূর্ণ চেতন ও সকল কর্ম্মের বা চেষ্টায় পরম কারণ হওয়ায় তাঁহাকে পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পরিপূর্ণ একত্ববশতঃ তাঁহাকে পুরুষ বিশেষ (Super-Person) বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার

চন্দ্রমল্লিকা

শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবশিশু মুঠি খুলে ডাকিলরে আয় চাঁদ, আয়!
মরাল বাঁকায়ে গ্রীবা ভেসে গেল মানস সরসে,
কাঁচলি পড়িল খসি অপ্সরার ফুটন্ত উরসে,
ঝরিল হাসির মুক্তা শিশুমুখে প্রভাত বেলায়।
ললাটে পরিল চাঁদ কলঙ্কের টীকা,
হেরিয়া আপন মুখ হাসিল মল্লিকা।

দৃষ্টিদান

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[রাজা, চিত্রাধ্যক্ষ ও পুঁথিখানার অধ্যক্ষ। পুঁথিখানার সংলগ্ন চিত্রাগারের দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে]

রাজা

চতুর্ভুজ, চিত্রাধ্যক্ষের কাজ নেওয়ার পর থেকে তোমায় আজ পর্য্যন্ত দরবারে দেখিনা কেন ?

চতুর্ভুজ

হুকুম ! হুজুরের তাঁবেদারীতে যখন দরবারে হাজির থাকতুম তখন হুজুরের কাছে চিত্রকলা, বাস্তুবিদ্যা, ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যা' শিক্ষালাভ করেছিলুম তাতে আমার এই সকল চারুকলার উপর বিশেষ অনুরাগ জন্মে গেছে ।

রাজা

আচ্ছা, তাই বুঝি তুমি পুঁথিখানার অধ্যক্ষ বিরূপাক্ষকে স্বর্গীয় পিতামহের আদেশ-অনুসারে শিলমোহর করা এই ঘরের ছবিগুলি দেখ্‌বার জন্যে এত চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রেচ ?

বিরূপাক্ষ

হুজুর ! শুধু চঞ্চলতা নয়, আমাকে শিবিরাজ-রাজস্ব-নির্ঘণ্ট কাব্যের টীকা রচনা করবারও অবসর পর্য্যন্ত ইনি দেন না । এ রকম করলে হুজুর—

রাজা

তা' বেশ ত',না হয় আজ ঐ শিলমোহর করা দরজাটার শিল আমার আদেশে খুলেই ফেল না ?

চতুর্ভুজ

(খুব আনন্দ সহকারে) হাঁ, হাঁ, পণ্ডিতজি, তা' খুলেই ফেলুন না.—রাজ আদেশ যখন—

বিরূপাক্ষ

না মহারাজ ! আমার বৃদ্ধ পিতা নিজের হাতে অন্নদাতার স্বর্গীয় পিতামহের আদেশে এই ঘরে প্রাচীন মুসাব্বরদের আঁকা বিশেষ বিশেষ চিত্রগুলিকে বন্ধ ক'রে রেখে গেছেন ! কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার অবহেলা করা হয়নি । আজ সেই শিলমোহর হুজুর, এই বৃদ্ধ বয়সে অধমকে দিয়ে আর কেন—

রাজা

তা' বেশ আমিই না হয় এই দ্বার নিজহাতে মোচন করচি ।

(রাজা শিলমোহরটা ভেঙে দিতেই বিরূপাক্ষ একতাড়া চাবি একটা লেফাফার শিলমোহর ভেঙে বার ক'রে অনেক চেষ্টা ক'রে তালাটা খুলে ফেল্লেন)

বিরূপাক্ষ

(জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ হ'ল ! আর দেশের শিল্প দেশে আর স্থায়ী রইল না !

চতুর্ভুজ

(জনান্তিকে) আজ দেশের শিল্পের দ্বার দশের কাছে উন্মুক্ত হ'ল ।

বিরূপাক্ষ

(জনান্তিকে) আর কোন্‌দিন কোন্ রাজ-বন্ধুর শুভাগমন হবে রাজদরবারে, আর তিনি রাজসমীপে চিত্রগুলির তারিফ করলেই এগুলি-কর্পূরের মত উপে যাবে । (প্রকাশ্যে) হুকুম !

রাজা

(দ্বার খুলে) এখন এই ঘরের ভিতর থেকে একে একে চিত্রপটগুলি বার করা হোক্ ।

চতুর্ভুজ

যো হুকুম ! (ঘর থেকে চিত্র বার ক'রে রাজসমীপে রেখে) এই দেখুন, এখানি নিদাস হোসেনের আঁকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিকারের ছবি । সম্রাটের খাস মোহর ছবিটির একপ্রান্তে দেওয়া আছে ।

বিরূপাক্ষ

(আর একটি ছবি উঠিয়ে) হুজুর! এবে দেখচি আবার রামহরের আঁকা রামলীলার ছবি!

রাজা

(আর একটি ছবি উঠিয়ে) বাঃ বাঃ কী চমৎকার! এ যে মিরাণের আঁকা বাজপাখী!

চতুর্ভুজ

হুকুম! কি জীবন্ত এর ভাবটি! যেন মনে হচ্চে এখুনি সে যেন সারা আকাশের স্পর্শ লাভ ক'রে মেঘের রঙে ডানা দুটিকে রাঙিয়ে এসেচে।

রাজা

বাঃ বাঃ, এ যে একটি আঁকা-বাঁকা নদীর ছবি। যেন একটি বিদ্যুৎলহরী থমকে গিয়ে আকাশ বেয়ে মাটিতে নেমে এসে থেমে গেছে।

বিরূপাক্ষ

তাইত, ছবি যে আর ফুরোয় না! এ যে কোনো প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ছবির নকল দেখচি।

রাজা

কি প্রাণবন্ত প্রকৃতিসঙ্গত এবং ভাবভঙ্গী-বিলাসদৃপ্ত রূপদক্ষের রূপ-রচনা।

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির তাড়া খুলে একটি একটি ক'রে দেখে)

হুজুর, এগুলিতে দেখচি যেন কোনো রাজার জীবনী পর পর ছবিগুলিতে বিবৃত করা হয়েচে।

রাজা

প্রথম চিত্রটিতে মনে হচ্চে রাজা খুব বিলাস-উন্মত্ত। প্রেয়সী সখীদের সাবলীল নৃত্যগীতোৎসবে রাজা একেবারে মত্ত!

বিরূপাক্ষ

দ্বিতীয় চিত্রটিতে রাজা বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে উপদেশ-প্রার্থীর মত উপবিষ্ট। তৃতীয় ছবিটিতে মনে হচ্চে তাঁর মনের মধ্যে যেন বৈরাগ্য ও ভোগের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েচে। তাই তিনি সেই কমনীয় রমণী পরিবেষ্টিত কক্ষে শাস্ত্রীর সঙ্গে যেন কী গভীর বাদানুবাদে নিযুক্ত। পরের ছবিটিতে রাজার সন্ন্যাসগ্রহণ ও গৃহত্যাগ; এবং তার পরবর্ত্তী চিত্রে দেখা যাচ্চে একেবারে সাত সমুদ্র তের নদী পারে এক দ্বীপে একটি গভীর অরণ্যভূমিতে উপবিষ্ট; যোগীবেশে পূর্ণ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেচেন।

চতুর্ভুজ

হুজুর, ছবিগুলি দেখলে মনে হয় যেন এইসব ঘটনা আমাদের চোখের সাম্‌নেই ঘট্‌চে।

রাজা

চতুর, তুমি বলত, এইরূপ শিল্পীদের যোগ্য শিল্পী আমার রাজ্যে কি এখন আছে?

চতুর্ভুজ

হুকুম! আপনার অজ্ঞাত ত কিছুই নেই! তবুও আপনি আদেশ করলেই আমি চিত্রশালার শিল্পীদের তলব করতে পারি।

রাজা

হাঁ, আমি চাই এই মনসুরের আঁকা ইরাণী ফুলের ছবিটির নকল।

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর! অন্দর মহলে রাজমাতার আদেশ এসেচে।

রাজা

বিরূপাক্ষ, চতুর্ভুজ, তোমরা শিল্পীদের কাল ভোরে আমার খাস বৈঠকে রঙমহলের দালানে হাজির হ'তে বোলো।

বিরূ ও চতুর

যে আজ্ঞে হুজুর!

রাজা

দ্বারী যাও, রাণীমাতাকে আমার সেলাম দাও গিয়ে।

দ্বারী

যেআজ্ঞে হুজুর!

[দ্বারীর প্রস্থান]

চতু ও বিরূ

জয় জয়, রাজ রাজেন্দ্রের জয়!

(নমস্কার ও রাজার প্রস্থান)

চতুর্ভুজ

পণ্ডিতজী, মহারাজের শিল্পানুরাগ অনুকরণীয়।

বিরূপাক্ষ

কিন্তু তাই ব'লে তাঁর এতদিনের শীলমোহর ভেঙে প্রাচীন চিত্রগুলিকে বাইরে প্রচার ও প্রকাশ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

চতুর্ভুজ

তবে কি তুমি পণ্ডিতজী, বলতে চাও যে এগুলি কীটদংশিত হ'য়ে পুঁথিখানায় পরকালের পরপারে সাক্ষ্য দিতে গেলেই ভাল হ'ত?

বিরূপাক্ষ

কিন্তু দেখ, রাজা যেমন রক্ষা করেন,তেমনি অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে ক্ষতিও অনেক ক'রে থাকেন।

চতুর্ভুজ

কেন?

বিরূপাক্ষ

দেখনা, ঐ আমাদের ধ্বজা যদি ওঁর সুনজরে না পড়ত ত হয়ত কাব্যচূড়ামণি, তর্কালঙ্কার বা একটা কিছু না কিছু সে নিশ্চয় হ'তে পারত, কিন্তু—

চতুর্ভুজ

কেন? এখনই বা তার হ'তে বাধা কি আছে?

বিরূপাক্ষ

আরে, আসলে মহারাজা তাকে সহসা রাজকবি সভার সদস্য যদি না করতেন ত ঐ যুবকের শিক্ষা পুরোপুরি হ'তে পারত,—এতে সে অহঙ্কারই সঞ্চয় করলে বিদ্যার জায়গায়।

চতুর্ভুজ

কিন্তু, কেন পণ্ডিতজি? তার রচনার তারিফ সেদিন অজয়গড়ের প্রাচীন রাজকবি সবীরসেন ত করছিলেন?

বিরূপাক্ষ

আরে, সেটা কি তার কাব্যের জন্যে,—না রাজ-সভা-মর্য্যাদা লাভের জন্যে।

চতুর্ভুজ

তা' সত্যি, কিন্তু দেখ এই রাজ্যে রাজার সাহিত্য শিল্প-দর্শন চর্চ্চার ফলে কত পণ্ডিত, দার্শনিক, শিল্পী আজ অন্ন লাভ করচে!

বিরূপাক্ষ

আর কত পণ্ডিত ও শিল্পীর প্রতিভা ফুলদানীতে তোলা কুঁড়িতে ফোটানো ফুলের মত অকালে বিনষ্ট হচ্চে তার আর ইয়ত্তা নেই।

চতুর্ভুজ

তবে কি বলতে চাও রাজ-অনুগ্রহ ছাড়াও এগুলি গড়ে উঠ্‌তে পারত?

বিরূপাক্ষ

তা পারত। মরুতেও ফুলের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌তে পারে সহজ সরস অন্তঃসলীলধারা লাভ কর'লে। কিন্তু সেই বীজই অতিরিক্ত সার যুক্ত রাজোদ্যানে পড়লে হয়ত তাতে পাতাই গজিয়ে উঠ্‌বে, ফুল আর ফুটবে না।

(দূরে গীত শুনে দু'জনে স্থির হ'য়ে রইলেন)

(দূরে গীত)

কে উঠে ডাকি
মম বক্ষোনীড়ে থাকি,
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ বিধুর পাখী!
নিবিড় ছায়া গহন মায়া
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্তগহন কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী।
যামিনী বিভোরা
নিদ্রাঘন-ঘোরা,
ঘন তমাল শাখা,
নিদ্রাঞ্জন মাখা;
স্তিমিততারা চেতনাহারা
পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,
চন্দ্রশ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি॥

চতুর্ভুজ

(গীত শেষ হ'তেই) পণ্ডিতজী, দরবারের দৌলতে গীতটাও কি আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ম'রে আছে?

বিরূপাক্ষ

হাঁ, তা' আছে সত্য, কিন্তু তানসেন যিনি, তিনি দরবারে কখনো জন্মান নি।

চতুর্ভুজ

আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি পণ্ডিতজী! আমায় আবার শিল্পীদের কাছে রাজ আদেশ নিয়ে যেতে হ'বে। নইলে—

বিরূপাক্ষ

হাঁ, তাদের বোলো যেন তারা যথাসময়ে তাদের আঁকা চিত্রপট নিয়ে রাজসমীপে হাজির হয়।

[পুঁথিখানার অন্তরালে গান]

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে,
তারি মধু কেন মনমধুপে খাওয়াও না ?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?
বিশ্বকমল ফোটে চরণচুম্বনে,
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত কমলটিরে সেই রসে,
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না ?
আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমি ক'রে সুধাসাগর সন্ধানে,
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?
পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ :
তেমি ক'রে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না ?

[প্রণামান্তে চতুর্ভুজের প্রস্থান ও যবনিকা পতন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদে রাজা ও রাজপুত্র সুনন্দন]

রাজা

তোমার ওস্তাদ প্রবীর যে গানগুলো শিখিয়েছিলেন, তা' কি তোমার মনে আছে ?

সুনন্দন

হাঁ বাবা, আমায় তিনি সেই কবি ভানুরাজের গান যা' শিখিয়েছিলে তা' আমার বেশ মনে আছে।

রাজা

আমায় শোনাও দেখি !

[সুনন্দনের গীত]

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে।
এখন চল্ রে, ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে, ডাকে আমায় পথের পরে
সেই নদীতে।
এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে, প্রেম-নদীতে উঠেছে রে,
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফিরবো কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
এখন চল্‌রে, ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে।

সুনন্দন

(গীত সমাপ্তে) বাবা আমার বড় ইচ্ছে হয় যে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রবিদ্যাটাও শিখি।

রাজা

তা' বেশ ত, আমি যদি ওস্তাদ মনসুরের মত বিচক্ষণ শিল্পী কাউকে পাই ত তাকে দিয়ে তোমায় নিশ্চয় চিত্রবিদ্যা শেখাব।

সুনন্দন

চিত্রবিদ্যা আমার বড় ভাল লাগে।

রাজা

হাঁ, চিত্র সীমার মধ্যে অসীমের আনন্দকে ধ'রে রাখে; শিল্পীর শিক্ষাসংযত সংস্থিতির উপর শিল্পের উৎকর্ষ। ভাব-লাবণ্য, বর্ণিকাভঙ্গযোগে তবে ছবিটি ছবি হয়।

সুনন্দন

শিল্পীরা বাবা, কি ক'রে এই ভাব-লাবণ্যকে পায় ?

রাজা

তা' তারাই জানে না। সেটা তাদের অনুভূতির জিনিষ —সাধনার শিক্ষার ধন সেটা।

সুনন্দন

আচ্ছা রাজন্, সব শিল্পীই কি এই রসের রসিক ?

রাজা

সুনন্দন, তাহ'লে ত সবাই শিল্পী অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষ হ'য়ে যেতো। দেখ্‌বার লোকের চেয়ে দেখাবার লোকই দুনিয়ায় ভ'রে উঠ্‌তো—এবং কেউ দেখতে চাইত না ব'লে দ্বন্দ্ব বেধে যেতো—ছন্দ, ভাব আর থাকত না।

সুনন্দন

দেখ্‌বারও কি একটা সাধনা নেই বাবা ?

রাজা

হ্যাঁ আছে, এবং সে সাধনা আরো কঠিন। তাতে শিল্পীর চেয়েও কল্পনাশক্তির ভাবশক্তির প্রাচুর্য্যের দরকার হয় শিল্পীকে বুঝতে এবং শিল্পকে জানতে। শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি না থাকলে কেউ তার শিল্পকে বুঝতে পারে না। কবি ভাস তাই বলেচেন :—

"সুলভ জগতে সুকাজ করার লোক,
দুর্ল্লভ শুধু তাহা দেখিবার চোখ।"

সুনন্দন

রাজন! দ্বারী অনেকক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করচে।

রাজা

ডাক তাকে।

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর, চিত্রাগারের চিত্রকর অগ্নিহোত্রীজি, জীমূতনাথজি, শ্রীনাথজি প্রভৃতি মহারাজের চরণদর্শন-প্রার্থী !

রাজা

বেশ, তাদের নিয়ে এস।

(দ্বারীর প্রস্থান)

[চিত্রকরদলের বগলে ছবির তাড়া নিয়ে প্রবেশ ও কুর্ণিশ করণ]

চিত্রকরদল

জয় রাজরাজেন্দ্র অন্নদাতাজীর জয় !

রাজা

বোস তোমরা।

চিত্রকরদল

(উপবেশনান্তে) হুজুরের আদেশলাভ করতে হাজির হয়েচি।

রাজা

বেশ, দেখি তোমাদের কাজ, কিছু এনেচ তোমরা ?

অগ্নিহোত্রী

(রাজার সাম্‌নে ছবি বার ক'রে) হুজুর এই ক'খানা সামান্য ছবি এনেচি, হুকুম হয় ত—

জীমূত

আমি যা এই প্রাচীন 'থাকা' থেকে চুচারটে এঁকেচি হুজুর, তাই—

শ্রীনাথ

হুজুর, এই সামান্য কখানি রামলীলার ছবি—রাওয়াল সাহেবের জন্যে আঁকা—

চতুর্থ শিল্পী

রাজমাতার জন্যে গীতগোবিন্দের কখানা যা' এঁকেচি তাই নিবেদন করতে—

পঞ্চম শিল্পী

হুজুর, এই—

চিত্রকরদল

রাজ অনুগ্রহে হুজুর, আমাদের কিছুরই অভাব নেই।

রাজা

হ্যাঁ, তা' এখন তোমরা আমার জন্যে একটি মন্‌সুরের আঁকা ছবির নকল ক'রে দিতে পারবে কি ?

চিত্রকরদল

নকল ? হুজুর হুকুম করলে কত শত আসল ছবি আমরা এঁকে দিতে পারি।

রাজা

তা জানি। কিন্তু তোমাদের বাপদাদার পুরোনো থাকা দেখে এঁকে এঁকে যে কী দশা হয়েচে তা' তোমাদের বোঝবারই ক্ষমতা নেই।

চিত্রকরদল

কি করি অন্নদাতা, পেটের দায়ে!

রাজা

হাঁ তা' জানি। তাই তোমাদের আজ পরখ করবার জন্যেই আমি ডেকেচি। প্রহরী—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী

হুজুর!

রাজা

যাও, চিত্রাগারের হাকিম চতুর্ভুজকে ডেকে দাও। আর বল, যেন মনসুরের ছবিখানি সঙ্গে নিয়ে আসেন।

প্রহরী

হুকুম!

(প্রহরীর প্রস্থান)

সুনন্দন

(এতক্ষণ শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি একে একে ব'সে দেখছিলেন; সবাইকে নীরব থাকতে দেখে)

রাজন্, আপনি কি তাহ'লে বলতে চান যে, এইসব ছবিগুলির কোনো মূল্য নেই?

রাজা

হাঁ, মূল্য আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।

সুনন্দন

কেন?

রাজা

কেননা, শিল্পীর প্রাণের সাড়ায় গড়া সব শিল্পেই একটি অভূতপূর্ব্ব স্পন্দনের সন্ধান পাওয়া যায়—যেটা তার পরবর্ত্তী নকলে অনুভব করা যায় না। নকলটিতে থাকে কলা-কৌশলের যান্ত্রিক ছলনা।

চিত্রকরদল

হুকুম! এটি আমাদেরই দুর্ব্বলতা!

রাজা

না, তোমাদের কোনো দোষ দিই না। তোমাদের কাছে দেশ যদি না চায়—রাজা যদি না দাবী করেন, ত তার ফলে এই নির্জ্জীবতা আসতে বাধ্য।

(ছবি হস্তে চতুর্ভুজের প্রবেশ)

চতুর্ভুজ

অন্নদাতার জয় হোক! (কুর্ণিশ ও উপবেশন)

রাজা

চতুর, এঁদের এই চিত্রটি প্রত্যেককে দুদিন ক'রে দেখবার সময় দেওয়া হোক। এঁরা ছবিটি দেখার পর আঁকবেন।

চতুর্ভুজ

যে আজ্ঞে!

চিত্রকরদল

হুজুর! চিত্রাগারের প্রদর্শনীগৃহে এটিকে টাঙিয়ে রাখার অনুমতি হোক্!

রাজা

বেশ, চতুর, একমাস এটিকে প্রদর্শনীগৃহে রাখ।

চতুর্ভুজ

তাই হবে হুজুর!

চিত্রকরদল

হুজুর অন্নদাতার আশীর্ব্বাদে মনসুরের ছবি এঁকে আমরা খিলাৎ পাব এই ভরসা।

রাজা

আমি তাই চাই।

[চিত্রকরদল "যো হুকুম" ব'লে কুর্ণিশ ক'রে প্রস্থান করলে]

রাজা

চতুর, দেখ, এদের দ্বারা যদি এই চিত্রটির নকল হয় ত ভালই, নচেৎ রাজ্যে ঘোষণা করে দিতে হবে যদি কেউ—

চতুর্ভুজ

হুজুর! আমার বিশ্বাস এদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ না কেউ এই চিত্রের নকল অনায়াসে ক'রে দিতে পারবেন। (খানিকক্ষণ নীরবে থেকে) হুজুর মন্ত্রী রুদ্রদমনজি রাজকার্য্য নিয়ে হুজুরের প্রতীক্ষায় আছেন।

রাজা

বল গিয়ে আমার শরীর মন বড়ই ক্লান্ত, আমি একদণ্ড পরে উজির দেউড়ীর খাস দরবারে হাজির হ'ব। (পুত্রের প্রতি) বৎস! তুমি আজ আমার কবি ভানুরাজের আর একটি গান শোনাও। তাঁর গানের ভিতরকার দরদটি যেন প্রাণে গিয়ে স্পর্শ করে!

যুবরাজের গীত

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার সঙ্গে আমার
দেহ বীণার তার
বাজাও আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব।

সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা।
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু॥

(দ্বারীর প্রবেশ)

দ্বারী

হুজুর, স্থপতি ধীরাজ ও দার্শনিক উদয়ন এসেচেন আপনার চরণদর্শন করতে।

রাজা

বেশ তাদের আমার নিকট আন।

ধীরাজ ও উদয়ন

নমস্তে অন্নদাতা, নমস্তে!

রাজা

বোস, তোমরা বোস! বল ধীরাজ, আমার মন্দির-প্রাঙ্গণের পৈঠার উপর দু'ধারে দুটি নৃত্যরতা নগ্ন নারীমূর্ত্তি যোজনা করে দিয়ে ভাল দেখাচ্চে ত?

ধীরাজ

হুকুম! তা' আপনি যেরূপ বলেছিলেন ঠিক্ সেইরূপটিই ক'রে দিয়েচি। শিল্প-সংস্থিতি শাস্ত্রমতে যদিও—

রাজা

আহা তা' হোক্‌গে—ঐ তোমাদের একটা কুসংস্কার লোহার বেড়ীর মত তোমাদের চেপে ব'সে আছে। নতুন একটা কিছু করতে গেলেই—

ধীরাজ

হুজুর! তা' ঠিক্,—তবে যদি অপরাধ না নেন ত—

রাজা

বল, বল,—

ধীরাজ

ওটাতে বেজায় ইরাণী ঢঙ এনে ফেলেচে। প্রাচীন বাস্তুবিদ্যা শাস্ত্রে মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা পুঁথিতে হুজুর—

রাজা

উদয়ন, তুমি ত একজন দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তুমি বল ত এতে দোষ কি আছে? তুর্কী ইরাণ চীন জাপান প্রভৃতি সব দেশের সঙ্গেই যখন আমাদের এখন কারবার, তখন তাদের দু' একটি জিনিষ আমাদের নিজেদের জিনিষের সঙ্গে প্রচলন করলে দোষ কি?

উদয়ন

হুকুম! সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের ভাব মানতে হ'লে শাস্ত্রেই ত আছে—বসুধৈবকুটুম্বকম্

রাজা

না না, তা' বলচিনে। তবে কিনা মিলে মিশে যদি ভাল একটা কিছু গ'ড়ে ওঠে—

উদয়ন

তাছাড়া শাস্ত্রে একথাও আছে—

রাজাদেশাৎ কৃতে কার্য্যে
নাপি দোষো কদাচন।

ধীরাজ

কিন্তু হুজুর শিল্পরত্নের দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে :—

দ্বারপালকমধ্যাদিষন্তরালে প্রকীর্ত্তিতাঃ
চণ্ডপ্রচণ্ডরথনেমিসুপাঙ্কজন্তং
দুর্গাগণেশরবিচন্দ্রমহানুভাবাঃ
সর্বেশ্বর সুরপতিশ্চ তথা দশৈতে
প্রকারমঞ্চমুখ গোপুর কল্যাণীয়াঃ ॥

উদয়ন

আহা! তাহ'লে কি হয়!

ধীরাজ

কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে আছে—

নগ্নং তপস্বীলীলাঞ্চ ন কর্য্যান্মনুবালয়ে
ভিত্তাদৌ তত্র লেখ্যং স্যাচ্চিত্রং চিত্রতরাকৃতি ॥

রাজা

ঐ দেখ, তোমাদের শাস্ত্রের শস্ত্র এমন ভয় দেখায় যে, তোমরা তাকে ছাড়িয়ে একপাও এগিয়ে চলতে পারনা।

উদয়ন

দেখনা ধীরাজ! মেঘপ্রতিচ্ছন্ন প্রাসাদ রচনাকালে রাজাদেশ মত ঝরোখার আলিন্দার উপর দুটি কপোত কপোতীর চিত্র জুড়ে দিয়ে কেমন সুন্দর হয়েচে। তা ছাড়া তাঁরই হুকুম মত প্রতি সহরের তোরণের উপর ময়ুরময়ুরীর নৃত্যের প্রস্তরউৎকীর্ণ মূর্ত্তিযোজনা ক'রে কত সুন্দর ক'রে তোলা হয়েচে।

রাজা

তাহ'লে উদয়ন, তুমি এগুলি সব অনুমোদন করেচ?

উদয়ন

অন্নদাতা, আপনার মত এমন বিচিত্র নব নব উন্মেষশালী প্রতিভার কাছে পরাস্ত কে না হয়?

ধীরাজ

কিন্তু শাস্ত্রে—

রাজা

দেখ ধীরাজ, আপাতত আমি যা' বলি তাই ক'রেই দেখনা! শাস্ত্র ত তোমার আছেই, কেউ ত আর তা' কেড়ে নিচ্চেনা?

ধীরাজ

যো হুকুম! আদেশ পালনে দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

রাজা

ধীরাজ, শিল্পকলার শাস্ত্র সৃষ্টি হবার আগে শিল্পসৃষ্টি হয়েচে, শিল্পের আগে শাস্ত্র হয় নি এটা জেনো।

উদয়ন

হুকুম! বাঁধাপথে চলবার বাধা নেই, তাই শাস্ত্রের বাঁধা নিয়ম মেনে চলার সহজ সুলভ শিক্ষা এদের এত পেয়ে বসেচে!

রাজা

কিন্তু তাই ব'লে কি শিল্পের মধ্যে একটা সংযম নেই? তা' আছে বই কি। সংযমই শিল্পের সুসংস্থান।

উদয়ন ও ধীরাজ

হুজুরের অনুমতি হয় আজ আমরা আসি। (উঠিয়া) জয়, জয়, মহারাজ অন্নদাতাজীর জয়!

(নমস্কারান্তে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[সহরের পথ; কতকগুলি সহরের লোক]

প্রথম লোক

ভাই শুনেচিস্, রাজা আবার কবির লড়াইয়ের মত ছবির লড়াই বানিয়ে বসেচেন।—

দ্বিতীয় লোক

ওদিকে আবার রাঠোরের রাওলজি যে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করচে তা' শুনেচিস্ ত?

তৃতীয় লোক

আরে ভাই, কি আর বলি বল। তার উপরে আবার রাজ দরবারের দলাদলি—হাকিমদের অবিচার, দেশে দুর্ভিক্ষ!

[এমন সময় একটি কুব্জা স্ত্রীলোককে পথ দিয়ে যেতে দেখে]

দ্বিতীয় লোক

ওরে খেঁদি, তোর ছেলে যে বেল চুরির মামলায় ধরা পড়েছিল,—তার কি হ'ল ?

কুব্জা

আর হবে কি বাছা ! এ রাজ্যিতে কি আর সুবিচার আছে ? তারে দু'মাসের ফাটক দিয়েছে বাছা !

(অঞ্চলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন)

কি অবিচার ! কি অবিচার !

(কুব্জার প্রস্থান)

দ্বিতীয় লোক

আরে ভজা, তোকে ত আমি বলেইচি যে, ছবি-কবি-টবি নিয়ে রাজা মেতে থাকলে কোন্‌দিন আমাদেরও সেইসঙ্গে হাউইয়ের মত ভাবরাজ্যে উড়ে যেতে হ'বে।

তৃতীয় লোক

কিন্তু দেখ, আমায় কাল পণ্ডিতজীর 'খাওয়াস' বলছিল যে, এতে নাকি দেশের মঙ্গল হ'বে—দেশের শিল্পী কারিগরেরা খেতে পাবে।

প্রথম লোক

আরে মোলো! শিল্পী কারিগরের পেট ভরলেই কি দেশের অকাল ঘুচ্‌বে।

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, আমরা চাষাভুষো অত শিল্পী-টিল্পী বুঝিনে। রাজপ্রসাদের খুদকুঁড়োও আমাদের জন্যে আর বাকী রইল না। এখন আমরা যাই কোথা ?

তৃতীয় লোক

আরে, যাব আর কোথা! ঐ দেখ্‌না ওদিকে ঐ গোয়েন্দার মত পাওনাদার আহির আসচে আমাদের ধরতে। সুদশুদ্ধ আদায় ক'রে তবে ছাড়বে।

প্রথম লোক

তাইত ভাই, ছা'পোষা লোক আমরা কোথা থেকে নগদ পয়সা জোটাই বল ?

দ্বিতীয় লোক

তাইত !

(আহিরের প্রবেশ)

আহির

এই যে ভজা যে, বলি টাকাটা আর কতকাল আটকে রাখবে ? আরে রামু যে ! তাইত বলদ কেনার দরুণ টাকার সুদ যে অনেকগুলো হ'ল বাপু !

তৃতীয় লোক

ভাই, দি কোথা থেকে। আমরা ত আর চিত্রকর নই যে রাজ অনুগ্রহে একেবারে ফেঁপে উঠেচি ; ভাই, আমাদের মুটেমজুরী ক'রে খেতে হয়—পেটেই বা দিই কি, আর তোমায় বা দিই কি দাদা, তাই বল ত ?

দ্বিতীয় লোক

আর এদিকে ত শুনেচিস, রাজার বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত চলচে !

প্রথম লোক

আবার একটা সেই সন আশীশালের মত লড়াই না বাধলে বাঁচি।

তৃতীয় লোক

তাহ'লে ত চিত্তির রে, চিত্তির !

প্রথম লোক

কেন ? তখন চিত্রকরদের আঁকা চিত্রকলার চিত্তিরগুলো চিত্রশালায় ব'সে ব'সে দেখবি'খন—কি বল ? ভয় কি তোদের ?

আহির

নাঃ, ওসব চালাকি আমি শুনচিনে বাপু ! সুদের সুদ আদায় ক'রে নেব—দেখি কে ঠেকাতে পারে আমায়।

(আহিরের প্রস্থান এবং ঢেঁট্‌রা পিটিতে পিটিতে একটি লোকের প্রবেশ)

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

রাজ-আদেশ এই যে, যে শিল্পী বসন্তকালের একটি চিত্র এঁকে দিতে পারবে তাকে তিনি জায়গীর আর খেলাৎ দেবেন। সে চিরকাল রাজশিল্পী হ'য়ে দরবারে আসন পাবে।

প্রথম লোক

কেন গো! আমাদের চিত্রাগারের চিত্রকর অগ্নিহোত্রীজী জিমূতনাথজী, শ্রীনাথজী থাকতে ছবির জন্যে আবার দামামা পিটুতে হচ্চে কেন?

তৃতীয় লোক

তাঁরা ত কোন্ এক মোগলাই তস্বীরের নকল ক'রে দিয়ে রাজার কাছে খেলাৎ পেয়েচেন শুনলুম।

ঢেঁড়্‌রাওয়ালা

হাঁ গো হাঁ, রাজা তাতে সন্তুষ্ট নন ব'লেই এই নতুন খেলাৎ ঘোষণা করেচেন, যে পার এগিয়ে এস।

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, লাঙ্গল ছেড়ে যদি তুলি ধরতুম, খেতের চাষ ছেড়ে ছবির চাষ করতুম ত আজ আমাদের কপাল ফিরে যেতোরে—ফিরে যেতো!

তৃতীয় লোক

তাই ত রে, রাজা এতগুলো পটুয়া পুষচেন কিন্তু কেউ-ই কি একটা ছবিও নকল করতে পারচে না?

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

হাঁ গো, যদি ওরা পারত তাহ'লে আমায় এই ঢাকবাদ্যি ঘাড়ে ক'রে এই দুপুরে রোদে রোদে গলাবাজি ক'রে বেড়াতে হ'ত না।

প্রথম লোক

এতক্ষণ তাহ'লে তোকে সেই নিবে মামার আখড়ায় দেখতে পেতুম রে!

ঢেঁট্‌রাওয়ালা

হাঁ রে হাঁ, তবে যাই ওদিকে আবার সহরের আনাচে-কানাচে অলি-গলিতে হুলিয়া করতে হ'বে।

প্রথম লোক

নিবেমামার চিলিমগুলো তাহ'লে উপোসী থাকবে য়!

দ্বিতীয় লোক

যা' ভাই ভজা, ওকে যেতে দে।

(ঢাকীর প্রস্থান এবং একদল বালকের কোলাহল করতে করতে প্রবেশ)

বালকের দল

ওরে ভাই, চ' ভাই চ' রাজদেউড়ীতে ছবি দেখে আসি চ'—

প্রথম লোক

ওরে, তোরা আবার কোথা চলেছিস রে?

প্রথম বালক

আমরা ছবি আঁকব বসন্তকাল, কেমন মজা হবে!

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, রাজা মাথায় পরিয়ে দেবেন সিরোপা।

তৃতীয় বালক

ছবি এমন আঁকব যে, দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

চতুর্থ বালক

আয় ভাই, সেই বসন্তের গানটা একবার আমরা গাই।

বালকদের গান

আয়রে তবে মাত্‌রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন পানের বাঁধন হ'তে
চল ছুটে ঐ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়াও
ছড়িয়ে দেরে দিগন্তে।
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে,
যা আছে রে, সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় আনন্দে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

দ্বিতীয় লোক

ভজা, চ' ভাই! এদের এই ঝামেলির ভিতর থেকে প্রাণ বেরুবার যো' হ'ল।

১ম লোক

হাঁ ভাই, মহারাজ দেখ্‌চি ছেলেবুড়ো সবাইকে খেপিয়ে তুলচেন।

দ্বিতীয় লোক

ছবি—কবি—এসব বুঝিনে বাপু।

ছেলেরা

ওহে! তোমরা আমাদের রাজার কাছে নিয়ে চলনা।

প্রথম লোক

হ্যাঁ শেষটা আমাদের প্রাণ যাক্ আর কি? ছবিটবি আমরা বুঝিটুঝিনে বাপু।

তৃতীয় লোক

চাষাভুষো লোক, ক্ষেতখামারের কথাই জানি।

প্রথম ছেলে

দেখ, সেদিন আমাদের গুরুমশাই একটি বড় দরবারী শিল্পীর ছবি আমাদের দেখাচ্ছিলেন, আর তার ব্যাখ্যা করছিলেন।

প্রথম লোক

ওঃ বটে? তবে ত আর নবীন পণ্ডিতজীর কাছে নেলোভুলোকে পাঠানো হবে না!

দ্বিতীয় লোক

আরে ভাই, তাই বলি আমাদের খগা লাউডগা দিয়ে, শিমপাতার রস দিয়ে বাড়ীর দেয়ালময় কি লেখে। কাগাবগা এঁকে খগা আমার দেয়ালের মাটি আর পরিপাটি রাখতে দিলে না।

তৃতীয় লোক

না ভাই, কোথায় যে যাই তা' ভেবে পাচ্চিনে! (একটি ছেলের চিবুকে হাত দিয়ে) বাসন্তীদেবীর ছবি এঁকে কি পেট ভরবে বাবারা, যাতে ঘরে লক্ষ্মী আসেন তার জন্যে কি কর্‌চিস?

ছেলেরা

আমরা ছবি আঁকবো; আমরা লক্ষ্মী-টক্ষী জানিনে কিছু—

[ছেলেদের ঘুড়ি দিতে দিতে গান গাইতে গাইতে প্রস্থান]

ছেলেদের গান

ভালমানুষ নইরে মোরা
ভালমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের,
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইলে মোরা
উল্টো কথা কই।
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে
সকল অনাসৃষ্টি,
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা
রাখিনে ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাইরে গতি
ভেসেই চলা বই।

প্রথম লোক

ভাই, চ' ওদিকে আবার ঢাকের বাদ্যি সুরু হ'ল, এদিকে ঘরে আবার ছুঁচোর কেত্তন না হয়!

তৃতীয় লোক

কেনরে, তোর তো ঘরে জবর পাহারা; ঘর কেন পাড়াপ্রতিবেশীরও নাকি তাঁর নথনাড়ার দাপটে তটস্থ থাক্‌তে হয়।

প্রথম লোক

তা' ভাই সত্যি, ছেলেবেলার গুরুমশাই আর এখনকার এই ঘরের গোঁসাই, বাট্‌খারায় চড়ালে ওজনে বেশ-কম কেউ যে হবেন বলে ত মনে হয় না।

দ্বিতীয় লোক

ভাই, এখন বল্ ত এই রাজ্যে চিত্রকর, আর কারিগর যদি ছেয়ে ফেলে ত আমাদের দশা কি হবে?

প্রথম লোক

রাজাকে এখন কে বোঝায় বল?

দ্বিতীয় লোক

কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে ভাই!

তৃতীয় লোক

দেখ্, এক কাজ করা যাক্, চ' আমাদের সহরতলীর মোড়লদার সঙ্গে একবার এ বিষয় পরামর্শ করা যাক্!

প্রথম লোক

চ' ভাই চ'।

দ্বিতীয় লোক

ঐ দেখ, রাজদেউড়ির চৌরাস্তার উপর কত ভীড়, সবাই যাচ্চে—রাজার মন যোগাতে পট এঁকে।

তৃতীয় লোক

ভাই, আমাদের পটে কাজ নেই, তার চেয়ে চট্‌পট্‌ ঘরে ফিরে যাওয়া যাক্‌।

দ্বিতীয় লোক

যা' ভাই, তুই বেজায় ঘরকুণো।

প্রথম লোক

ঐ যে শশাঙ্ক আসচে আমাদেরই খোঁজে।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

দ্বিতীয় লোক

কি হে শশাঙ্ক, তুমিও অঙ্কনশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য দেখাতে দরবারে ছুট্‌চো নাকি ভাই।

শশাঙ্ক

না ভাই, আমি যাচ্চি ঠিক্‌ বিপরীত কাজে। কর্ণরথ-পুরের বীরধড় সিংহের সঙ্গে আমাদের রাজার রাজনৈতিক কোনো অনৈক্য ঘটেচে। আমার উপর ভার পড়েচে সেটা মেটাতে, তাই দৌত্যগিরি করতে যাচ্চি।

প্রথম লোক

ভাই, ছিলে রাজ পেয়াদা, এখন হয়ে গেলে রাজদূত; শেষে না তোমাকেও ভূতে পায়, দাদা!

শশাঙ্ক

আরে ভাই, তাতে কি, পঞ্চভূতের এক ভূত ত আমাদের কোনোদিন-না-কোনোদিন হ'তেই হবে। তবে অদ্ভুত কিম্ভূত একটা কিছু না হলেই হ'ল।

প্রথম লোক

না, বলচি কি, আঁকা কবিতা লেখার বায়ুতে তোমায় না পেয়ে বসে!

শশাঙ্ক

আরে না দাদা! ঐ সব বায়ু সেবন আমার ধাতে নেই। ত্রেতাযুগে ছিল পবনের বেটা পবননন্দন, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাণ্ডটাও শেষ হয়ে গেছে!

প্রথম লোক

আরে সেই থেকে যেতে বলচি—চ'নারে, বেলা ব'য়ে যাচ্চে।

শশাঙ্ক

চ' ভাই চ'।

(সকলের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

ও কেন চুরি করে চায়,
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়॥
বনপথে ফুলের মালা হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥

(একদল বিদেশী লোক তল্পী-তল্পা নিয়ে রাজপথ দিয়ে চলে গেল। তাদের মূক অভিনয়, পোষাকের নানান বর্ণ বৈচিত্র্য।)

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চিত্রপ্রদর্শনীগৃহ।
রাজা, মন্ত্রী, রাজকুমার ও কয়েকজন চিত্রকর]

রাজা

(দেওয়ালে টাঙ্গানো চিত্রগুলি দেখতে দেখতে)

বিরূপাক্ষ, বলত এই সব শিল্পীরা লেখনী ও রঙ দিয়ে কি রচনা করেন?

বিরূপাক্ষ

হুজুর, শিল্পী শ্রীনাথকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতে পারবেন।

শ্রীনাথ

(নিকটে এসে প্রণাম ক'রে)

অন্নদাতা, শাকটক গাছের ডাল পচিয়ে ভিত্তিগাত্রে চিত্র আঁকতে হয়, আর কাঠবেড়ালীর লেজের তুলিতে সূক্ষ্ম পটচিত্র আঁকা হয়ে থাকে।

রাজা

আর বর্ণ ?

জীমূতনাথ

হুজুর, এলামাটি, লাজবর্ত্ত প্রস্তর, হরিয়ার প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা বর্ণ শিল্পীরা নিজেরাই তৈরী করে থাকেন।

রাজা

আচ্ছা চতুর্ভুজ, এখন শিল্পীদের কিছুকালের জন্যে অন্যত্র যেতে বলা হোক। আমরা চিত্র নির্ব্বাচন করব।

(চিত্রকরদের স্থানান্তরে প্রস্থান)

মন্ত্রী

হুজুর! এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহুদেশ বিদেশের শিল্পীরা তাঁদের চিত্রকলা পাঠিয়েচেন।

রাজা

তাই ত রুদ্রদমন! দেখচি নানা বর্ণভঙ্গী রেখাভঙ্গীর বৈচিত্র্যতে প্রদর্শনী গৃহ ভ'রে উঠেচে। যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি রেখার বৈচিত্র্য, ভাব বৈচিত্র্য, বর্ণ বৈচিত্র্য!

মন্ত্রী

এখন হুজুর, নির্ব্বাচন সুরু করা যাক।

রাজা

(দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলির নিকটে এসে)

হাঁ, এটি দেখচি বসন্তরাণীর প্রতিমূর্ত্তি। শিল্পী দেখাতে চান যে, ফুলসাজে ফুলের ডালা হাতে বাসন্তীদেবী যেন কার প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

চতুর্ভুজ

হুজুর, রেখাভঙ্গী ও বর্ণ চাতুর্য্য প্রশংসার যোগ্য!

রাজপুত্র

রাজন্! আমার কিন্তু এটা তত ভাল লাগ্‌চে না।

রাজা

(অপর একটি চিত্রের নিকটে গিয়ে)

দেখ, এটিতে আবার শিল্পী দেখাচ্চেন যে, নৃত্যারম্ভে বনদেবী বসন্ত আগমনে উৎসব করেচেন। বন-ফুলে বনের গাছপালা সব ভ'রে উঠেচে!

চতুর্ভুজ

হুকুম! এটির সজ্জা-সংস্থাপন খুবই উত্তম।

মন্ত্রী

হাঁ হুজুর! এর বনানীর গভীরতা যা' অল্প কয়েকটি গাছের গুঁড়ির রেখাপাতে দেখানো হয়েচে তাতে মনে হয় শিল্পী যথার্থই চক্ষুষ্মান্।

রাজা

কিন্তু দেখ, আমার মনে হয়, বসন্তকাল বলতে মনের ভিতর একটা যে ভাব আনে সেটা ত এসব চিত্রের ভিতর দেখতে পাচ্চিনে ?

চতুর্ভুজ

হুজুর, তা' সত্যি। বসন্তকাল বলতে কেবল বন বনানীর ফুলের শোভার কথাই ত আর শুধু মনে আসে না ?

মন্ত্রী

মানুষের মনে গোড়াতেই আসে যৌবন-উদ্বেল ভাব।

রাজা

আর তার আবেগ।

মন্ত্রী

হাঁ' হুজুর। তা' এগুলিতে তো তার কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্চে না!

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির নিকটে এসে নিরীক্ষণ ক'রে) এটি কি, এ যে একটি ধনীর গৃহে প্রমোদোৎসবের ছবি।

মন্ত্রী

হাঁ, এটিতে বসন্তকালের যৌবন-আবেগ দেখাচ্চে বটে, কিন্তু এটিতে প্রকৃতির বুকের যৌবন-চঞ্চলতা মোটেই ফোটেনি।

রাজা

(অপর একটি ছবির কাছে এসে) এ ছবিটি বস্তুতন্ত্রে ভরা, কেবল অঙ্গভঙ্গিমায় বসন্তকালকে জোর-জবরদস্তী ক'রে যেন হাজির ক'রেচে।

মন্ত্রী

(অপর একটি চিত্রের নিকট গিয়ে) একি ? এটি একটি দান বালিকা ফুটন্ত শিউলি ফুলের মত মাটির উপর প'ড়ে আছে; আর তার আশে পাশে ঘাসের ফুল হলুদ, নীল, সাদা—

কুমার

বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর!

রাজা

(নিকটে এগিয়ে এসে ভাল ক'রে দেখে) হাঁ, এটি খুবই ভাল, কিন্তু দেখা যাক্ আর যদি কিছু ভাল ছবি প্রদর্শনীতে থাকে। এটিতে একটি মোহর ক'রে দেওয়া হোক।

(মন্ত্রী ইঙ্গিত করা মাত্র প্রদর্শনীর কর্মচারী মোহরের সরঞ্জাম নিয়ে এসে একটি শীলমোহর ছবির কোণে ক'রে দিলেন)

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির মধ্যে শিল্পীর নাম পাঠ ক'রে) এ যে দাবাঁড়দেশের সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী অতীশনন্দনের আঁকা ছবি!

রাজা

(ভাল ক'রে দেখে) হ্যাঁ, এটিতে শিল্পী এঁকেচেন একটি তরুণ ও তরুণী নৌকায় ভেসে চলেচে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে; তরুণী নৌকার হাল ধ'রে আছেন, আর তরুণ বাঁশী বাজাচ্চেন।

মন্ত্রী

হুজুর, এটি নিরুদ্দেশ যাত্রীর ছবি—বসন্তকাল যে এদের চঞ্চল ক'রে তুলেচে তা' এই জলের ঢেউগুলি যেন ব'লে দিচ্চে!

কুমার

এই দেখুন রাজন্, এটি যেন ঠিক্ আমার বন্ধু রাতুলের বয়সী বালকের ছবি। কোনো কেল্লায় বন্দী আছে আর তার সাম্নে কেল্লার বাইরে একটি মুক্ত ঝরণা ঝ'রে পড়চে। বালকটি সেই মুক্ত ঝরণাটি দেখে যেন তার বন্দীজীবনেও মুক্তির আস্বাদ পাচ্চে!

রাজা

কিন্তু বসন্তকালের ভাব মোটেই ফোটেনি এটিতে।

মন্ত্রী

এই দেখুন হুজুর, এদিকে একটি ছবিতে শিল্পী শিব-পার্ব্বতীর মধ্যে দিয়ে বসন্তকালকে ফোটাতে চেয়েচেন।

রাজা

কিন্তু—একেবারেই ব্যর্থ হয়েচে।

কুমার

বাবা, কিন্তু হরপার্ব্বতীর ভাব কি সুন্দর হয়েচে!

রাজা

হাঁ, তা সত্যি, মন্ত্রী এ ছবিতে আমার মোহর দিয়ে দাও। আমি এটি চাই।

(কর্ম্মচারীকে ইঙ্গিত করাতে মোহর করণ)

কুমার

বাঃ, বাঃ, এটিতো বেশ! কেমন বনপথে ঘন সবুজ গাছ পালার ভিতর কেবল বনদেবীর মঞ্জুল চরণ-মঞ্জীর বেজে যাচ্চে। আর তাঁর পায়ের নূপুর, রঙ্গীন বসনাঞ্চল, বনপথের ছড়ানো ফুল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্চে না। আর সব ঢাকা পড়ে গেছে গাছপালার আড়ালে।

রাজা

হাঁ, একে বলে চিত্রের ব্যঞ্জনা। শিল্পীরা ভাব-ব্যঞ্জনা করতে হ'লে অনেক জিনিষ ইচ্ছা ক'রেই ঐ ভাবে প্রচ্ছন্ন রেখে থাকেন। সেইজন্যে নগ্নতাটা শিল্পকলা নয়। প্রসন্ন প্রচ্ছন্নতার ভিতর ভাব ফুট হয়; নগ্নতা কেবল উন্মুক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে, কিছুই ব্যক্ত করতে পারে না।

চতুর্ভুজ

(একটি ছবির নিকট গিয়ে)

হুজুর, এই একটি ছবিতে একটি শিশু হাতে ফুলবান নিয়ে যেন কাকে লক্ষ্য করচে।

রাজা

হাঁ, এটি বসন্ত দূত। কিন্তু বিদেশী ছাঁদে—

মন্ত্রী

আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কারগত ভাবের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, তাই আমাদের প্রাণে পৌঁছায় না।

রাজা

দেখ, দেখ, এ ছবিখানি কি সুন্দর!

মন্ত্রী

হাঁ, হুজুর ! এটিতে কেমন বসন্তসেনা অশ্বারোহণে চলেচে। অন্য তাদের নানা রঙিন সাজে সাজিয়ে নারী সেনার দলও চলেচে।

রাজা

দেখ, এটিকে বসন্তকালের ধ্বজপতাকা বলতে পার বটে, কিন্তু চিত্রকলা বলতে পার না।

চতুর্ভুজ

কেন হুজুর !

রাজা

দেখ, সংসারে দু'জাতের মানুষ আছে। এক জাতের যারা কাজ করে কিন্তু মুখে জাহির করে না ; আর একজাতের যারা কেবল মুখসর্ব্বস্ব। তবে মনবিৎ যিনি তিনি ঠিক্ খাঁটি মানুষকে খুঁজে নিতে পারেন। শিল্পকলায়ও ঠিক্ এইরূপ দুদিক আছে। এক ধরণের শিল্প দেখলে মনে হয় যেন সেটি চীৎকার ক'রে নিজেকে জাহির করচে, অপর ধরণের শিল্প নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন। এখানে শিল্পীর চেয়ে শিল্পের কথাই মনে আসে এবং অপর পক্ষে শিল্পের চেয়ে শিল্পীর কেরামতিই যেন দর্শককে করমর্দ্দন করতে উদ্যত। কেবল রসিক ও সমঝদারেরাই এর যাচাই করতে পারেন।

মন্ত্রী

ছবি ত অনেক দেখা হল হুজুর, কিন্তু—

রাজা

হাঁ, আমার মনের মতন এখনও একটিও চোখে পড়ল না।

কুমার

তাই ত বাবা, এই দুইশতরও অধিক চিত্রপটের মধ্যে একটিও কি তোমার ভাল লাগল না ?

দেখ, আমি চাই জহুরীর মত নিকষপাথরে ঘ'ষে মেজে নিতে। খাঁটি সোনা দেখে নিতে চাই, যাচাই ক'রে।

কুমার

শিল্পের যাচাই করার নিকষপাথর কি আছে বাবা ?

রাজা

তা নেই বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা সেটা লাভ করা যায়।

চতুর্ভুজ

যো হুকুম !

রাজা

কিন্তু তাই ব'লে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কতকটা সহানুভূতি ও ভাবানুভূতি থাকা দরকার।

চতুর্ভুজ

হুকুম !

রাজা

নইলে কেবল যাচাই করাই হয় ; রসগ্রহণ করার দিকে হয় শূন্যভাণ্ড !

চতুর্ভুজ

হুকুম !

কুমার

দেখ দেখ বাবা, ঐ মিস্‌মিসে কালো লোহার বর্ম্ম পোরে টক্‌টকে লাল কাপড় ও শিরস্ত্রাণ মাথায় তেজী ঘোড়সওয়ারের ছবিটি দেখ বাবা !

রাজা

(ছবি দেখে) তাই ত ! এতক্ষণ এমন একটি ছবি আমাদের চোখেই পড়েনি ? কি আশ্চর্য্য !

মন্ত্রী

মাপ করবেন অন্নদাতা ! এটিতে বসন্তকালের ব্যঞ্জনা মোটেই নেই !

রাজা

রুদ্রদমন ! বসন্তকালের ব্যঞ্জনা এতে নেই ?

মন্ত্রী

হুজুর ! এটিতো একটি ঘোড়সওয়ারের ছবি !

চতুর্ভুজ

হাঁ হুজুর, এটিতো একটি দাম্ভিক অশ্বারোহী সৈনিকের ছবিমাত্র !

রাজা

তাতে কি হয়েচে? ছবিখানিতে বসন্তদূত ভ্রমরের গুঞ্জন-ধ্বনি কি শুন্‌তে পাচ্চনা?

যুবরাজের গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুলজাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

মন্ত্রী

(মন্ত্রী ছবির নিকটে এসে ভাল ক'রে দেখে) তাই ত, কি আশ্চর্য্য। অশ্বারোহীর যৌবনদীপ্ত অশ্ব বসন্তকালের ফুলবন দলিত ক'রে চলেচে, তাই তার ক্ষুরের উপর ফুল-মধুর গন্ধ পেয়ে একটি ভ্রমর ক্রমাগত উড়ে উড়ে বসবার চেষ্টা করচে—যদিও তার সুযোগ সে পাচ্চে না।

রাজা

রুদ্রদমন, এই চিত্রকরকেই আমি জয়মাল্য পরাতে চাই।

মন্ত্রী

হুজুর! কিন্তু—এই শিল্পী বিদেশী।

রাজা

তা'তে ক্ষতি কি?

চতুর্ভুজ

হুজুর, দেশের শিল্পীরা তাহ'লে ভাব্‌বে যে তাদের প্রতি—

রাজা

শিল্পীর দেশ-বিচার জাতি বিচার করা চলে না। খোঁজ নাও এই চিত্রপটের রূপদক্ষটি কে!

চতুর্ভুজ

যো হুকুম অন্নদাতা!

রাজা

আজ তাকে আমার খাস-বৈঠকে নিয়ে এস।

চতুর্ভুজ

যো হুকুম!

রাজা

আজ তাহ'লে চল। আমার আবার আজ দেউড়ির দরশন-ঝরোখায় বিকেলে প্রজাদের আবেদন শোনবার দিন।

[রাজা, মন্ত্রী ও চিত্রাধ্যক্ষের প্রস্থান; প্রদর্শনীর কর্ম্মচারী তখন কতকগুলি তক্‌মা দেওয়ালে টাঙ্গাইলেন। একটি দ্বারদেশে টাঙ্গাইলেন "সর্ব্বসাধারণের জন্যে প্রদর্শনী খোলা রইল" এবং তাছাড়া "চিত্রপটে হাত দেবেন না", "ধূমপান নিষেধ", প্রভৃতি নানা তক্‌মায় প্রদর্শনী গৃহটি ছেয়ে ফেল্লেন। অম্‌নি দলে দলে সাধারণ লোকের প্রবেশ]

জনতার প্রথম লোক

এ কি? তুইও যে এসে জুটেচিস্?

দ্বিতীয় লোক

এই যে—বড় বড়াই করেছিলি না যে, রাজার এই খামখেয়ালীতে তুই যোগ দিবি নে?

তৃতীয় লোক

আরে ভাই, বক্ বক্ করিস নে,—দাঁড়া ছবিগুলো দেখতে দে!

প্রথম লোক

ছবি কবি কিছুরই ধার ধারবিনে বল্লি, আবার এখন আমায় শাসাচ্চিস্?

চতুর্থ লোক

আরে কি বেরসিকের পাল্লায় পড়লুম! ভজা, থাম্।

দ্বিতীয় লোক

ঐরে, পাওনাদার আহির ব্যাটাও এসে জুটেচে দেখচি—না, এই ত গা ঘেঁসে ছবি দেখচে, কৈ আমাদের দিকে লক্ষ্যই নেই তার।

তৃতীয় লোক

ও বাবাঃ দারোগা, চোপ্‌দার পাহারাওয়ালা সবাই এসে জুটেছে যে রে।

চতুর্থ লোক

আরে থাম্, থাম্, বক্‌বক করিসনে তোরা।

প্রথম লোক

তাই ত! এই রঙ বেরঙের পটের ভিতর এরা কি এত দেখচে? হাকিম হুকিমদেরও মুখবন্ধ!

চতুর্থ লোক

আরে মুখ্‌খু, ছবিতো আর কথা বলে না, তাই সবাই চুপ ক'রে সেটাকে দেখে।

প্রথম লোক

ওঃ তাই, তাই বলি আমাদের ও পাড়ার জগাই মোড়লকেও দেখচি, সেও একটি টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করচে না।

দ্বিতীয় লোক

হ্যাঁ, আশ্চর্য্য, যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চেঁচায় আর যার ভয়ে মোড়লটি ঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচায় তারও মুখে একটুও রা নেই গো!

তৃতীয় লোক

তাইত হ'ল কি?

চতুর্থ লোক

আরে, ভাই তোরা কজন বড় গোল বাধালি দেখচি। কোথায় ছবিগুলো দেখবি, না, চেঁচাচ্চিস কানের কাছে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক

হ্যাঁ, চেঁচাতে হয়তো বাইরে কাছারীর খোলা মাঠ প'ড়ে রয়েচে যা'না—

প্রথম লোক

তাইত, মহারাজ তিনটি ছবিতে শীলমোহর দিয়েচেন রে!

দ্বিতীয় লোক

হাঁরে, একটি গরীবের মেয়ের ছবি—

তৃতীয় লোক

একটি হরপার্ব্বতীর ছবি।

চতুর্থ লোক

আর একটি দেখচি—ঘোড়সওয়ারের ছবি।

দ্বিতীয় লোক

আরে, এই ঘোড়সওয়ারের ছবিতে জোড়ামোহর পড়েচে রে, জোড়ামোহর।

প্রথম লোক

তাই ত রে!

চতুর্থ লোক

তাহ'লে এই শিল্পীই রাজার সুনজরে পড়লো দেখচি।

(কয়েকটি শিল্পীর প্রবেশ)

শিল্পী জীমূতনাথ

ভাই দেখি, রাজার শিলমোহর কোন্ ছবিতে পড়েচে।

শিল্পী শ্রীনাথ

চল্ ভাই, চল্ দেখি গিয়ে।

শিল্পী অগ্নিহোত্র

হ্যাঁ ভাই, এই যে আমার ৫নংএর "দুর্দ্দিনের রসন্ত" ছবিটাতে মোহর পড়েচে!

শিল্পী শ্রীনাথ

ঐ দেখ, এ সেই সুবিখ্যাত দ্রাবীড় শিল্পী অতীশনন্দনের আঁকা ২৪নংএর হরপার্ব্বতীর ছবিটিতেও মোহর পড়েচে।

জীমূতনাথ

এটাতে আবার জোড়ামোহর পড়েচে যে হে?

অগ্নিহোত্র

তাইত, এই শিল্পীর নামও ত কখন শুনিনি!

শ্রীনাথ

(ভাল ক'রে চিত্রে শিল্পীর নামটি দেখে) ভাই, একি ভাষায় লেখা, প'ড়ে বুঝে উঠ্‌তে পারচিনে।

জীমূতনাথ

মনে হচ্চে,—কোনো দ্রাবীড় দেশের চিত্রকর।

শ্রীনাথ

না ভাই, হয়ত কলিঙ্গ দেশের।

অগ্নিহোত্র

না ভাই, বোধ হয় বঙ্গদেশের।

জীমূতনাথ

আর ভাই, ঐ যে মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই ঐ লোকটি ছবি দেখচে, ওকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক্।

(একটি তরুণ বঙ্গীয় যুবককে দর্শকদের ভিড় থেকে টেনে এনে) ভাই, তুমি ত বঙ্গদেশের লোক?

তরুণ

হাঁ৷ আমি পূর্ব্ববঙ্গের।

শ্রীনাথ

ভাই, তুমি এই ছবিটির আঁকিয়ের নাম প'ড়ে দিতে পার?

তরুণ

(ছবিটি দেখার ভাণ ক'রে ঈষৎ হেসে) হাঁ,—পারি।

জীমূতনাথ

নামটি পড়ত?

তরুণ

(লজ্জিত ভাবে) নাম—নাম—তা—

অগ্নিহোত্র

না, ভাই, প'ড়েই দাও না তুমি।

তরুণ

এই অধম শিল্পীর নাম ইন্দ্রধনু।

শ্রীনাথ

ইনি কি পূর্ব্ববঙ্গের, না পশ্চিমবঙ্গের।

তরুণ

তা—তা—আমি—

জীমূত

না ভাই, বল না?

তরুণ

কেন?

শ্রীনাথ

কেন? তুমি ছবিটি দেখে বুঝতে পারচ না? এতে অন্নদাতার ছুটো মোহর দেওয়া রয়েচে?

তরুণ

তাতে কি?

জীমূত

তাতে কি, তাও জান না?

তরুণ

কি?

অগ্নিহোত্র

ইনিই সেই সৌভাগ্যবান, যিনি মহারাজ কর্ত্তৃক আজ নির্ব্বাচিত হলেন রাজশিল্পী।

জীমূত

ইনিই জায়গীর খেলাৎ পাবেন।

অগ্নিহোত্র

তবে—তবে—

[এমন সময় দ্বারী প্রদর্শনী বন্ধ হবার ঘণ্টধ্বনি ক'রে জনতা প্রদর্শনী থেকে সরিয়ে দিলে]

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ]

মন্ত্রী

মহারাজ! রাঠোরের যুদ্ধের পর আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র ছুটি দরবার বসেচে। প্রজারা তাই—

রাজা

তা' কি করি বল? তোমরা তো রাঠোররাজের সঙ্গে সন্ধিসর্ত্তকায়েম করতে পারলে না, তাই যুদ্ধ শেষ হ'লেও আজ পর্য্যন্ত রাজ্যে শান্তি স্থাপন হ'ল না।

সেনাপতি

হুজুর! রাজকাজের চেয়ে রাজ্যরক্ষার কাজই এখন প্রবল হ'য়ে উঠেচে।

রাজা

কখনো যে আবার সেই আগেকার মত অবকাশ রাজকাজের মধ্যে পাব তা' তো বলতে পারিনে।

সেনাপতি

হুজুর! অবকাশের মধ্যে কি কোনো সুখ আছে?

রাজা

অবকাশের মধ্যেই সৃষ্টি হয়। রাজ্যশাসন কাজের চাপের মধ্যে হয় অনাসৃষ্টি।

সেনাপতি

তা' আশা করা যায় যে, বাণিজ্য সর্ত্তটার দলিল যদি রাঠোরের রাজা সই ক'রে দেন তো আগেকার মত পণ্য-দ্রব্যের আদান প্রদান ওঁদের সঙ্গে চলবে, ক্রমশঃ পুরোনো সখ্যতার পুনরুদ্ধার হ'বে।

রাজা

সুরথ! তাই যেন হয়। আমি আর এ বয়সে একমাথা ভাব্‌না একরাশ রাজ্যশাসনের মামুলি দস্তুর কাজ নিয়ে থাকতে পারচি নে! আমি চাই আবার আমার কলা সৃষ্টিতে মন দিতে।

সেনাপতি

হাঁ হুজুর! আপনার প্রতিষ্ঠিত নতুন মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদটি হিমগড় টিলার উপর সত্যিই যেন মেঘের প্রতিচ্ছন্দের মত দেখায়।

মন্ত্রী

তাতে বড় অপরূপ সেই গগন-লগ্ন কপোতকপোতীর ছবি দুটি।

সেনাপতি

রাজধানীটি আপনার অসাধারণ পরিকল্পনায় ক্রমে ক্রমে যেন ইন্দ্রপুরীর মতন গ'ড়ে উঠ্‌চে হুজুর।

রাজা

দেখ, এই সৃষ্টির আনন্দের আস্বাদ যে পেয়েচে তার আর যুদ্ধ বিগ্রহ গরমিল কিছুই ভাল লাগে না। সৃষ্টিই ছন্দ, ধ্বংসই গরমিল!

[এমন সময় চিত্রশালার অধ্যক্ষ, শিল্পী ইন্দ্রধনু ও পুঁথিখানার অধ্যক্ষের প্রবেশ]

সকলে

জয়, জয়, মহারাজ অন্নদাতার জয়!

রাজা

এস, তোমরা এস।

সেনাপতি ও মন্ত্রী

হুজুরের অনুমতি হয় ত—

রাজা

তা' বেশ, তোমরা যেতে পার। আমি একবার কাব্য ও কলার চর্চ্চায় মন দেবার চেষ্টা করি।

(কুর্ণিশ ক'রে মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রস্থান)

রাজা

(শিল্পীর প্রতি) চিত্রকর ইন্দ্রধনু, তোমার এ রাজে পাঁচ-সাত বৎসর বাস ক'রে মন লাগচে ত?

ইন্দ্রধনু

তা' অন্নদাতার আশীর্ব্বাদে আমার খুবই ভাল লাগচে।

রাজা

এমন নতুন ছবি বা ভাস্কর্য্য কি কিছু সৃষ্টি হয়েচে?

ইন্দ্রধনু

তা' হুজুরের হুকুম মত কাজ ত কিছু না কিছু ক'রে আস্‌চি।

রাজা

তা' বেশ, এখন তো অভিমান ভেঙেচে তোমার তোমার চিত্রকলার উপর আমার সংস্কার তোমার প প্রায় কুসংস্কার হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রধনু

হুজুর! আমার গুরুর আদেশে নিজের খেয়াল ম কাজ ক'রে এসেছি। রাজদরবারী রীতিনীতি ও রাজক পছন্দ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব ছিল।

বিরূপাক্ষ

হাঁ হুজুর! প্রথম প্রথম আমায় ইনি বলতেন মহারাজের অন্ন খাচ্চি ব'লে তাঁর কথামত আমার চিত্রক গড়তে হচ্চে,—আমি ক্রমশঃ স্বাধীনতা হারাচ্চি।

রাজা

ওহে, সংযমই ত স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষকে আ পায়ে বেড়ী পরায়।

বিরূপাক্ষ

হুজুর! আপনার কথাগুলি খুবই খাঁটি, তবে সাধা নয়; তাই আমাদের বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করে না।

রাজা

শিল্পী যে, সে একথার ভিতর সহজেই প্রবেশ করতে পারবে।

ইন্দ্রধনু

হুজুর! অন্নদাতার আদেশ হ'লে আমি নিজে নতুন কোনো একটি পরিকল্পনা দেখাতে চাই।

রাজা

তা' বেশ ত! একটি ছবি আমার ফরমাস মতই আঁক না। তবে আঁকার বিষয়টি বলবো মাত্র, আর কিছু ইঙ্গিত করবো না।

ইন্দ্রধনু

বেশ, হুজুরের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাজা

দেখ, এই পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেকার রাঠোরের লড়াইয়ের ঘটনা তোমার ত মনে আছে?

ইন্দ্রধনু

হুজুর, চোখের সাম্‌নে যেন জল্‌জ্যান্ত ভাস্‌চে।

রাজা

তাহ'লে শত্রু পক্ষায় সেনাপতি নরহরি শেষ যুদ্ধে কি ভাবে ঘোড়ায় চ'ড়ে পলায়ন করেছিলেন, সেইটি আমায় এঁকে দেখাও দেখি।

ইন্দ্রধনু

তা' বেশ, আদেশ হ'লে এখুনি এঁকে আন্‌তে পারি।

রাজা

বেশ, তুমি চিত্রশালা থেকে এঁকে নিয়ে এস।

(শিল্পীর নমস্কারান্তে প্রস্থান)

চতুর্ভুজ

রাজন্! এই শিল্পীর মাথা অসাধারণ।

বিরূপাক্ষ

হাঁ হুজুর, আমার অনেক পুঁথির পাতায় পাতায় সোনালী রূপালি ফুলকারি এঁকে রঙিয়ে দিয়েচেন।

রাজা

হাঁ, ইন্দ্রধনু যথার্থ শিল্পী বটে। তা ছাড়া আমি চিত্রাঙ্কনের বিষয়টি বলবামাত্র সে বুঝে নেয়। আমার চিত্রাগারের জীমূতনাথ, শ্রীনাথ এদের যদি বিশদ ক'রেও বোঝান যায় ত এমন সুচারুভাবে গ'ড়ে তুলতে পারে না। দেখ, আমার অনেকদিনের ইচ্ছা সিংহাসনটির সংস্কার করি।

চতুর্ভুজ

হুজুর, ওটি প্রাচীন আদর্শ অনুসারে,—

রাজা

ঐ ত তোমাদের ঘাড়ে শাস্ত্র, প্রাচীন শিল্প এমন ক'রে চেপে ব'সে আছে যে, তোমরা একপাও নড়তে চাও না।

বিরূপাক্ষ

হুজুর! কি ভাবে সিংহাসনটির সংস্কার করাতে চান দাস জানতে পারে কি?

রাজা

আমার ইচ্ছা, ইন্দ্রধনুকে দিয়ে দুটি নৃত্যরত কিন্নরীর ছবি এই সিংহাসনের দু'পাশে গড়িয়ে নি।

বিরূপাক্ষ

হা হুজুর, তা' খুব ভালই হবে।

চতুর্ভুজ

না, হুজুর অপরাধ যদি না নেন ত—

রাজা

তুমি কি বলবে তা আমি জানি। তুমি বলবে ওটা ইরাণী ঢঙ হয়ে যাবে,—না?

চতুর্ভুজ

হুজুর, যেরূপ ইরাণী সাম্রাজ্যের আওতায় আছি তা'তে ত সব নিজস্ব যাচ্চে; যদি আমরা একটু প্রাচীনপন্থী হই তাতে ক্ষতি কি?

রাজা

তা' সে যুক্তি মন্দ নয়। তবে কিনা ইরাণী, তুর্কি, চীনে বা পাশ্চাত্যকলার সঙ্গেও ত বোঝাপড়া হওয়া চাই?

বিরূপাক্ষ

তা সত্যি!

চতুর্ভুজ

মহারাজ! মানুষের মহামিলনের মন্ত্র নানা দেশে শিল্প-বৈচিত্র্যই ঘোষণা করচে। এ বৈচিত্র্য দ্বন্দ্ব নয়, আনন্দ; আনন্দের প্রকাশ পরস্পরের নকল ক'রে হয় না।

রাজা

নকল আমি করতে বলি না, আমি বলি গ্রহণ করতে।

চতুর্ভুজ

মাপ করবেন হুজুর! ছেলেবেলার সাথী ছিলুম ব'লে মহারাজের সামনে প্রগল্‌ভতা দেখালুম—মাপ করবেন।

রাজা

না, আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝতে পেরেচি, তুমি চাও শিল্পীর স্বাধীনতা। আমি চাই তাদের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন ক'রে সুসংযত ক'রে তুলতে।

বিরূপাক্ষ

হুজুরের মহতী ইচ্ছা!

রাজা

আমি চাই যে, এবারকার সালগিরার দরবারের সিংহাসনটি আমার সভা শিল্পীর গড়া মূর্ত্তিতে সজ্জিত হয়ে উঠে!

বিরূপাক্ষ ও চতুর্ভুজ

যো হুকুম!

(বিরূপাক্ষ ও চতুর্ভুজ প্রণামান্তে প্রস্থান)

চারণের গান

মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশী সূর্য্য মরে লাজে॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া,
মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।
একি পুলক বেদনা বহিছে মধু বায়ে!
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দরবারের দৃশ্য; সিংহাসনটি একটি স্বতন্ত্র পর্দ্দার আড়ালে ঢাকা। চিত্রকর ইন্দ্রধনু, পুঁথিখানার অধ্যক্ষ, চিত্রাগারের অধ্যক্ষ, অমাত্য ও সভাসদ্‌বৃন্দ যথাস্থানে উপবিষ্ট]

ইন্দ্রধনু

(বিরূপাক্ষের প্রতি) পণ্ডিতজী! আমার এই পদমর্য্যাদায় আমি অমর্য্যাদাও কম পাই না।

বিরূপাক্ষ

কেন?

ইন্দ্রধনু

আমাকে আমার সাথী শিল্পীদের অনেক গঞ্জনা ও ভর্ৎসনাও শুনতে হয়, আবার অপ্রত্যাশিত উপদেশও অনেক লাভ করতে হয়।

বিরূপাক্ষ

কি রকম?

ইন্দ্রধনু

কেউ বলেন অত বাড় ভাল নয়, কেউ আবার কৃপার চক্ষে দেখেন।

বিরূপাক্ষ

তাতে তোমার চিত্তবিক্ষেপ হয় না?

ইন্দ্রধনু

তা' আর কি করি,—আমায় সবই সহ্য করতে হয়।

[এমন সময় সভায় একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখে সভায় সরগোল প'ড়ে গেল]

সভাসদগণ

এঁ্যা, শিরস্ত্রাণ নাপ'রে দরবারে কে প্রবেশ করলে হে?

বৃদ্ধ

(মৃদু হাস্য ক'রে) আমি বঙ্গদেশের লোক! বহুযোজন পথ হেঁটে এসেছি, এরাজ্যে সিংহাসনের দুটি নূতন পরীমূর্ত্তি দেখবার জন্যে।

একজন সভাসদ

তোমার দরবার প্রবেশের ছাড়পাত্র আছে?

মন্ত্রী

হাঁ, এঁকে আমিই প্রবেশাধিকার দিয়েচি। বিদেশী বৃদ্ধ—

[বৃদ্ধের সভায় উপবেশন]

ইন্দ্রধনু

(দূর থেকে বৃদ্ধকে দেখে জনান্তিকে)

এঁকে যেন মনে হচ্ছে চিনি, কিন্তু—

চতুর্ভুজ

কেন? তুমি ঐ লোকটিকে দেখে এত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

ইন্দ্রধনু

হ্যাঁ, কেন তা ঠিক বলতে পারচিনে।

চতুর্ভুজ

বোধ হয়, দেশের লোককে বহুকাল পরে এখানে দেখতে পেয়ে—

ইন্দ্রধনু

তা' হবে।

(অন্তরাল থেকে চারণদের গান)

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে,
কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ-রণ শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে;
ধরণী ধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে
প্রণত-চিত্ত সাজে, বিশ্বশোভায় লুটায়ে
প্রেমে প্রেমে সাজে॥

(চারণের প্রবেশ) মহারাজ সভায় আসচেন।

[ঘণ্টাধ্বনি হ'তেই সিংহাসনের সামনের পর্দা খুলে গেল, মহারাজ সিংহাসনারূঢ় হ'য়ে ব'সে আছেন। আসনের দুপাশে দুটি নগ্ন কিন্নরী মূর্ত্তি। সভাসদগণ "জয় জয়, রাজরাজেন্দ্রের জয়" ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। রাজা সভাশিল্পীকে অন্তরালে যেতে ইঙ্গিত করবামাত্র সভা শিল্পীর প্রস্থান]

রাজা

আজ এই সুধীসমাজে আমার সভাশিল্পীকে আমি যাচাই ক'রে নিতে চাই।

সভাসদগণ

হুজুর অন্নদাতার যা' আজ্ঞা হয়।

রাজা

(সিংহাসনের পাশের দুটি মূর্ত্তিকে দেখিয়ে)

জানতে চাই যে, এই দুটি মূর্ত্তির বিরুদ্ধে কার কি বলবার আছে, আমার কাছে তিনি এগিয়ে আসুন।

সভাসদগণ

হুজুর, আপনার উপদেশে আপনার পরিকল্পনা যোগে যে চারুশিল্প গ'ড়ে উঠেচে তার বিচার আর দরবারে কেন?

রাজা

আমি চাই, আমার এই দরবারেই প্রজাদের সামনেই আমার শিল্পীর পরখ হয়।

[এমন সময় সভা থেকে বৃদ্ধ লোকটিকে উঠে চ'লে যেতে দেখে]

মন্ত্রী

মহারাজ! ঐ যে বঙ্গদেশের আগন্তুক বৃদ্ধটি ফিরে চ'লে যাচ্চেন, ওঁকে ডাকা হোক্।

রাজা

তা বেশ, তাহ'লে ঐপ্রাচীন বঙ্গীয় বৃদ্ধকে আমার সামনে আনা হোক্।

বৃদ্ধ

(রাজার নিকটে এসে কুর্ণিশ ক'রে) হুজুর! আমি বুড়ো মানুষ চোখ দুর্ব্বল, মনও সবল নয়। আমার বিচারের উপর নির্ভর করবেন না হুজুর! আমায় যেতে দিন।

রাজা

কেন? তোমায় এর বিচার করতেই হবে।

বৃদ্ধ

হুজুর! আমিও বঙ্গদেশবাসী, আপনার শিল্পীও—

একজন সভাসদ

অতএব যদি পক্ষপাতিত্ব দেখান।

সভাসদগণ

হাঁ, হুজুর! তার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

মন্ত্রী

মহারাজের যা' ইচ্ছা তাই করা হোক।

সভাসদগণ

অন্নদাতা যা' ভাল বোঝেন তাই হোক।

রাজা

না, বঙ্গবাসী, তোমায় আমরা আজ চাই তোমাদের দেশের শিল্পীকে যাচাই করতে।

বঙ্গবাসী

হুজুর, আমি সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেন চ'লে যাচ্ছিলুম তা থেকে কি আপনি—

রাজা

না।

বঙ্গবাসী

অপ্রিয় সত্য বলা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ!

মন্ত্রী

কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ-আদেশ।

বঙ্গবাসী

তা, ঠিক্, কিন্তু—

বৃদ্ধ

আমি চাই সেই শিল্পীকে দেখতে। আমি তার এই শিল্পকলার পক্ষপাতী নই।

সভাসদগণ

তুমি তার শিল্পকলার পক্ষপাতী নও, অথচ শিল্পীকে দেখতে চাও!

বৃদ্ধ

হাঁ, দেশমাতৃকবোধের দরুণ;

[বৃদ্ধ তাঁর জীর্ণ জামার ভিতর থেকে একটি চিত্রপট বার ক'রে রাজার হাতে দিলেন। রাজা ইন্দ্রধনুকে সভায় আনতে হুকুম করলেন। ইন্দ্রধনু সভায় এসে বৃদ্ধকে দেখেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন]

ইন্দ্রধনু

গুরু! গুরু! আজ দ্বাদশ বৎসর পরে আপনার চরণ দর্শন করলুম।

বৃদ্ধ

হাঁ বৎস! মহারাজের কল্যাণে তোমার শিল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথা আজ বঙ্গ কলিঙ্গ ছেয়ে গেছে। তাই আমি আজ দেখতে এসেছি সিংহাসনকে অলঙ্কৃত ক'রে কী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দুটি তুমি সৃষ্টি করেচ যার নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে গেছে।

ইন্দ্রধনু

সে আপনার শিক্ষা—

বৃদ্ধ

দেখ কবীর বলেচেন:—

গৃহী তাজিকে ভয়ে উদাসী—
বনখণ্ড তপ্‌কো যায়।
চোলি থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায়॥

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্যে গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া এত করিয়া শেষে বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী কুল। (রাজার প্রতি) রাজন্! আপনি এঁকে রাজশিল্পী করেচেন বটে, কিন্তু শিল্পরাজ ক'রে তুলতে পারেন নি।

ইন্দ্রধনু

গুরু, রাজাদেশ মানা এতদিন অভ্যাস করেচি, ভাবের রাজ্যে মনের আদেশ মেনে চলা হয়নি, তাই এই দশা।

বৃদ্ধ

শিল্পী ভাবরাজ্যের রাজা। রাজা সাম্রাজ্যের অধিপতি; রাজার কাছে ভাব বিকিয়ে দিলে ধনীর পণ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে বটে, শিল্প হতে পারে না।

চতুর্ভুজ

কেন? মহারাজের মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের মূর্ত্তি দুটি—

(সভাসদগণ একসঙ্গে)

প্রথম সভাসদ

কেন? আমাদের সহরপ্রাকার ও তোরণের ময়ূরের ছবি—

দ্বিতীয় সভাসদ

রাজ আদেশে কি না হয়েচে।

তৃতীয় সভাসদ

হাঁ, আমাদের সহরের শ্রী ফিরে গেছে।

চতুর্থ সভাসদ

হুজুরের কল্পনাশক্তির উপর কলম চালায় কার সাধ্য।

পঞ্চম সভাসদ

আমাদের চিত্রাগারের কত শিল্পী স্থপতি রাজ অনুগ্রহে আজ খ্যাতিলাভ করেচে।

(রাজা এতক্ষণ নীরবে বৃদ্ধের দেওয়া ছবিখানি ভাল ক'রে দেখছিলেন)

রাজা

শিল্পাচার্য্য! আজ আমার চোখ খুলে গেছে! আমি শিল্পীদের আর শিকল পরাতে চাই নে।

ইন্দ্রধনু

গুরু! আজ আমার সব অহঙ্কার গুঁড়ো হয়ে গেল।

সভাসদগণ

জয়, মহারাজাধিরাজের জয়! জয়, বঙ্গীয় শিল্পাচার্য্যের জয়! জয়, সভাশিল্পী—ইন্দ্রধনুর জয়!

(চারণের গান একতারা হাতে)

একমনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম —
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥
যেখানে তোর সীমা সেথায়
আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সে কড়ি তুই নিসরে হেসে।

লোকের কথা নিসনে কানে,
ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা।
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বলা বাহুল্য এই নাটিকার গানগুলি সবই পূজনীয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত।

শেষের কবিতা

শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু এম-এ

১

শেষের কবিতার একটা শেষের কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়ার কথা।

অমিত বলছে যতিশঙ্করকে—"দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি হয়ত সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা ব'লে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে।... একের কথার ওপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়।" এই ব'লে অমিত এক রূপকের সাহায্যে তার কথা বোঝাতে যায়।

অমিতর কথাগুলি প'ড়ে সহসা মনে হয় আমরাও তাহ'লে সারা "শেষের কবিতা" খানিকে একটা রূপক ব'লে নিতে পারি যার অনন্যপূর্ব্ব ভাবভঙ্গীর মধ্যে হয়ত পাঠকমন পরিমাপ করবার একটা গোপন ব্যারমিটার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে; অর্থাৎ এই উপন্যাসের যা কিছু বিশেষত্ব সেটা যদি কেউ সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে তাহ'লে আপনা হ'তেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে, অন্যের কথাও তার নিজের হ'তে পেরেছে; "রবিঠাকুরের কবিতা" তাহ'লে কবিতাই; "বুড়ো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নকল ক'রে ভদ্রলোক অন্যায় রকম বেঁচে" নেই।

সন্দেহ আরো বাড়ে এই সকল কথাতে—"কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নি-পরীক্ষায়—যে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সে আগুন সে যাচাই করবে কি দিয়ে; তাকে পাঁচ-জনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ে সেটা দুর্ম্মুখের কথা।" ফলে "যা আমার ভাল লাগে তাই আর একজনের ভাল লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।" দ্বিতীয়ত, যার প্রকাশ করবার শক্তি আছে তার বারে বারে ভাল লাগলে, সে বারেবারেই প্রকাশ করবে। ভাল লাগার প্রকৃতিই এই। এতে নতুন পুরানো নেই। তাই নিবারণ চক্রবর্ত্তী কোন দিনই নিজের কাছে পুরানো হ'য়ে যায় না। "ও প্রত্যেক বারই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা।" এই সহজ কথাটা "লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না ব'লেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতো। আজ পাখীকে নতুন ক'রে জানছি একথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্চে এই যে, আজ সমস্তই নতুন ক'রে জান্‌ছি, নিজেকেও......আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরানো...... চিরকালের জিনিষ নতুন ক'রে আবিষ্কার।" সেই জন্যেই তো একই কবিতা নিবারণ চক্রবর্ত্তী, ডন্‌, রবিঠাকুর আর শোভনলালের খাতায় এক সঙ্গে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ লিখেছে কি ও লিখেছে "এই ভেদজ্ঞানটা মায়া হ'য়ে দাঁড়ায়"। প্রত্যেকেই অন্যকে দেখিয়ে বলে "এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখ্‌তে পেয়েছি"। অতএব যখন "পরের কথাকে নিজের কথা ক'রে তুলি" তখন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই খুঁজে পাই না, বড় জোর মনে হয় যে "কথা নিয়ে সুর নিয়ে" দেবতা যখন নেমে আসেন তখন "পথের মধ্যে মানুষ ভুল করেন, খানকা আর কাউকে দিয়ে বসেন, হয়ত তোমাদের ঐ রবিঠাকুরকে"।

মোট কথা, তাই বুঝি বারে বারে মনে হয় যে, শেষের কবিতার রূপেও এই রূপকই সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান। কেবল দেখ্‌তে ইচ্ছে করে এর সত্য অন্যের সত্য হয় কিনা। মনে মনে ভাবি অমিত লাবণ্যর অভিজ্ঞতা কতজনের অনুভূতিকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে? এটা বুঝি যে, তাদের জীবনের হয় সমস্তটাই সমাদরে গৃহীত হবে, নয় কেউ তাদের মুখ দর্শনও করবে না। তাদের জীবন যে পথে চলেছিল তাতে তো ভাল মন্দর কোন মধ্যপথ ছিল না। তাই আজ তারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খুব স্পর্দ্ধার সঙ্গে—একটা চ্যালেঞ্জের মতন।

কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের স্বরূপ নির্ণয় করতে হ'লে রূপক নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে ভয় পাই। অমিত সাবধান ক'রে দিয়েছে যে তা করলে "এ সব কথার রূপ চ'লে যায়, কথাগুলো লজ্জিত হ'য়ে ওঠে"। তাই ও পথ নয়—রূপকে খণ্ডিত করবো না। "বেনারসী ওড়নার ঘোমটা" তুলে বধূকে লজ্জিত করবো না। বর্ত্তমানে কেবল বেনারসীর ঘোমটা আছে কিনা তাই দেখ্‌লেই হবে। থাকলে আপনিই বুঝবো যে, এর ভেতর "বধূর মুখ আছে", নাচওয়ালী হ'লে তো "বারোয়ারী তাঁবুর কানাত" হ'ত। শেষের কবিতার রূপ থেকেই ওর চ্যালেঞ্জ আরম্ভ।

২

অমিতর ভাষায় বলতে গেলে এ রূপের প্রকৃতি তারই যৌবনের মতন "নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবী, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে"। আমি শেষের কবিতার ষ্টাইলের কথা বলছি।

রূপেরও একটা বাইরের সজ্জা বা ভঙ্গী থাকে, যেহেতু form আর styleএর মধ্যে অনায়াসে একটু প্রভেদ করা চলে। রূপ বা form কথাটা একটু ব্যাপক; ভঙ্গী, style বা ধরণ একটু সংকীর্ণ। form অনুভব করবার; styleটা যেন অনেকটা চোখে দেখবার।

অমিতর মতন শেষের কবিতার প্রথম বিশেষত্ব এই ষ্টাইলে। অমিতর মতন এর "ঠাট ঠমক"টা আমাদেরও "চোখে খুব লেগেছে"। এ চমকের অবস্থিতি কোথায় প্রথমে তাই দেখবো।

এক কথায়, এর অবস্থিতি উপন্যাস রচনার কতকগুলি প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে। উদাহরণত এই উপন্যাস সম্বন্ধে সনাতন শাস্ত্রপুষ্ট পাঠকমনের কাছে এই ধরণের কতকগুলি আপত্তি কল্পনা করতে পারি:—

এ কোন্ শ্রেণীর গল্প? শেষ পর্য্যন্ত অমিত লাবণ্যর বিয়ে টুকু না হওয়ায় এমন কি ওরিজিন্যালিটির পরিচয় আছে? কুমু আর মধুসূদনের বেলায় যে ভুল হয়েছিল তারই প্রয়াশ্চিত্ত নাকি? এতো গেল গল্প বা প্লটের কথা। তারপর দেখুন চরিত্র—নায়ক অমিতর চরিত্র আঁকবার এ কোন্ নতুন পদ্ধতি? চরিত্র সৃষ্টির বাঁধা রাস্তা তো এই যে, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রের বিকাশ আর স্ফূর্ত্তি হবে। এখানে তার কি আছে? প্রথমেই "অমিত চরিত" ব'লে একটি বিশিষ্ট পরিচ্ছেদের অবতারণা। তাতে তার সম্বন্ধে যত কিছু উল্টো পাল্টা ক'রে ব'লে—কখনো তার বেশভূষার উল্লেখ ক'রে, কখনো লিলি গাঙ্গুলীর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের ছায়ায় ফ্লার্ট করিয়ে, কখন রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সভায় দাঁড় করিয়ে—এই রকম নানারকম কতকগুলো নমুনার মতন খাপছাড়া ঘটনার উল্লেখ ক'রে তার চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। তার পরে আসে "সংঘাত"—সে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এ রকমে যে পূর্ব্ব ধারণা সমস্ত এলোমেলো হয়ে যায়। বর্ণনাভঙ্গীতেই বা কি দেখি? আগাগোড়া অমন একটা বক্র পরিহাসের সুর কেন? যাকে ভাল বলছি তাকেও যেন জান্‌তে দিচ্ছি না, পাছে মনের ভাব ধরা পড়ে; কিম্বা কাকে ভালো বলছি কাকে মন্দ বলছি তার ঠিকই নেই; ঠিক আছে কেবল আমোদপ্রিয়তার, "নির্জ্জলা যৌবনের" জীবনের বৈচিত্র্যকে মনোহর ক'রে দেখার, উপভোগ করবার; বিচার করবার নয়। তাই যেন লেখক "গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারে না; কৌতুকপ্রিয়তা ওর যেন একটা উদ্দেশ্যহীন "মুদ্রা দোষ"। এই চাপল্যের বশেই যেন কোথাও কোথাও সোজা কথাগুলো ইচ্ছে ক'রেই একটু বেঁকিয়ে আড়ষ্টভাবে বলা হয়েছে, সহজকে শক্ত করবার, অন্যের মনে তাক্ লাগাবার দুষ্ট লোভে! স্থানে স্থানে গম্ভীর ঘন যেটা সেটাকে লঘু তরল ক'রে দেওয়া হয়েছে সেই জন্যেই। কোথায় গঙ্গার দুই পারে দুই মহল—মানসী আর দীপক, কোথায় পঁচাত্তর টাকায় ভাড়া নেওয়া কলকাতার একটা ছোট বাড়ীর ঘরের দুই কোণে সেই দুই মহলের প্রতিষ্ঠা! এ সকল ছাড়াও বর্ণনাতে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন খামখেয়ালী অস্বাভাবিকতা কত রকম। লাবণ্যর গলার স্বরের সঙ্গে অম্বুরী তামাকের তুলনা দিয়েই শেষ হ'ল না, নোটবুক বার ক'রে সেটুকু অমিতকে লিখে রাখতে হোলো, অথচ এমন মূর্খ কে আছে

যে বোঝে না যে, ও নোটবুক অমিতর মনেতেই, 'কেবল বলবার জন্যেই কথাটা ওভাবে বলা। অমিতর সব দোষ-গুণগুলোই দেখি ওর জীবনচরিতকারেরও ঘাড়ে ভর করেছে! আরো দেখুন, কথাবার্ত্তা চালানতেই বা কি রকম অস্বাভাবিকতা। দেখা হ'ল কি না হ'ল অমনি এমন আলাপ জ'মে ওঠে যেন কতদিনের ঘনিষ্ঠতা। মোটরে মোটরে লড়িয়ে অমিত হয়ত বল্লে "অপরাধ করেছি"। মেয়েটি যেন কথা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, কলের মতন ব'লে গেল, "অপরাধ নয় ভুল। সে ভুলের সুরু আমার থেকেই।" এতটা সপ্রতিভ তৎপরতা কি উপন্যাসেও সম্ভব? তারপর সব রইল প'ড়ে, আরম্ভ হ'ল পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের চাক্‌চাতুর্য্য বা battle of wits—একেবারে চায়ের নিমন্ত্রণে শেষ। সুরু হবার আধঘণ্টার মধ্যেই গল্পটা গেল মধ্যপথে এগিয়ে—কোথায় গেল সময়ের ঐক্য বা unity of time! চক্ষুপীড়ার তো শেষ নেই, তাই আবার স্থানে স্থানে ইংরাজী বাঙলা মেশা অদ্ভুত ভাষা চোখে পড়ে; "আলাপিতা", "হ্রস্ব অধোবাস" প্রভৃতি উদ্ভট শব্দ সৃষ্টিই কত। কিন্তু সব ছাড়িয়ে যা চোখে পড়ে সে একেবারেই অসহ্য। কেটি হ'লে বলতো, বাগ্‌দেবীর কাছে কবি "আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখে নি।" নইলে গল্প লিখতে গিয়ে অত আমিত্ব কেন—"অমিতকে আমি পছন্দ করি"; "আমার লেখার ঠাটঠমক"; "আমার বিশ্বাস আমার লেখার ষ্টাইল আছে"; "আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ"; "আমার স্ত্রী স্বয়ং ওর সহোদরা"। কে তুমি? শুধু তাই নয়। নিজের লেখা কবিতা চরিত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে, নিজেকে গল্পের বিষয় বস্তুর আলোচ্য অন্তর্ভুক্ত করে, এ কি রকম অভিনবত্ব? সম্প্রতি দুই একজন বড় বিলাতী ঔপন্যাসিক তাঁদের লেখায় বড় জোর সমসাময়িক দু' একজন সুপরিচিত লোকের স্পষ্ট বা ইঙ্গিতে উল্লেখ ক'রে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু এ যে তার চেয়েও নতুন একটা কিছু। এ কি উপন্যাস রচনা, না যথেচ্ছাচার?

সকল আপত্তির উত্তর দিতে ইচ্ছে যায় এই কথা বলে যে, অমিতর পোষাকের মতন এ উপন্যাসের বাহ্য রূপও হয়ত "একরকমের উচ্চ হাসি"। উপন্যাস লেখার প্রচলিত ফ্যাসানকে বিদ্রূপ করবার সখ হয়ত এর অপর্য্যাপ্ত। আর সে সখ বোধ হয় এতই দুর্দ্ধর্ষ যে, লেখক যখন ষ্টাইলের দাবী করে আমরা সে দাবী নত মস্তকে স্বীকার করি।

কিন্তু এ উত্তর হয়ত সম্পূর্ণ না হ'তে পারে এবং হলেও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হবে না। আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, মাত্র রহস্যপ্রবৃত্তিই কি মানুষের দীর্ঘকালের ধারণা আর সংস্কারকে বিচলিত করবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি? যেমন Moliere এর L'ecole de Maris নাটকে Ariste বলেছিল—"I hold that it is wrong, no matter what opinion one holds, to turn obstinately from public opinion; it is better to be numbered amongst fools than to be the only wise person and therefore opposed to all others."

এর উত্তরেও সেই নাটকের Sganarelle এর কথাই উল্লেখ করতুম যে, "He who does not like my dress has but to close his eyes," কিম্বা অমিতকে দিয়ে বলাতুম যে, "হাটের লোকের পায়ে চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না ব'লেই আমাদের দেশে ষ্টাইলের এত অনাদর।" কিন্তু অল্প কথায় সংক্ষেপ উত্তরের বিপদ আছে। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা গুণের চেয়ে পরিমাণটা ভাল বুঝি, তাই আয়তনে যেটা স্বল্প, যুক্তিতেও সেটা অসার ব'লে বোধ হয়। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি সাধারণের অবিশ্বাসের একটা কারণই বুঝি এই যে, ওর ওষুধের গুলিগুলো অত ছোট। অমন ছোট, সুগোল, সুশ্রী শাদা, তার ওপর আবার মিষ্ট, ওষুধে কি অসুখ সারতে পারে? অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধের এ্যালোপ্যাথী যদি কটু এবং বিরক্তিকর হয় তাহ'লে হয়ত সেটা ক্ষমাই হ'তে পারে।

শেষের কবিতার ষ্টাইলের উচ্চহাসি যথেচ্ছাচার নয়। নিছক গায়ের জোরের স্থান আর্টে কমই। বলতে চাই এই যে, সকল শ্রেষ্ঠ আর্টের মতনই শেষের কবিতার ষ্টাইলও তার স্বতঃ-প্রকাশিত রূপ রসের সঙ্গে দৃঢ়সম্বদ্ধ। ওর ষ্টাইল থেকেই ওর ভেতরকার সংবাদ পাই। অতএব এ কোন

ক্যাটালগ থেকে বিশেষভাবে নির্ব্বাচন করা ষ্টাইল নয়। শেষের কবিতার ষ্টাইল তার ভাববস্তুর নিতান্ত স্বাভাবিক পরিচ্ছদ। কথাটা পরীক্ষা করতে হ'লে এই ষ্টাইলের আর একটু বিশদ আলোচনা করতে হয়।

৩

এ ষ্টাইলের বিশেষত্ব কি? অর্থাৎ কিছু পূর্ব্বে যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করেছি সেগুলির সম্মিলিত প্রভাব কি? এক কথায় বলতে পারি Artificiality বা কৃত্রিমতা। এই কৃত্রিমতা প্রসঙ্গই হ'ল শেষের কবিতার রূপরসের অনন্যপূর্ব্বতাসম্বন্ধে মূল কথা। ইতিমধ্যে রূপ আর ষ্টাইলে যে প্রভেদ করেছি সেই অনুসারে দেখাতে চেষ্টা করবো যে, শেষের কবিতার ষ্টাইল বা ভঙ্গীর কৃত্রিমতা এর Form বা রূপের মূর্ত্তিময়তারই (objectivity) বাহ্য পরিচয়, আর এর রূপ এত মূর্ত্তিময় হওয়ার জন্যে এর Theme বা বিষয়বস্তুর স্বরূপই দায়ী। আমাকে তাই পরপর দেখাতে হ'বে যে, শেষের কবিতার ষ্টাইলে এর রূপের নির্দ্দেশ কোথায়; দ্বিতীয়ত, এর রূপের বৈশিষ্ট্যই বা কি এবং সে বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত।

৪

প্রথমে তাই ভঙ্গীর কথা। বলেছি যে এ ভঙ্গী Artificial বা কৃত্রিম। Artificiality বলতে কি বুঝি? ব্যাপকভাবে বলা যায় আমাদের অভিজ্ঞতার ন্যায়শৃঙ্খলার মধ্যে যার প্রতিধ্বনি নেই, বিচারে যার প্রত্যাশা নেই, তাই artificial, কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক। স্থান বিশেষে এই ব্যাপক অর্থ নানা রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে। আঠারো শতাব্দীর ইংরাজী নাটককে ল্যাম্ব "artificial" বলেছিলেন কেননা তাঁর মতে ঘটনাবিন্যাসের দিক থেকে সে নাটক খুব যুগধর্ম্মী বা বাস্তব হ'লেও, প্রায়ই মিথ্যা ভাবের (false to sentiments) ব্যঞ্জক হ'ত। তেমনি, ভাব সত্য হ'লেও যদি রূপ কল্পিত হয় তাকেও কৃত্রিম বলতে পারি। তখন সে সৃষ্টিকে ঔৎকর্ষ্য হিসাবে উদ্ভট (grotesque), অস্বাভাবিক (unnatural) থেকে আরম্ভ ক'রে কল্পপন্থী (romantic), আদর্শপন্থী (idealistic) পর্য্যন্ত যে কোন নামে অভিহিত করতে পারি। ভাব আর রূপের সামঞ্জস্যের অভাবেও কৃত্রিমতা দোষ ঘটতে পারে। তখন লক্ষ্য করি অত্যুক্তি (exaggeration), অতিরঞ্জন (false emphasis), ভাবালুতা (sentimentalism), lingering on details কিম্বা হয়ত সরাসরি tour de force। তেমনি একেবারে নতুন যেটা, একটু unusual, সেটাও পূর্ব্বপরিচয়ের অভাবে artificial ব'লে মনে হ'তে পারে। অপূর্ব্ব মনে হয় অদ্ভুত। শেষত, যেটা একটু চটকদার (striking), কিম্বা একটু আড়ষ্ট (studied), একটু বেশী মার্জ্জিত (overfinished), একটু যেন রাত্রি জেগে লেখা ব'লে মনে হয়, তার চারিদিকেও যেন একটু কৃত্রিমতার গন্ধ লেগে থাকে। শেষের কবিতার কৃত্রিমতা এর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর সেটা বিচার করবার ভার পাঠককে দিলুম।

আমাদের বক্তব্য এই যে, শেষের কবিতার কৃত্রিমতা যে ভাবেরই হোক উপরের পরিচয় থেকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, আর্টের পদ্ধতিতে ষ্টাইলের কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতা মাত্রেই একটা দোষ। স্বাভাবিককে শুধু শুধু অস্বাভাবিক করতে যাব কেন? অনর্থক চিত্তচমৎকারের মূল্য কি এতই বেশী যে তাতে সত্যের অপলাপ করার ক্ষতিপূরণ হয়? এ কথার উত্তরে তাই দেখতে হয় যে, আর্টের পদ্ধতিতে এমন কোন অবস্থা হ'তে পারে কিনা যখন কৃত্রিমতাকেও সত্য ব'লে স্বীকার করতে পারি। অস্বাভাবিকও যখন স্বাভাবিক। দুরকমে দেখা যায়।

প্রথমত, যখন জীবনের মত আর্টকেও একটা স্থিত ব্যবস্থার (system) মত দেখি। তখন আর্টও একটা স্বতন্ত্র জগত, একটা ভিন্ন মায়ালোক, মানুষের হাতে প্রেরণার সাহায্যে ইচ্ছে ক'রে গড়া কল্পনাসৃষ্টির কারবার সেখানে। কাজেই সেই make-believe-এর জগতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটতে পারে যেগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে অসঙ্গত ব'লে বোধ হয়। কোলরিজ বলেছিলেন যে, কল্পনার জগত সেই, যেখানে আমরা আমাদের সন্দেহপ্রবৃত্তি আর

প্রশ্ন করবার স্পৃহাকে ইচ্ছে ক'রে অসাড় ক'রে রাখি। প্রকৃতি আর আর্টের পদ্ধতি আর প্রভাবে বিভিন্নতা আছে। প্রকৃতিতে সত্যের বিকাশ ধাপে ধাপে হয় ব'লে তাতে সে বিকাশের গতিটা এত বেশী চোখে পড়ে যে, সেই গতিই আসল ব'লে বোধ হয়। বহমান ধারায়, ন্যায়ের সূত্র ধ'রে চ'লে, আমরা আরামে আত্মসমর্পণ করতে পারি। অতএব সেই একটানা চলার ছন্দে, সেই সুপ্তিদোলায়, হঠাৎ কোন অসঙ্গতি দেখ্‌লে আমরা বিশ্বাস আর আস্থা দুই হারাই। অপর পক্ষে আর্টের পদ্ধতি হ'ল মুহূর্ত্তগ্রাস। সে হয়ত সারাপথ ডিঙিয়ে বিদ্যুৎচমকে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছায়। কোথায় ধরে, কোথায় ছাড়ে সে সম্বন্ধে তার কোন বাঁধা নিয়ম নেই। অতএব আর্টে এইটে দেখবার জন্যেই প্রস্তুত থাকা উচিত যে, শেষ পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছল কিনা। তা যদি হয় তো কোন্ পথে এলো, সেটা বিবেচনা করবার সব সময়ে দরকার হয় না। লক্ষ্যস্থল এক হ'লেও পুষ্পকরথ আর লৌহ রেলরথের চলবার পথ এক না'ও হ'তে পারে। অবশ্য আর্টের এই পরিণত অভিপ্রায় বা effect যদি সত্য অর্থাৎ final না হয়, তাহ'লে বলাই বাহুল্য যে, প্রকৃতিকে অনর্থক খণ্ডিত করায় কোন সার্থকতা নেই। মূলতঃ সেখানে তো আর্টই নেই। মোট কথা, প্রকৃতির চেয়ে আর্টে অপূর্ব্ব ঘটনার একটা স্বাভাবিক সম্ভাবনা স্বীকার করতে বাধে না। কোন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেছেন যে, Artificiality কথাটা "should not be a term of abuse since it is largely the artificiality itself which makes a work permanent. To pass muster a piece of literature needs only enough of reality to make it understandable. It may be real enough, if not in experience, at least in desire, to make it appeal. It may map out, not the actualities of human emotion, but its ideals. And while feelings remain unchanged, ideals are various, and it may work out in practice that where ideals are the material only form can make a work last."

এই কৃত্রিমতাতত্ত্ব আর একদিক দিয়ে বুঝি যখন আর্টকে জীবনের মতন একটা স্বতন্ত্র বিশ্ব ব'লে কল্পনা করি না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জীবনকে বলতে পারি সময়ের কোঠায় এক দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্মক্রম—যে system সেই—কিন্তু আর্ট হ'য়ে পড়ে তার মধ্যে একটা ক্ষণিকের নিরালম্ব ভাবের উৎক্ষেপ, একটা mood, একটা attitude। তার অভিব্যক্তি কালের প্রসারে (period) নয়, তার অভিব্যক্তি সময়ের একটা বিন্দুক্ষণে (point বা moment)। তাতে বিস্তার থাকে না, থাকে নির্দ্দেশ। সে পাশের দিকে তাকায় না, সে ওপরের পানে হাত তোলে। আর্টের রূপ যখন এইভাবে জীবনের রূপ থেকে বিভিন্ন হয়, তখন তার সত্যও হয় জীবনের সত্য থেকে স্বতন্ত্র। তখন জীবনের চরমকে যদি বলি প্রাপ্তি তো আর্টের চরমকে বলি অবস্থা। একটা বস্তু, অন্যটা ভাব। একটা matter, অন্যটা idea। একটা morality, অন্যটা form। একটা পরিবর্ত্তন করে পরিমাণের দিকে, অন্যটা স্পর্শ করে গুণের দিকে।

অতএব এইভাবে যখন দেখি যে, কোন "কৃত্রিম" শিল্পসৃষ্টিও নিজের শক্তিতে নিজেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পেরেছে, যখন দেখি সে যথাযথ মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে; গ্রাম্যভাষায় বল্‌তে গেলে যখন দেখি সে ধোপে টিঁকে গেছে, তখন তাই কি তার সত্য হওয়ার, তার খাঁটি হওয়ার, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়? সত্য কি জিজ্ঞাসা করলে এও তো একটা উত্তর যে, নিজের জীবনীশক্তিতে যা বেঁচে আছে, নিজের প্রাণশক্তিতে যে নিজে চঞ্চল, গতিশীল, সেই সত্য। নিজে এসে যে স্পর্শ করে তার একটা বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে ব'লেই তো বুঝতে হবে। কাজে কাজেই আবশ্যকস্থলে চোখের অস্বাভাবিককে মনের স্বাভাবিক ব'লেই বরণ ক'রে নিতে হবে। দুটো একটা দৃষ্টান্ত দি।

অভিনয় কলায় দেখ্‌তে পাই স্বাভাবিক অভিনয়ের আদর্শ দু'রকম। যে দৃশ্য যত ঘটনাশ্রয়ী তাতে অভিনয় যত বাস্তব হবে আর্ট হিসাবে অভিনয় তত উঁচু শ্রেণীর হবে। কেননা আর্টের উদ্দেশ্য ভাবকে রূপে ফুটিয়ে তোলা। তাই যেখানে ভাব কাজে বা ঘটনাতেই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট তার ব্যঞ্জনায় সেই কাজ বা ঘটনাটুকুর নিখুঁত অবতারণা করতে পারলেই

অভিনয়ের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। কোন খাওয়ার দৃশ্য দেখাতে হ'লে স্বাভাবিকভাবে ভোজন ক'রে গেলেই চলে, কেন না ভোজনের আধ্যাত্মিকতা তার কাজটাতেই এত বেশী স্পষ্ট যে সেটা বোঝাতে কোন বিশেষ ভঙ্গীর টীকাকরণের আবশ্যকতা হয় না। ভাবের রূপ সেখানে একটিমাত্র, অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাবার যদি কোন বিশেষ স্থানীয় কারণ না থাকে। কিন্তু কোন সূক্ষ্মতর চিরন্তন ভাবের প্রকাশ যেখানে লক্ষ্য সেখানে যে, সব সময়ে বাস্তব অভিনয়কেই স্বাভাবিক অভিনয় বলতে পারবো তা মনে করি না। যাঁরা সম্প্রতি প্রকাশিত "কপালকুণ্ডলা" চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা ব'লতে পারবেন যে, নবকুমারের মৃত্যুসংবাদে পুত্রশোকাতুরা মা'র কপালে করাঘাত ক'রে কান্না কাজ হিসাবে স্বাভাবিক হ'তে পারে, কিন্তু অভিনয় হিসাবে ওরকম ক্ষেত্রে তত স্বাভাবিক নয়। পটের ওপর তাকে পাঁচ মিনিট কি তারও কম সময় দেওয়া হয়, তারই মধ্যে তাকে কান্না সাঙ্গ ক'রে স'রে প'ড়তে হবে, নইলে অন্যরা আসতে পারে না। মাকে সামলাতে গিয়ে নবকুমারের ছোট বোন তো কাঁদতেই পেলে না। কেন না সেও যদি কাঁদতে লাগে তো মাকে নিয়ে যাবে কে? ছেলে বা ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের কি এই রীতি? এতে ভাবের ঐক্য নষ্ট হয়। আর্টের দিক থেকে এরকম অভিনয়ের কোন ব্যঞ্জনামূল্য খুঁজে পাই না।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারছি যে, স্বাভাবিক অভিনয় না করাটাও সময়ে সময়ে স্বাভাবিক হ'তে পারে। সেটা হয় সচরাচর যাকে restraint বা সংবরণ বলি, তাই অবলম্বন করলে। অভিনেতার আদর্শ বোধ হয় নিজে অভিনীত চরিত্রে পর্য্যবসিত হওয়া নয়। আত্মজ্ঞান তার সব সময়ে সজাগ থাকা চাই। তার আদর্শ অন্যের ভাব, অন্যের কাজ নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। তাকে সব সময়ে মনে রাখতে হ'বে যে,সে মূল চরিত্র নয়, সে অভিনেতা মাত্র। অভিনয়ের এই সত্যই অন্য আর্ট সম্বন্ধে খাটতে দেখি। বাধা বা limitationএর মধ্যে থেকেই রূপকে প্রকট করা শিল্পের কাজ। শিল্পকলার তাই রীতিনীতি বা technique-এর আদেশ এত কড়া। বন্ধনের মধ্যে থেকে মুক্তির আস্বাদ দেওয়াই আর্টের ধর্ম্ম। আর্ট জীবনের "criticism"—duplication নয়।

আশা করি এতক্ষণে এই কথাটা স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, আর্টে কৃত্রিমতা কথাটার অর্থ খুব প্রশস্ত। তাতে এমন কিছুই নেই যা'তে কথাটা অস্পৃশ্য বা বর্জ্জনীয় হ'তে পারে। শিল্পের বিশেষ প্রয়োজনে অস্বাভাবিকও অপূর্ব্ব হ'তে পারে। অ-সাধারণ হয় অনন্যসাধারণ। শ্রেণী হারিয়ে যায় ব্যক্তির কিরণ-বিকীরণে।

৫

জাতিপাতের ভয় যখন নেই তখন শেষের কবিতার ষ্টাইলের কৃত্রিমতা প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। ওর রূপের সঙ্গে ভঙ্গীর সম্বন্ধ দেখাতে হবে।

হৃদয়ের প্রত্যাশার সঙ্গে যেটা খাপ খায় না তাই যখন কৃত্রিম, তখন সেটা স্বভাবতঃ একটা বাইরের বিচ্ছিন্ন (detached) জিনিষ হ'য়ে পড়ে। সেটা ভাবে প্রবুদ্ধ হ'লেও ভাবের স্পন্দনের চেয়ে যেন তাতে একটা মূর্ত্ত বাস্তবতা, রূপের একটা চক্ষুগত স্থূলত্বই, বেশী দেখা যায়। ধারণার উদ্বেল গতিবিধির চেয়ে তাতে দেখি হাতের গঠন-কৌশলের ইঙ্গিত বেশী স্পষ্ট। কেননা যেটা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন, যেটা বাইরের, যেটা দূরের, সেটাই বেশী ক'রে চোখে দেখে উপলব্ধি করবার। দূরে থেকে দেখা মানেই মূর্ত্তরূপে (objectively) দেখা—যেজন্যে শিল্পী ছবি এঁকে সেটা দু'হাত তফাতে সরিয়ে দেখে কেমন হ'ল। তখন সে তা'কে দেখ্‌ছে ভাব থেকে যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন ক'রে; তখন সে খুঁজছে তার একটা গঠিত বা structured রূপ; তখন সে দেখছে একটা দৈহিক সমগ্রতার দিকে। অতএব দেখছি যে, বিচ্ছিন্নদৃষ্টি আর মূর্ত্তিময় রূপে একটা গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে, অনেকটা মনস্তত্ত্বঘটিত। তাই কৃত্রিমতা যদি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির সহায়ক হয় তাহ'লে কতক পরিমাণে একটা নিরালম্ব বস্তুরূপেরও নির্দ্দেশক হবে।

এইবার শেষের কবিতাতে ভঙ্গী আর রূপের এই সম্পর্ক অনুসন্ধান করি। প্রথমে দেখুন স্থানে স্থানে বর্ণনভঙ্গীর কৃত্রিমতার প্রভাব।

যখন "বোন্‌রা দার্জ্জিলিং চ'লে গেলো" না ব'লে একটু ঘুরিয়ে আড়ষ্ট ক'রে প্রকাশ করা হয় "বোন্‌রা গেল চ'লে দার্জ্জিলিঙে", কিম্বা যখন বলা হয় "অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতন দেখ্‌তে হ'ল না—মনে হ'তে পারতো রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র" তখন বুঝি যে, এ রচনা রুদ্ধবেগ স্রোতস্বিনীর প্রথম উৎসারণ নয়; এ পরে ধীর মন্থর গতিতে এঁকে বেঁকে পথ ক'রে ক'রে চলা, রূপে গতির রেখাপাত করে। প্রথম আনন্দের ক্ষিপ্র আলুথালু ভাব এ নয়—এ তার পরের অবস্থা; সন্তুষ্ট আনন্দের প্রসাধন পারিপাট্য; Beautyর pretty হবার চেষ্টা। এতে প্রকাশের চেয়ে বড় বিন্যাস; অক্ষরপাত নয় রেখাপাত। এ কবির আঁকা ছবি বা শিল্পীর রচা ভাষা—রবির কিরণপাত অবনীর পটভূমির ওপর, হয়ত গদ্যছন্দে পদ্য বা ঐ রকম একটা কিছু। এতে রূপ সাধনের আয়াসই চোখে পড়ছে বেশী। এই ভাবে চক্ষুগোচর ক'রে রূপ দর্শনই কি মূর্ত্তিরূপে (objectively) দেখা নয়? যেন চৈনিক শিল্পীর হাল্কা হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাক্ষার কাজ—নিজের থেকে একটু ব্যবধান রেখে সৃষ্টি ক'রে চলেছে, কি রকম দাঁড়ায় সেটা চোখে চোখে রাখবার জন্যে।

চরিত্রের পরিকল্পনা আর বিন্যাস থেকেও শিল্পীর এই সংযত, বিচ্ছিন্ন, বাস্তব দৃষ্টির অভাস দিতে পারি। প্রত্যেক পাঠকই বোধ হয় অনুভব করেন যে অমিত, লাবণ্য, বা অন্যান্য চরিত্রগুলির চিত্রণে তাদের অমন সজীব, বিশিষ্ট, পূর্ণ ক'রে এঁকেও, তাদের পরিচয় দিতে শিল্পীর মুখে যেন ক্ষণেকের জন্যে একটু রহস্যপূর্ণ অথচ সহানুভূতির হাসির রেখাপাত হয়। তাঁর সহানুভূতির মধ্যে কোথাও একটু নিরীহ বিদ্রূপ, একটু কৌতুক, অর্থাৎ একটু অনাসক্তি, যেন আত্মগোপন ক'রে আছে, নইলে কেতকীর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লেও সেটা যে এনামেল করা সেটা বলবার প্রয়োজন কি? এমন কি অমিতকে "পছন্দ" করলেও কতটা ভালবাসেন তা একবার একবার সন্ধান নিতে ইচ্ছে যায়। তার পক্ষে বেশভূষা, ভাবভঙ্গিতে অতটা ব্যঙ্গপ্রিয় হওয়া কি নিজেকেও একটু ব্যঙ্গ করা নয়? লাবণ্যর বুদ্ধি-বর্ণনাতে তার বিদ্যার মস্তিষ্ক উত্তাপটুকুর কথাও কি সাবধানে বলা নেই? এই সকল কারণে সন্দেহ হয় যে, শিল্পীর আনন্দ আসক্তিতে নয়, জীবনে নয়, সৃষ্টিতে।

প্লটের গঠনেই শেষের কবিতার এই বস্তুরূপ (objective form) প্রকাশ পায় সব চেয়ে স্পষ্টভাবে। তার পরিমিত গঠনস্বল্পতা (structural economy) থেকে সে পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা গঠনে বাহুল্য কম থাকলেই রূপের সমগ্রতাও ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পারা যায়, যেহেতু তাতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে রূপের ঐক্যকে বিড়ম্বিত করে না বরং সেটাকে আরো একাগ্র ক'রে তোলে।

প্রথমেই দেখি প্লটের কোন ডালপালা নেই। প্রথম থেকেই গল্প তীরের মতন এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে। শেষের কবিতা নামেই যেন গোড়ার চেয়ে শেষটা বেশী ক'রে চোখের সামনে ধ'রে দেওয়া আছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম থেকে গল্পের বিকাশ বুঝতে পারা যায়। ভেতরেও দেখি সরাসরি ক্ষিপ্র বিবৃতি—rapid movement। সবই পরিষ্কার, উহ্য কিছুই নেই। প্রথম দিনের আলাপেই যোগমায়া জানেন যে, ওদের বিয়ে হওয়া চাই। তার দুদিনের মধ্যেই অমিত তাঁকে লাবণ্যর সম্মতির সুখবর এনে দেয়। গোরার কতদিন লেগেছিল পাঠকের মনে থাকতে পারে। শেষের কবিতায় এই মিতাচারের কারণই এই যে,এর উদ্দেশ্য প্রেমের গতি বা ক্রমবিকাশ দেখান নয়, এর উদ্দেশ্য তার মূল স্বরূপটি চোখের সামনে উদ্ভাসিত করা।

আমাদের পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে এই আকৃতিগত সৌষ্ঠব, এই structural balance এর জন্যেই শেষের কবিতার জগত হ'য়ে পড়ে এত artificial বা কৃত্রিম, অর্থাৎ আমাদের পরিচিত জগত থেকে এত বিচ্ছিন্ন। অতি নৈকট্যের ফলেই আমাদের পরিচিত জগতের বাহ্য পারিপ্রেক্ষিক রূপের কোন ধারণা করতে পারি না। এখানে সেইটেই সম্ভব হয়। প্রকৃতির শিথিল ফেলাছড়া লতাগুল্ম আগাছা প্রভৃতি দিয়ে আসল আকৃতিগত রূপটা ঢাকা পড়ে না। বিভিন্ন রূঢ় পদার্থগুলির সমন্বয় যত সুষ্ঠু হয়, সমগ্র সৃষ্টির

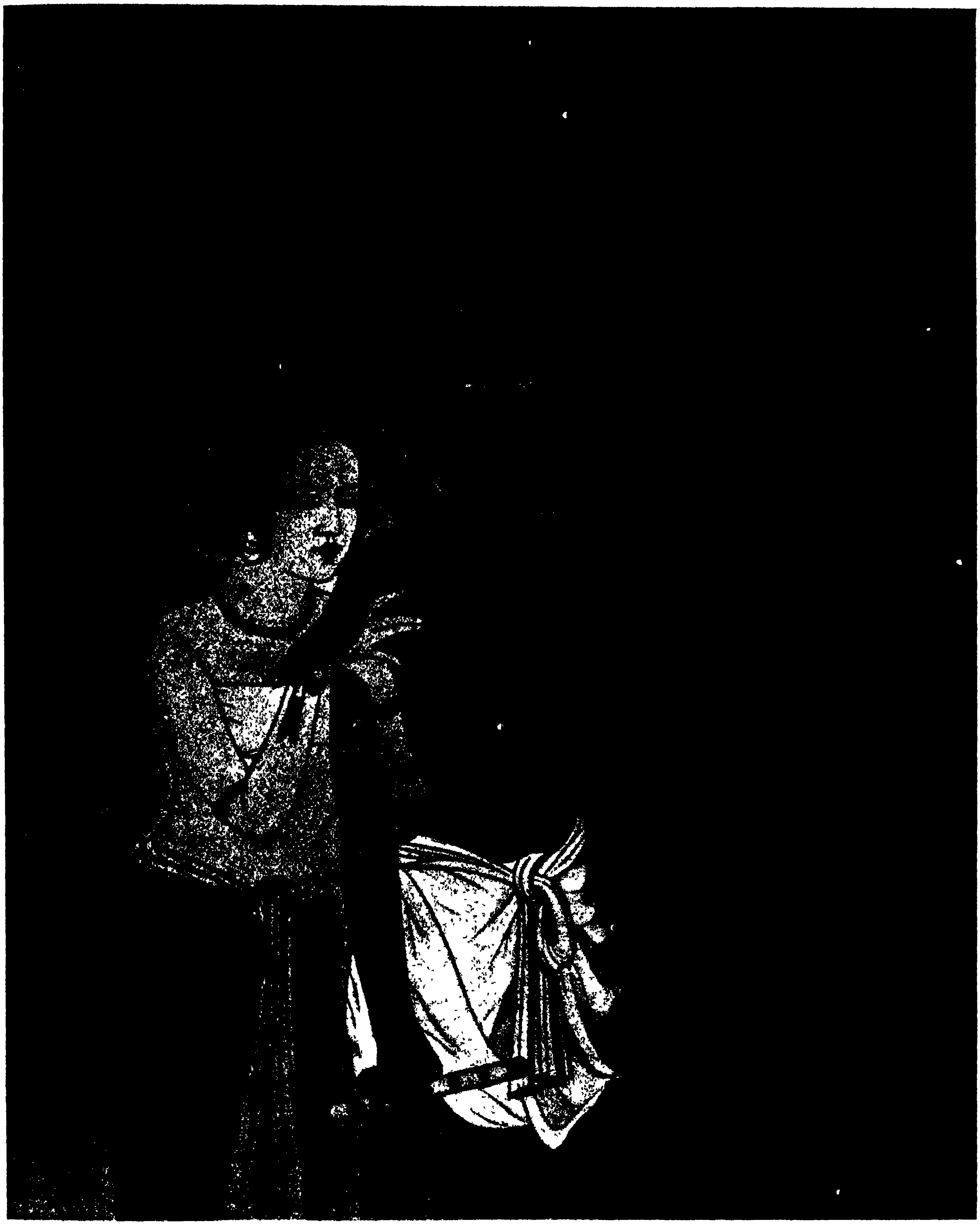

সাথী

শিল্পী—শ্রীহরিপদ বসু মল্লিক

বাস্তব রূপও তত স্পষ্ট হবে। আমাদের পূর্ব্বে উদ্ধৃত সমালোচকের ভাষায় "It is the proportion of the emotions, the varied strength of their impact, the general impression of their relation to one another, that determines the kind of balance finally attained."

একটা তুলনা থেকে কথাটা পরিষ্কার করি। অল্পক্ষণের জন্যে যদি শেষের কবিতার সঙ্গে গোরাকেও প্রেমের গল্প ব'লে মনে করি, তাহ'লে দুটি গল্পের গঠনে কি প্রভেদ দেখ্‌তে পাই? গোরা যদি হয় আগ্রা দুর্গের খাসমহল, তাহ'লে শেষের কবিতা হ'বে যমুনাতীরের তাজমহল। খাসমহলে প্রেমের লীলা; জীবনের অন্যান্য অভিব্যক্তির সঙ্গে যেখানে সে যুক্ত—যেমন গোরাতে। গোরার মস্তিষ্কের দেওয়ানী খাস আর তার হৃদয়ের উজ্জ্বল, রসাল, ফলন্ত আঙ্গুরী বাগ যেন পাশাপাশি। কিন্তু তাজমহল হ'ল প্রেমের স্তব্ধ পাষাণরূপ, অনড়, সম্পূর্ণ, আত্মসর্ব্বস্ব, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, গোড়া না রেখে, শেষ না রেখে, অসীম অদৃশ্য শূন্যের মধ্যে একটি দৃশ্যমান বিন্দুর মতন। সে নিজস্ব রূপেই নিজে পুরোপুরি ব্যক্ত। শেষের কবিতার প্রেম সৌধ এই রকম আত্ম সম্পূর্ণ। রাম, শ্যাম, যদুর জীবনের সঙ্গে তার কোথাও যোগ থাকলে তার স্থূল প্রমাণ পাওয়া যেত অমিত লাবণ্যের বিয়েতে; কিম্বা যদি ওদের বিয়ে না হ'ত তো অন্তত ওদের সঙ্গে কেতকী শোভনলালের বিয়ে হ'ত না; আর তাও যদি হোতো তো ওদের কাহিনীটুকু ওরা একটি ক'রে শেষের কবিতা লিখে চিরকালের মতন জিইয়ে রাখতো না। ওদের প্রেম হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন অনন্যপূর্ব্ব নক্ষত্রলোকের স্বকীয় নিয়মের ব্যাপার। এখানকার নিয়ম সেখানে খাটে না; সেখানে অমিত লাবণ্যকে বলে "নিয়ম-পালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্ত্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাবো ব'লেই।" সেখানে দায়িত্বহীনতার প্রবল স্রোত যুক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এলোমেলো খেয়ালের রথে এক দৌড়ে একেবারে "মোরাদাবাদে"। যদি বলেন এত জায়গা থাকতে মোরাদাবাদ কেন, তার কোন উত্তর নেই। কেননা সেখানে কেবল থাকা আর অনুভব করা; জানা আর মনে রাখার পাট সেখানে নেই। অতএব গোরায় বা খাসমহলে যদি দেখি প্রেমের রূপ সঞ্চরণশীল, একটু বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, তাহ'লে শেষের কবিতায় বা তাজমহলে সেটা একটা নিজস্ব ভিত্তির উপর সব থেকে পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব'লে একটু সংবৃত; নিজস্ব রূপের দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী; তাতে সৌষ্ঠবের চিহ্ন একটু বেশী পরিস্ফুট; একটু বেশী পরিমাণে Structured; বেশী formal বা আকৃতিগত দুর্গের তুলনায় তাজমহলের যে গঠন-স্বল্পতা (Structural economy) গোরার তুলনায় শেষের কবিতাতেও তাই। খাসমহল বা গোরার ছাদ যদি হয় epic, তাজমহল বা শেষের কবিতার সুর তাহ'লে lyric। শেষের কবিতার রূপের স্বরূপ এই।

৬

আমার বক্তব্যের তৃতীয় স্তর ছিল শেষের কবিতার রূপের সঙ্গে ওর বিষয়ভাবকে (Theme) যুক্ত করা। ওর theme এর বিশেষত্বের কতক আভাস এইমাত্র প্লট বিচারে দিয়েছি। সেই ভাবের সঙ্গত প্রকাশ এই রূপেই।

অমিত লাবণ্য যে জগতে বিচরণ ক'রে সেখানে "দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে।" তারা এসে পৌঁছেছে "একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম।" এখানকার আলো বাতাস সেই লোকের যেখানে "বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকীতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার যো থাকে না।" এখানে "দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।" এ জগত আমাদের চোখে কিরকম ঠেকে? বারে বারে কি এই কথাই মনে হয় না যে, ও যদি সত্যও হয় তাহ'লে একমাত্র স্বপ্নেই সত্য হ'তে পারে। ও ভাবুকের আদর্শ হয়ত, কার্য্য জগতের বাস্তব নয়। ওকে হয়ত কখন কোন সুদূর আভাসে অনুভব ক'রে থাকতে পারি কোন উজ্জ্বল নিমেষে; কোন অলৌকিক মুহূর্ত্তে; কিন্তু ওর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখন আসি নি। দূর থেকে ওর সৌরভ পাওয়া চলে, কিন্তু ও বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া চলে না।

দৈনিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বাহিরে থেকে' এই দূরের থেকে দেখাই কি আবারো সেই objectively দেখা নয়? কথাটা এতক্ষণ পরে পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু প্লট সম্পর্কে যেটা রূপের দিক থেকে objective ব'লে দেখাতে চেয়েছি এখানে সেইটে ভাব বা Sentimentএর দিক থেকে বল্‌তে চেয়েছি। আর শেষের কবিতার theme সম্বন্ধে এইটেই আমার শেষ কথা যে, ভাবে বা অনুভূতিতে যেটা স্বকীয়, নিরালম্ব, সেইটেই রূপে objective।

৭

আমি শেষের কবিতার রূপের কৃত্রিমতা, আকৃতি প্রকৃতির কথা এত বলেছি যে, অনেকস্থলে মনে হ'তে পারে যে ওর অন্তর্গত ভাব বা প্রেরণাও একটা যান্ত্রিক প্রাণহীন কল্পনা-বিলাস মাত্র। যেহেতু বর্ণনায় বা পদ্ধতিতে শিল্পী অবলম্বন একটা রসিক বা humourist সুলভ ভাব করেছেন তাই ওর মূলভাবের এমন কোন সম্পদ বা উৎকর্ষ নেই যেটা শিল্পীর নিজের বা অন্যের হৃদয়কে অভিভূত করতে পারে। অর্থাৎ অমিত লাবণ্যের জগত যেমন বাস্তব বিচ্ছিন্ন স্বপ্নজগত, ওদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতিও তেমনি মৌখিক হবার কথা। এক কথায় শেষের কবিতার প্রেরণার সেই সত্য আবেগ ভিত্তি নেই, যার দ্বারা সব-শিল্প-সত্য, সার্থক এবং স্বচ্ছন্দ হয়।

কিন্তু শিল্পীর বর্ণনা বা চিত্রণ পদ্ধতি যতই নিস্পৃহ আর কৌশলী হোক না কেন, যতই মস্তিষ্কের ব্যাপার হোক না কেন, সেটা কখনো মনোহর আর স্থায়ী হ'তে পারে না যতক্ষণ না তার ভেতরকার নিজস্ব ন্যায়নিয়ম বা পারম্পর্য্য ক্ষণেকের জন্যেও হৃদয়ের সত্য সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তাই কোন সার্থক সৃষ্টির বাইরেকার স্বপ্ন আচরণটাকে যদি অবাস্তব ব'লে স্বীকার ক'রেও তার অন্তরে আমরা প্রবেশ করতে পারি তাহ'লে সেখানে হয়ত দেখবো যে নিতান্ত সাধারণ মামুলী জাগতিক নিয়মের সত্য ছাড়া আর কিছুই নেই। অমিত লাবণ্যের চরিত্র থেকে দেখাচ্ছি যে ওদের জীবনের স্বপ্নের মধ্যেও সত্যের সূর্য্য কি ভাবে আর কত প্রখর আলো বিতরণ করেছিল। ওদের নিজেদেরই গোপন করবার চেষ্টার হয়ত অন্ত ছিল না, কিন্তু নির্ম্মম ভাগ্য সে কথা শোনে নি।

প্রথমে দেখুন অমিতকে। স্বীকার করি "অমিতর" নেশাই হ'ল ষ্টাইলে; ওর চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব "নির্জ্জলা যৌবনের প্রবল বেহিসেবী যুবকত্ব"; ও রসিক; শিক্ষা আর সমাজের প্রভাবে একটু অতিমার্জ্জিত; একটু হয়ত মানব-বিদ্বেষী ভাব—দুনিয়াটাকে হেসে খেলে উড়িয়ে দেবার মতন প্রবৃত্তি; ও ভালবাসে ডনের কবিতা সম্ভবতঃ তার বাস্তবতা, তার প্রাখর্য্য, তার বিশ্লেষণ রসের জন্যে। কিন্তু এ ধরণের চরিত্র কি বিরল? বাস্তব জগতে যাকে দেখি যত অনাসক্ত, ভাবি যে কোন অবাস্তব জগতে সে সেই পরিমাণে আসক্ত তারই সংস্পর্শে তার মানবতায় পরিবর্ত্তন ঘটে। তার পক্ষে সেই জগতই সত্য। অক্সফোর্ডে একবার অমিতর এই জগৎ সত্য হয়েছিল কেতকীকে হীরের আংটি দিয়ে। কোথায় ছিল তখন তার মেয়েদের প্রতি আগ্রহহীন উৎসাহ? দ্বিতীয়বার তার জীবনে যখন এ জগত সত্য হ'ল লাবণ্যর সংস্পর্শে এসে তখন তাই দেখি তার এতদিনকার চরিত্র বল্মীকের ধ্বসে যাওয়া। কারো চোখ এড়ালে না। যোগমায়া বল্লেন অমন দুরন্ত ছেলে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে; মিসি লিসি আবিষ্কার করলে যে ওর "প্রখর নাগরিকতা" ঘুচে গিয়ে ওর উপর "এক পোঁচ গ্রাম্য রং লেগে গেছে;" ও যেন কাঁচা হ'য়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। আমরা বলি ও বুঝিবা পাগল হ'য়ে গেছে; নইলে ছেলে মানুষের মতন বর্ষাকালে একটা ফুটো কুঁড়ে ঘরে টেবিলের তলায় একখানা খবরের কাগজ পেতে বসে প্রেম সাধনা করতে, আর ব'সে ব'সে ভেজে? একদিন যে লিলী গাঙ্গুলীকে নাস্তানাবুদ করেছিল আজ তার উপর অদৃষ্টের কি নির্ম্মম প্রতিশোধ। আজ সে তার চরিত্রের প্রধান ফাঁকি বুঝতে পেরেছে। তাই লাবণ্যর কাছে কত রকম তার স্বীকারোক্তি (১০১, ১৩২ পৃঃ)। আজ তার প্রকৃত উপলব্ধি (১২৬ পৃঃ)। তাই আজ সে এই প্রেমকে সত্য করতে কিছুতেই পরাঙ্মুখ নয়; কোন ত্যাগ কোন চেষ্টাতেই পশ্চাৎপদ নয়। পরিশ্রম করতে প্রস্তুত—কেতকীর

…স্কার সাধনে,—মিরাণ্ডার জন্তে যেমন ফার্ডিনাণ্ড কাঠের বোঝা বহেছিল।

দেখুন লাবণ্যকে। ওর চরিত্রেও দু'রকম গুণের পাশাপাশি সমাবেশ, আর তার বিকাশ দুইয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়। একটা ছিল ওর বিদ্যার, বুদ্ধির, এম-এ পাশ করার মস্তিষ্কের গরমের দিক, যেদিক থেকে ও শোভনলালকে অত যন্ত্রণা দিয়েছিল; যেদিক থেকে অমিত লক্ষ্য করেছিল যে "লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্ত স্পষ্ট ক'রে জানতে চায়;" এমন কি "মানুষ স্বভাবত সেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না।" কিন্তু এই শক্ত ক'রে বাঁধা তন্ত্রীর ছন্দই কেটে দিয়েছিল তার হৃদয়ের দ্রবময়ী ভাব, তার "মননের শক্তির" সঙ্গে "বেদনার শক্তির" সংযোগ। এ উপলব্ধি ওর যেদিন হ'ল সেইদিনই ও জানলে যে ওর "ধরা পড়বার দিন আস্‌চে।" সেইদিন ওর ইচ্ছে হ'ল যে "যাক্ সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধ'রে ব'লে উঠি—জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার… সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে শোনো তোমরা আমি ভালবাসি…আমার সমস্ত জীবন, আমার জগত সত্য হ'য়ে উঠ্‌লো…এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হ'য়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই।" এ লাবণ্য ধরা প'ড়ে গেল যেদিন যোগমায়া দেখ্‌লেন যে রাত বারোটার সময় ঘরে আলো জ্বলছে, আর টেবিলের উপর নুয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে লাবণ্য কাঁদছে।. তার এই সময়কার ভাব দুইছত্র গানে, চোখের জলের ছন্দে—

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"

এই তো অমিত লাবণ্য, আমাদেরই মতন হাসি অশ্রুতে গড়া সজীব রক্তমাংসের মানুষ—গোবিন্দলাল রোহিণী বা নবকুমার কপালকুণ্ডলার মতন কোন কল্পিত আদর্শ অনুসারে সৃষ্ট নয়—এদের সুখ দুঃখকে আমরা নিজের না ক'রে কেমন ক'রে থাকি?,এদের উপলব্ধির সত্যতা, এদের প্রাণের স্পন্দন কি আমাদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে না? এদের শুদ্ধ আবেগের তীব্রতা কি জাগতিক সুখ দুঃখের মতন আমাদের আকুল করে না? এদের ভাগ্যবিপর্য্যয় কি আমাদের জীবনের খুব কাছাকাছি আসে না? এদের ক্ষুদ্র জীবনের শেষ পাতা ওল্‌টাবার পর কি মনে হয় না যে, বড় প্রিয়, বড় আপনার, বড় পরিচিত কেউ তার রূপ আর কণ্ঠস্বর নিয়ে সামনে থেকে অপসারিত হ'য়ে গেল—বুঝি চিরদিনের মতন।

এত কাছাকাছি যদি তবে এ জগত এত দূর কেন? তার কারণ আমাদের জগতে আর এদের জগতে একটা রূপগত পার্থক্য আছে। আমাদের গড়া জগতটা সুবিধার দরবারে কতকগুলো পরিত্যাগের বদলে পাওয়া, একটা খণ্ডিত ব্যক্তিত্বরাজির সমন্বয়। কিন্তু এরা পরস্পরকে বরণ ক'রে নেয় যেখানে এই দুটি প্রখর, প্রবল, সজীব সত্বা নিজেদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করতে পারবে। এরা এমন লোক নয় যে, সেজন্তে নিজের নিজত্ব থেকে এক কড়াক্রান্তিও অযথা ঘুসের মতন বাদ দেবে। অথচ আত্ম উপলব্ধির চরম স্বাদ আত্মবিলুপ্তিতে। কাজেই দু'জনের মধ্যে এমন একটা জগত্ গড়ে ওঠে যাতে পরিত্যাগ না ক'রেও ত্যাগ সম্ভব। অন্যের কাছে হোক্ সে জগত আদর্শ-জগত বা কল্পিত কিম্বা কৃত্রিম জগত, কিন্তু ওদের কাছে সে জগত বড় বেশী সত্য; অতিশয় সম্ভব; ওদের নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত থেকেই উদ্ভূত। শেষের কবিতার প্লট সম্বন্ধে এইটেই বেশী ক'রে মনে রাখবার কথা যে, এর প্লটের উন্মেষ দুটি মোটরকারের সংঘাতে নয়, বরং দুটি চরিত্রের সংঘাতে। প্লটের ছকে এরা ভাগ্যচালিত ঘুঁটি নয়, এদের ছক্ এরা নিজেরাই chalk out করে। এদের তাই সবই নিজস্ব নিয়মের রাজ্য, যেটা আমাদের চোখে অনিয়ম। এই ধরণের একটা কথাই অমিত যতিশঙ্করকে বলেছিলো, "বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তা'র মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তা'র মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।" এরা তাই গ্রন্থিবদ্ধ হ'লেও সে গ্রন্থি হয় বন্ধনহীন, কেননা এরা যে "চলতি হাওয়ার পন্থী।" এদের নিয়মকে এদের জগতকে কিছুতেই টলাতে পারে না; এমন কি' কেতকীর সঙ্গে অমিতর বিয়ে হয়েও

না, শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে হয়েও না। যে বোঝে সে বোঝে, অন্যে বোঝে না—"সব কথা সকলের নয়।"

কিন্তু আমার ইঙ্গিত কি রূপক বা চ্যালেঞ্জের দিকে যাচ্ছে? তার চেয়ে এদের মিলনতত্ত্বের কথা এরা নিজ মুখেই ব'লে যাক্। এ সম্বন্ধে অমিতর কথা এই :—

"অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে; কেউ বা করে রচনায়...... এইখানেই কি মেয়ে পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে......মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে... ..রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন......এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি আমাদের সকলের চেয়ে বড় যে পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি।" লাবণ্যকে ও চেয়েছিল সেই জন্যেই, নিজের জীবনে ফসল ফলাবার জন্যে। লাবণ্য সে কথাটা বুঝেছিল। ওর প্রকৃতি সৃষ্টি, অথচ ওকে দিতে হ'লে দিতে হয় জীবন। সেটা বিয়ের নিয়মের মধ্যে সম্ভব নয়, কেননা "বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না। অতএব লাবণ্য জানে যে, ও লোক হয় পেয়েও পাবে না, নয় পেয়েও হারাবে। "যে মানুষ মাটীর মানুষ নয়" তার চাওয়াও যে সোনার মতন! এ চাওয়ার অপমান করবার হাত তার নেই। তার নিজের অর্ঘ্যও তো এর চেয়ে কম মূল্যের নয়। এ কথা সে যোগমায়াকেও বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই লাবণ্য যখন দেয় তখন বাইরে থেকেই দেয়। কিন্তু এ সেই বাইরে থেকেই দেওয়া যারা ধ্রুব শক্তিতে বিশ্বাস ক'রে সে বলতে পারে, "মিতা, ভালবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছো ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিও না—তাতেই আমি খুসি থাকবো।"

এসব কথা আর কাজের নতুনত্ব কেবল এইতে যে, এসব দেখে শুনে বক্র হাসি হাসবার অভ্যাস আমাদের এখন যায় নি! নইলে এই মুক্তমিলনের তত্ত্ব বোঝাবার ভাষাও লাবণ্যর নেই, ভঙ্গিও নেই। সে প্রণাম করি করি করেও করতে পারে না। অনেক কষ্টে কবিতায় একটুখানি বলে—

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি।

আমাদের এর অর্থ করতে হ'লে হয়ত ওরই কথাতে করতে হয়—"আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

কেবল অমিতই বুঝেছিল লাবণ্যর কথা, তাই শেষে "চিরদিনের সপ্তপদী গমনেই" সে রাজী হ'ল। গঙ্গার দু'ধারে মানসী আর দীপকের সেই রমণীয় মনোহর প্রতিষ্ঠা, স্নান সেরে পট্টবাস প'রে, হাতীর দাঁতের খড়ম পায়ে দিয়ে ঘাটের ওপর সেই প্রতীক্ষা, ধূপের অর্ঘ্য জ্বেলে সেই আবাহন, কবিতায় সেই নিমন্ত্রণ,—প্রতি পূর্ণিমাররাতে,—সে তো অমিতর কথায় মনের মধ্যে ঘর বানানো—অর্থাৎ বাইরের চেয়ে যেখানে সে টিঁকবে বেশী। আজ তাই না সে যতিশঙ্করকে বোঝাতে পারে যে, "যে ভালবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে জড়িয়ে থাকে সে দেয় আসঙ্গ।" ভরসা হয় যে, যোগমায়ার মতন নারীই কেবল শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলেন যে, এইভাবে পাওয়া আর এই ভাবেই থাকাই চিরদিন "নববধূর" মতন থাকা। অন্ততঃ অমিতর প্রিয় কবি ডন্ জানতো, যে বলেছিল—

Who loves a mistress of such quality
He soon hath found
Affection's ground
Beyond time, place, and all mortality.

আমরা এ জগতের কোন সন্ধানই রাখি না। মাঝে থেকে অমিত লাবণ্যই কেবল আমাদের এই ধূলিম্লান জগতের ওপর তাদের সত্য-স্বপ্ন জীবনের একটি শেষ স্বর্ণমুহূর্ত্ত একটি কবিতার মতনই রেখে গেল। এ জগতের আঙুলে জড়িয়ে থেকে গেল তাদের জগতের উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা; তাদের "পেয়েছি, এই ছোট্ট কথাটি সোনার ভাষায়, মাণিকের ভাষায়"—লাবণ্যর হাতে অমিতর আঙটির মতন।

শেষের কবিতার জগত Wells এর The Passionate Friends এর চেয়ে উর্দ্ধতর জগত। তা'তে ছিল কেবল প্রেমের পায়ে নারীর অধীনতার কথা। কিন্তু এখানে তো প্রেমের আসন সম্পূর্ণ উঁচুতে; এখানে তো স্বাধীনতার পূর্ণ মুক্তির মধ্যেই কথা। লাবণ্যর কৈফিয়ৎ তো মেরীর কৈফিয়ৎ নয়। তার তত্ত্ব পরিচিতের মধ্যে সত্যের অপরিচিত রূপের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর সংবাদ যে অপরিচিতের কাছে চিরপরিচিতের সন্ধান দেওয়া। এ সেই জগতের কথা যার সন্ধান পাই অমিতর প্রিয় কবি ডনের গোপন সংবাদদাতার কাছে—"Some old lover's ghost, who died before the God of love was born," অর্থাৎ যখন প্রেমকে "that vice-nature custom" এসে চোখ রাঙায় নি।

৮

শেষের কবিতার অনেক আকর্ষণের কথা হয়ত বলা হয় নি। এর রচনা নৈপুণ্য, এর সরসতা, এর কবিত্ব, আশা করি কোন পাঠকের চোখ এড়াবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তার স্থানে কেবল অমিত লাবণ্যর জীবনকাহিনীর কেন্দ্রগত ভাবটির কথাই বেশী বলেছি। এরকম করার কোন সামাজিক উদ্দেশ্য নেই। এ কথা বলা মোটেই অভিপ্রেত নয় যে, ওদের ইতিহাস একটা বাস্তবজীবনের অনুকরণ যোগ্য আদর্শ। শেষের কবিতা সামাজিক উপন্যাস নয়, শেষের কবিতা রোম্যান্স। আর রোম্যান্স বলি তাকেই যেখানে আমরা ইচ্ছা ক'রে রোজকার লৌকিক জগত ছাড়িয়ে কোন অন্য জগতে চ'লে যাই। দুটোতে বড় জোর সম্বন্ধ এই যে, এখানকার ভাব, বৃত্তি, প্রবৃত্তিগুলোর আর একটু শুদ্ধরূপ সেখানে দেখা যায়; তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অন্য পাঁচটা অবান্তর সমস্যা যেখানে এসে বাধা দেয় না। Lafcadio Hearn বড় সুন্দর বলেছেন যে, "by Romanticism we understand that unconscious tendency of the artist to elevate truth itself beyond the range of the familiar, and into the emotional realm of aspiration।" কাজেই রোম্যান্সকে কোন দিনই বাস্তবজীবনে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, সে ভয় নেই। যা বাস্তব, যা আয়ত্বের মধ্যে, তা কখন রোম্যান্স নয়। বর্ত্তমান আলোচনার তাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সত্যের এই emotional aspect টাই—এই ভাব রূপেরই—প্রতিষ্ঠা করা। কেননা যে কোন সৃষ্টি সম্বন্ধে সেটা স্পষ্ট করে না দেখাতে পারলে অনেক স্থলে আর্ট হিসাবে তার কৌলিন্য স্বীকৃত হয় না। অবশ্য এ ইচ্ছায় অন্যায় কিছু নেই, কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে আনন্দকে শুদ্ধ ব'লে উপলব্ধি করার একটা স্বতন্ত্র তৃপ্তি আছে। শেষের কবিতা সম্বন্ধে এইটেই আমার শেষ কথা।

শ্রীনবেন্দু বসু

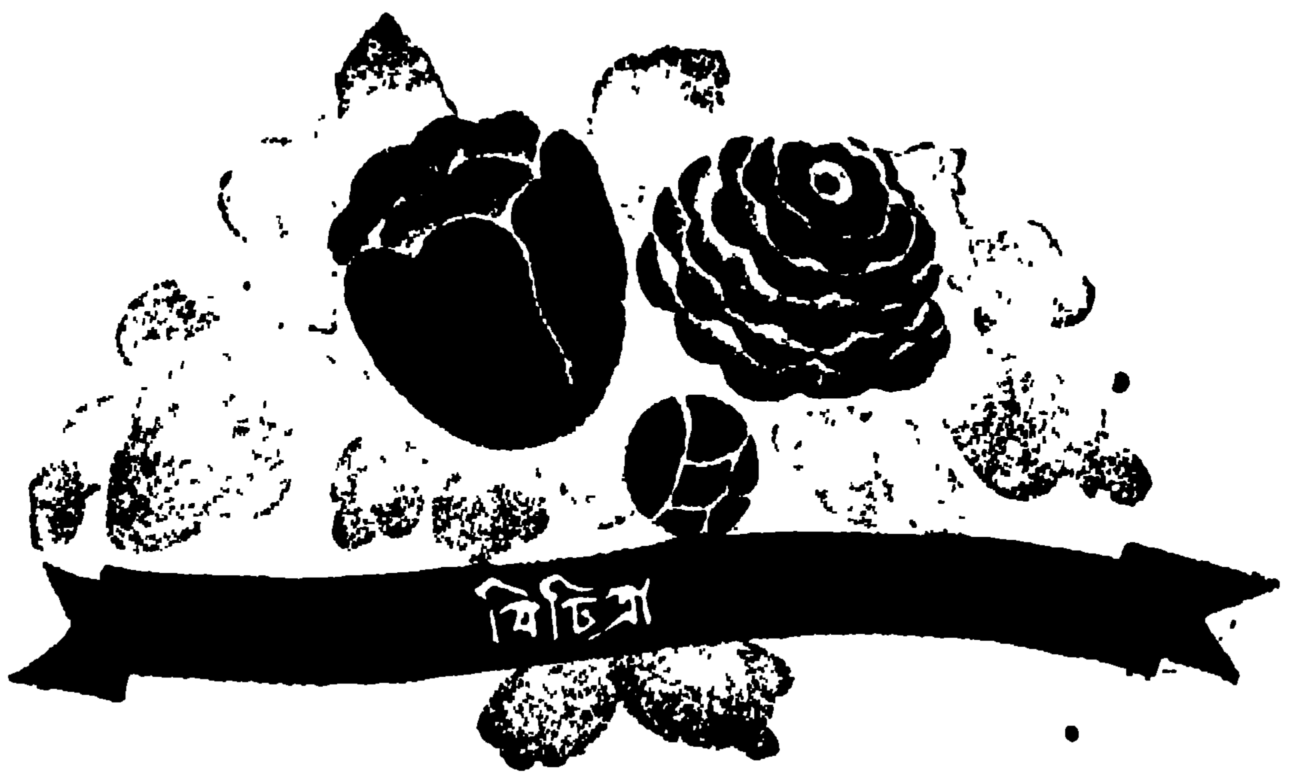

নেপালের পথে

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ

(ভাদ্রসংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৪। ইং ১৬।২।২৮। শীতের রাত্রি ৪টা, তখনও গভীর অন্ধকার। নানাদেশের যাত্রীগণ নানাভাষায় ভজন গান ধরিয়াছেন; কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছেন কেহ বা জিনিষপত্র বাঁধিয়া রওয়ানার উদ্যোগ করিতেছেন—কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া

আমলেক গঞ্জ

অদূরে রেষ্ট হাউস্ যাহাতে আমরা রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম।

গেল। লণ্ঠন লইয়া নীচে নামিয়া দেখিলাম বহু পশ্চিমা ও বিহারীযাত্রী খোলা ময়দানের অপরিষ্কৃত স্থানে, কেহ বা পথিপার্শ্বে, এই পাহাড়ি শীতের রাত্রে পড়িয়া আছেন। রাত্রে যতই শীত বৃদ্ধি হইয়াছে ততই তাঁহাদের হিন্দি ভজনের বিচিত্র সুর উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে—যাহা আমরা ধরমশালার দ্বিতল কক্ষ হইতেই উপভোগ করিয়াছি। ধন্য ইঁহাদের ধর্ম্মার্থে কষ্ট সহিষ্ণুতা। বহুযাত্রী এই রাত্রেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আহ্নিকাদির পর চা পান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলী তাঞ্জাম আসিতেও কিছু বিলম্ব হইল। ধরমশালার ভৃত্য ও মেথরকে কিছু বকসিস্ দিয়া আমরা সাতটা কুড়ি মিনিটে যাত্রা করিলাম।

এইবার আমাদিগকে পার্ব্বত্যপথে যাইতে হইবে। সম্মুখেই শিশাগোড়ীর খাড়া চড়াই, তাহার পর কয়েকটী পর্ব্বত ও উপত্যকা অতিক্রম করিয়া চন্দ্রাগিরির চড়াই ও কঠিন উৎরাই পার হইয়া নেপাল পৌঁছিতে দুইদিন লাগিবে। "শিশাগোড়ীকা চড়াই" এবং "চন্দ্রাগিরিকা উৎরাই" যে খুব কঠিন পার্ব্বত্য পথ, তাহা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কেদার বদরীর পথেও "বিজনীর" চড়াই ব্যতীত এরূপ কঠিন পার্ব্বত্যপথ নাই। খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে ২২২৫ ফিট্ উঠিতে হইবে। আমরা ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে লাগিলাম; যতই উপরে উঠিতেছি চীড়বৃক্ষ (Pine Tree) এবং নানারূপ হিমালয়ের বৃক্ষরাজি নয়নগোচর হইল। যাঁহারা পদব্রজে পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন তাঁহারা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া অতি ধীরে ধীরে উঠিতেছেন। পথে জলেরও অভাব, সুতরাং এ পথে যাওয়ার সময় যাত্রীগণ জল ও কমলালেবু, মিস্রী, তেঁতুল প্রভৃতি সঙ্গে রাখিবেন। চড়াইপথে বড়ই গলা শুকায়।

শিশাগোড়ী দুর্গের কিছু নীচে একটী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী আছে—পথশ্রান্ত যাত্রীগণ কেহ কেহ এখানে স্নান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। এখানে চিঁড়া, ছাতু ও কমলালেবু বিক্রয় হইতেছে। ভীমপেদী হইতে প্রায় তিন মাইল খাড়া উঠিয়া আমরা শিশাগোড়ীর পার্ব্বত্য দুর্গে বেলা নয়টা পঞ্চতাল্লিশ মিনিট সময় পৌঁছিলাম। এই দুর্গে সৈন্য ও গোলাগুলি রক্ষিত আছে। এখান হইতে ভীমপেদীর বাজার ও যে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আমরা আসিয়াছি তাহার অনেকাংশ দেখা

যায়। সামান্য সংখ্যক সৈন্য দুর্গোপরি হইতে শত্রুর আগমন রোধ করিতে পারে। দুর্গের অপরপার্শ্বে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সংকীর্ণ পথ—সঙ্গীনধারী নেপালী পুলিশ অবরোধ করিয়া আছে। বামপার্শ্বের একটী ঘরে চুঙ্গী বা শুল্ক আদায়ের আপিস্ (Custom office)। তথায় বাক্স ও বিছানাদি খুলিয়া দেখাইতে হয় কোন শুল্ক-আদায়-যোগ্য নূতন জিনিস বা নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য বা অস্ত্রাদি আছে কি না। দক্ষিণ পার্শ্বের একটী ঘরে নামধামাদির পরিচয় লেখাইয়া নূতন পাশ এবং যান ও মালবাহক কুলীদের নাম লিখাইয়া লইতে হয়। কুলি প্রতি তের পয়সা হিসাবে কর দিতে হয়। অপর একটী ঘরে কতকগুলি নামাঙ্কিত বাক্স আছে—যথা গৃহী,

ভীমপেদীতে বিশ্রাম

সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক। এই স্থানে পাশ দেখিয়া জনৈক রাজ-কর্ম্মচারী কয়জন পুরুষ কয়জন সাধু এবং কয়জন মহিলা তাহা গনিয়া তৎসংখ্যক ভুট্টার দানা উক্ত বাক্স গুলিতে ফেলিতেছেন। শুনিলাম দিনান্তে এই ভুট্টার দানা গণিয়া কোন জাতীয় যাত্রী কতজন নেপাল প্রবেশ করিবেন এই সংবাদ টেলিফোন দ্বারা কাটমণ্ডুতে জানান হয়।

কিছুক্ষণ সহযাত্রীগণের এবং মালবাহক কুলীর অপেক্ষায় থাকিতে হইল, কারণ সকলে একত্র হইলে মাল পরীক্ষা হইবে। আমরা পাশ লইতে লাগিলাম এবং সহযাত্রী শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্ট জিনিষপত্র পরীক্ষা করার জন্য লইয়া গেলেন। সমস্ত বিছানা ও বাক্স ব্যাগ খুলিয়া পরীক্ষা করিতে অনেক সময় লাগিবে, দু'একটি জিনিষ খুলিয়া দেখানর পর ভট্টজী আবিষ্কার করিলেন যে, নেপালীরা বিলাতী সিগারেট বড়ই প্রিয়; তাহাদিগকে কিছু সিগারেট বক্‌শিস দেওয়া মাত্র তাহারা আমাদের মাল আর খুলিয়া দেখিল না। আমরাও নিষ্কৃতি পাইলাম।

মনে করিয়াছিলাম যে, এখানেই শিশাগড়ীর চড়াই শেষ, কিন্তু গোড়ীর অপরপার্শ্বে গিয়া দেখিলাম আরও একটী সুউচ্চ খাড়া চড়াই সিঁড়ীর মত পর্ব্বত গাত্র দিয়া উঠিতে হইবে। এই পথে পার্ব্বত্য পুষ্পলতাশোভিত বৃক্ষের শোভা আরও মনোরম। রক্তপুষ্প সমন্বিত Rhododendrum বৃক্ষ, বিগোনিয়া ও আরও কত অপরিচিত বৃক্ষলতা দেখা গেল। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর্ব্বতারোহণ করিয়া আমরা এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে বেলা এগারটার সময় পৌঁছিলাম। এখান হইতে চারিদিকের শোভা আরও মনোরম। নীচে কুলিখালির ধর্ম্মশালা এবং নদীর রজত রেখা। চারিদিকেই পার্ব্বত্য দৃশ্য। ঐ চন্দ্রাগিরির পর্ব্বতমালা আরও উচ্চ; তাহার পর দূরে অতিদূরে হিমালয়ের চির-তুষারাবৃত শুভ্র রজতগিরিমালা।

এইখানে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চারিদিকের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা ও তার বা দড়ির পথ (Rope way) দেখিতে লাগিলাম। মাল বহন জন্য ভীমপেদীর ২ মাইল নীচে ধুরসিংহ গ্রাম হইতে কাটমুণ্ডু পর্য্যন্ত এই তারপথ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ধুরসিংহ গ্রাম হইতে ৪৫০০ ফিট্ উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া কাটামুণ্ডুর কিশিপেদী নামক স্থানে ইহা শেষ হইয়াছে। কিশিপেদীর উচ্চতা ধুরসিংহ হইতে ৯৩০ ফিট্। আকাশপথে বনজঙ্গল ও পর্ব্বতের উপরদিয়া এই তারপথ গিয়াছে। পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে খুঁটীর উপর একটি বড় চাকা সোজাভাবে বসান আছে, দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী তার ইলেক্‌ট্রিক মোটরের শক্তিতে অনবরত চালিত হইতেছে। এই দড়ির পথের দৈর্ঘ্য ১৪ মাইল। একটি খাঁচায় মাল বোঝাই করিয়া ঐ তারে আটকান আছে। ঐ খাঁচাগুলি অনবরত চালিত হইয়া ঘণ্টায় সাড়ে চার মাইল বেগে যাতায়াত করিতেছে। এই পর্ব্বতশৃঙ্গে উক্ত তার-

পথের একটী ষ্টেশনে ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিন দ্বারা তার চালিত হইতেছে দেখিলাম। মধ্যে বহু বিস্তৃত একটি উপত্যকা। ২।৩ মাইল দূরের আর একটি পর্ব্বত শৃঙ্গে অপর খুঁটির উপর দিয়া আকাশের মধ্য দিয়া তারদ্বয় উক্ত মালসহ অনবরত চালিত হইতেছে, ও শূন্য পথে বড় বড় বস্তা এবং কাষ্ঠের তীর বোঝাই হইয়া মাথার উপর দিয়া চলিতেছে। এইরূপ রোপ-ওয়ে (Rope-way) ভারতের আর কোন স্থানে আছে কিনা জানি না। * ইটালি সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে আছে।

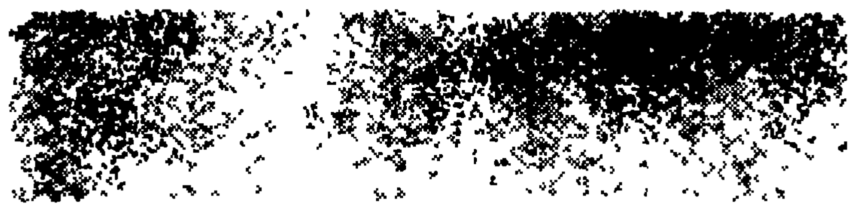

চিংলাং

এইবার উতরাই আরম্ভ হইল। নীচে কুলিখালি উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য, ক্রমে ঝর ঝর নিনাদিনী পার্ব্বত্য নদীর মধুর গর্জ্জন আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। পার্ব্বত্য-নদীর মধ্যে বড় বড় কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া মনে হয় যেন কতকগুলি হস্তী নদীর মধ্যে পড়িয়া আছে। বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় আমরা কুলিখালিতে পৌঁছিলাম। কুলিখালি অতি মনোরম স্থান। মেলা উপলক্ষে পুরী, তরকারী, কমলালেবু, চিঁড়া, চাউল প্রভৃতির দোকান খুলিয়াছে। নদীর উপর একটি সুন্দর ঝোলান সেতু। এখানে দুইটি দেবমন্দির; ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। নেপাল দরবারের পক্ষ হইতে সাধু ও দরিদ্রগণকে আহার্য্য বিতরিত হয়। আমরা স্নান আহ্নিক করিয়া গরম পুরী তরকারী ও কমলালেবু আহার করিয়া সঙ্গীগণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় দেড়ঘণ্টা অবস্থানের পরও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ এবং ডাক্তার শশীবাবু পৌঁছিলেন না। উভয়েই স্থূলকায়, পথেই দেখিয়াছিলাম তাঁহারা পদব্রজে পর্ব্বতারোহণে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের যদি পৌঁছিতে বিলম্ব হয় এবং অদ্য আর হাঁটিতে না পারেন, এই ভাবিয়া তাঁহাদের বিছানা ও মালের ব্যবস্থা রাখিয়া আমরা বেলা দেড়টার সময় কুলিখালি হইতে রওয়ানা হইলাম।

একটি পাহাড়ের পাশে পাশে রাস্তা—। এই উপত্যকাটি আরও সুন্দর; ফলভারাবনত কমলালেবুর পুষ্পমণ্ডিত আলুবোখারার প্রভৃতি গাছ এবং হরিৎ শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র সমূহ দেখা গেল। যে পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া পথ তাহার নাম একদণ্ডা। নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। এখানে দুইটি পথ; একটি চড়াই উৎরাই করিয়া সোজা নদী গর্ভ দিয়া পাকদাণ্ডি পথ, আর একটি পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘুরিয়া পার্ব্বত্য পথ।

আমরা শেষোক্ত দীর্ঘ পথে গমন করিয়া বেলা ২-৪৫ মিঃ মাকু নামক স্থানে পৌঁছিলাম। আমাদের ভারবাহক কুলি এবং বরকন্দাজ নদী পথে গিয়া আমাদের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দেখিলাম সহযাত্রীরা কেহই পৌঁছেন নাই। বাহক কুলিরা তাগাদা করিতে লাগিল, বাবু আজ চেতলাং না পৌঁছিতে পারিলে কল্য কাটমুণ্ডু পৌঁছিতে পারিবেন

* বছর কুড়ি পূর্ব্বে শিমলা শৈলে রেল ষ্টেশন হইতে গঞ্জে মাল যাতায়াতের জন্য ঠিক এইরূপ Rope-wayর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, বাঁধন ছিঁড়িয়া মালের বাক্স গৃহস্থের বাড়ির উপর পড়ায় সহরের পথে ওরূপ ব্যবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুনরায় সে ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল কি না এবং এখনো চলিত আছে কি-না জানি না। বিঃ সঃ।

না। রাস্তার ধার হইতে কিছুদূরে নদীতীরে ধরমশালা দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, যদি ধরমশালায় গিয়া রাত্রিযাপন করি সঙ্গীরা জানিতে পারিবেন না যে, আমরা

পশুপতিনাথের পথে বিষ্ণুমতী নদী

এইস্থানে আছি কিনা। হয়ত অগ্রসর হইয়া চলিয়া যাইবেন। পথের পার্শ্বেই কয়েকটি তাঁবু খাটানো ছিল, কিন্তু এগুলি যে যাত্রীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। কুলিদের তাগাদায় আমরা অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলাম।

কিছুক্ষণ চড়াইর পর যে স্থানে উঠিলাম তাহা ধান্য ক্ষেত্র শোভিত কতকটা সমতল ক্ষেত্র। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের উন্মুক্ত দৃশ্য—বড় মনোরম। পাহাড়ের গায়ে কেয়ারি করা হরিৎ ধান্য ক্ষেত্রগুলির মরকত শোভা। এই স্থানকে "লহরী নেপাল" বলে। দূরে নিকটে পাহাড়ীয়াদের হরিদ্রা রং রঞ্জিত গৃহ সমূহ দেখিয়া কাশ্মীরের দৃশ্য মনে পড়িল। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, চেতলঙ্গের ধরমশালার অভিমুখে আমরা অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় হঠাৎ ঘনকৃষ্ণ মেঘ উঠিয়া মুসলধারে বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হইল।

জলে ভিজিতে ভিজিতে তাড়াতাড়ি একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলাম বহুযাত্রী রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতেছে। আমাদের কুলিরাও বলিল ধরমশালা এখান হইতে দেড় মাইল দূরে। জলে ভিজিয়া পিছল্ পথে যাওয়া কঠিন। বহুযাত্রী আগে গিয়াছে, স্থান পাওয়া যাইবে না। যাহা হোক একটি কম্বল মুড়ি দিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে বাসা খুঁজিতে লাগিলাম। যে ঘরেই যাই দুর্গন্ধে প্রাণ যায়, তাহাও লোকে পূর্ণ। নেপালিরা নীচেকার ঘরে গরু, মুরগী প্রভৃতি পোষে ও বিচালি লকড়ি প্রভৃতি রাখে, সুতরাং বড়ই অপরিষ্কার। একটি গরীব নেপালি দম্পতীর কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতলের ক্ষুদ্র কক্ষে কোনরূপ রাত্রি কাটাইবার জন্য আট আনা ভাড়া স্থির করিলাম। এই ঘরটি রাস্তা হইতে কিছুদূরে। আমরা মাত্র দুইতিন জন আসিয়াছি। কিন্তু সহযাত্রীরা, বরকন্দাজ, চাকর বা মালবাহী কুলি কেহই পৌঁছে নাই। ঝড় বৃষ্টির জন্য ছত্রভঙ্গ ব্যাপার হইয়াছে। আমাদের সহযাত্রীগণ হয়ত চেতলঙ্গের ধরমশালায় চলিয়া

কাটমুণ্ডু—হনুমান ঢোকা, প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরাদি

যাইবেন এই আশঙ্কায় আমি কম্বল মুড়ি দিয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অনেক যাত্রীই সঙ্গীছাড়া হইয়াছেন; কাহারও বা কুলি বা মাল পৌঁছে নাই। যাত্রীগণের মধ্যে হাহাকার ও কান্নাকাটি পড়িয়া

গিয়াছে। আমাদের দুইজন সঙ্গী পৌঁছিলেন; কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হইল, মাল বা কুলি পৌঁছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম আমাদের বরকন্দাজ জলে ভিজিতে ভিজিতে আসিতেছে, কিন্তু মাল বা কুলি তাহার সঙ্গে নাই। সে বলিল তাহারা চাকরের সঙ্গে আসিতেছে। তাহাকে খুব তিরস্কার করিলাম। চাকরটি দুর্ব্বল, কখনই কুলির সঙ্গে হাঁটিতে পারিবে না। আশঙ্কা হইল যদি কুলিরা মাল সহ পলায়ন করিয়া থাকে তবেই সর্ব্বনাশ, এই শীতের রাত্রি কিরূপে কাটিবে। নেপালের পথে কুলিরা যে মালপত্র লইয়া সময় সময় পলায়ন করে তাহা জানা ছিল সুতরাং খুবই মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইল।

কাটমুণ্ডু—প্রধান বাজার ইন্দ্রচক

নেপালি পুলিশ কর্ম্মচারীরা যথেষ্ট তদারক ও পাহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন একটু দেখিয়া যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে অনুসন্ধান করিবেন। প্রায় এক ঘণ্টার পর দেখিলাম কুলিদ্বয় মাল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে,—সঙ্গে ভৃত্য নাই। যাহা হউক মালগুলিও পাইলাম, সঙ্গীগণের মধ্যেও প্রায় সকলেই ক্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। কেবল কুলীখালিতে যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম তাঁহারা ও ডাক্তারদ্বয় পৌঁছেন নাই। ইঁহারা মার্কু'র পূর্ব্বোক্ত তাঁবুর নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ঐ তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করেন। মামীমাতা ঠাকুরাণীকে পাওয়া গেল না। বড়ই চিন্তা হইল, তাঁহার সঙ্গে শীতবস্ত্র বিশেষ কিছুই নাই। তিনি পথে আসিতে আসিতে একটি কাণ্ডী ভাড়া করিয়া আমাদের অগ্রেই যাইতেছিলেন দেখিয়াছি। যাহা হউক আমরা পুলিশের ইনেস্পেক্টারকে এই কথা বলায় তিনি বলিলেন যে, নাম লিখিয়া সঙ্গে একজন সনাক্তকারী লোক দাও আমরা খুঁজিয়া বাহির করিব। বরকন্দাজকে তাঁহার সঙ্গে দিলাম। শরীর বড়ই ক্লান্ত; এইবার আহারের ব্যবস্থা। রান্নার স্থানাভাব। দোকানে কেবল দুগ্ধ পাওয়া গেল। ষ্টোভে চা প্রস্তুত করিয়া পান করা গেল, এবং ষ্টোভেই পুরী তরকারী প্রস্তুত হইতে লাগিল। আজ ষ্টোভ সঙ্গে না থাকিলে অনাহারেই রাত্রি কাটাইতে হইত। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বরকন্দাজ সহ মামীমাতাঠাকুরাণী পৌঁছিলেন। কুলিরা তাঁহাকে চেতলঙ্গের ধরমশালায় লইয়া গিয়াছিল। জলে ভিজিয়া শীতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হয়। সঙ্গে সামান্য যাহা কিছু পয়সা ছিল, তাহার দ্বারা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে ভীড়ের মধ্যে খুঁজিয়া পুলিশ ও আমাদের বরকন্দাজ বাহির করে। আমাদের ভৃত্যটিরও আজ অতি পরিশ্রমে জ্বর হইয়াছে। সে রাত্রে কিছু খাইতে পারিল না। আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি এগারটা বাজিল।

৪ঠা ফাল্গুন ১৭।২।২৮ চেতলঙ্গ হইতে কাট্‌মুণ্ডু

প্রাতঃকালে বড়ই শীত, কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। অগ্নি জ্বালিয়া হাত পা গরম করিতে করিতে চা প্রস্তুত হইল। যাঁহারা গত রাত্রে মার্কু'র তাঁবুতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরা

আট তেরজন যাত্রী, তিন জন স্ত্রীলোক, আট জন পুরুষ এবং একজন চাকর ও একজন বরকন্দাজ। রওয়ানা হইতে বেলা সাড়ে নয়টা বাজিল। বেশ রৌদ্র হইয়াছে। চেতলঙ্গের উপত্যকার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। বেলা দশটা পনর মিনিটে আমরা চেতলঙ্গের পান্থ নিবাসের নিকট পৌছিলাম। এখানে ক্ষুদ্র বাজার, দুইটি মন্দির ও সদাব্রত আছে—দরিদ্রগণকে আহার্য্য দেওয়া হয়। এইখানে উপত্যকা শেষ হইয়া চন্দ্রাগিরির চড়াই আরম্ভ হইল। অর্দ্ধঘণ্টা কড়া চড়াই আরোহণ করিয়া আমরা চন্দ্রাগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিলাম। এই স্থানে একটি গোলাকার নিশানাদিযুক্ত প্রস্তরস্তূপ আছে; কুলিরা বলিল দেবস্থান, চারিদিকে পরিক্রমা করা হইল। এই সর্ব্বোচ্চ শিখর সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০০০ হাজার ফিট্ উচ্চ। খুব শীত—রাত্রে তুষার পাত হইয়াছে। বড় বড় পাহাড়ীয়া বৃক্ষ লতা দেখিয়া দার্জ্জিলিংএর দৃশ্য ও কেদার পথের আরণ্য শোভা মনে পড়িল।

চন্দ্রাগিরির শিখর দেশ হইতে নেপালের বিস্তীর্ণ উপত্যকাটি চিত্রপটের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। এই উপত্যকা চতুর্দ্দিকে উন্নত পর্ব্বতমালায় অবরুদ্ধ; কেবল দক্ষিণে বাগমতী নদীর নির্গম স্থান। নেপালের পৌরাণিক কিম্বদন্তী এই যে, অতি পুরাকালে কাশ্মীর উপত্যকার ন্যায় নেপাল উপত্যকায় একটি প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য হ্রদ ছিল। হিন্দু মতে বিষ্ণু, এবং বৌদ্ধ স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ব তরবারির আঘাতে পর্ব্বত ভেদ করিয়া জল নির্গমনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কালে নেপাল মনুষ্য বাসের উপযোগী হইল। উপত্যকাটি অনেকটা সমতল এবং কঙ্করশূন্য, নদীতলের ন্যায় পল্বলময়।

এইবার চন্দ্রাগিরির ভীষণ উৎরাই আরম্ভ হইল। খাড়া সংকীর্ণ পথ, অনেকস্থানে পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় পথ নাই বলিলেই হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রত্যহই তুষারপাত হয়, সুতরাং পথটি পিছল। কল্য খুব বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অদ্য রাস্তায় ভয়ানক কাদা। প্রতি পদক্ষেপে পা পিছলাইবার আশঙ্কা। দুই হাজার ফিট্ খাড়া উৎরাই; দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। অনেক স্থলে গাছের শিকড় বা লতা ধরিয়া নামিতে হয়। এ পথে ঘোড়া বা খচ্চর চলে না। তাই নেপালের পথ এত ভীষণ। কিন্তু ধন্য নেপালী কুলী—তাহারা বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ড এবং সকল প্রকার মাল, যাত্রীসমেত তাঞ্জাম বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর ধন্য তীর্থ যাত্রীগণের মনের বল। কত ধনী ও বৃদ্ধা মহিলা এবং সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ যাত্রী এই পথে হাঁটিয়াই যাইতেছেন। কয়েকটা স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা মাড়ওয়ারী রমণী পুণ্যলাভ কামনায় ধনবতী হইয়াও হাঁটিয়া চলিয়াছেন। ভগবানে অগাধ বিশ্বাসে ও মনের বলে তাঁহারা এই অসাধ্যসাধন করিতেছেন। জনৈক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম কাষ্ঠ পাদুকা পরিয়া এই দুর্গম চড়াই উৎরাই পথে চলিয়াছেন।

টুটীখেল ময়দান
নেপালী সৈন্যের প্যারেড—শিবরাত্রির দিন

যদিও আমরা তাঞ্জাম আরোহণে যাইতেছি, কিন্তু প্রতিক্ষণই ভয় হইতেছে কোথায় কোন বাহকের পা পিছলাইয়া না যায়। তাহারাও অতি কষ্টে সাবধানে ধীরে ধীরে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া নামিতেছে। অদ্য চারিদিক কুজ্ঝটিকাবৃত। কিছুক্ষণ উৎরাইএর পর রৌদ্র উঠিলে কুজ্ঝটিকা অপসৃত হইল, তখন নেপাল উপত্যকার অপূর্ব্ব দৃশ্য স্বপ্নপুরীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। চারিদিকেই

পর্ব্বতবেষ্টিত এই অপূর্ব্ব উপত্যকায় মঠ মন্দির স্তূপের সুবর্ণরঞ্জিত চূড়াসমূহ, নগরগুলির সুধাধবলিত সৌধাবলি এবং শস্যশ্যামলক্ষেত্র ও ময়দান অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। যেন একটি অপূর্ব্ব চিত্রপট। দূরে অতি দূরে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত কিরীটমালা। (বিচিত্রা ভাদ্র সংখ্যা ৪০৫ পৃষ্ঠায় চিত্র।) প্রায় এক ঘণ্টা পনর মিনিট উৎরাইএর পর আমরা বেলা বারটায় পর্ব্বত-পাদমূলে থানকোটে পৌঁছিলাম। এখানে বহুযাত্রীর জমায়েত হইয়াছে। পথিপার্শ্বে বাজার এবং নির্ঝরিণী—যাত্রীগণ এখানে স্নানাহ্নিক, রন্ধন, আহার ও বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। এখনও হাঁটাপথে আট নয় মাইল যাইলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব। (১)

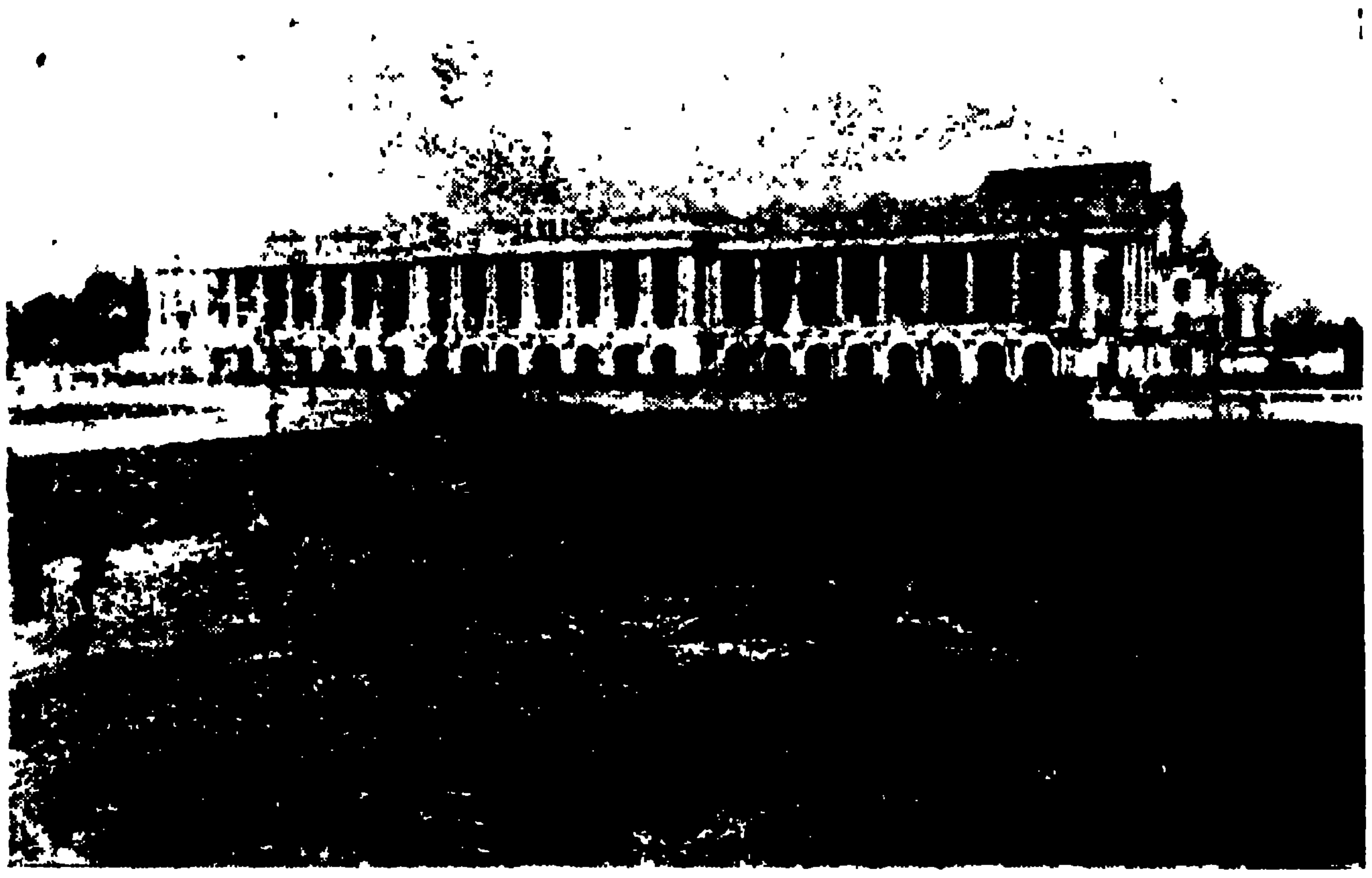

মন্ত্রী মহারাজের রাজপ্রাসাদ—সিংহ দরবার

তখন বেলা বারটা। যাঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন তাঁহারা বড়ই ক্লান্ত, বিশেষতঃ ভট্টজী দোকানের কিছু খান না—স্বপাক খাইয়া থাকেন; সুতরাং স্থির হইল তাঁহারা এবং ডাক্তারদ্বয় এখানে স্নানাহার করিয়া যাইবেন। এক্ষণে তর্ক উপস্থিত হইল বাসা কোথায় করিতে হইবে? বাঙ্গালী ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় থাকিবার জন্য বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের পরিচয়পত্র আছে। পথে নেপাল দরবারের Private Secretaryর ভ্রাতা নারায়ণ ভক্ত মহাশয় একটী পরিচয় পত্র দিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি খড়িদার ছত্রবাহাদুর আমাদিগকে তাঁহার দিল্লী বাজারের গৃহে অতিথি হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার বাড়ী কাটামুণ্ডু সহর এবং পশুপতি নাথজীর মন্দিরের মাঝামাঝি, সুতরাং পশুপতিনাথের নিকট। কাটামুণ্ডু সহরে বাসা লইলে দেড়মাইল বেশী হাঁটিয়া পশুপতিনাথ যাইতে হইবে। স্থির হইল আমি স্ত্রীলোক ও ভৃত্যাদি সহ ছত্রবাহাদুরের বাড়ী খুঁজিয়া তথায় সমস্ত ঠিক করিব। বন্ধুগণ স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌঁছিবেন। বেলা ১টায় আমরা থানকোট হইতে রওয়ানা হইলাম।

শিবরাত্রি নেপালের প্রধান পর্ব্ব। এই সময় নেপালের ও ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। নেপাল দরবার হইতে পথঘাটে পাহারার বন্দোবস্ত হয় এবং দরিদ্র যাত্রীগণের ও সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রত খোলা হয়। যাত্রীগণ পশুপতি-নাথজীর জয় উচ্চারণ করিয়া, কেহ বা ভজন-গান করিতে করিতে পরমানন্দে চলিয়াছেন; আজ তাঁহাদের পথের কষ্ট শেষ হইবে এবং পশুপতিনাথজীর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। নেপাল উপত্যকা প্রাকৃতিক শোভার অপূর্ব্ব ভাণ্ডার—বিশেষতঃ এই ফলপুষ্প-ভরা সুমধুর বসন্তকালে। নেপালি ভিক্ষুকগণ সারঙ্গী বাজাইয়া বসন্ত আগমনের সুন্দর হিন্দি গ্রাম্যগীত গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। রাস্তার পার্শ্বেই পুষ্পিত সর্ষপ ক্ষেত্র। উত্তরে গোঁসাইথান, এভারেষ্ট, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি হিমালয়ের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সর্ব্বোচ্চ তুষার শৃঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা। এই সকল দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে জন কোলাহল মুখরিত পথে অগ্রসর হইতেছি—অদূরে একটি পর্ব্বতের উপরে প্রাচীন কীর্ত্তিপুর নগরের ভগ্নাবশেষ এবং বৌদ্ধস্তূপের উচ্চ চূড়া নয়নগোচর হইল।

(১) পর বৎসর, অর্থাৎ ১৩৩৫ সাল হইতে থানকোট হইতে কাটমুণ্ডু পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস্ হইয়াছে।

ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কালীমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সেতু পার হইয়া কাটমুণ্ডু নগরে প্রবেশ করিলাম। ইহার প্রাচীন নাম কান্তিপুর; বিষ্ণুমতী ও বাগমতী নদীর সঙ্গম

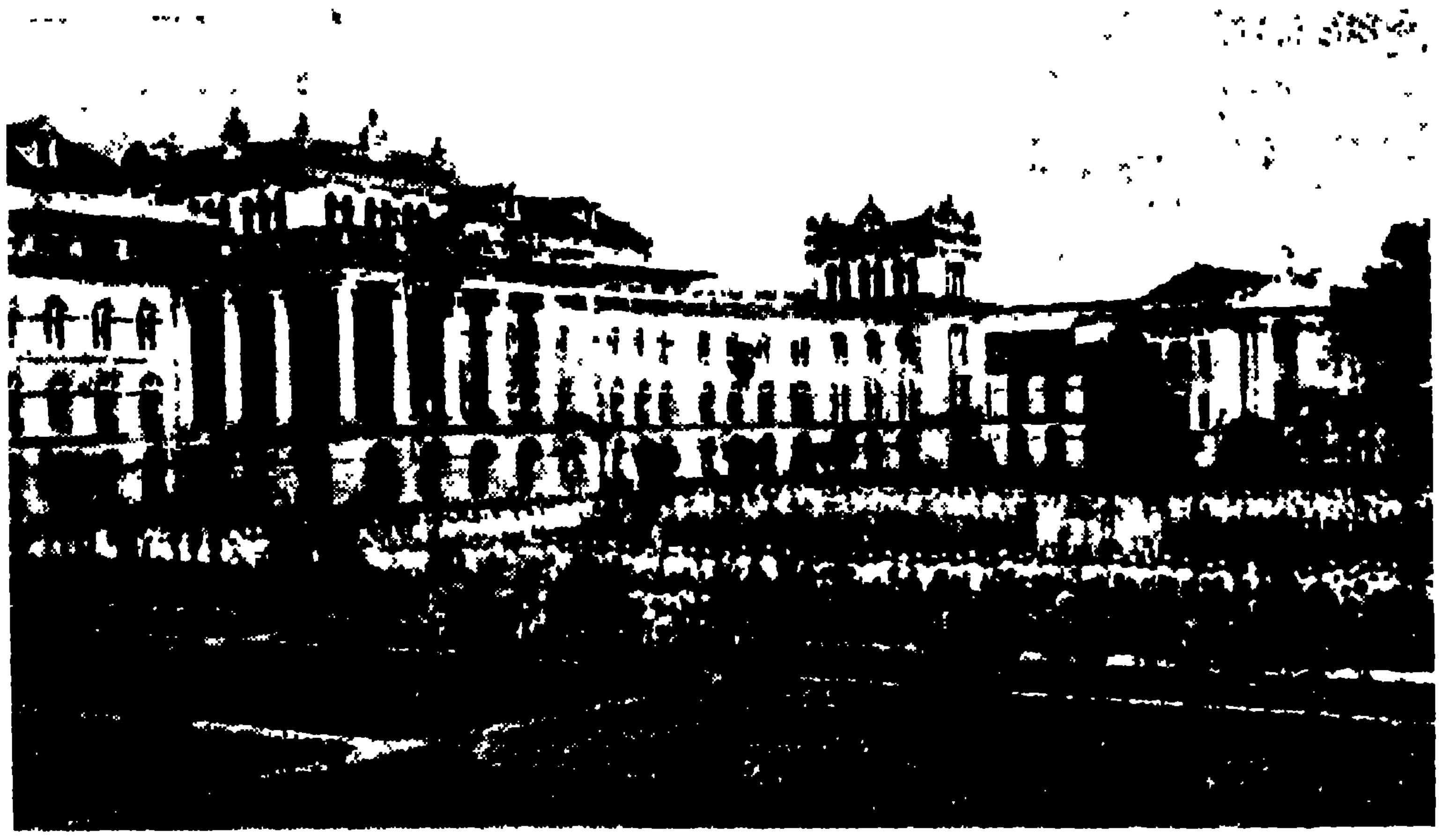

পাঁচ রাজ প্যালেস্
বর্ত্তমান নেপালের মহারাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ

স্থলে ৭২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা গুণরাম দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালের প্রাচীন বংশাবলী বা ইতিহাসে লিখিত আছে যে, মহালক্ষ্মী রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন যে, বাগমতী ও বিষ্ণুমতী সঙ্গম স্থলে এক নগর নির্ম্মাণ করিবে যাহার আকার আমার খড়্গের ন্যায় হইবে। এই সহরে প্রতিদিন লক্ষ টাকার কারবার হইবে। শুভলগ্নে রাজা পাটন হইতে কান্তিপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সিংহ মল্ল তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীদের জন্য সহরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজ প্রাসাদের সন্নিকটে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে এই গৃহ একটি মাত্র বৃহৎ বৃক্ষ হইতে নির্ম্মিত হয়। এই বৃহৎ গৃহের নাম কাষ্ঠ মণ্ডপম্। কাষ্ঠমণ্ডপম্ হইতেই কাটমুণ্ডু নামের উৎপত্তি। এই সহরের অধিকাংশ মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত। ইষ্টক নির্ম্মিত ঘরগুলির বারান্দা ছাদ প্রভৃতি মনোরম শিল্পশোভাযুক্ত সুরঞ্জিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত। উপরোক্ত কাষ্ঠমণ্ডপের নিকটেই নেওয়ার রাজাদের পুরাতন রাজপ্রাসাদ হনুমানঢোকা। সিংহদ্বারের সম্মুখেই হনুমানজীর বিশালমূর্ত্তি। নেপালি "ঢোকা শব্দের অর্থ দ্বার। হনুমান ঢোকা রাজ প্রাসাদের সম্মুখের চত্বরের চারিপার্শ্বে সুদৃশ্য কারুকার্য্যখচিত সুরঞ্জিত কাষ্ঠময় দেবমন্দিরসমূহ স্তম্ভ প্রভৃতির অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। বর্ত্তমান গুর্খারাজগণ এই প্রাসাদে বাস করেন না।

হনুমানঢোকার কিছু দূরে প্রধান হিমাচলের ক্রোড়ে অবস্থিত পাশ্চাত্য-প্রভাব-বর্জ্জিত বাজার ইন্দ্রচক্। হিন্দুরাজধানীর সুচিত্রিত আকাশচুম্বী কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবমন্দিরসমূহ, রাজপ্রাসাদ, প্রাচ্যরীতিতে নির্ম্মিত গৃহসমূহ ও হিন্দু বৌদ্ধ জনকোলাহল-মুখরিত বাজার চক্ প্রভৃতির প্রাচ্যভাব দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম; মনে হইল আমরা বাস্তব

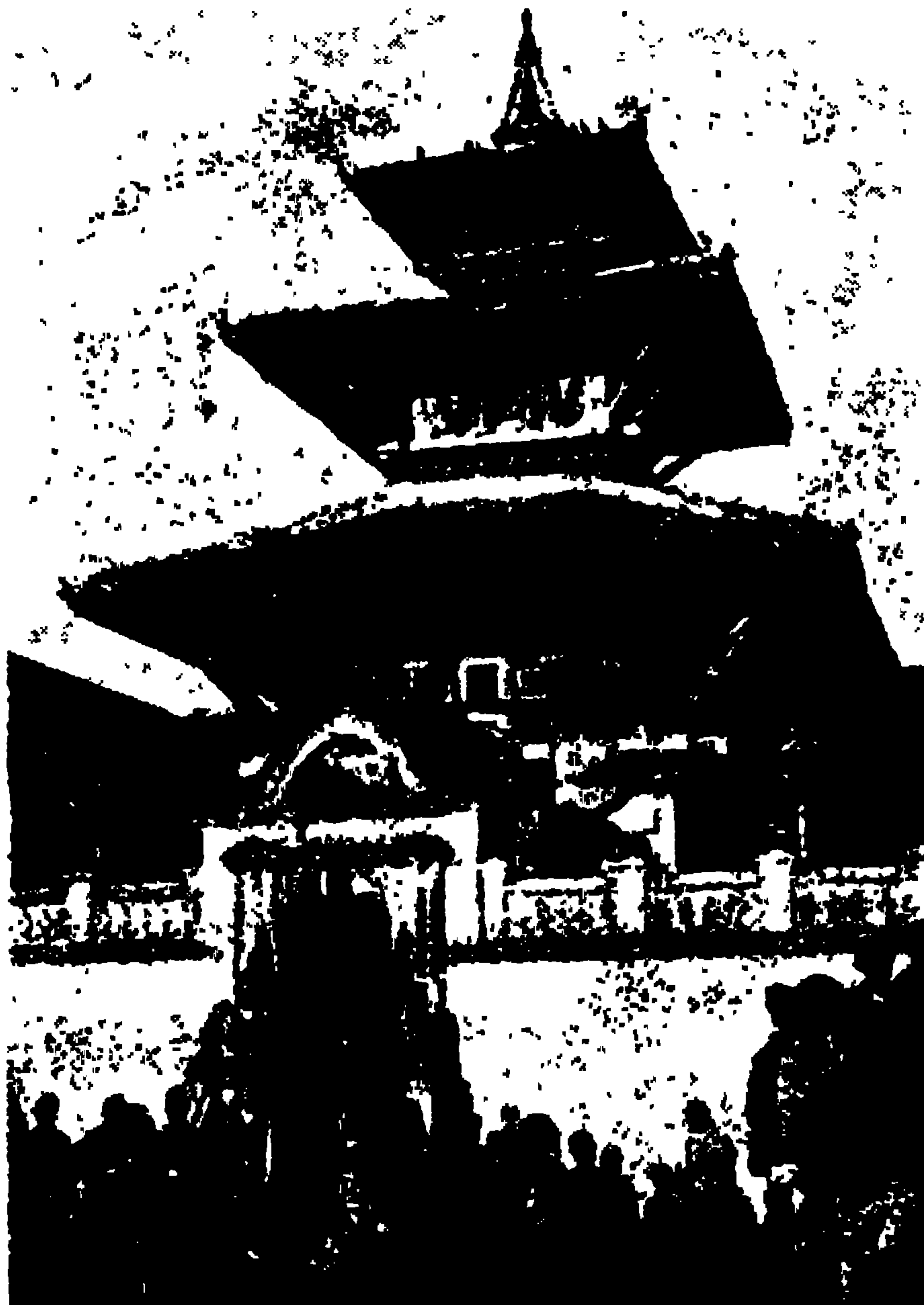

কাটমুণ্ডু—প্রাচীন মহাকাল মন্দির

জগতে বিচরণ করিতেছি,—না, স্বপ্নে মধ্যযুগের কোন প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর দৃশ্য দেখিতেছি।

সহর অতিক্রম করিয়া যখন এক প্রকাণ্ড ময়দানে পড়িলাম তখন স্বপ্ন ভগ্ন হইল। এই প্রকাণ্ড ময়দানের চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোক এবং বিলাতী প্রণালীতে নির্ম্মিত সৌধমালা, রাজপ্রসাদ, হাঁসপাতাল, কলেজ, মনুমেণ্ট, সরোবর, অশ্বারোহী সেনাপতিগণের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি—ঠিক যেন কলিকাতার গড়ের মাঠ। ইহাই প্রসিদ্ধ "টুটীখেল" বা নেপালি সৈন্যগণের কুচ্‌কাওয়াজের স্থান। ইহার দৈর্ঘ্য একমাইল এবং প্রস্থ অর্দ্ধমাইল। এই ময়দানের চতুর্দ্দিকে মন্ত্রী মহারাজের সিংহ দরবার, রাজপুরুষগণের প্রাসাদ সমূহ

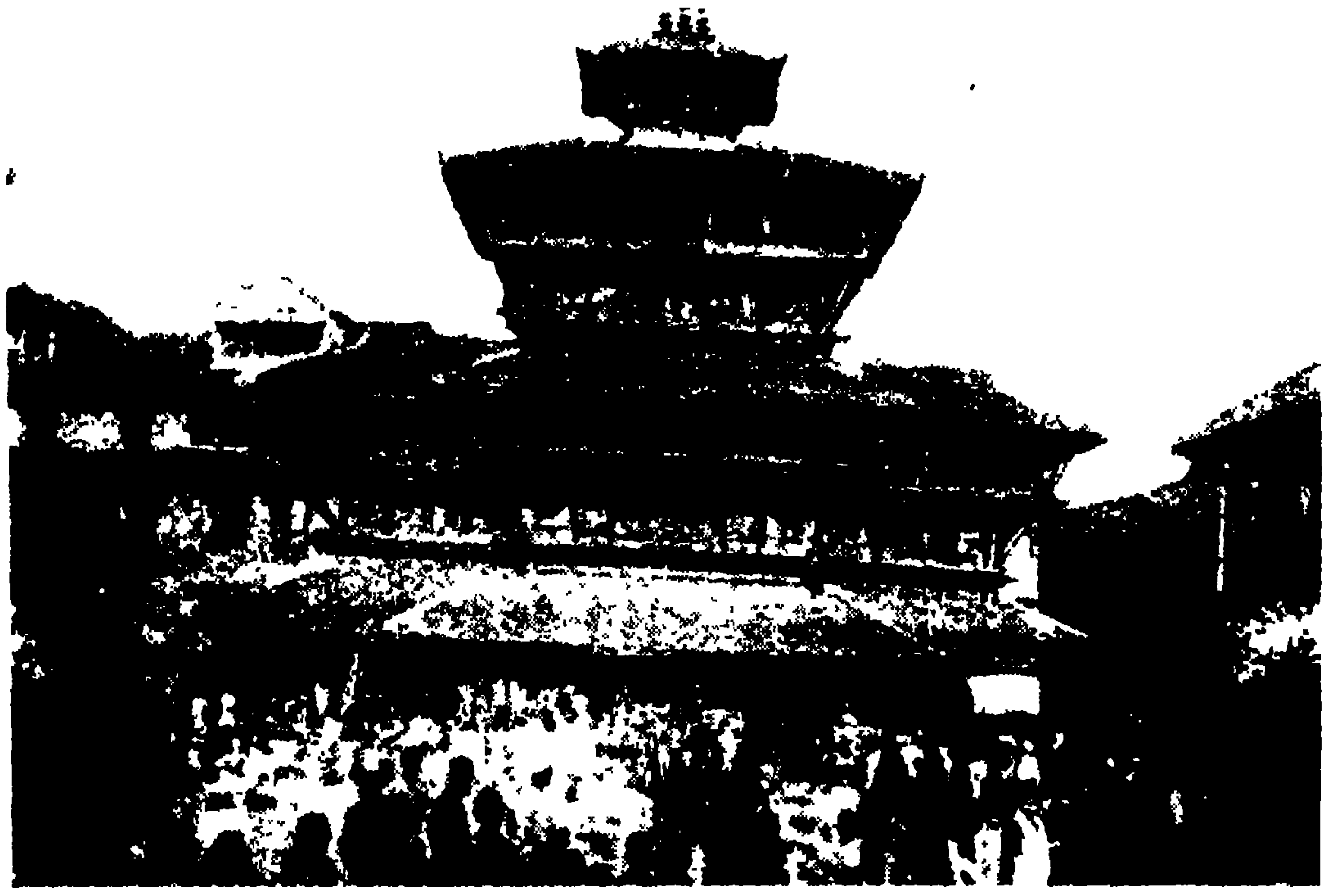

কাটমুণ্ডু—গোরক্ষনাথ মন্দির

হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, ঘড়িঘর, বৈদ্যুতিক কারখানা প্রভৃতি আধুনিক স্থাপত্য প্রণালীতে নির্ম্মিত সুরম্য সৌধমালা।

মাঠের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ মহাকালমন্দির। এই ময়দানে জঙ্গ বাহাদুর, বীর সমশেরজঙ্গ ভীমসেন থাপপা প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণের অশ্বারোহী মূর্ত্তি সমূহ শোভা পাইতেছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ভীমসেন থাপপার নির্ম্মিত স্তম্ভ বা মনুমেণ্ট। যে রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা দিল্লীবাজারে যাইতেছি তাহারই পার্শ্বে রাণীপুকুর নামে একটি সুন্দর সরোবর ও তন্মধ্যস্থ দেবমন্দির দেখিলাম। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা প্রতাপচন্দ্র মল্ল পুত্র শোকাতুরা রাণীর সান্ত্বনার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতের সমুদয় তীর্থ হইতে পবিত্র সলিল আনাইয়া ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। সরোবরের দক্ষিণে হস্তীর উপর রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁহার রাণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ময়দান অতিক্রম করিয়া আমরা দিল্লীবাজার মহল্লায় পৌঁছিয়া বাজারে একটু অনুসন্ধান করিয়াই ছত্র বাহাদুরের গৃহে পৌঁছিলাম।

তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন—তাঁহার দ্বিতলস্থ কার্পেটাচ্ছাদিত বিদ্যুতালোকিত বৈঠকখানা গৃহ আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সঙ্গীগণ সন্ধ্যার সময়ই পৌঁছিলেন। ভট্টজী আসিয়া বলিলেন, লেপটনাণ্ট তোপ বাহাদুর গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ফরাসীদেশে গোর্খা সৈন্যগণের সহিত ব্রিটিশ পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করিতেছিলেলেন, সেই সময় দেওঘর বৈদ্যনাথে তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কখনও নেপাল যান আমার বাড়ী দিল্লীবাজারে সাক্ষাৎ করিবেন। ভট্টজী তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার গৃহে অতিথি হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। অবশেষে স্থির হইয়াছে যে, কল্য প্রাতে আটটার সময় তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া সঙ্গে লইয়া পশুপতিনাথ দর্শন করাইবেন। আজকাল মন্দিরে বড়ই ভীড়। যাহাতে আমাদের কোন কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। আমরা আহারাদি করিয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। এইবার পথের কথা শেষ। বারান্তরে পশুপতিনাথের কথা এবং নেপাল ভ্রমণের কথা বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ

প্রাচীন ভারতে কুরুবংশ

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি

৩

অতঃপর পাণ্ডবেরা তাহাদের হৃতরাজ্য লাভ করিলেন এবং বিস্তীর্ণ কুরু-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। বিজেতারা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার মহিষীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের তত্বাবধানে বেশীদিন ছিলেন না। পাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিবার জন্য তাঁহারা বনে গমন করেন। বৃদ্ধ বয়সে এই বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় আর্য্যদের ধর্ম্মেরই অঙ্গ ছিল। যুধিষ্ঠিরও দীর্ঘদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। বৃষ্ণিদের ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। রাজ্য ত্যাগের সময় যাদবদের একমাত্র বংশধরের হাতে যুধিষ্ঠির শক্রপ্রস্থের রাজ্য ভার অর্পণ করেন এবং হস্তিনাপুরের ভার অর্পিত হয় অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যু এবং উত্তরার পুত্র পরীক্ষিতের হাতে।

অভিমন্যুর ঔরসে এবং তাঁহার পত্নী উত্তরার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরিক্ষীণ কুরুবংশের সন্তান বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় পরীক্ষিত। সংসার পরিত্যাগের সময় যুধিষ্ঠির এই পরীক্ষিতকেই হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। নূতন সম্রাট রাজ-কর্ত্তব্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিদ্যা, এবং সর্ব্বপ্রকার মহৎ গুণে ভূষিত ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাসক এবং নীতিশাস্ত্রবিৎ বলিয়া তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। ৬০ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেন। প্রজা-সাধারণের অনুরাগও তিনি পর্য্যাপ্ত মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহাবীর ছিলেন; ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না। তিনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদা রাজ্যভার মন্ত্রীদের হস্তে অর্পণ করিয়া মৃগয়ার্থে তিনি বনে গমন করেন, সেখানে একটি হরিণকে দেখিতে পাইয়া শর নিক্ষেপে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু শরবিদ্ধ হইয়াও হরিণটি পলায়ন করিল। পরীক্ষিত হরিণটি অনুসরণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে অতিমাত্রায় ক্লান্ত এবং পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তিনি যখন পলায়িত হরিণের অন্বেষণে ব্যস্ত, তখনই একজন ঋষি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। পরীক্ষিত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিণটি কোন পথে পলায়ন করিয়াছে তাহা তিনি দেখিয়াছেন কিনা। ঋষি তখন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। ইহাতে রাজা রুষ্ট হইয়া ধনুকের প্রান্ত-ভাগের দ্বারা ঋষির গ্রীবাদেশে একটি মৃত সর্প ঝুলাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই ঋষির শৃঙ্গী নামে একটি পুত্র ছিল। প্রজাপতির পূজা সাঙ্গ করিয়া শৃঙ্গী যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখনই পিতার এই অবমাননার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে,—"অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে আমার আজ্ঞায় নাগরাজ তক্ষকের দংশনে যে পাপাশয় ব্যক্তি আমার নির্দ্দোষ পিতার গলায় মৃত সর্প জড়াইয়া দিয়াছে সে ভস্মাবশেষে পরিণত হইবে।" তাহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পিতার কাছে তিনি তাঁহার অভিসম্পাতের কথা ব্যক্ত করিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া ঋষি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন। অতঃপর রাজাকে এই অভিসম্পাতের কথা জ্ঞাপন করা হইল, এবং তাঁহাকে সতর্ক হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করা হইল। সপ্তম দিবসে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে নাগরাজ তক্ষক পরীক্ষিতের প্রাসাদ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার সহিত কাশ্যপ

নামে একজন ঋষির দেখা হইল। তক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় যাইতেছেন ?" তিনি বলিলেন —"তক্ষকের দংশনে রাজা পরীক্ষিত ভস্মাবশেষে পরিণত হইলে আমি তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব এই উদ্দেশ্য লইয়া আমি পরীক্ষিতের কাছে গমন করিতেছি।" তক্ষক তখন একটি বট বৃক্ষকে দংশনে ভস্ম করিয়া কহিলেন—"এইবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করুন।" তক্ষক বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, কাশ্যপের মন্ত্র প্রভাবে বৃক্ষটি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তক্ষক কাশ্যপকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের মূল্য স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। অর্থ লইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া গেলে তক্ষক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে দংশন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইল।

পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জনমেজয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাগের দংশনে পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া সর্পবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার মনে সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। তদনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইল। ঋষিদের মন্ত্রপ্রভাবে সর্পদল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে যজ্ঞাগ্নিতে সহস্র সহস্র সর্প পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। ভীত হইয়া সর্পরাজ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন। সর্পরাজের এই আশ্রয়গ্রহণের ব্যাপার জনমেজয়কে জ্ঞাপন করা হইল। রুষ্ট হইয়া রাজা কহিলেন—"তবে তক্ষকের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রও আগমন করুন এবং এই অগ্নিতে নিপতিত হোন্।" ইহার পর তক্ষকের সহিত ইন্দ্রও আসিয়া শূন্যপথে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু যজ্ঞ দেখিয়া ইন্দ্রের চিত্ত আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। তিনি তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তক্ষক দ্রুতগতিতে অগ্নিশিখার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইসময় তাহার ভগ্নী ও ঋষি জরৎকারুর পুত্র সুপণ্ডিত এবং তরুণ ঋষি আস্তিক যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মধুর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যের দ্বারা রাজার প্রশংসা

জনমেজয়

করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহার বাক্যে প্রীত হইয়া কহিলেন—"আপনি বর যাচ্ঞা করুন।" রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়াই ঋষি কহিলেন—"থাম—থাম—থাম।" সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপথে তক্ষকের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন ঋষি সর্পদের জীবন এবং সর্পযজ্ঞের বিরতি রাজার কাছে যাচ্ঞা করিলেন। রাজা কহিলেন—"আপনি অন্য বর যাচ্ঞা করুন।" আস্তিক কহিলেন—"আমার অন্য কোনও প্রার্থনা নাই। এবং আমার মাতুলের জীবন রক্ষার জন্যই আমি রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।" উপস্থিত ঋষিরাও কহিলেন—"মহারাজ, আপনি যখন এই ঋষিকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন ইঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করাই আপনার সঙ্গত।" অতঃপর রাজা আস্তিকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সর্পযজ্ঞ স্থগিত করিলেন। রাজা যজ্ঞের ঋষিদিগকে এবং যাঁহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলকেই প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি তক্ষশিলা হইতে হস্তিনাপুরে গমন করেন।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, এবং পরীক্ষিত ও জনমেজয়ের রাজ্যশাসনের বিবরণের মর্ম্মাংশ উপরে প্রদত্ত হইল। এই বিবরণ সর্ব্বাংশেই সত্য—এরূপ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের এবং তাহার অত্যল্পকাল পরে যে সমস্ত কুরুরাজা রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাঁহাদের ঐতিহাসিকতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কাব্যে এবং পুরাণে যে সব কুরুরাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁহারা ছাড়াও বৌদ্ধ সাহিত্যে আরও কতকগুলি রাজার উল্লেখ আছে যাঁহারা বহু বিখ্যাত বৌদ্ধগল্প এবং আখ্যায়িকায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ধম্মপদ ভাষ্যে নিম্নলিখিত গল্পটি উল্লেখ পাওয়া যায়:—

বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত রাজাদের কাহিনী

অতীতকালে কুরুরাজ্যের রাজধানী ইন্দপত্ত নগরে রাজার প্রধানা মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তক্ষশিলায় গমন করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলে পিতার দ্বারা তিনি রাজপ্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হন, এবং পিতার মৃত্যুর

পর দশটি রাজধর্ম্মের কোনও অমর্য্যাদা না করিয়া কুরুধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। পঞ্চশীল পালনের দ্বারা, এবং

কুরু রাজার আখ্যায়িকা যিনি পঞ্চশীল পালন করিয়া-ছিলেন।

গূঢ় ধর্ম্ম সাধনায় সমগ্র রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধি বিধানের দ্বারা কুরুধর্ম্ম পালন করা হয়। মাতা, প্রধানা মহিষী, ভ্রাতা যিনি রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী যথা, পুরোহিত, রজ্জুবাহক (অশ্বরশ্মিধারণ করিয়া যিনি রথ পরিচালনা করিতেন), মন্ত্রী, সারথি, কোষাধ্যক্ষ, কৃষি বিভাগের কর্ত্তা, দ্বার রক্ষক, সভাসদ প্রমুখ সকলকে লইয়াই বোধিসত্ত্ব কুরুধর্ম্ম পালন করিতেন। এই সময়ে কলিঙ্গের অন্তঃপাতী দন্তপুর নামক স্থানে কলিঙ্গের রাজা রাজ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ ছিল না। কুরুরাজ বোধিসত্ত্বের অঞ্জন বাসব নামে একটি হস্তী ছিল। সাধারণের বিশ্বাস ছিল এই হস্তীটি কলিঙ্গরাজ্যে গমন করিলেই বর্ষণ সুরু হইবে। এইজন্য হস্তীটিকে কলিঙ্গ রাজ্যে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু তথাপি যখন বারি বর্ষিত হইল না তখন অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, কুরুধর্ম্ম পালন না করার ফলেই এই অনাবৃষ্টি উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর কুরুধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত কলিঙ্গ হইতে কুরুরাজ্যে ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইল। তাঁহারা কুরুধর্ম্ম সুবর্ণ ফলকে লিখিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই কুরুধর্ম্ম স্বর্ণ-ফলকে লিখিত ও প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নির্ঝর ধারায় কলিঙ্গ প্রদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপে কলিঙ্গ প্রদেশ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং শস্যপ্রাচুর্য্যেও সম্পদশালী হইয়াছিল। (Dhammapada Commy, Vol. iv, pp. 88-89) কুরুধর্ম্মের অন্যান্য সাধারণ শক্তির বর্ণনা করিয়া একটি জাতক গল্পেও এই আখ্যায়িকাটি বর্ণনা করা হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ :—কুরুরাজ্যে ইন্দপত্তের রাজা ধনঞ্জয়ের প্রধানা মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্ম গ্রহণ করেন। তক্ষশিলায় তিনি শিক্ষিত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকেই রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। দশটি রাজধর্ম্ম পালন করিয়াও তিনি পাঁচ রকমের কর্ত্তব্যের দ্বারা গঠিত কুরুধর্ম্ম পালন করিতেন। এই সময়ে দন্তপুর নামক নগরে কলিঙ্গ নামক জনৈক নৃপতির হস্তে কলিঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। অনাবৃষ্টি হেতু তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অবশেষে জনসাধারণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কুরু-রাজ-পরিবারের দ্বারা প্রতিপালিত সুবর্ণ ফলকে লিখিত কুরুধর্ম্মের প্রতিলিপি আনয়ন করিবার জন্য কলিঙ্গরাজ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কুরুরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। কুরুরাজ এবং রাজপরিবারের লোকেরা ব্রাহ্মণদের হস্তে কুরুধর্ম্মের প্রতিলিপি প্রদান করিলেন। এই কুরুধর্ম্ম পালনের দ্বারা কলিঙ্গ-রাজ্যে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইয়া কলিঙ্গ-রাজ্য পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধিসত্ত্ব ছয়টি দানসত্র নির্ম্মাণ করিয়া ৬,০০০০০ মুদ্রা ভিক্ষা স্বরূপ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহার পুণ্য কর্ম্মের অন্ত ছিল না। মৃত্যুর পর প্রজাবর্গকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (Kuru-dhamma Jataka, Cowell, Vol. II, pp. 251-260)

কুরুরাজ্যের ইন্দপত্ত নগরে ধনঞ্জয় কোরভ্য নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। সুচীরত নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রী এবং পুরোহিত ছিলেন। রাজার ধর্ম্ম এবং দানকর্ম্মের বিরতি ছিল না। একদিন রাজার ইচ্ছা হইল যে, তিনি সৎ এবং সত্যকে অবগত হইবেন। সুচীরত তাঁহাকে বলিলেন যে বারাণসীর

কুরুরাজ এবং তাঁহার মন্ত্রী সুচীরতের উপাখ্যান

বিধুরের দ্বারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। সুচীরত বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন। সেখানে কয়েকজন বিজ্ঞলোকের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করায় তাঁহারা তাঁহাকে সম্ভবের নিকট গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সুচীরত সম্ভবের নিকট গমন করিয়া সৎ এবং সত্যের স্বরূপ অবগত হইলেন। অতঃপর সম্ভবকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া স্বর্ণ-ফলকে সিন্দুরের দ্বারা প্রশ্ন সমূহের উত্তর লিপিবদ্ধ করা হইল; সেই উত্তর সহকারে ইন্দপত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুচীরত রাজাকে সত্যের সেবার স্বরূপ জ্ঞাপন করিলেন। এই রাজা অবশেষে ধৈর্য্য সহকারে ধর্ম্মপালন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (Cowell, Jataka, Vol. V, pp. 31—37) কুরুরাজ্যের

ইন্দপত্ত নগরে রাজা কোরবয় নামে একজন ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়। সোমবৃক্ষের নিষ্পেষণের দ্বারা যে নির্য্যাস নির্গত হয় সেই নির্য্যাস তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল যুতসোম। তক্ষশিলায় তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ভিক্ষাদান প্রমুখ বহু দান কর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (Cowell, Jataka, Vol. V. P. 246) জাতকের মতে কুরুরাজ্যের বিস্তৃতি তিনশত লিগেরও বেশী ছিল। (Cowell, Jataka, Vol V ; P 246)

কুরুরাজা এবং বিজ্ঞ বিধুরের উপাখ্যান

কুরুরাজ্যের ইন্দপত্ত নগরে কোরবয় নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। প্রত্যহ তিনি বহুলোককে ভিক্ষা দান করিতেন; কিন্তু যাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করিত তাহাদের ভিতর একজনও পঞ্চগুণের দ্বারা ভূষিত ছিল না। রাজা তাঁহার মন্ত্রী বিধুরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করায় যাঁহারা কেবল মাত্র নামে ব্রাহ্মণ, রাজার কাছে বিধুর কেবলমাত্র তাঁহাদেরই চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই উত্তরে রাজার চিত্ত পরিতুষ্ট হইল না। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ অতঃপর তাহাদের বর্ণনা করিবার জন্য রাজা বিধুরকে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন সত্যকার ব্রাহ্মণ যাঁহারা তাঁহারা জ্ঞানী হন এবং সৎ হন; সর্ব্বপ্রকার অসৎ প্রলোভনের মোহ হইতে তাঁহারা মুক্ত; তাঁহারা দিবসে একবার মাত্র ভোজন করেন; এই ব্রাহ্মণেরা তীব্র পানীয় কখনও স্পর্শ করেন না। রাজা এইরূপ ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। বিধুর তখন আটমুষ্টি পুষ্প বাতাসে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার শক্তি প্রভাবে এই পুষ্পগুলি পচ্চেক বুদ্ধদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা জ্ঞানী বিদুরের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অতঃপর উত্তর হিমালয়ের নন্দ পর্ব্বতের গুহা হইতে তাঁহারা রাজ-সমীপে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সাতদিন ধরিয়া নানারকমে আপ্যায়িত করিয়া সপ্তমদিবসে প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ দান করিলেন। ইহার পর তাঁহারা রাজ্য পরিত্যাগ করেন। (Cowell, Jataka, Vol. IV. pp. 227-231)

একদা কুরুরাজ্যের ইন্দপত্তন নগরে যুধিষ্ঠিরের বংশধর ধনঞ্জয় নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুরোহিত পরিবারে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বড় হইয়া তক্ষশিলা হইতে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই রাজার পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পার্থিব ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজাকে উপদেশ দিবার ভারও তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইল। তিনি বিধুর পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন। ধনঞ্জয় তাঁহার পুরাতন সৈন্যদিগকে অবহেলা করিয়া নবাগতদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ইহাতে তাঁহার পুরাতন সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং সীমান্ত প্রদেশের একটি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যখন তিনি গমন করিয়াছিলেন, পুরাতন এবং নবাগত সৈন্যদের কেহই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ না করায় তাঁহার পরাজয় হয়। ইন্দপত্তনে ফিরিয়া তিনি মনে করিলেন যে, নবাগতদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই তাঁহার এই পরাজয়ের কারণ। এ সম্বন্ধে বিধুর পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। তিনি রাজাকে ধূমকারি নামক একজন ব্রাহ্মণ মেষপালকের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দান করেন। অতঃপর স্বীয় প্রজাবৃন্দকে দানের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া এবং নানা পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। (Jataka, Cowell, Vol. III, pp. 241-242)

রাজা ধনঞ্জয় কোরবব এবং তাঁহার জ্ঞানী মন্ত্রীর উপাখ্যান জাতকের যুগে সম্ভবতঃ বিশেষ জন-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাই জাতক গল্পে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীতকালে কুরুরাজ্যের ইন্দপত্ত নগরে ধনঞ্জয় কোরবব নামে একজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল বিধুর পণ্ডিত। রাজাকে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উপদেশ দানের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। আইন সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহার বাগ্মীতাও অসাধারণ ছিল।

জম্বুদ্বীপের নৃপতিরা সকলেই তাঁহার এই আলোচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একদা সক্কর সহিত ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎ হইল। সক্ক ধনঞ্জয়ের কাছে তাঁহার নিজের গুণগ্রামের পরিচয় দিলেন। ধনঞ্জয় বলিলেন—"আমি ১৬,০০০ নর্ত্তকী লইয়া রাজসভা এবং রাজঅন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—এবং উদ্যানে থাকিয়া সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিয়াছি। সুতরাং আমার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।" এই শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া দুইজনে বাদানুবাদ আরম্ভ হইল এবং অবশেষে মীমাংসার জন্য ও রাজকীয় মতামতের জন্য তাহারা বিধুর পণ্ডিতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাদানুবাদে বিধুর পণ্ডিত যে মীমাংসা করিয়াছিলেন তাহাতে উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় কোরব্ব দ্যূতক্রীড়ার দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পুন্নক ঘোষণা করেন যে, তিনি এই ক্রীড়ায় ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিয়া বিধুর পণ্ডিতকে বন্দী করিবেন; তাঁহার গৃহে প্রচুর মণি-মাণিক্য আছে সুতরাং তিনি সামান্য অর্থের জন্য দ্যূতক্রীড়ায় রত হইবেন না। অতঃপর পুন্নক ইন্দপত্তে কুরুরাজ সভায় গমন করিয়া কোরব্বের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। দ্যূত্য ক্রীড়াগৃহে পুন্নক ও কোরব্বে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই ক্রীড়া দেখিবার জন্য এক শত রাজা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। পুন্নক ধীরভাবে কহিলেন,—"হে রাজন্ পাশা খেলায় মালিক, সাবট, বহুল, শান্তি, ভদ্র প্রভৃতি চব্বিশ রকমের প্রথা আছে। ইহাদের ভিতর যে পদ্ধতিটি আপনার মনঃপূত তাহা বাছিয়া লউন।" তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা বহুল পদ্ধতি বাছিয়া লইলেন। পুন্নক বাছিয়া লইলেন সাবট। ক্রীড়ায় ধনঞ্জয় পরাজিত এবং পুন্নক জয় লাভ করিয়াছিলেন। (Jataka, Cowell; Vol, vi, pp. 126-137).

যদিও বুদ্ধের প্রচার বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেই নিবদ্ধ ছিল তথাপি পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে তিনি উত্তর ভারতেও বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন,—এবং মানুষের জন্মগত দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভের বার্ত্তা ও শান্তির বাণী সেখানেও প্রচার করিয়াছিলেন। কুরুরাজ্যও তাঁহার ধর্ম্মালোচনার দ্বারা পবিত্রিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ এবং কুরুগণ

নিকায় গ্রন্থ সমূহ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বুদ্ধ যখন কম্মাসধম্ম নগরে কুরুদের মধ্যে বাস করিতেছিলেন তখন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। অঙ্গুত্তর নিকায়গ্রন্থে দেখা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া অরিয়দের দশটি আবাস স্থানের বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের অরিয়দিগকে এই সমস্ত আবাসেই বাস করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও আবাসে তাহারা বাস করিতে পারিবে না। (Anguttara Nikaya, Vol. V, pp. 29-32)

আনন্দ বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনি বুদ্ধকে কহিলেন—"ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, আপেক্ষিক উৎপত্তিগুলি যাহা এত গভীর, তাহাই আমার কাছে একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।" বুদ্ধ আনন্দকে সেরূপ মনে না করিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন। কারণ আপেক্ষিক উৎপত্তির সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতই মানুষ বিপদে পতিত হয় এবং পুনর্জ্জন্মকে জয় করিতে পারে না। বুদ্ধ এই বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তও প্রদান করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বস্তু আকর্ষণের সৃষ্টি করে তাহাদের দ্বারাই বাসনার উৎপত্তি হয়, বাসনা হইতেই মোহের সৃষ্টি, মোহ হইতেই জন্ম হয়। এইরূপে একটির পর আর একটি আসিতে থাকে। (Samyutta Nikaya, Vol, II, pp. 92-93) বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহারা নানাপ্রকারের দুঃখের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন কিনা। একজন ভিক্ষু কহিলেন যে, তিনি সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কিরূপভাবে চিন্তা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে ভিক্ষু যাহা বলিলেন তথাগত তাহাতে আনন্দিত হইতে পারিলেন না। অতঃপর আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ এ সম্বন্ধে ভিক্ষুদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি কহিলেন—"উপধি (অনুরাগ) দুঃখ উৎপত্তির কারণ।" তথাগতের এই বাণী শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুরা দুঃখের মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Samyutta Nikaya, Vol. II,

pp. 107-109) অন্য এক সময়ে বুদ্ধ সতিপট্ঠান সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতাটি প্রদান করেন। তিনি চারি প্রকার সতিপট্ঠানর নামোল্লেখ করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন। (Majjhima Nikaya, Vol. I. pp. 55 foll.) ভারদ্বাজ গোত্রের অগ্নিকুণ্ডের কাছে একখানি খড়ের কুটিরে বুদ্ধ এক সময়ে বাস করিতেছিলেন। সেখান হইতে তিনি বনে গমন করেন। তিনি যাওয়ার পর কুরুরাজ্যের মাগন্দিয় নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নিজগৃহে ভারদ্বাজের বুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভারদ্বাজ বুদ্ধের প্রশংসা করিতেছিলেন এবং মাগন্দিয় তাঁহার নিন্দা করিতেছিলেন। দৈবশক্তি প্রভাবে সে সমস্ত কথাই বুদ্ধ শুনিতে পান। ইহার পর বুদ্ধ ভারদ্বাজের কুটিরে আসিয়া কহিলেন,—"জন সমাজকে আমি ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার সংযত করিতে উপদেশ দিই। কারণ দেহ প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া এইসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মানুষ মোহ এবং অন্যান্য পাপ অর্জ্জন করে। এই প্রকার উপদেশ দানের জন্যই আমি ভূনহু নামে অভিহিত হইয়াছি।" (M. N. I, p. 501 foll) মাগন্দিয়ের মাগন্দিয়া নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি এই কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজিতেছিলেন, এবং অবশেষে অন্য সৎপাত্রের সন্ধান না পাইয়া তথাগত যখন কুরুরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেই পদসেবিকারূপে মাগন্দিয়াকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ বা অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া কেবল মাত্র একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে অসময়েই ব্রাহ্মণ এবং তাহার পত্নী সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান। ইহার পর মাগন্দিয়ার পিতৃব্য তাঁহার ভার গ্রহণ করিয়া কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের সহিত তাঁহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। Dhamma Pada Commy, Vol I, pp, 199-203, Cf Ibid, Vol. III p. 193 foll)

বহু সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ একদা 'কুরুরাজ্য পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কুরুদের একটি নগরের নাম ছিল থুল্ল কোট্ঠিত। সেখানকার ব্রাহ্মণ গৃহস্থেরা তাঁহাদের নগরে বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হন। বুদ্ধ তাঁহাদের কাছে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। সমবেত জনমণ্ডলীর ভিতর রট্ঠপাল নামক একজন যুবক ছিল। সে বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত গমন করে। এই রট্ঠপালকে পরে বৌদ্ধধর্ম্ম দীক্ষা দান করা হইয়াছিল। (M, N, II p, 54. foll)

মজ্ঝিম নিকায়তে দেখা যায় বুদ্ধ যখন কম্মসধম্ম নগরে কুরুদের ভিতর বাস করিতেছিলেন তখনই কর্ম্মের স্থায়িত্ব, শূন্যতা, অহিতকর এবং ভ্রমাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। চারি প্রকারের অরূপের ধ্যানে সময়াতিপাতের সুফল সম্বন্ধেও তিনি এইখানেই বক্তৃতা করেন। এইখানে তিনি আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে কাহারা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে এবং কাহারা লাভ করিবে না—এইসব বিষয় সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। (Majjhima Nikaya, Vol. II, p. 261 foll.)

মহানিদান সুত্তন্তে দেখা যায় যে, বুদ্ধ যখন কুরুদের রাজধানী কম্মাস্সধম্ম নগরে কুরুদের ভিতর বাস করিতেছিলেন তখনই আনন্দকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে এই সুত্তন্তের উপদেশসমূহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া আনন্দ কহিলেন,—"ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, যে ধর্ম্ম এত গভীর এবং মহান তাহাই আমার কাছে এত সহজ বলিয়া মনে হইতেছে।" বুদ্ধ কহিলেন—"এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না। এই ধর্ম্মের সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সম্যক অনুভূতির অভাবের জন্য মানুষ সংসারের সহিত জড়াইয়া পড়ে এবং নরককে জয় করিতে পারে না।" তাহার পর সুত্তন্তে কারণের যোগসূত্র সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। জন্ম, জরা এবং মরণের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং আপেক্ষিক উৎপত্তির আলোচনাও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। (Digha Nikaya, Vol, II, p. 55 foll.)

কুরুদের রাজধানী কম্মাসসধম্ম নগরে বুদ্ধ যখন কুরুদের ভিতর বাস করিতেছিলেন, তখন ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি, কায়ানুপস্সনা (দেহের অপবিত্রতা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসসম্বন্ধে চিন্তা) বেদনানুপসসনা (অনুভূতি

সম্বন্ধে চিন্তা) চিত্তানুপসসনা (চিত্ত সম্বন্ধে চিন্তা) ধম্মানু-পসসনা (ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা)—এই চারি প্রকারের সতিপট্‌ঠান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

পঞ্চ বাধা
পঞ্চ আকর্ষণের বস্তু
ছয়টি আয়তন
সাতটি বোজ্‌ঝঙ্গ (জ্ঞানের উপাদান)
চারটি অরিয় সক্ক (চারিটি মহাসত্য)

(Digha Nikya, Vol. II pp, 290 foll.)

কিছুকালের জন্য বুদ্ধ উত্তর কুরুতেও বাস করিয়াছিলেন। সেখানে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া অনোতত্ত হ্রদের তীরে তিনি গমন করেন এবং সেইখানেই ভোজন সমাপ্ত করিয়া দিবসের উত্তপ্ত অংশ বিশ্রামে অতিবাহিত করেন। (Vinaya Texts, Vol, I. 124)

কৌটিল্যের সময়ে কুরুদের শাসন তন্ত্র

চতুর্থ খৃঃ পূঃ কিছু পূর্ব্বেই কুরুদের রাজতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি প্রজাতন্ত্র শাসনপদ্ধতিতে পরিণত হয়। কৌটিল্য বলেন, কুরুদের সাধারণতন্ত্র রাজা নামেই অভিহিত হইত। (সামশাস্ত্রীর অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ p. 455)

নবম শতাব্দীর কুরুগণ

নবম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে কুরুদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মপাল যখন চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তিনি সেজন্য প্রতিবেশী শক্তি সমূহের মত অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রতিবেশী শক্তি সমূহের ভিতর কুরুদের নাম বিশেষ ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। (Smith, Early History of India, p, 398)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

কে ?

(শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী হইতে)

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

আকাশ-জোড়া ওই নীলিমা, দূর বনানীর শ্যামল শোভা,—
নিত্য তুলির টানে কাহার্ ফোটায় দীপ্তি মনোলোভা ?
পবন যখন ঘুমিয়েছিল মহাব্যোমের গর্ভে—সেথা
ইঙ্গিতে কার্ উঠল জেগে, আজ্ঞাতে কার্ বইল হেথা ?

হৃদ্-মাঝারে লুকিয়ে সে জন দৃশ্য-জগৎ-গহনগুহায়,
উত্তমাঙ্গে তার পরিচয় পায় যে যাওয়া চিন্তাধারায় ;
ফুলের রঙে বিন্যাসে তার শোভে সে জন নিজের সাজে,
দীপ্ত তারার মাল্যজালে দেয় সে ধরা আপন মাঝে !

নারীর কম লাবণ্যেতে, পৌরুষেতে, সে জন জাগে.
শিশুর মধু হাস্য লীলায়, বধূর ব্রীড়া রক্তরাগে ;
দেব্‌তারে সে ক'রলে শাসন বজ্রসম কঠোর হাতে—
সেই হাতেরি কারিকুরি কোঁকড়া চুলের নরম পাতে !

এ পরিচয় ছায়ার সাথে—লীলা এ তার সৃষ্ট মায়ার,
সে জন কোথা লুকিয়ে থাকে—কোন্ গহনে ? স্বরূপ কি তার ?
ব্রহ্মা সে কি ? বিষ্ণু সে কি ? নারী কিম্বা নারীর প্রিয় ?
দেহী কিম্বা বিদেহী সে ? যুগ্ম কিম্বা অদ্বিতীয় ?

দীপ্তশ্যামল কিশোর রূপে হৃদয় মোদের নেয় সে জিনি,
ইষ্ট মোদের নারীরূপা—ভীমা সে যে উলঙ্গিনী,
তুষার-মৌলি হিমালয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন সে জন—
নিখিল বিশ্ব-হৃদয়-যন্ত্রে তাহার লীলা প্রকটন।

কতই না তার ছল্ চাতুরী ক'রব রটন বিশ্বমাঝার—
দুঃখ বেদন যন্ত্রনাতে কতই না যে স্ফূর্ত্তি তাহার!
মোদের অশ্রু ফুটায় তাহার হর্ষ পুলক বদন ভ'রে,
পরক্ষণেই নেয় সে টেনে আনন্দ আর রূপের ডোরে!

তার হাসিটির ধ্বনি রচা সঙ্গীতেরি মধুর কায়া,
রূপ সে তাহার আনন্দেরি স্মিতবিকাশ, প্রতিচ্ছায়া;
বুকের তালে বিশ্বজীবন নাচে—মোদের পূর্ণ হরষ
কৃষ্ণ-রাধার বাসর-মিলন—প্রেমটা তাদের চুমোর পরশ

শক্তি তাহার গর্জ্জে ওঠে তূরীর তীব্র ভীষণ নাদে,
যুদ্ধরথে গতি তাহার, সিদ্ধি তীক্ষ্ণ বর্শাঘাতে,
নিঠুর হাতে মৃত্যু হানে, হৃদয় ভরা কারুণ্যেতে,
জগৎহিতে যুদ্ধ তাহার দৃষ্টি রেখে অলক্ষ্যেতে।

কালের কোলে যুগপ্রলয়, বিশাল সৃষ্টি মধ্যে স্বীয়
মহান, বিরাট, পূত সে যে দীপ্ত অনির্ব্বচনীয়,
বুদ্ধি অচল—যায় না দেখা যেথায় ধ্যানের দিব্য চোখে—
দৃঢ় তাহার আসন পাতা চিরন্তন সেই লোকে!

মোদের সে যে প্রভু, প্রিয়,—অনন্তকাল এম্‌নি ধারা,
অন্তরেরি কাছেই তবু দৃষ্টি মোদের দিশাহারা,
ইন্দ্রিয়েরি অহঙ্কারে মুগ্ধ মোরা গর্ব্বে আঁধা—
মুক্তি মোদের যেইখানেতে সেই মনেতেই রইনু বাঁধা!

সূর্য্য তেজে তার পরিচয়—সে যে জন্ম মৃত্যুহীন,
নিশীথিনীর স্নিগ্ধ বুকে ছায়া স্বরূপ সুপ্ত, লীন;
অন্ধকারের গর্ভে যেথায় শুদ্ধ নিবিড় অন্ধকার—
একক বিরাট রূপে ছিল সেই আঁধারে স্থিতি তার!

সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৪

সুধীর ইতিহাস সংক্ষেপে এই।

সুধীর পিতা শম্ভুনাথ শাস্ত্রী অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশধর, ভায়াদের সহিত মনোমালিন্য বশতঃ ম্লেচ্ছের চাক্‌রী লইয়াছিলেন, কোনো এক মিশনারী কলেজের পণ্ডিতী। সেইসূত্রে তাঁর গায় কালের হাওয়া লাগে, মোটাগোছের লাইফ্‌ইন্‌শিওর্যান্স করান। কিন্তু যাদের জন্য করা তাদের একজন—সুধীর জননী—পতির পায় মাথা রাখিয়া সীঁথির সিঁদুর সমেত স্বর্গে চলিয়া যান। শোক সহিতে না পারিয়া শম্ভুনাথ একরকম সহমরণেই গেলেন বলিতে হইবে। খবর পাইয়া সুধীর মামা পশ্চিম হইতে ছুটিয়া আসিলেন। সেই শিশুকাল হইতে সুধী মাতুলালয়ে মানুষ।

গোপালচন্দ্র সামান্য ইস্কুল মাষ্টার। তাঁর এখন দ্বিতীয়পক্ষ প্রবল বন্যা। সুধীর টাকার সুদটা তাঁর খুব কাজে লাগিয়াছে। সুধীকে তিনি যত্নের চূড়ান্ত করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থান দিয়াছেন। সুধীর মামাতো ভাই বোনগুলি জন্মিয়া অবধি সুধীকেই বড়দাদা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, এবং আচরণের গুণে সুধী তার মামীমাদেরও প্রিয়।

এহেন সুধী বিদেশ যাইতেছে। এই প্রথম সে বাড়ীর বাহিরে যাইবে, না জানি কতকাল বাহিরে থাকিবে, ফিরিয়া আসিয়া গরীব মামা মামীকে চিনিতে পারিবে কি না, এই ভাবিয়া তার প্রবীণ মামাবাবু ও তরুণী মামীমা কেবলই দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছিলেন। তরুণী মামীমা বয়স্ক ভাগিনেয়কে সমীহ করিয়া বলেন, "সত্যিই যাওয়া হচ্ছে?"

সুধী বলে, "সত্যি মামীমা।"

"এদেশের পড়া কি শেষ হয়ে গেছে? সব কটা পাস?"

"না মামীমা।"

"তবে"?

"বাদল যাচ্ছে, আমি না গেলে কে ওকে দেখ্‌বে শুন্‌বে?"

"ওঃ"!

মামাবাবু গম্ভীর হইয়া বলেন, "যাচ্ছো যাও। কিন্তু নিষিদ্ধ মাংস খেয়ো না। বিয়েটা ক'রে গেলেই পার্‌তে।"

সুধী চুপ করিয়া থাকে।

ছোট ভাইবোনগুলি নানা ফরমাস্ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। "বড়দা, আমার জন্যে কি পাঠাবেন?"

"তোর জন্যে একটা হাতী।"

"দূর্! হাতী কেমন ক'রে ডাকে আস্‌বে? বরং একটা বিলাতী কুকুরছানা।"

"বড়দা, আমার জন্যে?"

"তোর জন্যে এক হাঁড়ি সন্দেশ।"

"সন্দেশ তো সবাই মিলে খেয়ে ফেল্‌বে। ম—স্ত একটা মোটর গাড়ী।"

"একটা ফুটবল্।"

"একটা খোকা পুতুল; আমার সইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো।"

ফরমাস জানাইতে জানাইতে উহারা সুধীর কোলে কাঁধে পিঠে চড়িয়া বসে, কে কোথায় বসিবে তাই লইয়া কলহ বাধাইয়া দেয়। সুধী অন্য মনে ভাবে। এইসব কচি মুখগুলি একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মাকে বাবাকে প্রশ্ন করিবে, "বড়দা কোথায়?" মা বলিবেন "বিলেত গেছে।" তিনু বলিবে, "বিলেত কতদূর? আমি যাবো।" বিজু বলিবে, "সে কি রে! বিলেত কতদূর তাও জানিস্‌নে? সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ, যেমন নদীর মাঝখানে একটি চড়া।" ছোট্ট টিনি হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবে, যেন সব বুঝিতেছে, তারপর মুখে আঙুল পুরিয়া চুষিতে লাগিবে।

বিচিত্রা

ঝরাপাতা.

মাঘ, ১৩৩৬

শিল্পী—স্যার জন এভারেট মিলে

মামীমার মা কিছুদিন হইতে তাঁর মেয়ের বাড়ী আসিয়াছেন। রসিকতা করিয়া বলেন, "কি রে নাতি! সাহেব হ'তে যাচ্ছিস্, আমাকে মেমরা ক'রে নিয়ে যাবি ?" সুধী বলে, "দিদিমার রং যা শাদা, মেমরা লজ্জা পাবে।" "কি! আমার রং কালো? আচ্ছা দেখা যাবে নাত-বৌয়ের রং কত ভালো হয়।"

যাত্রার দিন যত নিকট হইয়া আসিতে লাগিল সুধী'র মন কেমন করিতে লাগিল। সকলের জন্য অল্প বিস্তর, বাদলের জন্য বড় বেশী। গত কয়েক বৎসর সে বাদলকে ছাড়িয়া একটা দিনও কাটায় নাই, বাদলের সঙ্গে থাকা তার নিত্যকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। স্নান আহ্নিক না করিয়া থাকা যায়, না খাইয়া উপবাসী থাকাও সম্ভব, কিন্তু বাদলকে ছাড়িয়া একটা দিনও থাকা কল্পনা করা যায় না। কলেজের ছুটীগুলোতেও দুইবন্ধু একত্র থাকিয়া লেখাপড়া করিয়াছে, বড় বড় ভাবুকদিগকে চিঠি লিখিয়া বিব্রত করিয়াছে, জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার বাঁধের উপর অর্দ্ধশয়ান রহিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচিয়াছে। বাদলকে দু'মাসের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও সুধীর মন উদাস হইয়া উঠিতেছিল। অথচ অপেক্ষা করিবারও উপায় ছিল না। সুধীর উত্তরাধিকার এত বেশী নয় যে, বাদলের সঙ্গে চাস দিয়া পি-এণ্ড্-ও'তে যাওয়া সঙ্গত হইবে, হিসাব করিয়া খরচ করিতে গেলে সস্তা জাহাজের থার্ড ক্লাসই শ্রেয়স্কর।

অবশেষে সত্যসত্যই একদিন সুধী মাদ্রাজ চলিয়া গেল। দি'দিমা তাঁর ইষ্টদেবতার প্রসাদী ফুল তার কাপড়ের কোনে বাঁধিয়া দিলেন। মামাবাবু তার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মামীমা দূরে দাঁড়াইয়া চোখে আঁচল চাপিলেন। টিনি মাকে কাঁদিতে দেখিয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তিনু মিনু ইত্যাদি বয়োঃজ্যেষ্ঠরা দাদার কামরায় বসিয়া ইঞ্জিন সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল, গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হইতেই তাড়া খাইয়া নামিয়া আসিল। সুধী গুরুজনদের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল ও কনিষ্ঠদের ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। বাদলকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "পুনর্দ্দর্শনায় চ"। বাদল উত্তরে বলিল, "Au revoir"! ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিলে সুধী বাদলের দিকে অনিমেষ চাহিয়া রহিল ও বাদল সুধীর উদ্দেশে অবিশ্রান্ত রুমাল নাড়িতে লাগিল।

৫

সুধী চলিয়া গিয়াছে। সুধী নাই। কাল প্রভাত আসিবে, কিন্তু সুধী আসিবে না। বাদল জীবনে কোনোদিন এত একা বোধ ক'রে নাই। শৈশবে তার মা ছিলেন। কৈশোরে ছিলেন এক পাতানো দিদি, পড়োশিনী। তাঁর স্বামী কোথায় বদলি হইয়া গেলেন, বাদলের পিতাও সাত ঘাট ঘুরিয়া বাঁকীপুরে উপস্থিত, দারভাঙ্গার সেই দিনগুলি আজ বাদলের মনে পড়িতে লাগিল। তখন হইতে তার জীবনে নারী নাই, নারী বলিতে কত যত্ন কত মমতা কত আব্দার কত মিনতি কত মধুরতা বোঝায় বাদল তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। মা ও দিদির স্থান লইয়াছে সুধী দা।

সেই সুধী একা চলিয়া গেল, বাদল তার সঙ্গ লইতে পারিত, যদি না এক আপদ আসিয়া জুটিত—তার বিবাহ। ইতিমধ্যে একদিন তার পিতা তাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "বইতে যার জীবন চরিত পড়েছো সেই বিখ্যাত এক্স্ গুপ্তর এক নাতনির সঙ্গে তোমার বিয়ে। মেয়েটিকে তুমি ছোট বেলায় দেখেছো। তোমার মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়।"

পিতার অসাক্ষাতে বাদল যতই লম্ফ ঝম্ফ করুক, পিতার সাক্ষাতে সে নিরীহ ভালো ছেলেটি! তাঁর কথার উপরে কথা বলিতে তার সাহসে কুলায় না কিম্বা সংকোচ বোধ হয়। অতবড় বক্তিয়ার মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

রায় বাহাদুর কহিলেন, "মেয়েটির বাবা ওয়াই গুপ্ত আমার বাল্যবন্ধু। মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জ্জন্। মেয়েটিকে ইংরেজী ধরণে মানুষ করছেন, তোমার সঙ্গে বনবে।"

বাদল তেমনি মৌন থাকিল। রায় বাহাদুর জানিতেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। যদিও অসম্মতির আশঙ্কা তাঁর ছিল না।

কহিলেন, "বিয়েটা অবশ্য কল্‌কাতাতেই হবে, এবং মাস খানেকের মধ্যেই। তুমি যদি একবার বহরমপুর বেড়িয়ে আস্‌তে চাও তো এখনো যথেষ্ট সময় আছে। যোগানন্দ তোমাকে দেখ্‌লে খুসি হবেন।"

অপরিচিতদের সাম্‌নে বাদল অত্যন্ত লাজুক মুখচোরা মানুষটি। ডাক্তার গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে শুনিয়া তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। শুধু কি গুপ্ত সাহেব? তাঁর কন্যা উজ্জয়িনীকে না হয় চিঠি লেখাই চলে, চিঠিতে আলাপ করা বিষয়ে বাদলের সমকক্ষ নাই, কত মহারথীর সঙ্গেই না তার চিঠিতে আলাপ—রম্যাঁ রলাঁ, বেনেদেত্তো ক্রোচে, রবীন্দ্রনাথ, কুমার স্বামী, কেইবা তার পত্র-বাণে বিদ্ধ না হইয়াছেন? কিন্তু মৌখিক আলাপ! ওরে বাপ্‌রে!

"নাঃ,। মুর্শিদাবাদ যাওয়া হইবে না। যা হবার তা কলকাতাতেই হবে। পিতাকে বলিল, "প্রোফেসারের নিমন্ত্রণ করেছেন, ইংলণ্ড সম্বন্ধে কারো কারো কাছে খবর নেবারও আছে, মুর্শিদাবাদ যাই কখন? তা ছাড়া সেখানে যা ম্যালেরিয়া!"

"ঠিক্, ঠিক্"—রায় বাহাদুর প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "না, না, ম্যালেরিয়ার দেশে কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। ঐ কল্‌কাতাতেই দেখা হবে। ঠিক্, ঠিক্"—কতকটা আপন মনেই বলিলেন।

বাদল খালাস পাইয়া সুধীদার বাড়ী সাইকেলে ছুটিল। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিল বিবাহ উপদ্রবটা কেমন করিয়া কাটানো যায়। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইবে ভাবিতে তার মন্দ লাগিতেছিল না, যদিও রাগও হইতেছিল সেই সঙ্গে। কিন্তু কী ষ্টুপিড্ কাষ্টম্। সকলের সাম্‌নে মামুলী মন্ত্র আওড়াইতে হইবে, তার মতো নাস্তিককেও এক ভগবানের নয়, বহু দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে; কত রকম অর্থহীন আচারের গোলক ধাঁধাঁর ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রীলোকরা আসিয়া নাকি কান মলিয়া দিবে—ইন্‌টলারেব্‌ল্। সুধী তাকে অভয় দিয়া কহিল, "আমার মামাতো বোন চুনীর বিয়েতে যে সব হিঁদুয়ানী দেখেছিস্ গুপ্ত সাহেবরা ওসব হ'তে দেবেন না। ক্ষীরোদ গুপ্ত ছিলেন কত বড় সংস্কারক।"

উজ্জয়িনীর নিকট হইতে চিঠির জবাব আসিল না। বাদল ইহাতে আরো চটিল। কহিল, "Silly! ভদ্রতার বর্ণপরিচয়ও জানা নেই, ইনি আবার শিক্ষিতা।" সুধী বলিল, "হয় তো তাঁদের সমাজের ভদ্রতারই অঙ্গ অমন চিঠির জবাব না দেওয়া।" বাদল বলিল, "তা হ'লেও একখানা নামমাত্র প্রাপ্তি স্বীকার পত্র পাঠানো গর্হিত নয় আশা করি। ও চিঠি যে ডাকে হারিয়ে যায়নি তার তো একটা প্রমাণ চাই।"

উজ্জয়িনীকে আবার একখানা চিঠি লেখা সঙ্গত কি-না সুধী এবিষয়ে ঠিক পরামর্শ দিতে পারিল না, বাদলকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। বাদলের হাতে করিবার মতো কাজ রহিল, দিনে প্রোফেসারদের বাড়ী যাইয়া গল্প করিয়া আসা, এবং রাত্রে বিছানায় পড়িয়া অনিদ্রায় অস্থির হওয়া। বড় হইবার জন্য মানুষকে একটা না একটা মূল্য দিতে হয়। বাদলকে দিতে হইয়াছিল নিদ্রা। যেদিন হইতে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেদিন হইতে এমন একটা দিনও কাটেনি যেদিন প্রভাতে সে শয্যাত্যাগ করিয়া ভাবিয়াছে, তৃপ্তির সহিত ঘুমাইয়াছি। প্রভাতের অপ্রসন্নতা সারাদিন থাকে। প্রতিদিন এই ব্যাপার।

৬

বাদলের ভাবী শ্বশুর ক্যাপ্‌টেন যোগানন্দ বহুবিজ্ঞ লোক। নামে ডাক্তার, আসলে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া। যৌবনকালে স্বাধীনচেতা ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে পসার জমাইতে পারিলেন না সরকারী চাকুরী লইতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁর সান্ত্বনা রহিল, আমি না হই আমার পুত্রকন্যা স্বাধীন হইবে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নামকরণ করিলেন, কাঞ্চী কৌশাম্বী উজ্জয়িনী। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র জন্মিল না, পুত্র-কামনা রহিয়া গেল।

ডাক্তার সাহেব এত অল্পবয়স্ক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিতেন না, যদি না তাঁর পুত্র-আদর্শ বাদলের মধ্যে মূর্ত্তি খুঁজিত। তাঁর অন্যান্য জামাতারা অধিক বয়স্ক। কৌশাম্বীর স্বামী সিম্‌লার বড় চাকুরে; কাঞ্চীর স্বামী

কল্‌কাতার ব্যারিষ্টার। তাঁরা আর একটু হইলেই শ্বশুরের সমসাময়িক হইতেন, আপাতত শাশুড়ীর সমবয়সী। তাঁহাদিগকে দেখিলে যোগানন্দের পুত্রভাব সঞ্চার হয় না। অথচ মিসেস্ গুপ্ত বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদিগকেই জামাতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই বিলাত প্রত্যাগত এবং অত্যন্ত উপার্জ্জনক্ষম।

বাদলের প্রতি মিসেস্ গুপ্ত কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু যোগানন্দ ধরিয়া বসিলেন, কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ আমিই স্থির করিব। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার মায়ের তেমন বনে না, উজ্জয়িনী তার দিদিদের মতো নয়। উজ্জয়িনীকে লইয়া তার পিতা একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ করিয়া আসিতেছিলেন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। সেইজন্যে তার মায়ের বা দিদিদের সঙ্গে তাকে বেশী মিশিতে দেন নাই, নিজের কাছে কাছে রাখিয়াছেন। কাঞ্চী ও কৌশাম্বী তাঁর কর্ত্তৃত্ব মানিল না। মায়ের অনুগত হইয়া society girls হইল, নিত্য নূতন পোষাক ও নিত্য নূতন পার্টি এই লইয়া তাদের জীবন। এমন কি পিতৃদত্ত নাম দুইটাকে পর্য্যন্ত তাদের মা লোকমুখে খারিজ করাইয়া দিলেন। তাদের ডাক নাম রটিয়া গেল লিলি ও ডলি।

মিসেস্ গুপ্ত নিজে বিলাত না যাইয়া থাকুন, বিলাত ফেরতের মেয়ে ও স্ত্রী ও শাশুড়ী। চাকর বেহারার মুখে মেমসাহেব ডাক শুনিতে শুনিতে তাঁর ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, তিনি অন্য দশজন বাঙালীর মেয়ের থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বামীর সাহেবিয়ানায় শৈথিল্য দেখিয়া তাঁর লজ্জা হইত। স্বামীর ত্রুটি ঢাকিবার জন্য তিনি অতিরিক্ত রকম মেমসাহেবিয়ানা করিতেন। তাঁর বসিবার ঘরে ইংরেজী ধরণে কয়লার আগুন জ্বলিত, অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যাণ্টেল্ পিসে একরাশ পুরাতন ক্রিস্‌মাস্ কার্ড ও নিউ ইয়ার ক্যালেণ্ডার শোভা পাইত এবং দেয়ালে-আঁটা একখানি প্রতিকৃতির চতুঃপার্শ্বে ফুল—পাতার Wreath জড়ানো থাকিত। প্রতিকৃতিটি পঞ্চম-জর্জ্জের স্বর্গগত কনিষ্ঠ পুত্রের।

এমন যে মিসেস্ গুপ্ত তাঁরই কন্যা উজ্জয়িনী হইল তার বাপের মতো কালো, যাকে সাধু ভাষায় বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই এক অপরাধে মেয়েটি মায়ের সহানুভূতি হারাইয়া বাপের হাতে গিয়া পড়িল। বাপের যৌবনকালের মানসী নারী ছিল নার্স্, আতুরকে ক্লান্তকে মুমূর্ষুকে যে নারী সেবা ও সঙ্গ দেয় শুশ্রূষা ও শান্তি দেয়। মেয়েকে তিনি চাহিলেন সেই আদর্শে দীক্ষিতা করিতে। অথচ ভারতীয় ধারায়। যেমন সুজাতা বিবাহ না করিয়া উজ্জয়িনী সেবা-সদন করিতে এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে। উৎসাহ ও রক্ত একই সঙ্গে শীতল হয়। যোগানন্দ ভাবিলেন, বিবাহটা করিয়া রাখা মেয়েমানুষের পক্ষে ইন্‌সিওর‍্যান্সের মতো; ওটাতে জীবনের ব্রতভঙ্গ হইবেই এমন কোনো কথা নাই। স্বামীটি যদি উদার হয় তবে উজ্জয়িনী বিবাহ করিয়া যত কাজ করিতে পারিবে বিবাহ না করিয়া তত পারিত না। অতএব এমন একটি জামাতা চাই, যে উজ্জয়িনীর সম-মনস্ক। পাট্‌নায় পড়্‌তে থাকা আত্মীয় হেমেনের মুখে বাদলের নিন্দা শুনিয়া বুঝিলেন পাত্রটির মন তাঁর মনের মতো, তখন সম্বন্ধ করিলেন।

রায় বাহাদুর তো প্রস্তাব শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। এক্‌স্ গুপ্তের নাতনি, এই যথেষ্ট। সেটি কালো না ফর্‌সা, কুৎসিত না সুন্দর, ভালো না মন্দ, ষোড়শী না ষষ্ঠী—এ সবের দিক দিয়াই গেলেন না। প্রথম চিঠিতেই পাকা কথা দিলেন। একখানা ফটো পর্য্যন্ত চাহিয়া পাঠাইলেন না। মেয়েটিকে অবশ্য এককালে তিনি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তার বয়স দুই কি আড়াই বছর। তখন বাদলের বয়স চার কি পাঁচ। ইহারা যে একদিন বিবাহের উপযুক্ত হইবে এমন উদ্ভট কল্পনা কোনো কর্ম্মব্যস্ত পুরুষের মনে স্থান পায় না। কোলের ছেলের সঙ্গে সম্ভবপর মেয়ের সম্বন্ধ করা স্ত্রীলোকদেরই মধ্যাহ্নকালের অবসর বিনোদনের বিষয়। এমনি একটি সম্বন্ধ বাদলের মা হয় তো করিয়াছিলেন, কেবল উজ্জয়িনীর মায়ের সঙ্গে কেন—কত মেয়ের মায়ের সঙ্গে। তাঁর পাতানো বেয়ানদের স্মৃতি এখনো সজাগ হয় নাই এইজন্যে যে, এখনো বাদল যথেষ্ট বড় এবং উপার্জ্জনক্ষম হয় নাই। বিলাতটা ঘুরিয়া আসিয়া বড় একটা চাকুরী জুটাইয়া বসিলে আর কয়েক বছর পরে মিসেস্ গুপ্তেরও কি

হঠাৎ মনে পড়িয়া যাইত না যে তাই তো, বাদলের মা'কে যে কথা দিয়াছিলাম, পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য এই বিবাহ প্রয়োজন। মিসেস্ গুপ্ত আপত্তির খাতিরে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সম্মতিও দিলেন। তিনি জানিতেন উজ্জয়িনীর রঙ্ এবং ঢঙ্ বাঙ্গালী সাহেবদের পছন্দ হবে না; ও মেয়ের বিবাহের আশা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই অন্যান্য মেয়েদের মতো তাকে লোরেটোতে দেন নাই, ফক্সট্রট্ নাচিতে ও পিয়ানো বাজাইতেও শিখান নাই, পাউডার মাখাইতে গিয়া তার কাছে এমন ধমক খাইয়াছেন যে মেয়েটিকে কোনো সেকেলে-ভদ্রের আত্মীয়কে পোষ্য দিতে পারিলে বাঁচিতেন। এক রায় বাহাদুরের বাড়ীতে মেয়ে দিতে তাঁর মেম সাহেবী প্রেষ্টিজে বাধিতেছিল, তবু ছেলেটি ভবিষ্যতে বাবাকে ছাড়িয়া শাশুড়ীকে গুরু করিবে (যদিও বিলাত ঘুরিয়া আসিবে বাপেরই টাকায়)—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস।

শ্রীলীলাময় রায়

অজানা

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার

ওগো অজানা!
আমার জীবন-ছন্দের সাথে তোমার আছে কি জানা?
আমি গাঁথি কথা
স্বপ্ন বারতা,
তুমি রচ মালা বসিয়া নানা
ওগো অজানা!

পেয়েছ কী তুমি মানুষের মাঝে
চির সুন্দর যেই সুর বাজে,
মুগ্ধ মনের প্রণয় পুলক
আপন ভোলার সকল কাজে?
পেয়েছ কী তুমি মানুষের মাঝে?

কোন কথা ব'ল ফুল হ'য়ে ফুটে,
কোন সুর প্রাণে মধু ল'য়ে উঠে!
দিকে দিকে এত সুরভি ছড়ায়ে
মাধুরী বন্যা নিতেছ লুটে?
কোন কথা ব'ল ফুল হ'য়ে ফুটে?

মানুষেরে তুমি দেবতা করিয়া
বসাবে কী পাতি অকলুষ হিয়া?
লুব্ধ চাহনি মুদ্রিত ক'রি
মুগ্ধ মনের বিনতি দিয়া?
মানুষেরে তুমি দেবতা করিয়া।

স্বর্গ-সাধনা এই ধরাতলে
নর-দেবতার হয় পলে পলে,
অসীম-ছন্দ সীমার সুরেতে
বাজিয়া উঠিল হৃদয়তলে।
স্বর্গ- সাধনা এই ধরাতলে।

টমাস্ ম্যান্

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জার্ম্মান কথা সাহিত্যিক টমাস ম্যান্ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লিউবেক্ সহরে জন্মগ্রহণ করে।

বাল্যে, লেখা-পড়ার দিক দিয়া তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি মিউনিচ্-এ গমন করেন এবং তথায় একটি অগ্নি-বীমার আপিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

টমাস্ ম্যান্

যদিও বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল, তথাপি তিনি যে কোনদিন মসী-জীবী হইতে সাহিত্যিক পদবাচ্য হইবেন এ ধারণা তাঁহার স্বপ্নেও বোধকরি ছিল না।

যাহাই হউক, কিছুদিন পরেই তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া মাসিকপত্রে গল্প-প্রবন্ধাদি লিখিতে সুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিউনিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

বছর কয়েকের মধ্যেই উদীয়মান কথাশিল্পীদের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। তখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

গত বৎসর বিশ্বের কথা-সাহিত্যিকের চরম মনস্কাম "নোবল প্রাইজ" তাঁহাকেই অর্পিত হইয়াছে। Budden brooks এবং Magic Mountain—তাঁহার এই দুইখানি উপন্যাস নোবেল-পুরস্কার বিচারকদিগের দ্বারা বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

উক্ত উপন্যাস দু'খানি ছাড়া খান-দুই গল্প-গ্রন্থ এবং খানকয়েক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছেন।

টমাসম্যান্ দুঃখ-বিবাদী কথা-শিল্পী। জীবনকে তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই বিবেচনা করেন; জীবনের দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপাকে তিনি অস্বীকার করেন না; সহজ-ভাবে অবিচলিত-চিত্তে তাহাদের গ্রহন করেন। বিপদের পীড়নে নিজেকে অসহায় মনে করিয়া নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তিনি মানুষের সকলের বড় দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করেন।

Every cloud has a silver lining—

এই মর্ম্মকথাটি তাঁহার রচনার ছত্রেছত্রে জাজ্জল্যমান দেখিতে পাই। নিম্নের এই সামান্য ছোট গল্পটির মধ্যেও সতর্ক পাঠক লেখকের মনের অনেক খানি পরিচয় পাইবেন।

রেল-দুর্ঘটনা

(গল্প)

গল্প চাও? কিন্তু একটাও তো জানিনে। যা হোক; বেশ, শোনো।

বছর দুই আগে একটা ট্রেন-সংঘর্ষে আমি ছিলাম যাত্রী। ঘটনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আজও পরিস্কার মনে রয়েছে।

সাহিত্যিক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে ড্রেসডেন্ যাচ্ছিলাম। আমি একটু আরাম ক'রেই ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করি—বিশেষ ক'রে, খরচ যখন অন্যে দেয়। সুতরাং ঘুমাবার-ঘর-লাগানো প্রথম শ্রেণীর একটি কাম্‌রা 'রিজার্ভ' করি এবং আগের দিন থেকেই বিছানা-পত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকি।

রাত্রি ন'টার মিউনিচ্-ষ্টেশন থেকে ড্রেসডেন্-গামী গাড়ী ছাড়ে। আট-টার আগেই ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হ'লাম।

চারিদিকে অসম্ভব ভীড়! যাত্রী, কুলি, মোট-ঘাটে প্ল্যাটফর্ম গিজ্‌গিজ্ করছে। কুলীর মাথায় লগেজ্ চাপিয়ে দিয়ে নিজের কাম্‌রার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে জন-স্রোতের পানে তাকালাম।

কুলিটা মাল-গাড়ীতে আমার বাক্স রাখছে। অনেকগুলো বাক্স-প্যাঁটরার তলায় আমার মূল্যবান ট্রাঙ্ক্‌টা চাপা পড়ে গেল।

মূল্যবান কিসে? ওর ভিতর আমার নতুন উপন্যাস-খানার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। থাক্ কোন চিন্তা নেই।

একজন টিকিট-চেকার একটা বুড়োকে তাড়া করছে। থার্ড-ক্লাসের যাত্রী উঁচু-শ্রেণীর পা-দানীতে উঠেছিল।

একটি ভদ্রলোক আমার সামনে পায়চারী করছে। সঙ্গে একটি ছোট কুকুর সুন্দর কুকুরটি; গলায় রূপোর চেন। চাল চলন দেখে নিশ্চয় মনে হয় ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার। টিকিট-চেকার তাঁকে সেলাম করে কথা কয়।

সময় হ'তেই তিনি আমার পাশ দিয়ে গাড়ীতে উঠেন। আমার গায়ে তাঁর কনুই-এর ধাক্কা লাগে, কিন্তু তিনি দুঃখ-প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন না। একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাই, কিন্তু তিনি আমাকে অধিকতর বিস্মিত ক'রে দিয়ে তাঁর কুকুর সমেত ঘুমাবার কামরায় (Sleeping car) প্রবেশ করেন। সবাই জানেন, এ ব্যবহার নিষিদ্ধ, বেআইনি। কিন্তু তিনি মানেন না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

একটা বাঁশী বেজে ওঠে। এঞ্জিন তার উত্তর দেয়। গাড়ী ছাড়ে। আলোর নীচে আমি একখানি বই নিয়ে বসি।

টিকিট-চেকার এসে দাঁড়ায়। টিকিটখানি বার ক'রে ধরি।

"শুভরাত্রি" জ্ঞাপন করে সে জমিদারের দরজায় গিয়ে ঘা দেয়। বার কয়েক টোকা দেবার পর তিনি ভিতর থেকে ভীষণ ক্রুদ্ধ-স্বরে বলে ওঠেন—"কে আমাকে এত রাত্রে বিরক্ত করছে?"

চেকার সবিনয়ে জানায়, যে, সে তাঁর টিকিট-খানি একবার দেখে নেবে; এটা তার অবশ্য-কর্ত্তব্য, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে, কামরার দরজাটি ঈষৎ উন্মুক্ত হয়, এবং একখানি টিকিট চেকারের মুখের ওপর এসে পড়ে। টিকিটখানি ফিরিয়ে দিয়ে, তাঁকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' চেকার চ'লে যায়। বিস্ময়ে আমি তখন হতবাক! না হ'লে হয়ত কুকুরের কথাটা বলে দিতাম।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, বই বন্ধ করে' শোবার আয়োজন করি। বিছানায় বসে' বালিশটা ঠিক করে নিচ্ছি এমন সময় সংঘাত ঘট্‌ল! ঘটনাটা ছবির মত মনে আছে।

সহসা, বাজ পড়ার মতো একটা ভীষণ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধাক্কা! মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক্‌রে পড়লাম! বোধ হ'ল, ডানদিকের কাঁধটা বুঝি পিষে গেল!!

তারপরেই ট্রেণখানা দুলতে লাগল! উঠে দাঁড়ানো যায় না, এত দোলানি! গাড়ী উল্টে পড়ে-পড়ে!! নর-নারীর আর্ত্তকণ্ঠে ভগবানের বুঝি নিদ্রা ভাঙ্‌ল। সহসা সশব্দে ট্রেণ থেমে গেল।

তারপরেই, মুক্তির জন্য ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি!

কখন, কেমন করে' গাড়ী থেকে নেমে উন্মুক্ত অন্ধকার মাঠের ওপর এসে দাঁড়ালাম, সেটুকু ঠিক মনে নেই। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল।

কেমন করে' ধাক্কা লাগলো? ক'জন গেল? চারিদিকে ইত্যাকার প্রশ্ন।

ট্রেণ বে-লাইনে ছুটেছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ মরেনি কেউ। তবে মাল-গাড়ীটা গেছে! একেবারে নষ্ট হয়েছে? একেবারে! পা-দুটো বুঝি মাটিতে ব'সে গেল! উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির আর নকল নেই!!

মনে মনে তখনই উপন্যাসখানা গোড়া থেকে আবৃত্তি করতে লাগলাম। আবার লিখতে হবে। প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া হ'য়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মশাল নিয়ে সাহায্যকারীর দল এসে পড়েছে। চারিদিক আলোয় আলো! ট্রেণখানা একটা মরণাহত বিরাট দৈত্যের মতো প'ড়ে আছে।

ধীরে ধীরে মাল-গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখে-শুনে জানলাম—গাড়ীখানা জখম হয়েছে মাত্র; ভিতরের মাল একটিও খোয়া যায় নি। সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যে একটি আন্তরিক ধন্যবাদ পাঠালাম।

দল-বেঁধে রিলিফ-ট্রেণ আসবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজ-নিয়ন্তা, দিন-মজুর।

গাড়ী এল। যার যে কামরায় খুসী উঠে প'ড়ল। আমার প্রথম শ্রেণীর টিকিট; গিয়ে দেখলাম, সবাই প্রথম শ্রেণীতেই উঠ্‌তে চাইচে। সেই গাড়ীতেই সব থেকে বেশী ভীড়!

কোন রকমে উঠে, এক কোনে একটু স্থান ক'রে নিয়ে ব'সে সাম্‌নে তাকিয়ে কাকে দেখলাম? সেই জমিদার, যিনি কুকুর নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিলেন! এখন আর কুকুরটি সঙ্গে নেই; বোধ হয়, মাল-গাড়ীতে চালান দিয়েছে। এখন তাঁর নিজের বসবার স্থানটুকুও স্বল্প-পরিসর; অন্ধকার! তাঁর প্রথম শ্রেণীর টিকিট এখন আর কোন কাজেই লাগছে না! আকস্মিক দুর্বিপাকের সম্মুখে উচ্চ-নীচ-ভেদাভেদের অস্তিত্ব নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে গেছে!

শুনলাম, তিনি তীব্র ভাষায় এমন-তর জঘন্য সাম্যবাদের (Communism) বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করছেন। একজন মিস্ত্রী তাঁর কথার উত্তরে ব'লে উঠ্‌ল—"মশায়, বস্‌তে জায়গা যে পেয়েছেন এর জন্যে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন।"

জমিদার তাঁর হাঁড়ির মতো মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন। হাসিচেপে, আমি সেই মিস্ত্রীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দি।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি সি-এস্

চতুর্থ স্তবক

টেলিমার্চ্চ

১

বালিয়াড়ি—শিখরে

হ্যাল্‌ম্যালো দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে বৃদ্ধ ওভার কোট্‌টি বেশ করিয়া গায়ে টানিয়া লইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। হ্যালম্যালো বুভয়ের দিকে গিয়াছিল, বৃদ্ধ চলিলেন হুইস্‌নেসের অভিমুখে।

তৎকালে হুইস্‌নেস্ ও আর্দ্দেভনের মধ্যে একটি খুব উচ্চ বালিয়াড়ি ছিল। ইহার শিখরদেশ হইতে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামজনপদ বহুদূর পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। বালিয়াড়ির উপরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল।

বৃদ্ধ সেই স্তূপের শিখরদেশে আরোহন করিলেন এবং স্তম্ভটিতে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া একটা প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। পদতলে ম্যাপের মতো বিস্তৃত ভূখণ্ডের দিকে চাহিয়া তিনি যেন একটি বহুপূর্ব্বদৃষ্ট পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকের মধ্যেও তিনি একাদশটি সহর ও গ্রামের অট্টালিকার ছাদ ও উপকূলস্থ সমস্ত উচ্চ ঘণ্টাস্তম্ভগুলি দেখিতে পাইলেন।

কয়েকমিনিট পরে বৃদ্ধ যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা যেন পাইলেন। প্রান্তর ও বনানীর মাঝামাঝি জায়গায় তরুশ্রেণী বেষ্টিত কতকগুলি অট্টালিকার উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেই—বৃদ্ধ সস্মিতভাবে মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত করিলেন। যেন বলিলেন—"এইতো পেয়েছি" মাঠ ও ঝোপজঙ্গলের উপর দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক তিনি যেন একটা পথের গতি-রেখা নির্দ্দেশ করিয়া লইলেন! ক্ষণে-ক্ষণে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, অনতিদূরে একটা গোলাবাড়ীর ছাদের উপর কি যেন নড়িতেছে। অন্ধকারে সেটার আকার সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না! জিনিষটা উড়িতেছিল, সুতরাং ওয়েদারকক্ (বায়ুর গতি জ্ঞাপক যন্ত্র) হইতে পারে না। আর ওটা পতাকাই বা কেন হইবে?

বৃদ্ধ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটু বিশ্রামের সুযোগ পাইলে ক্লান্ত দেহ মন বিস্মৃতির ক্রোড়ে সহজেই ঢলিয়া প'ড়ে। বৃদ্ধ ও ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির আরাম উপভোগ করিতেছিলেন।

দিবসের কর্ম্মকোলাহল থামিয়া আসিলে অন্তরের উত্তেজনা আপনা হইতেই কোমলস্বরে নামিয়া আইসে। সন্ধ্যার সুগম্ভীর মৌনমহিমাটুকু বৃদ্ধ আপনার অন্তর মধ্যে নিঃশব্দে অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় নারী ও বালকণ্ঠের মধুর নিক্কণ সেই মৌনতাকে আনন্দোদ্বেলিত করিয়া তুলিল। কাহারা বালিয়াড়ির নীচ দিয়া ধীরে ধীরে প্রান্তর ও বনের দিকে যাইতেছিল। চিন্তামগ্ন বৃদ্ধের কর্ণকুহর সেই মিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

রমণীকণ্ঠে একজন বলিল, "ফ্লেচাড, তাড়াতাড়ি চল। এই কি আমাদের পথ?"

"না, পথ ওই সুমুখে।"

কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

একজনের কণ্ঠস্বর উচ্চ, অপরের মৃদু ভীত।

"আমরা যে গোলাবাড়ীতে আছি, সেটার নাম কি?"

"লা হর্ব্-এন্-পেল।"

"সেখানে পৌছতে কি অনেকক্ষণ লাগ্‌বে?"

"প্রায় মিনিট পনেরো।"

"তাড়াতাড়ি না গেলে আজ আর সুপ্ খেতে পার্‌ব না।"

"হ্যাঁ, আমাদের দেরী হয়ে গেছে।"

"দৌড়াতে হবে দেখ্‌চি। কিন্তু তোমার ওই খুদেগুলো হাঁপিয়ে পড়েছে। আর তুমি—তুমি ত একটিকে কোলে ক'রে নিচ্ছ। একটি আস্ত বোঝা। এই ছোট্ট পেটুক মেয়েটাকে তুমি মাই ছাড়িয়েছ বটে, কিন্তু তা'কে কোল-ছাড়া ক'রনা, এটা বড় বদ্‌মায়েস। দেখ, ও'কে হাঁটিয়ে নিয়ে চল। তা' হবে না? তা' হ'লে আর করা যায় কি? কপালে আজ ঠাণ্ডা সুপ্‌ই আছে দেখছি।"

"আঃ কি ভাল জুতো জোড়াটাই তুমি আমাকে দিয়েছ! এ যেন আমারই জন্যে তৈরী হয়েছিল।"

"খালি পায়ের চেয়ে এই জুতো প'রে চলা অনেক ভাল এঁ্যা?"

"দৌড়ে আয়, রোনিজিন।"

"ওই তো আমাদের দেরী ক'রে দিচ্ছে। পথে যত চাষার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে, সব্বার সাথে তার আলাপ করা চাই। এরি মধ্যে পুরুষবাচ্চার নমুনা দেখা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বাস্তবিক। পাঁচ বছর বয়েস হয়েছে তো ওর।"

"ভাল রেনিজিন, ও গাঁয়ের সেই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে আবার কথা কইতে গেলে কেন?"

বালকের কণ্ঠে উত্তর হইল, "সে আমার জানা কিনা।"

"কি, তুই তা'কে চিনিস?"

"হ্যাঁ, আজ সকাল থেকে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। আমরা একসঙ্গে খেল্‌ছিলাম্ কিনা।"

সেই রমণী বলিল, "আচ্ছা ব্যাটাছেলেতো! এই গ্রামে আমরা মোটে এই তিনদিন এসেছি। এরই মধ্যে এই একরত্তি ছেলে আবার একটি প্রেমিকা যোগাড় করেছেন।"

কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

২

দেখা যায়, শোনা যায় না।

বৃদ্ধ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি যে কিছু ভাবিতেছিলেন, কি কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা নহে। চতুর্দ্দিকে গভীর শান্তি, বিপুল বিরতি, নিরাপদ নির্জ্জনতা। বালিয়াড়ির শিখরদেশ হইতে এখনো দিনের আলো অপসৃত হয় নাই। কিন্তু প্রান্তর ইতিমধ্যেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আর অরণ্যের অভ্যন্তরে রাত্রির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠিতেছে। মাথার উপরে নীলাকাশে বিন্দু বিন্দু কয়েকটি নক্ষত্র মিটমিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। অসীমের এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের মধ্যে সহস্র দুর্ভাবনা-ক্লিষ্ট বৃদ্ধও আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরনিভৃতে যেন আশার একটু ক্ষীণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল সমুদ্রের করাল কবল হইতে কঠিন-মৃত্তিকা-পৃষ্ঠের আশ্রয় পাইয়া তিনি সর্ব্ব বিপদের অতীত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার নাম জানে না, তিনি একাকী শত্রুব্যূহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন; অথচ পশ্চাতে সমুদ্রবক্ষে সে পলায়নের কোন চিহ্ন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও হয়তো খেয়ালই নাই, কেহ তাহাকে সন্দেহও করিতেছে না। কি আরাম! কি শান্তি! আর একটু হইলেই বৃদ্ধ বোধ হয় সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেন।

পৃথিবীর ও আকাশের এই সুগভীর নিস্তব্ধতা—বৃদ্ধের অন্তরে বাহিরে—ঝটিকাবিক্ষুব্ধ চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিল। সাগর হইতে প্রবাহিত বাতাসের সোঁ সোঁ ভিন্ন আর কোন শব্দই শোনা যাইতেছিল না। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে কর্ণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে এই নিয়তবহমান সাগর-বায়ুর অবিরামধ্বনি শ্রুতিকে আর পীড়িত করে না।

সহসা তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মন মুহূর্ত্তমধ্যে সজাগ হইয়া উঠিল। দিগ্বলয়প্রান্তে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি একটা বিশেষস্থানে আসিয়া নিবদ্ধ হইল। সেটা প্রান্তর-সীমাতে অবস্থিত কর্‌মেরের ঘণ্টাস্তম্ভ। তথায় অদ্ভুত কিছু ঘটিতেছিল।

আকাশের গায়ে স্তম্ভের অবয়ব রেখাগুলি আলেখ্যবৎ অঙ্কিত দেখা যাইতেছিল। স্তম্ভের উপরে তাহার উচ্চ চূড়া। এই দুইয়ের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ ঘণ্টাধার; তাহার চতুষ্পার্শ্বই উন্মুক্ত। এই ঘণ্টাধারটি সমকালব্যবধানে একবার খুলিতেছে, একবার বন্ধ হইতেছে—এমত বোধ হইতেছিল। ইহার ছিদ্রপথ ক্ষণে সাদা ক্ষণে কালো দেখাইতেছিল। একএকবার উহার ভিতর দিয়া আকাশের

আলো একটু একটু দেখা যায়, আবার সব অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়।

বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সম্মুখদিকে একটা ঘণ্টাস্তম্ভ। তিনি ডা'ন দিকে বাওয়ার—পিকানের স্তম্ভের দিকে চাহিলেন; উহার ঘণ্টাধারও একবার খুলিতেছে, একবার বন্ধ হইতেছে। তারপর তিনি বামে ট্যানিসের স্তম্ভের দিকে চাহিলেন, সেখানেও তদ্রূপ। তখন উপকূলস্থ সমস্ত স্তম্ভগুলি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। সর্ব্বত্রই ঘণ্টাধারগুলি খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে।

ইহার অর্থ কি ?

অর্থ এই যে, ঘণ্টাগুলি প্রচণ্ডবেগে দোলায়িত হইতেছে।

কেন ?

নিঃসন্দেহে সতর্ক করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে।

সকল গ্রামে, সকল সহরে, চতুর্দ্দিকের সমস্ত স্তম্ভ হইতে উন্মত্তভাবে ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, অথচ এখানে কিছুই শোনা যাইতেছে না। কারণ ঘণ্টাস্তম্ভগুলি তথা হইতে বহুদূরে এবং সমুদ্রবায়ু বিপরীত দিকে শব্দ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। চতুর্দ্দিকের ঘণ্টাসমূহের এই ক্ষিপ্ত আহ্বান, তবু বৃদ্ধের নিকট এই নিস্তব্ধতা। বড়ই কুলক্ষণ !

বৃদ্ধ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ঘণ্টার আন্দোলন দেখিতে পাইতেছেন, অথচ শব্দ শুনিতেছেন না। ঘণ্টাবাদ্য দর্শন—অদ্ভুত অনুভূতি !

কাহার বিরুদ্ধে এই ঘণ্টানির্ঘোষ ? কাহার সম্বন্ধে এই সতর্কীকরণ !

৩

বৃহদক্ষরের সুবিধা

নিশ্চয়ই কেহ ফাঁদে পড়িয়াছে। কে ?

এই লৌহকঠিন লোকটির বুকের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। তিনি নহেন তো ?

তাঁহার আগমন প্রকাশ পাওয়ার কথা নহে। নগরের অস্থায়ী প্রতিনিধির নিকট সংবাদ পৌছানো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। করভেট্‌টি নিঃসন্দেহ মগ্ন হইয়াছে—একজনও রক্ষা পায় নাই। আর সে জাহাজেও কেবল বয়বার্থেল্‌ট এবং লা ভিউভিলই তাঁহার নাম জানিত! ঘণ্টাগুলির উদ্দাম নৃত্য চলিতেছে। তিনি চন্দ্রচালিতবৎ সেদিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং যে সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়েই আসন্ন বিপদের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার চিত্ত কল্পনা হইতে কল্পনান্তরে দোদুল্যমান ঘণ্টাগুলির মতোই প্রচণ্ডবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি মনকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, "কেউ-তো আমার এখানে আগমনের কথা অবগত নহে, আমার নামও কেউ জানে না। আর বিপদসূচক ঘণ্টাতো কত কারণেই বাদিত হইতে পারে।"

কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া তাঁহার মাথার উপর পশ্চাদ্দিকে বৃক্ষপত্র কম্পনের মতো একটু শব্দ হইতেছিল। প্রথমে তিনি সেদিকে মোটেই মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু শব্দটা ক্রমাগতই হইতেছিল দেখিয়া তিনি অবশেষে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন একখণ্ড বড় বিজ্ঞাপনের কাগজ তাঁহার মাথার উপরে একটা প্রস্তরের গায় আঠা দিয়া লাগানো, বাতাস সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞাপনটা বোধ হয় অতি অল্পক্ষণই লাগান হইয়াছিল, কারণ কাগজটা তখনও ঈষৎ আর্দ্র ছিল। তাহার একটা কোণ আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। বাতাস সেটা লইয়া টানাটানি করিতেছে।

বৃদ্ধ বিপরীত দিক হইতে বালিয়াড়ি শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাই কাগজটা তখন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

তিনি অগ্রসর হইয়া ইতিপূর্ব্বে যে প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহার উপরে উঠিলেন এবং কাগজের আল্‌গা কোণটি হাতদিয়া চাপিয়া ধরিলেন। আকাশ পরিষ্কার। জুনমাসের প্রদোষালোক শীঘ্র অপসৃত হয় না। বালিয়াড়ির নিম্নদেশ ধূসর ছায়ায় আবৃত হইয়াছে,কিন্তু উহার উপরিভাগে

তখনো আলো ছিল। বিজ্ঞাপনের কতকটা অংশ বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত, তাহা বুঝিতে পারা গেল। তিনি পাঠ করিলেন,

"এক এবং অখণ্ড ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্র

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে ভূতপূর্ব্ব মার্ক্ইস্ ডি-ল্যান্টিনেক্, ভাইকাউন্ট্ ডি-ফন্টেনয়,—যে ব্রিটেনীর প্রিন্স্ নামে অভিহিত—গোপনে গ্রেন্‌ভিলের উপকূলে অবতরণ করিয়াছে; তাহাকে অদ্যাবধি আইনের আশ্রয়-বর্জ্জিত বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাহার মস্তকের মূল্য ৬০,০০০ ফ্রাঙ্ক্ নির্দ্ধারিত হইল। যে কেহ তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরাইয়া দিতে পারিবে সেই উক্ত মূল্যের স্বর্ণ-মুদ্রা (নোট নহে) প্রাপ্ত হইবে। চারবুর্গের উপকূলরক্ষী সেনাসমূহের একদল তথাকথিত মার্ক্ইসের গ্রেফ্তারের জন্য অবিলম্বে প্রেরিত হইতেছে।

এতদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য গ্রামবাসীদিগকে আদেশ দেওয়া গেল।

অদ্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে গ্রেন্‌ভিলের টাউনহল হইতে ইহা প্রচারিত হইল।

(স্বাক্ষর) প্রিউর-ডি-লা-মার্ণে
চারবুর্গ উপকূল-সন্নিবিষ্ট ক্যাণ্টন্-
মেণ্টের জনগণের অস্থায়ী
প্রতিনিধি।"

এই স্বাক্ষরের নিম্নে আর একটা স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে মুদ্রিত বলিয়া বৃদ্ধ তাহা পড়িতে পারিলেন না।

এই উচ্চ স্তম্ভের উপর আর অবস্থান করা নিরাপদ নহে। তথায় এতক্ষণ থাকাই হয়তো উচিত হয় নাই। চারিদিকে সবই অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। কেবল ঐ বালিয়াড়ি শিখরই এখনও পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে।

স্তূপ হইতে নিম্নে অন্ধকারে নামিয়া আসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে অঙ্গুলিদ্বারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সেই পথে গোলাবাড়ীর দিকে মন্দগতিতে অগ্রসর হইলেন। সেইদিকেই বিপদ-আশঙ্কা অল্প বলিয়া তাঁহার মনে হইল। প্রান্তর তখন জনশূন্য। একটা ঝোপের পিছনে আসিয়া তিনি ওভারকোটটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং ওয়েষ্ট্‌কোটটা উল্টাইয়া পরিলেন—তাহার লোমশ দিকটা বাহিরে রহিল। তারপর একটা উত্তরীয়ের ছিন্নাবশেষ গলায় জড়াইয়া বাঁধিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। আকাশে চাঁদ ঝল্‌মল্ করিতেছিল। চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন যেখানে পথটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দুইদিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই দ্বিপথের সংযোগ-স্থলে একটি পুরাতন পাথরের ক্রুশ দণ্ডায়মান। সেই ক্রুশের পাদপীঠের গায় একটা সাদা চৌকোণ জিনিষ তিনি দেখিতে পাইলেন, বোধ হয় আর একখানা নোটিশ। তিনি সেটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

"কোথায় যাচ্ছেন?" কে যেন বলিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ফিরিলেন। দেখিলেন বেড়ার ধারে তাঁহারই মতো দীর্ঘকায়, তাঁহারই মতো বৃদ্ধ, তাঁহারই মতো পক্ককেশ, তাঁহার চেয়েও অধিকতর জীর্ণবস্ত্রপরিহিত—তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তির মতো—একজন লোক, একটা লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সে আবার বলিল, "আমি জিজ্ঞেস কর্‌চি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন।"

উদ্ধত-গাম্ভীর্য্যের সহিত বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমি কোথায়? আগে বল।"

লোকটা বলিল, "আপনি ট্যানিসের জমিদারীতে। আমি তার ভিক্ষুক, আপনি তার জমিদার।"

"আমি?"

"হ্যাঁ আপনি, মাইলর্ড, মার্ক্ইস ডি-ল্যান্টিনেক্"

৪

ফকির

মার্ক্ইস্ ডি ল্যান্টিনেক (এখন থেকে আমরা তাঁহাকে তাঁহার নিজের নামেই সম্বোধন করিব) শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "তাই হোক, আমাকে ধরিয়ে দাও।"

"লোকটা বলিল, "আমরা উভয়েই তো এখন 'নিজ-নিকেতনে'; আপনি দুর্গে, আমি জঙ্গলে।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "সব চুকে যা'ক্। তোমার কাজ তুমি কর, আমাকে ধরিয়ে দাও।"

লোকটা বলিল, "আপনি হার্ব-এন্-পেলের গোলাবাড়ীতে যাচ্ছিলেন না ?"

"হ্যাঁ।"

"যাবেন না।"

"কেন ?"

"সেখানে "ব্লু"রা রয়েচে।"

"কতকাল যাবৎ" ?

"আজ তিনদিন থেকে।"

"গোলাবাড়ীর ও গ্রামের লোকেরা তাদের বাধা দিয়েছিল ?"

"না। তারা বরং ওদের অভ্যর্থনা ক'রে নিল।"

"বটে !"

লোকটা গোলাবাড়ীর ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। অনতিদূরে গাছের উপর দিয়া সেই ছাদ দেখা যাইতেছিল।

"মার্কুইস্, ছাদটা আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তার উপরে কি আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?"

"কি যেন উড়্‌ছে।"

"হ্যাঁ।"

"একটা নিশান।"

"তে-রঙা।" লোকটা বলিল।

বালিয়াড়ির উপরে মার্কুইস্ যখন দাঁড়াইয়া ছিলেন তখন এইটিই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

"সঙ্কেত-সূচক ঘণ্টা বাজ্‌ছে না ?"—মার্কুইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ।"

"কি জন্য ?"

"স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আপনার জন্যে।"

"কিন্তু আমি তো তা শুনতে পাচ্ছিনে !"

"বাতাসে শব্দ উল্টো দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" লোকটা আরও বলিল, "আপনার ইস্তাহার দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ"।

"তারা আপনার পিছু লেগেছে।" গোলাবাড়ীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ওখানে অর্দ্ধব্যাটালিয়ন সৈন্য আছে।"

"সাধারণ তন্ত্রের ?"

"প্যারিসের।"

"উত্তম চল।" এই বলিয়া মার্কুইস্ গোলাবাড়ীর দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন।

লোকটা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল,"ওখানে যাবেন না।"

"কোথায় তাহ'লে আমাকে যেতে বল ?"

"আমার সাথে আমার বাড়ীতে।"

মার্কুইস্ স্থিরদৃষ্টিতে ভিক্ষুকের দিকে তাকাইলেন।

"শুনুন, মাইলর্ড, আমার বাড়ী সুন্দর নয়, তবে নিরাপদ। কুঠরীটি একটি গুহার চেয়েও নীচু। মেজে সমুদ্রের শেওলার, আর ছাউনি হচ্ছে গাছের ডাল ও ঘাসের। আসুন, গোলাবাড়ীতে গেলে আপনাকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌বে। আমার বাড়ীতে চাইকি, আপনি ঘুমুতেও পার্‌বেন, নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত। কাল সকালে নীলদলের লোকেরা চ'লে যাবে। আপনি তখন যেখানে খুসি যেতে পারবেন।"

মার্কুইস্ লোকটাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন পক্ষের ? সাধারণ তন্ত্রের কি রাজপক্ষের ?"

"আমি ভিকিরী।"

"রাজপক্ষেরও নও, সাধারণ তন্ত্রেরও নও।"

"কোন পক্ষেরই না।"

"তুমি রাজার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে ?"

"ওসব ভাববার আমার সময় নেই।"

"যা সব ঘট্‌ছে তার সম্বন্ধে কি মনে কর ?"

"আমার জীবিকারই সংস্থান নাই।"

"তবু তুমিতো আমাকে সাহায্য করতে এসেছ ?"

"কারণ, দেখ্‌লাম আপনাকে আইনের আশ্রয়বর্জ্জিত করেছে। আইন কি ? দেখা যায় আইনের বাইরেও লোক থাকতে পারে। বুঝিনা। আমি কি আইনের

আশ্রয়ে আছি? না, তা'র বাইরে? মোটেই জানি না। অনাহারে প্রাণ দেওয়া—সেটা কি আইনের ভেতরে?"

"কতকাল এই অনশন ক্লেশ ভোগ করচ?"

"জীবনভোর।"

"তবু তুমি আমাকে বাঁচাতে চাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কারণ, আমার মনে হ'ল—এই একজন যে আমার চেয়েও দীনদরিদ্র। আমার শ্বাস টান্‌বার এক্তিয়ার আছে, এর তাও নেই।"

"তা সত্য। সেজন্যেই তুমি আমাকে রক্ষা করচ?"

"নিশ্চয়ই। মন্‌ সেইনিয়র, আমি আর আপনি ভাই-ভাই। আমি চাই—রুটি, আপনি চান—জীবন। আমরা জোড়া ভিকিরি।"

"কিন্তু তুমি কি জানো, আমার মস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কিরূপে জান্‌লে?"

"আমি ইস্তাহারটা পড়েছি।"

"তুমি পড়তে জান?"

"হ্যাঁ। লিখতেও জানি। জানোয়ার হয়ে লাভ কি?"

"তা তুমি যদি পড়্‌তে পার, আর নোটীশটাও দেখে থাক, তা হ'লে ত জান্‌তে পেরেছ যে, আমাকে ধরিয়ে দিলে ষাট্‌হাজার পাউণ্ড্‌ রোজগার করা যায়?"

"তা জানি।"

"নোটে নয়।"

"হাঁ, জানি, মোহরে।"

"ষাটহাজার পাউণ্ড্‌; জানো এটা একটা মস্ত সম্পত্তি?"

"হ্যাঁ।"

"যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সেই এই সম্পত্তি লাভ করতে পারে?"

"বেশ, তার পরে কি?"

"এতটা সম্পত্তি!"

"আমিও ঠিক তাই ভেবেছি। যখন আপনাকে দেখ্‌লাম তখনই আমার মনে হ'ল, যে-কেহ এই লোকটাকে ধরিয়ে দিয়ে হয়তো এতটা সম্পত্তি ক'রে নেবে—একে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলা আবশ্যক।"

মার্কুইস্‌ ভিক্ষুকের অনুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা একটা ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এইখানেই ফকিরের আস্তানা। একটা বিশাল ওক্‌বৃক্ষের জটিল শিকড়ের নীচে মাটি খুঁড়িয়া একটা কুঠুরীর মতো করা হইয়াছে। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় সেটা সম্পূর্ণ আবৃত। স্থানটি অন্ধকার, নীচু, গুপ্ত এবং অদৃশ্য। দুইজনের থাকিবার মতো জায়গা আছে।

ভিক্ষুক বলিল, "আমার অতিথি জুট্‌তে পারে, এটা আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম।"

কুঠুরীতে কয়েকটি জগ্‌, খড়ের আঁটি, একটি চক্‌মকি পাথর ও ইস্পাতের টুক্‌রা, একবোঝা জ্বালানি কাঠ—এইসব আস্‌বাব ছিল।

তাঁহারা দুইয়া একরূপ হামাগুড়ি দিয়া কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং ভূমিতলে আস্তৃত শুষ্ক সামুদ্রিক শৈবালের উপর উপবেশন করিলেন। এই শৈবালদ্বারা শয্যার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। গহ্বরের প্রবেশপথ একটু চাঁদের আলোতে রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কুঠুরীর এককোণে এক কলসী জল, খানিকটা কালো পাউরুটি ও কতকগুলি বাদাম রহিয়াছে।

ভিক্ষুক বলিল, "আসুন, আহার করা যাক্‌।"

তাঁহারা বাদামগুলি ভাগ করিয়া লইলেন। মার্কুইস্‌ তাঁহার বিস্কুটখণ্ডটিও বাহির করিয়া দিলেন। দু'জনে একই পাউরুটির অংশ ভক্ষণ করিলেন এবং দু'জনেই পরপর একই জগ্‌ হইতে জলপান করিলেন।

কথাবার্ত্তা চলিল। মার্কুইস্‌ ভিক্ষুককে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

"তা'হ'লে, যাই কেন ঘটুক্‌ না তোমার কিছুই আসে যায় না?"

"কিছু না। আপনারা লর্ড, ও সব আপনাদের ব্যাপার।"

"কিন্তু যাই বল, বর্ত্তমান ঘটনাবলী—"

"আমার গায়ে তার বাতাস লাগে না!"

পরক্ষণে ভিক্ষুক আরো বলিল, "এর চেয়েও বড় বড় ব্যাপার আছে—যেমন সুর্য্যি ওঠে, চাঁদ বাড়ে কমে—আমি তাই নিয়ে সময় কাটাই।"

জগ্ হইতে আর এক চুমুক জল পান করিয়া সে বলিল, "আঃ, কেমন মিষ্টি, ঠাণ্ডা জল। জিজ্ঞাসা করিল, "মন্‌সেইনিয়র, জলটা আপনার লাগ্‌ছে কেমন?"

মার্কুইস জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম টেলিমার্চ্চ, কিন্তু লোকে আমাকে 'ফকির' ব'লে ডাকে। 'বুড়ো' নামেও আমি এ অঞ্চলে পরিচিত। আজ চল্লিশ বছর ধ'রে তারা আমায় 'বুড়ো' ব'লে আস্‌ছে।"

"চল্লিশ বৎসর! কিন্তু চল্লিশ বৎসর আগে ত তুমি যুবক ছিলে।"

"আমি কখনই যুবক ছিলাম না। পক্ষান্তরে, মাইলর্ড, আপনার চিরযৌবন। কুড়ি বছরের ছোক্‌রাদের মতো আপনার পায়ের গোছা, আপনি এখনো সেই বড় বালিয়াড়ির উপরে উঠ্‌তে পারেন। আর আমার? আমার তো হাঁটুতেই কষ্ট হয়। মাইলখানেক চ'লেই আমি হাঁপিয়ে পড়ি। তবুও আমাদের বয়স কিন্তু একই। ধনীদের যে একটা মস্ত সুবিধে—তারা রোজ খেতে পায়, খেলেই স্বাস্থ্য বজায় থাকে।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফকির পুনরায় বলিতে লাগিল—"দারিদ্র্য, ধন এতেই তো গোলমাল পাকিয়ে তুল্‌চে। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। গরীব চায় ধনী হ'তে, ধনীরা গরীব হ'তে নারাজ। সকল গোলমালের মূলেই তো ঐ। এ সব ব্যাপারে আমি আর নিজেকে জড়াইনে। যা' হ'বার তা' তো হবেই। আমি মহাজনের পক্ষেও নই, খাতকের পক্ষেও নই। এই মাত্র জানি একটা দেনা আছে, আর সেটা শোধ হচ্ছে, এই পর্য্যন্ত। আমার মনে হয়, রাজাকে তারা না মার্‌লেই ভাল হ'ত—কিন্তু, কেন, তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত কথা। কেউ হয়তো আমাকে পাল্‌টে বল্‌বে—কিন্তু এটা মনে আছে কি, কোন কিছু দোষ নেই, তবু সুধু সুধু রাজার আমলে লোকদের ধ'রে কেমন ক'রে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসী দিত? ভেবে দেখুন, একবার কাণ্ডটা কি রকম। রাজার বাগানের একটা হরিণের গায় গুলি করেছিল ব'লে একজন লোকের ফাঁসী হ'ল—আর তার স্ত্রী ও সাত সাতটা কাচ্চাবাচ্চা অনাথ হ'য়ে গেল। এ আমি নিজ চোখে দেখেছি। দুই দিকেরই ঢের বল্‌বার আছে।"

আবার সে কিছুক্ষণের জন্য নিঃস্তব্ধ হইল। তারপরে বলিল—"আমি আবার একটু একটু ডাক্তারী হেকিমীও করি। ভাঙা হাড় জোড়া লাগাই, গাছগাছড়ার গুণাগুণ জানি। সময় সময় এখানে থাকি না, কখনো বা অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবি। তাই লোকেরা মনে করে আমি বুঝি মন্ত্রতন্ত্রও জানি। আমি ভাবি, খোয়াব্ দেখি, তারা কাজেই মনে করে আমি খুব জ্ঞানী।"

"তুমি এই গ্রামেরই লোক?"

"আমি কখনো এর বাইরে যাইনি।"

"তুমি আমাকে চেন?"

"নিশ্চয়ই। আপনাকে শেষ দেখেছিলাম, যখন দু'বছর আগে আপনি এদিক দিয়ে ইংলণ্ড চ'লে যান। খানিকক্ষণ আগে দেখ্‌লাম বালিয়াড়ির উপর একজন খুব লম্বাপানা লোক। লম্বা লোক এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। ব্রিটেনীর লোকেরা খর্ব্বাকার। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লুম। নোটিশটা আগেই পড়েছিলুম্; অম্‌নি আমার মনে হ'ল "আঃ হা।" আপনি যখন নেবে আসলেন জ্যোছনায় আপনাকে চিন্‌তে আর দেরী হ'ল না।"

"কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি না।"

"আপনি আমাকে দেখেছেন, কিন্তু কখনো আমার দিকে তাকাননি।" ফকির আরও বলিল, "আমি কিন্তু আপনাকে তাকিয়ে দেখেছি। দাতা এবং ভিক্ষুকের দৃষ্টি তো একরূপ নয়।"

"তোমার সঙ্গে পূর্ব্বে কি কখনো আমার সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"অনেকবার। আমি আপনার দোরের চিরকেলে ভিকিরী। আপনি আমাকে ভিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যিনি দেন তিনি চেয়ে দেখেন-না, যে নেয় সেই লক্ষ্য করে, পরীক্ষা

করে। আপনার দুর্গ থেকে যে পথ বেরিয়ে গেছে, তারই পাশে আমি অনেকবার আপনার কাছে হাত পেতেছি। আপনি শুধু হাতটাই দেখেছেন, আর তা'তে ভিক্ষা ফেলে দিয়েছেন। সকলে সে দান আমি কুড়িয়ে এনেছি, না হ'লে রাত্রিরে মারা যেতাম। চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কিছু না খেয়েও আমার দিন কেটেছে। কখনো কখনো একটি পেনিতেও জীবনরক্ষা হয়। আমি আপনার নিকট আমার জীবন ধারি। আজ সে ধার শোধ দিচ্ছি।"

"তা' সত্য। তুমি আমাকে রক্ষা করেছ।"

"হ্যাঁ মনসেইনিয়র্, আমি আপনাকে রক্ষা করচি, কিন্তু—" বলিতে বলিতে টেলিমার্চ্চের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল—"এক সর্ত্তে।"

"কি সেটা?"

"যে আপনি এখানে কোনো অনিষ্ট করতে আসেননি।"

মার্কু'ইস বলিল, "আমি এখানে ভাল করবার জন্যে এসেছি।"

"ঘুমানো যাক্ এখন"—ভিক্ষুক বলিল।

শৈবাল শয্যার উপরে উভয়ে পাশাপাশি শুইয়া পড়িলেন। ফকিরের তখনই নিদ্রাকর্ষণ হইল। মার্কু'ইস ক্লান্তিসত্বেও কিয়ৎকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। একবার স্থিরদৃষ্টিতে ফকিরের দিকে চাহিলেন। এই বিছানায় শোওয়া মানে মাটিতে শোওয়া। তাই মাটিতে কাণ পাতিয়া তিনি শুনিতে লাগিলেন। মাটির নীচে অদ্ভুত গুন্‌গুন্ শব্দ হইতেছে। আমরা জানি শব্দ ভূগর্ভে চলিয়া যায়। তিনি ঘণ্টা ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। বিপদসূচক ঘণ্টা তখনও বাজিতেছিল। মার্কু'ইস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

৫

(স্বাক্ষর) গভেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে মার্কু'ইস বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন। দো'রের বাহিরে ফকির লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভোরের আলোতে তাহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত।

টেলিমার্চ্চ বলিল, "মনসেইনিয়রর্, এইমাত্র চারটা বেজে গেল। বায়ুর গতি পরিবর্ত্তন হয়ে এখন স্থলবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। বিপদসূচক ঘণ্টা আর বাজ্‌চে না, শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিনে। হার্ব্ব-এন্-পেল গ্রাম এবং সেখানকার গোলাবাড়ী সব চুপচাপ। 'নীল'দলের লোকেরা হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, নয় চ'লে গেছে। সঙ্কটাবস্থাটা বোধ হয় কেটে গেছে। আমাদের এখন ছাড়াছাড়ি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার বেরুবার সময় হ'ল।"

দূরে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া ফকির বলিল, "আমাকে ওইখানে যেতে হবে।"

বিপরীত দিকে পুনরায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনি যান এই দিকে।"

ফকির মার্কু'ইসকে অভিবাদন করিল। ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্যের দিকে দেখাইয়া বলিল, "ক্ষুধাবোধ করিলে এই বাদামগুলো নিয়ে যান।"

মুহূর্ত্ত পরে বৃক্ষাবলীর মধ্যে ফকির অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার্কুইস শৈবাল-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া টেলিমার্চ্চ-নির্দ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন।

স্নিগ্ধ মধুর উষা। প্রাচীন নর্ম্যান কৃষকগণের ভাষায় এই সময়টিকে "দিবসের বুলবুল্ সঙ্গীত" বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিহঙ্গমগণের কলকাকলীতে প্রভাত গগন ঝঙ্কৃত। পূর্ব্ব রাত্রে যে পথ দিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন, মার্কু'ইস সেই পথের অনুসরণ করিলেন। ক্রমে যেখানে পাথরের ক্রুশটি প্রোথিত ছিল সেই দ্বিপথের নিকটে তিনি উপনীত হইলেন। বিজ্ঞাপনটি তখনো সেখানে লাগানো ছিল। অরুণালোকে কাগজটা চিক্‌চিক্ করিতেছিল। মার্কু'ইসের মনে হইল, কাগজটির তলদেশে ক্ষুদ্র অক্ষরে কি লিখিত ছিল, তাহা বিগত সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রুশটির পাদপীঠের নিকট অগ্রসর হইয়া মার্কুইস্ দেখিলেন—"প্রিউর-ডি-লা মার্ণে এই স্বাক্ষরের নিম্নে ছোট হরফে আরো দুইটি লাইন মুদ্রিত আছে—

"ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক্ নিঃসন্দেহরূপে সনাক্ত হইলে তাহাকে তখনই গুলি করিয়া মারিতে হইবে। স্বাক্ষরঃ—তল্লাসী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ—গভেন্।"

"গভেন!" বিস্মিত মার্কু'ইস বলিয়া উঠিলেন "গভেন!" নোটিশটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি

ভাবিতে লাগিলেন। আবার বলিলেন, "গভেন!"

মার্কুইস চলিতে লাগিলেন। পুনরায় ফিরিয়া ক্রশটির দিকে চাহিলেন; কয়েক পদ পিছাইয়া আসিলেন, আবার ইস্তাহারটি পাঠ করিলেন।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কেহ নিকটে থাকিলে শুনিতে পাইত। মার্কুইস্ অস্ফুটস্বরে বিড়-বিড় করিয়া বলিতেছেন, "গভেন!"

যে নীচু পথ ধরিয়া মার্কুইস চলিয়া যাইতেছেন তথা হইতে বামপার্শ্বের গোলাবাড়ীর গৃহগুলির ছাদ মাত্র দেখা যায়। সেই পথের পাশে খুব উচু খাড়াই। উহার শীর্ষদেশ নানাপ্রকার তরুগুল্মে আবৃত। ঊষার কনকচ্ছটায় পত্র-পল্লবে যেন হাসির লহর বহিয়া যাইতেছিল। প্রভাতের বিমল আনন্দে প্রকৃতি কানায় কানায় পূর্ণ।

সহসা এই নিসর্গদৃশ্য ভীষণ আকার ধারণ করিল। অবর্ণনীয় আতঙ্কজনক ঢক্কানিনাদ বন্দুকের আওয়াজ ও লোমহর্ষণ চীৎকার ধ্বনিতে কঠিন প্রান্তর শব্দায়িত হইয়া উঠিল। গোলাবাড়ীর দিকে গাঢ় ধূমরাশি ও অনলশিখা উত্থিত হইতেছে, দেখা গেল। বোধ হইল যেন পল্লীটি ও তাহার সমস্ত ঘরবাড়ী শুষ্কতৃণস্তূপের মতো ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির শান্ত শ্রী সহসা চণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রভাতের আনন্দনিকেতনে নারকীয় লীলা আরম্ভ হইল, আরাম অতর্কিতে আতঙ্কে পরিণত হইল। কি আকস্মিক পরিবর্ত্তন!

মার্কুইস থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামে লড়াই হইতেছে।

এরূপ সময়ে মানুষের ভয় হইতে কৌতূহলটাই প্রবলতর হইয়া উঠে। কি হইতেছে সেটা জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। তাহা জানিতে গিয়া যদি প্রাণ দিতে হয় তা'ও স্বীকার। মার্কুইস সেই খাড়াইর উপর চড়িলেন। সেখান হইতে সব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাঁহাকেও লোকে দেখিয়া ফেলিতে পারে, সে আশঙ্কা ছিল।

বাস্তবিক সেখানে লড়াই ও অগ্নিকাণ্ড চলিতেছিল। মার্কুইস আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। গোলা-বাড়ীতে কোন পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। কিন্তু কি তাহা? গোলাবাড়ী কি আক্রান্ত হইয়াছে? কাহারা আক্রমণ করিল? লড়াই হইতেছে কি? না ইহা কোন সামরিক অনুষ্ঠান? অনেক সময় 'নীল'দলের লোকেরা বিদ্রোহীদের গ্রাম ও ক্ষেতখামার জ্বালাইয়া দেয়। বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্টের এরূপ একটা আদেশ ছিল। সাধারণ তন্ত্রের সৈন্যদলের অভিযানের জন্য জঙ্গলের গাছ কাটিয়া পথ করিয়া রাখিতে গ্রামবাসীরা বাধ্য ছিল। তাহা না করিলে সেই সব গ্রাম উক্ত সৈন্যদল জ্বালাইয়া দিত। হার্ব-এন্-পেলে কি সেরূপ কিছু হইতেছে? গোলাবাড়ীতে সন্নিবিষ্ট অগ্রগামী সৈন্যদল কি এরূপ কোন আদেশ পাইয়াছে?

ব্যাপারটা এরূপ কোন সামরিক অনুষ্ঠান হইলে খুব সাংঘাতিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। কেননা সমস্ত পাশবিক কর্ম্মের মতোই অত্যন্ত সত্বরতার সহিত ইহার সমাধা হইল। মার্কুইস্ সেই উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া কল্পনা ও অনুমানের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এবং সেখানে থাকিতেও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, নামিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। সব লক্ষ্য করিতেছিলেন ও কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সেই ধ্বংসকার্য্যের বিরাম হইল। তিনি লক্ষ্য করিলেন, ঝোপের মধ্যে যেন একদল হর্ষোৎফুল্ল দুর্দ্দান্ত সৈন্য ছড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষের নীচে ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটাছুটি হইতেছে, শব্দ পাওয়া গেল। ড্রাম বাজিতেছে। বন্দুকের আওয়াজ আর হইতেছিল না। তাহারা যেন কি খুঁজিতেছে,—কিসের অনুসরণ করিতেছে। অস্পষ্ট কোলাহল ও চীৎকার এখানে সেখানে শোনা যাইতেছে। তাহাতে ক্রোধ এবং বিজয়ের স্বর মিশ্রিত। কোলাহলের মধ্যে সহসা একটি কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হইল। যেমন করিয়া ধূমরাশির মধ্যে কোন বস্তুর অবয়ব ফুটিয়া উঠে। সেটা হইতেছে একটা নাম। সহস্রকণ্ঠে উচ্চারিত সেই নাম মার্কুইস্ পরিষ্কার শুনিতে পাইলেন,—

"ল্যান্টিনেক্! ল্যান্টিনেক্! মার্কুইস্-ডি-ল্যান্টিনেক!"

তাঁহাকেই তাহারা খুঁজিতেছেন!

৬

অন্তর্বিপ্লবের ঘূর্ণীচক্র।

সহসা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঝোপঝাড়ের উপর দিয়া বন্দুক, সঙীন্, তরবারি ও একটা ত্রিবর্ণের পতাকা উচু হইয়া উঠিল, এবং ল্যাটিনেক্ নাম একেবারে কাণের গোড়ায় আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল। সম্মুখে পশ্চাতে পায়ের কাছে নিষ্ঠুরাকৃতি জনগণের সমারোহ।

সেই উচ্চভূমির উপর মার্ক্ইস্ একাকী দণ্ডায়মান। তাঁহার নাম লইয়া যাহারা চীৎকার করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দেখিতে পাইতেছিল। অরণ্যমধ্যস্থ সহস্র সহস্র বন্দুকের তিনি একমাত্র লক্ষ্যস্থল। যেদিকে তাকান সেইদিকেই রক্তচক্ষুর ক্রুদ্ধদৃষ্টি।

মার্ক্ইস্ টুপী খুলিয়া তাহার প্রান্ত উপরদিকে উল্টাইয়া দিলেন। পকেট হইতে একটা সাদা "রিবন্" বাহির করিয়া ঝোপ হইতে একটা লম্বা কাঁটা ছিঁড়িয়া তদ্দারা টুপীর উপর "রিবন্"টি আট্কাইয়া দিলেন। তারপর টুপীটি পুনরায় মাথায় দিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া উচ্চকণ্ঠে মেঘমন্দ্রে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—"আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে তোমরা খুঁজিতেছ। আমিই সেই মার্ক্ইস্ ডি-ল্যাটিনেক্, ভাইকাউণ্ট্ ডি-ফন্টেনয়, ব্রিটেনীর প্রিন্স, রাজসৈন্যের লেফ্টানেন্ট্ জেনারেল্। এইবার শেষ করে ফেল! লক্ষ্য কর, গুলি চালাও!" এই বলিয়া ছাগচর্ম্মের কোর্ত্তা দুইহাতে টানিয়া ছিন্ন করিয়া আপনার নগ্ন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, কৃতলক্ষ্য বন্দুকধারীর পরিবর্ত্তে তাঁহার চারিদিকে ক্ষিতিতল-ন্যস্ত-জানু জন-সমূহ। বিপুল নির্ঘোষে চীৎকার হইল,

"ল্যাটিনেক দীর্ঘজীবি হউন! মূন-সেইনিয়র্ দীর্ঘজীবি হউন! জেনারেল্ দীর্ঘজীবি হউন!"

হর্ষোচ্ছ্বাসে টুপীগুলি উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মাথার উপর উল্লাসে তরবারি খেলিয়া গেল, এবং সমস্ত ঝোপঝাড় হইতে উন্নত যষ্টিশীর্ষে বাদামীরঙের রেশ্মী টুপী আন্দোলিত হইতে লাগিল। মার্ক্ইস দেখিলেন, এক ভেণ্ডির সৈন্যদলে তিনি পরিবৃত। দর্শনমাত্রই তাহারা তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়াছে।

লোকগুলি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কাহারো হাতে বন্দুক, কাহারো হাতে কৃপাণ, কেহ বর্শা, কেহ কাস্তে, কেহ বা লাঠি লইয়া আসিয়াছে। সাদা "রিবন্" লাগানো বাদামীরঙের পশমী টুপী সকলেরই। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে চাম্ড়ার খাটো কোর্ত্তা, কিন্তু গুল্ফ অনাবৃত। সর্ব্বশরীরে তাবিজ কবচ ও জপ্মালার প্রাচুর্য্য। চেহারা সকলেরই ভয়ঙ্কর।

নতজানু জনতার মধ্য দিয়া একটি সৌম্যমূর্ত্তি যুবক মার্ক্ইসের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারও পরিচ্ছদ উল্লিখিত কৃষকদেরই মতো। তবে তাহার হস্তদ্বয় শুভ্র, পোষাকের কাপড়চোপড় অধিকতর মূল্যবান এবং তাহার ওয়েষ্ট্কোটের উপর একটি সাদা উত্তরীয় আবদ্ধ, তথা হইতে স্বর্ণবাটযুক্ত একটি তরবারি লম্বিত।

মার্ক্ইসের নিকট আসিয়া যুবক শিরস্ত্রাণ অপসারিত করিল, এবং রেশমী উত্তরীয়ের বন্ধন মোচন করিল। তারপর এক জানু ভূমিতলে রাখিয়া তরবারি ও উত্তরীয় মার্ক্ইসের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"আমরা আপনারই অনুসন্ধান করছিলেম এখন আপনাকে পেয়েছি। নেতার তরবারি এই গ্রহণ করুন্। আমি এতদিন উহাদের নেতা ছিলাম—এক্ষণে আপনার অধীনে সৈনিক হ'য়ে আমি গৌরব বোধ করছি। আমাদের বশ্যতা গ্রহণ করুন। মাইলর্ড, জেনারেল্, আদেশ দিন্।"

এই বলিয়া সে ইঙ্গিত করিলে একদল লোক একটা ত্রিবর্ণের পতাকা বহন করিয়া বন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং মার্ক্ইসের সন্নিধানে উপনীত হইয়া উক্ত পতাকা তাঁহার পদতলে রক্ষা করিল। এই নিশানটিই মার্ক্ইস্ বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যুবক বলিল, "জেনারেল্, এই নিশান হার্বে'ন্-পেলে সন্নিবিষ্ট "ব্লু" সেনাদলের নিকট হইতে আমরা এইমাত্র কেড়ে নিয়েছি। মন্‌সেইনিয়র্, আমার নাম গেভার্ড। আমি মার্ক্‌ইস্ ডি লা রোয়ারির অধিকারভুক্ত।"

মার্ক্‌ইস্ বলিলেন—"উত্তম।"

তারপর শান্তগম্ভীরভাবে তিনি সেই রেশমী উত্তরীয়খানি গাত্রবস্ত্রে আবদ্ধ করিলেন এবং কোষমুক্ত তরবারী মাথার উপরে সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন—

"ওঠ, রাজা দীর্ঘজীবি হোন্।"

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। অরণ্যের অন্তরতম প্রদেশ পূর্ণ করিয়া উদ্দাম উল্লাসধ্বনি আকাশে উত্থিত হইল—"রাজা দীর্ঘজীবি হোন! আমাদের মার্ক্‌ইস্ দীর্ঘজীবি হোন্! ল্যান্টিনেক্ দীর্ঘজীবি হোন্!"

গেভার্ডের দিকে ফিরিয়া মার্ক্‌ইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমাদের সংখ্যা কত?"

"সাত হাজার।"

খাড়াই হইতে নামিতে নামিতে গেভার্ড মার্ক্‌ইস্‌কে বলিলেন,

"মন্‌সেইনিয়র, যা' ঘটেছে, এক কথায় তা বোঝানো যেতে পারে। সুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা ছিল। সাধারণতন্ত্র আপনার গ্রেফ্‌তারের জন্য যখন পুরস্কার ঘোষণা কর্‌লে—তখনই আমরা বুঝ্‌তে পারলাম আপনি এই দিকেই আছেন। আর তা'তেই এ অঞ্চলের সমস্ত লোক রাজার জন্য ছুটে' এল। গ্রেন্‌ভিলের মেয়র্ (তিনিও আমাদের পক্ষে) গোপনে আমাদের সংবাদ দিয়েছিলেন। কাল রাত্রিরে তা'রা সঙ্কেতসূচক ঘণ্টা বাজিয়েছিল।"

"কার জন্য?"

"আপনার জন্যে।"

মার্ক্‌ইস্ সুধু একটা কথা উচ্চারণ করিলেন—"হুঁ।"

"দেখুন, অমনি আমরা এসে পড়েছি।"

"আর তোমরা হচ্চ সাত হাজার।"

"আজ তাই বটে। কাল আমরা পনেরো হাজার হ'ব। আমরা নিশ্চিত মনে ক'রেছিলাম, আপনি এইবনেরই কোন অংশে আছেন। তাই আপনাকে খুঁজছিলাম।"

"তোমরা "নীল"দলের লোকদের হার্ব-এন্-পেলে আক্রমণ করেছিলে?"

"বাতাসের গতিকে তারা ঘণ্টাধ্বনি কিছুই শুন্‌তে পায়নি—তারা কিছু সন্দেহও করেনি। গ্রামের লোকেরা নির্বোধ—তা'দের সদ্ভাবেই গ্রহণ ক'রেছিল। আজ সকালে "নীল"দলের লোকেরা যখন ঘুমে অচেতন, তখন আমরা তাদের ঘিরে' ফেলি। কাজ শীগ্‌গিরই ফতে হ'য়ে গেল। আমার একটা ঘোড়া আছে, আপনি সেটা নেবেন কি, জেনারেল?"

"হ্যাঁ।"

একজন কৃষক রণসাজসজ্জিত একটি শ্বেতবর্ণের তুরঙ্গম লইয়া আসিল।

মার্ক্‌ইস্ বিনা সাহায্যে তাহার উপর আরোহণ করিলেন।

"হুররে!" কৃষকগণ চীৎকার করিল। ব্রিটেনীর উপকূলপ্রদেশে ইংলিশ চ্যানেলস্থিত দ্বীপসমূহের সহিত সংস্রব বশতঃ ইংরাজের ব্যবহৃত হর্ষ-শোকাদিসূচক শব্দাদির খুব প্রচলন ছিল।

গেভার্ড মিলিটারী ধরণে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্‌সেইনিয়র্, আপনার প্রধান আড্ডা কোথায় হইবে?"

"প্রথমতঃ ফুজার্‌সের অরণ্যে।"

"এটি মাইলর্ডের সপ্তারণ্যের একটি।"

"আমাদের একজন পাদ্রী চাই।"

"তা আছে।"

"কে?"

"চ্যাপেল—আর—ব্রির কিউরেট্।"

"আমি তা'কে জানি। তিনি জার্সি'তে গিয়েছিলেন।"

একজন পাদ্রী জনতার মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া বলিল—"তিনবার।"

মার্ক্‌ইস্ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত, পাদ্রীমহাশয়, আপনার সম্মুখে কাজ রয়েছে।"

"ভালোই ত, মাই-লর্ড।"

"আপনাকে কনফেসন্ (পাপস্বীকার) শুন্‌তে হ'বে। অবশ্য যারা স্বেচ্ছায় করে,' কারো উপর জোর করা হ'বে না।"

পাদ্রী বলিল, "মাইলর্ড, গেমিনিতে গেষ্টন সাধারণতন্ত্রের লোকদের উপর এজন্যে বলপ্রয়োগ করে।"

"সে একজন নাপিত মাত্র। মৃত্যুটা স্বাধীন হওয়াই সঙ্গত।"

গেভার্ড লোকদের কি আদেশ জানাইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"জেনারেল্, আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌চি।"

"প্রথমে ফুজাসে'র অরণ্যে গিয়ে সকলে সমবেত হও। এদের বিদেয় করে' দাও, তারা সেখানে প্রস্থান করুক্।"

"এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

"তুমি না বল্‌ছিলে যে হার্ব-এন্-পেলের অধিবাসীরা নীলদলের লোকদের সদ্ভাবে গ্রহণ করেছিল?"

"হ্যাঁ, জেনারেল্।"

"তুমি বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছ?"

"হাঁ।"

"পল্লীটা জ্বালিয়ে দিয়েছ?"

"না।"

"জ্বালিয়ে দাও।"

"ব্লুরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা মোটে দেড়শো; এদিকে আমরা হচ্ছি সাতহাজার।"

"কে তারা?"

"সান্টারের সেনাদল।"

"সান্টারে!—সেই লোকটা যে রাজার মাথা কাটবার সময়ে ঢাক বাজাবার হুকুম দিয়েছিল। তাহলে এটা প্যারিসের রেজিমেণ্ট!"

"অর্দ্ধ রেজিমেণ্ট্।"

"রেজিমেণ্টের নাম?"

"এদের পতাকায় 'লাল-পল্‌টন' এই কথা লেখা ছিল।"

"জানোয়ারের দল।"

"আহতদের কি করা হবে?"

"নিকেশ করে ফেল।"

"আর বন্দীদের?"

"গুলি করে' মারো।"

"তা'রা প্রায় আশীজন।"

"সব্বাইকে গুলি করে মেরে ফেল।"

"তাদের মধ্যে দুটী হচ্ছে মেয়েলোক।"

"তাদেরও।"

"তিনটি শিশু আছে।"

"তাদের নিয়ে যাও। পরে দেখা যাবে—ওদের কি করা উচিত।"

মাইর্কুস্ ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

৭

"দয়া করোনা!" (সাধারণ তন্ত্রের রণমন্ত্র)।
"ক্ষমা করোনা!" (রাজতন্ত্রের রণমন্ত্র)।

এদিকে ফকির ক্রলন গ্রামের অভিমুখে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে সে নিঃশব্দ, ছায়াময়, তরুগুল্ম-সমাচ্ছন্ন খদগুলির মধ্যে ডুবিয়া গেল। কোনোদিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। লক্ষ্যহীন স্বপ্নমুগ্ধের মতো সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইলে বন্য ফল ভক্ষণ, পিপাসা পাইলে অঞ্জলি ভরিয়া ঝরণার জলপান—এইরূপে ফকির পথ অতিবাহন করিয়া চলিয়াছে। সময় সময় সূর্য্যকিরণে সে আপনার ছিন্ন গাত্রবস্ত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া লইতেছিল। এক-একবার কাণ পাতিয়া সে দূরের কোলাহল শোনে, আবার পাখীর কূজন শ্রবণ করিতে করিতে আবেশময় নিসর্গ সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া যায়।

ফকীর বুড়োমানুষ—ধীরে ধীরে চলা-ফেরা করে। বেশীদূর হাঁটিতে পারে না। মার্কুইস্‌কে সে বলিয়াছিল যে পোয়ালীগ্ যাইতেই তাহার ক্লান্তি হয়। সে কথা ঠিক। খানিকদূর যাইয়াই সে পুনরায় ফিরিয়া চলিল। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আস্তানায় পৌঁছিতে পারিল না।

ক্রমে সে একটা বৃক্ষহীন উচ্চভূমিতে আসিয়া উপনীত হইল। তথা হইতে পশ্চিমদিকে দূরসাগর-সীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি অবারিত।

একটা ধূমস্তম্ভের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

ধূমের মতো এমন শান্ত জিনিষ আর নাই। আবার চম্‌কাইয়া তুলিতেও উহার মতো দ্বিতীয় আর একটি মিলে

না। শান্তিময় এবং অমঙ্গলসূচক উভয়বিধ ধূমই আছে। ধূমরেখার আপেক্ষিক ঘনত্ব ও বর্ণভেদ সমর ও সন্ধি, মিত্রতা ও শত্রুতা, আতিথেয়তা ও সমাধি, এবং জীবন ও মরণের পার্থক্য সূচিত করে। তরুপুঞ্জভেদি উড্ডীয়মান্ ধূমরাশি হয়তো জগতের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম—গৃহ ও গার্হস্থ্য-জীবন—তাহারই দ্যোতক; অথবা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর—গৃহভবনভস্মসাৎ-কারী গ্রাম-জনপদ-বিধ্বংসী দিগ্‌দাহ—তাহারই সূচক। এই লঘু বাষ্পরাশি—বাতাস যাহাকে যদৃচ্ছা উড়াইয়া লইয়া বেড়ায়—কখনো কখনো ইহারই মধ্যে মানুষের সমগ্র সুখ কিংবা অপরিসীম দুঃখের বিচিত্র ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে প্রচ্ছন্ন থাকে।

টেলিমার্চ্চ যে ধূমরাশি দেখিতে পাইল তাহা উদ্বেগজনক।

ঘনকৃষ্ণ ধূমরাশি মাঝে মাঝে রক্তিম আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিতেছে, এবং প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে—এরূপ বোধ হইল। ধূম উঠিতেছে হার্ব্ব-এন্‌পেল্ গ্রামের উপর দিয়া।

টেলিমার্চ্চ এই ধূমের অভিমুখে দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল।

ফকীর বড়ই ক্লান্ত—কিন্তু এ'র মানে জানা চাই।

সে একটা টিলার উপর আরোহণ করিল। ইহারই পার্শ্বদেশে পল্লী ও গোলাবাড়ীটি নিষণ্ণ ছিল।

কিন্তু এখন তথায় আর পল্লীও নাই, গোলাবাড়ীও নাই।

একটা ধ্বংসাবশেষস্তূপ তখনও জ্বলিতেছিল। উহাই হার্ব্ব-এন্‌-পেল্।

রাজপ্রাসাদ-দহন হইতেও একটি পর্ণকুটীর-দহনের দৃশ্য অধিকতর করুণ। অনলশিখা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীর—কি মর্ম্মান্তিক! এ যেন দারিদ্র্যের উপর দুর্দ্দৈবের কশাঘাত, ভূমিলগ্ন কীটের উপর তীক্ষ্ণ-নখ-চঞ্চু গৃধ্রের নিষ্ঠুর আক্রমণ। ব্যাপারটা এমনই পরস্পরবিরোধি যে দেখামাত্র হৃদয় আড়ষ্ট হইয়া যায়।

বাইবেলে বর্ণিত আছে, একজন মনুষ্য দাব-দাহ-সন্দর্শনে প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎকালের জন্য টেলিমার্চ্চেরও সেই দশা হইল। সম্মুখের ভীষণ দৃশ্যে সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অবাধ নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বংসের দেবতা আপন কার্য্য সমাপ্ত করিতেছিল। একটি চীৎকার নাই—একটী দীর্ঘনিশ্বাসও এই ধূমোচ্ছ্বাসের সহিত মিলিত হইতেছিল না। জ্বলন্ত চুল্লীতে গ্রামটি নীরবে ভস্মসাৎ হইতেছে। দহ্যমান কাষ্ঠখণ্ড ও তৃণরাশির পট্‌পট্ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সময়ে সময়ে ধূম সরিয়া গেলে ছাদহীন হাঁ-করা কক্ষগুলি দেখা যাইতেছিল। ভিতরে সব সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত। যৎসামান্য আসবাব ও জীর্ণবস্ত্রাদির ভগ্ন-ছিন্নাংশগুলি চুণীর মতোই রক্তরাগে জ্বলিতেছে। টেলিমার্চ্চের মাথা ঘুরিয়া গেল।

গৃহসন্নিকটে কতগুলি বাদামগাছ ছিল। সেগুলিও জ্বলিতেছে।

আর্ত্ত-কণ্ঠে কোনো ক্ষীণ আবেদন, কোনোরূপ সাহায্য প্রার্থনা,—কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা, টেলিমার্চ্চ কান পাতিয়া রহিল। অগ্নির লেলিহান্ শিখার তাণ্ডবনৃত্য ব্যতীত আর কোনো চাঞ্চল্য সেখানে নাই। সব চুপচাপ। সকলেই কি পলায়ন করিয়াছে? কোথায় সেই সকল লোক যাহারা হার্ব্ব-এন্‌-পেলে বাস করিত, এবং যাহাদের কর্ম্ম-কোলাহলে গ্রামখানা সারাদিন মুখরিত থাকিত? এই ক্ষুদ্র সমাজটির কি হইল?

টেলিমার্চ্চ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল।

তাহার সম্মুখে এক দুর্ভেদ্য শ্মশানরহস্য। অপলক নেত্রে ছায়ার মতো ধীরে ধীরে সে এই ধ্বংসাবশেষের দিকে অগ্রসর হইল। এই মহাশ্মশানে নিজেকে প্রেতমূর্ত্তির মতো তাহার মনে হইতেছিল।

যেখানটায় গোলাবাড়ীর সদর-দরজা ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া টেলিমার্চ্চ প্রাঙ্গনের দিকে চাহিল। দেওয়াল পড়িয়া যাওয়াতে চতুর্দ্দিকের জমীর সহিত উহার পার্থক্য এখন আর বোঝা যায় না। এতক্ষণ সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা তো কিছুই নয়—ভয়ঙ্কর, এইমাত্র। কিন্তু এবার যাহা দেখিল, তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল।

প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটা কালো স্তূপ—তাহার একপার্শ্ব অগ্নিশিখায়; অপর পার্শ্ব চন্দ্রালোকে অস্পষ্টরূপে

আলোকিত। এই স্তূপ—মনুষ্যদেহের! আর এই মানুষগুলি সকলেই মৃত!

এই নরদেহস্তূপের চারিদিকে স্থানে স্থানে যেন তরল-পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে। আর সেই ধূমায়িত তরল পদার্থে অনলশিখা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কিন্তু অগ্নিশিখায় উহাকে রাঙাইবার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সে তরল পদার্থ নরশোণিত ভিন্ন আর কিছুই নহে!

টেলিমার্চ্চ আরো নিকটে গেল। একটি একটি করিয়া সে এই ভূলুণ্ঠিত দেহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সকলগুলিই প্রাণহীন।

উপরে চাঁদ হাসিতেছে—নীচে খাণ্ডবদাহের অট্টহাস্য!

সবগুলিই সৈনিকের মৃতদেহ। পাগুলি নগ্ন—পাদুকা ও অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু নীলসৈনিক-পরিচ্ছদগুলি অপসারিত হয় নাই। এই স্তূপের মধ্যে, এখানে ওখানে বন্দুকের গুলিতে শতচ্ছিদ্র ত্রিবর্ণ 'রিবন'যুক্ত টুপী দেখা যাইতেছিল। উহারা সাধারণতন্ত্রের লোক—সেই প্যারিসীয় দল যাহারা বিগত সন্ধ্যায় হার্ব্ব-এন্-পেল্ গোলাবাড়ীতে ছাউনী করিয়াছিল। শবগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে ইহাদিগকে আদেশানুসারে সতর্কতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে। সকলেই মরিয়া গিয়াছে। এই নরদেহস্তূপের মধ্য হইতে মুমূর্ষুর অন্তিম-চীৎকার একটিও শোনা গেল না।

টেলিমার্চ্চ দেখিল, দেহগুলি সবই গুলিবিদ্ধ।

যাহারা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় শবগুলিকে সমাহিত করিয়া যাইবার সময় হয় নাই।

টেলিমার্চ্চ সরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তাহার দৃষ্টি একটা অনুচ্চ প্রাচীরের উপর নিপতিত হইল। সে দেখিল উহার এককোণে চারিটি পা বাহির হইয়া রহিয়াছে।

এই পাগুলিতে জুতা পরানো ছিল; অপর পাগুলির তুলনায় এ পাগুলি ছোট। নারীর পা। দুইটি রমণীদেহ দেওয়ালের পিছনে পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারাও বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছে।

টেলিমার্চ্চ নুইয়া দেখিতে লাগিল। একজন উর্দ্দীপরা—তাহার পাশে একটা সুরাপাত্র—ভাঙা এবং খালি। এ একজন পানীয় সরবরাহিকা। মাথায় তাহার চারিটি গুলির আঘাত-চিহ্ন। মরিয়া গিয়াছে।

টেলিমার্চ্চ অপরাকেও লক্ষ্য করিয়া দেখিল। একজন কৃষক রমণী। ফ্যাকাসে দেহ—মুখ হা' করিয়া রহিয়াছে, চক্ষু মুদ্রিত। তাহার মস্তকে কোনো আঘাত চিহ্ন নাই তাহার জীর্ণ পরিচ্ছদ আলুথালু হইয়া পড়িয়াছে। বক্ষ অর্দ্ধ অনাবৃত। পোষাক একটু সরাইয়া টেলিমার্চ্চ দেখিল তাহার স্কন্ধে গুলির আঘাতের মতো গোলাকার ক্ষতচিহ্ন কাঁধের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার বিবর্ণ বক্ষের দিকে চাহিয়া টেলিমার্চ্চ বলিল—"দুধের ছেলের মা।" স্পর্শ করিয়া দেখিল রমণীর দেহ এখনো ঠাণ্ডা হইয়া যায় নাই। স্কন্ধের আঘাত ভিন্ন আর কোন আঘাত সে পায় নাই।

তাহার বুকে হাত রাখিয়া টেলিমার্চ্চ অনুভব করিল, হৃদ্‌পিণ্ড এখনো ধুক্ ধুক্ করিতেছে। রমণী মরে নাই। টেলিমার্চ্চ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চীৎকার করিয়া বলিল,

"এখানে কি কেহ নাই?"

"ফকীর, তুমি না কি?" কে একজন অতি মৃদুস্বরে জবাব দিল।

সেই মুহূর্ত্তে একটা ছিদ্রপথে একটা মাথা দেখা গেল, আর এক দিকে আর একটা মাথা বাহির হইয়া আসিল। ইহারা দুইজন কৃষক। গোলমালের সময় লুকাইয়া ছিল। কেবল এই দুইজনই এ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ফকিরের পরিচিত কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া কৃষকদ্বয় তাহাদের গোপন আশ্রয়স্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহারা তখনো ভয়ে কাঁপিতেছিল।

টেলিমার্চ্চ চীৎকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন কথা বলিতে পারিল না। প্রবল হৃদয়াবেগের কালে অনেক সময় এরূপ হয়। পদতলে শয়ান রমণী-মূর্ত্তির দিকে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করিল,

"এখনো জীবিত আছে কি?"

টেলিমার্চ্চ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ।"

"অপর মেয়ে লোকটিও বেঁচে আছে কি?"

টেলিমার্চ্চ মাথা নাড়িল। প্রথম কৃষক বলিল।

"আর সকলেই মরে গেছে, নয় ? আমি সব দেখেছি। আমি মেজের নীচের কুঠুরীতে লুকিয়ে ছিলুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কোনো পরিজন নেই। আমার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। হা ভগবান্, তারা সবাইকে মেরে ফেলেছে। এই মেয়ে লোকটির তিনটি ছোট্ট ছেলেমেয়ে ছিল। সবই কচিকচি। ওরা মা—মা ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; আর রমণী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল, "বাছারা!" এই হত্যাকাণ্ড যারা করেচে তারা সব চ'লে গেছে। মা'কে গুলি ক'রে তারা কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে নিয়ে গেছে। আমি সবই দেখেছি। কিন্তু তুমি বল্লে না, মাগী মরে নি ? বল, ফকীর, তুমি ওকে বাঁচাতে পার্‌বে ? তোমার আস্তানায় আমরা ওকে নিয়ে যাব কি ?

টেলিমার্চ্চ ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল।

গোলাবাড়ীর নিকটেই জঙ্গল। ডালপালা দিয়া তাহারা সত্বরই একটা ডুলির মতো তৈয়ার করিল এবং রমণীকে উহার উপর শোওয়াইয়া বহন করিয়া চলিল। একজন পায়ের দিকে, আর একজন মাথার দিকে; আর টেলিমার্চ্চ রমণীর হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতে দেখিতে চলিল।

চলিতে চলিতে কৃষকদ্বয় কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। রমণীর রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিতেছিল।

"সবাইকে হত্যা করা—কি ভয়ঙ্কর!"

"সব জ্বালিয়ে দেওয়া! হা ঈশ্বর! এখন কি এইরকমই চল্‌বে ?"

"সেই লম্বাপানা বুড়োর হুকুমেই এই সব হ'ল।"

"তা ঠিক, তারই আদেশ।" "যখন গুলি চালাচ্ছিল তখন আমি কিছু দেখিনি। বুড়ো তখন ছিল কি ?"

"না। চ'লে গেছ্‌ল। কিন্তু তাতে কি ? তা'র হুকুমেই তো সব হচ্ছিল।"

"তা হ'লে সে সব কল্লে বল্‌তে হ'বে।"

"সে বল্লে, 'হত্যা কর'! 'জ্বালিয়ে দাও'! দয়া করো না'!"

"বৃদ্ধ নাকি একজন মার্ক্‌ইস্‌ ?

"তা' ত বটেই; আমাদেরই মার্ক্‌ইস।"

"কি ব'লে তা'র এখন পরিচয় দেওয়া হয় ?"

"তিনি লর্ড অব্‌ ল্যান্টিনেক্‌।" টেলিমার্চ্চ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "যদি আগে বুঝতে পারতাম্‌!"

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

আধুনিক নাটক

শ্রীযুক্ত অভিনব গুপ্ত

১

কথোপকথন ও ক্রিয়া—ইহাদের লইয়াই নাটক। বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সঙ্ঘর্ষ—ট্র্যাজিডির প্রাণ সঞ্চারিত হয় ইহা হইতেই। ভাগ্য ও ঘটনার বিরুদ্ধে ইচ্ছার বিদ্রোহ—যে ঘটনা জীবনকে পঙ্গু ও পীড়িত করে, যে-ভাগ্য জীবনকে খর্ব্ব ও ক্ষুধিত করিয়া রাখে। হয় সমাজ, নয় দেবতা, নয় প্রথা, নয় মানুষ—কিম্বা কখনো কখনো নিজেরই সঙ্গে বিরোধ। এই দ্বন্দ্ব সব সময়েই শারীরিক নয়, আত্মিক। এবং এই দ্বন্দ্ব ও এই দ্বন্দ্বপ্রসূত পরাজয় হইতেই ট্র্যাজিডির উৎপত্তি।

'*Oedipus*'-এ আমরা ভাগ্যের বিরুদ্ধে বন্দী মানবাত্মার সংগ্রাম দেখি,—ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেখি *Romeo and Juliet*-এ, নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম *Hamlet*-এ, কর্ত্তব্য ও প্রেমের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ মেটারলিঙ্কের *Monna Vanna*-য়। এবং এই জীবনব্যাপী সংগ্রামের বিফলতাতেই ট্র্যাজিডির পরিণতি। কমেডির পক্ষে সমাপ্তিটাই লক্ষ্য নহে—প্রতি মুহূর্ত্তে বিচিত্র রসোদ্দীপন-ই তাহার উদ্দেশ্য,—শেষে কি হইবে তাহার জন্য তাহার কিছু আসে যায় না। Catastrophe-টা ট্র্যাজিডির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—তাহার রচনাগৌরবও সেই-খানে; কমেডি নিজের মধ্যেই সুসম্পূর্ণ—ঘটনার কোনো অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না।

ট্র্যাজিডির অস্তিত্ব মানুষের আত্মায়, তাহার সুকঠোর সংগ্রামের ভয়াবহ ব্যর্থতায়। অতএব, ট্র্যাজিডির নাটকীয় রূপের জন্য আর য়্যারিষ্টটলের সূত্র মানিয়া নেওয়ার প্রয়োজন নাই। রাজারাজড়া না হইয়াও মানুষ দুঃখভোগের পরম অধিকারী হইয়াছে, এবং তাহার অবিচল সহিষ্ণুতা দ্বারা সেই দুঃখকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে। হেরোডোটাস্ ও নীট্শের মতে মানুষ আজিও নিয়তির রথচক্রে শৃঙ্খলিত; বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের সুবিধা বাড়িলেও সুখ বাড়ে নাই—এস্কাইলাসের সময় যে দুঃখময় জীবন ছিল, বর্ত্তমান মানুষ তাহারই যোগ্য উত্তরাধিকারী। আজিকার দিনেও Job-এর দেখা মিলে। Oedipus বা Thyests না হইলেও *Justice*—নাটকের Falder আছে। অন্ধ Oedipus-এর চেয়ে ব্যর্থ Falder-এর দুঃখ কি কম?

ব্যক্তির পরাজয়, ঘটনার অব্যবস্থা এবং তৎপ্রসূত গভীর অনুভূতি ও অনুকম্পা—ট্র্যাজিডি ইহাই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। নায়কের অকালমৃত্যুর চেয়ে তাহার যাবজ্জীবন পঙ্গুতা বা অসম্পূর্ণতাই অধিকতর ব্যর্থতাসূচক। মৃত ওথেলোর চেয়ে আহত ইয়াগোই কি মনে গভীর রেখাপাত করে না? শক্তির চেয়ে আকাঙ্ক্ষা যাহার বড়, নাগালের বাইরে দৃষ্টি যাহার দূরপ্রসারিত—তাহার ব্যর্থতাই মর্ম্মস্পর্শী। এই দুঃখ পরিবেশন করিবার জন্য Necessity বা Nemesis-এর দরকার নাই; মানুষ নিজেই তাহার দুঃখের স্রষ্টা। ব্যাধ যে-বাণ দিয়া ঈগলকে বিদ্ধ করে সেই বাণ সেই ঈগলেরই পাখার পালক দিয়াই তৈরি। ঈগলের মৃত্যুটা দুর্ঘটনা মাত্র, তাহার নিজের পালক হইতেই তাহার মৃত্যু—এইটাই ট্র্যাজিডি।

২

নাটকে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বাক্য হয় চরিত্রকে বিকশিত করিবে নয় আখ্যানবস্তুকে উদ্ঘাটিত করিবে। গতি বা বেগ-ই নাটকের প্রাণস্বরূপ।

সেই কারণে নাটকের সাহায্যে প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে কথোপকথন অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়ে ও নাটক তাহার বেগ হারাইয়া ফেলে। চরিত্রগুলি হয় ত' এমন সব সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য আওড়ায় যাহা আমরা বাস্তব জীবনে শুনিবার আশা রাখি না। স্বামীর নিকটেও যে স্ত্রী যৌনসম্পর্কজনিত পবিত্রতা দাবী করিতে পারে—এই মতবাদকেই প্রতিষ্ঠিত

করিতে গিয়া বিয়র্ণসনের *A Gauntlet* নাটক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রোপাগাণ্ডা বা মত-প্রচার প্রায়ই নাটকীয় আদর্শের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। বার্ণার্ড শ' বিয়র্ণসনের চেয়ে বড় আর্টিষ্ট বলিয়াই *Your Never Can Tell*-এ তাঁহার মত পূর্ণমাত্রায় প্রচার করিয়াও তাহাকে চমৎকার কমেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন; নীতির চেয়ে আর্ট বড় বলিয়াই আমরা *Caddida* ও *Saint Joan*-এর মত নাটক পাইয়াছি।

সেইরূপ, নাটককে 'সাহিত্য' হইতে দিলে নাটকের যে কী মারাত্মক ক্ষতি হয় তাহা শেলি, সুইন্‌বার্ণ ও ইয়েট্‌সের নাটক পড়িলেই বুঝা যায়। আমাদের দেশের দ্বিজেন্দ্রলালও তাহারই দৃষ্টান্তস্থল। জর্জ্জ মূর নাটক সম্বন্ধে এত পণ্ডিত হইয়াও যে কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছেন ভাষার আড়ম্বর হেতু হয় ত' সেগুলি প্রশংসনীয় উপন্যাস হইতে পারিত, কিন্তু নাটক হিসাবে অসার হইয়াছে। গল্‌সোয়ার্দি ও ব্যারি নাটক ও উপন্যাস দুইই লিখিয়াছেন, কিন্তু দুই জায়গায়ই কথোপকথনের কী চমৎকার পার্থক্য রহিয়াছে!

নাটকে গতি ও বেগ অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলেও গ্রীক্ নাটককার অনুসৃত স্থিতি ও শান্তিকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না,—গতিকে চঞ্চল করিবার জন্যই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। গতির চেয়ে জীবন বড়, ঘটনার চেয়ে অবস্থা। কখনো কখনো কথোপকথনের মুখরতা হইতে আবহাওয়ার নিস্তব্ধতাই নাটকের রসকে নিবিড়তর করিয়া তোলে। ঘটনার সঙ্ঘর্ষের মধ্যে জীবনের বিক্ষোভ দেখানো হইতে জীবনের স্বকীয় চাঞ্চল্য দেখানোই রূপদক্ষতার পরিচায়ক হইয়া উঠে।

গর্কির *Lower Depths* প্রপীড়িত জীবনের কতগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি মাত্র,—ক্রিয়াবর্জ্জিত বলিয়া সম্পূর্ণ নাটক হয় নাই। কতগুলি সংশ্লেষহীন ঘটনার পারম্পর্য্য—তাহাতে জীবনের সঙ্ঘর্ষ নাই, চরিত্রের মধ্যে এমন কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই যাহা ঘটনাসঞ্জাত। সমাজের একটা বিশেষ অবস্থাকে পটভূমিকারূপে ব্যবহার করিয়া কতগুলি চরিত্রের দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়াছেন। অনেকস্থলে ট্রীণ্ডবার্গ-ও তাহাই।

আঁদ্রিভ্ বলেন যে নাটকের পক্ষে ক্রিয়া সর্ব্বস্ব নহে। দস্যুর হত্যা ও লুণ্ঠনের চেয়ে কবি বা দার্শনিকের নিষ্ক্রিয় তপস্যার মধ্যেই নাটকীয় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। গোচরীভূত কৃত্রিম ক্রিয়ার চেয়ে সুগোপন ও সুগভীর অনুভূতির মধ্যেই কি ট্র্যাজিডি নিহিত নহে? নাদিরশা'র রাজত্ব-স্থাপনের ব্যর্থতার চেয়ে নীট্‌শের দুঃখ কি মহত্তর নয়? সুনিয়ন্ত্রিত ঘটনাকে চেকভ্‌ও প্রাধান্য দেন নাই; *Cherry Orchard*-এ ঘটনা ও গল্পাংশ কতখানি? Philosophy-কে পিরান্‌দেল্লোও action বলিয়াছেন—প্রাচুর্য্যের চেয়ে গভীরতারই মূল্য বেশি।

ক্রিয়ার চেয়ে অনুভূতি অধিকতর ট্র্যাজিকাল হইলেও এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে সেই অনুভূতিকে ক্রিয়ার সাহায্যেই প্রকাশিত হইতে হইবে। চেকভ্ ও গর্কি নাটককে গল্পবিবর্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, ক্রিয়াশীল গল্প নিয়াই ড্রামার কারবার।

যাহা আমরা শুনি তাহার চেয়ে আমাদের মনে স্পষ্টতর হইয়া থাকে যাহা আমরা দেখি—বর্ণনার চেয়ে ক্রিয়া উজ্জ্বলতর। কিন্তু যে-ক্রিয়া আমরা চোখের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখি না, অথচ যে-ক্রিয়াকে অবশ্যম্ভাবী অনুমান করিয়া আমরা পরিণামের জন্য উৎসুক হই, সে-ক্রিয়াই অধিকতর শক্তিশালী। ভিক্টর হিউগো বলিয়াছেন, যে-প্রাচীরের অন্তরালে ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, ক্রিয়া হইতে সেই প্রাচীরান্তরালই অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে। ক্রিয়াকে সব সময়েই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। দ্রুত ক্রিয়ার চেয়ে তাহার বিরাম-ও মর্ম্মান্তিক হয়। সেইজন্যই নাটক শুধু পড়িতেই হয় না, দেখিতে হয়।

৩

গল্পাংশ ও ক্রিয়ার পরেই কথোপকথন। কথোপকথন চরিত্র উদ্ঘাটিত করে, বিষয়ের রূপান্তরসাধন করে, আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ঘটনাবলীকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলে। কথোপকথন সংযত সুপরিমিত ও সুসম্বদ্ধ হওয়া

দরকার। তাহাতে এমন একটি কথারও স্থান হওয়া উচিত নহে যাহা সমগ্র নাটকসম্পর্কে প্রয়োজনীয় নহে। তাহা এত দীর্ঘ হইবে না যাহাতে গল্পাংশ ভারাক্রান্ত ও জটিলতর হয় বা ঘটনার বেগ মন্থর হইয়া আসে। চেকভ্‌ ও গর্কির নাটকে অবান্তর বিষয়বিবৃতি ও রচয়িতার আত্মপ্রসঙ্গের আধিক্য থাকায় প্রায়ই নাটকের গতিরোধ হয়। উপন্যাসের মত নাটকে বর্ণবাহুল্য চলে না,—তাই কথোপকথন অধিকমাত্রায় কবিত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্মরসসম্পন্ন হইবে না। অধিকমাত্রায় উজ্জ্বল ও witty হইতে গিয়া অস্কার ওয়াইল্‌ডের নাটকীয় কথাবার্ত্তা অনেক স্থলেই মাটি হইয়াছে। কথোপকথনকে দিনের আলোর মত তীব্র ও বোধগম্য করিতে হইবে। নাটকীয় চরিত্রের গভীর ভাবানুভূতিপূর্ণ মুহূর্ত্তগুলিই নাটকের প্রধান সম্পদ।

গল্‌সোয়ার্দির মতে কথোপকথন ঠিক হাতে-বোনা 'লেস্‌'-এর মত—একটি সূতা দিয়া আরেকটি সূতাকে সংলগ্ন করিয়া রাখা। জলে মুখের ছায়া দেখিবার সময় জলে ঢিল পড়িলে ছায়া যেমন বিকৃত হয়, তেমনি কথোপকথনের মধ্যে একটা বাজে শব্দ বা বাক্য ঢুকিয়া সমস্ত দৃশ্যকে আবিল করিয়া তোলে। বাক্যব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যেকটি চরিত্রকে সজাগ ও অবহিত হইতে হইবে।

ব্যক্তিত্ব দিয়া চরিত্রগুলিকে আচ্ছন্ন বা অভিভূত না করিয়া নাটককারকে বিপরীত ঘটনার মধ্যে তাহাদের বিস্তৃত মুক্তি দিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যেন প্রকাণ্ড ভোজে কল্পিত চরিত্রগুলি উৎসব করিতে আসিয়াছে,—কেহ বেদনায়, কেহ ব্যর্থতায়—নাটককার শুধু অতিথি-সৎকারক,—উদাসীন, নির্ব্বিকার। হঠকারিতা করিয়া সেই উৎসবকে চালিত করিবার আস্পর্দ্ধা তাঁহাকে সাজে না।

সব কিছু ঘটনা ও ক্রিয়ার জন্য নাটককারকে যথাযথ কারণ দেখাইতে হইবে। *Richard III*-নাটকে রাণী মৃত রাজার শবানুগমন করিবার পথে স্বামীহন্তা রিচার্ডের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রেমে পড়িয়া গেল—ইহা আমাদের চোখে অবিশ্বাস্য ঠেকে, কেননা রাণীর এই আকস্মিক ভাবপরিবর্ত্তনের জন্য শেক্‌স্‌পীয়ার্‌ যথেষ্ট কারণ দেখান নাই। কিন্তু *Doll's House*-এর নোরার আমূল মানসিক পরিবর্ত্তন পাঁচ মিনিটে না হোক্‌ পাঁচ দিনে হইয়াছিল; ইব্‌সেন্‌ তবুও নোরার আচরণকে বিশ্বাস্য ও সমর্থনযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

৪

চরিত্রের বিকাশের চেয়ে চরিত্রের চরম পরিণতি অধিকতর মূল্যবান নহে। সেই কারণে পরিণামজ্ঞাপক পঞ্চম অঙ্ক স্বভাবতই হ্রস্ব হইয়া থাকে। চতুর্থ অঙ্কেই নাটকের শেষসঙ্ঘর্ষচূড়া আমাদের চোখে পড়ে। পঞ্চম অঙ্কে অনেক সময় নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু ঘটাইয়া নাটকেরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়।

প্রাচীন লেখকেরা নাটকের শেষ করিতেন একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বনাশ বা আকস্মিক উত্তেজনার মধ্যে, কিন্তু আজকালকার নাটকের সমাপ্তি বাহ্যিক বা কৃত্রিম ভাবোদ্দীপ্তির প্রতীক্ষা করে না। শেষ দৃশ্যকে সহজ ও স্বতঃসমাপ্ত হইতে হইবে—যেমন ধরা যাক গল্‌সোয়ার্দির *Strife*। আমাদের জীবন সব সময়েই সঙ্ঘর্ষ-সঙ্কুল নহে,—সেইজন্যই হয় ত' গল্‌সোয়ার্দি তাঁহার নাটকের শেষ দৃশ্যগুলিকে "unemphatic" রাখিয়াছেন। মনে হয় সেইজন্যই তাঁহার নাটকের রস আরো নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছে।

নাটক যেন দর্শকের কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়া শেষ হয়, আপাতত সব সংশয়ের যেন সমাধান হইয়া যায়। ট্রাজিডির চেয়েও কমেডির সমাপ্তিসাধন করায় তাই অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। নায়ক-নায়িকার মিলন ও সুখে কালাতিপাত —এই মামুলি রীতি মানিয়া চলা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কেননা মিলন বা বিবাহই চরম সুখশান্তির নিদর্শন নয়। Maurice Donnay-এর *Lovers*-নাটকে নায়ক-নায়িকারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কেননা পরস্পরের নৈকট্য হইতে মুক্ত হইয়াই তাহারা সুখে থাকিবে—বিয়োগের মধ্য দিয়াই কমেডি বা সুখচিত্র দেখানো হইয়াছে।

আজকালকার নাটকে 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের' সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। হেন্‌রি ডেভিস্ *Mollusc*-এ চারটি মাত্র চরিত্র নিয়া নাটক লিখিয়াছেন, Jules La Maitre তাঁহার *Pardon*-এ মাত্র তিনটি চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, জার্মান্ নাটককার Hasenclever মাত্র দুইটি চরিত্র নিয়া তাঁহার বিশালকায় পঞ্চাঙ্ক নাটক *Beyond* শেষ করিতে বেগ পান নাই। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপর হরদম লোক প্রবেশ ও প্রস্থান করিতেছে,—কোথা হইতে আসে যায় বুঝা দায় হইয়া ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্তে' আন্টিগোনাস্ ভারতবর্ষ হইতে চক্ষের পলকে গ্রীসে আসিয়া উপনীত হয়। আধুনিক নাটক সময় স্থান ও পাত্র—এই তিনটি জিনিসের সঙ্গতি সাধন করিয়াছে।

নাটকে 'surprise' বা অভাবিত ঘটনার আকস্মিক আবির্ভাবের স্থান আছে—তাহাতে নাটকের বেগ বর্দ্ধিত হয়, ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠে। Poe-র মতে প্রত্যেক আর্টপদবাচ্য রচনাতেই সব সময়েই এই অপ্রত্যাশিত বিচিত্রতার রঙ দরকার। কিন্তু সেই সব 'surprise' বা অভাবন-ঘটন স্বাভাবিক ও সম্ভবপর হওয়া আবশ্যক। এই 'surprise' মোটামুটি একটা সস্তা কৌশল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নিপুণতার সহিত ইহার প্রয়োগ হইলে ইহাই নাটককে সজীব করিয়া তোলে।

নাটকের চরিত্র হিসাবে আমরা সাধারণ মানুষ চাই—বিষয়বস্তু হিসাবে দৈনন্দিন জীবন। সহজ সরল সংযত ভাষা—কবিত্বময় উচ্ছ্বাস নয়। সুপরিচিতের মধ্যেই যে বিস্ময় নিহিত আছে নাটকে তাহারই পুনরাবিষ্কার হোক। আবেগের বৃষ্টির পর বুদ্ধির নির্ম্মল সূর্য্যালোক আসুক। নাটককে জোরালো করিবার জন্যই গল্‌সোয়ার্দি ঘটনা ও কথোপকথনগুলিকে অনুত্তেজক ও চাঞ্চল্যবর্জ্জিত রাখিয়াছেন। তিনি রোমহর্ষক চমকপ্রদ ঘটনা বা নাটুকেপণাকে ঘৃণা করেন,—যবনিকা এমন জায়গায় নামিয়া আসে যেখানে দর্শকের আবেগ প্রশান্ত ও স্থির—বিক্ষুব্ধ নহে। অনুচ্চারিত বাক্য, অসম্পন্ন ক্রিয়া ও অব্যবস্থিত ঘটনার মধ্যেই গল্‌সোয়ার্দির নাটকের সাফল্যসূচনা।

৫

ক্রোচে-র মতে প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ ও জনতা ইত্যাদি বাহ্যিক আয়োজন অনাবশ্যক; নাট্যকারের সৃষ্টি-সিদ্ধিৎসু মনই সেখানে সত্য,—নাটকে শুধু সেই অবিনশ্বর মনেরই ক্ষণিক গুণ্ঠনোন্মোচন। তত্ত্বের দিক দিয়া এই মতবাদের পক্ষে যাহাই যুক্তি থাকুক না কেন, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটককে অভিনীত হইতে হইবে—ইহাই প্রচলিত রীতি।

নাটক লিখিতে বসিয়া নাটককারকে জনসাধারণের রুচির সম্মান রাখিতে হইবে, কেননা নাটকের অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। সেই সঙ্গে যাহাতে দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি হয় ও রসবোধের উদারতা বাড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নাট্যকারেরই কর্ত্তব্য। কতগুলি শুষ্ক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তে জীবন্ত মানুষ চাই—যে-মানুষ দুঃখ পাইলেও মহান, ভুল করিলেও সাহস-স্বাধীন। এবং এই মানুষ সৃষ্টি করিতে বসিয়া নাটককারকে বর্ণনীয় চরিত্র হইতে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে হইবে,—ভয় বা পক্ষপাতিত্ব করিলে চলিবে না। সমস্ত ঘটনার প্রতিই তাহার সমান সহানুভূতি থাকিবে বা সমান ঔদাসীন্য; —'কি হইল'-র চেয়ে 'কিসে হইল'—এই ইঙ্গিতটিই তাহার অমোঘ অস্ত্র। দর্শকেরা 'কি হইল' দেখিবে এবং 'কিসে হইল' অনুভব করিবে। কথার চেয়ে ক্রিয়া যেমন বড়, তেমনি ক্রিয়ার চেয়ে অনুভূতি।

নাট্যকারকে যখন দেশের বিকৃত ও অপরিণত রুচির অনুযায়ী করিয়া নাট্যরচনা করিতে হয় তখনই আর্টের অপমৃত্যু ঘটে। আমাদের সাহিত্যে তাহা বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; আমাদের দর্শক সাধারণের রুচি আজিও অতিশয় স্থূল ও বর্ব্বর রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের দেশে খাঁটি নাট্যসৃষ্টি সম্ভবপর হইতেছে না। আমাদের দর্শকেরা নাটক দেখিতে আসিয়া গান শুনিবেনই এবং encore বলিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠকণ্ডুয়ন হইবেই—অতএব আমাদের নাটকের নায়িকারা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া (কখনো বা চেয়ারে বসিয়া) wings-এর বাইরে

অর্গ্যান্-এর সুর শুনিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া গান ধরেন—কখনো কখনো গান গাহিয়াই কথোপকথন চলে। ‘ষোড়শী’তে অনেক নাটকীয় পদার্থের সমন্বয় সত্বেও এক হরগৌরীর কদর্য্য নাচ ঢুকিয়া নাটকটির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সত্যিকারের ড্রামায় নাচ-গানের স্থান নাই,—আমাদের নাটকীয় সাহিত্য হইতে নৃত্যগীতাবতারণার হাস্যাস্পদ রীতিটা কবে অন্তর্হিত হইবে? ‘গৃহ প্রবেশে’ মুমূর্ষু রোগীর ঘরে পর্য্যন্ত আমরা গানের বন্যা বরদাস্ত করি, ‘মুক্তধারায়’ গান গাহিবার জন্য ধনঞ্জয় বৈরাগীকে ডাকিতে হয়।

দর্শকের রুচিকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা সম্প্রতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে কিছু কিছু চলিতেছে; কিন্তু আমাদের সাহিত্যে স্বল্পসংখ্যক নাটক (যদি সত্যই তাহাদের নাটক বলা যায়) এখনও নিস্তেজ ও নির্ব্বল;—নাটকের সাহায্যে সৃষ্টিকে নির্বারিত করিয়া দিতে হইবে। দর্শকের রুচি যে কতদূর অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে ইংলণ্ডে পিনেরোর *The Big Drum* তাহার নিদর্শন। বিয়োগান্ত নাটকে দর্শকদের মন উঠিল না বলিয়া পিনেরোকে শেষ দৃশ্য ছাঁটিয়া ফেলিতে হইল,—অবশেষে, বিচ্ছেদমুক্ত নায়ক-নায়িকার বাহুবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই যবনিকা পড়িল। আমাদের দেশে ‘সীতা’ ও ‘কর্ণার্জ্জুন’ কত রাত্রি যে অভিনীত হইল তাহা গণনা করা কঠিন, কিন্তু ‘গৃহ প্রবেশ’ (যদিও সঙ্গীতকণ্টকিত—সে সঙ্গীতাবলীর সাহিত্যিক মর্য্যাদা যাহাই হোক্ না কেন—তবুও সত্যিকারের ড্রামা) বোধ হয় এক সপ্তাহও টিঁকিল না। নাট্যকার নিজে গান লিখিতে অক্ষম, তবুও গান একান্তই দিতে হইবে বলিয়া অন্য কবির দ্বারস্থ হইবার দীনতা আমাদের দেশেই সুশোভন। আমরা কখনো কখনো এক জনের নাটক ও সেই সঙ্গেই আর একজনের গান শুনি। তাহাও আমাদিগকেই সহ্য করিতে হয়।

গল্পে উপন্যাসে ও কবিতায় বাঙলা সাহিত্যে আমরা নবতন সৃষ্টির ইঙ্গিত পাইয়া মহত্তর ভবিষ্যতের আশা করিতে পারিতেছি,—কিন্তু নাটকের ক্ষেত্র আজিও অনুর্ব্বর রহিয়াছে। নাটকরচনার চিরাচরিত ভঙ্গী অবিনশ্বর কাল ধরিয়াই অনুসৃত হইবে—ইহা সাহিত্যধর্ম্ম নহে। আইনষ্টাইন্ স্বতঃসিদ্ধ axiom সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াই Relativity সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সফল হইয়াছেন। তেমনি নাটকের ক্ষেত্রে বাঙলার নবযুগ নবীন প্রতিভাবানদের প্রতীক্ষা করিতেছে।

শ্রীঅভিনব গুপ্ত

চিত্র

ঔ——বৈচিত্র্য

জ্যোৎস্না

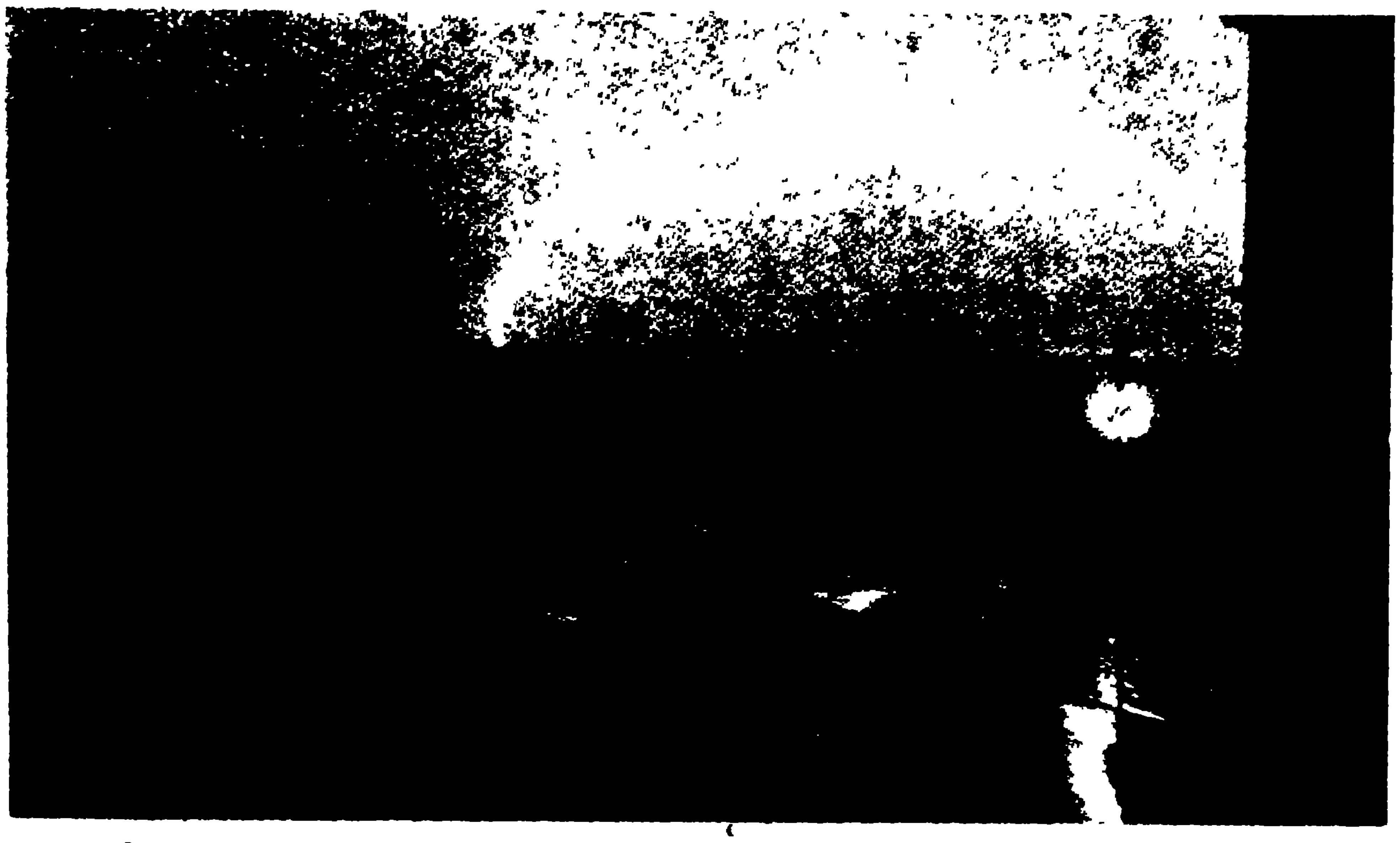

সমুদ্র সৈকত

নর্থ ওয়েল্‌সের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গ্রাম—বেতুসিকোয়েদ্

নির্ঝরিণীর শিলাবক্ষ—বেতুসিকোয়েদ্

পাহাড় ও নদী

মহারাজা রেওয়ার হস্তী—পালিত ভারতবর্ষীয় হস্তীদের মধ্যে এত বৃহৎ দাঁত-ওয়ালা আর কোন হস্তী কখনো ছিল বলিয়া জানা নাই। মাহুতের নির্দ্দেশে সেলাম করিতেছে।

গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সর্ব্বপ্রথম বলি—অষ্ট্রীয়া হঙ্গারির রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক্ ফার্ডিণাণ্ড এবং তাঁহার পত্নী এবং সন্তানগণ। সেরাজেভোয় আর্চডিউক্ এবং ডচেস্ নিহত হন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সমস্ত পৃথিবী চার বৎসর কাল সমরানলে প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

কৈলাস পর্ব্বত—দক্ষিণ দিকের দৃশ্য। বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। সমুদ্র স্তর হইতে পর্ব্বতশিখরের উচ্চতা ২২,০০০ ফিটের অধিক।

ভুটানে হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি খরস্রোতা নদীর উপর পাথরের সেতু। দেবদারু কাণ্ডের বসানো পাথরগুলি দৈবাৎ পিছলাইয়া পড়িলে স্রোত গর্ভে পতিত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য্য।

এ সংখ্যার চিত্র ও বৈচিত্র্যের প্রথম পাঁচখানি ছবি ইংলণ্ড হইতে অষ্টাবক্র নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

কলিকাতায় স্বদেশী আন্দোলন

সকলেই অবগত আছেন যে, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জ্জন পূর্ব্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিছিন্ন করিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত করেন। এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯০৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কলিকাতা টাউনহলে একটি বৃহৎ সভা আহূত হয়। সেই সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা হয়। এই প্রতিবাদকে শক্তিশালী করিবার জন্য ইংরাজী তথা বিদেশীয় বস্ত্র ও পণ্য দ্রব্যাদি বর্জ্জনের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন বাবু (পরে স্যার) প্রভাসচন্দ্র মিত্র। এই প্রস্তাবের নাম বয়কট বা বর্জ্জন বিষয়ক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে যেমন বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করা হইল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী গ্রহণ করা হইল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহারই নাম স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে জাতীয়তা-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে জাতীয়ভাবে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এই আন্দোলন এমন তীব্রভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম-নিযুক্ত লাটসাহেব স্যার ব্যাম্‌ফাইল্ড্ ফুলার প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে ইংরাজ বিদ্বেষ ক্ষয়কর তরল পদার্থের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে। স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ অতি প্রগাঢ়ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল।

এই আন্দোলন সংক্রান্ত সভা কলিকাতায় বিস্তর হইত। সেই সকল সভা অধিষ্ঠানের স্থান এইগুলি ছিল, যথা— কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের সম্মুখস্থ পান্তির মাঠ (এই স্থানে এক্ষণে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে,) বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাটির উদ্যানে বা প্রাঙ্গণে। এই সকল সভায় এক মৌলভী লিয়াকাৎ হোসেন ব্যতীত মুসলমানগণ বড় একটা যোগ দিতেন না, তাহার কারণ এই যে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকা বশতঃ স্বজাতীয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে মুসলমানদের নেতা হইয়াছিলেন ঢাকার নবাব সলিমোল্লা সাহেব।

এই সকল সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নেতা ছিলেন বাবু (পরে স্যার) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের নেতা বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় কখনও কখনও কলিকাতার সভাতে যোগদান করিতেন। অম্বিকাচরণ ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে বিশেষ পটু ছিলেন। ইংরাজী বক্তৃতায় তাঁহার ভাব-গাম্ভীর্য্য, ভাষা-জ্ঞান ও বাগ্মীতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার বাংলা বক্তৃতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুদূর মহারাষ্ট্র দেশ পুণা হইতে আগত মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের ইংরাজী বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল ১৯০৬ সালের জুন মাসে পান্তীর মাঠে এক সভায়। তিলক মহোদয়ের জ্বালাময়ী ভাষায় সভাস্থ জনগণ যেমন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার সঙ্গী মারাঠি গায়কের সুরতানলয়েগীত সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছিল। এই সভাতেই তিলকের পার্শ্বে অশ্বিনীকুমার দত্তকে আমি প্রথম দেখি। নগ্নগাত্রে উড়ানীখানি গলায় রাখিয়া দক্ষিণহস্তে হাতপাখা লইয়া ও বেলফুলের মালা জড়াইয়া অশ্বিনীকুমার বাংলাভাষায়

এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। এই আন্দোলন সংক্রান্ত অপর যে সকল ব্যক্তির বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম তাঁহাদের নাম —বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অভেদভাব রক্ষা করিবার জন্য একটি মিলনমন্দির বা ফেডারেসান হল নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হয়। তদনুযায়ী আপার সার্কুলার রোডে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড বা মাঠ সাধারণের নিকট চাঁদা তুলিয়া ক্রয় করা হয়। এই ফেডারেসান মাঠেও বহু সভার অধিবেশন হইত। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই স্থানের একটি সভায় সভাপতিরূপে আনন্দমোহন বসুকে দেখি। তিনি তখন রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। ইজিচেয়ারে করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলে আনা হইল। ইজিচেয়ারে শয়নাবস্থায় তাঁহার স্বরচিত জাতীয় ঘোষণা তিনি ইংরাজীতে পাঠ করেন। এই ঘোষণাবাণী জাতীয় শীল-মোহরসহ মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল। এই ঘোষণা-বাণীর মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা বঙ্গদেশস্থ সকলে সমবেত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় ততদিন আমরা বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিব এবং সাধ্যমত যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। অতএব ভগবান আমাদের সহায় হউন।" উভয় বঙ্গের মধ্যে একতা রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন প্রাতে গঙ্গাস্নানের পর রাখীবন্ধন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের মন্ত্র এইরূপ শিক্ষা দেন—"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইত সেরূপ অন্য কাহারও সম্বন্ধে নহে। সভাস্থলে তিনি চোগা চাপকান পরিয়া চশমা চোখে দিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কখনও উচ্চৈঃস্বরে আবার পরক্ষণে নিম্নস্বরে যখন বক্তৃতা করিতেন, তখন সকলে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত কথাগুলি শ্রবণ করিত। চাঁদা তুলিবার সভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনিলে কেহই চাঁদা দেয় না, একথা সেদিনও মহাত্মা গান্ধী নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যহ তাঁহার নিজ গ্রাম ব্যারাকপুরের নিকট মণিরামপুর হইতে রেলগাড়ীতে করিয়া কলিকাতায় আসিতেন এবং সন্ধ্যা আগত হইলেই তাঁহার মণিরামপুর বাটীতে রেলে চড়িয়া ফিরিয়া যাইতেন। দুই ঘোড়ার তাঁহার ছোট পাল্কী গাড়ীতে তাঁহাকে রাস্তায় যখনই দেখিয়াছি তখনই তাঁহাকে হয় খবরের কাগজ, নয় একখানি বই পড়িতেছেন এই অবস্থায় দেখিয়াছি। ১৯১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরের এম্পায়ার থিয়েটারে নিখিল ভারতের মধ্যপন্থীদলের সম্মেলনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা শেষ শুনি।

দেশী তাঁতের বস্ত্রের উন্নতি সাধন ও বহুল পরিমাণে ঐরূপ বস্ত্র বয়নের জন্য, ফেডারেসান হল নির্ম্মাণের জন্য, সর্ব্বপ্রকার স্বদেশজাত শিল্পের প্রচলনের জন্য, বয়ন বিদ্যালয় ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। হীরেন্দ্রনাথের শ্যালক সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা চাঁদা দেওয়ায় দেশের লোক তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়াছিল। এই জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ ও স্বদেশী গ্রহণ নীতি প্রচারের জন্য ছাত্রগণ রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির করিয়া গান করিয়া বেড়াইত। এই মিছিলে গীত দুই একটি গান আমার এখনও মনে আছে, যথা—রাজসাহীর উকিল রজনীকান্ত সেন (ইনি পরে "কান্তকবি" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) রচিত "আয়রে আমরা মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে তোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই।" রবীন্দ্রনাথের "ও আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।" মনোমোহন বোসের—"দীনের দীন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন। অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ দিন দিন তনুক্ষীণ।" রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান—"একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক। জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক।" কিন্তু সকল গানের সেরা গান বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে-মাতরম্। এই গানটি সুর তান-লয়ে, বাঁশী, করনেট্ ও পাখোয়াজের সহিত গান করিয়া বেড়াইতেন বাগবাজারের বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়। এই শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মিলিত কণ্ঠে গীত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলে ঐ সঙ্গীতে যোগদান না করিয়া কেহ থাকিতে পারিতেন না। তখন উহা প্রকৃতই "সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে" হইয়া উঠিত।

১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর বৈঠক পুলিশ কর্তৃক ভঙ্গ হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এমারসান্ সাহেবের নিকট তাঁহাকে হাজির করেন। এমারসান্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথের সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন নাই, সুরেন্দ্রনাথকে বসিবার আসন দেন নাই, সমস্তক্ষণই দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সাধারণ ফৌজদারী আসামীর ন্যায় তাঁহাকে গণ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জন এবং আরও অনেকে পুলিশের হাতে মার খাইয়াছিলেন। বরিশালের এই ব্যাপার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র ও ফ্লেচার সাহেবের বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব দাঁড়ান। রায় প্রকাশের দিন আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্বদেশীয় পক্ষগণের মতে এই রায় তত সন্তোষজনক হয় নাই। তজ্জন্য আবক্ষলম্বিতগুম্ফ জ্যাক্সন সাহেব জজ মিত্র মহাশয়কে দুই একটি কঠোর কথা শুনাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক উত্তরকালে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইয়া এই এমারসান সাহেবকে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন।

১৯০৮ সাল হইতে আলিপুরের বোমার মামলা চলিতে থাকে। আসামীগণের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি। নরেন্দ্র গোঁসাই নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া রাজার ক্ষমালাভ করিয়া রাজার পক্ষে প্রধান সাক্ষী হওয়ায় উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি অন্য আসামীগণ জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। জেলের বাহির হইতে কাঁঠালের ভিতর রিভলভার আনাইয়া এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বিচারে উল্লাস কর প্রভৃতির প্রাণদণ্ড হয় এবং আলিপুর জেলের প্রাঙ্গণে তাঁহাদের শবদাহ করা হয়। এই মামলায় ছিলেন সরকার পক্ষে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব ও সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস, এবং আসামী পক্ষে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। বিচারপতি সিভিলিয়ান বীচক্রপ্ট সাহেব। দীর্ঘ দুইবৎসর কাল মোকদ্দমার পর অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন এবং বারীন্দ্র প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হয়। এই মোকদ্দমা শুনানির সময়েই আশুতোষ বিশ্বাসকে বিপ্লববাদীরা রিভলভারের দ্বারা হত্যা করে। ১৯০৭ সালে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন কিংসফোর্ড সাহেব। ডাকযোগে পুস্তকের মধ্যে বিপ্লবীরা তাঁহার নিকট বোমা পাঠাইয়া দিয়াছিল। ইনি মজঃফরপুরে বদলি হইলে বিপ্লববাদীরা তাঁহার পশ্চাতে তথায় যাইয়া তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করে, কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে দুইটি নিরপরাধা ইংরাজ মহিলাকে বোমার দ্বারা হত্যা করে। এই মহিলাদ্বয় মজঃফরপুরের উকিল কেনিডি সাহেবের আত্মীয়া। মজঃফরপুরের এই হত্যাকাণ্ড হইতেই মাণিকতলার মুরারীপুকুর রোড বাগানে বারীন্দ্র ও তাহার সঙ্গীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বোমা তৈয়ারীর কারখানা প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহারই ফলে আলিপুরে সেসন আদালতে বোমার মামলার উৎপত্তি।

কলিকাতার সভা ইত্যাদি

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অসংখ্য সভার অধিবেশন হইত, সমস্তগুলিই প্রায় বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক। অন্য অন্য সভা যাহা হইত তাহা প্রায়ই শোকসভা অথবা স্মৃতিসভা।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সিমেট্রি বা গোরস্থানে কবিবর মধুসূদনের সমাধির নিকট যে সভা হইত তাহাতে ভীড় না হইলেও অনেক সাহিত্যসেবী ও ছাত্রগণ উপস্থিত থাকিতেন। আমি যে কয়েকবার এই সভায় উপস্থিত ছিলাম প্রত্যেকবারেই "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রের সম্পাদক বাবু (পরে রায় বাহাদুর) নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি এবং মধুসূদনের জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রধান বক্তা। সমাধি প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে যে লোহার রেলিং আছে

তাহা নরেন্দ্রনাথ সেনের চেষ্টার ফল। প্রতি বৎসর ২৯শে জুন তারিখে বৈকালে সভাধিবেশন হইত। ঐ তারিখের পূর্ব্বে রেলিং-এ কাল রং মাখান হইত এবং সমাধি প্রস্তরে কবিবরের স্ব-রচিত "দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল" ইত্যাদি বাক্য যাহা খোদিত আছে তাহার অক্ষরগুলি কাল রংএর দ্বারা সুস্পষ্ট করান হইত। স্মরণ হয় ১৯০৫ সালের এইরূপ সভাতে উক্ত বসু মহাশয় সেন মহাশয়কে সমাধিপ্রস্তরস্থ কবিবরের জন্ম তারিখ যাহা ভুল ছিল তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। এই বৎসরে সভাভঙ্গের পরে বসু মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী লিখিতেছেন কিনা। তাহাতে তিনি বলেন যে, তাঁহার সময়াভাবে ঐ জীবনী তাঁহার দ্বারা লেখা ঘটিয়া উঠিবে না।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সিটি কলেজের সাবেক বাটির তেতালার হলঘরে হইত। এইরূপ সভার একবারকার সভাপতি ছিলেন আনন্দমোহন বসু। সাহেবি পোষাক পরিহিত পিন্সনে চশমা চোখে ও শ্মশ্রু সমন্বিত আনন্দমোহনকে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইত। বাগ্মীতাপূর্ণ ইংরাজীতে তাঁহার সুন্দর বক্তৃতা সকলকে মোহিত করিত। রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও এই সভাতে গীত গান, মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইত।

কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতিসভা বেশীর ভাগ কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি, এ, বাটীর দ্বিতলের হলঘরে হইত। এই স্থানে বসিবার আসনের বেশ সুবন্দোবস্ত। সারি সারি চেয়ার এমন ভাবে পরস্পরের সহিত বদ্ধ আছে যে, একখানিকেও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বক্তাগণের জন্য কাষ্ঠের মঞ্চ বা প্ল্যাটফরমও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালের এইরূপ এক সভায় হাইকোর্টের জজ স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলাম। এই সভায় সভাপতির অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইত। মুদ্রণ ব্যয় ও এই স্মৃতিসভার সমস্ত খরচ কৃষ্ণদাস পালের পুত্র রাধাচরণ পাল দিতেন। সভাধিবেশনের দিনে হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তরমূর্ত্তি ফুল ও মাল্যে সজ্জিত করা হইত। ইহার ব্যয়ও রাধাচরণ পাল বহন করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভা যাহা দুই একবার দেখিয়াছি তাহা কলেজ স্কোয়ারে পশ্চিম ফটকের সম্মুখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে হইত। কলেজ স্কোয়ারের এই প্রতিমূর্ত্তি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের নিম্নতলে উঠানের উত্তরদিকে বারাণ্ডার এক কোণে রক্ষিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তির অনুরূপ হয় নাই বিবেচনায় এই প্রতিমূর্ত্তি কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সংস্কৃত কলেজে অন্য এক নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

শোকসভার মধ্যে প্রথম শোকসভা ১৯০১ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিম্নে দেখি। শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিয়া খোল করতাল বাজাইতে বাজাইতে নগ্নপদে সহরবাসীর যেরূপ বিরাট জনতা হইয়াছিল সেরূপ জনতা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। কীর্ত্তন গায়কের দল নিজ নিজ গান মুদ্রিত করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সভা দেখিবার জন্য স্বয়ং বড়লাট লর্ড কর্জ্জন মনুমেণ্টের সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে হাইকোর্টের জজ চন্দ্রমাধব ঘোষ দাঁড়াইয়া এইরূপ একখানি গানের কাগজ অনুবাদ করিয়া লর্ড কর্জ্জনকে শুনাইতেছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার্থ বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ কল্পে চাঁদা তুলিবার জন্য টাউনহলে এক মহতী সভা আহূত হয়। এই সভার সভাপতি বড়লাট লর্ড কর্জ্জন। এই সভায় অন্যতম বক্তা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ সভাক্ষেত্রে যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল লর্ড কর্জ্জন সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে সুরেন্দ্র বাবুকে বক্তৃতা করিতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লর্ড কর্জ্জন সুরেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিলেন। লর্ড কর্জ্জন মনে করিয়াছিলেন যে, এই এই সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাব বিষয়ে কি বলিবেন তাহা পূর্ব্বাহ্নে ঠিক করিয়া না আসার কারণে হয়ত সুরেন্দ্রনাথ দুই একটি কথা বলিয়া বসিয়া পড়িবেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধঘণ্টা

ব্যাপী আবেগময়ী ভাষায় বাগ্মীতাপূর্ণ যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে লর্ড কর্জ্জন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যতদূর স্মরণ হয় লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং বক্তৃতা দিতে উঠিয়া যেন এইরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর তাঁহার নিজের বক্তৃতা চিত্তাকর্ষক হইবে না। সেদিনকার সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা খুব ভাল হইয়াছিল।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু উপলক্ষে টাউনহলে এক সভা হয়। সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেন। বক্তাগণ মধ্যে মহাত্মা এন্‌. ঘোষ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বাবু জলধর সেন। জলধর বাবু তাঁহার হিমালয় ভ্রমণকালে স্বামীজীকে রুগ্ন অবস্থায় শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এইরূপ বলেন, এবং আরও বলেন যে, স্বামীজী যে ভবিষ্যতে লোকবিখ্যাত হইবেন তাহা তিনি (জলধর বাবু) সেই সময়ই বুঝিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং ঘোষ মহাশয় বিবেকানন্দ নামটি যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা সভা ভঙ্গের পরে আমাদের ছাত্রগণ মধ্যে একটু পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল। সভাপতি নরেন বাবুর উচ্চারণ এইরূপ দীর্ঘ ও মন্থর—বি-বে-কা-ন-ন্দা। ঘোষ মহাশয়ের উচ্চারণ এইরূপ দ্রুত ও হ্রস্ব—ভিভিকানন্দ্‌।

১৯০৭ সালে জুন মাসে কবিবর হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে ক্ল্যাসিক থিয়েটারে একসভা হয়। কবিবর তাঁহার শেষ কাব্য "চিত্তবিকাশ" নামক গ্রন্থ লিখিবার পর কাশীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কাশীবাসের সময় কবিবর খুব আর্থিক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। "হিতবাদীর" কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় হিতবাদীতে অনবরত প্রবন্ধ লিখিয়া কবিবরের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং কবিবরের সাহায্যকল্পে তাঁহার গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিয়া স্বল্পমূল্যে হিতবাদীর গ্রাহকগণকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্মৃতিসভার সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। কে একজন বক্তা চিত্তবিকাশ হইতে "হের ঐ তরুটির কি দশা এখন" এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া কবির জীবনের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখাইয়া দিলে এবং "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে" কবির এই খেদোক্তি স্মরণ করাইয়া দিলে সভাস্থ সকলেই কবিবরের দুঃখে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও একটি হাসির ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সকলেই জানেন যে, কবিবর হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" নামক একখানি বিখ্যাত কাব্য আছে। সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেন "বৃত্র-সংহার" নামটি বেত্র-সিংহ বলিয়া উচ্চারণ করাতে সভামধ্যে একটা চাপা হাসির রব উঠিয়াছিল।

১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে কবিবর নবীনচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে এই ক্লাসিক থিয়েটারে এক স্মৃতিসভা হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয় এই সভার সভাপতি ছিলেন বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সভায় প্রধান বক্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র ও "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সমাজপতি নবীনচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। ১৯১১ সালে নবীনচন্দ্রের আত্ম-জীবনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে হীরেন্দ্র বাবু দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল। কবিবরের "রঙ্গমতী" কাব্যের "এ জীবন না যায় রে'। যায় দিন যায়, দিনমণি যায়, নিভিয়া নিভিয়া রে। সকলিত যায়, কেবল দুঃখের জীবন না যায়রে॥" এই কবিতা বা গানটি ভাবপ্রবণ যুবকের অতি প্রিয় ছিল।

অন্য প্রকার সভা সম্মেলনের মধ্যে গীতাসভা ও পূর্ণিমা সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়েলিংটন পার্কের উত্তর পূর্ব্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসান নামক স্কুলের হলঘরে গীতাসভা প্রতি সপ্তাহে রবিবারে বসিত এবং অন্য দিন সন্ধ্যা-কালে খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। রবিবারের সভার সভাপতি অধিকাংশস্থলে নরেন্দ্রনাথ সেন এবং কখন কখনও রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় হইতেন। রবিবারের সভায় ১৯০৫ সালে বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিয়দ্দিন ধরিয়া "বেদান্তের বাদ বিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সব পিছনের বেঞ্চে বসিয়া আমি তাঁহার প্রবন্ধ বা বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া লইতাম এবং বাটীতে আসিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পত্রাকারে "ইণ্ডিয়ান মিরারে" প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিতাম। বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন আমার এই সকল পত্র অতি আনন্দের সহিত তাঁহার কাগজে ছাপিতেন। স্মরণ হয় যে, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যার দিনে হীরেন্দ্র বাবু ও সতীশচন্দ্র বিদ্যা

ভূষণ উভয়ের মধ্যে তর্ক খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ "খণ্ডন-খণ্ডন-খাদ্য" নামক গ্রন্থের কথা উত্থাপন করিয়া হীরেন্দ্র বাবুকে একটু কোণঠাসা করিয়াছিলেন।

বিশপ্স্ কলেজের অধ্যাপক হরিদেব শাস্ত্রী সংস্কৃত ও বেদান্ত বিষয়ে হীরেন্দ্র বাবুকে শিক্ষা দিতেন। একথা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই ছিল যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হীরেন্দ্র বাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ" গ্রন্থ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৮ হইতে ১৯২০ সালে "ব্রহ্মতত্ত্ব," "জীবতত্ত্ব" ও "জড়তত্ত্ব" প্রকাশিত হয়। এই শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানি জার্ম্মাণ দার্শনিক ডয়সেন্ রচিত "উপনিষদের দর্শন" গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিয়াছেন ইহা হীরেন্দ্র বাবু আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন। ডয়সেনের উক্ত গ্রন্থ আমাদের এম্-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। গীতাসভায় প্রদত্ত হীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক গ্রন্থের বেদান্তাধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারি, মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও সর্ব্বশেষে ইন্স্পেক্টার জেনারল অফ্ রেজিষ্ট্রেসান রূপে সরকারী কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়ের সম্পাদক-রূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

সহরের কোন না কোন ভদ্রলোকের বাটিতে প্রতি পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যাকালে পূর্ণিমা সম্মিলনের অধিবেশন হইত। এইরূপ এক রাত্রির কথা আমার মনে আছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের তখনকার লোয়ার সার্কুলার রোডের বাটিতে সে রাত্রের সম্মিলন স্থান। মান্যগণ্য সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে দুইজনকে আমার চক্ষের সম্মুখে এখনও দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম—শ্রদ্ধাভাজন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং দ্বিতীয়—পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত নাট্যকার ও লেখক মিঃ ডি, এল্, রায় অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্যার গুরুদাস তখন হাইকোর্টের জজীয়তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় অনুরক্ত, আচারনিষ্ঠ, চরিত্রবান, ক্ষীণদেহ ব্রাহ্মণ গুরুদাস যেখানে যাইতেন সেখানে তাঁহার মৃদু মধুর ব্যবহারে বালকবৃদ্ধ সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। স্যার গুরুদাসকে অন্যত্রও যে কয়েকবার দেখিয়াছি, যথা বহুবাজার ষ্ট্রীটে সায়ান্স্ এসোসিয়েসান গৃহে তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা উপলক্ষে, এবং ইউনিভার্সিটি ইন্ষ্টিটিউট্ গৃহে আমাদের ছাত্রদলকে উপদেশ দান উপলক্ষে, সর্ব্বত্রই তাঁহার বিনয়নম্র ও মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়াছি। একবারকার কোনও এক সভাভঙ্গের পর তিনি গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন এমন সময় একটি লোকের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কহিতে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত "ক্লেশ দুঃখৈ রপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ"—ঈশ্বরের এই যে সংজ্ঞা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এখনও মনে আছে। মিঃ ডি, এল্, রায় তখনও সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার মনে নাই। সকলেই জানেন যে, মিঃ ডি, এল্, রায়, সহরের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জামাতা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ ১৯০৫-৬ সালে ডি, এল্, রায়, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে অক্স্ফোর্ড মিশন্ বাটির দক্ষিণে নন্দকুমার চৌধুরী লেনস্থ তাঁহার বাটিতে থাকিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র, মিউনিসিপ্যালিটীর লাইসেন্স অফিসার, বাবু ললিতকুমার মিত্রের সহিত তাঁহার হরিহরাত্মা ছিল। যাহা হউক বসু মহাশয়ের বাটিতে উক্ত পূর্ণিমা সম্মিলনীতে ডি, এল্, রায়ের নিজ রচিত গান তাঁহার নিজ মুখ হইতেই আমার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একটি বড় টেবল্ হার্ম্মোনিয়াম নিজে দুইহাতে বাজাইয়া "আমরা ইরাণ দেশের কাজী" এই গান করিতে লাগিলেন। স্যার গুরুদাসের অনুরোধে ডি, এল্, রায় আর একখানি গান করিলেন; সে গানখানি এই—"আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক ভাই"। ডি, এল্, রায়ের সহিত তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র দিলীপকুমার রায় এই শেষোক্ত গানে যোগদান করিয়াছিল। দিলীপকুমারকে সে সময় কিছু রুগ্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। ধুতি পরিয়া কালকোট গায়ে ও কোটের উপর শালের একখানি লাল রুমাল জড়াইয়া দিলীপকুমার তাহার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিল। মিঃ ডি, এল্, রায়ের পরিধানে ধুতি, পাঞ্জাবী ও তাহার উপর বাদামী রংএর একখানি

শাল। মাথায় টাকূপড়া, তাঁহার সুগোল মুখখানি, চোখে চশমা, অনবরত পান চিবাইতেছেন ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। ডি, এল্, রায় তাঁহার "হাসির গান" ও প্রহসনের জন্যই তখন বিখ্যাত ছিলেন।

ওয়েলিংটন উদ্যানে ১৯০২ হইতে ১৯০৫ সালে গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ইংরাজীতে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা করিতেন। ইঁহার নাম রেভারেণ্ড্ আঙ্গারিকা ধর্ম্মপাল। ইনি সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া ইনি প্রচারকার্য্যে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন। ওয়েলিংটন উদ্যানের পূর্ব্বদিকে ক্রীকৃরো রাস্তায় "মহাবোধিও পালি টেক্স্‌ট্ সোসাইটি" বাটিতে থাকিতেন ও প্রত্যহ বৈকালে উক্ত উদ্যানে যাইয়া বক্তৃতা করিতেন। উক্ত সোসাইটির ইনি সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতা আমরা ছাত্রবৃন্দ অতি আগ্রহের সহিত শুনিতাম। ইঁহার ইংরাজীর উচ্চারণ ও কথার বাঁধুনি ঠিক সাহেবদের মত ছিল। কয়েকবৎসর পরে বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দির হিন্দু মোহান্তের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বৌদ্ধদিগের হস্তে আনিবার জন্য ইনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। আদালতের শরণাপন্ন হইয়াও ইনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমন্দিরের সন্নিকট বৌদ্ধ যাত্রীদিগের জন্য থাকিবার বিশ্রামগৃহ ইঁহারই উদ্যমে সংগৃহীত অর্থদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইনি চন্দনকাষ্ঠের একটি ধ্যানী-বুদ্ধমূর্ত্তি জাপান হইতে আনাইয়া বুদ্ধগয়ার মন্দিরে স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হন নাই। উক্ত চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি মন্দিরের নিকটস্থ ছোট মিউজিয়ামগৃহে এক্ষণে রক্ষিত আছে। ১৯০৪-৫ সালে রুষ-জাপান যুদ্ধে লোকক্ষয় সম্বন্ধে ইনি বিশেষ দুঃখ করিতেন। কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্বদিকে এক্ষণে যে ধর্ম্মরাজিকা চৈত্যবিহার নামক বাটি দেখা যায় তাহাও ইঁহার যত্ন ও চেষ্টায় ১৯১০ সাল নাগাদ প্রস্তুত হয়।

ওয়েলিংটন উদ্যানে স্যালভেসান আরমী বা মুক্তিফৌজের সাহেব ও মেম গেরুয়া রংএর ধুতি ও শাড়ী পরিয়া বাংলা ভাষায় গান করিয়া ও "মথীলিখিত সুসমাচার" ইত্যাদি মুদ্রিত কাগজ বিতরণ করিয়া প্রত্যহ বৈকালে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইঁহাদের ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য না হউক মেমেদের নাকিসুরে গান ও অপরূপ বাংলা শুনিবার জন্য লোকের অভাব হইত না।

এই উদ্যানে শুক্রবার বৈকালে এবং কখন কখনও অন্যদিনেও মুসলমানদের ধর্ম্মবক্তৃতা হইত। মুসলমানদের হাত মুখ ধুইবার বা "অজু" করিবার ও নেমাজ পড়িবার স্থান এখনও বাগানের উত্তর পশ্চিম দিকে রেলিংএর পার্শ্বে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাগানের দক্ষিণ দিকের দূর্ব্বাদল-আবৃত শ্যামল ভূমিখণ্ডে মুসলমানগণ উপবেশন করিয়া তাঁহাদের মোল্লার উপদেশ শুনিতেন।

এই বাগানে একটি বৃদ্ধ ফিরিঙ্গী ভদ্রলোক প্রায়ই সন্ধ্যাকালে আসিতেন। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিতেন, এবং নিজ মতের পরিপোষক যুক্তি দেখাইয়া ঈশ্বরবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ঠিক বক্তৃতা দিতেন না, সমবেত জনগণের সহিত তর্ক বিচার করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্র ও অন্যান্য সাধারণ লোক রবিবার উপাসনার দিনে গান শুনিবার জন্য যাইতেন। এইরূপ এক উপাসনার দিনে সন্ধ্যাকালে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, ও অন্য একদিনে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের উপদেশ-কথা শুনিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে এই দুইটি গান শিখিয়াছিলাম, যথা—

"আর কতদূরে সে আনন্দধাম।
যার তরে নিরবধি ব্যাকুল পরাণ॥"

এবং "আছে এ জগৎ মাঝারে এক সে সুন্দর সিদ্ধিস্থান। বাসনা থাকিলে যেতে পথ মেলে, কে যাবি রে কার কেঁদেছে প্রাণ।" সুগায়কের কণ্ঠে গম্ভীর স্বরবিশিষ্ট টেবল হার্ম্মোনিয়মের সহিত গীত এই সকল গান অতি হৃদয়গ্রাহী হইত।

মিসেস্ এ্যানিবেসান্টের উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা কয়েকবার শুনিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা ষ্টার থিয়েটার ও ধর্ম্মতলার কোরিন্থিয়ান্ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ হইতে

প্রদত্ত হইত। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অত্যাধিক ভিড় হইত বলিয়া থিয়েটার বাটিতে বক্তৃতা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত এবং টিকিট দেখাইয়া জনসাধারণ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে পাইত। এই টিকিট নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও কলেজ স্কোয়ারে থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই।

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে "বেরোস্" লেকচারার রূপে আমেরিকা হইতে ডাঃ কাথবার্ট-হল নামক একজন বিদ্বান ও বাগ্মী ধর্ম্মপ্রচারক কলিকাতায় আসিয়া ওয়াই, এম, সি, এ হলঘরে খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা সভার সভাপতি কালীচরণ বাঁড়ুজ্জ্যে। বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ ছিল যে, প্রাচ্যদর্শনের দ্বারা যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমত সমর্থিত হয়। বক্তৃতার নাম ছিল The Witness of Oriental Consciousness to Jesus Christ" তাঁহার বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে চার আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার যুক্তিতর্কের বিশেষ সারবত্তা অনুভব করি নাই। "ইণ্ডিয়ান নেশান্" সম্পাদক মহাত্মা এন, ঘোষ এই বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার পত্রে খুব যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশান বা উপাধি বিতরণ উপলক্ষে, লর্ড কর্জ্জন বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া টাউনহলে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল; সভাপতি ডাঃ (পরে স্যার) রাসবিহারী ঘোষ। ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সহকারে সুতীব্র ভাষায় ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের উক্তির প্রকৃত উত্তর দিয়াছিলেন "অমৃতবাজার পত্রিকা" লর্ড কর্জ্জনের "Problems of the Far East" গ্রন্থ হইতে কোরিয়া-দেশ ভ্রমণ কাহিনীর কয়েকটি কথা উদ্ধার করিয়া।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যায়

ওমর খৈয়ামের কবি কান্তিচন্দ্রের

"রোবাইয়াৎ হাফেজিয়ানা"

সম্পূর্ণ বাহির হইবে।

শিকারী

—গল্প—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

এক

ষ্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ী থামিতেই দেখি মণিমোহন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে জানালার উপর ব্যগ্র দুইবাহু বাড়াইয়া দিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কতদিন পরে দেখা, পনরো বৎসরের কম হবে না। কোথায় কাশ্মীরের কোন সীমানায় গিয়ে পড়েছিস যে একবারে আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখ্‌বারও ফুরসৎ হয় না? বেশী দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস ত?

আমি হাসিয়া কহিলাম, এসেছি দাদা, সে-বিষয়ে তোমার আর ভাব্‌তে হবে না। কিন্তু আমার জিনিষ পত্তরগুলি নামিয়ে নেবার বন্দোবস্ত কর।

মণিদা আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিয়া গাড়ী হইতে লাগেজ কয়টা নামাইয়া লইল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িলাম।

মণিদা কহিল, চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, ঘাটেই নৌকা বাঁধা, ছয় সাত দিন ত আর ট্রেণের ঝাঁকুনিতে ঘুম হয়নি, চল র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে একটু আরাম ক'রে ঘুমোবে'খন। আমি আপত্তি করিলাম না।

পূর্ব্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। শীতের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে; গাড়ী ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। দুই একজন যাত্রী গাড়ী হইতে নামিয়া রেল লাইন ধরিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। প্ল্যাটফর্মের এককোণে একটা কেরোসিনের আলো মিটমিট্‌ করিয়া জলিতেছিল, গাড়ী চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া পয়েন্টস্‌ম্যান তাহা নিবাইয়া দিয়া গেল।

ষ্টেশনের পশ্চাতেই নদীর ঘাট; একজন মাঝি আসিয়া আলো ধরিল, আমরা সন্তর্পণে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। পশ্চাতে ভৃত্য আমার জিনিষপত্র সমস্ত আনিয়া নৌকায়

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম শীতের কুয়াসা প্রকৃতির সারা অঙ্গ জুড়িয়া একটা হাল্‌কা ওড়্‌নার ক্ষীণ আবরণ টানিয়া রাখিয়াছে। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের গা' শুভ্র কুয়াসায় ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ধূসর কুয়াসার অস্পষ্ট ম্লানিমা দিগন্তের গায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে। ষ্টেশনের দক্ষিণদিকেই গ্রাম, তাহাও বাঁশবনের নিবিড় অন্ধকার তলে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে।

বাহিরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভব করিতে লাগিলাম; অসহিষ্ণুভাবে মণিদাকে কহিলাম, শীগ্‌গীর একটু ভেতরে শোবার জায়গা কর দাদা, নইলে যে হিম পড়্‌ছে, হয়তো মারাই পড়্‌ব।

মণিদা অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, বটে, কাশ্মীর থেকে এসেছিস্‌ কিনা, তাই বাংলায় এসে বেশী হিম ঠেক্‌ছে। এই হিমের ভয়ে বুঝি দেশে আর আসিস্‌নে?

আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

মণিদা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিতে লাগিল, দেশ-ছাড়া হ'য়ে কিছুদিন থাক্‌লে এম্‌নি ক'রেই লোকে জন্মভূমির দোষ খোঁজে।

কথাটা মনে মনে স্বীকার করিয়া লইলাম; প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, বক্তৃতা তোমার পরে শুনব, এখন শোবার একটু জায়গা করবে কিনা বল।

মণিদা কহিল, শোবার জায়গা তো ভেতরে করাই আছে। তুই শুগে যা, বলিয়া কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌বে, চল, ভেতরে চল। বলিয়া একপ্রকার টানিয়াই তাহাকে নৌকার ভিতর লইয়া আসিলাম। ভিতরে এক কোণে একটা হারিকেন জলিতেছিল, তাহার আলোকে দেখিতে পাইলাম বিছানা পাতাই রহিয়াছে।

নৌকার ঝাঁকুনিতে অনুভব করিলাম বাহিরে মাঝি

পাকে পোঁতা লগি প্রাণপণ চেষ্টায় টানিয়া তুলিতেছে। মণিদা'র দিকে ফিরিয়া কহিলাম, এখন নৌকা ছাড়্‌লে কাল কয়টায় বাড়ী পৌঁছানো যাবে দাদা ?

মণিদা র‍্যাপারের তল হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, দেখনা কখন পৌঁছায়, কাল ত দূরের কথা, পরশু সন্ধ্যের আগে·········

বাধা দিয়া কহিলাম সেকি দাদা! এই তিন দিন নৌকোর এই ঝাঁকুনিতে প্রাণ দিতে হবে না-কি ?

অন্ধকারের মধ্যে মণিদা একটু হাসিয়া কহিল, বড় বড় চাক্‌রী করিস্‌ তাই তোদের প্রাণের মায়াটা কিছু বেশী। আমরা ত মাসে একবার ক'রে এ পথে যাওয়া-আসা করি, প্রাণান্ত হ'বার আশঙ্কাও ত কোনদিন মনে জাগেনি।

মনে মনে অপ্রতিভ হইলাম। বড় চাক্‌রী করার খোঁটা বহুবার বহু লোকের কাছ হইতে পাইয়া পাইয়া এখন এক রকম সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু মণিদা'র এই অনুযোগের ভিতর যেন আরো একটু কিছু লুকাইয়াছিল। বাহিরে মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল, শুইয়া শুইয়া অনুভব করিলাম লগি ঠেলিয়া মাঝি সম্মুখের গলুই ঘুরাইয়া লইতেছে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলাম, তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে দাদা, কথায় কথায় তুমি যে রকম খোঁচা দাও। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, ত্রিশ চল্লিশ মাইল রাস্তা পাঁচ-মাঝির একটা নৌকাতে তিন দিন কেমন ক'রে লাগ্‌বে ?

মণিদা আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, রাস্তা পঁচিশ মাইলের বেশী হবে না, কিন্তু কার্ত্তিকের জল শুকিয়ে গেছে; সে রাস্তা ত পাবার আর যো নেই। একটু ঘুরে হাওর ধ'রে যেতে হ'বে।

হাওর ? সেকি দাদা ?

মণিদা বিরক্ত হইয়া কহিল, নে, ছেলেমি করিস্‌নে, একটু ঘুমো। সমুখের ওই মোড়টা ঘুরলেই হাওরে পড়া যাবে, মাঝি ডেকে দেবে, তখন দেখিস্‌ হাওর কি। তারপর মনে মনেই বলিতে লাগিল, যার চৌদ্দ পুরুষ হাওরের কোলে মানুষ, যার বাপ-দাদা সেদিনও হাওরের ধানে আর হাওরের শিকারে দিন কাটিয়ে গেছে সে আজ হাওরের নাম শুনে একেবারে চম্‌কে ওঠে!

মনে মনে স্বীকার করিলাম, জন্মভূমিতে যে এমনিভাবে প্রবাসী তার আবার কিসের শিক্ষা এবং সভ্যতার গর্ব্ব।

বাহিরের চারকোণা আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, কুয়াসার ক্ষীণ আবরণতলে দূর দিগন্তের গায়ে একটু ম্লানকৃষ্ণ রেখা। একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম; এতক্ষণে মনে হইল ছোট বেলায় মা'র কাছে এই হাওরের বিষয় কত রহস্যময় গল্প শুনিয়াছি। চারিদিকে কেবল জল, যতদূর দেখা যায় কেবল জল, দূরে কালো বন-রেখার সঙ্গে চক্রাকারে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে কোথাও বনঝাউ আর হিজল গাছের নিবিড় বন, তাহার আশ্রয়ে জেলের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিগুলি বাঁধা। এই হিজল গাছের আড়ালে ডাকাতের বজ্‌রা লুকাইয়া থাকিত এবং জেলা হইতে ফিরিবার কালে বাবা একদিন তাহাদের হাতে কি রকম লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহাও মা'র কাছে শুনিয়াছি। সঙ্গে শুধু বন্দুক ছিল বলিয়াই প্রাণে তিনি সেযাত্রা বাঁচিয়াছিলেন। মা'র কাছে আরও শুনিয়াছি এই হাওরের বুক জুড়িয়া বড় বড় বজ্‌রায় করিয়া ডাকাতের দল ঘুরিয়া বেড়ায় আর নিরীহ পথিক পাইলে তাহাকে কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। আশৈশব বাংলার বাহিরে পালিত আমি, আমার চক্ষে মা'র মুখের সেই বর্ণনার ছবি শৈশবে যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজিও আমার কল্পনার চোখে সেই ছবি বিভীষিকা ও রহস্যের আবরণ লইয়া ভাসিয়া উঠিল। ভীতভাবে মণিদা'র দিকে পাশ ফিরিয়া শুইলাম, কিন্তু কিছু বলিবার সাহস পাইলাম না। বাহিরে অনুভব করিলাম মাঝিরা লগি রাখিয়া দাঁড় লইয়াছে এবং তাহার টানে নৌকা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

র‍্যাপারের তল হইতে মুখ বাহির করিয়া মণিদার দিকে চাহিলাম, ভাবিলাম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না। নৌকার ঝাঁকুনিতে সহসা মণিদা'র মাথার সহিত আমার মাথার একবার ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। আমি অপ্রস্তুত হইয়া আবার পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, যে সম্মুখের দরজা দিয়া যে চারকোণা আকাশখানা দেখা যাইতেছিল তাহা গাছের আড়ালে অদৃশ্য

হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম নৌকা এখনো গ্রামের মধ্য দিয়াই যাইতেছে।

এমন সময় সহসা মণিদা জিজ্ঞাসা করিল তোর সঙ্গে বন্দুক আছে? আমি মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম, ব্যগ্রভাবে কহিলাম, শুধু বন্দুক কেন,ছয়নালের একটা পিস্তলও আছে। তারপর নিম্নস্বরে কহিলাম, পথে কি কোন ভয় আছে দাদা?

মণিদা কহিল, না, সেজন্য বলিনি। তোদের ত পাহাড় জঙ্গলে শিকার ক'রে অভ্যাস, হাওরে একদিন শিকার ক'রে দেখ কত আনন্দ পাস। আমি ত ভাই এই শিকারের মায়াতেই শুধু আমাদের গাঁ-টাকে আজো ছাড়্‌তে পারিনি। হাওরের মত এত প্রচুর শিকার কোথাও জোটে না।

মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম, তা' একদিন তোমার সঙ্গে শিকার করা যাবে দাদা।

বাঁয়ের কালো বাঁশবনগুলি পাশে রাখিয়া নৌকা পূর্ব্ব দিকে মোড় ফিরিল। সম্মুখের উন্মুক্ত দরজার পথে আবার কুয়াসাচ্ছন্ন চারকোণা আকাশখানা ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম পূর্ব্বাচলের ধূসর দিগন্তে চন্দ্রের আসন্ন উদয়বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। দূরে অতিদূরে স্বল্পজ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত ক্ষীণ বন-রেখা। বুঝিলাম, শীতের হিমক্লিষ্ট চাঁদ উঠিউঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছে না।

মণিদা জিজ্ঞাসা করিল, চাঁদপুরের হাওর আর কতদূর মাঝি? বাহির হইতে উত্তর আসিল, এই ত বাবু কাচারি খাল পেছনে ফেলে হাওরে এসে পড়েছি।

বিছানার উপর লাফাইয়া উঠিলাম; কহিলাম, চল দাদা, বাইরে চল।

মণিদাও উঠিয়া বসিল, কহিল তুই সাগর দেখেছিস্ কখনো?

কহিলাম, না।

মণিদা কহিল, আগেকার দিনে এই হাওরকেই লোকে সাগর মনে করত। এত বিস্তীর্ণ জলা-ভূমি বাংলার আর কোথাও নেই। সাগরকেই এ'দেশের ভাষায় হাওর বলে কিনা, তাই তার ও নাম।

নিস্তব্ধ শূন্যপথে এমন সময় একসঙ্গে সহস্র পাখীর ডানা-সঞ্চালনের শব্দ হইল। মণিদা কহিল, চল শীগ্‌গীর চল, একপাল শিকারের পাখী দেখ্‌বি ঠিক পুবদিকে উড়ে যাচ্ছে।

কহিলাম, বন্দুকটা সঙ্গে আন্‌বো দাদা।

মণিদা রসিকতা করিয়া উচ্চহাস্যে কহিল, আরে এ তোর পাহাড়ের শিকার নয় যে, বাঘ থাবা পেতে ব'সে আছে, সময় মত গুলি কর্‌লেই হ'লো। এ চলন্ত পাখীর পাল, চক্ষের পলকে বন্দুকের সীমানা ছেড়ে পালায়।

মণিদা নৌকার বাহিরে গলুইর দিকে আসিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল, আমি তাহার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিলাম। দেখিলাম উড্ডীয়মান পাখীর পাল কুয়াসার আবরণ তলে মিলাইয়া গিয়াছে আর তাহাদের ডানা সঞ্চালনের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে।

মণিদা বলিল, এ সমস্তই ভ্রমণকারী বুনো হাঁসের পাল, হাওরের কোনও আশ্রয়ে রাত্রিযাপন ক'রে ক'রে শীতের দেশ থেকে ক্রমশঃ উষ্ণ দেশের দিকে চ'লে যায়। আবার যখন এদেশে শীত কম্‌তে থাক্‌বে তখন দলে দলে এই সব শিকারের পাখী দক্ষিণদিকে উড়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রিতে ত এরা চোখে দেখতে পায়না, তবে এখনো কেমন ক'রে উড়্‌ছে?

মণিদা কহিল, এদেশের পথ-ঘাট এদের সমস্তই চেনা, প্রতিবৎসর যাওয়া আসা করে কিনা। এক প্রহর রাত্রির ভেতরই এরা বড় হাওরে গিয়ে পৌঁছুবে। সেইখানের একটা উঁচু চরের মত জায়গায় ওরা রাত্রিবাস ক'রে কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার উত্তর দিকে রওয়ানা হবে।

আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমি কহিলাম, তবে সেইখানেই বোধ হয় শিকারের জায়গা?

মণিদা কহিল, হাঁ, তোকে একদিন সঙ্গে ক'রে সেইখানেই নিয়ে যাব।

আমি আনন্দের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নৌকার ভিতরে ফিরিয়া আসিলাম।

দুই

চারিদিকে সাদা পাত্‌লা কুয়াসার ক্ষীণ আবরণ,—শীতের রাত্রি অতীত হইতে চলিয়াছে। পশ্চিম-দিগন্তের কালো বাঁশবনগুলির ফাঁকে,অস্তায়মান খণ্ড চন্দ্র শীতে আড়ষ্ট হইয়া

চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর দাদা?

মণিদা কহিল, সাম্‌নের মোড়টা ফির্‌লেই বড়-হাওরে পড়া যাবে, ওখান হ'তে শীকারের জায়গাটা আর বেশী দূর নয়।

লম্বা কোটের পকেট হইতে হাত দুইটা বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম, শীতে শরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিতেছিল।

মণিদা কহিল, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, বরাবর একলা শীকার করতে আসি, আজো ভুলে সেই আন্দাজেই গুলি সঙ্গে এনেছি, কিন্তু যদি কম পড়ে?

আমি হাসিয়া কহিলাম, তা'তে দুর্গোৎসব আট্‌কাবেনা দাদা, বরং কয়েকটা জীব প্রাণে বেঁচে যাবে।

পশমের টুপীতে মণিদার সমস্ত মস্তক আবৃত, গলায় গরম কাপড়ের কম্ফর্টার জড়ানো, তাহাদের অন্তরালে মণিদার মুখের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করা যায় না, কেবল দেখা যায় নিদ্রিত কুকুর দুইটার উপর তাহার সুবৃহৎ চক্ষুযুগল ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

বাহিরে মাঝি বৈঠা রাখিয়া লগি হাতে লইল আর পার্শ্বের হিজলগাছটা বাঁয়ে রাখিয়া সম্মুখের গলুই পশ্চিম-দিকে ঘুরাইয়া লইতেই শীতের তুষার আবরণের অন্তরালে বড় হাওরের অস্পষ্ট শুভ্রচ্ছবি আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে কহিলাম, চল দাদা, বাইরে চল, ওই হাওরে এসে পড়েছি। চল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া যাবে।

মণিদা কহিল, সেদিন চাঁদপুরের হাওরে সারারাত তোর সঙ্গে নৌকার বাইরে কাটিয়ে আমার সর্দ্দি ধ'রে গেছে; তোর সাধ থাকে তুই যা', আমার কাছে নূতন জিনিষ এ কিছুই নয়।

আমি কহিলাম, আচ্ছা তুমি থাক, আমি একাই চল্লেম। বলিয়া মাথার পশমের টুপীটা কানের দিকে আরো একটু জোরে টানিয়া দিয়া নৌকার বাহিরে আসিয়া গলুইর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলাম, দূরে পশ্চিমদিগন্তের ক্ষীণ বনরেখা কুয়াসার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া বিস্তৃত হাওরের শুভ্র জলরাশির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে নিস্তব্ধ জলরাশি, উর্দ্ধে নিস্তব্ধ আকাশ, যেন ভয়ে ধরিত্রীর বুক আঁকড়াইয়া অবসাদে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল, আমি কহিলাম, কই দাদা, তোমার পাখীর ত কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে।

মাঝি সম্মুখের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, সে জায়গায় বাবু, এখনো আমরা আসিনি। ওই যে দূরে কালো একটু উঁচু মতন জায়গা দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ওইখানে গেলেই সব পাওয়া যাবে।

মাঝি তাহার অন্তর্দৃষ্টিতে সম্মুখে কোথায় উঁচু জায়গা দেখিতে পাইল সেই জানে, কিন্তু আমি আমার সহজ দৃষ্টিতে ঘন-কুয়াসার মধ্যে কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

সেই স্তব্ধ জলরাশির বুক চিরিয়া নৌকা মন্থর গতিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাওয়া ধানের সরু ফিতার মত পাতাগুলি বৈঠার আঘাতে একবার মাত্র কাঁপিয়া উঠিয়া আবার নিশ্চলভাব ধারণ করিতে লাগিল। তাহার শব্দে মনে হইতেছিল শীতের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যেন কাহার অন্তিম নিশ্বাস উর্দ্ধে আকাশের গায়ে মিলাইয়া যাইতেছে।

সম্মুখের দিকে আবার চাহিলাম; দেখিলাম, যেন এই হাওরের বুকে বিশ্বস্রষ্টা আর এক স্বতন্ত্র জগতের রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। বাহিরের স্থূল জগতের সঙ্গে তাহার কোনও যোগ নাই, কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার বক্ষেও প্রাণের স্পন্দন আছে, জীবনের অনুভূতি আছে, নিজের স্বতন্ত্র জীব-জগত আছে এবং ইহারও সৃষ্টির রহস্য আছে। মনে হইল একদিন সৃষ্টির প্রভাতে জলময়ী প্রকৃতির বুকেই জীবের আদিম জীবাণু প্রথম সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করেন নিরন্তর সূর্য্য-কিরণের উত্তাপে এই অকূল জলরাশিতেই বিশ্বসৃষ্টির আদি পত্তন হইয়াছিল। সৃষ্টির এই দুজ্ঞের্য় প্রহেলিকার আবরণে এই জলাভূমি চিরদিনই আমার কাছে রহস্যময়ী। সেইজন্য তার প্রতি আমার এত আকর্ষণ।

ভিতর হইতে মণিদা ডাকিয়া কহিল, তোর কবিতা লেখার বদ্‌ অভ্যেস আছে নাকি? আমি মুখ ফিরাইয়া কহিলাম, কেন, দাদা?

সে কহিল, নইলে এই কুয়াসার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি

ভাব্‌ছিস্‌ ?

আমি হাসিয়া কহিলাম, ও, তাই বল !

মণিদা কহিল, আয়, আর এক কাপ চা খেয়েনি। বলিয়া কোমর হইতে চামড়ার বেষ্টনীটা খুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে ফ্লাস্ক্‌ হইতে কাপে চা ঢালিতে লাগিল। আমি ভিতরে আসিয়া একখানা কাপ দখল করিয়া বসিলাম।

বাহিরে অনুভব করিলাম মাঝি বৈঠা রাখিয়া আবার লগি হাতে লইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে আবার জল অল্প নাকি মাঝি ? মাঝি কহিল, না বাবু, তবে সাম্‌নে একটা উঁচু চরের মত জায়গা আছে, তা'তে নৌকা আটকে গেলে আজ সারা রাত্তিরেও টেনে বা'র করবার জোগাড় নেই, তাই একটু সাবধান হ'তে হয়।

মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম পশমের টুপীটা হিমে ভিজিয়া গিয়াছে। চক্ষের পলকে মণিদা'র মাথা হইতে তাহার টুপীটা টান দিয়া লইয়া চায়ের কাপ হাতে করিয়াই আবার নৌকার বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম হাতের বাঁয়ে খানিকটা উঁচু জায়গা, তাহাতে বন্য-হাঁসের পালক আর জলজ নানাপ্রকার লতাপাতা বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝি সন্তর্পণে লগি দিয়া নৌকা ঠেলিয়া তাহার পাশ কাটিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। আমি মুচকি হাসিয়া বলিলাম, কই দাদা, তোমার শিকারের পাখীর ত কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে। মাঝি আবার বৈঠা হাতে লইয়া কহিল, না বাবু, বড় চরটা ওই সাম্‌নেই আস্‌ছে, একটু কান পেতে এখান থেকেই পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দ শুন্‌তে পাবেন।

এক অদম্য কৌতূহলে আমার বুক পুরিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিলাম, তৈরী হও, দাদা—

মণিদা' বাধা দিয়া কহিল, নে, চেঁচাস্‌নে, পাখীর পাল চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে। আমি অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইলাম। কান পাতিয়া শুনিতে পাইলাম নিকটেই কোথায় যেন একটা কিসের অস্পষ্ট শব্দ হইতেছে।

আসন্ন উষার আকাশে শীতের কুয়াসা আরো ঘনাইয়া আসিতেছে, অতএব কিছু আগে হইলে যাহা লক্ষ্য করিতে পারিতাম এখন আর তাহার কিছুই পারিতেছি না। আমি ধীরে নিম্নস্বরে কহিলাম, দাদা, আজ তোমার সমস্ত শীকারের প্রোগ্রাম পণ্ড !

মণিদা' স্থির ভাবেই উত্তর দিল, কেন ?

আমি কহিলাম, যে রকম কুয়াসা পড়্‌ছে !

দাদা কহিল, শিকারের পক্ষে এ আরো সুবিধা !

আমি কহিলাম, কি জানি, সে তোমরাই জান দাদা, কিন্তু তুমি একবার বাইরে এসেই দেখনা কি অবস্থাটা হচ্ছে।

মণিদা শূন্য চায়ের কাপটার উপর একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, আর এক কাপ চা খেয়ে নিলে হ'ত না, আর ত ফিরবার আগে খাবার সময় হ'বে না।

আমি অসহিষ্ণুভাবে কহিলাম, এখন আর সময় নেই দাদা, দেখ চারদিক ফর্সা হ'য়ে উঠ্‌ছে।

মণিদা গুলির ব্যাগটা কাঁধে ফেলিয়া বন্দুক দুইটা সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল। কুকুর দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া সম্মুখের দুই পায়ে ভর দিয়া কান খাড়া করিয়া বসিয়া রহিল।

একটা বন্দুক আমার হাতে তুলিয়া দিতে দিতে মণিদা কহিল, এখনো একঘণ্টা দেরী।

মাঝি কহিল, কুয়াসার জন্যে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না বাবু, আমার মনে হয় আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই গুলি ছুঁড়্‌তে পারবেন। মণিদার ধমকের ভয়ে আমি আর এই ব্যাপারে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম না, শুধু মনে মনে ভাবিলাম, কোথায় সম্মুখে চর, আর কোথায়ই বা শিকার, এদের কি দিব্যদৃষ্টি আছে নাকি ? এমন সময় অনুভব করিলাম সম্মুখের গলুই গিয়া চড়ায় লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকার আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত এক প্রবল ঝাঁকুনিতে দুলিয়া উঠিল। আমি মণিদার কাঁধে ভর করিয়া কোনমতে টাল সাম্‌লাইয়া লইলাম। এতক্ষণে দেখিলাম সম্মুখেই একটা বিস্তৃত চর, আমি ইহাকেই অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা বাওয়া ধানের ক্ষেত বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলাম। ইহা এখনও কর্দ্দমময় ও স্যাঁৎস্যাতে। মনে হইল যেন দিনদুই মাত্র ইহার পৃষ্ঠ হইতে জল নামিয়া গিয়াছে।

আমি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, সম্মুখের গলুই পাঁকে পুঁতিয়া রহিয়াছে। কহিলাম, নাম্‌তে হবে না, দাদা ?

মণিদা হাসিয়া কহিল, তোর যে রকম বুদ্ধি! শুধু নাম্‌তেই হবেনা, দরকার পড়্‌লে শিকারের পেছন পেছন ছুট্‌তে হবে।

আমার আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, কিন্তু মণিদার কথার ভয়ে নীরব রহিলাম।

মাঝি লগি পাঁকের মধ্যে পুঁতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধিয়া রাখিল। মণিদা পেছনের দিকে দুই কনুইয়ের ভিতর দিয়া বন্দুকটা লইয়া হাত দুইটা পকেটে পুরিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে সম্মুখের গলুইর দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, চল নেমে পড়ি।

মণিদা নামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে টম্‌ও পণি লাফাইয়া পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম মণিদা'র বুট কাদায় লেপিয়া গিয়াছে। আমি বুটের মায়া ত্যাগ করিয়া বন্দুকে ভর দিয়া কাদার মধ্যে নামিয়া গেলাম।

চারিদিক চাহিয়া রবিন্‌সন্‌ক্রুসো'র জীবনের কথা মনে পড়িল! যেন কোন এক নির্জ্জন দ্বীপের নির্ব্বাসনে আসিয়া সমুদ্রের তীরে তীরে শিকার খুঁজিয়া ফিরিতেছি। চারিদিকে কুয়াসার সমুদ্র, যতদূর দেখা যায় কেবল কুয়াসা, যেন অদৃশ্য আকাশের গা' হইতে বৃষ্টির মত ঝরিয়া পড়িতেছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপরের তুষার বিন্দুগুলি মুছিয়া ফেলিলাম। তারপর আস্তে আস্তে মণিদাকে কহিলাম, একটু আগুন করা যায়না দাদা।

মণিদা'র আদেশে মাঝি নৌকার ভিতর হইতে কিছু খড় বাহির করিয়া আনিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল, কিন্তু মনে হইল অনবরত তুষারবর্ষণে এই ক্ষীণ অগ্নিশিখা নিমেষে নিভিয়া যাইবে। আমরা আগুনের পাশে আসিয়া বসিলাম, কুকুর দুইটাও কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার পাশে আসিয়া জুটিল আধঘণ্টা হয়ত এইভাবে কাটিয়া থাকিবে, মণিদা ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, না আর বিলম্ব করা চলেনা, চল উঠে পড়ি।

আমি উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, আকাশের গায়ে ঘন-কুয়াসার আবরণ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে। মণিদা'র সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তারপর সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম রং-বেরঙের হাঁসের পালে সমস্ত জায়গাটা একেবারে কালো হইয়া রহিয়াছে। এত শিকার একত্রে আর কোথাও দেখি নাই। আগ্রহের সহিত কহিলাম, এখন ত সবই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, গুলী ছুঁড়্‌তে তবে আর দেরী কেন ?

মণিদা আমাকে ইঙ্গিতে চুপ করিতে কহিয়া গুলির একটা ছোট ব্যাগ নিঃশব্দে আমার হাতে তুলিয়া দিল। কুকুর দুইটা উদ্‌গ্রীব হইয়া গুলি ছুঁড়িবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এক অব্যক্ত আনন্দে আমার বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিল, শিকারের এমন সুযোগ হয়ত জন্মে আর কখনও হইবে না।

সম্মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রাত্রিবাসের পর পাখীগুলি উড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঠোঁট দিয়া সারা অঙ্গ খুঁটিতে খুঁটিতে ছোট ছোট পালকগুলি খসাইয়া ফেলিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক বিচিত্রভঙ্গীতে ডানা মেলিয়া শীতের জড়তা ভাঙ্গিয়া লইতেছে। বুঝিলাম তাহাদের উড়িবার সময় আসন্ন। তাহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনের কথা কল্পনা করিয়া আমার বড় ভাল লাগিল। মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলাম যে, আমি তাদের হিংসা করিতে আসিয়াছি; কিন্তু সহসা মণিদা'র বন্দুকের আওয়াজে আমার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। দেখিলাম সম্মুখের সমস্ত পাখী নিমেষে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,—আর চক্ষের পলকে টম্ একটা রক্তাক্ত পাখীর দেহ মুখে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। একবার মাত্র শিহরিয়া উঠিলাম, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দুক হাতে লইয়া সম্মুখের পাখীর পাল উদ্দেশ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র পাখী চঞ্চল হইয়া আকাশে উড়িল। কুয়াসা তখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই, দূরে পূর্ব্ব-দিগন্তের বনরেখার আড়ালে আলোর একটু আভাস দেখা দিয়াছে মাত্র। ভীত পাখীর পাল কতক্ষণ মণ্ডলাকারে আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরে গুলির আঘাতে আবার ধরিত্রীর বুকে নামিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নাই, শুধু ওই উড্ডীয়মান পাতিহাঁসের পালকে লক্ষ্য করিয়া

গুলি ছুঁড়িয়া যাইতে লাগিলাম, আর কুকুর দুইটা প্রাণপণ ছুটিয়া মৃত পাখীগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল।

আকাশের গায়ে কুয়াসা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, ভীত পাখীর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে মিলাইয়া গেল। আমি ডান হাতে কপালের ঘাম মুছিয়া বন্দুক নামাইয়া লইলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, এক স্তূপ পাখী রক্তাক্ত পালকে মাটীর উপরে লুটাইতেছে।

মণিদা আমার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া কহিল, স্‌প্লেন্‌ডিড্‌! এমন শিকার অনেকদিন করিনি। দিন কয়েকের মধ্যে আবার আসা যাবে, কি বলিস্‌! আমি কহিলাম, অমৃতে আমার কোনও অরুচি নেই দাদা, আর পিসিমা'র আদর-যত্নের লোভ ছাড়িয়ে শীঘ্র যখন আর কাশ্মীর যেতে পার্‌ছিনে তখন সময়টাও ত এক রকম ক'রে কাটানো চাই।

কুয়াসার ঘোর কাটাইয়া সূর্য্য অনেকদূর উঠিয়া পড়িয়াছে, আমরা ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় শূন্যপথে দুইটী পাখীর দ্রুত ডানা-সঞ্চালনের শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের মাথার উপর দিয়া দুইটী কালো পাতিহাঁস পাশাপাশিভাবে উড়িয়া যাইতেছে। চক্ষের পলকে বন্দুক তুলিয়া লইয়া গুলী ছুঁড়িলাম, আর তাহাদের মধ্যে একটি সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পড়িয়া গেল। অমনি এক গগন-ভেদী করুণ আর্ত্তনাদ আমাদের কানে আসিয়া বাজিল। উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম হতাবশিষ্ট জীবিত পাখীটী তাহার মৃত সঙ্গীর পথ অনুসরণ করিতে করিতে ডানা সোজা করিয়া মাটীর দিকে নামিয়া আসিতেছে। তাহার করুণ বিলাপের উচ্চ চীৎকার দিগন্তের গায়ে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ডল ভূপতিত মৃত পাখীটীকে মুখে করিয়া লইয়া আসিল, আর সঙ্গীহারা শোকার্ত্ত পাখীটী সেই স্থান হইতে তাহার সদ্য বক্ষক্ষরিত তপ্ত রক্তটুকু চঞ্চুপুটে শুষিয়া লইতে লাগিল।

মণিদা বন্দুক তুলিল, আমি বাধা দিয়া কহিলাম, দাঁড়াও দাদা, একেও আমিই গুলি করি।

আমি বন্দুক লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম পাখীটি নির্ভীক চিত্তে আমারই দিকে ডানা তুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; সঙ্গীর শোকে সে আপনার বিপদের কথা ভুলিয়াছে, সঙ্গীর বিরহে সে মৃত্যুর নিকট আত্মদান করিতে আসিয়াছে। তাহার করুণ বিলাপের মর্ম্মভেদী চীৎকারে হাওরের সারা বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; যেন সে আমাদের এই অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ বিধাতার কাছে সহস্রমুখে নিবেদন করিতেছে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলাম না। বন্দুক তুলিয়া আবার ভাল করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লইলাম, তারপর চক্ষু মুদিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। মুহূর্ত্তে ক্রন্দনের রোল থামিয়া গেল, আর ডল পাখীর রক্তাক্ত দেহটা মুখে করিয়া লইয়া আসিল। আমি তাহাদের উভয়কে একই ব্যাগে পুরিয়া লইলাম।

সেইদিনেই কাশ্মীর রওয়ানা হইলাম।

* * * *

ঝিলম নদীর তীরে কাশ্মীরের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার নির্জ্জন বাস-ভবন। জীবনের সায়াহ্ন ঘনাইয়া আসিতেছে, আজিও তেমনি ভাবেই পূর্ব্ব দিগন্তের পানে ফিরিয়া শুনিতে পাই সেই সঙ্গীহারা পাখীর করুণ বিলাপ। ঝিলমের উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকার পাল উড়িয়া দূরে ধূসর পাহাড়ের গায়ে মিশিয়া যায়, আমি অপরাধীর মত আমার গৃহের এককোণ হইতে লুকাইয়া চাহিয়া থাকি; যদি আমার হিংসার দৃষ্টি আবার তাহাদের সরল জীবনপথে বাধা জন্মায়!

শীতের নিস্তব্ধ নিশীথে ঘুমের ঘোরে কাঁপিয়া উঠি;—পূর্ব্বদিগন্ত হইতে যেন কাহার ক্রন্দন ভাসিয়া আসে।

নিষাদের ক্রূর-হিংসায় কবি-গুরুর এই চিরন্তন অভিশাপের অশান্তি আমার আর কতকাল ভোগ করিতে হইবে কে জানে?*

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

* ফরাসী গল্পের ছায়া।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

পূর্ব্বে আত্মোন্নতির জন্য ধনলাভ, স্বাস্থ্যলাভ প্রভৃতির ন্যায় শিক্ষালাভও মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূত ছিল। গোড়ায় সকল দেশেই রাজ্য ছিল রাজার নিজস্ব সম্পত্তি। তিনি যদি শক্তিশালী হইতেন, সুদক্ষ মন্ত্রী পাইতেন, রাজ্যে শস্যাদি উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, রণ-নিপুণ সেনাদল রাখিতে পারিতেন, তবে প্রজাদের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার রাজ্যের সমৃদ্ধ ও প্রতাপশালী হইবার পক্ষে বাধা থাকিত না। কিন্তু যখন পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন গতিতে এবং বিভিন্ন পরিমাণে রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন রাজ্যের পরিবর্ত্তে জাতিই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই 'জাতি'ই রাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। যে জনসমষ্টি লইয়া জাতি গঠিত তাহাদের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক এবং ধন ও বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় উন্নতির উপর জাতীয় প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। তাই সর্ব্বদেশে শক্তি ও অগ্রগতির অনুপাতে শাসনযন্ত্রই প্রজাদের সর্ব্ববিধ অভাবমোচনের ভার অল্লাধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন; উন্নতির পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সেদিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইহা হইল সাধারণ কথা। ইহা ছাড়া বিশেষ কথাও আছে। লোকের এমন অনেক দৈন্য আছে যাহা জাতীয় জীবনে সংক্রামিত হইয়া তাহাকে পঙ্গু ও নির্বীর্য্য করিয়া ফেলে, সর্ব্বপ্রকার জাতীয় প্রয়াসের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ-সরকার প্রজাদের অভাব-মোচনের সুযোগ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, শিক্ষাদ্বারা এবং আরও অন্যান্য উপায়ে লোকের রুগ্ন মনোবৃত্তি দূর করিবার সময়সাপেক্ষ চেষ্টা করিতেই পারেন না। অনেকস্থলে আবার লোকের এদিকে শিক্ষা এবং এই অবস্থাকে অতিক্রম করিবার আগ্রহ থাকিলেও এই বিপদ ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাহিরে গিয়া পড়ে। এইরূপ হইলে রাজবিধিকে কঠোর হইয়া উঠিতে হয়—বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালনে লোককে বাধ্য করিতে হয়।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া যাউক। যাহাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে, রোগাক্রান্ত হইলে তাহারা চিকিৎসার সুযোগ পায়, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার ও নিবার্য্য ব্যাধিগুলির আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সমূহের সহিত পরিচিত ও সে সম্বন্ধে অবহিত থাকে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাজসরকারকে রাখিতে হয়। কিন্তু কোন সংক্রামক ব্যাধির আসন্ন আক্রমণে যখন জাতীয় স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য যে-সকল সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন, তাহার বাধ্যতামূলক প্রয়োগে কোন রাজসরকারই জনমতকেও উপেক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

শিক্ষা-সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। লোকে যাহাতে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও বিশেষ শিক্ষার সুযোগ যাহাতে তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য করণীয়।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই প্রকার মৃদু ব্যবস্থা সর্ব্বত্র সমীচীন না হইতেও পারে। জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের বিস্তৃত প্রয়োগ দ্বারা সুফল লাভ করিবার জন্য, নূতন নূতন চিন্তাদ্বারা জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া শক্তিশালী করিবার জন্য, বিদ্যার উচ্চবিভাগে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরকে উন্নত করিবার জন্য, আধুনিক সভ্যতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে গেলে সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে যে সকল চেষ্টা করিতে হইবে তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে কতকটা শিক্ষা বিস্তারের

একান্তই প্রয়োজন।

তাই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য অনেক দেশকেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আমরা যে দেশের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্টভাবে জড়িত সেই বিলাতের কথা এবং অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যে আমাদের ঘরের কাছে যে দেশ আশ্চর্য্য রকম উন্নতি সাধন করিয়াছে সেই জাপানের কথা বলা যাইতে পারে।

নিজের দেশে ইংরেজ অনেক বড় বড় নীতি ও আদর্শের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন। স্বদেশে এবং বিদেশে ইহা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়াছেন ও অন্যবিধ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু ত্রিশ কোটি লোক অধ্যুষিত এই বিরাট মহাদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা, সমস্ত উন্নতির অন্তরায় নিদারুণ অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যে সকল বিশেষ উপায় তৎপরতার সহিত অবলম্বন করা উচিত ছিল তাহা করেন নাই।

দেশের লোকের দৃষ্টি কিন্তু অনেকদিন পূর্ব্বেই এ দিকে পড়িয়াছে। সর্ব্বপ্রথম ১৯১০ সালের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় আইন পরিষদে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বিল উত্থাপিত হইয়া প্রত্যাহৃত হয়। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে মহামতি গোখেলে এই পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে অধিকতর সুব্যবস্থার জন্য বেসরকারি-ভাবে এক বিল উত্থাপিত করেন। * ইহাতে ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার বিধি ছিল। এই প্রস্তাব যে অতি সাবধানতার সহিত উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে। কাউন্সিল এই প্রস্তাব উত্থাপন সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করায় এ বিষয়ে জনসাধারণের মত জানিতে চাওয়া হয়। এক বৎসর পরে গোখেলে মহাশয় পাণ্ডুলিপির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা বিবেচনার ভার একটি সিলেক্ট কমিটির উপর দিবার প্রস্তাব আনয়ন করেন। তিনি বলেন, যেখানে স্কুলে গমনোপযোগী বয়সের বালকদের এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে যায় সেখানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাইবে এবং বাধ্যতা-মূলক হইলে শিক্ষা অবৈতনিক করিতে হইবে। খরচের এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ

* কোনও বোর্ড বা মিউনিসিপালিটীর এলেকাভুক্ত কোন স্থানে এই আইন প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সেই স্থানের একটা নির্দ্দিষ্ট শতকরা পরিমাণ বালক বালিকার স্কুলে পড়া এই আইন-অনুসারে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার ভার ছিল স-কাউন্সিল বড়লাট বাহাদুরের উপর। এই প্রকারে কোন স্থান উপযুক্ত হইলে বোর্ড বা মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ সেইস্থানে বা তাহার অংশবিশেষে এই আইন প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ইহা ব্যতীত আইন প্রযুক্ত হইবার পক্ষে স্কুলে-পড়া-বালক বালিকাদের সংখ্যার সর্ত্তটা পূর্ণ এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগে ইচ্ছুক হইলেও ইহার জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রয়োজন হইত। কোনস্থানে এই আইন প্রযুক্ত হইলে সেই স্থানের অধিবাসী অন্যূন ষষ্ঠ এবং অনূর্দ্ধ দশম বয়স্ক প্রত্যেক বালকের অভিভাবকের পক্ষে পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন্ বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ের জন্য সরকারের পরিচিত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত বালককে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমের বিধান ছিল এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষকে এই আইন হইতে মুক্তি দিতে পারিতেন। কোনও বালকের পিতার মাসিক আয় দশ টাকার কম হইলে সেই বালকের নিকট হইতে মাহিনা লইবার কথা ছিল না এবং অন্য প্রকারেও বেতন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ব্যবস্থা ছিল। এই আইন বালকদিগের উপর প্রযুক্ত হইবার পর সেই স্থানের বালিকাদিগের উপরও প্রযুক্ত হইতে পারিত। স্কুলে বালকদিগের উপস্থিতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইবার কথা ছিল। এই সমিতির কাজ হইত যে-সকল পিতামাতা বালকদের স্কুলে পাঠান না তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার পর কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা। ম্যাজিষ্ট্রেট্ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে বালকের পিতা তাহাকে স্কুলে পাঠান সে ব্যবস্থা করিবেন এরূপ বিধি ছিল। আদেশ প্রতিপালিত না হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক দুই টাকা এবং পরে প্রত্যেক অপরাধের জন্য দশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিতেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটি এই আইনের এলেকাভুক্ত স্থান হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া শিক্ষাকর আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টেরও দায়িত্ব ছিল।

গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। ১৯১২ সালের ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ্চ ইহা লইয়া বিতর্ক হয়। গোখেলে বলেন যখন সরকার জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তখন সে সেজন্য তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে গেলে অসম্ভব দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইবে। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে দেশবাসীর মতামত তিনি অনুকূল বলিয়াই বিবেচনা করেন এবং বলেন যে, মাত্র সরকারী কর্ম্মচারী মহল হইতেই কিছু বাধা আসিয়াছে। ব্যয় সঙ্কুলন হওয়াটাকে তিনি অসম্ভব বাধা বলিয়া মনে করেন নাই। ব্রিটীশ ভারতের পুরুষসংখ্যা সাড়ে বার কোটি ধরিলে তাহার এক দশমাংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোককে শিক্ষিত করিতে হইত। চল্লিশ লক্ষ পূর্ব্বেই স্কুলে পড়িতেছিল, তাহাদের বাদ দিলে জন প্রতি পাঁচ টাকা হিসাবে সাড়ে চার কোটি টাকার উপর খরচ হইত না। ইহার মধ্যে সরকারকে তিন কোটি টাকা মাত্র দিতে হইত। তিনি এই সংস্কার দশ বৎসরে সাধিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন এবং ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ৫-৭ বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহাতে চার কোটি টাকা উঠিতে পারিত।

এই বিলটি সরকারি বাধায় পরিত্যক্ত হইল। এত সতর্কতার সহিত, এত ধীরভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা লইয়া বিলটি গঠিত হইলেও তাহা আইনে পরিণত হইতে দেওয়া হইল না। অন্যান্য দেশে যাহাতে সুফল পাওয়া গিয়াছে এই দুর্ভাগা দেশের পক্ষে তাহা যে কিসে ক্ষতিকর হইত দেশের লোকে তাহা বুঝিতে পারিল না।

জাপানে ১৮৭২ সালে জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৭৩ সালে সেখানে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৮ (আটাশ) জন বিদ্যালয়ে যাইত; আর ১৯১২-১৬ সালে যাইত ৯৮·২% জন। ভারতে যে সমস্ত বালকবালিকা প্রাথমিক স্কুলে পড়ে তাহাদের সংখ্যা লোক সংখ্যার শতকরা ২·৮০ মাত্র। আর জাপানে তাহাদের সংখ্যা ১৩·৩; এবং পাশ্চাত্যদেশে ১৪-২০র মধ্যে। বিলাতে এই আইন ১৮৭০ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাতে এই দেশের যে প্রকার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সামান্য যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তাহাও অল্পদিনে আমাদের ছাড়াইয়া গেল।

অন্য দেশের সহিত ভারতের অবস্থার যদি দুরতিক্রম্য ব্যবধান থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও ভারতের অন্তর্গত বড়োদা সম্বন্ধে ত আর সেকথা বলা চলে না। ১৮৯৩ সালে সর্ব্বপ্রথম বড়োদায় এ সম্বন্ধে চেষ্টা হয়। ১৮৭১ সালে বড়োদায় মাত্র একটি ইংরাজী ও চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; এবং শিক্ষার জন্য খরচ হইত বৎসরে মাত্র তের হাজার টাকা। ১৯২২ সালে ২৭৪৮টি বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার সাহায্যে এবং ৬৬টীতে ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ এবং ব্যয় হইয়াছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা।

দেশীয় রাজ্য বড়োদার পক্ষে যাহা সম্ভব হইল ব্রিটীশ ভারতের পক্ষে তাহা সুফলপ্রসূ বলিয়া বিবেচিত হইবে না কেন? গবর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সামান্য চেষ্টাটুকু করিতেছেন শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায়, সেজন্য যে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় হয় তাহার অনেকটাই একেবারেই বৃথা হইয়া যায়। গোটা ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়া শুধু বাংলার কথাই দেখা যাক।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে যত ছাত্র পড়ে তাহার মধ্যে মাত্র শতকরা তিন জন এই শিক্ষা শেষ করে। অর্থাৎ এজন্য যে টাকাটা ব্যয় হয়, তাহার শতকরা মাত্র তিন টাকা সার্থক হয়। শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক হইত, সব নিম্নশ্রেণী হইতেই যদি পাঠ সমাপ্ত করা লোকের ইচ্ছাধীন না হইত, তবে এই গরীব দেশ এতটা অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইত।

সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার যে অপরিহার্য্য, সে সম্বন্ধে কাহারও আজ সংশয় নাই। অথচ, বর্ত্তমান যে গতিতে জনশিক্ষা অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকারের শিক্ষানীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কাজেই পূর্ব্বের কথা বাদ দিয়া বিগত কয়েক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২১-২২ সালে প্রাইমারি স্কুলের বালকবালিকার সংখ্যা ছিল ১১৬৪৫৯৭ এবং ১৯২৬-২৭

...লে হইয়াছিল ১৩৯৮৯৪২ অর্থাৎ এই পাঁচ বৎসরে ২৩৪, ৩৪৫ জন বালক বালিকা বাড়ে। তৎপূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে বাড়ে ৩৪১৭২৭ জন। আপাতদৃষ্টিতে এ সংখ্যা আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র শতকরা ৩ জন শিক্ষিত হইতেছে, এ কথা মনে রাখিলে ইহার প্রকৃত মূল্য বুঝা যাইবে।

জন সংখ্যার অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলে পড়া বালক বালিকার সর্ব্বোচ্চ অনুপাত অন্য দেশে দেখিতে পাই লোকসংখ্যার ⅙ অংশ। এসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ অবশ্য অনেক উচ্চ। আমাদের দেশে এই অনুপাত এক দশমাংশ ধরিয়া লইলেও মাত্র বাংলাতেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোককে শিক্ষিত করা দরকার। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে হারে শিক্ষার প্রসার হইতেছে, তাহাতে এই বিপুল সংখ্যাকে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার দিকে আনিতে গেলে আইনের সাহায্য লওয়া অপরিহার্য্য।

অধুনা এজন্য লোকমতের প্রবল চাপ পড়ায় সরকার এদিকে একটু মনোযোগী হইয়াছেন। নূতন আইন অনুসারে প্রদেশসমূহের মিউনিসিপালিটির হস্তে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা আসিয়াছে। কয়েকটি প্রদেশ, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, বাংলা এ বিষয়ে বড়ই পশ্চাৎপদ। মাত্র এক চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটিতে ইহা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে এবং কলিকাতা কর্পোরেসনও এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। অথচ এই বাংলাদেশে মিউনিসিপালিটির সংখ্যা ১১৬টি (১৯২১)।

এই সকল আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশীয় এবং অনেক স্থলে বে-সরকারি লোকদ্বারা গঠিত। অথচ, দুঃখের বিষয় এই যে, একান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়টির প্রতি কেহ দৃষ্টি দেন নাই। এরূপ হইবার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের ভারও ছিল ইঁহাদের উপর। লোকের উপর করবৃদ্ধি করিলে এবং নূতন কিছুতে হাত দিতে গেলে সাধারণের অপ্রিয় এবং নিন্দাভাজন হইতে পারেন, এই ভয়েই সম্ভবতঃ ইঁহারা এদিকে অগ্রসর হন নাই। যাহা হউক ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ক্রমবর্দ্ধমান জনমতের চাপে এদিকে একটু অবহিত হইতে হইয়াছে। শুধু বাংলার কথাই আলোচনা করা যাক।

গত কাউন্সিলে এ সম্বন্ধে সরকার পক্ষ হইতে একটি বিল উত্থাপিত হয়, এবং বিবেচনার জন্য উহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে যায়। কিন্তু নূতন কাউন্সিলে এই বিল উত্থাপন করিবার সময় সরকার সিলেক্ট কমিটির মতামত অগ্রাহ্য করিয়া অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় বিলটি কাউন্সিলে উপস্থিত করেন। ফলে বিলটি গৃহীত না হইয়া অধিকসংখ্যক ভোটের জোরে পুনরায় সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ায় উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছে।

এই বিলে সরকারি প্রাধান্য রক্ষিত হইবার পুরাপুরি ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোক বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাই এ বিষয়ে সরকারি আশ্রয় লোকের পছন্দ হইল না।

তাহার পর এই আইনের আর একটি বিশেষ ত্রুটি এই ছিল যে, ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ইহাতে নূতন শিক্ষাকর ধার্য্য হইবার বিধি ছিল। এই কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে লোকের বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক। তাহা হইলেও এই বিধিকে বাধা দিবার পূর্ব্বে কথাটা আমাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

সরকার ত অনেক দিক হইতেই টাকা দিতে পারিতেন। পাটের শুল্কটা ত বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা। বোম্বাই এবং বাংলায় রাজস্ব ত প্রায় সমান, অথচ বোম্বাই অপেক্ষা বাংলাকে ভারত সরকারের তহবিলে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অধিক দিতে হয়। এই অত্যধিক কর ভার হইতে ভারত সরকার যদি বাংলা প্রদেশকে মুক্তি দিতেন, তাহা হইলেও বাংলার টাকার অভাব হইত না।

জাতি গঠনের জন্য আমাদের যে-সকল কাজ প্রয়োজনীয়, জন-শিক্ষা তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; এজন্য সরকারের কৃপা যদি ভুল ভও হয়, তবুও আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হইবে এবং কর দিয়াও যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যদি শিক্ষা-নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনের ভার আমাদেরই উপর থাকে তবে,

এই নূতন কর দিয়াও আমরা লাভবান হইতে পারিব।

তাহার পর যাহাতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার কর্তৃত্ব ভার একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির উপর রাখা হয় এবং পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে একটি সাধারণ নীতি অনুসৃত হয়, সে বিষয়েও সিলেক্ট কমিটিকে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদক একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। বাংলার সমস্ত প্রান্তের এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য যাহাতে একই সাহিত্যিক ভাষায় লিখিত পুস্তক ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি একই প্রকারের হয়, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

আপাতদৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু বৈষম্য দেখা গেলেও সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য এবং সভ্যতা ও প্রকৃতিতে যে গভীর মিল আছে, সর্ব্বোপরি যে সাধারণ ভাষা পাঁচকোটি বাঙ্গালীকে অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, বাহিরের কোনও ব্যবস্থা যেন তাহাকে বিন্দুমাত্র শিথিল করিয়া না ফেলে সেদিকে আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। অন্তর্নিহিত এই ঐক্যকেই দৃঢ় এবং অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শুধু বৈশিষ্ট্যের নামে খণ্ড ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিলে জাতির মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলা হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ডোমের চিতা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এ

ধূ-ধূ করিতেছে প্রকাণ্ড বিল। চারদিকে খালি জল আর জলের বুকে কচুরীপানার গাদার মধ্যে মাঝে মাঝে রক্ত সাঁপ্‌লা, রক্ত কমল। নানা রকমের ঘাস, তার উপর পাখীর দল উড়িয়া পড়িতেছে আকাশের গভীর নীলিমার বুকে একটা সুর জাগাইয়া। মধ্যে মধ্যে এক একটা বাড়ী সমুদ্রের মাঝে লাইট্‌ হাউসের মত।

এই জলরাশির মাঝখানটায় প্রকৃতির সবুজ শোভায় ঘেরা মাদারের ভিটা—শুষ্ক, প্রাণহীন। ভিটার উপর গুটিকয়েক পাতাহীন মৃতপ্রায় গাছ বিকলাঙ্গ কুষ্ঠীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এখানে ওখানে ছড়ান কাঠের কয়লা, মানুষের কতগুলি অস্থি মাথার খুলি।

মাদারের ভিটায় দুটি ডোম থাকে হারু ও বদন। দু'জনেই প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান; কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রং। হারুর মাথায় ছিল একটা বাবরী, বদনের চুল কদম ফুলের মত চারদিকে সমান ভাবে ছাঁটা। অনেকদিন হইল দু'জনে এখানে আছে। সমাজের আবশ্যক অঙ্গ এই ডোম দুটিকে আশে পাশের দশমাইলের মধ্যে সকলেই জানে।

মাদারের ভিটা এই অঞ্চলের শ্মশান। দু'ধারে দশমাইল আন্দাজ দূর গ্রাম হইতেও মড়া পোড়াইতে সকলে এখানে আসে, তাই হারু ও বদন সকলেরই পরিচিত। কোথায় তাদের বাড়ী ঘর, কোথা হইতে তারা আসিয়াছে, কেহ জানে না। যমদূতের মত আকাশ হইতে যেন তারা এই শ্মশানের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল মড়ার কাঠ যোগাইবার জন্য। আজ বিশ বৎসর তাদের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। তারাও বিলের মধ্যে পোড়ো ভিটা হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কাঠ বেচিয়া, মাছ ধরিয়া, মৃতোর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল, ডাল, ফল-কলারি সিদ্ধ করিয়া তারা উদরান্নের সংস্থান করে। প্রায়ই তাদের উনান ধরাইতে হয় না, চিতার উপর হাঁড়ী চড়াইয়া দেয়, রুটী সেঁকিয়া লয়, চিতার তপ্ত অঙ্গার হাতে তুলিয়া কল্কিতে তামাক সাজে।

মাদারের ভিটায় একটা কুঁড়ে বাঁধিয়া তারা থাকে। সমাজ সংসার সবই তাদের পরস্পরকে লইয়া। বাহিরের জগত তাদের কাছে অর্থহীন। জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহ তাদের কাছে প্রাণবন্ত—তারাই যে তাদের জীবিকা।

পরস্পরের সঙ্গেও তারা বড় একটা কথা বলে না, হাসে তারা আরও কম। কোন্‌ মৃতদেহ কিরূপে পুড়িল, কোন্‌টার হাড় কতখানি শক্ত এই-ই তাদের আলোচ্য বিষয়। মৃত-দেহের অস্বাভাবিকতা মধ্যে মধ্যে তাদের হাসির উদ্রেক করে বটে। কিন্তু সে হাসি হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের মত বিকট। বহুদিন যাবত এই অঞ্চলে তাদের নামে নানারকম বীভৎস গল্প চলিয়া আসিতেছে।

হারু ও বদনের দুর্ভাগ্য-ক্রমে আজ দুদিন পর্য্যন্ত কোনও মড়া আসে নাই। হাঁড়ীতেও চাল ছিল না। চাল কিনিতে যাইতে হইবে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সমস্ত দিনটা মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, তাই তারা চাল কিনিতে যায় নাই। শুক্‌না ছোলা চিবাইয়াই দিনটা কাটাইয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় বদন বলিল—"যে ক'টা পয়সা আছে তা'তে দু'সেরের বেশী চাল হবে না। তা'তে একবেলা চলবে। তারপর?"

হারু বলিল—"জুটে যাবে'খন।"

বদন শূকরের মত অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিল—"ছাই, এ রাজ্যে দু'দিনের মধ্যে একবেটাও মরল না, মানুষগুলো যেন অমর হয়ে উঠেছে।" সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, কড়্‌...কড়াৎ...কড়্‌।

হারু বলিল—"কাল সকালে যা হয় করব। আজ এখন শোয়া যাক।"

ঘুম তাদের হইল না। বিধাতা তাদের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। মধ্য রাত্রে একজন যুবক আসিয়া ডাকিল —"হারু, বদন।" কোলে তার একটি মৃত শিশু। নিজের স্নেহ-পুত্তলি পুত্রকে সে একাই পোড়াইতে আসিয়াছিল। জাতিতে সে পদ্মরাজ। পাঁচ মাইলের মধ্যে আর পদ্মরাজ নাই। কাছে জেলে, কোচ, যুগী, ভুঁইমালী আছে বটে কিন্তু তারা পদ্মরাজের মড়া ছুঁইবে না, তাই সে একাই নৌকা বাহিয়া আসিয়াছিল তার পুত্রের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে।

তার ডাক শুনিয়া বদন বলিল—"এত রাত্তিরে মড়া পুড়ুতে বেশী দাম লাগবে।" যুবকের কাছে একটি মাত্র টাকা ছিল। সে বলিল—"বড় গরীব আমি। এই একটি টাকা আছে।" বদন বলিল—"এক টাকায় আর মানুষ পোড়ে না।"

যুবকটি অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও তাদের রাজি করাইতে পারিল না। বদন বলিল—"একটা মড়া পোড়াবার মত কাঠ আছে বটে। এক টাকায় তোমায় সেই কাঠ বেচলে তারপর যদি কেউ আসে তখন... ?

নিরুপায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবকটি বলিল—"তবে ছেলেটাকে জলেই ফেলে দিতে হবে দেখছি। শকুন চিলে ঠুক্‌রে খাবে। এমন অদৃষ্টই করেছিলাম।" বলিয়াই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হারু বদনকে বলিল—"দে ভাই, এমন করে কাঁদছে!" বদন তাকে কষিয়া ধমক দিল, বলিল—"আরে, না মরলে আমাদের কাছে কেউ আসে না। মরার দুখ্‌খু দেখে গললে চলবে কেন?

হারু আরো দু' একবার বলিল। বদন কিছুতেই সম্মত হইল না। কিন্তু যখন দেখিল যে যুবকটি সত্যই শব লইয়া যাইতেছে, তখন সে ভাবিল যে একটা টাকা যোগাড় করিয়া রাখিতে পারিলে অন্ততঃ আর দু-তিন বেলা চালের সংস্থান হয়। সে বলিল—"আচ্ছা, কাঠ দিচ্ছি, দুদিন পরে দামটা দিয়ে যেও কিন্তু। আরও তিনটাকা লাগবে।"

যুবকটি বলিল—"দু'দিনের মধ্যে পারব না। সাতদিন সময় দাও। ছেলের ঋণ আমি রাখব না।"

বদন বলিল—"আচ্ছা, পাঁচ দিনের মধ্যে দিয়ে যেও।" যুবকটি মৃত পুত্রের দেহ ছুঁইয়া বসিয়া রহিল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। চিতা জ্বলিবে না।

২

পরদিন সকালে; শিশুটির চিতা তখন নিভিয়া আসিতেছে। বদন হারুকে একটা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা দিয়া বলিল—"হারু, জল্‌দি গিয়ে চাল নিয়ে আয়। চিতেটা নিভে যাওয়ার আগে ফিরবি, তা' না হ'লে আবার জ্বালানি কাঠ লাগবে।" মৃতের পিতা ইহা শুনিয়া বদনের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু চিতা নিভিয়া গেল, হারু আর ফিরিল না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বদনের ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। সে হারুর উদ্দেশ্যে অকেজো, চোয়াড়, গাধা প্রভৃতি গালি পাড়িল।

চারিদিকে অসীম জলরাশির মধ্যে বদন বন্দী হইয়া আছে। ডিঙ্গিখানা হারু লইয়া গিয়াছিল, সে না ফিরিলে বদনের এক পা নড়িবার সামর্থ্য নাই। আগের দিন সে উপবাসী আছে। হারু না ফিরিলে ক'দিন যে না খাইয়া থাকিতে হইবে, একমাত্র বিধাতা জানেন।

সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, দু' একটা কাকের ক-ক ভিন্ন আর কিছু শোনা যাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধিত হিংস্র পশুর মত বদন নিষ্ফল গর্জ্জন করিতে লাগিল।

দুপুরের পর বৃষ্টি একটু কমিলে বদন গাছের উপর উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। পেটের জ্বালায় একটি জেলে বিলের মধ্যে নৌকায় বসিয়া মাছ ধরিতেছিল। আরো দূরে দেখা গেল কয়েকখানা বেদের নৌকা। বদন এদিক ওদিক চাহিয়া তাদের ডিঙ্গিখানা দেখিতে পাইল না। সে তখন গলা ছাড়িয়া ডাকিল "হা...রু।" সেই স্বরে ভীত হইয়া পাশের একটা গাছ হইতে ক-ক করিয়া একটা কাক উড়িয়া গেল, ছানাগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল চিঁ-চিঁ।

বৈকালের দিকে বদন খুব দুর্ব্বল বোধ করিল। প্রত্যহ দু'সের চা'লের ভাত খাওয়া তার অভ্যাস; দুদিন পেটে কিছু

না পড়ায় সে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেলা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারুর উপর তার রাগ কমিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল হারুর কিছু হইয়াছে। কিন্তু সে বড়ই নিরুপায়, হারুর খোঁজ লইবারও তার সাধ্য নাই। সে ভিটার পূর্ব্ব-প্রান্তে যাইয়া গলা ছাড়িয়া ডাকিল—"হা...রু-উ!" বাতাসের বুকে সে শব্দ মিশিয়া গেল। তারপর গেল সে দক্ষিণদিকে। সেখানে গিয়া কানে হাত দিয়া আবার ডাকিল—"হা...রু-উ!"

এবার জবাব আসিল। দূর হইতে একটা শকুনি চীৎকার করিয়া উঠিল...কর্...র্...র্..র্। বদন তার উদ্দেশ্যে কুৎসিত গালি পাড়িল।

পরদিন প্রাতে একদল ভদ্রলোক আসিলেন একটি স্ত্রীলোকের শব লইয়া। বদনের তখন একখানাও কাঠ নাই। সে বলিল—"অল্প সময়ের মধ্যেই কাঠ এনে দিচ্ছি। তোমাদের নৌকাখানা একবার চাই।" সে তাঁদের কাছে হারুর কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কিছুই জবাব দিতে পারিলেন না।

ঘণ্টা তিনেক পরে ভদ্রলোকরা দেখিলেন নৌকার সঙ্গে একখানা ডিঙ্গি বাঁধিয়া বদন ফিরিতেছে। নৌকায় একখানিও কাঠ নাই। ডিঙ্গির উপর একটা শব।

বদন হারুর নীলবর্ণ ফুলা মৃত দেহটা ভিটার উপর তুলিল। একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পেলে?" বদন বলিল—"পাতিয়ার বিলে। সাপ ওর হাতে কামড়ে দিয়েছে।"

ডিঙ্গির মধ্যে সের দশেক লাল মোটা চা'ল, গোটাকয়েক কইমাছ ছিল। কইমাছগুলি হারুর দেহের দু'চার জায়গা খাইয়া ফেলিয়াছে, পাখীতে মৃত দেহটা কত বিকৃত করিয়াছে।

বদন চা'ল ও মাছগুলি তুলিয়া কুড়াল লইয়া গোটা-তিনেক মরা গাছ কাটিয়া ফেলিল। কাঠ কাটিতে তার বেশী সময় লাগিল না। ভদ্রলোকদের প্রশ্নে সে হুঁ হাঁ করিয়া সংক্ষেপে জবাব দিল।

স্ত্রীলোকের শবটি পোড়াইয়া ভদ্রলোকরা চলিয়া গেলেন। যাবার সময় একজন বলিলেন—"থানায় খবর দাও বদন"। বদন বলিল, "কাকে চিলেই যথেষ্ট ঠুক্‌রেছে। আর দরকার কি?"

তারা চলিয়া গেলে বদন ভাল করিয়া একটা চিতা সাজাইল তারপর যত্নের সহিত শবটা চিতার উপর তুলিয়া দিল। চিতার ধোঁয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া আকাশে উঠিতেছে। বর্ণে তার একটা নীল আভা। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া বদন মানুষ পোড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত ধোঁয়া জীবনে আর কখনও দেখে নাই। এই ধোঁয়ায় যেন তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল।

সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য্য আগুনের হলকা ঢালিয়া দিতেছিল। হারুর চিতার ধোঁয়া সূর্য্যের জ্যোতিকেও ম্লান করিল। তারপর চিতার বুক হইতে বাহির হইতে লাগিল লোলজিহ্ব অগ্নিশিখা, যেন কতকগুলি লাল সাপের ফণা; ক্রুদ্ধ তার গর্জ্জন, অফুরন্ত তার হিংসা-বৃত্তি।

বদনের মনটা খারাপ, পেটে ক্ষুধা। খানিকক্ষণ চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "দূর ছাই কিছু ভাল লাগেনা। আগুনটা আবার নিভে যাবে। এর উপরেই চা'লটা চড়িয়ে দেওয়া যাক্।"

হারুর চিতার উপর বদনের চা'ল চড়িল।—বদন একদৃষ্টে হাঁড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। হাঁড়ীর ভিতর চা'লের সঙ্গেই গোটা দুই মাছ সিদ্ধ হইতেছিল। ফুটন্ত ভাতের টগ্‌বগানি, চিতার চড়্‌চড়াৎ চড়্‌ শব্দ,—তা ছাড়া সব নিস্তব্ধ।

দূরে বকের পাতি আকাশের বুকে উড়িতেছে। বৈকালিক সূর্য্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্য্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তার মনে হইল সব ফাঁকা। এমন অভাবের বেদনা বুকে আর কখনও বাজে নাই। সে দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া কোন রকমে বসিয়া রহিল।

ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, চারিধারে সীমাহীন জলরাশি,—তার মধ্যে বাতাসের তালে তালে ঘাসের পাগল নৃত্য, উজ্জ্বল জলের সাবলীল ভঙ্গী। এতদিন বদন

হারুর সঙ্গে কেবল মড়া পোড়াইয়াই আসিয়াছে। সে ভাবিত বিশ্বে সত্য শুধু তারা দু'জন, আর সত্য মানুষের মৃতদেহ। প্রকৃতির কোলেই সে পালিত, এতদিন সে প্রকৃতিকে বাদ দিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু আজ আর পারিল না। আজ বৃদ্ধ সেই ফকিরের মুখের গানটি তার মনে পড়িল। অনেকদিনই সে এ-গান শুনিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,

নাইয়ারে মোর নাইয়া,
তুমি চলহরে নাও বাইয়া।
চারদিকে সৌরভ তোমার
দেখনা মন চাইয়া

বদনের ভাত ও মাছ তখন পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

আলোচনা

লিপি সংসদ

বিচিত্রা সম্পাদক সমীপেষু—

আমার এ চিঠি পেয়ে আপনার মনে যে ভাবেরই উদয় হোক না কেন সেটা যে বিস্ময়রস নয়, তা' আমার মত অসম্পাদকেরও কল্পনা করা কঠিন নয়। বাঙ্গালার মাসিক পত্রগুলির সম্পাদকের কাছে যে অহরহ নানা রকমের সম্ভব-অসম্ভব প্রস্তাব, উপরোধ, অনুরোধ ইত্যাদির ফিরিস্তি দাখিল হওয়া স্বাভাবিক, সে বিশ্বাস আমার আছে। কাজে কাজেই আমার এ সামান্য প্রস্তাবটি আপনার কাছে অসঙ্কোচে এবং নির্ভয়ে উত্থাপন করা যেতে পারে। আমার বক্তব্যের সারাংশ হচ্চে এই যে, আমাদের বাঙ্গলাদেশে লিপি সংসদ অর্থাৎ Correspondence Club-এর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা। আমাদের দেশে নানা রকমের Club-এর অস্তিত্ব আমার জানা আছে, কিন্তু এদেশে কোনও Correspondence Club আছে ব'লে জানি না।

এ রকম প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমত অর্থের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে, ব্যয় বাহুল্যের তেমন কোনও আশঙ্কা নাই। এর জন্য কুসি কেদারা ছেঁড়া সতরঞ্চ কেনবার জন্য চাঁদা উঠাবার—যে ব্যাপারটার উপর সব ভদ্রলোকই বীতশ্রদ্ধ—দরকার নেই; নানারকম নূতন, আধভাঙ্গা এবং ভাঙ্গা যন্ত্র, তথা নাট্যগ্রন্থ এবং Billiard table থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদের কল্পিত সনাতন দাবা এবং পাশা প্রভৃতির সমাবেশ করবার জন্যও পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। কিম্বা নাটক অভিনয় উপলক্ষ ক'রে বাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বন্ধু বিচ্ছেদ এবং অবশেষে মানহানির নালিসের আশঙ্কা নেই।

এর বিপক্ষেও যে বলবার কিছু নেই, তা' নয়। প্রথমত সময় নষ্ট। তবে যাঁরা Club-এ গমনাগমন ক'রে থাকেন, তাঁদের কিছু সময় নষ্ট করবার আছেই; এবং যাঁদের একান্ত সময়াভাব তাঁরা কোন Clubই যোগ দেবেন না নিশ্চয়। আর একটা কথা, অনর্থক চিঠির কাগজ কেনার এবং ডাক মাশুল বাবদ অর্থ ব্যয় করার সার্থকতা সম্বন্ধে কেউ কেউ হয়ত সন্দিহান হ'তে পারেন; তবে এরকম ব্যয়-বাহুল্যের ফলে যে শীঘ্র দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সে আশ্বাস তাঁদের দেওয়া যেতে পারে। অথচ, সামান্য ব্যয় ক'রে যদি প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে ব্যক্তিগতভাবে কাম্‌চাটকা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ না হোক, অন্তত জামরুদ্ থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় ত' তাতে লাভ না হোক অন্তত ক্ষতি কিছু নাই। আমার প্রস্তাব আপনার বাঙ্গলা দেশবাসী পাঠক

পাঠিকাদের সমর্থনযোগ্য হবে কিনা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হলেও প্রবাসী-বাঙ্গালীদের কাছে হয়ত মন্দ লাগ্‌বে না।

অনেকদিন আগে কোথাও পড়েছিলাম কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ পুস্তকব্যবসায়ী বলেছেন, বাঙ্গলা সাহিত্য-গ্রন্থ কেনেন কেবল প্রবাসী বাঙ্গালিরা এবং বাঙ্গলার মহিলারা। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই; কারণ না ব'লে দিলেও এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝেছেন আমার বই-এর দোকান নেই। এই কথাটা যদি সত্য হয় এবং বই কেনার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চার কোনও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে, তাহ'লে স্বীকার করতেই হবে প্রবাসী বাঙ্গালিরা সাহিত্য-রসিক। তবে বাঙ্গলার বাহিরে পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও অন্যান্য স্থানে কিছুদিন কাটিয়ে এটা আমি দেখেছি যাঁরা দুই এক পুরুষে প্রবাসী হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে বাঙ্গলার যোগ দূরত্বের ব্যবধানের মধ্য দিয়ে নিবিড়তর হয়েছে। বাঙ্গলার সাহিত্য,সমাজ, মানুষ সবার সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁরা দিনের পর দিন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, হয়ত যাঁরা দেশে থাকেন তাঁদের চেয়েও বেশী। ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য। প্রবাসী বাঙ্গালীদের অনেকেই দেশের অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পত্রব্যবহার ক'রে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। এবং তৎপরিবর্ত্তে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ বাঙ্গলায় তাঁদের অন্য প্রদেশের অভিজ্ঞতার বিবরণ যে দেশবাসীদের মন্দ লাগবে না তাও আশা করা যেতে পারে।

রুচিভেদে পত্রলেখকেরা নানাবিষয়ে আলোচনা করতে পারেন—ভ্রমণ, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। আগ্রার তাজ, লক্ষ্ণৌ-এর ইমামবাড়া, দিল্লীর দুর্গের দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস, শ্রীনগরের দৃশ্য, জমরুদের বন্ধুর পথের বর্ণনায় এমন সাহিত্য-সৃষ্টি করা যেতে পারে যা কেবল চোখে দেখে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেই সম্ভব হয়। তবে এ রকম পত্র আদান-প্রদান একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হ'লেই ভাল হয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন। একজন ঘোরতর দার্শনিকের সঙ্গে একজন অসম্ভব রকমের কথাসাহিত্যিকের পত্র-ব্যবহার আরম্ভ হ'লে উভয়েরই যে বিপদের সম্ভাবনা আছে এ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। উৎসাহী সভ্যদের কাছ থেকে আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষা করার ইচ্ছাটা অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল হতে পারে।

আর একটা কথা ব'লেই আমি এ চিঠির উপসংহার করতে চাই। আমার এ চিঠিটা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করানই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনাকে একটা প্রস্তাবের পক্ষে ওকালতি করার জন্য অনুরোধ করছি মাত্র। সেটা নানা উপায়ে হ'তে পারে—যথা, আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা। অথবা আমার ideaটি আত্মসাৎ (অর্থাৎ assimilate) ক'রে একটু ভাল বাঙ্গলায় এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লেখা। তবে সব চেয়ে সোজা হবে এ চিঠিটা না প'ড়েই ছেঁড়া কাগজের বাক্সে নিক্ষেপ করা। আপনার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে আপনি যাই করুন না কেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমি বাঙ্গলার, তথা ভারতের, কোন পত্রিকারই দ্বারস্থ হবনা, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে এ প্রসঙ্গে ব'লে রাখা ভাল যে এরকম brilliant idea কার্য্যে পরিণত না করার জন্য যদি কোনও ভবিষ্যৎ Boswell আপনার অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করেন তার জন্য দায়িত্ব গ্রহণে আমি অক্ষম।

এই আলোচনার ফলে যদি আপনার অসংখ্য পাঠক পাঠিকাদের এক সামান্য ভগ্নাংশও তাঁদের মতামত আপনার কিম্বা আপনার মারফত আমায় জানিয়ে দেন তাহ'লে বাধিত হব। অনাহারি ব্যাপারটার প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হলেও, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি গঠন করার জন্য পারিশ্রমিক না গ্রহণ ক'রেই যথাসম্ভব পরিশ্রম করতে আমি প্রস্তুত আছি, যদিও আপনার সবল স্কন্ধে এ ভার অধিকতর শোভা পায়। ইতি

ভবদীয়

শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত

এমিল্ চক্

—গল্প—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেডি দামোদর

বিমল ঘোষাল সাহিত্যের ব্যাপারী।

অর্থাৎ দিনের বেলায় সারা সহর ঘুরিয়া সে খবর সংগ্রহ করে এবং রাত্রে ইংরাজী ও বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজের জন্য সেই সব খবর সুছন্দে রচনা করে এবং স্পোর্টস্ ও থিয়েটারের সমালোচনা লেখে। তাকে রিপোর্টার বলিলে সে চটিয়া তর্ক তোলে,—রিপোর্টার কি! শুধু নীরস খবরগুলাই যে লিখিয়া দেয়, সে রিপোর্টার—কিন্তু বিমল ঘোষাল সে-রিপোর্টে যে সাহিত্য-রস জোগান্ দেয়, তার তুলনা কোথায়!

বিমল থাকে পটলডাঙ্গার পিক্-মি-আপ্ হোটেলে; সংসারে তার কেহ নাই। যা রোজগার হয়, তার সবই মনের আনন্দে ব্যয় করে। তার পরিপাটী পোষাক, রূপার সিগারেট কেশ্, গোল্ডটিপ্ সিগারেট ও টিফিনের বহর দেখিয়া অপর রিপোর্টাররা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, হায় রে, যদি বিবাহ না করিতাম। আরাম তো ভারী, অনর্থক একটা কলোনি গড়িয়া...

বাহিরে বিমল একেবারে সাহেব। শুধু পোষাকে নয়, তার চলার কায়দা, ইংরাজী বলার ভঙ্গী—এ-সবই রিপোর্টার-মহলে আর পাঁচজনের ঈর্ষার সঞ্চার করে।

সন্ধ্যা ছটা বাজিয়াছে। খবরের কাগজের অফিস ঘুরিয়া বিমল আসিয়া উঠিল দীনেশের ডিস্পেন্সারিতে। দীনেশ বাল্যবন্ধু—এখন ডাক্তারীতে বেশ পশার গড়িয়া তুলিয়াছে। মট্স্ লেনের ওধারটায় তার খুব নাম-ডাক—রিপন ষ্ট্রীটের মোড়ে ডিস্পেন্সারি। সাহেব-মেমের দল তাকে খুসী রাখিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। দীনেশও পুরা সাহেব। তার স্ত্রী মেমের কাছে ইংরাজী শিখিতেছে, দীনেশের সঙ্গে বায়োস্কোপে ও পার্টিতে ঘোরে; এবং দীনেশের মেম-রোগীদের অনুকরণে তাঁর হাতে লেডিস্ ব্যাগ অবধি উঠিয়াছে—তার মধ্যে টাকাকড়ি, ছোট আয়না ও পাউডার-পাফ্ সর্ব্বক্ষণ মজুত্ থাকে।

দীনেশ এক মেম-সাহেবের সঙ্গে তার কি রোগের কথায় নিমগ্ন, বেহারা আসিয়া টেবিলে বিমলের কার্ড রাখিল। মেম-সাহেবকে বিদায় দিয়া দীনেশ ঘণ্টা টিপিল; বেহারা আসিল। দীনেশ বলিল—সেন-সাব্—

বিমল আসিয়া দীনেশের সঙ্গে দেখা করিল। দীনেশ কহিল,—কি খবর হে?

বিমল কহিল—একটু বিশেষ কাজ আছে...

দীনেশ কহিল—কি কাজ?

বিমল কহিল,—স্যার দামোদর বারিকের নাম শুনেচো, নিশ্চয়...?

দীনেশ কহিল,—ঐ যে মস্ত অয়েল-মিল-ওয়ালা...বছর দুই হলো বিলেত ঘুরে এসেচে?

বিমল কহিল—হ্যাঁ।

দীনেশ কহিল—তা...

বিমল কহিল—তাই বলচি...অর্থাৎ সেদিন টিটাগড়ে পাটের সাহেবদের যে বল্-রুম তৈরী হয়েচে, সেটা খোলা হলো। তাতে স্যার দামোদর সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন,—মানে, স্যার দামোদরই ঐ বল্-রুম তৈরীর ফণ্ডে দেড় লক্ষ টাকা দান করেচেন কি না—তা, আমি গেছলুম খবরের কাগজের তরফ থেকে...

দীনেশ কহিল,—তোমার খুব দীর্ঘ কাহিনী নাকি? তাহলে একটু বসো,—আমি ঐ সার্জ্জেণ্ট ব্যাটার্সীর ছেলেটাকে দেখে আসি। নিয়ে এসেচে এখানে...তার বুঝি ইনফ্লুয়েঞ্জা, না, হুপিং কাফ্...

বিমল কহিল,—না, না,, I shall cut quick.

সেরে নিচ্ছি হে। ফেরবার সময় টিটাগড় ষ্টেশনে wait করচি,—স্যার দামোদর সস্ত্রীক এবং সপারিষদ এলেন, সেখানে। লেডি দামোদর...ওঃ, ইয়া কালো মোটা চেহারা, তাহলে কি হয়, জুয়েলারির একটি দোকান তাঁর সারা অঙ্গে, এবং বক্ষে একটি বিড়াল...

দীনেশ কহিল—বেরাল ?

বিমল বলিল,—হাঁ হে, বেরাল। তিনি আজই না হয় মেম সাহেব হয়েচেন,—বাঙালীর মেয়ে তো···বাঙালীর মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই বিড়াল-প্রীতি আছে···স্যার দামোদর এঁকে এখনো পুরা মেম-সাহেব বানাতে পারেননি... তাহলেও পায়ে জুতা-মোজা এবং সেই জুতা মোজা-সমেত পা পর্দ্দার বাহিরেও বাড়িয়েচেন ! কিন্তু মেম-সাহেবরা কুকুর বুকে বয়ে বেড়ান, ইনি হয়তো পুরোনো প্রেজুডিসের বলে কুকুরের অস্পৃশ্যতা-দোষ ঘুচোতে পারেন নি···

হাসিয়া দীনেশ কহিল—কুকুরকে হয়তো ভয়ও করেন··· অনেক পুরুষ মানুষ যেমন কুকুরকে ভয় করে···তার উপর ছেলেমেয়ের কল্যাণে ষষ্ঠীদেবীর বাহন বলেও হয়তো বেরালের উপর...

বিমল কহিল—না, না, স্যার দামোদরের ছেলে-মেয়ে নেই···

দীনেশ কহিল—তাহলে ষষ্ঠীদেবীর কৃপা-ভিখারিণী হবার জন্যই হয়তো বা এ বিড়াল-প্রীতি !···

বিমল কহিল—কারণ যাই হোক, আমার কাহিনী ঐ বিড়াল নিয়েই···

দীনেশ কহিল—বলো তবে। আর পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে সেরে নাও···

বিমল কহিল—You are rolling in practice, I see. Lucky dog !

দীনেশ টেবিলের উপর একটা সিগারেট ঠুকিয়া হাসি-মুখে কহিল—Now to your story, please...

বিমল কহিল—তা ঐ বিড়াল-বক্ষে লেডি দামোদর প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করছিলেন ; তাঁর সঙ্গে দু'তিনটি দাসী ; ইতিমধ্যে একখানা মালগাড়ী এসে পড়লো,...তোমার কাছে গোপন করবো না,...ওঁদের দলে একটি রমণী ছিলেন,—বয়সে তরুণী কিন্তু অপরূপ সুন্দরী নন্ ! রঙ শ্যামবর্ণ, তবে পাউডার ঘসে সে-বর্ণকে আরো পাণ্ডুর করে তোলেন নি, জরিপাড় সাদা শাড়ীর পাড়টুকু মাথায় তোলা, গায়ে একটা চেষ্টারফীল্ড কোট, দুই চোখে যেন বিদ্যুতের লীলা ! লেডি দামোদরের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু দূর থেকে তিনি তাঁদেরই পানে কৌতুক-ভরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন···আমি ঐ কৌতুক-হাস্যময়ী তন্বী শ্যামাকে একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলুম···

দীনেশ কহিল,—Most unbecoming, though—ও-রকম তাকানো...

বিমল কহিল—তা ভাই, গোপন করবো না···আমি তাঁকে দেখছিলুম মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে...হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো তরুণীকে আর্ত্ত রব করে লাফিয়ে উঠতে দেখে। চমকে চেয়ে দেখি, লেডি দামোদরও দু' হাত সবলে নেড়ে নৃত্য করচেন, তাঁর সঙ্গিনী দাসীরাও সেই সঙ্গে ভীষণ কলরব তুলেচে ! স্যার দামোদরের দলও সচঞ্চল। তাঁদের ভঙ্গী লক্ষ্য করে দেখি সেই মার্জ্জার-শিশু লেডি দামোদরের বক্ষচ্যুত হয়ে রেল-লাইনে পড়ে মুষড়ে রয়েচে ! আমি তড়াক করে লাফিয়ে লাইনের উপর পড়লুম এবং বেরালটাকে তুলে নিতেই প্রচণ্ড শব্দ কানে গেল। দেখি, ঘাড়ের উপর একপাল কালো দৈত্যের মত কি যেন হুড়মুড় করে ছুটে আসচে ! চট্ করে সরে এসে চকিতে বুঝলুম, দৈত্য নয়—ওটা মালগাড়ীর এঞ্জিন ! বুকটা ধড়াস করে উঠলো... আর একটু হলেই—ওঃ···

দীনেশ কহিল –ভারী chivalric যোদ্ধা...তারপর ?

বিমল কহিল—মালগাড়ী চলে গেল। দেখি, প্লাটফর্ম্মের উপর থেকে একরাশ চোখের দৃষ্টি আমার পানে··· বেরালটাকে প্লাটফর্ম্মে ছেড়ে দিলুম -লেডি দামোদর একেবারে উচ্ছ্বাসে বিগলিত... স্যার দামোদর এসে আমার করমর্দ্দন করে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বললেন—বাঙালী যুবকগণ এমনি আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক, বাঙালীর কলঙ্ক দূর করুক···

দীনেশ কহিল—তারপর ?

বিমল কহিল,—সেই তরুণীর দিকে দৃষ্টি পড়লো। দেখি, নীরব বিস্ময়ে তাঁর দৃষ্টি ভরপুর···আমার মনে হলো, যেন

শত্রুকে হটিয়ে নিজেদের দুর্গ রক্ষা করে ফিরে এসেচি, আমি বিজয়ী সেনাপতি! আর উনি যেন রাজকন্যা দুর্গের ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে আমায় অভিনন্দিত করচেন! আমার মন জয়ের উল্লাসে ভরে উঠ্‌লো…কিন্তু এ কথা থাক্। তারপর স্যার আর লেডি দামোদর আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন, বললেন, একদিন আমায় তাঁদের ওখানে নিয়ে যাবেন…

দীনেশ কহিল,—এ কত দিনের কথা?

বিমল কহিল,—ঠিক এবার পুজোর পরেই…তা, পরশু ওঁদের বাড়ী লেডি দামোদরের জন্মতিথির উৎসব, আমায় কার্ড পাঠিয়েচেন…সান্ধ্য পার্টিতে…আমায় যেতেই হবে। মুস্কিল কিন্তু এই যে আমার ভালো চেষ্টারফীল্ডকোট্ নেই এবং অল্প অবসরে বানিয়ে নেবো, তারও উপায় নেই। কিনবো বলে দু'চারটে বিলিতি দোকানে গেছলুম, তা দেখলুম, যে রকম অগাধ মূল্য, তাতে ছোটখাট একখানা মোটর কেনা যায়…অতএব…

দীনেশ কহিল,—আমার ওভার-কোট তোমার গায়ে তো হবে না। আমি হলুম বেঁটে, মোটা মানুষ,—তোমার ঐ শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বক্ষ…

বিমল কহিল—উপায়? এর জন্য বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে যেতে পারি না, won't look nice. তা ছাড়া সাহেবী ছাঁট না হলে কোনো ওভারকোটই স্যার দামোদরের গৃহে প্রবেশ-লাভের যোগ্য হবে না…

দীনেশ কহিল—এক কাজ করতে পারো…? রাত ন'টার সময় আমার ওখানে এসো। মাতুলকে মনে আছে? আমার ছোট মামা হে…সেই যে বেজায় সাহেব…রাজ্যের কারবার্ করে বেড়ায়…সেই যে এমিল্ চক্…

বিমল কহিল,—এমিল্ চক্!

দীনেশ কহিল—অমূল্য চক্রবর্ত্তী…এক সময় ম্যাজিক দেখাবার বাতিক চাপে। ম্যাজিক শিখে কেরামতি দেখিয়ে বেড়াতো। ষ্টেজে নাম নিয়েছিল এমিল্ চক্… বাঙলা অমূল্য চক্রবর্ত্তী নামে পশার হবে না বলে। তার একটা ওভারকোট আমার কাছে আছে। সেটা র‍্যাঙ্কেনের বাড়ী থেকে তৈরী করিয়ে ছিল—প্রায় চারশো টাকা দাম পড়েছিল…সে ওভারকোট তোমায় ফিট্ করবে বেশ…

বিমল কহিল—আঃ, বাঁচালে, ভাই। সেই ওভারকোটে আমায় দিয়ো…তার…ভারী উপকার করা হবে। তার জন্য আমি একেবারে…

হাসিয়া দীনেশ কহিল,—আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না! রাত ন'টায় আমার ওখানে এসো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তন্বী শ্যামা

ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বিমল আসিয়া যখন গড়িয়া হাট রোডে স্যার দামোদরের গৃহে নামিল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তার মনের মধ্যে আশার রঙিন ফানুশ দুলিতেছিল—তারি রঙিন আলোয় চারিদিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ফটকের পরই প্রকাণ্ড লন্—আলোয় ফুলের মালায় ঝল্‌মল্ করিতেছিল। বিমলের মনে হইল, যে-বর্ণনা সে কেতাবে পড়িয়াছে, সে বর্ণনার সঙ্গে মিলাইলে ইন্দ্রপুরীর শোভাও এ-দৃশ্যের সাম্‌নে ম্লান হইয়া পড়ে। অপরূপ! সাহেব-মেম, সাহেবী পোষাক-পরা বাঙালী, পার্শী ধরণে শাড়ী-পরা বাঙালী রূপসীর মেলা! তার মনে হইল, খুশ্‌রোজের মেলার প্যাটার্ণে এ-মেলাকেও খুব ঘটা করিয়া ফুটানো হইয়াছে! স্যার ও লেডি দামোদর প্রসন্ন হাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন—মণ্ডপে গান চলিয়াছে…খানা-পিনাও অল্প-স্বল্প! স্যার দামোদরকে সে অভিবাদন করিল, লেডি দামোদরকেও। তাঁরা মৃদু একটু হাস্যে সে অভিবাদন গ্রহণ করিয়া বিমলকে আপ্যায়িত করিলেন। বিমলের প্রাণে বেদনা বাজিল,…সেদিনকার সে উপকারের বিনিময়ে কি এই মৃদু হাস্যটুকুই…

সে হতভম্বের মত ভিড়ের একদিকে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সহসা কোথা হইতে একটি মিষ্টস্বর…এই যে, আপনি এসেচেন! বিস্মিত দৃষ্টিতে বিমল চাহিয়া দেখে, সেই তন্বী শ্যামা তরুণী…!

তার বেদনা চকিতে মুছিয়া গেল।…

তরুণী কহিল—চা দিতে বলি…

বিমল আপ্যায়িত হইল। নিমেষে বয় আসিয়া বিমলের টেবিলের উপর চা ও রুটি রাখিল; তরুণী আসিয়া বলিল,—ওঃ, কি দুঃসাহসের কাজই করেছিলেন, সামনে ঐ চলন্ত ট্রেণ,…মেসোমশায় না থাক্‌লে পুলিশ আপনাকে ছাড়তো না!

মেসোমশায়! তবে ইনি স্যার দামোদরের অর্থাৎ লেডি দামোদরের ভগ্নীর কন্যা!

হাসিয়া তরুণী কহিল—মাসিমার যেমন সখ বেরাল নিয়ে মিটিংয়ে যাওয়া…

একটি-দুটি কথা সুরু হইল। বিমল পরিচয় দিল, সে বাংলা কাগজে বহু সরস নিবন্ধ লেখে, থিয়েটারের অভিনয়ের সমালোচনা লেখে। ধাঁ করিয়া সে তরুণীকে প্রশ্ন করিল—আপনি ইটালিয়ান অপেরা দেখেচেন? মানে, তাদের অভিনয় …?

তরুণী কহিল—দেখিনি।

বিমল কহিল—আহা! দেখেন্‌নি! চমৎকার! এই যে 'টকি', এ দেখেচেন, নিশ্চয়!…

তরুণী কহিল—ঐ ছবিতে কথা কয় …?

বিমল কহিল—হাঁ…

তরুণী কহিল—একদিন গেছলুম মাসিমার সঙ্গে। ছবিখানি বেশ। তা মাসিমার পছন্দ নয়, মাসিমা তো ইংরাজী জানেন না…

বিমল কহিল—তাই! ওঃ! তা আপনি নিশ্চয় ইংরাজিটা ভালোই জানেন। আপনি বার্ণার্ড-শর লেখা পছন্দ করেন?

নত মুখে কুণ্ঠিত স্বরে তরুণী কহিল—আমি ইংরাজী জানিনা তো…

বিমল যেন এতটুকু হইয়া গেল! বেকুবের মত এ-প্রশ্নে তাহা হইলে তো সে এঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছে! এ ত্রুটি…

তাড়াতাড়ি সে কহিল—দেখুন, তা যদি বলেন, আমার নিজের মত হলো এই যে ইংরাজী শিক্ষার আমাদের দেশে কুফলটাই বেশী ফলচে। আমাদের সেই সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা এখন যে এই দুঃসহ জটিল হয়ে উঠচে, এ শুধু ইংরাজী শিক্ষার ফলে। পুরুষকে নিরুপায় হয়েই ইংরাজী শিখতে হয়। কিন্তু মেয়েদের অন্তরে ও বিষ না দেওয়াই ভালো। আমাদের অন্তঃপুরের শুচিতা তাতে…

তরুণী কহিল—মাসিমা সেদিন বাড়ী এসেও আপনার কথা বলছিল। আপনার কি অদ্ভুত সাহস! ঐ বেরালটাকে উনি ভালো বাসেন কি না! ঐ বেরালটার মার মা, মানে… ওরা তিনপুরুষ মাসিমার কাছে মানুষ যে!

বিমল কহিল—বটে! তা সেটা কোথায়? আমার বড় দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে! বেরাল হলে কি হয়, জীবন্ত প্রাণী তো! তার প্রাণের দাম মানুষের প্রাণের দামের চেয়ে এক কড়ি কম নয়।

তরুণী কহিল,—আপনি বুঝি জন্তুজানোয়ার ভালো বাসেন খুব?

বিমল কহিল,—খুব। পথ থেকে কত বেরাল কুকুর কুড়িয়ে এনেচি! এই সেদিন…একটা কুকুর মোটর চাপা পড়লো। মরেনি, একটা পা ভেঙ্গে গেল। আমি তাকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি করে তখনই বেলগেছের হাসপাতালে গেলুম। মাসখানেক সেখানে থেকে কুকুরটা সারলো; তবে খোঁড়া হয়ে রইলো। সে কুকুর আমার কাছে আছে। অবোলা প্রাণী…আহা! মুখে দুঃখ-বেদনা জানাতে পারে না! তা ব'লে আমরা ব্যথা বুঝে তাদের পানে চাবো না!

তরুণী কহিল,—আমার কিন্তু ভারী বিশ্রী লাগে। কেন, বলুন তো? কেবল ভাবি, কখন আঁচড়ে দেবে…এই ভয়েই সারা হলুম। মাসিমা ঐ বেরালকে আদর করে নাচায়, আমি কিন্তু নিতেও পারি না। একবার আমার একটা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছিল, নখ দিয়ে আঁচড়ে…

কুকুর-বিড়ালের যে-প্রসঙ্গ একটু পূর্ব্বে অপূর্ব্ব সুধারসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তরুণীর এ-কথায় তা নিমেষে কদর্য্য কুৎসিত ঠেকিল। বিমল কহিল,—তা, যা বলেচেন; বড় বেইমান কিন্তু! মানুষের আদর বোঝে না। তাছাড়া সর্ব্ব রোগের বাহন হলো বেরাল। ডিপথিরিয়া রোগের ডিপো!

শিহরিয়া তরুণী কহিল,—বলেন কি?

বিমল কহিল,—হ্যাঁ! তাই আমি ভাবি, এই বেরাল

এমন রোগ নেই, যা বয়ে আনে না...অথচ শিশুদের পালন-দেবী ষষ্ঠীর বাহন যে আমরা কেন ওকে বলি! মহিষকে যমের বাহনগিরি থেকে ছাড়িয়ে বেরালকে তার জায়গায় বাহাল করলে যোগ্য যোগ্যেন সযোজয়েৎ হয়! মহিষ তো ভালো! ওর ঐ শিঙেই যা ভয়...শিঙে কিন্তু বহু জিনিষ তৈরী হয়! তার উপর দুধ? মহিষের দুধে যেমন ঘি পাওয়া যায়, তেমনি তা পরিপাক করতে পারলে শরীরে অসুরের বল হয়!

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় দুই চোখের দৃষ্টি ভরিয়া তরুণী কহিল,—আপনি অনেক কথা জানেন তো...আপনি খুব পণ্ডিত, না?

বিমল কহিল,—পণ্ডিত ঠিক হতে না পারি...তবে পড়াশুনা করেচি বিস্তর...মানে, আমার বাসনা আছে, জীব-জন্তুর সাইকলোজি ভালো করে বুঝিয়ে একখানি উপন্যাস লিখবো। তাতে শুধু মানুষের মনের পরিচয়ই নয়, জন্তু-জানোয়ারের মনস্তত্ত্বের পরিচয় অবধি সকলকে জানিয়ে দেবো···

তরুণী কহিল—উপন্যাস? ঐ বঙ্কিমবাবু যেমন বই লিখে গেছেন?...

বিমল কহিল—বঙ্কিমবাবু! তাঁর বই আপনি পড়েচেন?

তরুণী কহিল—পড়েচি। আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর...

বিমল বলিল—রবিবাবুর বই পড়েচেন?

তরুণী কহিল—পড়েচি। তাঁর গোরা, চোখের বালি, ছোট ছোট গল্প, কবিতা, গান...

বিমল কহিল—আপনি তাঁর গান গাইতে পারেন, নিশ্চয়?

তরুণী কহিল—দু-একটা। কে বা শেখাবে! মাসিমা শুনতে চায়, নিজের খুসী-মত এমনি গাই···

বিমল কহিল—একদিন যদি তেমন সৌভাগ্য হয়, তাহ'লে গান শোনার প্রার্থনা জানাবো।

তরুণী কহিল—তার আর কি! শুনবেন? তা চলুন... তাহ'লে ও-ঘরে কিন্তু...তার আগে দাঁড়ান,...মাসিমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েচে? মাসিমা আমায় বলে ছিল... আপনি এলে যেন আপনাকে দেখাশুনা করি...তিনি হয়তো ব্যস্ত থাকবেন···

বিমল কহিল—তিনি ব্যস্তই আছেন, তাঁকে আর... তাছাড়া দেখা হয়েচে তাঁর সঙ্গে···

তরুণী কহিল—বোধ হয় খেয়াল হয়নি এদিকে! আমি মাসিমাকে বলে আসি।

তরুণী চলিয়া গেল।—বিমল তার পানে চাহিয়া স্তব্ধ বসিয়া রহিল।—কি সারল্য ও চিত্তে! নেহাৎ যেন বালিকা! বয়সে তরুণ হইলেও মন পাকে নাই! কথাগুলির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নাই। এ-সমাজে যে বস্তু একান্ত দুর্লভ... অন্ততঃ বিমলের তাই ধারণা! হয়তো, গরীবের মেয়ে, বড়মানুষ-মাসির আদরে চিত্তটুকু এখনো সরল, অমলিন রহিয়াছে! অহঙ্কারের কালি কোথাও লাগে নাই...

তরুণী ফিরিয়া আসিয়া কহিল—মাসিমা বললেন্, যত্ন করিস্ মা···সেদিন আমার মেকুকে যে-ভাবে বাঁচিয়েচে... মেকু তো গেছলোই। বিমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তরুণী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া কহিল,—আপনি বুঝতে পারচেন না! মাসিমার সে বেরালের নাম হলো মেকু...

হাসিয়া বিমল কহিল—ওঃ!

তরুণী কহিল—আসুন...ঘরে। কত লোক কত কি দিয়েচে, দেখবেন, আসুন...!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বড়র প্রেম

মস্ত ঘর। একটা টেবিলের উপর রাশীকৃত ফুল...মালা, তোড়া, সাজি গন্ধে ঘরের বাতাস মশগুল! ফুলে টিকিট আঁটা,—কে কি দিয়াছে! তাছাড়া রূপার ফুলদানি, রেকাব, ট্রে, পাউডারের কৌটা প্রভৃতি অজস্র।

বিমল কহিল—এঃ, আমি তো কিছু আনিনি! যাই, ফুল কিনে আনি গে...

তরুণী কহিল—আবার কোথায় যাবেন এখন? আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলিয়া তরুণী একটা অপরূপ সাজি হইতে কার্ডখানা ফেলিয়া দিয়া বিমলের পানে চাহিল;

কহিল—আপনার নাম-লেখা কার্ড নেই সঙ্গে ?

বিমল কহিল,—আছে।

—একখানা দিন আমায়।

বিমল একটা কার্ড দিল। তরুণী সেটা পিন্ দিয়া সাজিতে গাঁথিয়া কহিল,—আপনি এখানে বসুন...আমি আসচি।

সাজিটা হাতে করিয়া তরুণী ঘরের বাহিরে গেল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—মাসিমাকে বললুম, আপনি এনেচেন। মাসিমা খুসী হলো বেশ. .

বিমল কহিল—কিন্তু এ অন্যায় হলো না ?

তরুণী কহিল—অন্যায় আবার কি! কি হবে বলুন তো এত ফুলে ? এ সব বড়মানুষী চাল! কাল সকালে এত টাকার জিনিষ...টেনে পথে ফেলে দেওয়া হবে, জঞ্জালের সঙ্গে। আমার গা কর্‌কর্ করে। এই পয়সায় কত লোকের মুখে অন্ন দেওয়া যেতো, ভাবুন...

বিমলের চিত্ত শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। এমন মমতা এঁর প্রাণে! সাহেবী-পোষাক-পরা আরো দুই চারিজন ভদ্রলোক ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। বিমল মুষড়াইয়া গেল।

তরুণীকে দেখিয়া একজন ভদ্রলোক কহিলেন,—এই যে, রাজু এখানে। একটি উপকার করো...

তরুণী কহিল,—কি, বলুন ?

তিনি কহিলেন,—আমাদের দুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। তাড়া আছে।

—বসুন। ব্যবস্থা করি। বলিয়া তরুণী ওরফে রাজু চলিয়া গেল।

বিমল ভাবিতে লাগিল—রাজু! তার অর্থ? রাজেন্দ্রাণী ? না! তবে ? রাজবালা ? বোধ হয়। সেকেলে নাম! তা হোক, এই নামই ইহাকে ঠিক মানায়! রাজার মেয়ের মতই মন, বটে! সেদিনকার সেই দুর্গ-জয়ের স্বপ্ন-কথা মনে পড়িল! সেই দৃষ্টির জয়-মাল্য! সে ঠিক রাজকন্যারই যোগ্য!

রাজু ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—আসুন আমার সঙ্গে। আপনিও আসুন...

রাজু তাঁদের সকলকে আনিয়া পাশের ঘরের টেবিলে বসাইল। বয় আসিয়া পরিবেষণ করিল ..

খাওয়া-দাওয়া চুকিলে আগন্তুক তিনজন বিদায় লইলেন। বিমল আরাম পাইয়া কহিল,—আপনার গান শোনা...

—আসুন...বলিয়া রাজু বিমলকে ড্রয়িংরুমে আনিল। আনিয়া কোনো ভূমিকা না ফাঁদিয়া নিঃশব্দে প্রকাণ্ড হার্ম্মোনিয়মের সাম্‌নে বসিল, বসিয়া গান ধরিল—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল-ধরণী,
জনক-জননী-জননী!

সহসা ওদিকে একটা কলরব···কোলাহল, ছুটাছুটি! ব্যাপার কি ? গান থামাইয়া তরুণী ছুটিল। কলরবের মাত্রাও বাড়িয়া চলিল। রাজু তখনি ফিরিল,—তার মুখে আতঙ্কের ছাপ! বিমল কহিল,—কি হয়েচে ?

রাজু কহিল,—মাসিমার মুক্তোর নেকলেস্ হারিয়েচে। আজই মেসোমশায় সে-নেকলেস্ কিনে দিয়েচেন। দাম পাঁচ হাজার টাকা।

বিমল কহিল,—বলেন কি! চুরি নয় তো ?...

—কে জানে!...কি হবে ?...রাজু কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমল কহিল,—কাঁদবেন না। কি হয়েচে, সব শুনি। বিমল অগ্রসর হইল।

বাহিরে হুলস্থূল কাণ্ড! সদরের ফটক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সাহেবী-পোষাক-পরা ভদ্রলোক বজ্র-স্বরে হাঁকিলেন,—যে যেখানে আছো, দাঁড়াও...সকলের পকেট তল্লাস হবে...স্যার দামোদর, আপনি কাকেও আদেশ করুন। এতে সকলের সাহায্য দরকার। আশা করি, কারো আপত্তি হবে না ..

সমস্বরে সকলে কহিলেন—না...

মন্ত্র-চালিতের মত বিমল নিজের ওভারকোটের পকেটে হাত পুরিল।...এ কি ? কতকগুলা কি মুক্তার মতই ঠেকে যে! বিমল কাঠ হইয়া দাঁড়াইল।

মিষ্টার রয় একজন সুদক্ষ পুলিশ-কর্ম্মচারী। তিনি তালাসী সুরু করিলেন। সকলেই পকেট দেখাইতে লাগিলেন...এবার বিমলের পালা...

মিষ্টার রয় কহিলেন,—আপনি...?

কাতরভাবে বিমল কহিল,—আমায় ক্ষমা করুন... আমি এ বিষয়ের কিছু জানি না। আমি এখানে ছিলুমও না, ড্রয়িংরুমে ছিলুম।

রয় সবিস্ময়ে কহিলেন,—কেউ তো আপত্তি করলেন না, মানী সকলেই এঁরা কেউ চুরি করেননি অবশ্য।

বিমলের মুখ পাণ্ডাস্ হইয়া গেল। সে কহিল,—কিন্তু...

স্যার দামোদর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাঁকিলেন,—কে তুমি? অচেনা লোক, দেখচি!

অচেনা লোক! বিমল চারিদিকে চাহিল...ঐ লোকারণ্য নিমেষে যেন মহাসমুদ্রে রূপান্তরিত হইল! সে সমুদ্র বিপুল তরঙ্গে ক্রমে সংক্ষুব্ধ...সে তরঙ্গ উত্তাল হইয়া তার দিকেই অট্টহাস্যে ঐ ছুটিয়া আসে...সে তরঙ্গরাশির মধ্যে ঐ ছুটী চোখে কি ও কাতর করুণ দৃষ্টি ..ও রাজু! ঐ যে... ও-দৃষ্টিতেও দ্বিধা? সংশয়? বিমল কম্পিত কাতর কণ্ঠে কহিল,—এই দেখুন...কিন্তু এ সব কি করে কোথা থেকে এলো, আমি জানিনা...

পকেট উল্টাইতে মুক্তার-মালা, ব্রুচ, মোহর, তাস, বোতাম প্রভৃতি বাহির হইল।...রয় ক্ষিপ্র হস্তে সেগুলা গ্রহণ করিলেন। মুক্তার নেকলেসও—এই যে···

সকলে রুদ্র দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। রয় তার পকেটে হাত পুরিয়া দিলেন। স্যার দামোদর মুক্তার নেকলেস হাতে লইলেন...এত লোকজন...সকলে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া! চারিদিকে অত কলরব...নিমেষে স্তব্ধ!...

রয় বিমলের পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া পড়িলেন,—এমিল্ চক্, ম্যাজিসিয়ান...

বিমলের পানে চাহিয়া রয় কহিলেন,—তুমি অমূল্য? না...আমি তাকে জানি। এই এমিল চক্ হলো অমূল্য চক্রবর্ত্তী...ওঃ,...এগুলো ঝুটো। এ-সব নিয়ে সে ম্যাজিক দেখাতো—ও নেকলেসটা তাহলে...

স্যার দামোদর কহিলেন,—ঝুটোই...

রয় কহিলেন,—এমিল চক্ সেজে এসেচে...এর মতলব তাহলে সাধু নয়। এর দলের আর কেউ তাহলে...ফটক বন্ধ আছে তো? অল্ রাইট্। He is arrested on suspicion—Section 54 C. P. C.

রাজু মুহূর্ত্তে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল, কম্পিত উত্তেজিত স্বরে কহিল,—এ অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়! একজন ভদ্দর লোককে নিমন্ত্রণ করে এনে এ-ভাবে অপমান করা...

স্যার দামোদর কহিলেন,—কিন্তু কে এ...?

রাজু কহিল,—চেনেন না? ইনি সেদিন সেই রেল লাইনের উপর থেকে মেকুকে...

লেডি দামোদর কহিলেন—ঠিক! আপনারা ভুল করচেন...

রয় কহিলেন—কিন্তু ব্যাপার যে আগাগোড়া সন্দেহজনক। এই এমিল্ চক্ সেজে আসা...

আবার কলরব...চারিদিকে দুশ্চিন্তার তরঙ্গ বহিল।...

রয় কহিলেন—আপনি কোন কোন্ ঘরে গেছলেন?...

লেডি কহিলেন—ঠিক! একবার বাথরুমটায়...

রাজু ছুটিল...সঙ্গে আরো দু-চারিজন...

এই যে···বাঃ! ওয়াশ,-ষ্ট্যাণ্ডের কলের মুখে দুলিতেছে...

লেডি দামোদর কহিলেন—মুখ ধুচ্ছিলুম। তখন খুলে ওখানে রেখেছিলুম, তারপর ভুলে গেছি...

স্যার দামোদর বিমলের হাত ধরিয়া কহিলেন—কিছু মনে করো না, বাবা···

রয় কহিলেন—কিন্তু এমিল চকের...জামা এঁর গায়ে! আর এ-সব জিনিষ...? হয়তো এমিল চক্ সেজে কাকেও ঠকাবার...

বিমল প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,—এ জামা আমার নয়। আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করেচি। দীনেশ ডাক্তার। অমূল্য চক্রবর্ত্তী দীনেশের মামা।

—My god! বলিয়া রয় হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগে তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

স্তম্ভিত দর্শকমণ্ডলীর মুখে হাসির একেবারে নায়েগ্রা ঝরিল।

বিমলের চোখের সামনে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। পায়ের তলার মাটী যেন ফ‍ুঁকাক হইয়া গেল...আর সে নামিয়া চলিল একেবারে নীচে, বহু নীচে, সুগভীর কোন্ অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুর্গ জয়

দু'দিন বিমল ঘরের বাহির হইল না; চিঠি পাঠাইয়া অফিসে ছুটী মঞ্জুর করিয়া লইল।

সেদিন রবিবার। সকালে উঠিয়া প্রথম সে যেন আজ রৌদ্র দেখিল! হতভম্বের মতই বসিয়া ছিল, সামনের টেবিলে চা...ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; পান করে নাই। চায়ের পেয়ালার দিকে তার হুঁসও নাই!

একটা বেয়ারা আসিয়া একখানি চিঠি দিল। বেহারার মাথায় মস্ত শাদা পাগড়ি...তার উপর পিতলের হরফ আঁটা—D.

চিঠি লইয়া বিমল পড়িল। স্যার দামোদর লিখিয়াছেন,—

বিমল বাবু

গাড়ী পাঠাইলাম। এখনি আসিলে আমরা বড় আপ্যায়িত হইব। সেদিনকার লজ্জা-লাঞ্ছনার জন্য ক্ষমা করিবেন।

দামোদর বারিক

শুনিয়া আবার সজীব রঙীন হইয়া উঠিল! পাশের বাড়ীতে একটা ময়না খাসা বুলি ধরিয়াছিল! বাঃ! ফুলের গন্ধে বাতাস আবার মশ্‌গুল যে! বিমল ক্ষিপ্র বেশভূষা সারিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

স্যার দামোদরের সেই গৃহ। না হোক, আজ ভিড় নাই, কোনো কলরবও নাই।

লেডি দামোদর কহিলেন—এসো বাবা...

সে-স্বরে কি মমতা-মায়া! নারীর যা একান্ত নিজস্ব...

স্যার দামোদর কহিলেন,—তুমি লিখিয়ে?

সলজ্জ ভঙ্গীতে বিমল কহিল,—আজ্ঞে, আমি লিখি।

স্যার কহিলেন,—ইংরিজিতেও লেখো তো?

বিমল কহিল,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

স্যার কহিলেন,—বেশ। আমি একটি সেক্রেটারী খুঁজছিলুম···চিঠিপত্র লিখতে হবে, ইংরিজিতে। তা তুমি কি মাইনের বলে এখানে আমার কাছে...?

বিমল কহিল,—আমি দুশো টাকা পাই।

—বিবাহ করেচো?

—না।

—বিবাহ করলেও মাহিনায় কুলোবে না। তা আমি আপাততঃ তিনশো করে দেবো...তারপর বিবাহ হ'লে পাঁচশো।...আমার সেক্রেটারী—আর জেনারেল ম্যানেজার ...কি বলেন?

লেডি কহিলেন—তুমি ব্রাহ্মণ,—না?

বিমল কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষাল...

স্যার কহিলেন—গোঁড়া?

বিমল হাসিল, কহিল—না।

স্যার কহিলেন—এখানে থাকতে আপত্তি আছে? আলাদা ঘর পাবে...

বিমল কহিল—কিছুমাত্র না।

লেডি কহিলেন—সেদিন থেকেই মনে কেমন মায়া জন্মেচে, বাবা! যে দুর্জ্জয় সাহসে মেকুকে বাঁচিয়েছিলে, তার খুব শোধ দিয়েচি সে রাত্রে অপমান করে...

কুণ্ঠা-ভরে বিমল কহিল,—আজ্ঞে না, তার জন্য আমি দুঃখিত নই।

লেডি কহিলেন,—বলতে পারি না, কিন্তু সাধ হয়, আমার ঐ বোন-ঝী রাজুটিকে...ওর সব ভার আমাদের কি না...তা, মেয়েটি ময়লা...এই যা! নাহ'লে গুণে...

বিমলের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল...রাজুকে...? বারিক কি জাত? যে-জাতই হোক্ ..কি তাহাতে আসিয়া যায়! সে জাত মানিবে না!

লেডি কহিলেন,—ও বামুনেরই মেয়ে, বাবা। বেশ ভালো বামুন। পাশের বাড়ীতে থাকতো—কেউ নেই—আমিই মেয়ের মত মানুষ করচি...খাওয়া-দাওয়া? বামুনে রাঁধে, তার রান্নাই খায়। তবে, মেয়ের মতই গেঁথে গেছে বুকের মধ্যে...

রাজু আসিয়া ডাকিল,—মাসিমা...

—এই যে রাজু...আয় তো মা...চেয়ে ত্যাখো দিকিন্ বাবা। রঙ ময়লা একটু নাহ'লে চোখ-মুখ...খাসা নয় কি?...

বিমল চাহিল, রাজুও চাহিল; চারিচক্ষে মিলন হইল। দু'জনের মুখে অমনি হাসির মৃদু ঢেউ...!

রাজু কহিল,—ঠাকুর বলচে, কি বিমল বাবুর ভাত বাড়বে?—বাড়ুক।...

ফিরিবার সময় বিমল পাকা কথা দিয়া গেল, চাকরির সম্বন্ধে...

আর লেডি দামোদরের যদি মত থাকে, রাজুর সম্বন্ধেও...বেশ!...এ তো মস্ত অনুগ্রহ! তারো কেহ নাই...মন কি-স্নেহের ভিখারী!

হাসিয়া লেডি দামোদর কহিলেন,—বড় খুসী হলুম বাবা। কালই তাহ'লে চলে এসো...

—নিশ্চয়।...

সে রাত্রে মেশের শয্যায় পড়িয়া বিমল স্বপ্ন দেখিল, সে যেন কোথাকার দুর্গ জয় করিয়া টিটাগড়ের ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর চলন্ত এক ট্রেণের কামরায় রাজেন্দ্রাণী-বেশে রাজু...রাজুর হাতে ফুলের মালা! রাজুও স্বপ্ন দেখিতেছিল, ফুলের মালা গাঁথিয়া মেকুকে ধরিয়া সে-মালা যেমন সে মেকুর গলায় পরাইবে, অমনি বিমল কোথা হইতে আসিয়া মেকুর মালা কাড়িয়া নিজের গলায়...

...রাজুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিস্ফারিত চক্ষে সে শয্যায় উঠিয়া বসিল...মুখে হাসির রেখা...ভাবিল, ভারী মজার স্বপ্ন তো! বাঃ!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংগ্রহ

বর্ত্তমান আবিসিনীয়া

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে যে সকল দেশ এখনও অনাবিষ্কৃত আছে বা যেখানে এখনও ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, আবিসিনীয়া তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আবিসিনীয়ার নাম ইতিহাসে ও

একটি আবিসিনীয় পল্লী

গল্পে সুপরিচিত, কিন্তু সে পরিচয় যতই বিস্তৃত হউক, আবিসিনীয়া দেশের খুব সামান্য অংশের সহিতই সভ্যজগতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আবিসিনীয়ার মধ্যে এমন সব স্থান এখনও আছে, যেখানে কোনো সভ্যদেশের মানুষ কখনও পদার্পণ করে নাই। আবিসিনীয়ার বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রহস্যাবৃত ভূভাগ তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে, সকল প্রকার বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতেই এই দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাপ্রিয় শক্তি তাহাদের স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছে। আবিসিনীয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে সে দেশের গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয়, ইউরোপীয় কোন গভর্ণমেণ্টের সম্মতি অসম্মতি সেখানে খাটে না।

আবিসিনীয়ার ইতিহাস ইজিপ্ট অপেক্ষা কম পুরাতন নয়, কিন্তু ইজিপ্টের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপাদান সে দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো আছে, কিন্তু আবিসিনীয়ার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। বহু পুরাতন হইলেও এখানে ইতিহাসের কোনো উপাদান পাওয়া যায় না। এরূপ অনুমান করা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে জুডিয়া ও এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম অংশ হইতে এই দেশে একদল লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, বর্ত্তমান আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ এই প্রাচীন জুডিয় জাতির বংশধর। কতকাল পূর্ব্বে এই জাতি আবিসিনীয়ায় আসে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসরে এ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কেহ আবার এই তারিখ অত্যন্ত কাছাকাছি আনিয়া ফেলিতে চান। বর্ত্তমান আবিসিনীয় জাতির মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারা

বাইবেলে বর্ণিত রাজা সলোমনের বংশধর। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই জাতির ভাষা, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে একমাত্র এই দেশেই অতীতকালের সমুদয়

পথের ধারে ফাঁসি-কাঠ

বিচার-নিষ্পত্তির জন্য আবিসিনীয়ায় কোন বিচারালয় নাই। পথের ধারের গাছতলাতেই বিচারক বসিয়া বিচার করেন ও পথের ধারেই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়া যায়।

চিহ্ন বজায় রাখিয়া কৌতূহলপ্রদ মিউজিয়মের মামির মত অবস্থান করিতেছে। আবিসিনীয়ার চারিপার্শ্বেই নিগ্রোজাতির বাসস্থান এবং বহুশতাব্দী ধরিয়া দাসপ্রথার ফলে কিছু নিগ্রোরক্ত যে ইহাদের মধ্যে না প্রবেশ করিয়াছে এমন নয়, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা নিগ্রো নয় বা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া নিগ্রো আচার ব্যবহারও গ্রহণ করে নাই।

আবিসিনীয়ায় এক ধরণের প্রাচীন সেমিটিক ভাষা এখনও ব্যবহৃত হয়, যদিও প্রদেশ ভেদে ও সামাজিক স্তরভেদে নানাপ্রকার প্রাদেশিক ভাষাও প্রচলিত আছে। আবিসিনীয়ার ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় গিজ্ ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারেন বটে, কিন্তু এ ভাষা সাধারণ লোকের কথিত ভাষা নহে।

এদেশের বর্ত্তমান ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিকের রাজত্বকাল হইতে। ইনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ কলহ মিটাইয়া বিভিন্ন যুধ্যমান প্রদেশকে একীভূত করেন ও প্রত্যন্ত সীমান্ত অসভ্য নিগ্রোদিগকে

গাছের তলায় ডালে বন্য-পক্ষীর বাসা ও বন্য-মৌমাছির মধু-চক্র

স্ববশে আনয়ন করেন। ইঁহার সময়েই প্রথমে এদেশে রেলওয়ে পত্তন হয় ও নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু গৃহ বিবাদের ফলে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার সকল তাঁহার জীবিতকালে ফলপ্রসূ হয় নাই।

আবিসিনীয়ায় এখনও দাসপ্রথা প্রচলিত আছে। যদিও বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট এই কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট, তবুও এমন মনে হয় না যে, দাসপ্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া

হইবে। বহু শতাব্দীর আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও প্রবাদের ফলে দাসপ্রথা ইহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ইহার মূল উৎপাটন করিতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইবে।

আবিসিনীয়ায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত আছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা খৃষ্টান। ইহাদের ধর্ম্ম খৃষ্টীয় কাপ্‌টিক শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইজিপ্টেই এই শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে ইজিপ্ট হইতে কাপ্‌টিক খৃষ্টধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত হয়।

এতকাল ধরিয়া এদেশে যাতায়াতের পথ সভ্যজাতির পক্ষে আদৌ সুগম ছিল না। ইহারা বৈদেশিকগণকে বিশ্বাস করে না, সুবিধা পাইলে মারিয়াও ফেলে। অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এইভাবে বে-ঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের প্রধান নগর জিবুটি হইতে আবিসিনীয়ার রাজধানী আদিস্ আবেবা পর্য্যন্ত ছোট রেলপথ খোলার পর হইতে বৈদেশিকগণের পক্ষে এদেশে ভ্রমণকার্য্য অনেক সহজ হইয়াছে। আদিস্ আবেবা চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র পাহাড়বেষ্টিত সহর, জল হাওয়া খুব ভাল, বেশী ঠাণ্ডাও নয়, বেশী গরমও নয়। আদিস্ আবেবার রাজপথে সব রকম পোষাক পরিহিত মানুষই দেখিতে পাওয়া যায়, রক্তবর্ণ ফেজ্ মাথায় আরব হইতে ইহুদী, নিগ্রো, মিসরীয় ও ইউরোপীয় পোষাক-পরা শ্বেতকায় ভদ্রলোক পর্য্যন্ত।

আদিস্ আবেবার রাজপথ সমূহ বেশ চওড়া কিন্তু ভারী আঁকা বাঁকা—সহরও খুব ছড়ানো। অধিকাংশ বাড়ীই খড়ের চাল ও মাটীর দেওয়াল, বাজারের মধ্যস্থলে দু'চারখানা টিনের বড় বাড়ী আছে। মোটরগাড়ীর আমদানী নিতান্ত কম নহে, প্রায় তিন চার শত মোটরগাড়ী এক আদিস্ আবেবার রাজপথে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে ভাল রাস্তা না থাকিবার দরুণ মোটরগাড়ীর প্রচলন সহরের বাহিরে এখনও তেমন হয় নাই। ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তুর্কী, ভারতবাসী হিন্দু ও আর্ম্মেনিয়ানই বেশী।

মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান যুগ উভয়কেই আদিস্ আবেবার রাজপথে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে সারি বাঁধিয়া ভারবাহী উষ্ট্র ও অশ্বতরের দল চলিয়াছে, গর্দ্দভ-বাহিত স্প্রিংবিহীন গাড়ী বিকট আওয়াজে রাজপথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে আবার ফোর্ড মোটরের হর্ণ শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যার পর কিন্তু রাজপথে লোক চলাচল করিতে পারে না, কারণ পথে আলোর কোনো ব্যবস্থা নাই। পাছে অন্ধকারে চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি হয় এজন্য আইনানুসারে রাত্রিতে পথে কেহ বাহির হইতে পারে না।

একটি পুরাতন আমলের লাইব্রেরী

প্রাচীন ঘিজ্ ভাষায় লিখিত বহু হাতের লেখা পুঁথি এই পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। পুঁথিগুলি কাঠের পাটা ও ভেড়ার চামড়ায় বাঁধা।

বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে এ আইন বলবৎ নয় বটে কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির কুকুরের ভয়ে নিতান্ত দরকারী কার্য্য না থাকিলে কেহই বড় একটা এ সময়ে বাড়ীর বাহির হয় না। নিকটবর্ত্তী পাহাড় সমূহের বন হইতে চিতাবাঘও সময়ে সময়ে রাত্রে সহর পরিদর্শনে আসিয়া থাকে।

সহরের বাহিরে কাহারও ধন প্রাণ নিরাপদ নহে। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দেশে পূর্ণ শান্তি নাই, দস্যুদলের উপদ্রব সর্ব্বত্রই অত্যন্ত বেশী। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে. ধনী লোকে সঙ্গে সময়ে সময়ে দুই

তিনশত অস্ত্রধারী অনুচর লইয়া চলে, সাধারণ গৃহস্থ শ্রেণীর লোকেও তুই তিনজন লোক সঙ্গে না লইয়া পথ হাঁটে না। তবে দস্যুরা প্রায়ই বৈদেশিকগণকে কিছু বলে না,' কারণ তাহারা জানে ইহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে অন্য কোনো গবর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক গোলযোগে পড়িবার ভয়ে পুলিশ যে কোনো উপায়ে হউক অপরাধীদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিবে।

আবিসিনীয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। বনাচ্ছাদিত পাৰ্ব্বত্যভূমি, তৃণপূর্ণ উপত্যকা, হ্রদ, নদী, পর্ব্বতকন্দর ও canyon, বড় বড় নির্জ্জন মাঠ—দেশের সর্ব্বত্র এমন ছড়ানো আছে যে, কোনো একটা দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখিতে হয় না, এক ঘেয়ে মনে হয় না। আধুনিক সভ্যতা বিস্তার না হওয়ার দরুণ চওড়া রাস্তা নাই, মাঠের মধ্যে বেড়া নাই, টেলিগ্রাফ লাইন নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই—চারিদিকে হাস্যময়ী প্রকৃতির মুক্ত অবাধ লীলা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ভাসন্ত মন্দিরের কাহিনী

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

গত অক্টোবর মাসের "ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্ রেল্‌ওয়েষ্ ম্যাগাজিন্"-এ শ্রীযুক্ত ইউ, সি, চোপ্রা ব্রহ্মদেশের একটী

[বর্ত্তমান আবিসিনীয়া]
একদল চিল

সুন্দর ভাসন্ত মন্দিরের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ষা-অন্তে ব্রহ্মদেশে এক উৎসব হয়, তার নাম "থান্‌ডিডিউট্"। ইংরেজী অক্টোবর মাসেই প্রায় এ উৎসব হইয়া থাকে। এইটা হইতেছে ব্রহ্মবাসীদের সব চেয়ে বড় পরব্। সব বড় বড় উৎসবেই ভোজের দিনে ব্রহ্মবাসীরা বাঁশ আর রঙীন্ কাগজ দিয়া পথের দুইধার সাজায়, মাঝে মাঝে তোরণ তৈরি করে; পুরোহিতেরা হলদে-কাপড়ে সাজিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতে আসেন;—রঙে-রঙে চারিদিক্ রঙীন্ হইয়া ওঠে।

থান্‌ডিডিউট্ উৎসবে আবার মাঝেমাঝে খোলা জায়গায় কাগজে তৈরি নানান্ মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়,—কত অদ্ভুত ড্রাগনের, অদ্ভুত সব রাজারাণীর, আরো কতকি মূর্ত্তি!

সন্ধ্যাবেলায় সারা-আকাশে রঙ্‌বেরঙের ফানুষ উড়িতে থাকে। সুন্দর সুন্দর ভেলায় প্রদীপমালা সাজাইয়া নদীতে বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ভেলা-গুলির আকার-প্রকার অনেকরকমের হইলেও প্রায় সবই ছোটছোট 'প্যাগোডা' বা ব্রহ্মের বৌদ্ধমন্দিরের আকারের।

"সেবার্ মৌল্‌মেনের কাছাকাছি সাগর-উপকূলের এক গ্রামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। নানান্ রঙের

ঝল্‌মলে রেশ্‌মী পোষাকে সাজিয়া অসংখ্য নরনারী আসিয়া সাগর-কূলে দাঁড়াইয়াছে। সোনালী বেগুনী মেঘের প্রান্তে দিনান্ত-সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। শান্তছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। বর্ণ বৈচিত্র্যে সারাদিক্ তখন স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল। স্বস্তি-বচন এবং প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া একে-একে মন্দিরগুলি বিশাল সমুদ্রের বুকে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। যে মন্দিরটীর কথা আমরা বলিতেছি, সেটী ছিল সাতফুট উঁচু; কাঠ আর রঙিন্ কাগজে তৈরি; লাল আর হল্‌দে রঙের নিশান উড়িতেছে; মধ্যস্থলে প্রায় দুইফুট উঁচু একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তি; তাহাকে ঘিরিয়া মোম্‌বাতিগুলি শুভ্ররশ্মির মালা রচনা করিয়াছে; সম্মুখে সুন্দর পাত্রে আহার্য্য এবং অর্ঘ।

অক্টোবরের এই সময়টায় ওদেশে উত্তর-পূব হইতে জোর বাতাস বহিতে থাকে। ছোট্টছোট্ট ভাসন্ত মন্দিরগুলি তরঙ্গমালায় দুলিতে দুলিতে কোথায় দৃষ্টি-অন্তরালে চলিয়া গেল। হয়ত, দক্ষিণে গিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বঙ্গসাগরের বুকে ছড়াইয়া পড়িল। সমুদ্র এসময়ে প্রায়ই শান্ত থাকেনা; ভয়ানক ঝোড়ো-বাতাস বহিতে থাকে; সময় সময় সাইক্লোন্‌ও দেখা যায়। কাজেই নিশ্চয়ই অধিকাংশ ভেলাই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের হাত এড়াইতে পারে নাই; ঝড়ের দাপটে ভাঙিয়া-চুরিয়া কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু একখানা ভাসানো-মন্দির বাঁচিয়া গিয়াছিল। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মাথায় চড়িয়া, ঝোড়ো হাওয়ার ঝাঁকানি খাইয়া কয়েক সপ্তাহ পরে মন্দিরখানি মধ্য-আন্দামানের একটি সুন্দর বনদ্বীপের কূলে আসিয়া লাগিল। হাসি আর আলোর কূল ছাড়িয়া বেদনা ও নৈরাশ্যের দেশে আসিয়া পৌছিল। আন্দামান নৈরাশ্যের দেশ; এখানকার আদিম অধিবাসীরা দিনদিন লুপ্ত হইতে চলিয়াছে; বিদেশ হইতে যাহারা আসিতেছে—তাহারা প্রায়ই হতভাগ্য, দণ্ডিত হইয়া যাবজ্জীবন, অথবা বিচারকের কৃপায় হয়ত বা কিছু কমদিনের জন্য, স্বদেশ হইতে এই সুদূর দ্বীপে নির্ব্বাসিত।

কিন্তু ইহারা বাদে আর কয়েকশত লোক আছে, তাহারা স্বাধীনভাবে কুলির কাজ করে; ভারতবর্ষ বা ব্রহ্মদেশ হইতে আন্দামানের বন-তাঁবুতে খাটিবার জন্য চালান্ হইয়া আসিয়াছে।

এইসব দ্বীপ হইতে যথেষ্ট কাঠ ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড্ ও আমেরিকায় রপ্তানী হইয়া থাকে। এই সবেরই একটির এক বন-তাঁবুর কাছাকাছি ভাসানো-মন্দির-খানি আসিয়া লাগিল।

ভোর বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই মধ্য-আন্দামানের বন-নিবাসের ব্রহ্মীয়েরা দেখিতে পাইল, সাগর জলে সুন্দর একখানি মন্দির ভাসিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে দুইজন সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছে। যে গ্রাম হইতে

[বর্ত্তমান আবিসিনীয়া]
এক ধরণের নমনীয় বৃক্ষ। বনে পথ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য পথিকেরা গাছগুলির চারা অবস্থায় গাঁট বাঁধিয়া দিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরটি ভাসানো হইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রামেরই অধিবাসী। ভোরে উঠিয়া তাহারা কাজ করিতে চলিয়াছিল,—সহসা দেখিতে পাইল লাল মন্দিরটি ক্রমে-ক্রমে কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিস্ময়ে আনন্দে তাহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল; অকস্মাৎ যেন দেশের বাতাস আসিয়া

সারা অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। তাহারা জলে নামিয়া পড়িল, এবং মন্দিরটিকে কূলে টানিয়া আনিল। সমস্ত ব্রহ্মবাসী ইহার আকস্মিক আবির্ভাবকে দৈববাণীর মত গ্রহণ করিল এবং উহার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল।

তাঁবুতে লইয়া গেলে সকলেই উহা দেখিয়া বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিল। শীঘ্রই সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। আজো সব দেশান্তরিত হতভাগ্যের নিকটে এই মন্দিরটি গৃহের শান্তি বহন করিয়া আনে। 'প্যাগোডা'-মন্দিরটির মধ্যে যাহা যাহা অবিকৃতভাবে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে, এক মুখ-আঁটা বোতলের মধ্যে একখানা চিঠি; তাহাতে লেখা,—যেখানেই গিয়া এ-মন্দির পৌঁছাক্, সেখানে যে-কোন ব্রহ্মবাসী ইহা দেখিতে পাইবে,—সে যেন স্বদেশে সংবাদ পাঠায়। আন্দামানের ব্রহ্মবাসীরা তার যোগে দেশবাসীদের জানাইয়াছিল।

এখন বোধ হয় ব্রহ্মের ঐ অংশ হইতে কুলি পাওয়া আর কঠিন হইবে না। যে ভক্ত বৌদ্ধ মন্দিরখানি ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভক্তির আশাতীত পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার শত শত প্রবাসী স্বজন এখানে আসিয়া আরাম এবং শান্তি অনুভব করে; সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর এখানে আসিয়া বন-নিবাসের নিস্তব্ধ দিনান্ত-ছায়ায় দেবমন্দিরের সম্মুখে বসিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ এবং পূজা-নিবেদন করে।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সিয়াম বা শ্যামদেশের শ্বেত হস্তী

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

"শ্যামদেশ শ্বেতহস্তী-ভূমি"—একথা প্রাচীনকাল থেকে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত। যদিও ব্রহ্ম, কম্বোজ ও সিংহলেরও অনুরূপ প্রসিদ্ধি আছে, এবং সেখানেও এই শ্বেত-হস্তীর উপর দেবত্বের আরোপ ক'রে রাজকীয় সম্মান প্রদত্ত হয়,—কিন্তু এর বিশিষ্টতায় শ্যামের প্রাধান্য সর্ব্ববাদি-সম্মত।

এই শ্বেত হস্তীর নাম শ্যাম দেশবাসীদের মধ্যে মন্ত্রশক্তির মত কাজ করে—এর নামে এরা যুগপৎ উত্তেজিত ও অভিভূত হ'য়ে উঠে। সু-দুর্ল্লভত্ব ও অপরূপত্ব এর অন্যতম কারণ হ'লেও, এর প্রধান কারণ—বুদ্ধের প্রতীক বা অবতার বিশেষ ব'লে এ দেশের শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, এবং আপামর সাধারণ সকলেই সহজে তা' বিশ্বাস ক'রেও থাকে। ভিন্ন মতে—এই শ্বেতহস্তীর ছদ্মবেশে স্বর্গীয় মহাত্মাদের শুভ্র আত্মা এসে স্বদেশকে পবিত্র ক'রে থাকেন।

অসাধারণ উত্তেজনার মূল এই শ্বেত-হস্তীকে নিয়ে সেকালে কতবার শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্বের সূচনা হ'য়েছে—যার পরিণতি অনেক সময় অনেক মুকুটধারীর পতন, এমন কি বংশবিলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়ে ছেড়েছে।

এই শ্বেতহস্তী বা শ্বেত দেবতাকে দেশ ও জাতির মঙ্গলের সর্ব্বোত্তম প্রতীক স্বরূপ সাড়ম্বর রাজকীয় অভ্যর্থনায় এবং ষোড়শোপচার পূজার অর্ঘ্যে সাগ্রহে বরণ ক'রে নেওয়া হয়।

এর দুর্ল্লভত্ব একদিক দিয়ে একে যেমন অপরূপ ও আগ্রহবর্দ্ধক করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ সৌভাগ্য এই যে,—সুলভ নয় ব'লে একটি নাতিধনী দেশীয় রাজ্যের পক্ষে এই বারণ-বরণের বহুল ব্যয় বহন অসাধ্য হ'য়ে পড়ে না।

শ্যামদেশে এই শ্বেতহস্তীকে 'চ্যাং পুয়েক' (Chang Puck) বা "বিস্ময়কর হস্তী" নামে অভিহিত করা হয়।

নানা কথা

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ

যথারীতি গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক উৎসব ও মেলা হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসবের প্রাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উৎসব-যোগদানকারিগণের অন্তরে আনন্দের দীপশিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন।

আশ্রমবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর এ বৎসর 'শান্তি নিকেতনে ৭ই পৌষ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য মাত্র দুই আনা—কিন্তু শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বইখানিতে লিখিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে লেখকের নামে দুই আনার টিকিট এবং উপযুক্ত ডাক ব্যয় (বোধ করি এক আনার অধিক নয়) পাঠাইলে বইটি পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে বইখানির কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"সে আজ প্রায় ৭০ বৎসর আগের কথাই হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাল্কীতে চড়িয়া বীরভূমের প্রসিদ্ধ গ্রাম রায়পুরের দিকে চলিয়াছেন। রায়পুরের সিংহেরা ধনে মানে বদান্যতায় চিরকাল প্রতিষ্ঠাবান। এই পরিবারের শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ (যিনি লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহের পিতৃব্য) প্রভৃতির সহিত মহর্ষির বিশেষ হৃদ্যতা থাকায় তিনি সেবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। বোলপুর রেলষ্টেশন হইতে একটি পথ সুরুলের পাশ দিয়া রায়পুর গিয়াছে—পাল্কী সেই পথেই যাইতেছিল। সহর ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে সহসা পাল্কীর মুখ ফিরিল। পথের দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠে ফসল নাই; একগাছি তৃণও কদাচিৎ দেখা যায় কি না সন্দেহ। চারিদিকের মাটি ধ্বসিয়া গিয়া মাঠের বুক বন্ধুর হইয়াছে। এদিকে বেলার সঙ্গে রৌদ্র বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরের তপ্ত খোয়াইয়ে দূর দিগন্তরে একটি উঁচু টিবি লক্ষ্য করিয়া পাল্কী চলিতে লাগিল! সেই ডাঙার উপর দুইটি মাত্র ছাতিম গাছ,—রুক্ষ ধূসর অসীম প্রান্তর, তারি মাঝে গাছ দুটি যেন তৃষিত পথিককে স্বর্গলোকের শান্তি সুধা বিতরণের জন্যই শাখা নাড়িয়া মধুর আহ্বান জানাইতেছিল। মহর্ষি পথের মাঝে দূর হইতে তাহাদের সুবিন্যস্ত শ্যামল পত্রের বিচিত্র শোভায় মুগ্ধ হইয়া বরাবর গাছের তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্ত শরীরে পাল্কী হইতে নামিয়া সেইখানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সেইদিনকার সেই শুভ্র মুহূর্ত্তে স্থানটি তাঁহার কী-যে ভাল লাগিল—তিনি সেই বসাতেই উপলব্ধি করিলেন—"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

* * *

"ছাতিমতলার বেদী, উপাসনামন্দির ও গ্রন্থাগার, মহর্ষি থাকিতেই নির্ম্মিত হয়। রোগের পর স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ তাঁহার আর শান্তিনিকেতনে আগমন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানকার উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থা পঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজেই তিনি কলিকাতা হইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এমন কি উৎসব শেষ হইলে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাঁহাকে না শুনাইলে চলিত না। নিজে না আসিলেও শান্তিনিকেতনের কাহাকেও কলিকাতায় দেখিলেই অতি আগ্রহের সহিত আশ্রমের বিষয়, বিশেষভাবে ছাতিমগাছটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ছাতিম গাছ তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে উহার একটি ডাল তাঁহার জন্য কলিকাতায় নীত হয়। ইং ১৯০৫ সনে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে।"

* * *

"ইং ১৮৮৭ সনে (১৮০৯ শকের ২৬শে ফাল্গুন) দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এই তিন জন বিশ্বস্ত অধিকারীর হস্তে মহর্ষি শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাপত্র দান করেন। এই ব্যবস্থাপত্র প্রণয়নে তাহার সংকল্প ছিল—শান্তিনিকেতনে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যে-কোন দেশের লোক আসিয়াই শান্তিতে

ঈশ্বরোপাসনা ও জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিবেন। "ধর্ম্মজ্ঞান উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্মবিচার ও ধর্ম্মালাপন করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।" (১৮১০ শকের তত্ত্ববোধিনীর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত ট্রষ্টডীড্ হইতে) সুতরাং দেখা যাইতেছে জনসাধারণও যাহাতে মেলার সূত্রে আশ্রমের ভাবের সহিত পরিচিত হয় ৭ই পৌষের মেলার অনুষ্ঠানে মহর্ষি সেইরূপই কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে আছে শান্তিনিকেতনে কখনো মূর্ত্তিপূজা বা জীবহিংসা হইবে না। এখানে যে মন্দির থাকিবে তাহার আকৃতির মধ্যেও মুক্তির একটি ভাব নিহিত থাকা চাই, যেন উহার ভিতর বাহির দুইদিক হইতেই দুইদিক স্বচ্ছ দেখা যায়। অনেকে না জানিতে পারেন যে এই জন্যই মন্দির গৃহটি কাচের দেয়াল ঘেরিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।"

* * *

"মহর্ষির অন্যান্য আরো অনেক আদেশের মধ্যে শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমা বেড়াজালে আবদ্ধ করাও নিষিদ্ধ ছিল। পাছে ইহার সেই অনন্তরূপটি কোনরূপ আবরণ দ্বারা প্রকাশের পথে বাধাগ্রস্ত হয়, ইহাই ছিল তাঁর আশঙ্কা। শান্তিনিকেতন আশ্রম আজ অবধি তাই সীমাবেষ্টিত হয় নাই।"

* * *

"ইং ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন।"

* * *

"৭ই তারিখ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। ঐ দিন সকালে কবি মন্দিরে আসিয়া বিশেষভাবের উপাসনা করেন। কবির বাণী তাঁহার নিজমুখে শুনিবার জন্য বাহির হইতে বহু অতিথির সমাগম হয়। ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদের এক বার্ষিক সভা বসে। তাহাতেও কবি প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যরূপে নিজ সাধনা ও আদর্শের এক সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহার পর আম বাগানে প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সম্মিলন হয়। ৯ই পৌষের দিনটিকে আশ্রমের মৃতছাত্র ও কর্ম্মীগণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তিথি হিসাবে পালন করা হয়। ঐদিন তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া সকলে সমবেতভাবে উপাসনা ও জীবনী আলোচনা করেন। ৭ই, ৮ই, এবং ৯ই পৌষ তিনদিন ধরিয়াই নানা প্রকার খেলা, সার্কাস, আতসবাজি, যাত্রা, চলচ্চিত্র ও সাঁওতালী নৃত্যগীতের আড়ম্বরে মেলাক্ষেত্র আনন্দ কলরবে মুখরিত থাকে। এই তিনদিন সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশে সহস্র সহস্র টাকার জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয় হয়।"

* * *

উচ্চারণে ভুল

গত অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "অতীতের স্মৃতি" নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দ্বারভাঙ্গার পরলোকগত মহারাজার নাম ৺রামেশ্বর সিং বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। পূর্ণিয়া হইতে বিচিত্রার জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত ভূদেবভূষণ লাহিড়ী লিখিয়াছেন উক্ত মহারাজার নাম 'রামেশ্বর' ছিল না, 'রমেশ্বর' ছিল। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণত তাঁহার নাম 'রামেশ্বর' বলিয়াই বিদিত ছিল। সম্ভবত ইংরাজি-সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার নামের ইংরাজি বানান হইতে এ ভুলের সৃষ্টি হয়। মহারাজার মত একজন বিশিষ্ট

ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে এরূপ ভুল থাকা অনুচিত বলিয়া আমরা এ কথার উল্লেখ করিলাম।

৺রাধারাণী দেবী

গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ নারী মন্দিরের" প্রাণস্বরূপা ৺রাধারাণী দেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। রাধারাণীর পিতৃকুল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছেত্রী বংশ-সম্ভূত, কিন্তু বাঙলা দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ দেশ বলিয়া অবলম্বন করায় ইঁহারা মনে প্রাণে বাঙালীই হইয়া গিয়াছিলেন। রাধারাণী শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ছিলেন।

৺রাধারাণী দেবী

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ নারী মন্দির" প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইনি দীর্ঘকাল উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাতৃস্বরূপ থাকিয়া মন্দিরের কার্য্য করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল, এবং যে আদর্শ নারী মন্দির কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়—"ভাগবত-জীবন লাভ এবং ভারতীয় জাতির মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।" ইঁহার অভাবে "নারী মন্দির" বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি ভবিষ্যতের দেহ মধ্যে নিজের প্রভাব রাখিয়া যান, তাঁহার মৃত্যু ঠিক মৃত্যু নয়।

৺দেবকুমার রায় চৌধুরী

সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বরিশালের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি নিরলস দেশ সেবায় জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

কবি নজরুল ইস্‌লামের সম্বর্দ্ধনা

গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীগণের পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলাম মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উৎসবে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা যোগদান করেন। নজরুল-সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে কবি নজরুলকে একটি সোনার দোয়াত কলম এবং রূপার আবরণীর মধ্যে রক্ষিত একটি অভিনন্দন-পত্র উপহার দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় পাঠক সমাজের অন্তরে কবি নজরুল যে প্রীতির স্থানটি অধিকার করিয়াছেন এ সম্বর্দ্ধনা-উৎসবটি তাহারই যথার্থ অভিব্যক্তি। কবি যশ, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হউন।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা পীঠ

উল্লিখিত নামে ১২৬এ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতায় বর্ত্তমান বৎসরে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাজবৈদ্য কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, জ্যোতির্ভূষণ ভিষগাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা উক্ত বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সম্বলিত একটি মুদ্রিত পরিচয় পত্র পাইয়াছি। এই বিদ্যালয়ে যাঁহারা গণিত এবং ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন তাঁহারা উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ফলিত জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে বহু শিক্ষিত লোকের মনে তাদৃশ আস্থা নাই। তথাপি

ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষই ইহার উৎপত্তি স্থল, এবং বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে যে এই বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা এবং গবেষণা হইয়াছিল তাহা প্রাচীন ভারতের ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি, চ্যবন প্রভৃতি মনীষীগণের এবং পরবর্ত্তী কালের আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, শ্রীনিবাস, লীলাবতী প্রভৃতির গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায়। এতকাল ধরিয়া প্রচলিত এবং বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আলোচিত বিদ্যার গর্ভে ফাঁকিবাজি ছাড়া বৈজ্ঞানিক সত্যতা যে কিছুই নাই এ কথা বলা শক্ত;—অথচ উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়া বহু অজ্ঞ ও ভণ্ড লোকের হস্তে এ বিদ্যা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং শিক্ষিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই জ্যোতির্ব্বিদ্যা পীঠের দ্বারা ফলিত জ্যোতিষের লুপ্ত খ্যাতির পুনরুদ্ধার হইলে আমরা সুখীই হইব।

গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা এবং গবেষণার বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। আমরা এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির সাফল্য কামনা করিতেছি।

"অসহায়"

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় "অসহায়" নামে যে এক-বর্ণ চিত্রটি প্রকাশিত হইল তাহা শিল্পী শ্রীযুক্ত আর, কে, পাল গঠিত মৃত্তিকা-মূর্ত্তির ছায়ালিপি। এই মূর্ত্তিটি বিগত ১৯২৬-২৭ সালের কলিকাতা ফাইন আর্ট সোসাইটির শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবর্গের প্রশংসা উদ্রেক করিয়াছিল। জন্‌ষ্টন্ এণ্ড হফ্‌ম্যান্ লিমিটেড্ কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এ, ডি, লণ্ড এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি বিশেষভাবে প্রসংশিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটির ছায়ালিপি হইতে পাঠকগণ লক্ষ্য করিতে পারিবেন, নিরাশ্রয় দরিদ্র বৃদ্ধ এবং তাহার পুত্রের সমস্ত অবয়বের মধ্যে দৈন্য, দুঃখ এবং সহায়হীনতার একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি মূর্ত্তিগঠন শিল্পবিদ্যা এবং ভাস্কর্য্য আমাদের বঙ্গ দেশে নবোদ্যমের সহিত অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয়ে সাধারণের সহানুভূতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত মূর্ত্তি প্রভৃতির ছায়ালিপি পাইলে আমরা তাহা বিচিত্রায় প্রকাশিত করিয়া চারুশিল্পের প্রচার বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না।

গ্রন্থকার-সম্বর্দ্ধনা

সারস্বত মহামণ্ডলের কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ এম্-এ মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দেশহিতৈষী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মনীষিগণের উৎসাহ ও অনুগ্রহে—বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি, মঙ্গলময়ী পরিপুষ্টি ও বিপুল বিস্তারসাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত—"সারস্বত মহামণ্ডল" কর্ত্তৃক প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজার মধ্যে সমালোচনার্থ বঙ্গভাষায় (গদ্যে ও পদ্যে যে কোনও) মুদ্রিত গ্রন্থ গৃহীত হয় এবং প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিকবর্গ কর্ত্তৃক সমালোচনান্তে বৈশাখমাসে মহামণ্ডলের প্রকাশ্য সভাধিবেশনে সুযোগ্য ব্যক্তির সভাপতিত্বে গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রীগণকে যোগ্যতানুসারে গ্রন্থ-রচনা-সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ বিনা অর্থ গ্রহণে প্রশংসাপত্র ও উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যিনি প্রশংসাপত্র ও উপাধির প্রত্যাশী নহেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থের এক এক সংখ্যা 'মহামণ্ডল গ্রন্থাগারে' দান করিলে মহামণ্ডল তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ঐ অনুগ্রহদত্ত গ্রন্থসকল বঙ্গভাষার উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ 'মহামণ্ডল গ্রন্থাগারে' শোভা পাইবে।

সমালোচনার্থ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ ও সমালোচনান্তে গ্রন্থ প্রত্যর্পণ করা হইবে না। মহামণ্ডল প্রতিবর্ষ এই অনুষ্ঠান বজায় রাখিবেন। পণ্ডিত শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ত-তীর্থ এম-এ, কার্য্যাধ্যক্ষ—সারস্বত মহামণ্ডল, ৪১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রন্থাদি পাঠাইবেন।

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

চ্যাং পুয়েককে তারা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে থাকে। এক শ্রেণীর শরীরের কোন কোন অংশ মাত্র শ্বেত; অপর শ্রেণীর মাথার উপর অদ্ভুত এক প্রকারের ডোরা-কাটা দাগ; কতকগুলির গায় লাল লোম; কতকগুলির দাঁতের গড়ন নূতন ধাঁজের;—কতকগুলির বা সাম্‌নের পায় দশটি ক'রে আঙুল, সাধারণতঃ যা আটটির বেশী দেখা যায় না। এই সব কারণে এর জন্যে বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছে—যাদের পরীক্ষায় নির্ণীত হয় কোন্‌টি বা প্রকৃতই চ্যাং পুয়েক, কোন্‌টি বা নয়।

১৯১১ সালের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল আর শ্যামদেশে এর শুভাগমন ঘটেনি। ১৯২৮-এর প্রথম ভাগে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল—বর্ণিও কোম্পানী লিমিটেডের সেগুন বিভাগের (Teak Concession) স্থান বিশেষে একে দেখা গিয়েছে।

এই শ্বেত হস্তীটিকে কিরূপ রাজোচিত ও দেবোচিত সম্ভ্রম ও সমাদরের সঙ্গে বিপুল আড়ম্বরে অভ্যর্থনা ক'রে রাজধানী ব্যাঙ্কক সহরে আনা হয়েছিল, তারি কৌতূহল-জনক কাহিনী আমরা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করব।

যার কথা আমরা বল্‌ছি, তার বয়স তখন এক কি দু'মাসের বেশী হবে না। সংবাদ পাওয়া মাত্র এই 'চ্যাং'টিকে পরীক্ষা করবার জন্য তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হ'ল সত্যই সে 'পুয়েক' কি না। উত্তর সীমান্তের প্রধান নগর 'চিয়েংময়' এই শ্বেত শিশুটিকে পরীক্ষা করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। পরীক্ষা-ফল সন্তোষজনক হওয়ায়

পবিত্র শ্বেতহস্তী এবং তাহার মাতা

কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সমর্থিত হ'ল। এরপর স্বয়ং শ্যামরাজ ও রাজ্ঞী এসে তার সঙ্গে সাক্ষাতকার করলেন। পরিশেষে তাকে স্পেশাল ট্রেন সহযোগে রাজধানী ব্যাঙ্কক সহরে নিয়ে আসা হ'ল।

কোনো এক ষ্টেশনে হস্তী পৌঁছিলে তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ অপেক্ষা করিতেছেন।

এই দেবশিশুটির যাত্রাপথের সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। বৌদ্ধ শ্রমণের মন্ত্রপাঠ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পবিত্র-বারি-সিঞ্চন পূজা-পরিক্রমা কোন কিছুরই ত্রুটি ছিলনা। এর ওপর, প্রত্যেক ষ্টেশনে উর্দ্ধাপরিহিত কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে এক একজন বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধি এসে একে অভিবাদন জানিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। ফল-ফুল-ধূপ-ধুনা দিয়ে অসংখ্য লোক এসে ভক্তি নিবেদন ক'রে গেল।

যাত্রারম্ভের স্বাগত-উৎসব চিয়েংময় নগরীটিকে আনন্দ-

চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। পদস্থ রাজানুচরগণ শিশুদেবতাটি ও তার মাতাকে বেষ্টন ক'রে দাঁড়ালেন। সযন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে মশাল জ্বালিয়ে তাদের তিনবার প্রদক্ষিণ করা হ'ল। সবার ওপর, তরুণী রাজনর্ত্তকীরা নৃত্যচ্ছন্দে উৎসব-পরিবেশ মধুর ক'রে তুল্‌ল।

হস্তীকে স্পেশাল ট্রেণে চড়ানো হইতেছে।

চাংপুয়েক ও তার মাতাকে যে স্পেশাল ট্রেনে ক'রে নিয়ে আসা হ'য়েছিল, বাইরে দেখ্‌তে সাধারণ ঢাকা-গাড়ী থেকে তার বেশী-কিছু তফাৎ না থাক্‌লেও ভিতরের সাজ-সজ্জা প্রাসাদ-কক্ষের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিলনা। বৈদ্যুতিক বাতি ও বীজনী ত ছিলই, উপরন্তু টেলিফোনেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—কক্ষরক্ষী যাতে যে-কোন সময় এঞ্জিনচালক বা ট্রেনের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সের (Royal Prince in charge of the train) সঙ্গে প্রয়োজন-মত যা-কিছু বল্‌তে পারে। শ্বেত দেবতার স্নানের জন্য একটি বৃহৎ ধারাযন্ত্রও সেই কক্ষে ছিল। ট্রেনে উঠ্‌বার এবং ট্রেন থেকে নাম্‌বার জন্য মাটির চাপ দিয়ে দৃঢ়ভাবে বড় বড় সিঁড়ির মত তৈরি ক'রে দেওয়া হয়েছিল, এবং তার চারিদিকে 'পাম' প্রভৃতি গাছের সপত্র শাখা দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে, বনচারী দেবতাটি যেন স্বাভাবিক বন মনে ক'রে তাতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

চিয়েংময় সহর থেকে ষ্টেশনে আস্‌বার পথে দেড়মাইল ব্যাপী এক বিরাট মিছিল চ্যাং পুয়েকের অনুগামী হ'য়েছিল —পুলিস, বয়স্কাউট, বেয়নেটধারী ও বল্লমবাহী সৈন্য সেই মিছিলের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিল। জয়ঢাক প্রভৃতি নানা-প্রকার বাদ্যভাণ্ডসহ বাদ্যকরগণ তালে তালে পদক্ষেপ করছিল,—এবং ত্রিশটি বৃহদ্দন্তী সেই অদন্ত দেব-শিশুটির দেহরক্ষী স্বরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে মার্চ্চ ক'রে চলেছিল।

দন্তী দেহরক্ষীরা মাতাকে আংশিক বল প্রয়োগ ক'রে ট্রেনে উঠিয়ে দিলেও পুত্রের প্রতি কৌশল ব্যতীত কোনরূপ বল প্রয়োগ করা হ'ল না এই মনে ক'রে—পাছে তার দেবাত্মা রুষ্ট হ'য়ে দেশ ও জাতির কোন ক্ষতি ক'রেফেলে। ...কৌশল আর কিছু নয়—শষ্পশস্যপল্লব প্রভৃতি দেবভোগ্য আহার্য্য-প্রাচুর্য্যে তাকে প্রলুব্ধ ও খুসী করা। মাতার ট্রেনারোহণের পুরো একঘণ্টা পর পুত্রের আরোহণপর্ব্ব সমাপ্ত হ'ল।

দুটি এঞ্জিনযুক্ত দেবতা ও দেবমাতার গাড়ীখানি—ওজনে কম-বেশী আড়াই শ টনের কাছাকাছি—একটা 'ব্রেক

হস্তীর শোভাযাত্রায় মহিলা-মণ্ডলী

ডাউন'-ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে' দেওয়া হ'য়েছিল। আকস্মিক আপদ বিপদের জন্য ঐ ট্রেনে একটি চল্লিশ টন ওজনের ভারোত্তলন-যন্ত্র, এবং বেতারযন্ত্রযুক্ত একখানি মোটরট্রাক্‌ তু'লে নেওয়া হ'য়েছিল। শোনা যায়, স্পেশাল ট্রেনখানির জন্যে রাজকোষ থেকে আনুমানিক পঞ্চদশ সহস্র পাউণ্ড ব্যয়িত হ'য়েছে।

এই দেবযাত্রা চার পর্ব্বে শেষ করা হয়। রাজার স্বয়ং-প্রতিনিধিরূপে (Personal Representative) প্রথম দুই

পর্ব্বের তত্ত্বাবধান করেছিলেন 'ক্যাম্বেরিং বেজ্‌রা'র মহামান্য 'প্রিন্স্‌ বাহাদুর; অন্য দুই পর্ব্বের মধ্যে, তৃতীয়ের তত্ত্বাবধারক —রাজার অন্যতম ভ্রাতা 'লোপবুরি'র প্রিন্স্‌; চতুর্থের —রাজার খুল্লতাত কমাণ্ডার-ইন-চীফ্‌ প্রিন্স্‌ 'ভানুরংশী'।

ব্যাঙ্ককে পৌঁছিবার পর এই শ্বেত দেবতার দর্শনলাভ কর্‌বার জন্যে যে বিপুল জন সমাগম হ'য়েছিল সেরূপ জনতা সে দেশে আর কখনো দেখা যায়নি। এই উপলক্ষে সমারোহেরও আর অন্ত ছিল না। মিলিটারি কুচকাওয়াজ,

কর্ম্মচারীগণ সহ শ্যাম দেশের নৃপতি হস্তী-দর্শনে যাইতেছেন।

ট্রেনে চ্যাং পুয়েকের সঙ্গে অন্য দুটি দেবসঙ্গীও আগাগোড়া ছিল যাদের কথা আগে বলা হয়নি; প্রথম— পিত্তল-নির্ম্মিত বৃহৎ একটি জড় বুদ্ধমূর্ত্তি, দ্বিতীয়— সৌভাগ্যসূচক শ্বেতবর্ণের সজীব একটি রক্তাক্ষ হনুমান।

থিয়েটার, বক্সিং, দেশীয় নৃত্য প্রভৃতি সকল প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন হ'য়েছিল প্রচুর রকম। রাজা স্বয়ং এসে স্বাগত-অভিনন্দনে অভিনন্দিত ক'রে খোকা দেবতাটিকে সুসজ্জিত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে দু'দিন দু'রাত্রিব্যাপী শুভ মহোৎসব চলেছিল মহা সমারোহে।

পুস্তক সমালোচনা

হাটে হাঁড়ি

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এল্‌, চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন, পোঃ বজ্‌বজ্‌, জেলা ২৪ পরগণা।

এখানি একটি রঙ্গ-নাট্যের বই। সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক সতীশবাবুর এ বইখানি যে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে তাহা বইখানি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, অথবা মিনার্ভা থিয়েটার ইহার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। রঙ্গনাট্যখানির মধ্যে সতীশবাবুর এমন নির্দ্দোষ কৌতুকরসের অবতারণা করিয়াছেন যাহা জাতি-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই আনন্দ-দান করিবে, কিন্তু কাহাকেও পীড়িত করিবে না। বহু নাটকীয় গুণসম্পন্ন এই বইখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

মণিমুক্তা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। মূল্য আট আনা প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ধর, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কবিতা এবং কাহিনীতে রচিত ইহা একখানি বহু-চি সম্বলিত শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহার আরম্ভ হইল দুর্ব্বিবা খোকার নিত্য-উপদ্রবের একটা হাল্কা সুরের মধ্য দিয়া- "ওরে খোকা নিস্‌নি, ওটা যেয়ে নস্যি, নাকে যেন দিস্‌নি-

দুষ্টু ও দস্যি!" কিন্তু দেখিতে দেখিতে খোকার দিদি এবং দাদাদের আগ্রহও পুস্তকখানিতে জমিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত রচনাগুলি সুলিখিত এবং কৌতুক-রসে উজ্জ্বল। শিশুরা বইখানি পাঠ করিয়া একসঙ্গে আনন্দ এবং শিক্ষা লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ।

বইখানির কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

নানা কথা

লিপি সংসদ

দেশীয় এবং প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একটি লিপি সংসদ অর্থাৎ Correspondence club স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীযুক্ত অপ্রকাশ গুপ্ত আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সংখ্যার স্থানান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পত্রটি পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন লিপি সংসদ ব্যাপারটি কি এবং তাহার উপযোগিতা এবং উপকারিতা কতদূর হইতে পারে। কল্পনাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বিভিন্ন দেশব্যাপী বাঙালিদের মধ্যে এ বিষয়ে যদি উৎসাহ জাগিয়া উঠে তাহা হইলে সামান্য পত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া নানা দেশের বহু মূল্যবান সংবাদাদি সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল পত্র কোথায় গিয়া মিলিত হইবে এবং তাহাদের মর্ম্ম অথবা মর্ম্মাংশ সাধারণের মধ্যে অথবা লিপি সংসদের সভ্যগণের মধ্যে কি প্রকারে প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে পত্রলেখক মহাশয় কোনও আভাস দেন নাই। আশা করি পত্রলেখক মহাশয় অথবা অপর যে কেহ ইচ্ছা করেন এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রণালী নির্দ্দেশ করিবেন।

পত্রলেখক মহাশয় তাঁহার পত্রের শেষে আমাদের 'সবল স্কন্ধে'র ভার বহন করিবার বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। স্কন্ধ আমাদের সবল কি-না জানি না,—কিন্তু সঙ্কীর্ণ নিশ্চয়ই। তথাপি লিপি-সংসদের যোগ্যতর club-গৃহ ভাবিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বে 'বিচিত্রা'ই তাহার প্রথম club-গৃহ হউক। বিচিত্রার স্থান অবশ্য সীমাবদ্ধ, সুতরাং প্রতি মাসে লিপি-সংসদের অংশে চার পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক স্থান দেওয়া সম্ভবপর হইবে না,—প্রেরিত লিপিগুলি যদি সংক্ষিপ্ত হয় এবং চিত্তাকর্ষক সারগর্ভ সংবাদ বহন করে তাহা- হইলে বিচিত্রা সানন্দে উক্ত পরিমাণ স্থান তাহাদের জন্য প্রতি মাসে নির্দ্দিষ্ট রাখিবে।

Advance

গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিক হইতে এই নূতন ইংরাজি দৈনিক সংবাদ-পত্রটি প্রকাশিত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয় ইহার সম্পাদক হইয়াছেন। কাগজখানির উত্তরোত্তর উন্নতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি—কিন্তু মূল সুরটি ইহার কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহা এখনো ধরিতে পারি নাই। উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে আশা করি লঘু চপল সুরের পরিবর্ত্তে গভীর উদাত্ত সুরই শুনিতে পাইব।

আমরা কাগজখানির সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মাঘ কলিকাতা ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবারকার সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, —কিন্তু তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির জন্য সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সম্মেলনের সহিত প্রাচীন পুঁথি, তাম্রলিপি ও পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সম্মেলনের প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে সুপরিচিতা সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলাদেবীর আলিপুরের ভবনে প্রীতি-সম্মেলন ও লীলা দেবী রচিত একটি নাটিকার অভিনয় হয়। অভিনয় দেখিয়া সকলেই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

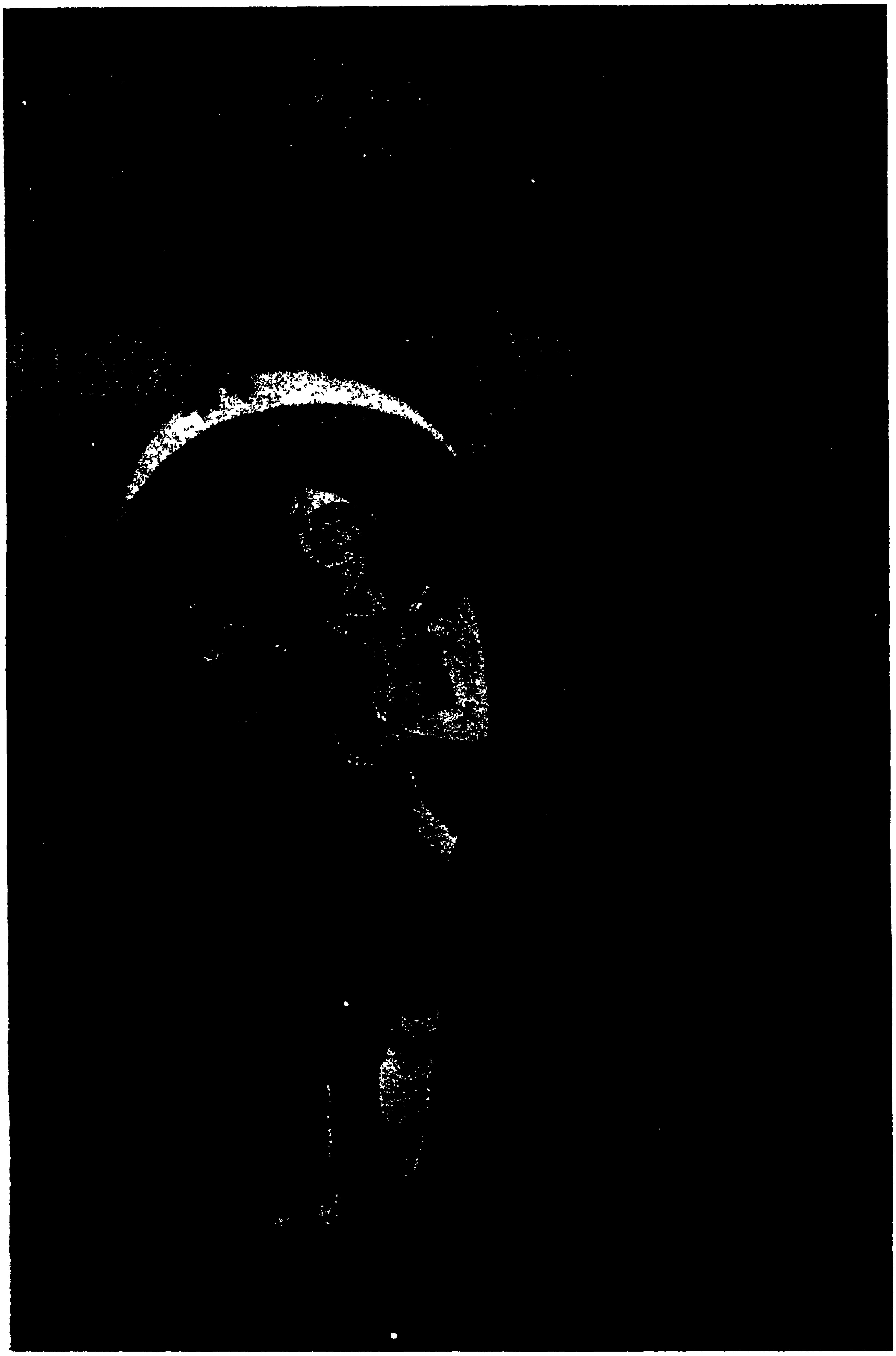

শিবপার্ব্বতী

বিচিত্রা

ফাল্গুন, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীদুর্গেশচন্দ্র সিংহ

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড	ফাল্গুন, ১৩৩৬	তৃতীয় সংখ্যা

বিশ্বভারতী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি যে শাসন যে ইচ্ছা কাজ করচে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে, তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এ'তে ক'রে আমাদের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্চে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে ক'রে প্রকৃতিস্থ হ'তে আমাদের বাধা দেয়। এই জন্যে মাঝে মাঝে যে-চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে তৃপ্তি দান করাকেই কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে, আর-একদল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন ক'রে হোক্ অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনাকুণ্ডের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড় ক'রে দৃষ্টি করা বা বড় ক'রে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোট হ'য়ে যায়। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে-ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড় হ'য়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা ক'রে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড় ক'রে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য ক'রে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা ব'লে ধ'রে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা ব'লে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য সকল কাজকর্ম্ম বন্ধই হ'য়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হ'য়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য, সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য ব'লে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্ম্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্ম্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর ক'রে দেয়।

তাই ব'লে একথা বলিনে যে বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে, বলিনে যে তাকে অলঙ্কার ক'রে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা'হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরিসঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য-দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানারকমে বল দিচ্চে ও পথ নির্দ্দেশ করচে। তারি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষা দীক্ষায় অন্য দশরকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হ'য়ে যাচ্চে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড় হ'য়ে উঠ্‌ল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে, সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, একথা যদি না মানি তা'হলে নিতান্ত ছোট হ'য়ে যাই।

এই কথাটা মান্‌ব, মান্‌তে শেখাব, এই মনে ক'রেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্চে বাইরের নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড় ছিল সে হচ্চে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুল মাষ্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হ'ত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা'হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টি'কতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হ'য়ে এসেচে। কিন্তু হ'লেও সেই মূল জিনিষটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্যমুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্চে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে-জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেচে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেইদিকে পৌঁছে না দেয়, তা'হলে কি জানি কি হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আন্‌তে পারি নি।

পূর্ব্বেই বলেচি, সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন। এই লক্ষ্য হ'তেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক্ ও রাজা তাঁদের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্যে বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন কি, তখনকার কোনো কোনো পুরোনো দফ্‌তরে দেখা যায় প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্ত্তৃপক্ষ তিরস্কার করেচেন।

তারপরে যদিচ অনেক বদল হ'য়ে এসেচে, তবু কৃপণ-প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারী শিক্ষার কপালে পিঠে এখনো অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের

সঙ্গ অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব'লেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন ক'রে হোক্ বহন ক'রে চলেচি। এই ভয়ঙ্কর জবরদস্তি আছে ব'লেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারচিনে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধ'রে নেওয়া হয়েচে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এ'তে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, তা'হলেও সেটাও কেমনতর বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনের এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর ক'রে তুলেচি।

যাই হোক মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা'হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি, তা'হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সঙ্কল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন ক'রে তার উপরে অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের ক'রে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র হ'তে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন।

তার পরে তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান ক'রে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ান থেকে নিষ্কৃতি দিলুম, তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল এই রকম কাজই হচ্চে শিক্ষার যজ্ঞ ক্ষেত্রে যথার্থ যজ্ঞ। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এই রকম বিদ্যার সাধকদের চারিদিকে সমবেত হন তা হলে ত ভালই, আর যদি আমাদের দেশের কপালদোষে সমবেত না হন তাহলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখী ক'রে তোলার চেয়ে এ অনেক ভাল।

শিশু দুর্ব্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়ি গোঁফ সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তাহলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েচে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়র আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক্, মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক্ যে এই শিশু বিধাতার অমৃত ভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন ক'রে এনেচে; সেই অমৃতই এ'কে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোট গল্প

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য এম-এ

ইউরোপে পূর্ব্বে ধারণা ছিল, ছোট গল্পের প্রথমত গল্প হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত ছোট হওয়া চাই—a short story is a story which is short। ও ধারণা এখন আর নেই। আধুনিক ইউরোপ ছোট-গল্প বলতে যা বোঝে সে বস্তু ছোট, এবং গল্প, এবং তাছাড়া আরো কিছু। বাইবেল্-এ কিম্বা পুরাণে গল্প আছে বিস্তর, এবং তাদের মধ্যে অনেক গল্পই আকারে ছোট, অথচ তারা আজকাল যাকে ছোট গল্প বলা হয় সে জিনিষ নয়। আধুনিক ছোট গল্পের বিশেষত্ব এই যে, তার গোড়া নেই এবং তার আগা নেই—আছে শুধু মাঝ্খান্। গল্পের নায়ক আগে কি ছিল, এবং পরে তার কি হ'ল, সে সংবাদ আমরা গল্পের মধ্যে পাবো না। শুধু তার জীবনের বিশেষ একটি ঘটনার কথা আমরা পাবো; উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে তার সম্বন্ধে যতটুকু জানা দরকার, তার চেয়ে বেশী কিছু জান্বার অধিকার আমাদের নেই। ঐ ঘটনার যবনিকা-পাতের সঙ্গে সঙ্গে গল্পেরও যবনিকা-পাত। এইখানে উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের আসল তফাৎ। ছোট গল্পের মিল্ আছে সনেট্ এবং নাটকের (নাটক বলতে আমি বাংলায় যাকে সাধারণত নাটক বলা হয় তার কথা বলছি না -বলছি ইংরেজি 'প্লে'-র কথা) সঙ্গে; একের সঙ্গে চরিত্রে, অপরের সঙ্গে চরিত্রে এবং গঠনে।

*　　*　　*

গল্প তিন প্রকারের হয়—কাহিনী, নক্সা (Sketch) এবং ছোট গল্প। বাইবেল বা পুরাণের গল্প কাহিনীর চমৎকার দৃষ্টান্ত। আর নক্সা বাংলা মাসিকে প্রতি মাসেই দেখা যায়। বাংলা মাসিকে যাকে 'ছোট গল্প' বলা হয় তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশটা নক্সা ছাড়া আর কিছু নয়। নক্সা আর ছোট গল্পের মধ্যে তফাৎ এই:—ছোট গল্পের প্রত্যেকটি ঘটনা তার পূর্ব্বের ঘটনা এবং তার পরের ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট; তার সমস্ত ঘটনাগুলি একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে চলতে থাকে—ইংরেজিতে সে লক্ষ্যের নাম Climax। Climax এই ছোট গল্পের প্রাণ। Climax যত কাছে আসে ছোট গল্পের বেগ তত দ্রুত হয়; এবং Climax-এর সঙ্গে সঙ্গেই ছোট গল্পের শেষ। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—মোপাসাঁর 'নেক্লেস্'।

মাদাম্ মাথিল্দ্ লোয়াজেল্ গরীব কেরাণীর স্ত্রী। নাচের নিমন্ত্রণে যাবার জন্য তিনি তাঁর ধনী বান্ধবী মাদাম্ ফরেস্তিয়ের কাছ থেকে একটা নেক্লেস্ ধার নিয়েছিলেন। নাচের মজলিসে নেক্লেস্টা হারিয়ে গেল। মাদাম্ লোয়াজেল এবং তার স্বামী সর্ব্বস্ব বিক্রী ক'রে এবং প্রচুর টাকা ধার নিয়ে হারাণো নেক্লেসের মতো একটা নেক্লেস্ কিনে মাদাম্ ফরেস্তিয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দাম লাগল চৌত্রিশ হাজার ফাঁ। মাদাম্ ফরেস্তিয়ে নেক্লেসের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না ক'রেই গহনার বাক্সটা তুলে রাখলেন।

এদিকে মাদাম্ লোয়াজেল্ এবং তাঁর স্বামীর দুঃখময় জীবন সুরু হ'ল। ধার শোধের জন্য নিদারুণ পরিশ্রম, নিজেদের সহস্র প্রকারে বঞ্চিত ক'রে প্রত্যেকটি পাই জমানো। এমনি ক'রে চলল দশ বছর—দশটা দারিদ্র্যময় বছরে স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই যৌবন এবং সুখের কিছু বাকি রইল না। দশ বছর পরে ধার শোধের শেষে মাদাম্ মাথিল্দ্ লোয়াজেল্ তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

"আহা, মাথিল্দ্, তোমাকে যে মোটেই চেনা যায় না!"

"হাঁ, তোমার সঙ্গে শেষবার দেখা হবার পর থেকে আমার দশ বছর দুঃখে কেটেছে—সে শুধু তোমার-ই জন্যে।"

"আমার জন্যে? সে-কি?"

"তোমার সে হীরের নেক্‌লেস্‌টার কথা মনে পড়ে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা কি ?"

"আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছিলুম।"

"বাঃ ! সে তো আমি ফেরত্‌ পেয়েছি—তোমারি কাছ থেকে।"

"সেটা নয়—তার বদলে সেই রকমই আর একটা নেক্‌লেস্ কিনে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম। তার জন্যে দশ বছর ধ'রে আমরা ধার শোধ করছি। বুঝতেই পারছ আমাদের মতো গরীবের পক্ষে অত টাকা শোধ করা সহজ হয় নি। যাক্—এতদিন পরে ধার থেকে বেঁচেছি।"

মাদাম্ ফরেস্তিয়ে চম্‌কে উঠলেন।

"কি বল্‌লে ? আমার নেক্‌লেস্‌টার বদলে নতুন একটা কিনে দিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ, দু'টোই এক রকম দেখতে ; তুমি বুঝতে পারোনি।"

ম্যাথিল্‌দের মুখে গর্ব্ব মিশ্রিত আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে মাদাম্ ফরেস্তিয়ে ম্যাথিল্‌দ্-এর হাত দুটি ধরলেন।

"আহা, ম্যাথিল্‌দ্ ! তুমি তো জানতে না,—আমার নেক্‌লেসটা ছিল আসল হীরার নয়, নকল। দাম হবে বড় জোর পাঁচ শ' ফ্রাঁ।"

এই গল্পের শেষ লাইন এবং এই শেষ লাইনেই climax এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীরা যাকে বলে denouement, অর্থাৎ রহস্যভেদ। এর পরেও দু'চার কথা লেখা যেতে পারত, মাদাম্ লোয়াজেল্-এর সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়ে অথবা তার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে। অন্তত মাদাম্ লোয়াজেল-এর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলা চলত। মোপাসাঁ তার কিছুই করেন নি। বলা বাহুল্য, করলে গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'ত।

নক্সার না আছে প্লট্, না আছে climax। ছোট গল্পেরি মতো প্রবাহ আছে নক্সায়,কিন্তু ছোট গল্পে প্রবাহের শেষের দিকে আছে বন্যা, এবং আকস্মিক সমাপ্তি—যা নক্সার নেই। নক্সা এবং ছোট গল্পের মধ্যে কোন্‌টা সেরা—সে বিচার আমি করছি না, কারণ দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র art form। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নক্সা লেখা ছোট গল্প লেখার চেয়ে ঢের সোজা। কিন্তু যে শব্দের যে বিশেষ অর্থ হয়—সেই বিশেষ অর্থেই সে শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য। নক্সাকে ছোট গল্প বলা এবং মৌমাছিকে মাছি বলা—এ দুই সমান।

*　*　*

ছোট গল্প কত বড় হবে ? বাংলা মাসিকে গল্পের আয়তন সম্বন্ধে সতর্কতা নেই, কারণ বাংলা মাসিককে গল্পের আয়তন অনুযায়ী দাম দিতে হয় না। অপর পক্ষে ইংরেজি সব কাগজই গল্পের আয়তন এবং quality হিসাব ক'রে দাম দিয়ে থাকে। ইংরেজি কাগজ সাধারণত ১,০০০ শব্দের জন্যে (সাধারণ মাসিকের এক পৃষ্ঠা) প্রায় চল্লিশ টাকা দিয়ে থাকে ; একটা তিন পৃষ্ঠার গল্পের দাম প্রায় দশ গিনি। এটা সাধারণ নিয়ম—এবং এ নিয়ম সাধারণ লেখকের পক্ষে খাটে। সাধারণ লেখক বলতে বাজে লেখক বোঝায় না। টেক্‌নিক্-এর (অর্থাৎ সাবলীল ভাষা, শব্দের সুপ্রয়োগ, নিখুঁত গঠন, suspense-interest, ইত্যাদি) দিক্ থেকে যে লেখার দোষ আছে তেমন লেখা এদেশের ছোট বড় কোনো কাগজেই বোঝায় না। বাংলায় সব্‌চে ভাল মাসিকে সাধারণত যে standard-এর গল্প বেরোয়, ইংরেজি কোনো কাগজেই অত নীচু standard-এর গল্প ছাপা হয় না। ছোট গল্প লেখা এখানে ডাক্তারি অথবা ব্যারিষ্টারি করার মতোই একটা উঁচু দরের ব্যবসা। যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাওয়া যায়—সুতরাং ভাল গল্প লেখকের অভাব হয় না। আমি অবশ্য এখানে টেক্‌নিকের দিক্ থেকে আলোচনা করছি ; টেক্‌নিকের দিক্ থেকে সবাই ভাল লেখে ব'লে এদেশ mediocre-এ ভ'রে গেছে। তাই ব'লে সবাই মাঝারি দরের নয় ; প্রতিভার চিহ্ন যাতে সুস্পষ্ট—এমন গল্পও এদেশে ছাপা হয় বিস্তর। আমাদের দেশে টেক্‌নিকের চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ("দেশী ও বিলাতী") গল্পে, রবীন্দ্রনাথের কতক এবং শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্পে।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য দু'একজন লেখক নতুন টেক্‌নিক্‌ নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করছেন—ও এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌ ভবিষ্যতে কেমন পরিণতি পাবে তা বলতে পারা যাবে শুধু ভবিষ্যতে। তবে এঁদের অনেকের গল্পই ছোট গল্প নয়। বায়স্কোপের মতো ছবির পর ছবি দেখিয়ে যাওয়া ছোট গল্পের উদ্দেশ্য নয়।

বড় লেখকদের লেখার দাম এদেশে আরো ঢের বেশী। নামের জোরে দাম প্রায়ই বেড়ে যায়। গল্স্‌ওয়ার্দির গল্প (৫।৬ পৃষ্ঠা) দেড় হাজার টাকার কমে যায় না, এবং কিপ্‌লিং একটা ছোট গল্পের জন্য সহজেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা পেতে পারেন। তাছাড়া একই গল্পের American rights আছে। আমেরিকান কাগজ ইংরেজি কাগজের চেয়েও বেশী দাম দেয়।

* * *

শুধু দামের জন্য নয়। এদেশে শব্দের ব্যবহার-বোধ এত সুপরিণত যে, একটা শব্দেরও নিষ্প্রয়োজন ব্যবহার এদের সহ্য হয় না। একটা comma-র ভুলও এদের কাছে অসহ্য। আমাদের দেশের ছোট গল্পের বাগাড়ম্বর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিস্তৃত বর্ণনা এগুলো এদেশের পাঠকের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। ইংরেজি সাহিত্যিক বাঙালি সাহিত্যিকের চেয়ে ঢের বেশী সংযমী। বাঙালির বাংলা তবু ভাল—কারণ বাইরের লোকের সেটা চোখে পড়ে না,—কিন্তু বাঙালির ইংরেজি শিক্ষিত ইংরেজের চোখে একটা হাস্যকর মতো জিনিষ। অথচ ভারতবর্ষেই ইংরেজি লেখার চরম উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যায়—মহাত্মা গান্ধীর লেখায়। বোধ করি মহাত্মা গান্ধী নিজে এত সাদাসিধা ব'লে তাঁর লেখা এত সাদাসিধা (simple) হ'তে পেরেছে। আমাদের দেশে বড় লেখক ব'লে যাঁদের নাম আছে, (এবং যাঁরা দেশী কাগজে ইংরেজিতে লিখে থাকেন) তাঁদের অনেকেই নির্ভুল ইংরেজি লিখতে জানেন না। বক্তাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। শিক্ষিত ইংরেজের চোখে তাড়াতাড়ি ইংরেজি বলা—fluency—একটা বড় অপরাধ—অশিক্ষিতের লক্ষণ। তার কারণ স্পষ্ট। ঝড়ের বেগে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের দেশে প্রচুর হাততালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার ফলে প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণ ভুল হয়; কেননা ইংরেজি শব্দ মাত্রেই accent আছে, এবং accent অনুযায়ী কথা বল্‌লে কিছুতেই তাড়াতাড়ি বলা যায় না। এক কথায়, আমাদের জীবনের নানা বিভিন্ন ধারায় যে অসংযমের বীজ বয়ে চলেছে, সেই অসংযমই সংক্রামিত হয়েছে আমাদের ছোট গল্পের গায়ে।

* * *

এড্‌গার অ্যালান্‌ পো বলেছেন,—ছোটগল্প 'must be capable of being read at one sitting in order that it may gain the immense force derivable from totality.'। তাছাড়া "in the whole composition there should not be one word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the **one pre-established design**"। বিশ্ব সাহিত্যের কয়েকটা সেরা গল্পের দৈর্ঘ্য দেখা যাক্‌—।

১।	সুতোর ফালি—মোপাসাঁ	(২,৫০০ শব্দ)
২।	The Monkey's Paw—জেকব্‌স্‌	(৩,৫০০ শব্দ)
৩।	The Insurgent—লুডোভিক্‌ হালেভি	(২,০০০ শব্দ)
৪।	On the Stairs—আর্থার মরিসন্‌	(১,৬০০ শব্দ)
৫।	The Father—বিয়র্ণষ্টিয়র্ণ্‌ বিয়র্ণসন্‌	(১,৫০০ শব্দ)
৬।	নেক্‌লেস্‌—মোপাসাঁ	(৩,০০০ শব্দ)
৭।	"Next to Reading Matter"—"ও হেন্‌রি"	(৬,০০০ শব্দ)
৮।	The Substitute—ফ্রাঁসোয়া কপেই	(৩,৫০০ শব্দ)
৯।	The Cask of Amontillado—এড্‌গার অ্যালান্‌ পো	(২,৫০০ শব্দ)

১০। Fennesee's Partner—
ব্রেট্ হার্ট (৪,০০০ শব্দ)

১১। Where Love Is, There God Is Also—টলষ্টয় (৫,৫০০ শব্দ)

১২। Another Gambler—পল্ বুর্জে (৬,০০০ শব্দ)

১৩। Mateo Falcone—প্রস্পার মেরিমি (৫,৫০০)

১৪। The Great Stone Face—হথর্ণ (৮,৫০০)

১৫। The Man Who Was—কিপ্‌লিং (৬,৫০০)

দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মোপাসঁার মতো পরম সংযমী অপর কোনো শিল্পী আছেন কি না সন্দেহ। মোপাসঁার লেখার প্রত্যেকটা শব্দ এবং প্রত্যেকটা শব্দের অক্ষর যেন গল্পের গায়ে খোদাই করা—তাদের একটাও বাদ্ দিতে পারা শক্ত। এমন অনেক গল্প মোপাসাঁ লিখেছেন যা না লিখলেও চলত, কিন্তু টেক্‌নিকের দিক্ থেকে তাঁর সব গল্পই নির্দ্দোষ। অতি-আধুনিকদের মধ্যে Leonard Merrick মোপাসঁার ভঙ্গী এবং শক্তি দুই-ই লাভ করেছেন।

আসচে; তার তারুণ্যের নিত্য নবনবোন্মেষ। পুরাতনের প্রতি ইউরোপের যতো গভীর শ্রদ্ধা, নূতনের প্রতি তার ততো গভীর প্রীতি। জার্মান্ যুবক Remarque তাঁর প্রথম বই ("All Quiet on the Western Front") লিখেই ইউরোপের বরমাল্য লাভ করলেন—এ শুধু ইউরোপেই সম্ভব। "Journe's End"-এর তরুণ লেখক Sheriff-এর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। অথচ আজকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ঐ কয়েক পৃষ্ঠার নাটকের জন্ত এক বছরে তিনি প্রায় চৌদ্দলক্ষ টাকা পেলেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক পাবেন। তাছাড়া ইংলণ্ডে সাহিত্যিকের যতো সম্মান দেশের প্রেমিয়ারেরো ততো সম্মান নয়। এদের চোখে প্রেমিয়ার দেশের চাকর ছাড়া আর কিছু নয়, এবং একথা কাগজওয়ালারা প্রেমিয়ারকে বারম্বার জানিয়ে দিতে ভোলেন না। অপর পক্ষে বার্ণার্ড্‌শ' সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর নিয়ে কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ বেরোয় এবং বার্ণার্ড্‌শ'র হাতে-লেখা চিঠি বাজারে অন্ততঃ হাজার টাকা দামে বিকোয়।

উপরের তালিকায় শেকভ্, পুশ্‌কিন্, হারম্যান্ জুদারম্যান্ ও অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য লেখকের কথা বলতে পারলুম না, কারণ হাতের কাছে তাঁদের ছোট গল্প নেই। এ তালিকায় আমি অতি-আধুনিকদের (যেমন Hugh Walpole বা Sheila Kaye-Smith) লেখাও বাদ্ দিয়েছি। কারণ সম্ভবতঃ এঁদের নাম এখনো আমাদের দেশে পৌঁছয়নি। আমাদের দেশে হামসুন, বোয়ার, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দাকে অতি-আধুনিকদের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। এটা ভুল। কেননা, কালকের অতি-আধুনিক আজকের ক্লাসিক্। ইউরোপীয় সাহিত্যের গতিবেগ এত দ্রুত যে, অত্যন্ত সজাগ না থাকলে তার ক্লাসিক্, তার আধুনিক এবং তার অতি-আধুনিক-এর মধ্যে তফাৎ বোঝা যায় না। ও সাহিত্যের গায়ে নিত্য নূতন রূপের জোয়ার

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত ভাবতে হবে না কারণ সাহিত্য চির-অজর। কিন্তু সাহিত্যিকের স্বাস্থ্যরক্ষার (অবশ্য মানসিক স্বাস্থ্য!) জন্ত মাঝে মাঝে ভাবা মন্দ নয়, —বিশেষ ক'রে যখন কোনো একটা রোগ epidemic হ'য়ে একাধিক সাহিত্যিকের মাথায় আশ্রয় নেয়। এমনি একটা রোগের উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সম্ভবত এ রোগের জন্ত দায়ী সাহিত্যিক নিজে নয়,—দায়ী সাহিত্যিকের সমাজ। বাংলায় পর্দ্দা-প্রথা এবং নীতির পোষাক-পরা অন্যান্য 'দুর্নীতির চাপে স্বভাবতই তরুণ সাহিত্যিকের মধ্যে sex-starvation আসে। তার ফলে জীবনে যা অতৃপ্ত থাকল তা' তৃপ্ত হয় কল্পনায়। বাস্তবের মাটি থেকে যে কল্পনা জন্মায়নি তার মধ্যে সত্য থাকতে পারে না। বিকৃত কল্পনাপ্রসূত লেখায় স্বভাবতই morbidity আসে; বাংলা সাহিত্যে গত কয়েক বছরে

এই জাতীয় ছোট গল্প বেরিয়েছে বিস্তর। normal মানুষকে নিয়ে ছোট গল্পের কারবার; বাংলা দেশের normal পুরুষ অথবা নারী sensual নয়,—কোনো দেশের normal পুরুষ অথবা নারী মূলত sensual নয়।

প্রশ্ন হ'তে পারে, তবে ফ্রান্স্ বা নরওয়ের সাহিত্যে এত দেহ নিয়ে চীৎকার কেন? তার উত্তর, উক্ত চীৎকার আর দশটা চীৎকারের মাঝে একটা। ঐ একটা চীৎকারের মাঝেই যদি আমরা আসল ফ্রান্স্ আছে ব'লে মনে করি, তাহ'লে আমরা 'Drain-Inspector' হিসাবে মিস্ মেয়েকেও ছাড়িয়ে যাবো। যাঁরা ফরাসিকে sensual মনে করেন, তাঁরা জীবনে কখনো আসল ফরাসি দেখেন নি। ফরাসি সাহিত্যে কুরুচিমূলক গল্প বেরোয়—সব সাহিত্যেই বেরোয়। কিন্তু ও জাতীয় গল্পের কেউ সমর্থন করে না—অন্তত তরুণরা তো নয়ই। ফ্রান্সের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য যত ভাল, বোধ করি জগতের আর কোনো জাতীয় তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য তার চেয়ে ভাল নয়। মোপাসাঁ ফ্রান্সের বিকৃত জীবন নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন—সে সব গল্প ইউরোপে আশ্রয় না পেয়ে এশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের দেশে মোপাসাঁর আদর তাঁর প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলোর জন্য নয়।

আর এক জাতীয় morbidityর ফলে sob stuffএ ভরা গল্প বেরোয়—হয় হতাশ প্রেমিকের উচ্ছ্বাস, নয় তো যক্ষ্মা-রোগীর ডায়েরি। ড্রামা এবং মেলোড্রামা যে দু'টো আলাদা জিনিষ এ ধারণা আমাদের দেশে আসবে কবে? আমাদের তরুণ সাহিত্যিকরা সবাই—"ট্র্যাজেডিয়ান্"—জীবন তাঁদের কাছে মরুভূমি এবং দীর্ঘশ্বাস তাঁদের প্রতিদিনকার সহচর! ইংরাজি কাগজে আজকাল সুখান্তক গল্প ছাড়া অন্য গল্প সচরাচর ছাপা হয় না—এটাও অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু গল্প সুখান্তক হ'লেই যে শিল্পসঙ্গত হবে না এ-ধারণা ভুল। কিপ্‌লিংয়ের অধিকাংশ গল্প সুখান্তক; গল্প-লেখক হিসাবে কিপ্‌লিংয়ের সমকক্ষ দু'চারজন থাকলেও কিপ্‌লিংয়ের চেয়ে বড় আজকাল একজনও নেই।

*　　*　　*

সাহিত্যে সুনীতির কোনো মানে হয় না, কিন্তু সাহিত্যে সুরুচি দাবী করবার অধিকার আমাদের আছে।

লণ্ডন
জানুয়ারী, ১৯৩০

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

[illegible]

[illegible]

ভিড়ের মাঝে দেখছি শুধু আননখানি তব,
ওই চরণের চিহ্ন-আঁকা পথটি চিনে লব ;
পাপ্‌ড়ি তো কেউ দেয়নি রেখে তোমার পথে কভু—
তোমায় ঘিরে ফিরছে কেন গন্ধটুকু তবু !

॥ ১

* *
*

অলক ছায়ে ফুটছে তোমার শুভ্রবদনের জ্যোতি,
অধর তোমার লুকিয়ে রাখে সাগর-ছ্যাঁচা মোতি ;
তোমার চোখে জাগছে আমার অন্তরেরি নেশা—
পেয়ালাটুকুর তত্ত্ব তোমার রূপের সঙ্গে মেশা !

* *
*

শিথিল অলক প'ড়ল বাঁধা না জানি কার্ আশে,
কার্ তরে ওই দৃষ্টিছায়ে স্বপ্ন খানি ভাসে ?
ঘুমন্ত এই রাজ্যে আছি আমিই শুধু জাগি—
চোখটি মেলে ঘুম-পাড়ানো চুমোর পরশ মাগি'।

॥ ৩ ॥

চন্দ্র সূর্য্য লুটায় মাথা রূপের দ্বারে তব—
তাই কি চাহ, গরবিণী, পথটি চেয়ে রব ?
মিথ্যা আশার অগ্নিতাপে জ্বালিয়ে কিবা ফল—
মৌন-আলাপ-মেঘের মাঝে কোথায় শান্তিজল ?

॥ ৪ ॥

মিথ্যা তব মায়ার দিঠি ইন্দ্রজালের বাণ—
আবছায়ে তার লুকিয়ে রাখো যুদ্ধশরের টান ;
চোখের দেখা দিবস নিশি—তাই কি অবহেলা
জমাট-বাঁধা অশ্রু দিয়ে তাই কি নিঠুর খেলা ?

*   *
*

তোমার দেওয়া একটি দুখে ভুলিয়ে দেছ কত
দীর্ণ হিয়ার জ্বালা শতেক যন্ত্রণারি ক্ষত ;
ভিতরটি মোর দেখছ, প্রিয়া, দুখের আগুন জ্বেলে—
হ'চ্ছে বাহির দীপ্তি উজল্ সোনার বরণ মেলে !

॥ ৬ ॥

বুক-ফাটা এই দীর্ঘ নিশায় ক'রবে তারে হেলা ?
আগুন-ছোঁয়াচ লাগবে না কি আগুন নিয়ে খেলা ?
জান্লা তলে শেষ রজনীর করুণ দীর্ঘশ্বাস—
আঁকবে শুধু ঊষার ঠোঁটে নিঠুর পরিহাস ?

আঁখির ডোরে বাঁধ্‌লে আমায় সেই না জানি কবে,
পরিহাসের নিঠুর বাণে স্বস্তি কোথা ভবে!
স্মৃতিটি মোর ছাই অবশেষ প'ড়বে যবে পায়ে—
ফুৎকারেতে উড়াবে তায় নূতন প্রেমের দায়ে?

॥ ৮

অন্তরেতে মর্‌মী কহে—আসবে ফিরে প্রিয়া,
বুকের তালে গাইছে কে যে—আসবে ফিরে প্রিয়া;
বাতাসে আজ বইছে তাহার আঁচলটুকুর হাওয়া,
শুক্‌তারাতে ফুটছে তাহার ঘুমটি-ভেঙ্গে-চাওয়া!

॥ ৯

* *
*

মুখের কথার মূল্য কে দেয় জগৎ মাঝে স্বীয়?
আজ্‌কে যাহার পরশ মলিন, কাল সে ছিল প্রিয়!—
এইটি বুঝে সংসারেতে হুঁচোট্‌ খেয়ে পায়ে—
বাস বেঁধেছি নির্জ্জনেতে অরণ্যানীর ছায়ে!

॥ ১০॥

স্মরণ রেখো বন্ধু আমার, এইটি শুধু মনে—
নারীর তুষ্টি হয়না শুধুই মিষ্ট আলাপনে;
হৃদয় দুয়ার খুলবে, খুলো—সম্ভ্রমেতে, ভয়ে—
নারীর মনটি পায়না কেহ ছন্দ বিনিময়ে!

॥ ১১

স্বর্ণ মূল্যে সওদা হেথা প্রেমের বিকি কিনি,
স্বর্ণমোষায় ধনী সে নেয় লাবণ্যেরে জিনি,
প্রেমের সাথে পণ্য মিশায়, দুগ্ধ সাথে সুরা—
রতির শিরে শোভে হেথায় চারু স্বর্ণচূড়া !

॥ ১২

দীর্ঘ বরষ কাটল আমার কিসের স্বপ্ন-ঘোরে,
বসন্ত যে বিদায় নিল ফুলের সাজি ভ'রে !
শিরে যাদের বরণডালা—কোথায় তারা আজি ?
পাপড়ি-খসা গোলাপ আমার, শূন্য আমার সাজি !

॥ ১৩ ॥

* *
*

তুচ্ছ এ সব ঘরের কোণে হিংসা, দুর্ব্বলতা
উছল্ সুরায় সুরের খেলা—নাইকো যথা তথা,
মিল্‌বে তাহা তাঁবুর ছায়ে সাকীর সাথে সাঁঝে—
মূর্খগুলোয় রেখে সুদূর হট্টগোলের মাঝে !

॥ ১৪

* *
*

একটি চুমোর পরশ লাগি' মরণ যাচি' লব,—
জাহান্নমের অগ্নিতে নয় জীবন্মৃত হ'য়ে রব।
ভাগ্যদেবী থাকুন্ ব'সে লেখন নিয়ে করে—
বেঁচে আছি আজও তোমার চুম্বনেরি তরে !

॥ ১৫

শতেক নরক ভুগতে রাজি ধূম্র অন্ধকারে,
বিশ্বজগৎ চুর্ হ'য়ে যাক্ ভাগ্য-জাঁতার ভারে—
আর্জিতে মোর পেশ্ ক'রেছি ইচ্ছাটুকু পুরা—
ভণ্ড সাথে ঢাল্‌তে না অম্ল সুরাই হ'তে সুরা!

॥ ১৬

* *
*

অম্ল-মধুর নারেঙ্গি এই মিশ্ররসে ভরা,—
মধুর ভাগটা নিংড়ে নিতে ক'রতে হবে ত্বরা,
জগৎ মাঝে দুঃখ সে তো চিরন্তনীর খেলা—
সাকী, সুরা, সুর-ও আছে তার ফাঁকেতে মেলা!

॥ ১৭

* *
*

ভাগ্যদেবীর পাখার আওয়াজ শুনছি আজি যেন,
গুল্ বাগিচার গন্ধ আজি ঘিরছে আমায় কেন?
নিঃশ্বাসে ওই আসছে ভেসে কল্পলোকের কথা,
স্পর্শে তোমার কাঁপছে দেহ— কী সে পুলক ব্যথা!

॥ ১৮

শুভ্র শিরে স্বর্গ আশীস্—কেনই বা সে আশা?
আয়ুর মেয়াদ শূন্য— সে তো মরণ-ভীরুর ভাষা;—
ত্রস্ত মুখের অশ্রু পরে সর্ব্বহারার হাসি,
বর্ষা পরে মানায় ভাল শরৎ মেঘের রাশি!

॥ ১৯ ॥

ঘুম ভেঙ্গে কাল দেখনু ভোরে নিরাবরণ সাকী--
অন্ধ হ'য়ে যায়নি কেন মুগ্ধ লোলুপ আঁখি ?
সুপ্ত মুখে দেখনু স্মৃতির রক্তরেখা ঘোর—
যার লালিমায় রাঙিয়ে উঠে পেয়ালাটুকু মোর !

॥ ২০ ॥

* *
*

আলিঙ্গনে প'ড়ল ধরা বাসর রাতে প্রিয়া,—
জিব্রেইলের পাখ না-ঢাকা মোদের যুগ্ম হিয়া,
জাগ্‌ল মনে—এইতো আমার চিরন্তনী সাকী—
স্বপ্ন শেষে দেখ্‌নু এ কি ?- আসলটুকুই ফাঁকি !

॥ ২১ ॥

* *
*

গালের পাশে তিলটি কালো আছেই না হয় আঁকা,
তারির তরে গর্ব্ব এত—মুখ ফিরিয়ে থাকা ?
তিলটি তোমার- শুনলে পরে ক'রবে নাকি মাফ ?—
আমারি এক গোপন দিঠির একটি ক্ষুদ্র ছাপ !

॥ ২২

* *
*

অধর তোমার মেনেই নিলেম— জীবন বিস্মরণী,
লজ্জা-রাঙা বদন তোমার রক্তপ্রবালখনি,
কণ্ঠে খেলে বুলবুলেরি মঞ্জু সুরের মায়া—
তোমার কান্তি আমার সে যে প্রেমের প্রতিচ্ছায়া !

॥ ২৩

দুইটি আঁখির ইন্দ্রজালে চৌদ্দ ভুবন সারা—
ছন্দোবন্ধে অমর হ'য়ে ফুটবে না কি তারা ?
ছোট্ট দুটি কানের পাতে—শুধ্‌রে কবির ভুল—
আমার গানের মুক্তো দিয়ে পরিয়ে দেবো দুল্‌ !

॥ ২৪ ॥

* *
*

কানের কাছে মুখটি এনে ব'ললে—ফিরে চাও,
ভাব্‌না চিন্তা দূর ক'রে মোর হৃদয়টুকু নাও ;
হৃদয় নামে যার পরিচয়—দেখনু কেতাব খুঁজে—
তা' শুধু এক স্নায়ুর ব্যাপার কেউ যা নাহি বুঝে !

॥ ২৫

* *
*

সাকীর সাথে স্বপ্ন রচন নদীর ধারে ব'সে –
খেয়ালটা সেই মিটিয়ে নে গো—স্মৃতিটি যাক্‌ খ'সে ;
ফুলের মতই প্রাণের আভাস—দিন কয়েকের নেশা –
সেই ক'টা দিন পেয়ালা ভ'রে হাসির সঙ্গে মেশা !

॥ ২৬ ॥

* *
*

তোমায় আমায় ব'সে আছি হাতটি রেখে হাতে—
নিয়ৎ-চাকার বিরাম তো নেই মিলন-মধুরাতে ;
ঘূর্ণিচক্রে প'ড়ব যেদিন বিচ্ছেদেরি ক্ষণে—
একটি ফোঁটা অশ্রু সাথে প'ড়বে আমায় মনে ?

॥ ২৭

নদীর তীরে শ্যামলছায়া কিছুই নাহি মানি—
বাহির হ'লেম যেথায় শোভে প্রিয়ার কুঞ্জখানি ; .....
চুলের গন্ধে ভরা শিথান, লেখন তারি পাশে—
প্রিয়া গেছেন তীর্থে আমার একটু পুণ্য আশে !

॥ ২৮ ॥

গোরস্থানে বন্ধু কয়েক—তর্কবাগীস্ ঘোর—
রূপের তত্ত্ব বিশ্লেষণে ক'রলে নিশি ভোর ;
গোরের ভিতর ফুটল বাণী—বৃথাই খোঁজা হোথা,
রূপের তত্ত্ব আছে সে যে মাটির নীচে পোঁতা !

॥ ২৯

* *
*

কৃপণ আমায় ব'লেছ সবাই—সত্য কতক বটে !
প্রেমের কৃপণ বদনামটা—মিথ্যা কিন্তু রটে ;
কপোল পাশে ওই যে কালো তিলটি আছে চুমি
পাই যদি আজ—দেবোই দেবো দুইটি রাজ্যভূমি !

৩০

* *
*

বসন্তে আজ ঘুমন্ত ফুল উঠছে মাটি চিরে—
মাটির তলে নাই কি সাড়া ওই অচেতন শিরে ? .....
চোখের জল ভিজিয়ে দিছি তোমার সমাধ্-ভূমি—
কাফন্ ছেড়ে আসতে উঠে ব্যথা না পাও তুমি !

॥ ৩১ ॥

ক্লান্তি যখন ঘনিয়ে এল প্রেমের অবসানে,
শুষ্ক হাসি হেসে প্রিয়া ব'ললে কানে কানে —
সমস্তটাই আমার, বন্ধু, এক নিমেষের ভুল,
কবির আবার হৃদয় কোথা—মরুর বুকে ফুল ?

॥ ৩২

*
*

কিসের তরে ক'রলে সে মোর উচ্চ শিরটা নত—
প্রেমের দায়ে হ'তেই হ'ল প্রিয়ার মনোমত ;......
'নতির সনে দেখি প্রেমের স্বপ্নজালটি ছিন্ন—
অবনত নাই হ'লে কি ফলটা হত ভিন্ন ?

॥ ৩৩

* *
*

দিন্ দুনিয়ার মালিক হওয়া শুধুই কথার কথা—
নাই যদি মোর ঘুচ্‌ল তাহে একটি ক্ষুদ্র ব্যথা !
মুকুট-পরা শিরটি সদাই মানের ভয়ে সারা,—
যশের তরে স্বস্তি বিকোয় এমন মূর্খ কারা !

॥ ৩৪

শাহান সাহের আমন্ত্রণী ধন্যবাদের সনে
শিরটি পেতে নিলেম আমি প্রবাসযাত্রা ক্ষণে ;......
মাঝ-দরিয়ার তুফান মাঝে হীরক মালার লোভ
লুপ্ত হ'ল—রইল শুধুই ঘরটি ছাড়ার ক্ষোভ !

॥ ৩৫ ॥

ছিলেম আমি দুয়ার পাশে বিদায় বেলার ক্ষণে
বিদায়-আঁখির প্রসাদ যেচে—প'ড়বে তাহা মনে ?
সেদিন ছিল কোন সুদূরে তোমার অধিষ্ঠান—
ক্লান্ত খিন্ন সুরটি মম পায়নি সেথায় স্থান !

॥ ৩৬ ॥

মরুর পথে প'ড়ছে মনে তপ্ত রৌদ্র রাগে—
মোর তরে কার স্নিগ্ধ দিঠি গৃহের কোণে জাগে !
ভাগ্যলিপির অঙ্কপাতে—এইটি দেখো প্রভু—
কালের খেলায় দীপ্তি তাহার নষ্ট না হয় কভু !

॥ ৩৭ ॥

* *
*

সাকীর চোখে স্বপ্ন-আবেশ তোমার তরে নহে—
অভিমানের অগ্নিজ্বালে হৃদয়টি তাই দহে ?......
পেয়ালা আজি শূন্য, কালি পূর্ণ হবে যবে—
যৌবনেরে মিথ্যা ক'রে নিমকহারাম হবে !

॥ ৩৮

* *
*

পুঁথির পড়া শুধরে নেবো—একটু যদি পাই
সেই পুরাতন সুরার সোয়াদ—মূল্য যাহার নাই !
শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আজ ব'লব তোমার কানে
এই দুনিয়ার গোপন কথা ছন্দে এবং গানে !

॥ ৩৯ ॥

ভাব্‌ছ তুমি—মূর্খ এ জন তাকিয়ে আমার পানে
কী কথা সব ছন্দে গাঁথে—নাইকো যাহার মানে!
ভাব্‌ছি আমি—সুরটি যে আজ ফুটছে আমার গীতে—
তোমার না হয় আর এক জনার তুল্‌বে সাড়া চিতে!

॥ ৪০ ॥

* * *

মরুর মাঝে ব্যর্থ তোমার কটাক্ষেরি তীর—
অবিদ্ধ এ শুষ্ক হৃদে কোথায় অশ্রুনীর?
চক্ষে তব ক্লিষ্ট প্রেমের ওই ছলনার শিখা
আমার মাঝে ক'রছে রচন ঘৃণ্য মরীচিকা!

॥ ৪১ ॥

* * *

কঠিন হৃদয়, বন্ধু, আজি প্রেমের নেশায় চুর?
ভয় কি—সুরা-সঞ্জীবনী-ক'রবে মোহ দূর;
স্মৃতির ঘরে প'ড়লে শূন্য—দুনিয়া নস্যসাৎ,
একটি দানের খেলায় হবে রূপের কিস্তিমাৎ!

॥ ৪২

* * *

মিলন লাগি মিথ্যা আশায় কাট্‌ল বিভাবরী,
অশ্রুভেজা শিথান শিরে বাসর শয্যা' পরি;
স্বপ্নদেবী রাত্রি শেষে ব'লবে তোমার কানে—
ব্যর্থ নিশার বাণীটি মোর জীবন অবসানে!

॥ ৪৩ ॥

তন্বী নারী ছিল সে এক—দর্পনেতে তার
ফেল্‌লে এসে সর্ব্বনাশা উজল রূপের ভার ;
রুমালখানি রাখতে পায়ে ব'ললে মোরে হেসে—
রূপটি গেলে থাকবে, বঁধু, কোন্ খেয়ালের দেশে !

॥ ৪৪

* *
*

তোমার মুখের একটু হাসি, কণ্ঠে বীণা তান,
কোন্‌টিতে এই ব'সে থাকা, নেশায়-মাতা প্রাণ,
শিরার মাঝে সুরার খেলা তপ্ত রক্ত সাথ—
হাতেম্ কাছে কিসের তরে পাতব্‌ গিয়ে হাত ?

॥ ৪৫

* *
*

চোখের জলে ভিজিয়ে দিনু প্রিয়ার অলক রাশ—
ঘুচিয়ে সে কি দেবে আমার ভবিষ্যতের ত্রাস ?
ব'ললে প্রিয়া ছাড়িয়ে অলক - লওগো মোরে বুকে
ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে আজ ক্ষণিকের সুখে।

॥ ৪৬

* *
*

গাইছ সাকী—কণ্ঠে তোমার খেল্‌ছে নব তান,
নবীন প্রাণে নূতন সুরা ক'রব আজি পান,
ওষ্ঠে তোমার চুমোর পরশ লাগবে আজি নব—
নবীন রঙে চোখ দুটি মোর রাঙিয়ে আজি লব !

॥ ৪৭

পাপড়ি-খসা ফুলের বোঁটায় দীপ্ত উষার আলো
জাগায় নাকো কোনই সাড়া—মন্দ কিম্বা ভাল ;—
বৃথাই বাণী সান্ত্বনারি হৃদয় যখন দীর্ণ,
স্নিগ্ধ ছায়া বৃথাই যবে পথটি কাঁটায় কীর্ণ !

॥ ৪৮

মূর্খ তারা নিজের কথা ভেবেই মরে শোকে,
বিরাট মহান সৃষ্টিটা এই প'ড়ছে নাকো চোখে ;
চোখের তারা দিচ্ছে নাকি চোখটা খুলে তোর ? -
অন্ধ তারা নিজের পানে, পরের রূপেই ভোর !

॥ ৪৯

বাণী তাহার কী অবসাদ ছড়িয়ে দিলে বুকে,
বিরক্ত ওই অধর পরশ তিক্ত লাগে মুখে ;
প্রাণের পিয়াস মিট্‌ল যাহার পাত্রসুধা পিয়ে –
তারেই সে আজ চায় ভুলাতে মিথ্যা সোহাগ দিয়ে !

॥ ৫০ ॥

কী আবেশে রাখ্‌লে সে মোর কোলের পরে মাথা,
সাঁঝের আলোয় স্বপ্নরচন, কথার মালা গাঁথা ;......
কিসের ব্যথায় ব'ললে তুলে দীপ্ত আঁখি কালো—
স্বপ্ন সফল হয় সাথে যার তারেই বাসি ভালো !

॥ ৫১ ॥

ঘরের কোনের শান্তিটুকু, ক্লান্তি বাহিরের,
মিষ্ট কিম্বা তিক্ত স্বাদে মিটুক্ স্ফুর্ত্তি জের—
সত্য জেনো—এমনি ক'রেই ভ'রছে হিসেব-খাতা,
এমনি ক'রেই ঝ'রছে আয়ুর একটি ক'রে পাতা !

॥ ৫২

* *
*

ভবিষ্যতের জাল্‌টা বোনা উর্ণনাভের মত,
ঠিক দিয়ে তার টানা পোড়েন্ বুদ্ধি খরচ কত !
সমস্তটাই সরল—শুধু এইটি বুঝতে বাকী—
নিঃশ্বাসে যা' নিচ্ছ টেনে প্রশ্বাসে তা' ফাঁকি !

॥ ৫৩ ॥

মস্‌জিদেরি উচ্চ মিনার উঠন্ত আকাশ চিরে,
বাদশাজাদা ব'সত এসে নম্রনত শিরে—
আজকে সেথায় মুয়েজ্জিনের নীরব কণ্ঠতান—
ভগ্ন চূড়ায় করুণ-আঁখি ঘুঘুর অধিষ্ঠান !

॥ ৫৪

* *
*

বুদ্ধি ভীষণ ক'রলে আমার জ্ঞানের বোঝা ভারী,
প্রেমের সাথে দেখনু ক'সে—নয় তুলনা তারি ;
সাগর মাঝে হারিয়ে-যাওয়া বৃষ্টিবিন্দু সম
প্রেমের মাঝে দিশাহারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি মম !

॥ ৫৫

বসন্ত যে তোর দুয়ারে প্রথম এলো আজি—
বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতে ভরিয়ে নে তোর সাজি,—
সুরার পাত্র শূন্য কভু হয়না যেন ভুলে—
আঙুল গুলো খেলিয়ে বেড়াক তন্বী সাকীর চুলে!

॥ ৫৬

* *
*

অচিন্ দেশের অতিথ এলো অকুণ্ঠিত পায়ে,
কল্পলোকের বার্ত্তা নিয়ে আমার কুঞ্জ ছায়ে;
আঁখির আবেশ, লজ্জা পরশ, রুদ্ধ বাণীর সনে
হারিয়ে যাওয়া সুরটি আমার প'ড়ল সেদিন মনে!

॥ ৫৭ ॥

* *
*

নিঃশ্বাসে তার মুঞ্জরিল শুষ্ক কুঞ্জ মোর,
স্পর্শে তাহার কাট্‌ল আঁখির তন্দ্রা আলস ঘোর,
চুলের গন্ধে প'ড়ল মনে যুগান্তরের স্মৃতি—
সদ্য-জাগা বুকের তালে বাজ্‌ল সুরে গীতি!

॥ ৫৮ ॥

* *
*

আপন মাঝে ঘুমিয়ে ছিলেম দীর্ঘ সারাবেলা,
কুটিল গ্রন্থি জড়িয়ে ছিলেম মর্ম্ম মাঝে মেলা;—
সোনার কাটি ছুঁইয়ে কে আজ অন্তরেতে কহে—
বিশ্ব-হৃদে আসন তব সামান্য সে নহে।

॥ ৫৯ ॥

তাহার সনে মিল্‌ব আজি মরণ-খেলা খেলে—
আমায় যদি দেখায় কেহ দিব্য প্রদীপ জ্বেলে—
বেহেস্তেরি কুঞ্জছায়ে শয়নটি তার মেলা,
আন্‌মনে মোর আসার আশায় কাট্‌ছে সারাবেলা।

॥ ৬০ ॥

* *
*

পথের ধূলায় অন্ধ আমি দৃষ্টিশক্তিহীন,
আকাশ—সেও কৃপণ আজি শুধ্‌তে ধরার ঋণ ;
বার্ত্তাটি তার বহন ক'রে বৃষ্টি আসে হেথা—
বর্ষাধারা ধ'রেই যাব সে আছে মোর যেথা।

॥ ৬১ ॥

* *
*

মোর সমাধি কেউ যদি বা খোলেই এসে কভু—
নিবিড় ধোঁয়ার অন্ধকারে দেখ্‌তে পাবে তবু—
তার বিরহের অগ্নিতে মোর দহন পলে পলে,
সেই আগুনের ছোঁয়াচ লেগে সৃষ্টিটাও জ্বলে।

॥ ৬২

* *
*

যেদিন আমার গোরের পাশে ব'সবে তুমি গিয়ে,
মদির-আঁখি সাকীর সাথে মদির-পাত্র নিয়ে—
মদির-গন্ধ-আকুল হাওয়া, সাকীর কণ্ঠতান
হয়ত সেদিন মৃতের দেহে সঞ্চারিবে প্রাণ!

॥ ৬৩ ॥

প্রেমের স্বপন টুট্‌বে যবে—সিক্ত সোহাগ রসে
আশ্বাসেরি বাণী যেন কর্ণে নাহি পশে ;
নিষ্ঠুরতা অসহ্য যা' মায়ার নামে রটে,
মৃতের উপর অস্ত্র প্রয়োগ নিরর্থকও বটে !

॥ ৬৪

*
*

যাবার সময় ফুটলো না তো রুদ্ধ কণ্ঠ গানে,
বিদায় নিলে নাই শুনে মোর বিদায়বাণী কানে —
কোথায় আজি তার অভিযান দিব্য পুষ্পরথে —
বক্র গতি ফেলে আমায় কণ্টকেরি পথে !

॥ ৬৫

হৃদয় আজি বিষাদ ভরা কোন্ অজানার শোকে—
তুচ্ছ কথায়, গানের সুরে, অশ্রু আসে চোখে ;
তন্ত্রী-বাঁধা সেতার কি দেয় স্পর্শে এম্‌নি সাড়া—
পূর্ণ পাত্র তাই কি উছায় ক'রলে নাড়াচাড়া !

॥ ৬৬ ॥

শতেক বরষ পরে আমার রইবে কি আর বাকী ?
ধূলির দেহ মিশবে ধূলায় চিহ্ন নাহি রাখি ;
যদিই বহে হাওয়ায় সেদিন চুলের গন্ধ তারি—
ধূলির দেহে প'ড়বে সাড়া—সঠিক ব'লতে পারি !

॥ ৬৭

কোন্ সুদূরের যাত্রী তুমি নাইকো আমার জানা,
অচিন্ পথে ফেল্‌তে চরণ কেউ করে না মানা ?
সূফী তুমি—তোমার পথে জ্ব'লবে জ্ঞানের বাতি,
রুদ্ধ ঘরে অশ্রু আমার ঝ'রবে দিবস রাতি !

॥ ৬৮ ॥

*

সোনার শিকল চরণ হ'তে খ'সবে নাকি কভু ?—
সর্ব্বহারার গর্ব্ব আমার টুট্‌লো না তো তবু !
ভগ্ন হৃদয় 'পরে আমার অস্ত্র শাণি' লব—
সেই ছুরিকার স্পর্শে আমি ম'রেই অমর হব।

॥ ৬৯ ॥

বর্ষা এলো ছড়িয়ে আশীষ শুষ্ক তৃণের শিরে—
কে গেল মোর দুয়ার হ'তে গোপন পায়ে ফিরে ?
বর্ষা গেল শ্যামল শোভা বিছিয়ে মরুর 'পরে—
আজ দেখি কার্ অশ্রু-চিহ্ন আমার শূন্য ঘরে !

॥ ৭০ ॥

সাকী যে কাল বিদায় লবে রাত্রি হ'লে ভোর
অশ্রু আভাস কোথায় আজি পূর্ণ পাত্রে মোর ?
নিঃস্ব ক'রে আপ্‌নারে আজ ক'র্‌বো তারে দান—
হবেই যে কাল্ বিশ্বহৃদে সর্ব্বহারার স্থান !

॥ ৭১

শয়ন 'পরে ভোরের আলো, কোথায় বাজে বাঁশী,
শেষ রজনীর সলাজ স্মৃতি জাগায় মুখে হাসি ;
মিলন শ্রান্ত আঁখির তারা অশ্রু সজল নহে,
ঘনিয়ে-আসা বিচ্ছেদেরি বার্ত্তা নাহি বহে।

॥ ৭২ ॥

* *
*

সাকী ওগো, শুন্‌ছ তোমার কবির কণ্ঠসুরে
উঠ্‌ছে বেজে সৃজন-গীতি সুদূর স্বপ্নপুরে,—
তরল আজি পাত্রে তাহার তোমার স্পর্শমণি
কবির গানের সুরটি তোমার কথার প্রতিধ্বনি !

॥ ৭৩ ॥

* *
*

জীবন যে তার জড়িয়ে ছিল তোমার স্বপ্ন সাথে,
সুরটি তাহার সুপ্ত ছিল ওই নয়নের পাতে,
তোমার দিব্য মন্ত্রে তাহার প্রাণের প্রতিষ্ঠান—
তাহার কণ্ঠে বাজবে চির তোমারি জয় গান।

॥ ৭৪

* *
*

অমর হ'য়ে রওগো সাকী, সৃষ্টি যদিন আছে,
দখিন্ হাওয়া কবির কথা ব'লবে তোমার কাছে,
স্মৃতি তাহার উঠ্‌বে ফুটে রক্ত-রাঙা ফুলে—
বিম্বাধরে ছুঁইয়ে তাহা পরিয়ে নিও চুলে !

॥ ৭৫ ॥

খতম্

বোলশেভিকির স্বরূপ

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

আজ ইউরোপ অর্থাৎ রুশ বাদে ইউরোপের অবশিষ্ট অর্দ্ধ, যে শক্তি-সঙ্ঘ ফলত ইউরোপের ও তথা জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তাহারা, বোলশেভিকিকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিতেছে; বলিতেছে বোলশেভিকি হইতেছে দারুণ অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যাচার বিভীষিকা। বোলশেভিকি সম্বন্ধে এইসব যত বিশেষণই প্রযুক্ত হোক না কেন, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বোলশেভিকি ইউরোপেরই নিজের সন্তান, ইউরোপেরই ধর্ম্মের জের সে টানিয়া চলিয়াছে—বোলশেভিজম হইতেছে ইউরোপের কর্ম্মফল, 'নেমেসিস্' (Nemesis)। ইউরোপ যাহা লইয়া ইউরোপ, ইউরোপের বিশিষ্ট শক্তি যাহা, স্বধর্ম্ম যাহা, ঠিক সেইটি ধরিয়া ধরিয়া তাহারই চূড়ান্তে পৌছিতে চাহিতেছে বোলশেভিকি—বোলশেভিকির ইহাই ভিতরকার বল ও গৌরব। ইউরোপের ইউরোপত্ব তাহার তর্কবুদ্ধিতে, তাহার যুক্তিবাদে, তাহার মানস ইচ্ছা-শক্তিতে, তাহার বিজ্ঞান-সিদ্ধিতে—সজাগ সক্রিয় মনোময় পুরুষের বিগ্রহ হইতেছে ইউরোপ। মনের উপরে, হৃদয়ের গভীরে কি সত্য, কি রহস্য আছে বা না আছে ইউরোপ তাহার সংবাদ বেশি কিছু রাখে নাই। এক প্রাচ্যের সংস্পর্শে মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া এই সম্বন্ধে যা একটু সে সচেতন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে বস্তুকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে, কার্য্যকরী শক্তি করিয়া তুলিতে কখন পারে নাই। ইউরোপের চেতনা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে মানস-শক্তির মধ্যে; সে চাহিয়াছে মনের বিচার বিতর্ক দিয়া সকল সমস্যা মীমাংসা করিতে আর মনের বল দিয়া কর্ম্মের পথে চলিতে। এই যে যুক্তি-তন্ত্র মন, ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যে, কোথাও কোন ধোঁয়া অস্পষ্টতা সে রাখিতে চায় না, কোন সন্দেহ কোন দ্বিধার অবকাশ সহ্য করিতে পারে না। ইহার আলো রূঢ় রুক্ষ, চলে ঋজু রেখায়। জিনিষের আশে পাশে আলো-আঁধারী রহস্যের দিকে ইহা মোটেও দৃষ্টিপাত করিতে চায় না। ইহার গতি কেবলি সম্মুখে, বাহিরের দিকে—জিনিষের যে সুস্পষ্ট স্থূল অবয়ব তাহারই সহিত ইহার পরিচয়, জিনিষের ততটুকু ও সেইটুকুই সে গ্রহণ করিতে চায় ও পারে যতটুকু ও যাহা আশু প্রয়োজনে, অব্যবহিত কর্ম্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যুক্তি-তন্ত্র মন স্বভাবতই হইতেছে ঘোর বাস্তব-তন্ত্র।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপও সমাজে একটা আমূল পরিবর্ত্তন, এমন কি মানুষের প্রকৃতিতে একটা বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা দেখিতে সুরু করিয়াছিল। জড় বিজ্ঞান যখন আবির্ভূত হইল তাহার অত্যদ্ভুত আবিষ্কার সব লইয়া, তাহার নূতন নূতন ক্ষমতা লইয়া—দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপ চমৎকৃত হইয়া উঠিল, নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করিল; বলিয়া উঠিল, হাঁ পাইয়াছি এইবার—"ইউরেকা"—পৃথিবীকে উল্টাইয়া ফেলিবার কলকাঠি পাইয়াছি। সেই হইতে তাহার একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া চলিয়াছে যে, এই বিজ্ঞান—বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর বৈজ্ঞানিক শক্তিই ভাবী মানুষকে তাহার সকল সার্থকতা, তাহার চতুর্ব্বর্গ লাভ করাইয়া দিবে। মানুষের ব্যক্তিগত আধিব্যাধি, তাহার সমাজগত দুঃখ দৈন্য সমস্ত দূর করিবে এই বিজ্ঞানের অবদান। এই বিজ্ঞানেই মানবজাতির জীবনে আনিয়া দিবে জ্ঞানের আলো, শক্তির হাওয়া, আনন্দের প্লাবন। ভূতলকে যদি স্বর্গের মত কিছু করিয়া তুলিতে হয় তবে তাহা পারিবে একমাত্র এই বিজ্ঞান।

অবশ্য প্রথম যুগের এই স্বপ্ন আজকাল হয়ত অনেকখানি মলিন হইয়া গিয়াছে; বৈজ্ঞানিকেরা সকলে আর তেমন জোর করিয়া ভরসা করিতে পারেন না যে, কেবল বিজ্ঞানেরই সহায়ে মানুষের জীবন তাহার চরম সার্থকতায় পৌছিতে পারিবে। তবুও ইউরোপ যাহা কিছু চেষ্টা করিতেছে মানব জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে, তাহার আশ্রয় বিশেষ ভাবে

আত্মশক্তি লাইব্রেরী হইতে প্রকাশ্য গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

হইয়াছে এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি। মানুষকে রোগ হইতে মুক্ত রাখা, তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলা—সুস্থ ও সবল সন্তান সন্ততির জন্ম দেওয়া—এমন কি যদি সম্ভব হয় জরাকেও জয় করা, দীর্ঘজীবন ও যৌবন আয়ত্ত করা—মানুষের অশন বসন ভূষণের সম্যক উৎপাদন নির্ম্মাণ ও বণ্টন—অর্থের সৃজন আহরণ—মস্তিষ্কের সুব্যবহার, বুদ্ধির উৎকর্ষ, জ্ঞানের অর্থাৎ শিক্ষার প্রসার—ব্যষ্টিগত ও সমাজগত জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য এই যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তের জন্য যাওয়া হইতেছে বিজ্ঞানের দুয়ারে; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধরিয়া, একান্ত যুক্তির ধারায় চলিয়া সকল সমস্যার মীমাংসা করা হইতেছে। যাহা কিছু ভ্রম-প্রমাদ, যাহা কিছু নিরর্থক ও পরিত্যাজ্য বিবেচিত তাহারই নাম দেওয়া হয় অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক (unscientific and irrational)।

বিজ্ঞানের এতখানি পূজারী হইলেও ইউরোপ কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের পথে আপনাকে ঢালিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান ত সবে মাত্র ইউরোপের আসরে নামিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে সমস্ত অতীতের যে একটা বিশেষ সংস্কারের ধারা চলিয়া আসিয়াছে, সেটিকে ইউরোপ হঠাৎ নাকচ করিয়া দেয় কি রকমে? ইউরোপের বুদ্ধি বিশেষভাবে যুক্তিবাদী হইলেও, তাহার প্রাণের মধ্যে আছে অনেকখানি প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক শিক্ষা দীক্ষার মতি গতির রেশ—প্রাচীনতর খৃষ্টীয় ধর্ম্মসাধনার, মধ্যযুগের আভিজাত্য-তন্ত্রের ইদানীন্তন কালের বুর্জ্জোয়া তন্ত্রের অঙ্কুর সব। কর্ম্মক্ষেত্রে সকল সময়ে এই বিরোধী শক্তির প্রভাব সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বৈজ্ঞানিক যুগেও বিজ্ঞানের নানা নির্দ্দেশ তত্ত্বহিসাবে মানিয়া চলা সত্ত্বেও, বহু "কুসংস্কার", বহু জীর্ণ রীতিনীতি তাহার ব্যষ্টির জীবনে, সমাজের অবস্থায় অটুট রহিয়া গিয়াছে; এবং এই সমস্তই তাহার সকল সম্মুখে চলার মধ্যে পিছন-টান হইয়া আছে। ইউরোপ হইতে কার্য্যত বরং আমেরিকা অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিতান্ত্রিক হইয়া উঠিতে পারিয়াছে—ইহার এক কারণ বোধ হয় এই যে, ইউরোপের মত তাহার উপর একটা দীর্ঘ অতীতের সংস্কার-ভার নাই, নূতন ক্ষেত্রে নূতন রোপিত তরুর মত সম্পূর্ণ নূতন জীবন সে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে, পিতৃপিতামহদের পাপের জের টানিয়া তাহাকে চলিতে হয় নাই। কিন্তু তবুও আমেরিকা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও "যৌক্তিক" হইয়া উঠিতে পারে নাই। শারীরিক সংস্কার সম্বন্ধে সে অনেকখানি মুক্ত হইয়াছে বটে, দেহগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এক রকম যতদূর সম্ভব ততদূরই বিজ্ঞান হইতে বুদ্ধি হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে; কিন্তু প্রাণের কোণে, মনেরও কোণে কোণে বহু অন্ধকার তাহাতে জমা হইয়া আছে, বহু বিষয়ে এখনও সে অন্ধ প্রাচীনপন্থী কুসংস্কারাপন্ন হইয়া আছে। যে মনোবৃত্তির ফলে পুরুষ ও নারীর ওজন সে সমান করিয়া দিয়াছে, তাহারই আর একটা দিক আবার Fundamentalist-দের আদর করিয়া লইয়াছে।

এইখানেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বোলশেভিকি—ইউরোপে যাহা পারে নাই, আমেরিকাও যাহা অর্দ্ধ-সমাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, বোলশেভিকি সেই অসাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছে এবং অনেকখানি যে পারিয়াছেও তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ তর্ক-প্রতিষ্ঠ বুদ্ধির, যুক্তিবাদের প্রখর উগ্র আলোকে বোলশেভিকি যেমনটি দেখিয়াছে বুঝিয়াছে ঠিক সেই মাপে মাপে মানুষকে সমাজকে সে ঢালিয়া সাজিতে বসিয়াছে,—কোন রকম দ্বিতীয় বৃত্তিকে সে আমলেই আনিতে চায় নাই, কোন সংশয় কোন দ্বিধা কোথাও আসিয়া যে তাহার প্রচেষ্টাকে খণ্ডিত দুর্ব্বল করিয়া দিবে এমন অবসরই সে দিতে চায় নাই। বোলশেভিকির সমস্ত সাধনা তাই ঋজু, সুদৃঢ়, একমুখী। যুক্তি বলিয়া দিতেছে, বিজ্ঞানে প্রমাণ করিতেছে, ভগবান নামে কোন বস্তু নাই, অতীন্দ্রিয় অতিমানস কোন লোক নাই, "ধর্ম্ম" বা আধ্যাত্মিকতা হইতেছে একদল একছত্র-প্রভুত্ব-প্রয়াসীর গঠিত সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়াইবার দাস করিয়া রাখিবার মন্ত্র যন্ত্র মাত্র। তেমনি নৈতিকতা সুরুচি সদাচার নামে পূজিত যে সব কর্ত্তব্যের বিধি নিষেধ তাহারাও অনেকে হইতেছে "বুর্জ্জোয়া"-সংস্কারের সৃষ্ট কুহেলিকা। মানুষকে প্রকৃতিকে দেখিতে হইবে খোলা চোখে, কর্ত্তব্যের আদর্শ খুঁজিতে হইবে রূঢ় সত্যের বাস্তবের তাগিদের মধ্যে। বিজ্ঞানে এই শিক্ষা দিতেছে, যুক্তি ইহারই সমর্থন

করিতেছে। প্রকৃতির প্রথম তাগিদ বুভুক্ষা, জীবনের বনিয়াদ হইতেছে তাই অন্ন—এই অন্ন-ব্যবস্থার অনুসারেই সমাজের সমগ্র কাঠামটি গড়িয়া দিতে হইবে—স্বরাজের আসল খাঁটি নাম হইতেছে "অন্নরাজ"। আর অন্নের আয়োজন ও আহরণ করিতে হইবে সংগ্রামের ভিতর দিয়া—জীবন-ধারণ হইতেছে যুদ্ধ, এখানে যোগ্যতম যে তাহারই হয় উদ্বর্ত্তন। এতদিন ধরিয়া সমাজের একটি শ্রেণী (উপরের মুষ্টিমেয় "বড় লোকেরা") আর একটি শ্রেণীকে (যাহারাই হইতেছে অসংখ্য অথচ নামে "ছোট লোক") পেষণ ও শোষণ করিয়া সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিজেদের জন্য আদায় করিয়া লইয়াছে; আজ চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে, এখন "ছোট"লোকের দিন আসিয়াছে, "বড়"লোককে ধরিয়া পেষণ ও শোষণ করিতে। দয়া মায়ার ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গত অসঙ্গতের কথা এখানে কিছু নাই,—প্রোলেটেরিয়েট অনুসরণ করিতেছে প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। তারপর প্রকৃতির আর এক প্রধান তাগিদ হইতেছে স্ত্রী পুরুষ নরনারীর সম্বন্ধে। কিন্তু বুর্জ্জোয়ারা এই সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া সৃষ্টি করিয়াছে "বিবাহ" বলিয়া একটি সংস্কার; শুধু তাই নয়, তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে প্রেম বলিয়া একটি বৃত্তি—দীন দুঃখীর কুলি মজুরের পরিশ্রমের ফল নিশ্চিন্তে উপভোগ করিতে করিতে এইসব কবিতা কল্পনা মায়া মতিভ্রম লইয়া তাহারা অবসর কাটাইয়াছে, আলস্য ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়া, নির্জ্জলা সত্যের দিক দিয়া দেখিলে কি পাই? বিজ্ঞানে কি বলিতেছে, নিছক যুক্তি কি দেখাইতেছে? পুরুষ নারীর সম্বন্ধ শুধু শরীরের ত্বকের সম্বন্ধ, ইহার বেশী কিছু নয়, অবশ্য ইহার কমও কিছু নয়। এটিকে অগ্রাহ্য ত করিবারই নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার উপর রং চড়াইয়া, সাজসজ্জা চাপাইয়া দিয়া ইহাকে বিপুল মহৎ এবং বিকট করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই মোটা সত্য সব মানুষ যদি স্বাভাবিক ও সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে, আকাশ বাতাসকে যে ভাবে দেখে সেই ভাবেই দেখিতে পারে, তবে তাহার প্রকৃতি হইতে যে কত ক্লেদ ঝরিয়া যায়, কত ময়লা যে জমিবার আর অবসর পায় না, তাহার জীবন তাহার সমাজ যে কত সুস্থ কত সহজ হইয়া উঠে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সহজ এই বাস্তব-তন্ত্র জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যই চাই শিক্ষা, জোর করিয়া শিক্ষা, সর্ব্বত্র শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল পাঠশালা মিউজিয়ম বক্তৃতার ছড়াছড়ি। শিক্ষা অর্থই হইতেছে সহজ বুদ্ধির, প্রত্যক্ষের, ইন্দ্রিয়ের দেওয় যে জ্ঞান—যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের যুদ্ধে কাজে আসিবে, ব্যবহারে লাগিবে। তত্ত্বালোচনা, দার্শনিকতা, ভাবুকতা, ভাব-বিলাসিতা—এসব হইতেছে "বুর্জ্জোয়া" মনোবৃত্তির ফল। বুর্জ্জোয়ারাই সৃষ্টি করিয়াছে এইসব কথা—জ্ঞানের জন্য জ্ঞান, art for art's sake ইত্যাদি। বোলশেভিকিরা তাই তাহাদের স্কুলে প্রাচীন ইতিহাস কিছু শিক্ষা দেয় না,—ইতিহাস হইতে প্রয়োজন জীবন্ত প্রেরণা, তজ্জন্য আধুনিক কালের ইতিহাস এবং তাহার যতটুকু প্রলেটারিয়াটের কীর্ত্তি ও প্রয়াস লইয়া ততটুকুই শিক্ষনীয়। এই একমুখী একরোখা—সময়ে সময়ে মনে হয়, দারুণ—বাস্তববুদ্ধি বোলশেভিকি তাহার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানে প্রয়োগ করিয়াছে। দেশবাসীর স্বাস্থ্য চাই? চাই তবে ডাক্তার ঔষধপত্র, হাসপাতাল সানাটোরিয়ম যথা তথা। আতুর ব্যাধিগ্রস্ত যে সে সন্তানের জন্ম দিবার অধিকারী হইতে পারিবে না—আইন আসিয়া তাহাকে আটকাইয়া ধরিবে। রুগ্ন দুর্ব্বল সন্তান যাহাতে না হয় তজ্জন্য সুপ্রজনন বিদ্যার বিধি নিষেধ সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে—নতুবা তাহার স্থান হইবে কারাগারে। সকলের শেষে ও সকলের উপরে অর্থ সমস্যা। দেশের অর্থাৎ শ্রমিক বা প্রলেটারিয়েট সম্প্রদায়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহ, অর্থ-বৃদ্ধি—সেইজন্য কল কারখানার বিপুল সমারোহ চাই, বিরাট আকারে জিনিষের উৎপাদন নির্ম্মাণ চাই, সর্ব্বতোভাবে industrial হইয়া উঠা চাই...ফলত বিজ্ঞানের ততখানিই সার্থকতা যতখানি এইরূপে সে মানুষের জীবনযাত্রার সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা আনিয়া দিতে পারিবে। জড়বুদ্ধির দত্ত মন্ত্র, বিজ্ঞানের দেওয়া অস্ত্র শস্ত্র নূতন আশার উৎসাহ লইয়া বোলশেভিকি আজ অসীম সাহসে বেপরোয়া হইয়া ছুটিয়াছে সেইপথে, যেখানে ইউরোপ

চলিতেছে ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, এক পা অগ্রসর হইতেছে ও থামিতেছে ও পিছন ফিরিয়া দেখিতেছে বার বার।

বোলশেভিকির ফুৎকারে যুগে যুগে সঞ্চিত মানুষের অনেক কুসংস্কার হয়ত উড়িয়া যাইতে বসিয়াছে—হয়ত রূঢ় তর্ক-বুদ্ধির ঐ একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু কুসংস্কারের সাথে সাথে অনেক সুসংস্কারের—অনেক নিত্যকার সত্যের বীজও যে উড়িয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা বোলশেভিকির নাই। বোলশেভিকি মানুষকে সমাজকে একটা চমৎকার যন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে—বাহিরের কর্ম্মজগতের দিক দিয়া সুষ্ঠু সঙ্গত সমর্থ—কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মার গভীরতর প্রকাশ নাই, নাই মানুষের দৈবী সম্পদের জ্যোতি। বোলশেভিকি-তন্ত্র মানুষের বাহ্যতম প্রকৃতি, জীবনের স্থূলতম আয়তন যাহা তাহার সমৃদ্ধি তাহার শৃঙ্খলার ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত। বোলশেভিকি যে সব সমাজ-সমস্যার মীমাংসা দিয়াছে ও দিতেছে তাহা ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু দেহ ছাড়িয়া, স্থূল প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া, জড়মস্তিষ্ক ছাড়িয়া যতই উচ্চতর গভীরতর প্রদেশে যাইতে থাকে, ততই দেখি বোলশেভিকির সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্তটি তত না হোক যত বোলশেভিকি মনোভাব—হইয়া উঠিতেছে অনিশ্চয়তাসঙ্কুল, প্রমাদপূর্ণ, এবং সময়ে সময়ে ভয়াবহ।

অবশ্য বলা যাইতে পারে, যাহা সে দিতে পারে, বোলশেভিকির নিকট হইতে ততটুকুই লইব—তাহার বেশী প্রয়োজন যাহা তজ্জন্য যাইব অন্যত্র। মুদির দোকান যদি হীরা জহরত সরবরাহ না করিতে পারে তাহাতে দোষের কিছু নাই। সত্য বটে, কিন্তু মুদি যদি রাজপাটে বসিয়া আইন করিয়া দেয় হীরা জহরৎ বড় লোকের বড় মানুষির খোরাক, ও সব বাজে খরচ মুদির রাজ্যে চলিবে না? আসল কথাটা হইতেছে এই, মানুষের গোটা জীবন একটা অখণ্ড সৃষ্টি—একটা দৃষ্টি, একটা আদর্শ, একটা স্বপ্ন মূর্ত্তিমান হইয়া ধরা দিয়াছে মানুষের সাষ্টাঙ্গ জীবনে, সমাজের সমগ্র আয়তনে। মানুষের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা ও ধরণ-ধারণ নির্ভর করে জগৎকে সে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছে সেই তত্ত্বের সেই দর্শনের উপর।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন ধনে ধান্যে স্বাস্থে শৃঙ্খলায় ভরিয়া উঠুক, সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সত্যকার সাম্য ও সমন্বয়—এই উদ্দেশ্যে বোলশেভিকির প্রয়াস যে একেবারেই নিরর্থক হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে চাই না—বলিতে চাই না বোলশেভিকির মীমাংসায় কোথাও কোন সত্য নাই। পূর্ব্বেই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এখনও স্বীকার করিতেছি যে সমাজে বাহ্য শৃঙ্খলার নিয়মাবলী, যে কাঠাম' বোলশেভিকি যাহা দিয়াছে হয়ত তাহার মধ্যে এখানে ওখানে ভাবি-সমাজের দেহের একটা ছায়া কিছু পড়িয়াছে। কিন্তু সমাজের আসল সমস্যা ত সেখানে নয়। আসল সমস্যাকে বোলশেভিকি এড়াইয়া গিয়াছে। মানুষের মধ্যে আছে দুই অংশ—এক প্রাকৃত আর এক অতি-প্রাকৃত। বোলশেভিকি মানুষের এই অতি-প্রাকৃত অংশটি কাটিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছে, সে নীচের প্রাকৃত অংশটুকু লইয়া পড়িয়া আছে। প্রাকৃতের সংস্কার চাই সমৃদ্ধি চাই—কিন্তু সেই সংস্কার সেই সমৃদ্ধির কলকাঠি কোথায়? বোলশেভিকি বলিতেছে ঐ প্রাকৃতেরই মধ্যে—অতি-প্রাকৃতটা মায়া মতিভ্রম বিষম অন্তরায়। আমরা বলিব তাহা নয়, তাহা নয়—নেদং যদিদং উপাসতে। এপারের সিদ্ধিরও কলকাঠি রহিয়াছে ঐ ওপারেরই মধ্যে। এই দুই পারের আদান প্রদান, ঐক্য ও সামঞ্জস্য ঐহিকের মধ্যে যে সম্ভব তাহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন ভারত দিয়াছিল তাহার জীবন-বিন্যাসে, তাহার সমাজ-সংস্থানে।

বলিয়াছি বোলশেভিকির ব্যবহারিক ব্যবস্থার একটা ছায়া মাঝে মাঝে পাই ভাবি সমাজের দৈহিক আয়তনের। কিন্তু সেই ততটুকুও সফল ও সত্য হইয়া উঠিতে পারিবে না—কারণ যে চেতনা যে জীবন-ধারায় সত্য ও সফল সেই জিনিষ তদপেক্ষা নিম্নতর সঙ্কীর্ণতর চেতনা ও জীবন-ধারার শক্তি দিয়া ও রূপ দিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বোলশেভিকিরা করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবও ছিল "যুক্তি-দেবীর" (Goddes of Reason) ভীষণ পূজারী, তাহাও সেই দেবীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল গিলটিন-রূপী খড়্গ—কিন্তু তবুও এপর্য্যন্ত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়

নাই। আজ বোলশেভিকিও প্রায় সেই একই পথে চলিয়া আনিতে চাহিতেছে কমিউনিজ্‌ম্ (এজমালি তন্ত্র)—এই প্রয়াসের ও ফল অন্যথা হইবে না বলিয়াই ত মনে হয়।

বোলশেভিকির ব্যবহারিক ব্যবস্থা, যাহা সে করিতে পারিয়াছে বা যাহা সে করিতে চাহিতেছে তাহা, কিছু ভাল হোক বা সবই ভাল হোক—তাহাতে বিশেষ আসে যাইবে না, ভবিষ্যতে। সেই ব্যবস্থা কোন্ মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাহা মোটের উপরে মানব-জীবনের কি মূল্য কি ওজন ধার্য্য করিতেছে, ইহাই হইল প্রশ্নের প্রশ্ন। যেমন, ব্যাকরণের সূত্রাবলী নির্ভূলভাবে সর্ব্বাংশে মানিয়া চলিলেই রচনা যে উৎকৃষ্ট হয় তাহা নয়; লেখার উৎকর্ষ নির্ভর করে ষ্টাইল বা লেখার প্রাণের উৎকর্ষের উপর। প্রকৃতপক্ষে বোলশেভিকি-তন্ত্র একটা রাজনীতিক বা সামাজিক শাসন-ব্যবস্থা মাত্র নয়,—তাহা হইলে বোলশেভিকির সে বলও থাকিত না, সে বৈশিষ্ট্যও থাকিত না। বোলশেভিকি আসলে হইতেছে একটা নূতন "ধর্ম্ম"-সম্প্রদায়ের—একটা "রিলিজিয়ন"-এরই অভ্যুত্থান—বোলশেভিকির ষ্টাইল এইখানে। বোলশেভিকির বুদ্ধি খর যুক্তিবাদী, তর্ক-প্রতিষ্ঠ হইলে কি হইবে? প্রাণের যে ছাঁদ, মনের যে চাল দেখি প্রত্যেক নব সু-সমাচারের প্রচারে, বোলশেভিকি-বাদেও পাই সেই একই জিনিষ—একটি বিশেষ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের আপন মতবাদে একনিষ্ঠ, একরোখা, অন্ধ আবেগ, সকল উপায়ে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত উৎসাহ, বিপুল পরিশ্রম, প্রয়োজন হইলে, আত্ম-বলি এবং আত্ম-পীড়ন (পর-বলি ও পর-পীড়ন পর্য্যন্ত)—এই বিশ্বাস যে বিশ্ব মানবের মুক্তি সিদ্ধি সমস্ত এই পথে, কেবল এই পথেই; অন্য যাহারা অন্য পথে চলে তাহারা যে শুধু ভুল করিতেছে এমন নয়, তাহারা মানুষের শত্রু, তাহারা শয়তানের অনুচর। বোলশেভিকিরা লেনিনকে খৃষ্টেরও অধিক করিয়া পূজা করিতেছে, মার্ক্‌সের গ্রন্থটিকে বাইবেলের অধিক ভক্তি করিতেছে, শ্রমিকদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ও প্রভুত্ব তাহাদের নিকট Sermon on the Mount অপেক্ষাও অভ্রান্ত অব্যভিচারী বিধান হইয়া উঠিয়াছে। অথবা সাদৃশ্যটা আরও ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য বলিতে পারি—কার্ল মার্ক্‌স্ হইতেছে বোলশেভিকির এক এবং অদ্বিতীয় খোদা আর লেনিন তাঁহার রসুল; বোলশেভিকির কোরাণ হইতেছে Das Kapital—তাহাদের চক্ষে এক শ্রমিক ছাড়া পৃথিবীর আর সকল মানুষই কাফের।

এই যে fanaticism, ইহা বোলশেভিকির সকল সৃষ্টি প্রয়াসের গোড়া কাটিয়া দিতেছে—বার্টাণ্ড রাসেল এই কথা বলিতেছেন। আমি কিন্তু fanaticismকেও সমর্থন করিতে রাজি ছিলাম—কারণ উদার অনিশ্চয়তা নয় একটা দৃঢ়-নিশ্চয়তার একরোখা আবেগই কিছু সৃষ্টি করিতে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম; কিন্তু সেই fanaticismকে তাহা হইলে মানুষের অন্তরতম উর্দ্ধতম চেতনার স্তর হইতে উৎসারিত এক আশীর্ব্বাদ মাগিয়া লইতে হয়,—বোলশেভিকি যে উপরের সে দৈবী-দ্বার সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বোলশেভিকির পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, বোলশেভিকির এই যে ধর্ম্মান্ধতা, ইহা সে পাইয়াছে তাহার প্রাচ্য প্রকৃতি হইতে—কারণ, রুশের রক্তে রহিয়াছে অর্দ্ধেকই এশিয়ার রক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় বোলশেভিকির fanaticism আর প্রাচ্য fanaticism বলিতে সচরাচর যাহা বুঝান হয় তাহা এক জিনিষ নয়। তথাকথিত প্রাচ্য fanaticism, "মধ্য-যুগে"ই যাহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখি, তাহা অনেকটা অসংস্কৃত প্রাণের দুর্ব্বার আবেগ—কিন্তু তাহা স্পষ্ট, খোলাখুলি। তাহার মধ্যে মস্তিষ্কের, বুদ্ধি-বৃত্তির বিচার-বিতর্কের স্থান বেশি কিছু ছিলনা, যৎসামান্য থাকিলেও সেখানে বিশেষ সংযম আনিয়া দেয় নাই বা তাহাকে রাখিয়া ঢাকিয়া ধরিতে চেষ্টা করে নাই। বোলশেভিকি প্রাণে প্রাণে fanatic; কিন্তু এই fanaticism সে তর্কবুদ্ধির, যুক্তিবাদের, স্থূলদৃষ্টির, বাহ্য প্রয়োজনীয়তার আটে ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সাজাইয়া তুলিয়াছে। ফলত বোলশেভিকির fanaticism হইতেছে বলিতে পারি "scientific fanaticism"। প্রাচ্যের যে fanaticism তাহার নাম যদি হয় ধর্ম্মান্ধতা, তবে পাশ্চাত্যেরও যে fanaticism আছে তাহার নাম দিতে পারি "বিজ্ঞানান্ধতা"। ধর্ম্মান্ধতার স্বরূপ হইতেছে হৃদয়ের বা প্রাণের একটা অনুভবকে আবেগকে একান্ত করিয়া দেখা,

সকল মানুষকে তাহা জোর করিয়া অনুভব করাইবার চেষ্টা এবং তাহা যাহারা না চায় বা পারে তাহাদিগকে কোতল করা; বিজ্ঞানান্ধতারও স্বরূপ হইতেছে জড়বুদ্ধির, বাহ্য প্রয়োজনের সিদ্ধান্তকে চরম সত্য মনে করিয়া, তাহারই কাঠামের মধ্যে তাহারই শক্তিকে দিয়া বিশ্বের লীলাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা, তাহারই খাপে খাপে মানুষের স্বভাবকে সমাজের ব্যবস্থাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া গড়িয়া ধরিবার প্রয়াস—আর ইহাতে যাহাদের আপত্তি তাহাদিগকে বিকৃতমস্তিষ্ক, কুসংস্কারপূর্ণ, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সমাজের বাহির করিয়া দেওয়া। বৈজ্ঞানিক ইউরোপের বিজ্ঞানান্ধতা অনেকখানি মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল বলিয়াছি, জীবনের প্রাণের মূল প্রেরণার উপর তাহার প্রভাব ছিল খুব স্তিমিত ও পরোক্ষ; বোলশেভিকির বৈশিষ্ট্য, ইউরোপের এই দ্বিধা, মনের ও প্রাণের মধ্যে যতটুকু বৈষম্য ছিল তাহা একেবারে মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞানান্ধতার সমগ্র বন্যা প্রাণের উপর জীবনের উপর নামাইয়া আসিয়াছে। যে কঠোর যৌক্তিক শিক্ষাদীক্ষা ও যান্ত্রিক সভ্যতার পূজারী হইতেছে ইউরোপ, বোলশেভিকি তাহারই পূর্ণ মূর্ত্তি নামাইয়া সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ভক্তি-বিলাস

—গল্প— —শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ

প্রথম ভাগ

পরিচ্ছেদ—এক

১

শ্রীগুরুর আদেশে ভার্গব গোঁসাই ছেলেটির নাম দিয়েছিল ভক্তি-বিলাস। বড় নামের বোঝা বওয়া, লোকের অভ্যাস নয়; তাই কালক্রমে ভক্তি শব্দটা বাদ প'ড়ে গিয়ে রইল শুধু বিলাস।

কেবল ভার্গব গুরুর আদেশ একদিনের জন্যও অতিক্রম ক'রেনি। তাই নয় শুধু, সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চাইত যে, ঐ নামটা ছেলের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হোক। ভার্গব তাই মনে মনে ব'লতো, যার ভক্তি নেই তার আর আছে কি? টাকাকড়ি, ধন-মান? এ সবই তো সংসারের বাইরের; শক্ত খোলাটার মত! মধুর হ'য়ে উঠে সবই, যদি ভক্তি রস সিঞ্চিত হয় সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলোয়!

ভার্গবের ছিল শ্রীকৃষ্ণ চরণে অচলা ভক্তি; তার মনের বাসনা ছিল, গোলোকে গিয়ে সেই চরণপদ্মের মধুপান ক'রেই যেন তার মনমধুপের নিরন্তর কাটে!

কিন্তু সে কেবল পরকালের চিন্তাতেই এ কালটাকে বৃথা ব'য়ে যেতে দেয়নি; যখন বৈকুণ্ঠের দিকে যাত্রা করলে ভার্গব, তখন তার এপারের ব্যবস্থাটা বেশ ঝল্‌থলেই; অবস্থাও শাঁষে-জলে।

২

তখন বিলাসের যৌবন। নামটার মোহ তার কৈশোর-স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও, যৌবনে পা দিতেই যেন কোথায় একটু রূপান্তর ঘটতে লাগলো। সে গোড়ায় গোড়ায় যেন চম্‌কে উঠ্‌তো; মনে হ'তো ঠিক যে পথে চলা উচিত ছিল সে পথটা গুলিয়ে গিয়ে যে পথ সাম্‌নে এসে প'ড়েছে, সেটা ভক্তির নয়, লালসার।

মধু-মালতীর প্রতি তার মনের টান্‌টাকে সে কিছুতেই যেন অস্বীকার করতে পারে না; যখন জোর ক'রে ভক্তির পথে নিজেকে নিয়ে যেতে চায়, তখন ভিতরের আর একটা মানুষ যেন লোলুপ দৃষ্টিতে অন্যদিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়।

তার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। ক্ষিদে পেলে যেমন কিছুতেই পড়ার পুঁথিতে মন স্থির হ'তে চায় না; যতই জোর কর, ততই যেন ব্যর্থতায় চতুর্দ্দিক পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে; অনেকটা তেম্‌নি!

শান্ত মানুষটি বিলাস; তাই ধীর হ'য়ে ভাবে কি করা যায়! নিজের উপর রাগই যেন একটু হয়, লজ্জাও যে করে না, তা নয়। মনে ভয় হয়, তার ভিতরের হীন-জানোয়ারটা, এমনি ক'রেই তাকে কর্ত্তব্যের পথে চ'লতে বাধা দেবে, পায়ে পায়ে, চিরকাল।

কিন্তু সব তর্ক যুক্তি যেন ভাঁটার টানে ভেসে যায় যখন মধু-মালতী স্নিগ্ধোজ্জ্বল দুটি চোখে তার হৃদয়ের পূজাটি নিবেদন ক'রে দেয় স্বামীর শ্রীচরণে। তখন হঠাৎ ভক্তির চাঁদ যেন ডুবে গিয়ে ঝলমল্‌ ক'রে উঠে পড়ে জীবনের দিকচক্রে প্রেমের প্রদীপ্ত সূর্য্যটি!

সমস্ত নিরোধ সত্ত্বেও সেই ভিতরের মানুষটা বিক্রমাদিত্যের পরাক্রমে এসে সিংহাসনে ব'সে প্রবল প্রতাপে আপনার শাসন বিস্তার করে।

বিলাসের মন যেন আকণ্ঠ কুণ্ঠায় ভ'রে উঠে!

৩

স্বামী দেবতাকে তাঁর পবিত্র পুণ্যের পথ থেকে টেনে সম্ভোগের পঙ্কিল পথে নামিয়ে আনার কোন কু-মতলবই

মধু-মালতীর ছিল না। তার সংজ্ঞানে নিজের দেহের সৌন্দর্য্য লাবণ্যের কথার একটা দাগও পড়েনি। ঠিক সরোবরের কুমুদ-কহ্লারের মতই সে ফুটে উঠেছিল বুক-ভরা মধু নিয়ে। সে সুধা নিয়ে কি যে করতে হয় তাও সে জানত না। জানতো শুধু একজনের কথাই যাঁর সুখে তার অপার তৃপ্তি; যাঁর দুঃখে তার মনে বিষাদের কালিমার ছাপ ফেলে মনটিকে শীতের সকালে কুঁড়ির মত কুঞ্চিত ক'রে দিত।

কিন্তু একান্ত স্বার্থপরের মত নিজের ক'রে নিয়ে, চারিদিক বেড়ে মাধবীলতার মত তাঁকে নিঃশেষে ভোগ ক'রে নেবার তীব্র প্রবৃত্তি সেই সহজ মনটিতে এক বিন্দু পরিমাণও ছিল না। সেবা-ব্রতের খোলা মন্দিরের মতই ত্যাগের আলো তাতে খেলা করত। ভোগের বীজ সেই পাথর-বাঁধান মাটিতে একটি শিকড়ও গাড়তে পারেনি।

কাঁচের গ্লাসে জলের মত স্বচ্ছ; চামেলির মত স্নিগ্ধ পরিমল মধু-মালতী, বিক্ষেপহীন সংসারে ফুলের মতই অশেষ লাবণ্য-মাধুর্য্যে ফুটে উঠ্‌ছিল। তার গতি ছিল সূর্য্যমুখীর মত ঊর্দ্ধে—তার জীবন বল্লভের চরণের প্রান্তে।

পরিচ্ছেদ—দুই

১

পিতার বৈকুণ্ঠ বাসের পর বিলাসের ভক্তি-চৈতন্যটা হঠাৎ যেন সাড়া দিয়ে মাথা-চাড়া দিলে। শোকের সদ্য অবস্থায় ছেলে চায়, কি ক'রে মৃত পিতার কায়মনবাক্যে একটা তৃপ্তি-বিধান করতে পারে। তখন বিরোধ থাকে না; থাকে শুধু স্মৃতির মধুর অবশেষটুকু। তখন মনে পড়ে, কি চাইতেন বাবা!—একটা সংকল্প জাগে মনে মনে যা' তিনি চাইতেন তাইতে হোক্ না নিঃশেষিত এই তাঁরই দেওয়া দেহ মন! জীবনের ত্রুটিগুলো লজ্জায় মুখ ঢাকা দিতে চায়। কৃতজ্ঞতা যেন দু'হাত জোড় ক'রে মৃতকে বার বার প্রশ্ন করে, এই কি চাইতে না, তুমি বাবা? এই কি নয়, তোমার মনের মত?

যে গত সে কিছু কথা কইতে আসে না; তাতেই বিপদ সব চেয়ে বড় জীবিতের। যে বিরোধের মধ্যে দুপক্ষের মুখর হবার অবসর আছে—তার আগুন বেড়ে উঠে আকাশ ছোঁয় না। কিন্তু যখন এক পক্ষ নির্ব্বাক—তখনি ত্রুটি বড় হয়; তার শাস্তি আবার যখন আসে,—তার বানের স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখা দায়! একথা সবাই জানে; কিন্তু বিলাসের মন পিতৃশোক এবং বিরহের মধ্যে এইটেকে ঢের বড় ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

ভার্গবের ভক্তি প্রীতির কথা বিলাস ভাল ক'রেই জান্‌তো; তার সেদিকে ত্রুটির কি কারণ তার নির্দ্ধারণ তার মনের মধ্যে নিত্য অস্বস্তি দিয়েই এসেছে এতদিন। কিন্তু সবই ছিল যেন মোহের ঘোরে অর্দ্ধ-সুপ্ত, অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় একটা নিষ্ক্রিয় অপ্রবুদ্ধতার মধ্যে।

আজ বিলাসের মনটা উঠ্‌লো যেন কোমর বেঁধে তাল ঠুকে! কর্ত্তব্যের প্রেরণা ঠিক অমনি ক'রেই আসে, যেন গোঁফ-উঁচু-করা জর্ম্মান কাইজারের মত, মার মার শব্দ তার মুখে। এ বীরের প্রখর প্রতাপের কাছে সহজ প্রিয়টি গা-ঢাকা দিয়ে দূরে পালায়,—হয়তো বা ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'য়ে যায়! ভক্তি-বন্যায় বিলাস নিজের দুকূল এমনি ভাসিয়ে বস্‌লো যে, দু'ধারের গাছপালার কি-হয়-না-হয়, সে কথা তার মনেই রইল না আর।

২

শেষ রাত থেকে খোলের চাঁটিতে চতুর্দ্দিক সরগরম; সঙ্গে সঙ্গে চল্‌চে করতাল তার সঙ্গে ধুয়ো, মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর! মাঝখানে ব'সে আছে ভক্তি বিলাস, নিষ্কলঙ্ক দীপ-শিখার মত। ভক্তির হিল্লোলে ডাইনে বামে মৃদুমধুর হেলা-দোলা! ভাবোচ্ছ্বাসে মুদ্রিত দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে হৃদয়-গলা প্রেমাশ্রু!

অবিরাম চলে এই কীর্ত্তন—প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস! সে যেন ঠিক,—মাস মাস করি' বরষ গোঙায়নু, না মিটিল হৃদয়কি আশা!

৩

ভক্তি-বিলাসের খ্যাতিতে দিগ্বিদিক ভ'রে গেল ; ধন্য সাধু জন্মেছিল সে, কোন এক শুভক্ষণে! রাধা-বল্লভজির মন্দিরে নিত্য-সংস্কার চলেছে এদিকে। দলে দলে কীর্ত্তনীয়া আসে, দেশ বিদেশে থেকে। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই!

ভক্তি-বিলাস দুই চোখ বুজে দেখ্‌তে চায় নিজের হৃদ্‌-পদ্মের উপর রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি, দেখ্‌তে চায় সে, ভাবে-ভোলা দুটি যুগল কিশোরের মধুর-সুঠাম মূর্ত্তি! স্নান আহারের কথা মনে থাকে না ; মনে থাকে না তার আর কারুর কথা!

সবাই বলে স্ব-নাম ধন্য! গুরুর আশীর্ব্বাদ নইলে এমনটি হয় না কারুর জীবনে! কেউ ব'লে ভক্তি-বারিধি, কেউ ব'লে ভক্তি-মহার্ণব! সবাই একবাক্যে স্বীকার করে ভক্তি-বিলাস কথাটির এতবড় গূঢ় অর্থ যে ছিল তা' আগে জগতে কেউ ভাব্‌তেও পারেনি। এমনি ক'রেই সাধুদের জীবনের মহামূল্যের ভগ্নাংশ দিয়ে ধর্ম্ম আপনার অবয়ব পূর্ণ ক'রে তোলেন! সবাই কানাকানি করে, ভক্তি-বিলাস আর বেশী দিন ঘরে থাকৃতে পারবে না। বৃন্দাবন-শ্যামের বংশী-ধ্বনি যার কানে এসে পৌঁছেচে একবার,—সে আর কিছুতেই ঘরে থাকৃতে পারে না। এ যে ধ্রুব সত্য! এই যে যুগে যুগে ঘটে এলো, মহাপুরুষদের জীবনে!

পরিচ্ছেদ—তিন

১

বিলাসের ভক্তির উচ্ছ্বাসে ওদিকে একজনের দম কিন্তু ক্রমেই যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। গতির তরঙ্গ যতদিন শান্ত-ছন্দে চল্‌ছিল ততদিন মধু মালতী সভয়-বিস্ময়ে বিলাসের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিল। চিকের আড়ালে ব'সে মালতী নিজের গৌরাঙ্গ সুন্দরটিকে দেখ্‌তো, দেখ্‌তো ;—আর কবির সঙ্গে এক সুরে এক কণ্ঠে যেন গেয়ে উঠ্‌তো,—তবুও তো তৃপ্তি হয়না এই পোড়া দুটো চোখের! জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু! সে ছিল একটা কোয়াসা-ঘেরা মধু মাসের মধুর সকালের মত অবস্থা ; নেশার মতই থাকৃতো মন জুড়ে ধূপছায়ার মত যেন আলো-আঁধার!

কিন্তু দিন বাড়তেই, প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর আলোতে ভেঙ্গে গেল সেই মোহের ঘোর। মালতীর কানে সমস্ত সুর হঠাৎ একদিন যেন বেসুর বেজে উঠ্‌লো! যাকে সিংহাসনে দেবতা ব'লে বসিয়েছিল—তাকে মনে হয়, প্রাণহীন পাথরের মূর্ত্তি। যে-পায়ের উপর মাথা রেখে স্বস্তি পেতে গেল, দেখ্‌লে সে চরণ সত্যি কমল-কোমল নয়, কঠিন, শীতল! সে যে বাজে!

প্রাণের দেবতাকে পাষাণ পুতুল ব'লে যেদিন মনে হয় সেইদিনই জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্দ্দিন ; সে ব্যথার তুলনা হয় না, তার আঘাত প্রিয়তমের মৃত্যু সংবাদের মতই নিষ্ঠুর কঠিন, মর্ম্মভেদী!

মালতী ফিরে দাঁড়িয়ে ফণিনীর মত গর্জ্জন ক'রে তার মনকে বল্লে, কি? আমার দেবতার বুকের নীচে রক্ত-কমলের মত হৃদয় কি প্রেম-স্পন্দনে দুল্‌চে না? জ'মে পাথর হ'য়ে গেছে?

কালো নিকষের মত কঠিন মনটা ব'লে, ক'ষে দেখ্‌না, সোনা হয় ত' দাগ প'ড়বেই!

ধিক্কারে মালতীর মন তিক্ত হ'য়ে উঠে। দেবতাকে পরীক্ষা! এতও ছিল পোড়াকপালে!

কিন্তু সন্দেহ শয়তান ঠিক ঝিঁ-ঝিঁ পোকার মত, একবার ডেকে উঠ্‌লে সারারাত চলে তার নিস্তব্ধতার গায়ে শব্দের ছুঁচ-ফোটানো! সন্দেহের ঘুণ ধরলে ঝাঁজ্‌রা হ'য়ে যায় মানুষের মনটি!

৩

কিন্তু মালতী বিলাসের উপর একটুও রাগ করলে না। সীতা যেমন ক'রে বনে গিয়েছিলেন একদিন, ক্ষমা-সুন্দর মুখখানিকে নিবিড় অভিমানের অশ্রুবাষ্প দিয়ে ঢেকে। রাজার কাছে রাজ্য ত বড়ই! তুচ্ছ নারী! রামচন্দ্র ছিলেন

ক্ষত্রিয়-রাজা! পুরুষ-সিংহ! নারীর সম্মান! ও কথা কাব্যে শোভা পায়; বাস্তব জীবনে রাজা একেশ্বর!

মালতীর দুঃখের মধ্যে হাসি পায়; মানুষ বড়, না রাজা বড়? সাপ বড়, না খোলস বড়? দু'চোখ উপ্‌চে জল আসে তার—যখন সে ভাবে এই কথাগুলো,—যুগ যুগ ধ'রে এমনি ক'রে আলেয়ার পিছনে মানুষ ছুটেই মর্‌ছে—মণি পাবার লোভে; আর, সেই মণি যে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে!

তবুও মালতী বিলাসের উপর রাগ করলে না! রাগ গিয়ে ডিঙ্গিয়ে উঁচিয়ে উঠ্‌লো বৈকুণ্ঠে! সে রাধারাণীকে ডেকে বল্লে, মেয়ে মানুষের দুঃখ পুরুষে বুঝবে না, কোনদিন; কিন্তু তুমি কি করছ সই! নিজের দুঃখের দিনের কথাগুলো কি এমনি ক'রেই ভুল্‌তে হয়, সুখের দিন এলে?

পরিচ্ছেদ—চার

১

দেবতার পরীক্ষা নিতে চায় না যখন মালতী, দেবতা তখনই এগিয়ে আসে পরীক্ষা দেবার জন্যে! অদৃষ্টের এই তো কঠিন পরিহাস।

অনেকদিন পরে, কি মনে ক'রে বিলাস সেদিন মালতীকে ব'লে পাঠালে যে, রাধা-বল্লভের ভোগ না খেয়ে সে বাড়িতেই খাবে—রাত্রে; শরীরটাও তেমন ভাল নেই।

ঐ শেষের কথা ক'টি মালতীর মনে যেন হুল বিঁধে দিল। শরীর ভাল না থাকা, হয়তো একটা ছোট মিথ্যা, যার তলায় দীর্ঘদিনের শৈথিল্যের অপরাধটা একটু গা-ঢাকা দিয়ে নিজেকে সাম্‌লে নিতে চায় মাত্র! কিন্তু অভিমান তার সংকীর্ণ রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে জিনিষকে বাড়িয়ে বিকৃত ক'রে দেখে; সেখানে পূর্ব্ব-পরের সঙ্গতি বোধ থাকে না, সেখানে সহানুভূতির উদার কোলে মানুষের ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি-চ্যুতি আর কিছুতেই লুকিয়ে যেতে না পেরে এমন একটা বৈষম্যের সৃষ্টি ক'রে বসে, যাতে উভয়পক্ষ ক্ষুব্ধ-আহত হ'য়ে দূরেই চ'লে যায়!

মালতীর সে রাতের সকল ব্যবস্থা নিখুঁত হ'লেও, মনটি রইল তেড়া-বেঁকা আড়ষ্ট হ'য়ে। বিলাসের মনটা নতি স্বীকার করার জন্যে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে—হঠাৎ চম্‌কে থম্‌কে যেন পিছিয়ে যায়! অকস্মাৎ মনে হয়, এ-ভাঙ্গা আর জুড়বে না, কোনদিন। এ তেলে-জলে মিশ খাবে না!

মালতীকে সেদিন কর্ত্তব্যের ভূতে পেয়ে ব'সলো যেন। ছোট একটি অবসরের মধ্যে সে শেষ ক'রে জেনে নিতে চায় সেই কথাটি, যার ইসারাটি পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল বিলাসের মনে সেদিনের আঘাতে।

অনেকদিন পরে মালতী পাস্তলায় ব'সে বিলাসের পা' দুটি নিজের কোলে টেনে নিলে সেবার জন্যে। বিলাস বলে থাক্, থাক্—তোমার যে কষ্ট হবে; পা দুটো টেনে নেয়। বিলাস মনে মনে জান্‌তো যেন, মালতী ছাড়বে না শেষ পর্য্যন্ত, ফিরে পা টেনে নেবেই নেবে। এমনি কতদিন সে নিয়েওচে; কিন্তু আজ মালতীর মনের মধ্যে বুক-ভাঙ্গা ঠাণ্ডা হাওয়া হাহা ক'রে কেঁদে ব'য়ে গেল; তাতে তার চোখের জল জমাট হ'য়ে গেল, হাত দুখানি যেন পাথর। চির জীবনের আশ্রয় দুটি এমনি ক'রে আল্‌গা হ'য়ে ফস্‌কে গেল কোন্ ফাঁকে!

মালতী জেগে ব'সে ডুবে মরার স্বপ্ন দেখে সমস্ত রাত! নিস্পন্দ প্রতীক্ষার গুমটের পর এলো দমকা অভিমানের ঝড়; বিলাসকে এক ফুঁয়ে বাইরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল!

একলা মালতী শূন্য শয়নে পাথরের মূর্ত্তিটির মত রাত্রি প্রভাত করলে।

২

জীবনের স্বাদ অনুপম; কল্পনার সিঁড়ি দিয়ে অমৃতের কাছে পৌছতে হ'লে মানুষের সম্বল তো এই অমূল্য জিনিষটি—এ জীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতাগুলিই! এর ওপর অরুচি, সে তো পরম দুর্ভাগ্য; একে জাল দিয়ে গাঢ় ক'রে, মিষ্টি করার প্রয়াস, সে শুধু বিড়ম্বনা! এরই র

অঞ্জলি ভ'রে পান ক'রে পথিক সব চ'লেছে—আগের পথে --সেই আদিহীন অন্তহীন পথ। আগে চলার পাথেয়, খোরাক—সবই জোগায় মানুষের জীবনের অফুরাণ ভাণ্ডার!

মধু-মালতীর জীবনে রুচি নেই; মনে হ'লো তার, আগে-পা-ফেলার আর এতটুকুও স্থান নেই! কিন্তু চলার ভিড়ে দাঁড়াবারও যে জায়গা নেই তার!

আশ-পাশের মানুষেরা হাসে; নিষ্ঠুর সে হাসি! বলে তারা—দৃপ্তা, মানিনী; যে মাটিতে দাঁড়িয়ে, তারই সঙ্গে তোর কলহ? যে জলে ভাসিস্, তারি সঙ্গে তোর এ কিসের অভিমান?

এ সেই সেকেলে, পুরোণো কথা! মালতীকে স্পর্শও করে না। অসীম গাম্ভীর্য্য তার, অপরিসীম উদাসীন সে; যার জন্যে বাঁচা, তার যদি আর তাকে প্রয়োজন না থাকে তো সে বাঁচার অর্থ কি? মালতীর হাসি পায়; কান্না যে তার শুকিয়ে গেছে, মরুভূমির খর তাপে!

পৃথিবী যার কাছে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে, আকাশের দিকে সে দু'হাত বাড়িয়ে বলে—নে, আমায় নে; আমি আর ফুল হ'য়ে ফুটবো না; ওই কালো-নীলের মধ্যে তারা হ'য়ে জ্বলবো, যতদিনে না আমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে যায়!

পৃথিবীর যোগ তার আল্‌গা হ'য়ে গেছে—তাই আকাশে সে বুকের ব্যথা নিঃশেষে ফুরিয়ে দিতে চায় প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে।

মালতী বিলাসের হাতখানা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লে, 'চন একে? তোমার ফুলদানির ফুল, একদিন ছিল এরও দিন...ও ফুলদানি তোমার খালি থাক্‌বে না—তোমার উপর গুরুর আশীর্ব্বাদ আছে, গোবিন্দজীর দয়া আছে যে! প্রেমের পেয়ালায় কিন্তু ভক্তির চুয়া-চন্দন কেমন ক'রে রাখ্‌বে তুমি?

বিলাস উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠে বলে, এ সব কি কথা বল্‌ছ, মালতী আমার?

আমি কি এখনো তোমার?—মালতীর শীর্ণ অধরে ডাক্তারের ছুরির মত সরু তীক্ষ্ণ একটা হাসি! বিদ্রূপ নয়, শিশিরের মতই তপ্ত!

কিন্তু এ কান্নার ধাক্কা আর সে সইতে পারলে না। উদ্দাম শীতের হাওয়াতে যেমনি ক'রে মালতী ফুল শুকিয়ে খ'সে যায় তার আল্‌গা বোটা থেকে, তেমনি ক'রেই সে ফেলে গেল দেহটা মাটিতে; কিন্তু তার আর সব-কিছু হাওয়াতে লীন হ'য়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে তারার দেশেই হয়ত চ'লে গেল উধাও হ'য়ে, এক নিশ্বাসে।

অসংখ্য তারার রাজ্যে নূতন একটির কেবা রাখে খোঁজ খবর?

দ্বিতীয় ভাগ

পরিচ্ছেদ—এক

বিলাস যখন বুঝলে, তখন মালতী আর সত্যি ক'রে বেঁচে ছিল না; গতির রেশের মত অভ্যাসের প্রাণটুকু দেহের এক কোণে ধুক্ ধুক্ করছে; চির নির্ব্বাসিতের মাতৃভূমির দিকে চেয়ে থাকার মত। প্রাণের গোধূলির আলো, প্রতিবিম্বের ভেল্‌কি!

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিলাস বল্‌লে,—আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে, কি ক'রে আমার দিন যাবে? মালতী, একি করলে তুমি, দুর্জ্জয় অভিমানে, অভিমানে......

একটা বছর যে কি ক'রে কেটে গেল ভক্তি-বিলাসের, তা' সে নিজেই জান্‌ত না।

মালতী নিজের চোখে সে সব পাগ্‌লামি দেখ্‌লে হয়তো লজ্জা পেত, হয়তো বা মনে মনে খুসি হ'তো। মাথায় একরাশ চুল, গোঁফ-দাড়ি লতিয়ে এসে বুকে পড়েছে, তারি তলায় লুকোনো মালতীর বাঁ-হাতের সোনা-বাঁধান লোহাটি! খালি পা, খালি গা। একবেলা স্বপাক হবিষ্যি খেত; আর সারা রাত আকাশের সঙ্গে ঝগড়া, বাতাসের সঙ্গে কলহ;

চাঁদকে ডেকে বার বার সেই একই কথা, ওরে তোরা কি জানিস্? তোরা কি ব'লতে পারিস? কোথায় লুকিয়েছে—আমার মধু মালতী?

বুকের মধ্যের ব্যথাটা যখন উঠ্‌তো ঠেলে, তখন সে চীৎকার ক'রে চেঁচিয়ে ডাক্‌তো মালতী, মধু-মালতী! সে শব্দ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে বৃত্তাকারে বিস্তৃত হ'য়ে, মহাব্যোম উৎরে, ঠেকতো গিয়ে নক্ষত্র-লোকে,—যেখানে অসীম কালের মধ্যে আলোর চুম্‌কির কানে কানে ফিস্‌ফিসিনির ঝিলি-মিলি!

২

কাঁধ থেকে রাধা-বল্লভের বোঝা ঝেড়ে ফেলেও তো ভার একটুও নামেনি! বিলাস নিজের আসনে স্তিমিত চোখে ব'সে ধ্যান করে; সে দেখ্‌তে চায় একটিবারের জন্য একটি মুখ অসামান্য লাবণ্যে, সহজ সৌন্দর্য্য যে একদিন তারই স্বপ্নে ফুটে উঠ্‌তে উঠ্‌তে থম্‌কে থেমে গেল; তারই অবহেলার অপরাধে!...আর সে ভাবতে পারে না; গলায় দেহের সমস্ত রক্ত উপ্‌চে উঠে দম বন্ধ ক'রে দেয়!

ধ্যানে সে তো মধু-মালতীকে দেখ্‌তে পায় না; কিন্তু যা দেখে তাতে তার সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়ে উঠে। মেঘের মধ্যে পাহাড়ের চূড়া উঠেছে সাদা ধপ্‌ধবে—তারই গায়ে চন্দ্রচূড় নাচ্চেন; সে নাচের তাল নেই, ছন্দ নেই! সেই পায়ের আঘাতে আঘাতে সৃষ্টি যেন টল্‌মল করে! সে একটা যেন গতির ঘূর্ণি! মনকে ছুঁচের ডগার মত তীক্ষ্ণ ক'রে বিলাস দেখে, সেই ঘূর্ণায়মান সাদার মধ্যে একটি ছোট লাল টক্‌টকে বিন্দু।

তার মধ্যে দৃষ্টিকে আরো সহজ ক'রে বিলাস দেখে ক্রমে সেই বিন্দু বড় হ'য়ে উঠে। একি! ঐ না মালতী? না, না, ওযে মহাকালের স্কন্ধ-সংলগ্ন সতী! মাটি তার পায়ের তলায় দুলে দুলে উঠে। কোথায় প'ড়ে থাকে ঘর দোর—কোথায় উড়ে চ'লে যায় সংসারের প্রতি মায়া মামতা!

এ পৃথিবী কি একটা মহা শ্মশান? জল্‌চে তাতে দাউ দাউ ক'রে চিতা? তারই চতুর্দ্দিকে ঐ প্রগলভ বাণী—বব বোম্ বোম্;—তারি চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য,—তা তা থৈথৈ?

এমনি ক'রে রাতের পর দিন দিনের পর রাত চ'লে যায় অস্থির প্রমত্ততায়। কাঁধে তার মালতীর স্মৃতির শব; বুকে জ্বলে লেলিহান্ শিখায় অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি! মুখে প্রগলভতার বব বম্; পায়ে অধীর চঞ্চল—তাতা থৈ।

৩

এমনি ক'রেই বছর ঘুরতে চলে। সমস্ত রাতের মাতামাতির পর বিলাস অবসন্ন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তার ছোট হরিণের চাম্‌ড়ার আসনের উপর, সেদিন রাতের শেষে। এ ঘুম নিবিড় নয়, আলো-আঁধারে শরতের কাক-জ্যোৎস্নার মত; মন রয়েছে যেন জেগে, দেহ অবসাদের ভারে আচ্ছন্ন-অবশ! চারিদিকে যেন কোয়াসার কুহেলিকা অবিশ্রাম ঘুর্‌চে, তাকেই ঘিরে! তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে সদ্য-ফোটা ফুলের মতই মধু-মালতী।

এসে বলে, এলুম আমি যে! এমন ক'রে কতদিন কাটবে তোমার?

যতদিন যতদিন, বিলাস মনে করতে পারে না তারপর কি বল্‌বে, সে শুধু বলে, যতদিন, যতদিন......

হাসে মালতী, না, ততদিন নয়; কিসের দুঃখ তোমার? আমি কি মরেছি?

এক বছরের আবর্জ্জনা যেন একটা দম্‌কা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাল্‌কা ক'রে দিয়ে গেল প্রাণটা!

মালতী হাসে, বলে, এত জ্ঞান, আর এই সোজা কথাটা জান না? প্রেম কি মরে?

আঃ, জুড়িয়ে যায় বিলাসের মনটি। দু'চোখ বেয়ে পড়ে আনন্দের চোখের জল, ফোঁটা ফোঁটা হ'য়ে শান্তিজলের মতই!

পরিচ্ছেদ—দুই

১

প্রেম মরে না!

শান্ত হ'য়ে গেলে শোকের হাহাকার। সৃষ্টি-স্থিতি যে মন্ত্রে বিধৃত, এ যে সেই! এ যে সূর্য্যের কিরণের মত এসে উদ্ভাসিত ক'রে দেয় মানুষের সমস্ত চেতনাকে! এর প্রমাণের দরকার হয় না। এ শুধু পাওয়া যায় মনের চোখ দু'টি মেলে ধরলেই! এ আছেই। একে অস্বীকার করাই ত মৃত্যু!

বিলাস যেন নব-জন্ম লাভ করে!

কাল-বৈশাখীর রৌদ্র-ভীষণ প্রশান্ত-নীলের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে! প্রশান্তির বুকে শতদলের মত সূর্য্য ভেসে চলেছে সহজ প্রবাহে। চাঁদ পাড়ি দিচ্চে মৌন মুখে রাতের পর রাত। এই সহজের প্রবাহে ফুল ফুটে চ'লে যায় তার লীলার আবর্ত্তে; পরিণতির ফল মাথা উচু ক'রে দাঁড়ায় নিঃশব্দ প্রতীক্ষায়। মহাকালের উদ্বেল বুকে মানুষ যেন এক একটা ঢেউ। যেন ক্ষণিকের শিহরণ! যেন ফেনার ফাউ!

ছোট তিনটি কথা! প্রেম মরে না! এর মধ্যে সমাহিত অসীম নীল; এর মধ্যে সগৌরবে বিরাজ করে রবি-চন্দ্র গ্রহ তারা; এর মধ্যেই ত' বলয়িত চেতনার দিকচক্রটি; এর মধ্যে বল্লভ প্রেয়সীর কাছে সহস্রশীর্ষ; এর মধ্যে মধু-মালতী অমলিন মণি-প্রভা!

বিলাসের অফুরন্ত অবকাশ, অপরিমেয় মন দিয়ে তবুও সে এর শেষ খুঁজে পায় না!

২

রাধা-বল্লভের মুখে সে এক নূতন হাসি! ওযে এবার সমানে সমানে ইঙ্গিত বিনিময়। সিংহাসন থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন কখন তিনি এক ভূমিতে। ভক্তি দিয়ে বিলাস যাঁকে দূরে রেখে, সভয়ে জোড়হাত ক'রে মনে করতো, তুমি অজ্ঞেয়, হঠাৎ তাঁকে কাছে পেয়ে সে দেখে তাঁরও বুকে মুদ্রিত আছে লাঞ্ছনার দাগ! বিরহ-সমুদ্রের ঢেউগুলির খাঁজ!

রাধা-বল্লভ স্মিত হেসে বলেন, ভুল করিস্‌নে বিলাস্‌, ওই যে আমার গৌরবের পুরস্কার।

বিলাসের চোখের সাম্‌নে রহস্যের পর্দ্দার একটা কোণ যেন আপনি স'রে যায়! অপূর্ব্ব সে অন্তর জগৎ।

ভোরে বিলাস পূজোর ফুল তোলে, আজকাল।

শিশির-ভেজা আলোয় গলা পৃথিবীর ঝল্‌মল করে চারিদিক। বর্ষার স্বপ্নে আকাশের নীল ত আর কাল্‌চে নয়; বসন্তের অশোক-শিমুলের লালের আভা এসে যেন এখনই প'ড়ে তাতে উৎসবের ছবি ফুটে উঠ্‌চে; শীতের অলস-কাঠিন্যের খোঁজ নেই, কোন তোয়াক্কাও নেই যেন তার।

সাজি হাতে বিলাস দাঁড়ায় এসে ফুল বাগানে;—কালো দুটি শান্ত চোখ বিস্ময়-পুলকে নিষ্পলক!

এদিকে লেগে গেছে ফুল, প্রজাপতি আর মৌমাছিদের পুলক-চঞ্চল সৃষ্টি-উৎসবের অধীর চপলতা। লাল রং-এর ওড়না ওড়ে ফুলের পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে; সবুজের মধ্যে সে লাল দেখলে বুকের মধ্যে কর্‌কর্‌ ক'রে ওই রঙ্গিন-ডানা প্রজাপতিটার; হাল্‌কা হাওয়ায়, চামেলির লঘু পরিমলে, মৌমাছির ডানা যে একেবারে উতলা।

যেন লজ্জা করে বিলাসের; এই আনন্দ-উৎসব থেকে মানুষ নিজেকে কবে, কেন, এমন ক'রে সরিয়ে নিয়ে পর্দ্দার আড়ালে অশুচি ক'রে তুলেছে তার জীবনের সহজ প্রেরণাগুলোকে!

ঐ তো মালতী, ওই তো জাতি! শিথিল দল ভৃঙ্গের চরণ বিক্ষেপে; কেনা জানে তা? বুকের মধ্যে বিলাসের শূন্যতায় ব্যাপ্ত! চোখ দুটো অশ্রুতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে! সে মনে মনে যেন বলি-বলি করে—মধু-মালতী, আমি কি প্রেমের অমর্য্যাদা ক'রেছি? আমার অকাল বৈরাগ্যের ত্যাগের কপটতায় জীবনের সহজ ক্ষুধাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে—দেহের মধ্যে কটুপিত্তের কালকূট এনেছি! তুমি ক্ষমা করলে; কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতি তোমায় ক্ষমা করলে না! জানি, সে শুধু আমারি প্রায়শ্চিত্ত! আমারি তুষানল!

মালতীর ডালে ডালে উদাস বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যেন বলে—না, না, তা নয়, তা নয়!

গভীর তন্ময়তার মধ্যে এমনি ক'রেই দিনটা কাটে তার!

সন্ধ্যায় নুবান-কিশোরের আরতির আলোতে, কিশোরীর মুখখানি থেকে প্রেমিকের দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করা যায়

না যে, সে চেষ্টার প্রতিঘাতেই তো ধূমায়িত কোপানলে হর-ভাল প্রদয়োজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সেদিন ! সে কথা মনে নেই ?

পরিচ্ছেদ—তিন

১

রাস পূর্ণিমায় রাধা-বল্লভজীর নাট-মন্দিরের সাম্‌নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মেলা ব'সতো।

তার কিছুদিন আগে থেকেই বিলাসদের বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হ'তে থাক্‌তো। মাসী-পিসী মামা-মামী —সে যে কত তার সংখ্যা নেই, ইয়ত্তা হয় না।

মধুমালতী থাক্‌লে ভাবনা কি ? সো-যত্নে তার জুড়ি মেলা ভার।

সবাই সে কথা বলে, আহা তেমনটি আর হয় না ; কিন্তু বিলাস…

বিলাস যেন চম্‌কে উঠে মানুষের প্রগল্‌ভ নির্লজ্জতায়। সেই এক কথা,—আবার বিয়ে কর, এমন ক'রে কি দিন কাটে মানুষের ? ঢেউ উঠে মিলিয়ে যায়—আবার ঢেউ উঠে। মধুমালতী তার বিধাতার দেওয়া আয়ুর পুঁজি শেষ-ক'রে চ'লে গেছে অন্য লোকে ; কিন্তু একলা যে প'ড়ে রইল সে কেমন ক'রে দীর্ঘপথ বইবে ? দু'জনের বোঝা একলাটি বওয়া যায় ? তাছাড়া পুরুষ মানুষ…

এসব কথার মধ্যে সত্য যেন মানুষের একান্ত প্রয়োজনের প্ররোচনায় তাড়ির মত ফেনিয়ে উঠে! তাই, বিলাসের মনটা উঠে বিদ্রোহ ক'রে। কিন্তু তার প্রকৃতিটা ছিল শান্ত, তাই সে সইত সবই চুপ-চাপ। মানুষের কথাকে বিলাস অবিচারে কোনদিনই নেয়নি।

২

কাদম্বিনী মাসী এসে ছিলেন বহুদূর গ্রাম থেকে ; ইনি ছুতোয়-নাতায় গ্রাম সম্পর্কে মাসী। বিধবা নয় ; কিন্তু সম্পূর্ণ সহায়হীন। স্বামী তাঁকে বিনা দোষে ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে অন্য সংসার পাতিয়েছেন। এতদিন কাদম্বিনী একটা পয়সাও কারুর কাছে প্রার্থনা করেন্ নি। কিন্তু আজ তাঁকে হাত পাততেই হবে—কারণ আইবড়ো মাধবী হঠাৎ এমন বড় হ'য়ে উঠ্‌বে, তা' কেউ ভাব্‌তেও পারেনি ! মানুষের পেট চালানো এক, আর মেয়ের বিয়ের সমারোহ —সে যে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার !

কাদম্বিনী এসেছিলেন বিলাসের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য। তাঁর খোলা কথা সব,—বাবা, তোমরা আমাদের পাল্‌টি ঘর ; কিন্তু তবুও আমার মাধবী তোমার পায়ের ধূলোরও যোগ্য নয়,বলুক গে লোকে—যা' তাদের মন চায়। তবে তুমি টাকা কিছু মনে কর্‌লে দিতেও তো পার। তাই বল্‌ছি ভিড়-ভাড় কম্‌লে, সে যা হয় একটা হবে। মাস্‌খানেক থাকার ইচ্ছে করি।

বিলাস হেসে বলে, তা কেন, যতদিন ইচ্ছে থাক না মাসী ; কিন্তু যত্ন করার লোক নেই তোমাদের…

সে হ'য়ে যাবে বিলু, সে তোমার কোন ভাবনা নেই। মাধবীর রূপ নেই, কিন্তু গতরে তার কাছে দাঁড়ায় কে ?

বিলাস সম্মতির হাসি হাসে।

৩

মাধবীর রং গৌরবর্ণ নয় ; কিন্তু তাই ব'লে সে কুৎসিত দেখ্‌তেও ছিল না। আর সে খবর রাখারও তার বড় একটা প্রয়োজন হয়নি। তার মার হাতে যন্ত্রটির মতই সে চালিত হ'তো। কাজেরও শেষ নেই,—আর তার তাগিদেরও অন্ত নেই। উদয়াস্ত,—যাকে বলে জুতো শেলাই থেকে চণ্ডী-পাঠ ; ঘুঁটে পাড়া থেকে তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া পর্য্যন্ত ; ধান-ভানা থেকে রাধা-শ্যামের ভোগ দেওয়া অবধি। এমনি ক'রেই কেটেছে তার দিন নিজেদের ঘরে।

এই চাপের মধ্যে ছোটখাট মেয়েটি চরকির মত ঘুরছে ; আর শুন্‌চে কানে মার ব্যাখান। মামারা ছিল কত বড় লোক ; বাপ ? সেও তো ছোটখাট কেউ নয়। তবে মেয়েমানুষের কপাল যখন ধ'রে যায় তখন…

কাদম্বিনী আর বল্‌তে পারেন না। আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। প্রতিবেশী কন্যা বলে, দিদি তুমি কেঁদোনা সব ফিরে পাবে; যিনি নিয়েছেন, তিনিই ফিরিয়ে দেবেন আবার।...দেখো তোমার মাধবীর রাজপুত্তুরের মত সোয়ামী মিল্‌বে! মেয়ে নয়তো একটা হীরের টুক্‌রো।

লজ্জায় মাধবী ঘর থেকে বেরুতে পারে না; মাথা যেন কাটা যায়!

দিন কয়েকের মধ্যে বিলাস বুঝলে, কোথা দিয়ে যেন একটা স্বস্তি, আরামের আমেজ এসে তাকে ছুঁয়ে আবার দূরে চ'লে যায়! যেন তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, যেন সেটা একটা মনের ইসারার মত, জেগে উঠে ধরতে গেলে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যায়।

বিলাস বিস্মিত হয়; আবার সময়ে সময়ে রাগ করে, ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে। নিজেকে শত ধিক্কার দিয়ে বলে ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

পরিচ্ছেদ—চার

কাদম্বিনী মাসীর আর মাধবীর বিয়ের জন্য মাথা ঘামাতে হ'লো না। শেষ-রাত্রের ভেদবমির দুর্জ্জয় প্রবাহে জন কয়েক ডাক্তার, ঐরাবতের মত মাতামাতি ক'রে হাল ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, শিবের অসাধ্য। বিলাসের অর্থ ব্যয়, মাধবীর অক্লান্ত সেবা ব্যর্থ ক'রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাসী পরপারের জন্য যাত্রা করলেন। একদিনের জীবনের অবলম্বন, যাকে পরের দিন গলগ্রহ ব'লেই আবার মনে হয়েছিল; যাকে দেখ্‌লে বুক শুকিয়ে উঠ্‌তো—আবার না দেখ্‌লেও ছট্‌ফট্‌ ক'রতো মন, সেই মাধবীকে বিলাসের পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে কাদম্বিনী দুই চক্ষু বন্ধ করলেন।

দিন দুপুরের সূর্য্যের পূর্ণ-গ্রাস গ্রহণ হ'লে যেমন ভয়ে কাককোকিল কেঁদে উঠে,—তেমনি ক'রেই চার পাশের লোক বিমূঢ় হ'য়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। মাধবীও কাঁদ্‌তে লাগলো; তার মনে হ'লো কান্না ছাড়া আর কোন কাজ রইল না তার জীবনে।

২

এক একটা এমন গলি থাকে, যা শেষ হয় গিয়ে একটা বাড়ীতে ঢোকার দরজায়। পথ হারিয়ে পথিক তেমন গলিতে ঢুকে যেন ফাঁপরে প'ড়ে যায়। ফিরতে লজ্জা করে, এগুলেও ততোধিক মুস্কিল। মাধবীর যেন তাই হ'লো। সে কোথায় ফিরবে, কার কাছে যাবে, জানে না। এদিকে এক পা' আগে বাড়ালে নিজেকে হয়তো বা বৃহত্তর বিড়ম্বনা মধ্যেই নিয়ে ফেলে।

অপার অশ্রু-সমুদ্রের মধ্যে মাধবীর কেবল পিতার কথাই মনে হয়। কোন রকমে বৃন্দাবনে গিয়ে যদি একবার সে পড়তে পারে, তাহ'লে সেবায় পরিচর্য্যায় নিশ্চয়ই বাবার মনটি জয় ক'রে নিতে দেরি হবেনা; কিন্তু বৃন্দাবনে সে যায় কেমন ক'রে? সে কথা অন্যকে বল্‌তেও যে তার বড় লজ্জা। অগত্যা সে ঝরা শিউলীর মত বিলাসের বাড়ীতে প'ড়ে রইল।

বিলাস একটুও নিশ্চিন্ত ছিল না। কাদম্বিনী মাসীর শেষের অনুরোধ, হয়ত তিনি বেঁচে থাকলে দিনান্তে মনে প'ড়তো কিনা সন্দেহ; কিন্তু এখন চলায় ফেরায় উঠায় বসায় যেন ঐ কথাই তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ব্যাকুল ক'রে তুল্‌লে! মাধবীর স্তব্ধ-সহিষ্ণুতা,যেন সে কোন মানুষের নয়; তার সেবা-কুশলতার তুলনা মেলা ভার। কথায়-বার্ত্তায় মাধবীর বেঁচে থাকার কোন পরিচয় নেই; কিন্তু সেবার মধ্যে একটি মনের পূর্ণ-আত্মনিবেদনের নিঃসন্দেহ পরিচয়ে বিলাস শুধু অবাক হ'তো না, মনে হতো, মাধবীর মত একটি মেয়েকে পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

মনের নিভৃত স্তরে বাসনা বুঝি এমনি ক'রেই নিজের ব্যূহ রচনা করে; এমনি ক'রেই বুঝি, অতর্কিতে একদিন বিজয়-অভিযানের উদ্যোগ সুরু হ'য়ে যায়!

কিন্তু মনের আর এক কোণের একটি সদ্য তাজা কথা বিলাসকে যেন পদে পদে নিরুদ্যম ক'রে দিত। সেটি

মধু-মালতীর কথা। মাধবীকে গ্রহণ করলে, মালতীর কাছে যে সে অপরাধী হ'য়ে পড়ে!

এক রাতের স্বপ্নের ধোঁয়া-আলোর কাকজ্যোৎস্নায় মালতী এসে উপস্থিত; সে হেসে হেসে বলে, যে বাগানে একদিন মালতী ফুটেছিল সেখানে মাধবীর ফোটার জায়গা নেই, এ আবার কোন দেশী কথা? গঙ্গা প্রয়াগে আছেন ব'লে কি কাশীতে আসেন্ নি?

পরিচ্ছেদ—পাঁচ

১

মাধবী চাইত সহকারের আশ্রয় এবং অবলম্বন। বিলাসের সেটুকু দেবার কোন অভাবই হ'ল না। ফাল্গুনের আরম্ভেই তাই বিলাস তাকে ঘরে স্থান দিল।

মনেও হয়ত বা একদিন স্থান দিতে পারত; কিন্তু মাধবী শুধু যে তার আশা করত না তা নয়; তার মনে ছিল একটা বদ্ধ-মূল ধারণার ভূতের মত গোপন বাসা। মধুমালতীকে সে ভাল ক'রেই জান্‌তো; জান্‌তো মালতী বিলাসকে কত ভালবাসত; আরো জান্‌তো যে, মালতীর বিলাস, মাধবীর বিলাস হ'তেই পারে না। লোকে সইবে না; ধর্ম্মের কাছে সে চির-জন্মের জন্য অপরাধী হ'য়ে থাক্‌বে।

এমনি ক'রে বিলাসের বহি-র্জীবনের আস্‌বাবের মত মাধবী বিলাসের সংসার, সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং রাধা-বল্লভজীর ভার নিয়ে দাসীর স্থান জুড়ে ব'সে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগ্‌ল। তার মন কি হৃদয় অধিকার করার কোন লোভও নেই, চিন্তাও নেই, মাধবীর।

কৃতজ্ঞতার স্থূল এবং দুর্ভেদ্য আবরণকে বিদীর্ণ ক'রে, প্রেম কিছুতেই জাগে না; শুধু ভক্তির, শুধু কর্ত্তব্যের, স্বচ্ছ-সংকীর্ণ ধারা পাহাড়ের গায়ে নির্ঝরের মত ক্ষিপ্র গতিতে ব'য়ে চলে।

বিলাস অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে; মনে ভাবে মাধবী মানুষ, না দেবতা!

২

একদিন বিলাস কোমর বেঁধে মাধবীর সঙ্গে কলহ করার জন্য এগিয়ে গেল:—

বিলাস। মাধবী, তুমি কি আমায় ভয় কর?

মাধবী। ভয় কেন ক'র্‌তে যাব, আপনি বাঘ ও নয়, ভালুকও নয়।

বিলাস। তবে? কেন তুমি পালিয়ে পালিয়ে থাক?

মাধবী ঘাড় হেঁট ক'রে থাকে, কথার উত্তর দেয় না।

বিলাসও ছাড়বার পাত্র নয়, বলে, উত্তর তোমার দিতেই হবে...

শেষে মাধবী বলে, লজ্জা করে...

বিলাস। কিসের লজ্জা?

মাধবী ঘোমটা টেনে দিয়ে বলে—দিদি থাকেন কিনা আপনারই সঙ্গে!......আঃ ঐ যে দিদি দাঁড়িয়ে...আঃ ছেড়ে দিন্ লজ্জা করে যে!

দিদি কে? মাধবী, দিদিকে? বিলাস অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে।

চুপি চুপি মাধবী বলে; মালতী দিদি!—

বিলাস বলে, ভুল, তোমার ভুল মাধবী...

মাধবী বলে, নিজের চোখে যে দেখ্‌তে পাই আমি!

৩

মাধবীকে বিলাস বহু চেষ্টা ক'রেও ফেরাতে পারেনি। মধুমালতী তার প্রেম-রাজ্যের সহ-ধর্ম্মিণী হ'য়ে রইল। মাধবী তার বহি-র্জীবনের ভক্তি-পথের অনুগামিনী ছাড়া আর কোন অধিকার নেয় নি!

সকল কথার উত্তরে একই কথা!—

দিদি কি মনে করবেন!

বসন্তে মাধবী কি মালতীর স্বপ্ন দেখে!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

১

আমরা যখন জন্ম নিই তখন বিধাতা পুরুষ আমাদের ললাটে যে কথাটি লিখে দেন সে কথাটি এই যে, "এখন থেকে এই বিশ্বসংসারের ভার এদেরি উপরে।" আমাদের আগে থেকে যাঁরা সংসার-ক্ষেত্রে আছেন তাঁদের কাছ থেকে আমাদের সংসার আমরা বুঝে নিই, সেই বোঝাপড়ার নাম শিক্ষা।

শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের বিষয় আশয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানো। অথচ বিষয় আমাদের এত বিপুল যে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে সমার্থক। সেইজন্যে এমন স্থানে ব'সে বোঝাপড়া কর্‌তে হবে যেখান থেকে সমস্ত জমিদারীটাকে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মতে এমন স্থান হচ্ছে—অরণ্য। অরণ্যে থেকে অনায়াসে উপলব্ধি করি, এতখানি আকাশ আর এত কোটি জ্যোতিষ্ক আমাদের, এত উর্ব্বরা পৃথিবী আর এত বিচিত্র প্রাণী আমাদের। নগরে আকাশ নেই, বাতাস বন্দী, পাখীরা খাঁচায় ও পশুরা চিড়িয়াখানায়; নগর হ'চ্ছে প্রকৃতির বিকৃতি। ভারতবর্ষ নগরকে শিক্ষাপীঠ কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেছেন।

যে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে সে তো কোনো মানুষেরই সংসার নয়। সূর্য্য নক্ষত্র ওষধি বনস্পতি পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ—সকলের ভার নিতে হ'লে সকলের সঙ্গ নিতে হয়। সেইজন্যে বিশ্ব-সংসারের যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয় হচ্ছে সেইখানে, যেখানে দিকে দিকে প্রাণ অঙ্কুরিত পল্লবিত প্রস্ফুটিত ফলাবনমিত হচ্ছে, বিকীরিত প্রবাহিত ধ্বনিত নিস্পন্দিত হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে মৃত ও সঞ্জীবিত জীর্ণ ও যৌবনান্বিত লুপ্ত ও আবির্ভূত হচ্ছে। নগর হয়তো মানুষের রাজধানী, কিন্তু মানুষকে জড়িয়ে যে বিশ্বপ্রকৃতি তার রাজধানী অরণ্য।

অরণ্য তো অনেক আছে,—শুধু অরণ্য হ'লেই শিক্ষাপীঠ হয় না। তার সঙ্গে কোনো মহাপুরুষের বহুকালাগত স্মৃতি সংযুক্ত থাকা চাই, কোনো মহা তপস্বীর সাধনার ইতিহাস। স্থানমাহাত্ম্য ফরমাস্ দিলে পাওয়া যায় না, বহুভাগ্যে ঘটে।

২

শান্তিনিকেতন তার স্থানমাহাত্ম্য পেয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের থেকে। মহর্ষির পুণ্যস্মৃতি শান্তিনিকেতনের মধ্যে উহ্য রয়েছে; প্রত্যেকের সাধনার তলে তলে মহর্ষির সাধনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবহমান। মহর্ষির আদর্শ প্রত্যেকের মনের আড়াল থেকে মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। চোখের সাম্‌নে মহর্ষির প্রতিকৃতি রাখ্‌বার দরকার হয় না।

আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ সেই আদর্শ বহু শতাব্দীর পরে আমরা মহর্ষির মধ্যে পুনরাবিষ্কার কর্‌লুম। সন্ন্যাসের বিকৃত আদর্শ বহু-শতাব্দীকাল ভারতবর্ষের মন কেড়েছিল, ভারতবর্ষের প্রকৃত আদর্শ কোথায় চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। মহর্ষিতে আমরা জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরাধিকারীকে প্রত্যক্ষ কর্‌লুম।

শান্তিনিকেতন ঠিক্ অরণ্য নয়; কিন্তু তার অবারিত আকাশ ও বহুবিস্তীর্ণ মাঠ অরণ্যের প্রতীক্ষা কর্‌ছিল; মহর্ষি অরণ্যের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন উদ্ভিদ্‌কে ও মানুষকে আমন্ত্রণ ক'রে।

মহর্ষিকে বাদ দিয়ে শান্তিনিকেতনের কথা ভাবা যায় না। শান্তিনিকেতনের তিনি কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠাতা নন্, অধিষ্ঠাতা। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তিনিও বাড়্‌তে

থাকবেন। তাঁর জীবনের গভীর শান্তি, প্রবল বিশ্বাস, উদার প্রেম প্রতি জীবনে সংক্রামিত হ'তে থাকবে।

মহর্ষির মহত্বই শান্তিনিকেতনের মূলধন, শান্তিনিকেতনের স্থান মাহাত্ম্য। এমন সৌভাগ্য অল্প শিক্ষায়তনেরই হয়। বর্ত্তমান ভারতে অন্য কোনো শিক্ষায়তনের তো নেই।

৩

বিদ্যা শেখানো শান্তিনিকেতনের মুখ্য কাজ নয়—শান্তিনিকেতন তো বিদ্যালয় নয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যের একটা লৌকিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, কৌমার্য্য। আসলে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন-যাত্রাটাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যা। ব্রহ্মচর্য্যার জন্যে শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের মুখ্য কাজ এমন একটি পরিমণ্ডল জোগানো যার মাঝখানে বাস করা আমাদের পরম শিক্ষার পক্ষে পরম আবশ্যক।

এমনি একটি পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কী? গুরুদেব।

সত্যকে আমাদের চারিদিকে ছড়ানো পাচ্ছি; কিন্তু তেমন ক'রে পেয়ে আমাদের সুখ নেই, আমরা পেতে চাই কোনো একজন মানুষের সুপরিণত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংহত রূপে, রঙকে যেমন রামধনুর ভিতরে পাই তেমনি। অত্যন্ত সহজ সত্যকেও আমরা গুরুর মুখ থেকে পেতে ভালোবাসি এইজন্যে যে, গুরুর ব্যক্তিত্ব তাতে একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে।

আমি সেই গুরুবাদের সমর্থন করছি নে যাতে গুরু অভ্রান্ত দেবতা ও শিষ্য আত্মসম্মানহীন নিজত্বহীন অমানুষ। কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সেই যে প্রথা ছিল, গুরুর কাছে কেবল একটি বিশেষ বিদ্যা নয় গুরুর অখণ্ড ব্যক্তিত্বকে আয়ত্ত করতে হবে, তার ফলে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ছিল প্রিয়জনের সঙ্গে প্রিয়জনের সম্বন্ধের মতো। আর পাঠ্যপুস্তক ছিল জীবন্ত মানুষ। এখন আমরা একজনের কাছে যাই গণিত শেখবার জন্যে, একঘণ্টা পরে আরেকজনের কাছে যাই ইতিহাস শেখবার জন্যে। এতে আমরা মানুষের চেয়ে মানুষের পাণ্ডিত্যকে দামি মনে করি এবং মানুষকে গণিতজ্ঞ বা ইতিহাসজ্ঞ ইত্যাদি হিসাবে খণ্ডভাবে চিনি।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক নন্, গুরু। পিতা যে রকম গুরু সেইরকম। তিনি আত্মীয় ও অগ্রণী। তিনি সকল কাজে ও খেলায় পূজায় ও পার্ব্বণে সকলের সঙ্গে ও সামনে আছেন। তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেন, তাঁর কীর্ত্তি তাঁর নিকটস্থ সকলের সম্মুখেই সৃষ্ট হ'য়ে উঠে। আশ্রমের কবি তিনি, নাট্যকার তিনি, নটগুরুও তিনি। আচার্য্য তিনি, মন্ত্রী তিনি, অর্থসংগ্রাহকও তিনি। সে কালের ভাষায় তাঁকে কুলপতি বলতে পারা যায়।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বেসর্ব্বা বা ডিক্টেটর নন্। যে আসন তিনি পেয়েছেন সে আসন সবাই ভালোবেসে ও যোগ্য মনে ক'রে তাঁকে দিয়েছে। এতে কারো আসন নীচু হয় নি, কারো মাথা নত হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যসম্রাট বললে যেমন কোনো সাহিত্যিকের আত্মকর্ত্তৃত্বে বা আত্মসম্মানে বাধা পড়ে না, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক সাহিত্যিকের চেয়ে এখনো প্রতিদিন বেশী লেখেন, ভালো লেখেন ও বেশী রকম লেখেন। শান্তিনিকেতনের কর্ম্মীরা তাঁকে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠরূপে পেয়েছেন ব'লেই তাঁকে পুরোভাগে স্থান দিয়েছেন।

৪

সাধারণত ইস্কুল স্থাপন করতে হ'লে আমরা কিছু টাকা তুলি, তাই দিয়ে বাড়ী তুলি ও মাষ্টার মজুত করি। অনেকে আবার শুধু বাড়ীটার বৃহত্ত্বের উপরেই বিশ্বাসী।

কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাড়ীঘর যেমন তুচ্ছ, বিশেষজ্ঞেরও তেমনি অকুলান। আদিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর বাসগৃহ। সেকালে যেমন গুরুগৃহে শিষ্যকে সন্তানের মতো করে নেওয়া হতো তেমনি ক'রেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আরম্ভ হলো। তার আগে থেকে ছিল মহর্ষির পুণ্যস্মৃতি, তার সঙ্গে যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব। এই দুই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে ক্রমে ক্রমে অনেক

আদর্শবাদীই সম্মিলিত হলেন। এঁদের জন্যে শান্তিনিকেতনের দেবার মতো ধনসম্পদ কিছু ছিল না, কেবল ছিল অবারিত আকাশ ও ধূ-ধূ করা মাঠ। সেখানে মানুষের আত্মা যে সহজ মুক্তিটি পায় তা শহরে পায় না। অনবরত বৃহৎ বিশ্বের তলে ও উপরে এবং বৃহৎ মানবের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য সর্ব্বত্র হয় না।

সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, উইলিয়াম্ পিয়ার্সন, সি-এফ্ এণ্ড্রুজ্, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু এঁরা প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এঁদের প্রতিভাকে মূল্য দিয়ে কেনা যায় না, বেতন দিয়ে নিয়োগ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এঁদের প্রতিভাকে টেনেছে। এঁদেরকে সবাই জানেন ব'লেই কেবল মাত্র এঁদের নাম করলুম, নতুবা কেবলমাত্র এঁরাই যে শান্তিনিকেতনের ত্যাগী কর্ম্মী এমন নয়।' শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এতদিনে সমস্ত পৃথিবীর হয়েছে, তাই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শান্তিনিকেতন কর্ম্মী ও বন্ধু পাচ্ছে।

সেকালের নালন্দ ইত্যাদি বিশ্ব-বিদ্যালয় শুধু পুরুষদের ছিল, তাই ভারতবর্ষের চিত্তকে তারা তেমন অধিকার করতে পারেনি যেমন পেরেছিল বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের তপোবনগুলি। শান্তিনিকেতনের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদেরকে প্রথম থেকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অঙ্গ জ্ঞান করা হয়েছে। ক্রমশঃ তাঁদের নিয়ে গুরুপল্লী গ'ড়ে ওঠে। তারপরে শিষ্যানীদেরকে দ্বার খুলে দেওয়া হয়।' স্ত্রীশক্তির আনুকূল্য না পেলে কোনো বড় জিনিষ বাড়তে পারে না। স্ত্রীরা কিছু না করুন, কেবলমাত্র নেপথ্যে উপস্থিত থাকলেও পুরুষ কাজ করবার দম্ পায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কীর্ত্তি হ'য়ে শান্তিনিকেতন সরস হয়েছে। শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত অল্পবয়স্ক বালক নেবার নিয়ম আছে। নারী না থাকলে সে বেচারাদের কী দশা হতো তার নমুনা যে কোনো বোর্ডিং দেখলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

৫

ভারতবর্ষের যা নিজস্ব ও শ্রেষ্ঠ তাকে বিশ্বের হাতে দেবার সময় এলো। বিশ্ব-ভারতী নামের প্রচ্ছন্ন অর্থ বোধ করি এই যে, এখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ অর্দ্ধনারীশ্বর হয়েছে; ভারতবর্ষের প্রবাহ বিশ্ব-সাগর সঙ্গমে উপনীত হয়েছে। বিশ্বভারতীর মন্ত্র, "যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্।" ভারতবর্ষের মাটি, বিশ্বের আকাশ; ভারতবর্ষের নীড়, বিশ্বের পাখী।

গত মহাযুদ্ধের দ্বারা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন কত জরুরি। দুর্ব্বার মিলন-প্রেরণা সব মানুষের ভিতরে আছেই; মিলন যদি ব্যাহত হয় তবে বিরোধ ঘটে। বিরোধ তো আর কিছু নয়, বিকৃত মিলন। প্রেমের ব্যাঘাতে যেমন ব্যভিচার, মিলনের ব্যাঘাতে তেমনি বিরোধ। মানুষের ইতিহাস ক্রমশঃ মহা মিলনের দিকে আসছে। তারই জন্যে রেল ষ্টীমার এরোপ্লেন, তারই জন্যে লীগ্ অব্ নেশনস্। এত রকম যন্ত্র হলো, অভাব রইলো কেবল একটি নীড়ের। এমন একটি পরিমণ্ডলের প্রয়োজন যেখানে সব দেশের মানুষ আত্মীয়তার সুযোগ পাবে, নানা সম্বন্ধে জড়াবে। পরস্পরের প্রতি মমতার থেকে আসবে পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে মানব-হিতকর কর্ম্ম।

বিশ্বভারতীর একটি ব্যক্তিগত দিকও আছে। নোবেল পুরস্কার থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব যে অকৃপণ আতিথ্য দিয়ে এসেছে সে আতিথ্যের পরিশোধ তিনি কর্ত্তব্য মনে করেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতার মুখ্য প্রতিনিধির সম্মান ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতারই সম্মান। ভদ্রতার খাতিরে বিশ্বকে আমন্ত্রণ ভারতবর্ষের হ'য়ে রবীন্দ্রনাথকে করতে হয়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ভদ্রতার এই ইঙ্গিতটি সকলের চোখে পড়ে না। আমরা কি কেবল নিতেই থাকবো, কিছু দেবো না? হাজার গরীব হ'লেও কি আমাদের আত্ম সম্মান থাকতে মানা?

বিশ্বভারতী ঠিক্ বিশ্ব-বিদ্যালয় নয়, সব রকম বিদ্যা শেখানো তার উদ্দেশ্য নয়। বিশ্বভারতী আমাদের ঘরের সেই অংশটি যেখানে আমরা অতিথির সঙ্গে মিলিত হই— আমাদের ঘরের শ্রেষ্ঠ অংশটি। সেখানে বিদ্যালোচনা হয়, এই তার চরম পরিচয় নয়। সেখানে আলাপ অন্তরঙ্গতা হয়, সেখানে রঙের ও ভাষার ভিন্নতা এবং ধর্ম্মের বিভেদ

হৃদয়কে পথ ছেড়ে দেয়।

বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের মহৎ অন্তঃকরণের উদ্যত দাক্ষিণ্য। বিশ্বভারতী মানব-মিলন-যজ্ঞে ভারতবর্ষের নৈবেদ্য।

৬

আগাছা আমরা তাকেই বলি প্রতিবেশীর প্রতি যার মমতা নেই, কৌতূহল নেই, নাড়ীর টান নেই। আমাদের শহরে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি পরগাছা না হোক আগাছা। পাড়াপড়শীর সঙ্গে তাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই।

শান্তিনিকেতন পদ্মপত্রে বারি বিন্দুর মতো নির্লিপ্ত নয়—চারিদিকের গ্রামগুলির সঙ্গে গোড়া থেকেই তার মৈত্রী আছে। ৭ই পৌষের মেলাতে প্রতিবেশী গ্রামের লোক শান্তিনিকতনে মিলিত হয়ে আসছে। অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতিতে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা নিকটস্থ গ্রামের লোকের ভরসা। সাঁওতালদের জন্য শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো অধ্যাপক ও ছাত্র বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেছেন।

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতেনর সেই অঙ্গ যে অঙ্গের নিত্যকর্ম্ম, প্রতিবেশীদের সেবা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব। শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্র তাদের দৃষ্টান্তস্থল; শ্রীনিকেতনে তারা কুটীর শিল্পের শিক্ষা পায়; ব্রতী বালকদলের পরিচালন-কেন্দ্র শ্রীনিকেতন। পল্লী কেমন ক'রে তার লুপ্ত শ্রী ফিরে পাবে, এই হলো শ্রীনিকেতনের ভাবনা।

কেবল আমাদের দেশ নয় সকল দেশই শেষ পর্য্যন্ত পল্লীগত প্রাণ। রূপোর চাক্‌তি খেয়ে মানুষ বাঁচে না, বাঁচে কৃষিজ দ্রব্য খেয়ে। প্রাণের সঙ্গে যার এত নিবিড় যোগ সেই কৃষি ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীতে বাণিজ্যের কাছে লাঞ্ছিত হচ্ছে। কৃষিকে আজকাল দরকারী একটা পেশা মনে ক'রে আমরা ক্ষান্ত হই, কিন্তু এককালে কৃষিকে আশ্রয় ক'রে কত কিম্বদন্তী কত গাথা কত ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে। একদিন যা জীবনের জীবন ছিল আজ তাই একটা স্বল্পার্থকরী জীবিকা মাত্র।

শ্রীনিকেতন কৃষির দিক থেকেই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এছাড়া শ্রীনিকেতনের আরো একটা তাৎপর্য্যও আছে। মানুষের মাথার সঙ্গে মানুষের হাতের বিরোধ বর্ত্তমান কালের অন্যতম মহা সমস্যা। বুদ্ধিজীবিতে শ্রমজীবিতে জাতিভেদের বাড়াবাড়ি প্রায় অস্পৃশ্যতায় পরিণত হয়েছে। এর প্রতীকার বুদ্ধিজীবিদের পক্ষ থেকে শ্রমজীবিদের প্রতি কার্য্যত সহানুভূতি প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধী চরকার সুতোকে সহানুভূতির সূত্র করেছেন। শান্তিনিকেতনের সহানুভূতি ব্যক্ত হচ্ছে শ্রীনিকেতন অন্তর্গত নানা মঙ্গল-প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল চালনা ক'রে শ্রমিকের সহিত ভাবুকের মিতালী পাতালেন।

প্রাচীনকালের তপোবনগুলিও চতুর্দ্দিকের লোকালয়কে ভাব দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে প্রীতি দিয়ে আপনার করেছিল। বটগাছের শিকড়ের মতো শান্তিনিকেতনের মূল অভিপ্রায় তেমনি ক'রে আশ পাশের মাটিকে শক্ত ক'রে ধরল। এর পরে শান্তিনিকেতনকে উপ্‌ড়ে ফেললে তার চারিদিকের পল্লীগুলিকেও উপ্‌ড়ে ফেলা হয়। যদি কোনো দিন শান্তিনিকেতন বহির্জগতের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তবে এই সব প্রতিবেশী পল্লী তার দুর্দ্দিনের আত্মীয় হবে।

৭

ইউরোপ খণ্ডে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেছি। ইউরোপের লোকের ধারণা শান্তিনিকেতনে এক প্রকার নতুন শিক্ষা প্রণালীর পরীক্ষা চলেছে। এ ধারণা ভুল যদিও নয় তবু ঠিক্‌ও নয়। কারণ শান্তি-নিকেতন শেখ্‌বার জায়গা নয়, থাক্‌বার জায়গা। অর্থাৎ অতি বৃহৎ অর্থে শেখ্‌বার জায়গা। এরূপ জায়গাকে ইউরোপীয় আদর্শে বিচার করা যায় না।

শিক্ষা আমাদের দেশের মতে ভগবানের কাছ থেকে—প্রকৃতির কাছ থেকে পাবার জিনিষ। গুরু কেবল সহাধ্যায়ী মাত্র। তিনিও শেখেন, আমারাও শিখি। ভারত-বর্ষের আকাশ বাতাস মাঠ ও গাছ থেকে আমরা পাই

অপরিসীম ঔদার্য্যের শিক্ষা। আমাদের প্রতিদিনের শিক্ষয়িত্রী যে প্রকৃতি তার মধ্যে আমরা দেখি অপরিসীম শান্তি। আমাদের অসংখ্য পশুপাখী পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এমন সহজ ভাবে ঘর করছে যে অস্তিত্বের জন্যে করাল সংগ্রাম ইত্যাদি আমাদের মনে আসে না।

শান্তিনিকেতনের শিশুরা গাছতলায় ব'সে বিদ্যাভ্যাস করে; আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি তাদের দৃষ্টি যায়; পাখীরা তাদের অনতিদূরে কণ্ঠাভ্যাস করে ও পশুরা চ'রে বেড়ায়; তাদের গায়ে গাছের পাতা খ'সে পড়ে ও হাতের কাছে প্রজাপতি ওড়ে। জীবনের এই যে বিচিত্র স্বাদ এই তাদের শিক্ষা। বৃহত্তম রিয়ালিটীর সঙ্গে তাদের সমস্তক্ষণ পরিচয়। অথচ এ এক নতুন শিক্ষা প্রণালীর প্রয়োগ নয়, এ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম তপোবনের অনুসরণ। এতে উপকরণের বাহুল্য নেই। বললে কম বলা হয়, এতে উপকরণের বালাই নেই।

তবে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা একেবারে বর্ব্বর নয়। তারা যে ঘরে খায় সে ঘরের আস্‌বাব নিজেরা তৈরি করেছে নিজেদের খেয়ালের ষ্টাইলে। মামুলী টুল টেবিল দেখে দেখে যাঁদের কল্পনাশক্তি অসাড় হ'য়ে গেছে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের খেয়াল তাঁদের কল্পনাশক্তিকে ঝাঁকানি দেবে।

তারপর তারা যে সব বাড়ীতে থাকে সে সব বাড়ী ভারতীয় বাস্তুকলার পুনর্জ্জন্মের নিদর্শন। বড়লোকের ছেলেদের জন্যে বড় বড় বাড়ী সব দেশে আছে, কিন্তু একটা প্রাচীন দেশের পুনর্জ্জাত বাস্তুকলার সঙ্গে সম্বন্ধের রোমান্স্‌ শান্তিনিকেতনের ছেলেদেরই জীবনে জুটেছে।

ছেলেদের যাঁরা গুরু তাঁরা শিক্ষক বা শিক্ষাতত্ত্ববিৎ নন্‌ যে ছেলেদের উপর দিয়ে শিক্ষা প্রণালীর পরীক্ষা করছেন। তাঁদের কেউ বা চিত্রকর কেউ বা বাস্তুশিল্পী। তাঁরা নিজের নিজের কাজ ক'রে যান্‌, ছেলেরা দেখে ও যোগ দেয়, শেখে ও শেখায়। গুরুতে শিষ্যে মিলে ভারতীয় চারু ও কারু শিল্পের নব যুগ প্রবর্ত্তন করছেন।

শান্তিনিকেতনকে যদি ইউরোপে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতেই হয় তবে মধ্য যুগের ফ্লোরেন্স্‌ বা সিয়েনা বা আসিসি'র সঙ্গে। এক প্রকার উপনিবেশ—তাতে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পাশাপাশি থেকে নিজের নিজের বৃহত্তম শিক্ষা ও স্বাভাবিক কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কেয়া ফুল

বিচিত্রা

ফাল্গুন, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

১

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঘনিয়ে এল। আকাশ অন্ধকার, খোলা জানালা দিয়ে অশান্ত পুবে বাতাস ঢুকে ঘরের জিনিষ-পত্রকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। মেঘনাদ একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে হাতের খবরের কাগজটা পড়বার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর কান অনতিদূরে স্ত্রীর ঘরের দিকেই পড়ে আছে। কখন্ একটি শিশুর কান্না শোনা যাবে উৎকণ্ঠিত হোয়ে তারি অপেক্ষা করছেন। সাত বৎসর পরে এই দ্বিতীয় সন্তান আসচে। মেঘনাদের স্ত্রী শৈল চিরদিনই ক্ষীণ দুর্ব্বল মানুষ, বড় মেয়ে বিজলীর জন্ম দিয়েই মাতৃত্বের গুরুভারে এম্নি নুয়ে পড়েছে যে, এতদিন পরে এই নতুন অতিথিটির আসবার সম্ভাবনা আনন্দের না হোয়ে উদ্বেগের কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার বাবু একবার ঘর থেকে বেরোবামাত্র মেঘনাদ এগিয়ে এলেন, "কি খবর? আর কত দেরী?" বৃদ্ধ ডাক্তারের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠ্‌লো; আশ্বাসের স্বরে বল্‌লেন, "ব্যস্ত হবেন না, আপনার স্ত্রী বেশ শক্ত আছেন।"

মেঘনাদ আবার বললেন, "বুঝেছেন, তো Dr. Sarkar, ছেলে আমার চাই না, কেবল আমার স্ত্রী যাতে—"

ডাক্তার বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "সবই ভালো হবে Mr. Chatterjee, আপনি উতলা হবেন না!" তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

আরো দু'ঘণ্টা অসীম উদ্বেগে কেটে গেল। বহুক্ষণ স্ত্রীর ঘর থেকে কোনো রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে মেঘনাদ যখন মনে মনে অস্থির হোয়ে উঠেছেন, ঘরে ঢুকলেন তাঁর বিধবা দিদি, যিনি এতক্ষণ শৈলর ঘর থেকে মুহূর্ত্তের জন্যে বের হোতে পারেন নি; বল্‌লেন, মেঘ, এইমাত্র আটটা কুড়ি মিনিটে তোর মেয়ে হয়েছে। ওরে লক্ষ্মী কোথা গেলি, শাঁখটা বাজা না।"

মেঘনাদ ব্যস্ত হোয়ে বল্‌লেন, "শৈল কেমন আছে?"

"বউ বড্ডই কষ্ট পেয়েছে ভাই, এখনো সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেনি,—মেয়েটা কিন্তু খাসা সুন্দর হবে। বিজুর রং পায়নি, কিন্তু বউএর মত মুখ হবে বোধ হয়!"

"রক্ষে কর দিদি, রূপ বর্ণনা রাখো, আমি কি ওঘরে যেতে পারি?"

"একটু অপেক্ষা কর্—আমি খবর পাঠাব"—তিনি আবার ঘরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

বৃষ্টি তখন জোরে পড়তে সুরু হয়েছে। নীচে বিজুর কলকণ্ঠ শোনা গেল,—অর্দ্ধ আলোকিত বারান্দা দিয়ে সে বাবার কাছে দৌড়ে এল; "বাবা দাসী বল্‌ছে বোন এসেচে—চল দেখে আসি।"

মেঘনাদ ওকে কোলের উপর তুলে বল্‌লেন, "দাঁড়া আগে একটা নাম ঠিক হোক্, নইলে ডাক্‌বি কি ব'লে?"

বিজু মহা উৎসাহে বল্‌লে, "সে তো আগেই ঠিক আছে বাবা, বোন হোলে কাজলী, ভাই হোলে অর্জ্জুন। আচ্ছা বাবা, 'কাজলী' কি গরুর নাম?"

"কেন? কে বলেছে?"

"মাষ্টার মশাই। তিনি বলেন শ্যামলী নাম ঢের ভাল।"

মেঘনাদ ওকে আদর করে বল্‌লেন, "না মা, কাজলী নামটিই সুন্দর। এই বর্ষার রাত্রে বিজলীর বোন কাজলীই তো পৃথিবীতে আসবে। চল আমরা কাজলীকে দেখে আসি, পিসিমা ডাক্‌ছেন।"

২

কাজলীর জন্মের আটদিন পরে শৈল মেঘনাদের হাত ধ'রে বল্‌লে, "কোনো সাধই মিট্‌ল না অথচ যাবার ডাক এসেছে।"

মেঘনাদ ভাল ক'রেই জানেন স্ত্রীর অবস্থা কতদূর সঙ্কটাপন্ন; সেপ্‌টিক্ তার সঙ্গে ১০৪।৫ জ্বর, দেহে রক্তও নেই শক্তিও নেই, এই আটদিন ধ'রে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। তবু স্ত্রীর ক্ষীণ হাতটি নিজের বুকের কাছে ধ'রে বল্লেন, "না রাণি, তোমায় বাঁচতেই হবে, তোমায় বাঁচাবই।"

শৈলর শীর্ণ করুণ মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো; বল্লে, "ছোট খুকি কোথায়"?

"দিদির কোলে ঘুমুচ্ছে, আনবো?"

"না থাক্। আমি কি ভাব্‌ছি জান? আমি ম'রে গেলে তোমার যন্ত্রণার অবধি থাক্‌বে না। বিজু বড় হয়েছে, কিন্তু ছোট খুকিটা এই তো সবে জন্মালো—ও হয়তো অনেকদিন বাঁচবে। পৃথিবীতে যে যত অসহায় সে তত দীর্ঘ আয়ু নিয়ে আসে,—ওকে নিয়ে অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হবে। ভালই হোল শৈল মুখপুড়িকে সহজে ভুল্‌তে পারবে না।" শৈল পরিহাস করতে ভালবাস্‌তো, এই মরণের দুয়ারে পা বাড়িয়েও স্বামীকে একটু খোঁচা দিলে।

মেঘনাদ উত্তর দিলেন না; ম্লান হাসি হেসে ওর কপালে, রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। শৈল চোখ বুজে ভাব্‌তে লাগলো—এত সুখ কার? কে ওর মত এমন অক্ষয় সৌভাগ্য ফেলে রেখে অজানা পথে পাড়ি দেয়? ওর মত স্বামীর বুক ঢালা ভালবাসা ক'টা নারীর ভাগ্যে জোটে? প্রাণের পুতুলি বিজলী—ছোট্ট অসহায় খুকু সব ছেড়ে যেতে হবে। হায়রে! মায়ার সংসারে কি বন্ধন!

মেঘনাদের অগাধ অর্থব্যয়, অক্লান্ত সেবা, দশজন ডাক্তারের আনাগোনা, পরামর্শ, চিকিৎসা, ওষুধ, ইন্‌জেক্‌সন্, রক্তদান সব ব্যর্থ ক'রে কাজলীর জন্মের ঠিক একুশ দিন পরে, বর্ষার ঘনঘটার মধ্যে, সংসার পথে এতদিনকার সুখদুঃখের সাথী, সহায়, সম্পদ, ভরসা, লক্ষ্মী-স্বরূপিনী শৈল চির আদরিণী শৈল অনন্ত-পথে যাত্রা করলে।

মেঘনাদের দিদি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন। বিজলী কতক বুঝে কতক না বুঝে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে লাগ্‌লো। লক্ষ্মীদাসী চোখের জল মুছে মা-হারা কাজলীকে কোলে নিয়ে ভোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। কেবল মেঘনাদ শুষ্ক চোখে, অপলক দৃষ্টিতে শৈলর সুন্দর অতি সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর যথা কর্ত্তব্য সবই সমাধা হোল—সংসার যথা নিয়মে চল্‌তে লাগ্‌লো।

৩

শৈলর মৃত্যুর পর আরো দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেল। মেঘনাদের দিদি ছোট মেয়ের দোহাই দিয়ে ভাইকে আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মেঘনাদ গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, "কাজলকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে যদি তোমার কষ্ট হয় দিদি, আমি গভর্ণেস ও দুটো দাসী বেশী রাখ্‌তে রাজি আছি।"

দিদি আর দ্বিতীয় কথা বলেন নি। জন্ম থেকে মানুষ করা ভাই-ঝি যে সন্তান-হীনা পিসিমার কতখানি, তা মেঘনাদও ভাল ক'রেই জানতেন।

কাজলীর জীবনে এই সাতটা বছর খুব বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্ত্তনশীল হ'লেও ইতিহাস অতি অল্পই। কথা বল্‌তে শিখেই সে চাকর দাসীর মুখে শুনে পিসিকে "বড়মা" ডাক্‌তে সুরু করলে। বিজুর খেলার সাথী ও মেঘনাদের চোখের মণি হোয়ে দাঁড়াল। ওর মুখের দিকে চেয়ে মেঘনাদ সমস্ত ভুলে যেতেন, এ যেন শৈলরই একটি ছোট ছবি, একটি শিশু সংস্করণ। সেই স্নিগ্ধ শ্যামাভ গায়ের রং, ঘন পক্ষ্ম ঘেরা বড় বড় দুটি কালো চোখ, রেশমের মত চুলের গুচ্ছ, নিখুঁত নাক,—আর গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত দুটি ঠোঁটে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। ওর মুখের দিকে চেয়ে শৈলকে এ বাড়ীতে কেউ ভুল্‌তে পারে না, ও যে শৈলের ধন একথা কাউকে ব'লে দিতে হয় না। বিজলীকেও কম সুন্দরী বলা যায় না; সে তার বাপ পিসির মত সুন্দর রং ও জলুজ্বলে চেহারা পেয়েছে; বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ওর রূপ রৌদ্রময় দিনের মত প্রখর ও উজ্জ্বল হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তার পাশে পাশে কাজলীকে স্নিগ্ধ ছায়াখানির মত দেখাত।

যেদিন মেঘনাদ বিজলীকে ডেকে বলেছিলেন, "বিজু, তুমি মায়ের ভালবাসা সাতবছর পেয়েছ, কিন্তু ছোট খুকু একমাসও পায়নি; ওকে তুমি ভালবেসো, আমরা সকলে মিলে ওকে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে রাখ্‌ব।"

বিজলী মাথা নেড়ে পরম বিজ্ঞ-ভাবে বলেছিল, "আমি তো ওকে খুব ভালবাসি।"

কাজল যেদিন দিদির আঁচল ধ'রে বেড়াতে শিখ্‌লো—"দিদি" ব'লে ডাকতে সুরু করলো,—বিজলীর সেদিন নব-জন্ম যেন। সকলকে একথা বার বার ব'লেও তৃপ্তি পায়নি। মাষ্টার মশাই শুনে বলেছিলেন, "তোমার বোন যদি তোমায় খুব মারে, তুমি কি করবে বিজলী?"

বিজলী তখনি জবাব দিয়েছিল, "আমার এমন মিষ্টি লাগ্‌বে মাষ্টার মশাই, ওকে আমি বুকে ক'রে চুমো খাব। কিন্তু ও তো মারতে শেখেনি, ও যে মা-মণির মত ভাল হ'য়েছে।"

মেঘনাদ প্রতিদিন আফিস থেকে এসে বিজলীর হাত ধ'রে কাজলীকে কোলে নিয়ে শৈলর ঘরে ঢুকতেন। সে ঘর তিনি আর ব্যবহার করতে পারেন নি, কিন্তু ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপের গন্ধ দিয়ে পুজোর ঘরের মত পবিত্র ক'রে রেখেছিলেন। মেয়েরা সে ঘরে জুতো খুলে ঢুক্‌তো, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বল্‌তো, দুইহাত জুড়ে মায়ের ছবিকে প্রণাম করতো আর প্রতিদিনকার শোনা মায়ের গল্প রোজ নতুন করে শুন্‌তো।

৪

কাজলীর সাত বৎসরের জন্মদিন এল। ওর জন্মটা বাড়ীতে সুখের ব্যাপার নয় ব'লে, কখনো উৎসব হোত না। পিসি রাগ ক'রে বলতেন, "নাই বা হোল সুখের, তবু ওকে পেয়েছিলুম ব'লেই তো শৈলকে ভুলে থাক্‌তে পেরেছি।" এবার বিজলী পিসিমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঐ দিন খুব একটা সমারোহ করবে ঠিক করলে। স্কুল থেকে এসেই বোনকে নিয়ে গেল ছাদে, বল্‌লে, "জানিস কাজল, পরশু পাঁচুই আষাঢ় তোর জন্মদিন।"

কাজল বড় বড় চোখ তুলে বল্‌লে, "জন্মদিন কাকে বলে দিদি?"—

"ওমা কি বোকা তুই, তাও জানিস্‌নে? যেদিন তুই জন্মেছিলি।"

এবার কাজল কতক বুঝ্‌তে পেরে বল্‌লে, "সেই যখন স্বর্গে চ'লে গেলেন?" এ সব কথা শুনে শুনে ওর মুখস্থ।

বিজলী বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই, এবার জন্মদিনে আমরা খুব মজা করবো। আমার স্কুলের বন্ধুদের, মিহিরকে, প্রদীপকে, মালুকে, বুলটুকে, রুনুকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব।"

কাজল মহাখুসি, হাততালি দিয়ে বল্‌লে, "এক্ষনি কর, আজই কর"—ওর দেরী সয়না। দিদি বিজ্ঞের সুরে বল্‌লে, "রোস্ আগে বাবাকে রাজি করি"।

বাবাকে রাজি করতে দেরী হোল না। এই সাত বছর ধ'রে মেঘনাদ নিজের মনের সঙ্গে আর হারানো স্ত্রী শৈলর সঙ্গে এমন একটি সম্বন্ধ ক'রে নিয়েছেন যেখানে স্মৃতিতে বেদনা নেই, যেখানে তাকে হারাবার ভয় নেই, যেখানে সে আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ হোয়ে অন্তরের অন্তস্থল আলোকিত ক'রে রেখেছে। তা'ছাড়া দিদির কথায় কিছুদিন হোল তাঁর খেয়াল হ'য়েছে বিজলী বড় হচ্ছে, ওর বিয়ে দিতে হবে—ওকে মানুষের সাম্‌নে বের করতে হবে, দুই মেয়ে নিয়ে ঘরের কোণে বন্দী হোয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। ওযে শৈলর বড় আদরের বিজু, ওকে মনোমত পাত্র খুঁজে সমর্পণ করতে হবে। বল্লেন, "বেশ তো মা, তবে এই সঙ্গে আমারও দু'চারজন বন্ধুকে বলি।"

বিজলী উৎসাহ পেয়ে বল্‌লে, "সে বেশ হবে বাবা, তোমার বুড়ো বুড়ো বন্ধুদের জন্যে হ'ল ঘরের পাশের ঘরটা সাজিয়ে দেব। তাঁদের নামগুলো বল, চিঠি পাঠাব"—

"এই তোর কালীকিঙ্কর জ্যাঠামশায়, আর তাঁর ছেলেমেয়ে—শশাঙ্ক আর তার ছেলে, আর পাশের বাড়ীর ভুবনবাবু।"

বিজলী বল্‌লে, "শশাঙ্ক জ্যাঠার ছেলে মিহিরকে তো আগেই আমরা লিষ্টএ ধ'রেছি। ওর সঙ্গে যে আমাদের খুব ভাব হ'য়েছে"—

মেঘনাদ আশ্চর্য্য হোয়ে বল্‌লেন, "কবে হোল?"—

ওমা, "তুমি যে কি ভুলে যাও! শিবপুর বাগানে প্রথম দেখা হোল,—মনে আছে? তারপর ওদের বাড়ী দুদিন নেমন্তন্ন খেলুম, মিহির একদিন বেড়াতে এসেছিল, তবু বুঝি ভাব হবেনা?"

মেঘনাদ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "নিশ্চয় মা, এতে যদি ভাব না হয় তবে তো অপরাধের কথা। কিন্তু বুড়ি, তুই সব পারবি তো? একসঙ্গে এত জনকে তো কখনো বলিসনি।"

বিজলী বল্লে, "খুব পারবো, পিসিমা সব দেখিয়ে দেবেন বলেছেন।"

মেঘনাদ নিশ্চিন্ত হোয়ে বই খুলে বস্‌লেন।

ভাঁড়ারের দালানে কাজল তখন বড়মার কাছে ব'সে তার ছোট ছোট চুলে বিনুনি বাঁধ্‌ছিলো। অনেক রকম আলোচনা ও গবেষণার পর কাজল বল্লে, "বড়মা, তুমি যে শ্বশুরবাড়ী যাবার গল্প বল, দিদি যাবে না তো সেখানে?"

"ষাট, ষাট, যাবে বই কি ধন—শ্বশুর বাড়ী না গেলে হয়, দিদি যাবে, তুমি যাবে"—

"একসঙ্গে যাব?"

"আগে দিদি তারপর তুমি। রাজপুত্তুর বর আস্‌বে, বাঁশি বাজ্‌বে, আলো জ্বল্‌বে, তারপর দিদিকে নিয়ে চ'লে যাবে"—

"আমিও দিদির সঙ্গে যাব।"

"তবে আমাদের কাছে কে থাক্‌বে?" কাজল এবার মহা ভাবনায় পড়্‌লো, বল্লে—"কেউ যাবে না, সবাই থাক্‌বে।" সম্প্রতি পিসিমা তাতে আপত্তি করলেন না; চুল বাঁধা শেষ হোয়ে গেল, তিনি মনে মনে বল্লেন,—বাছা আমার মায়ের স্নেহ জানে না, ওকে সংসারের ঝড় ঝাপ্‌টা থেকে কি ক'রে আগ্‌লে রাখ্‌ব?

৫

সেদিন বাড়ীতে সত্যিই উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেল। বহুদিনকার বন্ধ করা নীচের বসবার ঘরটার সব দরজা জানালা খুলে বিজলী নিজে হাতে ঝাড়া মোছা সুরু ক'রে দিলে। বালতি বালতি জল ঢেলে, জানলা দরজায় পর্দ্দা লাগিয়ে, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে—ঘরটার একেবারে শ্রী ফিরিয়ে সে যখন রান্না ঘরে এল,—তখন পিসিমা লক্ষ্মীদাসীর সাহায্যে অনেকদূর অগ্রসর হোয়েছেন দেখ্‌লে।

কাজলী নিকটে ব'সে অনর্গল ব'কে যাচ্ছে—ময়দার পুতুলও কয়েকটা বানিয়ে ফেলেছে।

পিসিমা বল্লেন, "যা, যা বিজু, এবার কাপড় চোপড় প'রে তৈরী হোয়ে নে; কাজলকে তোল্‌ ওখান থেকে, ভাল ক'রে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দে, নিজেও একটু সাজ গো' দেখি, অমন সন্ন্যাসিনীর মত মূর্ত্তি ক'রে থাকিস্‌নে। মায়ের তোরঙ্গ খুলে বেগুনী বেনারসীখানা আর দু'চারটে গয়না বের ক'রে পর।"

বিজলী খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো—বল্লে, "আজ যদি অমন সংএর মত সাজি, স্কুলের মেয়েদের সাম্‌নে মিহিরের সাম্‌নে মুখ দেখাতে পারবোনা পিসিমা।"

পিসি তো অবাক! "সাজলে আবার মুখ দেখানো যায়না নাকি? তোদের কালে বাছা সবই বিচ্ছিরি—তা তুই মিহিরকে নাম ধরে বলিস নাকি?"—

বিজলী ঠোঁট উল্‌টে বল্লে, "বলবনা তো কি? আমার চাইতে মোটে পাঁচ ছ' বছরের বড়—তা'কে দাদা বলতে হবে?"

পিসিমা আশ্চর্য্য হোয়ে ভাব্‌লেন এও বোধ হয় একালের ধারা! পাঁচ ছয় বছরের বড়, সে বড় নয়! তবু আর কথা বাড়ালেন না, তাড়া দিয়ে দুই মেয়েকে সাজ্‌তে পাঠালেন।

বিজলী ছোট বোনকে মনের মত ক'রে সাজালে, তারপরে ওর কচি মুখখানিতে চুমু খেয়ে বল্লে, "আজ তোকে এম্‌নি মিষ্টি দেখাচ্ছে কাজল, যে দেখ্‌বে সেই আদর করবে"—

কাজল বল্লে "মিহির দা করবে?"

ওর ছোট্ট মনটি কখন্‌ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল—মিহিরের কথা বল্লে দিদি খুসী হয়। কিন্তু বিজলীর মুখটা হঠাৎ লাল হোয়ে উঠ্‌লো—ওকে কোলের থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লে, "যাও সোনা, গেটে দাঁড়িয়ে থাকো, কেউ এলেই সাম্‌নের ঘরে বসিও।"

ছাড়া পেয়ে কাজল ছুটে পালালো। বিজলী নিজের সাজ গোজটা যথা সম্ভব সংক্ষেপে ও তাড়াতাড়ি সেরে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু কার্য্যগতিকে তা হোয়ে উঠলো না। শাড়ী নির্ব্বাচন আর হয় না, এটা সেটা ঘেঁটে—কোনোটা পরে কোনোটা না পরে' সবই অপছন্দ করলে। শেষকালে একটা

হাল্কা ফিরোজা রংএর শাড়ী মনোমত হোল—তার সঙ্গে একটা পান্নার দুল আর মুক্তোর হার প'রে তার ইন্দ্রাণীর মত রূপ শতগুণ বাড়িয়ে তুল্‌লে! সাজ শেষ ক'রে বড় আয়নায় নিজের সুন্দর মুখখানি আর একবার ভাল ক'রে দেখে নীচে নেমে গেল!

সিঁড়ির নীচেই মিহিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। মিহিরের সঙ্গে মনে মনে তার যতই ভাব জমে উঠুক্ কিন্তু সঙ্কোচ এখনো ভাল ক'রে কাটে নি। বিশেষতঃ মিহির এতই লাজুক প্রকৃতির যে বিজলীকেই লজ্জা দূর ক'রে আলাপ করতে হয়। বললে, "তোমার বাবা আসেন নি বুঝি?"

মিহির অপ্রস্তুত ভাবে বল্‌লে, "আস্‌বেন না কেন—তোমার বাবার কাছে বসেছেন, তিনি আমাকে এই দিকেই পাঠিয়ে দিলেন।"

"বেশ করেছেন, তুমি কি বাইরের ছেলের মত বসবার ঘরে ব'সে থাক্‌বে নাকি? এসো আমার সঙ্গে কাজ করবে—খাবারের প্লেট সাজানো বাকি"—ও সহজ হোয়ে মিহিরকে সহজ ক'রে নিতে চায়—তবু মিহিরের লজ্জা কাটে না।

খাবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বিজলী বল্‌লে, "কাজলকে দেখ্‌লে? ওকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না?" মিহির ভাব্‌লে তার দিদিটিকেই বা কি কম? কিন্তু কথাটা মনে হোতেই ও নিজেই লাল হয়ে উঠ্‌লো, কেবলমাত্র হুঁ ছাড়া আর কিছুই বলা হোল না।

নিমন্ত্রিতরা একে একে সবাই এসে পড়লেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার শেষ ক'রে গান বাজনা সুরু হোল। বিজলীর বন্ধু সবিতা যখন মিহি গলায় একটা হিন্দুস্থানী গান ধরলে কালীকিঙ্কর বাবুর ছেলে বিলেত থেকে সদ্য-আগত Mr. Ganguli ওরফে সুবোধ বিজলীর সাম্‌নে গিয়ে করযোড়ে বল্‌লে, "আপনার গান শোন্‌বার সৌভাগ্য কি হবেনা Miss Chatterjee?"

বিজলী অপ্রতিভ হোয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, আমার আবার গান?"

ওর বন্ধু কনক ওর কানের কাছে মুখ এনে বল্‌লে, "বলনা, কি পুণ্য করেছেন যে, সে সৌভাগ্যের আশা করেন?"

বিজলী ওর হাতে মৃদু চিম্‌টি কেটে সুবোধের পাশে ব'সে ইংরিজি গান সম্বন্ধে মতামত শুন্‌তে লাগ্‌লো।—

হলঘরের পাশের বারান্দায় প্রতিবেশী ভুবনবাবুর ছেলে প্রদীপ তখন কাজলকে বল্‌ছে, "কাজলি, আজ তোমায় এমন সুন্দর দেখাচ্ছে"—

কাজল খুসী হোয়ে বল্‌লে, "দিদি সাজিয়ে দিয়েছে"—

প্রদীপ বল্‌লে, "আমি তোমায় ফুলের তোড়াটা দিয়েছি ব'লে তুমি খুসী হোয়েছ কাজলি? ওটা আমি নিজের হাতে ফুল তুলে বেঁধেছি।"

কাজল দুঃখিত হোয়ে বল্‌লে, "তোমাদের বুঝি মালি নেই ভাই?"

"থাক্‌লেও, তোমার জন্মদিনের তোড়া আমার নিজে বেঁধে দিতে ইচ্ছে করলো"—হঠাৎ কাজলের মনে হোল, দিদি বলে দিয়েছিল কেউ কিছু দিলে খুসী হোয়েছি বল্‌তে হয়। ও বল্‌লে, "প্রদীপ, আমি খুব খুসী হোয়েছি।"

প্রদীপের মুখটা হাসিতে ভ'রে গেল—"সত্যি খুসী হোয়েছ?—ফুল পেলে তুমি আমারি মত খুসী হও বুঝি?"

কাজলী এবার একটু ভাব্‌লে, তারপর বল্‌লে, "আমি মনে করেছিলুম, তুমি কিছু দেবে না—তাই ফুল পেয়েই খুসী হোয়েছি।"

ওর ছেলেমানুষীতে প্রদীপ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল—তেরো বছরের ছেলে ও, তবু কাজলীকে কত ছোট লাগে—এমন কচি; ওর বোন মালবীর চেয়েও কত ছেলেমানুষ;—তাই তো ওকে এমন ভাল লাগে। বল্‌লে "তুমি আমায় মালুর মত প্রদীপদাদা বলনা কেন কাজলী?"

"দিদি কেন বলে না দাদা? আমি শুধু মিহিরকে দাদা বলি, দিদি ব'লে দিয়েছে কিনা। ওই দেখ মিহিরদাও কি রকম দুঃখ দুঃখ মুখ ক'রে ব'সে আছে। ওকে এই ফুলের তোড়াটা দিয়ে আসি প্রদীপ।"

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে ও ছুটে পালালো। প্রদীপ দুঃখিত হোল, কিন্তু রাগ করলে না। কাজল সে তোড়াটা

পেয়ে খুসী হোয়েছিল এতেই ওর মনটা ভ'রে গেল। এত অল্প বয়সেই ও কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছিল। তাই ওর কবি মনটি সদাই একটি মধুর ভাবুকতায় পূর্ণ হোয়ে থাক্‌তো—সামান্য ছোট্ট জিনিষকেও ও কল্পনা দিয়ে সুন্দর ক'রে দেখত।

মিহির একধারে গম্ভীর হোয়ে বসেছিল, বিজলী এক ফাঁকে ওর কাছে গিয়ে বল্‌লে, "কিছু কথা বলছনা কেন মিহির ?"

"আমার চুপ ক'রে সব দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে।"

"কিন্তু কই দেখ্‌ছ ? অন্যমনস্ক হোয়ে বসে আছ তো"—

"সব জিনিষ হয়তো দেখ্‌ছিনা—যা' চোখ এড়াবার নয়—তা' চোখ ভ'রে দেখছি।"

বিজলী হাসলে "উপস্থিত তো কালীকিঙ্কর বাবুর মেয়ে পারুলকে দেখ্‌ছ।"

মিহির অপ্রস্তুত হোয়ে বল্‌লে, "পাগল নাকি! একটা গান করবে বিজলী ? বড় শুন্‌তে ইচ্ছে করছে"—

বিজলী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "যদি করি, তবে ঐ Mr. Gangulir সবিনয়ে করজোড়ে অনুরোধেই গাইব, তোমার এ দায়সারা কথায় গাইব না জেনো।"

মিহির মলিন হাসি হেসে বল্‌লে, "সেইজন্যেই তো একপাশে ব'সে আছি"।

Mr. Ganguli ওদের এতক্ষণ কটাক্ষে দেখছিলেন, বিজলীকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সাম্‌নে এসে বল্‌লেন, "আজ আমার ভারী আনন্দের দিন"—

বিজলীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠ্‌লো, তিনি আবার বুঝিয়ে বল্‌লেন "বুঝ্‌তে পারছেন না ? এমন সহজ, সপ্রতিভ সুন্দরী বাঙালী মেয়ে এই প্রথম দেখ্‌ছি"—

বিজলী সুবোধের স্পষ্ট উক্তিতে লজ্জা বোধ করলে, বল্‌লে, "ওদের দেশের মেয়েরা বুঝি আপনাকে খুব মুগ্ধ করে Mr. Gangnli ?"

Mr. Ganguli একটি নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "এদেশের সব মেয়েরা যদি আপনার মত হোত Miss Chatterjee।"

এরকম ধরণের আলাপ বিজলী আর বেশী দূর অগ্রসর করতে পারলে না—মৃদু হেসে পাশের ঘরে চ'লে গেল। সেখানে বাবার বন্ধুদের পুরোদমে গল্প জমেছে। ও কালীকিঙ্করের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "ডাক্তারজ্যাঠা, পারুলের বিয়ে কবে দেবেন ?"

কালীকিঙ্কর মনে মনে বিজলীকে ভারী স্নেহ করেন— সাধ আছে বউ ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে যান; বল্‌লেন, "সুবোধের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজছি—পেলে একসঙ্গে দু'ভাই—বোনের বিয়ে হবে।"

বিজলী আর কিছু বল্‌লে না, সেখান থেকে বারন্দায় চলে গেল। মিহিরের শান্ত বিষণ্ণ মুখখানা দেখে ওর মনটা যে কেন এমন ভারী হোয়ে উঠ্‌ছে তা' ভেবে পেলে না।

কালীকিঙ্কর তখন বিজলীর কথার সূত্র ধ'রে মেঘনাদকে বল্‌ছেন, "মেঘনাদ, দাওনা তোমার বিজলীকে আমি বউ করি। আমার ছেলেকে তো দেখ্‌ছ ? কিছু অমানান হবে না।"

মেঘনাদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "সে তো বিজলীর সৌভাগ্য কালীদা"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমা দেবী

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

কলিকাতার সংবাদপত্রাদি

সংবাদপত্রের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের কথাই আগে বলি। ১৮৯১ সালে সিমলা শৈলে আমি একখানি সংবাদ-পত্র ছবি দেখিবার জন্য খুলি। তখন হয়ত সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয় মাত্র আমার হইয়াছে। সংবাদপত্রখানির নাম যে "বঙ্গবাসী" তাহা আমি জানিতাম, কারণ এই পত্র প্রতি সপ্তাহে ডাকযোগে সিমলাশৈলে আমাদের বাড়ীতে আসিত। যাহা হউক ছবি দেখিবার জন্য যে সংখ্যা আমি পড়িবার চেষ্টা করি তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত দুইখানি ছবি ছিল। একখানিতে বিদ্যা-সাগর মহাশয় পালঙ্কে শুইয়া আছেন এবং অপর খানিতে শ্মশানে তাঁহার কঙ্কালসার শবদেহ তুলিয়া বসাইয়া গঙ্গা-জলের দ্বারা স্নান করান হইতেছে—এইরূপ চিত্রিত ছিল। সেই সময় হইতেই সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" প্রায় নিয়মিত রূপেই পাঠ করিতাম। মস্ত নাক, মস্ত টিকি, মস্ত ভুঁড়ি, ও আকর্ণবিস্তৃত মুখযুক্ত পঞ্চানন্দের ছবি দেখিয়া আমার বালকহৃদয়ে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইত। ১৮৯৮-৯৯ সালে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যালয়-ভবন নির্ম্মাণ উপলক্ষে এই পত্রের সত্ত্বাধিকারী ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য যখন বঙ্গদেশবাসীর দ্বারস্থ হইলেন, তখন তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকাংশে যে হইয়াছিল তাহা শিবমন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ ভবন হইতে প্রমাণিত হয়। শুনিয়াছি এই পত্রের এইরূপ নিয়ম যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতি ইহার সম্পাদক হইতে পারে না। এই ভিক্ষা প্রার্থনার পূর্ব্বে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে পঞ্চানন্দের ছবি সমন্বিত যে সব হাস্য কথা "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইত তাহা পাঁচকড়ি বাবুর লেখা। অপর কেহ কেহ বলেন যে ঐ সকল লেখা বর্দ্ধমানের উকিল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী নিঃসৃত। কবি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে বাঙ্গালীর রাজনীতি আলোচনা সম্বন্ধে "ভারত-উদ্ধার" নামক যে তীব্র ব্যঙ্গকাব্য ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন তাহা এখনও উপভোগ্য। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ার সম্বন্ধে ঐরূপ ছন্দে তিনি যে আর একটি কবিতা লিখিয়াছেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত কবিতা "বঙ্গবাসী" পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর কেহ কেহ বলেন যে, পঞ্চানন্দ শীর্ষক সমস্ত রচনাই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর লেখনীও যে রসময়ী ছিল তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে সহজেই বুঝা যায়। * ভিক্ষা ঘটিত ব্যাপারে পাঁচকড়ি বাবু "বঙ্গবাসীর" সংস্রব ত্যাগ করিয়া সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান ভবন নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় কলুটোলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল।

স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, দর্শন, প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া "বঙ্গবাসী" হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের যে অশেষ উপকার করিয়াছেন তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। শশধর তর্কচূড়ামণি, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা "বঙ্গবাসীর" ক্রোড়ে স্থান পাইয়া হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বথা ন্যায্য—শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচারে যোগেন্দ্রচন্দ্র বেদব্যাসের সহিত তুলনীয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে তাঁহার হ্যারিসন রোডস্থ বাটিতে আমি একবার দেখিয়াছিলাম। রাস্তা হইতে সিঁড়ি

* ১৩১১ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তকে ইন্দ্রনাথ নিজেকে "পঞ্চানন্দের" লেখক বলিয়া প্রকাশ করায় এক্ষণে সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।

দিয়া উঠিয়াই বাঁ দিককার বৈঠকখানা ঘরে ঢালা বিছানার উপর প্রকাণ্ড তাকিয়ায় বিশাল শরীর কাৎ করিয়া গড়গড়ার নল মুখে ধরিয়া কি লিখিতেছিলেন। ভাঁটার মত চক্ষু দু'টি, নবজলধর-পটল-শ্যামলবর্ণ বিশিষ্ট তাঁহার স্থূল শরীরের সমকক্ষ কেবলমাত্র একটি লোককে কলিকাতায় দেখিয়াছি, সে লোকটির নাম দুর্গাচরণ জেলিয়া, নিবাস বহুবাজারের বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেনে।

১৮৯২-৯৩ সালে কলুটোলার কবিরাজদিগের দ্বারা "হিতবাদী" স্থাপিত হয়। এই পত্রিকাখানি আমি প্রথম দেখি পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের হাতে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার ভগ্নিপতি হরিমোহন বিদ্যাভূষণের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। "হিতবাদী"তে সেই সময় হইতেই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লেখা মাঝে মাঝে বাহির হইত। "বৃদ্ধের বচন" শীর্ষক যে রচনা হিতবাদীতে এখনও প্রকাশিত হয় তাহা অনুমান হয় এই বিদ্যাবিনোদমহাশয়ের লেখা। ১৮৯৭—৯৮ সালে "রুচিবিকার" শীর্ষক কবিতা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ঐ কবিতা প্রকাশের জন্য ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হইয়া বিচারে কাব্যবিশারদের নয় মাস কারাদণ্ড হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক বাংলায় অনুদিত অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের এক সংস্করণ এবং শব্দ-কল্পদ্রুম নামক অভিধান প্রকাশ করিয়া "হিতবাদী" পাঠক সাধারণের তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। "হিতবাদী" ও "বঙ্গবাসী"তে মাঝে মাঝে বেশ তর্জ্জার লড়াই হইত।

"বঙ্গবাসী" হইতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যখন "বসুমতী"তে যোগদান করিলেন তখন বসুমতী পত্রিকা পূর্ব্বোক্ত দুইখানি পত্রিকার সমকক্ষ হয় নাই। সে সময় বসুমতীর কার্য্যালয় গ্রে ষ্ট্রীটের পশ্চিম মোড়ের নিকট ছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামান্য অবস্থা হইতে নিজের ও বসুমতীর যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা তাঁহার অধ্যবসায়, কার্য্যক্ষমতা ও ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পাঁচকড়ি বাবুর লেখার গুণে "বসুমতী" জনপ্রিয় হইয়াছিল। নানা গ্রন্থরাজীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বসুমতী সৎ-সাহিত্যের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সে সময় "বসুমতী" সাপ্তাহিক পত্র ছিল। কিন্তু আজ "দৈনিক বসুমতী" পড়িলে মনে হয় না যে "বসুমতী" কখনও সাপ্তাহিক পত্র ছিল। বাংলা কাগজগুলির মধ্যে "দৈনিক বসুমতী" এক্ষণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। "দৈনিক বসুমতী" এক্ষণে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সন্নিকট বহুবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত হয়।

"সঞ্জীবনী" পত্রিকাও বহুদিনের। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই সম্ভবতঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহার সম্পাদক। এই পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দুই তিনখানি এক পয়সা মূল্যের বাংলা দৈনিক কাগজ দেখিয়াছিলাম। তাহার একখানিও এখন জীবিত নাই। "নায়ক" পত্র প্রথম প্রকাশিত হয় কালীঘাট হইতে। কালীঘাটের পুলের পূর্ব্বমুখের দক্ষিণদিকে ইহার প্রথম কার্য্যালয় ছিল। তখন ইহার কে সম্পাদক ছিল তাহা আমার মনে নাই। পাঁচকড়ি বাবু বসুমতীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া কিছুকাল "রঙ্গালয়" নামক পত্রের সম্পাদকতা করেন। এই "রঙ্গালয়" পত্র ক্ল্যাসিক থিয়েটারের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কাগজ উক্ত থিয়েটার বাটি হইতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। ইহা ১৯০১-২ সালের কথা। ইহার কয়েক বৎসর পরে পাঁচকড়িবাবু "নায়ক" পত্রের সম্পাদক হন এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০৮-৯ সালে "নায়ক" পত্র সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের দাঁইহাট নিবাসী মুখুয্যেদের হাতে আসে। ১৯২৫ সালের পরে এ পত্রের আর অস্তিত্ব দেখি নাই।

"সন্ধ্যা" নামক পত্রিকা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালেই প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আর্য্যসমাজ গৃহের উত্তর-দিকের বাটীতে ইহার কার্য্যালয় ও ছাপাখানা ছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুসন্ন্যাসীর ন্যায় গৈরিক বসন পরিয়া ও নগ্নগাত্রে উত্তরীয় ধারণ করিয়া মুক্তকচ্ছ অবস্থায় সভা সমিতিতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার

বক্তৃতায় ও লেখায় যথেষ্ট ব্যঙ্গ ও মধুর রসের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহাতে চলিত কথা, মেয়েলি কথা ও ছড়ার অধিক ব্যবহার হইত। এইরূপ একটি কথা আমার মনে আছে—"উল্টো লাথি খা, যমের বাড়ী যা"। এইরূপ মেয়েলি কথা ব্যবহারের একটি কারণ এই ছিল যে, তাঁহার কাগজ রাজদ্রোহ বা সিডিসানের মামলায় অভিযুক্ত হইলে সরকারী অনুবাদককে এই সকল মেয়েলি কথা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। সিডিসনের একটি মামলায় উপাধ্যায়কে শেষকালে পড়িতে হইয়াছিল। "গড়গড়ি" সাহেবের (উপাধ্যায় দত্ত ব্যারিষ্টার গ্রেগরীর নাম) বক্তৃতার পর এবং রায় প্রকাশের পূর্ব্বে উপাধ্যায়ের নশ্বর দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হয়।

১৯০৮ সালে "যুগান্তর" নামক পত্রের বহুল প্রচার হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন বিবেকানন্দ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। "যুগান্তর" খোলাখুলি ও সোজাসুজি ভাবে বিপ্লববাদ প্রচার করিত। রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হইয়া "যুগান্তর" কাগজ উঠিয়া যায়, ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়, এবং ইহার সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েক বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর ভূপেন্দ্রনাথ জার্ম্মানীতে যাইয়া বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডাক্তার" উপাধি লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

এক্ষণে বাংলা মাসিক পত্রিকার কথা কিছু বলিতেছি। ১৮৯২-৯৩ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। পাঁচ ছয় বৎসর এই পত্রিকাখানি নিয়মিত রূপে বাহির হইয়া অন্য কাহারও হাতে যায় এবং ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রের মধ্যে দুই একটির কথা আমার এখনও মনে আছে যথা—কয়লার খনির ভিতরে কিরূপে কার্য্য হয় তাহার চিত্রাবলী এবং সহবাস-সম্মতিসূচক-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষে "বঙ্গবাসী" অভিযুক্ত হইলে অভিযুক্ত কর্ম্মচারীগণের চিত্র।

"ধর্ম্মপ্রচারক" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বারাণসী ধাম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া কলিকাতায় আসিত। ইহার সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা ও প্রচারক শ্রীকৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজক। ১৯০০ সাল নাগাদ একটি যুবতী বালিকার উপর অত্যাচার করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া পরিব্রাজক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার পরেই এই কাগজ উঠিয়া যায়।

১৮৯৯-১৯০০ সাল হইতে রামকৃষ্ণ-মিশনের তরফ হইতে "উদ্বোধন" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত বিলাত যাত্রীর ডায়েরী, পাণিনি ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য, গীতার শঙ্কর ভাষ্যের মূল সহিত বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। ক্রমে এই পত্রে পরে পরে বিবেকানন্দের "রাজযোগ" "ভক্তিযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থ ব্রহ্মচারী (এক্ষণে স্বামী) শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

"পন্থা" নামক মাসিক পত্রিকা পূর্ব্বোক্ত সময়েই দর্জ্জিপাড়া হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহাতে ধর্ম্ম ও দর্শনাদি বিষয়ক প্রবন্ধই বাহির হইত। "অলৌকিক ঘটনাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি আশ্চর্য্যজনক ও ভৌতিক ঘটনার বিবরণ ইহার কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের পরে এ পত্রিকা আর দেখিতে পাই নাই।

১৯০২—৩ সাল নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া নবপর্য্যায় রূপে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ সম্ভারে এবং মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে ইহা সেই সময়ের শীর্ষস্থান লইয়াছিল। দুই তিন বৎসর পরে ইহা উঠিয়া যায়।

সাধারণ ব্রহ্মসমাজের উত্তরদিকস্থ একটি বাটি হইতে "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ইহাতে নানা সুলিখিত প্রবন্ধ বাহির হইত। ইহাও এখন লুপ্ত।

১৯০০ সালে কি তৎপূর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণলতা দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া "ভারতী" পত্রিকা বাহির হইত। আন্দাজ ১৯০৫—৬ সালে স্বর্ণলতা দেবীর কন্যা সরলা দেবী বি-এ কর্ত্তৃক "ভারতী"র সম্পাদন ভার গৃহীত হয়। তিন

চার বৎসর পরে পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে বিবাহ করিয়া সরলা দেবী পঞ্জাবের লাহোরে গমন করিলে পর ঐ পত্রিকা পুনরায় স্বর্ণলতা দেবীর হস্তে আসে। পরে কিছুদিন ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের অধিক হইল ভারতী উঠিয়া গিয়াছে।

"সাহিত্য" নামক পত্রিকা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বহু লোকের মনোরঞ্জন করিত। শ্যাম-পুকুরেরনিকট রামধন মিত্রের লেন হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। "সাহিত্যের" সমালোচনা কটু-তিক্ত-কথায় যুক্ত হওয়াতে অনেকের মুখরোচক হইত না।

১৯০৬—৭ সাল নাগাদ "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ইহা এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত বলিয়া ইহার নাম রাখা হইয়াছিল প্রবাসী। দশ বার বৎসর পরে "প্রবাসী" ও তাহার সম্পাদক কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলেও "প্রবাসী" নাম আর পরিবর্ত্তিত হইল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকাও এলাহাবাদ হইতে সম্পাদন করিয়া বাহির করিতেন। সেই পত্রিকার নাম "মডার্ণ রিভিউ"। "প্রবাসী"র সহিত এই শেষোক্ত পত্রিকাও কলিকাতায় চলিয়া আসে। উভয় পত্রিকার কার্য্যালয় প্রথমতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উত্তরদিকের একটি বাটিতে ছিল। বছর পাঁচেক হইল উহা লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৯১২ সালে বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবার বা প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোক গমন করেন। সেই সময় হইতেই রায় বাহাদুর জলধর সেন এই পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। কাহারও কাহারও মতে মাসিক পত্রিকার মধ্যে "ভারতবর্ষ" এক্ষণে শীর্ষস্থানীয়।

মাসিক "বসুমতী"র বয়সকাল মাত্র আট বৎসর, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও লেখিকার রচনাবাহুল্যে এই পত্রিকা অনেকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

"বিচিত্রা" নামক মাসিক পত্রিকার বয়স দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিপাটি মুদ্রাঙ্কণে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারি লেখকের প্রবন্ধে ইহার কলেবর সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

মাত্র এক বৎসর হইল "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুযোগ্য লেখকের হস্তে ইহার সম্পাদন ভার ন্যস্ত থাকায় আশা করা যায় যে ইহা বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

চারি পাঁচ বৎসর হইল "গল্পলহরী" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। ইহাতে কেবলমাত্র ছোট গল্প থাকে আর অন্য কোনও প্রবন্ধ থাকে না। গল্পপিপাসু বাঙ্গালী পাঠকের শুষ্ককণ্ঠে ইহা নিশ্চিতই বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, নতুবা এই পত্রিকা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বয়ং সম্পাদক হইয়া "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার রচিত সাগরকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটি কবিতা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টার পিঃ চৌধুরী সম্পাদিত "সবুজপত্র"ও অধিক দিন দেশবাসীর সেবা করিতে পারে নাই।

১৯০৮-৯ সালে প্রকাশিত "মানসী" নামক পত্রিকা কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া নাটোরের মহারাজার আশ্রয়লাভ করিয়াও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত "মর্ম্মবাণী"র সহিত মিলিত হয়।

ইংরাজী দৈনিকগুলির মধ্যে "ইণ্ডিয়ান্ মিরার," "বেঙ্গলী" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা"র নাম উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ সেনের জীবিতাবস্থায় প্রথমোক্ত পত্রের অল্পসংখ্যক গ্রাহক যাহা ছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে ক্রমশ হ্রাস হইয়া যাওয়াতে বছর আষ্টেক পূর্ব্বে ইহা লুপ্ত হইয়াছে। ১৯০৭ সালে ইহার সম্পাদক উক্ত সেন মহাশয় একটু বেশ মজা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে কংগ্রেসের অধিবেশন বোম্বাই প্রদেশে সুরাট্ সহরে হয়। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

লোকমান্য তিলক মহোদয় কি একটা গণ্ডগোল উপস্থিত করাতে সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। এদিকে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন তারিখের "ইণ্ডিয়ান্ মিরার্" পত্রে ঘোষ মহাশয়ের অপঠিত অভিভাষণ পঠিত হইয়াছে এইরূপ সংবাদসহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া গেল! স্মরণ হয় ঘোষ মহাশয়ের অপঠিত কিন্তু কলিকাতায় প্রকাশিত এই অভিভাষণে চরমপন্থীদলের বক্তাগণকে "ভন্‌ভনে বক্তার" (pestilential demagogues) আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক সেন মহাশয়ের ইংরাজী লেখার সুনাম ছিল। লর্ড কর্জ্জনের ভারত পরিত্যাগ কালে সেন মহাশয় যে একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এখনও মনে আছে। কথাটি এই—লর্ড কর্জ্জন তারাবাজীর ন্যায় আকাশে উঠিয়াছিলেন কিন্তু দগ্ধ যষ্টিখণ্ডরূপে নামিয়া আসিলেন।

"বেঙ্গলী" পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং তাঁহার কাগজ যে ছাত্রমহলে ও পাঠক সাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। "স্কুল মাষ্টার" সুরেন্দ্রনাথ লিখিত "বেঙ্গলী"র মতামত সাগরপারে বিলাতে পর্য্যন্ত পৌঁছিত। এই কারণে ১৯০৯ সালে লণ্ডন সহরে আহুত সংবাদপত্র সম্মেলনীতে ভারতের দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিরূপে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতের ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদ-পত্রগুলির (পাইওনিয়ার, ইংলিস্‌ম্যান্, ষ্টেট্‌সম্যান্, টাইমস্-অফ্-ইণ্ডিয়া ও মাদ্রাজ মেল্ প্রভৃতি) মত খণ্ডন করিয়া দেশীয় মত স্থাপন করিতে "বেঙ্গলী" অদ্বিতীয় ছিল। ১৯২১ সালে সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করায় ইহার পতন আরম্ভ হয়। সুরেন্দ্রনাথের আমলে "বেঙ্গলী"র অত্যধিক গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় "অমৃতবাজার পত্রিকা" ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের "হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী" "ঘোড়ার ডিম" প্রভৃতি উপমা সাহেব-দিগের মনে বাঙ্গালী লেখকের সম্বন্ধে হাস্যোদ্দীপক ধারণা জন্মাইলেও, আমরা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। মতিলাল ঘোষের লেখায় স্বদেশ প্রেমিকতা, স্পষ্টবাদীতা, সত্যবাদীতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বর্ত্তমান থাকায় "অমৃতবাজার পত্রিকা" দেশের বহু লোকের নিকট আদরণীয় ছিল।

১৯০৭ সালে সবুজবর্ণে রঞ্জিত ইংরাজী দৈনিক "বন্দে-মাতরম্" ওয়েলিংটন উদ্যানের পূর্ব্বদিকে ক্রীক্‌রো হইতে প্রকাশিত হয়, সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ। ইংরাজী লেখার গুণপনায় ও জাতীয় আন্দোলনের মূলে যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার সুচারু ব্যাখ্যায় ইহা চরমপন্থী-দলের মুখপত্র হইয়াছিল। সংবাদাদি সাধারণভাবে অন্য পত্রিকায় যেমন থাকিত ইহাতেও তেমনি থাকিত। কিন্তু এই পত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহা সর্ব্বতোভাবে জাতীয় ভাবকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট ও মহিমামণ্ডিত করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিত। অরবিন্দের ইংরাজী ভাষা এত সরল সহজ ছিল যে, তাঁহার অভিমতগুলি পড়িতে পড়িতে তর্কযুক্তির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই মনে হইত। পুণা সহর হইতে প্রকাশিত লোকমান্য তিলক সম্পাদিত ইংরাজী পত্র "মারহাট্টা"র সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত ছিল একমাত্র এই "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকা। "বন্দে-মাতরম্" পত্রিকার ছাপা কিন্তু অতি জঘন্য ছিল। ছাপার অক্ষর পড়িয়া গিয়া ও কালি ধেব্‌ড়াইয়া গিয়া ইহা পাঠ করা অনেক সময় কষ্টের ব্যাপার হইত। এই কাগজের সহিত অরবিন্দের সহকারী রূপে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অরবিন্দ আলিপুরের বোমার মামলায় জড়িত হইবার পর বিপিনচন্দ্র পাল এই পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে অধিককাল জীবিত রাখিতে পারেন নাই।

১৯০৩-৪ সালে রুষ-জাপান যুদ্ধ যখন প্রবলভাবে চলিতেছিল সেই সময় "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে প্রথম প্রথম বৈকালে ঐ যুদ্ধ-সংক্রান্ত রয়টারের টেলিগ্রাফগুলি মুদ্রিত হইয়া রাস্তায় বিক্রীত হইত। পরে "টেলিগ্রাফ" নাম দিয়া এক পয়সা মূল্যের ছোট আকারের একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। "টেলিগ্রাফ"পত্রের সম্পাদক ছিলেন এখনকার বাংলা "দৈনিক বসুমতী"র সম্পাদক শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইহাতে প্রকাশিত টাট্‌কা তারের সংবাদ আমরা অতি আগ্রহের সহিত পড়িতাম। প্রকৃতপক্ষে

"টেলিগ্রাফ"পত্রই এক পয়সা মূল্যের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্র।

১৯০৬-৭ সালে "এম্পায়ার্" নামক দৈনিক ইংরাজী সান্ধ্য পত্রিকা লালবাজার ষ্ট্রীট্ ও মিশন-রো রাস্তার সংযোগ স্থলে কোণের বাড়ী হইতে প্রকাশিত হয়। এই বাড়ী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার ইংরাজ সম্পাদকের নাম ফ্রেজার্ ব্লেয়ার্। ইঁহার এই নামটি "পোর্ট ব্লেয়ার্"রূপে উচ্চারিত হইত। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ব্লেয়ার্ সাহেবের লেখা প্রাঞ্জল ও হাস্যরসযুক্ত ছিল। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যাকালে সাহেবগণকে ভোজনের সময় কিছু আনন্দ দান করা। বিদেশীয় সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে এই পত্রের তৎপরতা বিশেষ প্রশংসার্হ ছিল। ইংরাজ সম্পাদিত অন্য সংবাদ পত্রের ন্যায় ইহার স্তম্ভ দেশীয় বিদ্বেষে কলুষিত হইত না। বহু হস্ত ভ্রমণ করিয়া বৎসরাধিককাল হইল এই পত্র অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইতে "সার্ভেণ্ট" নামক ইংরাজী দৈনিক প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী। প্রথম বৎসর দুই ইহা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ও অসহযোগীদিগের মুখপত্র হইয়াছিল, পরে ইহা উঠিয়া যায়।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড" পত্র রাণী মুদি গলি হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। জন্মকাল হইতেই ইহা এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে ইহা প্রকাশিত হইবার পরমাসের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত গ্রাহক (পাঠক সংখ্যা উহার অনেক অধিক) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পত্র বাহির হওয়াতে "বেঙ্গলী" "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি দেশীয় সম্পাদিত দৈনিক-গুলি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। দাস মহাশয়ের সাহেবের ন্যায় লিখিত ইংরাজী নূতন ভাবসম্পদে, সজ্জিত হইয়া দেশবাসীকে চমকিত ও প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট করিল। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতাগণ সংবাদ ও সন্দর্ভ লিখিয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিতেন। অনেক সময় গুপ্ত খবর টানিয়া বাহির করিতে ইহা অদ্বিতীয় ছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ইহার প্রচার বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইলেও স্বরাজ্যদলের মুখপত্র হিসাবে ইহার প্রভাব "লিবার্টি"রূপে আকারান্তরিত হইয়াও প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর একখানি পত্র ও নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীর মানহানির ক্ষতিপূরণ ব্যপদেশে "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা যেরূপে বিলুপ্ত হইল তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের মধ্যে মিঃ এন্. ঘোষ সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান্ নেশান্" সর্ব্বজনবিদিত ছিল। ইংরাজী ভাষার পারিপাট্যে লিখনভঙ্গীর মাধুর্য্যে, মত প্রকাশের গুরুত্বে, মিঃ ঘোষ সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ১৯০৬ সালের পরে আর এ কাগজ পড়িবার আমার সুযোগ হয় নাই। ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর সহিত এ কাগজ লুপ্ত হয়।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "রেইস্ এণ্ড রাইয়ৎ" অক্রুর দত্ত লেন হইতে ১৯০১-৩ সালে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। সামান্য কয়েকজন মাত্র তাহার পাঠক ছিল।

ইংরাজ সওদাগরদিগের মুখপত্র সাপ্তাহিক "ক্যাপিটাল্" সার্লি ট্রিমেয়ার্ণ সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহাতে "ডিচার্" নাম দিয়া একজন লেখক জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে এই লেখকের প্রকৃত নাম ছিল নর্ম্যান লিউক। এই পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

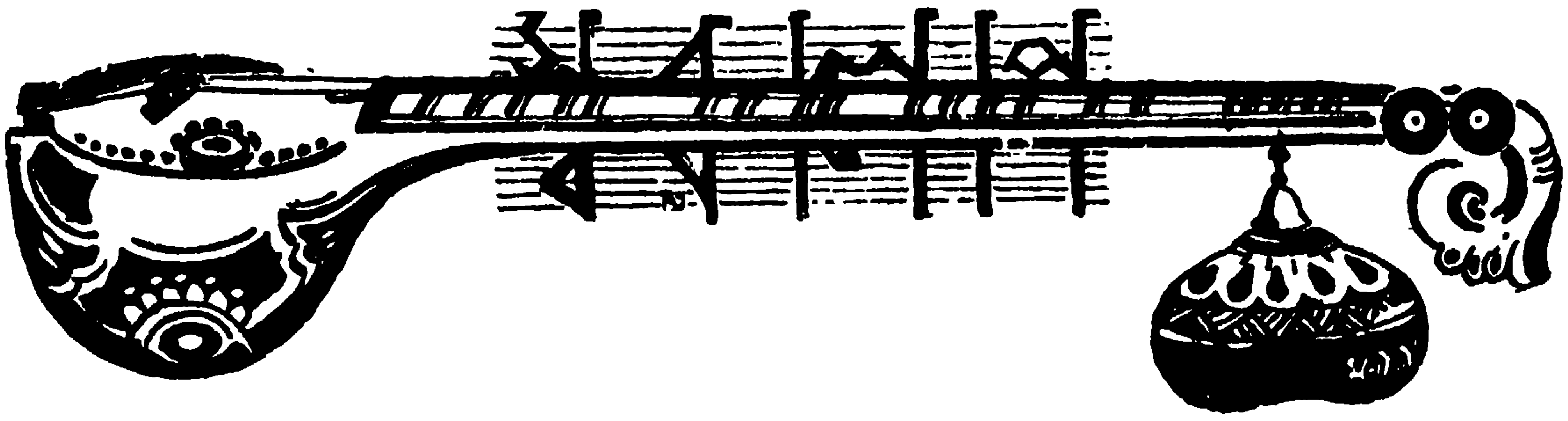

কবীর

সখিয়ো হম হূঁ ভঙ্গ বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো,
অব মৈঁ জ্ঞানগলী অঠিলাতী?
জ্ঞানগলী মেঁ খবর মিলগয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী।
ব্‌া পাতী মেঁ অগম সংদেসা,
অব হম মরনে কো ন ডরাতী॥
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে
বর পায়ে অবিনাসী॥

কথা ও সুর সংগ্রহ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

মিশ্র ভৈরোঁ—কার্ফা (মধ্যগতি)

। ঋা ঋা সন্‌া সা I
স খি য়ো ০

\+ ২ + ২
II ঋগা গা পমা -গা । গা -ঋা ঋা সা I ন্‌া -া সা -া । ঋা ঋা সন্‌া -সা I
হ ম হূঁ ০ ভ ঙ্গ ব ল মা ০ সী ০ স খি য়ো ০

I ঋগা গা পমা -গা । গা -ঋা ঋা সা I ন্‌া -া সা -া । -া -া -া -া I
হ ম হূঁ ০ ভ ঙ্গ ব ল মা ০ সী ০ ০ ০ ০ ০

I সন্‌া সা সা -দা । ণদা -া দা পা I মা -া গমা -পণা । -দপা -মগা -মা । I

হ ম হুঁ ৽ ভ ঈ ধ ল মা ৽ সী ৽ ৽৽ ৽৽ ৽৽ ৽ ৽

I মগা গা পমা -গা । গা -ঋা ঋা সা I ন্‌া -া সা -া । -া -া -া -া I

হ ম হুঁ ৽ ভ ঈ ব ল মা ৽ সী ৽ ৽ ৽ ৽ ৽

I সা -া সদা -পা । ণদা -া দা পা I মা পা পণা ণা । দপা -দা পমগা -মা I

আ ৽ য়ো ৽ ৽ জো ৽ ৽ ব ন বি র হ স তা ৽ ৽ য়ো ৽ ৽

I মমা -ণা -া ণা । দপা -দা পা মা I মা -া গমা -পপা । -মগা -মা মা গা I

জ্ঞা ৽ ৽ ন্‌ গ লী ৽ ৽ অ ঠি লা ৽ তী ৽ ৽৽ ৽৽ ৽ অব্‌ মৈঁ

I মমা ণা -া ণা । দপা -দা পা মা I মা -া গমা -পণা । -দপা -মগা -মা -া II

জ্ঞা ৽ ৽ ন্‌ গ লী ৽ ৽ অ ঠি লা ৽ তী ৽ ৽৽ ৽৽ ৽৽ ৽ ৽

II পদা -া -া দা । দনা -র্সা র্সা -া I ঋা ঋা র্সা র্সা । না -র্সা র্সা না I

জ্ঞা ৽ ন্‌ গ লী ৽ মে ৽ খ ব র মি ল ৽ গ য়ে

I র্সা র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞঋা -া র্সা -না I না -া নর্সা -ঋর্সা । -নর্সা -া র্সা না I

মি লী ৽ পি য়া ৽ কী ৽ পা ৽ তী ৽ ৽৽ ৽৽ ৽ হ মৈঁ

I র্সা র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । ঋা -া র্সা -না I না -া নর্সা -ঋর্সা । -নর্সা -া -া -া I

মি লী ৽ পি য়া ৽ কী ৽ পা ৽ তী ৽ ৽৽ ৽৽ ৽ ৽ ৽

I { র্পর্সা -না র্সা -া । র্সর্ঋা -া র্সা -া I না র্সা না নদা । র্সনা -া দা -পা } I
ব্‌ ॰ পা ॰ তী ॰ মেঁ ॰ আ গ ম সং দে ॰ সা ॰

I পমা -ণা ণা -া । দা -া পা মা I মা -া গমা -পপা । -মগা -মা মা গা I
ম॰ র নে ॰ কো ॰ ন ড রা ॰ তী॰ ॰॰ ॰॰ ॰ অব্‌ হম্‌

I মমা -ণা ণা -া । দা -া পা মা I মা -া গমা -পণা । -দপা -মগা -মা -া II
ম॰ র্‌ নে ॰ কো ॰ ন ড রা ॰ তী॰ ॰॰ ॰ ॰॰॰॰ ॰

II { সা সদা দা দা । পা -দা পমগা -মা I পা পণা দা -া । পা -দা পমগা -মা } I
ক হ॰ ত ক বী ॰ র॰ ॰ সু নো ভা ঈ প্যা ॰ রে॰ ॰

I মমা ণা -া ণা । দপা -দা পা মা I মা -া গমা -পণা । দপা -মগা মা -া II II
ব॰ ॰ র্‌ পা য়ে ॰ অ বি না ॰ সী॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰

'হে সখি, আমি বল্লভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। যৌবন আসিয়াছে, বিরহ ব্যথা দিতেছে, এখন কি না আমি জ্ঞানের গলি ঘুরিয়া মরিতেছি! জ্ঞানের গলিতে তাঁহার খবর মিলিয়াছে। আমি প্রিয়তমের পত্র পাইয়াছি। সেই পত্রের মধ্যে অগম্য খবর, এখন আর আমি মরণকে ভয় করি না। কবীর কহেন, হে প্রেমিক বন্ধু, আমি অবিনাশীকে বর পাইয়াছি।" গানখানির উল্লিখিত অনুবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী প্রণীত শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত "কবীর" পুস্তকের প্রথম খণ্ডের 'কবীর-প্রেম' শীর্ষক অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

পঞ্চাশোর্দ্ধম্

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে স'রে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেচেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তর পরিণতি জীবনের ধর্ম্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্য্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্ম্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন ক'রে দিলেই হলো না। শাস্ত্র বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ং; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান; সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্ম্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বল্‌তে পারি যে, থাক্ আর কাজ নেই।

বর্ত্তমান কালে আমরা বড়ো বেশী লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও এত বেশী দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করতো, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে বনং ব্রজেৎ বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল, আজ সেটা আগাগোড়া নির্ম্মূল। আজ মন যখন বলে, 'আর কাজ নেই,'—বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগ্‌লে বলে, 'কাজ আছে বই কি'—পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে—পাশ কাটিয়ে চুপি চুপি স'রে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভৎর্সনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারিদিক থেকে রব ওঠে,—"যাও কোথায়, এরি মধ্যে"? ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা প'ড়ে যায়।

যে-কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাসে, তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোন দায় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবী দুর্ব্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেচে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য ক'রেই হোক, ছল ক'রেই হোক, রাগের ঝাঁঝে হোক অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে, যখন-তখন, যাকে-তাকে, ব'লে উঠতে পারে, তোমার রসের জোগান ক'মে আসচে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ ফিকে হয়ে এল;—তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ, শেষ যুক্তিটা এই যে, আমার পছন্দ মাফিক হচ্চে না। তোমার পছন্দের বিকার হ'তে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে, এ কথা ব'লে লাভ নেই। কেন না, এ হ'লো রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক, এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার ক'রে বলা ভাল যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতা কালে যে উপহার দেওয়া গেছে, তারই কথা মনে রেখে,

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন-এর উদ্দেশে রোগশয্যায় লিখিত।

অনিবার্য্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়? আপন নবশ্যামল ধানের ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না, আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্য সমারোহের কথা?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবী প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক-ক্ষেত্রেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু সাহিত্যেই পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা ক'রতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব্ব করবার জন্যে তা'দের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোন কোন দেশে এমন মানুষ আছে, যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান ক'রলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নীচে গ'ড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নীচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো খুঁজে বেড়ানো কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতর সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সঙ্গত, কেন না, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা উদ্বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোন মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য ব'লে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্ম্মের জন্যে প্রস্তুত হ'তে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তারপরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে, ক্রমে ক্রমে, সেই কর্ম্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরো পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবী মাঝখানটাতে, আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্ত্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্ত্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্ম্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হ'য়েচে, কর্ম্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ ক'রতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে কর্ম্মের অভ্যাস কঠিন হ'য়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্ম্মের চল্‌তি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহঙ্কারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই। এমনি ক'রে ধর্ম্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা ক'রে আপন সীমা নিয়েই গর্ব্বিত হয়, তেমনি সকলপ্রকার কর্ম্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গ'ড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা ক'রতে ভালোবাসে।

সংসারে যত কিছু বিরোধ—এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম্ম হ'তে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে, যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর একটা ভাগ আছে, যেখানে সাহিত্যের

পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারচি, এমন দিন আসে, যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো, নইলে বাইরে ওড়ে ধূলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুইয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেক কাল দেখিনি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এই জন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়-মহলে যে কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লঙ্ঘন ক'রবো বা ক'রতে পারবো, এমন কথা মনেও করিনি। তখন এমন কিছু লিখিনি, যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তি-দৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুনতে হয়নি—যাতে সঙ্কোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চ'লেচে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা ক'রেচি। তবু যতই করি না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই।

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে ব'সে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারি আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহী আছে।

কখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারিনি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল ফল ফসলের দাবী এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায়—তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে, তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বল্‌চি কালের আসন, সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকার-প্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা ক'রতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারিনে—সেও এসেছে বর্ত্তমানের শিখর অধিকার ক'রে চিরকালের আসন জয় ক'রে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে, ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্ব্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে,

দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথ নির্ম্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সঙ্কুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক্ থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক্ থেকে দক্ষিণ হাওয়া চ'ল্‌তে সুরু করে। কিন্তু বদলের হাওয়া বইল ব'লেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোন কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব আছে, যে অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বল্‌বার উপলক্ষ খোঁজে, তার মন সংকীর্ণ—তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারী আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্ত্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই ব'লে দরবারী তোড়ীকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্ব্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারী তোড়ীর নিত্য আসন আপন মর্য্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো ক'রতে চায়, তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুতঃ নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ ক'রতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি-কি না।

কিন্তু নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কি, সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না; কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয় ত কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোন আকস্মিক মোহ তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয় তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দ্দমতা তার ফসলের ক্ষেতের প্রবল প্রতিবাদ করে, হয় তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয় ত বাহবা মেলে, কিন্তু সর্ব্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চল্‌লেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন, তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয়, আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্‌টোরিয়া যুগ জুড়ে সে-দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চ'লেছিল যে, মনে হ'য়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্ত্তিত হ'য়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত ক'রে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে একটা অধৈর্য্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব কিছু উলট-পালট কর্‌বার জন্য কোমর বাঁধল; গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা! কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠ্‌ল, আর ভাল লাগছে না। যা ক'রে হোক আর-কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব্ব মনুর বিধান মানতে চায়নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি ক'রে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল, ভাবখানা এই যে, উৎপীত ক'রে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্য্যের অঙ্কপাত নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চল্‌ছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা; এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা

লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো কিছুতে নড়চড় ক'রতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারেনি। এই জন্য এক ঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য্য চাঞ্চল্যকে সে-দিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল! এক দিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্দুকে সিন্দুকে ভয়ঙ্কর মাথা ঠোকাঠুকি, বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধূলোয় ধূলোয় ছড়াছড়ি! সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্ত্তে হ'ল ভূমিসাৎ! পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্য্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালুবেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে প'ড়ল, তাড়াহুড়ো বেঁধে গেল, গোলমাল চলচে; সাবেক কালের কর্ত্তাব্যক্তির ধম্‌কানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ঙ্কর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোন কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হ'য়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি সুরু হ'ল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে—'ভাল মানুষের মত থামো,' কেউ বলে—'মরীয়া হ'য়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রচেন, তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত ক'রে ব'লতে পারে? কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হ'য়ে বসেছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটা কম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো, সে তর্ক তুলে ফল নেই, আপাততঃ এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্ত্তন ক'রতে ব'স্‌ল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্চে না ব'লে যারা উদ্বেগ প্রকাশ ক'রচে, তারাও ঐ পঞ্চাশোর্দ্ধের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বল্‌ছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্দ্ধম্ আছে, কালগত হিসাবেও তেম্‌নি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম ক'রে থাকি, তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হ'য়ে উঠ্‌বে। নবাগত যাঁরা, তাঁরা যে-পর্য্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজেরা প্রতিষ্ঠা লাভ না ক'রবেন, সে পর্য্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে। পুরাতনকে অতিক্রম ক'রে নূতনকে অভূতপূর্ব্ব ক'রে তুলবই, এই পণ ক'রে ব'সে নব সাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশী টানাটানি ক'রতে থাক্‌বেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে, সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়, যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানতঃ তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হ'য়ে ব্যক্ত হ'তে থাকে। বাহিরের কর্ম্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ ক'রতে পারেনি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানাভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ ক'রে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের, সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু,

তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্ব্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায়, যাতে সে মনোহর হ'য়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্ত্তি ধরে, যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা, সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের মনে কাজ ক'রতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ, মহাভারত, ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ ক'রে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে আদর্শ কামনা ক'রেছে, তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হ'য়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। "বঙ্গদর্শনে" এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ ক'রেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলা দেশের মেয়ে পুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েচে; —এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। যা আমাদের ভাল লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গ'ড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভাল লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে যুগ প্রবর্ত্তন ক'রেছেন, আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ পর্য্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ ব'ল্‌চেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েচে; কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত ক'রে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সংবাদটা যদি সত্যই হয়, তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের ঘোষণা-বাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যূষের সুনির্ম্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে, তখন কোয়াসার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নব-প্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্দ্ধান ঘটে।

পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মর্ত্ত্যলীলার প্রান্তবর্ত্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসঙ্কোচে 'তরুণ সভায়' প্রেরণ ক'রলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখানকার দিনের সঙ্গে নাই মিলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ ক'রবেন, কোন হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দ্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই, তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোর্দ্ধম্‌ নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি—"যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আসুব"—যাহা ভদ্র, তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেশশক্তিধর
শ্রীযুক্ত মণি ধর

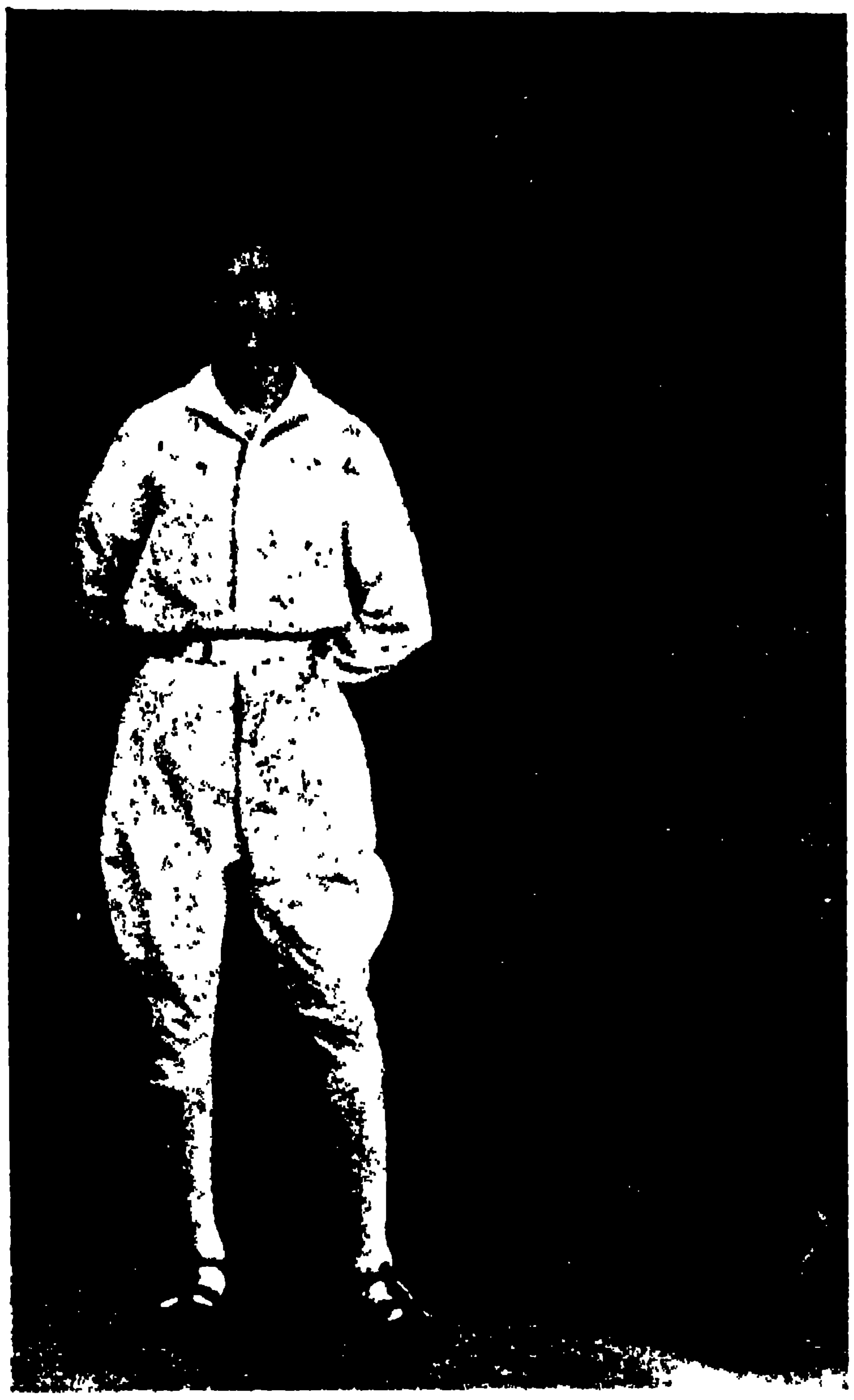

: পাঁচ মণ ওজনের ওই ভারটি ইনি কেশে বাঁধিয়া ভূমি হইতে তুলিতে পারেন।

এক ব্যক্তিকে কেশে ঝুলাইয়া রাখিয়া ইনি ট্র্যাপিজে ব্যায়াম করিতেছেন।

কুড়িটি বালক সহ একটি গরুর গাড়ী কেশে বাঁধিয়া ইনি টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

বাঙলা দেশের জলবায়ুর দোষেই হউক অথবা যে কারণেই হউক বাঙালি জাতি যে দুর্ব্বল জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রীড়া-কৌশল ব্যায়ামের যথোচিত অনুশীলনের দ্বারা বাঙালি নানা দিক দিয়া অসাধরণ শক্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম, তাহার প্রমাণও আজকাল আমরা সর্ব্বদাই পাইতেছি। সুতরাং বাঙালি বালক এবং যুবকদের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চা যত বাড়িবে দুর্ব্বল বলিয়া বাঙালি জাতির কলঙ্ক সেই মাত্রায় কমিবে। জাতির উন্নতি নির্ভর করে ব্যক্তির উন্নতির উপর, ব্যক্তির উন্নতি নির্ভর করে শুধু তাহার বিদ্যাবুদ্ধিরই উপর নয়—স্বাস্থ্যের উপরও বিশেষ ভাবে। সেজন্য জাতীয় উন্নতি-বিধানের উপায়গুলির মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চা একটি বিশিষ্ট উপায়।

শ্রীযুক্ত মণি ধরের কেশ-শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। কেশের ভিতর দিয়াও কতখানি শক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এই চারখানি চিত্র তাহার প্রমাণ। মণি বাবুর ঠিকানা ১০।৩, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইঁহার কেশ ধরিয়া দুইজন পূর্ণবয়স্ক যুবক ঝুলিতেছেন।

লাভের কড়ি

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

বাবুগঞ্জের হাট, মস্ত হাট। মানুষের মাথা গুণে শেষ করা যায় না।

ঐ পাশে বসেছে তাঁতিরা; মুসলমান জোলারা। নানা রঙের গামছা, লুঙ্গি, ধুতি, সাড়ী, চাদর, মশারি পর্য্যন্ত সস্তায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

এই পাশে কয়েকখানি মণিহারির দোকান ছুরি, কাঁচি, চিরুণী, চিনে মাটির পুতুল, ছোট কাঁচের আয়নায় ঝম্‌মল কোরছে।

মাঝের ওই খড়ের চাল-ছাওয়া বড় জায়গাটিতে তরি-তরকারির বাজার। সেখানে আলু, পটল, লাউ, কফি, কুমড়ো, শাক-শব্জির ছড়াছড়ি। সেখানে পুরুষের কর্কশ কণ্ঠ, স্ত্রীলোকের কাংস্য কণ্ঠ, বৃদ্ধদের কাশি, শিশুদের কান্না, ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি এবং টাকাপয়সার ঝন্‌ঝনাৎকার।

ওদিকে বসেছে মেছোবাজার।

—ওগো ও বাবুটি, এই তাজা মাছ শীতের বেলায় ভাজা খেতে মজা লাগ্‌বে।

—ওগো বাবু, তোমার মনের মত ক'রে কাতলা মাছের ভাগ সাজিয়ে বসে রইছি যে।

—ও বাবু, লাউ কিনলে? তবে চিংড়ি মাছের ভাগা-কটা নিয়ে যাও। গিন্নিমা রাঁধবেন ভাল।

—আহা বাবু জ্বর থেকে উঠ্‌লেন কবে? এই নিয়ে যান মাগুর, কই,—একেবারে সাত দিনের খাত্তিরজমা, একটাও মরবে না।

২

—আরে সর—বে-আক্কেলে বেটা, পথের মধ্যিখানে গুচ্ছের ঝিঙ্গে ছড়িয়ে বসেছে। মরবার আর জায়গা পায়না!

—ওগো—ও মণ্ডলের পো, তোমার ঐ বিলিতি বেগুনের ঝুড়িখানা একটু পাশ করে রাখ। পেকে লাল হয়েছে বলে কি রাস্তা জুড়ে বসতে হবে?

—ও নায়েব বাবু, ঐ একরত্তি ছেলেকে মারলে কেন? ওযে আজ দু'দিন কিছু খায়নি।

—তাই মোচলমানের ছ্যানা পথের মধ্যে মুড়ি-মুড়কী চেটে খাবে, না? সরা শীগ্‌গির তোর ছাওয়ালকে। চোখের মাথা খেয়েছিস? ওই দেখ্.. বাবু বেরিয়েছেন বাজার দেখতে।

জমিদারের নায়েব চলেছেন লাইন-ক্লিয়ার করতে করতে। অদূরে কোঁচা দুলিয়ে, ছড়ি ঘুরিয়ে, গরদের চাদরখানি উড়িয়ে নবীন জমিদার হবেন মজুমদার দেখা দিলেন। চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এদিকে জমিদার-ভৃত্য ধামাধারী ভজহরি মাথায় চাদর জড়িয়ে বাবুর আগে আগে চলে।

—দেরে বেটা দে, আর দর ক'রতে হবে না। তোদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্‌গি তোর ক্ষেতের তরকারি বাবুর পাতে পড়বে।

—দোহাই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, গরীব মানুষকে অমন ক'রে খুন কোর' না। হাঁগো, চার আনা সেরের পটল কি তিন পয়সায় দেওয়া যায়?

ভজহরি তিনটে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

হরেক-রকম তরকারি ধামাটিতে জমে উঠ্‌ল।

তার পরে এল বাজারের তোলা আদায় করবার গোমস্তা। তার পরে দারোগা বাবুর বাড়ী থেকে বাজারে আসে—তাঁর লাল পাগ্‌ড়ীওয়ালা অনুচর। তার পরে পুরুত ঠাকুর, মৌলভী সাহেব, কবিরাজ, হকিম, ছাইমাখা চিম্‌টা-হাতে সন্ন্যাসী, দাড়িওয়ালা লুঙ্গিপরা ফকির, ঢিলা পায়জামা-পরা মোটা লাঠি-হাতে সুদ-উসুলকারী কাবুলি-ওয়ালা, ষষ্ঠীদেবীর অনুচরী পাড়ার পরিচিতা ধাই,

পাঠশালার পণ্ডিত ; মূল মূল্যটাকে এঁরা ভুল ব'লে প্রমাণ করতে আসেন।

এমন সময় নায়েব মশায়ের ক্ষিপ্ত চীৎকার আকাশের গায়ে ছ্যাঁক্ ক'রে উঠ্‌ল ;

—বেটা, খাজনা দেবার নাম নেই ; আবার হাট ক'রতে আসা হয়েছে। কাল সকালে হাজ্‌রে দেবার কথা ছিল— ছিলি কোথায় ?

—ওরে জছিম, ওরে হাফিজদ্দি, তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? নিয়ে যা বেটাকে—চোরা কাম্‌রায় কুলুপ দিয়ে রাখবি।

—ওগো নায়েব মশায়, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি। আজ্‌কের দিনটে ছেড়ে দাও। আমার রোগা ছেলে তিনকড়ি যে আজ পথ্যি ক'রবে।

তিনকড়ির বাবাকে ধরে নিয়ে গেল।

পড়ে রইল নতুন আমদানি একঝুড়ি কচি কচি পটল ; পুকুর থেকে তুলে আনা এক বোঝা কলমী শাক ; বন থেকে কুড়িয়ে আনা কয়েকটা কয়েতবেল। পড়ে রইল বিক্কির-ক'রে-পাওয়া তিনটি পয়সা।

যেন, দূরে থেকে ভজহরি চীৎকার কোরে ব'লে—বেটা আবার চার আনা সেরের পটল বেচ্‌বে না—এই বারে কাছারী-বাড়ীতে মজা টের পাওয়াবে।

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

বিহারে কয়েক সপ্তাহ

শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন গোস্বামী

ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে বালাম চালের ভাত খাইয়া বাসে করিয়া আফিস-ঘর করিতে করিতে আবার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ধরিল।

এবারে কোথায় যাই? পশ্চিম ছাড়া ত উপায় নাই। মধুপুর, শিমূলতলা, ঝাঁঝাঁ বেরিবেরি ও থাইসিসে ভরিয়া গিয়াছে—কাজেই আর একটু পশ্চিম যাইব বলিয়া বাহির হইয়া প্রথম পাটনাতেই নামা গেল। অনেকদিন পূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়াছিলাম, তখন ষ্টেশনের নাম ছিল বাঁকিপুর—তখনকার সহরের চেহারা আর এখনকার বিহারের নূতন রাজধানীর চেহারার আকাশ পাতাল তফাৎ—সে ভোল একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের মোড়েই যে খোলার ঝুপ্‌ড়ি সব ছিল,—দাঁত বার করা ডিষ্ট্রিক্ট্‌-বোর্ডের রাস্তা; সে সব আর কিছুই নাই। এখন সুন্দর আলকাতরা দেওয়া চওড়া চওড়া রাস্তা—কেরোসিনের মিটমিটে প্রদীপের বদলে এখন বিজলি-বাতির রোস্‌নাই।

প্রথমেই হার্ডিঞ্জ পার্ক নামক একটি প্রমোদ-উদ্যান তৈয়ারী হইয়াছে—তাহার মাঝখান দিয়া রাস্তা। বাঁ দিকে লাট-বেলাটের রেলওয়ে প্লাটফর্ম্ম—উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি। উহার কিছু উত্তরে একটা প্রকাণ্ড মুসলমানি কায়দার ধপ্‌ধপে বাড়ী দেখা গেল। আমি প্রথমে সেটাকে ইমামবাড়ী বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম; পরে শুনিলাম সেটা পাটনা হাইকোর্টের গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট্‌-জেনারেল সার সুলতান আহমেদের বসতবাটী। ইনি পাটনা ইউনিভারসিটির ভাইস্‌চ্যানসেলার।

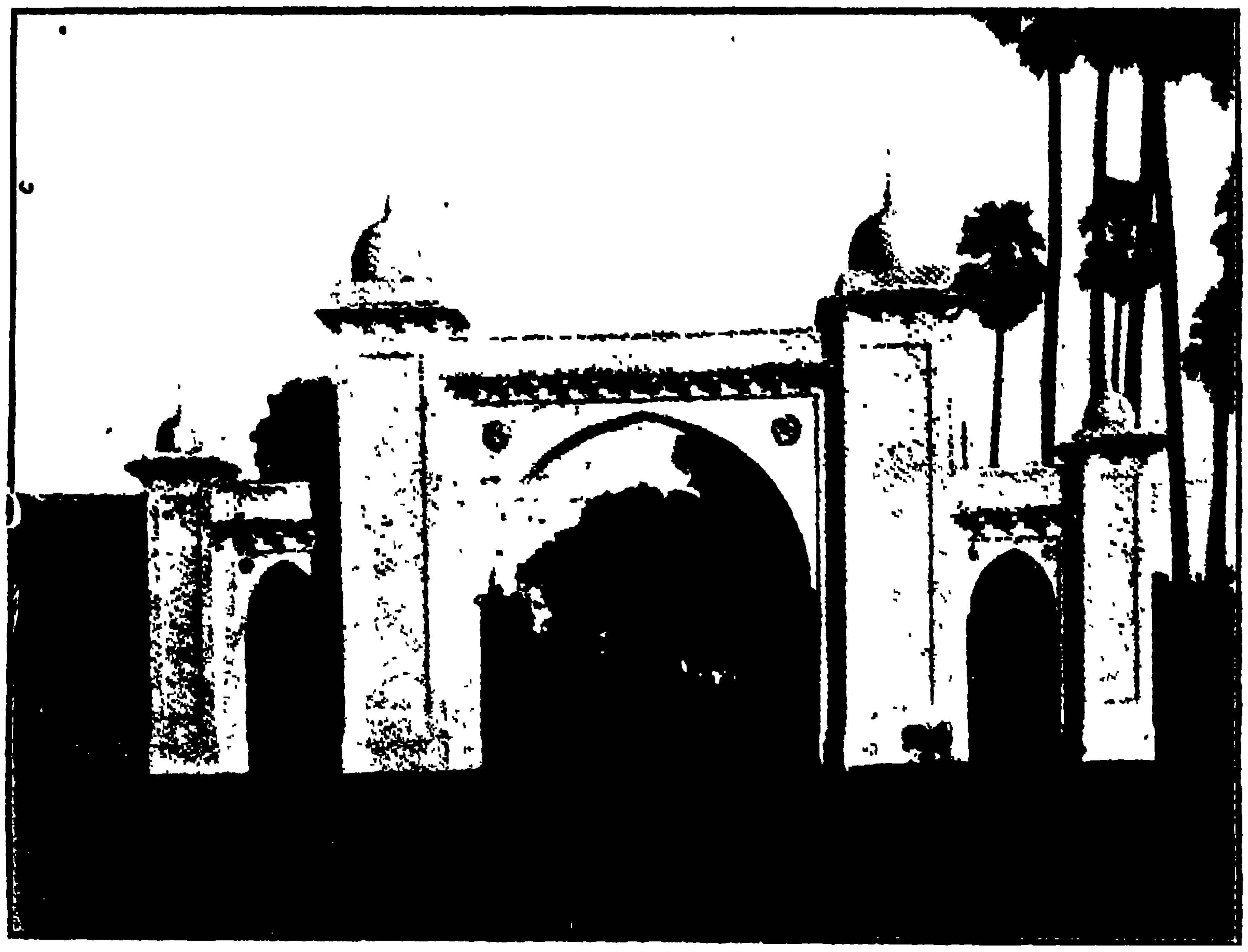

প্রথম তোরণ

সেকালে যেটাকে বন্দর-বাগিচা বলিত, সেইখানে সেক্রেটারিয়েট্‌ ও কাউন্সিল-চেম্বার তৈয়ারী হইয়াছে। কাউন্সিল-চেম্বারের স্থাপত্য—ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন অর্থাৎ দেশীবিলাতীর সংমিশ্রণ। সেক্রেটারিয়েটের প্রকাণ্ড ক্লক-টাউয়ার রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে, ১৫৬ ফুট উচ্চ। ঘড়ির ডায়েলটা শুনিলাম ১১ ফুট, কিন্তু রাস্তা হইতে দাঁড়াইয়া মনে হইল ফুট চারেকের বেশী নয়। ঘড়ীর ঘণ্টার শব্দ এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়। শুনিলাম ঐ টাউয়ারে বসিবার জন্য যে ঘড়িটি প্রথমে জাহাজে করিয়া বিলাত থেকে আসিতেছিল সে জাহাজখানি জার্ম্মানির "এমডেন্‌" ডুবাইয়া দেয়। টাউয়ার তৈয়ারীর

৮ বৎসর পরে পুনরায় তার একটি ঘড়ি আনাইয়া বসান হয়।

ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স অফিস—পাটনা

সেক্রেটারিয়েটের ঠিক সোজা পশ্চিমে ৩ পোয়া মাইল দূরে লাটভবন। একটা প্রকাণ্ড বাড়ী বটে কিন্তু সামনের দিকের চেয়ে পিছনের দিক্‌টা দেখিতে ভাল। আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোকের লাটসাহেবের বাড়ীর চেহারা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার কিছুই মিলিল না। যদি উহার পশ্চাৎ ভাগ না দেখিয়া আসিতাম তাহা হইলে বিশেষ ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরিতে হইত। বিলাতী স্থাপত্য-পরিকল্পনা বেশ উপভোগ করিতে পারিলাম না; তবে জেনারেল পোষ্ট অফিস এবং অন্যান্য বড় বড় অফিসারদের বাড়ীগুলি মন্দ নয়। হাইকোর্টটা শুনিলাম এলাহাবাদ হাইকোর্টের নকল। সৌধকপালে প্রস্তরখোদিত 'ইউনিকর্ণের' ছবিটি কপালজোড়া হইলেই ভাল হইত। এলাহাবাদ্‌ ব্যাঙ্কের বিল্ডিংটি মন্দ নয়। তার সামনেই কোতয়ালি থানা, চিরাচরিত সরকারি পি ডব্‌লু ডিপার্টমেন্টের পরিকল্পিত। মোটা ভাদ্দা কার্ণিশ।

এই কোতয়ালির মোড়ে দেখিলাম 'পি ডব্‌লু ডি'রা মহাব্যস্ত হইয়া বড়লাট্‌ সাহেব আসিবেন বলিয়া তোরণ নির্ম্মাণ করিতেছে। দূর হইতে দেখিলাম শুভ্র মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত স্যারাসনিক স্থাপত্য-শিল্পের পরিকল্পিত তোরণটি :— কিন্তু নিকটে গিয়া বুঝিলাম কাঠ, কাপড় ও পেষ্ট্‌ বোর্ডে তৈয়ারী। ঐ সমস্ত উপকরণে যে এরূপ সুদৃশ্য ও সুগঠিত তোরণ হইতে পারে তাহা এই প্রথম দেখিলাম।

দ্বিতীয় তোরণ

উহারই নিকটে মিষ্টার পি, কে, সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের বাসভবন। তাহার পরিকল্পনা লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। এই রকম সুন্দর সুন্দর আরও অনেকগুলি উকিল ব্যারিষ্টারের বাসভবন দেখিলাম। এ সমস্ত গৃহগুলির চেহারাতে একটু নূতনত্ব দেখিলাম যাহা বাস্তবিকই চিত্ত আকর্ষণ করে। কারুকার্য্য যে খুব বেশী তাহা নহে—অথচ সামান্য কয়েকটি সরল কার্ণিশ কিংবা মোল্ডিং চওড়া বাটীর অনুকরণ। এইখানে স্বদেশী শিল্পের আদর করা হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। জয়পুরের কোন দেশী মিস্ত্রী দ্বারা নক্সা করাইয়া লইলে ইহা হয় ত আরও সুন্দর হইত।

ব্যাঙ্ক রোডে ইন্‌কাম-ট্যাক্স আফিস দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। ইহা যদি একটু উচ্চ স্থানে এবং বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে হইত, তাহা হইলে ইহা অতিশয় সুন্দর হইত।

ব্যারিষ্টার আবদুল আজিজ সাহেবের গৃহ

এবং খাড়াই দিকে লাগাইয়া এই সৌন্দর্য্য ফোটান হইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীরই খিলানগুলি নূতন ধরণের। ইহাতে যে খরচ বেশী হয় তাহা ত মনে হইল না, কেবল কোথায় ও কিরূপ পরিমাণে এই বিভাগগুলি করিতে হইবে সে বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন।

পাটনা সহরের মিউজিয়াম-বিল্ডিংটি মন্দ নয়। বাঙ্গালা দেশের "প্রিন্স অফ্ কন্‌ট্রাক্টার" শ্রীযুক্ত জে, সি, ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের গঠিত। হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন আগ্রা অঞ্চলের আমার মনে হয় পাটনার বাসভবনের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শুনিলাম এখানকার ব্যারিষ্টার আবদুল আজিজ্ সাহেব ইহা বাসভবনের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন—এক্ষণে ইন্‌কাম-ট্যাক্স আফিসকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহারই উত্তরে পাটনার বিখ্যাত গোলঘর। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক মুসলমান নবাবের অর্থে গঠিত—কিন্তু যে জন্য নির্ম্মিত, অর্থাৎ শস্য রাখিবার জন্য, তাহার একেবারেই অনুপযুক্ত। অদ্ভুত আকৃতি—শস্য

বোঝাই করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং কোনও প্রকারে বোঝাই করিতে পারিলেও পচিয়া যাওয়াও সহজ। যাহা হউক সেই সময় হইতে দেশে কখনও সেরূপ দুর্ভিক্ষ হয় নাই, গোলাও ব্যবহার করিতে হয় নাই। এখন ইহা সরকারি গুদামরূপে ব্যবহৃত হয়। ভিতরে গিয়া শব্দ করিয়া দেখিলাম আমারই কণ্ঠস্বর আমাকে দশটি প্রতিধ্বনি শুনাইয়া দিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে বাঁকিপুরের প্রশস্ত লন্ বা ময়দান। ইহা সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহার কতক অংশ লইয়া একটি পার্ক, তন্মধ্যে ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড হইলে অতি সুন্দর হইত। পুরাতন পাটলিপুত্র নগরের ইহাই উপকণ্ঠ।

ইহারই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফ্রেসার রোডের মোড়ের উপর পি, ডব্লু, ডি, লাটসাহেবের অভ্যর্থনার জন্য দ্বিতীয় তোরণ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই তোরণের পরিকল্পনা বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুযায়ী। অজন্তা গুহায় এইরূপ স্তম্ভ প্রথম ব্যবহৃত হয়;—তবে সেখানে প্রস্তর-খোদিত, আর ইহা হইতেছে বাঁশের ছিটেবেড়ার উপর সিমেণ্টের পলাস্তারা। শুনিলাম মাঝে মাঝে উহাতে তারের জাল জড়াইয়া সিমেণ্ট-পলাস্তারা করা হইয়াছে। যেরূপ ভাবেই প্রস্তুত হউক, তৈয়ারী জিনিষটা যে পাথরের নয় তাহা বুঝিতে হইলে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের দরকার। পুরাতন পাটলিপুত্র সহরের প্রবেশ-পথে এহেন স্থাপত্যের সুচারুসম্পন্ন তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া লাট সাহেবের অভ্যর্থনা করিবার ধারণা যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পাটনায় আসিয়াছিলাম তখন বাঁকিপুর ময়দানের দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড একতলা পোড়ো বাড়ী দেখিয়াছিলাম। এবার ঠিক সেইখানেই একটি সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য দোতলা বাড়ী দেখিলাম। একতলা বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেইখানে এই নূতন বাড়ী করা হইয়াছে—ইহাই প্রথমে ভাবিয়াছিলাম;—কিন্তু বাটীর মালিক ব্যারিষ্টার আবদুল আজিজ সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, সেই বাড়ীটাই সংস্কার করার পর এইরূপ আকার ধারণ

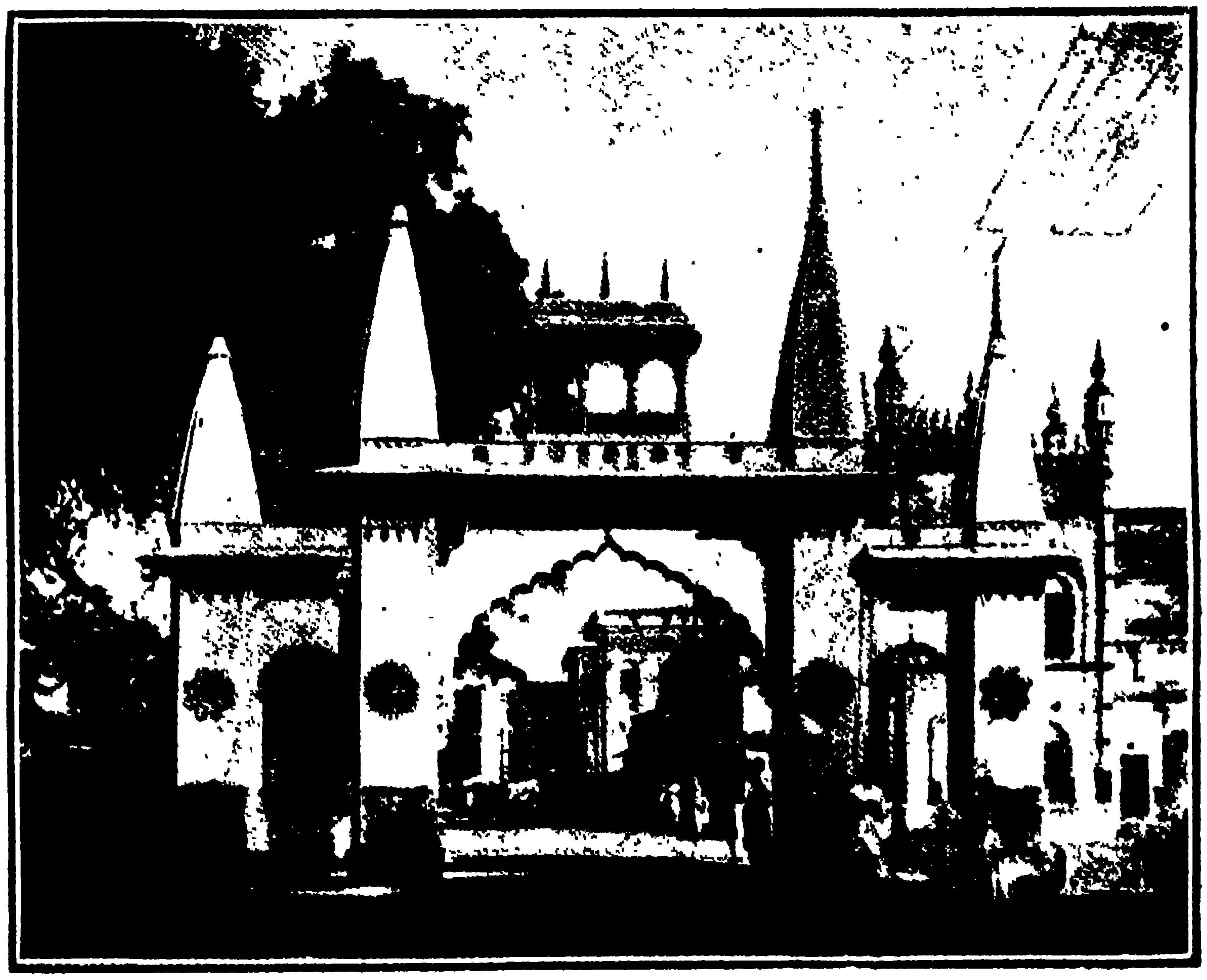

তৃতীয় তোরণ—বাঁকিপুরের প্রবেশ-পথ

করিয়াছে। স্থাপত্যশিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন ত হইয়াছেই, তাহা ছাড়া বাটীর মালিকের নিকট যখন শুনিলাম যে সেই পুরাতন একতলা বাটীটির বনিয়াদ এত কম চওড়া ছিল যে কোন ইঞ্জিনিয়ার তাহার উপর দোতলা করার মত্ দেন নাই, অথচ সামান্য কিছু খরচে সেই পুরাতন বাটী একেবারেই না ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বনিয়াদ চওড়া করিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, ইহা আমাদেরই একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের কৌশলে হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে

ইঞ্জিনিয়ারটি স্থানীয় পি ডবলু ডি-র ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত তারাপদ মৈত্র। বাঁকিপুর সহরে যে কয়টি চিত্তাকর্ষক বাড়ী দেখিলাম, এই বিল্ডিঙের কন্‌ট্রাক্টর স্বনামধন্য ইমারত-কারিগর জে, সি, ব্যানার্জ্জি মহাশয়। ইহার সম্মুখে শেষ তোরণটি গঠিত হইতেছে।

কদমকুড়ায় ডাঃ কুমারনাথ বাক্‌চীর গৃহ

পাটনার এই সব দেখিয়া বেশ মনে হইল যে বিহার একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ এখানে আসিয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে এই নূতন সহর চিনিয়া উঠা কঠিন হইবে। এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু পুরাতন সহরের রাস্তা ও ড্রেন এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে লজ্জাজনক।

কদমকুয়া নামক পল্লীতে অনেক সরকারী জমি বাসগৃহ-নির্ম্মাণের জন্য বিক্রয় হইয়াছে ও নানারূপ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার এবং লাট-সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য মনোরম তোরণগুলি তাঁহারই পরিকল্পনায় নির্ম্মিত।

পুরাতন বাঁকিপুরের প্রবেশপথে দেখিলাম আর একটি হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের অনুকরণে তৃতীয় তোরণ তৈয়ারী হইতেছে। পাটনার মেডিক্যাল্ কলেজ গভর্ণমেণ্ট অনেক ব্যয় করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন—কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ গৃহাদি বড় ঘেঁসাঘেঁসি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঁকিপুর, পাটনার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকা—সায়েন্স কলেজ। ইহারই দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে বড়লাট সাহেব আসিতেছেন।

মিস্ দাস মহাশয়ার গৃহ

ভিতরে কয়েকখানি বাঙ্গালীর বাটীও আছে। তাহার মধ্যে যেখানি চিত্তাকর্ষক সেখানি বিহার

গবর্ণমেণ্টের কেমিক্যাল এনালাইসার্ ডাক্তার শ্রীকুমারনাথ বাক্‌চী মহাশয়ের বাটী। ইহাও উক্ত তারাপদ বাবুর পরিকল্পনায় গঠিত।

কুমড়াহার, যেখানে অশোকের রাজধানী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম—যদি আরও নূতন কিছু আবিষ্কার হইয়া থাকে সেই আশায়। গিয়া দেখিলাম বিশেষ কিছু নয়—কেবলমাত্র পুরাতন সহর-সীমায় যে কাষ্ঠ-প্রাচীর ছিল তাহারই কিয়দংশ বাহির করা হইয়াছে। অর্থাভাবে এ কাজ কিছুই অগ্রসর হয় নাই, বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভগবতীর পীঠস্থান পাটলদেবীর মন্দিরটি অতি প্রাচীন। পাটনায় ইহাও একটি দ্রষ্টব্য। অনেকের বিশ্বাস এই পাটলদেবীর নাম হইতেই পাটনা নামের সৃষ্টি—আবার কেহ কেহ বলেন পাটলিপুত্র নাম হইতে পাটনা নাম হইয়াছে। তবে পাটলিপুত্র আগে কি পাটলদেবী আগে ইহাও বিবেচনার বিষয়।

পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরী, যেখানে বহু পুরাতন ফার্শি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাহার বিষয় বোধ হয় সকলেই জানেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রাধিকা সিংহের নামে একটি 'পাঠাগার ও পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসুবোধরঞ্জন গোস্বামী

বিদেশের গল্প

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র

(ক)

সম্প্রতি, লণ্ডনে ইটালিয়ান চিত্রকলার প্রদর্শনী আমি দেখেছি। চিত্রকলা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অতিসামান্য। নূতন তথ্য সংগ্রহ করবার ধৈর্য্য থাকলেও সময় নেই।

গেব্রিয়াল—আর্চ্চ এঞ্জাল

সুতরাং ইটালিয়ান চিত্রকলার মর্ম্ম বুঝবার জন্য আমার সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হ'য়েছে দুই চক্ষুর উপর। অনেক সময়ে নিজের চক্ষুর নির্দ্দেশ অন্যান্য লোকের 'গাইড বুকের' নির্দ্দেশের চেয়ে ঢের ভাল—এই আমার অনভিজ্ঞতার একমাত্র সান্ত্বনা। আমি ইটালিয়ান চিত্রগুলি দর্শনে প্রীত হ'য়েছি এই সান্ত্বনার বলে। আমার যে চিত্র ভাল লেগেছে তার প্রতিলিপি পাঠালাম।

* * *

প্রদর্শনী-গৃহে আমার মনোযোগ অনেকবার দর্শকের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে। সকলের মধ্যে আগ্রহের ভাব বিদ্যমান। এমন ভাবের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। কারো হাতে একটা মাসিকপত্রের আলোচনা, কারো হাতে একটা নিম্নশ্রেণীর দৈনিকের। কেউ চিত্রগুলি দেখছে আনন্দের জন্য, কেউ দেখছে ডিনার-টেবিলে গল্প করবে ব'লে। কিন্তু দেখছে সকলে। যে কোন কারণেই হ'ক, আর্টের দর্শনে এরা সকলে আকৃষ্ট। চিত্রকলার মর্ম্ম বুঝতে যারা অক্ষম তারাই আর্টের প্রতি তাদের আকর্ষণে নিজেদের সভ্য প্রমাণ করছে। এমন সার্ব্বজনীন আকর্ষণ আর্টের তথ্য-গ্রহণের লক্ষণ নয়, আর্টের প্রতি সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধার দ্যোতক!

(খ)

বর্ষারম্ভে এখানকার সাহিত্যিকমণ্ডলীতে একটা প্রশ্ন সব সময়েই শোনা যায়:—গত বৎসরের সব চেয়ে ভাল বই কোনটা? বইএর তাৎপর্য্য উপন্যাস; এবং উপন্যাসের মধ্যে সকলের মতে T. B. Priestely's "The Good Companions" শ্রেষ্ঠ গণ্য হ'য়েছে। আমি ইংরাজী উপন্যাস পড়ি না, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছু ব'লতে অক্ষম। T. B. Priestely একজন প্রবন্ধলেখক এবং সাহিত্যিক। Saturday Reviewতে এঁর প্রবন্ধ থাকে বরাবরই। এ প্রবন্ধগুলির ভাষা এবং ভঙ্গী অনেকটা Lambএর মতন।

* * *

T.B. Priestelyর সফলতায় একটি কথার প্রমাণ পাওয়া যায় :—ইংরাজরা অতীব সবল এবং গুণগ্রাহী। অতিমাত্রায় কুসাহিত্যের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা বলের লক্ষণ; এমন কুসাহিত্যের আপীল থাকলেও ভাল সাহিত্য বের ক'রে তাকে আদর করা গুণগ্রাহিতার চিহ্ন। বিলেতে, শূদ্রের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রভাব এবং সম্মান একটুকুও কমছে না।

(গ)

Galsworthy-র অতিআধুনিক নাটক "Roof"-এর ভাল সম্মান হয় নি ব'লে ইনি আর ড্রামা লিখবেন না শোনা যাচ্ছে। এ নাটক আমি প'ড়েছি এবং এর অভিনয় দেখেছি। এর প্লটে না আছে সামঞ্জস্য, না আছে কোন সূক্ষ্ম ভাবের নিদর্শন। নিছক অশ্রুপ্রবাহে নাটকের শেষ হয়, কিন্তু এমন অশ্রুপ্রবাহের জন্য নাটককার ঘটনাপরম্পরার সৃষ্টি করেন নি ভাল ক'রে। তাই তাঁর নিজের করুণার ধারা দর্শকের মধ্যে প্রবাহিত হয় না। তাই দর্শক নিষ্ঠুর,—দর্শকের নিষ্ঠুরতার জন্যই নাটককারের আক্রোশ।

Roof-এর প্রতীকই Galsworthyর এ নাটকের আধার। Paris-এর একটা Hotel-এ তিনতলায় তিনরকম মানুষের অবস্থান। একের সঙ্গে অপরের পরিচয় সর্ব্বশেষেই হয়—Roof-এ, after a fire has broken out below। নাটককার প্রত্যেক দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের লোকের উপর অভিন্ন প্রকোপের সংবাদের প্রভাব দেখাতে চান। প্রত্যেক দৃশ্যের সম্ভাবনার কাল আধঘণ্টা। দৃশ্য ছয়টা। এবং লেখকের মতেই সমস্ত নাটকেরই অবস্থান কাল আধঘণ্টা। সুতরাং একটা দৃশ্যের যেখানে শেষ, অপর দৃশ্যের সেখানে আরম্ভ না হ'য়ে আরম্ভ হয় সেখানেই যেখানে প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ হ'য়েছিল। ব্যাপারটা সরল নয়, সরসও নয়। Galsworthy-র উপর Cinema-র প্রভাব স্পষ্ট। Theatrical effects-এর জন্য ইনি নিজের ব্রাহ্মণত্বের কথা মনে রাখলেন না; লোকে মনে রাখলো না এঁর সম্মানের কথা।

(ঘ)

মিসেস্ Virginia Woolf এখানকার কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটিতে সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা পাঠ করেন। এ বক্তৃতাগুলি সম্প্রতি A room of one's own নামে

বেট্‌হ্‌ভন

প্রকাশিত হ'য়েছে। মিসেস্ Woolf-এর মতামত নিয়ে এখানকার সাহিত্যিকরা অনেক আলোচনা ক'রেছেন। মিসেস্ Woolf-এর বক্তৃতার উদ্দেশ্য কেম্ব্রিজের মেয়েদের সাহিত্যিক মোহ দূর করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি সফল হ'য়েছেন। তিনি বলেন যে, মেয়েদের একটা সুন্দর সুসজ্জিত ঘর এবং অন্তত পাঁচ শ' পাউণ্ডের স্বতন্ত্র বার্ষিক আয় না থাকলে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। এখানকার

ইউনিভারসিটির মেয়েদের বিশ্বাস তারা সকলেই অন্ততঃ তিনটা উপন্যাস লিখবেই, অন্ততঃ দশ হাজার পাউণ্ড পাবেই।

* * *

মিসেস্ Woolf বুদ্ধিমতী নারী। ওঁর বুদ্ধি সাধারণ লোকের নিকট অবিদিত থেকে যায়, কারণ এঁর লিখবার ভঙ্গী অদ্ভুত। অনেকে বলেন মিসেস্ Woolf সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। পুরুষের মনের মধ্যে স্রষ্টার ভাব উদিত হয় পাঁচ'শ' পাউণ্ড এবং সুসজ্জিত ঘরের সহায়তায় নয়, সৃষ্টির প্রেরণায়। এমন সৃষ্টির আধার পুরুষের চিরকালীন নিঃসঙ্গতা। এই তার বল। নারীর কোন অধিকার নেই সাহিত্য সৃষ্টি করবার, সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলবার। বলা বাহুল্য, মিসেস্ Woolf-এর মতের এমন আলোচনা ক'রেছেন পুরুষেরাই। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

* * *

মিসেস্ Woolf-এর মতের সত্যতা প্রমাণ ক'রতে আধুনিক লেখিকারা এতই ব্যস্ত যে তাঁরা বলেন, পুরুষরা বুদ্ধিহীন এবং মিসেস্ Woolfই এ যুগের একমাত্র চিন্তাশীল সাহিত্যিক। আমার মতে, এঁরা মিসেস্ Woolf-এর কথার অর্থ বুঝতে পারেন নি। নারীর নিকট সাহিত্য একটা সরস ব্যাপার। এর উদ্দেশ্য আমোদ, আনন্দ নয়। এ বিরাট ব্যথার রূপাভিলাষ নয়, ক্ষণিক হর্ষ-বিষাদের প্রকাশেচ্ছা। মিসেস্ Woolf এ সত্য জানেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির prescription—নারীর অক্ষমতার বিদ্রূপ। এ দিকটা আধুনিক যুগের লেখিকারা ধ'রতে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি অনেক সমালোচক।

(৬)

লণ্ডনে P. E. N. Club নামে একটা সমিতি আছে। যে-কোনো দেশের, যে-কোনো ভাষার লেখক এর সদস্য হ'তে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এর সদস্য। এ clubএ সম্প্রতি Journey's End-এর লেখকের সম্মানের জন্য একটা ভোজ দেওয়া হয়। এই অবসরে লেখক তাঁর নাটকীয় পাত্রদের বিষয়ে অনেক কথা বলেন। আমার কাছে সাহিত্যিকের এমন আলোচনা যত কৌতুকময় তার চেয়েও অধিক কৌতুকময় সাধারণ লোকের কাছে—কৌতুক সাহিত্যিকের জীবনের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ সকাল বেলায় কি খান আমি জানি না, কিন্তু গীতাঞ্জলীর লেখককে আমি চিনি। এখানকার লোক লেখার মধ্যে পাওয়া লেখকের আত্মা চিনতে যত ব্যস্ত তার চেয়ে অধিক ব্যস্ত লেখকের জীবন নিয়ে। অনেক সময়ে এখানকার লেখকরা নিজেই তাদের সাহিত্যিক কারখানার উপর প্রবন্ধ লিখে ছাপান। কেউ বলেন আমি ভোর বেলায় উঠে প্রথমত দশটা সিগার খাই তারপর নভেল লিখি। কেউ বলেন আমি রাত বারোটার পর জেগে পরদিন বারোটা পর্যান্ত পায়চারি করি এবং লেখা dictate করাই। কেউ বলেন আমি প্রতিদিন নিদ্রিতাবস্থায় প্লট ব'লে ফেলি এবং আমার স্ত্রী সেটা work out করেন সকাল বেলায়। এমন ক্ষুদ্র লেখকের অত্যাচারে ইংরাজী সাহিত্যের সরস্বতী পীড়িতা।

"বেট্‌ভন"এর জীবনীর প্রথম ভাগ কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়। এর লেখক রঁমা রঁলা। এর দ্বিতীয় ভাগ কবে প্রকাশিত হবে বলা যায় না। রঁমা রঁলার প্রকৃতি আধুনিক লেখকের প্রকৃতির চেয়ে ভিন্ন। গত বৎসর একটা ফরাসী সাহিত্যিক সাপ্তাহিকে আমি পড়ি যে, দুই সপ্তাহের পর রঁমা রঁলা লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী প্রকাশিত হবে। আমি এ বইয়ের একটা কপির জন্য প্রকাশকের নিকট পত্র লিখি। তিনমাস পরে খবর পাই যে, বই প্রকাশিত হ'ল না,—লেখকের গবেষণার শেষ হয় নি। প্রতিজ্ঞার এমন অসম্মান প্রতিভাশীল ব্যক্তিই করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর কিয়দংশ "য়ুরোপ" নামের মাসিকে বেরিয়েছে।

রঁমা রঁলার "বেট্‌ভন" সুন্দর রচনা। আমি এমন interpretative জীবনী আর পড়িনি। এ যেন রঁমার শিল্প—অসীম, অসংযত প্রাণোচ্ছ্বাসের অসম্পূর্ণ রূপ। এমন জীবনীতে বেট্‌ভনের আত্মার ক্রমবিকাশের সহিত, জীবনী-লেখকের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। বেট্‌ভনের সৃষ্টি অনুপম, অমর। তাঁর অমৃতের সহিত প্রত্যেক সংগীতজ্ঞের পরিচয়। বেট্‌ভনের আত্মা মহান। সে মহত্বের বিবেচনা করেছেন রঁমা রঁলা।

শ্রীঅষ্টাবক্র

বিষ্ণু-স্মরণ

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলে-ভুলানো ছড়া দিয়া কি বাহিরের দৃষ্টি ভুলাইয়া রাখা যায়? তা বোধ করি যায় না। চাই অন্তরের ভিতরকার দৃষ্টি সত্যস্বরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠা; বাহিরের দৃষ্টি তখন হয় ত নিরর্থক হইতে পারে। কিন্তু তা যদি হইত তাহা হইলে বুদ্ধদেবেরই বা এই নিষ্কলঙ্ক জীবনের গ্রন্থি এমন জোট্ পাকাইয়া উঠিল কেন?

'আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্নং তপোঽঞ্জলিং—' নাভিগঙ্গায় দাঁড়াইয়া বুদ্ধদেব তখন পিতৃ-পুরুষের মুখে গণ্ডুষ ভরিয়া জল দান করিতেছিল। কিন্তু পিতৃ-পিতামহের তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছিল কি না, সে খবর রাখিতে হইলে না কি বহু ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়; তাই তাহা আর হইয়া উঠে নাই।

বুদ্ধের সুন্দর গৌরবর্ণ অর্দ্ধ-মগ্ন তেজোদীপ্ত সৌম্য ভাস্বর-তুল্য মূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছিল। মস্তকে সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী, বাহুতে রুদ্রাক্ষ, কণ্ঠে তুলসীর মালা।—যেন মূর্ত্তিমান সাধক।

একাগ্র ঊর্দ্ধদৃষ্টি তাহার সম্মুখে নামিয়া আসিয়া একটি নারীমূর্ত্তির পানে পড়িতেই, বুদ্ধ গঙ্গার জলে চক্ষু ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় আচমন করিয়া লইল। মনে-প্রাণে শব্দার্থগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু এত একনিষ্ঠতার অন্তরালেও যেন অবাধ্য চক্ষু-জোড়া আবার একটু দৃষ্টি লইয়া লইল। বুদ্ধ অধিকতর আগ্রহে মনে বল সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রগুলি আরো স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিল।

পরের দিনের কথা। ব্যাসকাশীর মাথার উপরে তখন সূর্য্যদেব। এ পারে চৌষট্টির ঘাটে বুদ্ধদেব দৈনন্দিনের মত আজো ভগবানের ডাকে ব্যস্ত ছিল।

সেই নারী আজো ঠিক সেই সময়েই সবেমাত্র অবগাহন করিয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী। পরনে তাহার নীলাম্বরী। সদ্যস্নাতা সুঠাম লতার মত তন্বী ঋজু দেহখানি—সিক্ত বসনের কঠিন আলিঙ্গনে তাহার অঙ্গের প্রতি গঠন যেন দর্পণের মত আরো সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। ভারী কলসীর ভারে কোমর বাঁকাইয়া মাত্র সে দুই সিঁড়িতে পা বাড়াইয়াছে—ঘাট তেমন পিছল না হইলেও হঠাৎ পদস্খলন হওয়াটাই হয় ত তখন তাহার অনিবার্য্য কারণ ছিল।

অতি-সন্নিকটে অকস্মাৎ পতনের শব্দে বুদ্ধদেবের স্তিমিত দৃষ্টি যাইয়া পড়িল সেই দিকে—। তাহার ধ্যানগম্ভীর মুখখানা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার আরব্ধ মন্ত্র বাকী রাখিয়া সে উঠেই বা কেমন করিয়া!

মেয়েটি যেন উঠিতে পারিতেছে না। বুদ্ধের প্রতি করুণ দুইটি অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। বুদ্ধ কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অদূরে দুইটি স্নানার্থী বৃদ্ধকে ইঙ্গিতে হাত-চোখ্ ঘুরাইয়া কি যেন বলিয়া দিল। মেয়েটি অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া, এদিক-ওদিক একটু চাহিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—থাক্, কাজ নাই আপনি আহ্নিক করুন, আমি নিজেই উঠ্‌ব! কিন্তু একটা লোক সাম্‌নে প'ড়ে মরতে চাইলে তাকে সাহায্য করতেও ভুলবেন না যেন।......

পুনরাচমন ছাড়া আর গতি বোধ করি ছিল না, তাই বুদ্ধ কথা কহিল—খুব বেশী লেগেছে কি? মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল—ব্যাথা তেমন লাগে নি—ভারী অন্যায় করলেম আপনার কাজে ব্যাঘাত দিয়ে! আপনি কাজ করুন......বলিয়া চোখে-মুখে সুমিষ্ট হাসি ছড়াইয়া, বেশ একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া, লীলায়িত একটা অবাধ ভঙ্গীর সৃষ্টি করিয়া অচপল গতিতে ধীরে ধীরে মেয়েটি এখন কোথায় সরিয়া পড়িল।......

বুদ্ধের আসন টলিয়া উঠিল। সেই টলায়মান আসন সে আরো দৃঢ় করিয়া, পবিত্র গঙ্গাজলে চক্ষু ধুইয়া, ওষ্ঠাধরে, কর্ণমূলে বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া বুদ্ধ আবার কঠিন হইয়া বসে।

তবু যেন সেই কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া একটি পাত্‌লা শুভ্র ছায়া স্বচ্ছন্দ মৃদুগতিতে তাহার চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া বেড়ায়......

বুদ্ধ অর্থ খুঁজিয়া পায় না। গঙ্গায় আর একটা বেশী ডুব দিয়া বাড়ী ফেরে।

বুদ্ধ আর এখন অনেক বেলা পর্য্যন্ত গঙ্গায় থাকে না। প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া সূর্য্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে এখন বাড়ী ফেরে। সন্ধ্যা-আহ্নিক আর যাহা কিছু বাড়ীতেই করে।

কিন্তু তবু যেন কেন এত করিয়াও সে নিবিষ্টতার সীমা-রেখা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বিষ্ণু-স্মরণ করিতে করিতেই বেচারীর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল।

স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বোন বুদ্ধের নিজের বলিতে কিছুই নাই। গণেশমহল্লার ভিতর শিমূল চৌহাট্টায় ছোট একটা কোটাবাড়া—তাহাও কোন এক ভক্তশিষ্যের দেওয়া।

অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও শিষ্যেরাই করে। এমন অবকাশ কয়জনের ভাগ্যে মিলে? তাই বুদ্ধ সময়ের অপব্যবহার না করিয়া, ভগবৎ চিন্তায় মন দিয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ প্রাতঃস্নানে গঙ্গায় চলিয়া যায়। গঙ্গার ঘাটেই সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে। শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে, বেলা উঠিয়া যায় তখন প্রায় মাথার উপরে। বাড়ী ফিরিয়া স্বহস্তে আলু ও আতব-তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করে। উপকরণের মধ্যে আর যৎসামান্য দুগ্ধ ও গব্যঘৃত। এই মাত্র তাহার আহার্য্য। তা হউক; তাহাই সে পরম তৃপ্তির সহিত না-কি আহার করে। আহারান্তে খানিকটা বিশ্রাম না করিলে নয়, তাই একটু করে। পরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাগবৎ পাঠ ও সায়ং-সন্ধ্যাদি......

এই হইল তাহার দিনমানের কার্য্যতালিকা। ইহার বাহিরে জীব-জগতে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য আর যে থাকিতে পারে, ইহা জানা দূরে থাকুক, পাশের বাড়ীর জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গেও তাহার পরিচয় নাই।

এই যে দুনিয়া ছাড়া লোক—তাহারও সহজ জীবন-যাত্রার মধ্যে যেন কোথায় ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতে, একটা মস্ত পরিবর্ত্তন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

বুদ্ধ যোগাসনে বসিয়া কিছুতেই তাহার মনঃসংযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মধ্যাহ্ন প্রায় আগত, তবু তাহার পূজা সমাপন আর হয় না। বহু চেষ্টায় মন স্থির করিয়া বসে—আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, অসংবদ্ধ কত কি যে তাহার অন্তরের ভিতর উদয় হইয়া সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়া যায়, বুদ্ধ সেই ছিন্ন-সূত্র আর যোজনা করিয়া উঠিতে পারে না। মনের বল যেন সে ক্রমশঃই হারাইয়া ফেলে। এই সন্দিগ্ধক্ষণে হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বুদ্ধ পাশের বাড়ীর জানালার দিকে তাকাইয়া দেখে—সেই মেয়েটিই যেন কি বলিতেছে?

এও কি সম্ভব? অন্তরে—অন্তরে অনেক সময় বেতারে নিশ্চয়ই অনেক কিছু সংঘটন ঘটিতে পারে; নইলে এইরূপ একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, ইহা বুদ্ধ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

তাহার এই হতভম্ব ভাব দেখিয়া মেয়েটি আবার বলিল—শুন্‌চেন্? আপনার গায়ের কাপড়টা, বাঁদরে আমাদের ছাদে টেনে এনে ফেলে দিয়েছিল, তাই ছেলেটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে নিন্!

দ্বিধা? সঙ্কোচ? তা একটু হইলেও বুদ্ধের যেন কেন তেমন বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। বোধ করি মনের উদ্দাম গতি পথটাকে অনেক সহজ করিয়া আনিয়াছিল।

বলিল—আপনি এখানে কি ক'রে?

—আমার বাড়ীতে আমি আছি, আশ্চর্য্য হবার ত কিছু নেই।

—তা বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ত কখনো আপনাকে এ বাড়ীতে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

মেয়েটি একটু আশ্চর্য্য হইয়াই কহিল—পূর্ব্বে যে ভাড়াটে ছিল তাদের কি আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবার সৌভাগ্য ঘটেছিল ?

—তাও ত' বটে! সে সৌভাগ্য তাদেরো হয়নি আমারো হয়নি, সে যা হোক......

মাঝখানে বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল—এখন আর বক্‌বেন না, বেলা অনেক হয়েছে; আহ্নিকটা শেষ ক'রে ফেলুন্—তারপর ত' আবার ঐ আলুভাতে চট্‌কাতে হবে!

—আপনি দেখি আমার সব খবরই রাখেন ?

—কি করব, পাশের বাড়ী! আপনি না রাখলেও আমাদের রাখ্‌তে হয়...পুজোটা শেষ করুন!

ইতিমধ্যে উপরের ঘর হইতে একটি বৃদ্ধা ডাকিয়া উঠিল—কি লো দাসী, খেতেটেতে হবে না কি? বেলা বাজে দুপুর; খোসগল্প করলেই কি পেট্ ভরবে? গল্প করবার লোকও খুঁজে পাস্ না, ঐ ভম্বলটার সঙ্গে দরদ্ দেখাতে গেছিস্!

মুখ বাড়াইয়া গলার সুর একটু খাটো করিয়া দাসী বলিল—যাও তুমি; শুন্‌বে; কি ভাব্‌বে, বল ত?

—ওঃ বয়েই গেল!

দাসী চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ আবার পূজায় বসিল। তবে সেদিনের পূজায় কে প্রসন্ন হইয়াছিল কে বলিবে ?

তাহার পর যে কি করিয়া কি হইল সে অনেক কথা।

দাসীদের বাড়ী হইতে বৃদ্ধ বাহির হইতেই তাহার সেই ভক্ত-শিষ্যটির সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধের সেই সুন্দর মুখখানায় কে যেন একছোপ্ কালী মাখিয়া দিয়াছে।

শিষ্যটি পায়ের ধূলা লইতেই বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল—প্রণাম কোরোনা, বাধা আছে!

একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল—আর শোন, তোমার ঐ বাড়ীটা ফিরিয়ে নাও, আর গুরু-স্বও আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি, অন্য কাউকে বরণ ক'রে নাও গে! ওসব আমার কাজ নয়!......বলিয়া বৃদ্ধ দ্রুতপদে গঙ্গার দিকে হাঁটিয়া চলিল।

বিমূঢ় শিষ্য রাস্তার মাঝখানে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ পিছনে কাহার কোমল স্পর্শ অনুভব করিতেই দেখে—স্বয়ং বিশ্বনাথ ষণ্ডের মূর্ত্তিতে তাহাকে আপ্যায়ন করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং সেখানে তাহার দ্রুতপ্রস্থান ছাড়া আর উপায় ছিল কি? গুরুর সাক্ষাৎ লাভ তাহার অদৃষ্টে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

গুরুদেব ততক্ষণ—

'জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপক্ষয় কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে—' মন্ত্রপাঠ করিয়া গঙ্গায় দুই ডুব দিয়া নিষ্কলুষ হইয়া উঠিয়াছেন।

অন্তরবাসী দেবতাকে অনেক সময় সহজ দুই কথাতেই না কি বুঝান যায়, তাই এখন বৃদ্ধদেব এই সব বুঝিয়াই সান্ত্বনা পায়—যেখানে পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি, সাধনার ক্ষেত্রে ইহার চেয়ে বৃহত্তর পরীক্ষা না কি আর নাই......; এইরূপ কত কি যে বুঝাইয়া অন্তরকে সে সান্ত্বনা দিতে চায়; কিন্তু দুর্ব্বলতা অনেক সময় তাহার নিজের চক্ষেই ধরা পড়িয়া যায়, যখন স্বভাবকে ছাড়াইয়া সে কোন মতেই ঠেলিয়া উঠিতে পারে না।

অভ্যাসগত সংস্কার যাহা, এখনো সে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া উঠে নাই; জপ-তপ যাহা কিছু সংক্ষেপ হইয়া আসিলেও করিতে হয়। আর, তাহা এই দাসীর বাড়ীতে থাকিয়াই। এমনি করিয়া দিন যায়।

সেদিন দাসী তাহার নীচের ঘরে বসিয়া তাহার মার কাছে কি সব বলিতেছিল। মা তাহা উৎসাহ-ভরে শুনিয়া শুনিয়া মাঝে মাঝে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিলেন।

দাসী বলে—আর ভ্যান্-ভ্যান্ প্যান্-প্যান্ ভাল লাগেনা বাপু!

মা বলেন—হুঁ!

দাসী বলিয়া যায়—দিন নাই রাত্রি নাই খালি কানের

কাছে মশার মত ভন্‌ভন্‌—তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি—ভালবাসিস্‌ ত' মাথা কিনে নিয়েচিস্‌? ভাল ত' আমিও বেসেছিলাম, নইলে তোর মত কাট্‌-খোট্টাকে কি আর ঘরে ঠাঁই দিই?

মা বলেন—কেন রে, তখন যে বলেছিলাম, আমার কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে না?

—তা যাই বল মা, লোকটাকে মধ্যে আমার ভাল লেগেছিল; না হ'লে ওকে পাবার জন্য কি যে সব করেছি! তুমি ত' জান সব……যাক্‌গে, মরুকগে; ওর জন্যে আমার আর একটুও দরদ নেই। ওর জন্যে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কি শেষে সন্ন্যেসিনী হতে যাব?……

* * *

সন্ধ্যারাত্রে যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ইহার জন্য বুদ্ধদেব মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এরূপ একটা কিছু ভাবিতেই হয় ত সে কখনো পারে নাই। কিন্তু নিজের চোখে দেখা, অবিশ্বাসই বা করে কি করিয়া!

দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি শেষে এই……

দাসী স্পষ্ট পরিষ্কার উত্তর দিল—হ্যাঁ আমি এই, তুমি তা এতদিনে বুঝ্‌লে?

উঃ! বুদ্ধদেবকে—শেষে এও শুনিতে হইল! বুদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। মনে হইল—ঘূর্ণায়মান সুদর্শন চক্রের মত গোলাকার পৃথিবীটা যেন তাহার মাথার উপর ভন্‌ ভন্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আবার সেই চৌর্য্য বৃত্তি!

জোড়হস্তে, ঊর্দ্ধ নয়নে বুদ্ধদেব তখন গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতেছিল। দুই চক্ষু দিয়া তাহার তখন দর্‌ দর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল……

জাহ্নবীর বিগলিত করুণা যেন সেদিন শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বুদ্ধকে আলিঙ্গন করিল। মুক্তিস্নান করিয়া আজ সে যে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিল, আর তাহার স্পন্দন যেন সে সর্ব্ব শরীরে অনুভব করিল। মনে হইল—তাহার অন্তরের এতদিনের সঞ্চিত পঙ্কিলতা, দুর্ব্বলতা, আর এই বিরাট মিথ্যাচার সব ধৌত করিয়া, কাহার সঞ্জীবিত পবিত্র স্পর্শে, সেই সব কোন্‌ দূরে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, ঘন-কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে একটি সত্যিকারের সচ্চিদানন্দ-জ্যোতি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্‌জাক্‌

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল

ইংরাজী সমালোচকদের মতে বালজাকের সাহিত্য অপাঠ্য। তাঁহার জীবনকে দেখিবার যে বিশিষ্ট ভঙ্গী, কথাসাহিত্যের ভিতর দিয়া আপনার মতামতের যে অভিব্যক্তি, তাহার প্রতি ওদেশের সমালোচকদের কোন সহানুভূতিই নাই।

১৭৯৯ সালের ১০ই মে বালজাকের জন্ম-তারিখ। একটি নির্জ্জনতাপ্রিয় ছোট ছেলে, চোখে তার স্বপ্নের ঘোর—সে উদাস। ছোট দুটি বোন তাহাকে ক্রীড়াসঙ্গী-ভাবে পাইবার জন্য উৎসুক কিন্তু সে খেলা চায় না—পৃথিবীর এই বিরাট খেলাঘরের বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া শিশু-মনটি বুঝি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। মানবের সেই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর Don Juan or the Elixer of long life-এর প্রতি চরিত্রে কি চমৎকার বিকাশ পাইয়াছে।

তাঁহার একটি খেল্‌না-বেহালা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সেটি গভীর দরদে বাজাইতেন—তাঁর না ছিল গানের ধারা, আর বাজাবার পদ্ধতিও সঠিক জানা ছিল না। সকলের কাছে সেই সুরহীন ঝঙ্কার একটি বালকের অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইত, কিন্তু তাঁহার নিকট সেই যন্ত্রটির প্রতিটি ধ্বনি ছিল এক স্বর্গীয় অনুভূতি। তাঁর এই সঙ্গীতপ্রিয়তা আজীবন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। '*Gambara*' ও '*Massimilla Doni*' নামে তাঁহার দুইটি সুন্দর রচনায় সঙ্গীত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনাও স্থান পাইয়াছে।

তাঁহার অধ্যয়ন-পিপাসা অতুলনীয়; বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতেন; অদ্ভুত তাঁর মেধাশক্তি; পাঠ্য যাহা কিছু একবার চোখে পড়ে আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি তার সমস্তই গ্রহণ করিয়া ফেলেন—এতটুকু ভুল হইবার উপায় নাই—পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র অংশও তাঁহার মন হইতে পিছলাইয়া পালাইতে পারে না। এমনকি, অভিধানের প্রথম অক্ষরটি হইতে শেষ অক্ষরটি অবধি তাঁর কণ্ঠস্থ। এগারো বছর বয়সে Oratorian Collegeএ পড়িবার সময় তিনি "Will" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক রচনা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানকার একটি শিক্ষক শিক্ষকোচিত স্বভাবে সেটি জ্বালাইয়া ফেলেন—শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রের বিদ্যা বেশী, কাগজে কলমে তাহার প্রমাণ না রাখাই ভাল বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

সঙ্গীহীন ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা বিদ্যালয়ে অপরাধ করার একটি শাস্তি। বাল্‌জাক্‌ সেই শাস্তি নিজের উপর লইবার নানা উপায় খুঁজিতেন। নির্জ্জন ঘরটিতে তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলির অখণ্ড সঙ্গ কত মধুময়!—শাস্তি স্বর্গ হইয়া উঠিত। এই সময়ের ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া তাঁহার *Louis Lambert* রচিত হয়। আশ্চর্য্য সুন্দর সেই রচনাটি।

অপরিণত বয়সে এইরূপ বিপুল অধ্যয়ন ও তাহার প্রতি-কথাটি ধারণ করিতে উৎসুক তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আপনার বোঝা বহন করিতে বুঝি সক্ষম হইল না; তাঁহার ছোট মনটি, হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করিল যে সে আর বেশী কিছু মনে রাখিতে পারিবে না। বিহ্বল বাল্‌জাককে বিদ্যালয়ের সীমানা হইতে বাহিরে আনা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অদূরাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন সেই ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে—সে নিশীথের অলীক মায়া নয়, সে এক কীর্ত্তিময় সত্য। তাই একদিন ক্ষুদ্র বালক তাহার ভগিনীকে বলিল, দেখো একদিন-না-একদিন আমি বিখ্যাত হব।

সেদিন তাঁর বোনটি কি বালকের দম্ভ সত্য হইবে ভাবিতে পারিয়াছিল।

১৮১৩ সালে বালজাকের আত্মীয়গণ প্যারিসে আসেন, এবং সেখানে তিনি এক সুপরিচিত 'Pensionant'এ প্রেরিত

হইলেন। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি '*Bachelier*' ও '*Licencie'es lettres*' ডিগ্রী পান। আইন শিক্ষা করিবার পর পিতার অনুমতি-অনুসারে তাঁহাকে কিছুদিন 'নোটারী'র কাজ করিতে হয়। একুশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জীবিকা-উপায়ের জন্য স্থায়ীভাবে নোটারীর কার্য্য লইতে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তিনি আইন-ব্যবসায় করিতে অস্বীকৃত হইয়া পিতাকে বলেন যে অনেকদিন হইতে তিনি গ্রন্থকার হইবার বাসনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা বলিলেন—"Do you know that in literature if a man is not a master he is a mere 'hack'." তাহাতে তাঁহার উত্তর হইল—'Then I will be a master.' সাহিত্যের কঠোর সাধনার ভিতরও এতবড় আত্মবিশ্বাস যাঁহার ছিল, তিনি বালজাক—ফরাসী কথা-সাহিত্যের নবপ্রবর্ত্তক, ফরাসী জীবনের সত্যদ্রষ্টা।

বালজাকের পিতা তাঁহাকে নিজের মতে স্বীকৃত করিতে না পারিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। রুষ্ট পিতার প্রদত্ত সামান্য অর্থ লইয়া নিঃসঙ্গ আত্মীয়হীন বালজাক—সাহিত্যের একনিষ্ঠ অখ্যাত সাধক—প্যারিসে পড়িয়া রহিলেন সাহিত্যের রাজটিকা ধারণ করার যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া। দৈন্য তাঁর সঙ্গী—বাঁচিয়া থাকার বিরুদ্ধে নগ্ন কঠোরতা।

দৈন্যের কথা তাঁর প্রিয় বোন Laureকে ছাড়া আর কাহাকেও তিনি জানাইতেন না। ভীরু শশকের মত সঙ্গোপনে তিনি থাকেন। অর্থ-অনটনের কষ্ট, পাওনাদারের তাগাদা,—সান্ত্বনা শুধু সাহিত্য-সাধনার সুবিমল আনন্দ।

কেবল মুদীর দোকানে কাফি কিনিতে যাওয়া ছাড়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া বালজাক রচনা করিতে লাগিলেন। শীতকালের প্রচণ্ড শীতে ঘরে আগুন নেই, আহারও স্বল্প, সেই কঠোরতার ভিতর ফরাসীদের ভবিষ্য-সাহিত্য-গুরু পড়িয়া রহিলেন।

"*Cromwell*"নামে একটি নাটক বালজাকের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল। তিনি সেই নাটকটি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর নিকট পাঠ করেন;—তাঁহার বন্ধুদের মতে সেটি কিছু হয় নাই। সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় জানিনা, বালজাকের নাটকটি আজ অবধি অপ্রকাশিত। ইহার পর বেনামীতে তাঁহার কতকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়, পরে সেগুলি '*Œuversde Jeunesse*' নামক দশটি গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে।

বালজাকের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। লেখনী তাঁহার জীবন-বহন করিবার সঙ্গতি আয় করিতে পারিতেছিল না। নিজে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া নিজের প্রচুর রচনা প্রকাশ করিবার সুযোগের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কলেজের একটি পুরাতন সহপাঠী-বন্ধুর নিকট কিছু অর্থ ধার লইয়া তিনি প্রকাশক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নানা দুর্ব্বিপাকে তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার বন্ধুটি নিরুদ্যম না হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিল, এবং পুত্রের ব্যবসায়ী হইবার প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট পিতার নিকট হইতে আসিল—ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। তাঁহার পরিদর্শনে, ছাপাখানা ও হরফের কারখানার প্রতি-বিভাগের উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম হইতে লাগিল। কিন্তু মুদ্রাগারের স্বাধীনতা-নিষেধক আইনে তাঁহার ব্যবসায় আবার ভাঙিয়া গেল।

বাধ্য হইয়া তিনি আবার সাহিত্যের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন—শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নয়, ব্যবসায় যে ঋণ করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিবার জন্য। তাঁহার পাঠাগারের মধ্যে অন্যান্য পুস্তকের মত একটি বাঁধানো বই ছিল; তার নাম, *La Trag'edie Humanie*' এবং সেই বইটি তাঁহার নিজে-হাতে-লেখা আয়ব্যয়ের হতাশা-মিশ্রিত ইতিহাস।

১৮২৭ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস *Les Chouans* প্রকাশিত হয়। পাঠক-সমাজে উপন্যাসখানি তখন অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। উপন্যাসখানি জোরালো ও একটি সুন্দর রচনা—সুন্দরতম সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-প্রযোজক অন্যতম কথাশিল্পী বালজাকের প্রথম হইলেও উপযুক্ত রচনা। *Les Chouans*এর প্লটটি অত্যন্ত জটিল।

তাঁহার সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন কতকগুলি চরিত্র স্থায়ী ও সম্যকরূপে আঁকিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সময়, সকল উৎসাহ নিয়োগ করিলেন। Dante যেমন তাঁর "Commedia"তে ঐশ্বরিক সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তেমনি বালজাক সমগ্র মনুষ্যসমাজের চরমতম

ঘটনাগুলি লইয়া একটি অপরূপ, অভূতপূর্ব্ব রচনা-অর্ঘ্য সাহিত্যদেবীর পদে নিবেদন করিলেন। একশত গল্পকে সাতটি খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

এই গল্পগুলিতে পাঁচরকম জীবনের দার্শনিক মতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখা যায়। Private—Provincial—Parisian—Military—ও Country-life; ফরাসী-জীবনের সেই পাঁচটি বিভাগ। এই একশত গল্প তাঁহার দীর্ঘ বিশবৎসর সময়ের সাধনা, অনির্ব্বাপিত উৎসাহ, অপরিমিত অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। *Le père Goriot*, *L' Histoire des Treize*এর দুটি অংশ, *La recherche del' absolu* ও '*A tragedy by the sea*' এই পাঁচটি তাঁহার এক বৎসরের ফসল।

তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির এইখানেই সমাপ্তি নয়। তিনি দু'টি রিভিউ বাহির করিয়াছিলেন; বহুসংখ্যক প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা, চারিটি নাটকের নাট্যকার এবং তাঁহারই দেশের প্রসিদ্ধ লেখক Rabelaisএর মত বহু অদ্ভুত গল্পের কল্পয়িতা।

প্রতি লেখার জন্য কী প্রচুর যত্ন ও সাধনা! একটি চওড়া কাগজের মাঝামাঝি তিনি গল্পের প্রয়োজনীয় অংশগুলি লিখিতেন, তাহার পর প্রুফ দেখিবার সময় দুইপাশে কথার পর কথা যোগ দিতে দিতে গল্পটি বড় হইয়া উঠিত; যতক্ষণ না তাঁহার সন্তুষ্টি হইত, ততক্ষণ তিনি এই রকম লিখিয়া চলিতেন। *Pierette* নামে তাঁহার একটি চমৎকার চিত্র-গল্পের এই পদ্ধতিতে সতেরোবার প্রুফ দেখিতে হইয়াছিল, আর সে প্রুফ সংশোধনের জন্য খরচ পড়িয়াছিল চারশো ফ্রাঙ্ক, যাহা তাঁহার পুস্তকবিক্রয়-লব্ধ অর্থের চেয়েও বেশী। ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে পারেননাই। অথচ বালজাক—দরিদ্র বালজাক তাঁহার সকল ব্যয় অত্যধিক সঙ্কোচ করিয়া একদিন বহু অর্থের অধিকারী হইবার স্বপ্ন দেখিতেন।

দৈহিক সৌন্দর্য্যে বাল্‌জাক সবল ও স্বাস্থ্যবান। সেই-জন্যই বোধ হয় এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করার শক্তি তাঁহার ছিল। ঋণী বালজাক তাগাদার জোরে অস্থির—কিন্তু একটি মুহূর্ত্তের আনন্দে তিনি দীর্ঘ সপ্তাহ-গুলির সন্তাপ ভুলিয়া যান।

বাল্‌জাকের ব্যক্তিত্ব ছিল অসামান্য। তাঁহার অদ্ভুত আকৃতি, অস্বাভাবিক রীতিগুলি ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীশক্তি। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় সান্ধ্যভোজন শেষ করিয়া তিনি শয্যার আশ্রয় লইতেন। রাত্রি এগারোটা-বারোটা হইতে সকাল নয়টা অবধি তাঁহার লেখার সময়। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে প্যারিস ও পার্শ্ববর্ত্তী তুষারাচ্ছন্ন নিশীথের নির্জ্জন পথে পথে পাদ্রীদের মত একটি কালো আবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া প্রেতের মত রহস্যময় ভাবে বাল্‌জাক ঘুরিয়া বেড়ান।

ধর্ম্মমতে বালজাক Catholic,—Monarchism তাঁহার রাজনৈতিক মত।

উপরতলার প্রকোষ্ঠবাসী বাল্‌জাকের অবসর নাই।—অবিশ্রাম কাজ আর কাজ; প্রতিভা আর ক্ষমতায় তিনি পরিপূর্ণ; স্বাভাবিকের চেয়ে তিনি পনেরোগুণ বেশী রচনা করিতে পারেন—কম্পোজিটারদের হৃদয় হতাশায় ভরিয়া যায়, প্রেসের প্রুফ-রীডারদের চক্ষু ও চরিত্রও দুর্ব্বল হইয়া ওঠে। কালো কাফি রাত্রিতে তাঁহাকে নিদ্রাহীন করিয়া তোলে। শস্যসংগ্রাহকদের মত তিনি অদ্ভুত পরিশ্রমী, কর্ম্মক্ষমতায় তিনি Titan,—দ্বিতীয় Shakespeare। কী প্রয়োজন ছিল এই বিপুল রচনার! বালজাকের যে কোন দশটি গল্প সাহিত্যজগতে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত। কিন্তু তাঁহার ছিল কর্ম্মের প্রেরণা; তিনি একজন সহৃদয় সাহিত্যসেবী। এই ত বিপুল পরিশ্রম মৃত্যুর পরোয়ানা লইয়া আসিল। কাজ যখন তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে তখন তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত। শুধু খ্যাতির সম্মান নয়, সেদিন তাঁহার অর্থ-স্বচ্ছলতার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে রমণীটিকে তিনি তাঁহার *Pierrette* উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই ধনী রাশিয়ান-নারী—*Countess Eva de Hansik* সমস্ত অর্থ লইয়া তাঁহার পরিণীতা হইলেন। কিন্তু বহু-আয়াসলব্ধ সৌভাগ্যের আনন্দ বালজাকের জন্য নয়,—

ফরাসীর সাহিত্য-সাধক মৃত্যুর মমতায় তখন চুক্তি করিয়াছেন।

Sir Walter Scottও ছিলেন পরিশ্রমী, কিন্তু তাঁহার কাজ করার ভিতর ছিল স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফূর্ত্তি। বাল্‌জাক্ তাঁহার এক একটি রচনার এগারো-বারোবার প্রুফ দেখেন; স্কট্ নিজের রচনাক্ষমতার সীমা জানিতেন, তাই তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'কলিকে' ভুগিয়াও নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহার প্রিণ্টারদের সহিত মাত্র দুই একটি প্রুফের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। কিন্তু বাল্‌জাক্ তাঁহার রচনা সম্বন্ধে এতখানি সচেতন ছিলেন যে প্রতিবার প্রুফ-সংশোধন ও পুনঃ পুনঃ রচনা-সংস্কার করিয়াও মনে হইত, নিজের নামে জগতকে যে কথাগুলি যে-ভাবে শোনাইতে তিনি ইচ্ছা করেন সেইরকমটি এখনও গড়িয়া উঠে নাই। কাজের সঙ্গে ছিল তাঁর অস্থির-চিত্ততা। বালজাকের এই অত্যধিক self-consciousness-এর ফলে রচনাগুলি "Grotesque" হইয়া পড়িয়াছে।

এই কাজের বৃষ্টি,—কপি আর প্রুফ, প্রুফ আর কপি! দিনরাত্রির ভিতর আঠারো ঘণ্টা যাঁর বিরামহীন লেখনী কাগজের উপর হাঁটিয়া চলিয়াছে,আর এক হাতে যাঁর কালো কাফির কাপ্, সকলেরই মনে হয় যে সেই একরোখা কর্ম্মীটির জীবনে নারীর মোহ আসে নাই, রোমান্সের ছায়া সেখানে বাড়িতে পারে না—চুম্বনের স্বপ্ন দেখিবার অবসরই বা তাঁর কোথায়! সত্যই কি বালজাকের পঞ্চাশটি বৎসর এমনি বিশুষ্ক ভাবে কাটিয়া গিয়াছে! তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী Mme Hanskiর পূর্ব্বে একজনও কি *Com'edie Humanie*-লেখকের জীবনে পদার্পণ করে নাই!

একজন!—যখন তাঁর বয়স বাইশ, তখন প্রথম একটি নারী বয়সে তাঁর দ্বিগুণ, মার মত স্নেহ, বোনের মত আদর, স্ত্রীর মত সেবা দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। বাল্‌জাক্ তাঁর নাম দিয়াছিলেন 'La dilecta'! সংসার সম্বন্ধে তখন সেই মহিলাটির বাল্‌জাকের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা;—বহুদিন বালজাকের জীবনে এই নারীটি আধিপত্য করিয়াছিলেন।

তারপর Lady Errant, Princesse de Cadegnan, Nora Helmer,—আরও অসংখ্য নারী এলেন বিচিত্র রূপে বিভিন্ন ভাবে।

'*La Com'edie humanie*-র বাস্তব নারীচরিত্র এমনি ভাবে তাঁহার নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বালজাকের একজন জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন—"He preached the virtue with a most constant mouth; and with a constant heart he declined to practise it.—কিন্তু লোকসমাজে বালজাকের পরিচয়—তিনি একজন দক্ষ শিল্পী, প্রচণ্ড নীতিবাগীশ, তাঁহার হাতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের চাবুক।

বাল্‌জাকের সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ অনেক প্রকার আলোচনা হইয়াছে ও হয়। বালজাকের সমসাময়িক ফরাসী-জীবনের নিখুঁত ইতিহাস লিখিতে লিখিতে কোনমতেই তিনি স্বীকার করিতে পারেন না যে তাঁহার রচনা নীতির দিক দিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উপযোগী হইবে, এবং সেই কারণেই তিনি নিজের ভাগিনেয়ীদের তাঁহার পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবুও, তাঁহার সাহিত্যের সুপ্রচুর সাধুতার বিরুদ্ধে সেই সমালোচকবৃন্দ প্রশ্ন করিবেন,—যাঁহাদের সমালোচনা লোকপ্রিয় অগভীর ন্যায়যুক্তির উপর ন্যস্ত।

বালজাকের ছোট গল্পগুলির দিকে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। অথচ, এই গল্পগুলি রচনা হিসাবে তাঁহার উপন্যাসের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। শুধু এইটুকু ত্রুটি যে তাহারা আকারে ছোট। গল্পগুলির সজীবতা, সারল্য, এমন কি আকারের ক্ষুদ্রতা অকস্মাৎ আমাদের মনে একটি গভীর ও স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। গঠন-সৌষ্ঠবে এবং সূক্ষ্ম ঘটনাবিন্যাসের শিল্পকৌশলে সেগুলি আমাদের নিকট বিস্তারিত হইয়া ওঠে; সে বিকাশের কোথাও একটু শিথিল নয়। তাঁহার রচনার মধ্যে এমন একটি সুমধুর দুর্ল্লভ সঙ্গীত আছে যাহার সুর একবার শুনিলে বিস্মৃত হওয়া যায় না এবং যতবার শোনা যায় ততবার নূতন নূতন ভাবাবেশে আমাদের মুগ্ধ হইতে হয়।

বাল্‌জাকের সাহিত্যে আছে নূতন কল্পনা, আশু-উপলব্ধি এবং নির্ভুল নিরীক্ষণ। মন ও শরীরতত্ত্বের সঠিক জ্ঞান তিনি রাখেন; অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও

তাঁহার রচনা ব্যবচ্ছেদে শিল্পমাধুর্য্য হারায় না। অত্যন্ত সংক্ষেপ বা অত্যন্ত বিস্তৃত কাহিনী-বিন্যাসের সম্পূর্ণতায় এবং সামান্য ইঙ্গিতে গভীর সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতায় তিনি অদ্বিতীয় লেখক। তাঁহার চিত্রিত প্রতি চরিত্রটি যেন জীবন্ত হইয়া পাঠকের সম্মুখে হাজির হয়। তাঁহার রচনার রুচি সূক্ষ্ম, সংযম প্রশংসনীয়। যে-চরিত্রটিতে যতখানি সংযত হওয়া প্রয়োজন সেই অনুসারে তাঁহার বিচার নিরপেক্ষ।

বাল্জাক: প্রচুর রচনার কোনখানে এমন স্থানের বর্ণনা বা এমন ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই যাহা তিনি নিজে সম্পূর্ণ না দেখিয়াছেন। উপদেশক না-সাজিয়া তিনি আমাদের নিকট কেবল দৃষ্টান্তগুলি আনিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারই ভিতর দিয়া আমরা শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ নীতি শিক্ষা পাই। একসঙ্গে প্রতিভার রসবৈচিত্র্য, পরিহাস এবং মধ্যযুগের অস্বাভাবিকত্বের অধিকারী ছিলেন একমাত্র বাল্জাক। বেদনার উদ্বেলতা, আনন্দের পরিপূর্ণ জোয়ার, পৃথিবীতে সবল দৃপ্ত প্রেমের চিত্রে অপূর্ব্ব কোমলতার মাধুর্য্যের রেখা তাঁহার রচনায় অকুণ্ঠিত-বিকাশ পাইয়াছে।

Eva de Hanski ছিলেন রাশিয়াতে। তাঁর স্বামী *M. de Hanski* বয়সে তাঁর স্ত্রীর চেয়ে পঁচিশ বৎসর বড়। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিও হইয়াছিল অনেকগুলি যদিও তাহাদের ভিতর একটিমাত্র জীবিত ছিল। বাল্জাকের সহিত তাঁহাদের প্রথম দেখা হয় জেনেভাতে, তারপর ভিয়েনায়।

ম্যাডাম হান্স্কি প্রথম-স্বামীর জীবিতাবস্থায় বাল্জাককে প্রেমপত্র লিখিতেছিলেন। বাল্জাক প্রতিদিনই ভাবেন, এইবার তিনি রাশিয়াতে ম্যাডাম হান্স্কির নিকট চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু কি করিয়াই বা যাওয়া হয়! তিনটি গল্প শেষ করিতে হইবে,—বারোখণ্ড পুস্তক লেখা দরকার,—তারপর দশ কি বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জমাইয়া ঋণ পরিশোধ করাও প্রয়োজন। এমনি নানাবিধ কারণে বাল্জাক রাশিয়াতে যাইতে পারেন না।

হঠাৎ ১৮৪১ সালে ম্যাডাম হান্স্কির স্বামীর মৃত্যু হইল। ১৮৪২ সালে বাল্জাক রাশিয়ার দিকে চলিলেন। কিন্তু আঠারো-শো পঞ্চাশ সালের এপ্রিলের পূর্ব্বে তাঁহাদের দুইজনের বিবাহ হয় নাই। পরিণয়ের তিন-চার মাস পরে বালজাকের ইহজীবনের পরিণতি ঘটে।

এমনি করিয়া তাঁহার পঞ্চাঙ্ক জীবন-অভিনয়ে যবনিকা পড়িল। বাল্জাক্ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ভাবপ্রবণ মানব,—জীবনের স্বাভাবিক পথে যাঁহার চলিতে ভাল লাগিত না, অদ্ভুত উপায়ে যিনি সত্যকে ঘটনা দ্বারা সাজাইয়া মানুষের সম্মুখে রাখিয়া গেছেন।

যে লেখকটির অভাবে সাহিত্য প্রায় দুই হাজার অপূর্ব্ব মানবচরিত্রের জন্য দরিদ্র থাকিয়া যাইত, ফরাসীদেশে তাঁহার আবির্ভাব শুধু ফরাসীর গৌরব নয়,—জগতের সৌভাগ্য।

শ্রীফণীন্দ্র পাল

সত্যাসত্য

-উপন্যাস—

— যুক্ত লীলাময় রায়

৭

মিসেস্ গুপ্ত ব্রেকফাস্টের টেবিলে চা ও চিঠি দুই-ই পরিবেশন করেন। একদিন চাপ্‌রাশীর হাত হইতে সেদিনকার ডাক লইয়া দেখেন উজ্জয়িনীর নামে একখানি খাম, ঠিকানাটা অপরিচিত হাতে লেখা। গুপ্ত সাহেব তখন খবরের কাগজে ডুবিয়া ছিলেন, উজ্জয়িনী চিল দেখিতে উঠিয়া গেছে। চাপ্‌রাশী চলিয়া গেলে মিসেস্ গুপ্ত চিঠিখানিকে বুকের কাছ দিয়া ব্লাউসের ভিতর ঝুপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং শাড়ীটাকে আর একটু উপরের দিকে টানিয়া দিলেন। স্বামীর চিঠিগুলো স্বামীর একপাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "আমাকে এবার অনুমতি দাও তো উঠি।" গুপ্ত সাহেব কাগজের ওপাশ হইতে উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়।"

"তোমাকে আরো কিছু দিতে হবে?"

"না, থাক্।"

"আরেকটু চা?"

গুপ্ত সাহেব কাগজের ওপাশ হইতে মাথা নাড়িলেন। কিন্তু 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্' ভাবিয়া মিসেস্ গুপ্ত স্বামীর পেয়ালা হইতে পানাবশিষ্ট আলাদা করিলেন ও উহাতে নূতন চা ভরিয়া স্বামীর দিকে বাড়াইয়া দিলেন। অন্যমনস্ক গুপ্ত সাহেব পিয়ালাটি তুলিয়া লইলেন।

সিঁড়ি ভাঙিয়া মিসেস্ গুপ্ত সোজা গিয়া তাঁর শোবার ঘরে উঠিলেন। শুইয়া পড়িয়া খামখানা বাহির করিলেন। ছিঁড়িয়া দেখিলেন, আগাগোড়া ইংরেজী। মিসেস্ গুপ্ত ইংরেজী বলিতেন ভালো। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের ইংরেজী তাঁর মুখস্থ ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক ইংরেজী বুঝিবেন কেমন করিয়া? তবু অদম্য কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানাকে উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিলেন, কোথাও দন্তস্ফুট না করিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভবিষ্যতে আর একবার চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন। যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন দূর হইতে শুনিলেন উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বাবার কথা হইতেছে।

উজ্জয়িনী বলিতেছে, "আচ্ছা বাবা, চিলের মতো ডানা ছেড়ে দিয়ে ওড়া কি খুব শক্ত?"

তার বাবা হাসিতেছেন। "তুই একবার চিলের সঙ্গে উড়ে গিয়ে দেখে আয় না খুকি!"

উজ্জয়িনী আপন মনে দুই বাহু মেলিয়া চিলের মতো এলাইয়া দিতেছে ও ঝট্‌পট্ করিতেছে। তার অধ্যবসায় দেখিয়া তার বাবা হাসি চাপিয়া বলিতেছেন, "মন্দ এক্‌সার্‌সাইজ্ নয়, খুকি! রোজ করলে সাইজ্‌ও বাড়্‌তে পায় না তোর মা'র মতো।"

মিসেস্ গুপ্ত কোথা হইতে একজোড়া পুরানো মোজা পাড়িয়া আনিয়া গম্ভীরভাবে রিফু করিতে বসিলেন স্বামীর কাছে। এটাও মেমসাহেবীর অঙ্গ। অবশ্য মোজা জোড়া কারো কাজে লাগিবে না, খুব সম্ভব বেয়ারা কিম্বা চাপ্‌রাশীকে দান করা হইবে। ধৈর্য্যের সঙ্গে মোজা রিফু করা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু কান দু'টি খাড়া রহিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দের জন্য ওৎ পাতিয়া।

যোগানন্দ একখানা চিঠিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মহিম লিখেছেন।"

যোগানন্দ-জায়া একবার চোখ তুলিয়া স্বামীর চোখের সঙ্গে মিলাইলেন। তখনই নামাইয়া সূচীকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। কে কি লিখিয়াছে শুনিবার জন্য কৌতূহল দেখাইলে তাঁর মানহানি হয়।

অগত্যা যোগানন্দই একতরফা বলিয়া গেলেন, "লিখেছেন ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাস্ ফার্ষ্ট হ'য়েছে। বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে অক্টোবরের আগে বিলেত পৌছতে চায়—"

যোগানন্দ-জায়া আর একবার চোখ তুলিয়া চোখাচোখি করিলেন। ভাবটা এই যে, তাতে আমার কী!

কৈফিয়তের সুরে যোগানন্দ বলিতে লাগিলেন, "তা আমাদের দিক থেকেও তো আপত্তি নেই। খুকীর আপত্তি না থাকলেই হলো। কী বলিস্ রে খুকি!"

খুকীর মা খুকীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইলেন। খুকী তার বাবার দিকে শুধু বিস্ময়সূচক দৃষ্টি ফিরাইয়া রহিল।

যোগানন্দ এতদিন কথাটা উজ্জয়িনীর কাছে পাড়েন নাই, পাড়িতে তাঁর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। এত সকাল সকাল বিবাহ করিতে উজ্জয়িনীর আপত্তি হইবেই তো, তার পিতাই তো তাকে কবে থেকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন যে, দেশের সকল মেয়েই বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া দেশের সোশ্যাল্ সার্ভিস্ বিদেশিনীদের হাতে। এক্ষেত্রে কি আমরা কোনদিন স্বরাজ পাইব না?

একে বিবাহ, তায় অল্প বয়সে বিবাহ—যোগানন্দ নিজেই ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সাহস করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, খুকি, একটি সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই', তা হ'লে তোর এমন কি আপত্তি থাকতে পারে?"

উজ্জয়িনীর গালে কে যেন রং মাখাইয়া দিল। সে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাহিল, মা যেন দুর্জ্জয় ক্রোধ জোর করিয়া চাপিতেছিলেন। তারপরে খবরের কাগজ গুছাইতে বসিল। মেয়েকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিসেস্ গুপ্ত ভাবিলেন, কিছু একটা বলিতে চাহিতেছে, তাঁরই ভয়ে বলিতেছে না। তাই তিনি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন তেমনি সশব্দে মোজা-সেলাইয়ের পুঁজিপাটা সমেত প্রস্থান করিলেন। অবশ্য বেশীদূর গেলেন না, আড়ালেই কোথায় কান পাতিলেন।

উজ্জয়িনী কহিল, "বাবা, তুমি আজকাল কি সব ভাবো, আমাকে বলো না তো!"

যোগানন্দ কহিলেন, "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেতে চ'লে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার কোলে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হ'স্?" এই বলিয়া সস্নেহে কন্যার মুখে তাকাইলেন।

উজ্জয়িনী কাঁপিতে লাগিল। এমন কথা সে কোনদিন কল্পনায় আনে নাই। মনে মনে একটা ব্রত বাছিয়া লইয়াছিল, আদর্শও। বহুদিন হইতে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল সিষ্টার নিবেদিতার মতো সিষ্টার উজ্জয়িনী হইবে সে এবং গরীবদের খুকীদের লইয়া একটা ইস্কুল খুলিবে। ইস্কুলের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিবে একটা কুমারী-মঠ। অনাথাশ্রম কথাটা তার বিশ্রী লাগে, তাতে দীনতার উৎকট গন্ধ, সে দীনতা দয়ার পীড়নে বাড়ে। সিষ্টার উজ্জয়িনীর সঙ্গে যারা থাকিবে তারা তার বোন, হইলই বা তারা পিতৃমাতৃহীন, হইলই বা তারা নিঃস্ব। "ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া" একা তাদের অভাব মিটাইবে।

উজ্জয়িনী কহিল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?"

যোগানন্দ একটু দমিয়া গেলেন। "হাঁ, না, বিয়ে ঠিক্ নয় মা, বাগ্দান। হিন্দুমতে ঐটেকেই বিয়ে বলে বটে। ব'ল্লেই বা,—তুই যেমন আছিস্ তেমনি থাকবি, লাভের মধ্যে একটি সহকর্ম্মী পাবি। হ্যাট্ কোট্ পরা বাঁদর নয়, নিজের মতো ক'রে বাঁচ্বার স্পর্দ্ধা রাখে।"

মিসেস্ গুপ্ত আর সহিতে পারিলেন না। পাশের ঘর হইতে উঁচু গলায় বলিয়া উঠিলেন, "আমার জামাইয়ের যে নিন্দে করে সে নিজে বাঁদর!"

কঠিন বাধা পাইয়া গুপ্ত সাহেব থামিলেন। উজ্জয়িনীও লজ্জায় নীরব রহিল।

৮

সেদিনকার কথাবার্ত্তার ঐ শেষ। তারপরে একদিন সুযোগ বুঝিয়া পিতাপুত্রীতে ওবিষয়ে শেষ কথা হইয়া গেল। উজ্জয়িনী অনেক ভাবিয়া রাজি হইল। বাদলকে সহকর্ম্মী-রূপে পাইবার আশায় সে তার ব্রতের খানিকটা ভাঙিল ও বাকীটাকে বাদলের উপযুক্ত করিয়া গড়িল। এই তার জীবনের প্রথম আদর্শচ্যুতি। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রথম

সে রক্ষা করিল। ইহাতে তার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কাকে বুঝায়!

তার কৌমার্য্য রহিল না। সকল মেয়ের মতো তারও পতন ঘটিল। সিষ্টার উজ্জয়িনী হইবার স্বপ্ন অকালে টুটিয়া গেল, ভারতবর্ষের একটিও মেয়ে বিদেশিনীদের সমকক্ষ হইল না,সকলের মতো তারও জীবনে ঐ খাড়া-বড়ী-থোড়—স্বামী-শাশুড়ী-শ্বশুর।

যাক্, স্বামীটি তবু বড়দি ছোড়দির স্বামীদের মতো হইবে না, ভাবুক ও কর্ম্মী হইবে। দু'জনে মিলিয়া ইস্কুল খুলিবে,—খোকা ও খুকী দুই লইবে। একা মানুষ বড় অসহায় বোধ করিত; দু'টি মানুষ পরস্পরের কাছে বল পাইবে।

উজ্জয়িনীর বন্ধুতালিকা ছোট। তাতে একটি মাত্র নাম—তার বাবা। এই বার আর একটি নাম—তার স্বামী। নূতন বন্ধুটি বিলাত যাইতেছে, অতএব বিলাতে তার একটি বন্ধু থাকিল। ভাবিতে বেশ লাগে যে, দেশে দেশে তার বন্ধু আছে। শিশুকাল হইতে বিলাত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলাত যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবে—কোথায় Little Nell-এর দোকান ছিল, কোথায় কেনিল-ওয়ার্থ্ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল্ কোথায় কাজ করিতেন, ইংরেজদের পার্লামেণ্ট কেমন। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনিয়াছে, তাতে তার কৌতূহল কমে নাই, বাড়িয়াছে। এইবার তার বন্ধু যদি বিলাতে থাকে তো সে বিলাতে গিয়া পথ ভুলিয়া যাইবে না, অসাধু গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিয়া ফেলিবে না। তার বন্ধু তাকে সব দেখাইয়া শুনাইয়া দিবে।

উজ্জয়িনী যদি বাদলের চিঠি পাইত তবে নিশ্চয় জবাব দিত। সম্ভবতঃ সব কথার অর্থ বুঝিত না, বাবার কাছে বুঝিয়া লইত। বিবাহভঙ্গের কথায় চমকিয়া উঠিত—মা গো! তা নাকি হয়!—; কিন্তু খুসী হইয়া আলাপ করিত। জিজ্ঞাসা করিত আপনি ওদেশে গিয়া কী পড়িবেন, দেশে ফিরিলে কী করিবার স্বপ্ন দেখিবেন, সোশ্যাল সার্ভিসে জীবন ব্যয় করিতে আপনার মন যায় কি না। হয় তো আপনি স্বাধীনতার উপাসক,সুভাষ বাবুর মতো আই-সি-এস্ পাস করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। এমনি কত কথা! বাবার বন্ধুত্বে তার অতৃপ্তি ছিল, কারণ বাবার জীবনে নব নব সম্ভাবনা আশা করা যায় না, বাবাকে লইয়া তার কল্পনা বহুদূর উড়িতে পারে না। বাদলের সমস্ত জীবনটাই সাম্নে পড়িয়া। বাদলের বন্ধুত্ব তাকে কত সমুদ্র কত নদীর সংবাদ দিবে, কত বিদ্যা কত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া লইয়া চলিবে। হয় তো ভারতবর্ষের ভাবী নেতা হইবে তার বন্ধু, অথবা বিশ্ববিখ্যাত লেখক, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর।

এইসব আকাশচুম্বী কল্পনার দ্বারা তার ভূমিসাৎ কল্পনার ক্ষতিপূরণ হইল। ক্রমে ক্রমে উহাতেই সে রস পাইতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য মেয়েদের মতো সে পুতুল লইয়া খেলা করে নাই, লুকাইয়া প্রেমের গল্প পড়ে নাই, যেখানে ছেলে-মেয়েরা মিলিত হইয়া খুসী হইয়াছে—যেমন পার্টি বা নাচ—সেখান হইতে সরিয়া গিয়া সে মুক্ত আকাশের তলে তারা চিনিতে বসিয়াছে। সে যে কোনদিন সামাজিক জীব হইবে এ আশা তার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পাগ্‌লী বলিয়া তার দিদিরা তাকে ক্ষেপাইত এবং নিজেদের দলবল হইতে বাদ দিত। খুব ছোটবেলায় সে ইস্কুলে যাইত বটে, কিন্তু বাবা বদ্‌লী হইবার পর যাওয়া বন্ধ করে এবং বাবার পাঠাগারে ভর্ত্তি হয়। এ পাঠাগারে বই ছিল অগুণতি,—কিন্তু পিতাকে শুনাইয়া পড়িতে হইত বলিয়া খানকয়েক ক্লাসিক্ ছাড়া সবই নীরস।

বিবাহের সম্ভাবনা উজ্জয়িনীকে অকস্মাৎ মনে করাইয়া দিল যে, তার জীবনে অদ্যাবধি অর্দ্ধাশনে কাটিয়াছে, জীবনের বড় একটা রস এত দিন তার পাতে পড়ে নাই! বাদলের সঙ্গে সম্বন্ধ তাকে কত অপূর্ব্ব স্বাদ দিতে পারে, একথা কল্পনা করিতে গিয়া সে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা" খুলিয়া বসিল। এবার তার বাবাকে পড়ার সাথী করিতে তার লজ্জায় বাধিল। মনের কথার ভাগ দিতে না পারিলে মনের অসুখ করে। উজ্জয়িনীর মনের অসুখ করিল। তার মধ্যে একটা সদাসচকিত ভাব আসিয়া পড়িল,—রহিয়া রহিয়া কারণে অকারণে সে চমকিয়া উঠে,

যেন কেহ তার মনের ভাবনা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে, যেন তার মনের ভাবনাগুলি চোরাই মাল।

৯

মিসেস্ গুপ্ত সম্মতি দিলেন। কিন্তু বিবাহের আয়োজনে প্রাণ ঢালিতে পারিলেন না। তাঁর দলের লোক যোগানন্দকে খেয়ালী ও বিষয়বুদ্ধিহীন বলিয়া গালি পাড়িল এবং বিবাহ-আয়োজনে গা করিল না। লিলি-ডলিরা গালে হাত রাখিয়া (বা হাতে গাল রাখিয়া) থ' হইয়া রহিল। তার পরে বলিল, " ও ডিয়ার! খুকীর যে এখনো পুতুল-খেলার বয়স যায়নি। একটা ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে।" মিসেস্ গুপ্তর বোন মিসেস্ দাস দু'টি অধিক-বয়স্ক মেয়েকে লইয়া প্রত্যেক পার্টিতে যাইয়া থাকেন, এই তাঁর নিত্যকর্ম্ম। উজ্জয়িনীর বিবাহ শুনিয়া তাঁর মনে হইল ওটা যেন তাঁর কন্যাদের অবমাননা। কেবল দুই-চারিজন আত্মীয় সুখী হইয়া বলিলেন, কালো মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট ভালো; এক্ষেত্রে সবুরে মেওয়া ফলে না।

বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে গুপ্ত সাহেবরা কলিকাতায় গেলেন। লিলি ও ডলি তামাসা দেখিতে বাপের বাড়ী আসিল। তাদের দলবল লইয়া তারা প্রতিদিন সভা জমাইয়া বসে। তাতে বলিদানের পাঁঠার মতো উজ্জয়িনীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লওয়া হয়। কেহ বর সাজিয়া পিঁড়িতে বসে, কেহ পুরোহিত সাজিয়া তাকে মন্ত্র পড়ায়, কেহ উলু দেয়, কেহ শাঁখ বাজায়, কেহ উজ্জয়িনীকে জোর করিয়া বরের সাম্‌নে বসাইয়া দেয়। তুমুল হট্টগোল ও হাস্যরোলের দ্বারা উজ্জয়িনীকে তারা কাঁদাইয়া ছাড়ে। তখন, " মাগো তোমার খুকী কাঁদ্‌ছে, কোলে নাও!" " আহা, বাছাকে কে মেরেছে?" "ট্রাম্ থেকে পড়ে গেছে!" ইত্যাদি নানা কণ্ঠের নানা ধ্বনি উঠে। "এই তোরা চুপ কর"—বলিয়া কেহ এমন চীৎকার করিয়া উঠে যে তাকেই চুপ করাইতে গিয়া দক্ষযজ্ঞ বাধে।

একদিন উজ্জয়িনীর বিবাহ সত্য সত্যই হইয়া গেল। রঙ্গিণীরা বাদলকে লইয়া পড়িল। স্ত্রীপুরুষের সাম্যের গোঁড়া মিশনারী বলিয়া ছাত্রদের তর্ক-সভায় বাদলের বদ্‌নাম ছিল, কিন্তু অবলারা পুরুষের শিভ্যাল্‌রীর সুযোগ পাইয়া এতগুলি মিলিয়া একজনকে আক্রমণ করিতে লজ্জা পায় না, ইহাতে তার নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িল না। তারা তাকে গান গাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, গ্রামোফোন বাজাইয়া তাকে টানিয়া লইয়া নাচায়, তাকে কী খাইতে বলিয়া কী খাওয়ায়। বার বার অপদস্থ হইয়া বাদলের চোখে জল আসে। তাদের মধ্যে দয়ামায়া যে দু'তিন জনের ছিল তারা বাদলকে লইয়া তাস খেলিতে বসে, বাদল তাসের কাকে কী বলে তাও জানে না, ব্রে খেলিতে গিয়া ইস্কাবনের বিবি হাতে লইয়া বোকা বনে, রামি খেলিতে গিয়া তিনখানা নিকট-সংখ্য তাস একত্র করিতে পারে না। "আপনি নাকি খুব বিদ্বান্" বলিয়া কেহ তাকে শুধায়, "পো পো কাটাপট্‌ল্ কোথায়?" কেহ জিজ্ঞাসা করে, "শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন নাটকের নায়ক Petruchio?" কেহ বলে, "বলুন দেখি, বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নাম কী ছিল?"

বাদল সাহস পাইয়া পাল্টা প্রশ্ন করে, "উদয়নের রাজধানীর নাম করুন আগে। এবং তারো আগে বলুন কল্পিভেরামের বাংলা কী?"

বিদুষীদের বিদ্যা এতদূর যায় না। শুধু উজ্জয়িনীর চোখ দু'টি হাসিল। বাদল যে সমুপস্থিত সকলের চেয়ে বিদ্বান ইহার প্রমাণ পাইয়া সে গর্ব্ব বোধ করিল। উজ্জয়িনীকে কেহ বিব্রত করিতেছিল না,—নূতন পুতুল পাইয়া সকলে তাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাই সে নিরীহের মতো এককোণে বসিয়া বাদলের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইতেছিল।

বাদলকে প্রথম-দৃষ্টিতেই তার ভালো লাগিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে একবার বাদলকে কিম্বা তার প্রতিকৃতিকে দেখিতে চায় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে লজ্জায় মাথা নাড়িয়াছিল। তার মা গোড়া থেকেই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটা রায় বাহাদুরের ছেলে যে গোরু ছাড়া আর কিছু হইতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস করেন নাই, তাকে দেখিলেই কি তার জন্মদুর্ভাগ্য খণ্ডিয়া যাইবে? তার

বাবা জোর করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি জানি সে সুন্দর। সুন্দরকে যাচাই না করিলেও সে সুন্দরই থাকে।

উজ্জয়িনী বাদলকে দেখিয়া পিতার মতে মত মিলাইল। প্রত্যেক কুমারীই নিজের বলিয়া যে মানুষটিকে পায় তাকে প্রথম দেখাতেই পরম রূপবান ভাবিয়া থাকে। উজ্জয়িনী বাদলকে বাদল বলিয়া, কি স্বামী বলিয়া—কী বলিয়া রূপবান ভাবিল সে-ই জানে। নিরীহের মতো বাদলের দুর্দশা নিরীক্ষণ করিবার সময় বাদলের কিশোরতুল্য লাবণ্যময় মুখচ্ছবি মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতেছিল। যেন বহুবর্ষের ব্যবধানে মুছিয়া না যায়। একথা ভাবিতে তার কষ্ট হইতেছিল যে বাদল সপ্তাহকাল পরে সমুদ্র-পারে চলিয়া যাইবে,—তার চক্ষুর বিরহ কতকাল ঘুচিবে না।

১০

অবশেষে লিলি-ডলিরা স্থির করিল, বাদলকে উজ্জয়িনীকে পরস্পরের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া শুইতে যাইবে। "আসুন এইবার আপনাদের ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দিই—মিষ্টার সেন, মিসেস্ সেন।" এই বলিয়া তারা নিজেদের রসিকতায় নিজেরা হাসিয়া খুন হইল। তারপর একে একে গুড্‌নাইট্ করিয়া হাই তুলিতে তুলিতে চোখ মলিতে মলিতে বিদায় হইল।

কে আগে কথা কহিবে—বাদল, না উজ্জয়িনী? বহুকাল কাটিবার পর বাদল ভাবিল, ওটা পুরুষ মানুষেরই কর্ত্তব্য। পুরুষেই তো প্রপোজ্ করে। বলিল, "এক্স-কিউজ মি, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হ'চ্ছে কি?" উজ্জয়িনী বিষম ব্যগ্রতার সহিত উত্তর করিল, "না না, কিছুমাত্র না।"

"তবে আপনি ব'সে আছেন যে?"

"ঘুম পায়নি।"

কথা জমিল না। বলিবার মতো কিছু কোনো পক্ষই খুঁজিয়া পাইল না। ইতিমধ্যেই কখন এক সময় বাদল ঢুলিতে সুরু করিয়াছে। একবার সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই সে লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আই বেগ ইওর পার্ডন্।" উজ্জয়িনী নীচু গলায় বলিল, "হয় তো আমিই ব্যাঘাত দিচ্ছি।" বাদল সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া কহিল, "ইন্‌সম্‌নিয়ার রুগীকে আপনি ব্যাঘাত দেবেন কি ক'রে?"

উজ্জয়িনী এর উত্তরে বলিল, "অভয় দেন তো বলি, অনিদ্রার লক্ষণ দেখছিনে।"

উজ্জয়িনী তার চিঠির জবাব দেয় নাই বলিয়া তার উপর বাদলের রাগ ছিল। এই সুযোগে বলিল, "আমাকেও অভয় দেন তো জিজ্ঞাসা করি, আমার চিঠির জবাব দিলেন না কেন?"

উজ্জয়িনী আকাশ হইতে পড়িল। "কোন্ চিঠি?"

"জবাবের জন্য দেড়মাস অপেক্ষা ক'রেছি—পান্‌নি সে চিঠি?"

"সত্যি পাইনি আমি"—উজ্জয়িনী মিনতির সুরে বলিল।

বাদল সান্ত্বনার সুরে বলিল, "যাক্। খানকয়েক বই দিয়ে যাবো। চিঠির কাজ করবে।"

বৌ লইয়া বাদল পাট্‌না গেল না। কার কাছে যাইবে? বাবা তো কলিকাতার বাসায়। সেইখানে উঠিল।

রায় বাহাদুর প্রণতা পুত্রবধূকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কাছে বসাইয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি আগে দেখেছি, মা!—তখন তুমি এই এতটুকু। মনে হ'চ্ছে যেন সেদিনকার কথা। তোমার শাশুড়ী তোমার আমার কোল থেকে তোমাকে কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'যা বল্‌গে তোর মেমসাহেবকে, এ মেয়ে আমার। এতদিন পাল্‌তে দিয়েছিলুম তাঁকে, এখন ফিরিয়ে নিলুম।'" রায় বাহাদুর ক্ষণকাল আকাশে চাহিয়া, কাহাকে ধ্যান করিলেন। তারপর কহিলেন, "সেই তো ফিরে এলে, মা!—এসে দেখ্‌লে তিনিই ফেরার।" তিনি একলাই হাসিলেন।

"তা এসেছো যখন, আর যেয়োনা। এবার তোমার ঘর তোমার সংসার তোমার বুড়ো বাপ। মা গো,—তুমি যেয়ো না।"

উজ্জয়িনী কী বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে একথা সে কদাচ ভাবে নাই। বাদল আছে জানিত। কিন্তু বাদলের পিতাও আছেন এবং তাঁর

"দি মিরর অব ভিনাস"

শিল্পী—বার্ণ জোন্স্

আভাস দেখা যাইত। এক সময়ে সে ধর্ম্মযাজক ছিল; সেটার গুরুত্ব কম নহে। নৈশাকাশের মতো মানুষের হৃদয়েও তমসাবৃত অতলস্পর্শ প্রশান্তি বিরাজ করিতে পারে। তবে এমন কিছু চাই যাহাতে অন্তরের মধ্যেও নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকার জমিয়া উঠে। পৌরোহিত্য সিমুর্দ্দানের চিত্তে সে অন্ধকার আনয়ন করিয়াছিল। তামসী নিশায় আকাশ নক্ষত্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। সিমুর্দ্দানের ছায়াচ্ছন্ন হৃদয়েও সদ্‌গুণরাশি ঝল্‌মল্‌ করিত।

তাহার জীবনের ইতিহাস বিশেষ জটিল নহে। সে ছিল গ্রামের ধর্ম্মযাজক এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহশিক্ষক। পরে উত্তরাধিকারসূত্রে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সে ওসব ছাড়িয়া দেয়।

লোকটা বিষম একরোখা। কোনো একটা মতলব ঠাওরাইয়া শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া তাহার স্বভাব নহে। সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় তাহার দখল ছিল। তদ্ব্যতীত অপরাপর ভাষাও তাহার অল্প-বিস্তর জানা ছিল। অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্ব্বহ ভারবহনে তাহার একমাত্র সহায় ছিল অবিরাম অধ্যয়ন। মনোবৃত্তি এরূপভাবে নিরুদ্ধ ও নিষ্পেষিত হইলে জীবন বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

প্রবল আত্মাদর, উন্নত মনোভাব, কিংবা যে জন্যই হউক সে তাহার সংকল্প ঠিক রাখিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাসকে বজায় রাখিতে পারে নাই। বিজ্ঞান বিশ্বাসকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, ধর্ম্মমত তাহার ভিতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া সিমুর্দ্দান্ দেখিল তাহার আত্মা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পৌরোহিত্যের শপথ এখন আর নাকচ করা সম্ভব নহে। তবু নিজের জীবনকে সে নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা পাইল। পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সমগ্র দেশকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল এবং তাহার পত্নীপ্রেমবঞ্চিত শুষ্ক হৃদয় সার্ব্বজনীন উদার প্রেমের স্নিগ্ধ ধারায় নিজেকে অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। এইরূপ বিশাল উদারতার মধ্যে কিন্তু কোথাও না কোথাও শূন্যতা রহিয়া যায়।

তাহার কৃষক পিতামাতার অভিপ্রায় ছিল, পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া সন্তানকে তাহারা সাধারণজনগণের ঊর্দ্ধে উন্নমিত করিবে। কিন্তু সিমুর্দ্দান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই জনসাধারণের মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। জগতের দুঃখে তাহার হৃদয় অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠত। পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালেই সিমুর্দ্দান্ নিজেকে অস্পষ্টভাবে সাধারণতন্ত্রী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু সাধারণতন্ত্র তখন কোথায়? প্লেটোর এবং ড্রেকোর কাল্পনিক সাধারণতন্ত্রের কথাই হয়তো তখন তাহার মনে জাগিত।

ভালবাসার অধিকার না পাইয়া সিমুর্দ্দানের হৃদয় বিদ্বেষেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রকার মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ, রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ, বর্ত্তমানের প্রতি বিদ্বেষ, এবং ভীষণ-সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন—এই ছিল তাহার মনের খোরাক। তাহার মতে মানবের শোচনীয় দুর্দ্দশার অবসান করিতে হইলে এমন একজন যুগাবতার চাই যিনি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবেন এবং অন্যায়ের নাগপাশ হইতে সমাজকে মুক্তি দিবেন। সে মনে মনে সেই অনাগত রুদ্রদেবতার পূজা করিত এবং তাঁহার ভৈরব আবির্ভাবের প্রত্যাশা করিত।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সেই রুদ্রদেবতা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে ফরাসী ভূমি সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সিমুর্দ্দান্ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। মানবজাতির পুনরুজ্জীবনের এই বিপুল চেষ্টায় সে যুক্তির দিক দিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়াই, অর্থাৎ সমস্ত কঠোরতার জন্য প্রস্তুত হইয়াই যোগ দিল। যুক্তিশাস্ত্রে কোমলতার স্থান নাই। '৮৯ সালে ব্যাষ্টিল দুর্গের পতন এবং তৎসহ লোকের কঠোর দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়নের অবসান; '৯০ সালের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে আভিজাত্যের মূলোচ্ছেদ; '৯১ সালে ভ্যারসিলিসে রাজতন্ত্রের বিনাশ; এবং '৯২ সালে সাধারণতন্ত্রের জন্ম—এই বৈপ্লবিক বর্ষচতুষ্টয়ের ভিতর দিয়া সিমুর্দ্দান চলিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের মহানিঃশ্বাসের আঘাত নিজের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবকে ক্রমে ক্রমে আকার পরিগ্রহ

করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে সে দেখিল। কিন্তু এই দৈত্য-দর্শনে ভয় পাইবার লোক সে নয়। বরং সর্ব্বদিকে সর্ব্ববিষয়ে নবজাগরণের এই চাঞ্চল্য তাহার পঞ্চাশৎ বর্ষের জরাগ্রস্ত এবং পৌরোহিত্যজীর্ণ জীবনকেও যেন তারুণ্য প্রদান করিল। দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে ঘটনাপুঞ্জকে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে আত্মপ্রসার অনুভব করিল। প্রথমে তাহার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে রাষ্ট্রবিপ্লব বুঝি বা ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে যখন দেখিল যুক্তি এবং ন্যায় ইহার পক্ষে, তখন ইহার সাফল্য সম্বন্ধে তাহার আর বিন্দুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। ভীরু জনগণের ভয় যতই বাড়িয়া চলিল, সিমুর্দ্দানের বিশ্বাস ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। সে চায়, এই বিপ্লব-দেবতার দিব্যদৃষ্টি আবশ্যক হইলে যেন নরকাগ্নিও বর্ষণ করিতে পারে এবং বিভীষিকার প্রতিদানে বিভীষিকা ছড়াইতে পারে।

এইরূপে সে '৯৩ সালে উপনীত হইল। '৯৩ সাল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপের এবং প্যারিসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সমরাভিযান। আর রাষ্ট্রবিপ্লবটা ইউরোপের উপর ফ্রান্সের এবং ফ্রান্সের উপর প্যারিসের বিজয়-লাভ। এই জন্যই শতাব্দীর অন্যান্য বর্ষ হইতে এই ভীষণাব্দ '৯৩র এতদূর পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইউরোপ কর্ত্তৃক ফ্রান্স্ আক্রান্ত, আর ফ্রান্স্ কর্ত্তৃক প্যারিস্ আক্রান্ত!—এর চেয়ে অধিকতর মর্ম্মান্তিক আর কিছু হইতে পারে কি? বিষয়গৌরবে একটা নাটক যেন প্রায় মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। '৯১ সাল সংহত শক্তির বিকাশে, ঝটিকার প্রচণ্ড ক্রোধ ও ভীমসৌন্দর্য্যে মহিমান্বিত। ইহার মধ্যে সিমুর্দ্দান্ বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। ঝড়ো হাওয়ার এই ভয়ঙ্কর অথচ চমৎকার ভ্রষ্টকেন্দ্র তাহার আত্মা লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মতো পক্ষ বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু শকুনের মতো এই লোকটি বিপ্লবঝটিকায়, সমাহিতঅন্তরে বিপদটাকে বেশ উপভোগ করিতে লাগিল। কোনো কোনো উদ্দাম অথচ শান্ত-প্রকৃতির পাখী যেন প্রবল বাত্যার সঙ্গে যুঝিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—ইহারা যেন ঝড়েরই আত্মা; এরূপ প্রকৃতির মানুষও আছে।

দয়া মায়া মমতা সে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার যাহা কিছু করুণা, সে কেবল নিতান্ত হতভাগাদের জন্যই সঞ্চিত ছিল। যে সকল দুঃখ-ক্লেশ আতঙ্কজনক, সিমুর্দ্দান তাহারই শুশ্রূষায় নিজেকে নিয়োগ করিত। তাহার নিকট ঘৃণনীয় কিছুই ছিল না। যাহা ঘৃণ্য, যাহা কুৎসিত, যাহা বীভৎস, তাহার সেবায় সিমুর্দ্দানের তৎপরতা বাস্তবিকই স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত। সে খুঁজিয়া বেড়াইত কাহার বিষফোঁড়া হইয়াছে, যেন সেই ক্ষতমুখে সে চুম্বন করিতে পারে। সেই সকল মহৎকার্য্য—যাহার বহিরবয়ব অত্যন্ত কুশ্রী এবং যাহাতে দুরপনেয় ঘৃণার উদ্রেক করে—সম্পাদন করা বড়ই কঠিন। সিমুর্দ্দানের কিন্তু ঐরূপ কার্য্যেই অতিমাত্রায় আগ্রহ ছিল। তাহার চরিত্রের এই ছিল বিশেষত্ব। একদিন হোটেল ডিউতে একটা লোকের গলদেশে বিস্ফোটক হইয়া প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়—ভয়ঙ্কর ফোড়া, পুঁজে পূর্ণ, পচিয়া উঠিয়াছে; লোকটার দম আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। খুব সম্ভব এই ফোড়ার বিষ সংক্রামক। সিমুর্দ্দান্ সেখানে ছিল। ক্ষতমুখে ওষ্ঠপুট স্থাপন করিয়া সে সমস্ত পুঁজ চুষিয়া লইল। এক একবার পুঁজে মুখ ভর্ত্তি হইয়া যায় আর সে থুৎকার করিয়া ফেলিয়া দেয়। লোকটা সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সিমুর্দ্দানের গায় তখনো পাদ্রীর পোষাক ছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া কে একজন বলিয়া উঠিল, "রাজার জন্য যদি আপনি এরূপ কাজ কর্ত্তেন, তাহ'লে আপনাকে বিশপ ক'রে দিত।" সিমুর্দ্দান্ উত্তর দিল, "রাজার জন্য এরূপ কাজ আমি কখনই করতাম না।" এই কার্য্যে এবং এরূপ উত্তরে প্যারিসের সে অঞ্চলে তাহার প্রতিপত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

সিমুর্দ্দান এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, আর্ত্ত, ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ জনতাকে লইয়া সে যাহা খুসী করিতে পারিত। তৎকালে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের উপর লোকের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেক সময় ভুলে অনেক অসঙ্গত ব্যাপার ঘটিয়া যাইত। একদিন সিমুর্দ্দানের একটিমাত্র কথায় একটা সাবান-বোঝাই নৌকার লুণ্ঠন নিবারিত হয় এবং উত্তেজিত জনতা মুহূর্ত্তমধ্যে শান্ত হইয়া চলিয়া যায়।

১০ই আগষ্টের দুইদিন পরে তাহারই নেতৃত্বে জনগণ রাজপ্রতিমূর্ত্তি সকল ভূপাতিত করে। এই ব্যাপারে অনেক লোক প্রাণও হারায়। ভেণ্ডোম প্রাসাদে এক রমণী চতুর্দ্দশ লুইর প্রতিমূর্ত্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছিল, মূর্ত্তিটা সেই রমণীর উপরেই পড়িয়া যায় এবং তাহাতে নিষ্পেষিত হইয়া উহার প্রাণ বিয়োগ হয়। এই প্রতিমূর্ত্তি শতবর্ষ ধরিয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল—১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট উহার প্রতিষ্ঠা; আর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট উহার পতন। এই মূর্ত্তি-ভাঙা দলকে "বদ্‌মাস্" বলায় উহারা গুইন্ পারলট্ নামে একটা লোককে পঞ্চদশ লুইর প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠের নিকটে হত্যা করে এবং মূর্ত্তিটি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে; পরে উহা গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কেবল ডানহাতটা এই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সিমুর্ড্যানের অনুরোধে জনগণের একদল প্রতিনিধি হস্তটি লইয়া ল্যাটুড্‌কে উপহার দেয়। এই লোকটা ৩৭ বৎসর ধরিয়া ব্যাষ্টিলের ভীমদুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। রাজার হুকুমে শৃঙ্খলিতপদে সে যখন ব্যাষ্টিলের কারাকক্ষে জীবন্ত সমাহিত হইয়া পচিতেছিল, আর সেই রাজার প্রতিমূর্ত্তি গর্ব্বিতদৃষ্টিতে প্যারিসের দিকে চাহিয়া স্পর্দ্ধিতভঙ্গীতে দণ্ডায়মান ছিল, তখন কে বলিতে পারিত—এমন দিন আসিবে যখন এই ভীষণ দুর্গের পতন হইবে এবং রাজতন্ত্র সমাধি হইতে নিষ্ক্রান্ত ল্যাটুডের স্থলবর্ত্তী হইবে। কে জানিত, যে হস্ত বন্দীর কারাদণ্ডের আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল একদিন উক্ত হস্তের ব্রোঞ্জ্ প্রতিরূপের মালিক হইবে সেই বন্দীই, এবং সেই পার্থিব রাজার একমাত্র অবশেষ থাকিবে তাহার ধাতুময় হস্ত!

কেহ কেহ অন্তরের অনুচ্চারিত বাণী শুনিতে পায় এবং ঐ বাণীকে প্রত্যাদেশ বলিয়া গ্রহণ করে। সিমুর্ড্যান্ সেই প্রকৃতির লোক। এই সকল লোককে আপাতদৃষ্টিতে অন্যমনস্ক, পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের মন সর্ব্বদাই সজাগ—সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করে।

সিমুর্ড্যান্ একাধারে পণ্ডিত ও মূর্খ। দর্শন-বিজ্ঞানে তাহার অধিকার ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবজীবন সম্বন্ধে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাহার প্রকৃতির কঠোর নির্ম্মমতার মূল এইখানে। তাহার চোখ যেন বাঁধা ছিল। ধনুকনিক্ষিপ্ত তীর যেমন আপনার লক্ষ্যস্থল দেখিতে না পাইয়াও বরাবর সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, সিমুর্ড্যানের কার্য্যকলাপেও সেইরূপ একটা অন্ধ নিশ্চিতত্তা, একটা অব্যর্থ সন্ধান লক্ষিত হইত। রাষ্ট্রবিপ্লবে সরলরেখার মতো মারাত্মক আর কিছুই নাই। সিমুর্ড্যান্ স্বীয় লক্ষ্যের দিকে সরলরেখায় অগ্রসর হইত—অবিচলিত, অসন্দিগ্ধ, সাংঘাতিক গতিতে। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সামাজিক পুনর্গঠনে পরিবর্ত্তন যতই বেশী হইবে, তাহার ভিত্তি ততই দৃঢ় হইবে। যাহারা বিচারবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রানুসরণ করে, তাহাদের এইরূপ ভুলই হয়। সিমুর্ড্যান্ কন্‌ভেনসন্‌কে ছাড়াইয়া, কমিউনকে ছাড়াইয়া আরও দূরে অগ্রসর হইল।

সে ছিল "ইভিকে" সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়কে একমত-বিশিষ্ট লোকের সংহত-সমাজ না বলিয়া বহুবিধ-জনগণের জটিল সম্মিলন বলাই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত হইবে। ইভিকের এই অদ্ভুত মিশ্রিতজনতার মধ্যে প্যারিসের, তথা সর্ব্বজাতির বিশেষত্ব যুগপৎ লক্ষিত হইত। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই—প্যারিসেই যাবতীয় জাতির হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাকৃতজনগণের অগ্নি-কেন্দ্র ছিল ইভিকেতে। ইহার সহিত তুলনায় কনভেন্‌সন্ শীতল, কমিউন্ ঈষদুষ্ণ মাত্র। ইভিকে এমন একটা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান—যাহা আগ্নেয় গিরির সহিত উপমিত হইতে পারে—তাহাতে অজ্ঞতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, সাধুতা, বীরত্ব, বিদ্বেষ, গোয়েন্দাগিরি—সবই ছিল। প্রাচীন স্পার্টানদের মতো অকুতোভয় বীর এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উপযুক্ত লোক—এই উভয়ই ইহার মধ্যে দেখা যাইত। কন্‌ভেন্‌সনের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট্ ইস্‌নার্ড একদিন বক্তৃতা করেন—"প্যারিসের অধিবাসীগণ, তোমরা সতর্ক হও! তোমাদের এই মহানগরীর একটি ইষ্টক কি প্রস্তরখণ্ডও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। এমনদিন আসিতেছে যখন প্যারিস্ কোথায় ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে!"

এই বক্তৃতাতে "ইভিকে"-সম্প্রদায়গঠিত হয়। কতক-কতক লোক—তাহারা সকল জাতিরই, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—অনুভব করিল যে এখন প্যারিসের মঙ্গলার্থ দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সিমুর্দ্দা‌ন্ এই ক্লাবে যোগ দিল।

সরলমতি সিমুর্দ্দা‌ন্ বাস্তবিকই বিশ্বাস করিত যে সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো কার্য্যই অন্যায় নহে। এরূপ বিশ্বাস তাহাকে চরমপন্থীদের নেতৃত্ব করার উপযুক্ততা প্রদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক দুর্দ্দান্ত লোক ছিল। সিমুর্দ্দা‌নের স্বভাবসিদ্ধ সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় ইহাদের আসন্ন পতন নিবারিত হইত। দুষ্টেরা বুঝিত যে সে সাধু,—তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। পাপ পুণ্যের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে চায়। সিমুর্দ্দা‌নের অনুবর্ত্তীদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র এবং দাঙ্গাবাজ হইলেও সৎ ছিল। তাহার উপর তাহাদের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। নিজের উপর সিমুর্দ্দা‌নেরও বিশ্বাস ছিল অগাধ। নিজের কখনো ভ্রম হইতে পারে এরূপ ধারণা তাহার ছিল না। তাহাকে কেহ কখনো কাঁদিতে দেখে নাই। সে ছিল ন্যায়ের অমোঘ বিধানেরই মতো অনমনীয় ও অধৃষ্য—তাহার সাক্ষাতে সকল কোমলতা জমিয়া কঠিন হইয়া যাইত।

রাষ্ট্রবিপ্লবে একজন পুরোহিতের পক্ষে অর্দ্ধপথে থামিবার যো নাই। হয় খুব মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া, নয় খুব নীচ মতলবে সে এরূপ ঘটনাস্রোতের উদ্দাম প্রবাহে আত্মসমর্পণ করে। তাহাকে হয় অত্যন্ত ঘৃণিতজীব, নয় ত অতি উদারচরিত্র হইতে হইবে। সিমুর্দ্দা‌ন্ ছিল উদার। কিন্তু মহত্ত্বের এমন সুউচ্চশিখরে সে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সাধারণের পক্ষে সে অধিগম্য ছিল না। তাহার কঠোর অসামাজিক জীবনের অটল মহিমা দূর হইতে ভীতির উদ্রেক করিত। উন্নত গিরিশৃঙ্গের এরূপ ভীষণ গাম্ভীর্য্য দৃষ্ট হয়।

দেখিতে সিমুর্দ্দা‌ন্ সাধারণ-লোকের মতোই ছিল। সাদাসিধে পোষাক, দরিদ্রের চালচলন। বাল্যকালে তাহার মাথা নেড়া ছিল; বৃদ্ধবয়সে তাহাতে টাক পড়িয়াছে। অবশিষ্ট দুই-চার গাছ কেশ বার্দ্ধক্যের চূণকামে শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে। ললাটদেশ প্রশস্ত—সূক্ষ্মদর্শী তাহাতে তাহার চরিত্রের ছাপ দেখিতে পাইবেন। তাহার চক্ষু স্বচ্ছ, দৃষ্টি গভীর,—স্বর গম্ভীর ও আবেগপূর্ণ, উচ্চারণ দ্রুত, কথাবার্ত্তা প্রভুত্বব্যঞ্জক। মুখে বিরক্তি ও বিষাদের চিহ্ন, এবং সমগ্র বদনমণ্ডলে এক অবর্ণনীয় ঘৃণার ভাব প্রকটিত।

সিমুর্দ্দা‌ন্ ছিল এ-হেন ব্যক্তি। আজ তাহার নাম কেহ জানে না। ইতিহাসে এমন অপ্রসিদ্ধনামা শক্তিমান পুরুষের অসদ্ভাব নাই।

৩

পাষাণে উৎস

এমন লোককে ঠিক মানুষ বলা যায় কি? মানবজাতির এই সেবকটি মায়া-মমতা বলিয়া কিছু জানিত কি? এই মনোময় পুরুষের হৃদয় থাকা কি সম্ভব? যে উদার আলিঙ্গনের বিস্তৃত প্রসারের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব স্থান পাইত, তাহা সংকীর্ণ হইয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষকে জড়াইয়া ধরিতে পারিত কি? এককথায়, সিমুর্দ্দা‌ন্ ভালবাসিতে পারিত কি? আমরা বলি—হ্যাঁ, পারিত।

যৌবনকালে তিনি যখন এক রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক ছিলেন, তখন সেই বংশের দুলাল ও উত্তরাধিকারী—তাহার ছাত্রটিকে তিনি ভালবাসিতেন। একটি শিশুকে ভালবাসা এতই সহজ। তাহার সমস্ত দোষ, অপরাধই ক্ষমা করা যায়। ছেলেটি যদি অভিজাত, প্রিন্স্ কিংবা রাজাই হয়—তবুও তাহাকে মার্জ্জনা করা কঠিন নহে। তরুণবয়সের অপাপবিদ্ধতা তাহার জাতিগত অপরাধকে ভুলাইয়া দেয়। এমন দুর্ব্বল, নিরীহ প্রাণীটিকে দেখিয়া তাহার পদমর্য্যাদার আতিশয্যকে উপেক্ষা না করিয়া পারা যায় না। সে এতই ছোট্ট যে, তাহার বড়লোকের ঘরে জন্মানোটা মাপ করা চলে। ক্রীতদাসও তাহার শিশু-প্রভুপুত্রকে মার্জ্জনা করে। বৃদ্ধ কাফ্রী ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গী-শিশুকে বড়ই ভালবাসে, যত্ন করে। সিমুর্দ্দা‌নও তাহার ছাত্রের প্রতি অতি প্রবল স্নেহাকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। তাহার সমস্ত ভালবাসিবার ক্ষমতা যেন এই বালকটির নিকটে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, শিক্ষক—সকলের স্নেহ দিয়া সে ছেলেটিকে ভালবাসিত। এই শিশুটি তাহার শারীর-পুত্র না হইলেও তাহার মানস-পুত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি

পিতা নহেন, কিন্তু শিক্ষক ; এবং ছেলেটি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার সর্ব্বোত্তম ফল। এই ছোট্ট অভিজাতবংশীয় শিশুকে তিনি মানুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন। কে জানে,—হয়তো মহাপুরুষ করিয়াই গড়িয়াছিলেন। লোকে কতই না স্বপ্ন দেখে! নিজের যত মহদ্ভাব সব দিয়া তিনি তাহার এই ভাইকাউণ্ট্ শিষ্যটিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন ; এবং আপনার অবিচল সত্যনিষ্ঠার উন্নত আদর্শ, উদার বিবেক ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সবল প্রেরণা তিনি তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই অভিজাতবংশীয়ের মস্তিষ্কে তিনি জনসাধারণের আত্মা প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

স্তন্যের সহিত জ্ঞানের তুলনা হইতে পারে। ধাত্রী যেমন স্তন্যদান করে, শিক্ষক তেমনি জ্ঞানদান করে। শিশুর উপর ধাত্রীর প্রভাব কখনো কখনো মাতার প্রভাব হইতেও প্রবলতর হয়। তেমনি অনেক সময় ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব পিতার প্রভাবকে ছাড়াইয়া যায়।

এই সুগভীর আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব সিমুর্দ্যান্‌কে তাহার শিষ্যের সহিত নিবিড়বন্ধনে বাঁধিয়াছিল। তাহাকে দর্শন মাত্র সিমুর্দ্যানের অন্তরে স্নেহধারা বিগলিত হইত।

আর একটু বলা আবশ্যক, বালকটি ছিল পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। সুতরাং তাহার পিতার স্থান অধিকার করা কঠিন হয় নাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক অন্ধ পিতামহী ও এক খুল্লপিতামহ ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতামহীর মৃত্যু হয়, আর খুল্লপিতামহ—তিনি একজন সম্ভ্রান্ত যোদ্ধপুরুষ—রাজদরবারে কর্ম্ম পাইয়া পুরাতন অন্ধকূপের মতন পৈত্রিক ভবন পরিত্যাগ করিয়া ভার্সেলে চলিয়া যান। নির্জ্জন দুর্গে বালকটি রহিল—একাকী। কাজেই শিক্ষক সর্ব্বতোভাবেই তাহার প্রভু হইয়া উঠিল।

সিমুর্দ্যান্ এই শিশুটিকে জন্মিতেও দেখিয়াছিল। অতি শৈশবে ছেলেটি একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এই জীবন-মরণের সমস্যার সময়ে সিমুর্দ্যান্ দিন রাত তাহার পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিত। চিকিৎসক সুধু ঔষধের ব্যবস্থা করেন ; নার্সই সেবাদ্বারা পীড়িতকে রক্ষা করে। সিমুর্দ্যান্‌ই শিশুকে বাঁচাইল। তাহার ছাত্র তাহার নিকট হইতে কেবল যে শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার স্বাস্থ্য এবং জীবনও ইহার নিকট হইতে পাইয়াছিল। যাহাদের সব আমাদের হইতে, আমরা তাহাদিগকে স্নেহের পুত্তলী করিয়া তুলি। সিমুর্দ্যান্ এই শিশুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত।

অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল। বালক ক্রমে যুবক হইল এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল সুতরাং সিমুর্দ্যান্ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। কি হৃদয়হীনতা এবং উদাসীনতার সহিতই না এইসব করুণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়! কি নির্ম্মমভাবে পরিবার হইতে শিক্ষক ও ধাত্রীকে বিদায় দেওয়া হয়—যে শিক্ষক তাহার আত্মাকে একটি শিশুতে রাখিয়া যায়, যে ধাত্রী তাহার হৃদয়ের রক্ত দান করিয়া যায়!

সিমুর্দ্যানের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে বড়লোকের জগত হইতে আবার নিম্নতর জগতে নামিয়া আসিল। আর লর্ড যুবক কোন সেনাদলের কাপ্তেন পদে নিযুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। সামান্য শিক্ষক আবার গির্জ্জার অখ্যাত মেঝেতে নিম্নশ্রেণীর পাদ্রীদের দলভুক্ত হইল। সিমুর্দ্যান্ আর তাহার শিষ্যকে দেখিতে পাইল না।

রাষ্ট্রবিপ্লব আসিল। ছেলেটিকে যে সে মানুষ করিয়াছিল এই স্মৃতি তাহার হৃদয়নিভৃতে লুক্কায়িত রহিল। বিপুল ঘটনাপুঞ্জের সংঘর্ষেও তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না।

পাথর কুঁদিয়া একটি মূর্ত্তি গঠন করা এবং তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা অতি সুন্দর! কিন্তু প্রতিভাকে সুমার্জ্জিত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং তাহাতে সত্যসঞ্চার করা আরো সুন্দর! গ্রীক্‌পুরাণে কথিত আছে—পিগমেলিয়ন্ স্বগঠিত প্রস্তরমূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। সিমুর্দ্যান্‌কে এই যুবকের আত্মার পিগ্‌মেলিয়ন বলা যাইতে পারে।

আত্মারও সন্ততি থাকিতে পারে। এই শিষ্য, এই বালক, এই অনাথ শিশু ছিল জগতের মধ্যে সিমুর্দ্যানের একমাত্র ভালবাসার জিনিষ।

কিন্তু এরূপ ভালবাসার প্রভাবেও এমন লোক কি কখনো কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে পারে?

দেখা যাইবে। (ক্রমশঃ)

মায়ের পেটের ভাই

শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশন।—আশপাশের গোটা-দশেক গ্রামের অন্তঃকরণ তাহারই চতুর্দ্দিকে স্পন্দিত হয়। এইখান দিয়া বাহিরের পৃথিবীর সহিত এতটুকুখানি যোগ আছে,—ইহাকে বাদ দিলে গ্রামগুলো একলম্ফে বহু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া একেবারে সেই আদিমযুগে গিয়া উপস্থিত হইবে। এই ষ্টেশনের ভিতর দিয়া ইহাদের কত প্রিয়জন আসিয়াছে, গিয়াছে,—ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। যাহারা আসিল, যাহারা গেল, তাহাদিগের সকলের সন্ধান ইহারই কাছাকাছি কোথাও যেন পাওয়া যাইবে;—হয়ত কোনও বৃক্ষকাণ্ডে ছুরি দিয়া নিজেদের নাম লিখিয়া গেছে, হয়ত ষ্টেশনের টিনের ঘরের দেওয়ালের গায়ে নিজেদের কোনও পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছে,—গ্রামগুলোর অন্তঃকরণ সেইটুকুকেই ঘেরিয়া থাকে,—এই ষ্টেশনকে তাই আজ ইহাদের জীবন হইতে বাদ দেওয়া যায় না।

কিন্তু ষ্টেশনের প্রতি প্রভুর বড় অনুগ্রহ-দৃষ্টি নাই।—একখানি গাড়ী যায়, একখানি গাড়ী আসে, ইহাই সমস্ত-দিনের ব্যাপার। অন্য সবগুলোই তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না, পাশ দিয়া যাইবার সময়ে আরও দ্রুতবেগে যায় বলিয়া মনে হয়। এবং যেখানি এখানে আসে, তাহা উন্নত-সংস্করণ গরুর গাড়ীর গতিতে উপস্থিত হইলেও যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত,—এক মিনিটের মধ্যে সরিয়া পড়িতে পারিলেই যেন স্বস্তি পায়, যেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত-কণ্ঠে বলে, 'তোমার মতন অকিঞ্চনের গৃহে আসিয়াছি, আমার আত্মীয়-স্বজন দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইবে!'···কিন্তু তবুও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাছাকাছি কতকগুলো ক্রোশের মধ্যবর্ত্তী লোকগুলোর বৃদ্ধ বয়সের প্রথম পুত্রের ন্যায় আদর এবং অনুরাগের সীমা নাই।

বারোটা তেইশ-মিনিটের গাড়ী হইতে সেদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা নামিলেন,—সঙ্গে মোটমাট বেশী ছিল না; সেইগুলোকে সাম্‌লাইয়া লইয়া পিছনে পিছনে একটি যুবক অবতরণ করিল।

স্ত্রীলোকটি কহিলেন, "গোবিন্দকে আমি চিঠি লিখেছি, সে নিশ্চয়ই গাড়ী নিয়ে এসেছে,—তোকে কিছু ভাব্‌তে হবে না যতীশ।"

ষ্টেশন মানে একটি টিনের ঘর। সম্মুখে রেলের লাইনের উপর দিয়া গাড়ীগুলো ছুটাছুটি করে,—প্লাটফর্ম্মের কোন বালাই নাই। মাটির উপরে নামিয়া, একটি অ-দ্বিতীয় ষ্টেশন-মাষ্টারের হাতে টিকিটখানি দিয়া, গ্রামের লোকের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা চলে।

টিনের ঘরের পিছন দিয়া তারের বেড়া—চোখ মেলিয়া চাহিলে তাহার পরে গ্রামের রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিচিত লোকে বলে, 'ওই পাঁচভূতের মাঠ ছাড়িয়ে যেতে হবে—বোসেদের পুকুরপার ডানদিকে রেখে, তর্করত্ন মশাই-য়ের বার্‌ বাড়ীর উঠানের ভিতর দিয়ে, গোঁসাই বাড়ীর উত্তরের ঘরের পাশ দিয়ে চ'লে "যাও—" চারিদিকে তাকাইয়া যতীশ কহিল, "কই, তোমার গোবিন্দর গাড়ী ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

যতীশের কণ্ঠস্বরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই,—রেলগাড়ী-ভ্রমণ যে তাহার প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ করে নাই, তাহার কথায় তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল।

স্ত্রীলোকটি কহিলেন, "তুই ভাবিস্‌নে যতীশ, গোবিন্দ তেমন ছেলে নয়, সে আমার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আস্‌বে।—অনেকটা রাস্তা, সব সময় ঠিক টাইম ধ'রে কি পৌছান যায়! ইষ্টিশানে ব'সে না হয় একটু জিরো বাছা,—অতটা অধীর হ'সনে।"

টিনের ঘরের ছায়ায় বসিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কয়েকবার তারের বেড়ার নিকটে আসিয়া

নিজের ক্ষীণদৃষ্টি তুলিয়া সম্মুখের রাস্তাটা পর্যবেক্ষণ করিলেন; একটা অত্যন্ত মোটা কাচের চশমায় চোখ-দুইটা ঢাকা ছিল,—সেইটাকে ঘন ঘন চোখ হইতে খুলিয়া লইয়া, কাপড়ের আঁচল দিয়া তাহার কাচ দুইটা সজোরে মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু ধূলিলেশহীন চশমার ভিতর দিয়াও গোবিন্দ অথবা তাহার গরুর গাড়ীর সত্যকার কোন উদ্দেশ্য মিলিল না। অথচ, কয়েক মিনিট পরে-পরেই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন দূরে কোন গাড়ী আসিতেছে—কোন লোক আসিতেছে। সে যে গোবিন্দ ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না, ওই গাড়ী যে গোবিন্দর গাড়ী ব্যতীত আর কাহারও নহে, এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে প্রতিবারই কোন সন্দেহ রহিল না। যতীশকে ডাকিয়া একবার কহিলেন, "দেখ্ ত যতীশ, গোবিন্দর গাড়ী আস্‌ছে কি না,—"

তাহার কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "ওই যে গোবিন্দ আস্‌ছে,—দেখে যা দিকিনি যতীশ,—বাবা, তোকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমার যেন হাড়ির হাল হ'ল—গোবিন্দ সে ছেলেই নয়, তার দিদির চিঠি পেলে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে তেমন পাত্তর্ সে নয়—"

যতীশ উঠিয়া আসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া কহিল, কোথায় তোমার গোবিন্দ?—আস্‌ছে সে তোমার জন্যে,—তার ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—"

মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধা প্রতিবারই কহিতে লাগিলেন, "তুই ব্যস্ত হ'সনে বাছা, সে নিশ্চয়ই আস্‌বে,—অনেকখানি রাস্তা—"

কয়েকবারের পরে যতীশ আর তাঁহার ডাকে সাড়া দেওয়াও প্রয়োজন বলিয়া মনে করিল না,—টিনের ঘরের ছায়ায় অচল অবস্থায় বসিয়া রহিল। বৃদ্ধা অস্থিরচিত্তে এধার-ওধার করিতে লাগিলেন;—একবার অ-দ্বিতীয় ষ্টেশন-মাষ্টারটিকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, গোবিন্দর বাড়ীর কোনও খবর আপনি দিতে পারেন?—গোবিন্দ ভট্‌চায,—আপনি তাকে চেনেন ত?—তার শরীর ভাল আছে?—তার বউ?—তার ছেলেপুলে?—সব ভাল আছে?"

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন, আজ সকালেও গোবিন্দ ভট্‌চায তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া এক পয়সার জিরামরিচ বিক্রয় করিয়া গিয়াছে,—সে তাহার বাসায় সকলের সহিত কুশলেই আছে।

ষ্টেশনের ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল।—যতীশ অসন্তুষ্টভাবে কহিল, "তোমাকে এখানে পৌঁছে দেবার কথা আমার ছিল, তা ত দিয়েছি,—এখন তুমি যেমন ক'রে পারো তোমার ভাইয়ের বাড়ীতে যেয়ো,—আমি পাঁচটার ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি।

বৃদ্ধা কহিলেন, "রাগ করিস্‌নে যতীশ, গোবিন্দ আমাদের তেমন ছেলে নয়, সে অবিশ্যি আস্‌বে,—অনেকখানি রাস্তা—"

কিন্তু পাঁচটা বাজিয়া গেল, যতীশের ফিরিবার ট্রেনটাও একবার শুধু চোখের দেখা দিয়াই সরিয়া পড়িল, তথাপি গোবিন্দ আসিল না। বাক্স এবং বিছানাটা তুলিয়া লইয়া তাক্তকণ্ঠে যতীশ বলিল, "কাকার কাছে যখন স্বীকার করেছি যে তোমাকে পৌঁছে দেব, তখনই জানি কপালে আমার দুর্ভোগ্য আছে। চল, হেঁটেই যাওয়া যাক্,—এ দুঃখটুকুই বা কেন আর বাকী থাকে?"

কুণ্ঠিতস্বরে বৃদ্ধা কহিলেন, "তাই চল্ না হয়,—রাস্তাতেই হয়ত গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হবে, সে তেমন ছেলে নয়।"

দুইজনে পদব্রজে রওনা হইলেন।—ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময়ে যতীশ ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, "গোবিন্দ ভট্‌চাযের বাড়ী এখান থেকে কতটা দূর হবে, বল্‌তে পারেন?"

"তা আপনার ক্রোশ-দু'য়েক হবে।"

অতি ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বৃদ্ধা কহিলেন, "অতটা বোধ হয় হবে না, বড় জোর ক্রোশখানেক হবে,—সেবার যখন এসেছিলাম তখন ত খুব বেশী পথ ব'লে মনে হয়নি—"

যতীশ তাঁহার কথায় কান না দিয়া, পুনরায় ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিক দিয়ে যাব, আমায় একটু ব'লে দেবেন?"

পথের সংবাদ জানিয়া লইয়া সে অগ্রসর হইল। মালপত্র

বেশী নাই; কিন্তু দুই ক্রোশ রাস্তা পুলকিতচিত্তে বহন করিয়া লইয়া যাইবার মতন অল্পও নয়।

মাইলখানেক রাস্তা প্রায় পৌনে-এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া যতীশ দেখিল যে, দক্ষিণদিক হইতে আর একটা পথ আসিয়া সিধা উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিয়াছিলেন উত্তরদিকের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে। বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, আরও তিন মাইল রাস্তা যদি তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলে যতীশের মালপত্রের বোঝার সহিত খুব সম্ভব বৃদ্ধার মৃতদেহটাও গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এবং সেখানে যে কি রাজসিক অভ্যর্থনা মিলিবে সেটা অনুমান করাও বিশেষ শক্ত বলিয়া যতীশের বোধ হইল না। সে সদয়ভাবে কহিল, একটু জিরিয়ে নাও খুড়ীমা, তারপরেই না হয় যাওয়া যাবে।"

কিন্তু সত্যসত্যই যে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ জাগিতেছিল। এই একমাইল রাস্তা আসিতে তাহার খুড়ীমাকে অন্ততঃপক্ষে পাঁচবার বসিতে হইয়াছে,—প্রতিবারই তিনি ঘোর আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া যতীশই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বিশ্রামগ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এইরূপভাবে অগ্রসর হইলে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যতীশ যে সমস্ত রাত্রির ভিতরেও গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পৌছাইতে পারিবে না, এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

যতীশের খুড়ীমা তারামণি কহিলেন, "আমার আর জিরোতে হবে না যতীশ,—এই ত এসে পড়েছি, এবার একটু পা চালিয়ে চল্।"—যতীশ চাহিয়া দেখিল তারামণির সুগৌর মুখ রৌদ্রের উত্তাপে কালো হইয়া উঠিয়াছে, চশমার পিছনে চোখ দুটো রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে,—অর্দ্ধেক কপাল জুড়িয়া সিঁদুর পরিয়াছিলেন,—অতিরিক্ত ঘামের জন্য কিছু পরে পরেই মুখ-মোছার ফলে, কপালের সিঁদুর এখন অঞ্চল আশ্রয় করিয়াছে, কতক কতক বা মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দূরে, যেন গরুর গাড়ীর শব্দের মতন কি একটা শোনা গেল—যতীশ কান পাতিয়া রহিল গাড়ীটা দক্ষিণদিকের রাস্তা হইতে উত্তরদিকেই যাইতেছিল, শীঘ্রই তাহাদের নিকট আসিয়া পৌছাইল।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। দ্বারে আসিয়া গাড়ী থামিতেই ভিতর হইতে গোবিন্দ কহিল,—"কে?"—পরক্ষণেই একটা লণ্ঠন-হাতে নিজেই বাহির হইয়া আসিল। লণ্ঠনের আলোটা উঁচু করিয়া ধরিতেই তারামণির মূর্ত্তি চোখে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল।

তারামণি কহিলেন, "হ্যাঁরে গোবিন্দ, কারও অসুখ-টসুখ করেনি ত রে?"

গোবিন্দ বলিল, "না—"

"তুই ভাল আছিস্? বউ ভাল আছে? ছেলেমেয়েগুলো সব ভাল আছে?"

নীরসকণ্ঠে গোবিন্দ কহিল, "হ্যাঁ, ভালই আছে সব—"

তারামণি বলিলেন, "কিন্তু কি ভীষণ রোগা হ'য়ে গিয়েছিস্ গোবিন্দ! আর গায়ের রঙ্-ও কত ময়লা হ'য়ে গিয়েছে,—খুব খাটিস্ বুঝি? সময়ে নাওয়া-খাওয়া হয় না নিশ্চয়ই?—"

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—কাহারও চেহারা পর্য্যন্ত না। কিন্তু তাহারই মধ্যে যতীশ গোবিন্দর মুখের ভাব যথাসম্ভব লক্ষ্য করিয়াছিল। সে হঠাৎ পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি তাহ'লে যাই খুড়ীমা—" বলিয়া নীচু হইয়া তারামণির পদধূলি গ্রহণ করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "এই রাত্তিরে এতটা পথ একা না গিয়ে, আজ্‌কের দিনটা থেকে গেলে হ'ত না যতীশ?"

গোবিন্দ কোন কথা কহিল না।

যতীশ ব্যস্তভাবে বলিল, "কিছু ভেবোনা খুড়ীমা, আমার কোন অসুবিধে হবে না। তুমি কিন্তু বাবাকে চিঠি লিখো।—আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি গোবিন্দবাবু! নমস্কার।" বলিয়া সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বস্তুতঃ, তারামণির উপরে প্রীত হইবার যতীশের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না। শ্বশুর-গৃহ সম্পর্কিত সকল ব্যক্তির প্রতিই তারামণির তাচ্ছিল্য ছিল অসাধারণ, এবং

জন্মলহরী এই মায়ার সমুদ্র হইতে উঠিতেছে ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু কখনো থামিতেছে না, থামিবে না। এক ঢেউ কাটিতেই অন্য ঢেউএর সজ্জা জাগিতেছে। সাংখ্যদর্শন এই অনন্ত পারম্পর্য্য অতি সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন—

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্ব্বীজাঙ্কুরবৎ ॥
৬-৬৭

এখানে দুইটি কথা আছে,—অক্ষর-পুরুষস্থিত দিব্য ইন্দ্রিয়ের উপর প্রকৃতির যে প্রভুত্ব, ইহার কারণ কি? কারণ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, যখনই পঞ্চতন্মাত্রের মিলন-সূচক কাম-উপভোগে দেব-মন উন্মুখ হইল তখনই প্রথম "কর্ম্ম" কৃত হইল—তখনই শ্রুতির সেই "তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য নশ্নন্ আন্যাঽভিচাকশী"—পিপ্পল ফল (forbidden fruit) খাওয়া হইয়া গেল এবং অক্ষর শুধু দেখিয়া গেলেন। দেব-মন তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া "কামাদিবৃত্তিমৎ" হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি কর্ম্ম হইতে জাত হইয়া প্রথম রূপ লাভ করিল। এখন হইতে প্রকৃতিই হইল কামনার আধার; তাই শঙ্কর "...কামকর্ম্মবীজভূতা" বলিয়া ইহাকে একদিকে যেমন অবিদ্যা শব্দে বিশেষিত করিলেন, তেমনি অন্যদিকে কামকর্ম্মেরও হেতু বলিয়া ইহাকে চিনাইলেন। এই কামকর্তৃত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া প্রকৃতি দেব-মনকে আপনার আধিপত্যে ছিনাইয়া লইল। জন্মজন্মান্তরে কামোপভোগ মানুষের যত বাড়িবে, প্রকৃতির স্বামিভাব ততই বাড়িয়া যাইবে, কারণ কাম-ভোগ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কাম-ভোগ দ্বারাই ইহার স্থিতি। তাই জীবকে ইহা কামপ্রেরণা দিতেছে। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই—বীজ হইতে অঙ্কুর, তৎপরে বৃক্ষ,পুনরায় বীজ; তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে কর্ম্ম, এইরূপে adinfinitum চলিল। বীজ না জানিলে বৃক্ষ-জীবন দুর্ব্বোধ্য হয়,—প্রকৃতি না জানিলে মানব-জীবন অস্পষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জাপানের পুরাতন শিল্প-কলা

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ

জাপানের যে শিল্প-কলা, সে তার একটা সাধনা—একটা প্রবল শক্তি। ইহাদের অন্তরের যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ, তাহা ইহাদের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহারা নিজের অন্তরের সকল বাসনাভোগকে সংযত করিয়া নিরাসক্ত অনাবিল হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের সহিত নিজের প্রকৃতিকে বাঁধিয়া দিয়াছে। জাপানে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি খুব বেশী; ইহাদের ঘরবাড়ীর সাজসজ্জা হইতে নিজের তুচ্ছতম ক্রিয়া-কলাপ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়—যা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই সৌন্দর্য্যঅনুভূতির মধ্যে জাপানীদের সৌখিনতা, ভোগ বা আসক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না,—কেননা এই নিরাসক্ত গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্য দিয়াই জাপানীরা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, বীর্য্য এবং কর্ম্মনৈপুণ্য লাভ করিয়াছে।

জাপানীদের চোখের ক্ষুধা প্রকৃতি এখনও মিটাইতে পারে নাই—তবুও প্রকৃতির নিকট হইতেই জাপানীরা দেখিবার শক্তি লাভ করিয়াছে এবং সেই শক্তির সাহায্যেই ইহারা শিল্প-কলা-জগতের এত মণিমুক্তা আহরণ করিয়া জগৎবাসীদের উপহার দিতে পারিয়াছে।

রূপরাজ্যের রাজা জাপানীদের ভাবকোমল মাধুর্য্যেপূর্ণ অন্তরে যখন চিত্রকলার গভীর অনুভূতি জাগে, তখন তাহাদের তুলির রেখায় এবং রংএ নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কৃত হয়। তজ্জন্য চিত্রকরের ছবির বিষয়ের সহিত মানসিক চিন্তা ও ধ্যানের বিশেষ পার্থক্য থাকে না। পাশ্চাত্যদেশীয় চিত্রকর তাহাদের চিত্রে সমস্ত বিষয় খুঁটিনাটি-ভাবে অঙ্কন করিতে চেষ্টা করে বলিয়া তাহা অত্যন্ত বাস্তব ও অবসাদজনক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জাপানী চিত্রকরের বিশেষ গুণ এই যে তাহারা চিত্রের মধ্যে ফুটাইয়া তোলে তাহাদের অন্তরের আশ্চর্য্য কল্পনা। পাশ্চাত্য চিত্রকর প্রকৃতির গাছপালা, নদী, গিরি হুবহু নকল করিতে চেষ্টা করে—তাহাতে অন্তরের জিনিষ থাকে খুবই কম। কিন্তু জাপানী চিত্রকর তাহাদের ছবিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কল্পনায় রঙীন করিয়া নূতন ভাবে ফুটাইয়া তোলে। এবং এইখানেই আলোকচিত্রের সহিত চিত্রের মস্ত প্রভেদ। এই কারণেই পাশ্চাত্যদেশীয়গণ জাপানী চিত্রকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে সমাদর করিতে পারে নাই। ইহা নিঃসন্দেহ যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই যে মনোভাবের পার্থক্য, ইহা উভয় দেশেরই দৃশ্যের ও architectureএর প্রণালীর বিভিন্নতা এবং উভয় দেশের মানবের অভ্যাস ও রীতিনীতির পরস্পর-বিরোধিতার জন্যই ঘটিয়াছে।

অনাড়ম্বরতা জাপানীদের প্রধান গুণ। যে সকল ছবি তাহারা আঁকে তাহাতে না থাকে বাহুল্য না থাকে সৌখিনতা। পূর্ব্বে জাপানের সভ্যতা অত্যন্ত ধীরে উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল এবং সমগ্রদেশ বৌদ্ধধর্ম্মকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল, জাপানের প্রকৃত আর্টের বিকাশলাভ ঘটিল তখনই। এই বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানীদের জীবনযাত্রাকে আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বাঁধিয়া তুলিতে পারিয়াছে। জাপানে অনেক শতাব্দী ধরিয়া অবিরত আন্দোলন চলিতেছিল; সমগ্র দেশে অবস্থিত বুদ্ধ-মন্দিরের পুরোহিতগণ শান্তি আনয়নের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। অবশেষে খ্যাতনামা 'হিদেহুসি' (Hideyoshi) জাপানে সম্পূর্ণরূপে শান্তি আনয়ন করিলেন। তখন নানাধরণের চিত্রকলা, যাহা এতদিন দেশের অরাজকতা ও আন্দোলনে চাপা পড়িয়া একেবারে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, পুনরায় তাহা

পুর্ণোদ্যমে উদ্বোধিত হইয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৎপরে ১৬০৩ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত 'তোকুগাওয়া'র (Tokugawa) যুগে সেই সকল চিত্রকলা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সেই সময় প্রত্যেক জেলার দাইমিয়স্ (daimyos)-গণ দলাদলি ও পরস্পর দ্বন্দ্ববিরোধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রকলার দিকে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিল।

কেরামিক্স্ (Keramics) আর্ট বা পটাঙ্কন

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল চাকচিক্যবিহীন সরল রেখার দ্বারা সুশোভিত বহু প্রাচীন মৃৎশিল্প মাটির স্তূপের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় সমাধিস্তূপ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সকল পটের অধিকাংশেই মনুষ্য ও পশুমূর্ত্তি অঙ্কিত। তৎপরে এই পটাঙ্কন বিষয়ে ১৩ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। সেই সময় 'তসিরো' (Toshiro) নামক জাপানের বিখ্যাত শিল্পী চীনদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একপ্রকার উজ্জ্বল glazeএ আবৃত বাদামী রংএর পাথরের পাত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেগুলি বিচিত্র দাগ যুক্ত, শক্ত এবং পুরু। তাঁহার নির্ম্মিত এই পাত্র পূরাকালে চা-চক্রে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। জাপানের এই চা-পান-অনুষ্ঠান জিনিষটা কি, তাহা জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওকাকুরার The Book of Tea পড়িলেই বুঝা যায়। এই অনুষ্ঠান জাপানীদের ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এবং ইহা জাপানীদের একটা জাতীয় সাধনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চা-পান-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতার সহিত সমাদর খুব বাড়িল, কিন্তু এই পাত্রের ব্যবহার সাধারণের চক্ষে অমার্জ্জিত ও অশোধিত বলিয়া পরিগণিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত 'হিদেয়সি' এই চা-চক্রের অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি জাপান-বাসীদের মধ্যে 'কেরামিক্স্' আর্টের মস্ত প্রেরণা আনিল।

সেই সময়ে 'রুকু' (Ruku) নামক একপ্রকার বিশিষ্ট পট ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'এ্যামেইয়া' (Ameya) নামক 'কিয়োটো'-নিবাসী একজন শিল্পী খ্যাতনামা চিত্রকর রুকুর নিকট হইতে নক্সা লইয়া এই পাত্র নির্ম্মাণ করে বলিয়াই ইহা 'রুকু' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যথেষ্ট সমাদর ও লাভ করে। হস্তদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই পাত্র অত্যন্ত অসমান ও অমসৃণ ছিল, এবং গঠন বা ছবির মধ্যে কোনপ্রকার চাকচিক্য বা আড়ম্বর ছিল না। তখন জাপানে যে-সব লোক চিত্রকলার মধ্যে কোনরূপ আনন্দ পাইত না, তাহাদের চক্ষে এই পাত্র অসমান ও অমার্জ্জিত বলিয়া কোনরূপ সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু যাঁহারা কলা-শিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন তাঁহাদের চক্ষে ইহার সৌন্দর্য্য ছিল অশেষ। এই সময়ে বিখ্যাত চিত্রকর কাকিয়েমনের (Kakiemon) নক্সানুযায়ী 'কারাট্সু' নামক একপ্রকার বিশেষ পট অতীব সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। এই অতিসাধারণ পাত্রটির মধ্যে চিত্রের বা রংএর কোনরূপ বাহুল্য বা আড়ম্বর ছিল না, উপরন্তু ছিল শৈল্পিক রুচিতে পূর্ণ। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স্ 'নাবোসমা' একটি কারখানা তৈয়ারি করিলেন। তিনি এই কারখানার সাহায্যে নানারকম আকৃতির সুন্দর সুন্দর পাত্র তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। নীল রংএ পালিশ-করা পাত্রগুলি স্বচ্ছ কাচের মত ঝক্‌ঝকে,— তারি উপরে আঁকা লাল রংএর ফুলের দলগুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। 'হিরাদো' নামক আরেকটি বিখ্যাত পাত্র তখন নির্ম্মিত হইয়াছিল। রঙীন পাত্রটির বুকে চিত্রকরের তুলির ছাপ নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনেকের চোখে এই পাত্রই ছিল সকলের সেরা। ১৭৫১ সালে 'মিকাওয়াচি'তে ইহার জন্ম এবং শত বৎসর ধরিয়া এই পাত্র জাপানের অন্যান্য পাত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া সমাদর লাভ করে।

'সাতসুমা' (Satsuma)

বিগত ৬০ বৎসর ধরিয়া জাপানের প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে, —মেয়ে,—বৃদ্ধ সকলের কাছেই এই পাত্র সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। 'সাত্সুমা'র সর্দ্দার প্রিন্স্ 'সিমাজু' 'য়োসিহিয়ো চোসা' খুব জাঁকজমকের সহিত প্রথম এই পাত্রের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। জাপানে এই পাত্র 'Satsuma Tangen' নামেই পরিচিত। কেননা জাপানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী

Tangenএর নানারূপ পাখী, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পুষ্পময় সরল নক্সার দ্বারা এই পাত্র সুশোভিত। চিত্রকর Tangenএর অন্তর ছিল রঙীন কল্পনায় ভরা, কিন্তু ছবির মধ্যে খুব বেশী রং-ফলানোর পক্ষপাতী তিনি মোটেই ছিলেন না। ফিকে লালের সহিত একটুখানি বাদামী রং ছিল তাঁর বড়ই প্রিয়। তাঁর সব ছবিই প্রায় এই রঙেতেই আঁকা। জাপানী কলা-শিল্পে Tangenএর দান যে অনেকখানি ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

ইহার পর ১৭৯৫ সালে এনামেলের তৈয়ারি একপ্রকার পাত্র তৈয়ারী হইল এবং বর্ত্তমানে উহাকে 'old satsuma' বলিয়াই সকলে জানে। ইহার আকার-প্রকার অনেকটা Tangenএর সাত্সুমার মত। এই পাত্র বেশ শক্ত এবং সুন্দর। বাহিরের ঝক্ঝকে আবরণ উজ্জ্বল—কিন্তু তাহার মধ্যেও কোমলতা রহিয়াছে। আট ইঞ্চি দীর্ঘ পাত্রটি অত্যন্ত সাদাসিধা রকমের তৈরি—অধিকাংশেরই গায়ে সামান্য রংএর নানারকম ফুলের ছবি আঁকা। এই 'old satsuma' খুবই সুন্দর কিন্তু অত্যধিক দুষ্প্রাপ্য। পরবর্ত্তী ১৮৬৮ সালে জাপানের বাণিজ্যলক্ষ্মী যখন দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—তখন তাহারা এই সব বিখ্যাত পাত্রের অনুকরণে নানাপ্রকারের পাত্র তৈয়ারি করিয়া ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে চালান দিত। এখন পাশ্চাত্য দেশে জাপানী পাত্রের ব্যবহার সৌখিন জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে; চায়ের মজলিসে কিম্বা ডিনার-টেবিলে জাপানী চিত্রে বিভূষিত বড় বড় পাত্র সকল দেখা যায়।

রঙীন প্রতিলিপি

জাপানের শিল্প-কলা শুধু একদিক দিয়াই উৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহার অন্যদিকও আছে। মৃৎ-শিল্পের দিক দিয়া জাপানীদের রুচি ও দক্ষতার কিছু পরিমাণে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আর্টের সহিত পরিচয়ের এখনও অনেক বাকি। রঙীন প্রতিলিপি দ্বারা তাহারা জগতের নিকট যে খ্যাতি ও যশ লাভ করিয়াছে তাহা কালের কোলেও অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে। ইহাও ঠিক যে বিশ্বের শিল্প-কলার ভাণ্ডারে জাপানীদের দান সকল দানের চেয়ে অনেক উচ্চে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প-কলার মধ্যে প্রাচ্য অনেক উন্নত। প্রাচ্য Asiatic Art বলিতে যত রকম আর্ট বুঝায় তন্মধ্যে জাপানী আর্ট অনেক শ্রেষ্ঠ। জাপান হাজার হাজার বৎসরের শিল্পসাধনার দ্বারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গুটিকতক কথায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তবুও ইহা বলা যাইতে পারে যে, জাপানী শিল্প-কলা ভারতীয় বা মোগল শিল্প-কলার চাইতে অনেক সূক্ষ্ম। জাপানীদের মত প্রাণঢালা সূক্ষ্ম ছবি আঁকিতে এখনও পৃথিবীর কোন জাতিই পারে নাই।

পাশ্চাত্য-দেশীয়রা জাপানী আর্টে প্রথম অনুভূতি লাভ করিয়াছিল—তাহাদের রঙীন প্রতিলিপি দেখিয়া। অনেক প্রতিলিপি যদিও চোখে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হইত, তবুও ছবির বিষয়নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি রেখা ও রং-ফলানোর মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য ও চিত্রকরের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণের কাছে ইহার যথেষ্ট মর্য্যাদা না থাকিলেও চিত্রকর বা সৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তিদের চক্ষে ইহা অনেকখানি নূতন ও দামী। হয়ত ইহার মধ্যে প্রকৃত জাপানী আর্টের সব কৃতিত্ব নাও থাকিতে পারে, তবুও ইহা জাপানের বিগত-জীবনের প্রতি মোহ আনিয়া দেয় এবং ইহার মধ্যে চিত্রকরের গভীর ধ্যান ও সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে।

রঙীন প্রতিলিপির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন 'sazuki Harunabu'। তাঁহার দান অমর; তাঁহার চিত্রের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে—ছোট্ট প্রতিলিপির মধ্যে একখানি অতি সামান্য বিষয় তুলির টানের অপূর্ব্ব রেখায় জীবন্ত করিয়া তোলা। রংএর চাকচিক্য তাঁর বেশী ছিল না,—একটুখানি ফিকে লাল, একটুখানি বাদামী কিম্বা একটু সবুজের মধ্য দিয়াই তিনি ছবির রং ফুটাইয়া তুলিতেন। বর্ত্তমানে 'Sazuki'র স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র খুবই দুর্লভ; কয়েকটি বড় বড় Museum ছাড়া আর কোথাও বিশেষ দেখা যায় না এবং তাঁহার ছবির অনুকরণ যথেষ্ট বাহির হইয়াছে। তৎপরে Koriusai, Harunabuকে অনুসরণ করিয়া জাপানে চিত্রকর বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ চিত্রই পাখীর সম্বন্ধে এবং

তাহা খুব উঁচুদরের। তাহার পর আসিলেন 'shauso'। ১৭৭০ সালে তাঁহার খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশী। মেয়েদের ছবি আঁকিতে 'shauso' ছিলেন অদ্বিতীয়। স্নিগ্ধ অথচ শান্ত রং দিয়া মহিলাদের দেহের সুষমা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটাইয়া তোলা ছিল তাঁর কাজ। 'shauso'র সময়ের চিত্রকর 'Torri kigonaga' ও যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিলেন। ইনি চিত্রে পুরুষ বা মহিলাদের গায়ের জমকালো পোষাক আঁকিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Shausoর অনুসরণে চিত্রকর Kitagawa Utamaro গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। Utamaro বোধ হয় জাপানের রঙীন প্রতিলিপির সকল চিত্রকরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। ইনিও মহিলাদের ছবি আঁকিতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর ছবির প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। ইহার মধ্যে জাঁকজমকের লেশমাত্র নাই— যেমন উদার, তেমনি গম্ভীর। রেখা এবং রংএর কারসাজি নাই—দেখিলেই মনে হয় খুব উঁচুদরের ছবি এবং সত্য। তাঁর সব ছবিই প্রায় ঘোর কাল রংএর উপরে গোলাপী বা ফিকে—বাদামী আর সবুজ দিয়ে আঁকা। তাঁর ভূদৃশ্য ও ফুলের ছবিগুলিও বিখ্যাত।

১৭৯০ সালে আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর 'Toyukuni' জাপানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তিনি খ্যাতিলাভের যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন একথা নিঃসন্দেহ। অবশ্য তাঁর চিত্রের মধ্যে নিজস্ব কিছু ছিল। তিনিও মহিলাদের ছবি আঁকিতেন, তবে তাঁর ছবির মধ্যে কোন খুঁটিনাটি বিষয় বাদ পড়িত না এবং রং ও রেখার যথেষ্ট সমাবেশ ছিল। ইহার পর ১৮৩০ সালে বিখ্যাত চিত্রকর 'Hokussai' আবির্ভূত হইলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী shausoর একজন প্রধান শিষ্য। 'Maugawa' ও 'Hundred Pictures of Fuzi' বলিয়া তাঁহার দুইখানি বিখ্যাত ছবির বই আছে। এর প্রত্যেকটি ছবিই কাল, বাদামী রংএর। এগুলি নানারকমের ফুল, পাখী, পশুর ছবি; রাস্তার সুন্দর দৃশ্য—তখনকার দিনের জাপানী-জীবনের রীতিনীতির এক-একটি প্রতিলিপি। তাঁর 'Thirty-six views of Fuzi'র রঙের অপূর্ব্ব সমাবেশ এবং বিষয়নির্ব্বাচন ও চিত্রাঙ্কণের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

অবশেষে তখনকার দিনের রঙীন প্রতিলিপির শেষ চিত্রকর Hirosige, 1, অপ্রতিদ্বন্দ্বী-ভাবে জাপানে উদয় হইলেন। তাঁর এক একটি ভূদৃশ্য-চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে সেগুলি অতি সাবধানে ও যত্নে অঙ্কিত। তিনি বাতাস এবং সন্ধ্যার অলোক সম্বন্ধে গভীরভাবে সাধনা করিয়াছিলেন— এবং তাঁহার প্রত্যেকটি চিত্রের মধ্যে কল্পনার রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তখনকার দিনের জাপান-বাসীরা এই আশ্চর্য্য ক্ষমতাপূর্ণ চিত্রকরদের চিত্রাঙ্কণের মহৎ-গুণগুলিকে সমাদর করিতে পারে নাই এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমানে জাপানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আশ্চর্য্য-সৃষ্টি রঙীন প্রতিলিপিগুলি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা ঠিক যে জাপানের আর্টের প্রেরণা প্রাণবন্ত, অমর; আর্টিষ্টের তিরোধানের সহিত এ আর্টের নির্ব্বাণলাভ ঘটে না—নূতন যুগে নূতন ভাবে ইহা প্রকাশলাভ করে।

শ্রীসাগরময় ঘোষ

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—   —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম স্তবক

সিমুর্‌দা'ন

১

তৎকালীন প্যারিসের রাজপথ

নাগরিক জীবনে তখন নিভৃত কিছু ছিল না। ঘরের বাহিরে টেবিল পাতিয়া লোকেরা প্রকাশ্যভাবে আহারাদি করিত। রমণীরা গির্জ্জার সিঁড়িতে বসিয়া জাতীয়-সঙ্গীত "মার্শেলেজ্" গাহিতে গাহিতে সেলাই ও বুনানি করিত। পার্কে পার্কে সৈন্যদের কাওয়াজ্ হইত, এবং সকলের চোখের সাম্‌নেই বন্দুকের কারখানায় পুরাদমে কাজ চলিত, আর লোকেরা বাহাবা দিত। সকলেরই মুখে এই কথা—"ধৈর্য্য ধর, বিপ্লব চলিতেছে।" এরূপ সময়েও তাহাদের সস্মিত-বদন। থিয়েটারে দর্শকের অভাব ছিল না।

জার্ম্মেনরা একেবারে নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাজারে গুজব—প্রুশিয়ার রাজা পূর্ব্বাহ্নেই থিয়েটারে আসন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। 'সন্দিগ্ধদের' সম্বন্ধে অদ্ভুত আইন প্রত্যেকের অন্তরে মাথার উপরে উদ্যত গিলোটিনের দৃশ্য জাগাইয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে বিভীষিকা, তবু কেহই ভীত নহে। লেয়ান নামক একজন এটর্নী অভিযুক্ত হইয়া ড্রেসিং-গাউন পরিয়া চটিজুতা-পায়ে জানালার ধারে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গ্রেফ্‌তারের প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

পুরাতন বাজে-জিনিষের দোকান রাজপ্রাসাদ হইতে অপসারিত মুকুট, সোনার আশাসোঁটা, ফ্লোর-ডি-লিস্ প্রভৃতিতে পূর্ণ। রাজতন্ত্রের ধ্বংস নিঃশেষে চলিতেছিল। সামান্য লোকেরাও চাঁদা তুলিয়া বুটজুতা কিনিয়া সাধারণ-তন্ত্রের সৈনিকদের জন্য "কন্‌ভেনসনের" নিকট পাঠাইয়া দিত। দোকানে দোকানে বাড়ীতে বাড়ীতে ফ্রাঙ্ক্‌লিন্, রুশো, ব্রুটাস্ এবং ম্যারাটের আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তির ছড়াছড়ি।

প্রধান প্রধান দোকানগুলি প্রায়ই বন্ধ ছিল। মেয়েরা ফিতা, রিবন, খেলনা প্রভৃতি ফিরি করিয়া বেড়াইত। মঠ-প্রাচীরাবদ্ধ ভূতপূর্ব্ব "নানেরা" পরচুলা-সজ্জিত মস্তকে মুক্ত আকাশের নীচে দোকান করিয়া বসিত। এই ষ্টলে যিনি মোজা বুনেন—তিনি ছিলেন একজন কাউণ্টেস্; ওখানকার পোষাকবিক্রেত্রী—তিনি একজন মার্শিয়নেস্। ম্যাডাম ডি বুফ্লার্স্ একটা ক্ষুদ্র কুঠুরীতে বাস করিতেছিলেন—সেখান থেকে তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য দেখা যাইত। রাজার সঙ্গীত-রচয়িতা পাইটু জনতাকর্ত্তৃক রাজপথে অপমানিত হয়। এই লোকটি খুব সাহসী—দ্বাবিংশবার কারা-ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। কোটের ল্যাজ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে সে "সিটিজেন্‌সিপ্" (নাগরিকতা) এই কথাটি উচ্চারণ করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহাকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। মাথাটাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, যদি কারুর অপরাধ হয়ে থাকে তবে সেতো আমার মাথার উল্‌টো দিকের।" এই রসিকতায় জজেরা হাসিয়া ফেলিলেন এবং পাইটু সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেল। গ্রীক্ এবং লাটিন নাম রাখার ফ্যাসানকে পাইটু খুব বিদ্রূপ করিত। তাহার ফলে অনেক সাধারণ স্থান ও রাজপথের নূতন নামকরণ হইল। একজন মার্ক্‌ইস্ 'ডিক্‌স্ ঔট্' (দশই আগষ্ট) * এই নাম গ্রহণ করেন। 'ভদ্রমহোদয়' ও 'ভদ্রমহিলা' শব্দের ব্যবহার রহিত হইয়া 'সিটিজেন্' (দেশভ্রাতা) এবং 'সিটিজেনেস্' (দেশভগ্নী) শব্দের প্রচলন হয়। নূতন আমদানী 'লিবার্টি-ক্যাপ্' (স্বাধীনতা-টুপী)

* ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট প্যারিসের জনগণের অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের ফলে ষোড়শ লুই রাজক্ষমতা-পরিচালন হইতে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লি কর্ত্তৃক অপহৃত হন।

মাথায় দেওয়ার রেওয়াজ দেখিতে দেখিতে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। †

মেয়রের আফিসে নূতন-পদ্ধতির বিবাহকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দোরের সম্মুখে ভবঘুরের দল আসিয়া জটলা করিত। বরক'নে চলিয়া যাইবার সময় তাহারা চেঁচাইয়া উঠিত—'মিউনিসিপ্যাল্ বিয়ে!' চৌমাথার পাথরের উপর বসিয়া লোকেরা তাস খেলিত। তাসের ছবিতেও ঘোর বিপ্লব—রাজার (সাহেবের) ছবির পরিবর্ত্তে দানবের ছবি, রাণীর (বিবির) পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা-দেবী, গোলামের পরিবর্ত্তে সাম্যের ছবি এবং টেক্কার স্থলে আইনের বিবিধ পরিকল্পিত মূর্ত্তি। সাধারণ উদ্যান, এমন কি টুইলারিস্ প্রাসাদসংলগ্ন ভূমিও কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এইসব বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত-পক্ষের লোকদের জীবনের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। কুকিয়ার টিন্‌ভিলের নিকট একজন লিখিয়া পাঠায়, "দয়া ক'রে আমাকে এই অস্তিত্ব থেকে মুক্তিদান কর। আমার ঠিকানা দিলাম।"

অসংখ্য খবরের কাগজের প্রাদুর্ভাব হয়। কেশ-বিন্যাসের বিপণিতে দোকানের কর্ত্তা বসিয়া বসিয়া 'মনিটার' কাগজ পাঠ করিত, আর তাহার ভৃত্যগণ প্রকাশ্যভাবে রমণীদের পরচুলা কুঞ্চিত করিয়া দিত। অন্যেরা সোৎসুকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া 'ট্রাম্পেট্' বা অন্যান্য কাগজ পাঠ করিতে করিতে টিপ্পনী কাটিত। পলাতকগণের মদ্যাদি প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইত। এক মদ্যবিক্রেতা বাহান্ন রকমের মদের বিজ্ঞাপন দেয়। এক নাপিতের দোকানের সাইন্‌বোর্ডে লেখা ছিল, "আমি পাদ্রীদিগের ক্ষৌরকর্ম্ম করি; অভিজাতগণের কেশসংস্কার করি; এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের (Third Estate) প্রতিও অমনোযোগী নই।"

রুটি, কয়লা ও সাবানের বড়ই অভাব ছিল। গ্রাম থেকে দলে দলে দুগ্ধবতী গাভীর আমদানী হইত। এক পাউণ্ড মটনের দাম ছিল পনর ফ্রাঙ্ক্। কমিউনের আদেশে প্রতি দশদিনে জন-প্রতি অর্দ্ধ পাউণ্ড মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কসাইর দোকানের সম্মুখে লোক পর-পর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত—পর্য্যায়ক্রমে মাংস কিনিবে। এরূপ একটি সারি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উহা রু দ্য পেটিটের একটা মুদীর দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া রু মন্টরগুইল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দুর্দ্দশাতেও রমণীরা খুব সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। পালাক্রমে রুটি কিনিবার জন্য তাহারা অনেক সময় এরূপভাবে সারারাত কাটাইয়াছে।

কাঠের দাম ভয়ঙ্কর চড়িয়া গিয়াছিল—এক এক বোঝার দাম ৪০০ ফ্রাঙ্ক। তক্তাপোষ কাটিয়া জ্বালানি-কাঠের যোগাড় হইতেছে—এরূপ দৃশ্য রাস্তায় চোখে পড়িত। শীতকালে ঝরণাগুলি জমিয়া যায়। দুই কলসী জলের দাম দুই 'সু'। লোকে নিজেরাই জল তুলিয়া আনিত। একবার ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িলেই ৬০০ ফ্রাঙ্ক্ লাগিত। দিনভর গাড়ী খাটাইলে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই এরূপ কথোপকথন শোনা যাইত—"কোচম্যান্, কত দিতে হবে?" "আজ্ঞে, দুই হাজার ফ্রাঙ্ক্।"

চুরি তখন অল্পই হইত। চারিদিকে ভয়ঙ্কর অভাব, অথচ অবিচলিত সাধুতা। নগ্নপদ অনশন-ক্লিষ্ট জনসমূহ মণিরত্ন-গহনার দোকানের নিকট দিয়া যাইবার সময় চক্ষু নত করিয়া যাইত। জনৈক রমণী কোন উদ্যানের একটি ফুল ছিঁড়িয়া নিয়াছিল বলিয়া ক্রুদ্ধ জনতা তাহার কান মলিয়া দেয়।

বিপ্লব সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন সংশয় ছিল না। রাজ-সিংহাসনের নিপাতসাধন করিয়া তাহাদের বিষাদগম্ভীর আনন্দ। ভলান্টিয়ারের অসদ্ভাব ছিল না। প্রতি ষ্ট্রীট্ হইতে এক এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সংগৃহীত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টের * ভিন্ন ভিন্ন পতাকা। কেপুচিন্ ডিষ্ট্রীক্টের পতাকায় লিখিত ছিল—"আমাদের শ্মশ্রু কেহ কাটিতে পারিবে না।"

† তুলনা করুন—আমাদের দেশের ছেলের নাম "স্বদেশকুমার," মেয়ের নাম "রাখী"। 'গান্ধী-টুপীর' প্রচলন।

* প্রাচীনকাল হইতে ফ্রান্স কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের ছিল। দেশাত্মবোধের এই অন্তরায় দূর করিয়া সমগ্র দেশে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে আবে সাইয়ের প্রচেষ্টায় পুরাতন প্রদেশ-বিভাগের পরিবর্ত্তে ফ্রান্স কতকগুলি ডিপার্টমেণ্টে, প্রতি ডিপার্টমেণ্ট কতকগুলি ডিষ্ট্রীক্টে, এবং প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট কতকগুলি 'কমিউনে' বিভক্ত হয়, এবং ইহাদের মধ্যে আইন ও অধিকার-সাম্য স্থাপিত হয়। ইহাদের শাসনকার্য্য নির্ব্বাচন-প্রথানুসারে গঠিত একটি মন্ত্রণাসভা ও একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সমর্পিত হয়।

অন্য একটি পতাকার 'মটো' ছিল—"হৃদয়ের আভিজাত্য ব্যতীত অন্য আভিজাত্য নাই।" দেওয়ালে দেওয়ালে সাদা, লাল, সবুজে, হলদে, বিবিধ রঙের প্লাকার্ড (বিজ্ঞাপন)—তাহাতে লিখিত কিম্বা মুদ্রিত আছে—"সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক।" ছোট ছোট শিশুরাও সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বত্র প্রচারিত রাষ্ট্রীয়-সঙ্গীতের প্রারম্ভবাক্য অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিত—"শা ইরা"। এই শিশুরাই দেশের মহান্ ভবিষ্যৎ।

কিছুদিন পরে আবার সব পরিবর্ত্তিত হয়। প্যারিসের রাজপথে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটা দিকই দেখা গিয়াছিল—৯ই থার্মিডারের * পূর্ব্বে এবং পরে। পিউরিটান্-সুলভ শুচিবাইএর পরে আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ। যেমন চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বের পরে, তেমনি এই রবস্‌পীয়রের শাসনের পরেও লোকের একটু দম লইবার আবশ্যক হইয়াছিল। এ যেন রাষ্ট্রীয় মুক্তির আনন্দ।

৯ই থার্মিডারের পরে প্যারিস্ আমোদে মাতিয়া উঠিল। বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ। বিলাস, ব্যসন, আড়ম্বর, নৃত্য-গীতের আতিশয্য। জীবন-কর্ম্ম-নিরতা গম্ভীর নাগরিকাগণের স্থলে এখন প্রসাধন-সজ্জিতা, হাবভাবময়ী ভামিনীবর্গের সমাগম ঘটিতে লাগিল। সৈনিকের ধূলিধূসরিত রক্তাক্ত পদের পরিবর্ত্তে এখন চারিদিকে রমণীর মণিমুক্তাবিজড়িত নগ্নপদের সৌন্দর্য্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লজ্জাহীনতার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহীনতার পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইল—কি বড়লোক, কি নিম্নশ্রেণী, সকলের মধ্যে। চোর-বাটপাড়েতে আবার নগর পূর্ণ হইয়া গেল। পথিকগণকে সন্তর্পণে পকেটবুক রক্ষা করিতে হইত। বিচারালয়ে গিয়া নারী-তস্করদিগকে দেখা একটা আমোদের বিষয় ছিল। 'প্রজাবন্ধু' ও তৎশ্রেণীর পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া 'পঞ্চরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকার বিক্রী বাড়িয়া গেল।

এইভাবেই প্যারিস আন্দোলিত হয়—সম্মুখে ও পশ্চাতে। সভ্যতার এই বিশাল পেণ্ডুলাম (দোলা) একদিকে থার্ম্মপলি * অপরদিকে গমোরা † স্পর্শ করে।

'৯৩ সালের পর রাষ্ট্রবিপ্লব যেন একটা ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া যায়। শতাব্দী যেন তাহার প্রারব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিতে ভুলিয়া গেল। ট্র্যাজিডির স্থান ব্যঙ্গ অধিকার করিল, এবং দিগন্তের গূঢ় গহ্বর হইতে উত্থিত উৎসবের ধূমরাশি বিপ্লবের করাল মূর্ত্তিকে দৃশ্যপট হইতে যেন মুছিয়া ফেলিল।

কিন্তু '৯৩ সালে—যখনকার কথা আমরা আলোচনা করিতেছি—তখনও প্যারিসের রাজপথে এসব পরিবর্ত্তন আসে নাই। তখনও তথায় প্রারম্ভকালের গম্ভীর ও অমার্জ্জিত দিকটারই প্রভাব ছিল।

রাস্তায়-রাস্তায় অনেক বক্তা ছিল। তাহাদের একজনের নাম ভাল্‌ে ট—সে একটা চার-চাকার প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া নগরময় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহার উপর হইতে বক্তৃতা করিত। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল জনসাধারণ যাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই সব জনপ্রিয় দলপতিদের কেহ কেহ ভাললোক, কেহ কেহ আবার দুষ্টমতিও ছিল। একজন ছিল খুব সৎ এবং সাংঘাতিক। সে হচ্ছে সিমুর্দ্দাঁন।

২

সিমুর্দ্দাঁন

সিমুর্দ্দাঁনের চিত্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ছিল, কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল ছিল না। তাহার মধ্যে অসীমের একটু

* ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্ব্ব-বিষয়ের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। ১৭৯১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এক নূতন বৈপ্লবিক অব্দ গণিত হইতে আরম্ভ হয়। বৎসর ৩০ দিনের ১২টি মাসে, এবং প্রতি মাস ৪ সপ্তাহের পরিবর্ত্তে ৩ সপ্তাহে বিভক্ত হয়। ঋতু অনুসারে মাসগুলির নূতন নামকরণ হয়; যথা,—থার্মিডার—গ্রীষ্মমাস, ব্রুমেয়ার—কুয়াসার মাস, ইত্যাদি। ২২শে সেপ্টেম্বর সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আবার শারদীয় সমদিবারাত্রিও সেই দিনেই। তাই ঐদিন হইতে বর্ষারম্ভ হইল।

* থার্ম্মপলি—গ্রীসের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম। এইখানে (৪৮০ খৃঃ পূঃ) মাত্র ৩০০ সৈন্য লইয়া স্পার্টার রাজা লিওনিদাস্ পারস্যরাজ জারেক্সাসের অগণিত সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং সসৈন্যে নিহত হন।

† গমোরা—বাইবেলোক্ত নগর। ইহার ও অপর কতিপয় নগরের অধিবাসীগণের পাপাচরণে ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, এবং স্বর্গাগ্নিতে ঐ নগরগুলির ধ্বংস হয়।

দাবীও আছে, এত বড় সাধারণ সত্যটা তার মনেই হয় নাই। বিবাহ করিলে একটি বহুদূরবাসী বন্ধু পাওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত তার ভালো লাগিয়াছে বলিয়া এই পর্য্যন্ত সে ভাবিয়াছে। বন্ধুর পিতামাতা ভাইবোন আত্মীয়স্বজন থাকিতে পারে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি বাঁধা কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, হয় তো বন্ধুর চেয়ে বন্ধুর বন্ধুদেরই অধিকার বেশী—এ সব এক-নিমিষে তার খেয়ালে আসিল। তাই তো, এতগুলো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় সে ভুলিয়া রহিয়াছিল কী বলিয়া!

বাদল তার বৌয়ের জন্য বুক-কোম্পানীর দোকান ঘাঁটিয়া ইব্‌সেন, অলিভ্ শ্রাইনার ও ডি-এইচ্-লরেন্সের একরাশ বই কিনিয়া আনিল। তার সবগুলিতে স্বহস্তে উজ্জয়িনীর নাম লিখিয়া দিল,—কিন্তু উজ্জয়িনী সেন নয়, উজ্জয়িনী গুপ্ত।

আলাপ করিতে করিতে কখন তাদের জড়তা কাটিয়া গেছে। মেলামেশা সহজ হইয়া আসিয়াছে। উজ্জয়িনী অনুযোগ করিয়া কহিল, "ভুল লিখেছেন, মিষ্টার সেন। দেশ ছাড়বার আগে শুধ্‌রে দিয়ে যান।"

বাদল বেশ সপ্রতিভাবে কহিল, "ভুল লিখিনি, মিস্ গুপ্ত। বইয়ের ভিতরটা পড়্‌লেই উপরটার সঙ্গতি খুঁজে পাবেন।"

উজ্জয়িনী কখনো একসঙ্গে এতগুলি নাটক-উপন্যাস চোখে দেখে নাই। আলাদিন সেই পাতালপুরীতে আনন্দে ও বিস্ময়ে পথ হারাইয়াছিল, উজ্জয়িনীর মনে হইল এইবার বুঝি ভাবরাজ্যে পথ হারাইবে। ছেলেমানুষির সুরে আব্‌দার করিয়া কহিল, "বিলেতে গিয়ে আমাকে আরো—আরো বই পাঠাবেন?" বাদল যেন তার দাদা! দাদা-সুলভ বীরত্বের ভঙ্গীতে কহিল, "অল্ রাইট্! বই প'ড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু। পাস্ হ'লে পুরস্কার।"

১১

বাদলকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে সপরিবার গুপ্ত সাহেব আসিলেন।

বাদলের সঙ্গে যোগানন্দের বড় বড় বিষয়ে তর্ক হইয়া গিয়াছে। বাদল প্রমাণ করিতে চায় যে, সে সব বিষয়ে অথরিটী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধেও তার নিজস্ব থিওরী আছে। কিন্তু যোগানন্দ তাকে সংস্কৃতে হার মানাইলেন। বাদলের মুখ দিয়া স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, সে সংস্কৃত 'উত্তর রামচরিত' পড়ে নাই,—দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা সমালোচনা পড়িয়া তর্কে নামিয়াছে। এতে বাদলের মনটা যোগানন্দের উপর বিরূপ হইয়া গেল।

বিলাত সম্বন্ধে তাঁর অযাচিত পরামর্শগুলো বাদল গণনায় আনিল না। বলিল, "পোষ্ট্-ওয়ার ইংলণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা। আপনার সেকালের গুরু ও বন্ধুরা কোথায় তলিয়ে গেছেন, বরঞ্চ আপনার সেকালের রুটিওয়ালা বা নাপিতের ঠিকানা জানেন তো বলুন, হয় তো তারা এখন পার্লামেন্টের মেম্বার।"

বাপের সাম্‌নে যার মুখ খোলেনা শ্বশুরের সাম্‌নে যে সে 'বিপিন পাল' হইয়া উঠিল এর কারণ যোগানন্দের ব্যবহারের যাদু। তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হইতে জানেন, ছাত্রের সহিত সহপাঠী। তাঁকে সমবয়স্ক বলিয়া ভ্রম করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল।

যোগানন্দ বলিলেন, "কি বলো বাদল, বম্বে অবধি তোমার সঙ্গে গেলে কেমন হয়?—তর্ক কর্‌বার লোভটা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠ্‌ছে যে।" বাদলের হইয়া বাদলের বাবা কহিলেন, "কাজ কি, ভাই যোগী। ওর সঙ্গে চাকর দিচ্ছি বম্বে অবধি। বম্বেতে তোমার বন্ধু ডাক্তার মিত্রকে তার ক'রে দিলেই তিনি ট্রেন থেকে জাহাজে নিয়ে যাবেন।"

বাদলের হৃদয় অজানার প্রতীক্ষার আনন্দে ও উদ্বেগে উঠিতেছিল পড়িতেছিল। যাত্রার প্রাক্কালে কারো কথায় মন দিবার মতো মন তার ছিল না,—কারো প্রতি আসক্তি তার চোখে জল আনিয়া দিতেছিল না। সে টাইম্-টেবিলের পাতা উল্টাইতে ব্যস্ত ছিল; গাড়ী কখন রায়পুরে পৌঁছাইবে, কখন নাগপুরে, কখন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে, তাই যেন সে মুখস্থ করিতেছিল। উজ্জয়িনী তার জিনিষপত্র বার বার গুণিতেছিল, একটা জিনিষ ভুল বশতঃ পরের বার্থের নীচে রহিয়াছিল, সেটাকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না, অকারণে কুলীগুলোকে দৌড় করাইতেছিল।

মিসেস গুপ্ত তাঁর বিলাতী মুরুব্বি ও কুটুম্বগণের কাছে বাদলের জন্য পরিচয়পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন—চেল্‌টেন্‌হ্যামের এক রিটায়ার্ড্‌ সিবিলিয়ান দম্পতি, এবারডিনের এক মিশনারী বুড়ী মিস্‌, এক পিস্‌তুতো বোনের জামাইয়ের ভাই, এক ননদের দেওরের ছেলে ইত্যাদি জন-দশেকের কাছে লেখা বাদলের পরিচয়পত্র, অর্থাৎ তার শ্বশুরকুলের পরিচয়পত্র। পত্রের মধ্যে ঢের বাজে কথাও ছিল—যথা, "দেশে গিয়ে আর আমাদের মনে পড়ে না বুঝি", "শত যুগ হলো চিঠি পাইনি", "দুষ্টু খোকাটাকে তার ভারতীয় খুড়ীমার অনেক অনেক চুমু", "আমরা হতভাগারা এই গরম দেশে প'ড়ে রইলুম"।

বাদলকে বলিলেন, "পৌঁছেই এঁদের সঙ্গে দেখা কোরো, বাছা। তা হ'লে আর হেল্‌প্‌লেস্‌ বোধ করবে না। এঁরা হলেন কিনা আমাদের আপনার লোক!" বাদল মনে মনে বলিল, "চেল্‌টেন্‌হ্যাম আর এবার্‌ডিন লণ্ডন থেকে আধঘণ্টার রাস্তা কিনা, পৌঁছেই ধন্না দেবো!" ভাবিল, মাদার ইন্‌ ল'কে ইংরেজরা শতহস্ত হইতে পরিহার করে, আমি তো ইঁহাকে পরিত্যাগই করিব, কারণ, কা তব কান্তা কা তব শাশুড়ী, এই হইল আমাদের নব নীতি-শাস্ত্রের বচন।

দয়া করিয়া চিঠিগুলাকে জানালার কাছে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল, ট্রেন চলিলেই ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে বাতাসে উড়াইয়া দিবে।

ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া আসিলে উজ্জয়িনী বাদলের পায়ের ধূলা লইতে গেল। বাদল কহিল, "এ কী!" উজ্জয়িনীর হৃদয়ে বহুদিনের সঞ্চিত বাষ্প মেঘ হইয়া বর্ষণের ছল খুঁজিতেছিল। মুষলধারে ঝরিয়া পড়িল। বাদল তো অবাক। উজ্জয়িনী যে তাকে এই ক'দিনে ভালোবাসিয়া ফেলিতে পারে এমন সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও আনে নাই। তার নিজের দিক থেকে যখন ভালোবাসা নাই তখন অপরের দিক থেকে থাকিবে কেন? অতি অকাট্য যুক্তি!

তবু তার মনটা ঈষৎ ভিজল। সে কহিল, "আপনাকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী দিয়ে যাই—আপনার আদর্শ আপনাকে নিরন্তর দুঃখ দিক্‌।"

উজ্জয়িনী প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল। যোগানন্দ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন, "আমারও মন উড়ু উড়ু করছে, বাদল। ছুটি পেলে তোমার সঙ্গেই দৌড় দিতুম ওদেশে। যাক্‌, তোমার মনের সঙ্গে আমারও মন ইউরোপ বেড়াতে চলো—যত পারো চিঠি লিখো।"

রায় বাহাদুর ছেলেকে খড়্গপুর অবধি আগাইয়া দিতে চলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই কহিলেন, "উঃ কি গরম!" কামরায় কতকগুলি বাঙালী যাত্রী ও যাত্রিণী ছিলেন। রায় বাহাদুর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "কিছু যদি না মনে করেন, ফ্যান্‌টা খুলে দিতে পারি কি?" তেমনি একটি পুরুষ হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিলেন। "আজ্ঞে আমার মেয়েটির সর্দ্দি-কাসি। চক্রধরপুর অবধি অপেক্ষা করেন তো আমরাই ফ্যান্‌টা খুলে দিয়ে নেমে যাবো।" রায় বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

"নিন্‌, নিন্‌, একটা সিগারেট্‌ নিন্‌ দাদা। আপনি রসিকের রাজা।"

ভদ্রলোক প্রচুর হাসিয়া সিগারেট্‌ নিলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কামরাটা অন্ধকূপে পরিণত হইল। তার ফলে সর্দ্দি-কাসির রুগীটি কাসিতে কাসিতে কামরা মাথায় করিয়া তুলিল।

বাদলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেই ভদ্রলোক কহিলেন, "তা মশাই, বিয়ে দিয়ে পাঠাচ্ছেন তো? যে প্রলোভনের জায়গা। আমার ভাইপোটি আর ফের্‌বার নাম করছে না মশাই, যদিও বিয়ে ক'রেই গেছে।"

আর একদফা হাসি।

আসন্ন পুত্রবিরহের প্রবল ব্যথা রায় বাহাদুর হাসি দিয়া চাপা দিতেছিলেন। বাদলকে বলিবার মতো কথা বাকী ছিল না কিছু। সী-সিক্‌নেসের ওষুধ কিনিয়া দিয়াছিলেন, জাহাজে খাইবার জন্য আঙুর কমলা কলা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, প্রচুর টাকা দিয়াছিলেন। কেবল কহিবার ছিল, "দরকার দেখ্‌লে তার করতে ইতস্ততঃ কোরো না।"

উজ্জয়িনীর দেওয়া খাবার, মিসেস্‌ গুপ্তের পিক্‌লস্‌ এবং Restaurant Carএর খানার কথা বার বার স্মরণ

করাইয়া দিতে দিতে খড়্গপুর আসিয়া পড়িল। রায় বাহাদুরের সঙ্গে বাদলও নামিয়া পড়িল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "তুই নাম্‌লি যে!—গাড়ী ছেড়ে দেবে এখনি।"

বাদল পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতেই তিনি মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরে এসো।"

দাসমনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া উক্তবিধ প্রণামের উপর বাদলের রাগ ছিল। কিন্তু তার একমাত্র আত্মীয়কে কতকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে, অথচ দুঃখিত বোধ করিতেছে না—ইহারই অনুশোচনায় সে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিল। গাড়ী হইতে এবং আদর্শ হইতে নামিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে বাদল চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। পিছনের জন্য নয়, সম্মুখের জন্য তার মন কেমন করিতেছিল। এতদিনে সত্যসত্যই সে তার স্বপ্নরাজ্যে চলিল। ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্য্যের মতো দ্যুতিমান করিয়াছে, তার দিকে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়! কত কীর্ত্তি কত কাহিনী কত ঘটনা কত আন্দোলন কত তত্ত্ব কত সন্ধান কত সাঁলো কত ক্লাব—ভাবিতে বাদলের মাথা ঘোরে। বাদল যেন মঙ্গলগ্রহে চলিয়াছে।

এইবার সকলকেই সে চোখে দেখিবে। পথের ভিড়ে একদিন গায় গা ঠেকিয়া যাইবে—কে? না, অল্‌ডুস্‌ হাক্স্‌লী। ট্রেনে যাইতে যাইতে কী সূত্রে আলাপ হইয়া যাইবে—কে? না, মিড্‌ল্‌টন্‌ মারী। দুর্য্যোগে কারো দিকে ছাতা বাড়াইয়া দিবে—কে? না, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌। এমনি করিয়া কত সমধর্ম্মীর সঙ্গে ফ্রী-লভ্‌ হইবে, কত অজানাকে জানা ও কত ঘরে ঠাঁই। বাদলের একটুও সন্দেহ ছিল না যে মুক্ত পুরুষ ও মুক্ত নারী ইউরোপের পথে ঘাটে বিচরণ করিতেছে, কেবল চিনিয়া লইতে পারিলেই হইল।

সারা রাত বাদলের ঘুম আসিল না। যত উপন্যাস পড়িয়াছে তাদের নায়ক-নায়িকারা বাদলের কল্পনায় ভিড় বাড়াইতে থাকিল। ইংরেজ নায়ক-নায়িকাদের লইয়া সে তৃপ্ত হইল না, ফরাসী রাশিয়ান স্কাণ্ডিনেভিয়ান চরিত্রগুলিকে একে একে স্মরণ করিতে লাগিল। এতদিন পরে সহসা পরিচিত মানুষগুলিকে সে জীবন্ত করিয়া পাইবে, ইহারাই তো তার আপনার লোক—মিসেস্‌ গুপ্তের মুরুব্বি ও কুটুম্বরা তার কে?

একথা মনে হইতেই সে মিসেস্‌ গুপ্তের দেওয়া পরিচয়-পত্রগুলি জানালার বাইরের বাতাসে উড়াইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

মায়ী অক্ষর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

নাটকের বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভিতরের অভিনয়ের রসাস্বাদন যেমন, এ জীবন-নাট্যের বহিরঙ্গণে থাকিয়াও তেমনি ভিতরের অক্ষর পুরুষের অভিনয় কিছুই শোনা যায় না, দেখা যায় না। ভিতরে ঢুকিতে মানা কিসের? সাধারণ রঙ্গালয়ে যত বালাই ত টিকিট লইয়া, এখানে সেইরূপ একটি বাধা আছে। সেইটি কি? পানপাত্রে ফেনায়িত ফোয়ারা তুলিয়া রূপ রস উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে, মনসিজ ইহা মুখের উপর তুলিয়া ধরিতেছে—চুমু না খাইয়া সাধ্য কি? খাইলেই মন নেশায় চুর হইল,—আর অমনি রঙ্গালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। "নেতি" "নেতি" বলিয়া যে উদ্বাহু হইয়া পানপাত্র দূরে ছুঁড়িয়া মারে, মনসিজ ক্রমে তাহার নিকট অস্ফুট হইতে হইতে একেবারে মিলাইয়া যায়, তখন রঙ্গালয়ের ঈষৎ রেখাপাত জাগিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া একদা ভিতরে প্রবেশ কখনই সম্ভবপর নয়, সাধনার ক্রমে তাহা লভ্য হয়। মুখের কথায় হইবে না—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ," পানপাত্র হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া উহার বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। তখন জানিবার পক্ষে সহজ হইবে—যাহাকে চাই সে ও আমার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল দাঁড়াইয়া আছে, ইহার এ-পারে আমি ও-পারে তিনি। তাঁহার মুখখানি ত আমি দেখিতে পাই না। যদি মেঘ সূর্য্যকে আড়াল দিয়া দাঁড়ায় তবে সূর্য্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, দেখিতে ত পাই না। তিনিই আমার লক্ষ্য, কিন্তু আমার দৃষ্টি ত তাঁহাকে নাগাল পায় না—মাঝখানে অন্তরায় রহিয়াছে যে! লক্ষ্য-ভেদ করিতে যাইয়া মহা-ভারতের মহারথী বা হার মানিল কেন? মৎস্যের চক্ষু সুদর্শনচক্রে শ্রীকৃষ্ণ ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, তাই লক্ষ্যে শর পৌঁছাইল না। যখন অর্জ্জুন শরান্বেষণ করিলেন, অমনি সে অন্তরায় অপসৃত হইয়া গেল, মৎস্যের চক্ষুর সহিত তাঁহার চক্ষুর শুভদৃষ্টি ঘটিল। অর্জ্জুনের তপশ্চক্ষু লক্ষ্য ভেদে ক্ষান্ত হয় নাই—বিশ্বরূপ-দর্শনে ধন্য হইয়াছিল। সুদর্শনচক্র দ্বারা বাসুদেব যেমন মৎস্য-চক্ষু আচ্ছাদন করিয়াছিলেন তেমনি তাঁহার আপন রূপ মেঘকল্প মায়া দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এ রূপ দেখা অর্থ দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালকে অতিক্রম করা। অর্জ্জুনের তপশ্চর্য্যা এত উর্দ্ধে গিয়াছিল যে এ মায়াবরণটি একেবারে নিরস্ত হইয়াছিল, তাই গীতায় উল্লেখ রহিয়াছে—

"ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।"

এই মায়ার অন্তরাল তাঁহাকে লোক-চক্ষুর নিকট ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ইহা যতক্ষণ না সরিয়া যায় ততক্ষণ সেই অক্ষর-পুরুষ দর্শন অসম্ভব—ততক্ষণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ ঘটিল না, ততক্ষণ অভিনায়কের অভিনয় দেখা স্থগিত রহিল।

যাহা আমাকে সেই পরম প্রিয়কে পাইতে দিতেছে না তাহা ত ভাল করিয়া জানা দরকার, নতুবা ইহাকে এড়াইব কেমন করিয়া। "মায়াস্তু প্রকৃতিম্‌"——সেই মায়া বা প্রকৃতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সাংখ্যকার এমন ভাবে করিয়াছেন যে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইলে "অন্তরায়-বিধ্বস্তের" শুভ-সুযোগই উপস্থিত হয়। অন্তরায়-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অক্ষর-পুরুষের দর্শনলাভ ঘটিবে। যে শাস্ত্র ইহাতে সহায়ক তাহারই নাম "দর্শন," দেখাই চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, শুনা নহে বা জানা নহে, তবে এ শাস্ত্রের নাম হইত "শ্রবণ" বা জানন্‌। Philosophy ঠিক ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ কি না তাহা অনুধাবনার যোগ্য; যেমন যজ্ঞোপবীত অর্থ Sacred thread নহে এবং যজ্ঞের ইংরেজিও ঠিক Sacrifice ধরা বোধ হয় সঙ্গত নয়। যে দেশে যাহা নাই সে-দেশের ভাষা সে বিষয়ে মূক বলিতে হয়, দধি

যাহারা জানে না তাহারা দুধ বলিয়া ইহাকে অভিধা দিতে পারে; কিন্তু দুধ শব্দের ব্যাপকতা তাই বলিয়া অতদূর পৌছান সমীচীন নহে। মায়ার কথা হইতেছিল, মায়ার আবরণে শ্রীভগবান্ আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়া জীব-চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। মায়া ঠিক একটা ম্যাজিক বা কোনরূপ ইন্দ্রজাল নহে। মায়া কি?—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ইহারা মায়ালোকের ত্রিশক্তি। ইহাদের প্রতিপত্তি মনের উপর—আকাশ যেরূপ সূর্য্যের বিচরণ-কক্ষ মনও তেমনি ইহাদের বিচরণ-কেন্দ্র। ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এ নহে, তবে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের ধারা ভগ্ন হইবে। এই মায়া যে প্রকৃতিরই অপর নাম তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে পরিষ্কার দেওয়া হইয়াছে—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধি অনাদী উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্।

সাংখ্য দর্শনের সহিত ইহার অভিন্নতা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। পুরুষ নির্ব্বিকার, কিন্তু মায়ার সৃষ্টি বিকার। এ মায়ার খোলস পরিয়া যিনি ত্রিগুণাতীত তিনিই মায়ী; তাঁহার খোলস ঠেলিয়া জীবদৃষ্টি সহজে তাঁহাতে পৌছে না—এই ত মহা মুস্কিল!

অভিনায়ক অক্ষরে আমরা দেখিয়াছি ইন্দ্রিয়-গ্রাম প্রত্যুত আত্মভূ; সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, চক্ষু, কর্ণ, মন আদি তেমনি অক্ষর-পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিবে, যদি ইহারা আত্মন্ হইতে আসিয়া থাকে, তবে সূর্য্য কিরণানুসারী-চক্ষু যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পায় ঠিক তেমনি ভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুধাবনা করিয়া আমরা কেন আত্মন্‌কে দেখিতে পাই না? এ প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। সুদর্শন চক্রে যেমন মৎস্য-চক্ষু, মায়ার ঘন-সন্নিবেশেও তেমনি অক্ষর-পুরুষ, আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন; তাই লক্ষ্যভেদে যেমন অর্জ্জুন ভিন্ন মহারথীরা অন্ধকার দেখিয়াছিল, তেমনি জীবন্মুক্ত ভিন্ন সকলেই আত্ম-দর্শন-প্রয়াসে চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখিয়া থাকে। পৃথিবী যখন সূর্য্যের আলোতে ঝল্‌সাইয়া যাইতেছে—আমরা চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখি, ইহার অর্থ কি? সূর্য্যের আলোকই যদি দর্শনের একমাত্র উপাদান হইত তবে যেখানে সূর্য্যালোক আছে সেখানে অন্ধ থাকিবার কোন কারণ ঘটিত না। আমাদের ভিতরে সহস্রসূর্য্যপ্রভ dynamo জ্বলিতেছে, সে কিরণ-বর্ত্তির সহিত সূর্য্যের যেখানেই সংযোগ ঘটিবে সেখানেই দর্শন; চক্ষু যাহার আছে তাহার জন্য প্রদীপের আয়োজন, কিন্তু ইহার বিপরীত কখনো নয়। তাই বলিতে হয় চক্ষুর জন্য সূর্য্য, সূর্য্যের জন্য চক্ষু নহে;—চক্ষু মুখ্য, সূর্য্য গৌণ। কিন্তু "চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" বলিয়া শাস্ত্র যে অক্ষর-পুরুষকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছেন তিনিই হইলেন আলোকাধার, কিন্তু চক্ষু মুদিলে সেই সহস্রসূর্য্যপ্রভের খদ্যোতপরিমাণ রশ্মিও না দেখিয়া আমরা খালি অমানিশীথিনীর অন্ধকার দেখি কেন?—ইহার কারণ সেই মায়া। যদি মায়ার আবরণ ভিতরে জমাট বাঁধিয়া না থাকিত তবে চক্ষু মুদিলে সকলেরই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিত। আত্মন্‌কে দেখা সহজ নহে বলিয়াই নিগূঢ় "দর্শন" শাস্ত্রের সমুদ্ভব ঘটিয়াছে এবং সেইজন্যই আত্মনের স্বরূপবর্ণনে "দুর্দ্দর্শ" ইত্যাদি বিশেষণের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এপর্য্যন্ত এটুকু বুঝা গেল যে নাট্যমঞ্চে প্রবেশের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে মায়া। ইহাকে অপসারণ ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ একেবারে নিষেধ। এখন মায়া সম্বন্ধে আমাদের অল্পবিস্তর একটু আলোচনা করা বিধেয়। একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে মায়ার শক্তি তিনটি গুণ—ইহাদিগকে বলা হইয়াছে "প্রকৃতি সম্ভবান্," ইহারা মায়া হইতে উৎপন্ন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের

"গুণান্ এতানতীত্য ত্রীণ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥" ২০

এখানে "দেহ-সমুদ্ভবান্" দ্বারা প্রকৃতি বা মায়াকে দেহ বলিয়া ধরা হইয়াছে। গীতার এই প্রয়োগটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গুণগুলি আসিতেছে কোথা হইতে?—প্রকৃতি হইতে, এ একপ্রকার প্রয়োগ। এখানে সেই প্রশ্নটির উত্তরে বলা হইতেছে—ইহারা আসিতেছে দেহ হইতে। "দেহ" শব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে অভিহিত

করিয়া সুনিপুণ ভাবে ইঙ্গিত করা হইল যে প্রকৃতিও মূলতঃ একপ্রকার দেহ। যদি প্রকৃতি বা মায়াকে "দেহ" আখ্যা দেওয়া যায় তবে ইহা যে জড়েরই একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংস্করণ তাহাতে প্রতীতি জন্মে। জড়ের রূপ আমাদের সুপরিচিত, কারণ এ সংসার জড়েরই খেলা। যদি মায়া জড়ান্তর্গত হয় তবে ইহার স্বরূপ-চিন্তন একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা তবে ইন্দ্রজাল-রূপে একটা অলীক আলেয়ার আলো নয় কিন্তু বাস্তব পদার্থ, ইহা প্রহেলিকার কুহেলি নয় পরন্তু নামরূপধারী জগতের শত শত বিচ্ছিন্ন পদার্থের ন্যায় একটি। মায়া দর্শনশাস্ত্রের গোলক-ধাঁধা, গীতায় শ্রীভগবান্ 'দুরত্যয়া' শব্দ দ্বারা ইহার অতিক্রমণ যে কি কঠোর তপঃসাধ্য বুঝাইয়াছেন।

"ক্ষর ও অক্ষর" প্রবন্ধে যেখানে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণ আলোচনা করিয়াছি সেখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে অ-জড় ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে বসিয়া জড় সৃষ্টি করিলেন,—এই সুবিশাল জগতের সকল অংশ-(parts)ই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; non-matter হইতে matter-এর অভ্যুদয় ঘটিল, ইহাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য "জীবেন আত্মনা" তিনি আপন সৃষ্ট জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। জীব সৃষ্টি করিয়া নিজে অভিনায়ক হইয়া ভিতরে রহিলেন—আর তাঁহার কিরণকণাপাতে দেহে ইন্দ্রিয়ের দীপান্বিতা জাগিয়া উঠিল! পঞ্চভূতাত্মক দেহের অন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয়ের আত্ম-প্রকাশ ঘটিতে লাগিল তখন কেমন করিয়া ছান্দোগ্যের "দেবাসুর-সংগ্রাম" বাধিয়া গেল, তাহা ক্ষরের পানপাত্রে দেখিয়াছি। অসুরের জন্ম অর্থেই—পঞ্চতন্মাত্রের সমাবেশে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় কাম উদ্দীপিত হয়, ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাত্মক মেঘে যেমন অলক্ষ্যে বিদ্যুৎ জাগিয়া উঠে পঞ্চভূতাত্মক দেহেও তেমনি গোপনে কামের সঞ্চার ঘটে। কাম যাহার স্বরূপ তিনিই কামদেব; দেহের অন্তর্ভাব তন্মাত্রের মধ্যে অনঙ্গের অঙ্গ ভাগ ভাগ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; যখনি ইহারা সকলে পাপড়ির ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ হইল, অমনি ফুল ফুটিল—কাম বিকশিত হইল! কামের বিলোল লালসায় যখন দিব্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি ঐ দিকে টলিতে থাকে তখনই দেবাসুর-সংগ্রাম আরম্ভ হইল।—দেবস্বরূপ ইন্দ্রিয়রাজ-মন চাহিতেছেন দেহে থাকিয়াও ইহার সহিত মূলতঃ পৃথক্ থাকিবেন, আর দেহের মদনরাজ চাহিতেছে পানপাত্র উঁহার মুখে তুলিয়া ধরিয়া দেহের-সুধা পানে মত্ত করাইয়া উঁহাকে আত্ম-বিস্মৃত করাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়াধিপ-মন অ-ক্ষর পুরুষের সহিত অ-ভিন্ন—তাই অ-মৃত-আস্বাদনে বিভোর, আর কামদেব ক্ষর-দেহের সহিত অ-ভিন্ন—তাই মৃত্যুময় জড় সুখের আধার। যে অ-মৃতভোজী সে কেন অ-মৃত ছাড়িয়া মৃতের প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এ আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই,—কিন্তু কখনই অসম্ভব নহে। সংসারে দেখা যায় অমৃতোপম আম খাইয়া বা সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়া কাহারও জমিদারী ছারখার হয় না, পরন্তু ইহাদের তুলনায় পরম বিস্বাদ সুরার রসে মজিয়া কত ধনিকের সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়াছে, হইতেছে। এ কেন? ইহার অর্থ আছে—সুরার এক নাম মদ, যাহা পানে মানুষের মত্ততা আইসে, মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারায়। কিন্তু সন্দেশ-রসগোল্লার নাম মদও নয়, কার্য্যেও মত্ততা নাই। কাম হইতেছে মদনের শক্তি, ইহার আস্বাদনে মত্তত অনিবার্য্য, তাই সেখানে যেমন মদ দেখিয়াছি এখানে দেখিতেছি মদন নামে সেরূপ অভিন্নতা, কার্য্যেও তেমনি সমতা। মদনের সঙ্গে যখন দিব্য মন ক্ষণিক আচ্ছন্ন হয় তখনি মত্ততার সঞ্চার, অ-ক্ষর মনকে ছাইয়া ফেলে। নেশার ঘোরে কেমন যেন ক্ষণিক আত্ম-বিস্মরণ হয়, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে মত্ততার রঙীন পুলকের মধ্যে মনের লোকে একজন জাগিতে থাকে—ইনি মনসিজ। মত্ততায় মনকে মথিত করিতে করিতে ইঁহার উৎপত্তি প্রখ্যাপিত হয় বলিয়া ইনি মন্মথ। যেমনি মনসিজ মনের আসনে আরোহণ করিলেন অমনি অক্ষরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ মন ভুলিয়া গেল, অ-মৃতের স্বাদ বিস্মৃত হইয়া দেহের সুধা-পানে উন্মুখ হইতে লাগিল। মন কামোন্মত্ত হইয়া কেবলি রূপরস-গন্ধে ভরা পানপাত্রের দিকে চুমু খাইবার জন্য লোল হইয়া উঠিল, কেবলি কম্পিত অধরোষ্ঠ লইয়া ঐ দিকে এলাইতে লাগিল—ততক্ষণ রূপরসের ফেনায়িত ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—দেহের এ সুধা পান না করিলে কিছুই ত হইল না। কত সুন্দর, ওঃ কি ভয়ঙ্কর সুন্দর এ রূপের

পেয়ালা, এক চুমুক তারপর আর এক চুমুক—নাঃ আরো, —একেবারে নেশায় মন চুর হইয়া গেল, আর মনসিজ ততই ফুলশর লইয়া মনের আসনে জাঁকিয়া বসিলেন। ছান্দোগ্যের "দেবাসুর-সংগ্রামের" দিব্য মন অসুরের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া আপনার পরিচয় ভুলিয়া গেল, সে ক্ষর-দেহের সুধাপানোন্মত্ত হইতে হইতে ইহার সহিত একেবারে অভিন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। এইখানেই পতন—যেখানে এক ছিল সেখানে দুই হইয়া গেল, "দ্বৈত বাদ" সুরু হইল।

অক্ষর-পুরুষ জড়ের সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; অভিনায়ক সাজিয়া ভিতরে থাকিলেও তাঁহার কিরণ-কণা দিব্য ইন্দ্রিয়রূপে দেহে তাঁহারই জ্যোতিঃ প্রচার করিতেছিল, কিন্তু দেহের অন্তর্ভাব কাম ইন্দ্রিয়প্রধান মনকে বিজয় করিয়া ইহাকে এমনি নেশায় চুর করিল যে সে আপনার আসল পরিচয় ভুলিয়া দেহকে চিনিল—যে, এটিই আমি এবং ইহার রূপরস আমারি, আমি কাম উপভোগ করিব। এ যেন অনেকটা পোষাক পরিয়া অবশেষে আপনার নাম-ধাম ভুলিয়া পোষাকটাকেই 'আমি' মনে করা! এই ভাবেই মিথ্যা আমিত্বের সূচনা ঘটিল, অক্ষরের আশ্রয় ছাড়িয়া মন ক্ষর-দেহের সহিত মিশিয়া 'ক্ষর' হইয়া গেল। এ অবস্থার কথা আচার্য্য শঙ্কর কি সুন্দরই না পরিব্যক্ত করিয়াছেন!

কামাদিবৃত্তিমৎ মনঃ, তেন মনসা ষচ্চৈতন্যজ্যোতির্ম্মন-সোঽবভাসকং ন মনুতে ন সঙ্কল্পয়তি, নাপি নিশ্চিনোতি লোকঃ।

কি আশ্চর্য্য!—মনের শক্তি যে চৈতন্যজ্যোতি জ্বালিয়া দিতেছে মন তাহাই জানে না, চিন্তাও করিতে পারে না! মন্মথের মন্থন কি যাদুমন্ত্র-সিদ্ধ, ইহা যে সমুদ্রমন্থনের ন্যায় নিত্য কামনার গরল-উদ্গীরণ করিতেছে! মন যখন ভুলিল তখন আর কি, মন দেহ-সুধা-পানে মধুপ সাজিয়া বসিল। কিন্তু ভিতরে যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের আধার অভিনায়ক রূপে বসিয়া আছেন তাঁহাতে এ কাম-দৌত্য পৌঁছিতে পারে না, ছান্দোগ্যের সেই "নৈতং সেতুং অহোরাত্রে তরতঃ" ওখানে গেলে রক্ষা নাই, মদন ভস্ম হইয়া যাইবে যে! কিন্তু অভিনায়ক নিঃশব্দে সকলি দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহারি আলো লইয়া যখন মন বিকারের কাম-পঙ্কে গড়াইতে চাহিল, তখন প্রতিকূলতার মধ্যে আলোর যে বিপত্তি তাহা ঘটিল। কথাটি একটু পরিষ্কার করা ভাল। অ-ক্ষর, দিব্য ইন্দ্রিয়, দেহে ঠিক তেমনি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন যেমন ভাবে আমরা ল্যাম্পে আলো জ্বালিয়া থাকি—দেহে আলো হইতেছে অক্ষরের ইন্দ্রিয়রূপী স্ব জ্যোতিঃ। আর ল্যাম্পের আলো ত আমরা জানিই, এ আলোটির দেহ হইতেছে প্রভূত তৈল ও সলিতা। । এটা আমরা বেশ জানি, যদি তৈল ও সলিতার সহিত আলোর অসংযত সম্বন্ধ ঘটে তবে ফলে কি দাঁড়ায়; রাশি রাশি ধূঁয়া উঠিয়া চিম্‌নিটিকে একেবারে কালো করিয়া ফেলে। এ না হইয়া উপায় নাই—এই অসংযত সম্বন্ধকে আলো কিছুতেই সহিতে পারেনা, আলোর স্বভাবই ইহা নয় যে এ অসংযমকে উপেক্ষা করিবে। ল্যাম্পের আলোর যে অবস্থা, অভিনায়কের আলোরও সেই একই অবস্থা। তিনিও এ দেহে তেমনি প্রদীপ জ্বালিয়াছেন। যদি তাঁহার আলোর সহিত দেহের অন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রের অসংযত সম্বন্ধ দাঁড়ায় তখন এই প্রতিকূলতাকে তিনি উপেক্ষা করেন কেমন করিয়া? সেখানে যেমন রাশি রাশি ধূঁয়া বিরুদ্ধ সম্বন্ধের দরুণ প্রতিবাদের ন্যায় আসিয়া চিম্‌নিতে জমাট হয়, এখানেও সেইরূপ ধূমোদ্গীরণ দ্বারা একটা প্রতিবাদ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক এবং ইহা ঘটেও নিশ্চয়। ল্যাম্পের ধূঁয়ায় যেমন বিশ্লেষণ দ্বারা তৈল ও সলিতার সূক্ষ্মাংশের সঞ্চয় ঘটে, অক্ষরের আলোর ধূঁয়ায় তেমনি তবে কি থাকিতে পারে? এক উত্তর দেওয়া যায়—সেখানকার তৈল ও সলিতার স্থলবর্ত্তী পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মাবভাস এ ধূঁয়ায় থাকিবে।

আমরা জানি, দেহের অন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে অনঙ্গের অঙ্গ ভাগ ভাগ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যখনই ইহারা সকলে পাপড়ির ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ হইল অমনি ফুল ফুটিল—কাম বিকশিত হইল। এই কামোপভোগ দ্বারা যে অসংযত সম্বন্ধের পরিচয় দেওয়া হয় তাহার ফলে যে ধূঁয়া উঠিবে তাহাতে তন্মাত্রের সূক্ষ্মাবভাস থাকিবে; তন্মাত্র

প্রত্যুত জড়াত্মক, জড়দেহ না থাকিলে তন্মাত্রের সংস্থান কোথায় হইবে? তাই বলিতে হয় তন্মাত্র জড়স্ফুলিঙ্গবৎ, ইহাদের হইতে যে ধূম উঠিবে তাহা যে তৈল ও সলিতার ন্যায় জড়দেহেরই সূক্ষ্ম উপাদানমণ্ডিত তাহাতে সন্দেহ কি? এবং এই ধূম যে কামাত্মক তাহা ত একপ্রকার নিশ্চয়। কামগন্ধী ধূম যাইয়া, প্রদীপের ধূম ল্যাম্পের চিমনিতে যেমন জমাট বাঁধে, তেমনি অক্ষরকে আড়াল দিয়া এক অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইহাকেই প্রকৃতি আখ্যা দেওয়া শাস্ত্রের অভিপ্রেত মনে হয়। গীতা ইহাকেই "দেহ" শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়া ইহার জড়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শরের আধার যেরূপ তূণীর, সংখ্যাতীত অগণন জন্মের তূণীরও এই প্রকৃতি। ইহারই অতিক্রমণ 'দুরত্যয়া' শব্দ দ্বারা শ্রীভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ইহার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন:—

তাম্...প্রকৃতিম্ কারণমবিদ্যাং কামকর্ম্মবীজভূতাম্...

প্রকৃতির স্বরূপ এইখানে যতদূর উন্মোচিত হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতির সহিত কামকর্ম্মের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহাই প্রতীত হয়, কামকর্ম্ম দ্বারা যে প্রকৃতির অভ্যুত্থান এবং প্রকৃতি হইতেই যে পুনরায় কামকর্ম্মের প্রেরণা প্রবর্ত্তিত হয় তৎসম্বন্ধেও স্বতঃই ধারণা জন্মে। আমরা দেখিয়াছি, ছান্দোগ্যে যখন "জীবেন আত্মনা" হইয়া স্বয়ম্ভূ তৎসৃষ্ট জড়দেহামু প্রবিষ্ট হইলেন তখন প্রকৃতির কোন বালাই ছিল না, ইহার ক্রমিক অভ্যুদয় আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ইহা যে জন্মান্তরের হেতু-স্বরূপ তাহা ঐ "কারণ" শব্দ দ্বারাই বোধ্য হয়। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই,—জড়দেহ দ্বারা অক্ষরের আলোকের অনভিপ্রেত যে কোন কার্য্যই কৃত হয় তাহাই অনৃত বলিয়া গণ্য, সুতরাং অনৃত কথাটি abstract নহে পরন্তু দেহেরই ন্যায় concrete; তবেই বলিতে হয় মানুষের কৃত অসংযত কর্ম্মের একটা material effect ভিতরে সঞ্চিত থাকিবে নিশ্চয়, এবং তবেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়—Vice is material, অনৃত কখনো অ-জড় নয়, পরন্তু জড়। কামোপভোগে যে ফল দাঁড়াইল উহা জড় এবং উহার ক্রমিক সঞ্চয় দ্বারা প্রকৃতির আকার লাভ করিল।

প্রকৃতির এক নাম যেমন মায়া দেখিয়াছি, এখানে আর এক নাম দেখিলাম 'অবিদ্যা'। যে জিনিসটি কামকর্ম্ম, বিদ্যার বিরোধী তাহা যে অ-বিদ্যা হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু এই প্রকৃতির সবে প্রথম কখন সৃষ্টি কে বলিবে? ইহার জন্য Archæology একেবারে নিরুত্তর, Chronologyর অত স্পর্দ্ধা নাই। সৃষ্টির আদি অপরিজ্ঞাত, তাই ইহারও আদি-সৃষ্টি অপরিজ্ঞাত, তাই ইহা অনাদি—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

অনাদি না হইয়া উপায় কি—ইহা বাসনার সহিত বীজাঙ্কুরবৎ সম্পর্কিত। বাসনারও আদি জানা নাই, সুতরাং বাসনাও অনাদি—

ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। ২-৩

সাংখ্যদর্শনের এই সূত্রটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতির সূত্রপাত সুতরাং কর্ম্মারম্ভ হইতে—বাসনাত্মক কর্ম্ম হইতে প্রকৃতির অভ্যুদয়। সাংখ্য দর্শন কহিতেছেন—"কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ"। ৩৬২। অনাদিকাল হইতে কর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, এই কর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই প্রকৃতি আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার ঋষিকল্প গ্রন্থকার এই সূত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম অনাদি; সুতরাং অনাদিকাল হইতে সেই কর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়েন।" প্রকৃতি যে জড় জিনিস তাহা পূর্ব্বের "দেহ" শব্দ দ্বারা প্রতীত হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রসঙ্গে প্রকৃতিকে ক্ষেত্র শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে--ইহাতে প্রকৃতির জড়ত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না।

প্রকৃতি বা মায়ার স্বরূপে আমরা সংক্ষেপে একবার চক্ষু বুলাইয়া আসিয়াছি। ইহাই অনাদিকাল হইতে রঙ্গালয়ের দ্বার রোধ করিয়া আছে, এ অবরোধ না ভাঙ্গিলে অভিনায়ক অক্ষর-পুরুষকে দেখিবার কোন সম্ভাব নাই। লক্ষ্যভেদের ইহাই প্রধান অন্তরায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা জন্মের তূণীর, এক একটি শরের ন্যায় এক একটি জন্ম ইহা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লহরীমালা যেমন সমুদ্র হইতে উঠিতেছে, সমুদ্র না শুকাইলে ইহাদের নিবৃত্তি নাই, তেমনি

শ্বশুরকুলের সকলকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়া, যামা কিছু অর্থ ও সামগ্রী গোবিন্দর গৃহে চালান করিবার এমন সব মসৃণ পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সেই বঞ্চিতের দলে তাঁহার উপরে সবিশেষ তুষ্ট হইতে পারে নাই। অথচ, তিনি মোটের উপরে লোক যে বিশেষ মন্দ ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু গোবিন্দ-সম্পর্কীয় সব ব্যাপারেই তাঁহার সকল বুদ্ধি, সততা এবং সত্যবাদিতায় যেন ঘুণ ধরিয়া যাইত,—এবং শ্বশুরবংশের সমস্ত লোকগুলোর উপরেও অশ্রদ্ধার যেন অন্ত থাকিত না। অতএব যতীশ যদি তাহার খুড়ীমার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। যতীশের খুড়ীমা যাঁহাদের খুড়ীমা নহেন তাঁহাদের এই কথা বলিবার একটি দাবী আছে যে, "তবু ত যা-ই হ'ক গুরুজন, তাঁর প্রতি একটা কর্ত্তব্য—" কিন্তু এই খুড়ীমা যদি তাঁহাদের খুড়ীমা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানটা যে কতটা অসাধারণ হইত সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করাই নির্ব্বিরোধী-রূপে বাস করিবার সহজ উপায়।

কিন্তু গোবিন্দ সম্বন্ধে যতীশের বীতরাগ তারামণির প্রতি বিরক্তিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল,—এবং ইহারই গভীরতা যে কত বেশী, তাহা তারামণি আর একবার নূতন করিয়াই টের পাইলেন যখন এই ছেলেটি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে গভীর অন্ধকারের মধ্যে, হয়ত বা সমস্ত রাত্রিই পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার দুর্ভোগ আপনা হইতেই যাচিয়া লইল, তথাপি গোবিন্দর গৃহে মুহূর্ত্তের জন্য আতিথ্যস্বীকার করার মনেও স্থান দিল না।

লণ্ঠনটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গোবিন্দ ভিতরে চলিয়া গেল। তারামণির অল্প-স্বল্প জিনিষ-পত্র তিনি নিজেই টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নীচে নামাইলেন। আঁচলের গিরা খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে দিলেন। আমীরুদ্দীন গোবিন্দর বাড়ীর কাছেই থাকে, চাষের কাজে জীবনধারণ করে। কি একটা প্রয়োজনে হালের বলদ দুইটাকে ভাঙা একটা গাড়ীতে জুতিয়া গ্রামান্তরে গিয়াছিল,—ফিরিবার পথে যতীশের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যাওয়ায় ফাঁকতালে কিছু উপরি-রোজগারের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল।

নিজের জিনিষগুলা কোন রকমে ভিতরের উঠানে আনিয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তারামণি কহিলেন, "হ্যাঁরে গোবিন্দ, তোর আক্কেলটা কি বল্‌দিকিনি,—জিনিষগুলো হাত লাগিয়ে ভেতরে নিয়ে এলে কি মহাপাপ হ'ত? যা-ই দিদি, তাই তোর এখানে আসি। অপর কেউ হ'লে এমন ভাইয়ের মুখও দেখ্‌ত না!"

ঘরের ভিতরে গোবিন্দ এবং তৎগৃহিণী হরিমতীর আলোচনার অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যাইতেছিল। উভয়ের কেহই তারামণির কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। তারামণি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন, "ছেলেমেয়েগুলোও কি এরই মধ্যে ঘুমোল না কি? কারও কোন সাড়াই ত পাচ্ছিনে। কি অন্যায়ই হয়েছে এখানে আসা! ওরে ও গোবিন্দ,—ও বউ, একবার তোরা কেউ আয় না দয়া ক'রে, জিনিষগুলো দাওয়ায় তুলি।"

ঠিক যেন কে কাহাকে কি বলিতেছে,—ভিতর হইতে গোবিন্দ এবং হরিমতির আলাপের শব্দ কানে আসিতেছে, কিন্তু তারামণিকে তাহারা চেনে বলিয়াও বোধ হইল না।

তারামণি এইবার কান মলিলেন, নাক মলিলেন,—"কালই আমি চ'লে যাব গোবিন্দ, এই নাক-কান মলছি, আর যদি জীবনে তোর বাড়ীমুখো হই, তবে আমায় বলিস্।"

এইবার হরিমতি বাহির হইয়া আসিল, ঢিপ্ করিয়া পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "কতক্ষণ এসেছ দিদি?—কার সঙ্গে এলে? আহা, তোমাকে ইষ্টিশান থেকে আনতে যাবে ব'লে তোমার ভাইয়ের কত আগ্রহ,—দু'দিন আগে থেকে গরুর গাড়ী ঠিক্ ক'রে রেখেছে। সকাল সকাল দোকান বন্ধ ক'রে দুপুরে এসে বল্‌লে কি, 'শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাত দাও ছোটবউ, দিদিকে আন্‌তে যেতে হবে।'—খেয়েদেয়ে উঠে শেষে আমায় ডেকে বলে, 'ছোটবউ, মাথাটা বড় ধরেছে, বোধ হয় জ্বর হবে।' তারপর থেকে বিকেল পর্য্যন্ত ত বিছানায় শুয়ে।"

তারামণি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "গোবিন্দর সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি ত বউ?" মাথা নাড়িয়া হরিমতি কহিল, "না,—এখন ত বেশ ভালই আছে। কিন্তু তোমার কত

কষ্ট হল দিদি—"বলিয়া কি একটা কথা যেন ভাবিয়া লইয়া একমুহূর্ত্ত পরে বলিল, "গাড়ী ঠিক সময় ইষ্টিশানে গিয়েছিল ত ?"

তারামণি কহিলেন, "গাড়ীর জন্তে ব'সে ব'সেই ত এত দেরী হ'য়ে গেল বউ,—কিন্তু কই গাড়ী ত যায়নি।"

হরিমতি একেবারে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "বল কি গো! তাহ'লে ত তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে! কিন্তু মানুষের ব্যবহারটা একবার দেখ দিদি,—এই প্যারীচরণ, দরকার হ'লেই, একটা কিছু বিপদে পড়লেই, অমনি ওর কাছে দৌড়ে আসে,—আর আজকে ওর গাড়ীখানা নিয়ে ইষ্টিশানে যাওয়ার কথা ওকে পই পই ক'রে বলা হয়েছে, কিন্তু একবার দেখদিকিনি নেমকহারামিটা!" বলিয়া প্যারীচরণের অকৃতজ্ঞতায় হরিমতির যেন কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু ভ্রাতৃবধূর অসামান্ত সৌজন্তে তারামণির ক্রোধ এবং অভিমান একেবারে জল হইয়া গিয়াছিল, তিনি কহিলেন, "তাতে আর কি হয়েছে বউ? আমার এমন কিছু বিশেষ কষ্ট হয়নি।"

হরিমতি হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, "আচ্ছা, আমিও দেখব একবার কতবড় বদ্‌মাইস এই প্যারীচরণ! আর কি কোনদিন বাছধনকে এবাড়ীর দোর মাড়াতে হবে না?—কিন্তু তোমার বড্ড কষ্ট হ'ল দিদি!"

"বারবার ওকথা বল্‌ছিস্ কেন বউ? তোরা যে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাল আছিস্, এইতেই আমার আনন্দ। ইষ্টিশানে গোবিন্দকে না দেখে যা ভয় আমার হয়েছিল তোদের জন্তে!"

গোবিন্দ এতক্ষণ ঘরের ভিতরে বসিয়া, মনে মনে হরিমতির নিকট মিথ্যা একটা কাহিনী চট্ করিয়া প্রয়োজন মত দাঁড় করাইবার ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছিল, এইবার বাহির হইয়া আসিল, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি তাহ'লে ওদের ডেকে নিয়ে আসি—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

হরিমতি কহিল, "শনি-পুজো, সেইখানেই গেছে ছেলেমেয়েরা সব,—পিসি পিসি ক'রে ত সবকটা খুন—যাক্, ডেকেই নিয়ে আসুক বরঞ্চ—"

চারদিন পরের কথা।

মিত্রদের বাড়ীর হরেনের বয়স অল্প, কিন্তু হইলে কি হয়, সে দশখানা ইংরাজী বই শেষ করিয়াছে। কিঞ্চিৎ অল্পবয়সে সিগারেট ধরার জন্ত সময়ে অসময়ে তাহার দুই-একটা পয়সার অত্যধিক প্রয়োজন;—সেইজন্ত লোকের চিঠি লিখিয়া দেওয়া হয়ত কদাচিৎ কাহারও টেলিগ্রাম পড়িয়া দেওয়া, এবং মনি-অর্ডার লিখিয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে সে দুই-এক পয়সা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার ইত্যাকার স্বাধীন ব্যবসার কথা বাড়ীতে কাহাকেও জানাইতে তাহার কঠোর নিষেধ আছে, এবং তাহার মক্কেলবৃন্দেরও সে আদেশ অবহেলা করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলার কোন আগ্রহ আপাততঃ নাই, অতএব হরেনের ব্যবসা এখন অন্ততঃ কিছু দিনের জন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ।

গোবিন্দর নামে সেদিন একখানা টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। ইহা অসাধারণ ঘটনা,—গোবিন্দ সেইজন্ত অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যস্ত হইয়া হরেনের কাছে গিয়াছিল। দক্ষিণাস্বরূপ নগদ দুই পয়সা গণিয়া দিয়া, টেলিগ্রামের সংবাদ সে যাহা শুনিল—তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন পাটনা হইতে তারামণির ভাসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশ। তিনি লিখিতেছেন, হঠাৎ হার্টফেল করিয়া তাঁহার খুল্লতাত, অর্থাৎ তারামণির স্বামী সেইদিন সকালবেলা মারা গিয়াছেন। তারামণিকে পাটনা লইয়া যাইবার জন্ত সতীশ তাহার পরের দিন আসিবে, তারামণিকে এখন যেন এ ঘটনা না জানান হয়।

টেলিগ্রামের অর্থ শুনিয়া গোবিন্দর ভাবনার অবধি রহিল না। ভাবনা তারামণির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া নহে,—ভাবনা এখন পাটনায় যাইয়া কেমন করিয়া কোন্ সুযোগে পরলোকগত ভগিনীপতির জিনিষপত্র এবং

টাকাকড়িগুলো হাত করা যায়। সেদিনকার কলিকাতাগামী একমাত্র গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, পরের দিনের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করা ছাড়াও উপায় নাই। গোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিল। এতক্ষণে হয়ত মৃত কুঞ্জবিহারীর আত্মীয়স্বজন, ভাইপো-ভাগিনেয়ের দল পাটনায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইল! অথচ সব কিছুই কিন্তু পাওয়ার কথা তার। আইনে না বলুক, বাস্তবিক-পক্ষে ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী সে-ই, যেহেতু সে চিরকাল তাহার ভগিনীপতির অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে; অতএব যুক্তির দিক দিয়া, ভবিষ্যতেও তাহার ভগিনীপতির অর্থে জীবন ধারণ করিবার দাবী সে রাখে, এবং যেহেতু সে তারামণির ভাই, সেহেতু কুঞ্জবিহারী যে না-বলা না-কহা মরিয়া গিয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন এ ধৃষ্টতাও অসহ্য। বাঁচিয়া থাকিতে যে কোনদিন গোবিন্দর হাত এড়াইতে পারে নাই,—সে আজ মরিয়াছে বলিয়াই যে তাহার বিষয়সম্পত্তিতে গোবিন্দর সমস্ত অধিকার শেষ হইয়া যাইবে, এ যুক্তি গোবিন্দ স্বীকার করিয়া লইতে একান্তই নারাজ। কিন্তু সে স্থির করিতে পারিতেছিল না যে এখন তাহার কি করা উচিত। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সে এখানে এ-রকম বোকা বনিয়া বসিয়া থাকিবে, আর উহারা হয়ত এতক্ষণে ওখানে সমস্তই লুটিয়া-পুটিয়া লইল।

গোবিন্দ সকাল সকাল দোকান বন্ধ করিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বাড়ী ফিরিল। স্ত্রীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল, কিন্তু কিছুই ঠিক হইল না। অবশেষে হরিমতি কহিল, "আচ্ছা, কাল যতীশ আসুক্, দেখাই যাক্-না সে কি বলে।"

পরদিন দুপুরবেলা যতীশ আসিল, এবং ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া গোবিন্দকে তাহার আগমন-সংবাদ দিয়া গেল। যতীশ কহিল, "আজ বিকেলের গাড়ীতেই খুড়ীমাকে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি বাড়ী গিয়ে সব ঠিক ক'রে রাখুনগে, আমি একটু পরে আস্ছি, আমায় গিয়ে যেন না অপেক্ষা করতে হয়।"

কথা হইতেছিল গোবিন্দর দোকানে দাঁড়াইয়া;—গোবিন্দ কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "তুমিও না হয় আমার সঙ্গে এক্ষুনি বাড়ীতে চল। দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে—"

যতীশ বলিল, "এক্ষুনি দেখা কর্‌বার দরকার নেই, আর খানিক পরে একেবারে যাওয়ার মুখেই দেখা হবে 'খন। আপনি তাহ'লে বাড়ী যান্,—আর দেরী কর্‌বেন না।"

খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া গোবিন্দ কহিল, "তোমার আবার এত কষ্ট ক'রে আস্‌বার কি দরকার ছিল, আমিই ত নিয়ে যেতে পার্‌তুম। তবে, দিদিকে একথা জানানর পরে একজনের পক্ষে তাকে নিয়ে যাওয়া শক্ত হ'ত; তা দু'জনই ভাল। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে,—দু'জনের পক্ষে আর ততটা অসুবিধে হ'বে না। হেঁ হেঁ, বুঝেছ কিনা, দশের লাঠি একের বোঝা।" বলিয়া গোবিন্দ টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

যতীশ অত্যন্ত কঠিন স্বরে জবাব দিল, "আপনার যাওয়ার দরকার নেই ব'লেই দাদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে পাটনা যেতে নিষেধ কর্‌বার কথাও আমাকে ব'লে দিয়েছেন।"—গোবিন্দর মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা লক্ষ্য না করিয়াই যতীশ বলিয়া চলিল, "আপনি তাহ'লে সমস্ত গুছিয়ে রাখ্‌বেন, আমায় যেন গিয়ে না দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।" বলিয়া গোবিন্দ কি বলে তাহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

দেড়মাস পরে আবার একদিন যতীশ আসিয়া তারামণিকে গোবিন্দর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। এবার মালপত্র কিছু বেশী। যতীশকে বিদায় দিবার সময় চোখের জল মুছিয়া তারামণি কহিলেন, "মাঝে মাঝে একটু আধটু তত্ত্ব-তালাস করিস্ বাবা, একেবারে ভুলে থাকিস্‌নে যেন।"

যতীশ কহিল, "খোঁজ-খবর নেবো বৈকি খুড়ীমা,—

তোমার কোন চিন্তা নেই।—আমরা আছি, দরকার হ'লেই খবর দিয়ো, আস্‌ব।"

তারামণি বোকা ছিলেন না। গোবিন্দ সম্বন্ধে তাঁহার স্নেহ অত্যন্ত ভারসহ হইলেও তাহাকে তাঁহার অপেক্ষা ভাল করিয়া পৃথিবীতে কেহই বোধহয় চিনিতে না। স্বামীর লাইফ-ইন্সিওরের দরুন হাজার-দুই টাকা তিনি পাইয়াছিলেন। সেই টাকাটা গোবিন্দকে দিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল;—কিন্তু একেবারে সমস্তগুলা টাকা তাহাকে দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িবার বাসনা তাঁহার ছিল না। ভাবিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অর্থ দিয়া তাহার দোকানখানি বড় করিয়া দিবেন,—তাহার জীর্ণ গৃহের সংস্কার করিয়া দিবেন, এবং এমনি আরও কত-কি।

ঘুরিয়া ফিরিয়া গোবিন্দর শৈশবের কথা মনে পড়ে। জননী যখন মারা গেলেন তখন গণেশের বয়স আট, গোবিন্দর ছয়,—তারামণি তখন বারো বৎসরের বালিকা। পিতা পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন, এইবার মাতাও গেলেন। মাতুল ঘনশ্যামের অবস্থা বিশেষ ভাল না হইলেও, ভাগিনেয়ী এবং ভাগিনেয় দুইজনের কোন অনাদর হইল না। গণেশ এবং গোবিন্দ পড়িতে গেল, এবং তারামণির বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। গণেশ পড়া-শুনা করিতে এবং পরীক্ষা পাস্‌ করিতে লাগিল, এবং গোবিন্দ বাড়ী হইতে স্কুলে যাইবার নাম করিয়া বাহির হইলেও স্কুলে গেল না,—এবং যদি বা কদাচিৎ গেল তাহা হইলে ও লেখাপড়ার পরিবর্ত্তে মাষ্টারের সহিত কুস্তী অথবা ঘুষাঘুষির এমন পরিচয় দিয়া আসিল যে, নিরীহ ঘনশ্যাম আর পুনরায় তাহাকে সে পথে পাঠাইতে সাহস করিলেন না।

তারামণির বিবাহ হইয়া গেল। কাঁদিয়া কাটিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া স্বামীর মত করাইয়া তারামণি ভ্রাতা গোবিন্দকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চলিলেন। কিন্তু গোবিন্দর অসাধারণ এবং অসংখ্যপ্রকারের শয়তানীতে তারামণির শ্বশুরগৃহের সকলেই উত্যক্ত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সে তাহার দিদির কাছেই রহিয়া গেল।—আজ তারামণির সে সকল কথা মনে পড়ে। নানারকম কাজে কুঞ্জবিহারী গোবিন্দকে বহুবার লাগাইয়াছেন, কিন্তু বসিয়া খাইয়া শয়তানি করিতে গোবিন্দর যত আমোদ বোধ হইত তত আর কিছুতে নহে;—অতএব কুঞ্জবিহারী তাহাকে দিয়া কোন মতেই কিছু করাইতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্ত্রীর শত অনুরোধ-উপরোধ এবং চোখের জল অগ্রাহ্যপূর্ব্বক তাহাকে নিজেদের বাড়ী হইতে সরাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এই সম্পূর্ণ অপচিত স্থানে তাহাকে জায়গা কিনিয়া ঘর তুলিয়া দিয়াছিলেন,—এই মুদীর দোকানখানি খুলিয়া দিয়াছিলেন।

গোবিন্দ তাহার দিদির জিনিষপত্র এবং টাকাপয়সাগুলোকে সত্য সত্যই ভালবাসিত—এ সম্বন্ধে তাহার ছল-চাতুরী অথবা লেশমাত্র কপটতাও ছিল না। অপর পক্ষে সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রীত ছিল না এবং এ সম্বন্ধেও তাহার কিছুমাত্র ছলনা ছিল বলিয়া কেহ জানিত না।

মাছ ভালবাসে অনেকেই, কিন্তু মাছের কাঁটা কেহই পছন্দ করে না;—এবং গোবিন্দও তাহার দিদিকে বাদ দিয়া তাঁহার টাকাগুলিকেই ভালবাসিত,—আর ইহা কোন গুরুতর অপরাধও নহে।

তাহার গৃহে,—তারামণির অর্থে রচিত তাহার গৃহে, তারামণির আগমন ব্যাপারটা সে পছন্দ করিত না, এবং তাহার প্রতি তারামণির স্নেহ যে কতটা গভীর সে সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল না বলিয়াই, সে তাহার দিদিকে এই কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিত যে, তুমি এখানে আসিয়া উৎপাত করিয়ো না, দূরে থাকিয়া অর্থ এবং নানাবিধ উপহার প্রেরণ করিয়ো,—এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই।

তারামণি ভাবিতেছিলেন, এই ভাইয়ের জন্যই তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে পর হইয়া গেছে,—স্বামী তাঁহার নিজের আত্মীয়স্বজনের কাছে সম্মান পান নাই।

স্বামীর কথা তাঁহার মনে পড়িল,—শ্যালক-অত্যাচার-পীড়িত নিরীহ বেচারা! তারামণিকে বিবাহ করিয়া যেন চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছিলেন।

গোবিন্দ আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "দিদি, তোর

গহনাগুলি ভোঁদার মা'কে দিস্ত'—গায়ে একখানাও জিনিষ নেই, কোথাও যেতে-আস্তে হ'লে আমার মানের হানি হয়।"

দিদির সহিত কথা কহিবার সময় গোবিন্দর কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই গম্ভীর হইয়া উঠে, কিছু প্রার্থনা করিবার সময়ও সে গাম্ভীর্য্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় না,—যেন মহামহিমান্বিত সম্রাট তাঁহার দীনতম ভৃত্যকে আদেশ করিতেছেন, এম্নি একটা ভাব তাহার বাক্যে প্রকাশ পায়!

তারামণি কহিলেন, "গহনা ত আমি নিয়ে আসিনি ভাই,—সব পাটনায় রেখে এসেছি।"

তীব্রদৃষ্টিতে তারামণির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া একটু পরে গোবিন্দ কহিল, "এই ত আমার এতগুলো ছেলে-মেয়ে। বাড়ীতে অসুখবিসুখ লেগেই আছে, ডাক্তার ত আর সব সময় ডাক্‌তে পারিনে,—রায় মশাইয়ের হোমো-প্যাথি ওষুধের বাক্সটা আর বই দু'খানা আমায় দে দিকিনি, একটু প'ড়ে-শুনে' ওষুধ-টষুধ গুলো না হয় দেব' খন।"

তারামণি বলিলেন, "ওষুধের বাক্স ত আমি আনিনি গোবিন্দ।"

গোবিন্দর কণ্ঠস্বর অধিকতর ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, "তোর কাপড়-জামা, শাড়ী-সেমিজগুলো ভোঁদার মা'কে আজই দিয়ে দিস্,—ওগুলো আর যক্ষির মতন আগ্‌লে থাকিস্‌নে।"

তারামণি কহিলেন, "সে সব কি আর সঙ্গে ক'রে এনেছি গোবিন্দ,—বাড়ীর বউ-ঝিদের সব ভাগ ক'রে দিয়ে এসেছি।"

গোবিন্দ আর কথা বলিল না,—যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ করিয়া পা ফেলিয়া সে চলিয়া গেল।—তারামণি যে একটা কথাও সত্য কহেন নাই, তাহা সে বুঝিয়াছিল।

দুইদিন পরে আসিয়া গোবিন্দ আবার কহিল, "রায় মশাইয়ের ঘড়ি আর চেনটা দে ত, আমায় এক জায়গায় যেতে হবে।"

তারামণি কহিলেন, "সে ত পাটনায় রয়েছে—"

গোবিন্দ বলিল, "তবে রায় মশাইয়ের আংটিটা বার ক'রে দে—"

তারামণি কহিলেন, "সেটাও যতীশকে দিয়ে ফেলিছি—"

গোবিন্দ একটা কাগজ এবং দোয়াত-কলম লইয়া আসিল, কহিল, "তবে লেখ্ এই চিঠি তোর ভাসুরের বড় ছেলের কাছে,—আমি যা বলি তাই লেখ্—" বলিয়া তারামণির হাতে কলমটা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "লেখ, আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ গোবিন্দর করকমলে তোমার কাকার ঔষধের যাবতীয় কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স, পুস্তক আর সোনার আংটি, ঘড়ি, চেন, আমার সমুদয় অলঙ্কার, বস্ত্র সমর্পণ করিবে।" বলিয়া গোবিন্দ চুপ করিল, কিন্তু তারামণিকে একটা কথাও না লিখিতে দেখিয়া বলিল, "কি, লিখ্‌ছিস্‌নে যে বড়?"

তারামণি কহিলেন, "ক্ষেপেছিস্ গোবিন্দ? এই চিঠি পেলেই তারা তোকে জিনিষ দেবে?"

গোবিন্দ বলিল, "তুই লিখে' দে ত, তারপর দেখ্‌চি—না দেয়, সে আমি বুঝ্‌ব।"

কিন্তু কিছুতেই তারামণিকে সম্মত করাইতে না পারিয়া তাহার বাড়ী হইতে তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়া, এবং ভালয় ভালয় না গেলে জোর করিয়া তাড়াইবার বন্দোবস্ত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া ক্রোধ-ভরে গোবিন্দ উঠিয়া গেল।

বাড়ীর পিছনের পুকুরে স্নান করিতে যাইবার একটা সোজা রাস্তা আছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশগাছের ভিতর দিয়া একটা পথ গিয়াছে,—দুইধারের বাঁশবনের ঝোপে জায়গাটা অন্ধকার। একটা বহুকালের বৃদ্ধ বটগাছ সেই অন্ধকার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি যে দেখে কে জানে।

তারামণি গহনার বাক্সটা বাঁশঝাড়ের একদিকে একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া মাটি চাপা দিলেন। তাঁহার ঘরের বাক্সের ভিতরও দুই হাজার টাকা ছিল; অতএব চাবিটা নিজের আঁচলে রাখিতে সাহস করিলেন না। বুড়া বটের একটা কোটরে চাবিটাকে রাখিয়া দিলেন,—প্রতিদিন প্রাতে পুকুরে মুখ ধুইতে যাইবার সময়ে সেটাকে বাহির করিয়া আনিতেন, বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিয়া

নোটের পুঁটুলিটা একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেন, পরে স্নান করিতে যাইবার সময়ে চাবিটা পুনরায় বটগাছের কোটরে রাখিয়া আসিতেন। তারামণি নোটের পুঁটুলিটা রোজই হাত বুলাইয়া রাখিয়া দেন, কোনদিনই খুলিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। কি ভাবিয়া সেইদিন সেটা খুলিয়া দেখিবামাত্র তারামণি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন,—ভিতরে কতকগুলা খবরের কাগজ ভাঁজ করা আছে, নোটগুলা অদৃশ্য হইয়াছে। বারান্দায় আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি রে?" গোবিন্দ ভাত খাইতে বসিয়াছিল; তারামণির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল না, কিছু গোপন করিবার চেষ্টাও করিল না,—যেন কিছুই হয় নাই, এম্‌নি ভাবে কহিল, "তোরই ভালর জন্যে নিয়েছি, তা শেষে বুঝ্‌বি—"

তারামণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে ও সর্ব্বনেশে, আমার ভাল তোকে কর্‌তে হবে না, আমার টাকা তুই ফিরিয়ে দে—" খাইতে খাইতেই গোবিন্দ কহিল, "হাঁ, তোর টাকা ফিরিয়ে দিই, আর চোর-ডাকাত এসে এই মেটেবাড়ী থেকে গালে চড় মেরে দু'টি হাজার টাকা নিয়ে যাক্‌ আর কি!—টাকার জন্যে কি শেষে প্রাণটা দিবি?"

তারামণির চীৎকার থামিলনা,—"ওগো গোবিন্দ আমার টাকা নিয়ে আমায় নিশ্চিন্দি করেছে গো!—"

তারামণির কণ্ঠস্বরের উচ্চতায় গোবিন্দ বিরক্ত হইল, কহিল, "তোর টাকা কি আমি চুরি করেছি, না, ফিরিয়ে দেব না বলেছি, যে তুই অত চেঁচাচ্ছিস্‌?"

তারামণি কহিলেন, "যদি না-ই চুরি ক'রে থাকিস্‌, তবে আমায় না বলে নিলি কেন?"

"নিয়েছি তোরই ভালর জন্যে,—তোকে জিজ্ঞেসা কর্‌লে কি, তুই দিতিস্‌?" বলিয়া একটু থামিয়া গোবিন্দ বলিল, "আর তুই-ই বল্‌, এই পাড়াগাঁয়ে কেউ বাড়ীতে দু'হাজার টাকা এম্‌নি ক'রে একটা ভাঙা তোরঙ্গে রাখে? যাকে খুসী তোর জিজ্ঞেসা কর্‌গে যা, দেখি কে কি বলে!" বলিয়া আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "তোর টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার মতলব থাকলে আমি কি স্বীকার কর্‌তুম যে তোর টাকা নিয়েছি?—তুই-ই বল্‌!—"

চোখের জল মুছিয়া তারামণি কহিলেন, "টাকা কি করেছিস্‌?"

"পোষ্টাপিসে জমা রেখেছি—"

"কার নামে?—"

"আমার নামে, ভোঁদার মা'র নামে, আর ভোঁদার নামে।"—

তারামণি আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন. "ওরে অলপ্পেয়ে, আমার টাকা চুরি ক'রে নিজের নামে, বউয়ের নামে, ছেলের নামে জমা রেখে সাধুগিরি ফলাতে এসেছ?"

ক্রুদ্ধস্বরে গোবিন্দ কহিল, "ত্যাখ্‌, মুখ খারাপ করবি না ব'লে দিচ্ছি;—বল্‌ছি যে মেয়েমানুষের নামে পোষ্টাপিসে টাকা জমা হয় না, নইলে তোর টাকা তোর নামেই রাখ্‌তুম, না ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলি—"

তারামণি প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েমানুষের নামে টাকা জমা না হ'লে, বউয়ের নামে রাখ্‌লি কি ক'রে?"

মুহূর্ত্তমাত্র গোবিন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কহিল, "সোয়ামী থাক্‌লে টাকা জমা রাখে, নইলে রাখে না—"

তারামণি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে স্বামী ম'রে গেলে বিধবার টাকা সবাই ঠকিয়ে নেবে নাকি?"

গোবিন্দ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, "জানিনে সে খবর, দরকার হয় জিজ্ঞেসা কর্‌গে যা গবরমেণ্ট্‌কে,—বিধবারা ভাইদের বিশ্বাস করে,—তোর মতন অমন যক্ষি সবাই নয়।"

তারামণি কহিলেন, "তুই আমায় কাল পোষ্টাপিসে নিয়ে চল্‌, আমি সেখানে নিজে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ব—"

খাওয়া ফেলিয়া গোবিন্দ উঠিয়া পড়িল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, পার্‌ব না আমি তোকে নিয়ে যেতে,—চুলোয় যাক্‌ তোর টাকা! আমার দেখ্‌বার দরকার নেই,—তোর টাকা আমি ফিরিয়ে এনে দিচ্ছি,—তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।"

অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া তারামণি কহিলেন, "আমার টাকা দিয়ে দে, আমি আর তোর বাড়ীতে থাক্‌তে চাইনে।"

গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

একদিন দুইদিন করিয়া সাতদিন কাটিল। তারামণি কহেন, "গোবিন্দ, তোর নামে আমি নালিশ কর্‌ব,—জমিদারবাড়ী গিয়ে জমিদারের কাছে তোর নামে ব'লে

আসব,—থানায় যাব আমি,—আমার শ্বশুরবাড়ীর সবাইকে খবর দেব,—"দেখি তুই আমার টাকা দিস্ কি না।"

গোবিন্দ বলে, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তোর মুখে নুড়ো জেলে দেবে "খন, একবার সেখানে গিয়ে দেখ্ না।" পরে সুর নরম করিয়া বলে, কেন একটা গোলমাল বাধাবি দিদি? তার চাইতে তুই চিরকাল এ বাড়ীতে থাক্,—তোকে আমি সুখে রাখব। তীর্থধর্ম্ম যা করতে চাস্ সব করাব, যেখানে বেড়াতে যেতে চাস্ বেড়িয়ে আন্‌ব। আমি যতকাল আছি, তোর ভাবনা কি দিদি?—সামান্য টাকার জন্যে ভাইকে পর করে দিবি? তোর টাকা তোরই আছে, যখন যেমন দরকার বার ক'রে দেব।"

কিন্তু তারামণি ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন, তাঁহার অত্যাহিক ক্রন্দনে এবং নানাবিধ ভয়প্রদর্শনে অবশেষে একটা লোক-জানাজানি হইবার উপক্রম ঘটিল। কোনপ্রকারেই তারামণিকে চুপ করাইতে না পারিয়া গোবিন্দ শঙ্কিত হইল।

সে ভাবে,—দুই হাজার টাকা! খুব বরাতক্রমে জুটিয়া গিয়াছে—কিন্তু গহনাগুলো যে কোথায় রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। টাকাটা? ভাগ্যে সে লুকাইয়া আসিয়া একদিন চাবির সন্ধানটা লইয়া গিয়াছিল! দুই হাজার টাকা! তাহার কত বৎসরের উপার্জ্জন তাহা সে ধারণাও করিতে পারে না। ধরো, গত মাসে অনেক টানাটানি করিয়া তাহার দোকানে লাভ হইয়াছিল কুড়িটাকা,—আর প্রত্যেক মাসে যে কুড়ি টাকাই লাভ হইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? কমও ত হইতে পারে। বাব্বা, দুইহাজার টাকা জমাইতে তাহাকে আরও কতবার এ পৃথিবীতে যাতায়াত করিতে হইবে তাহাকে জানে! আর,—এ কি-রকম সহজে পাওয়া গিয়াছে! কিন্তু এখন রাখিতে পারিলে হয়!- অথচ, দিদি যদি হাঙ্গামা বাধায়, যদি কাহাকেও বলিয়া দেয়!—দিক্ বলিয়া; পোষ্টাপিসেও সে টাকা রাখে নাই যে সেখানে গিয়া সন্ধান লইয়া কেহ কিছু করিবে। দিদি কাহাকেও কিছু বলিলে সে বেমালুম অস্বীকার করিয়া বসিবে,—টাকার কথা সে কিছুই জানে না। কিন্তু আজই শেষ তারিখ, আজিকার ভিতরে টাকা না ফিরাইয়া দিলে জমিদারকে বলিয়া তারামণি থানায় সংবাদ দেওয়াইবেন বলিয়াছেন। গোবিন্দ ভাবিতে লাগিল, জমিদার শালা বড় বদ্‌মাইস্, থানার দারোগাটাও কম নয়,—সেবারকার মোকদ্দমায় একটুখানি বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলায় কি ভোগানটাই না ভুগাইয়াছিল। এবার আবার তারামণির দায়ে শ্রীঘর বাস হইয়া না যায়! কিন্তু টাকাগুলো যদি থাকে, তবে না হয় কয়টা বৎসর ঘরের খরচ বাঁচাইয়া খাটিয়া আসিল। কিন্তু দারোগাটা যা ফেরেব্বাজ, হয়ত টাকাগুলোর কোন গতিকে সন্ধান করিয়া তারামণিকে ফিরাইয়া দিবে।—গোবিন্দ আর ভাবিতে পারে না,—মাথার ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে,—মনে হইতেছে, শক্ত ধাতুর টাকাগুলো জল হইয়া তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া গেল!—ঘুরিতে ঘুরিতে সে পুকুরপারের বাঁশঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তারামণির স্নানের সময় হইয়া আসিয়াছে, ঘাটে আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। সেইখানে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ কি যেন ভাবিতে লাগিল।

অন্ধকারের আব্‌ছায়ায় তারামণির মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা দিতেই, বাঁশঝোপের আড়ালে আড়ালে চলিয়া গোবিন্দ তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া, দুইহাত দিয়া তারামণির গলাটা টিপিয়া ধরিয়া তাহার সর্ব্বশরীরের সমস্ত জোর দিয়া চাপ দিল। প্রাণান্তকর চেষ্টায় তারামণি ঘাড়টা একটু বেঁকাইয়া পিছনদিকে ফিরাইয়া গোবিন্দকে দেখিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার মাংসপেশীর সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া তাঁহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। তারামণির শ্বাস পড়িল না;—গোবিন্দর চুলগুলা তখন খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—চোখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, চেহারার পানে তাকাইয়া মনে হয়, যুগযুগান্তর নরকবাসের পর একটা প্রেত যেন ফাঁকি দিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার প্রহরীবৃন্দের হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে;—তাহার রক্ষীবৃন্দ ছুটিয়া আসিতেছে, কোন্ কুম্ভীপাকে তাহাকে নিক্ষেপ করিবে তাহা কেহ জানে না।—গোবিন্দ আস্তে আস্তে হাতের চাপ ঢিলা করিয়া লইতেই তারামণির মৃতদেহটা শব্দ করিয়া বাঁশ-ঝাড়ের উপরে পড়িয়া গেল। গোবিন্দ আর অপেক্ষা করিল

না,—ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

সেদিনকার প্রভাতে বিশ্বমানবের বন্দনার জন্য পৃথিবীর আয়োজন ছিল সম্পূর্ণ।—প্রকৃতির পূর্ণতায় ত্রুটি ছিল না; —গাছের পাতা ছিল সবুজ, বাতাস ছিল শান্ত, রবিকর ছিল অমলিন, বনানী ছিল রহস্যময়। কিন্তু চক্ষের পলকে যেন সব বদ্‌লাইয়া গেল,—মুখের উপরে ঘনঘোর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া আহতচিত্তে ব্যথিত বিশ্বপ্রকৃতি কহে, "প্রবঞ্চিত হইয়াছি—"

মাঠের পরে মাঠ, গোবিন্দ ছুটিয়া চলিল,—গ্রামান্তরের প্রান্তদেশে এক কুটীরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে কেহ নাই, কোন জিনিষপত্র নাই।

গোবিন্দ আবার ছুটিল,—পিছন হইতে তারামণি ডাক দিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, আমার চাবি?"

গোবিন্দ পিছন ফিরিয়া চাহিল,—কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার এক কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, —তাহারও ভিতরে বাহিরে কোন জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। গোবিন্দ সেইখানে বসিয়া পড়িল। পশ্চাৎ হইতে তারামণি কহিলেন, "গোবিন্দ, আমার টাকা?"—গোবিন্দ চারিদিক চাহিয়া কাহারও সন্ধান পাইল না। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া সে বসিয়া রহিল। সেটা গ্রামের শেষ সীমা,—পরে ধানের ক্ষেত আরম্ভ হইয়াছে।

পোষ্টাপিসে টাকা রাখিতে গোবিন্দ সাহস করে নাই,— পোষ্টমাষ্টার তাহাকে চিনিত, অতগুলো টাকা সে কোথা হইতে পাইল, এই প্রশ্ন উঠিবার আশঙ্কা তাহার ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া গোবিন্দ তাহার দুই বন্ধু—নদেরচাঁদ ও রামলালের নিকট দুই হাজার টাকা সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া রাখিয়াছিল,—ভাবিয়াছিল, ইতিমধ্যে তারামণিকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া যাহা হয় একটা কিছু করিয়া ফেলিবে। কিন্তু টাকাটা যদি একজনের কাছে রাখে, আর সে যদি গোবিন্দকে কোনপ্রকারে প্রতারিত করে, তাহা হইলে সমস্ত টাকাটাই যাইবে, এই ভয়ে দুই গ্রামের দুই বন্ধুর নিকটে দুই ভাগে টাকাটা রাখিয়াছিল;— একজনের হাতের মধ্যে গিয়া না পড়িয়া দুই হাতে টাকাটা থাকিলে সেটা মারা যাইবার সম্ভাবনা কম বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ আসিয়া দেখিল যে দুই পাখীই উড়িয়া গিয়াছে।—রামলাল এবং নদেরচাঁদের মধ্যে হয়ত জানাশুনা অথবা কোনও পরিচয় ছিল না, কিন্তু জগতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের চিন্তার ধারা শেষ পর্য্যন্ত একই স্থানে গিয়া মিলিত হয়,—অতএব রামলাল এবং নদেরচাঁদের মত ও পথের সাদৃশ্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল, মাথার চুলগুলোর ভিতরে ডানহাতের আঙুলগুলো বেপরোয়াভাবে চালাইতে চালাইতে হঠাৎ কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিল, —সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারামণি কহিলেন, "গোবিন্দ, তোর নামে আমি নালিশ কর্‌ব।" দুইহাতে চোখ কচ্‌লাইয়া গোবিন্দ কাহারও উদ্দেশ পাইল না।

ডানদিকে আসিয়া তারামণি বলিলেন, "গোবিন্দ, আমার চাবি?"—পিছন দিক হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, আমার টাকা?"—গোবিন্দ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।— সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে, সর্ব্বত্রই তারামণি। কণ্ঠস্বর ভাসিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ ছুটিতে ছুটিতে পুকুরপারের বাঁশঝোপের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল,—তারামণির দেহটা টানিয়া বাহির করিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সমস্ত শরীরটা যেমনটি ফেলিয়া গিয়াছিল, ঠিক তেমনি আছে! ইহা সে আশা করে নাই,—সে ভাবিয়াছিল আসিয়া দেখিবে হয়ত মুণ্ডুটা নাই, ধড়টা পড়িয়া আছে; নয়ত দেখিবে ধড়টা নাই, শুধু মুণ্ডুটা রহিয়াছে!

চশ্‌মার আড়াল হইতে তারামণির চোখ দুইটা চাহিয়া ছিল,—যে চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টি দিয়া গোবিন্দকে আজীবন তিনি স্নান করাইয়াছিলেন, আজ সেই চোখের মাঝে বিস্ময়, ভয়, ক্রোধ এবং ঘৃণা যেন পাশাপাশি বাস করিতেছিল! গোবিন্দ তারামণির চোখের পাতা দুইটা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে-দুইটা তৎক্ষণাৎ আবার খুলিয়া গিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল!—গোবিন্দ সেখান হইতে বাহির হইয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। পিছনে পিছনে তারামণি হাঁকিতে লাগিলেন, "আমার টাকা দে, গোবিন্দ!" —আকাশে, বাতাসে, কোথাও আর কোনও ফাঁক নাই, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া তারামণি জাগিয়া আছেন,—সে দৃষ্টিও

আর বন্ধ হয় না, চাহিয়া থাকে ত থাকেই।—সম্মুখে আসিয়া তারামণি বলিলেন, "গোবিন্দ, আমার চাবি?—"

অসম্ভব! -ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব! গোবিন্দর চোখ দুইটা জ্বলে, মাথা জ্বলে, গা হাত পা জ্বলে, —সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে।—

তিনটা গ্রাম পরে থানা,—তারামণি ডাকিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, আমার চাবি?"—গোবিন্দ থানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তারামণি বলিলেন, "গোবিন্দ, আমার টাকা?—"

গোবিন্দ দারোগার ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।—

শ্রীআশীষ গুপ্ত

জিজ্ঞাসা

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মানুষ হইয়া মানুষেরে তুমি
কেন কর' অপমান,—
বিত্ত-গরবে বাড়াও দেবতা-
চিত্তের অভিশাপ?
দরিদ্র বলি' অপরাধী কর'
দারিদ্র্যে ভাবি' পাপ?-
মানুষের মাঝে অলক্ষ্যে জাগে
জগতের ভগবান।

হীনতার মাপে দীনতার করি'
পরিমাপ—পরিমাণ,
তুমি বহুমানী—মনে ভাবো বুঝি
আরো যাবে বাড়ি' মান?

আপনার শ্রম-অর্জ্জিত কড়ি
দিন এনে দিন খেয়ে,
মাথা নত করি' না কুড়িয়ে কারো
অবহেলা-অবদান,
পর-পদধূলি অবহেলি'-লেহি'
নাহি চাটুগান গেয়ে
সঞ্চয়—সে কি সম্ভব কভু ?
হে প্রভু বিভববান !

লুঠ-করা ধন পুঞ্জিত করি'
তার পিতা, পিতামহ
যায়নি রাখিয়া,—শিখেনি সে লুঠ,
অপরাধ কি তা' কহ ?

তুমি ধনী—তুমি মানী, গুণী, জ্ঞানী—
একাধারে তুমি সব ;
আমি জানি আর সকলেই জানে—
করিনি অস্বীকার।
তোমার যা-আছে তাই নিয়ে কেন
থাকোনাক নীরব ?

হে মহামহিম, দূরে থেকে করি
তোমারে নমস্কার !

নির্ধন দীন—তারো কিঞ্চিৎ
গুণ থাকে যদি তবু,
সে গুণ নাশিতে কিবা প্রয়োজন ?—
কি তোমার ক্ষতি প্রভু !

জীবনাহবের অস্ত্রের ক্ষত—
কলঙ্ক-লেখা কহি'
করিয়া প্রচার কি লাভ তোমার,
সৌখের সেনাপতি ?
তব উৎসব-আলোকশিখার
সব তাপ একা সহি'
প্রভাতে মলিন দীন দীপাধার—
হ'ল কি ঘৃণিত অতি ?

মানুষ হইয়া মানুষেরে তুমি
কেন কর' অপমান,—
মানুষের মাঝে অলক্ষ্যে জাগে
জগতের ভগবান !

বিবিধ সংগ্রহ

গ্রীসীয় তক্ষণ-শিল্প

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শিল্প-কলার প্রতি আসক্তি মানবের প্রকৃতিজাত সংস্কার—এ সংস্কার অসভ্যদের এমন কি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগের মধ্যেও দেখা যায়। এ সংস্কার জাতি হিসাবে বিকসিত হয় না—সামাজিক প্রভাবে বর্দ্ধিত হয়।

'আর্টেমিস্'

এর ফলে মানুষের উদ্ভাবনী-কল্পনা শক্তি বর্দ্ধিত বা নষ্ট হয়। এর প্রমাণ গ্রীসীয় ভাস্কর্য্য। এ অনুপম শিল্প-কলার অপূর্ব্বতা শিল্পীর জীবনে, নয়—তাদের সৃষ্ট বস্তুতে। অধিকাংশ শিল্পীর নাম অজ্ঞাত—কাহারো শুধু নাম ছাড়া বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। গ্রীসীয় ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ক্রম-উন্মেষ ও নিখুঁত শিল্পের অভিব্যক্তি ও উন্নতির পরাকাষ্ঠার ইতিহাস।

গ্রীক-জাতির শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-জাত অধিকার স্বাধীনতার প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি জ্ঞানের রাজ্যেও তাদের সব বাধা-বন্ধন অসহনীয় ক'রে তুলেছিল। তারা পরম্পরা-গত প্রথা হ'তে মুক্ত ছিল—তাদের শিল্পে প্রাচ্য-দেশীয় শিল্পের প্রভাব পড়া সত্ত্বেও তারা এর অনুকরণ করেনি—তারা শুধু নিজেদের অনুপ্রাণিত ও উন্নতির পথে সাহার্য্য করবার জন্য অন্যদের শিল্প গ্রহণ করেছিল। তারা যা কিছু সৃষ্টি করেছিল—তাতেই তাদের উদ্দীপনা, আনন্দোজ্জ্বল প্রাণ ও সজীব মানসিক তেজ এনেছিল—যাতে ক'রে এমন এক শিল্পের সৃষ্টি হল—তা জগতে সম্পূর্ণ মৌলিক, অভিনব ও অনুপম। তারা শিল্প উদ্ভাবন করেনি—তারা শিল্পের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে। তারা বিশাল 'মনোলিথ' (monolith, পাষাণ-স্তম্ভ বা মূর্ত্তি) নিয়ে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় আকৃতি দিয়ে সৌন্দর্য্যের প্রাণ বার করে—যাতে মানবজাতির চোখে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের নতুন অধ্যায় খুলে গেল। তাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান এরূপ বিকসিত হ'য়েছিল যে প্রতিভাবান যে কোন রূপদক্ষ যা করত-তাই শ্রেষ্ঠ শিল্প বস্তুতে পরিণত হ'ত—তাদের ধর্ম্ম এ প্রবৃত্তি বিকাশের পথে বন্ধন না হ'য়ে বিশেষ সাহায্য করে। তারা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ মানবরূপে কল্পনা করে ও তাদের মূর্ত্তি গঠনের জন্য নিখুঁত মানব-সৌন্দর্য্য থেকে আদর্শ নেয়—

ফলে তারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন আদর্শ ভাস্কর্য্য সৃষ্ট করতে সমর্থ হয়—যা আর কোন জাতির ভাস্কর্য্যে দেখা যায় না—বা কোন জাতির সৃষ্ট শিল্প এর সহ তুলিত হ'তে পারে!

গ্রীসীয় শিল্পের উন্নতি খুব ক্ষিপ্র। এর সূত্রপাত প্রায় ৬২০ খ্রীঃ পূঃ। এ সময়ের সমুদয় মূর্ত্তি একেবারে সেকেলে

"এথিনা"—ফিডিয়াস

(archaic) এযুগকে গ্রীক শিল্পের ইতিহাসে 'আরকেয়িক' যুগ বলা হয়। এর দু'শ বৎসরের ব্যবধানে ফিডিয়াস (Phidias) ও ইক্টিমাসের (Ictimus) ভাস্কর্য্যে উৎকর্ষের বিশেষ নিদর্শন দেখা যায়। খুব সেকেলের দৃষ্টান্ত, আর্তেমিস (Artemis), অত্যন্ত অসংস্কৃত মূর্ত্তি—তারিখ ৬২০ খ্রীঃ পূঃ শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ আদরণীয়। এরূপ মূর্ত্তিকে গ্রীকেরা xoan (দারুমূর্ত্তি) বলত— কাঠ খোদাই ক'রে এ সব মূর্ত্তি গঠিত হ'ত। অতিশয় সেকেলে—ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে তার কোন সূচনা নেই—কোন কারুকার্য্য নেই। কিন্তু এ মূর্ত্তিতে প্রথম মুখের ভাব দেখাবার বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। এ যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন Ægina-মন্দিরের খোদিত মূর্ত্তি। খ্রীঃ পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীকরা সেকেলে কাঠের শিল্প ও প্রাচ্যদেশীয় প্রথা থেকে মুক্ত হ'তে বিশেষ চেষ্টা করে। ৭০ বৎসর পর এর বিকাশ দেখা যায়। Aechur-mus এ যে পক্ষযুক্ত মূর্ত্তি আছে—তাতে লীলাগতি দেখানোর প্রথম চেষ্টা হয়।

মিশর দেশীয় মূর্ত্তির পদদ্বয় সব স্থলেই ভূমিতে সংলগ্ন—আর সে সময়ের সব মূর্ত্তিই পুরুষের—বিশেষ উল্লেখের বিষয়, সপক্ষক দেবী স্মিতাস্য। শুধু হাসি এ স্থলে স্পৃহণীয় না হ'তে পারে—কিন্তু শিল্পে এই প্রথম হাসি দেখানোর প্রচেষ্টা। ভাস্কর্য্যে এ হাসি থেকে ভাব ও উচ্ছ্বাসের উৎপত্তি। এ মূর্ত্তি সূচনা করছে—পরের যুগে প্রতিভাশালী শিল্পী লীলাগতি, নিখুঁত সঙ্গতি ও ভঙ্গী, ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্য প্রকাশে সমর্থ হবে—এ মূর্ত্তি গতানুগতিক প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন পথ দেখিয়ে দিলে।

আহত 'আমাজন'—ক্রেসিলাস

গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যের প্রধান বিশেষত্ব—ভঙ্গীর দ্যোতনা ও ভাবব্যঞ্জনা। এই যুগ গ্রীসীয় শিল্পের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ যুগ (the Golden Age of Greek Art) ব'লে কথিত এই

যুগের শ্রেষ্ঠ তিন জন ভাস্কর হচ্ছেন—মিরন (Myron), পলিক্লিতাস ও ফিডিয়াস্। মিরন ঢৌল প্রদর্শনে বা ভঙ্গীর দ্যোতনায় সফলতা লাভ করেন—তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চক্রনিক্ষেপ-কারীর মূর্ত্তি (The Discobolus or Discus-thrower)। মিশরীদের মূর্ত্তির সহ তুলনায় এ মূর্ত্তির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। মিশরের সমুদয় মূর্ত্তি দর্শকের দিকে চেয়ে আছে ও উল্লম্বতলে (vertical plane) অবস্থিত। এর বিরুদ্ধে মিরনের প্রথম অভিযান তিনি এ চলিত প্রথা ভাঙ্গতে সমর্থ হন। তিনি কখনও রমণী মূর্ত্তি গড়েন নি—তাঁর প্রিয় পরিকল্পনার বিষয়, সুসঙ্গত নিখুঁত মল্লের মূর্ত্তি। তিনি

জয়-দেবী

(The Victory of Samarthrace).

শরীর গঠনে ও ভঙ্গীর দ্যোতনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখালেও তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মুখের সুসঙ্গতি নেই, এ সম্বন্ধে প্লিনি বলেন, "Myron succeeded buyeond all others in human figures in which purely physical qualities are to be expressed......Myron was careless in his treatment of the heads of his statues and he seemed at all times more anxious to express *form* than action."

তাঁর গঠিত আসল মূর্ত্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে—তবে অনেকগুলি অনুকৃতি আছে।

এ যুগের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী—পলিক্লিতাস; তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত, আমাজন (The Amazon, প্রমিলা বা রণরঙ্গিণী স্ত্রী)। এ আদর্শের মূর্ত্তি গ্রীকদের বিশেষ প্রিয় ছিল—তাদের কল্পনা-শক্তি এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'ত। গ্রীক ও আমাজনদের লড়াই—গ্রীক ও পারশিয়ানদের সহ সংগ্রামের প্রতীক (symbol) হ'য়ে উঠে। আমাজনরা কুস্তিগীর—এদের মূর্ত্তিতে রমণী-সৌন্দর্য্য ও বীর্য্যের আদর্শ দেখাবার সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে অপরূপ মাধুর্য্যের ছাপ এনে দেয়—অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-বিন্যাসের সুষমা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই—প্রতি রেখা অতি সুন্দর—এত সুন্দর যে মনে হয় গানের সুর কানে ভেসে আস্ছে। এ মূর্ত্তির সংস্থিতি (pose) বা দাঁড়াবার ভঙ্গিমার নতুনত্ব লক্ষ্য করবার বিষয়। মনের স্বাধীনতা মিশরীদের ছিল না—কিন্তু গ্রীক্‌রা এগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তারই ফলে গ্রীসীয় শিল্প এত শীঘ্র বিকশিত হ'য়ে উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠ্‌তে পেরেছিল। পলিক্লিটাস প্রথমে একটা পা ভূমিতে সংলগ্ন না ক'রে দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখান। তিনি মূর্ত্তির সুষ্ঠুতা ও সম্পাদন করতে নৈপুণ্যের পারিপাট্য প্রদর্শন করেন।

এ গৌরবময় যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর—ফিডিয়াস। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু ব'লে গণ্য—স্বর্ণ ও হস্তিদন্তে নির্ম্মিত 'আথেনা' (Athena) মূর্ত্তি—'পার্থিননে' (Parthenon) অবস্থিত ছিল। ঐ উপাদানে গঠিত জেউস (zeus)—অলিম্পিয়া পর্ব্বতে ছিল। এ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ 'Olymnpian games' সম্পন্ন হ'ত। এ সব মূর্ত্তি ধ্বংস হ'য়ে গেছে, শুধু এথেন্সের যাদুঘরে কতকগুলি নিকৃষ্ট অনুকৃতি আছে। ফিডিয়াসের অনন্যসাধারণ প্রতিভা শুধু দেবতাদের বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয় নি—তিনি 'পার্থিননের' প্রাচীর অলঙ্কৃত করবার জন্য যে সব মূর্ত্তি গঠন করেন তা সাধারণ মানুষের মত। তিনি দেবতাগঠনে আধ্যাত্মিকতার চরম সীমায় উঠেছিলেন। তাঁর শুধু

'টেক্‌নিক্‌স্' জ্ঞান ছিল না—তাঁর সৃষ্টি উচ্চ চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত—তিনি শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে জানতেন। তিনি দেবতাদের মানবাকার ছাড়া আর কোন আকৃতি দেন নি। তাঁর 'জেউস' মূর্ত্তিতে দেবরাজের এমন এক মহান ভাব দেখাতে পেরেছেন, তা আর কোন শিল্পী চির-জীবনের সাধনায় অনুকৃত করতে পারেনি। মূর্ত্তিতে যেন ন্যায়, সাধুতা ও সত্যের মহিমা বিরাজ করছে—তাঁর সৃষ্ট দেবতা নীচভাব প্রভৃতি দোষ-দুষ্ট নয়। যা কিছু মহৎ—যা কিছু পবিত্র, তাই ছিল ফিডিয়াসের আদর্শ।

Hieratic (দেবকার্য্যে উৎসর্গীকৃত) শিল্পের ধারাকে নতুন পথে নিয়ে যাওয়ার চিরন্তন গৌরব—ফিডিয়াসের। তিনি সৌন্দর্য্যের মূল খুঁজে বার করেন— বস্তুর আধ্যাত্মিক রূপ—দেহগ্রাহ্য আত্মা বা কল্পিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য উপলব্ধি করেন। এ আদর্শ সৌন্দর্য্য-খোঁজবার প্রয়াস তাঁর কাজে বেশ বোঝা যায়—এ আদর্শ ছাড়া যুগধর্ম্মের প্রভাবের চিহ্ন দেখা যায়। পারসিয়ান যুদ্ধের ফলে লোকে ব্যক্তিগত ভাব ভুলে গিয়ে জাতি হিসাব সব কাজ করত। এর প্রভাবের ক্রিয়া সে সময়ের শিল্পে বেশ পরিস্ফুট।

ফিডিয়াসের সমসাময়িক দু'শ' বৎসরের গ্রীক-শিল্প উঁচু দরের। যে কোন ভাস্কর যা কিছু করত, তাই সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌ত। দেমেতর (Demeter) ও কোভ (Cove), ইসিস্ (Isis) ও সেফিস্‌নো (Cephisno); চ্যারিটিস্ (Charities) বা নিয়তি দেবীত্রয় (Fates, Clotho, Lachesis, ও Atropos), হর্কুলেস (Hercules) থেসেউস্ (Theseus)—ফিডিয়াসের শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক গঠিত—কিন্তু তাঁর মানসজাত বল্লেও চলে। এ সকল মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ, তা হলেও চরম উন্নতির যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক সৃষ্টি। গঠনের রীতির পবিত্রতায় অপূর্ব্ব শান্ত-গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ—কোন কোন অঙ্গ বিশেষ সমুজ্জ্বল। এ যুগের বিশেষত্বপূর্ণ গতি-ভঙ্গী দেখোনোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, বিখ্যাত নাইক অব্ সমরথ্রেস (The Nike or Victory of Samarthrace)। ৩০৬ খ্রীঃ পূঃ সাইপ্রাস দ্বীপের নিকট নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ স্মরণীয় করবার জন্য গঠিত হয়। জয়দেবী যেন রণশৃঙ্গ (trumpet) বাজিয়ে বিজয় ঘোষণা করছেন। গ্রীক ভাস্কর্য্যের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্গহীন। মাথা উড়ে গেছে—রণশৃঙ্গ, বাহুদ্বয় খসে গেছে তবুও জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব'লে গণ্য। অজানা প্রতিভাবান শিল্পী দৈহিক শক্তি ও বিজয়-শ্রীযুক্ত মাধুর্য্য ছাড়া অঙ্গাবরণে সমুদ্র বায়ুর তীব্রতার আভাস মর্ম্মর পাথরে দেখিয়েছেন।

ভাস্কর্য্যে ভাব-দ্যোতনার দৃষ্টান্ত ভেনুস অব্ মিলো (Venus of Milo)। ১৮২০ খ্রীঃ অঃ Melos (Milo) দ্বীপে ঘটনাক্রমে আবিষ্কার হয় বলে মূর্ত্তির এ নাম হয়েছে। প্যারির 'Louvre' যাদুঘরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য। এ মূর্ত্তি একখানি পাথর কুঁদে গঠিত হয় নি—পাঁচখানি

সারথি

(প্রাক্সিতেলিসের যুগের)

পাথরে গঠিত। একখানায় বক্ষদেশ ও মুখমণ্ডল, একখানায় পাদদ্বয় অবধি নিম্নাঙ্গ, আর বাকী দুইটায় দু'বাহু ও আর একখানায় পশ্চাৎভাগের কুঞ্চিত কেশরাশি। কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের মানসকল্পনাজাত এ অসামান্য নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ মূর্ত্তি তা জানা যায় নি। মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ যুগের বিশেষত্বের লক্ষণে পূর্ণ। আনন-রাগদ্বেষাদি বর্জ্জি-

নির্ব্বিকার ভাব পূর্ণ—দেবী অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে মগ্ন—এমন রমণীয় সৌন্দর্য্য যে তার বিশ্লেষণ চলে না। দাঁড়াবার ভঙ্গী মাধুর্য্যপূর্ণ মহিমাব্যঞ্জক—নিখুঁত স্বাস্থ্য ও সুডৌল আকৃতি—শান্ত গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ—যা কিছু দেবত্বসূচক সে-সব বিশেষ গুণে পূর্ণ।

পরবর্ত্তী যুগে পেলোপনিসিয়ান যুদ্ধের (৪৩১-৪০৪ খ্রীঃ পূঃ) ফলে এথেন্সের বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ মনের বিশালতা নষ্ট না হলেও শিল্পকলায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—এ পরাজয় জাতীয় জীবনে প্রতিঘাত এনেছিল।

কণ্টক-বিদ্ধ বালক—প্রাক্‌সিতেলিসের যুগের

ফিডিয়াসের সময়ের নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ত ভাবের পরিবর্ত্তে শিল্প উচ্ছ্বাসব্যঞ্জক হ'য়ে উঠল। এ যুগের তিন জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী—প্রাক্‌সিতেলিস্ (Prasiteles), স্কোপাস্ (Scopas) ও লিসিপ্পাস (Gysippus)। এ তিন জনের কিছু পূর্ব্বে সিফিসোডোটাসের (Cephisodotus) প্রতিভার ক্ষণিক দীপ্তি দেখা যায়। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন—বালক Plutas হস্তে শান্তি দেবী (Irine)। ব্রোঞ্জে ৩৭০ খ্রীঃ পূঃ গঠিত হয়। মূর্ত্তিতে দেবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এমন কোন বিশেষত্ব নেই—কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠব, ভঙ্গী, অঙ্গাভরণ সম্পাদনে এমন এক সরল, অকৃত্রিম ও উচ্চ ভাব আছে—যা ফিডিয়াসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর প্রাক্‌সিতেলিস্ শিল্পকলার সেই অন্তর্নিহিত গুণ ধরতে পেরেছিলেন—যার জন্য অক্ষয় যশ তাঁর চিরকাল প্রাপ্য। পরবর্ত্তী যুগে তাঁর কার্য্য বিশেষ সমাদৃত হয়—ও সর্ব্বজনপ্রিয়তা গুণে জাতির মস্তে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিডিয়াসের চেয়ে প্রাক্‌সিতেলিস্ বেশী লোকপ্রিয় হলেও, ফিডিয়াস তার চেয়ে কম প্রতিভাশালী শিল্পী—তা নয়; বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। ফিডিয়াসের চেয়ে প্রাক্‌সিতেলিসের কাজ অনুকৃতি করা সহজ বলে প্রাক্‌সিতেলিস লোকপ্রিয় হন। কিন্তু ফিডিয়াসের আসল মূর্ত্তির কঠোরতা ও পরুষ-শ্রীর যে প্রাণ তা কোন অনুকার সহজে আন্‌তে পারে না—এজন্য ফিডিয়াসের যে কোন নিকৃষ্ট অনুকৃতি সহজেই অসঙ্গত হ'য়ে পড়ে। তাঁর প্রতিভার আসল প্রাণ ধরা নিকৃষ্ট প্রতিভার ক্ষমতার বাহিরে। এই যুগে শিল্প-কলা আরো অলঙ্কৃত, আরো নিরঙ্কুশ হ'য়েছিল—রেখাসমূহ আরো বঙ্কিম হ'য়ে ওঠে। শিল্প মহান হওয়ার পরিবর্ত্তে রমণীয় ও মনোহর হ'য়ে উঠ্‌ল। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীর দেবতারা সব বিষয়ে মানুষের মতন হ'য়ে উঠল—তফাৎ এই যে শুধু তারা নামে দেবতা। কিন্তু ফিডিয়াসের যুগে দেবতারা ভক্তদের বুঝিয়ে দিত যে তারা কত নগণ্য—কত তুচ্ছ—কত অবজ্ঞেয়!

প্রাক্‌সিতেলিসের গঠিত শিশু দিওনিসাস্ (Dionysus) হস্তে হর্মেসের (Hermes) আসলমূর্ত্তি পাওয়া গেছে—সেকালের শিল্পের একমাত্র আসল নিদর্শন। প্রাক্‌সিতেলিস্ শান্তসমাহিত বীর্য্যের সহিত তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা এনে দিলেন। মর্ম্মর পাথরে তাঁর কারিগরীর বাহাদুরী আরো অতুলনীয়। যা কিছু মহৎ, যা কিছু উচ্চ, সব এতে আছে—আর অবর্ণনীয় মোহিনী শক্তি—যা দেবমূর্ত্তি পক্ষে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক;—কারণ ইহা পুরুষের ধর্ম্ম নয়;—রমণীর ধর্ম্ম। কোন ফটোগ্রাফ এ মর্ম্মর নির্ম্মিত আসল মূর্ত্তির অপরূপ সম্পাদন দেখাতে পারে নি। কেশ ও চর্ম্মের সূক্ষ্ম সংস্থান, মাংসপেশীর পরিচালনা, অঙ্গাবরণের

অপূর্ব্ব সম্পাদন। শিল্পকলায় উচ্ছ্বাসের দ্যোতনা এ মূর্ত্তিতে বেশ দেখা যায়। কেশরাশি তরঙ্গায়িত ও কুঞ্চিত, প্রশান্ত ললাট-প্রদেশের স্নিগ্ধতা মূর্ত্তিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছে। আর চোখে প্রগাঢ় চিন্তা। গ্রীকলেখক লুসিয়েনের (Lucien) মতে মস্তক-সম্পাদনে প্রাক্‌সিতেলিস সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। সম্পাদন করার কৌশল—তাঁর কার্য্যের বিশেষত্ব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আফ্রোদিতে' (Aphrodite)র প্রতিমূর্ত্তি—এর তুলনায় হর্মে'স্‌মূর্ত্তি নগণ্য সৃষ্টি।

শিল্পের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ ক'রে শ্রেষ্ঠ ভাস্করগণ প্রথম মহান্‌ গাম্ভীর্য্য হ'তে উচ্চ ভাবোচ্ছ্বাসে গিয়েছিল—ক্রমশঃ এ উচ্ছ্বাসে রাগ-দ্বেষাদির ভাবের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল।

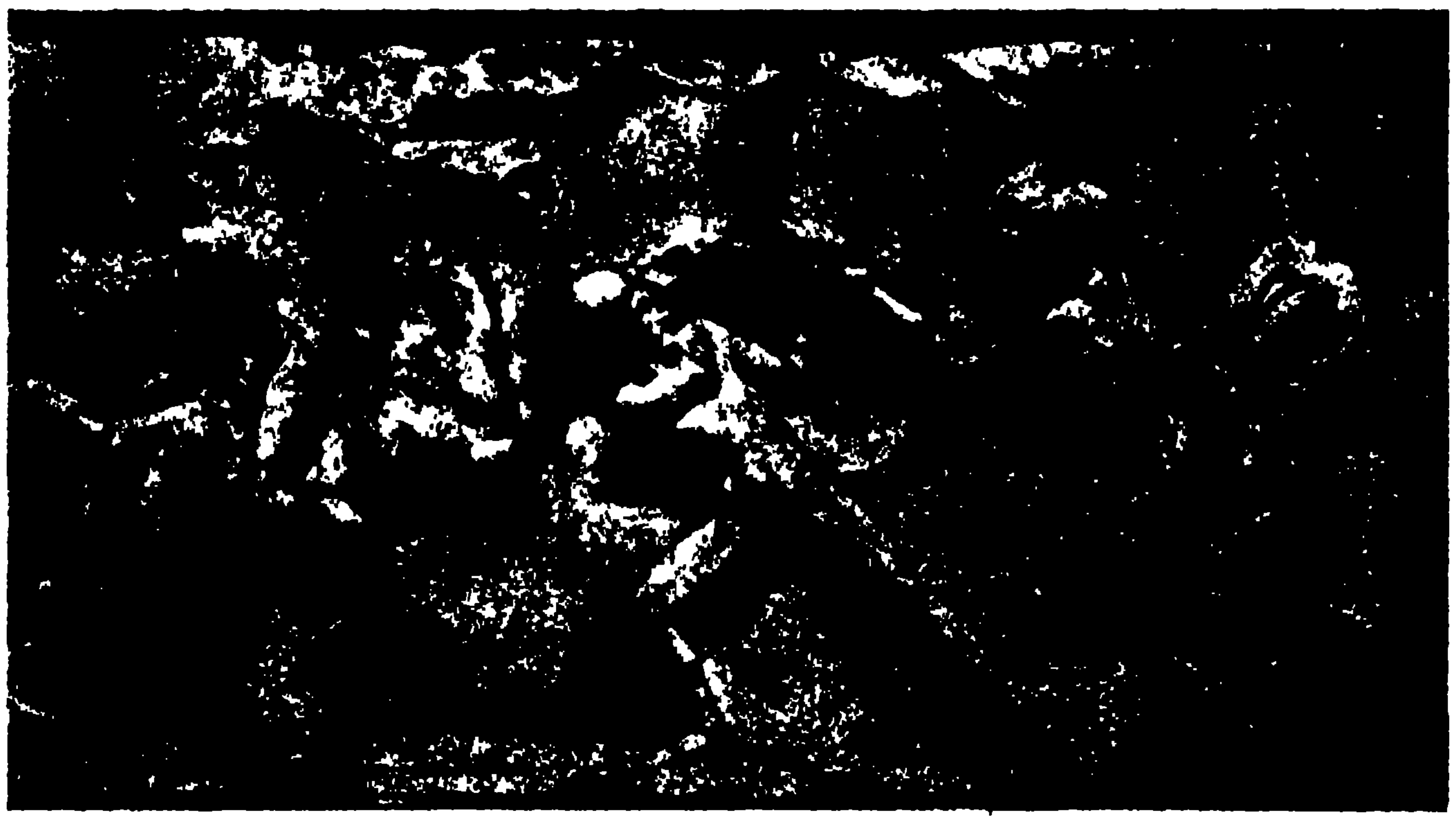

কেরিয়া-রাজ মোসলাসের স্মৃতি-মন্দিরের কপোতে খোদিত মূর্ত্তি

হৃদয়গ্রাহী ও অভিনয়োপযোগী বিষয় হিসাবে ক্লাসিকাল 'নাইওবে' (Niobe)র কথা অতুলনীয়। থিব্‌সের রাজা আম্ফিওনের (Amphion) পত্নী নাইওবের ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল। তিনি সন্তানদের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে 'লিটোর' (Leto) সন্তানদের সহ তুলনা ক'রে গর্ব্বপ্রকাশ করেন। এ জন্য আপোলো (Apollo) ও আর্তেমিস তাঁকে ভীষণ শাস্তি দেন। এক একটি ক'রে তীর ছুঁড়ে আপোলো তাঁর ছেলেদের ও আর্তেমিস তাঁর মেয়েদের নিহত করে। নাইওবে ক্লাসিক গল্পে শোকের প্রতীক হ'য়ে উঠ্‌লেন। স্কোপাসের দলের কোন ভাস্কর এঁর মূর্ত্তিতে শিল্প-কুশলতার বিশেষ জ্ঞান ও ভাব-দ্যোতনায় বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তাঁকে এরূপভাবে গঠিত করা হয়েছে যেন তিনি সন্তানদের চারিদিকে একটির পর একটি নিহত হ'তে দেখে দুঃসহ যন্ত্রণায় ছোট মেয়েটিকে দেবতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। শেষ আঘাতে নাইওবে অভিভূত—সুন্দর মুখ শোকে উন্মত্ত ও কম্পিত; এতে ভাবের দ্যোতনায় সংযম যে কত হৃদয়স্পর্শী তা শিল্পী দেখিয়েছেন। এরূপ সংযমের মহৎ দৃষ্টান্ত মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটর (The Dying Gladiator) দেখা যায়। জ্বলন্ত বাস্তবতা ও প্রগাঢ় করুণরসে পূর্ণ। কিন্তু লেকুন-সঙ্ঘে (The Lacoon Group) বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। পিতাপুত্রের সর্পসহ সংগ্রাম খুব হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী ও অভিনয়-উপযোগী ভাবে সম্পাদিত। তবে নাইওবের সহ তুলনায় 'শক্তি' প্রকাশে যেন বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যায়।

স্কোপাস তাঁর প্রতিভার প্রকৃতি অনুযায়ী খুব সীমাবদ্ধ ছিলেন—প্যাগান ধর্ম্ম, দেবতা ও তাদের শত্রুসহ সংগ্রাম তাঁর বিষয়বস্তু ছিল। স্কোপাস তাঁর খোদিত আননে ফিডিয়াসের মহান্‌ গাম্ভীর্য্য ও প্রাক্‌সিতেলিসের মাধুর্য্য সহ ক্রোধ, প্রেম ও বীর্য্য পরিস্ফুটনে চেষ্টা করেন। এতে প্রাথমিক গ্রীক-ভাস্কর্য্যের মুখসের মত কৃত্রিম মুখের অনেক উন্নতি সাধিত করা হয়—কিন্তু অপরদিকে অবনতির যুগের বিকৃত মুখের পথ দেখিয়েছিল। ভাবোচ্ছ্বাসের অতিশয়োক্তির জন্য স্কোপাস দায়ী নন—তিনি তেজব্যঞ্জক সৃষ্টির জন্য তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পেলোপনিসের (Peloponnese) অন্তর্গত তিগিয়ার (Tegia) মন্দিরের কাজ—তাঁর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। এসিয়া মাইনরে মোসলাসের (Mausolus) মূর্ত্তিতে স্কোপাসের প্রতিভার মৌলিকতা ও বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও স্থপতি পাইথিয়াস সহ একযোগে রাজ্ঞী আর্‌তেমিসিয়ার (Artemisia) আদেশে তাঁর স্বামী কেরিয়া-রাজ মোসলাসের স্মৃতি-মন্দির গঠিত করেন। 'এই 'মোসলিয়াম' জগতের অন্যতম আশ্চর্য্য। স্কোপাস এই চৈত্য-গৃহের 'কপোতে' (frieze) ক্ষোদিত

করেন। এর অঙ্গাভরণ-সম্পাদন তক্ষণ-শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক—ইহা ক্ল্যাসিক-যুগের কঠিন ভাঁজ হ'তে আরো উন্নত,—'জয়দেবী'র (The Victory of Samarthrace) অঙ্গাভরণের শেষ সম্ভাবনা সূচনা করে। ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিভাবান ভাস্কর এর প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে নি।

লিসিপ্পাস Sicyon দেশীয় ভাস্কর। তিনি ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি করতেন ব'লে প্রায় সব নষ্ট হ'য়ে গেছে। মল্লদের মূর্ত্তি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি প্রকৃতি ও প্রাক্সিতেলিসকে গুরু ব'লে মানতেন—তিনি attic-শিল্পে ডোরিক পদ্ধতির তেজপূর্ণ ভাব আনেন। আলেকজান্দারের কার্য্যে নিয়োজিত হ'য়ে তিনি সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি থেকে শিকার ও সংগ্রাম-দৃশ্য, মল্ল-ভাস্কর্য্য ও দেবতার মূর্ত্তি—কোন কাজ হ'তে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁর চির-স্মরণীয় সৃষ্টি—প্রসিদ্ধ-মল্ল Apoxyomenus। গ্রীসীয় তক্ষণ-শিল্পে লিসিপ্পাসের ব্যক্তিত্ব অপূর্ব্ব—

আলেকজান্দারের প্রস্তর-নির্ম্মিত শবাধার

তিনি আলেকজান্দার-স্থাপিত নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়ে-ছিলেন—কিন্তু তাঁর সম্পর্ক ছিল অতীত যুগের সঙ্গে। তিনি রূপকের ভারী ভক্ত ছিলেন।

প্রাক্সিতেলিসের সময় গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যে মাধুর্য্য, লীলাগতি, ও ভাব-উচ্ছ্বাস পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল—কিন্তু এর পরের যুগে তীব্র আবেগ বা মানসিক উত্তেজনা মর্ম্মরকে আন্দোলিত ক'রে তুলল—ভাস্কর্য্য তখন নিজ বিশেষত্ব ভুলে গিয়ে চিত্রকলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলে। ফলে এই সময় হ'তে গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যের পতনের যুগ। দৃষ্টান্ত হিসাবে "Furnese Bull" ধরা যেতে পারে—এ মর্ম্মরে মূর্ত্ত করবার উপযুক্ত বিষয় নয়। শিল্প-কলার ইতিহাসে এ সময় এক নতুন জাতি দেখা দিল—জগতকে শাসন ও নতুন আদর্শ সৃষ্টি করবার জন্য। আলেকজাণ্ডারের বিশাল মাসিডন-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর রাজকীয় ক্ষমতা সপ্তপর্ব্বত-বেষ্টিত রোম-নগরীর হাতে এল। কিন্তু রোমীয় প্রতিভা ভাস্কর্য্যে নতুন কিছু দিতে পারে নি। তারপর শিল্পকলার গৌরবময় যুগ অন্তর্হিত হ'ল। অসভ্য, বর্ব্বর গথ ও ভাণ্ডালদের আক্রমণে প্রাচীন সভ্যতা ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে গেল। এর সঙ্গে সমুদয় ইয়োরোপ অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হ'ল। এ যুগের নাম—তামস-যুগ (dark ages)। এ যুগ অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। যাবতীয় কলা-শিল্প লুপ্ত হ'ল—দেউল-মন্দিরাদি নষ্ট হ'য়ে গেল—ক্ল্যাসিকাল সময়ের যা-কিছু গৌরবজনক নষ্ট হ'ল বা ধ্বংসাবশেষ সহ লুপ্ত হ'য়ে গেল। খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ বর্ব্বর জেতাদের মতন ক্ল্যাসিক যুগের জগতের শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদরাশির মর্য্যাদা বোঝে নি। এ অমূল্য সম্পদরাশির নাশ প্রত্যেক সৌন্দর্য্য-পূজকের দুঃখ করবার যোগ্য। রেনেশাঁসের পূর্ব্ব অবধি শিল্প দাসত্ব থেকে মুক্ত ছিল না—ইয়োরোপময় ব্যাপ্ত বিখ্যাত গির্জ্জায় গির্জ্জায় শোভিত উপল-চিত্রে সমুদয় কল্পনা-শক্তি ব্যয়িত হ'ত; কিন্তু শিল্প-কলার কতকটা প্রকাশ পায়—'বাইজানটাইন' (Bizantine) শিল্পে। ইতালী শিল্প-কলাকে রাজকীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে নিয়ে গেল। শিল্প-কলার এ নবজাগরণ—এর মূলেও গ্রীস। কনস্তান্তিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যের কতক বিশেষত্বের অধিকারী গ্রীসীয় শিল্পীরা শিল্প-কলার নিদর্শন ও পুঁথি নিয়ে ইয়োরোপময় ছড়িয়ে পড়ল। এককথায় বলা যায়-প্রাথমিক রোমীয় ভাস্কর্য্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পরে ইতালী সৌন্দর্য্য খুঁজে পেয়ে ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কিলিমান্‌জারো—আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ হইতে সাতাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মান মিশনারী রেব্‌ম্যান্ তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়া যান যে তিনি দূর হইতে একটি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া দেখিয়াছেন; প্রথমে উহা মেঘ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পথ-প্রদর্শক বলে উহা মেঘ নহে "বেরেডি"—ঠাণ্ডা। ক্রমে আরও নিকটে আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন উহা মেঘ নহে, বহুদূরবর্ত্তী কোনো উচ্চ পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরদেশ। এই সর্ব্বপ্রথম কিলিমান্‌জারো পর্ব্বত ইউরোপীয়দের নজরে পড়িল।

দূর হইতে কিলিমান্‌জারো পর্ব্বতের দৃশ্য

ইহার পূর্ব্বে ইউরোপে কেহ জানিত না যে বিষুবরেখা হইতে মাত্র ৩ ডিগ্রী দূরে এত বড় একটি বিশাল তুষারাবৃত পর্ব্বতের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং মিশনারী রেব্‌ম্যানের কথা কেহ শোনে নাই, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। রেব্‌ম্যানের পক্ষেও একটু মুস্কিল হইয়াছিল—তিনি জোর করিয়া কোনো কথা বলিতে পারেন নাই। কিলিমান্‌জারোর শিখরদেশ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই মেঘে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা মেঘ কি তুষার, এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনেও সকলের কথা শুনিবার পরে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এ লইয়া তিনি আর কোনও তর্ক করেন নাই।

কিন্তু দিন যতই যাইতে লাগিল, এ সম্বন্ধে এত রাশি-রাশি প্রমাণ জমিতে সুরু করিল যে বৈজ্ঞানিকগণ ব্যাপারটাকে আর হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। ইহার কিছুকাল পরেই নানাদিক্ হইতে ভৌগোলিক অভিযান আরম্ভ হইল—শুধু কিলিমান্‌জারো আবিষ্কারের জন্য নয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ পর্ব্বত কত উচ্চ তাহার একটি তুলনামূলক হিসাব প্রস্তুতের জন্য এবং আফ্রিকা মহাদেশে এরূপ কোনো উচ্চ পর্ব্বত আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য। একটি দুইটি করিয়া উপরি উপরি কয়েকটি দল কিলিমান্‌জারো পর্ব্বত খুঁজিয়া বাহির করিতে রওনা হন ও সে সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করেন। ঐ সকল অভিযানের বিবরণ পড়িলে বিস্মিত হইতে হয় শুধু এই ভাবিয়া যে সাতাত্তর বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান সভ্যতা কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশেও নিজের অধিকার বিস্তার করিতেছে। পূর্ব্বে কিলিমান্‌জারো পর্ব্বত ছিল আফ্রিকার অতি দুর্গম স্থানে অবস্থিত—সেখানে পৌঁছিতে হইলে জনবিরল অরণ্য, মরুভূমি, নানা পর্ব্বত ও দুর্দ্দান্ত জাতিদের দেশের মধ্যে দিয়া বহুদিন ধরিয়া যাইতে হইত। আর এখন সেই কিলিমান্‌জারো পর্ব্বত ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে ট্রেনে মাত্র আঠারো ঘণ্টার পথ।

যে সকল ব্যক্তি এই পর্ব্বত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ডাঃ হ্যান্স্ মেয়ারের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকদিন ধরিয়া কিলিমান্‌জারো পর্ব্বতের সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সম্বন্ধে যে বই লিখিয়া গিয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাহাই কিলিমান্‌জারো সম্বন্ধে একমাত্র মূল্যবান গ্রন্থ। তখন ইহার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে

জার্ম্মানেরা নিজেদের অধিকারবিস্তার-কার্য্যে শুরু করিয়াছিল এবং হয়তো কালে ইহার সমগ্র অংশই জার্ম্মানদিগের অধিকারে আসিত। কিন্তু ইতিহাসজ্ঞ পাঠকেরা জানেন কিরূপে অল্পকাল মধ্যেই এই সকল প্রদেশে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে কিলিমানজারো পর্ব্বত ব্রিটিশ ইষ্ট্ আফ্রিকার সীমার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। এই ব্রিটিশ ইষ্ট্ আফ্রিকার বর্ত্তমান নাম কেনিয়া।

জার্ম্মানি এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল—সেটা খুবই স্বাভাবিক; কারণ কিলিমানজারো পর্ব্বতের ম্যাপ প্রস্তুত করা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কার-কার্য্য সবটাই তাহাদেরই উদ্যোগে হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান্ সম্রাট কাইজার উইলিয়ম এই পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নানা উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার আত্মীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করেন,—পর্ব্বতটা তাঁহাকে জন্মদিনের উপহার স্বরূপ দেওয়া হউক। ইহার অল্পদিন পরেই তাৎকালীন ব্রিটিশ ইষ্ট্ আফ্রিকার সীমার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং কিলিমানজারো পর্ব্বত পুনরায় জার্ম্মাণির অধিকৃত ভূভাগে ঢুকিয়া গেল।

সুবিখ্যাত পর্য্যটক সার্ হ্যারি জনষ্টন্ ইংরাজদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বতে আরোহণ করেন এবং ইহার উদ্ভিদ্-সংস্থান বিষয়ে সার্ হ্যারি জনষ্টনের যে বই আছে তাহা একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ১৯১৪ সালে মিঃ ওয়েষ্ট্ নামে জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ও পর্ব্বতের ক্রেটারেও নামেন, এবং দুর্গম বরফাবৃত অধিত্যকা পার হইয়া ইহার আর একটি উচ্চ শিখর—যেখানে এ পর্য্যন্ত কেহ যায় নাই—সেখানে গিয়া ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন।

দূর হইতে কিলিমানজারো পর্ব্বতের দৃশ্য অতীব সুন্দর। অন্যান্য পর্ব্বতের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না—বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত আরও অনেক আছে কিন্তু সেগুলি কোনো একটি বড় পর্ব্বতমালার অংশ মাত্র, কিন্তু কিলিমানজারো সেরূপ নহে। ইহা যেখানে অবস্থিত সেখানে অন্য কোনো পর্ব্বত নাই, নিম্নের সমতলভূমি হইতে একেবারে খাড়া প্রায় বিশহাজার ফিট্ উচ্চ ইহার তুষারাবৃত শিখরের সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য না দেখিলে বোঝানো যায় না। প্রধানতঃ ইহার দুইটি শিখর—

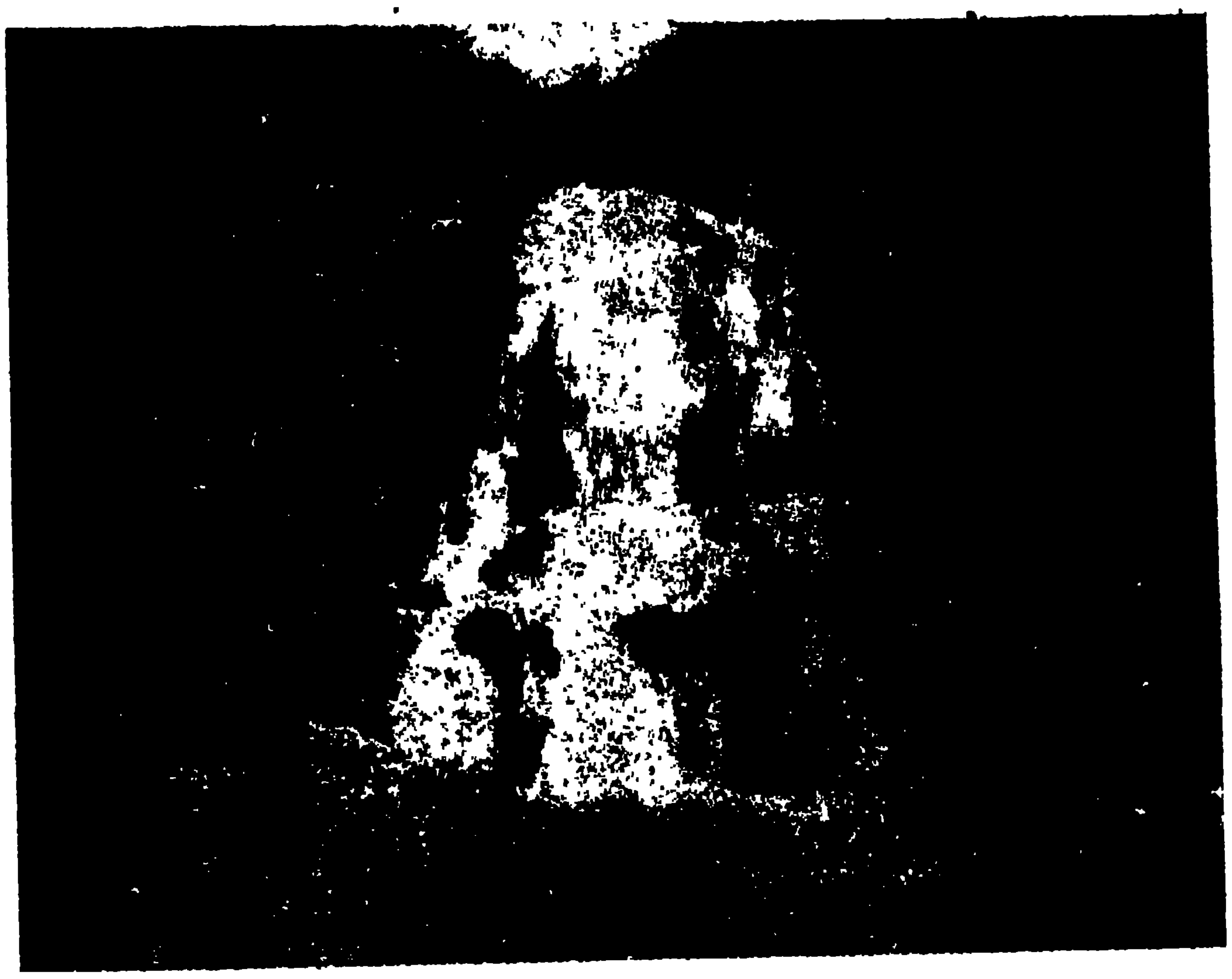

"ফেরারি ফল্স্"—কালেমো

কিবো (উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফিট্) ও মায়েন্জী (১৭,০০০ ফিট্)—মধ্যে প্রায় পাঁচমাইল-ব্যাপী একটি বিস্তৃত অধিত্যকা প্রদেশ। যেদিক হইতেই দৃষ্টিপাত করা যায়, এই পর্ব্বতের দৃশ্য এত মনোমুগ্ধকর যে সমগ্র আফ্রিকা ভূখণ্ডে একমাত্র ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ছাড়া এত সুন্দর জিনিস আর নাই।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যখন শিখরদেশের তুষার গলিতে আরম্ভ করে তখন নানা দিক হইতে জল পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। চিরতুষার-রেখার অর্দ্ধ মাইলের মধ্যেই ঘন আরণ্যভূমি—এই আরণ্যভূমির দৃশ্যও অতি মনোহর—গ্রীষ্মকালে এই বনের নানা অংশ দিয়া এই সকল প্রপাতের জল নীচে নামিতে নামিতে সবগুলি মিশিয়া যায় ও মাত্র দুইটি বড় বড় জলপ্রপাতের সৃষ্টি

করে। সমতলভূমি হইতে এই জলপ্রপাতের দৃশ্য অতি গম্ভীর।

পর্ব্বতের উত্তর দিকের ঢালু জমিতে আজকাল অনেকে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং প্রধানতঃ কফি চাষের উপযোগী। এই অংশে ইউরোপীয়দের পরিচালিত বহু কৃষিক্ষেত্র আছে—স্থানীয় অধিবাসীরাও সম্প্রতি কিছু কিছু জমি লইতে আরম্ভ করিয়াছে, তবে তাহারা প্রধানতঃ আলু, ভুট্টা ও তরিতরকারীর চাষ করে।

পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে না ভুলিলেও প্রায়ই তাহার মধ্যে যায় না। ইহারা প্রধানতঃ কলার চাষ করিয়া থাকে। উত্তর অংশের ঢালু জমি প্রায়ই কফিক্ষেত্র ও কলাবাগান।

কৃষিক্ষেত্রসমূহের কিছু উপর হইতে ঘন অরণ্যময় ঢালুর আরম্ভ। এই অরণ্য সাধারণশ্রেণীভুক্ত নহে—ইহা অত্যন্ত নিবিড় ও প্রায় এগারো হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বনে হস্তী খুব বেশী,—যদিও গরিলা, বানর, ও অন্যান্য জন্তুও

কিলিমান্জারোর তুষার-মণ্ডিত শিখর "কিবো—সমুদ্র হইতে ২০ হাজার ফিট উচ্চ

কফিক্ষেত্র-পরিচালনের জন্য যে বিপুল মূলধনের আবশ্যক তাহা তাহাদিগের নাই। তবে অধিবাসীদিগের অনেকেই এই সকল ক্ষেত্রে মজুরের কাজ করিয়া কফি-উৎপাদনের প্রণালী শিখিয়া লইতেছে। আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে ইহারা এদিকে মন দিবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই অধিবাসীগণ অসভ্য ও রক্তপিপাসু বর্ব্বর ছিল। তাহারা সব সময়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত এবং কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। নরবলি ও নরমাংসভোজন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও কৃষিজীবী জাতি হইয়া

আছে। আদিম অধিবাসীগণ খুব ভাল শিকারী নয় বলিয়া বোধ হয় হস্তীর বংশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেক সময় অরণ্যের প্রান্তবর্ত্তী কফিক্ষেত্রসমূহ ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় ইহারা দলবদ্ধভাবে কৃষিক্ষেত্রসকলের উপর আসিয়া পড়ে এবং মাইলের পর মাইল ধরিয়া গ্রাম ও ফসল একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া আবার বনে পলাইয়া যায়। একবার ইহাদের উপদ্রব এত বেশী বাড়িয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও একবৎসরের মধ্যে বহু চেষ্টার ফলে পাঁচশত হাতী মারা পড়ে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এত বেশী যে এত মারিয়াও তাহাদের উপদ্রব বিশেষ কিছু

কমে নাই।

আজকাল কিলিমানজারো পর্ব্বতে আরোহণ করা খুব দুঃসাধ্য নহে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকের ঢালু দিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক; এইদিকে বড় বড় পথ তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং অনেক ধনী ও আস্থাপন্ন ইউরোপীয় কফিক্ষেত্রের মালিক পাহাড়ের উপরে তাঁহাদের বাসস্থান স্থাপন করিয়াছেন। এই বাসস্থান অবশ্য শিখরদেশে বা অরণ্যময় ঢালুর নিকটে নয়, তাহাদের অনেক নীচে। আশা করা যায়, অল্পদিনমধ্যে এই পর্ব্বত দেখিতে কৌতুহলী আমেরিকান্ টুরিষ্টদের ভিড় হইবে।

নাচের পোষাক পরিহিত 'ওয়াথাগুগা' বালিকা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রহেলিকা-সুন্দরী

শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা

তুমি সুন্দরি, কেন নিশিদিন ধরি,
ফিরিছ ভুবনে আমারে পাগল করি' !
সন্ধ্যা-উষায় কনক-আঁচল টানি'
ওগো কুহকিনি, কেন ঢাক' মুখখানি ?
যে স্বপন তুমি রচিছ অন্তরালে,
তাই উঠে ফুটি' রূপের ইন্দ্রজালে
তাই হেরি' মোর নয়ন উঠে যে ভরি'—
প্রহেলিকা-সুন্দরি !

তুমি আছ শুধু প্রাণেমনে তাই জানি,—
চির-চঞ্চলা, চিররঙ্গিণী রাণি !
বাসনার তীরে চির-কল্পনারূপে
গোপন চরণে বিহরিছ চুপে চুপে ;
তুমি হৃদয়ের শুধু অনুভূতি-ভরা,—
দিশি দিশি প্রাণ উদাস আকুল করা,—
সকল চিত্তে কী যে তোল' মর্ম্মরি'
প্রহেলিকা-সুন্দরি !

তোমারে আমার নয়ন না পায় খুঁজি,'
তোমারে কেবল অন্তরে মনে বুঝি ;
তনুবন্ধনে লইতে না পারি কাড়ি'—
পাইতে কেবলি আপনারে যাই ছাড়ি' !
যেথা বাহু নাই, যেথা নাহি পরশন,
যেথা আঁখি নাই, যেথা নাহি দরশন,
সেথায় তোমারে স্বপনে আপন করি,—
প্রহেলিকা-সুন্দরি !

কতদিন,—কত ভরা-বরষার দিনে
চকিতে তোমারে লইয়াছি যেন চিনে' !
কত বসন্তে বনপথে যেতে যেতে
উদাস গন্ধে হারায়েছি পেতে' পেতে' !
কত শরতের নীরব জ্যোৎস্না-রাতে
স্বপনে তোমারে দেখেছি শিশির-পাতে,-
নূপুরের সুরে তন্দ্রা পড়িছে ঝরি'...
প্রহেলিকা-সুন্দরি !

আমার এ ভুল পাগল জীবন-মাঝে
আসিয়াছ তুমি কত বিচিত্র সাজে—
কখনো আভাসে,—কখনো ভাবের মত,
কভু সঙ্গীতে,—নিবিড় বেদনা কত !
কখনো আবেশে নিমেষে বিভোর করা,
ধরি ধরি তবু আর নাহি যায় ধরা—
স্মৃতিখানি শুধু হৃদে ফিরে সঞ্চরি' !
প্রহেলিকা-সুন্দরি !

ইনসিওরেন্স

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আদিম যুগে মানুষ ছিল একান্ত বর্ব্বর, স্বার্থের দাস। প্রাণ যা চায় তাই সে করিত—শরীরের আরাম,মনের আরাম যেমন করিয়া হোক আয়ত্ত করা চাই। অপরের তাহাতে কোথায় কি বাজিল, সে দিকে লক্ষ্যমাত্র ছিল না।

তার পর শিক্ষায় তার মন জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে-মনে স্নেহ-প্রেম, মায়া-মমতা, দরদ-সহানুভূতিও দেখা দিল। প্রাণ যা চায় তা করিতে করিতে প্রাণের যারা প্রিয়জন, তাহাদের কোথাও ব্যথা বাজে কি না, এদিকে তার দৃষ্টি পড়িল। এবং এই দৃষ্টি-পড়া হইতেই সে সংসার পাতিতে শিখিল; ক্রমে সংসার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে দেশ, ভূঁমি, জনপদ, রাজ্য, ব্যষ্টি-সমষ্টি; এবং মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে বাস করিতে লাগিল। সমাজবন্ধনের ইহাই পূর্ব্ব ইতিহাস। তারপর নানাজাতি, বিভিন্ন সমাজ national, international প্রভৃতি জটিলতর ব্যাপারের সৃষ্টি। কিন্তু এসব কথা আজ আমাদের আলোচ্য নয়।

সংসারে মানুষ আরাম চায়। জীবনযাত্রার প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হইলেই আরাম; নিজে ভালো খাইব, ভালো পরিব, স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে যাহাই জুটুক,—এমন এমন কথাও যে একালে মানুষ বলে না, তা বলিতেছি না। তারা বাহিরে চাকচিক্য যতই জাহির করুক, অন্তরে সেই আদিম মানুষের মত বর্ব্বর রহিয়া গিয়াছে।

সাধারণ মানুষ স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে আরামে রাখিতে পারিলেই জীবনে আরাম বোধ করে। তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের দিকে এই যে মানুষের লক্ষ্য, ইহার মূলে দরদ, সহানুভূতি বা আরো ব্যাপকভাবে করুণা, দয়া, এ কথা অনায়াসে মানিয়া লওয়া চলে। এমন মানুষ বিরল নয় যে মৃত্যুর পর নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর জন্ম সামান্ত সংস্থান রাখিয়া বিষয়সম্পত্তি দাতব্য-চিকিৎসালয়ের জন্ম বা এমনি কোনো অনুষ্ঠানের কল্যাণে দান করিয়া যায়। এ বৃত্তির মূলে দুটি কারণ সহজে অনুমান করা যায়। প্রথম, খ্যাতির লোভ; দ্বিতীয়, সুখের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া দাতার বৃহত্তর গণ্ডী রাখিবার প্রয়াস। এবার হইল জটিল ব্যাপার। সোজাসুজি এই দরদ বা দয়ার দিকটা আলোচনা করা যাক।

এই দরদ বা করুণা-বৃত্তি সকল দেশের—সকল মহাপুরুষ মানবচিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়াই বিবৃত করিয়াছেন। জীবনে আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দুর্ভাগ্য, অভাব-অভিযোগ ক্ষতি-লোকসানের অন্ত নাই এবং তা থাকিবেই;—তবে কারো ভাগ্যে মাত্রা তার বেশী, কারো বা কম।

যে-বৃত্তি মানুষের মনে স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা জোগায়, সেই বৃত্তিই তাকে বিশ্বহিতের জন্ম দানশীল করিয়া তোলে। এই বৃত্তিই মানুষকে সর্ব্বপ্রথম সঞ্চয়ী হইবার প্রেরণা দান করে। যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ আমার উপার্জ্জনের পয়সায় আমার স্নেহাশ্রিত স্ত্রীপুত্রকে সকল অভাব-অভিযোগ হইতে আগুলিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে তাদের অভাব-অভিযোগ কে মোচন করিবে? করুণার দিক হইতে এই প্রশ্ন যেদিন মানুষের মনে প্রথম সাড়া দিল, সেদিন সে তার উপার্জ্জনের কড়ি হইতে কিছু কিছু সঞ্চয়ের তহবিলে জমাইতে লাগিল—এই সঞ্চয়ে মানুষের অবর্ত্তমানে স্নেহাশ্রিতদের অভাব-অভিযোগ মিটিবে।

এমনি করিয়া সংসারী মানুষ সঞ্চয়ী হইল। অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করিতে না জানিলে মানুষ সঞ্চয়ী হইতে পারে না। জীবনে চলার পথে নানা প্রলোভন—যেন দোকানীরা রঙীন পণ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে—পয়সা ফেলিলেই আয়ত্ত হয়,—কিন্তু নিমেষের দ্বিধা—না, যে-পয়সা ঐ বাহুল্যের জন্ম ব্যয় করিব, তা থাকিলে হয়তো কোনো দুর্দ্দিনে আমার স্নেহাশ্রিতদের এর চেয়ে বেশী আরাম দিতে পারিব। লোভটুকু সম্বৃত হইল। স্বার্থত্যাগ করিতে না জানিলে এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

এমনি করিয়া শত লোভ সম্বরণ করিয়া চলিলে তবে স্ত্রীপুত্রের ভবিষ্যৎ অকল্যাণ দূর করিবার জন্য সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারিব। পয়সা বাঁচাইতে লাগিলাম—আমার মৃত্যুর পর ঐ পয়সায় স্ত্রীপুত্রের অভাব মিটিবে।

কিন্তু এ কি সহজ ব্যাপার। দুর্দ্দিনের মেঘ নিত্য ঘনাইয়া ওঠে—বাজ হাঁকিয়া যায়, প্রবলবৃষ্টি ধারায় সংসার ছাউনি বুঝি ভাসিয়া যায়। লোকলৌকিকতা, রোগ-শোক, দায়ের পর দায় দৈত্যের মত হুঙ্কার তুলিয়া সামনে দাঁড়ায়,—তাদের দাবী মিটাইতে সঞ্চয়ের থলি খুলিয়া পয়সা বাহির করিয়া দিই। এমনি দিতে দিতে থলিটুকু একদিন নিঃশেষ হইয়া পড়ে। সঞ্চয়ের থলি খুলিবার সময় ভাবিয়াছিলাম, আজ ব্যয় করি, আবার একদিন জমাইয়া তুলিব। কিন্তু হয়তো সেদিন আর না আসিতেও পারে! তখন?

স্ত্রীপুত্রকে যদি একেবারে নিঃস্ব সহায়হীন নিরাশ্রয় ফেলিয়া চলিয়া যাই—তবে কে তাদের দেখিবে? হয়তো কারো না কারো প্রাণে দয়া হইবে—নিছক দয়ার ভিখারী হইয়া আমার স্ত্রীপুত্রের দিন কাটিবে। নয়তো তারা দাসত্ব করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে—তাও যদি না জুটে মৃত্যু—অতি নির্ম্মম, শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইবে।

দয়ার ব্যাপারে অপরের উপর দায় চাপাইলাম; এ দায়ের মাত্রা বেশী ঘটিলে, শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয় একেবারে সমষ্টিগত অর্থাৎ সামাজিক ক্ষতি ঘটাইব অনেকখানি। তা-ছাড়া একজনের দয়ার দান অপরকে কতখানি গড়িয়া তুলিতে পারে? দানে দাতা ধন্য হইতে পারেন, কিন্তু সে দান যে গ্রহণ করে তার মনুষ্যত্ব পদে পদে ক্ষুন্ন হয়, কুণ্ঠিত হয়—সে মনুষ্যত্বের গঠন যথোচিত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন ঘটে প্রচুর।

তার উপর, ইচ্ছা থাকিলেই মানুষ সঞ্চয়ী হইতে পারে না। মানুষের মন তো অনুশাসনে চলার বস্তু নয়—তারমনের একটা স্বচ্ছন্দ গতি আছে। সেই গতির মুখ হইতে মনকে রুখিয়া রাখিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তি সকলের থাকে না। এমনি নানা কারণে, আমাদের মনে হয় জীবনবীমার যে ব্যবস্থার আদর আজ সুরু হইয়াছে, মানুষকে সঞ্চয়ী করিয়া তুলিবার পক্ষে তার মত পাকা ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। মাসে মাসে বীমার টাকা দিতেই হইবে এই যে বাধ্যবাধকতা, মানুষ এই বাধ্যতার বাগেই অনাবশ্যক বহু বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়।

ইন্‌সিওরেন্সের অর্থ কি? যে জীবন বীমা ক'রে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট বয়স হইতে প্রতি মাসে বা প্রতি তিনমাস অন্তর বা বছরে নির্দ্ধারিত-রেটে কোম্পানীকে টাকা দিতে হয়, এই দেয় টাকার হার বয়স-অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। এই টাকা দিতে হয় একটা নির্দ্দিষ্টকাল অবধি—দশ বৎসর, পনেরো বৎসর বা বিশ, বাইশ বা ত্রিশ বছর কাল ধরিয়া। যত অল্প-কাল টাকা দিতে হয়, দেয় টাকা সেই পরিমাণে বেশী হয়। সারা জীবন অর্থাৎ যতদিন বাঁচিবা ততদিন টাকা দিব—এমন সর্ত্তও থাকে। এই টাকার বিনিময়ে কোম্পানী সর্ত্ত করেন, নিরূপিত কাল অবধি বীমাকারী বাঁচিয়া থাকিলে তাঁর বীমার নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইবামাত্র তিনি, বা তাঁর মৃত্যু হইলে তাঁর উত্তরাধিকারী মোটা টাকা পান্—এবং এই নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু ঘটিলে ঐ মোটা টাকা বীমাকারী কোম্পানীর কাছ হইতে আইন মতে পান।

যাঁর যেমন অবস্থা তিনি তেমনি টাকার জন্য জীবন-বীমা করিতে পারেন। ধনী জীবনবীমা করেন দশলক্ষ টাকার,—কেরানী করেন এক বা দু হাজার টাকার। বীমা-কোম্পানী ঐ টাকার উপর বোনাস দিয়া থাকেন—যে টাকার বীমা হয়, তাহা সুদে খাটাইয়া সে সুদও প্রাপ্য টাকার সহিত দেন এই নিয়মে দেখা গিয়াছে। পাঁচ হাজার টাকার বীমায় (with profit) বীমাকারী যথাকালে প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছেন।

বীমার উপকারিতা বহু। যিনি ধনী, তিনি তাঁর প্রচুর অর্থ জীবিতকালে দানাদিতে ব্যয় করিলেও তাঁর মৃত্যু ঘটিলে তাঁর স্ত্রীপুত্র বীমার টাকায় আর্থিক স্বচ্ছলতার সকল সুযোগই পাইয়া থাকেন; অল্প আয় যাঁদের, তাঁদের স্ত্রী-পুত্রকে রোজগারী কর্ত্তার মৃত্যুকে গালি দিতে হয় না।

নানাকথা

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন ও রবীন্দ্রনাথ

গত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইতে না পারায় সভামধ্যে যে চাঞ্চল্য এবং বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পরে এই ঘটনা লইয়া সাধারণের মনে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ জাগিয়া উঠে, সে সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। অভিযোগ প্রধানতঃ এই যে, শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ রবীন্দ্রনাথের সভায় উপস্থিতি সম্ভব না হইলে সে কথা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষকে সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে তাঁহার জানানো উচিত ছিল, তাহা ত তিনি জানান নাই, অধিকন্তু সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া কয়েক স্থানে তাঁহাকে যে তার করেন তাহারও তিনি উত্তর দেন নাই। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে সকল কথা শুনিয়া সাধারণের মনে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে তাহা অপনোদনের জন্য আমরা নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশ করিলাম।

১। আমেদাবাদে অবস্থানকালে অত্যন্ত গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতার মধ্যে চিকিৎসকগণের সনির্ব্বন্ধ নিষেধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অতিকষ্টে তাঁহার অভিভাষণটি লেখেন। পরে বরোদায় গিয়া তাঁহার শারীরিক অবস্থা এত বেশী মন্দ হয় যে, সম্মেলনে যোগ দিবার সংকল্প একান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

২। অগত্যা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চৌধুরী উক্ত অভিভাষণটি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং স্বতন্ত্র পত্রে লেখেন যে, রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থায় কলিকাতায় গিয়া সম্মেলনে যোগদান করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে, একথা যেন তিনি সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন এবং সভাস্থলে অভিভাষণটি পাঠ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

৩। সংবাদ পাইয়া অধিবেশনের সাতদিন পূর্ব্বেই সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে দুইজন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অভিভাষণ ও উক্ত পত্রটি লইয়া যান।

৪। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনকালে কানপুরে রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রেরিত তারগুলি পান। তখন সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, এবং সম্মেলনে উপস্থিত হইবার অক্ষমতার সংবাদ তার বহু পূর্ব্বে তিনি দিয়াছেন।

উল্লিখিত তথ্যগুলি বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, প্রথমত, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র বাবুর নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক সংবাদ পাওয়ার পর সম্মেলনের পক্ষ হইতে অতগুলি তার করিয়া রবীন্দ্রনাথকে যোগদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি না করিলেই ভাল হইত, এবং দ্বিতীয়ত, তারগুলির উত্তর না পাইয়া সেগুলি রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছায় নাই, —এই সহজ সিদ্ধান্ত করিয়া অধিবেশনের প্রথম দিন রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার অতিকষ্টে লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়, এই কথার বলে সভাপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত অভিভাষণ, যাহা তিনি অপর কর্ত্তৃক পঠিত হইবার জন্যই পাঠাইয়াছিলেন, সর্ব্বাগ্রে পঠিত না করা উচিত হয় নাই।

কত কষ্টে উক্ত অভিভাষণটি লিখিত হইয়াছিল এবং অভিভাষণটির প্রতি যেরূপ আচরণ করা হইয়াছিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে অভিভাষণটি পাঠাইবার কালে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে সে কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। নিম্নে আমরা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

কল্যাণীয়েষু,

সম্ভাষণটা অনেক দুঃখের লেখা। আঙুল চল্‌তে চায় না, মাতালের মত টলোমলো করে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ভূমিকম্প হ'তে থাকে—উপবাস-ক্লান্ত দুর্ব্বল মস্তিষ্ক করুণা ভিক্ষা করে। যমদূতকে উপেক্ষা ক'রে কোনোমতে লিখেচি—হাতের অক্ষর দেখ্‌লে সভানেতাদের মনে উদ্বেগ জাগতে পারে এই আশা ক'রে মূল হস্তলিপিটাই পাঠিয়েছিলুম। যমদূত দয়া ক'রে ক্ষমা ক'রলে কিন্তু বাংলাদেশের সভা-পাষাণী ভ্রূকুটি ক'রেই রইল।

তারপরে লেখাটা নিয়ে সভায় যা খুসি তাই হল, —প্রায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর ব্যাপার। পরে এই উপেক্ষিত লেখাটাকে লেখকের বিনা সম্মতিতেই দৈনিকে পাঠালেন।

অবজ্ঞার সঙ্গে পদচ্যুতি ও শব্দবিভ্রম ও অক্ষর ভুলের যোগ হয়ে লেখাটা আবর্জ্জনার আকার ধারণ করেচে। তুমি যদি তোমার সাহিত্যিক পত্রের সাধু পংক্তিতে ওকে পুনশ্চ জাতে টেনে নিয়ে ওর মান বাঁচাতে পারো তা হ'লে আমি খুসি হব। আজকাল বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা নারীও সমাজে ফেরে, আমার লেখার বেলায় কি সেই শুদ্ধির সম্ভাবনা নেই?

শীঘ্রই সমুদ্রপারে পাড়ি দেব। ফেব্রুয়ারির শেষ কয়েকদিনে কলকাতায় থাক্‌ব—দেখা করতে চাও যদি তো দেখা হবে। ইতি ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশা করি অতঃপর কাহারও মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থাকিবে না।

* * *

রোবাইয়াৎ হাফেজিয়ানা

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের এই সংখ্যায় প্রকাশিত "রোবাইয়াৎ হাফেজিয়ানা"র সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। হাফেজের প্রকৃত নাম ছিল খুজা শামসুদ্দিন মহম্মদ এবং তিনি ওমর খৈয়ামের প্রায় চারশো বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু। অন্যান্য ইরাণী কবিদের মধ্যে যাহা নাই, ওমর খৈয়াম অনুবাদক ফিটস্‌জেরাল্‌ডের মতে হাফেজ এবং ওমর খৈয়ামের মধ্যে তাহা আছে—Hafiz and old Omar Khyyam ring like true metal। ১৩৬৯ সালে গৌড়ের তদানীন্তন সুলতান গিয়াসুদ্দিন হাফেজকে বাংলায় আসিতে নিমন্ত্রণ করেন। কবি তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং একটী গজলে নিজের দুঃখ সুলতানকে জ্ঞাপন করেন এবং তজ্জন্য পুরস্কৃত হন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন—ইহার কিছুকাল পরে দাক্ষিণাত্যের সুলতান বাহমণি বংশের মহম্মদ শাহের আমন্ত্রণে তিনি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য

কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ

সমস্ত উদ্যোগ সমাধা করেন। কিন্তু জাগজে চড়িয়া সমুদ্র পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হওয়ায় তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, সে সময়ে হাফেজের যশ ভারতবর্ষেও কতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কবি নিজেই এই যাত্রার সম্পর্কে বলিয়াছেন—

মাঝ দরিয়ার তুফান মাঝে হীরক মালার লোভ
লুপ্ত হ'ল রইল তবুই ঘরটি ছাড়ার ক্ষোভ!

রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্রের ওমর খৈয়াম অনুবাদ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন—অর্থাৎ অনুবাদে মূলের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাব্যকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়—এ ক্ষেত্রেও কান্তিচন্দ্র সেই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। হাফেজ চতুষ্পদী কবিতা খুব বেশী লেখেন নাই এবং রোবাইয়াৎ গুলিই যে সেই সকলগুলির সমষ্টি তাহাও নহে। তাঁহার অন্যান্য কতকগুলি কবিতাকেও অনুবাদক রোবাইয়াতের রূপ

দিয়াছেন। হাফেজের আধ্যাত্মিক কবিতা গুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়া অনুবাদক সাধারণ প্রেমের কবিতাগুলিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত এবং এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। আশা করি কান্তিচন্দ্রের ‘ওমর খৈয়ামে’র মত ‘হাফেজিয়ানা’ও বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রীতি সাধনে সক্ষম হইবে।

* * *

সবুজ সঙ্ঘ—কলিকাতা

গত সরস্বতী পূজার সময় ৩৮নং কাশী মিত্রের ঘাট ষ্ট্রীটস্থ সঙ্ঘ ভবনে সবুজ সঙ্ঘের বার্ষিক শ্রী-পঞ্চমী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে যে সরস্বতী প্রতিমাটি গঠিত হইয়া পূজিত হইয়াছিল তাহার ছায়াচিত্র আমরা এখানে দিলাম। সঙ্ঘ সভ্য শ্রীদেবাংশু রায় ও শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি পরিকল্পিত ও শ্রীযতীন পাল কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। রূপপরিকল্পনায়, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের অপূর্ব্ব শ্রীতে গঠন সৌষ্ঠবে এই দেবীমূর্ত্তি এ বৎসর কলিকাতার রসবেত্তা সুধী মণ্ডলী কর্ত্তৃক সৌন্দর্য্যের অভিনব বিকাশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হংসপদ্মারূঢ়া সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর আসন মঞ্চের উভয় পার্শ্বের দুইটি কীর্ত্তনীয়া রমণীর খোদিত মূর্ত্তি এবং দুইটি সূর্য্য-চক্র মৌলিক পরিকল্পনার পরিচায়ক। দেশের এই সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণের সময়ে তরুণ সমাজের এই সৃজনপ্রচেষ্টা ও ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

সবুজ সঙ্ঘের বাণী প্রতিমা

* * *

সারস্বত মহামণ্ডল—গ্রন্থকার-সম্বর্দ্ধনা

“সারস্বত মহামণ্ডল” হইতে যে পত্র আমরা পাইয়াছি তাহার প্রয়োজনীয় অংশ সাধারণের অবগতির জন্য আমরা প্রকাশিত করিলাম।

“সারস্বত মহামণ্ডল” কর্ত্তৃক প্রতি- বৎসর শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজার মধ্যে সমালোচনার্থ বঙ্গভাষায় (গদ্যে ও পদ্যে যে কোনও) মুদ্রিত গ্রন্থ গৃহীত হয় এবং প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিকবর্গ কর্ত্তৃক সমালোচনান্তে বৈশাখমাসে মহামণ্ডলের প্রকাশ্য

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ মেলে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। মাদ্রাজে জাহাজ ধরিয়া তিনি উপস্থিত প্যারিসে যাইয়া কিছুকাল তথায় যাপন করিবেন। তাহার পর ইংলণ্ড এবং সুবিধা হইলে অন্যান্য স্থানেও যাইবার সঙ্কল্প আছে।

সভাধিবেশনে সুযোগ্য ব্যক্তির সভাপতিত্বে গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রীগণকে যোগ্যতানুসারে গ্রন্থ-রচনা-সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ বিনা অর্থ গ্রহণে প্রশংসাপত্র ও উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এ বৎসর সংবাদ-পত্রে এই গ্রন্থকার-সম্বর্দ্ধনার সংবাদ অতি বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় ও বহু গ্রন্থকারের অনুরোধে মাত্র বর্ত্তমান ১৩৩৬ সালের জন্য গ্রন্থাদি গ্রহণের শেষ দিন ১০শে চৈত্র নির্দ্ধারিত হইল। যিনি প্রশংসাপত্র ও উপাধির প্রত্যাশী নহেন, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থের এক এক সংখ্যা মহামণ্ডল-গ্রন্থাগারে দান করিলে মহামণ্ডল তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ঐ অনুগ্রহদত্ত গ্রন্থসকল বঙ্গভাষার উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ 'মহামণ্ডল-গ্রন্থাগারে' শোভা পাইবে।

সমালোচনার্থ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ ও সমালোচনান্তে গ্রন্থ প্রত্যার্পণ করা হইবে না। মহামণ্ডল প্রতিবর্ষ এই অনুষ্ঠান বজায় রাখিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ বেদান্ততীর্থ এম-এ, কার্য্যাধ্যক্ষ—সারস্বত মহামণ্ডল, ৪১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রন্থাদি পাঠাইবেন।

* * *

৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

গত ২৭শে মাঘ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত করিয়া বরেন্দ্রভূমির অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়া অক্ষয়কুমার অসামান্য ঐতিহাসিক গবেষণা শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "সিরাজুদ্দৌলা" "গৌড়রাজ মালা" "গৌড়লেখ মালা" বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন তাঁহার জন্য একটি গৌরবজনক স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে। বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান বহুমূল্য। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইল।

* * *

ভ্রম সংশোধন

গত মাঘমাসের বিচিত্রায় "অতীতের স্মৃতি" প্রবন্ধে ২৫৫ পৃষ্ঠায় "উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি অন্য আসামীগণ জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।" "বিচারে উল্লাসকর প্রভৃতির প্রাণদণ্ড হয় এবং আলিপুরের জেলের প্রাঙ্গণে তাঁহাদের শবদাহ করা হয়।" এই দুইটি প্রকাশিত কথা ভ্রমাত্মক। চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র বসু নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। উল্লাসকর বাবু এখনো জীবিত আছেন। কানাইলালের শব আলিপুর জেলের প্রাঙ্গণে দাহ করা হয় নাই, ফাঁসির পর তাঁহার আত্মীয়দের দ্বারা শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সংকার হয়। এই উপলক্ষে এরূপ বিরাট জনতা হইয়াছিল যে, ইহার পর সত্যেনবাবুর শবদেহ আর বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। জেলের মধ্যে দাহ করা হইয়াছিল।

এই ভুলের জন্য আমরা সবিশেষ দুঃখিত।

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

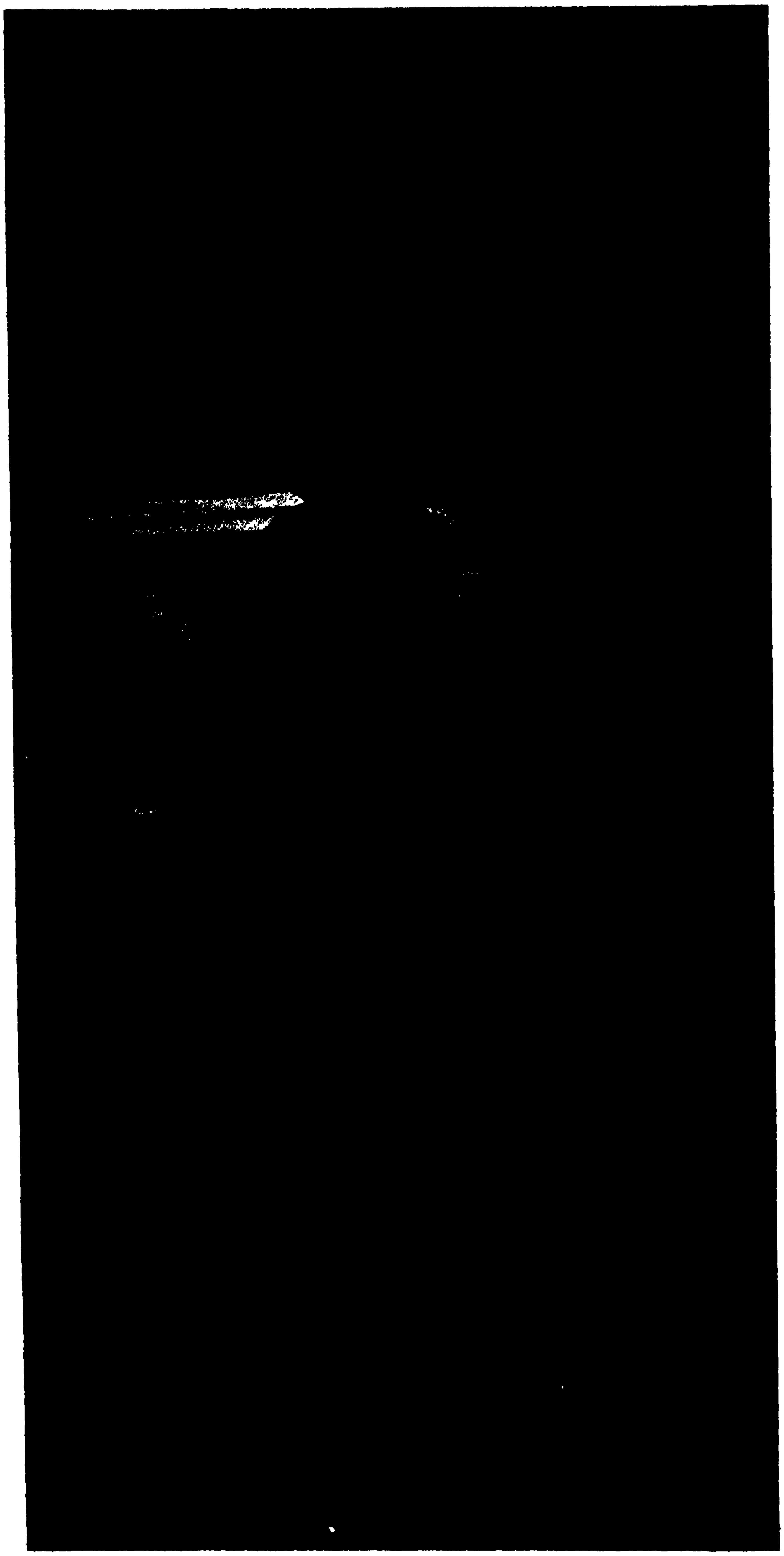

স্নানার্থিনী

বিচিত্রা
চৈত্র, ১৩৩৬

শিল্পী—শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৩৬	চতুর্থ সংখ্যা

ভারত ইতিহাস-চর্চ্চা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি অন্যত্র এ কথার আলোচনা করেছি যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। কেন নয় তার কারণ আছে।

প্রত্যেক জাতির এক-একটি সাধনার বিষয় আছে। সেই মূলগত সাধনাটি নিয়েই সেই জাতির সকল লোক আঁট বাঁধে। নর্ম্মানে-স্যাক্সনে মিলে ইংরেজ যখন এক হয়ে গেল, যখন তাদের মধ্যে সমাজভেদ রইল না, তখন তাদের মধ্যে একটা বড় ভেদ রইল—রাজার সঙ্গে প্রজার স্বার্থের ভেদ। সেই ভেদ যখন একান্ত থাকে তখন রাজার খেয়ালের জন্যে প্রজাদের দুঃখ ও ক্ষতি হ'তে থাকে। সেই ভেদ বিলুপ্ত ক'রে রাজশক্তিতে নানাপ্রকার বাঁধ বেঁধে পরস্পরের সামঞ্জস্যসাধনের ইতিহাসই ইংলণ্ডের ইতিহাস। অর্থাৎ ইংলণ্ডের যে সমস্যা প্রধান ছিল সেই সমস্যার সমাধান নিয়েই তার ইতিহাসের পরিণতি ঘটেচে।

ইংরেজি ইস্কুলের ছাত্র ভারতের ইতিহাসে সেই রাষ্ট্রীয় ধারার পথই খুঁজ্‌তে থাকে। খুঁজে না পেলে বলে—ভারতের ইতিহাস নেই। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা যেখানে।

প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তার অসামঞ্জস্য। যারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাদের মিল্‌তেই হবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজার-প্রজার ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই সকল নানা উপজাতির বর্ণ, ভাষা, আচার, ধর্ম্ম, চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ এরা সকলেই প্রতিবেশী। এতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চল্‌ছিল তেমনি আর একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধন-চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কি করলে পরস্পরে মিলে এক বৃহৎ সমাজ গ'ড়ে ওঠে অথচ

পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হ'তে ভারতে চ'লে আস্ছে, আজও তার সমাধান হয় নি।

য়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্সের ইতিহাসে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চল্‌চে তার সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের কিছু মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। সেখানে য়ুরোপের নানাস্থান হ'তে নানাজাতি মিল্‌ছে। কিন্তু তারা একই বর্ণের সুতরাং তাদের মিলনের বাধা সুগভীর নয়। তা ছাড়া, য়ুরোপের সকল উপজাতির মধ্যে সভ্যতার রূপভেদ নেই। নিগ্রোদের সমস্যার কোনো ভাল মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত সেখানে হয়নি ব'লে কেবলি দুঃখ, অত্যাচার, অবিচারের সৃষ্টি হ'চ্চে। এতেই মনুষ্যত্বের পীড়া ঘটে। এই পীড়া দুর্ব্বল-সবল উভয়কেই স্পর্শ করে। তা ছাড়া এশিয়াবাসীদের সম্বন্ধে শুধু আমেরিকায় নয় য়ুরোপের সকল উপনিবেশেই বিরোধ চল্‌ছে—এশিয়াবাসীকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'রে রাখ্‌লে এই বিরোধ দেশের বাহিরে গিয়ে কালক্রমে আরো প্রবল হ'য়ে জম্‌তে থাক্‌বে এবং একদিন এর হিসাব-নিকাশ কর্‌তেই হবে।

আমেরিকার ইতিহাসে আর একটা ব্যাপার দেখ্‌তে পাই—তাকে ঐক্যসাধন না ব'লে একাকারকরণ বলা যায়। যে কোনো জাতীয় লোক আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস কর্‌তে আসে—ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে তাকে সম্পূর্ণই আমেরিকান ক'রে তোলবার চেষ্টা করা হয়। এতে রাষ্ট্রীয় দিক হতে সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানব-সভ্যতার দিক হ'তে এতে ক্ষতিই ঘটে। সৃষ্টিতত্ত্বে যে পরিণতিক্রিয়া দেখি তাতে একাকারত্ব আরম্ভে দেখা যায় কিন্তু বিকাশসাধনের সঙ্গে সঙ্গে একের মধ্যে বিভাগ ও সেই বিভাগের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ হতে থাকে। যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে একাকারত্বই একান্ত আবশ্যক ব'লে ধরা হয়, তবে বল্‌তেই হবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঐক্যের আদর্শ নয়। এতে একপ্রকার স্বাধীনতার লোভে মানুষের গভীরতর স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক বলি দেওয়া হয়। সমস্যার এ প্রকৃত সমাধান নয় ব'লেই এতে জগতে এত নিগূঢ় দাসত্ব ও ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হচ্চে।

ভারতবর্ষে নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে,—বৌদ্ধযুগ পৌরাণিকযুগে পরিণত হয়েচে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নয়। অবশ্য, বিদেশী রাজা যখন হ'তে ভারতে এসেচে, তখন হ'তে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য্য বাধা পাওয়ার আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। এই জন্যই ইংরেজ যাকে ইতিহাস ব'লে গণ্য করে—ভারতে সেই ইতিহাস মুসলমান-অধিকারের পরে। কিন্তু তাই ব'লে এর অর্থ এমন নয় যে, বিদেশী রাজত্বের পর হ'তে ভারত-ইতিহাসের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেচে। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পূর্ব্বের চেয়ে আমাদের ইতিহাস জটিল হয়েচে, আমাদের দুরূহ সমস্যায় আরো একটি নূতন গ্রন্থি পড়েচে। এখনো আমাদের মধ্যে ভেদের সমস্যা। এই ভেদ সমাজের ভিতরে থাকাতেই অন্যদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কিছুতেই ঠিক-মত খাট্‌চে না। আমরা অন্য দেশের নকলে যে-সব পন্থা অবলম্বন করচি, বারম্বার তা ব্যর্থ হচ্চে।

যাই হ'ক, আমাদের দেশের এই সামাজিক ইতিহাসের ধারা এখনো আমরা আগাগোড়া অনুসরণ ক'রে দেখি নি, অনেকটাই অস্পষ্ট আছে এবং অনেক জায়গাতেই ফাঁক পড়েচে। বিশেষতঃ, যেহেতু আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্ম্মতন্ত্রমূলক, সেইজন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কুয়াশার মত আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করেচে—সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে বাধা দিচ্চে। যেটুকু গোচর হ'য়ে উঠ্‌ছে তা বিদেশী ঐতিহাসিকদের চেষ্টায়।

কিন্তু নিজের দেশের ইতিহাসের জন্যে চিরদিনই কি এমন ক'রে পরের মুখ তাকিয়ে থাকা চল্‌বে?

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। এ আর্য্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্য্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিমঅধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চল্‌ছিল। বৌদ্ধযুগে সেই সকল বিরুদ্ধ-জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক ধর্ম্মবন্যায় ভেঙেছিল;—শুধু তাই নয়, বাইরের নানা জাতি এই ধর্ম্মের আহ্বানে ভারত-বাসীদের সঙ্গে মিশেছিল। তারপরে এই মিশ্রণকে যথা-সম্ভব স্বীকার ক'রে এবং একে নিয়ে একটা ব্যবস্থা খাড়া ক'রে আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলেচে। বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য্য ও অনার্য্য এক-গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়েছিল। এর ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হ'তে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন;—তাই সকল দিকেই বেশ সুসঙ্গত রকমে রফা হ'য়ে গিয়েচে তাও বল্‌তে পারিনে। আভ্যন্তরিক নানা অসঙ্গতির জন্যে আমরা অন্তরে-বাহিরে দুর্ব্বল রয়েচি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে পদেপদেই বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে আমাদিগকে চল্‌তে হয়,—যা কিছু আছে তাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া নয়, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়ে নেওয়াই আমরা প্রধানতঃ আশ্রয় করেচি।

যাই হ'ক, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিন্‌তে হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটেচে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যে-সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন তা হীনযান-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম-চীন-জাপান-জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান-সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই জন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মত হয়েছিল—যার ভিতর দিয়ে নানাজাতির নানা ক্রিয়াকর্ম্ম-মন্ত্রতন্ত্র-পূজার্চ্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক-মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হয়েচে।

এই মহাযান-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্ম্মের নিজেরই বিশুদ্ধ 'স্বরূপগত' কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণজনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নয়, এরাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিককালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই,—দেশের মধ্যে এরা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানাজাতির সংমিশ্রণ হ'ল তখন ক্রমশঃ এদের প্রভাব জেগে উঠ্‌ল, এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে এরাই আর-সমস্তকে ঠেলে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করবার চেষ্টা, যে নিতান্ত অনার্য্য তাকে আর্য্যবেশ পরাবার প্রয়াস, এই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

অতএব, ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁরা অনুসরণ করতে চান, তাঁদের বিশেষ ক'রে এই মহাযান বৌদ্ধপুরাণ সকলের অনুশীলন করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত-প্রতিভা

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়

(শ্রীঅরবিন্দের A defence of Indian culture হইতে অনুবাদিত)

[মিস্ মেয়ো তাঁহার Mother-India নামক পুস্তকে ভারত সম্বন্ধে যে-সব অতি কদর্য্য কুৎসা রটনা করিয়াছেন, তাহার জবাবে অনেকেই ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজজীবনের গ্লানিগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন,—কিন্তু ভারতীয় কাল্‌চারের (culture),ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা-সভ্যতার যাহা প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, প্রকৃত শক্তি ও মহত্ব, এ পর্য্যন্ত কেহই গভীর বা বিস্তৃতভাবে তাহা দেখাইয়া দেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Mr William Archer নামে একজন বিখ্যাত ইংরাজ-সাহিত্যিক ভারতীয় কাল্‌চারের সর্ব্ব-অঙ্গের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তক ভারতে ও ভারতের বাহিরে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Arya পত্রিকায় Mr. Archer-এর সমালোচনার সম্পূর্ণ জবাব দিয়া যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি ভারতীয় কাল্‌চারের অপূর্ব্ব দিগ্‌নিদর্শন। আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি-- ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কি, বৈশিষ্ট্য কি, সে-সবের শক্তি কোথায়, ত্রুটি কোথায়, ইউরোপীয় আদর্শের সহিত তাহাদের ভেদ কোথায়, ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা কোন্ পথে বিকশিত হইয়া কোন্ অভূতপূর্ব্ব সার্থকতা ও সিদ্ধির দিকে চলিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা ও অগাধ বিদ্যার সাহায্যে সেইসবের যে গভীর ও সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে একদিকে যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়, অন্যদিকে ভারতীয় কাল্‌চার, ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। আমরা শ্রীঅরবিন্দের সেই বাণীসমূহের অনুবাদ করিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি।]

১

যখন আমরা কোনও কাল্‌চারের (culture) মূল্য বুঝিতে চাই, এবং সে কাল্‌চার আমাদের নিজেদেরই কাল্‌চার—তাহারই মধ্যে আমরা গড়িয়া উঠিয়াছি বা তাহা হইতেই আদর্শ গ্রহণ করিয়া আমাদের জীবনকে পরিচালিত করিতেছি, তখন আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব আসিয়া পড়িতে পারে, আমরা তাহার দোষগুলিকে ছোট করিয়া দেখি, অথবা অতি-পরিচয়বশতঃ তাহার এমন অনেক গুণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি—যাহা অপর নূতন-লোকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। এরূপ অবস্থায় অপর লোকে আমাদের কাল্‌চারকে কি রকমে দেখিতেছে তাহা জানা সকল সময়ে প্রীতিকরও বটে, লাভজনকও বটে,—আমাদের আদর্শ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য নহে,—কিন্তু নূতন আলোকে আমাদের ভিতরটাকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার জন্য। অবশ্য দেখিবারও বিভিন্ন ভঙ্গী আছে। কেহ দেখেন সহানুভূতির চক্ষে সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া,—আমাদের কাল্‌চারের সহিত নিজকে ঘনিষ্ঠভাবে মিলাইয়া দিয়া। এইভাবেই আমরা পাই ভগ্নী নিবেদিতার Web of Indian life, Mr. Fielding-এর বর্ম্মা সম্বন্ধে বই,Sir. John Woodroofe-এর তন্ত্র সম্বন্ধে বই। ইঁহারা চেষ্টা করেন বাহিরের আচ্ছাদন সরাইয়া জাতির প্রকৃত আত্মার পরিচয় দিতে এবং সেই আত্মার অভিব্যক্তির নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে। আমাদের মনে হইতে পারে বটে যে, বাহিরের জীবনের কঠোর সত্যগুলি সব তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না; কিন্তু এমন গভীরতর জিনিষের পরিচয় আমরা পাই—যাহা আরও বড়, আরও সত্য। জীবনের অপূর্ণতার মধ্যে জিনিষটি কেমন দাঁড়াইয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহার আদর্শ সত্তাটি দেখিতে পাই। মূল সত্তা, আত্মা হইল এক জিনিষ, আর এই মানবজীবনের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে তাহা কি-রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা আর এক জিনিষ। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব বাহ্যরূপ অসম্পূর্ণ বা বিকৃত;—কিন্তু যদি আমরা সমগ্রভাবে দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না। আবার কেহ দেখেন—

বিচারশীল সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া, তাঁহারা দেখেন জিনিষটির লক্ষ্য কি আর বাস্তবরূপই বা কি,—তাঁহারা ভালমন্দ, দোষগুণ, সাফল্যনিষ্ফলতা সবই বিচার করেন,—কতটুকু প্রশংসার যোগ্য, কতটুকু নিন্দনীয় তাহা দেখাইয়া দেন। সকল সময়ে তাঁহাদের সহিত আমাদের মত না মিলিতে পারে; তাঁহাদের দেখিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, তাঁহারা বাহির হইতে দেখেন, সহজ দৃষ্টি ও ঐক্যবোধের অভাব থাকে,—সেইজন্য অনেক মূল জিনিষ তাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহারা যাহার নিন্দা বা প্রশংসা করেন তাহার সম্যক মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না; তথাপি এরূপ সমালোচনা হইতে আমাদের লাভ হয়, কারণ ইহা হইতে আমরা আমাদের নিজেদের মত সংশোধন করিয়া লইতে সাহায্য পাই। আবার কেহ দেখেন বিরুদ্ধভাব লইয়া; যে কাল্‌চারের সমালোচনা তাঁহারা করিতেছেন সে কাল্‌চার নিকৃষ্ট বলিয়াই তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা। তাঁহারা কেন এইরূপ মত পোষণ করেন, সততার সহিত সোজাসুজি ভাবেই তাহার কারণ বলিয়া দেন,—ইচ্ছা করিয়া অত্যুক্তি করেন না। এইরূপ সমালোচনাতেও আমাদের লাভ আছে,—এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা আত্মা ও বুদ্ধির পক্ষে হিতকর; তবে অবশ্য আমরা যেন ইহার দ্বারা অভিভূত বা বিচলিত হইয়া না পড়ি,—আমাদের জীবন্ত বিশ্বাস ও কর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ি। এই মর্ত্ত্যজগতে বেশীর ভাগ জিনিষই অপূর্ণ, আর মাঝেমাঝে আমাদের অপূর্ণতাগুলি সম্বন্ধে কঠিন কথা শুনা ভাল। আর কিছু না হউক, বিরুদ্ধবাদীরা কোন্ দিক হইতে দেখিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে শিখি এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধতার মূল কোথায় তাহার সন্ধান পাই; এইরূপ তুলনার দ্বারা জ্ঞান, দৃষ্টি এবং সহানুভূতি বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু বিরুদ্ধ-সমালোচনা হইতে বিশেষ কোনও লাভ পাইতে হইলে তাহা প্রকৃত সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন, শুধু কুৎসা, মিথ্যা অপবাদ ও গালিবর্ষণ হইলে চলিবে না। সত্য তথ্যগুলি বিকৃত না করিয়া বলা চাই, যে-সব আদর্শ-অনুসারে বিচার করা হইতেছে তাহাদের সঙ্গতি থাকা চাই, সুবিচার করিবার কতকটা চেষ্টা, বিবেচনা, সংযম থাকা চাই। Mr. William Archer-এর যে নূতন বইখানি গুণের তুলনায় ভারতে অত্যধিকমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সে বইখানি এরূপ নহে। ভারতীয় কাল্‌চারের ভক্তগণ এই কাল্‌চারের যে অত্যুচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাকেই আক্রমণ করা Mr. Archer-এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সেইজন্য তিনি নিন্দা করিবার ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় কাল্‌চারের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে সেই সব খুঁজিয়া বাহির করা এবং সেইগুলিকে খুব জোরের সহিত প্রচার করাই তাঁহার কাজ। আমাদের পক্ষেও ইহা লাভের, কারণ ভারতীয় কাল্‌চারের শত্রু যাঁহারা তাঁহাদের মতটি এইরূপে সমগ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু, Mr. Archer-এর পুস্তকে তিনটি মস্ত বড় দোষ আছে। প্রথমতঃ ইহার এক গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ভারত যাহাতে স্বরাজলাভের যোগ্যতা দাবি করিতে না পারে সেইজন্য ভারতকে সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্ব্বর প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই বইখানি লিখিত। এইরূপ মতলব লইয়া যাহা লিখিত তাহা শুনিবারই যোগ্য নহে; কারণ এইভাবে মতলব-সিদ্ধির জন্য পদে পদে ইচ্ছা করিয়াই সত্যকে বিকৃত করা হয়; বিভিন্ন কাল্‌চারের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার জন্য যে নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক মনোভাব থাকা প্রয়োজন, এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

বস্তুতঃ এই বইখানি সমালোচনা নহে; এটিকে সাহিত্যিক 'মল্লযুদ্ধ' বলা যাইতে পারে।—তাহাও আবার এক বিশেষ রকমের; এখানে আছে ভারতের একটা কৃত্রিম প্রতিকৃতির উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত—সুদীর্ঘ ও অজস্র মিথ্যা ও অত্যুক্তির দ্বারা অবহেলায় সেটিকে ধরাশায়ী করা হইয়াছে এই আশায়, যে, অজ্ঞ দর্শকেরা মনে করিবে, বুঝি সত্য সত্য জীবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ভূপাতিত করা হইল। সদ্‌বিবেচনা, সুবিচার, সংযম এ-সব একেবারেই নাই। এমনভাবে আঘাত ও আক্রমণের ভাব দেখান হইয়াছে যেন তাহার আর কোনও জবাব নাই, এবং এইজন্য হাতের কাছে যে সুবিধা মিলিয়াছে তাহাই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা হইয়াছে—তথ্য সকলের ভুল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অথবা সেগুলিকে বিশ্রীভাবে বিকৃত করা হইয়াছে,—নিতান্ত অসম্ভব ও আজগুবি মন্তব্য সকল এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে—যেন সে-সব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ

সত্য !—কোনও একটা মত দাঁড় করাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে একান্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক কথাও নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

অসদ্ উদ্দেশ্য লইয়া লেখা এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় অবিচার করা ছাড়াও Mr. Archer-এর লেখার আর একটি অতি নিকৃষ্ট দোষ আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাই—Mr. Archer যে-সকল বিষয়ের উপর প্রগল্‌ভতার সহিত নিন্দা-বর্ষণ করিয়াছেন, সে-সবের অধিকাংশ সম্বন্ধেই তাঁহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যত মন্তব্য পাঠ করিয়াছেন সেই সব তাঁহার মনের মধ্যে একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন,—নিজের দুই একটা ভাসা-ভাসা ধারণা তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন এবং এই অসার মিশ্র-পদার্থটিকেই তাঁহার নিজের মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।—পরন্তু, পরের নিকট হইতে ধারকরা মতগুলিকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া সানন্দে ধরিয়া লওয়া,—কেবল এইটিই তাঁহার নিজস্ব মৌলিকতা। এই বইখানি সৎ-সমালোচনা নহে,—এটি প্রচারকার্য্যের জন্য একটি মিথ্যা সৃষ্টি।

Mr. Archer দার্শনিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে কিছুই জানেন না তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দর্শনশাস্ত্রকে তিনি মানব-বুদ্ধির অপব্যবহার বলিয়া অবজ্ঞা করেন। অথচ তিনি ভারতীয় দর্শনের লম্বা সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি একজন যুক্তিপন্থী (rationalist),—তাহার মতে ধর্ম্ম (religion) একটা ভুল, একটা মানসিক ব্যাধি, বুদ্ধির বিরুদ্ধে পাপ। অথচ তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমালোচনা করিয়াছেন; খ্রীষ্টানধর্ম্মকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন, কারণ খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান নহে—পাঠকগণ হাসিবেন না—Mr. Archer গম্ভীরতার সহিতই এই অদ্ভুত যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম্মকে তিনি সর্ব্বনিম্ন স্থান দিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই, তথাপি ভারতীয় সঙ্গীতকে একেবারে নীচে ফেলিয়া দিতে তাঁহার এতটুকুও বাধে নাই *। শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বিচার করিবার উপযোগী শিক্ষা তাঁহার খুব কমই আছে, তথাপি তিনি এ-সকল বিষয়ে নিন্দামূলক মন্তব্য প্রকাশ করিতে মুখর। নাটক ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে লোকে ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবহার আশা করিতে পারে, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহার যুক্তি ও বিচারপদ্ধতি এত আশ্চর্য্যভাবে তরল ও অসার যে, তিনি নাটক ও সাহিত্যের সমালোচক বলিয়া কেমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; হয় ত তিনি যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের সমালোচনা করেন তখন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, অথবা ইউরোপে এইরূপ খ্যাতি লাভ করা খুবই সহজ।—কোনও কিছু ভাল করিয়া না জানিয়া সত্য তথ্যের ভুল বর্ণনা দেওয়া এবং যে-বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই সেই বিষয়ে নির্ভাবনায় মত প্রকাশ করিবার হঠকারিতা, কেবল এই গুণ লইয়াই Mr. Archer ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন এবং তিনি যেন এই বিষয়ে একজন যোগ্যতম পুরুষ, authority,—এই ভাবে ভারতীয় কাল্‌চারকে বর্ব্বরতার স্তূপ বলিয়া খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, বিদেশের লোক যাঁহারা ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে বাস্তবিকই কিছু খবর রাখেন, তাঁহাদের মতামত জানিবার জন্য Mr. Archer-এর নিকট গেলে চলিবে না। এমন কি যে বিরুদ্ধ-সমালোচনা হইতে কিছু শিক্ষা-লাভ করা যাইতে পারে, Mr. Archer-এর লেখার মধ্যে তাহাও নাই। বস্তুতঃ, যাঁহাদের মধ্যে কিছু কাল্‌চার আছে তাঁহারাই ভারতীয় কাল্‌চারের মূল্যবিচার করিতে পারেন, কারণ কেবল তাঁহাদের পক্ষেই ইহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করা সম্ভব। বিদেশী সমালোচকের কাছে আমরা যাইতে পারি শুধু তুলনামূলক বিচার করিবার জন্য,– ইহাও আবশ্যক। কিন্তু, কোনও কারণে এই সব বিষয়ে চূড়ান্ত মতের জন্যই যদি আমাদিগকে বিদেশীয় বিচারের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে এমন সব লোকের কাছেই যাওয়া উচিত—যাহাদের এ-সব সম্বন্ধে কথা বলিবার বাস্তবিকই কিছু অধিকার আছে। Mr. Archer বা Dr. Gough বা এই রকম কোনও লোক ভারতের

* আমাদের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও আজকাল অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা Mr. Archer-এর মতই এই-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও সোৎসাহে ভারতীয় কাল্‌চারকে নিন্দা করিয়া থাকেন।—অনুবাদক।

দর্শন (philosophy) সম্বন্ধে কি বলিতেছেন তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না; আমার পক্ষে ইহাই জানা যথেষ্ট যে, Emerson বা Shopenhauer বা Nietzsche (এ বিষয়ে উচ্চতম শক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিভা) কি বলিতেছেন, অথবা Cousin ও Schlegel-এর ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি বলিতেছেন, অথবা ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রভাব কিরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রাচীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সহিত কোথায় ইহার মিল রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির সত্যতা কিরূপে প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্মবিষয়ে আমি Mr. Harold Begbie বা কোনও ইউরোপীয় নাস্তিক বা যুক্তিপন্থীর (rationalist) নিকট আমাদের আধ্যাত্মিকতার বিচার শুনিতে যাইব না, কিন্তু দেখিব—ধর্ম্মভাবসম্পন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ধারণা, টলষ্টয়ের (Tolstoi) ন্যায় অধ্যাত্ম ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ধারণা কিরূপ, কারণ কেবল এইসব লোকই ধর্ম্মবিষয়ে বিচার করিতে সক্ষম; এমন কি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মিশনারীগণ তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী কতকটা পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছে, ইহাকে আর বর্ব্বরোচিত কুসংস্কার মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না, তাহাও আমি দেখিতে পারি। আর্ট সম্বন্ধে মতামতের জন্য আমি কোনও সাধারণ ইউরোপীয়ানের নিকট যাইব না; ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলার মূল ভাব, মর্ম্ম বা বৈশিষ্ট্য-কৌশল (technique) সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও জ্ঞান নাই। স্থাপত্য সম্বন্ধে আমি Ferguson-এর ন্যায় বিশেষজ্ঞের নিকটে যাইব; অন্যগুলি সম্বন্ধে Mr. Havell, Okakura কিম্বা Mr. Lawrence Binyon-এর নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারিব। সাহিত্য সম্বন্ধে কাহার নিকট যাইতে হইবে খুঁজিয়া পাই না; কারণ আমি এমন কোনও প্রতিভাশালী বিখ্যাত ইউরোপীয় সমালোচকের নাম মনে করিতে পারিতেছি না যাঁহার সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে অথবা কোনও প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-জ্ঞান আছে; কারণ অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া যে বিচার করা হয় তাহাতে কেবল বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই বিচার করা হয়, তাও অধিকাংশ ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদে সম্পূর্ণ প্রাণহীন। তথাপি এক্ষেত্রেও শকুন্তলা সম্বন্ধে Goethe'র যে মন্তব্য বিখ্যাত হইয়াছে তাহাই আমাকে বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট যে, ভারতের সকল সাহিত্যই ইউরোপীয় সৃষ্টির তুলনায় বর্ব্বরোচিত অপকৃষ্ট নহে। এখানে সেখানে দুই-একজন বিদ্বান লোকেরও সন্ধান মিলিতে পারে যাঁহাদের সাহিত্যের রসবোধ ও বিচার করিবার কিছু ক্ষমতা আছে (যদিও সাধারণতঃ এরূপ যোগাযোগ হয় না); তাঁহাদের নিকট হইতেও আমরা সাহায্য পাইতে পারি। এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলে অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মতামত আমরা পাইব না, তবু অন্ততঃ Gough, Archer, Begbie প্রভৃতি অধম শ্রেণীর নিন্দুকদের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা তাহা অনেকটা নিরাপদ হইবে।

ইহা সত্ত্বেও যে আমি Mr. Archer-এর প্রগল্ভ পুস্তকের সমালোচনা করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে উদ্দেশ্যেও Mr. Archer-এর সকল লেখাই কাজের নহে, তাঁহার লেখার অনেক অংশই এমন অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও নিঃসঙ্কোচ মিথ্যা, যে সেসব কেবল দেখিয়াই ছাড়াইয়া যাইতে হয়। যেমন, তিনি তাঁহার পাঠকগণকে অসংশয়ে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া নিজের নাভিদেশ ধ্যান করাই বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে অলস নিষ্কর্ম্মার জীবনযাপন করা এবং অনুরক্ত ভক্তদের ভিক্ষার উপর জীবিকানির্ব্বাহ করা। বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যান করিবার একটি বিশিষ্ট আসন বা উপবেশন-ভঙ্গীকে এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, অজ্ঞ ইউরোপীয় পাঠকের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া—যে, ধ্যান জিনিষটাই একটা কিম্ভুত কিমাকার ব্যাপার এবং স্বার্থপর অলসতা। তাঁহার কুণ্ঠালেশশূন্যতার এই দৃষ্টান্ত তাঁহার নিজের যুক্তিপন্থী মনের প্যাঁচগুলি বুঝিতে আমাদিগকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তাহার বেশী আর কোনও লাভ হয় না। যখন তিনি বলেন

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আদৌ নৈতিকতা (morality) নাই, অথবা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম নীতিশিক্ষা দেওয়াকে ধর্ম্মের অবস্থা বলিয়া কখনও বিবেচনা করে নাই, এমন কি এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, ভারতবাসীর চরিত্রই হিন্দুত্ব (Hinduism) এবং যাহা কিছু বীভৎস ও অশুভকর সেই দিকেই ইহার ঝোঁক; তখন কেবল এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, সত্য কথা বলার প্রয়োজনীয়তা একটা নৈতিক গুণ বলিয়া Mr. Archer বিবেচনা করেন না, অন্ততঃ তাঁহার মতে, যখন কোনও যুক্তিপন্থী ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন সত্য কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু না, Mr. Archer শেষ পর্য্যন্ত কুণ্ঠিতচিত্তে সত্যের কিছু মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; কারণ তিনি ঐ একই নিঃশ্বাসে স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম সাধুতার কথা অনেক বলিয়াছে এবং হিন্দুসাহিত্যের মধ্যে অনেক প্রশংসনীয় নৈতিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোনও সঙ্গতি নাই,—নৈতিকতা সেখানে আছে বটে কিন্তু থাকা উচিত নহে; অন্ততঃ এটা থাকা Mr. Archer-এর প্রবন্ধ লেখার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যুক্তিপন্থার পরমভক্ত এই ব্যক্তিটির যৌক্তিকতা ও সঙ্গতিকে সাবাস দিতে হয়।—আবার দেখুন হিন্দুদের বাইবেল-স্বরূপ রামায়ণের বিরুদ্ধে তাঁহার একটি আপত্তি এই যে, শ্রেষ্ঠ হিন্দু পুরুষত্ব ও নারীত্বের জীবন্ত আদর্শ, রাম ও সীতা, তাঁহার রুচি অনুসারে অতিমাত্রায় সৎ। রামের সাধুতা মানবচরিত্রের পক্ষে অসম্ভব,—বস্তুতঃ রাম যে খ্রীষ্ট বা সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ অপেক্ষা বেশী সাধু তাহা আমার জানা নাই, তথাপি আমার সকল সময়েই মনে হইয়াছে যে, উঁহারা মানবপ্রকৃতিরই সীমার মধ্যে। কিন্তু হয়ত এই সমালোচক জবাব দিবেন যে, যদি মানবপ্রকৃতির সীমার বাহিরে নাও হয়, তথাপি ত তাঁহাদের গুণের অতিমাত্রা হিন্দুধর্ম্মের দৈনিক আচার-ব্যবহারের ন্যায়* তাঁহাদিগকে সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে ফেলিবার পক্ষে যথেষ্ট—sufficient to place them beyond the pale of civilisation." কারণ তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, দাম্পত্য-অনুরাগ ও সতীত্বের আদর্শের দিক দিয়া সীতার সাধুতা এত অতিমাত্রায় বেশী যে, তাহা প্রায় দুশ্চরিত্রতারই কাছাকাছি। অর্থহীন চটকদার যথেচ্ছভাষণ যখন এইরূপ গণ্ডমূর্খতার কাছাকাছি হয় তখনই তাহা চরমে উঠে,—Mr. Archer সম্বন্ধে "গণ্ডমূর্খতা" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইতেছে বলিয়া আমি সেই-রকমই দুঃখিত যেমন তিনি ভারতীয় "বর্ব্বরতা"র বর্ণনা করিতে দুঃখিত; কিন্তু ইহা না করিয়া উপায় নাই; এই কথাটির দ্বারাই ব্যাপারটি মূলতঃ প্রকাশ করা যায়। Mr. Archer-এর ভাষায়, "it expresses the essence of the situetion"। যদি সবই এই রকম হইত—দুঃখের বিষয় এই রকমের অনেকই আছে—তাহা হইলে অবজ্ঞাভরে চুপ করিয়া থাকাই একমাত্র জবাব সম্ভব হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মল্লযোদ্ধা সকল সময়েই এইরূপ চরমে উঠেন নাই। সাধারণ পাশ্চাত্য মন (the average occidental mind) ভারতীয় কাল্‌চারের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি প্রথমে দেখিয়াই যাহা অনুভব করে Mr. Archer-এর অনেক লেখার ভিতর দিয়াই তাহা যতই অমার্জ্জিতভাবে হউক তথাপি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সুযোগটিই আমি গ্রহণ করিতে চাই; কারণ এটি বাস্তবিকই একটি সুযোগ। যে-সকল মানসিক ভেদ-বৈষম্য আমাদের এক সাধারণ মানবজাতির প্রধান প্রধান বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের মূলে পৌঁছিতে হইলে সাধারণ মনের (the average mind) ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। উৎকর্ষপ্রাপ্ত মন এই সকল বিদ্বেষের জোরকে কমাইয়া দেয়, অন্ততঃ ভেদবৈষম্যের মধ্যেও ঐক্য ও সাদৃশ্যের দিকগুলিকেই পরিস্ফুট করে। কিন্তু সাধারণ মনোভাবের মধ্যে এই সকল বিদ্বেষকে তাহাদের স্বাভাবিক শক্তিতে দেখিতে পাইবার এবং তাহাদের পূর্ণ প্রভাব ও মর্ম্ম বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা বেশী। এই হিসাবে Mr. Archer আমাদের সুন্দর সহায়। আমরা যাহা চাই তাহা পাইতে হইলে আমাদিগকে যে

* হিন্দুরা যে অতিসাবধানতার সহিত শরীরকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখে এবং প্রত্যহ পূজা ও ধ্যানের দ্বারা মনকে ভগবদ্‌মুখী করে—এই সবই কি দৃষ্টান্ত?

অনেক রাবিশ্ সরাইতে হইবে না তাহা নহে। ইউরোপীয়গণ ভারতীয় কাল্চারকে সকলক্ষেত্রে কিরূপ ভুল বুঝে তাহা সংক্ষেপে সোজাসুজি ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু অনর্থক বিদ্বেষ বা বদ্ চঞ্চলতার ছড়াছড়ি নাই, এইরূপ কোনওপুস্তক থাকিলে আমি সেইটিকেই পছন্দ করিতাম। কিন্তু সে-রকম কোনও পুস্তক অপ্রাপ্য। অতএব Mr. Archer-কেই গ্রহণ করা যাক এবং তাঁহার কতকগুলি বিদ্বেষ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের ভিতরকার তত্ত্বের সন্ধান করা যাক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুগে যুগে যে পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে এইভাবে হয় ত আমরা তাহার মূলে পৌঁছিতে পারিব। সেটিকে ঠিকমত বুঝিতে পারিলে তাহা আমাদিগকে কোনও রকম সমন্বয়ের দিকেও অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

মাণিকমালার মণি

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

রাজার তনয় বলিল, 'তোমায় দূর হ'তে শুধু দেখিব,—
মনের গহনে গুমরি' মরিবে কথা!
গান আর প্রাণ আসিবে আঁখিতে, জানিবেনা কেহ হায় রে,
তরঙ্গ সম উঠিবে চঞ্চলতা!'
দিবসের স্রোত তর-তর
ধীরে ধীরে হয় খরতর—
দেখা নাহি হয়—রাজার তনয় দেশে দেশে ঘুরে মরিছে—
সুদূর সীমায় কোথা সে আলোক-লতা?
রাজার তনয় বৃথাই বলিল, 'দূর হ'তে তোমা' দেখিব'—
মনের গহনে বৃথাই গুমরে কথা!

'দেখা হ'লে হায় বুকে টানি' লব মাণিক-মালার মণিরে'-
রাজার তনয় কহিল আপন মনে।
সাগর-মাঝারে কত না শুক্তি প্রাণ দিল হায় নীরবে,
কত না মুকুতা পড়িল নয়ন-কোণে!
তবু, তবু সেই মণিকায়
বুকে বুকে নাহি রাখা যায়—
মুখে মুখে তবু তারি কথা হায়, মাণিকমালার মণি সে—
পাথার কোথায় রহিল সংগোপনে!
দূরে নাহি হায়, বুকে নাহি হায়—তবু সব ঠাঁই আছে সে-
কবি তাহারেই খুঁজিছে আঁধার মনে।

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় তার থ'লে,
লোকে তার 'পরে মহা রাগ করে
হাতি দেয় নাই ব'লে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায়,
ফুকারে সে, ওহো ওহো,
বলে আঁখি মেজে, "যথেষ্ট এ যে,
পরম অনুগ্রহ।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া
স্তবের লম্বা দৌড়।
পিছনে গোপন নিন্দা-রোপন,
ধন্য ধন্য গৌড়॥

প্রবাসযাত্রীর পত্র

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম বয়সে অনেকদিন পৃথিবীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেচি। নারিকেল তরুশ্রেণীর উপর সূর্য্যের উদয়, পুকুরের জলে সমস্ত দিন হাঁসের ডোবাডুবি, বাড়ির ছাদের পিছনে হঠাৎ জলভরা ঘন নীল মেঘের সমারোহ, গলির ধারের বাড়ির নানা আয়তনের দেয়াল, তার উপরে জ্যোৎস্নারাত্রে নানা আকারের ছায়ার ষড়যন্ত্র, অন্দরের প্রাচীর পেরিয়ে গয়লাপাড়ার কুঁড়ে ঘর, তারি একপ্রান্তে ডোবার জলের উপর রৌদ্রের ঝিকিমিকি, পূবদিকে অনেক দূরে উঁচুনীচু অনেক রকমের ছাদের শেষে গাছে গাছে নীলাভ নিবিড় সবুজের স্তূপ, কখনো ঘরের জানলার ধারে চুপ ক'রে ব'সে, কখনো ছাদের পাঁচিলের গায়ে একট প্যাক্‌বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে কেবল দেখে দেখে কাটিয়েচি—তাতে ছিল অতি নিবিড় আনন্দ। ভোর বেলায় উঠেই সব প্রথমে মনে হ'ত দেখবার জিনিষ কত কি আছে। আর কিছুই না, সমবয়সী বন্ধু কেউ ছিল না, নিতান্তই একলা ছিলুম—আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল এই চোখের দেখার বিচিত্র বিশ্ব—সেও বুঝি তার আকাশের বাতায়নে ব'সে কোনো একটা সুদূর অভাবনীয়ের দিকে চেয়ে থাকত। তার পরে রূপের জগতের সীমানায় যেখানে মানুষে মানুষে রূপকথা জ'মে উঠচে সেইখানে এসে পড়লুম। এক যে ছিল রাজপুত্র, আর এক যে ছিল কত কী। স্পষ্ট ক'রে কিছুই বুঝিনে, অস্পষ্ট ক'রে অনুভব করি, এই হ'ল ভাবের যুগ। চাওয়া পাওয়া হারানোর বেদনা-বাষ্পাকুল আলোছায়ার আবর্ত্তন। মনের মধ্যে গানের সুর ঘনিয়ে এল। তখন চোখে দেখার জগতের উপর রঙীন কুয়াশার একটা পাৎলা পর্দ্দা কখন নেমে এল জানিনে। তা'র পরে জাগল চিত্ত; নানা বলবার কথা এবং করবার ব্রত ভিড় ক'রে আসে। তাদের দাবী গুরুতর—কিছু অবসর বাকি রাখে না। সেও ত কম দিন হ'ল না।—তা'র দুঃসাধ্যতা অতি কঠোর। এদিকে শরীরের শক্তি ক'মে আসচে, ক্লান্তির গোধূলি নেমে আসচে মনের উপরে। ছুটি নিতে চাই, কিন্তু ছুটির বেলাকার খেলা একটা কিছু না থাকলে যে ছুটি ফাঁকা হ'য়ে পড়ে, সেই ফাঁকার ভার বইবে কে? হেন কালে কাজের কোন্ একটা ছিদ্র দিয়ে আমাকে পেয়ে বস্‌ল ছবি আঁকার নেশা। এ যেন আবার সেই বিশুদ্ধ দেখার জগতে ফিরে আসা। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই দেখার খেলাটা ছিল বাইরের দিক থেকে, এখন এটা ভিতরের দিক থেকে। ছবি দিয়ে রূপের খেলনা নিজেই বানাই; ঠিক বালকেরই মতো।

অর্থাৎ সেগুল ভাল কি মন্দ সে তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। রেখাতে রঙেতে একটা কিছু গ'ড়ে উঠচে এই যথেষ্ট, তার কোনো উদ্দেশ্য নেই। এর দ্বারা খ্যাতি পাব সে ভরসাও রাখিনে। বরঞ্চ দেশের লোকের কাছে অখ্যাতি পাবার আশঙ্কাই প্রবল। বাইরের কৌতূহল থেকে এদের প্রচ্ছন্ন রাখাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তা হোক্, এই রূপ-উদ্ভাবনের নেশা মরে না—কর্ত্তব্য ভুলি, মনে হয় আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। অবশেষে আজ মনটা ঘুরে এল সেই কর্ত্তব্যহীন চোখে দেখার রূপলোকে; সেই বালককালের খেলাঘরে। এই জন্যেই তো সেদিন শান্তিনিকেতনে আমার জানালায় ব'সে সবুজ মাঠ ও নীল আকাশের উপর শীত-মধ্যাহ্নের ছায়ালোকের তুলি বোলানো দেখে দেখে সব কাজ ছেড়ে বেলা কাটিয়েচি। সে কোন্ সঙ্গীহীন সুরবালকের খেলা, কোন্ অন্যমনস্ক দিগঙ্গনার স্বপ্নরচনা।

তা'র পরে আজ চলেচি রেলগাড়িতে চ'ড়ে মাদ্রাজের দিকে। একটা ভারী গোছের নীল-মলাট ওয়ালা বই এনেছিলুম—সে আর খোলা হ'ল না। জানলার বাইরে আমার দুই চক্ষের অভিসার আর থামে না। কোথাও বা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ জমি, কালো পাথরগুল রোদ্দুরে নিঃঝুম হ'য়ে রয়েচে, যেখানে সেখানে বাবলা গাছ, আলুথালু অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে,—কোথাও বা গ্রামের কাছাকাছি চষা ক্ষেত আঁকা বাঁকা আল দিয়ে বিভক্ত, বিরলতৃণ মাঠে গরু মোষ শান্তগমনে চ'রে বেড়াচ্চে, আমবাগানে বোল ধরেচে, ইঁদারায় জল তোলবার বংশদণ্ডের আগায় ল্যাজ ঝোলানো ফিঙে, গ্রামের রাস্তায় চলেচে গোরুর গাড়ি, কিসের বোঝাই জানিনে,—দিক্‌প্রান্তে বেগ্‌নি রঙের শৈলশ্রেণী, তার পিছনে পাণ্ডুর নীল আকাশ। মন ব'লচে দেখে নিলুম। রথ চলেচে ছুটে—কোন কিছু ফিরে দেখবার সময় নেই। যারা চঞ্চলতার অপবাদ দিয়ে এই দেখা শোনার সংসারকে ত্যাগ করবার উপদেশ দেয়, এই রেলে-চড়া মানুষ তাদের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। প্রতি মুহূর্ত্তেই ত্যাগ ক'রেই চল্‌তে হচ্চে তবু কেন ধ'রে রাখার কথা বলা? সেই তো আশ্চর্য্য। এ যদি এত বেশি অদ্ভুত হবে তবে এ কথা মানুষ বলেই বা কেন? ত্যাগ করচি এ কথার চেয়ে অনেক বেশি সত্য—পাচ্চি—ত্যাগ করার ভিতর দিয়েই সেই পাওয়া এত নিবিড়। জানালা দিয়ে এই ফাগুনের রৌদ্রে যখন একটি অভাবনীয় মাধুরীর মূর্ত্তি দেখি তখন নিশ্চিত জানি সেটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে যাবে। মনকে জিজ্ঞাসা করি এই উপলব্ধিটা কি একেবারেই মায়া। মন তো তা স্বীকার করে না। যা দেখ্‌চি সে তো একলা আমারই আনন্দের দেখা নয়—এ তো একজন মানুষের খেয়াল নয়, পাগলামি নয়, আমি যে সমস্ত মানুষের হয়ে দেখচি—আমি যাব কিন্তু মানুষ তো যাবে না। কালিদাস মেঘদূতে আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াশ্যামলা পৃথিবীর যে-রূপ দেখে মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে তা'র আনন্দ ঢেলে দিয়েচেন—সে যে সমস্ত মানুষের আনন্দ—সে আনন্দ তখনো ছিল আজও আছে। তার মাঝখান দিয়ে রেল গাড়ির মতো আমাদের প্রত্যেকের জীবন ছুটে চলেচে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেটুকু পাচ্চি, সে ক্ষণকালীন নয়, সে চির-কালীন, তা'র উপরে যুগযুগান্তরের মানুষ আপন ভালো লাগা জড়িয়ে গেল—আমি সেই সহস্রের

আনন্দকেই পাই একলা ব'সে। যারা এত কাল দেখেচে এবং চিরকাল দেখবে তাদেরই দেখাকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেলুম – সেই সঙ্গে এই একটা কবিতাও লেখা গেল :—

সুনীল সাগরের শ্যামল-কিনারে
দেখেচি পথে যেতে তুলনা-হীনারে।
একথা কোনোদিন পারে না বুঝিতে
আছে সে নিখিলের মাধুরী-রুচিতে,
একথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥

সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপন-ফসলের বিছনে বিছনে।

মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদল-সিচনে,
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে,
স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা সে,
চকিতে খনে খনে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

কিন্তু এই পর্য্যন্ত। ঘাটে ব'সে তরীর অপেক্ষায় সময় হাতে ছিল তাই বড়ো ক'রে চিঠি লিখলুম। আর বোধহয় এমন অবকাশ জুটবে না। কিন্তু "লেখা তো লিখেচি ঢের।" ইতি ২ মার্চ্চ ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈষ্ণবসাধনায় 'মধুর'

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মিত্র

(১)

চণ্ডীদাসের একটি কবিতায় আছে—

'কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে,
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে !'

যে রূপ রাধা দেখিলেন তাহা দেখাইতে পারা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে এ দেখা কিছু নূতন, সকল দেখার সহিত ইহাকে এক করা চলিবে না, কারণ ইহা 'নয়নের জলের' ভিতর দিয়া দেখা; এবং এ দেখার কোনো রহস্ত যদি কোথাও মেলে, সে কেবল ঐ নয়নের জলটুকুর মধ্যেই সম্ভব। কেন না বাহিরে কেবলমাত্র যাহা নিছক 'রূপ' (form), নয়নের জলের মধ্যে তাহাই অপরূপ! রূপ ধরা দেয় নয়নের দেখায়, কিন্তু অপরূপকে দেখিতে হইলে শুধু নয়নে কুলাইবে না, নয়নের জলের ভিতর দিয়াই তাহার দর্শন লাভ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতন'নাটিকার একটি গানে আছে—

'প্রেমের দেখা দেখবে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে !'

চোখ ছুটিয়া যায় রূপের দিকে, কিন্তু প্রেমের যে দেখা, সে হইল রসের ভিতর দিয়া, তাই 'লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে !'

'চোখের দেখা' ও 'প্রাণের দেখায়' বিরোধ নাই, কিন্তু ব্যবধান আছে। আমাদের ঐন্দ্রিয়িক চেতনার একটা জগৎ আছে, সেই জগতের সীমানার মধ্যে 'চোখের দেখার' কাজ। আমাদের ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধি বিষয়কে রূপগত করিয়া তোলে ;—'চোখের দেখা' এই রূপের রেখায়। কিন্তু প্রাণের যে দেখা সে হইল রসের ধারায়,—'প্রাণের দেখা' বিষয়কে রসগত করিয়া দেখা। এই রসের মধ্যে বিষয়কে ডুবাইয়া ধরা হইল হৃদয়ের কাজ। বুদ্ধি এবং হৃদয় এই দুটি বিশিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপার; প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ চেতনার পথে বিষয়ে পৌঁছাইতেছে ও তাহাকে একটি বিশেষ দিক্ হইতে স্পর্শ করিতেছে।

প্রবাহ ও তাহার অব্যাহত নিরন্তরতার মধ্যে রসের আশ্রয়; রসের মধ্যে একটি গতির রহস্ত রহিয়াছে। গলিয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটি অদৃশ্য স্রোতের আবেগ স্পন্দিত হইতে থাকে, সেই আবেগ, সেই স্রোত, সেই স্পন্দন ও কম্পনে রসের স্বভাব ও তাহার স্বধর্ম্মের প্রকাশ। রস একটি প্রবাহ-ব্যাপার,—ইহা স্থিতির মধ্যে সংযত বা সমাপ্ত নহে,—অবস্থার মধ্যে অচল নহে,—ইহা অপরূপের ধারায় অনর্গল, উন্মুখতায় চঞ্চল। রূপের মত ইহা নিঃস্রোত নিষ্প্রবাহ নহে,—ইহা অরূপ প্রবাহে চঞ্চল।

কিন্তু 'রূপ' গড়িয়া ওঠে স্থিতিকে আঁকড়িয়া, ইহা একটি অচল অবস্থাগত (static) ব্যাপার, গতি ইহার স্বভাবে নাই। তাই রূপ ও রস দুটি বিভিন্নচেতনার জগৎ ;—একটি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের, অপরটি বুদ্ধির অতীত ও অতীন্দ্রিয়।

স্থিতিকে হৃদয় আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না, কারণ স্রোতের মধ্যে তাহার (হৃদয়ের) সঞ্চার, ডুবিয়া চলা, গলিয়া যাওয়ায় তাহার স্বভাবের সার্থকতা, এবং এই স্বভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার কোনো স্বতন্ত্র হিসাব চলিবে না— ধরিয়া থাকা তাহার ধর্ম্ম নহে। তেমনি স্রোতের মধ্যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠা পায় না, প্রবাহের মধ্যে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না, চঞ্চলকে স্পর্শ করিতে পারে না, রূপের স্থিরতার মাঝে তাহারা আশ্রয় খোঁজে! রূপ-চেতনায় তাই আমরা একটা স্থিরতাকে লক্ষ্য করি—এবং রসানুভূতিতে অনুভব করি প্রবাহ, স্পন্দন ও আবেগ।

কথা উঠিয়াছে যে প্রাচীনের সৃষ্টিতে আমরা একটা শান্তির সুর পাই, যাহা আধুনিকের সৃষ্টিতে মেলে না। কথাটা সত্য, এবং তাহার রহস্তও রহিয়াছে এইখানে—এই

বুদ্ধি ও হৃদয়, রূপে ও রসে। প্রাচীনের সৃষ্টি এই হিসাবে বুদ্ধির, তাই রূপগত অঙ্গসৌষ্ঠব (perfection of form) ও সামঞ্জস্যে তাহার প্রতিষ্ঠা; কিন্তু আধুনিক স্রষ্টা দাঁড়াইয়াছে হৃদয়ের স্তরে আসিয়া, এবং তাই এই হিসাবে রসের দিক্ দিয়া তাহার আবেদন,—গতি ও স্পন্দন তাহার সৃষ্টির প্রাণ। একথা বুঝিলে ভুল বোঝা হইবে যে, রসের দিক্ দিয়া যাহার আবেদন 'রূপের' দিক্ দিয়া সে দেউলিয়া, বা রূপের মধ্যে যাহার পরিচয় রস হিসাবে সে একেবারে রিক্ত। ভাবটা হইতেছে—রূপ যেখানে প্রধান রস সেখানে গৌণ, এবং রূপ যেখানে গৌণ রস সেখানে প্রধান।

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের রহস্যকে আয়ত্ত করিতে হইলে, যথাক্রমে এই রূপ ও রস, বুদ্ধি ও হৃদয়ের হিসাব দিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। রূপকে আশ্রয় করিয়া সুন্দরের প্রকাশ,—রসের মধ্যে মধুরের বাস। ছন্দ ও সামঞ্জস্য হইল সৌন্দর্য্যের সুর—

'ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশঃ যথোচিতম্।'

এবং বুদ্ধির অধিকারের মধ্যে ইহার বাস, বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে আমাদের ঐন্দ্রিক চেতনার দ্বারা ইহার আবিষ্কার ঘটে। ছন্দ ও সমঞ্জস্য হইল রূপগত ব্যাপার, কিন্তু মাধুর্য্য একটি রসগত আস্বাদ—প্রবাহ ইহার স্বভাব। রূপের ভিতর ছন্দ ও সামঞ্জস্য, রসের মধ্যে স্রোত, সুন্দর ও মধুরের এই দুটি বিভিন্ন হিসাব। কথা উঠিবে যে, ছন্দে কি গতি নাই?—তাহার উত্তর এই যে ছন্দে আছে গতির ছবি, স্থিরের উপর গতির নকল, গতি নহে,—কারণ প্রকৃত গতির মধ্যে যে অব্যাহত নিরন্তরতা আছে, ছন্দে তাহা ভাঙিয়া যায়। ছন্দের মধ্যে যে গতি তাহা আসল নহে, কৃত্রিম, কারণ তাহা রূপের একটা বিশেষ ভঙ্গী মাত্র, এবং রূপের মধ্যে যে স্থিরতা আছে সত্যিকারের গতিপ্রবাহের নিরন্তরতাকে তাহা ব্যাহত করে। স্থিরের বিচ্ছিন্ন অন্তরগুলির ফাঁকে ফাঁকে কৃত্রিম প্রবাহ পুরিয়া দেওয়াতে ছন্দের জন্ম, ফলে হইয়া ওঠে তাহা রূপগত ব্যাপার, অথচ আসল প্রবাহের মধ্যে কোনো অন্তর নাই, তাহা নিরন্তর।

বৈষ্ণব মাধুর্য্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে আমরা বলি যে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য নহে, সমস্ত বৈষ্ণব 'কালচার' এই মধুরের চেতনা ও সাধনার ইঙ্গিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধির উপর যেমন সৌন্দর্য্যচেতনা নির্ভর করিতেছে, হৃদয়ের উপর নির্ভর করে তেমনি মধুরের আস্বাদ। রস বা রাগ হইল এই হৃদয়ধর্ম্ম; সমস্ত বৈষ্ণব সাধনা এই রসের সাধনা, মধুরের আস্বাদে অপরূপ!

(২)

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল!'

—কিন্তু কেন?—কেন না ইহা শুধু নয়নের দেখা নহে, ইহাও সেই 'নয়নের জলের' ভিতর দিয়া দেখা! বৈষ্ণব কবিতায় যাহাকে 'অনুরাগ' বলা হইয়াছে, সেই অনুরাগের রসে মধুরের সাক্ষাৎ, তাই 'নয়ন না তিরপিত ভেল'!

আমাদের চেতনা যখন একটা স্থিতির মধ্যে আশ্রয় লাভ করে, তখনই তৃপ্তির আস্বাদকে আমরা আয়ত্ত করিতে পারি। বুদ্ধিগত যে চেতনা, তাহা এই স্থিতির বন্ধনে স্থির, এবং সেইজন্যই রূপ ও সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, কারণ রূপ ও সৌন্দর্য্য হইতেছে স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থিরকে লইয়া তৃপ্তি, সুন্দরের মধ্যে তাই আমরা তৃপ্তিকে লাভ করি; তৃপ্তির চেতনা হইল বুদ্ধিবৃত্তির সীমানায়, বুদ্ধির অধিকারের মধ্যে তাহার কাজ; সুন্দর আমাদের তৃপ্তি দেয়, কিন্তু মধুর আমাদের আকুতি, আবেগ ও এই হিসাবে অতৃপ্তির মধ্যে ভাসাইয়া দেয়, কারণ হৃদয়ের স্রোতের মধ্যে তাহাকে আমরা লাভ করি—তাই আমাদের বলিতে হয়—

'নয়ন না তিরপিত ভেল!'

কিন্তু এই দেখা যদি কেবলমাত্র নয়নের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে ইহাতে তৃপ্তির আস্বাদ মিলিত, কারণ বিষয়ের আবেদন তখন ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধির কাছে হইত, এবং তাহারই নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধির দাবী মিটিত সুন্দরের মধ্যে। কিন্তু ইহা যে সেই 'অনুরাগের', রসের দেখা! তাই—

'সোই পিরীতি বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়!'

বলিয়াছি, হৃদয়ের এই বৃত্তি, যাহা 'অনুরাগ, যাহা 'অনুভব' তাহা প্রবাহমূলক, গতিবেগে তাহার প্রাণ। বিদ্যাপতির কথায় তাহা 'তিলে তিলে নূতন হোয়!' এই গতি, এই গলিয়া যাওয়া, এই আকুতি ইহাই হইল অতৃপ্তি,—ইহারই মধ্যে মধুরের জন্ম। এই 'অনুভব', এই পিরীতি, এই 'অনুরাগের' দেখা, এই 'তিলে তিলে নূতন' হওয়ার অতৃপ্তি ও নিঃশেষবিহীনতার মধ্যে মধুরের আবির্ভাব। সেইজন্যই—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল!'

ইহা শিল্পীর দৃষ্টি নহে,—ইহা বৈষ্ণবের কথায় 'রসিকের' বা 'প্রেমিকের' সৃষ্টি! শিল্পীর দেখা—বুদ্ধির আলোকে সুন্দরের মূর্ত্তি; প্রেমিকের যে দেখা—সে হৃদয়রহস্যে,প্রেমের রঙে মধুরের মায়াকে! প্রেম ও মাধুর্য্যে এই অবিচ্ছেদ অনন্ত সম্বন্ধ রহিয়াছে। সামঞ্জস্য ও মাত্রা হইল শিল্পীর লক্ষ্য, আবেগ ও আকুতি হইল প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষিত; তৃপ্তিতে শিল্পীর পরম প্রাপ্তি, অতৃপ্তির মধ্যে প্রেমিকের চরম আস্বাদ! যেখানে এই মধুরের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি, সে হইল একটি নিগূঢ় রহস্যে নির্জ্জন, নিবিড় হৃদয়ের ছায়ালোক। এখানে পৌছিয়া মানুষের সকল সমাপ্তির চেতনা একটি একাকার অননুভূত আবেগে লেপিয়া-মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়,—একটি অন্তর্গূঢ় অমৃত-আস্বাদের পরম অনির্ব্বচনীয়তায়, নিঃশব্দ মাধুর্য্য-ধারায় অন্তর গলিয়া ইহারই অপরিসীম অতলপানে থেই হারাইয়া চলিতে আরম্ভ করে,—একটি অমর নিঃশেষবিহীনতা নিবিড় হইয়া উঠিতে থাকে, এবং অবশেষে অসহ্য আবেগের অধীর অতৃপ্ততায় কাঁদিয়া ওঠে—

'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!'

ইংরাজ কবি শেলির কথায়—'Ever still burning
yet ever inconsummable.'

এই নিরন্তর গলিয়া চলার মধ্যে, এই অতীন্দ্রিয় নিবিড়তা ও নিগূঢ়তার আস্বাদে, এই নিঃশেষবিহীনতায়, সেই মধুরকে বচনের মধ্যে, শিল্পীর মত করিয়া রচনার মধ্যে বাঁধা যায়না। তাহার মধ্যে আমরা আপনাকে হারাইয়া ফেলি, তাই পরম অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে তাহা চিররহস্য-মগ্ন, কারণ—

'সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়—'

'—কি পুছসি অনুভব মোয়!'—বিদ্যাপতির মত সেই 'পিরীতি', সেই 'অনুভব', সেই 'অনুরাগ' 'বাখানিতে' গিয়া Epipsyehiden-এর কবি ঠিক তেমনি অধীর হইয়া কহিয়াছেন—

'Woe is me!
The winged words on which my
soul would pierce
Into the height of Love's rare universe
Are chains of lead around its flight of fire!'

এবং অবশেষে একান্ত অসহায়ের মত বলিতে হইয়াছে—

'I pant, I sink, I tremble, I expire.'

ইহাই হইল এই 'হৃদয়ের দেশ',—এই রহস্যগূঢ় ছায়ালোকের শেষ কথা। এই অতীন্দ্রিয়'হৃদয়ের দেশ'টিকে শেলি 'Love's rare universe' বলিয়াছেন; ইহাই বৈষ্ণব প্রেমিকের 'পিরীত', 'অনুরাগ' ও মাধুর্য্যের বিরল জগৎ। ইহারই অন্তরে আছে তাঁহার 'লাবণ্যামৃত', 'কারুণ্যামৃত' বা 'রসামৃত'! অনন্ত প্রেমের যে কথা আছে, এই Love's rare universe-এর আভাসে তাহারি আস্বাদ মেলে,—এই 'অনুভব', এই 'অনুরাগ' এই মাধুর্য্যামৃতের নিঃশেষ-বিহীনতায় তাহারি ছায়াপাত হইয়াছে।

এইখানে পৌছিয়া, এই ছায়ালোকের গোধূলিমায়ায় রাধা মধুরকে (শ্রীকৃষ্ণ) দেখিলেন, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়কে বর্ণনার মধ্যে বাঁধিতে পারিলেন না, শুধু কহিলেন—'তোমার তুলনা তুমি' (চণ্ডীদাস)। চণ্ডীদাসের কথায় রাধার তখন'অনুরাগে মন সদাই মগন'! চোখেও'অনুরাগের তুলিকায়' যে রঙ লাগিল, সেই প্রেমের রঙের ভিতর দিয়া তিনি প্রাণের দেখা দেখিলেন। শিল্পীর নয়ন তখন প্রেমিকার 'নয়নের জলে' ভাসিয়া গিয়াছে; তাই দেখিলেন মধুরকে, যাহা অনির্ব্বচনীয়, এবং রূপের তুলনা দিতে গিয়া

শিল্পীর মত করিয়া আঁকিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন—'তোমার তুলনা তুমি!'

(৩)

বুদ্ধি বিষয়ের চারিপাশে সীমানা টানিয়া, হিসাব করিয়া, বিচার করিয়া তাহাকে দেখে,—বিষয়ীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, কারণ বিচ্ছিন্নতাকে লইয়াই বিচার; বিষয়ের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে হিসাবের অঙ্ক কষিতে থাকে,—বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে বুদ্ধি একটা দ্বৈতভাব ও ব্যবধান রাখিয়া দেয়, তাহা না হইলে তাহার হিসাব ভণ্ডুল হইয়া যায়। কিন্তু হৃদয় বা দরদ বিষয়ীকে একেবারে বুকের মধ্যখানে আনিয়া ফেলে, বিষয় ও বিষয়ীকে একটা ঐক্যের মধ্যে মিলাইয়া ধরে, কারণ হৃদয়ধর্ম্ম বিচারের উজান স্রোত, ইহার বিচার বিমুখী, বোধের মধ্যে ইহার কাজ। হৃদয় বিচ্ছিন্নতাকে ঘুচাইয়া দেয়। এই জন্যই বুদ্ধি ও বোধের দুটি বিভিন্ন চেতনার ধারা। বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর সকল আগ্রহ, সকল চেতনাকে বুদ্ধি প্রতিনিয়ত বিচার ও বিশ্লেষণ-মূলক করিয়া তুলিতেছে। বিষয়ের চারিপাশ দিয়া বুদ্ধির পথ,—সমস্ত বিষয়টির মধ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। বিষয়ের বাহিরকে সে পায়, ভিতরকে আয়ত্ত করিতে পারে না। এও এক রকমের পাওয়া। আবার হৃদয়ের যে প্রাপ্তি সে ভিন্ন প্রকৃতির; হৃদয় বিষয়ের একেবারে অন্তরে গিয়া পৌঁছায় বলিয়া বাহিরের রূপটিকে দেখিতে পায় না, ভিতরের ঐক্যকে সে বোধ করে। বিচারের বিচ্ছিন্নতা তাহার নহে, দরদের ও বোধের ঐক্যে তাহার আশ্রয়। বিচার-মূলক ও বিশ্লেষণ-মূলক চেতনার মধ্যে ভালমন্দের হিসাব,—বিষয়ের ভালমন্দ, সুন্দর ও অসুন্দরের আবিষ্কার এই চেতনার দ্বারা ঘটে; ইহা বিষয়ের উপরের আবরণ ও বর্ণানুরঞ্জনকে লক্ষ্য করিতেছে, বিষয়ের শাঁসকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কারণ বিচার দিয়া সে জায়গাটি ছোঁয়া যায় না, এবং ভালমন্দ, সুন্দরঅসুন্দরে মিলিয়া বাহিরের যে রূপটি সৃষ্টি করে, ভিতরের রূপাতীত সত্তায় তাহার চিহ্ন মেলে না;—রূপ হইল বাহিরকে জড়াইয়া, সেখানে বুদ্ধির কাজ; ভিতরে হইল রস, সে স্থান দরদের অধিকারে, তাই ভালমন্দ, সুন্দরঅসুন্দরের বিচার লইয়া বুদ্ধির সেখানে প্রবেশ নিষেধ, সে আর এক রাজ্যে।

এই বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে মানুষের প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। একদিকে সে শিল্পী, আর একদিকে সে প্রেমিক!—তাহার ভিতরে যে শিল্পী রহিয়াছে সে যখন মানুষের পরিচয় সংগ্রহ করে, তখন সে তাহার ভালমন্দ সুন্দরঅসুন্দরের হিসাব লইতে থাকে, মানুষের জীবনপদ্মের সে পাপড়ির খোঁজ রাখে, জীবনের রঙ্‌ ও রূপের মধ্যে সে জীবনকে লক্ষ্য করে, জীবনের এই বর্ণবৈচিত্র্যের জালে সে জড়াইয়া থাকে,—ইহারই উপর তাহার সকল আগ্রহ আসিয়া থামিয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রেমিক যে, সে মানুষের জীবন-পদ্মের মধুটুকুর আস্বাদ লয়,—তাহার মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া রাখে, তাই তাহার পরিচয় ভিন্ন ধরণের। রূপের মধ্যে আছে ভালমন্দ, সুন্দরঅসুন্দর,—রসের মধ্যে আছে মাধুর্য্য ও তিক্ততা। শিল্পী বাহির হইতে রূপের মধ্যে যে সুন্দরকে লাভ করে, প্রেমিক ভিতর হইতে তাহা হারায়; আবার ভিতর হইতে প্রেমিক যে মধুরকে আয়ত্ত করে, শিল্পী ভিতরে তাহার পথ পায় না। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জীবনের মূলে প্রেমিকের হৃদ্‌স্পন্দন—যাহা-কিছু বা যে-কেহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইতেছে, অথবা আমাদের হৃদয় ও দরদ যাহার উপর গিয়া পড়িতেছে, আমরা তাহারি সাথে মিশিয়া যাইতেছি। তাই বিচারের হিসাবের বা তুলনার কোনো অবসর বা অবকাশ আর তখন থাকে না, কারণ বিচার বা তুলনা তখনই থাকে যখন বিচারকারী বিষয় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে; বিষয়ের মধ্যে মিশিয়া বিষয়ের বিচার বা তুলনা করা চলে না—বুদ্ধির কাজ হৃদয়ের নহে। তুলনা দিতে গেলেও চণ্ডীদাসের কথায় প্রেমিককে বলিতে হইবে—'তোমার তুলনা তুমি'। তাই প্রেমিকের কাছে তাহার প্রিয় সকল ভালমন্দ, সকল সুন্দরঅসুন্দরের অতীত,—কারণ প্রেমিক তাহার প্রিয়ের বাহিরকে দেখিতে পায় না, সে তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারই জীবন-ধারার সাথে আপনার জীবনপ্রবাহকে মিলাইয়া ধরিয়াছে,

সকল ভালমন্দের অতীত হইয়া তাহার প্রিয় তাহার কাছে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, পরম মাধুর্য্যে সে অপরূপ! শিল্পী কালো অপবাদ দিলে প্রেমিক সহ্য করিতে পারিবে না, বলিবে—

'লোকে তারে কালো কয়
সহজ সে কালো নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি!' (পদকল্পতরু)

শিল্পীর চোখে যাহা নিছক কালো, প্রেমিকের প্রাণে তাহা সহজ সাধারণ কালো নহে, প্রেমিকের হৃদয়ের মধ্যে তাহা নীলমণির রঙ্ ধরিয়াছে! সাধারণে দেখে শিল্পীর চোখ দিয়া, প্রেমিক দেখে দরদীর হৃদয় দিয়া; প্রেমিক যে পথে প্রিয়কে পায়, শিল্পীর সে পথ অজানা। শিল্পী মানুষকে বা বিষয়কে নয়নের বাহিরে বসাইয়া রাখে, নয়নে দেখিবে বলিয়া; প্রেমিক নয়ন দিয়া দেখিবে না, তাই সে তাহার 'মনের মানুষকে' 'নয়নদ্বারে' বসাইয়া রাখিতে পারে না, একেবারে নয়নের মধ্যে আনিয়া ফেলে, সে বলে—

'বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থোব—
প্রেমচিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।'

সে 'রসেতে গাঁথিয়া' হৃদয়ে তুলিয়া লইতে চায়,—সে মধুরকে চায়। তাই বিষয়ের প্রতি শিল্পীর রাগদ্বেষ ও প্রেমিকের রাগদ্বেষ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। শিল্পী যাহাকে ছাড়িয়া দেয় প্রেমিক তাহাকে ছাড়িতে পারে না, কারণ প্রেমিক তাহারই মধ্যে জড়াইয়া থাকে!—প্রিয় তাহার ভালমন্দ দোষগুণ সব লইয়া প্রেমিকের প্রাণে সমস্তের অতীত এক অপূর্ব্ব ব্যাপার,—অপরূপ (unique) সে! হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে যাহা unique তাহাকেই স্পর্শ করে; বুদ্ধি symbolise করে,—সেইজন্য যাহা অপরূপ, যাহা অপূর্ব্ব তাহাকে সে দেখে না।

মানুষের জীবনের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এই শিল্পী ও প্রেমিকের নিদ্রা ও জাগরণ চলিয়াছে। যখনই শিল্পী আঁখি মেলে, প্রেমিক ঘুমায়; প্রেমিকের প্রাণ জাগিলে শিল্পীর আঁখি মুদিয়া আসে। যে-কেহ একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে, আমাদের বুদ্ধি আর তাহাকে ছুঁইতে পারে না, বুদ্ধির বিচারের মধ্যে হৃদয়ের 'প্রবেশ নিষেধ'। এক-কথায় শিল্পী হইল সৌন্দর্য্যমরমী,—প্রেমিক হইল মাধুর্য্যমরমী। আমরা দেখিতে পাই গ্রীক্ ও বৈষ্ণব কালচারের মধ্যে যথাক্রমে এই দুটি বিশেষ সাধনার দুটি বিশিষ্ট ধারা পরিণতি লাভ করিয়াছে। গ্রীকের মধ্যে লক্ষ্য করি একটি শিল্প-সাধনার বিশেষ প্রতিভাকে,—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ধারায় তাহার বিকাশের পথ, তাহা রূপ (form), ছন্দ ও সামঞ্জস্যের মধ্যে তৃপ্ত। কিন্তু বৈষ্ণব সাধনা বুদ্ধি হইতে সরিয়া আসিয়া রস ও হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছে, তাহার সকল সৃষ্টি ও সাধনার মূলে রহিয়াছে একটি মাধুর্য্যের আস্বাদ।

'নয়নের জলের' ভিতর দিয়া শোনা ও 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবেশ করা, ইহারই মধ্যে বৈষ্ণবমাধুর্য্যমরমীর জগৎ,—এইখানেই Love's rare universe। তাই বৈষ্ণব-সাধনা প্রধানতঃ মধুরের সাধনা, মাধুর্য্যের সন্ধানকে লইয়া ইহার গতি ও পরিণতি, হৃদয় ও রস হইল ইহার প্রাণ। সেইজন্য এই বিশেষ হিসাবে ইহা বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য হইতে সরিয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্য শব্দটির উল্লেখ বহুস্থানে মিলিলেও তাহা বিশেষ করিয়া পারিভাষিক অর্থে যাহা মাধুর্য্য তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব-সাধনায় যে সৌন্দর্য্যচেতনার কোনো স্থান নাই, এমন নহে। কথা হইতেছে যে মাধুর্য্য হইল ইহার মুখ্য ও মূল সুর। কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে নিখিল রসামৃতমূর্ত্তি! এই 'রসামৃতের' মধ্যেই বৈষ্ণব-মাধুর্য্যের রহস্য! বৈষ্ণব মাধুর্য্যমরমী তাই কহিতেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো—
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

পলাতক

শ্রীযুক্ত জসীমউদ্দীন

সে এক কিশোর ছেলে
মোর আঙিনায় এসেছিল হেসে রাঙা পায়ে রেখা মেলে।
সাদা সাদা মেঘ রোদে ভেসে যায় শারদ গগন-গায়,
তারি 'পরে যেন অফুট উষসী সিঁদুর ছড়ায়ে যায়।
এমনি মেঘের গুঁড়ো-করা ধূলি মাখা ছিল তার দেহে,—
সে দেহ পড়িছে এলায়ে এলায়ে মায়া মমতায় স্নেহে।

এলো মোর আঙিনায়—
হাসিখানি তার গোলাপী ঠোঁটের মালায় বাঁধিয়া হায়!—
সেই হাসি,--যারে কৌটায় ভরি' প্রথম রবির রেখা
পূবের গগনে উঁকি মেরে চায় মেঘে মেঘে আঁকি' লেখা।
সেই হাসি যাহা গোপন রয়েছে অফুট কুঁড়ির ঘরে,—
যে হাসি আজিও গড়ায়ে পড়িছে চাঁদের কলস ভ'রে।
কবে যে আসিল আজ মনে নেই, কখন যে হাসে ফুল,
কখন যে জাগে সন্ধ্যার তারা কে জানে তা নির্ভুল।
প্রভাতেরে দেখি, কখন যে আসে সন্ধান নাহি জানি,—
তেমনি সে এলো মোর আঙিনায় রাঙা পায়ে রেখা টানি'।
আমার দেশের ধানের আঁচল যে হাওয়া দোলায়ে যায়,
সেই হাওয়া তারে ঘুম পাড়াইত স্বপন-পরীর গাঁয়।
পাখীরা তাহারে গান শুনাইত,— মেঘেরা আঁকিয়া ছবি
প্রভাতে ও সাঁঝে বানাইত তারে বিভোল কিশোর কবি।
গাছের পাতায় বাতাস দুলিত, পেতে সে রহিত কান,
রাতে সে বসিয়া নিরালে শুনিত ঝিঁঝি পোকাদের গান।
ভাবিত সে বসি', ভাবিত সে তার কিশোর কালের মনে
মাটি যেন তার বুকের বেদনা ছড়াইছে তারি সনে।

রাত্রের আঙিনায়—
যত অপ্সরী নাচিয়া যাইত নূপুর জড়ায়ে পায়।
তাহারা কখন কে নাচিবে এসে জানিত সে সন্ধান,
এরই মাঝে সে যে ভ'রে নিয়েছিল তাহার কিশোর প্রাণ।
অতীত তাহার বল্কল-ঘেরা কুহেলি-কুহর খুলে'
নিয়ে যেতো তারে স্বপন-জড়ান রূপকথা-রাজপুরে।
সে দূর দেশের অজানা রাজার কিশোর কুমার আসি'
তার সনে যেচে মিতালি করিত তারই মত মৃদু হাসি'।
হাসিয়া আসিত রাজার কুমারী কনক-মেঘের নায়—
হাজার যুগের ঘুম-লেখা যার চোখে মুখে আর গায়।

আমার দেশের এই গাঁওখানি মাটির পাত্র ভরি'
লতারে সাজায়ে পাতারে সাজায়ে ফুলেরে প্রদীপ ধরি'
পাখীর গানেতে মন্ত্র পড়িয়া পূজা দিত তারে নিতি,—
কিশোর দেবতা সেই পূজাভারে মাখাত মনের প্রীতি।
ফিরিত সে মাঠে রাখালের সনে, বিকায়ে সোনার হার
সাপলা-লতার মালা লইবারে পরাণ কাঁদিত তার।
রাখালের সনে ভাব সে করিত, ঢেলার দালান গড়ি'
তাহাদের নিয়ে রাজা-রাজা খেলা করিত সে দিন ভরি'—
রাখাল ছেলেরা মনের হরষে শামুকের মালা গাঁথি'
কিশোর রাজার গলায় পরায়ে করিত খেলার সাথী;
রাঙা মুখখানি রোদে পুড়ে যেতো, তাহারা ব্যাকুল হ'য়ে
সারা গায়ে তার বাতাস করিত কুমড়ার পাতা ল'য়ে।
কাশের পাতায় চরণ কাটিত, কাঁধের গামছা চিরে'
দুটি রাঙা পাও বেঁধে দিতে তারা ভাসিত নয়ন-নীরে।

তার পানে চেয়ে মাঠের চাষীরা ভুলিত খেতের কাজ,—
ভাবিত সে কোন্ সোনার দেবতা ধরায় এসেছে আজ!
তাহাদের মাঠে মাসে মাসে সাজে শস্যের আল্পনা,
আব্‌সা-হলুদ লাল্‌সে-হলুদ হলুদে-জরদে-সোনা;—
সাজে তৃণ-ভার ফুলে ও পত্রে গোলাপী-সবুজে মিশে',
আসমানী নীল মেঘলীয়া নীল তাহাতে হারায় দিশে।

সব রঙ যেন কাড়াকাড়ি করি' এ ওর হইতে বড়
বাতাসে হেলিয়া তৃণ এলাইয়া ভাঙিতেছে কড়মড় !

তবু কোন্ রঙ সব চেয়ে সেরা ভাবিবার আছে ধারা—
সে যেথা দাঁড়ায় সেথাকার রঙ সব চেয়ে লাগে বাড়া।
উপরে আকাশ, নীচেতে অথই শস্যের পারাবার,
চার ধারে গাঁও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলয় হয়েছে তার ;
মাঝখানে তারি দাঁড়ায়ে হাসিত তরুণ কিশোর ছেলে—
দূর শূন্যের পথে উড়ে যেতো কনক-মেঘেরা খেলে।
সে দূর শূন্য কথা কয়নাক ; মাঠেরও নাহিক ভাষা,
তাতে ফুল ফোটে বরণে বরণে পাতায় পাতিয়া বাসা ;—
সে যেন তাদেরি জীবন্ত ভাষা, তাহারই কথার সুরে
এ মূক মাঠের সকল কাহিনী ছন্দে ফিরিত ঘুরে'।
চাষীরা ভাবিত তাহাদেরি কোন ফসলের পথ বেয়ে
মাঠের দেবতা এসেছে বুঝিবা শস্যের গান গেয়ে !

ফিরিত সে রাতে জ্যোৎস্নার রথে ছায়াপথ-মেঘ ধরি',
দেবতারা তার গায়েতে মাখাত তারকার ফুলঝুরি।
পূর্ণ চাঁদের গায়েতে জড়ায়ে আব্‌ছা মেঘের দোলা
অলস দেহটি আলসে এলায়ে ঘুমাত সে ঘুম-ভোলা।
রাতের শিশির চরণ ফেলিয়া তার চোখে আর মুখে
মণিমাণিক্যের খেলা জুড়ে দিত আপন মনের সুখে।
রাত-জাগা পাখী শুনাইত তারে ঘুম-পাড়ানিয়া গান,—
চাঁদেরে জড়ায়ে ঘুমায়ে হাসিত তাহার বদন-চান।

প্রভাত-মেঘের রাঙা পথ বেয়ে আসিত কিশোরী মেয়ে
বন-বিহগীর অধরে অধরে ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে।
গোলাপী ঠোঁটের চুমু এঁকে দিত তাহার সারাটি গায়,
রাঙা মুখ তার আরও রাঙা হ'ত রঙীন আলোর ঘায়।
ঘুম হ'তে সে যে জাগিয়া উঠিত, গায়ে নীহারের দাগ,
তাহাতে আবার ঢেউ খেলে গেছে নয়া প্রভাতের রাগ !

এমনি কিশোর-বেশে
এসেছিল সেই সোনার কুমার মোর আঙিনায় হেসে
সেই একদিন,—ধূ-ধূ বালু ওড়ে জীবনের সাহারায়,
শিশিরের ফোঁটা ভেসে এসেছিল বিন্দু মেঘের গায়।
জীবনের এই অনন্ত ক্ষত অনন্ত ক্রন্দন,
তার মাঝে কেবা ভালে এঁকেছিল এতটুকু চন্দন।
কে এই আকাশে দোলাইয়া গেল একটি রঙীন ঘুড়ি,—
কোন্ দুরাশার লিখন লিখিয়া পাখী চ'লে গেল উড়ি'
কোন্ মায়ালোকে—ছায়াপথ-পারে,—আলোকের
অলোকায় ?—

কে আনিয়াছিল কি যাদুমন্ত্রে মোর আঙিনার ছায় !
আজি যতদিকে যতবার চাহি, যেন দূর—কত দূর,
সে দূরেরো কোন্ দূর দুরাশায় মিশে গেছে সেই সুর।
আজি মনে হয়—শুধু মনে হয়—কতকাল—কতকাল—
কতকাল এসে কতকাল গেছে পাতি' বরষের জাল,
তারি এক-কালে এসেছিল সেই সোনার কিশোর ছেলে—
আর এক-কালে চলিয়া গিয়াছে মোর পূজাভার ফেলে।

আজি নগরের পাষাণকারায় কাঁদিছে বন্দী প্রাণ,—
আর কি জীবনে পাবনাক সেই কিশোরের সন্ধান ?
পাষাণপ্রাচীর পাষাণে ঘিরেছে, কোনখানে নাহি ফাঁক,
পাষাণ-বক্ষ ভেদিয়া ইহার বাহিরে যায় না ডাক।
ডাকি উভরায়—সোনার কিশোর ফিরে আয়,—আয়,
—আয়,
সুর লেগে তার দিন-রজনীর খেয়া-নাও ভেসে যায়।
পাষাণের সাথে মাথা কুটে কাঁদি, নয়ন-নদীর জলে
যে গেছে চলিয়া সে যেন হায় রে আরও দূরে যায় চ'লে।
কে সেই কিশোর ? শুধাইছে সবে, বলিব কি আমি আজ ?—
পাষাণের দেশে কঙ্কাল-সার রুক্ষ ভিখারী-সাজ—
এই যে কিশোর ! এ দেহের এই ভাঙা মন্দির-মাঝে
এসেছিল সেই সোনার কুমার নব জীবনের সাজে !
—না রে—না রে—এ যে মিথ্যা প্রলাপ, অজান-গাঁয়ের
ছেলে
পথ ভুলে ওরে শুধু পথ ভুলে এসেছিল হেসে-খেলে।
তারপর সে যে চলিয়া গিয়াছে আপন খেয়াল-ভরে,
কোথায় গিয়াছে—কোন্ দূর দেশে, কে দেবে বলিয়া
মোরে ?

হয় ত সে কোন শস্যের খেতে ঘুমায়ে রয়েছে আজ,
হিজলের বনে ছড়ায়ে তাহার গায়ের রঙীন সাজ,—
হয়ত সে কোন বেগানা-গাঁয়ের কৃষাণ ছেলের সনে
বেথুল কুড়ায়ে ডুমকি বাজায়ে ফিরিছে আপন মনে !

শ্রীজসীমউদ্দীন

শীত-প্রাতে

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

শীতের সকালবেলাটি রোদের স্পর্শ উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে ছাতে গিয়েছিলাম। এই মাত্র প্রায় মাইল পাঁচেক সাইকেলে সহরের বাইরে ঘুরে আসার পর যখন ছাতে দাঁড়িয়ে চারদিককার দৃশ্যের পানে তাকালাম তখন বেশ একটা প্রভেদ চোকে পড়ল……পথে বেরিয়ে দেখেছিলাম জাগ্রত জগৎ তার বিচিত্র কর্ম্ম-চঞ্চলতার সূত্রপাত করচে; না জানি কোন্ ভোর-রাতে উঠে বহুদূর গ্রামের পসারিণীরা তাদের তরিতরকারী দুধ ঘুঁটের পসরা নিয়ে সহরের পানে ছুটে আসচে, কত ক্রোশ দূরের দিনমজুরেরা মিস্ত্রীরা তাদের দিনের কাজ করবার উদ্দেশ্যে আসচে, এক্কাওয়ালা ঘোড়াকে জুতচে গাড়ীতে, খাবারওয়ালা কাক চিলদের সতর্ক করতে করতে পাড়ার ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে চলেচে, দোকানী তার দেবতাকে স্মরণ ক'রে দোকান খুলচে। মানুষের জগৎ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র হ'য়ে ওঠে! দ্রুতগতিতে আবার এই বিচিত্র কর্ম্ম-চঞ্চলতা দেখতে আরো চমৎকার লাগে। ঠিক তারপরই যখন ছাতে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালাম তখন একটা যেন স্বতন্ত্র জগতের মাঝে এসে পড়েচি মনে হ'লো।

চারিদিকে রাশি রাশি গাছ আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে যতদূর চোক যায় কেবলি কাঁচা পাকা বাড়ী, তার ওপরে নীল আকাশ। প্রতিদিনের দৃশ্যের সঙ্গে এর কোথাও কোনো প্রভেদ নাই। হয়ত কোথাও এক-আধটা বাড়ী নতুন উঠেচে, কিন্তু তাতে কি! ওই আকাশ বাতাস গাছ পাতার সবুজ রঙ সব কালও যেমন ছিল আজও তেমনি; সকাল-সন্ধ্যা এরা একভাবে একটানা সানাইয়ের পোঁর মত চলেচে। যার বৈচিত্র্য নেই তার আবার রস কোথায়? ওই আকাশ-বাতাসের একটানা একঘেয়েমীর পানে তাকিয়ে মনে হলো যেন আসল সানাই-বাজিয়ে তার আলাপ আর তানের খেলা শেষ ক'রে বিশ্রাম করচে কিম্বা এখনো তার কাজ আরম্ভই হয় নি, শুধু যে-জন পোঁ ধরে সে-ই এই একটানা সুরটাকে টেনে নিয়ে চলেচে। মনে হ'ল, হ্যাঁ বিশ্রাম চাই বই কি! এই তো বর্ষার বিদ্যুৎ-ঝলকে, মেঘের গুরু-গর্জ্জনে, ঘনান্ধকারের মায়ায়, গভীর সবুজের মাধুর্য্যে, বর্ষণের রিমিঝিমি তালে বিচিত্র সুরের খেলা শেষ হ'য়ে গেল; এবার আসচে বসন্ত—পাতায় পাতায় কচি কোমল শ্যামলের বাহার সুরু হবে। এই শীতটা হচ্চে মাঝেকার বিশ্রাম-পর্ব্ব। কিন্তু এই বিশ্রামের মাঝে ওই পোঁ একেবারেই ভালো লাগে না। পথে পথে যে বিচিত্র কর্ম্মজগতের সুর জাগচে বরং সেই ব্যাণ্ডের বাদ্য ভালো, কিন্তু আকাশ-বাতাসের এই বৈচিত্র্য-হীনতা একটুও ভালো নয়। ছাতে উঠে এমনি ধারাই মনের মধ্যে একটা কি ভাব যেন আন্দোলন তুলেছিল।

আমার রোগশয্যার ফেরৎ বন্ধুটি কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে ছাতের আলসের ওপর বাহু রেখে এই দৃশ্যটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছিল। কতকাল হ'ল সে তার শয্যা ছেড়ে পথের পানে তাকাতেও পারেনি, কিন্তু তবু এই চিরন্তন গাছ পাতা বাড়ী আর আকাশের পানে চেয়ে যে সে

এত কি উপভোগ করচে তা আমার বোধগম্য হ'ল না। ভেতরে ভেতরে বোধ করি এতে আমার বিরক্তিই হয়েছিল, বললাম, কি বিরস আর বিশ্রী এই আকাশ আর ওই গাছগুলো!

বন্ধু শুধু মৃদু হেসে বললে, "রস আর শ্রী নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে তো তোমরা সমালোচকেরা সাহিত্য-পত্রগুলোকে একেবারে অখাদ্য ক'রে তুলেচ, এবার কি আকাশ আর গাছের পাতা ধরবে না কি?—ওই একটুকরো আকাশ আর গাছের সবুজকে ক্ষমা কর। আমার মত অজ্ঞানের তিমিরান্ধকার দূর ক'রে আর দরকার নেই; না হয় মায়া নিয়েই আছি, তবু এইটুক্ রসেই আমার রুগ্ন মন-প্রাণ তৃপ্ত আছে, সুতরাং সমালোচক 'তুষ্ণীম্ ভব'।"

"আচ্ছা আমি না হয় চুপ করচি, কিন্তু এই যে তুমি এতক্ষণ ধ'রে ওই দিকে তাকিয়ে আছ, তুমি কি দেখছিলে বলতো বন্ধু? পথ দিয়ে আসতে আসতে কত বিচিত্র দৃশ্যই চোকে পড়ল। কি অভিনব এই জীবন আর তার কর্ম্মধারা! আমি ওর মধ্যে জীবনের সুর পাই,—অবিশ্যি এ-দেশী খেয়াল-ধ্রুপদের সুর নয়। তুমি শুনে হয়ত হেসে উঠবে কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীত-বাদ্য তোমার ভালো লাগে না। তবু আমার কিন্তু বিলাতী ব্যাণ্ড চমৎকার লাগে। ওর মধ্যে একটানা ভাবকে ফেনানো নেই, কিন্তু আছে এই বিশাল জীবনগতির বহুমুখী বিচিত্রতা। এই সহরের পথ দিয়ে চলতে চলতে যে বহুলজীবন চোকে পড়ে তার মধ্যে একটি মাত্র রাগের আলাপ পাই না,—তার মধ্যে কত বিভিন্ন ভাব এবং সুরের সংমিশ্রণ এবং সমাবেশ, কত বিসদৃশ বর্ণের ভিড়! ব্যাণ্ডের সুর আমার ভালো লাগে এই কারণেই যে তাতে জীবনের এই যে অসামঞ্জস্য, বহুলতার বৈচিত্র্য, তার প্রকাশ ওই সুরে আছে। তার পাশে আমাদের রাগ-আলাপ যেন কেমন লাগে। সেই আলাপও তবু কিছু বৈচিত্র্য আনে; কিন্তু তানপুরার একটানা সুর, সানাইয়ের পোঁ এ তো আমায় বিরক্ত ক'রে তোলে।..."

বন্ধু আমার কথাগুলো শুনে চুপ ক'রেই রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, "দেখ, তর্ক এক বস্তু আর অনুভূতি আরেক বস্তু। তর্ক দিয়ে দুটো বস্তুকে তুমি আলাদা করতে পার, কিন্তু তর্ক দিয়ে সেই তৃতীয় বস্তুটিকে কি ক'রে প্রতিষ্ঠিত করবে যা তোমার অনুভবেই আসেনি? তুমি একটানা একঘেয়ে সুর ব'লচ, সে যে একঘেয়ে নয় একথা তো তর্ক ক'রে বোঝানো যাবে না। সেতারের পরদাগুলোয় আলাদা আলাদা ধ্বনি উঠচে, ধর না যে পঞ্চমের সুরটাই, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বলচে ওই পঞ্চম অপরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু ওকে ভিন্ন ভিন্ন রাগে-রাগিণীতে একটু নিবিষ্ট হ'য়ে যদি শোনো, দেখবে কত বিচিত্ররূপে ওই সুর তোমার কানে ফিরে ফিরে এসে লাগবে। ওই তানপুরার সুরকে তুমি একঘেয়ে বলচ কারণ তুমি যখন গান শুনো তখন তানপুরার তানকে তুমি কান দিয়ে গ্রহণ করনি; সেটা যে গ্রহণ করবার জন্য সে কথাটাই তুমি হয়ত জান না। কিন্তু যাঁরা সত্যিকার গাইয়ে, দেখবে তাঁরা ওই তানপুরার সুর মেলাবার জন্য কতখানি সময় খরচ করেন। অনেকেরই কাছে ওটা সময়ের বাজে খরচ হয় জানি, ততক্ষণে পাঁচটা গান হার-মোনিয়ামে হ'তে পারে ব'লে কেউ কেউ আপশোষ ক'রে আসর ছেড়ে যান তাও জানি। কিন্তু তবু এই কথাটি না ব'ললে চলে না যে ওই তানপুরার সুরই একজনের কানে পরম বিচিত্র মধুর হ'য়ে লাগে। গানের এক একটা হিল্লোল উঠে' যখন ওই তানপুরার সুরে এসে লীন হয় তখন ওই তানপুরার তথাকথিত একঘেয়ে বাঁধা সুর যে বিচিত্র মাধুর্য্যে এবং নবীনতায় ভ'রে ওঠে, সেই কথাটি জানেন শুধু সেই গাইয়ে—যিনি কান এবং প্রাণকে ওই সুরের মধ্যে নিবিষ্ট ক'রে গান করেন। কথাটা হয়ত তোমার অদ্ভুত লাগবে, তবু আমার মনে হয় ওই যে একতান সেটা গানকে তার সীমায় রাখবার জন্য নয়, বরং এই গান এই সুর-তানের আলাপ হ'চ্চে ওই একতানের অশেষ মাধুর্য্যে প্রাণকে ধ্যানস্থ করবার জন্য।

"তুমি যাকে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে আকাশ-বাতাস ব'লচ তারই কথা আজ আমি বিশেষ ভাবে ভাবছিলাম। এই আকাশ বাতাস গাছপালার সবুজকে তুমি হয়ত তেমন নিবিষ্ট হ'য়ে দেখনি, তানপুরার তানের মত এও তোমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেছে। এই শরৎ চ'লে গেছে, আজকের আকাশ-বাতাসে সেই চ'লে যাওয়াটা যে কত স্পষ্ট তা তুমি লক্ষ্য

করনি। আমি এই বাড়ী-ঘর, তার চতুষ্পার্শ্বের বৃক্ষশ্রেণী আর তার ওপরকার এই নীলাবরণের পানে চেয়ে স্পষ্ট দেখছি যেন এর ওপর একটা নতুন সুরের ছায়া এসে প'ড়েচে। একে বিশ্লেষণ ক'রে কোথাও পাবে না। সেতারের পঞ্চম সুর তেমনি বাজচে কিন্তু যে পর্দ্দাগুলো এর আগে হিল্লোল তুলেছিল তারা একটি অদৃশ্য অশ্রুত মায়ায় এই পঞ্চমকে অভিনব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ক'রে গেছে,—পঞ্চমের পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে তো তাকে বোঝার কোনো উপায় নেই! তুমি পথের চলচঞ্চলতার বৈচিত্র্য ভালবাস, সেই বৈচিত্র্য তোমাকে আনন্দ দিয়েচে, আমিও তাতে আনন্দ পাইনি তা নয়। কিন্তু এই দীর্ঘকাল রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে পথ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়েচি, পথ আমার কাছে আজ যে বহুদূর স্মরণের বস্তু মাত্র। দিনের পর দিন আমি শুয়ে শুয়ে ওই বাতায়ন দিয়ে শুধু এই আকাশ আর বাতায়ন-সমুখের ওই ছাতগুলো আর গাছের রাশিই দেখিচি। এরা নিজেরা বদলায়নি, কিন্তু আমি দিনের পর দিন এদের মুখের ওপর যে অপরূপ ছায়াপাত হয়েচে তাই নিবিষ্ট হ'য়ে দেখেচি। আজ ভোরবেলাকার এই আকাশ, পূজার ভোরের আকাশ থেকে কত স্বতন্ত্র! পথ থেকে দৈনন্দিন কর্ম্ম-কোলাহল আজও তেমনি উঠ্‌চে, কিন্তু এই সমস্তের ওপর আকাশ আজ কি সকরুণ বিষণ্ণতা বিস্তার করেচে। কয়েকদিন আগেকার আকাশ ছিল কি উজ্জ্বল, তার হাসিতে ওই পুরানো বাড়ীগুলোও যেন নতুন হ'য়ে উঠেছিল, আর গাছের শ্যামলতা যে কত স্নিগ্ধ সুন্দরই লেগেছিল! আজকের আকাশের গায়ে একটি পাতলা সাদা কুয়াসার আবরণ প'ড়েচে, তাকে স্পষ্টতঃ এখনো বোঝারই উপায় নেই;—এ যেন ভাবী মৃত্যুর ছায়ার মত। ওই আকাশের একটুখানি ভাবান্তরে গাছগুলির মুখের ভাব কি অদ্ভুত রকমই ব'দলে গেছে; মনে হ'চ্চে বার্দ্ধক্য এল, জীবন বিরস হ'য়ে গেছে,—সর্ব্বত্র কেমন একটা রিক্ততা, জড়তা, প্রাণহীনতা মনকে শোকার্ত্ত ক'রে তুলতে চায়।

"পথের কোলাহলে এ সুরকে হয়ত এড়িয়ে ভুলে থাকা চলে, কিন্তু সমগ্র আকাশব্যাপ্ত এই যে ভাবান্তর একে চোক বুজলেই কি এ মিথ্যা হ'য়ে যাবে?—মৃত্যুর আগমন কি তাতে ঠেকানো যাবে?"

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৬ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

উমেশ মাঝির নৌকা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত সুনীল সরকার বি-এ

সমুদ্রের ঠিক্ কাছাকাছি এসে নদীর মোহানাটা যেখানে খুব চওড়া হয়ে গিয়েছে সেইখানে অসমতল তটভূমিতে ঝুরঝুরে বালিমাটির ওপর উমেশ মাঝির ঘর। গ্রামের লোকেরা কতকাল যে ও-ঘর ওই ভাবেই দেখে আসছে তার ঠিক নেই।

মাটির গাঁথুনি বাড়ী। মাটি আর নদীর ধারের নুড়ি-পাথর মিলিয়ে তার সামনে বেশ শক্ত একটু রোয়াক মত করা হয়েছে; খড়ের ছাউনি—খড়গুলো বৈরাগীর মাথার চুলের মত রুক্ষ—দিনরাত সাগরের ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে।

বড় হাজার-মণী নৌকোটা নিয়ে প্রায়ই উমেশকে বেরোতে হয় ভাড়া খাটতে। কখনও যায় কাছাকাছি কোনও গ্রামে—সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে বাড়ী ফিরে আসে। আবার কখনও কখনও যেতে হয় দু'তিন দিনের পথ। এ দু'তিন দিন তার নৌকাতেই কাটে। কাজেই নৌকার ওপর তার খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত সরঞ্জামই রাখতে হয়। গাঙের জলে নেয়ে কোনোক্রমে দুটি মোটা লাল-রঙের চাল সেদ্ধ ক'রে সে পেঁয়াজ আর নূণ দিয়ে খেয়ে নেয়। দূর গ্রাম থেকে যেদিন সে ঘরে ফেরে সেদিন ঘরের লোকজনের মধ্যে একটা ছোটখাট উৎসব লেগে যায়। ঘরের লোকজন বলতে অবশ্য উমেশের মেয়ে চন্নন আর দু'তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। চন্ননের মা প্রায় বছর সাতেক হল মারা গিয়েছে,—তাই উমেশ এক দূর-সম্পর্কের পিসিকে এনে রেখেছে। এ ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই।

সেদিন ছিল চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী। সন্ধ্যা না হতেই আকাশের মাঝখানে এক টুক্রো চাঁদ উঠেছে—দক্ষিণে হাওয়ার তেমন জোর নেই। বাড়ীর সামনের উঠানটায় ব'সে উমেশ নারকেল গাছের কাঁচা পাতা দিয়ে বুনে একটা বাতা তৈরী করছে—রোয়াকটা একটু আড়াল করবার জন্যে। নইলে, বার' মাস তিরিশ দিন যে হাওয়া—রোয়াকে ব'সে সুস্থমনে একটু তামাক খাবারও উপায় নেই। এমন সময়ে কে যেন ডাক দিলে—ওহে মাঝি ঘরে আছ?

উমেশ ঘাড়টা একটু তুলে দেখবার চেষ্টা করলে লোকটা কে। কিন্তু অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ঠিক বুঝ্‌তে পারলে না। গলাটা পরিষ্কার ক'রে হাঁকলে—কে?

একজন ভদ্রবেশধারী উঠোনটার মধ্যে ঢুকে বল্লেন—ওহে উমেশ মাঝি কোথায় বল্‌তে পার?

উমেশ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আঁজ্ঞে—আমিই।

—দূর-পথের ভাড়া আছে; যাবে?

—আঁজ্ঞে হাঁ, যাব না কেন? তা কোথায় যেতে হবে?

—যেতে হবে মধুমতীর চরে। কোথায় জান ত? কাঁটাবেড়ের ট্যাঁকের পাশ দিয়ে সহস্রমুখীর গাঙ্ পেরিয়ে তবে মধুমতীর চর।

উমেশ একটু হেসে বললে—আঁজ্ঞে হাঁ, সে আর আমাকে বলতে হবে না। এই নৌকোর ওপর আজ আমার প্রায় চল্লিশ বছর কাটল। মধুমতীর চর খুবই চিনি—সপ্তগ্রামের বাবুরা প্রায়ই সেখানে শিকার করতে যেতেন। তবে হাঁ, আজকাল আর বড় একটা ওসব দিকে যাইনি। পথে বিপদ আছে।

—হাঁ, সেইজন্যেই ত' তোমাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখতে চাই। যাহোক্—তাহ'লে রাজী ত?

—কিন্তু এখন সেখানে গিয়ে করবেন কি? এ তো শিকারের সময় নয়। আর দু'এক দিনের মধ্যেই কাল-ব'শেখি আরম্ভ হবে।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ উমেশের বলিষ্ঠ শিরাবহুল হাতটা ধ'রে ফেলে তার কানের কাছে মুখ এনে

ফিসফিস ক'রে কি বললেন। তারপর গলাটা একটু চড়িয়ে বল্লেন—এ কাজটা তোমায় করতেই হবে উমেশ! তোমার নৌকো এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। শুনেছি সে ঢেউয়ের তালে তালে হাওয়ার আগে ছুটে চলে। পুলিশের নৌকোর সঙ্গে পাল্লা দিতে আর কোনো নৌকো পারবে না।

উমেশ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—না বাবু, সে আমি পারব না। এ সব ব্যাপারে আমি জড়াতে চাই না। অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত আমি করিনি—আর কখনো করবও না। আপনি অন্য নৌকো দেখুন।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—কিন্তু অসৎ কাজ তুমি বলছ কাকে? আমি কি জেল-কয়েদী না ফেরার আসামী? বিশেষ দরকারে আমি শুধু দিনকতক আত্মগোপন করতে চাই।

উমেশ উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে পারবে না। আস্তে আস্তে সে বাড়ীর দিকে চ'লে যাবার উপক্রম করছে দেখে ভদ্রলোক ডাক দিলেন—ওহে মাঝি, শোনোই না!

—কি বলুন? ব'লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উমেশ কাছে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক সন্তর্পণে পকেট থেকে একটা হাতির দাঁতের পাত বার করলেন—তার ওপর নানারকম নক্সা আঁকা রয়েছে। সেইটা উমেশের চোখের সামনে ধ'রে বললেন—পড়তে পার? এটা কি চিনতে পারছ?

মন্ত্রমুগ্ধের মত ভদ্রলোকটির পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে উমেশ বললে—চিনি বই কি হুজুর! আমার কসুর মাফ করবেন। আমি এখনি নৌকো নিয়ে জাহাজঘাটায় যাচ্ছি।

ভদ্রলোক খুব খুসী হয়ে উমেশের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন যাই। শেষরাতের ভাঁটার টান ধরবার আগে তুমি প্রস্তুত হ'য়ে থেকো।

ভদ্রলোক চ'লে গেলে চন্নন পা টিপে টিপে উমেশের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—ও কে এসেছিল বাবা?

উমেশ ব'সে ব'সে কি ভাবছিল। বোধ হয় তখনও তার আশ্চর্য্যের ঘোরটা কাটেনি। চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—অ্যাঁ, কি বলছিস? কে এসেছিল? উনি একজন খুব বড়লোক। আমার নৌকোটা কয়েকদিনের জন্যে ভাড়া চান।

চন্নন উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে—বড়লোক ব'লে কি আমাদের তিনি মাথা কিনে রেখেছেন? তিনি বড়লোক আছেন বড়লোক থাকুন—গরীব লোকদের এসব হাঙ্গামার মধ্যে জড়াতে চান কেন?

উমেশ ভয় পেয়ে তার মুখে হাতচাপা দিয়ে বললে—চুপ, চুপ। হাঙ্গামা আবার কিসের?

মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে ধরা-গলায় চন্নন বললে—কেন, চুপ করব কেন? পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে তোমার যাবার দরকার কি? যেমন ক'রে হোক্ দু'বেলা দু'মুঠো ত' জুটছে। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি বাবা, তুমি কখখনই এ-ভাড়া নিয়ে যেতে পারবে না।

উমেশ বিরক্ত হয়ে বললে—আঃ তুই ছেলে মানুষ, তোর এত কথায় দরকার কি? আর তুই বুঝিস-ই বা কি? যা, ঘরে যা—তাড়াতাড়ি দুটো চাল ফুটিয়ে দে। এখুনি আমায় বেরোতে হবে।—নৌকোটা কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার।

—বেশ, তুমি যাও। ব'লেই চন্নন ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেল্লে।

উমেশ তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধ'রে কোমল সুরে বল্লে—ছিঃ চন্নন, তুই কি পাগল হ'লি? তোর এত ভয় কিসের?

চন্নন কাঁদতে কাঁদতে বললে—পুলিশের নৌকো যদি তোমাদের নৌকোকে ধ'রে ফেলে?

উমেশ মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একটু হেসে বল্লে—কেন, তুই কি জানিস না যে সে হ'তে পারে না? দুটো দাঁড়ি নিয়ে আমি যদি নৌকো চালাই তাহ'লে বিশ দাঁড়ের নৌকোও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

চন্ননের কান্না থেমে গেল। সে অবাক্ হ'য়ে বড় বড় চোখ দুটো মেলে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বাবা? তোমাদের ধরতে পারবে না কেন?

উমেশ একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর চন্ননকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, এই যে আমাদের বাড়ী, এখানে আগে কি

ছিল জানিস?

চন্নন ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

উমেশ ব'লে যেতে লাগল—এইখেনে আগে ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতকগুলো বুনো গাছ। সে গাছের নাম কেউ জানত না। কালো মিশমিশে রঙ—পাতাগুলো অনেকটা ঝাউ গাছের পাতার মতন। এ জায়গাটা আমি যখন রাজাদের কাছ থেকে জায়গীর পেলুম, তখন ইচ্ছে ছিল গাছগুলো কেটে তাই দিয়ে ঘরের জন্যে তক্তা বানাব। কিন্তু গাছ কাটা হ'য়ে যেতে দেখি এ-গাছের কাঠ যেমন মজবুৎ তেমনি অদ্ভুত রকমের হাল্কা। তক্ষুণি ঠিক ক'রে ফেললুম এই কাঠ দিয়ে একটা খুব বড় নৌকো বানাতে হবে। আমার হাজার-মণী নৌকোটা এই কাঠেরই তৈরী। ওটা এত হাল্কা যে হাজার-মণ মাল নিলেও তীরের মত ছুটে চলে। শুধু হালটা ধ'রে ব'সে থাকতে পারলেই হয়—ভাঁটা কিম্বা জোয়ারের টানে নৌকো শন্‌শন্ ক'রে দৌড়োবে।

চন্নন বাপের গা ঘেঁসে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে—আর তোমার ছোট নৌকোটা? ওটাও কি সেই কাঠের?

—ওটা বাজে কাঠের। ও ছোট নৌকোটা নোঙর ক'রে এই সামনেই রেখে যাব। একটু নজর রাখিস।

এই ব'লে উমেশ নারকেল পাতার অর্দ্ধেক বোনা বাতাটাকে রকের ওপর আড় ক'রে রেখে মুখ হাত পা ধুতে চলল। চন্নন হঠাৎ কি ভেবে ডাকলে—বাবা!

—কি বলছিস। ব'লে উমেশ ফিরে দাঁড়াল।

চন্নন একটু ইতস্তত: ক'রে বললে—আচ্ছা বাবা, রাজাদের যে ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তিনিই কি আজ এসেছিলেন?

উমেশ চমকে উঠে বললে—সে-কথা তোকে কে বললে?

চন্নন ঘাড় দুলিয়ে বললে—সে আমি জানি। বুড়ো রাজা ওঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে পুলিশে খবর দিয়েছেন. আর প্রচার ক'রে দিয়েছেন যে যদি কেউ ওঁকে লুকিয়ে রাখে তা হ'লে তার ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা হবে।

উমেশ ভয়ানক ভয় পেয়ে বললে—দোহাই তোর, চুপ কর্। এসব খবর তোকে কে দিলে?

—ক্ষ্যামা মাসী।

—সে বুড়ীর যেমন আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। সব বাজে কথা- সব বাজে কথা। যা, তুই চাল কটা চড়িয়ে দিগে যা। ব'লে উমেশ ঘাটের দিকে চ'লে গেল।

চন্নন ঘরের ভেতর গেল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে কি-সব ভাবতে লাগল। সামনেই গাঙের জল আলো-অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্ করছে। নদীর ওপারে কিছুই দেখা যায় না—শুধু যেন কতকগুলো ঝাপসা ঝাপসা কালোর আভাস! হাওয়াটা একেবারে থেমে গিয়েছে—চারিদিকে যেন একটা থম্‌থমে ভাব। নদীর ওপর কই, কোথাও একখানাও নৌকো নেই। না—ঐ ত! পশ্চিম দিকে খুব দূরে জলের ওপর কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে না? আলোগুলো অন্য নৌকোর আলোর মত লাল নয়—বেশ সাদা! তারার মত ঝক্‌ঝক্ করছে!—কিসের নৌকো ওটা?

যদি পুলিশের নৌকো হয়? কথাটা মনে হ'তেই ভয়ে চন্ননের শরীর অবশ হ'য়ে এল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। মনে হ'ল যেন সেই তারার মত উজ্জ্বল আলোগুলো জলের ওপর চারদিকে নাচতে নাচতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। দাঁতের ওপর দাঁত শক্ত ক'রে চেপে চন্নন কি যেন একটা সঙ্কল্প ক'রে নিলে।

তখন প্রায় মাঝ-রাত্রি। চাঁদটা ঘণ্টা খানেক হ'ল ডুবে গিয়েছে।

উমেশ নৌকোটা প্রস্তুত ক'রে রেখে এসে একটু শুয়ে পড়েছে।—এক ঘুম দিয়ে জোয়ারটা থমথমে হবার আগেই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। বাড়ীর আর সকলেও নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু চন্নন একা আছে জেগে। তার চোখে ঘুম নেই—ঘরের মধ্যে সে ছটফট করছে। জানলা দিয়ে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখছে—পশ্চিম দিকের বড় তারাটা কোথায় আছে। সে জানে যে সামনের ঐ নারকেল গাছটার মাথার কাছ পর্য্যন্ত তারাটা নেমে আসলেই তার বাবা নৌকো নিয়ে বেরোবে।

খানিকক্ষণ বাদে চন্নন যখন বুঝতে পারলে তার বাবা গভীর ঘুমে ঢুলে পড়েছে, তখন সে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে তার ভারি ভয় করতে লাগল। আঁচলের খুঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে

খানিকক্ষণ সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুট-ভাবে কি-একটা কথা ব'লে সে গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তারার আলোয় সরু মেঠো পথটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। চন্ননের এ পথ খুবই জানা ছিল, তাই তার যেতে কোনোই কষ্ট হচ্ছিল না। দ্রুতপদে সেই পথে খানিক দূর গিয়ে সে একটা সুন্দর কুঁড়েঘরের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। এবার সে কি করবে? ঐ পথের ধারের জানলা দিয়ে তাকে ডাকলে সে উঠে আসতে পারে, কিন্তু যদি বাড়ীর আর সকলে জেগে ওঠে? কিন্তু আর দেরী করা চলে না—তারাটা অনেক নীচে নেমে এসেছে। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সে জানলাটার কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে ডাকলে—হীরু, হীরু! একবার ওঠো না, হীরু!

নিঃশব্দে দরজা খুলে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—জংলীর মত দেখ্‌তে। চোখ দুটো উজ্জ্বল! হাত-পায়ের গড়ন দেখে মনে হয় শরীরে বেশ শক্তি আছে। চন্ননের কাছে এসে তার কানের কাছে মুখ এনে সে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে রে চন্নন? এত রাতে আমায় ডাকতে এসেছিস?

চন্নন তার হাতটা ধ'রে বললে—এখন বলবার সময় নেই। নদীর ধারে একবার যেতে হবে। চল্‌,—চলতে চলতে সব বলব এখন।

নদীর ধারে এসে চন্নন আর হীরু উমেশের নৌকোটা যেখানে বাঁধা ছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল। চন্নন সব কথা হীরুকে খুলে বললে।

হীরু বললে—তা হ'লে এখন কি করা যায়?

চন্নন একান্ত নির্ভরশীলভাবে তার চোখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি বল, আমি কি জানি।

—আচ্ছা, তুই ঠিক জানিস্‌ এ ভাড়া নিয়ে গেলে তোর বাবার বিপদ হ'তে পারে?

—হ্যাঁ! সেই লোকটা নিজেই ত বললে পুলিশে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

—তোর বাবাকে বুঝিয়ে বললে ভাড়াটা ছেড়ে দিতে রাজী হবে না?

চন্নন ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

হীরু মাথা হেঁট ক'রে কি ভাবতে লাগল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—নাঃ, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

চন্ননের চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। হীরুর হাতটা চেপে ধ'রে সে বললে—তবে কি হবে হীরু? বাবাকে যে তারা মেরে ফেলবে!

হীরু উত্তর দিলে না। মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল। হঠাৎ কি-একটা কথা মনে হ'তে তার চোখ দুটো জলজল ক'র উঠ্‌ল, বললে—আচ্ছা দাঁড়া, এক কাজ করলে হয় না?

উৎসুকভাবে চন্নন জিজ্ঞাসা করলে—কি?

—ওই হাজার-মণী নৌকোটা যদি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায় তাহ'লে ত আর তোর বাবা যেতে পারবে না?

—না। কিন্তু সে কি ক'রে হবে?

—কেন, আমরা দু'জনে মিলে নোঙরটা তুলে নৌকো নিয়ে মাঝ-গাঙে চলে যাব। কি—বল্‌? ওকি চুপ ক'রে রইলি যে?

—না হীরু, সে আমার ভয় করে। বাবা কি রকম রাগ করবেন! আর অত বড় নৌকো কি আমরা সামলাতে পারব?

—বেশ, তাহ'লে থাক্‌। কিন্তু তোমার বাবাকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই।

চন্ননের বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। সে আর হীরু ঐ প্রকাণ্ড নৌকোটা নিয়ে মাঝ-গাঙে চলে যাবে! কথাটা তার মন্দ লাগছিল না কিন্তু ভয়ও করছিল। বাবা যখন জানবে তখন?

কিন্তু এ-ছাড়া আর উপায় নেই। চন্নন একবার সেই বড় তারাটার দিকে আর একবার হীরুর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

হীরু বললে—তাহ'লে কি ঠিক করলে?

—চল'। চন্ননের গলাটা কেঁপে গেল।

তার হাতটা শক্তভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে ধ'রে হীরু বললে—ভয় পাচ্ছিস কেন চন্নন? আমাকে তোর বিশ্বাস হয় না?

চন্নন হীরুর দিকে চেয়ে একটু হাসলে। তারপর দু-জনে হাত-ধরাধরি ক'রে নদীর ধারের ভিজে মাটির ওপর দিয়ে নৌকোর দিকে এগিয়ে চলল।

নৌকোয় উঠে নোঙরটা তুলে ফেলে দিয়ে হীরু লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নৌকোটাকে গভীর জলের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। চন্ননকে বললে—হালটা ধ'রে একটু বোস্ দেখি।

ভয়ে তখন চন্ননের সমস্ত শরীর কাঁপছে। কোনও রকমে হালটাকে ধ'রে সে ব'সে রইল। মাঝির মেয়ে সে—কি ক'রে হাল ধরতে হয় তা সে জানে। কিন্তু এত বড় নৌকোর হাল ধ'রে থাকা কি তার শক্তিতে কুলোয়? খানিকক্ষণ পরেই তার হাত ব্যথা করতে লাগল। জোয়ার তখন থমথমে। হীরু নৌকোর মাঝখানে ব'সে দু'হাতে দু'খানা দাঁড় টানছে। লজ্জায় চন্নন তাকে বলতে পারলে না যে তার হাত ব্যথা করছে।

নৌকো যখন প্রায় মাঝ-গাঙে এসে পড়েছে তখন হঠাৎ নৌকোর মুখটা ঘুরে গেল। হীরু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওকি চন্নন, হাল ঘুরে যাচ্ছে কেন?

চন্নন উত্তর দিচ্ছে না দেখে দাঁড় রেখে তার কাছে উঠে এসে তার মুখের দিকে চেয়েই হেসে ফেলল, বললে—কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা বলতে হয়। কি বোকা মেয়ে রে তুই!

চন্ননের হাত থেকে হালটা নিজে নিয়ে হীরু তাকে একটু শুয়ে পড়তে বলল। ঘুমে চন্ননের চোখ জড়িয়ে আসছিল। হীরুর পায়ের কাছটিতে শুতে না শুতে সে একেবারে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন চন্ননের ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে এসেছে। চোখ মেলেই সে দেখলে আকাশ টুকরো টুকরো সাদা মেঘে ভরা,—তার মধ্যে থেকে ভোরের ফ্যাকাসে আলো ফুটে বেরোচ্ছে। শন্‌শন্ ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—শরীরে কাঁপন ধ'রে যায়। রাতের হিমে তার আঁচল আর চুল একেবারে ভিজে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে উঠে ব'সে দেখলে হালটা বাঁ হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে হীরু ঝিমোচ্ছে! আহা, বেচারা সারাক্ষণ ঐ-ভাবে ব'সে আছে! তার গায়ে হাত দিয়ে চন্নন ডাকল—হীরু!

হীরু চমকে উঠে বলল—কে চন্নন? উঠেছ?

চন্নন হীরুর পাশটায় উঠে তার গা ঘেঁসে ব'সে বলল—হীরু, এ আমরা কোথায় এসে পড়লুম?

হীরু চারধারে একবার চেয়ে দেখে বলল—কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেক দূর চ'লে এসেছি নিশ্চয়।

হীরুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চন্নন বলল—আচ্ছা, বাবা এখন কি করছে?

—বোধ হয় ছোট নৌকোটা নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে।

এর পরে অনকক্ষণ দু'জনে চুপ ক'রে রইল।

চন্ননের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত এর কি পরিণাম হবে এই ভেবে ভয়ে-আশঙ্কায় তার মনটা দুলছিল। এর মধ্যে কখন যে সূর্য্য উঠেছে তা সে দেখেও নি। হঠাৎ যখন চোখ তুলে সে দেখলে রাঙা আলোর সমস্ত আকাশ ভ'রে গিয়েছে, নদীর জল পর্য্যন্ত সেই আলোয় রঙিন্ দেখাচ্ছে, তখন সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তার কেবলি মনে হ'তে লাগল—এ কী সুন্দর! বাবার বকুনির ভয়, তাদের অদৃষ্টে কি আছে এ আশঙ্কা, সবই যেন তার মন থেকে এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসার মত মিলিয়ে গেল। দিনের পর দিন এইভাবে হীরুর পাশটিতে ব'সে সে যেন দূরে—অনেক দূরে নির্ভয়ে চ'লে যেতে পারে!

হীরুও এতক্ষণ এই রঙের খেলা দেখছিল। চন্ননের মুখের দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে ডাকল—চন্নন!

চন্নন তার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল—কি?

– এ বেশ সুন্দর, না?

—হুঁ।

—তোমার ভয় করছে না?

—না।

হীরুর উজ্জল চোখ আরও জলজল করতে লাগল! সে চন্ননের কানে কানে বলল—চন্নন, আর যদি আমরা না ফিরি?

চন্ননের বুকের মধ্যে কি-রকম ক'রে উঠ্‌ল। আবেশে দু'চোখ বুজে বলল—বেশ হয়!

সারাদিন একটা তীব্র আনন্দের মধ্যে কখন যে কেটে গেল তা তারা জানতেও পারল না। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন চন্ননের আবার ভয় করতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সে হীরুকে বলল—হীরু, এবার বাড়ীর দিকে ফিরলে হয় না?

হীরু একটু হেসে বলল—বাড়ী কোন্ দিকে তা' জানলে ত! এখন তো দেখছি জোয়ার এসেছে, কিন্তু এ-জোয়ারে গেলে কোথায় গিয়ে পড়ব তা ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

জোয়ারের স্রোতে নৌকো ভেসে যেতে লাগল। যতই রাত্রি বাড়তে লাগল ততই ভয়ে চন্ননের বুকের ভেতর কাঠ হ'য়ে যেতে লাগল। ষষ্ঠীর চাঁদ যখন প্রায় ডোবে-ডোবে, তখন হঠাৎ সে কান্নার সুরে বলে উঠল—হীরু, কোনো দিকেই যে আর মাটি দেখা যাচ্ছে না?

জোয়ার থেমে গিয়ে কখন যে ভাঁটার টান এসেছে হীরু তা জানতেও পারে নি। চন্ননের কথায় তার হুঁস হল। ভাটার টানে নৌকো তরতর ক'রে চলেছে—কেউটে সাপের মত কালো গভীর জলের ওপর দিয়ে। উত্তর দিকের তীরটাও আর দেখা যাচ্ছে না। হীরুর আর বুঝতে বাকী রইল না যে তারা সমুদ্র না হোক, সমুদ্রের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বোধ হয় একেবারে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়বে। কিন্তু এখন আর ফেরবার উপায় নেই। এই টানের সময় উজান বেয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে দেখতে পারে—কিন্তু চন্নন কি এই টানের বিরুদ্ধে হাল ধ'রে থাকতে পারবে?

চন্নন আবার কান্না-মেশানো স্বরে বলল—কি হবে হীরু?

—তুমি হালটা ধ'রে বসতে পারবে?

—পারব।

হীরু হালটা ঘুরিয়ে দিয়ে চন্ননকে বলল—এস, এটা ধ'রে বস।

শরীরে যত শক্তি ছিল সব দিয়ে চন্নন হালটা চেপে ধ'রে রইল। হীরু ছপছপ ক'রে উজান বাইতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাল ধ'রে থেকে চন্ননের হাত যেন ভেঙে পড়তে লাগল। হাতের শিরাগুলো নীল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ল—মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল—যেন এখনি রক্ত ফেটে পড়বে। শেষে আর না পেরে সে হাল ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর আছড়ে প'ড়ে কেঁদে উঠ্‌ল—হীরু, আমি আর পারলুম না!

নৌকোটা এক-ঝটকায় হঠাৎ ঘুরে গেল। হীরু দাঁড় রেখে তাড়াতাড়ি এসে হাল ধরল। নৌকো আবার সমুদ্রের দিকে চলল।

চন্নন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল—ওগো বাবা গো! তুমি এস—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবার এস!

হীরু স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

চন্ননের গুমরে গুমরে কান্না সেই গভীর রাত্রে কূলহীন জলরাশির ওপর অদ্ভুত শোনাতে লাগল।—এ কান্নার যেন আর শেষ নেই!

তারার আলোয় হীরু দেখলে চারিপাশের জল গাঢ় নীল হ'য়ে এসেছে। চন্ননের চুলের ভেতর হাত দিয়ে সে ডাকল—চন্নন, আর কেঁদে কি হবে? আমরা সমুদ্রে এসে পড়েছি!

কিন্তু চন্ননের তখন আর সাড় নেই। তাকে নাড়া দিয়ে হীরু দেখলে যে সে মূর্চ্ছা গিয়েছে। ভাবলে—যাক, এ মূর্চ্ছা আর ভাঙিয়ে কাজ নেই।

হালটা আর ধ'রে থেকে কোনও লাভ আছে কিনা ভাবছে, এমন সময় হীরুর নজর পড়ল—উত্তর দিক থেকে যেন একটা আলো জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় এ কোনো নৌকোর আলো!—আশায় আনন্দে হীরুর প্রাণ নেচে উঠল। এখনও সে চেষ্টা করলে চন্ননের প্রাণরক্ষা ক'রতে পারে। চন্ননকে ঠেলে ঠেলে সে ডাকতে লাগল—চন্নন, চন্নন!

চন্নন যেন স্বপ্নের ঘোরে উঠে বসল।

হীরু বলল—চন্নন, একটু ত জিরিয়েছ। আর একবার হালটা ধরতে হবে। খানিকটা উজান বেয়ে যেতে পারলেই ওই নৌকোটার কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারব।

এক দিন এক রাত্রি কিছু খাওয়া নেই—তার ওপর হাতও যেন নিঃসাড় হ'য়ে এসেছে। তবুও চন্নন নতুন আশায়

বুক বেঁধে হালটা ধ'রে বসল। নৌকো এগিয়ে চলল সেই আলোর দিকে। একটুখানি—আর একটুখানি, বোধ হয় আধ মাইলও হবে না। কিন্তু চন্নন যেন আর পারে না। তার চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল পড়তে লাগল। শেষে সে বলল—হীরু, আর যে কিছুতেই পারছি না!

হীরু বলল—লক্ষ্মীটি, আর মিনিট পনের ধ'রে থাক, তাহ'লেই আমরা ঐ নৌকোর কাছে পৌঁছে যাব।

অন্য নৌকোটাকে লক্ষ্য ক'রে হীরু চীৎকার ক'রে ডাকল—নৌকোয় কে যায়?

উত্তর এল—এ উমেশ মাঝির নৌকো। ও নৌকা কার?

বাপের গলার আওয়াজ শুনে চন্নন চেঁচিয়ে উঠল—বাবা, এ নৌকোয় আমরা! তুমি শীগগির এস—আমি আর পারছি না!

উমেশ চেঁচিয়ে বলল—এখুনি যাচ্ছি; তোমরা উজান বেয়ে এস। নইলে নৌকোকে ধরতে পারব না।

হালটা নিজের দাঁড়ীকে দিয়ে উমেশ নিজে হু'খানা দাঁড় টেনে আসতে লাগল। হীরুও অতি কষ্টে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে স্রোতের উল্টো দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চন্নন আর কোনও রকমে হাল ধ'রে রাখতে পারল না। তার মুঠো আপনি আল্‌গা হ'য়ে এল—হাত থেকে ছেড়ে গিয়ে হালের গোড়ার দিকটা ঘুরে এসে নিজের কপালে লাগল।

উমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ও কি করলে? নৌকো ঘুরোও —নৌকো ঘুরোও!

চন্নন শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল—সে যেন আর কিছুই বুঝতে পারছে না।

হীরু চেঁচিয়ে বলল—আমি হাল ধ'রছি, তোমরা দাঁড় বেয়ে এগিয়ে এস শীগ্‌গির। শুধু স্রোতে আর আমাদের নৌকো কতটা এগিয়ে যাবে?

উমেশ প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল। কিন্তু শুধু স্রোতের টানেই চন্ননদের নৌকো এগিয়ে চলল। দুটো নৌকোর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। উমেশ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল—চন্নন, চন্নন!

বুনো গাছের হালকা কাঠে তৈরী।—তীরের মত চলে! —ঠিক!

সাম্‌নে যতদূর দেখা যায়—কালো সমুদ্রের জল তারার আলোয় চিকমিক করছে।

পেছন থেকে উমেশের বুকফাটা কান্না ক্রমশঃ অস্পষ্ট হ'য়ে আসতে লাগল।

হীরু আস্তে আস্তে হাল ছেড়ে দিয়ে চন্ননের পাশে এসে বসল। চন্নন নীরবে তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরল।…

শ্রীসুনীল সরকার

বিবাহ-সমস্যা ও "দেবদাস"

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়

[বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মীরাট শাখায় পঠিত]

এখানকার সাহিত্যপরিষদের এক সভায় আমাদের এক বন্ধু একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন—তাতে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন, "দেশের তরুণদল বড়দের পছন্দমত বিবাহের পক্ষপাতী নয়; তাহারা চায় স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ—ভালবাসার পর বিবাহ। এই free love জিনিসটিকে প্রকৃত ভালবাসা বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুল করা হয়, ইহা প্রকৃতপক্ষে চোখের নেশা। যৌবন যখন তাহার আকুল পিপাসা লইয়া মানবের দেহে বাসা বাঁধে তখন মানব যে রঙীন মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া বসে তাহা যে সব সময়েই তাহার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইবে এমন আশা করা যায় না। ইত্যাদি।"

বন্ধুবরের উপরের উক্তি পরখ ক'রে দেখবার যোগ্য। আমার নিজের বহুদিন থেকে একটা ধারণা ছিল যে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করবার একটা বিশেষ বয়স আছে এবং সে বয়স বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ও নয়, অব্যবহিত পরেও নয়। কিন্তু আবার বিবাহের বহু পরেও নয়। মোদ্দা কথা, বিবাহ সম্বন্ধে গবেষণা করবার বয়স তখন যখন মানুষের মন অতি-আগ্রহে সব কিছুকে আঁকড়ে ধরতেও চায় না, আবার অতি-বিতৃষ্ণায় সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলতেও উন্মুখ হ'য়ে ওঠে না, অর্থাৎ যে বয়সে মানব-মনের রসের উৎস একেবারে শুকিয়েও যায় না, আবার বিচারবুদ্ধিরও অপ্রতুলতা ঘটে না। কিন্তু আমার বন্ধুর প্রবন্ধ শুনে আমার সে ধারণা উল্টে গেছে এবং তার জায়গায় অপর একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই—যে, বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক মনোভাব অত্যন্ত একপেশে। সংস্কারহীন এবং উদার যে মনোভাবের প্রসাদে এই সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হ'তে পারে আমাদের সমাজে তার একান্ত অভাব।

বন্ধু উপরের কয়েক ছত্রে যে প্রশ্ন তুলেচেন তার বিচার করতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষীয় বিবাহের রীতি এবং নীতির গোড়ার কথা থেকে সুরু করতে হবে। শাস্ত্রানুসারে আমাদের দেশে পাঁচ রকম বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে—গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ এবং ব্রাহ্ম। মনু তাঁর শাস্ত্রবিধির মধ্যে সবগুলিকেই স্থান দিতে বাধ্য হ'য়েচেন। কন্যাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার নাম আসুর বিবাহ। তাকে বলপূর্ব্বক হরণ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। সুপ্তা অথবা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে বিবাহ হওয়ার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আর ব্রাহ্ম বিবাহ মানে হচ্চে সেই ধরণের বিবাহ যা আমরা সদাসর্ব্বদা চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি,—যাতে কন্যাকে বর প্রার্থনা করবে না, অযাচক বরকে কন্যাদান করতে হবে। সম্প্রতি আমাদের হিন্দু-সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহ চলিত দেখতে পাওয়া যায়—তার কারণ হ'চ্চে অন্যান্য বিবাহপদ্ধতিগুলির মধ্যে সামাজিক কোন নিবিড় অভিপ্রায় নেই—যা' আছে তা' হ'চ্চে অর্থবল, বাহুবল, না হয় ত রিপুর বল। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রে ওগুলিকে অগত্যা স্বীকার করেও নিন্দা করা হ'য়েচে—সুতরাং সামাজিক জীবনে ওগুলি যথাসাধ্য পরিত্যক্ত হ'য়েচে। মনু গান্ধর্ব্ব বিবাহকেও কামসম্ভব ব'লে একটু খোঁচা দিয়েচেন।

ভারতবর্ষীয় বিবাহপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার সামাজিক কি অভিপ্রায় ব্যক্ত হ'চ্চে বুঝতে হ'লে আমাদের সমাজ-জীবনের তথা ভারতীয় সভ্যতার ভিতরকার তত্ত্বটি বোঝা চাই। ভারতীয় সভ্যতার ধারা হ'চ্চে নিবৃত্তিমূলক—এখানে প্রবৃত্তির জয় গাইবার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং যে দেশে ত্যাগ এবং নিবৃত্তির চর্চ্চা হ'য়ে থাকে, সে দেশে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ। এই গৃহকে

গৃহাশ্রম নাম দিয়ে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হ'য়েছে, এবং যারা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় মনুর মতে তারা এই আশ্রমের অযোগ্য, সুতরাং হিন্দু স্ত্রী প্রেয়সী নয়, গৃহিণী—যৌথ পরিবারের অঙ্গবিশেষ। এই পরিবারে স্ত্রীপুরুষের প্রেম ব'লে যে একটি স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি আছে তাকে অতিক্রম ক'রে দাম্পত্য প্রেম নামক একটি সামাজিক হৃদয়বৃত্তিকে গ'ড়ে তোল্‌বার সাধনা ছিল। কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখা চাই যে এদেশ গৃহকেও চরম ব'লে স্বীকার করেনি—এখানকার গৃহাশ্রম বাণপ্রস্থের পূর্ব্বাশ্রম মাত্র। মুক্তির অন্বেষণে একদিন গৃহকে ত্যাগ করতে হবে, এই ছিল ভারতসমাজের উপদেশ!

এবং উক্ত আদর্শকে সম্ভব ক'রে তোল্‌বার জন্যে আমাদের দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। যে ইচ্ছা স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটায়, তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব যদি বিবাহকে সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমত করাই শ্রেয় হয়, তবে সেই বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভাল। বিবাহের পূর্ব্বেও নানা কথাকাহিনী ব্রতপূজার মধ্য দিয়ে তাদের মনকে এই আদর্শের উপযোগী ক'রে গড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে স্বামী তাদের পক্ষে একটা আইডিয়া—যতটা তাদের নিজের মনের জিনিস, ততটা বাইরের জিনিস নয়। সমাজে সতী-স্ত্রীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের যে ব্যবস্থা আছে তাতেও এই উদ্দেশ্য পরিপুষ্টি লাভ করে।

এই রকম ক'রে আমাদের যে সমাজ গড়ে উঠেচে সে যে আদৌ চলিষ্ণু নয় এ কথা বলা বাহুল্য। এ সমাজের স্থিতির দিকেই লক্ষ্য, গতির দিকে নয়। তাই মন্দিরের মত জরাজীর্ণ আচারঅনুষ্ঠান আঁক্‌ড়ে স্থাবর হ'য়েই সে রইল, বৃক্ষের মত শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে আলো-বাতাস সে গ্রহণ করতে পারলে না। এই রকম ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-সৌধের একখানি ইঁট নড়তে দিলেও ক্ষতি; তাই এখানে সতর্কতার অন্ত নেই—চলা-ফেরা সম্বন্ধেও তার এত সাবধানতার বাণী। বিবাহ সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে খাতির করে না—ভয় করে, তাই প্রাণপণে দাবিয়ে রাখতে চায়। কেন না আচারই তার বাহন, বিচার নয়। সমুদ্রযাত্রা, ম্লেচ্ছদেশে বাস এককালে সমাজে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় ছিল। এপারের যাত্রীদের না হয় কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু ওপারের যাত্রীরা যখন হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, তখন সনাতন পদ্ধতি থেকে সে এক-চুল স'রে দাঁড়াতে রাজি নয়—এইখানে এখনো সে নির্ম্মম—এইখানে আঘাত পেলে একেবারে তার ভিতে গিয়ে ঘা লাগে।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে আমাদের চিন্তার ধারায় এবং ততোধিক জীবনযাত্রার প্রণালীতে বহুল পরিবর্ত্তন ঘটেচে। প্রথম কথা, আমাদের সমাজের যে নিশ্চলতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেচি সেটি হ'চ্চে সমস্ত প্রাণ-শক্তির প্রতিকূল, মানবধর্ম্মের বিরোধী। নিবৃত্তিমার্গের কথা আগে যা' বলেচি তা' হ'চ্চে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম;—সমাজজীবনে সকলেই ব্রাহ্মণ নয়। যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা নব নব ক্ষেত্রে আপন চঞ্চল শক্তির সাধনা করতে ছোটেন—গার্হস্থ্যনীতির জটিল বেড়াজালে তাঁদের বেঁধে রাখা অসম্ভব। ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন ছিল রক্তবস্ত্র—সেটা বিদ্রোহেরই প্রতীক—তাই ক্ষত্রিয়ের দ্বারাই পুরাকালে যত-কিছু বিপ্লব ঘটেচে। ভারত-ইতিহাসে এর উদাহরণ বিরল নয়। ভরতজন্মের আখ্যান-মূলক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের নায়ক দুষ্মন্তই বলুন, আর বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণই বলুন, সবাই ছিলেন ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান কালে যে ব্রহ্মণ্যশক্তির বিশেষ অপহ্নব ঘটেচে একথা জান্‌তে আর কারো বাকী নেই। আর ক্ষত্রিয়েরা যে নিবৃত্তমার্গী নয় একথা সেদিন উপেন বাবু তাঁর অভিভাষণে বলেচেন।

ইউরোপীয় সমাজের মূলপ্রকৃতি যেমন রাষ্ট্রিক, আর্থিক; আমাদের সমাজের মূলপ্রকৃতি তেমনি সাম্প্রদায়িক—অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের আচারধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র। বর্ত্তমান জীবনে এই প্রকৃতির সম্পূর্ণ বদল হ'য়েচে ব্রাহ্মণ তাঁর আচারধারাকে রক্ষা করতে পারচেন না প্রতিদিন চোখের সাম্‌নে দেখা যাচ্চে—এমনি সব শ্রেণীরই দশা। আগে সমাজের যে উপাদান ছিল গৃহ, এখন সেখানে ব্যক্তি চেপে বসেচে। তার কারণ পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা ভারতের উপকূলে আছ্‌ড়ে পড়েছে এবং পড়ছে—চোখ বন্ধ ক'রে অথবা কানে তুলো গুঁজে তাকে ঠেকাবার উপায় নেই। 'দ্বিতীয়তঃ, এই অর্থকৃচ্ছ্রতার যুগে

গৃহাশ্রমের সে বিশেষত্ব আর নেই। অন্ন-স্বচ্ছলতা না থাকলে বহুল-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনো পালিত হ'তে পারে না। ফলে গৃহাশ্রমের পরিধি এখন সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীতে এসে দাঁড়িয়েচে। আরো সর্ব্বনাশের কথা হ'য়েচে এই যে, আমরা অধিকাংশ লোকই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দূরে বাস করচি—এখানে সমাজের বাঁধন অত্যন্ত আল্‌গা, সমাজকে তার প্রাপ্য দিতে লোকে কড়াকড়ি করচে, উপরন্তু সবলেন্দ্রিয়-দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সকলেই নির্ব্বিচারে গৃহাশ্রমের পক্ষপাতী। গৃহী আর এখন তপস্বী নেই, অপরপক্ষে কোন বড় তপস্যা জীবনে গ্রহণ করতে গেলেই গৃহত্যাগের ব্যবস্থা হ'য়েচে। মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার পথ আইন দ্বারা রুদ্ধ হ'য়েচে। ব্রত, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে স্বামিত্বকে আইডিয়া ক'রে গড়ে তোল্‌বার উপযোগী আবহাওয়ার অভাব হ'য়েচে। সতীত্বকে সংস্কার ব'লে উল্লেখ করতেও দেখা যাচ্চে। এ সমস্তই আমাদের পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার ফল,—অথচ সমাজের কাঠামো এখনো বদ্‌লে যেতে পারে নি। সেইজন্যে আজকাল সমাজের সমস্ত বাধাকেই আমরা বহন করচি, অথচ তার লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারচি নে। যে গৃহ ছিল একদিন আশ্রম, আজ সে গর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েচে।

সমাজের উপাদান যখন ছিল গৃহ তখন নারীকে গৃহিণীর রূপ দিতে আমাদের বাধেনি, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে তার প্রেয়সীরূপই একান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। বন্ধু যে free-loveএর কথা তুলেচেন, তাকে সমাজ-জীবন থেকে নির্ব্বাসিত করতে হ'লে সমাজ নিরাপদ হয় সত্য, কিন্তু নিঃসম্পদও হয়। নরনারীর মধ্যে প্রকৃতি যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখেচেন, সেই বিচ্ছেদের আকাশে একটি প্রবল শক্তি সর্ব্বদা বিচিত্র আকর্ষণলীলায় প্রবৃত্ত। পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের যে প্রভাব আমাদের দেশ তার নাম দিয়েচে শক্তি। এ শক্তি সংহারও করে, সৃষ্টিও করে। সমাজে এ শক্তির অভাব ঘট্‌লে তার সৃষ্টিক্রিয়ার নির্জ্জীবতা ঘটে, মানুষ এ অবস্থায় নিস্তেজের মত গতানুগতিক হ'য়ে চলে। আমাদের সমাজের আজ সেই অবস্থা হ'য়েচে। অচল স্থিতিকে সে চেয়েছিল ব'লে সর্ব্বপ্রকার সক্রিয় শক্তিকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল—আজ জেগে দেখ্‌চে বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেচে।

আরো একটা কথা। হৃদয়বৃত্তির আনুষঙ্গিক উৎপন্ন একটা জিনিষ আছে—যার নাম হ'চ্চে মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্য আলোর মত, এ একটি শক্তি। আমাদের সমাজে প্রেমের চাষ ক'রবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে এ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ হয় না। অথচ পুরুষের চিত্তকে নারীর এই প্রাণবান মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে সক্রিয় না করলে সে আপন পূর্ণফল ফলাতে পারে না। বীরের বীর্য্য, কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম, রূপকারের কলাকৃতিত্ব প্রভৃতি সভ্যতার সমস্ত বড় বড় চেষ্টার পিছনে নারীপ্রকৃতির গূঢ় প্রবর্ত্তনা আছে। আনন্দলহরী নামে একখানি কাব্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত। বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেচেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানব-সমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। অথচ আমরা এই শক্তিকে চিরকাল বাইরে ঠেলে রাখলুম—ভিতরে আমল দিলুম না। নারীর এই মাধুর্য্য যে বিলাসসামগ্রী নয়, সে যে মানুষের সকল সাধনাতেই পরম সম্পদ এ কথা বোঝ্‌বার বয়স আজো আমাদের সমাজের হ'ল না—আমাদের সর্ব্বব্যাপী শক্তি-হীনতার এ-ও একটা প্রধান কারণ।

শুন্‌তে পাই বঙ্কিম বাবু লিখে গেছেন যে বাল্যপ্রেমের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত আছে। অন্যদেশে আছে কিনা জানিনে কিন্তু আমাদের দেশে যে আছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এর কারণ ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করবার প্রবৃত্তি। আমাদের সামাজিক আইন-কানুন এমনি বিচিত্র এবং তার দংষ্ট্রা এতই দূরবিস্তৃত যে কোন হৃদয়বৃত্তিকে অভিসম্পাত ক'রে তুল্‌তে আমাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। আপাততঃ এই সম্পর্কে আমার "দেবদাসে"র কথা মনে পড়ছে। শরৎ বাবুর এ উপন্যাস আপনারা সকলেই প'ড়ে থাক্‌বেন। ছোট বেলা থেকেই দেবদাসের একমাত্র সঙ্গী ছিল পার্ব্বতী। খেলা-ধূলা দুষ্টুমি প্রভৃতি সব কাজেই পার্ব্বতী ছিল তার সহায়, এবং এই সব চিরন্তন তুচ্ছতার

ভিতর দিয়েই প্রেমের দেবতা তাঁর আসনখানি তাদের হৃদয়পটে বিছিয়েছিলেন। অন্য কোন সমাজ এই মধুর সম্বন্ধটিকে কোনক্রমেই বাধাগ্রস্ত করতে চাইত না—বরং এর শক্তির দ্বারা সমাজজীবনকে লাভবান ক'রে তুলত। কিন্তু আমাদের সমাজ তর্জ্জনী তুলে বল্লে, 'খবরদার, বেচা-কেনা ঘরের মেয়ের সঙ্গে জমিদারের ঘরের ছেলের বিয়ে হয় না।' পরস্পরের এতদিনের সম্বন্ধ এক ফুৎকারে উড়ে গেল, সমাজের বাধাই বড় হ'য়ে রইল। এ বাধা দেবদাসের জীবনের উপর যে কি ফল প্রসব করতে পারে তা' সমাজ একবারও ভেবে দেখার দরকার মনে করলে না, প্রেমের নির্যাতনে এমনি এর ক্রূর আনন্দ! তারপর চলচ্চিত্ত দেবদাস যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমে গেল তখন সমাজ আবার তর্জ্জনী তুলে বল্লে, 'লোকটা কি মন্দ, কি দুর্নীতি-পরায়ণ!'

মানব-মনের সাম্‌নে আজ এই প্রশ্ন উদিত হয়েচে যে দেবদাসের অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? সে যে কোন মতেই অধম হ'য়ে জন্মায় নি, গল্পে সে প্রমাণের অভাব নেই। পিতাকে সে ভক্তি করত—মৃত্যুর পর বাহ্য শোক প্রকাশ না ক'রে তার শোবার ঘরে গিয়ে পড়েছিল; তাঁর শ্রাদ্ধে নিজের অংশের বহু অর্থ ব্যয় করেছিল। মাতৃভক্তি যে তার কত অসীম ছিল তা' এ আখ্যায়িকা একটু প্রাণ দিয়ে পড়লেই ধরা যায়। পরপারের ডাক যখন এসে পৌঁছল তখন মায়ের পদপ্রান্তে গিয়ে আছ্‌ড়ে পড়ার জন্য কি সে মর্ম্মন্তুদ আকুলি-বিকুলি,—অথচ নিজের মসীলিপ্ত কালিমামাখা মুখখানা কিছুতেই মায়ের সাম্‌নে দেখানর স্পর্দ্ধা সে করতে পারলে না। সত্যি কথা বলতে কি, দেবদাস পিতৃমাতৃভক্ত না হ'লে এই গল্পটির এ রকম পরিণতি হ'তে পারত না। বড় ভাই দ্বিজদাসের মত সে না ছিল অর্থগৃধ্নু, না ছিল কপটাচারী। অথচ এই দ্বিজদাসই তার হাজার রকমের নীচতা নিয়ে সমাজের মাথার-মণি হয়ে রইল,—দেবদাস তার হাজার রকমের উদারতা নিয়ে একেবারে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। অত্যাচার সে করেছিল এ কথা অস্বীকার করচি নে—কর্ম্মফলের ন্যায়বিধানে তার পুরা ফল সে পেয়েছে। বারে বারে ভুগেছে, কুৎসিত রোগাক্রান্ত হ'য়েছে, শেষকালে মৃত্যু হ'ল তার এমন এক সময় যখন তার কাছে না ছিল একজন বন্ধু, না ছিল একজন পরিজন। মৃত্যুর পর চাঁড়ালে তাকে বেঁধে নিয়ে গেল এবং কোন্ পুষ্করিণীর কোন্ তীরে তাকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলে রেখে এল ইতিহাস তার খবর রাখ্‌লে না। এর চেয়ে বেশী শাস্তি আমাদের সমাজবিদ্‌গণ নিশ্চয়ই তাকে দিতে চাইতেন না।

কিন্তু মানব-মনের রুদ্ধ দুয়ারে একটা প্রশ্ন এই ব'লে অবিরত মাথা খুঁড়ে মরচে যে দেবদাস যেমন কর্ম্ম করেছিল তেমনি ফল পেয়েছে, এই কি এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর? কে তাকে এই পথের পথিক হওয়ার উপকরণ জুগিয়েছিল? কে তাকে তার সকল সার্থকতার পথ থেকে ছিনিয়ে এনে কর্ণধারবিহীন নৌকোর মত গভীর তুফানে ছেড়ে দিয়েছিল? কি সে তার অপরিসীম ব্যথা যার সর্ব্বনেশে জ্বালা জুড়োতে তাকে সুরার আশ্রয় নিতে হয়েছিল? সমাজের কেবল কি বেদনা দেবারই অধিকার,—ব্যথা বোঝ্‌বার দায়িত্ব নেই? জৈবধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে মানবধর্ম্মের লড়াই বেধেছিল সেখানে দেবদাস জৈবধর্ম্মের কাছে পরাস্ত হয়েচে মানি, কিন্তু তবু ত তাকে ছোট মানুষ ভাবতে পারি নে। মদ খেয়ে নিজের মানবত্বকে বিলুপ্ত ক'রে না দিয়ে যে ব্যক্তি বেশ্যার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারত না, সে কি মানুষ হিসাবে এতই ঘৃণ্য?

তাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলুম, "দেবদাসের" মধ্যে সব চেয়ে বড় চরিত্রই হচ্চে দেবদাস। নীতিবিদ্ বন্ধু নাক সিঁটকে বলেছিলেন, না, "দেবদাসে"র মধ্যে বড় চরিত্র হচ্চে চন্দ্রমুখী—সে, যে পরশ-মণির জোরে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে নিবৃত্তির পথে এল সেইটি দেখানই হচ্চে "দেবদাসে"র বড় কথা। হতেও পারে, কিন্তু আমার কেবল এই কথাটি মনে হয় যে দেবদাসের ভিতর দিয়ে শরৎ বাবু আমাদের এক দিক্‌কার দৃষ্টি খুলে দিয়েচেন। নীতিসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের মন এতকাল দুর্নীতিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি দিয়েই বিচার ক'রে এসেচে কিন্তু দুর্নীতিরও যে একটা পূর্ব্বেতিহাস থাকতে পারে এবং সে ইতিহাস যে অত্যন্ত করুণ হ'তে পারে দেবদাসকে দিয়ে সেইটিই প্রমাণ

হ'য়ে গেল। To know all is to pardon all—ইংরাজি এ প্রবাদবাক্যও কি সত্য নয়?

পার্ব্বতীকে নিয়ে এইবার হয় ত ঝগড়া বাধবে। তাকে সতীসাধ্বী বল্‌তে অনেকের আপত্তি হবে। সমাজের ব্যবস্থা মাথা পেতে নিয়ে সে শ্বশুরঘর করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার মনের অসীম রাজত্বে দেবদাসই যে চিরকাল একাধিপত্য করেচে এ কথা কারুরই অগোচর নেই। পার্ব্বতীর জীবনে তাল সোনাপুরই সত্য কি হাতী-পোতাই সত্য, দেবদাসই সত্য কি ভুবন চৌধুরী সত্য, মনই সত্য কি দেহ সত্য এ প্রশ্নের মীমাংসা জগদীশ্বরের দরবারে এখনো পেশ করা আছে—আমরা কেবল এইটুকু জানি যে মানুষ এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে নি।

* * *

Elixir of life ব'লে কোন বস্তু আবিষ্কার হয়েচে কি না আমার জানা নেই। মানুষ চিরকালই আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির তারতম্য হিসাবে এই সন্ধানের পথ প্রতি মানুষেরই বিভিন্ন। লালা বাবু একদিন এক-কথায় রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে আনন্দের সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন। যতীন দাসও সেদিন যে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিল তার মধ্যে সে তার অমৃতরূপ দেখেচে। দেবদাসও যে সুবিপুল বেদনার অনলে ধূপের মত নিজেকে নিঃশেষে উৎসৃষ্ট করেছিল সেও এই চিরন্তন অর্দ্ধজ্ঞাত আনন্দের অভিসারে। মানুষের এ যাত্রাপথ এখনও শেষ হয় নি—লীলাময়ের এ অনন্ত লীলা চলেইচে। তাই এ পথবাহীদের কে ছোট কে বড় তার মীমাংসা আজো পর্য্যন্ত হ'তে পারল না!

কোন সমাজই এখন পর্য্যন্ত বিবাহ-সমস্যার নির্দ্দোষ সমাধান করতে পারে নি। মানুষের চরিত্রে এখনো প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব সমান চলেচে। অতএব প্রতীচ্যের সমাজবিধিই শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণকর—এ কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অপরপক্ষে আমাদের সমাজে পূর্ব্বতন আদর্শের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রার যে একটি স্বতঃবিরোধ জমেচে সেইটির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করাই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়। *

শ্রীঅবনীনাথ রায়

* বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে এই প্রবন্ধের উপকরণ গৃহীত হ'য়েচে। লেখক

মীরার জীবনসঙ্গীত

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

সঙ্গীত ও সাধনার মধ্যে একটা বিরোধ নানা দেশে ও নানা কালে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে মধ্য-যুগে দেখা যায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তখন দেখি সাধকরা সবাই সঙ্গীতকে সাধনার এক বিশেষ সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের অন্তরের গভীরতম ভাবকে প্রকাশ করিয়াছেন সঙ্গীতে। তাঁহারা নিজেদের ভাবের বৈচিত্র্যবশতঃ অনেক সময় তাঁদের রচিত ভজনে নানা সুরের বিচিত্র-সংযোগ করিয়াছেন, পরে তাহাই আবার এক একটা নূতন সুর বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার কখনও কখনও তাঁহারা নূতন সুরই সৃষ্টি করিয়াছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের কলাবতেরা তখন সাধকদের সেই সব সৃষ্টি লইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া সভায় দরবারে তাহা স্থাপন করিয়াছেন। কবীর, মীরাবাই, রবিদাস, নানক, দাদূ প্রভৃতি সব সাধক সঙ্গীতেই তাঁহাদের গভীরতম ভাবকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতাংশ বাদ দিলে ইঁহাদের ভাবপ্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তার মধ্যে আবার কাহারও কাহারও জীবনটিই একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত। তন্মধ্যে মীরার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বাল্যে তাঁর ভগবানে ভক্তি, যৌবনে তাঁর সাংসারিক সকল সুখের অবসান, তাঁর জীবনে ভগবানের মনোমোহন আহ্বান-ধ্বনি, সেই মোহন সুর শুনিয়া তাঁর সংসার ত্যাগ, ভগবানের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ ও এই আত্ম-সমর্পণের জোরে ভগবানের সঙ্গে তাঁর যোগ এ সবই যেন একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত।

মরমিয়া সাধকরা মীরার জীবনকে একটি সঙ্গীতের মতই মনে করেন। দেহতত্ত্ববাদী সাধক যেমন সাধন-ধারায় দেহস্থিত ষট্-চক্র "বেধ" করিয়া ব্রহ্মকমলরস পান করেন, মীরাও তেমনি তাঁর জীবন-ধারা দ্বারা ছয়টি সঙ্গীতময় অবস্থাকে পার করিয়া ভাবানন্দরসে ভরপুর হইয়া গিয়াছেন।

মীরার রচিত অনেক গান বিদ্যমান, তার ভাষা ও সুর অতি চমৎকার। কিন্তু তন্মধ্যে মীরার ছয়টি গানে যেন তাঁর জীবনের সব গভীর ভাবই আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার বাহিরে তাঁহার যে জীবন তাহা যেন অতিরিক্ত ঘটনা মাত্র। আসল সব কথাই আসিয়া পড়িয়াছে এই ছয়টি গানের মধ্যে। এই ছয়টি গানে যেন ছয়টি ভাবের চক্র "বেধ" করিয়া মীরার সঙ্গীতময় জীবন-ধারা পরিপূর্ণ যোগানন্দরসে ভাবলোকে আপন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মীরার যে জীবন তাহা বাদ দিলেও ভাব বাদীর কিছু বিশেষ আসে যায় না, যদিও ঐতিহাসিক ও জীবনবৃত্তকার তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন।

মীরার সেই ছয়টি গান অনুবাদসহ যথাপর্য্যায়ে এখানে দেওয়া যাইতেছে। গানের প্রধান কথাই সুর। সেই সুরের পরিচয় দিতে হইলে স্বরলিপি দিতে হয়। সেই কলা আমাদের জানা নাই। কল্যাণভাজন শ্রীমান হিমাংশুকুমার দত্তের সহায়তা না পাইলে এই স্বরলিপিগুলি দেওয়া অসম্ভব হইত।

শ্রীমান হিমাংশুর সমস্ত পরিবারটি একটি সারস্বত সঙ্গীত-লোক। পিতা, মাতা, ভাই, বোন সবাই মিলিত হইয়া একটি সঙ্গীতের কল্পলোক রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার বড় দাদা শ্রীমান শচীন্দ্র দত্ত লক্ষ্ণৌতে কলাবিদ্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীমান হিমুর প্রধান শিক্ষাই হইল প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে, অর্থাৎ Clasical musicএ। কিন্তু ভজনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। সবাই জানেন সাধকেরা তাঁদের ভজনে সঙ্গীত-ব্যাকরণের নানা বিধিনিষেধ অতিক্রম করিয়া নানা সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছেন। শ্রীমান হিমু প্রাচীন ওস্তাদী পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইলেও ভজনের এই বিশিষ্টতা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও ভজনের একটুও বৈশিষ্ট্য হীন করেন নাই। সাধুদের মধ্যে

ভজনের যেমন সুর পাওয়া যায় তাহা শুনিয়া তিনি নিপুণ ভাবে তাহা তাঁর স্বরলিপিতে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। "খোদার উপর খোদকারী" কোথাও করেন নাই।

কাজেই তাঁহার সাহায্যে মীরার এই ভজনগুলির সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইল।

মীরা রাজার কন্যা, রাজার বধূ। স্বামী রাজা না হইতেই মারা গেলেন। মীরার দুঃখময় জীবনের আরম্ভ হইল—তার মধ্যেই আবার ভগবানের ডাক আসিয়া তাঁর জীবনে পৌঁছিল।

যেদিন মীরার জীবন সংসারের অসহ দুঃখে কাতর, যেদিন তিনি তাঁর ব্যর্থ ঘর-সংসারের মিথ্যা বন্ধনটুকু দগ্ধ রজ্জুর মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই বৃহৎ ভাগবত জগতে বাহির হইয়া পড়িবেন কি না এই দ্বিধা লইয়াই দোদুল্যমান, সেদিন মীরা রাজপুতানার একটি রাজপুরীর নির্জ্জন কক্ষে সন্ধ্যাকালে বসিয়া আছেন। দূরে পর্ব্বতনির্গতা মরুনদী; তার তীরের অরণ্য হইতে বন্য পুষ্পের মিশ্র-সুগন্ধ মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে প্রিয়জনের দীর্ঘনিশ্বাসের মত আসিতেছে। মীরা মনে করিলেন, আজ যেন চরাচরবিহারী প্রিয়তম বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন এবং আজো মীরা বাহির হইতে পারেন নাই বলিয়া কুসুম-সুগন্ধে-ভরা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মরম-ব্যথা মীরার কাছে প্রেরণ করিতেছেন। এই কুসুম-সুগন্ধি দীর্ঘনিশ্বাসের পরশে মীরার সুপ্ত চিত্ত জাগিয়া উঠিল, সংশয়ের অবসান হইল, মীরা গাহিলেন—

নৈন ললচাব্‌ত জীয়রা উদাসী।
সাবঁ্‌ল বনমেঁ বাজে সাব্‌ঁলকী বাঁসী।
রৈন মেঁ সৈন মেঁ মোরা নৈনা ন লাগে।
পীতমকে শ্বাস আবে্‌ কুসুম সুবাসী॥

"আজ আমার নয়ন প্রলুব্ধ, জীবন উদাসী। শ্যামল বনের মধ্যে আজ শ্যামলের বাঁশী বাজিতেছে। আজ রাত্রিতে সুখশয়নে আমার নয়নে নিদ্রা আসিতেছে না। আজ প্রিয়তমের কুসুম-সুবাস দীর্ঘনিশ্বাস আমার কাছে আসিতেছে।"

এই দীর্ঘনিশ্বাসের মর্ম্ম বুঝিয়া যেন মীরার অন্তর কহিল—"সকল বন্ধনের বাহিরে মুক্ত জগতে হে প্রিয়তম, তুমি যে এতকাল আমার প্রতীক্ষা করিতেছ, আজ আমি বাহির হইয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার জন্য তোমার সকল দুঃখ মোচন করিব।" তাই সেই রাত্রেই মীরা সংসার ছাড়িয়া সেই নদীর তীরে উন্মুক্ত বন-ভূমিতে গেলেন। তারপর পিত্রালয়ে, বৃন্দাবনে, নানা তীর্থে অতীর্থে সর্ব্বত্র সেই প্রিয়তমেরই সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ও যখন প্রিয়তমের বিরহ তাঁহাকে দুঃখ দিতেছিল তখন মীরা এই কথা জোর করিয়া বলিতে পারিলেন যে, এখন আমাকে দূরে রাখিবার, তৃষিত রাখিবার কোন যুক্তিই তোমার আর নাই; কারণ জীবনে এমন কোন সুখ, এমন কোন সম্পদ আমি নিজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়া দেই নাই যাহার জন্য তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া মিলিতে অক্ষম। তোমার জন্য আমি সবই ছাড়িয়াছি, যদি কোথাও কিছু ছাড়িতে বাকী থাকে তবে এখনই বল এই মুহূর্ত্তে আমি বিসর্জ্জন দিব। কাজেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে রহিবার কোন হেতু এখন আর তোমার থাকিতে পারে না। মীরার এই বাণীতে যেমন নিষ্ঠা তেমনই জোর। তাই মীরা গান করিলেন—

তুম্‌হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা।
অব মোহি কুঁ্য তরসাবে্যা॥
অব ছোড়্যাঁ নহিঁ বনৈ প্রভুজী।
চরণকে পাস বুলাবে্যা॥
বিরহ বিথা লাগী উর অংদর।
(প্রভুজী) সো তুম আয় বুঝাবে্যা॥
মীরা দাসী জনম জনমকী।
মম অঙ্গসূঁ অঙ্গ লগাও।
(প্রভুজী) মম চিত্তসূঁ চিত্ত লগাও॥

"তোমার জন্য সব সুখই ত ছাড়িলাম; এখনও তবে কেন আর তৃষিত রাখ। হে আমার প্রভু এখন আমায় ছাড়িয়া দূরে থাকা কিছুতেই তোমার সাজে না। তোমার শ্রীচরণ-পাশে আমায় ডাকিয়া লও। বিরহ-ব্যথা আমায় মর্ম্মের

ভিতরে আসিয়া লাগিয়াছে তাহা তুমি আসিয়া দূর কর। জন্ম-জন্মের তোমার দাসী আমি মীরা। আমার অঙ্গে তোমার অঙ্গ লাগাও, আমার চিত্তে তোমার চিত্ত লাগাও।"

এমন করিয়া পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম-নিবেদন করিবার পর মীরা অনুভব করিলেন তাঁহার প্রিয়তম ভগবান তাঁর জীবনে আসিতেছেন। তখন পাখীর গানে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, মেঘের গর্জ্জনে, প্রিয়তমেরই পদধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। বর আসিবার সময় যেমন বধূরা ও কন্যারা বাতায়ন খুলিয়া খুলিয়া লজ্জা ছাড়িয়া দেখিতে থাকে কখন বর আসিবেন, তেমনই আজ বিদ্যুৎ-কন্যারা যেন বার বার মেঘ-যবনিকা সরাইয়া তাঁর আগমনের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। সবাই খবর পাইয়াছে বর আসিবেন, তাই ধরিত্রীও নবরূপ ধারণ করিয়াছেন। মীরার চিত্তেও তাই আজ ধৈর্য্য থাকিতেছে না। মীরা গাহিলেন—

সুনী মৈঁ হরি আবনকী আব্বাজ।
মহল চঢ়ি চঢ়ি জোউঁ মোরী সজনী
কব আবৈ ম্হারাজ।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ
কোইল মধুরে সাজ।
গরজে বদরব্বা মেঘা বোলৈ,
দামিন চোড়ী লাজ।
ধরতী রূপ নব্বা নব্বা ধরিয়া
কংত মিলনকে কাজ।
মীরাকী চিত ধীরা ন মানৈ
বেগ মিলো মহারাজ॥

"হরির আগমনের পদধ্বনি আমি শুনিতেছি। রাজ-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকল বাধার উপরে উঠিয়া তাঁহাকে আজি জীবনে দেখিতে চাই। তাই এই সকল ঐশ্বর্য্যের রাজ-প্রাসাদের উপরে উঠিয়া হে আমার সখি, আমি সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখিতেছি কখন আমার স্বামী আসেন। দাদুর ময়ূর পাপিয়ার ধ্বনি চলিয়াছে, কোকিলের মধুর সঙ্গীত চলিয়াছে, বাদল গর্জ্জিতেছে, ভেক সকল ডাকিতেছে, দামিনী লজ্জা ছাড়িয়াছে, কান্ত-মিলনের জন্য ধরিত্রী নব নব রূপ ধরিতেছে। মীরার চিত্ত যে আজ আর মানিতেছে না; হে স্বামি, শীঘ্র আসিয়া দেখা দেও।"

তাঁর পদধ্বনি শুনিতে শুনিতেও দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে তবু তিনি আসিলেন কই? তাঁর হাতে ত কাল অনন্ত, তাঁর ত কোন তাড়াহুড়া নাই, আমার সময় যে পরিমিত, তাই ত বিলম্ব সহে না, তাই ত আমার এত ব্যাকুলতা। বিরহে প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, বিরহে জীবনলতা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবার আগে একটুখানি প্রাণ থাকিতেও যদি তাঁর প্রেমবারি বর্ষণ হয় তবুও কিছু আশা আছে। তাঁর বড় বিলম্ব হইতেছে, মৃত্যুমেঘে জীবন ঘেরিয়া আসিতেছে, তাই মীরা গাহিতেছেন—

চিতনন্দন বিলমাঙ্গ
বাদরা নে ঘেরী মাঙ্গ।
ইতঘন গরজে উতঘন লরজে
চমকত বিজ্জু সবাঙ্গ।
উম'ড় ঘুম'ড় চহুঁ দিস সে আয়া
পব্ন চলে পুরব্বাঙ্গ।
বিরহন মেরো প্রাণ জলত হৈ
দগধ বেলী সিঁচাঙ্গ।
প্রাণ রহত মোকো দরসন দীজ্যো
প্রাণ রখো চরণাঙ্গ।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ
কোয়ল সব্দ সুনাঙ্গ।
মীরাদাসী চরণ উপাসী
চরণ কমল চিত লাঙ্গ॥

"হে চিত্তনন্দন বড় বিলম্ব তোমার হইতেছে। এদিকে যে আমার চারিদিকে মেঘ ঘেরিয়া আসিতেছে। এইদিকে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ঐদিকে মেঘ তর্জ্জন করিতেছে। সকল বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, চারিদিক হইতে মেঘ ঘন হইয়া জমাট হইয়া আসিতেছে। জলভার মন্থর পূরব-("পুরব্বাঙ্গ") পবন চলিতেছে। বিরহে আমার প্রাণ জ্বলিতেছে। দগ্ধ জীবনলতাকে জলসেচন কর। প্রাণ থাকিতে আমার দরশন দেও, আমার প্রাণ তোমার চরণে রাখ। দাদুর, ময়ূর, পাপিয়া ডাকিতেছে, কোকিল শব্দ

শুনাইতেছে। মীরাদাসী তোমার চরণ-উপাসী,—তোমার চরণ-কমলে তাহার চিত্ত আনিয়াছে।"

তারপর যখন অন্তরে প্রিয়তমের প্রেমানন্দ পাইয়াছেন তখন মীরার সব চঞ্চলতা শান্ত হইয়া গিয়াছে। পরমেশ্বরের বিশ্ব-সভায় নানা জনে নানা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে। তাঁর রাজসভায় রাজপ্রসাদ পাইবার জন্য পরস্পরে সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে, এই ভীড়ের মধ্যে যাইবার আর কোন লোভ মীরার নাই। লোভী হৃদয় কখনও যদি প্রসাদ-লাভ-কামনায় চঞ্চল হইয়া ওঠে মীরা অমনি তাহাকে শান্ত করিয়া দেন। মীরা বলেন, তিনি যে আমার প্রিয়তম, আমি কি ভীড়ের মধ্যে তাঁর কাছে ভিক্ষুকের মত যাইতে পারি? আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হইবে গভীর নিশীথে প্রেমনদীর তীরে, কোনও উদ্দেশ্য লইয়া নহে কেবল তাঁর মিলনানন্দে সকল হৃদয় সকল জীবন পরিপূর্ণ করিতে। মীরা তখন কেবল জানিতে চাহেন কোন্ সেবা দ্বারা তিনি প্রিয়তম স্বামীকে, কোন্‌রূপ আনন্দ দিয়া নিজেকে ধন্য করিতে পারিবেন। তাঁর কাছে কিছু পাইবার জন্য নহে তাঁর যে-কোনরূপ সেবা করিবার জন্যই মীরার ব্যাকুলতা, কিছু দিবার জন্য, কিছু সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁর এই ব্যথা, তাই মীরা গাহিতেছেন—

ম্হাঁনে চাকর রাখো জী।
চাকর রহস্যূঁ বাগ লগাস্যূঁ
নিত উঠি দরসন পাস্যূঁ।
বৃন্দাবনকী কুংজ গলিন্‌মেঁ
তেরী লীলা গাস্যূঁ।
হয়ে হরে সব বন বনাউঁ
বিচ বিচ রাখঁু বারী।
সাব্‌লিয়াকে দরসন পাউঁ
পহির কুসুম্মী সারী।
জোগী আয়া জোগ করনকূঁ
তপ করনে সন্ন্যাসী।
হরী ভজনকূঁ সাধু আয়ে
বৃন্দাবনকে বাসী।
মীরা কে প্রভু গহির গঁভীরা
হৃদয়ে রহোজী ধীরা।
আধীরাত প্রভু দর্সন দেহৈ
প্রেমনদীকে তীরা॥

"আমায় চাকর রাখগো, হে স্বামী আমায় চাকর রাখ। আমি চাকর রহিব, তোমার উদ্যান রচনা করিব, নিত্য উঠিয়া তোমার দরশন পাইব। বৃন্দাবনের কুঞ্জগলিতে-গলিতে তোমারই লীলা গাইব।"

"আমি শ্যামল শ্যামল সব উপবন রচনা করিব, মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারী রাখিব এবং এই সৃষ্টির মধ্যেই আমি সকল কুসুম-শোভায় শোভিত শ্যামল রূপের দরশন পাইব।"

"যোগী আসিয়াছেন যোগ-সাধন করিতে, সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তপস্যা করিতে, সাধু আসিয়াছেন হরিভজন করিতে, সবাই এঁরা তাই বৃন্দাবন-বাসী। মীরার যে প্রভুর সঙ্গে গভীর গম্ভীর প্রেমের সম্বন্ধ! ওরে অশান্ত হৃদয়, তুই স্থির হ'। অর্দ্ধরাত্রে প্রভু যে তোকে দর্শন দিবেন তাঁর প্রেমনদীরই তীরে।"

এখন হইতে মীরার সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমের সম্বন্ধ গভীর গম্ভীর, দিনে দিনে তাহা প্রগাঢ় হইতেছে। প্রেমের গভীর যোগ জীবনে ক্রমেই শান্ত গভীর হইয়া আসিতেছে। মীরা দিনের পর দিন আপনাকে তাঁর প্রিয়তমের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতেছেন। ক্রমে তাঁর জীবন প্রেমে প্রেমময় হইয়া প্রিয়তমময় হইয়া উঠিতেছে। তখন তিনি তাঁর আগেকার রচিত একটি গানে জীবনের সুরটি বাঁধিয়া সেই গানেই তাঁর মর্ম্মের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বলিলেন—

ম্‌হাঁরে জনমমরণকে সাথী।
থাঁনে নহিঁ বিসরূঁ দিনরাতী॥
তুম দেখ্যাঁ বিন কলন পড়ত হৈ।
জানত মেরী ছাতী॥
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ।
রোয় রোয় অঁখিয়াঁ রাতী॥
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর।
হরি চরণাঁ চিতরাতী॥
পল পল তেরা রূপ নিহারূঁ।
নিরখ নিরখ সুখপাতী॥

"হে আমার জনম-মরণের সাথী, তোমাকে যেন দিন-রজনী কখনও না ভুলি। তোমাকে না দেখিলে একটুও যে সোয়াস্তি নাই একথা আমার হৃদয় জানে। যে সব বাধা তোমাকে আড়াল করিয়া রাখে সে সকলের উপরে উঠিয়া দেখি আর তোমার আগমন চাহিয়া তোমার পথ প্রতীক্ষা করি; কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রাঙা করি। মীরার প্রভু পরম মনোহর—সেই হরির চরণেই চিত্ত অনুরাগী। পলে পলে তোমার রূপ নিরখি এবং নিরখিয়া নিরখিয়া পাই আনন্দ।"

ক্রমে তাঁর জীবনগঙ্গা পরব্রহ্মসাগরে আপনাকে দিনে দিনে ভরপুর উৎসর্গ করিয়া দিতে লাগিল। তাঁর জীবন ক্রমে তাঁর প্রিয়তমের মধ্যে বিলীন হইতে লাগিল। দিনে দিনে তিনি আপনাকে আপনার প্রেমময়ের মধ্যে সমাহিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁর জীবন সার্থক ও জন্ম চরিতার্থ হইল। *

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

স্বরলিপি

অ = অ ও আ-র মাঝামাঝি, ইংরেজী U

ঐ = অয়্; ঔ = অও

ব্ = ওঅ, ইংরেজী W

য = ইঅ

মিশ্র ভীমপলশ্রী—কার্ফা (মধ্যগতি)

```
   +                          ২
II জ্ঞা -মা পা -র্সা । ণা -ধণা পা -া I মজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা রা । সা -া -া -রা I
   নৈ  •  ন  •      ল  • •  ল  •     চা  • •   • •  ব্     ত  •  •  •

I সণ্ সা জ্ঞা -া । জ্ঞ-সা জ্ঞা জ্ঞা -মা I পা -া -মপা -দপা । মা -পমা -জ্ঞা -া I
  জী  য়  রা  •      •   উ  দা  •      সী •  • •  • •      •  • •  •  •

I জ্ঞা -মা পা -র্সা । ণা -ধণা পা -া I মজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা রা । সা -া -া -া I
  নৈ  •  ন  •      ল  • •  ল  •     চা  • •  • •  ব্     ত  •  •  •
```

* উল্লিখিত মীরার ছয়খানি গান সাধকরা "ষট্-কমল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ছয়টি গানের মধ্যে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রথম দুইটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল; বাকি চারটি গানের স্বরলিপি পরবর্ত্তী দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ভাব-গৌরবে এবং সুরের মিষ্টতায় ছয়টি গানই অপূর্ব্ব আমাদের সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে এই উৎকৃষ্ট গানগুলি স্বরলিপিসহ উপহার দিতে সক্ষম হইলাম বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়কে এবং শ্রীমান হিমাংশুকুমার দত্তকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিঃ সঃ।

I পা -ণা ণা -া । ণা -া ণা -া I ধণা -র্সর্রা -র্সর্রা র্সা । ণধর্সা -ণধা পা -া I
সা ০ বঁ ০ ল ০ ব ০ ন০ ০০ ০০ মেঁ বা০ ০০ জে ০

I পা -ণা ণা -া । ণা -া ণা -া I ধণা -র্সণা -ধণা ধপা । পা -দা পা -া I
সা ০ বঁ ০ ল ০ ব ০ ন০ ০০ ০০মেঁ০ বা ০ জে ০

I পা -দা পা -মা । মা -জ্ঞা জ্ঞা -সা I জ্ঞা -মা পা -া । -মপা -দপা -মপা -মজ্ঞা II
সা ০ বঁ ০ ল ০ কাঁ ০ বাঁ ০ সী ০ ০০ ০০ ০০ ০০

II { মা -পা দদা -পমা । -মপা -মা মজ্ঞা -া I জ্ঞা -মা পা -না । -া না র্সা -া I
রৈ ০ ন০০০ ০০ ০ মেঁ ০ সৈ ০ ন ০ ০ ০ মেঁ মো ০

I নর্সা -র্রর্রা -র্সনা -র্সা । -া -া -া -া I

I র্সা -া নর্সা -র্রর্মা । -র্জ্ঞর্রা -র্সা র্সা র্সা I নর্সা -ঋর্সা -নর্সা -না । নদা -া পা -া } I
নৈ ০ না০ ০০ ০০ ০ ন লা গৈ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -ণা ণা -া । ণা -া ণা -া I ধণা -র্সর্রা র্সর্রা র্সা । ণধর্সা -ণধা পা -া I
পী ০ ত ০ ম ০ কে ০ শ্বা০ ০০ ০০ স আ০ ০০ বৈ ০

I পা -ণা ণা -া । -া -া ণা ণা I ধণা -র্সণা -ধণা ধপা । পা -দা পা -া I
পী ০ ত ০ ০ ০ ম কে শ্বা০ ০০ ০০ স০ আ ০ বৈ ০

পা -দা পা -মা । মা -জ্ঞা জ্ঞা -সা I জ্ঞা -মা পা -া । -মপা -দপা -মপা -মজ্ঞা II II
কু ০ সু ০ ম ০ সু ০ বা ০ সী ০০ ০০ ০০ ০০

ভজনের সুর—কার্ফা (মধ্যগতি)

+ ২ ॥
I -া সা রা মা । মা -া মা মা I গা মা পা ধা । ধা ণা ধর্সণা -ধপা I
• তুম্ হ রে কা • র ণ স ব সু খ ছো ড়ি য়া • • • •

I পা পধা পা পা । গমা -া মা মা I গা -পা মাঃ -পঃ । -গমা -গা -গঋা -সা II
অ ব মো হি কুঁ • ত র সা • বে • • • • •

+ ২
II { পা পা পা ধা । ধর্রা -র্সা র্সা র্স I র্সর্রা র্সর্রা -র্গা র্রা । র্সা -নর্সা -র্রর্সা -নধা I
অ ব ছো ড়ি য়া • • ন হীঁ ব • নৈ • • প্র ভু জী • • • • •

I -ধনা -র্সনা -ধা -পা । -া -া -া -া } I
• • • • • • • • • •

I পধা ধা ধা ধা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা -পা -ধা I
চ র ণ কে পা • স বু লা • বে • • • • • • • •

I ধর্সা র্সা নর্সা -র্রর্রা । -র্সনা -র্সা -া -া I
প্র ভু জী • • • • • • •

ধনা না না ধপা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা পা -া II
চ র ণ কে • পা • স বু লা • বে • • •

+ ২
II { পা ধা ধর্রা র্সা । র্সা -া র্সা -র্রা I র্সর্রা -র্গর্রা র্রা র্সা । নর্সা -র্রা র্সা নধা I
বি র হ • বি থা • লা • পী • • • উ র অ • ং দ র •

I -ধা -গধা -পা -া । -া -া -া -া } I
• • • • • • • • •

বিচিত্রা
৪৮৭

I পধা -া ধা ধা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা -পা -ধা I
সো ০ তু ম আ ০ য়ে বু ঝা ০ বে্০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

I ধর্সা র্সা নর্সা -র্রর্া । -র্সনা -র্সা -া -া I
প্র ভু জী ০০০ ০০ ০ ০ ০

I ধনা -া না ধপা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা পা -া II
সো ০ তু ম০ আ ০ য় বু ঝা ০ বে্০ ০০ ০০ ০০ ০

\+ ২
II { পা -ধা ধা -র্রা । র্সা -া র্সা -া I র্সা র্সা র্রা র্গা । র্রর্সা র্সা নর্সা -র্রর্সা I
মী ০ রা ০ দা ০ সী ০ জ ন ম জ ন ০ ম কী০ ০০

I -নধা -ধনা -র্সনা -ধা । -পা -া -া -া } I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I পধা -া ধা ধা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা -পা -ধা I
অ ং গ সুঁ অ ং গ ল গা ০ বে্০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

I ধর্সা র্সা নর্সা -র্রর্া । -র্সনা -র্সা র্সা র্সনা I
প্র ভু জী০ ০০ ০০ ০ ম ম০

I ধনা -া না ধপা । পা -ধা পা পা I পা -ধা পধা -নর্সা । -ধর্সা -নধা -পা -া II II
চি ৎ ত সুঁ০ চি ৎ ত ল গা ০ বে্০ ০০ ০০ ০০ ০০

তুর্ক-কেশরী প্রেসিডেণ্ট কামাল পাশা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ বি-এ

বিগত বিশ্ব-কুরুক্ষেত্রের অবসানে জগতের ইতিহাসে যে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে নবীন তুর্কীর অভ্যুদয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে য়ুরোপ-এশিয়ার সন্ধিস্থলে বিশ্বদৃষ্টির অন্তরালে এমন একটি শক্তিশালী জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। স্বেচ্ছাচারী সুলতানগণের কু-শাসন, য়ুরোপীয় মুখ্য রাষ্ট্র-সমূহের

গাজি মুস্তফা কামাল পাশা—তুর্ক প্রেসিডেণ্ট

কূট-কৌশল ইত্যাদির ফলে তুর্কীতে সর্ব্বক্ষণ এমন এক অশান্তি বিরাজ করিতেছিল যাহার ফলে তুর্কীর জাতীয় উন্নতি পদে পদে বাধা পাইতেছিল। কিন্তু এ সকল সত্বেও তুর্কগণ থামিয়া রহে নাই—একাধিক উপযুক্ত নেতা তাহাদিগকে জোর করিয়া উন্নতির পথে প্রেরণ করিতেছিলেন। এশিয়ার গৌরব কামাল পাশা এই সকল নেতৃগণের অন্যতম এবং শীর্ষস্থানীয়। জগতের ইতিহাসে তাঁহার অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ তুলনা মিলে না। বাহ্যতঃ তাহার মিল রহিয়াছে মার্কিন জাতির গৌরব জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে। উভয়েই-স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বজাতির উদ্ধারকর্ত্তা এবং জাতির প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু কামালের আন্তরিক মিল বিশেষভাবে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন এবং রুশ সম্রাট পিটার-দি-গ্রেটের সহিত। কামালের যে অসামান্য সৃজনীপ্রতিভার ফলে তুর্কী আজ অজ্ঞতা ও কু-সংস্কারের নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া পূর্ণ সভ্যতার দিবালোকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার তুলনা শুধু পূর্ব্বোক্ত দুইজন সম্রাটপদবীধারী মহাপুরুষ।

কামালের প্রতিভা বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তুর্কীর রাষ্ট্রীয় অবস্থা একটু স্মরণ করা প্রয়োজন। ১৯০৮ সালে নব্য তুর্ক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে তুর্কীতে নিয়মতন্ত্র (Constitutional) শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে গলদ ছিল বিস্তর। কিন্তু ইহা সত্বেও নব্য তুর্কীর বিপ্লবের মহিমা অন্য কোন রাষ্ট্র-বিপ্লব হইতে ন্যূন নহে। এই বিপ্লবের নেতৃগণ মুসলমান, খৃষ্টান, তুর্ক, গ্রীক, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের লোকদের মিলাইতে পারিয়াছিলেন; এবং ঐ মিলনের ফলে অতি সামান্য রক্তপাতেই তুর্ক সুলতান নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রবর্ত্তনে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়া এক কথা আর ঐ শাসনতন্ত্রকে কার্য্যে পরিণত করা আর এক কথা। ভাঙ্গা যত সোজা গড়া তত সোজা নহে। এই জন্যই ১৯০৮ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তুর্কীর রাষ্ট্রীয় অশান্তি সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। 'এই অশান্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে

পাই তুর্কীর শাসন-পরিচালক জাতীয় দলে উদ্ধত সমরপ্রিয় ব্যক্তিদের মত-প্রাধান্য। সুবিখ্যাত আনোয়ার পাশা ছিলেন এই দলের নেতা। তাঁহারই প্রেরণায় তুর্কী মহাযুদ্ধে জার্ম্মানীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু কামাল পাশা—যিনি তখন সামান্য সেনানী মাত্র ছিলেন—তিনি এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ হইতে কামালের সামরিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তুর্ক জাতি তখন অদ্রিয়ানোপল-বিজয়ী আনোয়ার পাশার বীরত্বে মুগ্ধ ছিল তাই তাঁহার নির্দ্দেশে সর্ব্বনাশের পথে যাইতেও কুণ্ঠিত হইল না। সে যাহাই হৌক, যুদ্ধ ঘোষিত হইয়া গেলে কামাল বিনাদ্বিধায় কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইলেন। এবং তিনি যে কিরূপ নিষ্ঠার সহিত নিজ কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ গ্যালিপলির রণাঙ্গণেই প্রকটিত হইয়াছে। এই একটি মাত্র বিজয়কাহিনী তুর্কীকে মহাযুদ্ধের ইতিহাসে স্থায়ী সম্মানের আসন দান করিবে। যদি দার্দ্দানেলস বিনাবাধায় মিত্রশক্তির হস্তগত হইত তবে হয় ত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ অনেক আগেই ঘটিত। সে যাহাই হৌক, এই পরাক্রম-প্রদর্শনে তুর্কীর কোন লাভই হইল না; যুদ্ধান্তে প্যারিসের সন্ধি-বৈঠকের সর্ত্তানুসারে তুর্কীর যে ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইল তাহার মত দুর্ভাগ্য কোন জাতির হইতে পারে না। কারণ ঐ নির্দ্ধারণের সারমর্ম্ম এই যে তুর্কী অতঃপর চিরকাল মিত্রশক্তি, এমন কি গ্রীসের নিকটও মাথা নোয়াইয়া থাকুক। অথচ এই গ্রীস্ কিছুকাল আগে তুর্ক সাম্রাজ্যের সামান্য প্রজা মাত্র ছিল।

মাতৃভূমির এই ভীষণতম দুর্দ্দিনেই কামালের প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ দেখা গেল। সালোনিকাতে জন্ম (১৮৮০) বলিয়া কামাল বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের দুঃখদুর্দ্দশা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন, কারণ এই সহরটি য়ুরোপীয় তুর্কীর মধ্যভাগে হওয়ায় তথাকার অধিবাসীরা সহজেই য়ুরোপীয় রাষ্ট্রবাসীদের সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিতে পাইত। তাহার উপর কামালের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক সামরিক বিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে সেনাবিভাগের কাপ্তান পদ পাইলেন তখন তিনি ধীরে ধীরে সুলতান-শাসিত তুর্কীর গলদ ও দেশের দুর্দ্দশা ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর পাইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নব্য তুর্কী বিপ্লব-প্রয়াসীদের সহিতও যোগদান করিয়া দেশকে সুলতানের স্বেচ্ছাচার হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরূপ আজন্ম আন্তরিক স্বদেশপ্রেম যাঁহার, তিনি যে স্বজাতির উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যুদ্ধ বিরতি-পত্র (armistice) স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন কামালের উপর দার্দ্দানেলস ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ হইল, তখনই বিচক্ষণ কামাল বুঝিয়াছিলেন যে মিত্রপক্ষ তাঁহাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ছাড়িবেন না; তাই

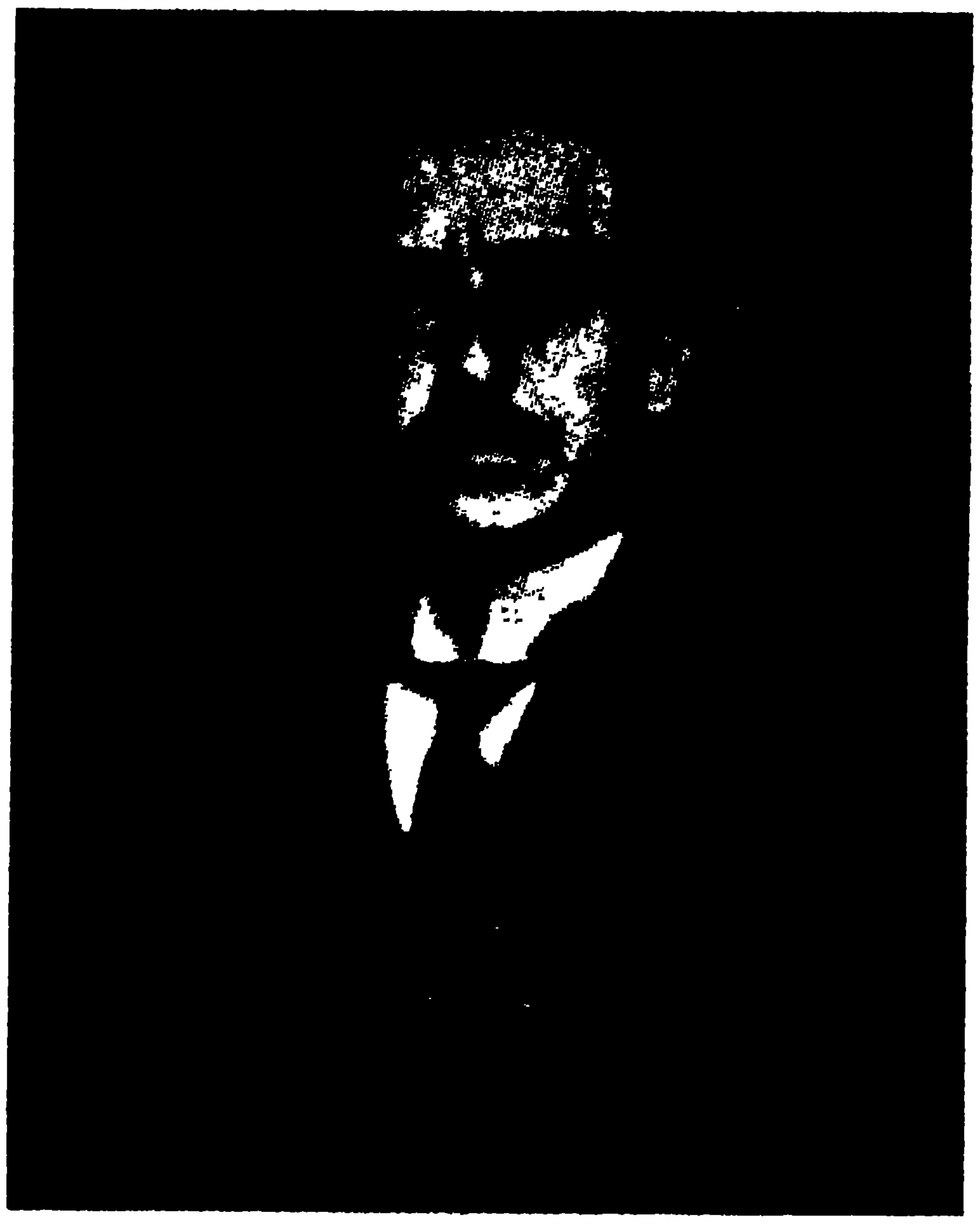

জেনারেল ইস্‌মেৎ পাশা—প্রধান মন্ত্রী

কামাল অত্যন্ত দূরদর্শিতার সহিত ব্রিটিশ-চরদের দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া যে কয়টি কামান ও সৈন্য সরাইতে পারিলেন তাহাই লইয়া সরিয়া পড়িলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়া কামাল দেখিলেন সর্ব্বত্র বিষাদ ও নৈরাশ্য। সকলেই উইলসনের চৌদ্দ দফা আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে তুর্কী সাম্রাজ্য অটুট থাকিবে, কিন্তু প্যারিস সন্ধি-বৈঠকের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহাদের বুঝিতে বাকী

রহিল না যে বিনাশ আসন্ন; তাই সমগ্র তুর্ক সমাজ তখন আশঙ্কায় ম্রিয়মান ও নিরুৎসাহ। কিন্তু এইখানে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষে তফাৎ। কামাল 'নসিব' বা 'কিস্‌মেতে'র উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। তাই তিনি মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে কখনো নৈরাশ্য পোষণ করেন নাই।

তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে তখনো যথানিয়মে সমগ্র তুর্ক শক্তিকে পরিচালিত করিতে পারিলে তুর্কীর হতাশ হওয়ার কারণ নাই। একটু আগে দেখিয়াছি,—তিনি ভবিষ্যতের জন্য দার্দ্দানেলস হইতে কিছু কামান ও সৈন্য হস্তগত করিয়াছিলেন।

গাজি মুস্তফা কামাল পাশা

যে সময়ে গ্রীকেরা স্মার্ণা দখল করিল কামাল তখন কৃষ্ণ-সাগরের পারস্থিত সামসুনের সেনাবিভাগের কর্ত্তা। গ্রীকদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া কামাল মাতৃভূমিকে গ্রীক-অধীনতা-মুক্ত করিবার জন্য জাতীয় তুর্কীবাহিনী-সংগঠনের আয়োজন করিলেন। সংবাদ পাইয়া অচিরেই মিত্রশক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত কাপুরুষ সুলতান কামালকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কামাল তাহার জবাবে কর্ম্মত্যাগপত্র পাইয়া দৃঢ়ভাবে স্বকার্য্যে রত হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার চেষ্টায় দুইবার তুর্ক জাতীয় কংগ্রেস আহূত হইল এবং তুর্ক সাধারণতন্ত্রের সংস্থিতি-পত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেই কামাল পাশা সাময়িক রাষ্ট্রনায়ক (President) নির্ব্বাচিত হইলেন। এই খবর পাইয়া সুলতান কামালকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কামালের কোনই ক্ষতি হইল না বরং তাঁহার প্রতিপত্তি তুর্কীর সর্ব্বত্র বাড়িয়া চলিল। তাহাতে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইল যে সুলতানের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং কামালের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য সুলতানকে নূতন মন্ত্রিসভা গড়িতে হইল। নিষ্পত্তির যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল তাহাতে কামাল একটি জাতীয় মহাসমিতি আহ্বানের প্রস্তাব করিলেন। ঐ মহাসমিতি যেন মিত্রশক্তির প্রভাব-পরিমণ্ডলের বাহিরে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরস্থ কোন সহরে বসে ইহাই কামালের নির্দ্দেশ ছিল, কিন্তু নূতন মন্ত্রি-সভার অধ্যক্ষ রিজা খাঁ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধতাই ইহার কারণ। ব্রিটিশশক্তি তখনই কনষ্টান্টিনোপল দখল করিয়া ফেলিলেন। তখন তুর্ক পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ বা ব্রিটিশপক্ষ দ্বারা ধৃত হইয়া মাল্টাতে নির্ব্বাসিত হইলেন। কামাল অচিরে আঙ্গোরায় এক তুর্ক পার্লামেণ্ট গঠন করিয়া ইহার জবাব দিলেন। ব্রিটিশের ক্রীড়া-পুত্তলী সুলতানের সৈন্যদল কামালের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। আনাতোলিয়ার কৃষকগণকে কামালের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই ঐ সৈন্যগণের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কামাল সহজেই এই কৃষকবিদ্রোহ দমিত করিলেন।

কামালের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রতাপে ব্রিটিশগণ প্রমাদ গণিল। তাহাদেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত গ্রীকগণ তখন বিরাট বাহিনী লইয়া আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করিল। কামাল দুই এক যায়গায় গ্রীকগণকে বাধা দিলেন বটে, কিন্তু স্থায়িভাবে বাধাদান কিছুকালের জন্য সাধ্যায়ত্ত বিবেচিত হইল না। কারণ গ্রীকদের সামরিক সরঞ্জাম ও লোকজন তুর্কগণের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। সে যাহাই হোক,

কামাল সহজে নিরাশ হইবার লোক নহেন। তাঁহার ভিতরে যে অদম্য উৎসাহ ছিল তাহাই দিয়া তিনি সমর-সরঞ্জামের অভাব কতকটা পূরণ করিলেন। সমগ্র তুর্ক জাতীয়দল তাঁহার নয়াকতায় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ১৯২২ সালের ২৫শে আগষ্ট কামাল গ্রীকগণকে ভীমবেগে যে আক্রমণ করিলেন তাহার ফলে সুরক্ষিত গ্রীক সেনাবাহিনী দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া গেল। ৩০শে আগষ্ট যে যুদ্ধ হইল তাহাতে গ্রীকসেনা সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল, এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সসৈন্যে স্মার্ণায় প্রবেশ করিলেন। এইবার বেগতিক দেখিয়া মিত্রপক্ষ যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাহার ফলে তুর্কী তাগর য়ুরোপীয় অধিকারের কিয়দংশ ফিরিয়া পাইল।

অনতিবিলম্বে লোসানের সন্ধিবৈঠকে তুর্কীর ডাক পড়িল। রাজনীতিকুশল ইস্‌মেত পাশা ঐ বৈঠকে প্যারিসের সন্ধি-বৈঠকের নির্দ্দিষ্ট তুর্কী সম্বন্ধীয় সর্ত্তগুলিকে উল্টাইয়া দিলেন। মিত্রশক্তি বেগতিক দেখিয়া তাহাতে আপত্তি করিল না। ইহার পরে ১৯২৩ সালের ২৯শে অক্টোবর তুর্ক সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। কামালের আজীবন উদ্দেশ্যের প্রথমভাগ সাধিত হইল। যে স্বাধীন তুর্কীর নাম য়ুরোপ হইতে মুছিয়া যাইবার মত হইয়াছিল, সেই তুর্কী কামালের প্রতিভায় পরাধীনতার গ্লানি হইতে রক্ষা পাইল।

কিন্তু দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করাই কেবল কামালের মাহাত্ম্য নহে। যদিও মাতৃভূমির উদ্ধারকর্ত্তা হিসাবে ওয়াশিংটন, গারিবলদি ইত্যাদি মহাপুরুষগণের পার্শ্বে তাঁহার স্থান, স্বজাতিকে গড়িয়া তোলার ব্যাপারে নেপোলিয়ন বা পিটার-দি-গ্রেটই তাঁহার একমাত্র তুলনা-স্থল। একথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। কামালের একটি প্রধান দৃঢ়তার পরিচয়, তুর্ক শাসনকে ধর্ম্মতন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিদান। এই ব্যাপার একদিকে যেমন তাঁহার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়, অপরদিকে ইহা তাঁহার সিংহোচিত সাহসের ও নিদর্শন বটে। ধর্ম্মান্ধতা যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিরূপ বাধার সৃষ্টি করে তাহা আমাদের হতভাগ্য দেশ ও আফ্‌গানিস্থানের দিকে তাকাইলে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কামাল এরূপ ঝুঁকি স্কন্ধে লইতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। কারণ দেশ-প্রেমই কামালের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু—ইহার তুলনায় ব্যক্তিগত বিপদ ও অশান্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাই তিনি খলিফা পদের উচ্ছেদসাধন করিতে দ্বিধা করেন নাই। খলিফার উচ্ছেদসাধন করিলেও কামাল ধর্ম্ম-

রাস্তায় নব্য তুর্ক নারী

বিরোধী বা নাস্তিক নহেন। তবে ধর্ম্মতন্ত্রের অধীনে নারী-জাতির যে দুর্দ্দশা, ও জনসাধারণের মধ্যে যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জাতির উন্নতিকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে ছিল কামাল তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাই খলিফা-পদের উচ্ছেদসাধন করা হয়। বাস্তবিক খলিফা যখন সকলের ইহ-পরকালের নিয়ন্তা হইয়াও বহু বিবাহ করিতে

পারেন তখন তাঁহাকে স্বপদে রাখিয়া নারীজাতির উন্নতি-বিধান অসম্ভব। তাহার উপর খলিফার অধীন তথা-কথিত ধর্ম্মশিক্ষিত মোল্লাগণ ধর্ম্মের নামে গৃহে গৃহে যে কুসংস্কার ছড়াইত তাহাতে বাধাদানের জন্যও খলিফাকে বিতাড়নের প্রয়োজন ছিল। কামাল তাই তাহা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কামালের গুণমুগ্ধ দেশবাসী এজন্যে কামালকে ভুল বুঝে নাই। দেশবাসীর এই অটল বিশ্বাসে বলীয়ান্

তুর্কীর বিখ্যাত লেখিকা সুয়াতে দারবিশে হানুম

কামাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে তুর্কীতে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে জগতের ইতিহাসে তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব।

কামালের চরিত্রের এক বিশেষত্ব যে তিনি কোন কাজই আধাআধি করার পক্ষপাতী নহেন। খলিফাকে অপসারণের ব্যাপারেই তাহা দেখা গিয়াছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা পাওয়ার পরই কামাল সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। অল্পকাল মধ্যে তুর্কীর সমস্ত পুরাতন আইন পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে আধুনিককালের সিবিল আইন প্রবর্ত্তিত হইল। নারীগণ আর পুরুষের তুলনায় অধম বিবেচিত রহিলেন না, এমনকি অ-মোস্লেমের সহিত তাহাদের বিবাহের বাধাও ঘুচিয়া গেল। পরদা, হারেম, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হইল। বিবাহ-আদি ব্যাপারের আইন হইল যে পুরুষের আঠারো আর নারীর ষোল বছরের আগে বিবাহ হইতে পারিবে না এবং বিবাহের আগে চিকিৎসকের দ্বারা শরীর পরীক্ষা করাইতে হইবে। ইহার ফলে তুর্কীর নারী-জাতি এক আশ্চর্য্য গতিতে উন্নতিলাভ করিতেছে। (১) লেখক, ডাক্তার, রাজদূতের পত্নী ইত্যাদি রূপে তুর্কনারী আজ দেশ-বিদেশে তুর্কী নামকে গৌরবান্বিত করিতেছেন।

জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অগ্রসর করার জন্য কামাল আরও কয়েকটি বিপ্লবমূলক পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন। তাহার মধ্যে রোমক বর্ণমালার প্রবর্ত্তন সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আরবী অক্ষরের দুরূহতা ও অস্পষ্টতার জন্য তুর্কীর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভয়ানক অসুবিধা হইতেছিল, তাই কামাল রোমক বর্ণমালা প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশের সাধারণকে অনায়াসে লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন। ফেজের পরিবর্ত্তে হ্যাট গ্রহণ, মসজিদের ভিতর কাষ্ঠাসনের প্রবর্ত্তন এবং রবিবারকে জাতীয় বিশ্রামের দিনে পরিণত করা ইত্যাদি ব্যাপারও কামালের স্বজাতি-হিতৈষণা হইতে প্রসূত। এই সকল কাজের ন্যায্যত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কামালের প্রতিভার একটি প্রধান দিক ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। কামাল যে একজন বিপ্লবী সংস্কারক উপরের সংস্কারগুলি হইতে তাহাই বোঝা যাইতেছে। রুশিয়ার সম্রাট্ পিটার-দি-গ্রেটও এরূপ সংস্কারক ছিলেন। তিনিই রুশিয়াতে নবযুগ আনয়ন করেন। তিনি প্রাচীনতন্ত্রের লোকদের প্রভাব হইতে সংস্কারকে বাঁচাইবার জন্য মস্কো হইতে সরাইয়া সেন্টপিটার্সবার্গ নামক নূতন-নির্ম্মিত সহরে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎকর্ত্তৃক ক্ষৌরকর্ম্মের প্রবর্ত্তন কামালের হ্যাট-প্রচলন প্রভৃতির সহিত তুলনীয়। কথিত আছে, সেন্টপিটার্সবার্গের রাস্তার মোড়ে মোড়ে তিনি নাপিত-খানা বসাইয়াছিলেন। সরকারী রক্ষীদের প্রতি হুকুম ছিল

এই প্রসঙ্গে গত বৈশাখ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত তুর্কনারী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে, দাড়িওয়ালা লোক রাস্তায় দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া আনিয়া যেন দাড়ি কামাইয়া দেওয়া হয়। পিটার সুসভ্য পশ্চিম-য়ুরোপ ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলেন প্রায় সকলেই দাড়ি কামায়, তাই তিনি সভ্যতার এই বাহ্যিক চিহ্নটি রুশিয়ায় আনয়ন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা হাস্যকর মনে হইতে পারে, কিন্তু পিটার-দি-গ্রেট না জন্মিলে বর্ত্তমান রুশিয়ার জন্ম অনেক পিছাইয়া যাইত। বর্ত্তমান দিনে কামাল পাশার অবলম্বিত পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইলেও ইহা একটি ধ্রুব সত্য যে কামাল না জন্মিলে কেবল নব্য তুর্কী নহে নবীন এশিয়ারও অগ্রগমন অনেক বাধা পাইত। কামাল পাশার মত বীরপুরুষের অভ্যুদয় কেবল তুর্কীর নহে পরন্তু এশিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে।

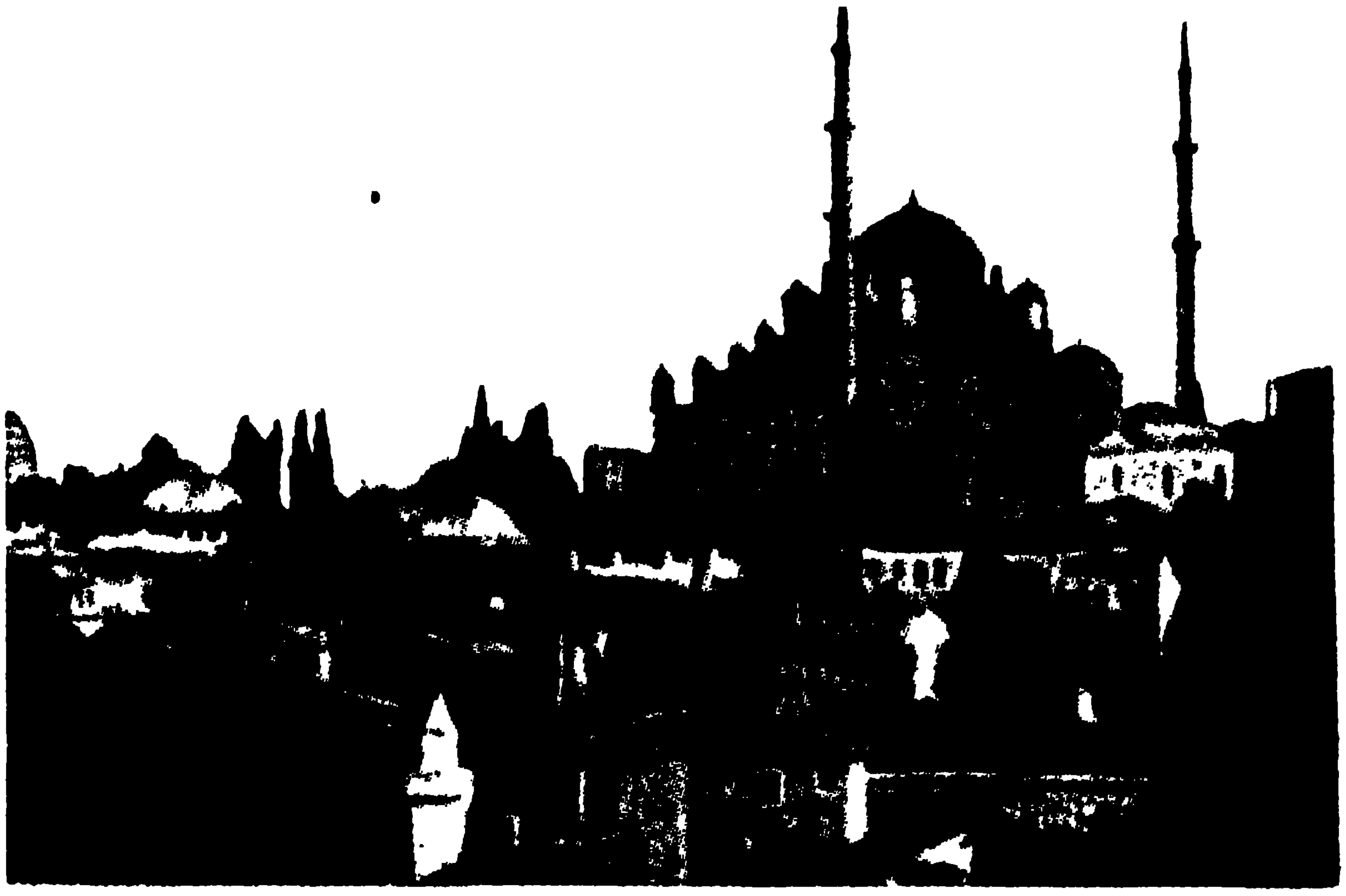

একটি বিখ্যাত মসজিদ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

স্বপ্নমায়া

রূপ-নাটিকা

শ্রীযুক্ত নীরদবরণ দাশগুপ্ত এম-এ, বার-এট্-ল

চরিত্র-পরিচয়

মিহির—রাজকুমার
স্বপ্নমায়া—বনবালা
রাজা—
গণকপণ্ডিত
সুবুদ্ধি—মন্ত্রী
বনবালাগণ
বনরাজ
শুক্লা—রাজবধূ

এক

মায়াকানন

১ম দৃশ্য

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

গভীর রাত্রি। গভীর বন। বনে নাই শুধু গভীর অন্ধকার। মাথার উপরে প্রশান্ত নীল আকাশের মাঝখানে প্রস্ফুটিত শরতের পূর্ণচন্দ্র। মন্ত্রদৃষ্টি তার ছড়িয়ে পড়েছে ভুবনে ভুবনে, আকাশে আকাশে। বাতাসে বাতাসে, লতায় পাতায়, জলে স্থলে এক অপূর্ব্ব মায়ার পরশ—ছন্দহীন, শব্দহীন, শক্তিহীন।

গভীর রাত্রি। গভীর বন। বনে নাই শুধু গভীর অন্ধকার।

আছে বন-নিবিড় তরুশ্রেণী—নীরব, নিথর, মন্ত্রমুগ্ধ। আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে-বদ্ধ আলোছায়ার লুটিয়ে-পড়া নীরব অভিসার—শ্রান্ত-ক্লান্ত-ঘুমন্ত।

গভীর রাত্রি। গভীর বন। এমন বনে একাকী রাজকুমার। শ্রান্ত-ক্লান্ত পথ-হারানো রাজকুমার মিহির। ব'সে আছে বিশাল তরুমূলে—পার্শ্বে তীর-ধনুক। অঙ্গে তার উত্তরীয়, কর্ণে তার সুবর্ণ-কুণ্ডল; মাথায় তার উচ্চ শিরস্ত্রাণ।

ব'সে আছে রাজকুমার—নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে ভীষণ শঙ্কা, গভীর বনে কখন কি বিপদ হয়!

রাজকুমার বেরিয়েছিল দিনের আলোতে, বিজন বনে সন্ধ্যা হ'ল। বেরিয়েছিল দিনের আলোয় মৃগয়া করতে, সন্ধ্যাবেলায় পথ হারালো। ছিল সাথে অনেক সঙ্গী; পথ হারালো,—কে কোথায় গেল! ব'সে আছে রাজকুমার। এমন সময় ভেসে এল এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত—ভেসে এল; আনমনা তার মনটাকে কখন যে সে সুর নিজের রূপের রং মাখিয়ে মাতাল ক'রে তুলেছিল, রাজকুমার নিজেই কি জানে? এক অপূর্ব্ব ছন্দে কেঁপে উঠ্‌ল বনের তরুশ্রেণী,

লতা-পাতা। কেঁপে উঠ্‌ল রাজকুমারের অন্তরতম অন্তর। শিউরে উঠ্‌ল বনের ঘাসগুলি।

কী এ মায়া—? ভাবলে রাজকুমার, হয় ত এ গান গভীর বনের কোন মায়াবিনীর মায়াজাল মাত্র; তাকেই জড়াতে চায়। ভাবলে, যাবো না, না—যাবো না। কিন্তু থাকতে পারলে কই? প্রাণের মধ্যে যে প্রবল টান, চুপ ক'রে ব'সে থাকা কি যায়?

গান

হায় হায় হায়রে আমার আগুন জ্বলে:
'পথিক! তোমার লুকিয়ে থাকা চলবে না ব'লে
সারা ভুবন কেঁপে ওঠে রূপের অনলে।
আজ কোথাও আঁধার আড়াল নাই,
আমি সেইটুকুই চাই,—
আঁচল ভ'রে আগুন ছড়াই জলে স্থলে।

আমার নয়ন দুটি
গগন তলে উঠি'
আগুন হয়ে রইল চেয়ে তারায় তারায় ফুটি'।

আজকে তুমি পড়বে ধরা জানি,
তোমার ভাঙবে আড়ালখানি,
দাঁড়াবে আজ অগ্নিশিখার রক্তদলে॥

২য় দৃশ্য

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

সেই গভীর রাত্রি। গভীর বন। সেই পূর্ণচন্দ্রের মন্ত্র-দৃষ্টি।

বনের অপর প্রান্তে উন্মুক্ত আকাশতলে ঘাসের উপর আপন মনে গান গাইছে আর নৃত্য করছে—সুন্দরী বনবালা স্বপ্নমায়া। বড় সুন্দরী সে। মনে হয় তারই অঙ্গের মাধুরীটুকু নৃত্যের ভঙ্গিমায় তালে তালে ছড়িয়ে পড়েছে,—লুটিয়ে যাচ্ছে সমস্ত আকাশে বাতাসে ভুবনে।

মনে হয়, ভুবনে ভুবনে আজ যে রূপ ভেসে উঠেছে তার একমাত্র উৎস আকাশের পূর্ণচন্দ্র নয়—সুন্দরী স্বপ্নমায়া।

গান গাইছে সে। চঞ্চল অঙ্গের উজ্জ্বল লাবণ্যগুলি গানের সুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে,—বহুদূরে।

রাজকুমার এলো। এই সুরের টানে আকুল-প্রাণে রাজকুমার এলো।

রাজকুমার

কে? কে তুমি?

স্বপ্নমায়া

আমি স্বপ্নমায়া। তুমি কে?

রাজকুমার

আমি রাজকুমার মিহির।

স্বপ্নমায়া

এখানে কি ক'রে এলে?

রাজকুমার

জানি না ত!

স্বপ্নমায়া

কি ক'রে পথ চিনলে?

রাজকুমার

তোমার গানের সুর আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এলো।

স্বপ্নমায়া

বনে কি ক'রে এলে? আমার গানের সুর বন ছাড়িয়ে বাইরে যায় না ত।

রাজকুমার

বনে এলাম পথ ভুলে'।

স্বপ্নমায়া

এ বনের পথ ত কেউ চেনে না? এ বনের নাম যে মায়াকানন!

রাজকুমার

পথ চিনিনা ব'লেই ত এলাম। পথ চিনলে ত আসতাম না। মৃগয়া করতে এসে পথ হারিয়েছিলাম। তাই ত এলাম।

স্বপ্নমায়া

কিন্তু ফিরে যাবে কি ক'রে?

রাজকুমার

ফিরে যাবো না।

স্বপ্নমায়া

কেন?

রাজকুমার

ইচ্ছে নেই।

স্বপ্নমায়া

কেন?

রাজকুমার

তোমার গানের সুরে আমার মন ধরা দিয়েছে—আর যাবো না।

স্বপ্নমায়া

আমার গান শেষ হ'লে তারপর ত যাবে।

রাজকুমার

তোমার গানের শেষে যদি কখনও পৌছতে পারি—তবেই যাবো। নইলে যাবো না।

স্বপ্নমায়া

বেশ! তখন পথ চিনবে কি ক'রে?

রাজকুমার

তখন আমার আর পথ চেনার দরকার হবে না স্বপ্নমায়া! পথই আমায় চিনে নেবে।

স্বপ্নমায়া

তুমি আমায় "স্বপ্নমায়া" ব'লে ডাকলে!

রাজকুমার

হ্যাঁ, কেন ডাক্‌ব না! তোমার নাম ত স্বপ্নমায়া।

স্বপ্নমায়া

তুমি আমায় স্বপ্নমায়া ব'লে ডাকলে! আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি আমার বড্ড—আপনার।

রাজকুমার

তবে তুমি আমায় "মিহির" ব'লে ডাকনা কেন?

স্বপ্নমায়া

মিহির! মিহির!

রাজকুমার

স্বপ্নমায়া! স্বপ্নমায়া!

[রাজকুমার হাত বাড়ালো স্বপ্নমায়ার হাতদুটি ধরবার জন্যে।]

স্বপ্নমায়া

ছুঁয়োনা—তুমি আমায় ছুঁয়োনা।

মিহির

কেন?

স্বপ্নমায়া

কি জানি,—কেমন যেন ভয় করে!

মিহির

ছিঃ! আমাকে তোমার ভয়?

স্বপ্নমায়া

তুমি রাগ করলে?

মিহির

না। তবে তুমি আমায় ভয় করো?

স্বপ্নমায়া

না। মিহির! মিহির! এই যে যত তোমায় ডাকৃছি তত তোমারও নাম একটা সুরের রূপ নিয়ে ধরা দিচ্ছে আমার প্রাণে। গাইব গান?

মিহির

গাও। আমি শুনি।

গান

আমার—সুরের হাওয়ায়
তোমার—তরী বাওয়া।
তখন—জানি! ওগো জানি!
তোমার গোপন পথে আসা যাওয়া,
তরী বাওয়া॥

সুরের হাওয়া যেমন জাগে
আমার প্রাণে কাঁপন লাগে—পুলক-ভরা;
ঢেউয়ে নাচে বনে বনে আকুল হাওয়া,
তরী বাওয়া।

তখন—তোমার নূপুর বেজে উঠে গানে গানে,
তোমার হাসি বাজায় বাঁশী প্রাণে প্রাণে॥

যখন—গানের শেষে ভাঙা সুরে
পরাণ আমার মরে ঘুরে—পথহারা;
চোখ্‌ চেয়ে যে কেবলি চাই আকুল চাওয়া,
তরী বাওয়া।

মিহির

স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

মিহির!

মিহির

দেবে না--ধরা?

স্বপ্নমায়া

দেবো।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

গভীর বন। গভীর অন্ধকার। ঘোর অমাবস্যা। এত অন্ধকার যে—নয়নের পলক পড়ে কি না নয়নও জানে না। এই অন্ধকারে, গভীর বনে, তরুমূলে ব'সে আছে স্বপ্নমায়া, ব'সে আছে মিহির। এই অন্ধকারে পরস্পরের আকুল পরশে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাণের আলোটুকু। ভয়,—এই ঘোর অমাবস্যায় তাও বুঝি হারায়!

মিহির

স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

মিহির!

মিহির

এমন গান গাইতে পার না যে ভীষণ আঁধার কেটে যায়।

স্বপ্নমায়া

পারি।

মিহির

তবে গাইচ না কেন?

স্বপ্নমায়া

এ আঁধার যে আমার ভাল লাগ্‌ছে।

মিহির

ভাল লাগ্‌ছে?

স্বপ্নমায়া

হাাঁ—বড্ড ভাল লাগ্‌ছে। আজ যে আমার আর কিছুই নাই, খালি তুমি। আজ আকাশে চাঁদ নেই, বাতাসে রূপ নেই, পাখীর গান নেই, গাছ লতা পাতা আজ আর কিছুই নেই—খালি তুমি। আজ আমার সব হারিয়ে গেছে—খালি তুমি আমার আছ। তাই আজ তোমাকে যেমন ক'রে পেয়েছি—এমন ক'রে ত সারা শুক্লপক্ষে কখনও পাইনি। তাই আমার এত ভাল লাগ্‌ছে।

গান? আজ তোমার আমার মধ্যে গানের আড়ালও রাখব না মিহির!—তাও হারিয়ে ফেল্‌ব।

মিহির

কিন্তু, তুমি কি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ স্বপ্নমায়া? নয়ন দুটি যে অন্ধ হ'য়ে গেছে—এই অন্ধকারে।

স্বপ্নমায়া

পাচ্ছি না? কতরূপে যে আজ তোমাকে দেখ্‌ছি মিহির—কই আলোতে ত তেমন ক'রে দেখিনি। কখনও দেখ্‌ছি কত বিরাট তুমি, সমস্ত অন্ধকারের আড়ালে অনন্তময় ছড়ান তোমার রূপ আমার প্রাণে আজ ধরা দিয়েছে। তাই ত বাইরে অন্ধকার। আবার কখনও দেখ্‌ছি– না বল্‌ব না।

মিহির

বল, বল, স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

না লজ্জা হয়।

মিহির

বল—ছিঃ, আমার কাছে লজ্জার আড়াল রেখোনা স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

কখনও দেখ্‌ছি—কতটুকু তুমি, কত ছোট তুমি। অপরাজিতার মত সুন্দর তোমার মুখ, শুকতারার মত উজ্জ্বল তোমার চোখ,—আমার গলায় মুক্তার হারের মত তুমি দুলছ। আমি অপূর্ব্ব পুলকে শিউরে উঠ্‌ছি মিহির!

মিহির

স্বপ্নমায়া! স্বপ্নমায়া! তুমি ধন্য।

স্বপ্নমায়া

মিহির! তুমি? তুমি কি আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না? অন্ধকার কি এতই ভীষণ? তোমার চোখের চাহনিটি কি এই আঁধার ভেদ ক'রে আমার মুখের উপর এসে পড়ছে না?

মিহির

স্বপ্নমায়া! তুমি যে কত সুন্দর আমি তা জানি। অমাবস্যার সাধ্য নেই তোমার রূপ ঢেকে দেয়—আমি তা জানি। কিন্তু স্বপ্নমায়া! দিগন্ত-উদ্ভাসিত পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে তোমার রূপের তুলনা নাই। তখন তোমায় দেখি আর আমার মনে হয় তোমার রূপের আভায় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তুমি এক বিরাট রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছ।

—সে রূপের যেন আদি নেই, অন্ত নেই, আরম্ভ নেই, শেষ নেই। আমি দেখি, দেখি আর নিজেকে হারিয়ে ফেলি—তোমার গভীর অতল মাধুরীর মধ্যে।

স্বপ্নমায়া

মিহির!

মিহির

স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

তোমার কথা শুনি আর আমার বড় ভয় করে!

মিহির

কেন?

স্বপ্নমায়া

পথ হারিয়ে আমার কাছে এসেছ, আবার পথ চিনলে হয় ত আমায় হারিয়ে ফেল্‌বে।

মিহির

তোমাকে হারাব স্বপ্নমায়া? তাহ'লে যে নিজেকেও হারিয়ে ফেল্‌ব!

স্বপ্নমায়া

তা আমি জানি মিহির। তাই ত ভাবি পথ যদি কখনও চিন্‌তে পার—পথকেই চিন্‌বে। আমাকেও হারাবে—নিজেকেও হারাবে।

মিহির

স্বপ্নমায়া! স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

মিহির! মিহির! কি হ'লো? কি হ'লো?

মিহির

আমার হাতের আংটি দেখ্‌ছ?

স্বপ্নমায়া

হ্যাঁ। ওকি? আংটি জ্বলছে কেন?—অন্ধকারে কি ভীষণ জ্বলছে!

মিহির

আমার আংটিতে ছিল কৃষ্ণ পাথর। হঠাৎ রক্ত পাথর হ'য়ে উঠেছে—জ্ব'লে উঠেছে।

স্বপ্নমায়া

কেন? কেন?

মিহির

স্বপ্নমায়া! আমার পিতা মৃত্যুশয্যায়—তিনি আমায় স্মরণ করেছেন। তাই আংটি জ্ব'লে উঠেছে।

স্বপ্নমায়া

তোমার পিতা? কে তিনি? কই,—তাঁর কথা ত কখনও বলনি।

মিহির

ভুলে গিয়েছিলাম স্বপ্নমায়া, সব ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ আমার হাতের আংটিতে আগুন জ্ব'লে আমার বুকের মধ্যে আগুন ধ'রে উঠেছে। সব মনে পড়েছে!

স্বপ্নমায়া

কে,—কে তোমার পিতা ?

মিহির

বর্ণপুরের রাজা অগ্নিবাহন। নাম শোননি ?

স্বপ্নমায়া

না, আমাকে ত এতদিন বলনি।

মিহির

তুমিও ত জিজ্ঞাসা করনি ?

স্বপ্নমায়া

তোমার পিতার কথা ত এতদিন কিছু মনে হয়নি।

মিহির

স্বপ্নমায়া! আমাকে এখুনিই যেতে হবে।

স্বপ্নমায়া

যাবে ?

মিহির

হ্যাঁ স্বপ্নমায়া! যেতেই হবে। পিতা মৃত্যুশয্যায়—আমি তাঁর একমাত্র কুমার।

স্বপ্নমায়া

যাবে ?

মিহির

হ্যাঁ স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

তুমি চ'লে যাবে ?

মিহির

যাবো—আবার আসবো স্বপ্নমায়া! কিছুদিন অপেক্ষা কর।

স্বপ্নমায়া

কিছুদিন ?

মিহির

হ্যাঁ স্বপ্নমায়া!

স্বপ্নমায়া

কতদিন ?'

মিহির

দুই পক্ষ।

স্বপ্নমায়া

দুই পক্ষ ? কেমন ক'রে থাক্‌ব ?

মিহির

স্বপ্নমায়া! আমাকে যেতেই হবে এক্ষুণি।

স্বপ্নমায়া

আর একটু বসো। অমাবস্যা কেটে যাক্—তারপর যেও।

মিহির

না না স্বপ্নমায়া! আমার আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করবার সময় নেই। তুমি আমায় বাধা দিও না।

স্বপ্নমায়া

আমি তোমায় বাধা দেবো না।

মিহির

স্বপ্নমায়া! বিদায়!

[মিহির চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।]

স্বপ্নমায়া

একটু দাঁড়াও! একটা কথা শোন!

[মিহির ফিরে দাঁড়াল।]

মিহির

আবার ডাক্‌ছ ? পিছু ডাক্‌ছ স্বপ্নমায়া ?

স্বপ্নমায়া

আর ডাক্‌ব না। শুধু একটা কথা। যাবে ? যদি যাও ত এই নাও, তোমার হাতে আমি আমার মন্ত্র-অঙ্গুরীয়ক পরিয়ে দিচ্ছি। কখনও হারিও না। কোনও বিপদ হবে না। শুকতারার দিকে তাকিয়ে সোজা চ'লে যেও। এ যাত্রায় পথ হারাবে না। পথ চিন্‌বে।

[মিহির চ'লে গেল। স্বপ্নমায়া নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।]

দুই

স্বর্ণতারা

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য ও প্রকৃতি-পরিচয়

বর্ণপুরের রাজপ্রাসাদে রাজকক্ষ—বিশাল, মহিমাময়। সুবর্ণগঠিত উচ্চ মঞ্চে রুগ্নশয্যায় রাজা অগ্নিবাহন শায়িত। পদতলে উপবিষ্ট রাজমন্ত্রী সুবুদ্ধি। কিছু দূরে উচ্চ রৌপ্যাসনে উপবিষ্ট গণকপণ্ডিত।

আজ আবার অমাবস্যা। কিন্তু রাত্রি নয়, প্রভাত। একমাস হ'ল রাজকুমার ফিরে এসেছেন—আজ আবার অমাবস্যা। দুই পক্ষ পরে আজ আবার অমাবস্যা।

রাজশয্যার পাশে বাতায়ন খোলাই ছিল। হেমন্তের প্রভাত; শিশির ভেজা আলোর-পরশ সরস হ'য়ে লুটিয়ে পড়েছে রাজ-উদ্যানের গাছে গাছে, ঘাসে ঘাসে, দূরে মাঠে মাঠে, এবং আরও দূরে সুনীল সমুদ্রের বিশাল জলরাশির উপর।

রাজা রুগ্নশয্যায়। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন দূরে সমুদ্রের দিকে। মনে হচ্ছিল তাঁর, হেমন্তের প্রভাত-আলো সাগর-জলের উদ্বেলিত আঘাতে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—বিন্দু বিন্দু আলোককণা।

রাজা

গণকপণ্ডিত!

গণক

মহারাজ!

রাজা

আজ অমাবস্যা।—

গণক

তা জানি মহারাজ; কিন্তু আপনি অত অস্থির হবেন না। আজ রাত্রেই আমি কুমারকে রোগমুক্ত করব।

রাজা

গত পূর্ণিমার রাত্রে কুমারের কি ভীষণ অবস্থা হয়েছিল ভাবলে আমি এখনও শিউরে উঠি। তাই ত ভয় হয়, আজ অমাবস্যা।

গণক

তখন পর্য্যন্ত আমি রোগ নির্ণয় করতে পারিনি মহারাজ! তারপর এক পক্ষ ধ'রে গণনা-যাগ-যজ্ঞের ফলে আমি কুমারের অবস্থা কতকটা বুঝতে পেরেছি। আর ভয় নেই।

রাজা

কি বুঝতে পেরেছ?

গণক

কোনও এক মায়ার পরশে কুমারের মস্তিষ্কবিকার ঘটেছে।

রাজা

এই বুঝতে পেরেছ? এইটুকু বুঝতেই তোমাকে এক পক্ষ ধ'রে যাগ-যজ্ঞ-গণনা করতে হল পণ্ডিত? সেটুকু গণনা না ক'রেও ত আমরা জানি।

গণক

আর সেই মায়ার পরশ থেকে কুমারকে মুক্তি দিতে হবে।

রাজা

সাধু! সাধু! তোমার গণনার বাহাদুরী আছে পণ্ডিত! মস্ত সত্য আবিষ্কার করেছ ত? কুমারের আজ দুই পক্ষ চোখে নিদ্রা নাই, আহারে রুচি নাই, প্রশ্ন করলে উত্তর পাই না—সর্ব্বদা আনমনা, দৃষ্টি উদাস, এ সত্ত্বেও ভাগ্যিস তুমি গণনা করছিলে, তাই ত বুঝতে পারছি—কুমারের মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে এবং তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে!

সুবুদ্ধি

মহারাজ! আমি একটা নিবেদন করব।

রাজা

কি?

সুবুদ্ধি

কুমারকে এবার মুক্তি দিন। আমার মনে হয়, ও রকম বন্দী অবস্থায় রাখলে কুমারের রোগ-মুক্তি হবে না।

লর্ড কারমাইকেলের শিকার শিবির

শিল্পী—ডি, দত্ত

রাজা

মন্ত্রি! সময় সময় আমিও সে কথা ভাবি,—কিন্তু ভয় হয়। মুক্তি পেলে যদি আবার নিরুদ্দেশ হয়! মস্তিষ্ক-বিকার ত পূর্ণভাবেই চলেছে। বিশেষতঃ কুমারের বিবাহের দিন স্থির—ক্রমেই এগিয়ে আস্‌ছে।

সুবুদ্ধি

কুমারকে নজরবন্দী রাখুন,—কিন্তু তাকে মুক্তি দিন।

রাজা

তা' করলেও হয়। কিন্তু কুমারের ত কোনও কষ্ট হচ্ছে না?—রাজ প্রাসাদেই ত বন্দী অবস্থায় আছে।

সুবুদ্ধি

তবু মহারাজ, মুক্তির আনন্দ স্বতন্ত্র।

রাজা

তা বটে। কিন্তু মন্ত্রি, আমি নিজে যে রুগ্নশয্যায় বন্দী! ভাবি, তেমন ক'রে কুমারকে নজরবন্দী ক'রে রাখবে কে?

[সুবুদ্ধি নীরব হইল।]

তারপর গণক-পণ্ডিত মহাশয়! দুই পক্ষ গণনার ফলে ত বুঝতে পেরেছ কুমারের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটেছে এবং তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে,—কিন্তু মুক্তির উপায়টা কিছু গণনায় স্থির হয়েছে কি?

গণক

হ্যাঁ, মহারাজ!

রাজা

বটে!—কি শুনি?

গণক

কুমারকে ঘুম পাড়াতে হবে।

রাজা

বটে!—এটা ত এতদিন আমাদের কারুর বুদ্ধিতে আসেনি। ঘুম পাড়াতে হবে? তা ত বটেই, ঘুমুলে পরেই ত মাথা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু ঘুমটা পাড়ান'র উপায়টা কি? আজ যে দুই পক্ষ ধ'রে কুমারকে কিছুতেই ঘুম পাড়ান যাচ্ছে না।

গণক

মন্ত্র প'ড়ে কুমারকে ঘুম পাড়াতে হবে।

রাজা

তা মন্ত্রটা কি গণক-পণ্ডিত মহাশয়ের জানা আছে?

গণক

হ্যাঁ, মহারাজ!

রাজা

আছে,—তা এতদিন সেটা প্রয়োগ করনি কেন?

গণক

এতদিন ছিল না।

রাজা

তা হঠাৎ কোত্থেকে পেলে?

গণক

সবে কাল রাত্রে গণনায় পেয়েছি।

রাজা

সত্য?

গণক

হ্যাঁ, মহারাজ!

[রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।]

সুবুদ্ধি

গণক-পণ্ডিত মহাশয় আজ প্রত্যুষেই আমাকে বলেছেন, যে আর ভয় নেই—তিনি আজ রাত্রেই কুমারকে রোগমুক্ত করবেন।

[রাজদূতের প্রবেশ।]

রাজদূত

মহারাজ!

রাজা

কি সংবাদ?

রাজদূত

মহারাজ! বর্ণ-সাগরের ঈশান কোণে ভাবী রাজবধূ 'কুনালা' রাজকুমারীর তরীর স্বর্ণমাস্তুল-চূড়া সূর্য্যকিরণে জ'লে উঠেছে; সাগর-প্রহরী দেখতে পেয়েছে।

রাজা

ভাবী রাজবধূ শুক্লার তরীর মাস্তুল-চূড়া দেখা দিয়েছে। মন্ত্রি! রাজপ্রাসাদ-চূড়ায় সিংহপতাকা উড়িয়ে দাও। নগরে উৎসব ঘোষণা কর। রাজ-নহবতে আগমনীর সুর বাজাতে বলো!

গণক-পণ্ডিত! যেমন ক'রে পার কুমারকে মুক্ত কর। পুরস্কার এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা।

গণক

আমি আজ রাত্রেই কুমারকে রোগমুক্ত করব। শুধু একটা নিবেদন! কুমারের ঘরের ঈশান কোণের বদ্ধ-বাতায়ন খুলে দিতে আজ্ঞা দিন—এই মুহূর্ত্তে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

রাজপ্রাসাদে কুমারের শয়ন-কক্ষ। সুবৃহৎ কক্ষের এক কোণে শয্যার উপর কুমার উপবিষ্ট। ঈশান কোণের জানালা খোলা। কুমার একদৃষ্টে চেয়ে আছে—দূরে সাগরে।

অমাবস্যার রাত্রি। বাহিরে গভীর অন্ধকার। কেবল দূরে অন্ধকারের বুকের ওপর সুবর্ণমাস্তুল-চূড়ায় প্রদীপ জ্বলছে—যেন প্রকাণ্ড একটা শুকতারা! কুমার একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই পানে—মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি, নয়নে যেন পলকই পড়ে না।

কক্ষের অপর এক কোণে সুবুদ্ধি এবং গণক-পণ্ডিত চাপা-গলায় কথাবার্ত্তা বল্‌ছিলেন; কুমারের সেদিক দৃষ্টি নাই।

সুবুদ্ধি

দিনটা ত এক রকম ভালই কাটল, এখন রাতটা ভাল ভাবে কাটলে বাঁচি।

গণক

রাতটাও ভালই কাটবে—কোন ভয় নাই মন্ত্রি মহাশয়!

সুবুদ্ধি

আজ অমাবস্যা কি না—তাই ত ভয় পাই। রাজা ত প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছেন!

গণক

লক্ষণ সবই এখন পর্য্যন্ত ভাল। তবে একটা কথা, তরী এসে ঘাটে পৌঁছবে কখন?

সুবুদ্ধি

যতদূর খবর পাচ্ছি—কাল পূর্ব্বাহ্নে।

গণক

তা হ'লে জানলা খোলা থাকলে, সমস্ত রাতই মাস্তুল-চূড়ার প্রদীপ দেখা যাবে—কেমন?

সুবুদ্ধি

হ্যাঁ।

গণক

হুঁ। কুমারকে এখন ঘুম পাড়ান দরকার।

সুবুদ্ধি

পণ্ডিত মহাশয়! আমার মনে হ'চ্ছে, জানালা খোলা ছিল ব'লেই অমাবস্যার দিনটা কাট্‌ল ভাল। সমানে একদৃষ্টে চেয়ে ব'সে আছেন—সমস্ত দিন। সন্ধ্যাবেলায় যখন ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎখানি অন্ধকার হ'য়ে গেল, দূরে মাস্তুল-চূড়ায় প্রদীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল, কি অপূর্ব্ব পুলক ও বিস্ময় কুমারের চোখে ভেসে উঠেছিল তখন,—আপনি ত এখানে ছিলেন না—কাজেই লক্ষ্য করেন নি। চেয়ে দেখুন, এখনও ঠিক সেই দৃষ্টি—যেন মুগ্ধ শিশুর সাম্‌নে রঙীন খেলনা তুলে ধরা হ'য়েছে।

গণক

কিন্তু এইবার ঘুমপাড়ান দরকার।

সুবুদ্ধি

তার কি উপায় করেছেন কিছু?

গণক

উপায় আপনা হ'তেই হবে। এতদিন ছিল বিক্ষিপ্ত মন, আজ ধরা দিয়েছে। এতদিন ছিল আঁখির চাহনি অনন্তে উদাস, আজ বাঁধা পড়েছে—ঐ দূরে সুবর্ণমাস্তুল-চূড়ার

সীমার মধ্যে; আর ভয় নেই। সীমার ধর্ম্ম এবার আপনা থেকেই কাজ করবে!

[সহসা] মন্ত্রী মহাশয়! শীঘ্র যান, বাইরে থেকে ঈশান কোণের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিন—এই মুহূর্ত্তে।

সুবুদ্ধি

এ কি! কুমারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কেন?—কত বড় বড় ফোঁটা!

গণক

যান, যান,—আর দেরী করবেন না। রাজ-নহবতের সান্ধ্য বীণায় কোমলে পূরবী সুর বাজাতে বলুন।

[মন্ত্রী মহাশয় বাইরে চ'লে গেলেন। বাইর হ'তে ঈশান কোণের জানলা বন্ধ হ'য়ে গেল। গণক-পণ্ডিত কুমারের শয্যার পাশে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন কুমারের মুখের পানে—খানিকক্ষণ।]

গণক

কুমার! এইবার আপনার ঘুমুবার সময়, এইবার আপনি ঘুমোন।

[কুমারের শরীর শয্যায় এলিয়ে পড়ল। রাজ-নহবতে কোমলে পূরবী বেজে উঠল। সুরগুলি যেন চারদিক হ'তে এসে, হাওয়ায় ভেসে কুমারের অঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে!]

[মন্ত্রী মহাশয়ের প্রবেশ।]

মন্ত্রী

[চাপাস্বরে] ঘুমিয়েছেন?

গণক

হ্যাঁ।

মন্ত্রী

দেখুন, দেখুন চোখ দিয়ে এখনও কি রকম বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে—যেন এক একটা মুক্তো।

গণক

আহা!—পড়বে না? ঐ এক একটা ফোঁটার মধ্য দিয়েই ত প্রাণের ভিতরকার মায়ার বন্ধন—একটি একটি ক'রে শিথিল হ'চ্ছে।

মন্ত্রী

ঐ দেখুন, মুখের মধ্যে কি রকম একটা অপূর্ব্ব আলোক ভেসে উঠেছে।

গণক

হুঁ। এইবার স্বপ্ন দেখ্‌ছেন।

মন্ত্রী

আমি যাই রাজাকে খবর দি—রাজকুমার ঘুমিয়েছেন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।]

[গণক একদৃষ্টে কুমারের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। নহবত করুণ সুরে বাজ্‌ছিল।]

স্বপ্ন

দৃশ্যান্তর

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

গভীর বন, গভীর বন, আবার সেই গভীর বন। বনের এক পার্শ্বে অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমার মিহির। পাহাড় তলায় নৃত্যের তালে ভেসে এল স্বপ্নমায়া।

সমস্ত দৃশ্যটি একটি অপূর্ব্ব রঙে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। না রাত্রি—না দিন। আকাশের গায়ে জ্বলছে একটি মাত্র উজ্জ্বল তারা—সমস্ত রংএর মাথার মণি।

স্বপ্নমায়ার গান

আমি এসেছি—হাওয়ায় ভেসে,
অনেক দূরে—তোমার দেশে।
তোমার রূপে রঙীন করা আমার পাখা,
আমার চোখে তোমার ঘুমের কাজল মাখা,
তোমার হাসির কনকচাঁপা আমার কেশে।
আমি—তোমার কাছে এসেছি,
আজি—সপ্ত সিন্ধু বাজায় বীণা—শুনেছি আমি শুনেছি।
সেই সুরে আজ অঙ্গে আমার কাঁপন লাগে,
সেই সুরে আজ প্রাণে আমার ছন্দ জাগে,
তাই এসেছি মিলন-রাগে রঙীন বেশে।

মিহির

স্বপ্নমায়া !

স্বপ্নমায়া

মিহির !

মিহির

তুমি এসেছ ?

স্বপ্নমায়া

আজ অমাবস্যা, মিহির !—এ দুই পক্ষ পরে আজ অমাবস্যা।

মিহির

আমি কি ক'রে এই পাহাড় থেকে নামি, বল্‌তে পার ?

স্বপ্নমায়া

কেন নাম্‌ছ না ?

মিহির

আমায় বন্দী করেছে।

স্বপ্নমায়া

কে বন্দী করেছে তোমায় ?

মিহির

ঐ যে আকাশে নতুন তারা জ্বলছে—ওর নাম জান ?

স্বপ্নমায়া

না।

মিহির

ওর নাম স্বর্ণতারা—ওই আমায় বন্দী করেছে।

স্বপ্নমায়া

তুমি বন্ধন ছিন্ন করতে পার না ?

মিহির

না—এই দেখ্‌ছ না, আমার পা দুটো কি রকম ভারি, একেবারে তুলতে পারছি না।

স্বপ্নমায়া

আর তোমার প্রাণখানা—তাও বন্দী করেছে কি ?

মিহির

আমার প্রাণখানা এত ভারি হয়েছে স্বপ্নমায়া,—যে আমি তাকে ব'য়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।

স্বপ্নমায়া

আমি জানি উপায়,—বলব ?

মিহির

বলো,—বলো আমাকে, এ বন্ধন থেকে মুক্তি দাও !

স্বপ্নমায়া

তোমার পাহাড়ের ওপাশে সমুদ্র গর্জ্জন করছে না ?

মিহির

হ্যাঁ।

স্বপ্নমায়া

দেখ্‌তে পাচ্ছ ?

মিহির

হ্যাঁ।

স্বপ্নমায়া

আমি তোমার হাতে যে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম, ঐ সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দাও—এক্ষুণিই মুক্তি পাবে।

[মিহির নীরব।]

স্বপ্নমায়া

কি, চুপ্‌ করে রইলে যে ? স্বর্ণতারা চাইছে—ঐ আংটির তর্পণ চাইছে। ছুঁড়ে ফেলে দাও—এখুনিই তোমায় ও মুক্তি দেবে।

মিহির

তা সমুদ্রে ফেলে দেবো কেন ?—তোমার আংটি তোমাকেই ফিরিয়ে দিই না ?

[স্বপ্নমায়ার চোখ ছল-ছল করে উঠ্‌ল। উত্তরে একটা কথাও কইল না।]

মিহির

ও কি—তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন ?

স্বপ্নমায়া

আমায় ফিরিয়ে দিতে চাও ? কিন্তু ও আংটির ভার ত আর আমি বইতে পার্ব্ব না ; সে শক্তি কই আমার !

সমুদ্রের অতল জলে আংটি তলিয়ে দাও, তা হ'লেই মুক্তি পাবে।

মিহির

আচ্ছা, তাই দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

স্বপ্নমায়া

কি ?

মিহির

আজ আকাশে এই স্বর্ণতারা উঠেছে কেন ?—বলতে পার ?

স্বপ্নমায়া

আর সব তারা তলিয়ে গেছে ব'লে ; নইলে অন্ধকারে নিজেকে যে হারিয়ে ফেলবে !

মিহির

আমারই জন্য ?

স্বপ্নমায়া

হ্যাঁ,—তাই ত চাইছে তোমারই হাতের আংটি তর্পণ।

মিহির

আচ্ছা,—এই দিচ্ছি।

[স্বপ্নমায়া কোন কথা কইল না। মিহির হাতের আংটি সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ করলে। সমস্ত দৃশ্যটি সহসা অন্ধকারে তলিয়ে গেল।]

মিহির

একি !—স্বপ্নমায়া ! স্বপ্নমায়া ! কোথায় তুমি ? আমি যে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ কি হঠাৎ অন্ধ হ'য়ে গেল ? পা দুটি এত হাল্‌কা বোধ হ'চ্ছে—নিজেকে বইতে পারছি না। বুকের মধ্যে প্রাণখানা হাল্‌কা হ'য়ে শূন্য হ'য়ে গেল।

কি হ'ল—কি হ'ল—

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

[আবার সেই রাজকুমারের শয়ন-কক্ষ। শয্যার উপর রাজকুমার অঘোরে নিদ্রিত। গণক-পণ্ডিত তখনও শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল গণক-পণ্ডিত কুমারের হাত হ'তে আংটি খুলে নিলেন।]

[মন্ত্রীর প্রবেশ।]

গণক

আর ভয় নাই,—এইবার কুমার সম্পূর্ণ মুক্ত।

সুবুদ্ধি

রাজা সেই কথা জানবার জন্যই আমাকে আবার পাঠালেন।

গণক

মন্ত্রি মহাশয় ! এই নিন মায়া-অঙ্গুরীয়ক, এই মুহূর্ত্তে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করুন। যান্—একটুও বিলম্ব করবেন না।

তিন

সুরের রূপ

১ম দৃশ্য

দৃশ্য ও প্রকৃতি-পরিচয়

হেমন্ত গেল, শীত গেল, বসন্ত এল। আজ ফাগুন-পূর্ণিমা।

গভীর বন, গভীর বন, আবার সেই গভীর বন। বনের এক পার্শ্বে অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়-চূড়ায় বৃক্ষরাজি—বট, অশ্বত্থ, দেবদারু প্রভৃতি ছোট বড় বৃক্ষরাজির অনুপম সংমিশ্রণে তৈরী বনরাজের বনপ্রাসাদ —ফুলে ফলে লতায় পাতায় আপন রূপে আপনি মহিমান্বিত বনরাজের বনপ্রাসাদ।

গভীর বন,—গভীর বন,—গভীর বনে পাহাড়-চূড়ায় বন-রাজের বনপ্রাসাদ।

রূপে আজ রং লেগেছে ; ফাগুন-পূর্ণিমা।

পাহাড়-গায়ে লতায় লতায় পাতায় পাতায় চারিদিকেই ছড়ান আছে আধ-ঘুমন্ত বনবালাগণ,—নাই কেবল স্বপ্নমায়া। নাই কেবল স্বপ্নমায়া,—তাই রাজতোরণ-চূড়ার প্রস্ফুটিত রক্ত গোলাপের পাপ্‌ড়িগুলি ঝ'রে পড়েছে রাজ-সোপানের ধাপে ধাপে।

নীলনয়না

রক্তরেখা!

রক্তরেখা

কি ভাই নীলনয়না,—

শুক্লাননা

সবুজসখি!

সবুজসখী

কি ভাই, শুক্লাননা,—

সুপ্তিমালা

চন্দ্রকলা?

চন্দ্রকলা

কি ভাই, সুপ্তিমালা,—

সুপ্তিমালা

স্বপ্নমায়ার এ কি হলো?

সকলে

হায়! হায়! হায়!
আমাদের পরাণ ক্ষ'য়ে যায়,
আমাদের নয়ন ব'য়ে যায়,
স্বপ্নমায়ার এ কি হলো—
হায়! হায়! হায়!

রক্তরেখা

আমার বড় ভয় করছে ভাই!

নীলনয়না

কেন ভাই রক্তরেখা?

রক্তরেখা

আজ ছয় মাস পরে ফাগুন-পূর্ণিমায় রাজার ঘুম ভাঙবে। স্বপ্নমায়া যে আমাদের বনরাজের নয়নের মণি!

নীলনয়না

তাই ত ভাই, কি হবে?

শুধু কি তাই,—দেখ্‌ছিস্‌ না, ফাল্গুনের দক্ষিণে-হাওয়া আজ ঈশান কোণ দিয়ে বইছে!

শুক্লাননা

শুধু কি তাই,—দেখ্‌ছিস্‌ না, সে হাওয়া তীরের মত ছুটে আস্‌ছে, আমার বুকের অন্তঃস্থলে যেন গিয়ে বিঁধ্‌ছে।

চন্দ্রকলা

শুধু কি তাই,—ওই দেখ, সেই হাওয়ার আঘাতে রাজতোরণ-চূড়ার রক্ত গোলাপের পাপ্‌ড়িগুলি ঝ'রে পড়েছে রাজসোপানের ধাপে ধাপে।

সুপ্তিমালা

আমার ভাই মনে হচ্ছে, আমাদের এই মায়াকাননের মায়ার বন্ধন কোথায় যেন শিথিল হয়েছে।—তাই এই সব অমঙ্গলের আভাস।

রক্তরেখা

তাই ত ভাই,—কি হবে?

নীলনয়না

বনরাজের ঘুম ভাঙবার আর কত দেরী?

সবুজসখী

আর দেরী নেই। ওই দেখছিস না,—রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বদিকের বাতায়নের উপর থেকে ছায়া স'রে গেল; এখুনিই বাতায়ন মুক্ত হবে।

শুক্লাননা

আমাদের ত ঘুম-ভাঙান গান গাইতে হবে।

চন্দ্রকলা

তা ত হবেই,—বাতায়ন মুক্ত হ'লেই গান ধরব।

সুপ্তিমালা

রাজার এখন যত শীঘ্র ঘুম ভাঙে ততই ভাল; তাঁর শুভদৃষ্টিতে যদি বনের অশুভ কেটে যায়!

[এমন সময় সহসা পূর্ব্বদিকের বাতায়ন মুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বনবালাগণের গানের সুর এক অপূর্ব্ব পুলকে ভেসে উঠল—সেই গভীর বনের বাতাসে বাতাসে।]

গান

হে বনরাজ! তোমার ঘুমের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেল,—
নয়ন মেল, নয়ন মেল।

দখিন হাওয়ায় ফাগুন এসে
তোমার ঘরে উঠল ভেসে,
প্রণাম করি' তোমার পায়ে লুটিয়ে গেল ;
নয়ন মেল, নয়ন মেল ॥

হে বনরাজ !
আশীষ তোমার দাও ছড়িয়ে
গন্ধ তোমার দাও ভরিয়ে
দখিন হাওয়ায় ॥

রূপের ছবি রঙে মাখা
তোমার চোখে আছে ঢাকা,
বনে বনে রং ছড়াবার সময় এলো ;
নয়ন মেল, নয়ন মেল ॥

[ধীরে বনরাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার মুক্ত হ'ল। বনলতায়, বনফুলে মোহনসাজে সজ্জিত বনরাজের আবির্ভাবে, রাজসোপানের প্রত্যেক ধাপে ধাপে রক্তপদ্ম ফুটে উঠল—তাঁরই পদক্ষেপের প্রতীক্ষায়।

বনবালাগণ ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল—তাঁরই আশীর্ব্বাদের জন্য।

বনরাজ রাজসোপানের রক্ত গোলাপের পাপ্‌ড়িগুলির দিকে বারেক দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রেই খানিকক্ষণ একদৃষ্টে স্তম্ভিতের মত চেয়ে রইলেন—দূরে ঈশান কোণে।

মুখে তাঁর কথা নাই—চোখে তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতার শুষ্ক অভিব্যক্তি।]

রক্তরেখা

বনরাজ ! আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

নীলনয়না

বনরাজ ! আমাদের মায়াকাননের চারিদিকেই যে অমঙ্গলের আভাস।

সবুজসখী

বনরাজ ! আজ তোমার শুভ দৃষ্টিতেও কি বনের অশুভ কেটে যাবে না ?

শুক্লাননা

বনরাজ ! আজ ফাগুন-পূর্ণিমার উৎসব কি সত্যই ব্যর্থ হ'লো ?

চন্দ্রকলা

বনরাজ ! এখন আমরা কি করি—আদেশ কর।

সুপ্তিমালা

বনরাজ ! আমাদের একটি আর আমাদের নাই। এ কি হলো ?

সকলে

হায় ! হায় ! হায় !
আমাদের পরাণ ক্ষ'য়ে যায়,
আমাদের নয়ন ব'য়ে যায়,
স্বপ্নমায়ার একি হলো—
হায় ! হায় ! হায় !

বনরাজ

কে খুলে দিয়েছে ?—আমাদের মায়াকাননের ঈশান কোণের বন্ধ-দুয়ার কে খুলে দিয়েছে ?

[বনবালাগণ শঙ্কিতচোখে ঈশান কোণের দিকে চেয়ে রইল।]

বনরাজ

এই যে আমি বুঝতে পারছি, ঈশান কোণের মুক্তদুয়ার দিয়ে ভেসে আসছে বাহিরের তপ্ত নিশ্বাস।—আমাদের মায়াকাননের মায়ার বন্ধনগুলি সব জুড়িয়ে দিতে চায় !

বনবালাগণ

বনরাজ ! আমাদের কি হবে ?

বনরাজ

তোমরা যাও,—এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাসাদের মধ্যে যাও। সিংহদ্বার বন্ধ করে দাও ভিতর থেকে—এই মুহূর্ত্তে।

[বনবালাগণ মুহূর্ত্তে বনপ্রাসাদে অদৃশ্য হল। সিংহদ্বার বন্ধ হ'য়ে গেল।]

বনরাজ

স্বপ্নমায়া !

[দূরে স্বপ্নমায়া।]

গান

সদা ব'সে ভালবাসি,
দূরে বাজায় বাঁশী—
মগন গগন-মাঝে রে,
হায় রে !

বনে বনে বহে হাওয়া,
জানি তারি আসা যাওয়া,
পাতায় পাতায় বাজে রে,
হায় রে !

বনরাজ

এ কী গান—কী সুর!...স্বপ্নমায়া!

[দূরে স্বপ্নমায়া]

গান

নয়ন মুদিলে, প্রাণে
কয় কথা কানে কানে,
ধীরে দাঁড়ায় পাশে রে,
হায় রে—!

নয়ন মেলিলে, হায়!
নয়নে মিশায়ে যায়,
আঁখির তারায় ভাসে রে,
হায় রে!

বনরাজ

স্বপ্নমায়া!

[গান গাহিতে গাহিতে স্বপ্নমায়ার প্রবেশ।]

গান

লুকায়ে চোখের চাওয়া
প্রাণে কর আসা যাওয়া,
কেন এ নিঠুর খেলা রে,
হায় রে!

নয়নে ফাগুন লাগে
তোমার রূপের রাগে,
এসো—বুঝি গেল বেলা রে,
হায় রে!

[বিহ্বলদৃষ্টিতে বনরাজের দিকে চেয়ে রইল।]

বনরাজ

স্বপ্নমায়া!—আমাকে স্পর্শ কর। এইবার আমাকে চিন্‌তে পারছ?

স্বপ্নমায়া

বনরাজ! বনরাজ! আমার কি হবে?

বনরাজ

তুমি কি চাও?

স্বপ্নমায়া

জানি না! আমার কি হবে?

বনরাজ

তুমি মুক্তি চাও কি, বালা? মায়াকাননের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি চাও কি?—আমি তোমাকে সেই মুক্তি দিতে পারি।

স্বপ্নমায়া

আমি জানি না। বনরাজ! বনরাজ! আমাকে দয়া কর!

বনরাজ

তোমার এ বন্ধন তুমি সইতে পারছ না? কিন্তু এ বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার শক্তি ত আমার নাই স্বপ্নমায়া! বন্ধন যার, মুক্তি কেবল সেই দিতে পারে।

স্বপ্নমায়া

আমি কোথায় তাকে পাই?

বনরাজ

আমি পথ ব'লে দিতে পারি। ওই দেখ আমাদের মায়াকাননের ঈশান কোণের দুয়ার খোলা। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে—একটা সুরের রূপ নিয়ে, যাতে ভাষা থাক্‌বে না, পরিচয় থাক্‌বে না. কেবল সুর।

স্বপ্নমায়া

সুরের রূপ!—কি সে বনরাজ?

বনরাজ

আকাশে বাতাসে ভুবনের নানান ঋতুতে যে সুর চিরদিন বাজ্‌বে, তার একটি রূপ নিয়ে তোমাকে যেতে হবে স্বপ্নমায়া। মুক্তি পাবে—এক মাস পরে চৈত্র পূর্ণিমায়।

স্বপ্নমায়া

কি সে রূপ—বনরাজ?

বনরাজ

পূর্ণিমার বিহঙ্গ—পাপিয়া।

[স্বপ্নমায়া বনরাজকে প্রণাম করল। সস্নেহ আশীর্ব্বাদে বনরাজ হাত রাখলেন স্বপ্নমায়ার মস্তকে।]

২য় দৃশ্য

প্রকৃতি ও দৃশ্য-পরিচয়

এক মাস পরে চৈত্র পূর্ণিমা। বর্ণপুরের রাজ-উদ্যানের প্রত্যেক লতাটি ঘাসটি পূর্ণচন্দ্রের উদ্ভাসিত মায়ার বন্ধনে নীরব নিথর নিশ্চল—যেন এক নেশায় বিভোর!

রাজ-উদ্যানের একটি কদম্ব গাছের সন্নিকটে একটি প্রস্তর-বেদীর উপর ব'সে আছে রাজকুমার মিহির, ব'সে আছে রাজবধূ শুক্লা। দু'জনারই হাত দুটি দু'জনারই হাতে বাঁধা। বন্ধনরজ্জুর অভাব পূর্ণ করেছে—পূর্ণিমার আলোক-ধারা।

কদম্ব গাছের উচ্চতম ডালে ব'সে আছে একটি পাপিয়া। মুখে গান নাই,—চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাজদম্পতীর হস্ত-বন্ধনে।

মিহির

শুক্লা!

শুক্লা

কি রাজপুত্র!

মিহির

শুক্লা! আমি তোমায় ভালবাসি। এ কথাটি যে বার বার ব'লেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

(উর্দ্ধে কদম্ব ডালে পাপিয়া তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। মিহির, শুক্লা দুজনেই চম্‌কে উঠলেন। শুক্লা বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বারেক উর্দ্ধে চেয়ে দেখলেন কদম্ব ডালে।)

শুক্লা

যুবরাজ! আজ পূর্ণিমার রং তোমার প্রাণ আলো করেছে। তাই তোমার প্রাণের সব কথাই আজ বড্ড সজাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মিহির

কিন্তু শুক্লা! তুমি ত আমায় কিছু বলছ না?

শুক্লা

কি বলব?

মিহির

তুমি ত আমায় একবারও বলছ না যে তুমি আমায় ভালবাস।

শুক্লা

যুবরাজ! আমি যে রমণী। আমার সত্যিকারের প্রাণের কথা ত মুখে নয়—চোখে। আমার চোখের দিকে চেয়ে দেখ।

মিহির

কি সুন্দর দুটো চোখ তোমার। যেন কোন অনাদি অনন্তকালের স্মৃতি তোমার চোখের মধ্যে ভেসে বেড়ায়,—এত গভীর।

শুক্লা

আমার চোখে কি আজ পূর্ণিমার রং লাগেনি? ভেসে কি ওঠেনি আমার সমস্ত প্রাণখানা আমার চোখের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে—সজাগ হ'য়ে?

মিহির

হ্যাঁ উঠেছে।

শুক্লা

তবে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

মিহীর

হ্যাঁ পাচ্ছি। শুধু কি দেখ্‌তে পাচ্ছি—শুক্লা! তোমার প্রাণের কথাটি আজ যে কী রূপ নিয়ে তোমার নয়নের উপর ভেসে উঠেছে—তুমি জান না। আমি ধন্য হচ্ছি শুক্লা, তোমার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আমি ধন্য হচ্ছি।

শুক্লা

তুমি আমায় ভালবাস—তাই তোমার এত ভাল লাগ্‌ছে।

মিহির

শুধু কি আমি,—আমার মনে হয়, আজকের এই পূর্ণিমা তোমার ঐ চোখের রূপে সার্থক হলো।

শুক্লা

বটে! শুনে যে আমার গর্ব্ব হচ্ছে প্রাণে রাজপুত্র! এত ভালবাস তুমি আমায়!

মিহির

তোমার চোখ দুটোর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে এ যেন আমার কতকালের চেনা চোখ। ওর ভেতরে যেন আমার প্রাণের কত স্মৃতি লুকিয়ে রয়েছে।

শুক্লা

কিসের স্মৃতি?

মিহির

তা জানি না। মনে হচ্ছে কি যেন আমার প্রাণের হারিয়ে গেছে—যার স্মৃতি ধরা পড়েছে তোমার ঐ নয়ন-দুটোর মধ্যে। ও দুটো যেন আমার কতকালের চেনা!

শুক্লা

তা হ'লে আমায় দেখবার আগেই আমার নয়ন দুটোর সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল, কেমন?

মিহির

নিশ্চয় ছিল শুক্লা, নিশ্চয় ছিল। কেমন যেন মনে হ'চ্ছে কবে কোথায় কোন পথহারা বিজন দেশে উদ্ভাসিত চন্দ্রালোকে এক স্বপ্নরাজ্যে পরিচয় হয়েছিল আমার, তোমার ঐ নয়ন দুটোর সঙ্গে।

শুক্লা

কবে?—কোথায়?

মিহির

তা জানি না—আর ত কিছুই মনে নেই। আমি ভালবেসেছিলাম শুক্লা, একথা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, তোমাকে দেখবার অনেক আগেই আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

শুক্লা

আমাকে?—একথা শুনে যে প্রাণে পুলক ভ'রে উঠ্‌ছে রাজপুত্র!

মিহির

তোমাকে, তোমাকে, তোমাকেই শুক্লা,—আর কাউকে নয়। আমার প্রাণের ভালবাসার রূপ মূর্ত্তিমতী ক'রে তোলবার শক্তি যে শুধু তোমার মধ্যেই আমি পেয়েছি।

[আবার কদম্বডালে পাপিয়ার তারস্বরে আর্ত্তনাদ। এবার শুক্লা মিহির দুজনেই বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ল উর্দ্ধে কদম্বডালে।]

শুক্লা

কী কঠোর, কী ভীষণ কণ্ঠস্বর!

মিহির

পাপিয়া—না?

শুক্লা

কি জানি। কিন্তু ওর এই চীৎকার কি যেন এক অমঙ্গলের সৃষ্টি করছে।

মিহির

আমারও প্রাণ কেমন যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

শুক্লা

তাড়িয়ে দাও—রাজপুত্র! ওকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে।

[মিহির তাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাপিয়া নড়ে না।]

মিহির

কৈ—নড়েনা ত।

শুক্লা

কিন্তু আমি ওর ঐ চীৎকার সইতে পারছি না যুবরাজ!

মিহির

আর একবার চীৎকার করলেই আমি বাণে ওর কণ্ঠ বিদ্ধ করব। তুমি অস্থির হ'ও না শুক্লা।

(আবার আর্ত্তনাদ।)

শুক্লা

[হাতে মুখ ঢাকিয়া] ওঃ—

(উর্দ্ধে পাপিয়ার বক্ষ লক্ষ্য ক'রে মিহির বাণ নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ গগনভেদী চীৎকারে আর্ত্তনাদ ক'রে পাখীটি অস্থিরভাবে উড়ে গেল দূর গগনে।)

মিহির

[অস্থির ভাবে] এ কি সুর শুক্লা, এ কি সুর! আমার প্রাণের মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করছে—এ কি সুর—

শুক্লা

রাজপুত্র! রাজপুত্র! অত অস্থির হ'চ্ছ কেন? কৈ আর ত চীৎকার করছে না—থেমে গেছে। শেষ হ'য়ে গেছে।

মিহির

না, না, শেষ হয়নি। ঐ যে গগনে গগনে শোনা যাচ্ছে প্রতিধ্বনি—এ কি সুর! ঐ যে দূরে দূরে এখনও শোনা

যাচ্ছে—একি সুর! শুন্‌তে পাচ্ছ না শুক্লা! শুনতেপাচ্ছ না? বুকের মধ্যে বাজছে ও সুর। এ ত থামবে না—থামবার নয়।

শুক্লা

কৈ না। থেমে গেছে। তোমার বাণ যে ওর বুক বিদ্ধ করেছে। আমি দেখেছি। তাই ঐ শেষ আর্ত্তনাদ। এখন আর নাই।

মিহির

থেমে গেছে? কিন্তু শুক্লা এখনও ত বাজছে—আমার

শুক্লা

তাই ত, তোমার এ কি হলো রাজপুত্র!

মিহির

শুক্লা! চলো, ঘরে চলো।

শ্রীনীরদবরণ দাশগুপ্ত

অজন্তা

শ্রীমতী বিমলা দেবী

গিরি গুহাশ্রয় মাঝে কে তুমি বসিয়া একমনে
সৌন্দর্য্যের পূজারত, এঁকে গেলে তুলি আলিম্পনে
মৃত্যুঞ্জয় চিত্র তব। মহাকাল বিস্ময়ে নেহারে
তোমার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি; যুগ হ'তে চলে যুগান্তরে
তোমার সাধনা ধন আপনাতে আপনি বিভোর;
স্পর্শিতে পারে না মৃত্যু, নাহি পারে সীমার অন্তর
রোধিতে তাহার গতি; ধন্য করি ধরণীর ধূলি
হে বীর পূজারী যোগী, যুগে যুগে তব পূজাঞ্জলি
চলেছে বন্ধন হীন অনন্তের সিংহাসন পানে,
ত্রিলোক চঞ্চলি উঠে, তারি লাগি ব্যগ্র আমন্ত্রণে
বসন্ত বাহিয়া আনে স্বর্গ হ'তে পুষ্পিত লিপিকা—
বারে বারে মৃত্যু লঙ্ঘি, তোমার পূজার দীপ শিখা
অচঞ্চল চিরদীপ্ত। চঞ্চলিয়া উঠেনি শ্রবণ
নিন্দা প্রশংসারে দলি, উর্দ্ধলোকে পাতিয়া আসন
মানসের ধন তব দিয়ে গেলে ধরণীর করে
অন্তর আভায় রঞ্জি সাজাইয়া গেলে জননীরে;
ত্রিলোকের আভরণে। হে অজ্ঞাত মানববন্দন
তাই রাত্রিদিন চাহে স্তম্ভিত অপূর্ব্ব বিস্ময়
যোগেন্দ্রের যোগাসনে; নাহি জানে কোন শক্তিবলে
মানস কমল দলে, আপনারে ঢাকি অন্তরালে
নিমজ্জিয়া মিশাইয়া অস্তিত্বের ক'রে গেলে লয়
আপন সৃষ্টির মাঝে। হে সাধক, হে চিরনির্ভয়,
আপনার মাঝে তুমি আপনাকে ক'রেছ বিভোর,
জগতের কোলাহলে চিরদিন উদাসী অন্তর
চাহেনি ফিরিয়া কভু; প্রতি বর্ষে বসন্তের বাণী
তব আলিঙ্গন পরে ব'হে আনে নব জাগরণী
নূতন আনন্দ ধারা। আপনারে করিয়া গোপন
শাশ্বত নবীন আনে বর্ষে বর্ষে বিশ্বের কানন
মুঞ্জরিতে, কুসুমের সুরভিত ফাগুনের ডালা
তারি সম তব দান। এ ধরার মৃত্তিকার থালা
উজলিয়া চিহ্ন তার রেখে গেলে রেখায় রেখায়
চিরন্তন রূপ দিয়ে। কোনো কালে কোনো সীমানায়,
বাঁধনি তাদের নীড়, শৃঙ্খলিত করনি চরণ।
হে প্রবীণ, রেখে গেলে কালে কালে তব আমন্ত্রণ
নবীনের পথ চাহি। বিজয় পতাকা তব আজি
বিশ্বের আকাশ মাঝে অপরূপে উঠিয়াছে সাজি
বলিছে গভীর রবে,—"কল্পনার মুক্তি পথ দিয়া
অনন্ত যৌবন মোরা ধরণীতে এ'নু বাহিরিয়া;
মৃত্যুরে দলিয়া পদে অমৃতের পেয়েছি সন্ধান।"
পল্লবে পল্লবে বাজে তোমারি অপূর্ব্ব জয়গান
ভেদিয়া অসীম নভ, মহাকাল মানে পরাজয়
তোমার চরণতলে; হে অনন্ত, হে চিরবিস্ময়;
ধ্বংস-অস্ত্র ফেলি তার তব কণ্ঠে জয়মাল্যখানি
আপনি পরায়ে দিল; ক্ষয়হীন গ্লানিহীন বাণী
রেখা আলিম্পনে আঁকি, চলিয়াছে আপনার পথে;
ধ্বনিছে তাহারি জয় মৃত্যু ভেদি অসীম অমৃতে॥

যুগ-সন্ধি

-উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি সি-এস্

দ্বিতীয় স্তবক

রু দ্যু প্যাঁও সাধারণ পানাগার

১

বিপ্লবের নেতৃত্রয়

প্যারিসের রু দ্যু প্যাঁও নামক রাজপথের একটি সাধারণ পানাগার "কাফে" নামে অভিহিত হইত। এই "কাফে"র পশ্চাদ্ভাগে একটি কক্ষ ছিল, যাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অনেক সময় সেখানে কোনো কোনো প্রসিদ্ধ-নামা লোক গোপনে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতেন। এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর লোকের এতদূর প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, তাঁহারা সাধারণ্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠে একটা টেবিলের তিন দিকে তিনটি চেয়ারে তিনজন লোক উপবিষ্ট ছিল; চতুর্থ চেয়ারটি শূন্য। সন্ধ্যা—৮টা। রাজপথের আলো তখনো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই; কিন্তু কক্ষের ভিতর অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। ছাদ হইতে দোদুল্যমান একটি ল্যাম্পের আলোতে টেবিলটি আলোকিত।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যুবক—গম্ভীরাকৃতি, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে। তাহার ওষ্ঠ পাতলা, দৃষ্টি অপ্রসন্ন। গণ্ডদেশ মাঝে মাঝে স্নায়বিক কম্পনে স্পন্দিত হওয়াতে হাস্য করা তাহার পক্ষে কঠিন ছিল। যুবকের হাতে দস্তানা; গায়ে ফিকে নীল রঙের বোতাম-আঁটা কোট—সুমার্জ্জিত ও অকুঞ্চিত; পায়ে সাদা মোজা ও রূপার বকলস্‌ওয়ালা জুতা; পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ফুলা পায়জামা এবং গলায় উঁচু কলার।

অপর দুইজনের মধ্যে একজন দৈত্যের মতো দীর্ঘকায় এবং আর একজন বামন—খর্ব্বকায়। লম্বা লোকটি একটি লাল বনাতের কোট যেনতেন প্রকারে পরিয়াছে। তাহার গলদেশ অনাবৃত; বোতাম খুলিয়া যাওয়াতে কলার সার্টের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওয়েষ্টকোট্ বোতামহীন—হা করিয়া রহিয়াছে। পায়ে উঁচু বুট্‌জুতা। মস্তকের কেশগুলি সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া এবং অবিন্যস্ত। এমন কি তাহার পরচুলাটা কেশরের মতো দেখাইতেছিল। মুখে বসন্তের দাগ। ভ্রূযুগল প্রভুত্ব ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের পরিচায়ক। মুখের কোণে একটু টোল—সহৃদয়তাব্যঞ্জক। ওষ্ঠ পুরু, দন্ত বৃহৎ, হাতের মুঠা মজুরদের মতো, চক্ষু জ্বালাময়।

খাটো লোকটির গায়ের রং হল্‌দে। বসিলে তাহাকে কুব্জ বলিয়া বোধ হয়। মাথা পেছনের দিকে হেলানো; চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ; বদনমণ্ডল ব্রণ-চিহ্ন-বহুল। ললাটদেশ তাহার নাই বলিলেই হয়; মুখবিবর প্রকাণ্ড ও ভীষণ। মাথার খাড়া ও আঁটাল চুলের উপর একটা রুমাল বাঁধা। ফুলা পা-জামার পরিবর্ত্তে সে পাঁতলুন পরিয়াছিল। তাহার বিবর্ণ ওয়েষ্টকোট্টা বোধ হয় সাদা সাটিনের। ইহার উপর একটা ঢিলে জামা তাহার গায়ে ছিল। জামার ভাঁজের নীচে একটা কঠিন সোজা লাইন্ গুপ্ত ছুরিকার অস্তিত্ব সূচনা করিতেছিল।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি রবস্পীয়র্, দ্বিতীয় ড্যান্টন্, তৃতীয় ম্যারাট্।

প্রকোষ্ঠে আর কেহ ছিল না। ড্যান্টনের সম্মুখে একটি পানপাত্র ও ধূলিধূসরিত মদের বোতল; ম্যারাটের সম্মুখে এক পেয়ালা কাফি; রবস্পীয়রের সম্মুখে শুধু কাগজপত্র। কাগজপত্রের নিকটে একটা ভারী, গোলাকার, শিরতোলা সীসার দোয়াত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্কুলের ছাত্রদিগের ঐরূপ দোয়াতের সহিত একেবারে অপরিচয় ছিল না। দোয়াতের নিকট একটি কলম পড়িয়া রহিয়াছে।

কাগজের উপর একটা বড় পিতলের শীলমোহর—ব্যাষ্টিল-দুর্গের একটি অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

টেবিলের মধ্যস্থলে ফ্রান্সের একটা ম্যাপ্ বিস্তৃত রহিয়াছে। কক্ষ-দ্বারের বহির্ভাগে ম্যারাটের অনুচর লরেন্ট বুয়ে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। তাহার উপর আদেশ ছিল যতক্ষণ ম্যারাট্, ড্যান্টন্ ও রবস্পীয়র্ কথোপকথন করিবে ততক্ষণ সে দ্বার-রক্ষা করিবে এবং "কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি," "কমিউন্" কি "ইভিকের" মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।

পরামর্শ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছে। টেবিলের উপর ছড়ানো কাগজপত্র সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। এইমাত্র সেগুলি রবস্পীয়র্ কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল। তিনজনের মধ্যে রাগারাগির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। বাহির হইতে ইহাদের বাগ্র কথাবার্ত্তা দুই একটি শোনা যাইতেছিল। লরেন্ট বুয়ে চাবির ছিদ্রপথে কান পাতিয়া শুনিতেছিল। সে ম্যারাটের ভৃত্য বটে, কিন্তু "ইভিকে" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২

বজ্র-সংঘাত

ড্যান্টন্ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চেয়ারটা সজোরে পেছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"শোনো! এখন কেবল মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ-তন্ত্র বিপদগ্রস্ত আর আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্চে তাঁকে বাঁচানো। আমি সুধু এই জানি যে, শত্রুর হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করতে হবে, আর তার জন্যে সব উপায়ই অবলম্বনীয়,—সবই সঙ্গত,—সবই বৈধ,—সবই কর্ত্তব্য। বিপদের উপর বিপদ যখন এসে পুঞ্জীভূত হয় তখন তার সঙ্গে যুঝতে আবার উপায়ের বাচ-বিচার কি? আমার মন সিংহের মতো—আধা-আধি কাজে তা' সন্তুষ্ট নয়। আমার সঙ্কল্প দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন। নিয়তির শুচিবাই নাই। আমাদের নির্ম্মম হ'তে হবে এবং তা' হলেই আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারব। কোথায় তার পা পড়ল, হাতী তা' আগে দেখে নেয় কি? শত্রুকে আমাদের একেবারে পিষে ফেল্‌তে হবে—তা যেরূপেই হোক।"

রবস্পীয়র শান্তভাবে উত্তর দিল—"আহ্লাদের সহিত তা' করব। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শত্রু কোথায়?—তা' তো জানা চাই।"

ড্যা। শত্রু বাইরে, আমি তাদের সেখানে অনুসরণ করেছি।

র। শত্রু ভেতরে, আমি তাদের উপরে নজর রেখেছি।

ড্যা। আমি তাদের দেশ থেকে তাড়াব।

র। ঘরের শত্রুকে তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ড্যা। তা' হ'লে কি করবে?

র। আমি তাদের নিকেস করব।

ড্যা। বেশ আমি স্বীকৃত। কিন্তু বল্‌চি কি রবস্পীয়র, শত্রু বাইরে।

র। ড্যান্টন্, আমি বল্‌চি—শত্রু ভেতরে।

ড্যা। রবস্পীয়র, তারা সীমান্তে।

র। ড্যান্টন, তারা ভেণ্ডিতে।

এই সময়ে ম্যারাট বলিয়া উঠিল—"তোমরা মিছা-মিছি তর্ক করচ, শত্রু সর্ব্বত্র—আর তোমাদের পরিত্রাণ নেই।"

রবস্পীয়র তাহার দিকে তাকাইয়া শান্তভাবে বলিল—"রেখে দাও তোমাদের অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ ভাবের কথা,—আমি যা বল্‌চি, তা' হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্চি। এই আমার প্রমাণ।"

"পণ্ডিত!"—ম্যারাট্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

সম্মুখে টেবিলের উপর বিস্তৃত কাগজপত্রের উপর হাত রাখিয়া রবস্পীয়র বলিয়া উঠিল—

"মার্ণের প্রিউর্ যে ডেস্প্যাচ পাঠিয়েচেন এই মাত্র আমি তা' তোমাদের নিকট পাঠ করলাম। গেলেম্বার যে খবর দিয়েছে, তাও এই মাত্র তোমাদিগকে বলেচি। ড্যান্টন্, শোনো, বৈদেশিক সমর কিছুই নয়, অন্তর্বিপ্লবই সব। বৈদেশিক সমর গায়ে আঁচড় লাগার মতো, কিন্তু অন্তর্বিপ্লব হ'চ্চে পচা ঘা, যাতে ভেতরটা একেবারে খেয়ে ফেলে। কাগজপত্র দেখে আমি যা' বুঝতে পারচি, তা' এই—ভেণ্ডি এতকাল বিভিন্ন সর্দ্দারের অধীনে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন

ঐক্যবদ্ধ হচ্চে। এখন থেকে তার হবে, সুধু একজন কাপ্তেন—"

"কাপ্তেন না-দস্যু-সর্দ্দার!" ড্যান্‌টন্ অনুচ্চস্বরে বলিল।

নিজের কথার সূত্র অনুসরণ করিয়া রবস্‌পীয়র বলিল—

"এই নেতা হচ্চে সেই লোক যে ২রা জুন তারিখে পন্টস‍র্নের নিকট সমুদ্রকূলে অবতরণ করে। মনে রাখবে, এই ২রা জুন তারিখেই বেল্‌ভেডোস্ জেলার বিশ্বাসঘাতক জনগণ কর্ত্তৃক রমে এবং 'কোট-ডি-ওর'-এর প্রিউর ধৃত হয়—"

"এবং তারা কোরনের দুর্গে নীত হয়"—ড্যান্টন্ বলিল।

রবস্‌পীয়র বলিতে লাগিল—"ডেস্‌প্যাচগুলির সারমর্ম্ম আমি বলে' যাচ্চি। অতি ব্যাপক ভাবে আরণ্য যুদ্ধের বন্দোবস্ত হ'চ্চে। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ফ্রান্স-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'চ্চে। ভেণ্ডিয়ান্ ও ইংরাজ একযোগে—ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ পরস্পরের সহকারী। একটা চিঠি আমাদের হাতে পড়েছে, তা' তোমাদের দেখিয়েচি। তা'তে আছে—'২০ হাজার লালকোর্ত্তা (সৈন্য) ইহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে আরো লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা হইবে। কৃষক-বিদ্রোহের বন্দোবস্ত সব ঠিক হইলে, ইংরাজেরা আক্রমণ করবে।' এই দেখ তার প্ল্যান—ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।"

রবস্‌পীয় নক্সার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া বলিল—"ক্যান্‌কেল্ হইতে পেম্পল্ পর্য্যন্ত যে কোনো স্থানে ইংরাজেরা এসে নামতে পারে। লয়ের নদীর বাম তীর বিদ্রোহী ভেণ্ডিয়ান্ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং চল্লিশটি নর্ম্মান্ গ্রাম ইংরেজদিগকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত। তারা অচিরেই প্যারিসের নগর-তোরণে এসে উপস্থিত হবে। পনেরো দিনের মধ্যে তারা তিন লাখ সৈন্য তুলতে পারবে, এবং সমগ্র ব্রিটেনী ফ্রান্সের রাজার হস্তগত হ'বে।—"

"অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজার হস্তগত হ'বে!"—ড্যান্টন্ বলিল।

"না, ফ্রান্সের রাজার। আর ফ্রান্সের রাজা ব'লেই অবস্থাটি অধিকতর খারাপ। অল্পকাল মধ্যে বিদেশীকে দেশ-বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু দেশীয় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন আঠারো শ' বছরেও হ'য়ে উঠে না।"—রবস্‌পীয়র উত্তর দিল।

ড্যান্‌টন পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিল এবং টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া করতল-ন্যস্ত-মস্তকে ভাবনা-সাগরে মগ্ন হইল।

রবস্‌পীয়র বলিল—"এখন দেখতে পাচ্চ বিপদটা। ভিত্রে দিয়ে ইংরেজদিগের নিকট প্যারিসের পথ উন্মুক্ত।"

ড্যান্‌টন্ মাথা তুলিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করিয়া বলিল—"রবস্‌পীয়র, ভার্দ্দুনও তো প্রুশীয়ানদিগকে প্যারিসের রাস্তা খুলে' দিয়েছিল?"

"ভাল!"

"ভাল!—প্রুশীয়ান্‌দের আমরা যেমন ক'রে তাড়িয়েছিলাম, ইংরাজদেরও তেম্‌নি ক'রে তাড়াব।" এই বলিয়া ড্যান্‌টন্ আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

রবস্‌পীয়র আপনার ঠাণ্ডা হাত অপরের উষ্ণ মুষ্টির উপর রাখিয়া বলিল—"ড্যান্‌টন্, শাম্পেন্ প্রদেশ তখন প্রুশীয়ানদের পক্ষাবলম্বন করেনি; কিন্তু ব্রিটেনী এখন ইংরেজের পক্ষে। ভার্দ্দুন্ পুনরায় দখল করা—সে ছিল একটা বৈদেশিক যুদ্ধ; আর ভিত্রে পুনরায় দখল করা—এটা হবে অন্তর্বিপ্লব। গুরুতর প্রভেদ!" শেষ কথা কয়টি রবস্‌পীয়র অত্যন্ত মৃদু, গম্ভীর ও হতাশাব্যঞ্জক-স্বরে উচ্চারণ করিল। তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বলিল—"বসো ড্যান্‌টন্, ম্যাপটা হাত দিয়ে না রগ্‌ড়ে' এটার দিকে চেয়ে দেখ।"

কিন্তু ড্যান্‌টন তখন তাহার নিজের ভাবেই বিভোর। সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—

"এ তো নিতান্তই পাগলামি! বিপদ পূর্ব্বদিকে—অথচ চেয়ে থাক্‌ছ পশ্চিমদিকে। রবস্‌পীয়র, না হয় মান্‌লাম ইংলণ্ড সাগর থেকে মাথা তুলচে; কিন্তু দেখচ কি, পিরেনীজের গিরিশিখর হ'তে স্পেন্ আমাদের আক্রমণ করতে আস্‌চে; আল্‌পস্ পর্ব্বতের উপর দিয়ে ইটালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করচে; রাইন্ নদী অতিক্রম ক'রে জার্ম্মানীর রণ-বাহিনী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে? আর সকলের মূলে আছে—বৃহৎ রুশ-ঋক্ষ। রবস্‌পীয়র, আমাদের বিপদ হ'চ্ছে চক্রাকার, আর আমরা তার বেষ্টনীর মধ্যে। চক্রের বাইরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের ষড়যন্ত্র ও

বিচিত্রা
৫১৫

সমবায়; চক্রের ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মদ্রোহ। দু' চারজন ছাড়া আর সকলেই বিশ্বাসঘাতক। তার ফলে ফ্রান্সের অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে জার্ম্মান পতাকা প্রোথিত হচ্ছে। এরূপ ভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে দেখা যাবে—ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবটা জার্ম্মানীরই সুবিধার জন্য হ'য়েছিল। আমরা ফ্রান্সের রাজার জীবনহরণ করেছিলাম, প্রুশীয়ার রাজার উপকারার্থে।"

এই বলিয়া ড্যান্টন্ ভয়ঙ্কর ভাবে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহাতে ম্যারাটের ওষ্ঠ-প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—

"তোমাদের প্রত্যেকেরই দেখছি এক একটা বাতিক আছে। ড্যান্টন্, তোমার বাতিক হচ্ছে প্রুশীয়া; আর রবস্‌পীয়র, তোমার বাতিক হচ্ছে ভেণ্ডি। এখন আমার বল্‌বার পালা। শোনো, তোমরা আসল বিপদটা মোটেই ঠাহর করতে পার্‌ছ না। সেটা হচ্ছে এই সহরের কাফে (পানাগার) ও জুয়ার আড্ডাগুলি। 'কাফে চয়সিউল' জেকোবিন্ * সম্প্রদায়ভুক্ত, 'কাফে পাইটু' রাজপক্ষীয়; 'কাফে রেণ্ডেভো' ন্যাশন্যাল গার্ড সৈন্যদলকে আক্রমণ করে, 'কাফে পোর্ট সেণ্টমার্টিন' তা'দের হ'য়ে লড়াই করে; 'কাফে রেজেনস্' ব্রিসোর বিপক্ষে, আর 'কাফে কোর্য্যাজা' তার স্বপক্ষে; 'কাফে প্রোকোপ' ডিডিরোর অনুরক্ত, 'কাফে থিফটার ফ্রান্কয়' ভলটেয়ারের অনুরক্ত; 'কাফে মাসুরিতে' ময়দার কথা আলোচিত হয়, আর 'কাফে পেরনে' অর্থসমস্যার বোল্‌তা-ভীমরুলের বন্‌বন্ শোনা যায়। এই সব ব্যাপার হ'চ্ছে আসলে গুরুতর।"

ড্যান্টন্ আর হাসিতেছিল না। ম্যারাটের মুখে তখনো ঈষৎ হাস্যের আভাস। দৈত্যের হাসির চেয়ে বামনের হাসি অধিকতর ভীষণ।

ড্যান্টন্ খুঁৎ খুঁৎ করিতে করিতে বলিল—"নিজেই নিজেকে নাক সিঁটকাচ্ছ না কি, ম্যারাট?"

* জেকোবিন ক্লাব (Jacobin club) ফ্রান্সের প্রাচীনতম ক্লাব। ইহা প্রথমে ভার্সেলস্ নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে ১৭৮৯ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাদি হইত এবং তদ্দারা জনসাধারণ পরিচালিত হইত। 'জেকোবিন' নাম দ্বারা তদানীন্তন গরম দলকে বুঝাইত।

"তোমাকে আর চিন্‌তে বাকি নেই আমার, দেশবন্ধু ড্যান্টন্! আমি নিজেকে ঠাট্টা করচি, বটে? শোনো তবে, আমি কি কি করেচি। চেজোকে আমি অভিযুক্ত করি; পিটিয়ান্‌কে আমি অভিযুক্ত করি; কার্সেট্টকে আমি অভিযুক্ত করি; মরেটোন্‌কে আমি অভিযুক্ত করি; ভেলাজে, লিগোনিয়র, মেনু, বানভিল্, বাইরন, লিজন, চ্যাম্বন—এদের সববাইকে আমি অভিযুক্ত করি। আমার কি ভুল হয়েছিল? আমি বিশ্বাসঘাতকদের আঁচেই টের পাই এবং তাদের মতলব-সিদ্ধির পূর্ব্বেই ধরিয়ে দি। তুমি কিংবা অন্যেরা পরের দিন যা' বলবে সেটা আগের দিন সন্ধ্যে বেলায়ই বলা হ'চ্চে আমার স্বভাব। আরো শোনো, আমি এ যাবত কি কি করেচি। আমি বত্রিশটা বাক্সের শীলমোহর ভেঙেচি, এবং রোল্যাণ্ডের হস্তে গচ্ছিত হীরকের পুনরুদ্ধার করেছি; আহত সৈনিকদের অনুকূলে আমি এক প্রস্তাব উত্থাপন করি; মন্‌সের ব্যাপারে ডুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা আমি পূর্ব্বাহ্নেই বুঝতে পেরেছিলাম। মার্সেলেজের গোলযোগে রোল্যাণ্ড সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র আমি প্রকাশ ক'রে দি; প্যারিসিয়ানরা দেশের ভাল করেছে, এই ঘোষণা আমার গতিকেই হয়। এই জন্যেই লুভেট্ আমাকে বলে 'নাচের পুতুল'; এই জন্যই ফিনিষ্টার আমার বহিষ্কারপ্রার্থী; এই জন্যেই লণ্ডন নগরী আমার নির্ব্বাসন কামনা করে; আমিয়ানস্ চায় আমার মুখ বন্ধ করতে; কোবার্গের ইচ্ছা আমি ধৃত ও আবদ্ধ হই; এবং আমাকে পাগল সাব্যস্ত করবার জন্যে কন্‌ভেন্‌সনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

"আমার মতামতই যদি না জান্‌তে চাও, তবে এই মন্ত্রণার মধ্যে আমায় ডেকেছিল কেন? আমি কি আসবার জন্যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলুম?—কিছুমাত্র না। রবস্‌পীয়র কিংবা তোমাদের মতো 'পান্টা বিপ্লব প্রয়াসীদের' সহিত কথোপকথনে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নেই। আগেই আমার জানা উচিত ছিল যে, তোমরা আমাকে মোটেই বুঝতে পারবে না—তুমিও না, রবস্‌পীয়রও না। তোমরা কেউ রাজনীতিজ্ঞ নও। রাজনীতির বর্ণজ্ঞানও তোমাদের এখন পর্য্যন্ত হয় নি। আমি যা' বলতে চাই, তা' হচ্ছে এই—

তোমরা দু'জনেই ভ্রান্ত। বিপদ লণ্ডনে নয়—যা রবস্‌পীয়র মনে করচেন; বার্লিনেও নয়—যা' ড্যান্টন ভাবচেন; পরন্ত বিপদ হচ্ছে, প্যারিসে। বিপদ একতার অভাবে; বিপদ—তোমাদের দু'জন থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই যে যার নিজের দিকে টান্‌ছে; তা'তে বিপদ বিচার-বিমূঢ়তায়, অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সংঘাতে—"

বাধা দিয়া ড্যান্টন বলিল—"অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা! সেটা কার, তোমার নয় কি ?"

ম্যারাট্ থামিল না।—

"রবস্‌পীয়র, ড্যান্টন্, আমি বল্‌চি, বিপদ প্যারিসের এই অগণিত কাফে ও ক্লাবের মধ্যে। বিপদ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে, বিপদ কাগজের নোটে—লোকের নিকট যার মূল্য নেই। রু ডু টেম্পলে একখানা একশো ফ্রাঙ্ক মূল্যের নোট মাটিতে প'ড়ে যায়; তা' দেখে' অনেক পথিক বলে কি, 'কুড়িয়ে নেওয়ার মজুরীও ওতে পোষায় না!' তোমরা ব্যারন ট্রেঙ্ককে গ্রেফতার করেচ—তা যথেষ্ট নয়; আমি চাই এই বুড়ো ষড়যন্ত্রকারীর ঘাড় মট্‌কে ভাঙতে। তোমরা প্যারিসের দিকে কিছুতেই তাকাবে না; তোমরা বিপদ খুঁজচ দূরে, অথচ বিপদ তোমাদের অতি সন্নিকটে। রবস্‌পীয়র, তোমার যে এত গোয়েন্দা, তা'তে কি লাভ হ'চ্ছে? অস্বীকার করতে পারবে না, তোমার গোয়েন্দা রয়েচে,—কমিউনে পাজান, বৈপ্লবিক বিচারালয়ে কফিন্‌হাল্, জেনারেল সেফটি কমিটিতে ডেভিড, প্রাবিক-ওয়েল-বিয়িং-কমিটিতে কুথন। দেখচ, আমি সবই জানি। উত্তম, এখন আমার কাছ থেকে এইটুকু জেনে রাখ—বিপদ তোমাদের মাথার উপরে, বিপদ তোমাদের পায়ের নীচে। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র! রাস্তার লোকেরা খবরের কাগজ পড়ে, আর পরস্পর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত-বিনিময় করে। রুটির দোকানের সাম্‌নে লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ায়, আর বলাবলি করে, 'কতদিনে আবার শান্তি হবে?' শাসনপরিষদের মন্ত্রণা-গৃহে ব'সে, ব'সে তোমরা যতই কেন না মনে কর যে তোমরা একাকী, তোমাদের প্রত্যেকটি কথা কিন্তু লোকে জান্‌তে পারে। প্রমাণ চাও?—এই দিচ্ছি। রবস্‌পীয়র, কাল রাত্রিরে তুমি সেন্ট জাষ্টকে এই কথাগুলি বল্‌ছিলে, 'বারবারুজের পেট মোটা হচ্ছে;—সেটা কিন্তু তার পালানোর পক্ষে অন্তরায় হবে।' হ্যাঁ, বিপদ সর্ব্বত্র এবং বিশেষ ভাবে কেন্দ্র-মূলে। প্যারিসে যখন রাস্তায় রাস্তায় খালি পায়ে পাহারাওয়ালা ফিরচে, তখনই বিপ্লব-বিরোধী-দলের ষড়যন্ত্র চল্‌চে। যে সকল অভিজাতবর্গকে ৯ই মার্চ্চ গ্রেফতার করা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই তা'দের মুক্তি দেওয়া হয়েচে; কামানের গুলিতে সীমান্তেই যাদের উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল, তারাই এখন প্যারিসের রাস্তায় আমাদের গায় কাদা ছিটিয়ে বেড়াচ্চে। চার পাউণ্ড ওজনের একটি পাঁউরুটির দাম হ'চ্ছে ৩ ফ্রাঙ্ক ১২ সু; থিয়েটারে অশ্লীল অভিনয় হ'চ্ছে; আর রবস্‌পীয়র অচিরেই ড্যান্টনকে গিলোটিনে চড়াবে।"

"থামো, থামো, যথেষ্ট হয়েছে!"—ড্যান্টন বলিল।

রবস্‌পীয়র মনোযোগের সহিত মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সহসা ম্যারাট্ বলিয়া উঠিল—"একজন ডিক্টেটরের * এখন প্রয়োজন। রবস্‌পীয়র, তুমি জান, আমি একজন ডিক্টেটর চাই।"

রবস্‌পীয়র মাথা তুলিল—"জানি, ম্যারাট্, তুমি কিংবা আমি।"

"আমি কিংবা তুমি।"—ম্যারাট্ বলিল।

ড্যান্টন দন্ত চাপিয়া বলিল—"ডিক্টেটর! হুঁ,—দেখ না একবার চেষ্টা ক'রে!"

ম্যারাট্ ড্যান্টনের কুঞ্চিত ভ্রূ লক্ষ্য করিল। বলিল—"শোনো, আর একবার শেষ চেষ্টা করা যাক্। দেখা যাক্, আমাদের কোনো বিষয়ে মতের ঐক্য আছে কি না। ৩১শে মে তারিখে গিরোণ্ডিদের সম্বন্ধে আমরা একমত হয়েছিলেম না কি? এখন কিন্তু বিষয়টা অধিক গুরুতর। তুমি যা' বল্‌ছ, তা'তে কতক সত্য আছে; কিন্তু বাস্তবিক সত্য, সমগ্র সত্য, খাঁটি সত্য আছে আমি যা' বল্‌ছি, তা'তে। দক্ষিণে ফেডারেলিজম্; উত্তরে রাজতন্ত্র; প্যারিসে কন্‌ভেন্‌সন্ ও কমিউনের দ্বন্দ্ব; সীমান্তে কুষ্টিনের প্রত্যাবর্ত্তন

* ডিক্টেটর—দেশের সঙ্কটকালে অসীম ক্ষমতা সহ যে শাসনকর্ত্তা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়।

এবং ডুমুরিয়েজের বিশ্বাসঘাতকতা। এ সবের মানে কি? অনৈক্য। অথচ এখন আমাদের চাই ঐক্য। বাঁচবার উপায় আছে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র সে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিচালন-ভার প্যারিসকে গ্রহণ কর্ত্তে হবে। এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হ'লে, চাই কি, আগামী কল্যই ভেণ্ডিয়ান্‌রা অর্লিয়েঁতে এসে উপস্থিত হবে এবং প্রুসিয়ান্‌রা প্যারিসের ফটক আগলে বস্‌বে। ড্যাণ্টন্, তুমি যা বল্‌ছ, স্বীকার করছি; রবস্‌পীয়র্, তুমি যা বল্‌ছ, তাও মেনে নিচ্ছি। তথাস্তু!—কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে এই যে, এখন ডিক্টেটরসিপ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই। আমরাই এই বিপ্লবের প্রতিনিধি; চল আমরা এই 'ডিক্টেটরসিপ' হস্তগত করি। আমরা এই বিপ্লবদানবের তিন মাথা। তিন মাথার একটি বাক্যবাগীশ—সে তুমি রবস্‌পীয়র; এক মাথা গর্জ্জন করে—সে তুমি ড্যাণ্টন্।"

"আর তৃতীয়টি কামড়ায়—সেটি হ'চ্চ তুমি ম্যারাট!"—ড্যাণ্টন্ বলিল।

রবস্‌পীয়র বলিল, "কামড়ায় তিনটিই।"

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তারপর পুনরায় ক্রুদ্ধ কথোপকথন আরম্ভ হইল।

"শোনো ম্যারাট,—দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরকে জানা চাই। তোমার সহিত যোগ দেওয়ার আগে আমি জান্‌তে চাই, সেণ্ট জাষ্টকে আমি কাল কি বলেছিলাম তা' তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

"রবস্‌পীয়র, সে আমার কথা, তোমার তা'তে কি?"

"ম্যারাট্!"

"আমার কর্ত্তব্য হ'চ্চে নিজকে সর্ব্ববিষয়ে ওয়াকিফ্‌হাল রাখা।"

"ম্যারাট!"

"সর্ব্বপ্রকার খবর রাখা আমার স্বভাব।"

"ম্যারাট্!"

"রবস্‌পীয়র্, তুমি জিজ্ঞেস্ করচ সেণ্ট জাষ্টকে তুমি যা' বলেছিলে সেটা আমি কেমন ক'রে জান্‌লাম? কেমন ক'রে আমি জানি, ড্যাণ্টন লেক্রয়কে কি বলে? কেমন ক'রে আমি জানি, হোটেল লা ব্রিক এ কি ঘটে? কেমন ক'রে আমি জানি থিলেসের বাড়ীটার ব্যাপার—যে বাড়ীতে সাইয়ে এবং ভার্জ্জিনড যেত, এবং এখন যেখানে আর একজন সপ্তাহে একদিন ক'রে যায়?" 'আর একজন' কথাটা বলিবার সময় ম্যারাট্ ড্যাণ্টনের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

ড্যাণ্টন চেঁচাইয়া উঠিল—"আমার যদি এক কড়ারও ক্ষমতা থাক্‌ত, তা হ'লে এর ফল বড়ই ভয়ানক হ'য়ে দাঁড়াত।"

ম্যারাট বলিতে লাগিল—"রবস্‌পীয়র্, তোমাকে যা' বল্‌চি, তা বেশ বুঝেসুঝেই বল্‌চি। জানো তো, আমার অজ্ঞাত কিছু নেই। টেম্পল্ টাওয়ারের কারাকক্ষে তা'রা যখন ষোড়শ লুইকে খাইয়ে দাইয়ে বেশ নাদুস্‌নুদুস্ ক'রে তুল্‌ছিল তখন সেখানে কি হচ্ছিল, তা' আমি জান্‌তাম। এমনই খাওয়া খাইয়েছিল যে, সেই বাঘ, বাঘিনী আর তা'দের বাচ্চাগুলি * এক সেপ্টেম্বর মাসেই ৮৬ ঝুড়ি পিচফল সাবাড় ক'রে দিয়েছিল; অথচ এদিকে তখন সাধারণ লোকেরা অনশনে দিন কাটাচ্ছিল। রু দ্য লা হার্পে রাস্তার পশ্চাদ্ভাগে একটা বাড়ীতে রোল্যাণ্ড যে লুকিয়েছিল, আমি তা' জান্‌তাম। ১৪ই জুলাইর জন্য ৬০০ বল্লম যে ডিউক অব অর্লিয়েঁর কর্ম্মকারের কারখানায় তৈরী হয়েছিল, আমি তা' জান্‌তাম না কি? সিলারির মিষ্ট্রেসের বাড়ীতে কি হয়, তাও আমি জানি। ২৭শে তারিখ সালাদিন সেখানে নিমন্ত্রণ খেয়েছিল কা'র সঙ্গে, রবস্‌পীয়র?—তোমার বন্ধু ল্যাসোসে'র সঙ্গে।"

"থাম্‌খা কথা; লাসোর্স্ আমার বন্ধু নয়।"—রবস্‌পীয়র বলিল। চিন্তিতভাবে আরো বলিল—"ইতিমধ্যে লণ্ডনে ১৮টা কারখানায় কৃত্রিম নোট তৈরী হ'চ্চে।"

ম্যারাট বলিতে লাগিল। তাহার স্বর তখনো শান্ত, তবে ঈষৎ কম্পিত—ক্রোধের লক্ষণ। "আমি সবই জানি, সব খবরই রাখি। রবস্‌পীয়র, আমি হচ্চি 'জনসাধারণের দূরদর্শী তৃতীয় নেত্র। আমি আমার গুহার গোপন-তল হ'তে সবই লক্ষ্য রাখি। আমি দেখি, আমি জানি,

* ষোড়শ লুই, তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ।

আমি শুনি। তোমরা অল্পে সন্তুষ্ট। তোমরা নিজে নিজের প্রশংসা নিয়েই ব্যস্ত। তোমরা মাথা উঁচু ক'রে চল। রবস্‌পীয়র্ মনে করেন, তিনি যে একেবারে কন্‌ভেন্‌সনের হাল-ফ্যাসানে অলিভ রঙের ফ্রক্‌কোট্ আর আশমানি রঙের ড্রেস্‌কোট পরেন, ইতিহাস তা জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত; তাঁ'র কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে তিনি নিজেরি ছবি টাঙিয়ে রাখেন।"

বাধা দিয়া রবস্‌পীয়র বলিল—"আর ম্যারাট, তোমার ছবি ত নর্দ্দামায় নর্দ্দামায়।" তাহার কণ্ঠস্বর ম্যারাটের চেয়েও গম্ভীর।

এইরূপ ভাবে কথোপকথন চলিল। তাহাদের কণ্ঠস্বর যতই ধীর-গম্ভীর হইতে লাগিল অন্তর্গূঢ় উত্তেজনার রুদ্ধ বাষ্প ততই ঘনীভূত হইতেছে বোঝা গেল। ক্রুদ্ধ বাক্-বিতণ্ডায় একটা বিদ্রূপের আভাস।

"রবস্‌পীয়র, যারা রাজসিংহাসনের পতন কামনা করে, তুমি তা'দের 'মানবজাতির ডন্ কুইক্সো' ব'লে উপহাস করেছিলে।"

"আর তুমি ম্যারাট, ৪ঠা আগষ্ট তারিখের পরে 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকার ৫৫৯তম সংখ্যায় (দেখচ, সংখ্যাটা আমার মনে আছে; ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।) তুমি লিখেছিলে, অভিজাতবর্গের খেতাব তাহাদিগকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা উচিত। তুমি বলেছিলে—যে ডিউক্, সে সর্ব্বদাই ডিউক।"

"রবস্‌পীয়র, ৭ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে তুমি ভার্য়ার্ডের বিরুদ্ধে সেই মাদাম রোল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেছিলে।"

"আমার ভাইও তো তোমার পক্ষ সমর্থন করেছিল ম্যারাট্, যখন জেকোবিন † ক্লাবে তোমাকে তারা আক্রমণ করে। তা'তে কি প্রমাণ হয়?—কিছুই না।"

"রবস্‌পীয়র, টুইলারিসের মন্ত্রণা-সভায় তুমি যে গ্যারাটকে বলেছিলে—'বিপ্লবে বিরক্তি ধ'রে গেছে', সে কথা আমার জানা আছে।"

"ম্যারাট, এইখানে, এই পানাগারে ২৯শে অক্টোবর তারিখে তুমি বারবারুক্সকে আলিঙ্গন করেছিলে।"

"রবস্‌পীয়র, তুমি বুজোকে বলেছিলে—"সাধারণ তন্ত্র! সে আবার কি?"

"ম্যারাট, এই পানাগারেই তুমি তিনজন সন্দিগ্ধ লোককে নিয়ে মন্ত্রণাও করেছিলে।"

"রবস্‌পীয়র, বাজার থেকে যাওয়ার সময় সর্ব্বদাই একটা মোটা লোক লাঠি হাতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

"আর ম্যারাট, ১০ই আগষ্টের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় ঘোড়দৌড়ের জকির ছদ্মবেশে মার্সেলেজে পালিয়ে যেতে তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে তুমি বুজোকে অনুরোধ করেছিলে।"

"সেপ্টেম্বরের বিচারের সময় তো তুমি আত্মগোপন করেছিলে, রবস্‌পীয়র্!"

"আর ম্যারাট্, তুমি তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলে।"

"রবস্‌পীয়র, তুমি তখন লালটুপী মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলে।"

"হাঁ; আর একজন বিশ্বাসঘাতক গিয়ে সেইটে কুড়িয়ে তুলেছিল। ডুমুরিয়েজের যা ভূষণ, রবস্‌পীয়রের তা' কলঙ্ক।"

"রবস্‌পীয়র, শেটোভিউজের সৈন্যদল মার্চ্চ ক'রে যাওয়ার সময় তুমি ষোড়শ লুইর মাথা ঢেকে দিতে আপত্তি করেছিলে।"

"আমি তার চেয়ে ভাল কাজ করেছিলাম; আমি সেই মাথাই কেটে ফেলি।"

ড্যাণ্টন মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে থামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাতে আরও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল।

ড্যাণ্টন বলিল—"রবস্‌পীয়র্, ম্যারাট্, তোমরা শান্ত হও।"

নিজের নামটা রবস্‌পীয়রের নামের পরে উক্ত হওয়াতে ম্যারাট্ ভয়ঙ্কর চটিয়া উঠিয়া বলিল—'ড্যাণ্টন্ আবার কথা বল্‌তে আস্‌চেন কি সম্বন্ধে?"

* ৪ঠা আগষ্ট—১৭৮৯ খৃঃ—"মানবের স্বাভাবিক স্বত্ব" সম্বন্ধীয় ঘোষণা এই তারিখেই এসেম্‌ব্লিতে বিধিবদ্ধ হয় এবং অভিজাত ও যাজক-সম্প্রদায় আপনাদের উপাধি ও বিশেষ অধিকারগুলি স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করে।

† ৫১৫ পৃঃ ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

‡ সার্ভেন্টিসের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক ডন কুইক্‌সোর মতো অসম্ভব আদর্শে অনুপ্রাণিত—হাস্যাস্পদ।

ড্যাণ্টন্ লাফাইয়া উঠিল—"কি সম্বন্ধে কথা বল্‌চি? শোনো। ভ্রাতৃহত্যা আমাদের চল্‌বে না। জনসাধারণের কার্য্যে ব্যাপৃত দু'জনের মধ্যে বিরোধ হ'তে পারবে না। বৈদেশিক যুদ্ধ রয়েচে তাই যথেষ্ট; তার উপর গৃহবিবাদ হ'লে আর উপায় থাকবে না। এই রাষ্ট্রবিপ্লব আমার হাতের তৈরী, আমি একে নষ্ট হ'তে দোবোই না। এখন বুঝলে, আমি কেন হস্তক্ষেপ করচি?"

ম্যারাট্ না চেঁচাইয়া বলিল—"তুমি বরং ততক্ষণ তোমার হিসাবের নিকাস তৈরী কর।"

"আমার হিসাব?"—ড্যাণ্টন্ গর্জ্জিয়া উঠিল। "যাও, হিসাব চাও গে' আর্গোনের গিরিবর্ত্মে, শত্রুহস্ত-মুক্ত শাম্পেনে, বিজিত বেল্‌জিয়মে—যেখানে চার চার বার আমি শত্রুর গুলির সম্মুখে বুক পেতে দিয়েছিলেম। যাও, হিসাব চাও গে বৈপ্লবিক আদালতে, ২১শে জানুয়ারীর বধমঞ্চে, ভূলুণ্ঠিত সিংহাসনের নিকটে, গিলোটিনের নিকটে সেই বিধবা—"

ম্যারাট্ বাধা দিয়া বলিল—"গিলোটিন হ'চ্ছে বন্ধ্যা, মর্দ্দামাগী—সে ধ্বংস করে, প্রসব করে না!"

"তাই নাকি? ঠিক জান?" ড্যাণ্টন্ শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে জবাব দিল। "আমি ওকে সন্তানবতী করব।"

"দেখা যাবে।" এই বলিয়া ম্যারাট্ একটু ক্রূর হাসি হাসিল।

ড্যাণ্টন্ তাহা দেখিতে পাইল। বলিল—"ম্যারাট্, তোমার সবই গোপনে গোপনে, আমার সবই প্রকাশ্যে। আমি যা' করি মুক্ত বাতাসে, এবং দিনের আলোতে। সরীসৃপ-জীবন আমি ঘৃণা করি। তুমি থাকো গর্ত্তের মধ্যে, আর আমি বাস করি রাজপথে। সংসারের লোকের সঙ্গে তোমার কোনো সংস্রব নেই,—আমার সাথে যে-কোনো পথিক আলাপ-পরিচয় করতে পারে।"

"চমৎকার লোক! আমি যেখানে থাকি তোমার সেখানে উঠতে সাহস হবে কি?" ম্যারাট বলিল। তারপর তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। রুক্ষকণ্ঠে পুনরায় বলিল—"ড্যাণ্টন্, রাজার নামে মণ্টমরিণ তোমাকে যে তেত্রিশ হাজার ক্রাউন্ দিয়েছিল—তোমার ওকালতী কার্য্যের খেসারতের অছিলায়—সে টাকাটার হিসাব দাও দেখি।"

উদ্ধতভাবে ড্যাণ্টন্ জবাব দিল—"১৪ই জুলাই আমি তার হিসাব দিয়েছিলুম।"

"আর রাজভাণ্ডারের হীরা-জহরতের হিসাব?"

"৬ই অক্টোবর আমি কি করেছিলুম, স্মরণ কর।"

"আর বেলজিয়মে তোমারই বেনামদার ল্যাক্রয়ের চুরী?"

"জানো, আমি ২০শে জুনের লোক?"

"আর মণ্ট্যান্‌সিয়রকে ধার দেওয়া টাকাটা?"

"আমিই জনসাধারণকে ভ্যারেনিস্ হ'তে ফিরে আস্‌তে প্ররোচিত করেছিলুম।"

"আর সেই অপেরা হাউস—যা তৈরীর জন্যে তুমি টাকা যুগিয়েছিলে?"

"প্যারিসের জনগণকে আমিই মন্ত্র দিয়ে তৈরী করিয়েছিলুম, সেটা ভুলো না।"

"বলি, বিচার-বিভাগের গুপ্ত অর্থ, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তা'র কি হ'ল?"

"মনে রেখো, '১০ই আগষ্ট' আমিই ঘটিয়েছিলুম।"

"এ্যাসেম্ব্লির গুপ্ত কার্য্যের জন্যে ২০ লক্ষ—যার চতুর্থাংশ তুমি নিয়েছিলে—সে টাকা গেল কোথায়?"

"আমি শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ ক'রে রাজগণের সম্মিলন বারণ করেছিলেম।"

"ঘৃণ্য আত্মবিক্রয়ী!"

ম্যারাটের এই মন্তব্যে সটান খাড়া হইয়া ড্যাণ্টন্ গর্জ্জিয়া উঠিল—"হাঁ, আমি আত্মবিক্রয়ী। কিন্তু নিজেকে বিক্রয় ক'রে আমি জগৎকে রক্ষা করেছিলেম।"

রবস্‌পীয়র্ এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া নিজের নখ কামড়াইতেছিল। সে হো হো করিয়া হাসিতেও পারিতেছিল না, কিংবা বিদ্রূপের চোরা হাসিতেও যোগ দিতে পারিতেছিল না। দামিনী-ঝলকবৎ ড্যাণ্টনের অট্টহাস্য, কিংবা তীরের খোঁচার মতো ম্যারাটের তীক্ষ্ণ ক্রূর হাসি, কোনটাই রবস্‌পীয়রের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

ড্যান্টন্ বলিতে লাগিল—"আমি মহাসমুদ্রের মতো,—আমার জোয়ার-ভাটা আছে। ভাটার সময় আমার পঙ্ক-কর্দ্দম দেখা যেতে পারে, কিন্তু জোয়ারের সময় দেখ্‌বে আমার তরঙ্গরাশি।"

ম্যারাট বলিল—"তুমি ফেনাও বড্ড বেশী।"

"সে আমার ঝড়"—ড্যান্টন্ উত্তর করিল।

ড্যান্টনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যারাটও দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। এইবার সে বোমার মতোই ফাটিয়া পড়িল—সর্প ড্রাগনে পরিণত হইল।

"হু," সে বলিয়া উঠিল—"রবস্‌পীয়র, ড্যান্টন্, তোমরা কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করবে না। বেশ, আমি ব'লে রাখ্‌চি, তোমাদের আর কোনো আশা নেই। তোমাদের যা' পলিসি, তা'তে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের আর বেরুবার পথ নেই। তোমরা চারদিকের দোর এঁটে বসেছ, এখন খোলা আছে সুধু কবরের পথ।"

"সেই তো আমাদের বাহাদুরী!"—ড্যান্টন্ জবাব দিল।

ম্যারাট দ্রুত বলিয়া চলিল—"সাবধান, ড্যান্টন্! ভার্জ্জিনদেরও মুখ বড়, ওষ্ঠ পুরু, ও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ছিল; মিরাবো এবং পেথার মতো তার মুখেও বসন্তের দাগ ছিল। কিন্তু তাতে ৩১শে মে'র কোন বাধা হয়নি। হুঁ, তুমি কাঁধ নাড়্‌ছ! মনে রেখো, কখনো কখনো একটি কাঁধ নাড়ার গতিকেই মাথা মাটিতে লুটায়। ড্যান্টন্, তোমাকে আমি ব'লে রাখচি, ঐ উচ্চকণ্ঠ, ঢিলে গলবন্ধ, উঁচু বুট, সান্ধ্যভোজন, বড় পকেট—এই সবই লুইসেটের সহিত সংস্পৃষ্ট।"

'লুইসেট' ম্যারাটের দেওয়া গিলোটিনের আদরের নাম।

ম্যারাট বলিতে লাগিল—"আর তোমাকে বল্‌চি রবস্‌পীয়র, তুমি একজন মডারেট কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। যতই পাউডার মাখো, যতই কেশবিন্যাস কর, আর যতই ফর্সা কাপড় প'রে বাবুগিরি কর, তোমাকেও সেই বধ্যভূমিতে যেতে হবে! ব্রান্‌জউইকের ঘোষণাপত্র পড়েছ কি? রাজহন্তা ড্যামিয়েনের চেয়ে তোমাকে আর তারা কম করবে না। তুমি সৌন্দর্য্যের জাঁক কর?—কিন্তু চার ঘোড়ার ল্যাজে বেঁধে' তোমাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে।"

দন্ত চাপিয়া রবস্‌পীয়র্ বলিল—"করলেনজ-এর বুলি কপচাচ্ছ?"

"আমি কারো বুলি কপচাইনে, রবস্‌পীয়র! আমি হ'চ্ছি সকলের মর্ম্মবাণী। আর তুমি ড্যান্টন্, তুমিও এখনো ছেলেমানুষ। কত বয়স তোমার? মোটেতো ত্রিশ! আর আমি আমি সেই মান্ধাতার আমল থেকে আছি ভুষণ্ডী। চিরনিপীড়িতের প্রতিরূপ আমি—জানো আমার বয়স ছ'হাজার বছর!"

ড্যান্টন্ ব্যঙ্গপূর্ণস্বরে বলিল—"তা' সত্য। ছ' হাজার বছর ধ'রে পার্ব্বত্য ভেকের মতো কেইন্ বিদ্বেষবিষে পরিপুষ্ট হচ্ছিল। পাহাড় ভেঙেছে, আর কেইন্ বেরিয়ে এসে মানুষের মধ্যে ঢুকেছে। কেইনের নাম এখন ম্যারাট।"*

"ড্যান্টন্!"—ম্যারাটের দৃষ্টি পাণ্ডুর,—বিবর্ণ আলোকে উদ্দীপ্ত।"

"কি বলতে চাও?"—ড্যান্টন্ জিজ্ঞাসা করিল।

এইরূপে তিনজন ভয়ঙ্কর লোকের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল—তিনটি পরস্পর বিরোধী বজ্রের সংঘাত।

৩

নিগূঢ় হৃদ্‌স্পন্দন

কথোপকথনের একটু বিরাম হইল। এই শক্তিমান পুরুষত্রয় কিছুক্ষণের জন্য নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিল।

সিংহও সহস্রশীর্ষ সর্প দর্শনে ভীত হয়। রবস্‌পীয়রের বদনমণ্ডল অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল। ড্যান্টনের মুখ লাল। দুই জনেই শিহরিয়া উঠিল।

ম্যারাটের চোখে যে বন্যপশুর হিংস্রদৃষ্টির বিজলী খেলিতেছিল তাহা এখন আর নাই। দুর্দ্ধর্ষ সঙ্গীগণের ভীতিস্থল এই লোকটি আবার দাম্ভিক শান্তভাব ধারণ করিল।

* বাইবেলে উক্ত আছে আদমের জ্যেষ্ঠপুত্র কেইন্ তাহার দ্বিতীয় পুত্র আবেলের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে এবং তদ্ধেতু ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হয়।

ড্যাণ্টন্ মনে মনে বুঝিতে পারিল যে, তাহার পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহা স্বীকার করিতে পারে না। সে বলিল—"ম্যারাট ডিক্টেটরসিপ এবং একতার সম্বন্ধে খুব জোর-গলায় বল্‌চে বটে, কিন্তু তা'র ক্ষমতা আছে সুধু টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাঙবার।"

রবস্‌পীয়র তাহার পাতলা ঠোঁটদুটি ফাঁক করিয়া বলিল—"আমার কথা যদি বলি, তো আমার মত হ'চ্চে এ্যানাকার্সিস্ ক্লুট্‌সের যা' মত—রোল্যাণ্ডও নয়, ম্যারাটও নয়।"

ম্যারাট উত্তর দিল—"আর আমি বল্‌চি, ড্যাণ্টন ও নয়, রবস্‌পীয়রও নয়।" দুইজনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সে আরো বলিল—"ড্যাণ্টন্, তোমাকে একটা সুপরামর্শ দিচ্চি। তুমি এখন প্রেমে পড়েচ, আবার বিয়ের কথা ভাবচ; যদি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতে চাও তবে রাজনৈতিক হাঙ্গামাতে আর হস্তক্ষেপ ক'রো না।"

তারপর দোরের দিকে এক-পা পিছু হটিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া সে তাহাদের উভয়কে শাসানোর ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া বলিল—"বিদায়, ভদ্রমহোদয়গণ!"

রবস্‌পীয়র এবং ড্যাণ্টন্ কাঁপিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে কক্ষতল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"ম্যারাট, তুমি ভুল করচ।"

তিনজনেই চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল। ম্যারাটের উত্তেজিত বক্তৃতার সময় অলক্ষিতে একজন লোক দ্বার খুলিয়া কক্ষপ্রান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

"তুমি কি সিটিজেন (দেশভ্রাতা) সিমুর্দ্যান্?" ম্যারাট জিজ্ঞাসা করিল। "নমস্কার"!

সিমুর্দ্যানই বটে।

সিমুর্দ্যান্ পুনরায় বলিল—"ম্যারাট, বাস্তবিকই তোমার ভুল।"

ম্যারাটের মুখের রঙ সবুজ হইয়া উঠিল।—মলিন হইলে তাহার ঐরূপই হইত।

"তোমাকে প্রয়োজন আছে, ম্যারাট! কিন্তু ড্যাণ্টন্ ও রবস্‌পীয়রকে নৈলেও চল্‌বে না। তাদের শাসাচ্চ কেন? একতা—একতা, ভাইসব! দেশ একতা চায়।"

প্রকোষ্ঠমধ্যে সিমুর্দ্যানের এই অতর্কিত প্রবেশ প্রধূমিত বহ্নিতে শীতল জলসিঞ্চনের মতো কাজ করিল। পারিবারিক কলহের সময় কোনো অপরিচিত লোক আসিয়া সহসা উপস্থিত হইলে যেমন হয় তাহাই হইল; ভিতরে না হউক বাহিরে শান্তি স্থাপিত হইল।

সিমুর্দ্যান্ টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। ড্যাণ্টন্ এবং রবস্‌পীয়র উভয়েই তাহাকে চিনিত। কন্‌ভেন্‌সনের সভাগৃহে তাহারা অনেক সময় এই অখ্যাত কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকটিকে জনসাধারণের সসম্ভ্রম অভিবাদন লাভ করিতে দেখিয়াছে। তবুও আদবকায়দার অত্যন্ত পক্ষপাতী রবস্‌পীয়র জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না—"সিটিজেন্, তুমি প্রবেশ করলে কিরূপে?"

ম্যারাট অপেক্ষাকৃত নরমস্বরে বলিল—"সিমুর্দ্যান 'ইভিকে' সম্প্রদায়ভুক্ত।"

ম্যারাট কন্‌ভেন্‌সন্‌কে গ্রাহ্য করিত না, আর কমিউনকে ত সে ইচ্ছামত পরিচালন করিত; কিন্তু ইভিকের নামে সে ভীত হইত। সংসারের নিয়মই এই। মিরাবো অনুভব করিত—নিম্নে রবসপীয়রের অজ্ঞাত আন্দোলন; রবস্‌পীয়র অনুভব করিত ম্যারাটের আন্দোলন; ম্যারাট অনুভব করিত হিবার্টের আন্দোলন; আর হিবার্ট, ব্যাবিউকের। নিম্নস্তর যদি সুস্থির থাকে তবেই না রাজনীতিকেরা তাঁহাদের উদ্দিষ্টপথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত বৈপ্লবিক স্তরের নীচেও অন্য স্তর থাকে। সুতরাং নিতান্ত দুঃসাহসিকতাকেও ভীত হইয়া থাকিতে হয়, যখন সে পদতলে তাহারই অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পের বেগ অনুভব করে।

মতের জন্য আন্দোলন আর মতলবের জন্য আন্দোলন এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা, এবং একের সহায়তা করা ও অপরের প্রতিরোধ করা, এই হচ্চে প্রতিভাশালী ও খাঁটি বিপ্লববাদীগণের কার্য্য।

ড্যাণ্টন্ ম্যারাটের ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিল। বলিল—"সিটিজেন্ সিমুর্দ্যানের উপস্থিতিতে আশঙ্কার কোনো

কারণ নেই।" তার পর নবাগতের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল—"বেশ তো, অবস্থাটা এঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল। ইনি ঠিক সময়েই এসেচেন। আমি চরমপন্থীদের প্রতিনিধি; রবস্‌পীয়র 'কমিটি-অব-পাব্লিক্-সেফ্‌টির' প্রতিনিধি; ম্যারাট 'কমিউনের' প্রতিনিধি; আর সিমুর্দ্যান্ হচ্চেন 'ইভিকের' লোক। অতিরিক্ত শেষ-ভোট দেবার জন্যে ইনি এসেচেন।"

সহজ-গম্ভীর ভাবে সিমুর্দ্যান্ বলিল—"তাই হোক্। আলোচ্য বিষয়টি কি?"

রবস্‌পীয়র উত্তর দিল—"ভেণ্ডি।"

তাহার কথার পুনরুক্তি করিয়া সিমুর্দ্যান্ বলিল—"হাঁ, ভেণ্ডি। সেইখানেই আসল বিপদ। রাষ্ট্রবিপ্লবটা যদি বিফল হয় তবে ভেণ্ডির জন্যেই হবে। একটা ভেণ্ডি দশটা জার্ম্মানীর চেয়ে অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ। ফ্রান্সকে বাঁচাতে হ'লে ভেণ্ডিকে বিনাশ করা আবশ্যক।"

এই কয়টি কথায় সিমুর্দ্যান রবস্‌পীয়রকে জয় করিয়া লইল।

তবু রবস্‌পীয়র জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি না একসময়ে পাদ্রী ছিলেন?"

সিমুর্দ্যানের পাদ্রীদের মতো আকারপ্রকার রবস্‌পীয়রের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। নিজের অন্তরে যাহা ছিল, তাহা সে অপরের মধ্যে অনায়াসেই চিনিয়া লইল।

সিমুর্দ্যান্ উত্তর দিল—"হাঁ, সিটিজেন্।"

ড্যান্টন্ বলিল—"তা'তে কি আসে যায়? পাদ্রীরা যদি ভাল লোক হয় তবে তাদের মূল্য অপরের চেয়ে বেশী। রাষ্ট্রবিপ্লবে পাদ্রীরা 'সিটিজেনে' পরিণত হয়, যেমন গির্জ্জার ঘণ্টা গালিয়ে বন্দুক ও কামান তৈরী হয়। ড্যান্জু একজন পাদ্রী; ডনো একজন পাদ্রী; রবস্‌পীয়র, কন্‌ভেন্সনে তুমি তো বিশপ মসিউর পাশেই বস। আবে অড্রেন্ই না 'ন্যাশনাল এসেম্ব্লি রাজার উপরে' এই ঘোষণা করে? আবে গুটে ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করে যে, ষোড়শ লুইর চেয়ার মঞ্চ হ'তে নামিয়ে দেওয়া হোক্; আর আবে গ্রেগয়র্ রাজতন্ত্র-বিলোপের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিল।"

"আর তাঁর সহকারী ছিল—অভিনেতা কলট্-ডি-হারবয়।" ম্যারাট নাকী সুরে বলিল—"তা'রা দু'জনে মিলেই কাজটা সমাধা করে। পাদ্রী সিংহাসনটি উল্টে দেন, আর অভিনেতা রাজাকে ভূপাতিত করে।"

রবস্‌পীয়র বলিল—"এসব কথা ছেড়ে দিয়ে ভেণ্ডির কথা পুনরায় আলোচনা করা যাক্।"

সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল, ভেণ্ডিতে এখন কি হ'চ্চে?"

রবস্‌পীয়র বলিল—"ভেণ্ডি একজন নেতা পেয়েছে, আর ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে।"

"কে এই নেতা, সিটিজেন্ রবস্‌পীয়র?"

"একজন ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক্, যে বৃটেনীর প্রিন্স ব'লে নিজের পরিচয় দেয়।"

সিমুর্দ্যান্ যেন একটু বিচলিত হইল। বলিল—"আমি তা'কে জানি। আমি তার বাড়ীতে চ্যাপলেনের (পাদ্রীর) কাজ করতুম্।" এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সিমুর্দ্যান্ পুনরায় বলিল—"সৈনিক হওয়ার পূর্ব্বে তিনি আমোদ-প্রমোদ নিয়েই থাক্‌তেন। লোকটি বোধ হয় ভয়ঙ্কর।"

"সাংঘাতিক!" রবস্‌পীয়র বলিল। "সে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আহতদিগকে হত্যা করচে, বন্দীদিগকে দলে দলে বধ করচে,—এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকেও গুলি ক'রে মারচে।"

"স্ত্রীলোকদিগকে!"

"হাঁ, অন্যান্যের সঙ্গে তিন সন্তানের জননী একটি মেয়েলোককেও গুলি করা হয়;—ছেলেপিলেদের কি হয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না। লোকটা একজন সেনাপতির মতো সেনাপতিই বটে!—যুদ্ধটা খুবই বোঝে।"

সিমুর্দ্যান্ বলিল—"তা' সত্যই। হ্যানোভেরিয়েন-সমরে সে যুদ্ধ করেছে। সৈনিকেরা বল্‌ত, নামে রিসিলু, কিন্তু আসলে সেনাপতি হ'চ্ছে—ল্যান্টিনেক।"

"সিটিজেন সিমুর্দ্যান, এই লোকটাই এখন ভেণ্ডিতে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"কতদিন হ'ল?"

"গত তিন সপ্তাহ যাবৎ।"

"তাকে আইনের আশ্রয়-বর্জ্জিত ব'লে ঘোষণা কর্‌তে হবে।"

"তা' করা হয়েছে।"

"তা'র মস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণ কর্‌তে হবে।"

"তা' করা হয়েছে।"

"তা'কে ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে।

"তা'ও করা হয়েছে।"

"পুরস্কার নোটে নয়, মোহরে দেওয়া হবে।"

"সেরূপ ঘোষণাই হয়েছে।"

"তা'কে গিলোটিনে চড়াতে হবে।"

"সেটা করা হবে।"

"কে করবে?"

"তুমি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, এর জন্যে কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি হ'তে তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হবে।"

সিমুর্দ্দান্ বলিল—"আমি সম্মত।"

বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের যে গুণ—অতি সত্বর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম লোক নির্ব্বাচন করা—তাহা রবস্‌পীয়রের ছিল। সে সম্মুখস্থ ফাইল্ হইতে একখণ্ড কাগজ লইল, তাহার শীর্ষদেশে এই কয়টি কথা মুদ্রিত আছে, 'এক এবং অবিভাজ্য ফরাসী সাধারণতন্ত্র—কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি।'

সিমুর্দ্দান্ বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি এ প্রস্তাবে রাজী। ল্যান্টিনেক অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির; আমিও তাই হব। এই লোকটার সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ করতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তার হাত থেকে আমি সাধারণতন্ত্রকে উদ্ধার করবই।" নিজকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া সিমুর্দ্দান্ বলিল—"আমি পাদ্রী, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যাক্ তাতে কিছু এসে যায় না।"

ড্যাণ্টন্ বলিল—"ঈশ্বর তো আজকাল আর চলিত নেই!" অকুণ্ঠিতভাবে সিমুর্দ্দান্ বলিল—"আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।"

রবস্‌পীয়র মাথা নাড়িয়া তাহাতে সায় দিল—কিন্তু মাথা-নাড়াটি ক্রূরতাব্যঞ্জক।

সিমুর্দ্দান্ জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় আমাকে যেতে হবে?"

"ল্যান্টিনেকের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদলের অধ্যক্ষের নিকট। একটা কথা কিন্তু জানিয়ে রাখছি—এই লোকটি সম্ভ্রান্তবংশীয়।"

ড্যাণ্টন্ বলিয়া উঠিল—"এই আর একটা জিনিষ যাতে কিছু এসে যায় না। সম্ভ্রান্ত!—তা'তে কি হয়েচে? পাদ্রীদের সম্বন্ধে যে কথা, অভিজাতবংশীয়দের সম্বন্ধেও তাই। এই দুই শ্রেণীর লোকই যদি ভাল লোক হয়—তবে চমৎকার! অভিজাত্য একটা কুসংস্কার মাত্র; আমাদের সেটা থাকা উচিত নয়। অভিজাত হ'লেই ভাল লোক হবে এটা যেমন মনে করতে নেই, আবার অভিজাত মাত্রই মন্দ লোক সেটা মনে করাও ঠিক হবে না। রবস্‌পীয়র, সেণ্ট জাষ্ট কি সম্ভ্রান্ত নয়? এ্যানা কার্সিস্ ক্লুটস্ সেতো একজন ব্যারন। ম্যারাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্টাউট একজন মার্ক্‌ইস। বৈপ্লবিক বিচারালয়ের একজন জুরী পাদ্রী, আর একজন জুরী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। কিন্তু এই দুই জনই পরীক্ষিত খাঁটি লোক।"

রবস্‌পীয়র বলিল,—"এই জুরীদের ফোরম্যানের (মুখ-পাত্রের কথাই তুমি ভুলে' যাচ্ছ।"

"এন্টোনেল?"

"হ্যাঁ, মার্ক্‌ইস এন্টোনেল।" ড্যান্‌টন বলিল—"ড্যাম্পিয়ারও অভিজাতবংশীয়, যে এই অল্পদিন হ'ল সাধারণতন্ত্রের জন্যে যুদ্ধে কণ্ডিতে প্রাণ দিয়েছে। আর বোরোনিয়ারও একজন অভিজাতবংশীয়, যে ভার্দ্দনের ফটক প্রুশীয়ানদিগের নিকট উন্মুক্ত ক'রে দেওয়ার চেয়ে পিস্তলের গুলিতে নিজের মগজ উড়িয়ে দেওয়াই বরণীয় মনে করেছিল।"

ম্যারাট বিরক্তপূর্ণস্বরে বলিল—"এ সব সত্ত্বেও ভুল্‌তে পারচিনে যে, যেদিন কণ্ডরসেট বলেছিল 'গ্রেকাইরা সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছিল', সেদিন ড্যান্টন্ চেঁচিয়ে উঠেন—"সকল সম্ভ্রান্তবংশীয়েরাই বিশ্বাসঘাতক, মিরাবো থেকে আরম্ভ ক'রে তুমি পর্য্যন্ত।"

সিমুর্দ্দানের গম্ভীর কণ্ঠ পুনরায় শ্রুত হইল—"সিটিজেন

ড্যান্টন্, সিটিজেন রবস্পীয়র, এই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়ের উপর তোমাদের যে বিশ্বাস আছে, তা হয় ত ঠিকই ; কিন্তু জনসাধারণ তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না, আর এতে তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। একজন পাদ্রীকে যদি আবার একজন অভিজাতবংশীয়ের উপর নজর রাখার ভার দেওয়া যায়, তা' হ'লে দায়িত্বটা দ্বিগুণিত হয়। সেই পাদ্রীকে হ'তে হবে—কঠোর অনমনীয়।"

রবস্পীয়র বলিল—"তা' সত্য।"

"আর নির্ম্মম!"—সিমুর্ত্তান্ বলিল।

রবস্পীয়র জবাব দিল—"বেশ বলেচ, সিটিজেন সিমুর্ত্তান্! তোমার কাজ-কারবার হবে একজন যুবকের সঙ্গে। তোমার বয়স তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ, সুতরাং সে তোমাকে মান্য না ক'রে পারবে না। তা'কে চালিয়ে নিতে হবে, কিন্তু সেটা বেশ বুঝে শুনে করা চাই। যতদূর জানা গেছে, যুদ্ধ বিষয়ে তা'র বিশেষ প্রতিভা আছে। যে পল্টনের সে এখন অধ্যক্ষ সেটা পূর্ব্বে রাইন্ নদীর তীরে নিযুক্ত সেনা-দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখান থেকে তা'রা ভেণ্ডিতে প্রেরিত হয়। সেই সীমান্ত-সমরেই সাহস ও বুদ্ধির জন্যে তার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তা'র সৈন্যপরিচালন একটু অসাধারণ রকমের। পনেরো দিন যাবত সে বৃদ্ধ মাকু'ইস ডি ল্যান্টিনেককে বাধা দিয়ে রেখেছে, তাকে হটিয়ে নিয়ে যাচ্চে, শেষটায় তাকে সমুদ্রে না ডুবিয়ে ছাড়বে না। অথচ এই ল্যান্টিনেকের মধ্যে প্রবীণ সেনাপতির ধূর্ত্ততা এবং যুবক-কাপ্তেনের দুঃসাহস উভয়ই রয়েচে। এই যুবকের ইতিমধ্যেই অনেক শত্রু হয়েচে—অনেকে তাকে ঈর্ষ্যা করে। এডজুটান্ট জেনারেল লেচেল্ তা'র পরে ঈর্ষ্যান্বিত।"

ড্যান্টন্ বাধা দিয়া বলিল—"এই লেচেল্ কমাণ্ডার-ইন্-চিফ (প্রধান সেনাপতি) হ'তে চায়।"

রবস্পীয়র বলিল—"আবার সে নিজে ছাড়া কেউ যে ল্যান্টিনেককে পরাস্ত করবে, এটা তার পছন্দ হয় না, এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেতাদিগের মধ্যে এই রকম রেষারেষি এই হচ্চে ভেণ্ডি-সমরের দুর্ভাগ্য! আমাদের সৈন্যদিগের মধ্যে বীরের অভাব নেই। কিন্তু অভাব হচ্চে—সুপরিচালকের। লেচেল্ দক্ষিণ উপকূল রক্ষার অজুহাতে উত্তর উপকূলের সমস্ত সৈন্য উঠিয়ে নেয়, আর তা'তেই তো ইংরেজদের পক্ষে ফ্রান্স আক্রমণের সুযোগ হ'ল। ৫০ লক্ষ কৃষকের বিদ্রোহ এবং যুগপৎ ইংরেজ সৈন্যের ফ্রান্সের অবতরণ এই হ'ল ল্যান্টিনেকের প্ল্যান। ভল্লাসী সৈন্যদলের যুবক কমাণ্ডার ল্যান্টিনেক্‌কে আক্রমণ ক'রে পরাস্ত করচে—কিন্তু লেচেলের অনুমতি না নিয়ে। এদিকে লেচেল্ হচ্ছে তার জেনারেল্, কাজেই লেচেল্ তার দোষ দিচ্ছে। এই যুবকের সম্বন্ধে সকলে একমত নয়। লেচেল্ চায় তাকে গুলি ক'রে মারতে, মার্নের প্রিউর চায় তাকে এডজুটান্ট জেনারেলের পদ দিতে।"

সিমুর্ত্তান বলিল—"এই ছোকরার অনেক গুণ আছে ব'লে আমার বোধ হচ্চে।"

"কিন্তু তার একটি দোষও আছে।" ম্যারাট্ বলিয়া উঠিল।

সিমুর্ত্তান জিজ্ঞাসা করিল—"কি সেটা?"

ম্যারাট বলিল—"দয়া। যুদ্ধে সে দৃঢ়, অবিচলিত ; কিন্তু তা'র পরে দুর্ব্বল। সে ক্ষমা করে—দয়া দেখায় ; ভক্ত ও নান্‌দিগকে আশ্রয় দেয় ; অভিজাতবর্গের স্ত্রীকন্যাদিগকে রক্ষা করে ; বন্দীদিগকে মুক্ত করে ; পাদ্রীদের ছেড়ে দেয়।"

"মারাত্মক দোষ।"—সিমুর্ত্তান মন্তব্য করিল।

"মহা অপরাধ!"—ম্যারাট বলিল।

"কখনো কখনো এটা দোষ বটে।"—ড্যান্টন্ বলিল।

"অনেক সময়।"—রবস্পীয়র বলিল।

"প্রায় সর্ব্বদাই।"—ম্যারাট বলিল।

সিমুর্ত্তান্ বলিল—"দেশের শত্রুর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া—তখন এরূপ কার্য্য সর্ব্বদাই অপরাধ।"

ম্যারাট তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—"তা হ'লে সাধারণ-তন্ত্রের একজন নেতা যদি রাজ-পক্ষীয় একজন বন্দী নেতাকে ছেড়ে দেয়, তার কি করবে?"

"তা' হ'লে লেচেলের মতানুসারেই কাজ করব। তাকে গুলি ক'রে মারা হবে।"

"অথবা গিলেটিনে চড়ানো হবে।"—ম্যারাট বলিল।

সিমুর্ত্তান্ বলিল—"সে যা পছন্দ করে।"

ড্যান্টন্ হাসিতে লাগিল। বলিল—"ছুটোই আমার খুব পছন্দ হয়।"

ম্যারাট্ শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"এর একটা না একটা তোমার হবেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।"

তারপর তাহার দৃষ্টি ড্যান্টনের উপর হইতে সরিয়া যাইয়া পুনরায় সিমুর্ন্ডা'নের উপর ন্যস্ত হইল।

"তা হ'লে সিটিজেন সিমুর্ন্ডা'ন্, সাধারণতন্ত্রের কোনো নেতা কর্ত্তব্যের ত্রুটি করলে তুমি তা'র প্রাণদণ্ড করবে?"

"চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।"

"উত্তম।"—ম্যারাট্ বলিল। "আমার ও রবস্‌পীয়রের মতে মত। 'কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি'র প্রতিনিধি স্বরূপে সিটিজেন সিমুর্ন্ডা'ন্‌কেই উপকূল-রক্ষী সৈন্যদলের তল্লাসী-বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই সৈন্যাধক্ষের নাম কি?"

"সে একজন ভূতপূর্ব্ব অভিজাতবংশীয়।" এই বলিয়া রবস্‌পীয়র্ তাহার কাগজপত্র দেখিতে লাগিল।

ড্যান্টন্ বলিল—"আচ্ছা, তাই হোক। পাদ্রী অভিজাত-বংশীয়ের উপর নজর রাখুক। একা একজন পাদ্রীকে আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু তারা দু'জন একত্র থাকলে তাদের থেকে কোন ভয় নেই। একজন আর একজনের উপর নজর রাখবে, আর তাতে কাজ ভালই হবে।"

সিমুর্ন্ডা'নের চক্ষে সাধারণতঃই যে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি দেখা যাইত এই মন্তব্যে তাহা আরও গভীরতর হইয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা ঠিক; সেই জন্যেই ড্যান্টনের দিকে না চাহিয়া সিমুর্ন্ডা'ন্ আপনার স্বাভাবিক কঠোর স্বরে বলিল—"সাধারণ-তন্ত্রের যে সৈন্যাধ্যক্ষের ভার আমার উপর সমর্পিত হ'ল, সে যদি কোন দোষ করে, তবে তার সাজা হবে মৃত্যু।"

কাগজের ফাইলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি রবস্‌পীয়র্ বলিল—"এই যে, নামটা পাওয়া গেছে, সিটিজেন সিমুর্ন্ডা'ন্, সে একজন তথাকথিত ভাইকাউণ্ট, নাম—গভেন।"

সিমুর্ন্ডা'নের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল—"গভেন!"

সিমুর্ন্ডা'নের মুখের এই আকস্মিক পাণ্ডুরতা ম্যারাট্ লক্ষ্য করিল।

সিমুর্ন্ডা'ন পুনরায় বলিল—"ভাইকাউণ্ট গভেন!"

রবস্‌পীয়র্ বলিল—"হ্যাঁ।"

"ভাল?"—ম্যারাট্ তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পাদ্রীর উপর স্থাপিত করিল।

একমুহূর্ত্তের জন্য সব চুপচাপ।

তারপর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ম্যারাট বলিল—"সিটিজেন্ সিমুর্ন্ডা'ন্, তোমার কথিত সর্ত্তে সৈন্যাধ্যক্ষ গভেনের নিকটে 'প্রতিনিধি কমিশনার' স্বরূপে এই কার্য্যভার গ্রহণ কর্‌তে তুমি প্রস্তুত আছ কি? কথাবার্ত্তা সব ঠিক হ'ল তো?"

"হ্যাঁ, ঠিক হ'ল।"—সিমুর্ন্ডা'ন্ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

কলমটা নিকটেই পড়িয়া ছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া রবস্‌পীয়র্ ধীরে ধীরে স্বীয় সুন্দর হস্তাক্ষরে একখণ্ড কাগজে (যাহার শীর্ষদেশে 'কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটি' এই কথা কয়টি মুদ্রিত রহিয়াছে) কয় ছত্র লিখিল এবং তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিল। তারপর কাগজ ও কলমটা ড্যান্টনের হাতে দিল। ড্যান্টন্, ও তার পরে ম্যারাট উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করিল।

সিমুর্ন্ডানের বিবর্ণ বদনমণ্ডল হইতে ম্যারাটের দৃষ্টি তখনো অপসারিত হয় নাই।

রবস্‌পীয়র্ কাগজখানা আবার হাতে নিল এবং তাহাতে তারিখ বসাইয়া সিমুর্ন্ডা'ন্‌কে পাঠ করিতে দিল। সিমুর্ন্ডা'ন্ পড়িল—

"সাধারণতন্ত্রের প্রথম বর্ষ।

"উপকূলরক্ষী সৈন্যদলের তল্লাসী-বিভাগের অধ্যক্ষ গভেনের নিকট প্রেরিত পাব্লিক-সেফটির প্রতিনিধি কমিশনার সিটিজেন সিমুর্ন্ডা'ন্‌কে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

"রবস্‌পীয়র্

"ড্যান্টন্

"ম্যারাট

(স্বাক্ষরত্রয়ের নীচে)—"২৮শে জুন, ১৭৯৩।"

বৈপ্লবিক পঞ্জীর অস্তিত্ব তখনো ছিল না। ১৭৯৩ সনের ৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বে কন্‌ভেন্‌সন্‌ কর্তৃক উহা পরিগৃহীত হয় নাই।

সিমুন্‌'ান্‌ যতক্ষণ কাগজখানা পাঠ করিতেছিল, ম্যারাট তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে, যেন আপন মনেই সে বলিতেছিল—"এখনো কিছু বাকী আছে। কন্‌ভেন্‌সনের একটা নির্দ্ধারণ দ্বারা এগুলিকে আবার আইনসঙ্গত ক'রে নিতে হবে।"

রবস্‌পীয়র্‌ জিজ্ঞাসা করিল—"সিটিজেন্‌ সিমুন্‌'ান্‌, তুমি থাক কোথায়?"

"কমাস'কোর্টে।"

ড্যাণ্টন্‌ এই সময়ে বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে ত দেখছি, তুমি আমার প্রতিবেশী।"

রবস্‌পীয়র্‌ বলিল—"আমরা আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্ত্তে পারিনে। আগামীকল্য কমিটি-অব-পাব্লিক-সেফটির সকল মেম্বরগণের স্বাক্ষরিত রীতিমত ক্ষমতাপত্র তুমি পাবে। তাহাতে মানে'র প্রিউর প্রভৃতি অস্থায়ী প্রতিনিধিগণ সকলেই তোমাকে খুব খাতির করবে। আমরা তোমাকে খুবই জানি। তোমার ক্ষমতা এখন হ'ল অসীম। তুমি গভেনকে সেনাপতিও করতে পার, বধ্যমঞ্চে পাঠাতেও পার। তোমার ক্ষমতাপত্র কাল বেলা ৩টার সময় তুমি পাবে। রওয়ানা হবে কখন?"

"চারটের সময়"—সিমুন্‌'ান্‌ বলিল।

তারপর তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইল।

স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিবার সময় ম্যারাট সাইমন এভ্রার্ডকে বলিয়া গেল, পরদিন তাহাকে (ম্যারাটকে) কন্‌ভেন্‌সনে যাইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

অতীতের স্মৃতি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বানুবর্ত্তন)

কলিকাতায় বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন

১৯০৫ সালে শীতকালে প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্ ও তাঁহার পত্নী (এক্ষণে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী) কলিকাতায় আগমন করেন। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপত্তন ইনিই করেন। এবং ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে ইঁহার পুত্র, এখনকার প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্, এই সৌধের দ্বার উন্মোচন করেন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী কলিকাতায় পুনরায় আগমন করেন। উভয় বারেই সহর রাত্রিকালে আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল এবং রেড্‌রোড-তোরণ পতাকাদির দ্বারা অতি সুন্দরভাব ধারণ করিয়াছিল। কেল্লার সম্মুখে গড়ের মাঠে রাত্রিকালে আতসবাজী পোড়ান এবং অশ্বপৃষ্ঠে সৈনিকগণ কর্ত্তৃক মশালের খেলা দেখান হইয়াছিল। সকলপ্রকার আমোদপ্রমোদে দেশের আপামর সাধারণ যোগদান করিয়া তাহাদের অসীম রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ ও গোরা সৈনিকের প্রহারে বহুদূর হইতে আগত গ্রামবাসীগণ যেরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে গড়ের মাঠে প্যারেড্ বা কুচ্‌কাওয়াজ্ উপলক্ষে পুলিশ দর্শক-সাধারণকে মারধর করে বটে, কিন্তু ১৯১১ সালে রাজদর্শনোৎসুক প্রজার উপর পুলিশের উৎপীড়ন কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল। এ স্থলে বলা ভাল যে, আমার ইউরোপীয় পরিচ্ছদ আমাকে পুলিশ ও গোরার হাত হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়াছিল।

১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট দাদাভাই নৌরোজীকে হাওড়া ষ্টেসন হইতে সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য বিপুল জনতা হইয়াছিল। দুই ঘোড়ার ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া চশমা ও পার্শীদিগের উচ্চ টুপি-পরিহিত বৃদ্ধ নৌরোজী দুই হাত তুলিয়া সেলাম করিতে করিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ। ছাত্রবৃন্দ ও জনতা প্রেসিডেণ্টের গাড়ীখানি একরূপ ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাতে গাড়ীর গতি খুবই মন্থর হইয়াছিল। ব্যাঘ্র-সুলভ কোপনস্বভাব ঘোষ মহাশয় তাঁহার পকেট হইতে অনবরত ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিতেছিলেন, এবং বিলম্ব হেতু ক্রোধসূচক মুখভঙ্গী করিতেছিলেন। হাওড়া পুল পার হইয়া ষ্ট্রাণ্ড রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট দিয়া মিছিল যখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিল, তখন রসরাজ অমৃতলাল বসু গাড়ী আটক করিয়া দাদা-ভাইকে সম্বোধন পূর্ব্বক একটি অভিবাদন পাঠ করিলেন। অভিবাদন-পাঠে কিছু বিলম্ব হওয়াতে ডাঃ ঘোষ মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল বুঝিতে পারিয়া বসু মহাশয় পাঠকার্য্য সংক্ষেপে সারিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক এইরূপ ধীরগতিতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ অতিক্রম করিয়া প্রেসিডেণ্টের গাড়ী কলেজ-স্কোয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এইস্থানে সুরেন্দ্রনাথ জনতাকে প্রেসিডেণ্টের গাড়ী ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, রৌদ্রে প্রেসিডেণ্টের কষ্ট হইতেছিল। বৃদ্ধ নৌরোজী তাঁহার কংগ্রেসের অভিভাষণে যে একটি কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথার প্রতিধ্বনি সমগ্র ভারতে ও বিলাতে এখনও শোনা যাইতেছে। সে কথাটির নাম—"স্বরাজ" বা "স্বরাজ্য।"

কংগ্রেসের কথা যখন উত্থাপন করিলাম, তখন আরও দুইটি কংগ্রেসের কথা এইখানেই বলিয়া রাখি। ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়েলিংটন-স্কোয়ারে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতি পাঞ্জাবের জননায়ক লালা লাজপত রায়। ইনি ১৯০৮ সালে মাণ্ডালে জেলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'অন্তরীণ' হন, ১৮১৮ সালের তৃতীয় রেগুলেসনের বলে। মুক্তিলাভ করিয়া ইনি আমেরিকা প্রদেশে কিছুকাল

বাস করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অভিভাষণে সুরেন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তে অরবিন্দ ঘোষকে জাতীয় আন্দোলনের নেতা বলাতে কেহ কেহ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ, অথবা নরমপন্থী ও চরমপন্থীদলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সুরেন্দ্রনাথের দল আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন দ্বারা বশীভূত করিয়া রাজনৈতিক অধিকার-লাভের পক্ষপাতী। অরবিন্দ-দলের মত এই যে, আবেদন-নিবেদনে কোনও ফল হয় না, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ; সুতরাং জাতি নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নিজেকে মুক্ত করিবে। এই শেষোক্ত মতের অপব্যাখ্যা হইতে বিপ্লবপন্থীদলের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ জোর-জুলুম, জবরদস্তি ও অত্যাচারমূলক শাসনযন্ত্রকে বিকল করিতে হইলে হিংসাপ্রণোদিত উপায়ের অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাই হইল বিপ্লববাদীদিগের মূলমন্ত্র। সুরেন্দ্র-দলের মত ও অরবিন্দ-দলের মত উভয় মতই একদেশদর্শী। এই উভয় মতের যেন কতকটা সমন্বয়সাধনে ও বিপ্লবী-দিগের পন্থা পরিত্যাগে দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া এক নূতন মত দেশের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এই মতের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে কৃষ্ণবর্ণ ভারতবাসীর নানা অসুবিধা ও হীনতা দূর করিবার জন্য যে অহিংসামূলক আন্দোলন উপস্থিত করিয়া নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, সেই অহিংসামূলক উপায়ের দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার মতানুযায়ী কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে অহিংসামূলক অসহযোগ নামক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের উপস্থাপক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ভারতবাসী সরলান্তঃকরণে প্রভূত অর্থ ও সৈন্য সরবরাহ করিয়া, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজের যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। এই অতুলনীয় আত্মত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ ভারতবর্ষ যে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির আশা করিয়াছিল, তাহা ১৯১৯ সালের গভর্ণমেণ্ট-অফ্-ইণ্ডিয়া আইন-প্রণয়নের দ্বারা ফলবতী হয় নাই। অতএব ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ বা নরমপন্থীদলের মত যে ভ্রমাত্মক তাহা ভারতবাসী সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এই হতাশা-ক্লিষ্ট ভাব হইতে বিপ্লববাদীরা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার, অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অহিংসামূলক বাণী দুন্দুভি-নির্ঘোষে প্রচার করিয়া দেশের অসীম উপকার সাধন করিলেন। বিপ্লবের দ্বারা লোকক্ষয়, শক্তিক্ষয় হওয়া ছাড়া আর কোনও সুফল পাওয়া যায় না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু অহিংসাভাব প্রচারের দ্বারা জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সেই কারণে বঙ্গের স্বদেশী-আন্দোলন যুগের বয়কট্ বা বর্জ্জননীতি ও "স্বদেশী"গ্রহণ নামান্তরিত হইয়া অসহযোগ ও খদ্দর-গ্রহণ রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। বয়কট্-নীতির মূলে হিংসা, দ্বেষ, বা অন্য প্রচণ্ড-ভাব যাহাতে আশ্রয় না পায়, সে বিষয়ে দেশবাসীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানাপ্রকারে স্বদেশী-আন্দোলনের কালে সাবধান করিয়া দিতেন। অতএব বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধমতের মিলন বা সমন্বয় করিবার প্রতিভার পরিচয় ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের এক প্রস্তাবে পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত প্রস্তাবে নরমপন্থীদিগের মতানুযায়ী ইংরাজরাজের নিকট স্বায়ত্ত-শাসন চাওয়া বা দাবী করা হইয়াছে; কিন্তু উগ্রপন্থীদের মন রাখিয়া এই কথা বলা হইয়াছে যে, অমুক নির্দ্দিষ্ট-কালের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না ঘটিলে রাজশক্তির সহিত ট্যাক্স্ দেওয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে, এবং এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারও অহিংস উপায়ের দ্বারা ঘটাইতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রথমতঃ—স্বায়ত্ত-শাসন দান করিবার নির্দ্দিষ্টকাল কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন, এবং দ্বিতীয়তঃ—বিপ্লববাদীদিগের হিংসানীতিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হইয়াছে।

১৯২৮ সালে প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে

হাওড়া রেল-ষ্টেসন হইতে ছত্রিশ ঘোড়ার গাড়ীতে আনিয়া এবং সৈন্যবেশে সজ্জিত ভলণ্টিয়ারের দল প্রভৃতির দ্বারা প্রকাণ্ড মিছিল বাহির করিয়া এবং রাস্তায় মাঝে মাঝে তোরণাদি গঠিত করিয়া কংগ্রেস যেরূপ আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছিল তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের ইতিহাসে এরূপ আড়ম্বর ইহার পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কংগ্রেসের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এই বাহ্য প্রদর্শনীর আবশ্যকতা আছে ইহা স্বীকার করিলেও, দরিদ্র দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত অর্থ এইরূপ ভাবে সীমার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাহাতে অপব্যয়িত না হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

১৯০৮ সালের আরম্ভে আফ্‌গানিস্থানের আমীর হবিবুল্লা খান্ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তখনকার বড়লাট লর্ড মিণ্টো আমীরের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট লেডী মিণ্টো ফিট্ (ফাতে) বা উৎসবে নানারূপ আমোদপ্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল। আলিপুরের হেষ্টিংস হাউসে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কয়েক দিন এখানে বেশ আনন্দে কাটাইয়া আমীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে আমীর হবিবুল্লা জেলালাবাদে আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। আমীর যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহার পরিচরগণের বন্যভাবসূচক একটি গল্প প্রচারিত হইয়াছিল। গল্পটি এই—আমীরের রেলগাড়ী রাওলপিণ্ডি ষ্টেসনে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে কাহারও একটি বন্দুক রেলগাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া লাইনের পার্শ্বে পড়িয়া যায়। তদ্দৃষ্টে একজন আফ্‌গান বা কাবুলি চলন্ত রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঐ বন্দুকটি কুড়াইয়া লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে।

১৯১০ সালের মার্চ্চ কি এপ্রেল মাসে তিব্বতের দালাই-লামা চীনঅভিযানের ভয়ে ভীত হইয়া লাহসা নগরী হইতে পলাইয়া আসিয়া কলিকাতায় ব্রিটিশরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দার্জ্জিলিং হইতে স্পেশাল সেলুন-গাড়ীতে তিনি শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া অবতরণ করেন। শিয়ালদহ ষ্টেসনের বাহিরে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা জনকয়েক দাঁড়াইয়াছিলাম। দুই ঘোড়ার একখানি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে গাড়ীর টপ্ বা উপরিভাগ অর্দ্ধখোলা অবস্থায় থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র, পাঞ্জাবীর ন্যায় একটি জামা ও উত্তরীয়-পরিহিত, মুখে বসন্তের দাগযুক্ত, চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বৌদ্ধ ভিক্ষু, তিব্বত মহাপ্রদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ও প্রধান ধর্ম্মযাজক বা দালাই-লামা ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহিত আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ী যখন আমাদের সম্মুখীন হইল তখন আমাদের দুইটি হাত দুই হাঁটুর উপর রাখিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া তিব্বতীয় প্রথানুযায়ী আমরা দালাই-লামাকে অভিবাদন করিলাম। দালাই-লামার বাসস্থান হেষ্টিংস হাউসে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম দালাই-লামা হেষ্টিংস হাউসে থাকিবার কালে পালঙ্কে শয়ন করিতেন না, ভূমিতে কম্বল পাতিয়া তাহারই উপর শয়ন করিতেন। চীনে যখন অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় তখন তিব্বত চীনের বশ্যতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়া পড়ে।

১৯১৭ সালে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সদস্য ও ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারের সংস্কার সাধনকল্পে কি পরিবর্ত্তন করা উচিত তাহারই অনুসন্ধানের জন্য মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে আগমন হয়। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড সাহেবের সহিত একযোগে লিখিত এই সংক্রান্ত তাঁহার রিপোর্ট ১৯০৯ সালের মর্লিমিণ্টো শাসন-সংস্কারের সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের দল এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে বোম্বাই সহরে সম্মিলিত হইয়া এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত দ্বৈতশাসনের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। ঐ সহরেই তৎপূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে মিসেস বেসান্ত প্রমুখ চরমপন্থীগণ সম্মিলিত হইয়া এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত সংস্কার অসন্তোষজনক, অন্তঃসারশূন্য ও হতাশোদ্দীপক বলিয়া ঘোষণা করিয়া দ্বৈতশাসনের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে মহা ডামাডোল উপস্থিত হইয়াছিল। এই গোলযোগের সময় বড়লাট লর্ড রেডিং প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলসকে ভারতে আনিবার পরামর্শ দিয়া যে বিষম ভুল করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। লর্ড রেডিংএর উদ্দেশ্য এই ছিল যে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের ঝালিয়ান্‌ওয়ালা-বাগ-ঘটিত ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ভারতবাসীর মনকে রাজভক্তির স্রোতে ডুবাইয়া দিবেন এবং মণ্টেগু সাহেব প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার ভারতবাসীর প্রিয় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলসের আগমনে অসহযোগ আন্দোলন আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া যুবরাজ ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের দ্বার উন্মোচন করেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যুবরাজের সম্মানার্থ গড়ের মাঠে যে পেজিয়াণ্ট বা জীবন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সমাগম টুপিওয়ালা সাহেবদিগের সমাগম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেদিন ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকের গ্যালারীতে যত টুপি দেখিয়াছিলাম এত টুপি একত্রে আমি আর কখনও দেখি নাই। এই অগণিত টুপিসমুদ্রে মাড়োয়ারীদিগের রঞ্জিত পাগড়ী মুষ্টিমেয় বলিয়াই আমার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। যুবরাজের সম্মুখে যাহা দেখান হইয়াছিল তাহার মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নৌরোজ বা নববর্ষের মিছিল এবং তিব্বত দেশীয় ভূতের নৃত্য উল্লেখযোগ্য। উক্ত মিছিল বাহির করিবার জন্য অনেকগুলি সজ্জিত হস্তী আনা হইয়াছিল। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে গড়ের মাঠে কাঙালী-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মুসলমান কাঙালীদের জন্য স্থান মনুমেণ্টের নিকট এবং হিন্দু ভিখারীদের জন্য রেড্ রোডের পশ্চিম দিকে কেল্লার নিকটস্থ বৃহৎ ভূমিখণ্ডে। উভয় স্থানই কানাতের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছিল। শেষোক্ত ঘেরা স্থানের অভ্যন্তরে এক পার্শ্বে একটি ছোট সামিয়ানা খাটান হইয়াছিল এবং এই সামিয়ানার মধ্যে যুবরাজ আসিয়া বসিবেন বলিয়া একখানি চেয়ার ও একটি টেবিল রাখা হইয়াছিল। এই ঘেরা জায়গার মধ্যে এত কাঙালী জমিয়াছিল যে সামিয়ানায় যাইবার কোন পথ ছিল না। আমি কানাতে প্রবেশপথের নিকটেই দাঁড়াইয়া নিজচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই এখানে লিখিতেছি। কিছুক্ষণ পরে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ বসু ফোর্ড্ মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া যুবরাজের জন্য পথ করিবার উদ্দেশ্যে কাঙালীদের মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলেন। তাহার ফলে মোটরের সামনের কাঙালীগণ তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল বটে কিন্তু মোটরের পশ্চাতের দিকে পুনরায় বসিয়া তাহারা সেই পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল। তৎপরে পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার—উইলসন্ কি বার্ড নামটা আমার ঠিক মনে নাই—কয়েকটি কনেষ্টবলসহ কানাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিষ্ট কথায় কাঙালীদিগকে সরাইয়া দিয়া অল্পপরিসর পথ বাহির করিলেন এবং যাহাতে কাঙালীরা পথ বন্ধ করিয়া না ফেলে ইহা দেখিবার জন্য এই পথের দুই পার্শ্বে দুই সারি কনষ্টেবল দাঁড় করাইয়া দিলেন। এই ব্যবস্থার অল্পক্ষণ পরেই মোটরযোগে যুবরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী লর্ড ক্রোমার্। যুবরাজের গাড়ীর পশ্চাতেই একখানি ছোট মোটরগাড়ী হইতে মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ নামিয়া যুবরাজকে অভ্যর্থনা করিয়া কানাত-মধ্যস্থ সামিনায়ায় লইয়া চলিলেন। যুবরাজ কানাতের দ্বারমুখে প্রবেশ করিবামাত্র অসংখ্য কাঙালীকণ্ঠে "মহাত্মা গান্ধীকি জয়" এই রব উত্থিত হইল। যুবরাজ কাঙালীদিগকে সেলাম করিতে করিতে সামিয়ানা মধ্যে যাইয়া বসিলেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তথা হইতে উঠিয়া কানাতের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। যুবরাজ কানাত মধ্য হইতে বাহিরে আসিবামাত্র আবার সেই "মহাত্মা গান্ধীকি জয়" রব কাঙালী-কণ্ঠ হইতে ঘোষিত হইল। যুবরাজ মোটরে যখন উঠিতে যাইবেন সেই সময় মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দুইহাতে বারংবার কুর্ণিস্ করিতে লাগিলেন। যুবরাজও সেইরূপ কুর্ণিস্ করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মান রক্ষা করিলেন।

স্মরণ হয় প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলসের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যাহাতে সাধারণ স্থানে সভাসমিতি বা পথে মিছিল বাহির হইতে না পারে সে সম্বন্ধে চীফ্ প্রেসিডেন্সি

ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪১ ধারামতে এক নোটিশ জারী হয়। যুবরাজকে যে রাত্রে ডাল্‌হাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটে আহারের নিমন্ত্রণ করা হয় সেইদিন বৈকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁহার পত্নী বাসন্তী দেবী উপরোক্ত নোটিশ অমান্য করিয়া জনতা করার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নীত হন। ইঁহাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ ড্যাল্‌হাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটের ভোজ-সভায় পৌঁছাইলে আলিপুরের উকিল বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক লাট সাহেবের কার্য্যকরী সভার সদস্য স্যার হেন্‌রী হুইলারকে এই সংবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে সংবাদ প্রকৃত শুনিয়া মল্লিক মহাশয় ভোজন না করিয়াই বাটীতে চলিয়া আসেন।

১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণার ফলে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লীতে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে নববর্ষে বা সম্রাটের জন্মদিনে উপাধিপ্রাপ্ত মিত্র বা করদরাজ্যের সামন্তগণ বড়লাটের নিকট হইতে খেতাব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য প্রায়ই শীতকালে কেহ না কেহ কলিকাতায় আসিতেন। ১৯০৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীরের মহারাজা স্যার প্রতাপসিং ও ঝালোয়ারের রাজরাণা স্যার ভওয়ানীসিং এই উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। রাণা সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান পরমানন্দ চতুর্ব্বেদীর সহিত পরিচিত হইবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কাশ্মীর নরপতির দেওয়ান অমরনাথের সহিতও আমার আলাপ হইয়াছিল। এই কয় ব্যক্তির কেহই এক্ষণে জীবিত নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সিমলায় শিবি মেলা

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ধর

সিমলা হইতে মাইল দশেক দূর "কোটি" নামক এক সামন্ত রাণার জমিদারীর ভিতর 'শিবি' নামে একটি সুন্দর উপত্যকা আছে। এইখানে একটি শিবমন্দির আছে এবং তাহা হইতেই এই উপত্যকার নামকরণ হইয়াছে 'শিবি'। প্রতি বৎসর এখানে বৈশাখের শেষ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিনে যে মেলা বসে তাহার নাম 'শিবি' মেলা। কখনও কখনও তিথি-অনুযায়ী দিনের পরিবর্ত্তন হয়; গতবার বৈশাখের শেষ দিন ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিনে মেলা বসিয়াছিল। পাঞ্জাবের মধ্যে বিশেষ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ও পুরাতন মেলা। অনেকে ইহাকে 'সিপি' (Sippi) মেলা বলিয়া অভিহিত করেন। মেলা বসিবার পূর্ব্বে রাণা স্বয়ং আসিয়া লগ্ন-অনুযায়ী প্রথমে ঐ শিবমন্দিরে শিবের পূজা করেন, তাহার পর দামামা বাজাইয়া মেলা ঘোষণা করেন। বছরে মেলার এই দুইদিনই মন্দিরে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত নরনারী জাতিনির্ব্বিশেষে পূজা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং রাণা এই দিন তাঁহার রাজ্যের এবং বাহিরের নিমন্ত্রিত সকলকে সমান আদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। এইদিন তাঁহার নিকট জাতিধর্ম্মের কোন বিচার থাকে না।

বড়লাটের প্রাসাদ (ভাইস রিগ্যাল লজ্)—সিমলা

এই মেলার বিষয়ে অনেক প্রবাদ ও মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই রাণাবংশের কোন এক 'টীকা রাণা'র (যুবরাজ) বিবাহোপলক্ষে সমস্ত পার্ব্বত্য সামন্ত-রাণা ও রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যা বা নিকটআত্মীয়াদিগকে এই মেলায় উপস্থিত করেন। এইরূপে সমস্ত পার্ব্বত্য-দেশের সুন্দরীরা একত্রিত হইলে 'টীকা রাণা' সেই সভা হইতে নিজের মনের মত পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লয়েন। সেই গৌরবময় স্মৃতিকে চিরজাগরূক করিয়া রাখিবার জন্যই না কি এই মেলা। তাঁহাদের মতে এখনও না কি এই মেলায় পত্নী-নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ার প্রথা বিদ্যমান আছে।

কাহারও কাহারও আবার এই ধারণা আছে যে, এই মেলায় বহু পূর্ব্ব হইতেই পাহাড়ীদের ভিতর স্ত্রী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চলিয়া আসিতেছে, এবং এখনও নাকি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন ছয়মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর) স্ত্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। মেলায় সমাগতা বিবাহ বা দেহবিক্রয়ার্থিনী এই নারীদিগকে রাণার তরফ হইতে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সারি বাঁধিয়া বসিতে দেওয়া হয়, এবং তাহারা সেইখানে বসিয়া বিবাহেচ্ছুক বা ক্রয়াকাঙ্ক্ষী পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করে। যখন কোন পুরুষ আসিয়া তাহাদের

ভিতর কাহাকেও পছন্দ করিয়া রুমাল ছুঁড়িয়া নির্দ্দেশ করে, তখন সে কিম্বা তাহার আত্মীয় বা আত্মীয়া ঐ পুরুষের সহিত দেনাপাওনা ঠিক করিয়া তাহাকে সমর্পণ করে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া অনেকে ইহাকে লণ্ডনের May Fairএর সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এইরূপ ধারণা বা প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। প্রথম প্রবাদটিকে বিশ্বাস করিবার মত কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

অতীতে 'কোটি' যে খুব শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 'কোটির' বর্ত্তমান রাণাবংশের কোনও পূর্ব্বপুরুষ রাজপুতানার এক সামন্ত রাণা ছিলেন। রাণা হইলেও অন্তঃকলহে ও মুসলমানদের অত্যাচারে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইয়া কেবলমাত্র নামটুকুই অবশিষ্ট ছিল। রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও, জয় করিবার মত কোন রাজ্যই তখন ছিল না। এই বংশের কোন এক ধার্ম্মিক বৃদ্ধ এক রাত্রিতে স্বপ্নে মহাদেবের আদেশ প্রাপ্ত হন—"পাহাড়ের এক অন্ধকার গহ্বরে আমি অবরুদ্ধ আছি, তোরা যদি আমাকে মুক্ত ক'রে জগতে প্রচার করিস্ তা হ'লে তোদের আমি সহায় হব। তোরা রাজ্য জয় করার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিস্, ওখানে যা, ওখানকার সর্দ্দার অত্যাচারী ও দুর্ব্বল—তোরা তাকে অল্প আয়াসে পরাজিত ক'রে রাজ্য স্থাপন করতে পারবি।"

তখন এই পার্ব্বত্যজাতি মোটেই সভ্য ছিল না, এবং আত্মকলহের জন্য চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। সেই সুযোগে 'কোটি'র পূর্ব্বপুরুষ মাত্র কয়েকশত সৈন্যের সাহায্যে পাহাড়ের ছোট একটা 'মহল্লা' জয় করেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্ত পার্ব্বত্যজাতি অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী ছিল, সেইজন্য তিনি অল্প সময়ের ভিতর অতি অল্প আয়াসে নিজের রাজ্য একটু একটু করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্যজয়ের আমোদে ও বিত্তের মোহে তাঁহাদের দিন বেশ কাটিতে লাগিল, কিন্তু সুখের দিনে ভগবানের আদেশ একবারও তাঁহাদের স্মরণ হইল না। দেবতাকে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন।

এইরূপে দিন দিন রাজ্য বাড়িয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, সে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য তিন-চার পুরুষ রাণাবংশে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল না; প্রতিবারই তাঁহাদিগকে মনের দুঃখে দত্তক-পুত্র লইতে হইত। এইরূপে আরও কয়েক পুরুষ কাটিবার পর পুনরায়

জঙ্গীলাটের প্রাসাদ—"স্নোডন"

ঐ বংশের কোন লোক স্বপ্নে মহাদেবের আদেশ শুনিতে পান—"তোরা যে অর্থের মায়ায় আমায় ভুলে আছিস্। আমারি কৃপায় তোদের এত বিত্ত-বৈভব, কিন্তু আমি আজও সেই রুদ্ধ অবস্থায় প'ড়ে আছি...।"

তখন তাঁহাদের খেয়াল হইল, এবং পূর্ব্বে যে-কথাকে অর্ব্বাচীনের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, এবার আর তাহা পারিলেন না। নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিহিত ভাবে তাহাতে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে মন্দির আজও এখানে বর্ত্তমান আছে। দেবতা-

প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই রাণাবংশে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার বংশের প্রথম পুত্রের সেই জন্ম-তিথিতে আজও প্রতি বৎসর এই মন্দিরের পাশে একটি করিয়া মেলা বসে, এবং তাহারই নাম 'শিবি' মেলা।

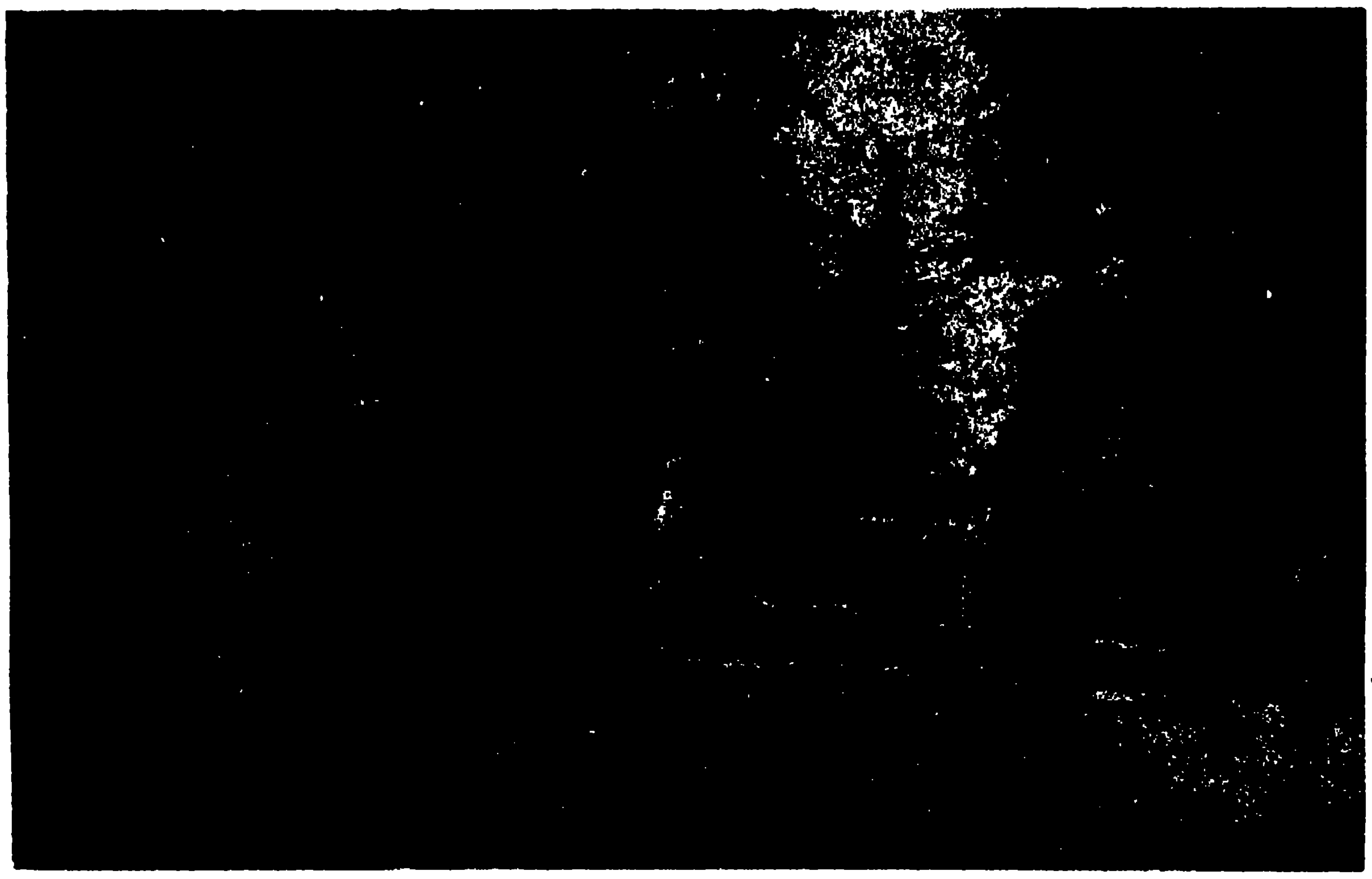

ম্যালরোডের একটি দৃশ্য

এই মেলা কতদিন ধরিয়া বসিতেছে তাহার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এতদিনের মুখরোচক প্রবাদকে পরিত্যাগ করিয়া বা ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরী ভাবিয়া অনেকেই হয় ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু আমি নিজে ঐ স্থানে যাইয়া এই প্রবাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়াছি, এবং যাঁহার সাহায্য লইয়া সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি তিনি কোটির রাণাবংশের সহিত বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং অনেকদিন রাণার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

'কোটি' মানে কৃপাণ (Dagger), অর্থাৎ তাঁহারা কাহারও অধীন নহেন। বর্ত্তমানে 'কোটির' রাণারা নামে মাত্র 'জুববলের' এলাকাধীন হইলেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহারা কোন প্রকার কর প্রদান করেন না। মিঃ টাওয়েলের (Mr. Towell) মতে 'কোটির' রাণা-উপাধি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ১৮৫৭ সালে এই বংশের হরিচাঁদ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন, এবং তাহার প্রতিদানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই রাণা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে যাঁহার নিকট হইতে আমি 'শিবি মেলার' তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তিনি বলেন যে, এই বংশের প্রথম হইতেই রাণা উপাধি, এবং 'কোটি'তে আসিয়া তাঁহারা নিজেদের রাণা বলিয়াই ঘোষণা করেন। ইঁহাদের পদবী হইতেছে 'সিং', কিন্তু সিংহাসন (গদি) প্রাপ্তির পর 'চাঁদ' উপাধি গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান রাণার নাম রাণা রঘুবীর চাঁদ, এবং 'টীকারাণার' নাম বিশষ্ঠ সিং।

এই মেলায় বড়লাট বাহাদুরের মধ্যে লর্ড মেয়ো প্রথম

তুষারাবৃত সিমলা

পদার্পণ করেন। অন্য আর দশটা সাধারণ মেলার মতই এই মেলা, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তবে সিমলার নিকটে আর কোন যায়গায় এতবড় মেলা হয় না বলিয়া, মেলার জন্য একদিন ভারত সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের দপ্তর বন্ধ থাকে, এবং প্রায় প্রতিবৎসরই পাঞ্জাবের লাট, জঙ্গীলাট, ও সময়ে সময়ে বড়লাটও এই মেলায় পদার্পণ করেন। পাহাড়ীরা এই দিনটিকে একটি পর্ব্বের দিন মনে করিয়া আমোদ-

মেলায় সমাগতা পাহাড়ী নারী

আহ্লাদ করে।

পাহাড়ী নর্ত্তকী

পাহাড়ী নারীরা বাংলাদেশের মেয়েদের মত কুণো নহে, পথের জুজুর ভয় তাহারা করে না। জুজুকে অতিক্রম করিবার মত সাহস ও শক্তি তাহাদের আছে। তাই এই মেলার একটি প্রধান আকর্ষণ—প্রজাপতির মত রঙ-বেরঙের পোষাক-পরা পাহাড়ী নারী। পাছে নারীসংক্রান্ত কোনরূপ ব্যভিচার হয় এজন্য রাণার আদেশ আছে যে, কোন অভিভাবকহীনা নারী একা এই মেলার ভিতর বেড়াইতে পারিবে না। সেই জন্য যেসব নারী একা বা দলবদ্ধ হইয়া মেলায় আসে অথচ সঙ্গে নিজেদের কোন পুরুষ অভিভাবক থাকে না, তাহাদের জন্য বসিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ঠিক করিয়া দেওয়া হয়।

মেলার বাহিরে অথচ মেলার অজুহাতে কোনপ্রকার ব্যভিচার যদি হয় তাহার জন্য রাণা দায়ী বা মেলা যে তাহার জন্য বসে তাহা বলা চলে না; অথচ অনেক লেখক বাহবা পাইবার আশায় এই কথাটিকে বেশ একটু রঙীন করিয়া আঁকিয়াছেন। যদি কখনও এই মেলায় সমাগত কোন পুরুষ বা নারী পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং যদি তাহারা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রী রূপে মিলিত হইবার ইচ্ছা করে, এবং সামাজিক কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে

তাহারা রাণার অনুমতি লইয়া পুরোহিতের দ্বারা যথাবিহিত ভাবে বিববাহিত হইতে পারে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রী-ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। বহুপূর্ব্বে পাহাড়ীরা যখন সভ্য হয় নাই, এবং ইংরাজ যখন এদিকে নিজের আধিপত্য ভালভাবে বিস্তার করিতে পারে নাই, তখন হয় ত ইহাদের ভিতর এইরূপ কোন প্রথা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অবৈধভাবে এই স্ত্রী-বিক্রয়ের কথা বিশ্বাস করিবার

শিবি মেলার একটি দৃশ্য

শিবি মেলার অপর একটি দৃশ্য

মত কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মেলার আর একটি বড় আকর্ষণ—পাহাড়ীদের তীর-ছোড়া, লাঠিখেলা ও কুস্তি (দঙ্গল)। পাহাড়ীদের তীরের লক্ষ্য এক আশ্চর্য্য জিনিষ। ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়—লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াই যেন অসম্ভব। যখন তাহারা সভ্য হয় নাই, তখন তাহারা এই তীর-ধনুক দিয়াই নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছে। আজও তাহারা নির্ভয়ে এই তীর-ধনুক লইয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুকের সম্মুখীন হয়। যেখানে এই মেলা বসে, সেই উপত্যকাটি বড় সুন্দর। পাহাড়ের কোলে বেশ খানিকটা সমতল জমি, চারিপাশে পাইন-'বরাশের' সারি, তাহার বুকের উপর দিয়া ছোট একটি ঝরণা বহিয়া গিয়াছে,—যেন একটি রূপালি রেখা পথ ভুলিয়া এই পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর আর পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

শ্রীসুনীলকুমার ধর

শেষ দান

—গল্প— —শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরা দুই বৎসর ধরিয়া একেবারে জল না হওয়ায় দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও তাহার চিরসহচর মড়ক দেখা দিয়াছে, আর তাহার ফলে ক্ষেত্রগঞ্জ জেলাটি প্রায় উজাড় হইতে বসিয়াছে।

রায় সাহেব ঠাকুরদাস আয়মাদার ক্ষেত্রগঞ্জের সরকারী উকীল, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ছোটখাট একটি জমিদারও। সদর এলাকাধীন ঈশানপুর গ্রামে কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, শুনিবামাত্রই তিনি কয়েকজন ডাক্তার ও ঔষধপত্রসহ ঈশানপুর রওনা হইলেন; ওরূপ বিপজ্জনক স্থানে এ সময় যাওয়া একেবারেই নিরাপদ নহে বলিয়া গৃহিণী জাহ্নবী দেবী বহু আপত্তি করিলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস বাবু তাহা শুনিলেন না। জাহ্নবী ঠাকুরাণী আগুন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় ৯টায় ঠাকুরদাস বাবু ঈশানপুর হইতে ফিরিলেন, সঙ্গে একটি ৭।৮ বৎসর বয়স্ক মুমূর্ষু বালক। একে তো স্বামী এই যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, কি জানি কি বিষ লইয়া আসিলেন, কপালে কি আছে, কি হইবে; তার উপর আবার এই মরণোন্মুখ রোগীকে ঘরে আনা? অপরাধ অমার্জ্জনীয়। জাহ্নবী দেবী একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল!—কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি স্বামীকে গোয়াল-বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাড়ীর মধ্যে ঐ কাপড়-চোপড়ে ডাকিতে সাহস হইল না।

ঠাকুরদাস বাবু আসিতেই নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে ঝঙ্কার দিয়া জাহ্নবী দেবী কহিলেন—"বলি, তোমার কি আক্কেল? বুদ্ধিশুদ্ধির হাঁড়ীতে কি গোবর গুলে' দিয়েচ?"

ঠাকুরদাস বাবু সেই প্রকৃতির লোক যিনি কখনও উচ্চ হাস্যে গড়াইয়া পড়েন না, কিম্বা ক্রোধে জ্ঞান হারান না, অথচ সর্ব্বদাই যাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা লাগিয়াই থাকে—এমন কি যাঁহার মুখভাব দেখিয়া মানসিক চাঞ্চল্যের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। বিপদে-আপদে, পরাজয়ে, পুত্রশোকে, অথবা মজলিশে, রঙ্গব্যঙ্গে, সম্পদে-সুখে সকল সময়েই স্থির নিষ্কম্প এবং নিস্তরঙ্গ,—আর মুখে সেই মৃদু হাসি।

কাজেই পত্নীর কথায় তাঁহার বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল না, মৃদুহাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? ব্যাপার কি? একেবারে যে রণ-চণ্ডী মূর্ত্তি!"

জাহ্নবী দেবী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন—"ব্যাপার কি? কোন্ মুখে জিজ্ঞেস কর্‌চ? বলি, আমাদি'কেও কি তোমার মেরে ফেল্‌বার মৎলব? তা, আমাদি'কে আজই রাত্রের ট্রেনে ক'লকাতা পাঠিয়ে দাও, দিয়ে তুমি যা' খুসী তাই কর'! তুমি তো বল্‌লে কোনও কথা শুনবে না? তাই ব'লে আমার খেলুকে তো আর মা হ'য়ে এমন ক'রে যমের হাতে সঁপে দিতে পারি না—"

খেলু অর্থাৎ শ্রীমান খেলাৎচন্দ্র, ঠাকুরদাস বাবুর ৭।৮ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র। খেলাতের পূর্ব্বে জাহ্নবী দেবীর পাঁচটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচে নাই, কেবল খেলু বাবাজীবনই দয়া করিয়া মাতার শূন্য কোল পূর্ণ করিয়া জীবিত আছেন। এইজন্য তিনি জননীর অত্যন্ত আদরের,—আর এই আদরের মাত্রাধিক্য হেতু এই বয়সেই পিতাকে পর্য্যন্ত রীতিমত কদলী-প্রদর্শন করিতে শিখিয়া ফেলিয়াছে। ঠাকুরদাস বাবু উক্ত পদার্থ দেখিবেন না বলিয়া সময় সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেও, পুত্রের গর্ভধারিণীর মধ্যস্থতায় তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে হইয়াছে।

ঠাকুরদাস কহিলেন—"কেন তুমি অকারণ ভীত হ'চ্ছ, গিন্নি? সাবধানে থেকো, খোকাকে সাবধানে রেখো, বা'র-

বাড়ীর দিকে এ ক'দিন আসতে দিও না—তা' হ'লেই হবে। ছিঃ—অমন অবুঝ হ'য়ো না, গিন্নি! কাঁদচ' কেন? চুপ কর'।"

জাহ্নবী দেবী ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"চুপ কর্‌ব কিগো? একে চারিদিকে এই কলেরা, রোজ সহরে ১৫।২০ জন ক'রে লোক মরচে, দেশসুদ্ধ সবাই ভয়ে সশঙ্কিত,—কত লোক দেশ ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ফেলে ছেলেপিলে নিয়ে পালাচ্ছে, আর তুমি কি না ঠিক সেই সময়ে পথের মড়া এনে ঘরে ভর্‌লে? কত ভাগ্যে, ম'রে ধ'রে ঐ একটা রোগা পট্‌কা ছেলে!—"

ঠাকুরদাস কহিলেন—"ছেলের জন্যে কেন মিছে ভাবচ? এ থাক্‌বে বা'র বাড়ীতে; তোমার ছেলে এদিকে দু'দিন না এলেই তো পারে। আহা, এ ছেলেটির কথা যদি শোন' তা' হ'লে তোমারও মায়া হবে, অমন কথা আর বল্‌বে না। সাধে কি এনেচি? এ-ও বামুনের ছেলে,—আমাদের খেনুরই সমবয়সী। ঈশানপুর গাঁখানা হ'য়েচে ঠিক যেন একটা শ্মশান! ঘরে ঘরে মড়া পচচে,—সৎকার পর্য্যন্ত হচ্ছে না। লোক কোথা, কে কার সৎকার কর্‌বে? এ ছেলেটির বাড়ীতে শুন্‌লাম, ওর মা আর এক বিধবা দিদি দু'জনে ম'রে প'ড়ে আছে; আর এ-ও ধুঁক্‌ছিল। যদি ফেলে আসতাম, তা' হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় ম'রে যেত'। আহা, একটা অমূল্য প্রাণ রক্ষা হ'ল,—আর তুমি এমনি কর্‌চ?"

গৃহিণী এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন—"তা' হ'লে তুমি রাজ্যের যত ঘাটের মড়া এনে তাদের অমূল্য প্রাণ সব বাঁচাও, আমাদি'কে ক'লকাতা পাঠিয়ে দাও; আমি খোকাকে নিয়ে এখানে কিছুতেই থাক্‌ব না, আজ রাত্রের গাড়ীতেই খোকাকে নিয়ে আমি চলে যাব!"

ঠাকুরদাস কহিলেন—"আচ্ছা, আমার যদি কলেরা হ'ত? তা' হ'লে তুমি কি কর্‌তে?"

গৃহিণী সশব্দ পদক্ষেপে "কথার ছিরি দেখ," "ভীমরতি ধরেচে পোড়াকপালে উকীলের," বলিতে বলিতে দাপাইতে দাপাইতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালকের নাম ইন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সে বাঁচিয়া উঠিল। প্রায় তিন মাস কাল ঠাকুরদাস বাবুর গৃহে সুপথ্যে ও সুনিয়মে থাকিয়া ইন্দ্রনাথ যখন বলসঞ্চয় করিল, তখন গৃহিণী আবার ধরিয়া বসিলেন—"এইবার ও পাপ বিদেয় কর', আর ব'সে ব'সে কদ্দিন ওকে খাওয়াবে?"

ঠাকুরদাস মৃদু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

জাহ্নবী দেবী হটিবার লোক নহেন; খোঁচা মারিয়া কহিলেন—"বলি, শুনচ' উকীল মশায়? ও কি তোমার গুরুপুত্তুর? আর কদ্দিন সেবা করবে? অনেক পুণ্যিই তো কুড়োলে! আর কেন? এইবার বিদেয় কর! এই আকালের বছরে, এই মাগ্যি-গণ্ডার দিনে, গুরু এলেও তো এতদিন রাখা যায় না।"

ঠাকুরদাস কহিলেন—"একটা ছোট ছেলেকে যদি দুটি খেতে দিতে না পার, তবে এমন সংসার নাইবা করলে? ঐ ছোট্ট ছেলে, ও আর কিই বা খায়? তাতে কি সংসারে কিছু কমে? আর আমাদেরও ভগবানের আশীর্ব্বাদে এমন কিছু দুর্দ্দশা এখনো হয় নি যে, একটা ছেলেকে চাট্টি খেতে দিতে পারব না! সে অবস্থা যখন হবে, তখন ও আপনিই যাবে—বলতে হবে না।"

গৃহিণীর আর সহ্য হইল না, তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন—"সে অবস্থা শত্তুরের হোক্! মুখের বাক্যি দেখ' না! তা' হ'লে রাস্তার যত লোক ধ'রে ধ'রে বাড়ী নিয়ে এসে জামাই-আদরে কেবল খাওয়াও! কেমন অপব্যয়-অপচয়ে সংসারটাকে নষ্ট করচ তুমিই। আমি বাড়ীর গিন্নি, পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে গেল, সদাই আমার তুচ্ছু আর তাচ্ছিল্যি! এতদিন গুছিয়ে গাছিয়ে হিসেব ক'রে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে ক'রে, কত রকম ক'রে আমি যদি সংসারটা না চালাতাম, দেখতে তা' হ'লে আজ এই জমিদারী কোত্থেকে আসতো! দাঁতের মর্ম্ম তো আর বুঝলে না, বুঝবে আমি চোখ বুজলে! পোড়া মরণ যে হয় না! আমি মরলে তুমি বাঁচো—"

ঠাকুরদাস বাধা দিয়া উত্তর দিলেন—"তুমি বেঁচে রয়েছ, তবু যখন মরি নি, তখন তুমি মরলে আবার আমি নূতন ক'রে বাঁচব' কি? কেন, মিছে কথা-কাটাকাটি করছ? ও ছেলেটি এখন যায় কোথায়?"

জাহ্নবী।—তা' হ'লে ওকে চিরকাল ভাত-কাপড় দিয়ে পুষ্‌তে হবে? কি বল্‌চ' তুমি?

ঠাকুর।—শুধু ভাত-কাপড় নয়, ওর লেখাপড়ার খরচ পর্য্যন্ত যোগাতে হবে—

জাহ্নবী দেবী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা ঝাঁকানি দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি ক্ষেপ্‌লে নাকি গো? তোমার আদিক্যেতা দেখে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে মন হ'চ্ছে! বলি, বিষয়সম্পত্তি সব যদি এমনি উড়োনচণ্ডীর মত উড়িয়ে দিয়ে যাও, তা হ'লে আমার খেলু কি পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাবে? ও ছোঁড়াটার জন্যে না হয় "দেব্‌তা"দাস আয়মাদার ছিল, আমার খেলাতের জন্যে কে থাক্‌বে? তুমি ভেবেছ কি—"

ঠাকুর।—আমি ঠিকই ভেবেছি। ও বামুনের ছেলে, ভদ্রসন্তান, লেখা পড়া না শিখ্‌লে ও ক'রে-ক'র্ম্মে খাবে কি ক'রে?

জাহ্নবী।—ও কি লেখাপড়া শিখে হাকিম হবে, না জজ্‌ ম্যাজিষ্টর হবে? আ-মোলো আপদ্—হাসিও পায়, লজ্জাও হয়! কথায় বলে,—'মা কাটে কানা কাপাসের সুতো

তার বেটার পায়ে চৌদ্দ সিকের জুতো!'

না, না, ও সব হবে-টবে না! অত অপব্যয় করবার মত টাকা-পয়সা আমাদের নেই। আর লেখাপড়া শিখে কাজ নেই, তার চেয়ে বামুনের ছেলে, হাঁড়ি ধর্‌তে শিখুক্—ক'রে খাবে।

ঠাকুর।—তোমার সব ছেলেগুলি যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত গিন্নি, তা' হ'লে তাদের সম্বন্ধেও কি আজ ঐ কথাই বল্‌তে? তোমার ছেলেরাও তো বামুনের ছেলে। তোমার ছেলে তার বাপের পয়সায় বাবুগিরি কর্‌বে, আর ঐ ভদ্রসন্তান লেখাপড়া শিখে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভদ্রভাবে দু' পয়সা রোজগার ক'রে সংসার-নির্ব্বাহ কর্‌বে, এটা আর তোমার সহ্য হ'চ্ছে না?

জাহ্নবী দেবী তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি? ঐ ভিখারীর ছেলের সঙ্গে আমার ছেলের তুলনা! তুমি বাপ হ'য়ে কোন্ মুখে এমন ছোট কথা যে মুখে আনো, তা' আমি কিছু ভেবে পাইনে—"

"তা হ'লে, সেবারকার মত আর একবার বাপের বাড়ী চ'লে যাও ছেলেকে নিয়ে! সেবার রোগের ছোঁয়াচের ভয় ছিল, এবার কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচ, সাবধান!"—বলিতে বলিতে ঠাকুরদাস বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন।

জাহ্নবী দেবী সেইখানে বসিয়া বসিয়া, কি করিয়া ইন্দ্রনাথকে তাড়ানো যায়, তাহারই উপায় আবিষ্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় দ্রুতপদে খেলাৎচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া জননীকে লক্ষ্য না করিয়া, একখানি ছবির পশ্চাৎ দিক হইতে কি একটা বস্তু মুষ্টিমধ্যে লুকাইয়া লইয়াই আবার তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল।

মা ডাকিলেন—"কিরে খেলু?"

থতমত খাইয়া খেলাৎ হাতদুইটি পিছনে লুকাইয়া যাইতে যাইতে কহিল—"ও একটা জিনিষ, মা! পেন্‌সিল—পেন্‌সিল্—উট্‌পেন্সিল—"

জাহ্নবীর কেমন একটা সন্দেহ হইল, তাড়াতাড়ি গিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন পুত্রের হাতে একটা অর্দ্ধভুক্ত সিগারেট্। জাহ্নবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, এ কিরে? তুই সিক্রেট খেতে ধরেচিস্ না কি? দাঁড়া—"

খেলাতের মুখ ও কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিল। কহিল—"আমি কেন খাব? ও ঐ ইন্দিরের—আমায় রাখতে দিয়েছিল রেখেছিলাম; এখন চাইছে তাই দিতে যাচ্ছি।"

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—"তাই তো বলি, খেলু কি আমার সেই ছেলে? দাঁড়া, দাঁড়া, আজই তোকে বাড়ী থেকে বিদেয় কর্‌ছি,—নইলে এই বদ্‌সঙ্গে মিশে খোকা পর্য্যন্ত মাটি হ'য়ে যাবে।"

খেলাৎচন্দ্র তার বহুপূর্ব্বেই বিজয়গর্ব্বে একদৌড়ে একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়া খাস্তগীরদের 'ইটখোলার বন্ধু' উদয়চন্দ্রের নিকট উদয় হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিল। জাহ্নবী দেবী বহু চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রনাথকে যখন বিদায় করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন স্বামী অপেক্ষা তাঁহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া এই নিঃসহায় শান্ত নিরীহ বালকটির উপর। ইহাকে যতপ্রকারে সম্ভব নির্য্যাতিত করিতে জাহ্নবী দেবী কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায় বিনা প্রতিবাদে নীরবে প্রশান্তমুখে সমস্ত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া, গৃহিণীর সব প্রয়াস যতই এক একটি করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার আক্রোশও বাড়িতে লাগিল। তিনি তাহাকে খাইতে দিতেও কার্পণ্য করিতে আরম্ভ করিলেন; এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামীর অসাক্ষাতে বহু বাক্য-যন্ত্রণা দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেও বলিতে সুরু করিলেন। ইন্দ্রনাথ ছল-ছল চক্ষে সকরুণ ভাবে নিঃসহায়ের মত এমন সকাতরে তাহার ডাগর চোখদু'টি তুলিয়া চাহিয়া থাকিত যে, তাহা দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইত, কিন্তু জাহ্নবী দেবীর অন্তরে তাহা রেখাপাত পর্য্যন্ত করিত না। ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে পলাইয়া আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরটিতে ঢুকিয়া ছোট্ট আধ-ময়লা বিছানাটাতে লুটাইয়া পড়িত এবং চোখের জলে আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করিত।

খেলাৎচন্দ্রের বহু দুষ্কার্য্য ইন্দ্রনাথের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া প্রথমাবধিই জাহ্নবী দেবী এই বালকটির উপর স্বামীর মন বিষাক্ত করিয়া দিতে বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস বাবুর ন্যায়বিচারে প্রকৃত দোষী বাহির হইয়া পড়ায়, প্রতিবারই গৃহিণীকে অপদস্থ ও পুত্রকে লাঞ্ছিত হইতে হইল। যদিও তদ্দ্বারা দুই জনের মধ্যে কাহারও কোনও শিক্ষা হয় নাই।

স্নেহময়ী জননীর প্রচুর সোহাগে এবং স্নেহান্ধতাজনিত কুশিক্ষায় খেলাৎচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই ধূমপান, মিথ্যা কথা বলা এবং পিতার পকেট হইতে দেখ্-না-দেখ্ টাকাটা-সিকেটা চুরি করিতে দিন দিন বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ফেলিল। বিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত খেলাৎচন্দ্রের বিদ্যার সবিশেষ নাম-ডাক রটিয়া গেল।

ঠাকুরদাস বাবুর কানে পুত্রের বহু কুকীর্ত্তির কথা পৌছিল; তিনি গৃহিণীকে বলিলেন—"শুন্ছ কি? আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথাটি ত' বেশ ক'রে খেলে। এইবার ছেলেকে সামলাবে কি ক'রে, সামলাও।"

জাহ্নবী দেবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, হ'ল কি তা'তে? ছেলেপিলের এমন একটু আধটু দুষ্টুমি ক'রেই থাকে! তা' নৈলে ছেলে বল্বে কেন? ওতে আর মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না! ওসব বড় হ'লে দু'দিনেই সেরে যাবে।"

ঠাকুর।—সেরে যাবে না, গিন্নি, এ বেড়ে যাবে। এ সব সারবার রোগ নয়! এই ছেলে নিয়ে শেষে বহু কষ্ট পেতে হবে, এ আমি এখন থেকে ব'লে রাখছি কিন্তু। ছেলের ভাল চাও তো, এখনো আমার কথা শোন'—আমার হাতে ওকে ছেড়ে দাও, কোনও কথাটি ব'লোনা, শুধু দেখে যাও আমি কি করি—দেখবে, দু'দিনে ছেলে ঠিক হ'য়ে যাবে।

জাহ্নবী।—না, তাই ব'লে তোমায় আমি ছেলেকে মার-ধোর করতে দেব' না। মরে' হেজে' কত ভাগ্যে ঐ পোকাটুকু, ও যে মুখ নামিয়ে বেড়াবে, এ আমি দেখতে পারব না!

ঠাকুরদাস বাবু হতাশভাবে শিরঃসঞ্চালন করিয়া হাত-দু'খানি উল্টাইয়া কহিলেন—"বেশ। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'—যা' ঘটবার, তা' এমনি ক'রেই ঘটে বটে!"

জাহ্নবী দেবী তীক্ষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ঘটবে আবার কি? হয়েছে কি? আমার ছেলে না হয় বি-এ, এম-এ পাশ না করল,' তাতে কি এমন হবে? তোমার ইন্দির তো করবে,—তা' হ'লেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে!"

ঠাকুরদাস বাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথাটি দোলাইয়া কহিলেন—"ইন্দিরের মত ছেলে হ'লে, তুমি ও আমি দু'জনেই বর্ত্তে যেতাম, সন্দেহ নাই। অমন ছেলে লাখে একটা মেলে কি না! খুব যেই ভাল ছেলে, সেই

এখনও এ বাড়ীতে টিঁকে আছে—মায়ে পোয়ে লেগে ঐটুকু দুধের ছেলের সর্ব্বনাশ করতে কি কিছু কসুর করেছ ?"

জাহ্নবী।—লাগিয়েচে; আঁটকুড়ির পুত আমার নামে সব লাগিয়েচে। এস' এইবার বাড়ীর মধ্যে, দোবো থাল-থাল ভাত, ছাই দোবো,—ভস্ম দোবো ! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোবো—

ঠাকুর।—ইন্দির সম্পূর্ণ নিরপরাধ। যে নিজের মিথ্যে দোষ ঝেড়ে ফেল্‌তে কখনো কোনও কথা কয় না, যে অম্লানবদনে তোমাদের চাপানো অপরাধের ভার বিনা-প্রতিবাদে নিজের মাথায় তুলে নেয়, সে কি কখন' লাগালাগি করে ? সে বল্‌বে কি ? আমি সব জানি। আমার সাক্ষাতেই না হয় তোমরা কিছু করতে সাহস কর' না, তাই ব'লে কি কর' না কর' সেসব খবরও কি আমার কাছে আসে না, ভেবেচ ? অমন ক'রে চেয়ে আছ কি ? তোমার গুণধর পুত্রই তার মায়ের এসব কীর্ত্তি যেখানে সেখানে ব'লে বেড়াচ্ছে,—আমি আজ বার-লাইব্রেরীতে শুনে এলাম।

জাহ্নবী দেবী স্বামীর মুখ হইতে চক্ষু নামাইয়া নীরবে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভাঙা-গলায় নিম্নস্বরে কহিলেন—"এসব ঐ বদ্ সঙ্গে মিশেই ও শিখেচে। ছোট লোকের ছেলের সঙ্গে সারাদিন মিশলে এ রকম ইতরামি শিখবেই তো ! এই জন্যেই তো ও ছোঁড়াটাকে আমি বিদেয় করতে চাই—"

ঠাকুর।—সে রকম যদি কিছু হবার সম্ভাবনা থাক্‌তো, তা' হ'লে আমিই তার ব্যবস্থা কর্‌তাম্, তোমার অপেক্ষা কর্‌তাম্ না। ইন্দিরের সঙ্গে তোমার ছেলে যদি ঠিকভাবে মিশতো, তা' হ'লে, হয় ত অতটা বেলেল্লা বেল্লিক হ'তো না, আর নয় ইন্দিরটাও এমনি বাঁদর হ'য়ে যেত। এখন ইন্দির যাতে খোকার সঙ্গে না মেশে, তার ব্যবস্থা করার দরকার হ'য়ে পড়েচে।

জাহ্নবী দেবী নীরবে অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুর।—তোমরা কি জান; তোমরা কল্‌কাতার লোক, নূতন কোনও লোকের বৈব সইতে পার না। কোনও অতিথি কি দুঃখীকে কিছু দিতে গেলে তোমরা কাতর হও। এক বেলার বেশী দু'বেলা যদি কাউকে দুটো খেতে দিতে হয়, তা' হ'লেই তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে যায়; তোমরা বড় স্বার্থপর। আমরা মফঃস্বলের লোক কিনা, আমরা ঠিক তার উল্টো। এ তো তোমায় আমি বিয়ে ক'রে থেকেই আজ প্রায় ৩০ বৎসরকাল ব'লে আসচি। পাড়াপড়শীকে যারা চেনে না, তারা আবার মানুষ ?

জাহ্নবী।—তা বেশ, আমরা মানুষ হই, অমানুষ হই, যা' তা' আমরাই আছি। এখানে থেকে ছেলে যখন খারাপ হ'চ্ছে, তখন দাওনা কেন ওকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে, সেখানে থেকে পড়ুক্।

ঠাকুর।—ও আর কি পড়বে ? দু'বছর আগে ইন্দিরকে আর খোকাকে একসঙ্গে দু'জনকে সিক্‌স্থ ক্লাসে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিলাম তো ? ইন্দির দু'বারই ফাষ্ট হ'ল—এবার সে উঠলো ফোর্থক্লাসে, আর শ্রীমান্ আমার এখনও সেই সিক্‌স্থ ক্লাসে ! এবার তবে বাবাজী ফেলের মধ্যে ফাষ্ট হয়েচে।

জাহ্নবী সাহ্লাদে কহিলেন—"ফেল্ হ'লেই বা, ফাষ্টো হয়েচে ত ?"

ঠাকুর।—হাঁ, তা' হয়েচে। তবে এ ফাষ্টো কি রকম জানো ? বাপধনের চেয়ে কম নম্বর কেউ পায় নি। ছেলে আমার লেখাপড়ায় শ্লো-রেসে বরাবরই ফাষ্ট, এইবার শীল্ড পাবে বোধ হয়।

জাহ্নবী দেবীর হিংসানল আবার উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া, তাঁহার প্রদত্ত অন্নবস্ত্রে মানুষ হইয়া এবং লেখাপড়া শিখিয়া, তাঁহারই পুত্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া দরিদ্র ইন্দ্রনাথ আগাইয়া কেন যাইবে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরও আট বৎসর কাটিয়া গেল। জাহ্নবী দেবী নিরুপায়। ইন্দ্রনাথ বাড়ীতেই রহিল, তাহার জন্য অপব্যয়েরও অন্ত নাই, কারণ বাড়ীর কর্ত্তা যে অবুঝ ! তবে স্বামীর কার্য্যের শেষ প্রতিবাদ স্বরূপ, তিনি ইদানীং ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আজ ৫।৬ বৎসর হইতে কোনও বাক্যালাপই আর করেন না। যেহেতু ইহাকে দেখিলে না কি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে।

পত্নীর মনোভাব অপরিবর্ত্তমান্ বুঝিয়া ঠাকুরদাস বাবু সংসারে শান্তিস্থাপন ও ইন্দ্রনাথের মনঃকষ্টলাঘব-মানসে ঝি চাকর ঠাকুরদিগকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছেন যে, ইন্দ্রনাথের খাবার জলখাবার প্রভৃতি সমস্ত জিনিষ যেন যথাসময়ে বাহিরেই আনিয়া দেওয়া হয়,—ইন্দ্রনাথের অন্দরে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রনাথ এ আদেশের মর্ম্মকথাটি বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞতায় গদ-গদ অন্তরে ঠাকুরদাস বাবুর চরণোদ্দেশে বারম্বার সেদিন প্রণাম করিয়াছিল।

উন্নতচরিত্র সর্ব্বজনমান্য ধনী সরকারী উকীলের খাতির যতটা সম্ভব, স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় খেলাৎচন্দ্রের জন্য বাধ্য হইয়া তাহা করিলেন। তদ্বারা খেলাৎ এই আট বৎসরে ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত উঠিল; ইহার পরেই পাথরের দুয়ার—যাহা নিজের ক্ষমতায় খুলিতে হয়, যেখানে পিতৃপুণ্য নিষ্ফল। খেলাৎ এ অসাধ্যসাধনের জন্য মোটেই চিন্তিত হইল না, কাজেই তাহার নিকট সে দরজা চিরদিনের মত রুদ্ধই রহিয়া গেল। খেলাৎ লেখাপড়া ছাড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মা পুত্রের বিবাহ দিয়া, টুক্‌টুকে ডাগর একটি বউ আনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। খেলাৎও কিছুদিনের জন্য বাহিরের সব আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ঘরেই প্রেমমহাবিদ্যালয় খুলিয়া বসিল।

ইন্দ্রনাথ এই সময়ে ম্যাট্রিকুলেশনে ও আই-এতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া সসম্মানে বি-এ ও এম্-এ পাশ করিয়া ফেলিল। ইন্দ্রনাথ কলিকাতাতেই থাকে; ছেলে পড়াইয়াই প্রায় সে নিজের বাসাখরচ চালায়, কখনও কিছু বাড়তি প্রয়োজন হইলে ঠাকুরদাস বাবুকে লেখে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠাইয়া দেন। ইন্দ্রনাথ যে তাঁহার সাহায্য লয় না, এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত, অথচ ইহার আত্মনির্ভর হইবার প্রচেষ্টাকে খর্ব্ব করিতেও নিমি প্রস্তুত নহেন; তাই প্রতি পত্রেই তিনি ইন্দ্রনাথকে লেখেন, যেন সে অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে গিয়া আসল কার্য্যটি না পণ্ড করে। ইন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস বাবুর চিত্তমাহাত্ম্যের এই ইঙ্গিতটুকু সম্পূর্ণরূপেই বুঝিত ও তাহার যথাযথ উত্তরও দিত।

৮।১০ দিন যাবৎ ইন্দ্রনাথের কোনও পত্রাদি না পাইয়া ঠাকুরদাস বাবু কলিকাতা চলিয়া আসিয়া দেখিল যে ইন্দ্রনাথের জলবসন্ত হইয়াছিল, গুটীগুলি এখন ক্রমশঃ শুকাইতেছে ও দাগগুলি মিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অপরাহ্ন। তেতলার ছাদে ইন্দ্রনাথ ও ঠাকুরদাস উভয়ে কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছেন।

ঠাকুর।—এইবার একটা বিয়ে থাওয়া কর,' বাবা! তোমায় সংসার বেঁধে না দিয়ে গেলে যে আমার কর্ত্তব্য পূর্ণ হবে না, ইন্দির! তুমি ভাবচ' কি, চাক্‌রী তোমার ভালই হবে দেখে নিও। আমার শরীরটাও বড় ভাল নয়, বুড়ো হয়েচি, কবে আছি, কবে না—

ইন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে, সবিনয়ে ও নতনেত্রে ধীরে ধীরে কহিল—"ইউনিভারসিটি থেকে আমায় বিলেত পাঠাবার মতলব করেছে, কিন্তু আপনার মত না নিয়ে, বাবা, আমি তাঁ'দিকে কিছুই বল্‌তে পারি নি—"

ঠাকুরদাস বাবুর আহ্লাদ তাঁহার স্থির নিস্তরঙ্গ মুখেও যেন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন—"বেশ, এ অতি উত্তম কথা! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমার কোনও অমত নেই।"

ইন্দ্র।—আমার খুবই ইচ্ছে, বাবা—

ঠাকুর।—তা হ'লে যেতে পার। তবে এখন বিয়ে থাক্—

ইন্দ্রনাথ বুঝিল, কেন ঠাকুরদাস বাবু বিবাহ স্থগিত করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিলেন। ভক্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

ঠাকুরদাস বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"এতেও তো তুমি আমার সাহায্য নেবে না, দেখচি! মাসে মাসে যে বৃত্তির টাকাটা পাবে, তাতে তোমার খরচ কুলোবে ত?

ইন্দ্র।—কুলোবে।

ঠাকুর।—তবে এখন কিছু টাকার দরকার। কতকগুলি পোষাক-টোষাক করাতে হবে,ত? কালই চল একটা ইংরেজের দোকানে অর্ডার দিয়ে দিইগে—আর কি কি

জিনিষের প্রয়োজন, সংবাদ নাও, একটা ফর্দ্দ কর,' আমি সব জোগাড় ক'রে দিয়ে তবে ফিরে যাব'।

* * * *

তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইন্দ্রনাথ সাশ্রুনয়নে বারম্বার ঠাকুরদাস বাবুকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার পদধূলি লইয়াও যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। অবশেষে গাড়ীর শেষ ঘণ্টা হইল, ইন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিয়া দুয়ারের কাছে ঠাকুরদাস বাবুর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিমেষ মধ্যে গাড়ী প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া পথে আসিয়া পড়িল। ইন্দ্রনাথ মুহ্যমান হইয়া নিজের জায়গায় গিয়া চুপটি করিয়া বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিঞ্চিন্ন্যূন চারি বৎসর কাল বিলাতে অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়াই ইন্দ্রনাথ ক্ষেত্রগঞ্জে গেল। কারণ, ইদানীং প্রায় তিন বৎসর কাল ঠাকুরদাস বাবুর কোনও চিঠি-পত্রাদি না পাইয়া ইন্দ্রনাথ শুধু যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই নহে, সে বিলক্ষণ মর্ম্মপীড়াও অনুভব করিতেছিল। ত্রিকুলে ইন্দ্রনাথের কেহই ছিল না; সহপাঠী ২।৪ জন বন্ধুবান্ধব যাহারা ছিল প্রথম প্রথম তাহারা খুব চিঠি-পত্রাদি লিখিত, ইন্দ্রনাথও উত্তর দিত, কিন্তু ক্রমশঃ সেসব বন্ধুত্বের তাপ মন্দ হইতে হইতে একেবারে শীতল হইয়া গেল,—কেবল যায় নাই ঠাকুরদাস বাবুর। আর কাহারও চিঠির ইন্দ্রনাথ বড় ভরসা করিত না, কেবল ঠাকুরদাস বাবুর চিঠির আশায় সে প্রতিটি দিন উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত—এবং উপযুক্ত সময়ে সেই প্রতীক্ষিত চিঠিখানি স্নেহময় দরদী বন্ধুর ন্যায় অতি নিয়মিত ভাবে আসিতই, কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই। অথচ একদিন যেমন বন্ধ হইল, আর তাহা আজ পর্য্যন্ত আসিল না। প্রথম প্রথম ইন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিল, হয় ডাক ছাড়িয়া গিয়াছে, নয় ব্যস্ততানিবন্ধন লেখা হইয়া উঠে নাই, কিম্বা ভুলিয়া গিয়াছেন—এইরূপ কিছু-না-কিছু; কিন্তু দীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে যখন আর একখানি চিঠিও আসিল না, তখন সে যে তাহার অশান্ত মনকে কি দিয়া সান্ত্বনা দিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ষ্টেশনে আসিয়া ইন্দ্রনাথ শুনিল, ঠাকুরদাস বাবু আজ প্রায় তিন বৎসরকাল হইল হঠাৎ অপস্মার রোগে মারা গিয়াছেন। শুনিয়াই ইন্দ্রনাথ শিশুর মত উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল,—কোনও মতে নিজেকে সামলাইতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনি ফিরিয়া যায়, কারণ যাঁহার জন্য আসা তিনিই যখন নাই, তখন আর এখানে থাকিয়া ফল কি? কিন্তু বেলা চারিটার পূর্ব্বে কোনও গাড়ী না থাকায়, বাধ্য হইয়া তাহাকে ডাক্-বাংলায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এতদিনে সে যেন সত্য সত্যই পিতৃহীন হইল!

যখন এতদূর আসিয়াছে এবং দিন-ভোর থাকিতেও হইল, তখন জাহ্নবী দেবী ও খেলাতের সঙ্গে দেখাটা না করিয়া গেলে ভাল দেখায় না, তাই বেলা একটার সময় ইন্দ্রনাথ অত সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত তাহার একান্ত দুর্দ্দিনের আশ্রয়-ভবনে ধীরে ধীরে ভারাতুর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জাহ্নবী প্রথমটা স্বামীর শোকে খুব একচোট কাঁদিয়া লইলেন; তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার বড় আদরের দুলাল খেলাৎচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী সবিশেষে সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করিয়া ইন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন—"বাবা, তোমায় অনেক কুকথা বলেচি, অনেক যন্ত্রণা দিয়েচি, সে সব কিছু মনে রেখ' না, বাবা! তুমি আমার বড় ছেলে, জ্যেষ্ঠ ছেলে—তুমিই তোমার ছোট ভাইটিকে সৎপথে ফেরাতে পার্‌বে, ফেরাও বাবা!—এই দুঃখিনীদের মুখ চেয়ে তোমায় এ কর্‌তেই হবে। আমি তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি বাবা, আমি তোমায় পেটেই ধরি নি, কিন্তু তোমার মা তো বটে! আমরা ধনে প্রাণে হাভাত হ'লাম, বাবা! অত বিষয়-সম্পত্তি, নগদ টাকা,—এই তিন বছরের মধ্যে সব ফুট্‌কড়াই হ'য়ে উড়ে গেলো! কি ডোক্‌লা ছেলে, বাবা—এইবার নিজেই বা খাব কি আর এই অপুষ্যিগুলোকেই বা খাওয়াব কি? পথে বসেছি, বাবা, পথে বসেছি!"

ইন্দ্রনাথ জাহ্নবী দেবীর ভাবান্তর দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু খেলাতের ক্রিয়াকলাপ শুনিয়া তাহার

সর্ব্ব শরীরে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কহিল—"আচ্ছা মা, আমি দেখছি এর কোনও বিহিত করতে পারি কি না। কেঁদে কি করবেন, বলুন? কেঁদে তো আর কোনও ফল হবে না। আপনি স্থির হোন—"

এমন সময় খেলাতের ৪।৫ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র একটা ডিবের বাটিতে করিয়া কয়েকটি পাণ, একটা পাণের টুক্‌রাতে একটু চূণ এবং কয়েকটা পাণের বোঁটা রাখিয়া দিয়া সন্ত্রস্তভাবে ঠাকুরমার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

জাহ্নবী দেবী কহিলেন—"এইটি খেলুর প্রথম ছেলে; এর পিঠে আরো দু'টি মেয়ে! বৌমাটি আমার বড় লক্ষ্মী। নামেও সুশীলা কাজেও সুশীলা, কিন্তু তা হ'লে হবে কি? অমন যে পটের সুন্দরী মেয়ে, তার চেহারায় আর কি কিছু আছে? সারা দিনে রেতে সতীলক্ষ্মীর আমার চোখের জল আর শুকোচ্ছে না,—মনের দুঃখে বৌমার কঠিন রোগ জন্মে গেছে। শরীরে আর আছে কি?—ঠেলা মারলে প'ড়ে যায়! তা' আর হবে না? সোমত্ত মেয়ে, উপযুক্ত স্বামী, বাইরে ভূত নেত্য করবে, তা'তে কি পরিবারের মন ভাল থাকে?"

পাশের ঘরে খেলাতের জ্যেষ্ঠাকন্যার কান্না শুনিয়া জাহ্নবী দেবী বধূকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"টেপী বুঝি উঠলো বৌমা—"

তাহার পর কি করিয়া খেলাৎচন্দ্র তাহার বন্ধু উদয়চন্দ্র খাস্তগীরের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিয়া অবাধে গণিকালয়ে গমন করিতে শিখিল এবং কেমন করিয়া টাকা-পয়সা বিষয়-আশয় সব অপব্যয় করিতে লাগিল, তাহার বিস্তারিত অশ্রুসজল ইতিহাস শুনাইয়া দিয়া তিনি কহিলেন—"এখন সে তো একেবারে উন্মত্ত বাবা! ক'লকাতা হ'তে স্বরূপিণী ব'লে একজন স্ত্রীলোককে এনে বাড়ী কিনে দিয়ে এখানে রেখেছে, নিজেও সেইখানেই থাকে। মাসে দু'মাসে দশবার ডেকে পাঠালে তবে একআধবার আসে, তাও পাঁচ-সাত মিনিটের জন্যে। বিষয়সম্পত্তি একে একে সেই রাক্ষুসীর পেটেই গেল। এখন থাক্‌বার মধ্যে আছে শুধু এই বাড়ীখানা, আর আমার গায়ের বা' দু'চারখানা গহনা ছিল তাই—ওকে লুকিয়ে রেখেছিলাম ব'লে বেঁচেছে। জান্‌তে পারলে কোন্‌দিন টেনে নিয়ে যেত'। এও কি থাকৃত? বৌমার গায়ে একরত্তি সোনা বলতে আর নেই, সব মার-ধোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। অত গয়না—একঝুড়ি গয়না—কি সব গয়নার শোভা!—কি করি বাবা ইন্দির, খোকা আমার এমন কি ক'রে হ'ল?"

ইন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখিল—চারিটা বাজে। ইঁহাদের এই করুণ দুঃখকাহিনী শুনিয়া ইন্দ্রনাথের হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল; সেদিন কলিকাতা ফিরিবার আশা সে পরিত্যাগ করিল। খেলাতের ঈদৃশ অধঃপতনে এবং ঠাকুরদাসবাবুর সংসারে ঈদৃশ বিশৃঙ্খলা ও দুরবস্থা হওয়ায় ইন্দ্রনাথ সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল। কহিল—"আচ্ছা মা, আমি এখন ডাক্‌-বাংলায় চললাম; আজই হোক্‌, কালই হোক্‌, খেলাৎকে ডাকিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখছি, যদি তাকে সুপথে আন্‌তে পারি। তবে ভরসা বড় কম; আপনারা যখন পারেন নি, তখন আমার কথা সে কি শুনবে? তবু আমি চেষ্টা ক'রে দেখি—"

বাস্তবিক সাতদিন কাল ক্ষেত্রগঞ্জ ডাক-বাংলায় থাকিয়া ইন্দ্রনাথ খেলাৎকে সৎপথে ফিরাইতে সম্ভব-অসম্ভব নানা উপায় অবলম্বন করিল, সাধ্যমতে কিছু ত্রুটি করিল না; এজন্য খেলাতের ও উদয় প্রভৃতি তাহার মোসাহেবগণের হাতে বহু লাঞ্ছনাও সহ্য করিল, কিন্তু তাহাতে সুফল তো কিছু ফলিল না, উপরন্তু একদিন ইতরজনোচিত অপমান লাভ করিয়া ইন্দ্রনাথ হতাশ, ম্লান ও অবসন্ন হইয়া বাসায় ফিরিল। সেই তাহার শেষ দিন। জাহ্নবী দেবীকে মোটামুটি গিয়া জানাইল যে খেলাতের সংস্কার তাহার অসাধ্য এবং এ কার্য্যে আর সে জীবনে হাত দিবে না, ইহাতে তাঁহাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক। তবে তাঁহারা যদি কোনও দিন অন্য কোনও উপায়ে তাহার সাহায্য চাহেন, তাহা হইলে সে পরমানন্দে সে-আদেশ প্রতিপালন করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরও বৎসরাধিক কাটিল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রনাথ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চ বেতনে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার সহপাঠী ও বিলাতের

পথের সহযাত্রী, অধুনা ব্যারিষ্টার টরেশ পণ্ডিতের সুন্দরী সুশিক্ষিতা ও বি-এ পাশ-করা বিদুষী ভগিনী তমালিনীকে বিবাহ করিয়া, সে সম্প্রতি সুখের সংসার পাতিয়াছে। ইন্দ্রনাথের চক্ষে জগৎ সুন্দর, তাহার মনে কোথাও আর কোনও রাগ নাই দ্বেষ নাই অভিমান নাই—হৃদয়খানি পরের দুঃখে সমবেদনায় কারুণ্যে পরিপূর্ণ।

এমন সময় একদিন প্রভাতে জাহ্নবী দেবী সুশীলা ও তাহার তিনটি সন্তানকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বসতবাটীখানি পর্য্যন্ত খেলাতের ঋণদায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে,—তাঁহারা আজ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অন্নবস্ত্রহীন! স্বরূপিণী মৃত, তাহার শোকে খেলাৎও নিরুদ্দেশ। জাহ্নবী দেবী বড় আশা করিয়া ভ্রাতার নিকট আশ্রয় লইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হাঁকাইয়া দিয়াছেন। তিনি ছা-পোষা মানুষ, ভগিনীর এত বড় সংসারের ভার লইতে তিনি অপারগ। তবে ইহাঁরা ইহাদের নিজের ব্যয়ভার যদি বহন করিতে পারে, তাহা হইলে ভ্রাতা কৃপাপরবশ হইয়া বিনা ভাড়ায় গৃহে স্থানটা শুধু দিতে পারেন মাত্র, ইহার অধিক আর কিছুই করিতে তাঁহার সাধ্যে কুলাইবে না।

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কিছু নগদ দিয়া, আমরণ মাসিক একশত টাকা করিয়া মাসোহারা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। সে যে এখন দিতেই চায়—শুধু দিবার জন্য, পরের অশ্রু মুছাইবার জন্যই তাহার প্রাণ যে এখন বড় ব্যাকুল। দানের মাধুর্য্যে ইন্দ্রনাথের অন্তরখানিতে যেন খানিকটা ভারের লাঘব হইল।

ইন্দ্রনাথের ঈদৃশ হঠাৎ-কার্য্যে জাহ্নবী দেবী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পাথরের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। সুশীলা তমালিনীকে জড়াইয়া কেবলি কাঁদিল। যাইবার সময় গদ্‌গদ্ কণ্ঠে শুধু বলিল—"দিদি, তুমি বড় ভাগ্যবতী। ঠাকুরপো মানুষ নন্—দেবতা।"

তমালিনী কহিল—"উনি বলেন, এ দেবত্বের বীজ ওঁর অন্তরে তোমার শ্বশুরই পুঁতে দিয়ে গেছেন। কেঁদোনা বোন্, আবার সুদিন আস্‌বে।—সংসারের নিয়মই এই।"

সুশীলা সুদিনের আগমন বিষয়ে হতাশ হইলেও, মুখে সে কথাটা প্রকাশ করিতে পারিল না।

জাহ্নবী দেবী বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা, ইন্দির, এসব নোট্ আমি কি তবে সত্যি নিয়ে যাব?"

ইন্দ্রনাথ অন্যদিকে চাহিয়া ধরা-গলায় কহিল—"হাঁ মা, ও আপনারই হাল্‌ফিল্ খরচ কর্‌বার জন্যে।"

জাহ্নবী দেবী সন্দিগ্ধ ভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে ঐ যে বল্‌লে, মাসে মাসে একশো ক'রে—"

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ কহিল—"সে তো আলাদা মা, কী মাসেই আমি নিজে গিয়ে আপনাকে সে টাকা পৌঁছে দিয়ে আসবো, আপনাকে তার জন্যে কষ্ট ক'রে আর আসতে হবে না।"

জাহ্নবী দেবীর মাথার মধ্যে আগাগোড়া সব গোলমাল ঠেকিতেছিল; সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন ঝাপসা একটা রহস্য বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

তিন চারি মাস পরে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন একদিন পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন—"তা দেবে না? মাসে একশো টাকা, এ আর বেশী কি? এই যে এতকাল আমরা ওর পেছনে হাজারে হাজারে খরচ করেছি, তবে তো ও আজ মানুষের মত হয়েছে? আমরা যা' খরচ করেছি, এ তার সুদের সুদও নয়—"

পৌষ মাস; দুরন্ত শীত; অপরাহ্ন। ইন্দ্রনাথ ও তমালিনী পড়িবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছে ও গল্প করিতেছে। হঠাৎ দরজার কাছে খেলাৎচন্দ্র! ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে?—কে তুমি?" স্বর ভয়-মিশ্রিত।

খেলাৎচন্দ্র বক্রহাসি হাসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর দিল—"নতুন্ বড় লোক হ'য়েছ কি না, তাই আমায় চিন্‌তে পারছ না। চিরকালটা ত আমার বাপের ভাত মেরে মানুষ হ'লে, আজ সেটা মনে কর্‌তে লজ্জা হচ্ছে বুঝি?—তা' যদি হয়, তা হ'লে বল চ'লে যাই।"

ম্লান হাসি হাসিয়া ইন্দ্রনাথ সত্বর উঠিয়া আসিয়া খেলাতের

হাতটি ধরিয়া ফেলিয়া কহিল—"মাফ করো ভাই খেলু, সত্যি তোমায় প্রথমটা চিন্‌তে পারি নি। তোমার চেহারা কি হয়েছে, একবার দেখেছ?—কার সাধ্যি তোমায় পরিচয় না দিলে চেনে? এস, এস, বসবে এস,—চা খাও—"

সম্মুখে ছয় ইঞ্চি ও পশ্চাতে আধ ইঞ্চি করিয়া চুল ছাঁটা, তেলের অভাবে ও ধূলায় চুলে কটা রংয়ের ছোপ পড়িয়াছে; মুখে, হাতে পায়ে গোল গোল কোনও রোগের শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন; নিষ্প্রভ কালিঢালা বসা-চোখ; নাকের ডগা মোটা; অপরিষ্কার দাঁত; কালো পুরু ঠোঁট; গালে উঁচু উঁচু হাড় বেরুনো; বাম কানের উপর আধখানা পোড়া বিড়ি গোঁজা; অক্ষৌরিত মুখমণ্ডল। পরিধানে অত্যন্ত ময়লা একখানা দেশী ধুতি; গায়ে ময়লা ধূলা ও তেলের চিটে ভরা কাশ্মীরী চেকের পুরোনো একটা কোট; তাহার উপর শালের কল্‌কাদার একখানা ছেঁড়া আলোয়ান্; পায়ে দুইপাটিতে পাঁচটা তালি-মারা কালো একজোড়া অতি পুরাতন কোর্টশু। গায়ে একটা বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ। তাহার নির্লজ্জ ক্ষুধিত লুব্ধ তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া তমালিনী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

তাহার বর্ত্তমান চেহারা ও সাজসজ্জা দেখিয়া বাস্তবিকই প্রথম-নজরে তাহাকে খেলাৎ বলিয়া চেনা শক্ত।

খেলাৎকে নিজের পাশে টানিয়া বসাইয়া, তমালিনীকে ইন্দ্রনাথ চা দিতে ইঙ্গিত করিল। তমালিনী একটা কাজ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে খেলাৎ কহিল—"দাও তবে চা-ই খাওয়া যাক্, অগত্যে। এটি কে? বউ না কি? বাঃ বেশ জুটিয়েচ ত' ইন্দির দা,—একেবার তৈরি বৌ যে! বেশ বাবা, খুব ভাগ্যি তোমার!" বলিয়াই তমালিনীর পানে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

খেলাতের কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডলে হঠাৎ রক্তের বন্যা বহিয়া গেল, অতর্কিতে হাতটা কাঁপিয়া উঠিয়া 'চা-দানীর' ঢাক্‌নিটি চায়ের পেয়ালার উপর পড়িয়া গিয়া পেয়ালা ও পিরিচটি ভাঙিয়া, টেবিলে চা পড়িয়া একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তমালিনীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল; সমস্ত জব্যস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সে নীরবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

খেলাৎ ভদ্রতা জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে কহিল—"থাক্‌গে, যাক্, আর চায়ে কাজ নেই, চা-ফা বড় আমি খাই না। চা'র চেয়ে এই সন্ধ্যে বেলা, শীতে, অন্য যদি কিছু থাকে তো দাও, একটু খাই। আজ প্রায় ৮।১০ দিন সে-জিনিষের মুখ পর্য্যন্ত দেখি নি। কি,—চুপ ক'রে রইলে যে?"

ইন্দ্রনাথ কহিল—"তারপর উঠেচ কোথা? মা, বৌদিদি এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেচ?—"

খেলাৎচন্দ্র রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে কহিল—"কি বাবা, এরই মধ্যে 'খেলু'-কর্‌বার মতলব? আচ্ছা লোক তো? ভয় কি? কোনও ভয় নেই! একটু জায়গা-টায়গা দাও ভাই, ২।৪ দিন এখানে থাক্‌তে হবে। উঠ্‌বো আর কোথায়? উঠ্‌বার কি আর কোথাও স্থান আছে!"

ইন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল; কোনও রকমে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া কহিল—"তা' বেশ, তা' থাক, থাক্‌বে বই কি? ছোট ভাই আমি তোমার। তবে তোমার ছেলেপিলেরা সব এখানে, তোমার মামার বাড়ীতে আছে,—তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবে না?"

"সে হবে পরে। সতেরোটা ছেলের মা হ'লে কি আর বৌয়ের উপর টান থাকে, ভাই? দিনরাত্তির প্যান্‌-প্যানানি ভ্যান্-ভ্যানানি, ছেলেপিলের ট্যা-ট্যায়ানি, সময় নেই অসময় নেই এটা দাও সেটা দাও,—এসব কি আর ভালো লাগে? আমরা, বাবা, সুখের পায়রা—" বলিতে বলিতে কানের উপর হইতে অর্দ্ধভুক্ত বিড়িটা ধরাইয়া সজোরে একটা টান দিয়া, ঘরের মেঝের খানিকটা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া, কাসিতে কাসিতে খেলাৎচন্দ্র কহিল—"মালটাল তো নেই বুঝচি, তা' এক আধটা সিগ্রেট ফিগ্রেটও তো দাও—"

ইন্দ্রনাথ বিপন্নভাবে কহিল—"আমি তো ওসব কিছুই খাই না, ভাই।"

খেলাৎচন্দ্র সহাস্যে কহিল—"আরে, তুমি না খাও, আমার জন্যে আনিয়েও তো দিতে পার। তাই না হয় দিলে ?"

এটা ইন্দ্রনাথের এতক্ষণ খেয়ালই হয় নাই, সে যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল। এমন সময় ভৃত্য এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু বাজারের খাবার সাজাইয়া আনিয়া খেলাতের সম্মুখে রাখিল। ইন্দ্রনাথ তাহাকে সিগারেট আনিতে বলিল।

খেলাৎচন্দ্র খুসী হইয়া কহিল—"হাঁ, একেই বলে ওয়াইফ—দেখ' দেখি ? আর আমাদের সে কি আর—হেঃ! সাধে কি বাইরে বাইরে ঘুরি ? অনেক দুঃখে রে ভাই, অনেক দুঃখে! এমন ওয়াইফ পেলে আমিও ঘর ছেড়ে এক পা নড়ি না।"

ইন্দ্রনাথ খেলাতের কথাবার্ত্তায় স্তম্ভিত।

খেলাৎ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বউয়ের নাম কি ভাই, ইন্দির! শুনছি বি-এ পাশ না কি ?"

ইন্দ্রনাথ কোনও রকমে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল—"বি-এ পাশ করেছেন, ঠিক শুনেচ। নাম—তমালিনী।"

খেলাৎ খাইতে খাইতে নিজের মনেই কহিল—"তমালিনী!—নামটিও তো বেশ ভাই! আহা, (সুর করিয়া) 'মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরি ডালে!' কি সুন্দর গাইত স্বরূপিনী—" চা ও খাদ্যগুলি উদরস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, তোমার বউ কৈ ? আর এদিকে আসে না যে ? লজ্জা হ'ল না কি ?"

ইন্দ্রনাথ মনে মনে এবার বিলক্ষণ চটিল, কিন্তু এরূপ অসভ্য অপদার্থের উপর চটাও বিপজ্জনক, কাজেই এইসব অপমান তাহাকে নীরবে নিঃসহায় নিরুপায় শিশুর মতই বরদাস্ত করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খেলাৎকে এরূপ দীনবেশে ভিক্ষুকের মত তাহার গৃহে দেখিয়া, সেদিন ইন্দ্রনাথ প্রথমটায় এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যেন সে শিক্ষিত সভ্য ও ভদ্র হইয়া খেলাতের কাছে কতই লজ্জিত, কত অপরাধী, কত ছোট। এক-মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত বাল্যজীবনখানি তাহার মনশ্চক্ষে বায়স্কোপের ছবির মত ফুটিয়া উঠিল, এবং সেইসব পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে করুণস্বরে শুধু একটা গানই ঐক্যতানে কেবল বাজিতেছিল; সে গানটি—"মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং। * * * চলচ্চিত্ত চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনং।"

কাজেই প্রথমে ইন্দ্রনাথ খেলাৎকে যে ভাবে গ্রহণ করিতে গিয়াছিল, দু'চারিটি কথাবার্ত্তায় কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিল যে, এ ব্যক্তির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করাই শক্ত, আর তার চেয়েও শক্ত ইহাকে কোনও ভদ্রপরিবারে স্থানে দেওয়া। তবু কি করে ? এ যে ঠাকুরদাস বাবুর পুত্র,—অবস্থাবিপর্য্যয়ে ইন্দ্রনাথের দুয়ারেই আজ প্রার্থী!

যাহাকে মুখ ফুটিয়া চলিয়া যাইতে বলা শক্ত, এবং ইঙ্গিত যে বুঝে না, অথচ যাহার সঙ্গ বিষবৎ, তাহাকে লইয়া বাস করাও যেমন কষ্টকর, তাহাকে তাড়ানোও তেমনি কষ্টসাধ্য।

ইন্দ্রনাথ খেলাতের জন্য নীচে তাহার সুসজ্জিত বসিবার কক্ষখানি ছাড়িয়া দিয়াছে। খেলাৎ সেইখানে থাকে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গেই আহার করে, খাবার খায় ও একতলার কলেই কার্য্য সারে। তমালিনী খেলাতের সম্মুখে আর বাহিরই হয় না।

ইন্দ্রনাথ ও তমালিনী উভয়েই ভাবিয়াছিল যে, দুই চারি দিনেই এ পাপ যখন বিদায় হইবে, তখন এ কয়দিন একটু সাবধানেই না হয় থাকা গেল। কিন্তু প্রায় তিন সপ্তাহ হইয়া গেল, খেলাৎচন্দ্রের সেরূপ কোনও অভিলাষ প্রকাশ পাইল না।

ইন্দ্রনাথ কহিল—"ভাল ভাবে, ভদ্রলোকের মত যদি থাকে, তবে থাক্ না। চিরকাল থাক্; আমি পরম আনন্দে যেমন ওর সংসারের ভার নিয়েচি, তেমনি ওরও ভার নিচ্ছি, আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু ঐ যে অসভ্যতা, অশ্লীলতা, ইতরামির দোষ—ঐ জন্যেই তো আমি বিরক্ত হই।"

তমালিনী কহিল—"তা' বৈকি! আহা, বেচারাকে দেখলে বড় কষ্টও হয়! লেখাপড়া শেখে নি, সৎসঙ্গে কখনও বেড়ায় নি, কোনও সভ্যসমাজে জীবনে মেশে নি—চিরটা কাল জ্যান্ত নরকে বাস ক'রে এসেচে; ওকে দোষই বা আর কি দোবো? তবে বড্ড যখন বাড়াবাড়ি করে, তখন বড় রাগ হয়। এইবার তোমার সঙ্গে পড়েচে, ভাল হ'য়ে যেতে পারে—"

ইন্দ্রনাথ হতাশভাবে কহিল—"ও ভাল হবে? অসম্ভব! অবে আজকাল অসভ্যতা করলে ছোটখাট ধমকধামক্ দিই। তা'তেও আমার উপর চটে, বুঝতে পারি—কিন্তু শাসন না করলেও যে চলে না!"

তমালিনী ম্লানভাবে একটু হাসিয়া কহিল—"তা বটে; তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হ'চ্ছে ওর রসিকতাগুলি। দয়া ক'রে এই কার্য্যটি যদি ও ছেড়ে দিয়ে কাজের কথাই শুধু কয়, তা' হ'লেও বরং সহ্য করা যায়; কিন্তু রসিকতা? একেবারে মারাত্মক!"

প্রথম কয়েকদিন ইন্দ্রনাথ কলেজে চলিয়া গেলে, খেলাৎ একটা দিবানিদ্রাতেই পাঁচটা বাজাইয়া দিত, কিন্তু ইদানীং তাহার নিদ্রা কি দিবসে কি রাত্রিতে ক্রমশঃ অত্যন্ত কমিতে লাগিল। দিনটা কোনও রকমে হিন্দুস্থানী পাণওয়ালার কাছে দাঁড়াইয়া, "স্বরাজ রেষ্টুরেন্টে"র বেঞ্চিতে বসিয়া তাহার সত্বাধিকারীর সঙ্গে গল্প করিয়া, কখনও বা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময়টা কাটাইতে চাহিত; মনটা যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল—কিছুই ভাল লাগিত না, চিন্তাকুল।

ঝি-চাকর নিদ্রিত। দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দপদসঞ্চারে খেলাৎ উপরে ইন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের পর্দ্দা ঠেলিয়া ঢুকিল। তমালিনী বিস্রস্তবসনে খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয় একখানি বই পড়িতেছিল, চমকিত হইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া তীব্রস্বরে কহিল—"এ কি খেলাৎবাবু? এমন করে কি নিঃসাড়ে কোনও ভদ্রমহিলার শোবার ঘরে ঢুকতে আছে? কি দরকার আপনার এখানে এমন সময়ে? যান্—বেরিয়ে যান্—বেরিয়ে যান্—"

গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বরে আয়া আসিয়া পড়িল। খেলাৎ দুই-একটা ঢোক গিলিয়া কহিল—"তা, তুমি চটচ কেন, বউ? আমি তো কিছুই করি নি! এই তো কেবল এসে দাঁড়িয়েচি মাত্র! আমার সিগ্রেট ফুরিয়ে গেছে, তাই ন'টা পয়সার জন্যে এসেছিলাম—"

"আচ্ছা, আপনি নীচে যান্, আমি আয়াকে দিয়ে পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

খেলাৎচন্দ্র সশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে কুপিতভাবে তক্তপোষে পা ঝুলাইয়া বসিল। আয়া নয়টা পয়সা দিয়া গেল। খেলাৎ পয়সা কয়টি একখানা রুমালে বাঁধিয়া রাখিয়া, বালিশের নীচে হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া, একটি ধরাইল।

অপরাহ্নে ইন্দ্রনাথ তমালিনীর নিকট একথা শুনিয়া সহাস্যে কহিল—"এ রকম গাধা কখনও মানুষ হয় না। এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও যার নেই, তার উপরে কি রাগ হয়, না দুঃখ হয়? একে নিয়ে করিই বা কি? মহামুস্কিলে পড়া গেল, দেখচি!—"

তমালিনী কহিল—"আহা, বেচারীকে আজ বড় রূঢ় কথা বলেচি! হয় ত মনে বড় দুঃখ পেয়েচে, কে জানে কি ভাবচে! কিন্তু কি করব? চট্ ক'রে রাগ হ'য়ে গিয়েছিল বড়! অত অপমান পেয়েও, আহা, সিগারেটের পয়সা ক'টি যখন চাইল,—তখন আমার বড্ড মায়া হ'ল! মানুষ তো?"

তমালিনীর নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে বলিয়া ইন্দ্রনাথ আর খেলাৎকে এ অভব্যতার কথা কিছু বলিল না, পাছে সে আবার লজ্জিত হয়। সেদিন সন্ধ্যা হইতে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে খুবই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিল। সে দিনটা কাটিয়া গেলে খেলাৎ ঠিক করিল, ইন্দ্রনাথ তবে কিছু শোনে নাই! সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনে মনে খুব খুসী হইল। ভাবিল অনুরূপ। তমালিনী মেয়েটিকে চুরি করিয়া দেখার লোভ তাহার বাড়িয়া গেল। দেখা দিতে বা কোনও কথা বলিতে সাহস হইত না; তবু দ্বিপ্রহরে খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিতে খেলাৎ ছাড়িল না।

'এপ্রিল মাস'। ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। টক্কেশ বা সপরিবারে দার্জ্জিলিঙ যাইবেন, ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

On the Alert

বিচিত্রা

চৈত্র, ১৩৩৬

শিল্পী—জে, এম, সোয়ান্

আসিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিল, কলেজ বন্ধ হইলেই সে-ও সস্ত্রীক মে মাসের শেষাশেষি গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে।

কথায় কথায় খেলাতের কথা উঠিল। টঙ্কেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, ইন্দিরের বন্ধু এই মাস-দুই যদি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। কারণ, বাড়ীতে কেহই থাকিবে না—তাঁহার বড় আদরের ফুলের চারা ও টবগুলি সব নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু মালী ব্যাটা বড় ফাঁকিবাজ। অথচ খেলাৎ বাবু যদি থাকেন, তাহা হইলে সে ভয়ে ভয়ে ঠিক কাজ করিবে, গাছপালা বাড়ীঘরেরও যত্ন হইবে। ঠাকুর, চাকর সবই থাকিবে, তাঁহার কোনও কষ্ট হইবে না।

ইন্দ্রনাথ নীচে আসিয়া খেলাৎকে জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়া জানাইল যে, খেলাৎ তাহাতে রাজী। যথাসময়ে খেলাৎ টঙ্কেশ বাবুর বালীগঞ্জের লেক্‌রোড-স্থিত নূতন অট্টালিকায় গিয়া হাজির হইল। টঙ্কেশ বাবু ঘর বাড়ী মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়া, স্ত্রী ও শিশু পুত্র-কন্যা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া শীতল হইতে পাহাড়ে যাত্রা করিলেন।

খেলাৎ প্রায় প্রত্যহই কালীঘাটে বেড়াইতে আসিত। টঙ্কেশ বাবু যাইবার সময় খেলাতের কাছে প্রায় দেড়শো টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের বাজার-হাট ও অন্যান্য সব খরচপত্র করিবার জন্য। খেলাৎ দেখিল, এতদিন সে কি কষ্টেই না দিন কাটাইয়াছে! প্রার্থনা করিল, টঙ্কেশ বাবু যেন চিরদিন পাহাড়েই বাস করেন।

খেলাতের ২।১ জন করিয়া বন্ধুও জুটিতে লাগিল। রসারোডের উপর একটা মস্ত বাড়ীর ত্রিতলে তাহার প্রায় নিত্য আড্ডা জমিত। সেইখানে যত পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বাসা। তাহাদের সঙ্গে খেলাৎ প্রাণ খুলিয়া গল্পসল্প করে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের সঙ্গে বেড়ায়ও। একদিন দেখিল, একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার একজন বাঙ্গালী ড্রাইভারকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছে, তাহাদের দোস্ত এই বংগালী বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ করাইয়া দিবার জন্য।

আগন্তুক উদয়চন্দ্র খাস্তগীর, খেলাতের বাল্য-বন্ধু, আজ বৎসর-দুই হইতে সে ট্যাক্সি চালাইতেছে। বহুকাল পরে দুই বন্ধুতে মিলিয়া, সেদিন দুই বোতল হরিণ-মার্কা 'খাঁটি' ও পাকা এক ভরি বড়-তামাকের সদ্ব্যবহার করিয়া টঙ্কেশ বাবুর বারান্দায় সে রাত্রির মত শেষ আশ্রয় লইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"তা' এর জন্যে আর এত ভাবনা কি? হেঃ, তুমিও যেমন!—এ দু'বছরের মধ্যে কত কি করলাম, তার ঠিক আছে? ছ'টা ডাকাতী, চারটে চুরি, গোটা দুই যাত্রীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে মাণিকতলা খাল-পারে ছেড়ে দিয়ে এসেচি, তিন চারটে অমন বিবি মেয়ের সঙ্গেও যে এই ট্যাক্সি চালাতে চালাতে আলাপ-সালাপ না হ'য়েচে, তাই বা বলি কি ক'রে? দু'টো মেয়েকে তো হাওড়া ষ্টেশন থেকে নিয়ে একেবারে বেমালুম স'রেই পড়লাম!—তারপর ৪।৫ দিন পরে, আবার তাদি'কে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিলাম। কোথায় পুলিশ,—কোথায় কি? এ বাবা ক'লকাতা! এখানে কি আর কোন জিনিষ চট্ ক'রে কারও নজরে পড়ে? না, কেউ কারো খোঁজ রাখে? ফূর্ত্তি যদি ওড়াতে হয়, তবে এমন বেপরোয়া জায়গা আর কোথাও নেই! পয়সা-কড়ি থাক্ বা না থাক্, বুকের পাটা চাই। ব্যস।"

খেলাৎ তন্ময় হইয়া বন্ধু উদয়ের বীরত্বকাহিনী শুনিতেছিল। তাহার নৈরাশ্যদুর্ব্বল প্রাণেও আশার সঞ্চার হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে ভাই, ওকে কি ক'রে হাত করা যায়, তার একটা ফন্দী তোকে ঠাওরাতেই হবে। তা'কে না পেলে, মাইরি ভাই, আমি ম'রে যাব।"

উদয় সাহস দিয়া কহিল—"ব্যস্ত হ'য়ো না খেলু, এ আমি ঠিক করে দিচ্ছি। বেচনসিংকে বলিগে, সে যদি এ কাজে হাত দেয়, তবে নির্ঘাৎ! আচ্ছা, আমি আজই তার কাছে যাচ্ছি, সন্ধ্যে বেলায় চাই কি, বেচনসিংকেও এখানে নিয়ে আসবো। তুই তিন বোতল 'খাঁটি' আর খানিকটে মেটে-চচ্চড়ী ও দোপেঁয়াজী ঠিক ক'রে রাখিস। হাঁ, আর তামাকও ভরি খানেক—" উদয় চলিয়া গেল।

* * * *

মঙ্গলবার। বেলা প্রায় ১২টা। তমালিনী একা উপরে তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া পত্র লিখিতেছে। আয়া বাহিরে গিয়াছে, ভৃত্য গ্রীষ্মাধিক্যে কোনও একটা ঠাণ্ডা কোণে

শুইয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিবানিদ্রা যাইতেছিল। খেলাৎচন্দ্র 'ইন্দির আছ নাকি? ইন্দির, ও ইন্দির?' বলিতে বলিতে দ্বিতলে উঠিল। তমালিনী খেলাতের কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

খেলাৎচন্দ্র ম্লানমুখে সসঙ্কোচে জানাইল—"টঙ্কেশ বাবু বড় কাহিল, আজই সকালে দার্জ্জিলিঙ হ'তে ফিরেচেন। অবস্থা খুবই খারাপ, তোমায় এক্ষুণি নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েচেন।"

তমালিনীর সর্ব্ব শরীর একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। অকস্মাৎ স্নেহময় ভ্রাতার এইরূপ নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তমালিনীর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"বৌদিরা সব এসেচেন? কি হয়েচে দাদার? আমি কোনও খবর পাই নি!"

খেলাৎ অধীর ভাবে কহিল—"হাঁ, সবাই এসেচেন। তাঁর কি হার্টের ব্যারাম হ'য়েচে। যদি যাও তো শীগগির এসো! আমার দেরী করলে চলবে না। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী এখানে দেরী করতে টঙ্কেশ বাবুর বউ আমায় মানা ক'রে দিয়েছেন। কে জানে, এতক্ষণে কি হয়েচে!"

তমালিনী সাশ্রুনয়নে কহিল—"একটু তবে দাঁড়ান্, আমি যাচ্ছি।" বলিয়াই তমালিনী ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড়টা কোনও রকমে গায়ে জড়াইয়া লইল। স্বামীর জন্য একটা কাগজে কি লিখিয়া হাতে লইয়া বাহিরে আসিতেই আয়ার সহিত দেখা। তাহাকে কাগজের টুকরাটি দিয়া, বাড়ী-ঘর তাহার উপর ছাড়িয়া, তাড়াতাড়ি নীচে আসিল। চক্‌চকে উর্দ্দি-পরা বেচনসিং গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তমালিনীকে সসম্ভ্রমে একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া দিল। তমালিনী বসিলে সে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে গেল।

আয়াও দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে তমালিনী স্বামীর চা ও খাবার ঠিক করিয়া দিতে বারম্বার উপদেশ দিতে ভুলিল না। গাড়ী ছুটিল।

সহরপ্রান্তে জনবিরল নিস্তব্ধ পল্লীতে মস্ত বাড়ী, প্রশস্ত আঙিনা। এদিকে এই কেবল লোকে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। বাড়ীটিও নীরব নিঃশব্দ—যেন মৃত্যু-ছায়ায় স্তম্ভিত। কোথাও কোনও মানুষের সাড়া পর্য্যন্ত নাই। গাড়ী থামিবা মাত্রই, কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া তমালিনী একরকম ছুটিয়াই দ্বিতলে উঠিল। পশ্চাতে অথচ দূরে দূরে বেচনসিং ও খেলাৎ।

তমালিনী যেমন ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া টঙ্কেশ বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে বেচনসিং ও খেলাৎচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। বেচনসিং চক্‌চকে একখানা ছোরা বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল—"খবরদার! আমি এই বাইরে রইলাম।" বেচনসিং বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বসিল।

প্রায় দশ মিনিট কাল ঘরের মধ্যে মারামারি দাপাদাপি চেঁচামেচি প্রভৃতি বহু শব্দ শোনা গেল, তাহার পরেই একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ।

খেলাৎ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া বেচনসিংকে ধরিয়া জানালার ধারে টানিয়া লইয়া গিয়া দেখাইল, তমালিনী জানালা টপ্‌কাইয়া নীচের একটা পাথরকুচির গাদায় লাফাইয়া পড়িয়াছে; তাহার নাক, মুখ ও মাথা দিয়া দরদর ধারে রক্তপাত হইতেছিল।

বেচনসিংয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল—"পালাও, আর নয়।" খেলাৎকে লইয়া বেচনসিং মোটর হাঁকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কলেজ-ফেরত বাসায় আসিয়া আয়ার মুখে সব শুনিয়া ইন্দ্রনাথ টঙ্কেশের গৃহে আসিয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন সকালে পুলিশ তমালিনীর মৃতদেহ আবিষ্কার করিল।

তিন দিন পরে। বৈশাখের অপরাহ্ণ। ইন্দ্রনাথের শরীর খুব অসুস্থ, তবুও সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিঠিপত্রাদি লিখিতেছে, এ ড্রয়ার, ও আলমারি, এ বাক্স, ও বাক্স সব খুলিতেছে, বন্ধ করিতেছে, এটা বাহির করিতেছে, ওটা

রাখিতেছে, সেটা ঢাকিতেছে—একমুহূর্ত্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার যেন তাহার অবকাশ নাই, এমনি ব্যস্ত। অন্তরের ব্যথায় ও রোগের যন্ত্রণায় ইন্দ্রনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পর্য্যন্ত পারিতেছিল না, পা টলিতেছিল।

জিনিষপত্র মেঝেতে সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো, সেইখানেই ইন্দ্রনাথ শুইয়া পড়িল। আর নড়া-চড়া করিতে পারিল না। এমন সময় জাহ্নবী দেবী সুশীলার সহিত একতলা হইতেই উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া ইন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া কহিলেন—"বাবা ইন্দির, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বাবা! খেলুকে পুলিশে ধরেছে, তাকে বাঁচাও বাবা,—রক্ষে কর' বাবা, দোহাই বাবা—"

ইন্দ্রনাথের কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ভৃত্য পাশের বাড়ীর ডাক্তারকে দৌড়াইয়া গিয়া ডাকিয়া আনিল। ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিল। ক্রমশঃ বহু বন্ধুবান্ধবকেও খবর দেওয়া হইল।

ইন্দ্রনাথ জাহ্নবী দেবীর পদধূলি লইয়া থামিয়া থামিয়া আবেগকম্পিত স্বরে কহিল—"মা, আপনার ছেলেকে রক্ষা করা আর আমার সাধ্যাতীত। আমার এমন দুর্দ্দিনেও, মন্দভাগিনী আপনারা, আপনাদের জন্যে কষ্ট হ'চ্ছে! তবু—তবু—আপনাদের কৃপায় একদিন আমার প্রাণ-রক্ষা হয়েছিল, দেবতুল্য আপনার স্বামীর মহৎ শিক্ষায় আমার জীবন গঠিত হয়েছে ব'লে, আপনাদের দুর্ভাগ্যে মৃত্যুকালেও আমার শান্তি হ'চ্ছে না—"

জাহ্নবী দেবী চীৎকার করিয়া রোদন করিয়া কহিলেন—"বাবা, তোর এ কালরোগ কেন হ'ল বাবা, তুই যে আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে! তুই গেলে আমরাই কি প্রাণে বাঁচব? বাবারে—ইন্দির—"

ইন্দ্রনাথ ক্রমশঃ-অসাড় হাতখানি তুলিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়া কহিল—"ভয় নেই মা, এই আমার উইল—যথাসর্ব্বস্ব খেলাতের ছেলের, আর এই আমার লাইফ-ইন্সিওরের পলিসি—আপনার নামে লিখে দিয়েছি। এই নগদ দশ হাজারে আপনারা কোনও রকমে চালিয়ে নিবেন—উঃ—খেলাৎ, খেলাৎই আমার যে সর্ব্বনাশ করবে, সে যে এমন তা' কি জান্‌তাম?—"

কথা এড়াইতে এড়াইতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল, তারপরে একেবারে চুপ!

কিন্তু আজ সকালেই ইন্দ্রনাথ যে ভীষণ কলেরার বিষ নিজের শরীরে স্বেচ্ছায় ঢুকাইয়া এভাবে প্রাণত্যাগ করিল, একথা কেহই জানিল না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুসঙ্গীতের মাধুর্য্য

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন

হিন্দুসঙ্গীতের মাধুর্য্য যে কোথায় ও কি তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'সা, রে,গা, মা' প্রভৃতি সুরগুলির বৈজ্ঞানিক মোটামুটি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিকদের মতে কম্পন হইতেই সুরের উৎপত্তি; একটা সুরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া চড়ার দিকে যাইতে থাকিলে কম্পনসংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে; নির্দ্দিষ্ট সুর যত কম্পন হইতে উৎপন্ন হইবে সেই কম্পনসংখ্যার দ্বিগুণ কম্পন-সংখ্যায় এমন একটি সুর পাওয়া যাইবে যাহা সেই নির্দ্দিষ্ট সুরের সঙ্গে একত্র বাজিতে থাকিলে দুইটি সুর যে একত্র বাজিতেছে তাহা বুঝা যাইবে না। অর্থাৎ সেই নির্দ্দিষ্ট সুরটি যদি সেকেণ্ডে ২৪টি কম্পন হইতে উৎপন্ন হয় তবে সেকেণ্ডে ৪৮টি কম্পন হইতে এমন একটা সুর পাওয়া যাইবে যে এই দুইটি সুর একই সময়ে বাজাইলে একসঙ্গে মিশিয়া যাইবে। আমরা জানি যে 'স' সুর ও চড়া 'স' বা খাদ 'স' সুর একত্র ধ্বনিত হইলে একসঙ্গে মিশিয়া যায়; 'র' সুর ও চড়া 'র' বা খাদ 'র' সুরও একত্র ধ্বনিত হইলে অবিকল মিশিয়া যায়। এইরূপ উদারা সপ্তকের সুরগুলির সঙ্গে মুদারা ও তারা সপ্তকের সুরগুলি পরস্পর অবিকল মিশিয়া যায়। এখন, পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট সুরটি যদি 'স' হয় ও তাহার কম্পনসংখ্যা ২৪ হয় তবে চড়া 'স' সুর ৪৮টি কম্পন হইতে উৎপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে 'স'এর অনুরণন-বেগ ১ হইলে চড়া 'স'এর অনুরণন-বেগ ২ হইবে এবং অন্যান্য স্বরগুলির অনুরণন-বেগ নিম্নলিখিত অনুপাতে হইবে, যথা :—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
১	$১\frac{১}{৮}$	$১\frac{১}{৪}$	$১\frac{১}{৩}$	$১\frac{১}{২}$	$১\frac{২}{৩}$	$১\frac{৭}{৮}$	২

এই অনুরণন-বেগ-অনুযায়ী 'স'কে ২৪ কম্পনযুক্ত ধরিলে অন্যান্য স্বরকম্পন নিম্নলিখিত অনুযায়ী হইবে, যথা :—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	স
২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮

সুরের যে যে স্থানে মিল আছে তাহা কানে মিষ্টি লাগে। সুরগুলির মধ্যে 'স' সুরের সঙ্গে চড়া 'স' সুরের সব চাইতে বেশী মিল। তার পরেই 'স'এর সঙ্গে 'প'এর মিল এবং তারপর 'ম'এর মিল এবং তারও পরে 'গ'এর মিল। এই সুর প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতে হইলে দুইটি তারযন্ত্র (Stringed instrument) লইয়া পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। দুইটি যন্ত্রই এক-সুরে বাঁধিতে হইবে। এক-সুরে বাঁধা দুইটি তারের যে কোন একটিতে আঘাত করিলে অন্য তারটি আপনা হইতেই (Sympathetic vibration) কাঁপিয়া উঠে। প্রথমে যন্ত্র দুইটি এক-সুরে বাঁধা কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। একজন একটা যন্ত্রের 'স' সুরই ক্রমাগত ধ্বনিত করিবে, অন্য জন প্রথমে চড়া 'স' সুর ধ্বনিত করিবে। তাহাতে বুঝা যাইবে যে দুইটি সুরই একসঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। চড়া 'স' সুর হইতে অবরোহণ-ক্রমে 'ন'তে আসিলে দেখা যাইবে যে দুইটি সুর পৃথক পৃথক ধ্বনিত হইতেছে ও আওয়াজ অস্পষ্ট হইতেছে। প্রথম জন ক্রমাগত 'স' সুরই ধ্বনিত করিতে থাকিবে। দ্বিতীয় জন 'ধ' সুর ধ্বনিত করিলেও সেইরূপ অস্পষ্ট আওয়াজ হইবে। পরে 'প'তে আসিলে দুইটি সুর মিশিয়া বেশ স্পষ্ট আওয়াজ হইবে। 'ম'তেও বেশ মিল পাওয়া যাইবে ও স্পষ্ট আওয়াজ হইবে। তারপর 'গ' সুর ধ্বনিত করিলেও বেশ কতকটা মিল পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'র' সুরে আসিলে অস্পষ্ট আওয়াজ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে স্বাভাবিক স্বরগ্রামে 'স' ও চড়া 'স' উত্তম মিল, 'স' ও 'প' এবং 'স' ও 'ম' মধ্যম মিল, ও 'স' 'গ' বেশ ভাল মিল হয়।

প্রথমে আমরা 'স' সুর নির্দ্দিষ্ট করি, 'স' সুরই মূল সুর। 'স' সুর হইতেই সব সুরের উৎপত্তি। অন্যান্য

সুরগুলিকে 'স' সুরের আত্মীয় বলিতে পারি। 'স'কে ঠিক করিয়া আমরা তাহার দ্বিগুণ চড়া 'স' সুরটি পাই। তাহার পরই আমরা 'প' সুর পাই। কি ভাবে পাওয়া যায় দেখাইতেছি। 'স' সুরের কম্পনের সংখ্যা ও চড়া 'স' সুরের কম্পনের সংখ্যা যোগ করিয়া দুই দিয়া ভাগ করিলেই 'প' সুরের কম্পনসংখ্যা পাওয়া যায়, যেমন—

$$\frac{\text{স}+\text{স}'}{\text{২}}=\text{প}=\frac{\text{২৪}+\text{৪৮}}{\text{২}}=\text{৩৬}$$

অতএব প = ৩৬

স্বরকম্পন-তালিকাতেও আমরা 'স' সুরের ২৪ বার কম্পন হইলে 'প' সুর ৩৬ কম্পনযুক্ত হয় দেখিতেছি। 'প'এর পর আমরা 'গ' পাই। উপরোক্ত অঙ্ক-অনুযায়ী

$$\frac{\text{স}+\text{প}}{\text{২}}=\text{গ}=\frac{\text{২৪}+\text{৩৬}}{\text{২}}=\text{৩০}$$

অতএব গ = ৩০

কাজেই 'স'কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমরা চড়া 'স' পাই এবং পরে 'প' ও 'গ' পাই। আবার, চড়া 'স'কে সুর করিয়া যদি খাদের দিকে তাহার পঞ্চম সুর পর্য্যন্ত আসি তবে 'ম' সুর পাই। 'ম'কে 'খরজ'বৎ ধরিলে চড়া 'স' 'ম'এর পঞ্চম হয়। আবার—

$$\frac{\text{ম}+\text{স}'}{\text{২}}=\text{ধ}=\frac{\text{৩২}+\text{৪৮}}{\text{২}}=\text{৪০}$$

অতএব ধ = ৪০

এখানে আমরা 'ম' ও 'ধ' সুর পাইতেছি। এইরূপ—

$$\frac{\text{স}+\text{গ}}{\text{২}}=\text{র}=\frac{\text{২৪}+\text{৩০}}{\text{২}}=\text{২৭}$$

অতএব র = ২৭

এখানে আমরা 'র' সুরটি পাইতেছি। 'প'কে 'খরজ'বৎ ধরিলে চড়া 'র' 'প'এর পঞ্চম হয়। 'র' সুরের কম্পন-সংখ্যা ২৭; অতএব চড়া 'র'তে ২৭ × ২ = ৫৪ কম্পনসংখ্যা হইবে। কাজেই—

$$\frac{\text{প}+\text{র}'}{\text{২}}=\text{ন}=\frac{\text{৩৬}+\text{৫৪}}{\text{২}}=\text{৪৫}$$

এখানে আমরা 'ন' সুর পাইতেছি। সুতরাং দেখা গেল প্রথমে আমরা 'স'কে নির্দ্দিষ্ট করিয়া চড়া 'স', 'প' ও 'গ' সুর পাই; পরে 'ম' ও 'ধ,' সর্ব্বশেষে 'র' ও 'ন' সুর পাই। এইরূপেই আমরা সাতটি সুর পাইয়াছি।

প্রতীচ্যের সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে ৪ : ৫ : ৬ বা ১০ : ১২ : ১৫ অনুপাতযুক্ত স্বর একত্র ধ্বনিত হইলেই কানে মিষ্টি লাগে। 'স': 'গ': 'প' এই তিনটি সুরই ৪: ৫: ৬ অনুপাতযুক্ত। যেমন —

স	গ	প
২৪	৩০	৩৬

প্রত্যেকটি রাশিকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে আমরা পাই—

৪ : ৫ : ৬

আবার—

ম	ধ	স
৩২	৪০	৪৮

প্রত্যেকটি রাশিকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে পাই—

৪ : ৫ : ৬

আবার—

প	ন	র'
৩৬	৪৫	৫৪

ইহাতেও অনুপাত ৪ : ৫ : ৬

কাজেই দেখা যাইতেছে—স : গ : প, ম : ধ : স', প : ন : র', প : ন, গ : প, স : প, ম : ধ, ধ : স', ম : স' এইরূপ অনুপাতযুক্ত স্বর আমরা অনেক পাই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণ এইরূপ সুরের একত্র-ধ্বনিকে কর্ড (chord) বলিয়া থাকেন। এই কর্ডগুলির উপযুক্ত ব্যবহারকে পাশ্চাত্য দেশে হার্‌মনি (Harmony) বলে। এই হার্‌মনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন।

প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে বুঝা যায় Chordগুলির উপযুক্ত ব্যবহার আমাদের রাগরাগিণীতে সুন্দর ভাবে হয়। তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতাচার্য্যগণ ইহার উপর যেরূপ জোর দিয়া থাকেন আমরা তেমন দিই না। সূক্ষ্ম স্বর-অন্তরগুলির আবেগভরা অনুরণনগুলিই আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ। আমাদের সঙ্গীতের বাদী-সম্বাদীর মিলনই প্রকৃত স্বর-সম্বাদ (Harmony)। একটা রাগ বা রাগিণীর '[illegible]' যদি

প্রবল করি তবে তাহার পঞ্চম 'ন'কে প্রবল করিতেই হয়। তাহা না হইলে রাগ-আলাপ প্রাণমাতান হয় না। 'গ'কে 'স' ধরিলে 'ন' তাহার পঞ্চম হয়। কাজেই এখানে স : প অনুপাত। এখানে ইমন্ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

র্সা না । ধা পা ক্ষা । গা । । গক্ষা পা না ।

ধা পা ক্ষা গা । রা ন্া রা গা । রা ন্া রা সা ।

ইমন্ রাগিণীর স্বর-বিন্যাস এইটুকু হইতেই দেখা যায় যে প্রথম 'স' হইতে 'ন' কে একটু প্রবল করিয়া 'গ' কে প্রবলতর করা হইতেছে ও 'গ' হইতে প্রায় লাফ দিয়া 'ন' কে গিয়া প্রবল করিতেছে। এই স্থানটির মাধুর্য্য সুন্দর। আবার—

গা । রা ন্া রা গা । রা ন্া রা সা ।

স্থানটিতে বারে বারে 'গ' হইতে খাদ 'ন' তে গিয়া আমাদের প্রাণ মাতাইয়া তুলিতেছে।

বেহাগ রাগিণীর সা । । I গা । মা I পা । । I না । না I র্সা । র্সা I না । না I পা ক্ষা পা I মা । গা I

এইটুকু আমাদের মন যেমন উদাস করিয়া তোলে এমন আর অন্য রাগরাগিণীতে পারে বলিয়া মনে হয় না। এখানে আমরা স : গ, প : ন দুইটি কর্ড (chord) সুন্দর পাইতেছি। 'স' হইতে 'গ' তে বা 'প' হইতে 'ন' তে মীড়-যোগে আরোহণ-অবরোহণ করিলেই প্রাণে সুধা বর্ষিত হয়। আবার, আমরা যখন এক সুর হইতে কিছু দূরে আরোহণ বা অবরোহণ করি, আমরা হয় সেই সুরের পঞ্চম সুরে, চতুর্থ সুরে বা তৃতীয় সুরে অর্থাৎ সুরের মিল যেসব সুরে আছে সেই সব সুরেই যাই। ইহাই আমাদিগকে আনন্দ দিয়া থাকে।

সাধারণতঃ রাগরাগিণীতে অন্তরাতে 'ম' বা 'প' হইতে 'ন' বা 'র্স' সুরে যাওয়া বিশেষত্ব। 'প' হইতে 'ন' সুরের অনুপাত ৪ : ৫। বাগেশ্রী রাগিণীতে—

সা রা মা পা ধা ণা র্সা র্রা র্জ্ঞা ।
র্রা র্সা ণা । ধা পা ণা । জ্ঞা ।
মা রা সা ।

এখানে 'ণা' হইতে 'জ্ঞা' তে লাফাইয়া গেলে বাগেশ্রী মধুর হয়। 'ণ' সুর 'জ্ঞ' এর পঞ্চম, বা 'জ্ঞ' বাদী হইলে 'ণা' সংবাদী হয়। সুর দুইটিতে এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাদের একত্র-ধ্বনিতে মাধুর্য্য এইরূপ বাড়িয়া উঠে। যে-যে সুরের সঙ্গে যে-যে সুরের মিল আছে ঐ সব সুর গীতে সংযোজনা করিয়া আমরা রাগরাগিণীর মাধুর্য্য বাড়াইয়া থাকি। ইহাই হিন্দুসঙ্গীতের প্রকৃত স্বর-সম্বাদ (Harmony)।

(২)

স্বর-উৎপত্তি ও বর্ণ-উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দুইটিতে একটা সুন্দর সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি এক ধ্বনি হইতেই সবগুলি সুরের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণ-উৎপত্তিতেও দেখা যায় যে, শুভ্র জ্যোতির মধ্যে সকল বর্ণই পাওয়া যায়—সূর্য্যরশ্মি সাতটি বর্ণের সমষ্টি।

"শুভ্র জ্যোতির মধ্যে সকল বর্ণই লীন,
ঈশ্বর-ভক্তির মধ্যে সকল ভাবই লীন,
শুদ্ধ ধ্বনির মধ্যে সকল সুরই লীন।"

সাত সংখ্যাটিকে অনেকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন। সূর্য্যের আলোক সাতটি বর্ণের সমষ্টি, সাতটি সুরের সমষ্টিতে সপ্তক, সাত বারে এক সপ্তাহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল ইত্যাদি। যাহাই হউক, সুরগুলির মধ্যে আমরা 'স' নির্দ্দিষ্ট করিয়া 'প' ও 'গ' প্রথমেই পাই। ইহাতে বুঝা যায় যে 'স' 'গ' ও 'প' এই তিনটি সুরই প্রধান। 'স' মূল সুর এবং এর পরেই 'প' ও 'গ' এর স্থান।

সাতটি বর্ণের মধ্যে আমরা রক্ত, পীত ও নীল এই তিনটিকেই প্রধান দেখিতে পাই। এই তিনটি বর্ণের সাহায্যে আমরা সাতটি বর্ণ পাইতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে 'স' 'গ' ও 'প' এই তিনটি সুরের সাহায্যে সাতটি সুরই পাইতে পারি। স, গ, প সুরত্রয়কে যদি যথাক্রমে রক্ত, পীত ও নীল বর্ণ ধরা যায় তবে অন্যান্য সুরগুলি কি বর্ণের হয় তাহা দেখা যাউক। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে দুইটি সুরের কম্পনসংখ্যা একত্র করিয়া এক একটা সুর পাইয়াছি। যথা—

$$\frac{স + গ}{২} = র, \quad \frac{২৪ + ৩০}{২} = ২৭$$

'স' কে রক্ত, 'গ' কে পীত ও 'প' কে নীল বর্ণ ধরিয়া নিলে 'র' সুর কি বর্ণের হয় দেখা যাউক—

স+গ
———=র=রক্ত+পীত=কমলা
২

এইরূপে—

ম=গ+প
=পীত+নীল
=সবুজ

আবার—

ন=প+র্র
=নীল+কমলা
=বেগুনী

ধ=প+ন
=নীল+বেগুনী
=অতি নীল (প্রায় কাল)

অতএব সাতটি সুরের বর্ণ আমরা পাইতেছি—

ধ্বনি=শ্বেত
স=রক্ত
র=কমলা (গোলাপী)
গ=পীত
ম=সবুজ
প=নীল
ধ=অতি নীল (কাল)
ন=বেগুনী

বর্ণ ও সুর যে এই একই সূত্রে গাঁথা তাহা প্রথমে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় আলোচনা করিয়া সঙ্গীত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সেইজন্য সঙ্গীত-আলোচক মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী।

সাতটি সুরের বিন্যাস করিয়া আমরা যেমন নানাবিধ রাগরাগিণী পাই, তেমনি বর্ণগুলির মিশ্রণেও নানাপ্রকার ফুল, লতা-পাতার রংএর কল্পনা করিতে পারি। ভাবুক সমালোচক মাত্রেই এক একটা রাগরাগিণীকে নানাবিধ বর্ণের সঙ্গে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ দিলীপবাবুর সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাগরাগিণীগুলি এক একটা মণি, মুক্তা, পান্না, হীরা বা মোতি ইত্যাদি; রাগরাগিণীর আলাপ শুনিলে মনে হয় যেন একটা কোটা হইতে এক একটা জহরত খুলিয়া লইয়া তাহার রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। সঙ্গীতাচার্য্য রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় একটা প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, সকাল বেলায় এক একটা রাগিণী শুনিলে মনে হয় যেন প্রভাতে প্রস্ফুটিত ফুল মৃদুসমীরণে নাচিয়া নাচিয়া রূপের প্রস্রবণ খুলিয়া দিতেছে। এইরূপ অনেক কবি অনেক ভাবে অনেক কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

সুরগুলিকে এক একটা ফুল বা ফুলের তোড়ার সঙ্গে কল্পনা করিতে পারি, যেমন—

সা দা । দা ণা । দা পা মা জ্ঞা ।
মা জ্ঞা ঋা সা ।

এই স্বর-বিন্যাসে সব কয়টি সুরই আছে। আমরা জানি যে সব কয়টি বর্ণ-সংযোগে শ্বেত বর্ণ হয়।

দা জ্ঞ´া । ঋ´া স´া ণা দা পা । মা জ্ঞা ।
মা জ্ঞা ঋা সা । ঋা । জ্ঞা মা । জ্ঞা রা
জ্ঞা ঋা সা

এখানে 'দ' হইতে 'জ্ঞ´' তে আরোহণ মধুর হইয়া কানে বাজে, আর সুরের রেশ পুনঃ পুনঃ 'জ্ঞ' তে আসিয়া সুরের আরোহণ মধুর করিয়া দেয়। আবার 'ঋ' সুরের সঙ্গে 'স' সুরের একটানা ধ্বনি শুনিয়া আমরা সুখানুভব করি। এই স্বর-বিন্যাসে কোমল 'গ' ও কোমল 'র' এই দুইটি সুরই বিশেষ মাধুর্য্য বাড়াইয়া দিতেছে। 'গ' সুর, পীতবর্ণযুক্ত ও 'র' সুর গোলাপী। কাজেই এই স্বর-বিন্যাসে যে রাগিণী হয় সেই রাগিণীকে এমন একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি যাহা শ্বেতবর্ণের ও যাহাতে পীতবর্ণ বিশেষ মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতেছে ও গোলাপী বর্ণের কোমল আভায় তাহা আরো মধুর-স্নিগ্ধ হইতেছে। কবিদের অতিপ্রিয় পদ্মই হইতেছে এই কল্পিত ফুল। পূর্ব্বোক্ত স্বর-বিন্যাসটি ভৈরবী রাগিণীর। কাজেই ভৈরবী রাগিণীকে আমরা পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি।

হিন্দুসঙ্গীতে রাগরাগিণী গাহিবারও একটা সময়

নির্দ্ধারণ করা আছে। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণই তাহা করিয়াছিলেন। কেন ও কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এক একজন এক এক প্রকার মত পোষণ করেন। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ভাবেই রাগরাগিণী গাহিবার সময় ঠিক করা হইয়াছে। যেমন পদ্মফুল সকাল বেলায় ফুটে, আবার ভৈরবী রাগিণীও সকাল বেলায়ই গাহিবার সময় নির্দ্ধারিত আছে।

(৩)

সঙ্গীত একটা ললিত-কলা—যেমন কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্যও ললিত-কলা। ললিত-কলায় নানাবিধ রস সৃষ্টি করিতে হয়।

"শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়,
করুণ, অদ্ভুত, শান্তি—এই রস নয়।"

এই নয়প্রকার রস গীত, বাদ্য বা নৃত্যে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়াই সঙ্গীত ললিত-কলা। নৃত্যও সঙ্গীতের মধ্যে; নৃত্যে ভাবগুলি বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া দর্শনেন্দ্রিয়কে অভিভূত করিতে হয়।

প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ এক একটি সুর এক এক ভাব প্রকাশ করে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন—

স — বিশ্রামের সুর
র — উৎসাহসূচক সুর
গ — শান্তিপ্রদ সুর
ম — নিরাশা বা ভয়সূচক সুর
প — উত্তেজক সুর
ধ — শোকসূচক সুর
ন — প্রদর্শক সুর

কিন্তু ইহারও ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। কারণ, গায়কের মনের অবস্থা যখন যেমন থাকে সুরেও তদনুযায়ী ভাব আসে। এমন কি, উপরে সুরগুলিকে যেরূপ ভাব-ব্যঞ্জক ধরা হইয়াছে গায়কের মনের ভাব-ভেদে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়।

ইহা কেন হয় দেখা যাক। প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ কণ্ঠস্বর-উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে মন দেহাগ্নিকে আঘাত করে; শরীরে ব্রহ্মগ্রন্থি নামে যে গ্রন্থি আছে ও তাহাতে যে বায়ু থাকে, দেহাগ্নি সেই বায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে চালনা করে; সেই বায়ু ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে আসিয়া যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও বদনে ধ্বনি উৎপন্ন করে (সঙ্গীত-রত্নাকর)। এখানে দেখা যায় যে মনই ধ্বনি-উৎপাদনের প্রধান সম্বল। মন ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে দেহাগ্নিকে আঘাত করে। কাজেই গায়ক বা বাদক যে ভাব নিয়া স্বর-উৎপত্তির জন্য দেহাগ্নিকে আঘাত করে সেই ভাবই গানে বা বাজনায় ফুটিয়া উঠে। মন যদি হাস্য ভাব নিয়া দেহাগ্নিকে আঘাত করে—তবে গানে হাস্যরস ফুটিবে, যদি করুণ ভাব নিয়া আঘাত করে—তবে গানে বা বাজনায় করুণ ভাব আসিবেই।

তবে আমরা দুইটি সুর পাই যাহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। একটি 'স' ও অপরটি 'ন' সুর। 'স' বিশ্রামের সুর। অন্যান্য সুরগুলি হইতে আরোহণ-অবরোহণ করিয়া আসিয়া সা সা ন্রা সা । । উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যাইতে হয়, তখন আর অন্য সুরে যাওয়ার ইচ্ছা হয় না। 'ন' প্রদর্শক-সুর। 'ন' উচ্চারণ করিলেই 'স' উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হয়, একটু স্পর্শ না করিলে যেন আশা মিটে না। ভাবুকদের ভাষায় এই 'ন' যেন তাহার প্রিয়পাত্র 'স' কে চুম্বন না করিয়া আসিতে চায় না। এই জন্যই ইহা প্রদর্শক-সুর।

প্রাচীন কবি-সঙ্গীতাচার্য্যগণ এক একটা রাগরাগিণী এক এক ভাব ব্যক্ত করে বলিয়া গিয়াছেন। যেমন করুণ-রসাত্মক গুণকিরী রাগিণী সম্বন্ধে সঙ্গীত-সাহিত্যিক লিখিয়া গিয়াছেন—

শোকাভিভূত নয়নারুণ দীন দৃষ্টিঃ
নম্রাননা ধরণিধূসর গাত্রযষ্টিঃ।
আমুক্ত চারু কবরী প্রিয় দূরবৃত্তা।
সঙ্কীর্ত্তিতা গুণকিরী করুণোৎ কৃশাঙ্গী।

অর্থাৎ, দূরগত প্রিয়জন-বিরহে যাঁহার শোকার্ত্ত অরুণ নয়নে করুণ দৃষ্টি, বিনত বদন, দেহ ধূলিধূসরিত এবং সুন্দর কবরী মুক্ত, এই দীনা কৃশাঙ্গীই গুণকিরী বলিয়া বিখ্যাত।

কোহল নামক কবি 'গৌরী' রাগিণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

নিবেশয়ন্তী শ্রবণেহ বতঃসম্
আম্রাঙ্কুরং কোকিলনাদরম্যম।
শ্যামা মধুস্যন্দি সুসূক্ষ্মনাদা
গৌরীয় মুক্তা কিল কোহলেন॥

অর্থাৎ, যিনি কর্ণপুটে কর্ণভূষণরূপ আম্রমুকুল সংযোজনে ব্যাপৃতা, কোকিল-রবের ন্যায় মৃদুমধুর ভাষিণী, এই শ্যামাঙ্গীই কোহল কর্তৃক 'গৌরী' রাগিণী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন।

তোড়ী রাগিণী সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

তুষারশুভ্রোজ্জ্বল দেহযষ্টিঃ
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্॥

অর্থাৎ, তুষারের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল ও কুঙ্কুমমিশ্রিত কর্পূরে চর্চ্চিত দেহসম্পন্না এই তোড়ী বনমধ্যে বীণাবাদন-পূর্ব্বক হরিণকে সম্মোহিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

প্রাচীন কবি-গায়কগণ সকল রাগরাগিণীর রূপকেই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সঙ্গীতের মাধুর্য্য বাড়াইয়া গিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দুই শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—এক শ্রেণীর ছিলেন গায়ক ও বাদক, আর এক শ্রেণীর ছিলেন সঙ্গীত-সাহিত্যিক কবি ও সমালোচক বা সমজদার। তবে আজকাল গায়ক বা বাদকই সঙ্গীতাচার্য্য নামে অভিহিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আধুনিক যুগেও সঙ্গীত-সাহিত্যিক কবির দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দোল রাগে হৃদয়ে বসন্তের ভাব আসে, মল্লারে বর্ষার ভাব আসে ইত্যাদি। কিন্তু তাহা প্রমাণ করা যায় না, এইজন্য আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বর্ষাকালে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলে কিরূপ স্পন্দনের আন্দোলন হয় তাহা যদি কোন বিজ্ঞানাচার্য্য আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে হয় ত ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মল্লারে বর্ষার ভাব আসে। বর্ষাকালে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলে যেরূপ স্পন্দনের আন্দোলন হয়, মল্লার রাগিণী শুনিয়া মানুষের স্নায়ুতে যদি ঠিক সেইরূপ স্পন্দন হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে মল্লারে মানব-হৃদয়ে বর্ষার ভাব আসে। যাহাই হউক, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও প্রধান জিনিষ ভাব; হিন্দু-সঙ্গীত বিশ্বের ভাব ব্যক্ত করে এবং ইহাই তাহার বিশেষত্ব।

শ্রীমণিলাল সেন

মুক্তি

—গল্প—

পূজারী

ক্ষুদ্র সংসার; অভাব বেশী, অভিযোগ কম। স্বামী, স্ত্রী, চারিটি পুত্র, দুইটি কন্যা লইয়া সংসারে দিন আসে দিন চলিয়া যায়। অলক্ষ্যে চতুর্দ্দিক হইতে অভাবের তীক্ষ্ণ শর ছুটিয়া আসে, কিন্তু অভ্যাসের বর্ম্মে লাগিয়া তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। বাড়ীর বড় ছেলে পড়াশুনা শেষ করিয়া বেকার বসিয়া আছে। পঠদ্দশায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়া তাহার দিন একরূপ নিশ্চিন্ত ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্নের মত বুক চাপিয়া ধরিল তখন এই একটানা নিষ্কর্ম্মা জীবন একেবারে বিস্বাদ হইয়া উঠিল। মেজো ছেলে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, কিন্তু ভবিষ্যতের পড়ার ভাবনা তাহার বর্ত্তমানের পড়ার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। কারণ ইহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে যে বৃত্তি না পাইলে তাহাকে কলেজে পড়ান একেবারে অসম্ভব। সেজো ছেলেটির বালকোচিত সরসতা এখনও অভাবের তাপে শুষ্ক হইয়া উঠে নাই। পড়ার অপেক্ষা খেলাই তাহার অধিক প্রিয়। সংসারের লোকে সকল অভাবই মুখ বুজিয়া সহ্য করে, কিন্তু বালকের পড়াশুনার অভাবের বেলায় তাহারা যেন শতমুখ হইয়া উঠে। ছোট ছেলে এবং ছোট মেয়ে এখনও পরস্পর রেষারেষি,—বায়না, আব্দার করিয়া থাকে, কিন্তু প্রহার ও তিরস্কার তাহাদিগকে অনেকটা শান্ত করিয়া আনিয়াছে। বড় মেয়েটি বিবাহের পর হইতে এ সংসার হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াই সংসারের দায় মিটিয়া যায় নাই। ঋণ এবং 'তত্ত্ব'-তাপাসের অপদেবতারা মিলিয়া এখনও বিবাহের জের টানিয়া চলিতেছে।

ক্ষুদ্র ভাড়াটে বাড়ী; খাওয়া শোওয়ার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী এতটুকুও উপরি-পাওনা নেই। তলোয়ার যেমন খাপের মধ্যে আঁটিয়া থাকে, এই সংসারটিও তেমনই বাড়ীটির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। সংসারের স্থাবর জঙ্গম উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পরিত্যাগ করিলে সমূহ বিপদ, একটা সংঘর্ষ না হইয়াই যায় না। দুইটি বাসগৃহের একটি ছেলেদের সাধারণতন্ত্র, অপরটি গৃহস্থের রাজধানী, মন্ত্রণাগৃহ, ধনাগার, ছোটদের ক্রীড়াক্ষেত্র, একাধারে সমস্তই। ছেলেদের ঘরে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিছানা, বইপত্র, নিজস্ব দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক সাজান। মেজো এবং সেজো ছেলে বইয়ের প্রাচীর দিয়া তাহাদের রাজত্ব পৃথক করিয়া লইয়াছে—একের রাজ্যে অন্যের কোন জিনিষের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। বিছানার কাছে দেওয়ালের গায়ে পেরেক মারিয়া প্রত্যেকে জামা-কাপড় টাঙাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। ঘরের একপ্রান্ত ভাঁড়ারের হাঁড়িকুঁড়িতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। দেওয়াল-আলমারী, সেল্ফ প্রভৃতিতেও যাহাদের স্থান হয় নাই তাহারা জাতিচ্যুতের মত অন্তরীক্ষে শিকায় ঝুলান থাকে। ভাঁড়ারের পাশেই অবশিষ্ট স্থানটুকুতে ঘুঁটের বস্তা, উনান ধরানোর কাঠের টুক্‌রা, কাপড় সিদ্ধ করার টিন, আরও কত-কি হাবিজাবি ভিড় করিয়া আছে। ঘরে ঢুকিলেই একটা মূক শাসনের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠে—স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিলে চলিবে না। বড় ছেলে সুধীর মাথায় একটু লম্বা, তাহার মাথায় হাঁড়িকুঁড়ি লাগিয়া প্রায়ই একটা অনর্থ হয়। সে মাকে হাসিয়া বলে, "তোমার রাজত্বে বড় কড়াকড়ি; একটু অসাবধান হ'লেই হাঁড়িকুঁড়ির সিপাই-শান্ত্রী মাথা ঠুকে' সাবধান ক'রে দেয়।

ক্ষুদ্র সংসার; গতিও মৃদু। বহুদিনের রুগ্ন যেমন হাঁটিবার অভ্যাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, এ সংসারও ঠিক তেমনই ভাবে দিন হইতে দিনান্তরে গড়াইয়া চলিবার অভ্যাসটাকে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। সকালে আসিয়া যেন সংসারের কলে দম দিয়া যায়। পড়াশুনা, খাওয়াদাওয়া, স্কুলে যাওয়া, আফিসে

খাওয়া সমস্তই রুটীন-মত হইতে হইতে কলের দম ফুরাইয়া যায়, সংসারের লোকেও নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে। আবার দিন আসে দিন যায়। প্রতিদিনের ঋণকে খাওয়া, শোওয়া, সংসারের কাজকর্ম্ম দিয়া শোধ করিয়া একদিনকে অন্যদিনে পৌঁছাইয়া দিয়াই যেন সকলে নিষ্কৃতি পায়। 'দিন শেষ হ'য়ে গেল'—এই শেষ হইয়া যাওয়াতেই, এই বোঝা নামাইয়া দেওয়াতেই একটা মুক্তির আনন্দ। সংসারে জীবনের আনন্দ নাই। তাই তাহার প্রকাশের জন্য উৎসবও নাই—শুধু জীবনধারণের গ্লানি নিয়তই সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

২

সুধীর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "হ'ল না?—তারা কি বল্‌ল?"

হীরেন বলিল, "তাদের আফিস নূতন খুলেছে; একজন অভিজ্ঞ লোক চায়।"

হীরেন সুধীরের আবাল্য বন্ধু; চিরকাল বন্ধুর সুখের অংশই পাইয়াছে, কিন্তু দুঃখের ভাগ কোনদিনই তাহার ভাগ্যে মিলে নাই। সে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছে, "আমার যখন অপর্য্যাপ্ত আছে তখন দরকার হ'লে তুমি নেবে না কেন? ভগবান একজনকে দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তিনিই ত আবার আমাদের বন্ধুত্বসূত্রে এক ক'রে বেঁধে দিয়েছেন। এতেই ত তোমার বোঝা উচিত, তিনি আমার হাত দিয়ে তোমাকেও দিতে চান।" সুধীর উত্তরে বলিয়াছে, "নেওয়ার সময় ত চ'লে যাচ্ছে না হীরেন! দরকার হ'লে নিতে হবে বৈ কি?" হীরেন এই উত্তরে খুসী হয় নাই, অভিযোগ করিয়া বলিয়াছে, "তোমার দরকারে সে কোনদিনই আস্‌বে না সুধীর, সে আমি নিশ্চয় জানি। আসল কথা বল না কেন, তুমি আমার জিনিষ নিতে পার না।" সুধীর একটু ব্যথিত হইয়াই বলিয়াছে, "সত্যি কথা হাঁক, আমি নিতে পারি নে। তোমার মত বন্ধু পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য সে আমিই জানি। কিন্তু এই দুল'ভ বন্ধুর পায়ে কৃতজ্ঞতার বেড়ী পরিয়ে তার স্বাধীনতাকে আমি খর্ব্ব কর্‌তে চাই নে।"

বন্ধুর একটি চাকুরী জুটাইয়া দিবার জন্য হীরেনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুধীর যে এই চাকুরীটার উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছিল তাহা হীরেন জানিত, এবং সেই জন্য বন্ধুর আশাভঙ্গের বেদনায় সেও মনে মনে শুষ্ক হইয়া উঠিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুধীর বলিল, "তা হ'লে এটাও হ'ল না! জান হীরেন, মনটা মানুষের কত বড় শত্রু; তোমার কাছ থেকে এই খবরটা শোনবার আগেও সে কত রঙীন কল্পনা করেছে—যেন এ চাক্‌রীটা হ'য়েই গিয়েছে, সংসারও অনেকটা স্বচ্ছল হ'য়ে এসেছে।"

হীরেন কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুধীর একটু হাসিয়া বলিল, "মনে আছে হীরেন, আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশায় বল্‌তেন যে আমি বড় হ'লে একজন মস্ত লোক হব। তাঁর কথাটা কি রকম অক্ষরে-অক্ষরে ফ'লে গিয়েছে দেখেছ?—এত বড় নিষ্কর্ম্মা বোধ হয় আর নেই।"

হীরেনও হাসিয়া বলিল, "না, একেবারে নিষ্কর্ম্মা the great."

সুধীর গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল, "না হীরেন হাসি নয়, একটু ভেবে দেখ জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, 'সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্।' পড়াশুনা শেষ হ'য়ে গেল, দু'দিন বিশ্রাম নাও ভাল কথা, কিন্তু এ যে একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত! ভাল জিনিষ যে আমার নিজের কাছেই তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে।"

হী। কিন্তু হাত-পা ছুঁড়লেও ত কোন উপায় নেই।

সু। একটা উপায় থাক্‌লেই যে ভাল ছিল হে! ছাত্র পড়িয়ে যা রোজগার করি, তাতে কেবল একটা লোকেরই চলে—সংসারের কোন সাহায্যই হয় না। বাড়ীর লোকেরা যে আমারই মুখ-পানে চেয়ে আছে এ ত বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু কোন দিকেই যে কোন সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারছি না। এক যদি কানা-খোঁড়া হতাম কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ যে বেঁধে মার খাওয়া।

হীরেন সান্ত্বনা দেবার ছলে বলিল, "চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তেই হবে।"

সু। না হ'য়ে যায় না, কিন্তু কেমন ক'রে হবে সেইটাই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। হাজার যায় 'where

there is a will……' কিম্বা লক্ষবার 'উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ……'জপ করব, না দিনরাত 'উদ্যম বিহনে কভু…' আবৃত্তি করব, বল, আমি সব তাতেই রাজী আছি। বাবাও আজ সকালে ঠিক্ তোমার কথাই বলছিলেন, "বাড়ী ব'সে থাক্‌লে চাক্‌রী আপনি বাড়ী আস্‌বে না, পাঁচ জায়গায় চেষ্টা করতে করতে এক জায়গায় হ'য়েও যেতে পারে।" তাঁর ইচ্ছা—আমি খুব ঘোরাঘুরি করি। তোমার এই খোঁজ নেওয়া নিয়ে বোধ হয় একশ' জায়গার বেশী ঘোরা হয়েছে, কিন্তু চাক্‌রী-দেবতা ধরা দিলেন কই? আমার ত ক্রমশঃই মনে হচ্ছে ঐ যে 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র' ব'লে একটা কথা আছে সেটা খুব সত্যি। একজন দৈবজ্ঞের কাছে গেলে হয় না?—কোথায় চাক্‌রী মিল্‌বে তার একটা ঠিকানা বাৎলে দিলেও দিতে পারে; তা হ'লে আর বাজে ঘুরে মর্‌তে হয় না।

হীরেন রাগিয়া বলিল, "ঠাট্টার একটা সময় আছে সুধীর!"

সু। আহা, চট কেন? হা-হুতাশের ভাণ্ডার ত আর অক্ষয় নয়, ফুরিয়ে এসেছে। ভাইগুলো অল্প খেয়ে খেয়ে দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, মার শরীর একলা খেটে খেটে হাড়-জিরজির্ কচ্ছে', বাবার সব দিক্ দিয়ে স্বল্পতাকে বরণ কর্‌বার চেষ্টা, এ সবই ত চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে দেখ্‌ছি। মনটাকে callous কর্‌বার চেষ্টা করছি যাতে কোন আঘাতই তাকে চঞ্চল না করতে পারে। কিন্তু মা যখন ভাইদের বুঝিয়ে বলেন, "আর দুটো দিন সবুর কর্ না দাদার একটা হিল্লে হোক্, তখন কি আর এত টানাটানি থাক্‌বে?"—তখন মন্‌টায় আগুন লেগে যায়। সকলেই যে আমার কাছে অনেক আশা ক'রে আছে ভাই! এই নির্ভরশীল বিশ্বাসের বোঝা যে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে। এক এক সময়ে তাই ছুটে বা'র হ'য়ে পড়ি! রাস্তার গাড়ী, ঘোড়া, বিলাসের অগণিত উপকরণ দেখে মনের আগুন আরও জ্ব'লে ওঠে। অপরের ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিশাপ মনের মধ্যে গ'র্জ্জে উঠে। তারপরে রাস্তার ধারের ভিখারীকে দেখে মনে হয়, না, জগতে আমি একলাই দুঃখী নই, আমার নীচেও অনেকে আছে; কিন্তু এ যে অক্ষমের সান্ত্বনা—নিজের উচ্চাশার আত্মহত্যা। দারিদ্র্যের এই নাগপাশ ছেদন ক'রে আমি যতই মুক্ত হ'তে চাচ্ছি, দারিদ্র্য-দেবতা যেন ততই আমাকে সেই পাশে আবদ্ধ করতে চাইছেন। হীরেন, তুমি বলতে না মানুষের জীবনটা সুখের?

হী। সুখের ব'লে ভাবলেই ত অশান্তি কম ভাই!

সু। মনুষ্যত্বের বেদনা চোখ মেলে দেখতে পার না ব'লেই ত মনকে এই আঁখি ঠারা হীরেন! বুকে হাত দিয়ে বল ত তুমি, সুখদুঃখের ধারণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও কি না? এমন মনে হয় না যে, রাত্রিতে কামনা ক'রে শুলে তোমার যত দুঃখের স্মৃতি মন থেকে মুছে যাক্,—আর সকালে উঠে দেখলে ঠিক তাই হয়েছে? উঃ—সে মুক্তির আনন্দ আমি কল্পনাও করতে পারিনে! কিন্তু সে যে হবার নয়, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার ঋণ যে অনন্তকাল ধ'রে শোধ করতে হবে।

৩

দুই মাস হইল চাকুরী-দেবতা সুধীরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—সদাগরী অফিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার একটি চাকুরী জুটিয়াছে। এতদিন অভাবের দাবদাহের পর এই স্বচ্ছলতার বর্ষণটুকু উপবাসী সংসারতরু অগস্ত্যের গণ্ডূষপানের মত এক-গণ্ডুষে পান করিয়া লইল। অভাবের সময় যাহাদের নাই বলিলেই চলিয়া যাইত, এখন তাহারা কিছু না লইয়া উঠিতেই চাহে না। সংসারও যেন রক্তের স্বাদ পাইয়াছে, তাহার প্রয়োজন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঋণ-শোধ এবং অভাবপূরণের শত ছিদ্র দিয়া সুধীরের অল্প আয়টুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বেশী দেরী হয় না। বহু দিনের অবসাদের পর সংসারটা যখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিল, তখন তাহার এই নবলব্ধ গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা সুধীরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

সুধীর খাইতেছিল। তাহার মা বলিলেন, "বিমলার শাশুড়ী বোধ হয় আমাদের উপর রাগ করেছে। দু'বার পূজার 'তত্ত্ব' বাকী পড়েছে। মেয়েটাও বোধ হয় অভিমান

করেছে, কেমন আছে পর্য্যন্ত চিঠি লিখে জানায় না। এবার ত কিছু 'তত্ত্ব' করতে হয়।"

মায়ের কথার আভাষেই সুধীর বুঝিয়াছিল এবার 'তত্ত্বের' অপদেবতার পালা—তিনি তাঁর স্থায্য-গণ্ডা বুঝিয়া না লইয়া ছাড়িবেন না। হাসিয়া বলিল, "ছাই হয়েছে, দু'বার যখন বাকী পড়েছে তখন তিনবারেও কোন দোষ হবে না। আর ও ঘুমন্ত বাঘকে ঘাঁটিয়ে কাজ কি?"

তাহার কথাতে মা দুঃখ পাইলেন বুঝিতে পারিয়া সুধীর আবার বলিল, "এটা কাজের কথা না মা,—কি দিতে হবে বল'।"

মহামায়া বলিলেন, "জামাইয়ের ধুতি চাদর, মেয়ের কাপড় সেমিজ এ ত দিতেই হবে। আর তার সঙ্গে একটু মিষ্টি না দিলেও ভাল দেখায় না।"

সুধীর মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল দশ টাকার কমে হইবে না। কিন্তু এই দশ টাকার সংস্থান হয় কোথা হইতে? তাহার মাথায় চট্ করিয়া খেলিয়া গেল যে, দুপুর বেলা আফিসে জল-খাবার না খাইলে এবং ফিরিবার সময় হাঁটিয়া আসিলে দুই মাসে দশ টাকা বাঁচান যাইতে পারে। মানুষ যখন কত কমে চলিতে পারে তাহার পরীক্ষা নেয়, তখন কি এক রকম আত্মনাশের নেশা তাহাকে পাইয়া বসে—তখন নিজের কোন অভাবই বড় বলিয়া মনে হয় না, কোন কৃচ্ছ্র-সাধনই কষ্ট দিতে পারে না। সুধীরকেও এই নেশাতে পাইয়া বসিয়াছিল। সে যে নিজের জন্য কিছুই বাঁচাইতেছে না সমস্তই সংসারের জন্য, ইহা মনে করিয়া এক গভীর আত্ম-তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত।

সেইদিনই অফিস হইতে ফিরিয়া সুধীর মাকে বলিল, "আরো একটা টিউশানী পেয়েছি; সন্ধ্যেবেলা দু'ঘণ্টা ক'রে পড়াতে হবে—কুড়ি টাকা ক'রে দেবে।"

সংসারের আয় হইবে শুনিয়া মহামায়া মনে মনে একটু খুসী হইয়া বলিলেন, "কোথায় যেতে হবে?"

সু। তা একটু দূর আছে, এখান থেকে মাইল-দুই হবে। সন্ধ্যায় একটু বেড়ানো হবে,—সঙ্গে সঙ্গে রোজগারও হবে; মন্দ কি?"

দূরত্বের কথা শুনিয়া মহামায়া একটু দমিয়া গিয়া বলিলেন, "সকালে সন্ধ্যায় ছেলে পড়ান, এ ছাড়া চাকরী, শরীরে সইবে কেন?"

সু। সইবে আবার না!—তা'ছাড়া এ ত চিরদিনের জন্য নয়, সংসার একটু স্বচ্ছল হ'লে ছেড়ে দিলেই চল্‌বে

মহামায়ার কাছে এ যুক্তি মন্দ লাগিল না। তিনি সম্মতি দিলেন।

৪

আফিসের জীবনকে সুধীর আর-পাঁচজনের মত ঘরোয়া ব্যাপার করিয়া লইতে পারিল না। আফিসের কর্ত্তব্যের দিকটাই তাহার কাছে বড় হইয়া দেখা দিল—সে কাজের মধ্যেই সব সময় নিজেকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিত। কিন্তু কর্ত্তব্যের মাঝে মাঝে অবসরের সুযোগে যে গল্পগুজব করিয়া আত্মীয়তা করা যায় এটা তাহার কাছে সহজ হইল না। তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে সকলে অন্যরূপ বুঝিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "সুধীর বাবুর কাজে যে রকম মন তাতে একেবারে ডবল-প্রমোশন না হ'য়েই যায় না।" সুধীর স্বাভাবিক শঙ্কাবশতঃ চুপ করিয়া থাকিত। বিদ্রূপের উত্তরে বিদ্রূপ করিলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত। এই চুপ করিয়া থাকাটাও সকলের কাছে বিসদৃশ লাগিত;—তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত, "এম-এ পাশ যেন একলা উনিই করেছেন, আর কেউ করে নি।"

সুধীরের কানে একটা আলোচনা প্রায়ই আসিয়া পৌঁছিত—সেটা আফিসের বড় বাবুকে লইয়া। তিনি কবে কাকে কতখানি তিরস্কার করিয়াছেন, তাঁকে কে কতখানি খোসামোদী করিতেছে, এ সব খবর লইয়া বাদ-বিতণ্ডা পর্য্যন্ত হইত। বড় বাবু সম্বন্ধে সুধীরের একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু সেদিন বোধ হয় সুধীরের কপাল নিতান্তই খারাপ ছিল তাই বড় বাবু নিজে আসিয়া তাহাকে দেখা দিলেন। সুধীরের কাছে আসিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনি না এম-এ পাশ করেছেন? আপনাদের

এম-এ পাশের গলায় দড়ি!—একটা স্কুলের ছেলেও বোধ হয় এ ভুলটা করত না।"

বড় বাবু পদটারই বোধ হয় কিছু মাহাত্ম্য আছে নতুবা বড় বাবু মাত্রেই এত উগ্র হইবেন কেন? পদমাহাত্ম্য ছাড়াও এক্ষেত্রে অন্য কারণ আছে। সুধীরের পদটা খালি হইলেই তিনি উহাতে নিজের শ্যালককে বসাইয়া দিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব এম-এ পাশ বলিয়া সুধীরকেই নিযুক্ত করিয়া সমস্ত পণ্ড করিয়া দিলেন। এই বিপত্তির জন্য বোধ হয় গৃহিণীর নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইয়াছিল। তাই তিনি এই সুযোগে সেই আক্রোশটা বেচারী সুধীরের উপর দিয়া তুলিবেন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

একঘর লোকের সামনে সুধীর লজ্জায় অপমানে লাল হইয়া উঠিল। কাগজে তাহার ভুলের নিদর্শন দেখিয়া সে বলিল, "কই, ভুল ত কিছুই নেই।"

বড় বাবু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "নেই, একশ'বার আছে। ভুল ক'রে আবার উল্টে তর্ক!"

সুধীর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "ওটা ভুল হ'তেই পারে না।"

এইবার বড় বাবু একটু দমিয়া গেলেন। পাছে সকলের সাম্‌নে তাঁহার হার স্বীকার হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি বলিলেন, "দাঁড়ান তা হ'লে একবার ভাল ক'রে দেখি। না, ঠিকই আছে দেখছি; তবে হাতের লেখাটা একেবারে একজিবিশনে দেবার মত! সাহেব চাক্‌রী দিয়েই খালাস, তারপরে তার হাতের লেখা বুঝতে পারা যাক্ আর নাই যাক্।" বলিয়া তিনি অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

বড় বাবু চলিয়া যাইতেই সকলে সুধীরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হলধর বলিল, "কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না সুধীর বাবু, বড়বাবুর নোশানটা খারাপ হ'য়ে গেল। ওটা না হয় ভুল না-ই হ'য়েছিল, কিন্তু ভুল স্বীকার ক'রে নিলে ত আপনার গাঁটের কড়ি খরচ হ'ত না।"

বনমালী যোগ দিয়া কহিল, "সে ত ঠিক কথাই। হাজার হ'লেও উনি বড়বাবু, ওঁর সঙ্গে তর্ক করাটাও কি ঠিক হল? এতে ক'রে Superior officerকে অসম্মান করা হ'ল না?"

সুধীর এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—কিন্তু এইবার মুখ খুলিল, "তাই ব'লে যা ভুল নয় তাকে কি ক'রে স্বীকার করি?"

সেইদিনই বড়বাবু জানিলেন যে সুধীর তাহার বিপক্ষে যত কিছু বলিয়াছে তাহার সার মর্ম্ম এই—বড়বাবু পদটা তাহাকে দিলে সে না কি তাঁহার অপেক্ষা ভাল কাজ করিতে পারে।

সুধীর কিন্তু জানিতেও পারিল না যে অলক্ষ্যে তাহার কত অনিষ্ট সাধিত হইয়া গেল।

সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে একজন কাহারও বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অন্য পাঁচজন তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। সুধীরের সহকর্ম্মীগণও সেইরূপ বড় বাবুর সহিত মিলিত হইয়া সুধীরকে শত্রুপক্ষ খাড়া করিয়া লইল। সুধীরের ইহাতে একটু মুস্কিল হইল; আফিসের নূতন কাজ অন্য কাহারও কাছে বুঝিয়া লইবার জন্য গেলে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, 'আপনি নিজেই করতে পারবেন, আপনার ত ভুল হ'তেই পারে না।' সুধীর এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু তাহার অপরাধটা যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অন্যের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া সে সাধ্যমত নিজে নিজেই সমস্ত করিতে লাগিল, কিন্তু একদিন ভুল বাহির হইয়া পড়িল।

বড় বাবু আসিয়া শ্লেষের সুরে বলিলেন, "সুধীর বাবু, দেখুন ত এটা ভুল হয়েছে কি না?"

সুধীর অপরাধ স্বীকার করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবুর মুখে চোখে হিংস্র আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, তিনি ক্রূরস্বরে বলিলেন, "কি—একেবারে ভিজে বেড়ালটি হ'য়ে গেলেন যে,—মুখে যে আর কথাটি নেই!"

অপমানে সমস্ত মুখ-চোখ লাল করিয়া সুধীর বলিল, "ভুল হ'য়ে গিয়েছে।"

বড়বাবু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ বলেন কি, আপনার কি কখনও ভুল হ'তে পারে?"

সেদিন ভাগ্যে বহু অপমান লেখা ছিল, বড়বাবু বাছা-বাছা গোটাকয়েক কড়া কথা শোনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

সুধীর বুঝিল যে তাহার চাকুরী-গগনে ধূমকেতু উদিত হইয়াছে; কিন্তু সে যে কতখানি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া যাইবে তাহাই সে বুঝিতে পারিল না।

৫

রবিবার। আফিসের তাড়া নাই। সপ্তাহের মধ্যে এই দিনটাতে সংসার যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার হাড়ের মধ্যেও কাঁপুনি ধরাইতেছিল। কয়দিন হইতেই প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। মেরুদেশের অবরুদ্ধ হাওয়া যেন বিদ্রোহ করিয়া পৃথিবী-পরিক্রমণে বাহির হইয়াছে। সূর্য্যদেবের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি যখন মুখ দেখাইতে নারাজ হইলেন, তখন সুধীর ভাইদের ডাকিয়া বলিল, "যার যার পুরান খাতা আছে নিয়ে এস। শীতবধ-যজ্ঞ হবে।" পুরান খাতা জড় করিয়া আগুন জ্বালান হইল। পাতা ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। বহুদিনের পুরান টেবিল-ঢাকা বনাত কাটিয়া সুধীর গেঞ্জির অনুকরণে ছোট ভাই-বোনের জামা তৈরী করিয়া দিয়াছিল। তাহারা তাই পরিয়াই উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

সুধীর প্রত্যেকের হাতে এক একখানি কাগজ দিয়া বলিল,"মন্ত্র পড়, 'ওঁ শীতবধায় গ্রীষ্মকরণায় ছিন্নপত্র স্বাহা'।"

সকলে সুর করিয়া বলিয়া উঠিল,"......স্বাহা।"

ঠিক্ এমন সময় হীরেন প্রবেশ করিয়া সুধীরের কাণ্ড দেখিয়া বলিল, "কি হে ব্যাপার কি, বুড়ো বয়সেও আগুন নিয়ে খেলা!"

সুধীর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়াবলিল, "কি,—পবিত্র হোমাগ্নিকে খেলা বলা? যজ্ঞদেবতার কাছে হাত্-জোড় ক'রে বল, "মার্জ্জনাং দেহি মে।"

বালকবালিকাদের অপূর্ব্ব সজ্জা চোখে পড়ায় হীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "আধুনিক ঋত্বিকদের কি এই সজ্জা না কি?"

সু। শীতযজ্ঞে উপযুক্ত শীতবস্ত্র পরিধান ক'রে আসা বিধিমত। সে যাই হোক্, জামাগুলিতে কি রকম workmanship প্রকাশ পেয়েছে হে তাই বল। কিছু capital পেলে একটা দর্জ্জির দোকান খুলে বস্তাম।

হীরেনের কাছে এতক্ষণে সমস্ত স্বচ্ছ হইয়া গেল। যাহাকে সে নিছক খেলা বলিয়া ভাবিয়াছিল তাহা নিষ্ঠুর প্রয়োজন। এই নিদারুণ শীতে কাহারও গায়ে উপযুক্ত শীতবস্ত্র নাই;—ছোটরা বনাতের জামা গায়ে দিয়াই কত খুসী।

হীরেন খুব দৃঢ়স্বরে বলিল, "সুধীর,আমার কোন সাহায্যই ত কোনদিন নাওনি, কিন্তু আজ নিতেই হবে।"

সুধীর হীরেনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, "অর্থাৎ আমার যজ্ঞ পণ্ড ক'রে দিতে চাও। কিন্তু বাবা যে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন।"

হী। আমি ছোট ভাইদের উপহার দেব এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন কেন? আজ আমি কোন আপত্তিই শুন্‌বনা।

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হীরেনবাহির হইয়া গেল।

হীরেন যখন সুধীরের মাকে প্রণাম করিল, তখন সুধীর গায়ের নূতন জামাটার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌লে মা, যাগযজ্ঞের ফল একেবারে হাতে হাতে ফ'লে গেল। যারা যারা আহুতি দিয়েছে সবাই নূতন জামা পেয়েছে। স্বর্গের দেবদূতের চেহারা কখনও দেখিনি, কিন্তু আজ হীরেনের মুখ দেখে অনেকটা অনুমান কর্‌তে পার্‌ছি!

* * *

আহারের পর দুই বন্ধুতে একত্র হইলে সুধীর বলিল, "এত শীতেও সকালে এসেছিলে কি মনে ক'রে?"

হীরেন কি একটা বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে পারিতেছে না দেখিয়া সুধীর বলিল, "অভয় দিচ্ছি—নির্ভয়ে নিবেদন কর।

হী। মার শরীর দিন দিন খারাপ হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছ ত, একা একা খাটা ওঁর পক্ষে সহ্য হ'চ্ছে না।

হাওয়া কোন দিক হইতে বহিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুধীর বলিল, "এটা ত গৌরচন্দ্রিকা হ'ল হে, আসল কথাটা কি ভেঙেই বল না কেন?"

হী। আসল কথাটা তুমিও বুঝ্‌তে পেরেছ। আমি বলি,

একটা বিয়ে কর।

সুধীর উল্লাসের ভাণ করিয়া বলিল, "তুমি বলছ, না মার proxy দিচ্ছ। আজকের সকালটা দেখ্‌ছি ভাল ভাবেই হ'য়েছিল। কবে দিন স্থির হ'ল?"

হী। তোমার সব তাতেই ঠাট্টা সুধীর,—কোন জিনিষ তুমি serious ভাবে নিতে জান না।

সু। তুমিও যে এটা serious ভাবে বল্‌তে পার এ আমার কল্পনার অতীত। যাঁকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব তাঁকে ঐ রকম সেল্‌ফে তুলে রাখলে দেখায় ভাল, কিন্তু তিনি থাক্‌তে রাজী হবেন কেন?

হী। আগে বিয়ে কর ত তার পরে জায়গা আপনি হবে।

সু। অর্থাৎ ঘোড়া হ'লে চাবুক আপনি আসবে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা একেবারে অসম্ভব। মার কষ্টের কথা বল্‌ছিলে, সে কি তুমি দেখিয়ে দিলে তবে আমি দেখ্‌ব? খেটে খেটে তাঁর শরীর অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে গেল, এখন তাঁকে একটু বিশ্রাম দেওয়া এ ত সন্তানের কর্ত্তব্য। কিন্তু এ যে হবার উপায় নেই ভাই! তুমি ত আমার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জান, কিন্তু তার কোন্‌টা সার্থক হ'য়েছে বল ত? সাহিত্যের কল্পলোক, আদর্শের ভাবরাজ্যে অভাবের মত্তহস্তী প্রবেশ ক'রে কবে তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এখন আর কিছুর জন্যই দুঃখ হয় না। এখন কি মনে হয় জান? তোমরা একে কবিত্ব ব'লে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু আমার এইটাই একমাত্র সত্য; মনে হয়—এই বিরাট বিশ্বের মাঝে এই যে অগণিত জীবজন্তুভরা অশেষ বৈচিত্র্যশালিনী পৃথিবী অসংখ্য জ্যোতিলোকের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে অনন্তযাত্রায় চলেছে তার মাঝে এই আমি-বিন্দুর সুখদুঃখ কত তুচ্ছ! ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্প-পরিসরের মাঝে যদি সার্থকতা আসে সে ত মস্ত সৌভাগ্য, কিন্তু তা যদি না-ই আসে তা হ'লে এর জন্যে দুঃখ করা ত মিছামিছি কষ্ট পাওয়া। না হয় মিলনের আনন্দ এ জীবনটাকে শতসহস্র সার্থকতায় ভ'রে তুললে পারল না; এই বিফলতার বেদনা যদি বিরাট বিশ্বে একটু স্পন্দন জাগাতে সমর্থ না হয় ত আমি এর জন্য দুঃখ করি কেন? এই অনন্তপথে যাত্রা যাতে শীঘ্র শেষ হ'য়ে যায় আমি তারই কামনা করি।

৬

সুধীরের চাকুরী-গগনে যে ধূমকেতুর সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহা করাল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আসন্ন হইয়া উঠিল। সুধীর যথাসম্ভব ভুলত্রুটি বাঁচাইয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই তাহার ভাগ্যে বড়বাবুর তিরস্কার ও গঞ্জনা ঘটিত। বড়বাবু চলিয়া গেলেই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসা হলধরের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুধীর ইহাকে বড় আমল দিত না।

একদিন হলধর আসিয়া বলিল, "দেখুন সুধীরবাবু, ভাল-মানষির কাল আর নেই। আপনি মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেন কেন? এবার বকাবকি করলেই আপনি সোজাসুজি বল্‌বেন যে সাহেব আপনাকে এনেছেন, বড়বাবু খামকা অত বক্‌বেন কেন? আর, কেবল ভুল ভুল কর্‌লে ত ভুল আপনিই হ'য়ে যায়।"

সুধীর হলধরকে দরদী-জ্ঞানে অন্তরের কথা বলিল, "ভুল-চুকের জন্য তিরস্কার ভোগ কর্‌তে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু বেয়ারাগুলোর সাম্‌নে এ রকম সব কথাবার্ত্তা বলেন যা বাস্তবিক অপমানকর।"

সেইদিন হলধর প্রমুখাৎ বড়বাবু শুনিলেন যে সুধীর বলিয়াছে, সাহেব তাকে এনেছেন—বেয়ারাদের সাম্‌নে অপমান কর্‌বার তিনি কে?

হলধরের ইহাতে একটু স্বার্থ ছিল। বড়বাবুর শালাকে নিজের পদটি দিয়া সুধীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার গোপন ইচ্ছা তাহার ছিল। সুধীরকে যে-কোন উপায়ে সরাইতে পারিলে তাহার ইচ্ছায় বড়বাবুর কোন আপত্তি ছিল না।

সপ্তাহখানেক পরে সুধীর আফিসে আসিয়াই শুনিল সাহেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—চাকুরীর কোন আশঙ্কা নাই ত? সুধীর ঘরে ঢুকিতেই সাহেব টেবিলের উপর হইতে একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "Read."

সুধীর পড়িয়া দেখিল—কে বেনামীতে সাহেবের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে। তাহার পড়া শেষ হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "Do you write this?"

সুধীর বিহ্বলের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "No."

সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "That is of no avail. You may seek for a better master."

সুধীর কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। খবরের কাগজে কে কি লিখিয়াছে, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি! সাহেবের শেষ কথাটা কিছুতেই তাহার মাথায় ঢুকিতেছিল না; তাহার চাকুরী যাইবে এ কখনই হইতে পারে না, তাহার অপরাধ কি? তাহার নিশ্চয়ই কোথাও বুঝিবার ভুল হইতেছে ভাবিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার টেবিলে হলধর কাজ করিতেছে!—এ কি হইল! কালও সে ঐ টেবিলে বসিয়া কাজ করিয়া গিয়াছে, আর আজ এই সকালের মধ্যে এমন কি হইয়াছে যাহাতে তাহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে?—এ সমস্তই তাহার কাছে প্রহেলিকার মত বোধ হইল। সে হলধরের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্র তুলিতেই হলধর বলিয়া উঠিল, "কি কর্‌ব সুধীর বাবু, আমরা সকলেই ত হুকুমের দাস, সাহেবের হুকুম ত আর অমান্য কর্‌তে পারিনে। বড়বাবুর সঙ্গে একটু বনিয়ে চল্‌লে ত আর এ বিপদটা ঘট্‌ত না।"

বিপদটা যে কি তাহা তখনও বুঝিতে না পারিয়া সুধীর মূঢ়ের মত কহিল, "বিপদটা কি হয়েছে হলধর বাবু?"

হলধর বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি, সাহেব আপনাকে জানান নি, আপনার যে জবাব হয়ে গিয়েছে।"

সুধীরের মুখ দিয়া প্রতিধ্বনি বার হইল,—"জবাব হ'য়ে গিয়েছে!" ভাই-বোনদের শীর্ণ চেহারা, জননীর শ্রমক্লিষ্ট মুখের ছবি তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল। তাহার চাকুরী গিয়াছে—এই কথা যখন তাহার বাবা-মা শুনিবেন তখন তাহাদের মুখের অবস্থা কিরূপ হইবে মনে করিতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সুধীর "মাগো" বলিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখচোখ দিয়া আগুন ছুটিয়া কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। সে হলধরের কাছে এক গ্লাস জল চাহিল। জল খাইয়া একটু সুস্থ হইলে পর হলধর বলিল, "আপনি একবার বড়বাবুর কাছে যান্ না, দেখুন যদি কিছু হয়।"

তাহাকে দূর হইতে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই বড়বাবু বলিয়া উঠিলেন, "এতে আমার কোনও হাত নেই সুধীর বাবু, যিনি আপনাকে এনেছিলেন তিনিই জবাব দিয়েছেন।"

সুধীর কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমাকে যে এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন, কিন্তু আমার অপরাধ কি? আপনি ত জানেন আমি লিখি নি।

বড়বাবু। আমি জান্‌লে কি হবে, সাহেব যে আপনাকে সন্দেহ করেছেন। তাঁর ধারণা, আফিসে আপনি ছাড়া ত আর কেউ অমন লেখাপড়া জানা লোক নেই; ও রকম ইংরাজী একা আপনিই লিখ্‌তে পারেন।

সুধীর ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "দোহাই আপনার, আমার চাক্‌রীটা নেবেন না, বাড়ীর লোকেরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্‌বে। আপনার বাড়ীতেও ত ছেলেপিলে আছে, তাদের মুখ চেয়েও এতগুলো লোকের অন্ন মার্‌বেন না। আপনার কাছে অপরাধ ক'রে থাকি তার জন্যে পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি, এই নাকে ক্ষত দিচ্ছি—আর কখনও এমন নির্ব্বোধের কাজ কর্‌ব না। আপনি একবার সাহেবকে ব'লে দিন যে এতে আমার কোন অপরাধ নেই।"

বড়বাবু ব্যস্ত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "আহা, করেন কি! আমি সাহেবকে বল্‌লে ত কোন ফল হবে না, জানেন ত ওদের এককথা।"

নিজের শিক্ষাদীক্ষার অভিমান সুধীরকে শক্ত করিয়া তুলিল। তাহার মনে হইল এই হৃদয়হীন পশুর কাছে দয়া ভিক্ষা করিয়া এতক্ষণ সে তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা করিতেছিল কেমন করিয়া!—অপরিসীম বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল।

"আপনার মঙ্গল হোক্ বড়বাবু"—বলিয়া সে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

৭

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সুধীর গঙ্গার ঘাটে আসিয়া অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। দূরে দিক্‌চক্রবালে

সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটা তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া যায় নাই। অন্যদিন গৃহে ফিরিবার সময় এই সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধচ্ছবিটি তাহার মনে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিয়াছে। সারাদিনের আলো-বিতরণের পর সূর্য্যদেবের বিদায়ের সহিত তাহার কাজ হইতে ছুটিকে এক করিয়া দেখিয়া সে মনে মনে এক গভীর তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহাদের মাঝে কত প্রভেদ। সূর্য্যদেব কাল আবার আসিবেন, কিন্তু তাহার এ যে চিরবিদায়! অপরিসীম বেদনায় সে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চাকুরী গিয়াছে, এই ভাবনাটা আর সমস্ত ভাবনাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। এই চাকুরী না-থাকা যে তাহার পরিবারের কতখানি মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিবে তাহার চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে জলস্থল আবৃত করিয়া দিল। তীরে অগণিত দীপালোক জ্বলিয়া উঠিল। নিঃশব্দ অম্বর ব্যাপিয়া বিশ্রামের মূক ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল। সুধীর তখনও নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল সুধীরের মন বাড়ীর কথা ভাবিয়া ততই বিকল হইয়া উঠিতে লাগিল—সে বাড়ী গিয়া মাকে কি বলিবে, বাবাকে কি বলিয়া বুঝাইবে। "আর ভাবিতে পারি না" বলিয়া সে শ্রান্ত হইয়া ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, এখন যে ছাত্র পড়াইতে যাইবার সময়। তাহার মনের ভিতর জ্বালা করিয়া উঠিল—কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য, একটু যে শান্তি ভোগ করিবে তাহারও উপায় নাই।

ছাত্র পড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া সুধীরের মন একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আসন্ন মুহূর্ত্তের কথা মনে করিয়া তাহার পা যেন আর নাড়িতেই চাহে না। তাহার মা যে তখনও নিঃসন্দিগ্ধমনে পুত্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছেন,—সে কেমন করিয়া এই শঙ্কাহীন নিশ্চিন্ততাকে নিদারুণ দুঃসংবাদের বজ্রাঘাতে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে? বিপদ যখন দুয়ারের বাহিরে তাম্বুটা গাড়িয়া বসে, তখন যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া মনে মনে যেমন বল আসে সুধীর সেইরকম মরিয়া হইয়া পথ চলিতে লাগিল।

"আঃ—লোকটা কানে শুনতে পায়না না কি!"

সুধীর চম্‌কিয়া মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতেই একখানি সাইকেল তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। এই আকস্মিক আঘাতে সুধীরের উদ্বেগখিন্ন দুর্ব্বল শরীর বেদনায় ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। সে ইহার প্রচণ্ড বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাস্তার পাশেই ছিল খাদ, রাস্তা হইতে গড়াইয়া সুধীর সেইখানে যাইয়া পড়িল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই আকাশের বুক চিরিয়া উজ্জ্বল জ্যোতির্লেখা টানিয়া উল্কা খসিয়া পড়িল। কে জানে,—কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল কি না!

* * *

দুই দিন হইল সুধীরের সংজ্ঞাহীন দেহ সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাড়ী আনিয়াছে। ডাক্তার দেখিয়া বলিয়াছেন, "সারারাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া ডবল-নিউমোনিয়া হইয়াছে। রোগী যে-রকম দুর্ব্বল তাতে জীবনের আশা খুব কম।"

এই দুই দিন ধরিয়া একটা বিপদের আশঙ্কা জগদ্দল পাথরের মত এই সংসারের বুকে চাপিয়া রহিয়াছে। হীরেন প্রাণপণে অর্থ ও সাহায্য দিয়া রোগীর সেবা করিতেছে। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। দু'দিনের মধ্যে একবারও জ্ঞান হয় নাই,—আজ আবার বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

সুধীরের জননী বিহ্বলের মত বসিয়া ছিলেন—তাঁহার মাথায় কিছুই ঢুকিতেছিল না। হীরেন আসিয়া বলিল, "মা, একটু ফ্লানেল দিতে হবে।"

মহামায়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, আমার সুধীর কি বাঁচ্‌বে না? ভগবান কি আমার উপর এতবড় অবিচার কর্‌বেন?—আমি ত কখনও কারও কোন অনিষ্ট করিনি বাবা! আমি যে বড় দুঃখী হীরেন, শুধু সুধীরের মুখ চেয়ে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছি, সেই সুধীরও কি শেষে আমাকে ফাঁকি দিয়ে যাবে?"

হাঁ। আগে থেকেই অমঙ্গল ভাব্‌ছেন কেন মা, এতে যে অকল্যাণ হয়।

মহামায়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি যে নিজেই অমঙ্গল বাবা, আমি যে রাক্ষুসী, বাছাকে কেবল টাকা-

টাকা ক'রে উত্যক্ত করেছি। বাছা আমার খেটে খেটে প্রাণ দিতে বসেছে,—এ যে আমি ভুলতে পারছিনে হীরেন! শুধু এইবারটি তোমরা ওকে সারিয়ে দাও, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আর কখনও টাকার কথা বলব না।"

হী। মানুষের যা সাধ্য তার ত কোন ত্রুটি হ'চ্ছে না মা,—এখন সব ভগবানের ইচ্ছা! ঘরে কি একটু ফ্লানেল আছে?

মহামায়া তাঁহার সযত্ন-রক্ষিত শালের একটুকরা ছিঁড়িয়া আনিয়া হীরেনের হাতে দিলেন।

হীরেন বলিল, "দামী জিনিষটা নষ্ট করলেন,—ছেলেদের কারও ফ্লানেলের জামা ছিল না?"

মা। সব নষ্ট হ'য়ে যাক্ বাবা, আমার কিছুতে দরকার নেই; শুধু সুধীর সেরে উঠুক।

* * *

হীরেন সুধীরের মাথায় আইস্‌ব্যাগ ধরিয়া বসিয়াছিল, মহামায়া বুকে সেঁক দিবার জন্য আগুন প্রস্তুত করিতেছিলেন।

সুধীর পূর্ণমাত্রায় প্রলাপ বকিতেছিল, "বড়বাবু, নির্দ্দোষীকে এতবড় শাস্তি দেবেন না! বড় দুঃখের সংসারের একমাত্র অবলম্বন! আমার চাকরীটি নেবেন না,— এত বড় অধর্ম্ম করবেন না!"

মহামায়ার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হীরেন বহুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

প্রলাপের ঘোরে সুধীর সহসা "হীরেন! হীরেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মহামায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কি বাবা?—হীরেনকে ডাকছ কেন, সে যে তোমার মাথার কাছেই রয়েছে।"

হী। ব্যস্ত হবেন না মা, এখনও ওর জ্ঞান হয় নি।

রোগী বিকারের ঘোরে বলিতে লাগিল, "দেখ্‌ছ হীরেন, আমার পিছনে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে? উঃ, কি ভীষণ চেহারা—মুখে কি বিরাট ক্ষুধার চিহ্ন! ঐ দেখ আমার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে চাইছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "ঐ, ঐ আবার এসেছে ...হাতে কি ভীষণ শৃঙ্খল... আমাকে ধরবার জন্য দেখ কতবড় জাল ফেলছে......উঃ, আকাশ ছেয়ে গেল যে... ঐ এল, ঐ এল, আমাকে বেঁধে ফেলল... আমি মুক্তি চাই না, মুক্তি চাই না...দারিদ্র্য-দেবতা, এই নাও, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি—তোমার শৃঙ্খল পরাও...তোমার জাল সরিয়ে নাও...উঃ..."

হীরেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, "ভগবান্!"

দীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শিখা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ হইল সুধীরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে জননীর একখানি হাত লইয়া সুধীর ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিতেছিল, "মা, তোমার দুঃখ যে দূর করতে পারলাম না! আসছে জন্মেও যেন তোমার কোলে এসেই জন্মাই। সে জন্মে যেন এত দুঃখ না থাকে, শুধু তোমার এই আদর যেন ভোগ করতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। উঃ,—বুক যে জ্বলে গেল মা।"

হীরেন সুধীরের বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "কি কষ্ট হচ্ছে ভাই?"

সুধীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আর ত কোন কষ্টই নেই ভাই,—এতদিন পরে মুক্তি এসেছে। কিন্তু মার কথা মনে ক'রে যে কোন আনন্দই পাচ্ছিনে ভাই! ভাই-বোনরা রইল, মা-বাবা রইলেন, তাদের তুমি দেখো। আর, জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকেই যেন বন্ধুরূপে পাই হীরু!"...

হীরেন অব্যক্ত বেদনার ভারে সুধীরের পাশে লুটাইয়া পড়িল।

পূজারী

বিহারে কয়েক সপ্তাহ

শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন গোস্বামী

পাটনায় কিছুদিন থাকিয়া শরীরের সামান্য উন্নতি বোধ হইল বটে, কিন্তু সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় আরায় আসা গেল।

ময়দানের নিকট জজ সাহেবের বাঙ্গলোর পার্শ্বে "আরা হাউস"। বাটী দেখিতে এমন কিছু নয়, অথচ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণ এই বাড়ীতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ এর ২৭শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত ৮ দিন এই স্থানে

হাইকোর্ট—পাটনা

এল্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোংর (ফটোগ্রাফার্স্) সৌজন্যে

৯ জন ইংরাজ, ৬ জন ইউরেশিয়ান, ৩ জন ভারতীয় সৈন্য ও ৫০ জন শিখ্ পুলিসকনষ্টেবল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে খাদ কাটিয়া উহা দুর্গে পরিণত করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সাহাবাদের জজ সাহেব নিউটন্, কলেক্টার কুম্ব, ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েক, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কল্ভিন্, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন্ হলস্, ই-আই রেলওয়ের এঞ্জিনিয়ার বইল, ফিল্ড, এণ্ডার্সন, ডিকমুটে, গডফ্রে, কুক্, টেট্, ডিলিপের, হওল, ডিসুজা, সৈয়দ্ আজিমুদ্দিন হোসেন এবং জমাদার হুকুম সিং এই "আরা হাউস" রক্ষা করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে ৩ রেজিমেণ্ট দেশী সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া কুমার সিংহের নেতৃত্বে এই বাটী আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর মেজর এয়ার্ বহু ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করেন এবং পরে জগদীশপুরে কুমার সিংহের কেল্লা দখল করেন।

আরার ময়দানটি মনোরম। ইহারই এক পার্শ্বে কাছারী ও আদালত। এই ময়দানে আর একটি প্রস্তরে ১১৮ জন ইংরাজের নাম লেখা রহিয়াছে। ইহারা সকলেই ৩৫নং রেজিমেণ্টের অফিসার ও নন্-কমিসান্ড্ অফিসার—১৮৫৮ সালের ২৩শে এপ্রেল তারিখে সাহাবাদ জেলার বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

আরার রাস্তা একটিও ভাল দেখিলাম না। এত ধূলা কম-স্থানেই দেখিয়াছি। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় নয়। এখানকার এক্কা দেখিয়া "বেঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা" গানের কথা মনে হইল। এখানে ৩০।৩৫ জন বাঙালী আছেন। তাঁহাদের একটি ছোট ক্লাবও আছে। শাক, সব্জী, মাছ, উৎকৃষ্ট দধি ও মালাই এখানে সস্তা।

আরা হইতে একদিন সসারামে ছোট রেলে করিয়া বেড়াইতে গেলাম। ইহা সাহাবাদ জেলার একটি সাবডিভিসান্। এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে সের-সা'র

সমাধি। কারুকার্য্য হিসাবে আশ্চর্য্য রকমের না হইলেও, এতবড় পুষ্করিণীর মধ্যে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা বিশেষ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। সের-সা'র পিতা হাসানসুরেরও একটি সমাধি এখানে বর্ত্তমান আছে। স্থাপত্যশিল্পে উভয়ই প্রায় সমান—তবে হাসানসুরের সমাধির চতুর্দ্দিকে বসতি গ্রাম বা পুষ্করিণী নাই। এই দুইটি সমাধিই সরকারী খরচায় সংরক্ষিত হয়।

এই গ্রামে মুসলমান আমলের স্নানাগার (হামাম) এখনও বিদ্যমান আছে। বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই স্নানাগারে যে লোকটি স্নান করাইত তাহার বংশধরদের একজন এখনও ঐ কার্য্য করে; সে লোকটি জাতিতে মুসলমান নাপিত—সরকার হইতে ৮৲ মাহিনা পায়। স্নানের গরম-জল করিতে ১২ মণ কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। গাত্রমর্দ্দনের মশলাপাতি এবং স্নানের পর আহার—যাহা না করাইয়া স্নানাগার হইতে বাহির হইতে দেয় না, ইত্যাদির খরচ ১২৲ টাকা। অবশ্য ৪ জন একদিনে স্নান করিলে এক এক জনের প্রায় ৪৲টাকা করিয়া খরচ পড়ে।

সসারাম হইতে দক্ষিণ দিকে যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায় উহা বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর এক অংশ। উহার পূর্ব্বপ্রান্তে রোটাস দুর্গ অবস্থিত। রোটাস গড় দেখিবার বাসনা বলবতী হওয়ায় ডিহিরী যাত্রা করিলাম। সসারাম হইতে ডিহিরী ১২ মাইল মাত্র। রেল ব্যতীত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়াও যাওয়া যায়। ডিহিরী সহরে প্রবেশ করিতেই ক্যানালের অপরপারে বাঙালীদের একটি ক্লাব-ঘর দেখিলাম। ক'টিই বা বাঙালী আছে, অথচ উহারই মধ্যে জীবনের সাড়া পাওয়া গেল। এখানে কালী ও স্বরস্বতী-পূজা হইয়া থাকে। দ্রষ্টব্যের মধ্যে সাহাবাদ জেলায় যে সেচের খাল (ক্যানাল) তৈয়ার করা হইয়াছে এখানে তাহারই Head works অর্থাৎ শোণনদী-বক্ষে বাঁধ—Ani cut। ইহা ১৮৭০ সালে আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ সালে শেষ হয়। ডিহিরী বৎসরের কয়েক মাস বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান—হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য ৩০।৩৫ খানি বাড়ী আছে। কোনখানিই বড় খালি থাকে না। অধিকাংশই শোণের ধারে। এখানে পূর্ত্তবিভাগের ডাকবাঙ্গলো আছে; বাড়ীটি খুব ভাল না হইলেও স্থানটি বড় মনোরম। সমগ্র ডিহিরী সহরের মধ্যে হাওয়া-খাওয়ার জন্য যদি কেহ বাস করিতে চান, তাহা হইলে ইহার ন্যায় উপযুক্ত স্থান আর নাই। বাঙ্গলোর পূর্ব্ব

গোলঘর—পাটনা

এল, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং (ফটোগ্রাফর্স্) সৌজন্যে

সীমাতে শোণ নদীর গর্ভ আরম্ভ—৩ মাইল ফাঁকা—ধূ ধূ করিতেছে বালুকারাশি। অতি ক্ষীণকায় জলস্রোত কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহা কদাচ দেখা যায়। এই শোণ নদ—পূর্ব্বকালে যাহার নাম ছিল হিরণ্যগর্ভা—গ্রীকেরা যাহাকে 'ইরাণ বোয়স্' বলিত, আজ তাহার কি দুরবস্থা! এই নদীবক্ষে কত বাণিজ্যপোত, কত নৌসেনা ও যুদ্ধসম্ভার হিন্দু ও পাঠানদের সময়ে যাতায়াত করিয়াছে—এখন ইহার অবস্থা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু যখন বর্ষার বন্যা আসে, তখন এই ৩ মাইল প্রস্থ নদীগর্ভ ত

ভরিয়া যায়ই, তাহা ছাড়া কত ক্রোশ ব্যাপিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ প্লাবিত করিয়া দেয়। বাঙ্গলোর বারাণ্ডায় বসিয়া অল্প দূর উত্তরে ই-আই রেলের গ্রাণ্ড-কর্ডের বিখ্যাত শোণ-ব্রিজ দেখা যায়—দক্ষিণে এনিকাট—শোণের

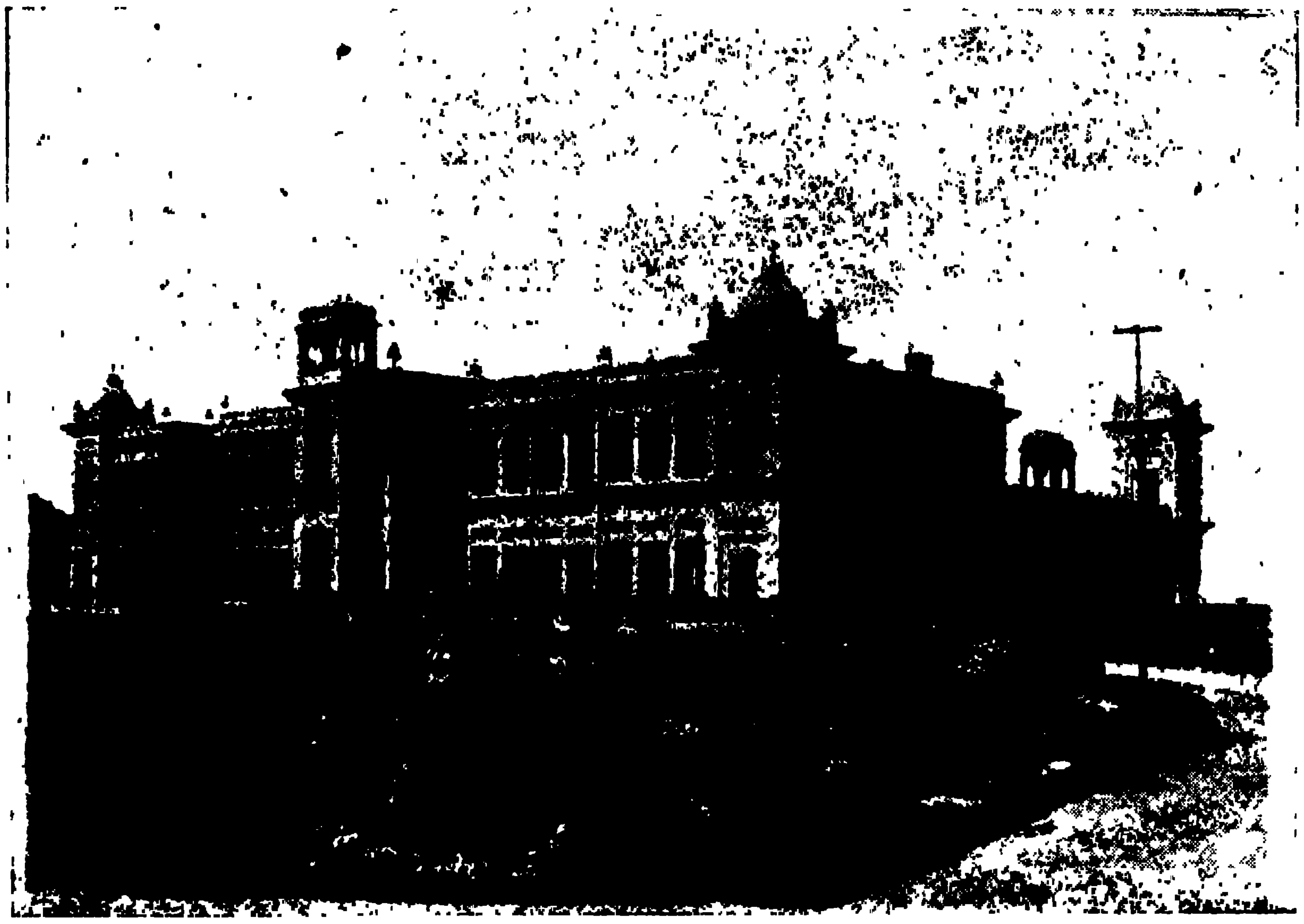

যাদুঘর—পাটনা
এল্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং'র (ফটোগ্রাফার্স্) সৌজন্যে

প্রতিহত প্রবাহের উদ্বৃত্ত জলপ্রপাতধ্বনি, যেন অবরুদ্ধা নারীর করুণ ক্রন্দন। এই এনিকাটের নিকটে শোণের ধারে সকলেই সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে আসেন।

'ডিহিরী রোটাস্ লাইট্ রেলওয়ে'র ডিহিরী সিটি ষ্টেশন হইতে দ্বিপ্রহরের সময় রোটাস্ যাত্রা করিলাম। বৈকাল ৩টার সময় রোটাস-কোর্ট ষ্টেশনে পৌছিলাম। অল্প দূরেই রোটাস পর্ব্বতের পাদমূল। পথ দুর্গম। সরকার হইতে এই রাস্তা মেরামত বাবদ যে ব্যয় বরাদ্দ আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে—কাজেই বর্ষার পর কেবল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। দুর্গের প্রথম দ্বারে উঠিতে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট লাগিল। ইহা প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ, কিন্তু হাঁটিতে হইল প্রায় ১॥০ মাইল। একটানা পর্ব্বতের উপরে উঠা দুঃসাধ্য, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইলে ভাল হয়। প্রথম-তোরণের কেবল চিহ্ন মাত্র আছে। যে রাস্তা দিয়া আমরা এই তোরণে উঠিলাম—ইহার নাম 'মেরুয়া ঘাট'। এখনও আরও ২০০ ফিট্ আন্দাজ উচ্চে পর্ব্বতশিখর—সেখানে রাজপ্রাসাদ ও পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পর্ব্বতশিখরে প্রকাণ্ড উপত্যকা ভূমি—মাঝে মাঝে পুষ্করিণী ও নির্ঝরিণীও দুটি-একটি দেখিতে পাওয়া যায়। উপত্যকা ৮ মাইল লম্বা ও ৪ মাইল চওড়া। রোটাস দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে ৫ মাইল লম্বা এবং ৪ মাইল চওড়া, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এই দুর্গের পরিধি ২৮ মাইল বলিয়া ধরে। দুর্গের ভিতর এখন নানাবিধ চাষবাস হইতেছে; কয়েকটি গ্রাম আছে এবং বহু গো-মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। রোটাস দুর্গের পর্ব্বতগাত্র চতুর্দ্দিকেই প্রায় লম্বা ভাবেই দণ্ডায়মান। 'মেরুয়া ঘাট' ব্যতীত উপরে

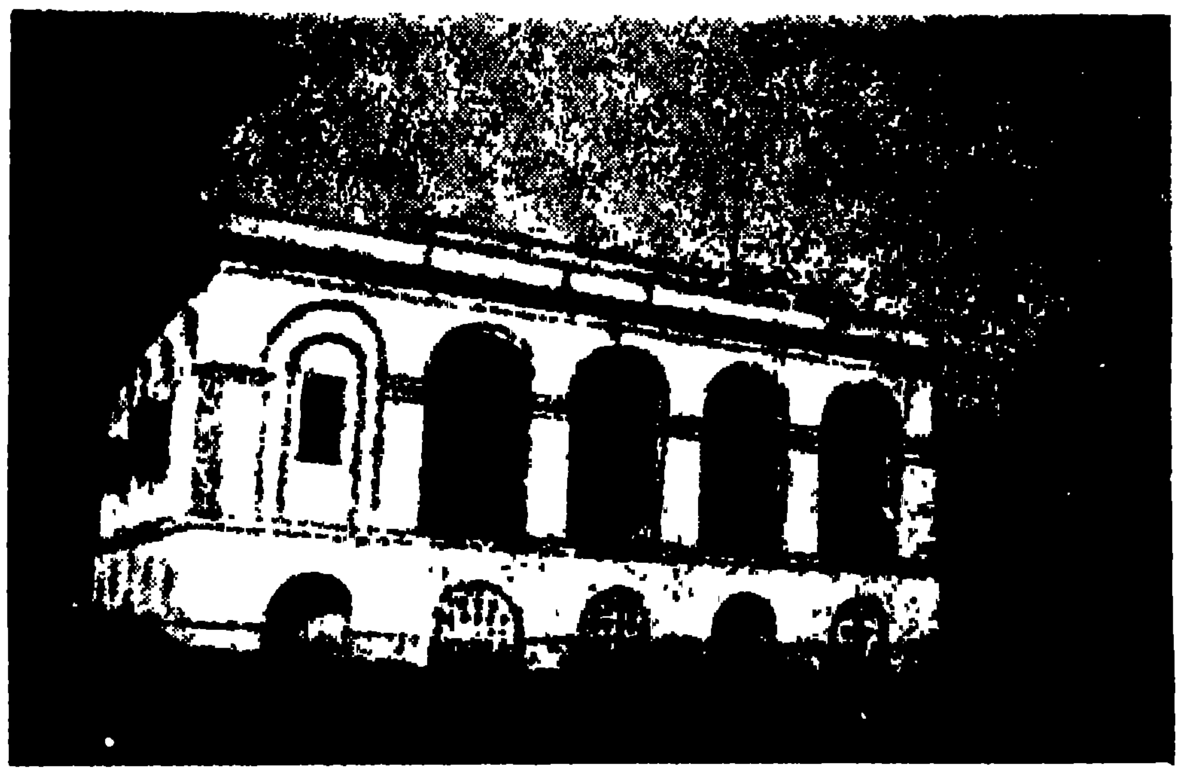

আরা হাউস—আরা

উঠিবার ও নামিবার জন্য আরও কয়েকটি ঘাট আছে, যথা—রাজঘাট, কাঠোতিয়া ঘাট, লাল-দরজা ইত্যাদি। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৮৩টি রাস্তা আছে; ইহার মধ্যে ৪টিকে ঘাট বলে, বাকি গুলি ঘাটী—অত্যন্ত দুর্গম। দক্ষিণে

রাজ-ঘাট অপেক্ষাকৃত সুগম হইলেও অত্যন্ত খাড়াই। কাঠোতিয়া ঘাটটি সর্ব্বাপেক্ষা সুগম বলিয়া হিন্দু রাজারা ইহার সম্মুখে খাদখনন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জনশ্রুতি এইরূপ যে, ঐ খনন কার্য্য করিতে করিতে প্রস্তর-অভ্যন্তর হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়,—সেইজন্য খাদ আর খনন করা হয় নাই। এই প্রস্তরখণ্ডটিকে গ্রাম্য-লোকেরা কখনও কখনও সিন্দূর মাখাইয়া রোটাস-রক্ষক দেবতার প্রতীক কল্পনা করিয়া পূজা-অর্চ্চনা করিত।

প্রথম-তোরণ হইতে প্রায় ২ মাইল হাঁটিলে প্রাসাদ-দ্বারে পৌঁছান যায়। দুর্গের বাহিরে একটি মুসলমানের সমাধি আছে। ফরিদ খাঁ (পরে সের-সা) যখন রোটাস-রাজ হরেকৃষ্ণ রায়কে তাঁহার মন্ত্রীর সাহায্যে প্রতারণা করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন, সেই সময় যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ফরিদ খাঁর এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিহত হন, ইহা তাঁহারই সমাধি।

উদার আতিথ্যপরায়ণ হরেকৃষ্ণ রায় বিপদাপন্ন সের-সা'র পরিচারকবর্গকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সের-সা তখন হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বিব্রত। এই মহানুভবতার সুযোগ লইয়া ফরিদ খাঁ বা সের-সা তাঁহার পরিবারবর্গ ডুলি চড়িয়া যাইতেছে এইরূপ ভাণ করিয়া সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে রাজার জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ফরিদ খাঁর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি দুর্গদ্বার রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অতর্কিত ভাবে এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায়, যুদ্ধের ফলে রাজাই পরাজিত হন এবং ফরিদ খাঁ রাজাকে হত্যা করিয়া দুর্গ দখল করেন। রোটাস দুর্গ ১৫৩৯ খৃঃ অঃ-এ প্রথম মুসলমানের হাতে যায়। ইহাই ফরিদ খাঁর দ্বিতীয় দুর্গ হইল,—কারণ ইতিপূর্ব্বে তিনি চুণার দুর্গ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ লাভ করেন, এবং ইহারই ভরসায় তিনি দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বৎসর-চার আন্দাজ

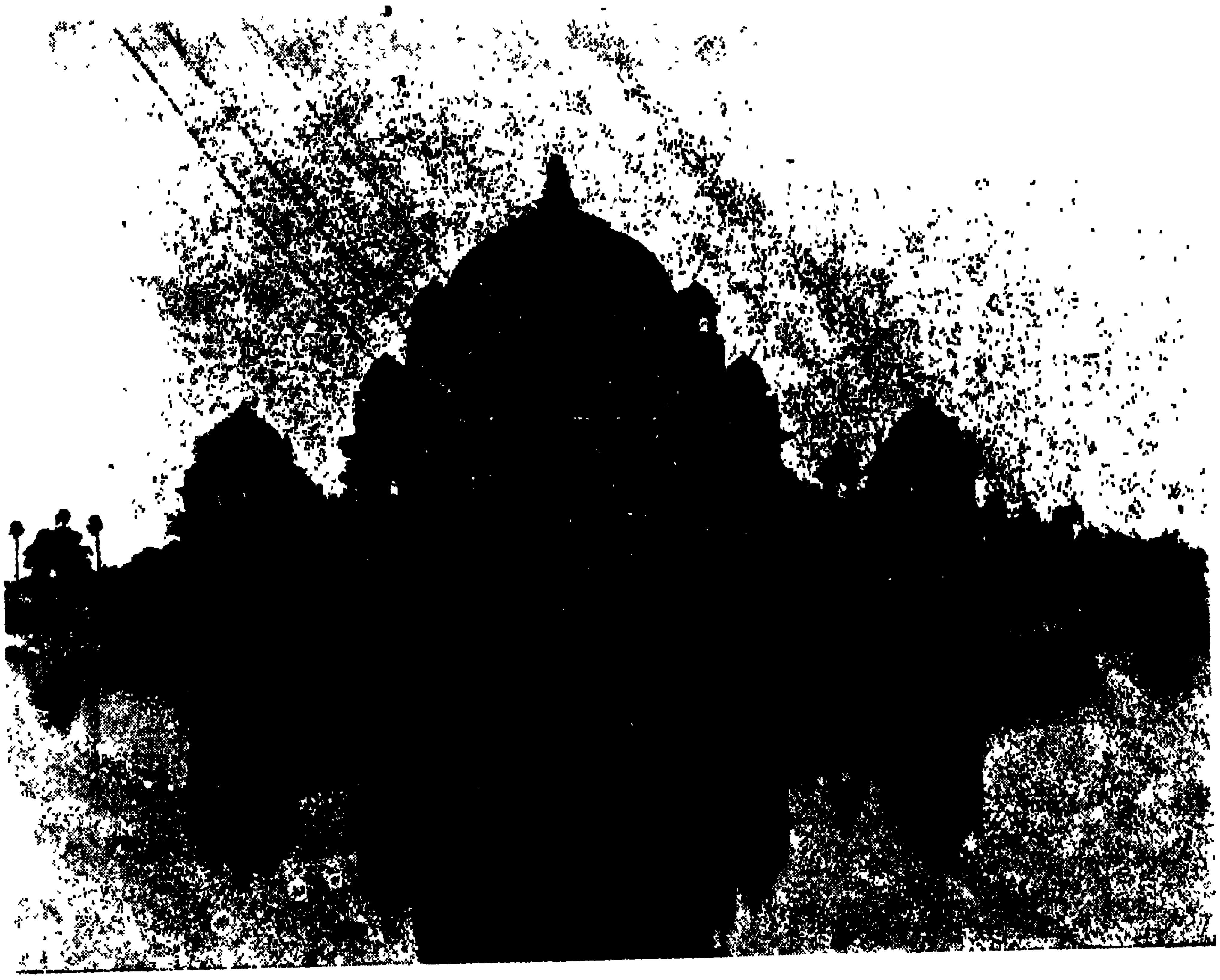

সের সা'র সমাধি—সসারাম

এই দুর্গে বাস করিয়া তিনি পরে এখান হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আর একটি অব্যবহৃত পুরাতন দুর্গ আবিষ্কার করিয়া সেইখানে রাজধানী লইয়া গিয়া সের-গড় নাম দেন।

একজন পূর্ত্তবিভাগের চাপরাসীর সঙ্গে যখন আমি রোটাস-প্রাসাদ পরিদর্শন করিতেছিলাম, সেই সময় কতকগুলি উরাওঁ আসিয়া ঐ চাপরাসীর কাছে প্রাসাদ দেখিবার অনুমতি চাহিল। ইহারা পালামৌ জেলার পশ্চিম অঞ্চলের লোক, রোটাসে বিবাহের বরযাত্রীরূপে আসিয়াছে। বেচারীরা জানে না যে, এই রোটাসে তাহাদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষ রাজত্ব করিয়াছে। হরেকৃষ্ণ রায় তাহাদেরই একাদশ কিম্বা দ্বাদশ উর্দ্ধতন পুরুষ; আর আজ তাহারা তাহাদেরই ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি-ভিক্ষা করিতেছে! ইতিহাসে কথিত আছে যে সের-সাঃ কর্ত্তৃক রোটাস অধিকৃত হইলে হরেকৃষ্ণ রায়ের বংশধরগণ পালামৌ জেলার পশ্চিম অঞ্চলে বেলোঞ্জা (Belonja) পরগণায় পলায়ন করেন।

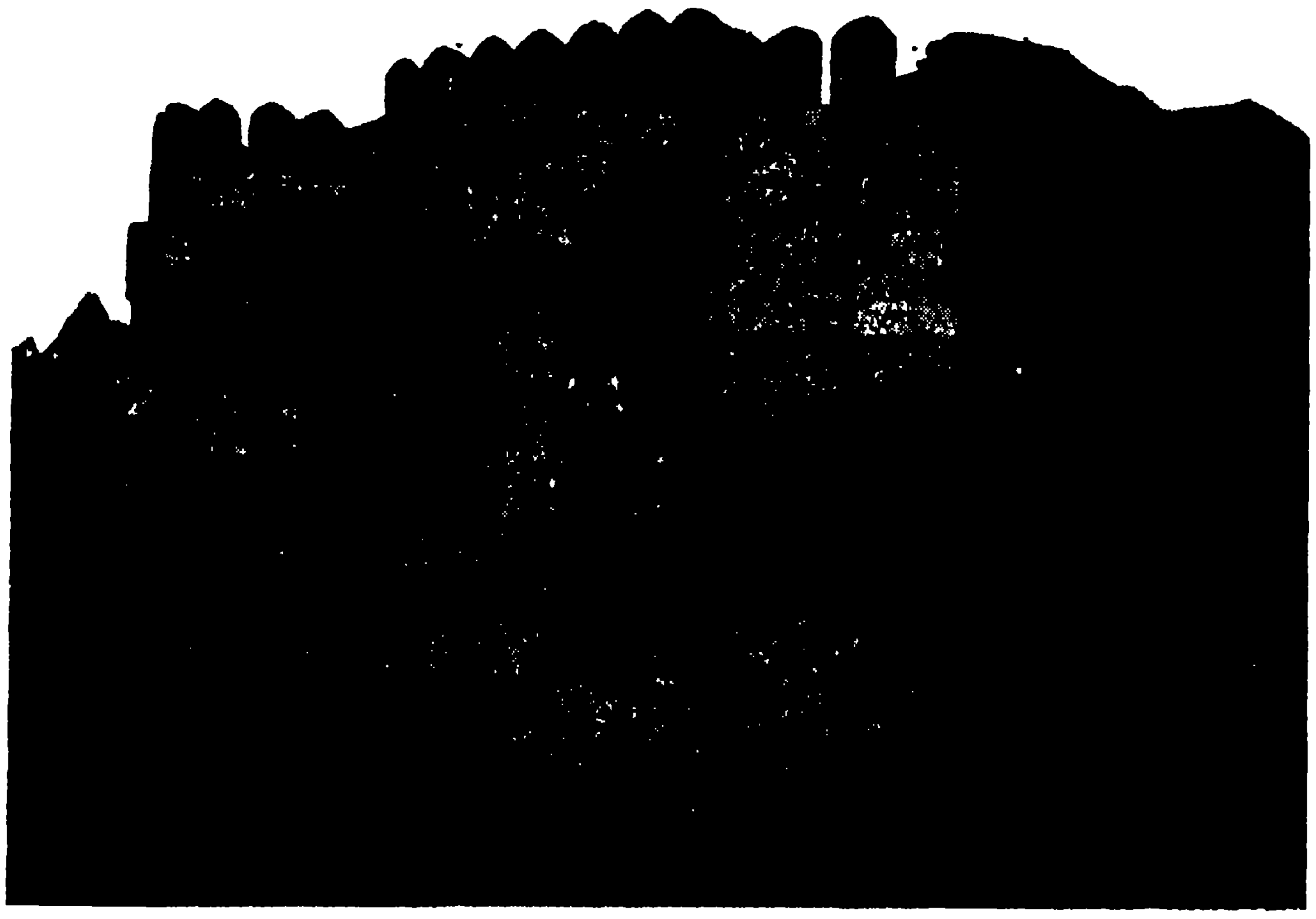

কঠোতোয়া ঘাট—রোটাস্
সসারামের সাবডিভিসানাল অফিসার মিঃ ডি, ম্যাক্লিয়ড স্মিথের সৌজন্যে

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের সময় হইতে ১৫৩৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রোটাস দুর্গ হিন্দুদের অধীনে ছিল এবং রোহিতাশ্বের নামানুসারেই এই দুর্গের নাম। রোহিতাশ্ব শব্দের অপভ্রংশ রোহতাস হইতে রোটাস এই নাম হইয়াছে। উপত্যকাভূমির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এখনও পর্য্যন্ত একটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে—যাহাকে লোকে রোহিতাশ্বের চৌরি বা মন্দির বলে। দেবতার মূর্ত্তিটি যে কি ছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ আওরঙ্গজেবের সময় এই মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস হয়। আপাততঃ সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন একটি শিবলিঙ্গ—তাহাও আবার ভাঙা। রোটাস্ উপত্যকার সর্ব্বোচ্চ স্থানে এবং সুউচ্চ বেদীর উপর এই মন্দিরটি নির্ম্মিত। ৮৪টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া এই মন্দিরে উঠিতে হয়। রোহিতাশ্বের মূর্ত্তিটি স্থানীয় লোকেরা বরাবর পূজা করিয়া আসিত। এই স্থানটি খুব উচ্চ বলিয়া এখান হইতে নিম্নে বহুদূর

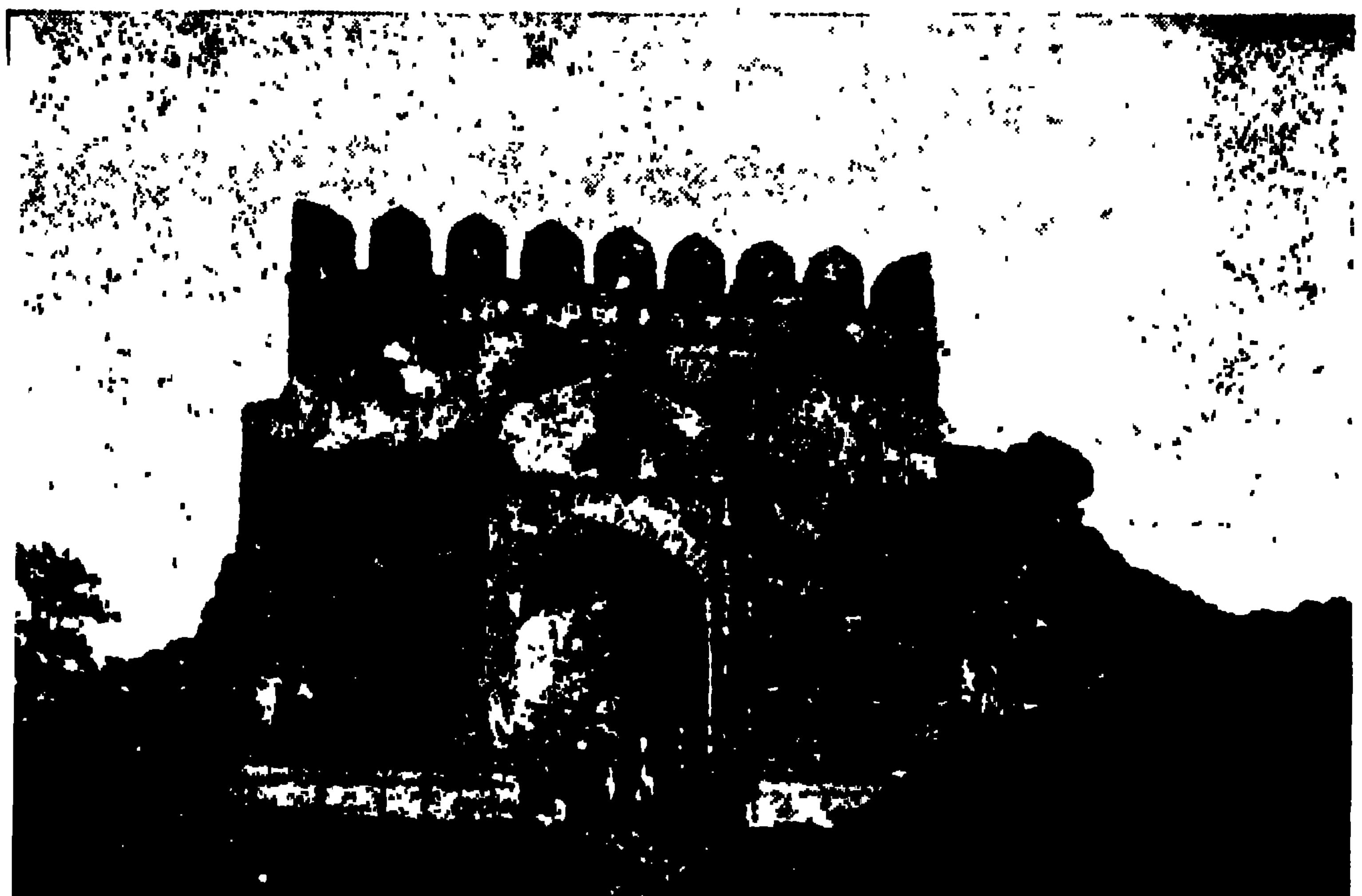

লাল দরজা—রোটাস্
সসারামের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার মিঃ ডি, ম্যাক্লিয়ড স্মিথের সৌজন্যে

ব্যাপিয়া সমতল ভূমি—শোণ ও কোঁয়েল নদীর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসিংহ যখন বঙ্গ ও বিহারের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই দুর্গ তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের বাসোপযোগী করিয়া লন এবং কিছুকাল বসবাসও করেন। অধুনা যে-সমস্ত কারুকার্য্যময় ইমারত দেখিতে পাওয়া যায়

কাজীর বিচারালয়—রোটাস
সসারামের সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার
মিঃ ডি, ম্যাক্‌লিয়ড স্মিথের সৌজন্যে

তাহা প্রায় সমস্তই মানসিংহের নির্ম্মিত। কাথোটিয়া-গেটে সংস্কৃত ও পার্শি ভাষার যে-সমস্ত পাণ্ডুলিপি (Inscription) পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, এই প্রাসাদ মানসিংহ দ্বারা গঠিত। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে ইহার গঠনকার্য্য শেষ হয়। প্রাসাদ-অভ্যন্তরে দরবার-গৃহ, যন্ত্রশালা, শিসমহল, নাচঘর, হামাম, ফুলমহল, রাণীদের অন্তঃপুর, খোজা ও বাঁদীদের থাকিবার স্থান এখনও বিদ্যমান আছে। যদিও এ সমস্তই প্রায় মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তাহা হইলেও কেবল এক যন্ত্রশালা এবং প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তীমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। দুর্গাভ্যন্তরে এখনও ৩।৪টি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে গণেশ-মন্দিরটিই উল্লেখযোগ্য, যদিও ইহার সম্পূর্ণ কলেবর বিদ্যমান নেই। ইহারই নিকটে পূর্ব্বে ৫২ গলি ৫৩ বাজার বর্ত্তমান ছিল। ১৫৪৩ খৃঃ অব্দে সের-সা কৃত কেবল জুম্মা মসজিদের অস্তিত্ব এখনও আছে।

মানসিংহ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর হইতে প্রায় ১০০ বৎসর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদের বক্সার-যুদ্ধের সময়ে, মীরকাসিম তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের আশ্রয়ের জন্য এই দুর্গ বাসোপযোগী করিয়া লইয়া কিছুদিন তাঁহাদিগকে এইখানে রাখেন। বক্সার-যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া সামরিক কার্য্যের ব্যবহারোপযোগী সেনানিবাসাদি যাহা কিছু ছিল সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। কাজেই প্রাসাদটি ব্যতীত এখন বিশেষ কিছু আর নাই।

এই পুরাতন কীর্ত্তি দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণকে পাহাড়ে উঠিবার পূর্ব্বে নীচে আকবরপুর গ্রাম হইতে চাউল, ঘৃত ও দুগ্ধ ব্যতীত যাবতীয় আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত। যাঁহারা পদব্রজে পর্ব্বতারোহণ করিতে অপারগ, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে আকবরপুর গ্রামে পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টরকে তামজাম বা খাটুলী বন্দোবস্ত করিতে যেন লেখেন। পর্ব্বতোপরি ডাক-বাঙ্গলো P. W. D. অফিসারদের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত। কাহারও ব্যবহারের জন্য আবশ্যক হইলে প্রত্যেক যাত্রী দৈনিক ১৲ হিসাবে ভাড়া দিয়া একটি কামরা অধিকার করিতে পারেন। একদিনে নীচে হইতে উপরে উঠিয়া দ্রষ্টব্যগুলি সমস্ত দেখিয়া আবার নীচে নামিয়া যাওয়া কষ্টকর এবং ডিহিরী হইতে যাতায়াতের ট্রেনের সুবিধাও তেমন নাই, কাজেই পর্ব্বতোপরি রাত্রিবাস করাই বিধি।

দেখা সব শেষ হইলে ডাক-বাঙ্গলোয় বিশ্রাম লইলাম। এখানকার বাঙ্গলোর আসবাব ও বাসনপত্র বেশ পরিষ্কার। বারাণ্ডায় বসিয়া শোণের পরপারে জ্যাপলা-সিমেণ্টের কারখানা দেখা যায়। রাত্রে বিদ্যুতের আলোকে উহা

বেশ সুন্দর দেখায়। বাঙ্গলোর সম্মুখে দুর্গপ্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পৃথিবীপৃষ্ঠের শ্যামশোভা উপভোগ করিবার জিনিষ। দূরে প্যালামো জেলার ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, বিসর্পিতগতি শোণ ও কোয়েল, মাঝে মাঝে খেলার ঘরের মতন ছোট ছোট গ্রাম্যকুটীর, 'ডিহিরী রোটাস লাইট্ রেলওয়ে'র ষ্টেসনের ঘর, চুণের কারবারীর বাঙ্গলো এবং সবুজ শস্যক্ষেত্র—যেন একখানি রঙীন্ মানচিত্রের ন্যায় দেখায়।

রোটাস ফোর্ট ষ্টেসন হইতে ডিহিরী ষ্টেসন ২৬ মাইল। এই লাইন অক্টোভিয়াস ষ্টীল কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত। লাইনের অধিকাংশ শোণ নদের সহিত সমান্তর ভাবে গিয়াছে। এই লাইনের প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসনে বাঙালী কর্ম্মচারী আছেন। এই অঞ্চলে বহু চুণা-পাথরের (Limestone) পাহাড় দেখা যায়।

সসারাম হইতে আমরা ফিরিবার সময় বক্সার হইয়া আসিলাম। আমার এক বন্ধুর মোটরে ৬৬ মাইল পথ ঘণ্টা-তিনেকে আসিলাম। বক্সারে সরকারী বাঙ্গলোয় উঠিলাম। যে কয়টি বাঙ্গলো দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এখানকার গঙ্গার দৃশ্য সুন্দর ও গঙ্গার ধারের রাস্তাটিও মনোরম। কথিত আছে এইখানে গঙ্গাতীরে বিশ্বামিত্রের তপোবন বা 'চরিত্রবন' ছিল। তাড়কাসুরের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া ঋষি এখানে রামচন্দ্রকে আনয়ন করিয়া তাড়কাবধ করাইয়াছিলেন।

"এই সে 'চরিতবন'!
বিশ্বামিত্র তপোধন
যেথা বিগলিতমন
উগ্র সাধনায়।
হাতে লয়ে ধনুর্ব্বাণ
রামরূপে ভগবান
করিল ঋষিরে ত্রাণ
বধি, তাড়কায়॥"

রামচন্দ্র যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন তাহার নাম রামরেখা ঘাট এবং যে শিবমূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন তাহার নাম রামেশ্বরনাথ মহাদেব। রামচন্দ্রের ও তাড়কাসুরের মূর্ত্তিও এখানে আছে। গঙ্গাতীরে বহু পুরাতন কূপ দেখা যায়, যাহা যজ্ঞকূপ বলিয়া খ্যাত। এখানে বহু বানর—তাহাদের অত্যাচারেরও সীমা নাই।

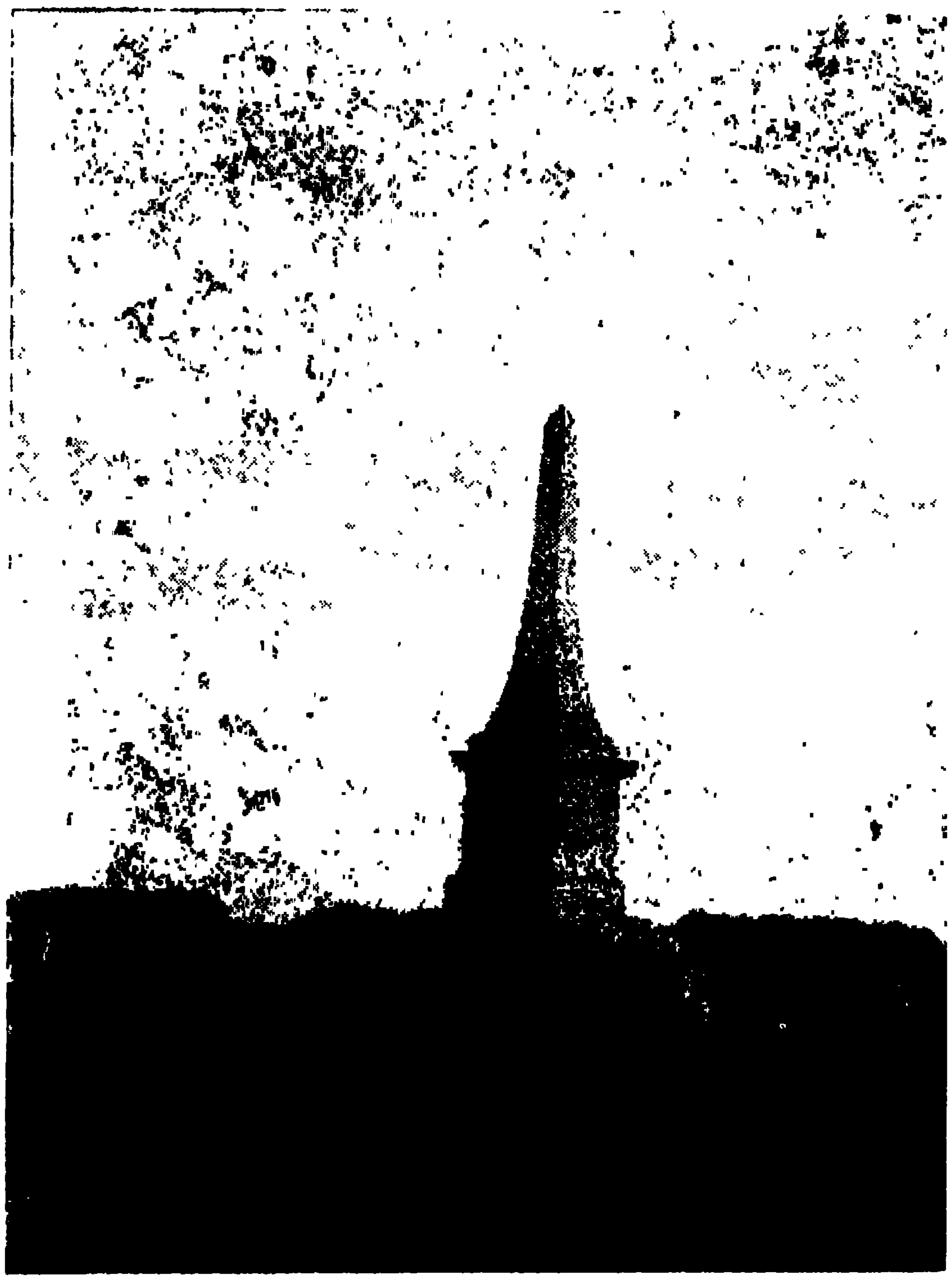

বক্সার মনুমেণ্ট

নৌকা করিয়া গঙ্গার অপর পারে গেলাম। ইহা বালীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানে মঙ্গলা ভবানীর সপ্তধাতুর মূর্ত্তি আছে; ইহা দেবীর একটি পীঠস্থান—কিন্তু স্থানীয় লোকের সহানুভূতি-অভাবে ইহার অবস্থা শোচনীয়। গাজীপুর এখান হইতে ২০ মাইল মাত্র এবং ছাপরা ২৪ মাইল। সময়-অভাবে গাজীপুরের প্রসিদ্ধ গোলাপবাগান দেখা হইল না।

বক্সারের সেণ্ট্রাল জেল একটি দেখিবার জিনিষ; এখানে ১৪৭০ কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। জনৈক বন্ধুর সাহায্যে জেলের ভিতরে যাইয়া সব দেখিতে পারিয়াছিলাম।

এখানকার সতরঞ্চ ও আসন বিখ্যাত—কিরূপে ইহা প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। এইখানে নিজের ওজন লইয়া দেখিলাম, ৩ সপ্তাহে বিহারে ১১ পাউণ্ড বা ৫।৷০ সের ওজনে বাড়িয়াছি। এখানকার রেলওয়ে ষ্টেসনটি আরা অপেক্ষা সুবৃহৎ।

বক্সারে আর একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান আছে—বাক্সারের রণক্ষেত্র। এক্ষণে সে স্থানটি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে ঐ যুদ্ধ হয়—যাহাতে আউধের নবাব ওয়াজির সুজাদ্দৌলা এবং মীরকাশিম ইংরাজ দ্বারা পরাজিত হন। ইংরাজের সেনানায়ক ছিলেন মেজর হেক্টর মন্‌রো। এইখানে বঙ্গের সূর্য্য অস্তমিত হয় এবং ইংরাজ বাঙলা-বেহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পান। লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক এই স্থানে একটি চূণার প্রস্তরের মনুমেণ্ট বা স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে।

আরায় ফিরিবার পথে ডুমরাওন ও জগদীশপুর হইয়া আসি। ডুমরাওন মহারাজার প্রাসাদ, স্কুল ও হাঁসপাতাল দেখিলাম। জগদীশপুরে কুমার সিংহের বাসস্থান; এই কুমার সিংহ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বহু রাজপুত সৈন্য লইয়া ইংরাজকে আক্রমণ করেন। কুমার সিংহের পৌত্র-বংশীয় কেহ নাই, তবে দৌহিত্র বংশীয় অনেকেই আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৮কালীমূর্ত্তি বিদ্যমান। স্থানীয় লোকেরা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া থাকে যে, এই মূর্ত্তি যখন তাঁহার বংশধরগণ পূজা করেন তখন একটি খড়্গ ভূমিতে রক্ষা করিয়া পূজা আরম্ভ হয় এবং ধ্যান করিবার সময় সেই খড়্গ পূজকের হস্তে স্বতঃই উঠিয়া আসে। গত কয়েক বৎসর হইতে এই জনশ্রুতি আর বড় একটা শোনা যায় না। ডুমরাওনের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষেরা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরাজকে সাহায্য করায় বহু জায়গীর পান।

আর একটি কথা বলিয়া এই বিবরণ শেষ করিব। সসারাম হইতে সের-গড় পাহাড় দেখার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সসারাম হইতে কুঁদরা ১৬ মাইল এবং সেখান হইতে চ্যানেরী হইয়া মালীপুর ১৫ মাইল। এই ৩১ মাইল মোটরে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে পাল্কী বা খাটুলি লইয়া ৪ মাইল গেলে সের-গড় পাহাড়ের পাদমূল। একটা দড়ির খাটিয়াকে উপরে বাঁশ দিয়া বাঁধিয়া খাটুলি করা হইয়াছে। উহাতে বসিয়া যাইবার উপায় নাই বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া গেলাম। তুলসীদাসের "চড় খাটোলী ধো ধোলগড়া জেহেন পরমে যাওয়ে" কথা মনে পড়িল। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, তাহাকে রাস্তা না বলাই ভাল। ঐ পথে অতি কষ্টে হাঁটিয়া যাওয়া যায়।

সের-গড়ও বেশ পাহাড়—তবে রোটাসের ন্যায় নয়। আনুমানিক ৮০০ ফুট উচ্চ হইবে। রোটাসের ন্যায় অত খাড়াই পথ নয়। এখানে উঠিবার সিঁড়ি আছে—যদিও অনেকগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। উঠিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিল। উপরে সিংহদ্বার ও প্রাকার সমস্তই ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। সরকার হইতে মধ্যে মধ্যে কিছু মেরামত হয়। পর্ব্বতশিখর হইতে ১ মাইল সমতলভূমি গিয়া আর একটি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সের-গড় কেল্লায় উঠা যায়। এখানেও দরবারগৃহ, রাণীদের আবাস, নাচঘর ইত্যাদি অতি জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় আছে। এই সমস্ত গৃহগুলি তয়খানা বলিলেই ভাল হয়, কারণ যে সমতলক্ষেত্রে প্রাসাদের আঙিনা, তাহার অধোভাগে এইগুলি নির্ম্মিত। মনুষ্যের বাসোপযোগী মোটেই নয়, তবে বিপদকালে লুকাইয়া থাকার পক্ষে সুবিধা বটে এবং গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকা বেশ আরামদায়ক। গিরি-শিখর হইতে নিম্নে দুর্গাবতী নদী এবং শস্যপূর্ণ শ্যামল সমতলভূমি দেখিতে চমৎকার। সরকার হইতেও কিছু ব্যয় প্রতি বৎসরে হয়, কিন্তু টাকা এত কম যে জঙ্গলকাটা ভিন্ন আর কিছু মেরামত হয় না। স্থানীয় লোকেরা বলে—সের-গড় কেল্লা রাজা হরিশ্চন্দ্র দ্বারা গঠিত; পরে সের-সা এখানে বাস করেন। সের-গড় কেল্লা হইতে রোটাসগড়ে যাইবার একটি গুপ্ত রাস্তা ছিল। এই পাহাড় বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণীর এক অংশে অবস্থিত।

এ অঞ্চলের গুপ্তরাজাদের সময়ের পর এবং পাঠানদের সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০০ খৃঃ অঃ হইতে ১৪০০ খৃঃ-অঃ পর্য্যন্ত যদি কোনো ঐতিহাসিক একটু মনোযোগ দিয়া কিছু গবেষণার দ্বারা একখণ্ড ইতিহাস প্রস্তুত করেন, তবে একটা প্রকাণ্ড অভাব দূরীভূত হয়।

শ্রীসুবোধরঞ্জন গোস্বামী

সাধনার ধন

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

হে সাধকবীর,—সার্থক তপোবলে
কি প্রাণ জাগালে কঠিন পৃথ্বী-তলে !
নাহি বুঝে সুখ, না দেখে কি আছে ভালে,
মরণে কাঁপায় বক্ষের তালে তালে,
কত যে হারায়--কত ভুলে যায় ধনী,
অচপল তবু মনের মধ্যমণি !
কেবা জানে জয় কেবা জানে পরাজয়,
লক্ষ্য তাহার ভ্রষ্ট কভু না হয়।
সে ত আনে নাই দীন ভিক্ষার ঝুলি,
হৃদয় ভরিবে ছোট ছোট সুখ তুলি' ;
সে যে আসিয়াছে ভুবন-ভুলানো বেশে,
বিপদের ভয় দলিয়া চলেছে হেসে',
কি কঠোর পণ— কি কোমল মায়া বুকে,
পথ ছেড়ে দেয় চিতানলে দহি' সুখে !

তুমি এসে জানাইলে মোরে

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম-এ

আজ শুধু এই কথা মনে মোর জাগে,
আমাদের সেই শুভ মিলনের আগে
কোথা ছিলে তুমি আর কোথা ছিনু আমি ?
কোন্ কাজে মগ্ন হ'য়ে ছিনু দিবা-যামি ?
—কিছু না ভাবিয়া পাই ! অন্তরের পানে
একটি দিনের তরে সে অর্থ-সন্ধানে
চেয়ে কভু দেখি নাই। আজি বারবার
আমাদের মিলনের সেই পূর্ব্বকার
ভাবিয়া দেখিতে চাই সেই দিনগুলি ;
বৃথা চেষ্টা, সব যেন গেছি আজ ভুলি' !
মিলনের আগে যেন ছিনু না ক 'আমি',
মোর এ অস্তিত্বটুকু যায় সেথা থামি'।
তুমি এলে, তুমি এসে জানাইলে মোরে
আমার দিনগুলি সচেতন ক'রে।

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

৬

অতিথিরা চ'লে যেতেই পিসিমা বল্লেন, "যাই বলিস্ মেঘ, আমার মিহির ছেলেটিকেই সব চেয়ে ভাল লাগে; কেমন ধীর-নম্র স্বভাব,—বিজলীর সঙ্গে বেশ মানাবে।"

মেঘনাদ ব্যস্ত হোয়ে বললেন, "ও সব কথা মনেও স্থান দিও না দিদি, ওর সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হবে না।"

"কেন রে? ওতো মন্দ ছেলে নয়, এবার বুঝি এম-এ দেবে, তা'ছাড়া শশাঙ্কের জমিদারীর আয়—"

মেঘনাদ বাধা দিয়ে বল্লেন, "সে-সব আমি জানি দিদি, তবু কালী দা'র ইচ্ছে বিজলী ওঁর পুত্রবধূ হয়; আমিও আপত্তি করিনি—"

"সে কি? কথা দিয়েছিস না কি?"

"ঠিক কথা নয়, তবে খানিকটা তাই। দিদি, অতীতের কথা একবার ভাবো, শৈলকে ভাল ক'রে তোলবার জন্যে কালী দা'র সে কী প্রাণপণ চেষ্টা!—তা'ছাড়া আজ আমার এত টাকা, এত মান, এত প্রতিষ্ঠা, সবই যে কালী দা'র সাহায্যে গ'ড়ে উঠেছে তা' ভুলে যেও না। বিলেত গেলুম—কার টাকায়?"

পিসিমা হ্যাটকোটপরা সুবোধকে কিছুতেই বিজলীর জামাই রূপে কল্পনা করতে পারলেন না, তবু ভাইএর কথাও বুঝলেন; বল্লেন, "যা' ভাল বুঝিস তাই করিস মেঘ, আমার আর কি বলবার আছে?"

সেদিন রাত্রে বিজলী কাজলের কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, "আজ যারা যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে সব চেয়ে কাকে ভাল লাগল বল্‌তো—"

কাজল দ্বিরুক্তি না ক'রে বল্লে, "কালী জ্যাঠা-মশায়কে—"

বিজলী অবাক হোয়ে বললে, "কেন?—"

"তিনি আমায় একটা পুতুল-খোকা, একটা কাঠের বাক্স, একটা চাবি-দেওয়া পাখী, আর চারটে ছবির বই দিয়েছেন—"

"ওঃ, তাই বুঝি? আর মিহির তোকে কিছু দেয় নি?"

"হ্যাঁ দিয়েছে—এক বাক্স চকোলেট।"

"তা হোক, তবুও সে-ই সব চেয়ে ভাল, বুঝেছিস্?"

কাজলী বল্লে, "হুঁ।" বেচারীর চোখ ঘুমে ঢুলে আ'ছিল—আর কোনো কথা না ব'লে ঘুমিয়ে পড়লে।

বিজলীর কিন্তু অনেক রাত অবধি ঘুম এল না—সে শুয়ে-শুয়ে সমস্ত সন্ধ্যার কথা ভাবতে লাগ্‌লো। কে কি বল্লেছিল, কে কি করেছিল, সব নতুন ক'রে দেখলে, শুনলে। সর্ব্বশেষে এই ঠিক করলে—মিহিরই সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে ভাল; হোক না সুবোধের গায়ের রং ফর্সা, বিলিতি কায়দাগুলো খুব আশ্চর্য্যজনক দুরস্ত, তবু মিহিরের মত অমন ঢলঢলে দুটো ভাবে-ভরা চোখ নেই ত?—অমন ভয়ে-ভয়ে মিষ্টি ক'রে কথা বলে না ত? ওকেই সব থেকে ভাল লাগে!—ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন নিজের চোখদুটিও বন্ধ হোয়ে গেল।

৭

পরদিন সকালে চা খেতে ব'সে কাজল হঠাৎ বল্লে, "বাবা, জান, কাল যত লোক এসেছিল তার মধ্যে মিহির সব চেয়ে ভালো।"

মেঘনাদ একবার বিজু ও একবার কাজলের দিকে চেয়ে ভাবার্থ গ্রহণ করবার চেষ্টা করলেন। বিজলী বোনের নির্ব্বুদ্ধিতায় অপ্রস্তুত হোয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে, "কেন? তিনি তো তোকে মোটে এক বাক্স চকোলেট দিয়েছেন—"

এ সাবধানতায় ফল কিন্তু বিপরীতই হ'ল; কাজল বল্‌লে, "কিন্তু তুমি যে কাল বল্‌ছিলে—তবুও মিহির দাদাই সব চেয়ে ভাল।"

এবার মেঘনাদ হো-হো করে হেসে উঠলেন। বিজলী মনে মনে ঠিক করলে, এর পর থেকে কাজলকে আর কিছুই বলা হবে না।—কি অসম্ভব বোকা মেয়ে ও!

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চ'লে গিয়ে সে বল্‌লে, "পিসিমা, আজ আমি রাঁধব—"

পিসি বল্‌লেন, "থাক্ বাছা, পড়বি ত কালীকিঙ্কর সাহেবের বাড়ী। তারা তরকারীও কোটে না, রাঁধেও না; দশটা খানসামা দিনরাত্তির ঘুরচে—খানা বানাচ্ছে; কি হবে মা, তোর হাত-পুড়িয়ে রান্না শিখে?—হাঁা পড়তিস্ যদি ঐ মিহিরের হাতে তবে ঘরের লক্ষ্মী হোয়ে যেতে হোত—শশাঙ্ক তো আজকালের লোকের মত নয়—"

বিজলী দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে শুনছিল কিন্তু আর পারলে না—বলে উঠ্‌ল, "এ সব কি বল্‌ছ পিসি, আমি ত কিছু বুঝতে পারছিনে—"

ভাইএর জামাই-নির্ব্বাচন দেখে পিসির সত্যিই রাগ হোয়েছিল; বল্‌লেন, "বুঝ্‌বি আর কি—তোর বাপ সুবোধের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে ঠিক করেছে—বুড়ী পিসির শিক্ষাদীক্ষায় আর কুলোবে না—"

পিসিমা বোধ করি আরো কিছু বল্‌তেন—কিন্তু বিজলী হঠাৎ উঠে চ'লে গেল।

মেঘনাদ চা খাওয়া সেরে খবরের কাগজ হাতে ক'রে ভাবলেন, কাজলের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে তো বিজুর মন জানা দরকার। মনে মনে বল্‌লেন, আঃ—শৈল আমাকে কি অসহায়ই ক'রে গেছে! এ সব কি বাপের কাজ! ডেকে পাঠালেন বিজলীকে। সকালবেলা উঠেই বোনের বোকামি ও পিসিমার সখেদ উক্তিতে বিজলীর মন অপ্রসন্ন হোয়ে উঠেছিল; বাবা আবার নতুন কথা কি ব'লে বস্‌বেন ভেবে ও মনটাকে শক্ত ক'রে নিলে যে কিছুতেই চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না।

মেঘনাদ বল্‌লেন, "বিজু, মা, আজ কালী দা তোদের দুই বোনকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেছেন—বৌঠাকরুণও আবার সকালে উঠেই ফোন্ ক'রে জানিয়েছেন। কাল তো তিনি মাথার যন্ত্রণায় আস্‌তেই পারেন নি—"

বিজলী উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লে, "বেশ তো বাবা যাব—পারুলের সঙ্গে যে আমার খুব বন্ধুত্ব—"

মেঘনাদ ওর আগ্রহ দেখে নিশ্চিন্ত হোলেন—মনে ভাবলেন, এখুনি আমি সাত-সতেরো কত ভেবে মর্‌ছি, কিন্তু মেয়ে তো আমার ঠিক আছে। বল্‌লেন, "বেশ যেয়ো দুই বোনে।"

"আর ভাবছি মিহিরকেও একদিন নেমন্তন্ন করব—শশাঙ্ক ওকে বিলেত পাঠাতে চায়, আমি কিছু পরামর্শ দেব।"

এবার আর বিজলী কিছু উত্তর দিলে না; ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "যাই, তোমার দুধটা নিয়ে আসি।"

৮

দুই বোনে যথাসময়ে গাঙ্গুলী সাহেবের বাড়ী উপস্থিত হোল। বিজলীর মনে অস্বস্তির সীমা ছিল না—তবু যথেষ্ট সাহস ও মনের জোর ক'রে ও কাজলের হাত ধ'রে গাড়ী থেকে নামল। সুবোধ দরজাতেই অপেক্ষা করছিল; বল্‌লে, "বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়ে রেখেছেন Miss Chatterjee, মনে মনে অধৈর্য্য হোয়ে উঠ্‌ছিলাম—"

পারুল এগিয়ে এসে ওকে হাত ধ'রে নিয়ে গেল—তারপর মাকে খবর দিতে চল্‌লো।

বিজলী কাজলীকে নিয়ে একটা বড় কোচে পাশাপাশি বস্‌লে; সুবোধ পাখাটা আর একটু জোরে চালিয়ে মুখের সাম্‌নে আরো দুটো বাতি জ্বালিয়ে বিজলীকে ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত ক'রে তুল্‌লে।

মিসেস গাঙ্গুলী অথবা সুবর্ণলতা ঘরে এসে ঢুক্‌লেন—বিজলী নত হোয়ে প্রণাম করলে। তিনি ওর চিবুক স্পর্শ ক'রে বল্‌লেন, "আজকালকার মেয়ে তুমি, তবু তো সবই জানো মা!—আমার পারুলকে প্রণাম করতে বল্‌লে সে নাক সিঁটকে পালায়।"

বিজলী সলজ্জ ভাবে হাস্‌লে—তারপর নিজের জায়গায় ব'সে সুবর্ণলতাকে ভাল ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বয়েস চল্লিস্‌ পেরিয়ে গেছে—অতিরিক্ত মোটা শরীর—সুগোল অথবা অতিগোল বাহুর উপরে ছোট-হাতের টাইট জামা ফেঁপে ফেঁপে বসেছে—পরনে একখানি ধূসর গরদ, তাতে ছাপার পাড়—মাথার সাম্‌নের পাত্‌লা চুলগুলো ছুটো ব্যাঁকা চিরুনী দিয়ে ফোলাবার ব্যর্থ চেষ্টা, গায়ে "ফ্লেস কলার" মোজার সঙ্গে হাইহীল জুতো। কুশলপ্রশ্ন ও দু'চারটি কথার পর তিনি খাওয়ার আয়োজনে গেলেন। সুবোধের ছোট বোন কুন্দ এসে কাজলের হাত ধ'রে টান্‌লে, "এসো না ভাই, আমার খেলা-ঘর দেখ্‌বে—"

দিদির অনুমতি পেয়ে কাজল চ'লে গেল। তারপর পারুল এল। বিজলীর কানে কানে বল্‌লে, "কোনো বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে টেলিফোনে আমার একটি বিশেষ কথা বল্‌বার আছে; কিছুক্ষণ ছুটি প্রার্থনা করি।" ছুটি মঞ্জুর হোল।

একে একে সকলের প্রস্থানের পর দেখা গেল—সুবোধ ভারী খুসী হোয়ে উঠে কাজলীর শূন্য স্থানটা দখল ক'রে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে। বল্‌ছে, "আপনার সেদিনকার গানটি কখনো ভুলব না বিজলী দেবী, এখনো মাথার ভেতর ঘুরচে "ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—" বিজলী লজ্জিত হোয়ে বল্‌লে, "মনে রাখবার মত কিছুই গাইতে পারি নে—বাঙালী মেয়েদের গান তো বেশী শোনেন নি তাই হয় তো ভাল লাগে।" সুবোধ বল্‌লে, "না, না, আপনি সত্যিই ভারী ভাল গান করেন, এ তো কেবল আমি একা বক্‌ছি না, সেদিন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন! ঐ যে young manটি, কি নামটা মনে আস্‌ছে না—মিহির রায় বুঝি—উনিও গান শুনে ভারী চঞ্চল হোয়ে উঠেছিলেন—"

বিজলী অবাক হোয়ে বল্‌লে, "কেন?"

"কেন? এসব কি মুখে বলা যায় Miss Chatterjee, এ সব অনুভব করবার জিনিস। পুরুষের চঞ্চলতা কিন্তু যত অব্যক্ত থাকে ততই ভাল।"

বিজলী চুপ ক'রে রইল—সে বিরক্ত হ'চ্ছে মনে ক'রে সুবোধ প্রসঙ্গটা বদ্‌লে ফেল্‌লে; বললে, "দেখুন আপনাকে সেদিন যখন প্রথম দেখি, কি মনে হোয়েছিল জানেন? ঠিক যেন বিদ্যুতের মত আমার অন্ধকার জীবনে—"

বিজলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কাজল কই?—ও নিশ্চয় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েচে, ও কারো সঙ্গে মিশতে পারে না।"

সুবোধ অগত্যা কাজলের খোঁজে গেল; সেদিন আর অব্যক্ত বাণী বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

৯

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। অল্পক্ষণ আগে এক-পশলা বিষ্টি হোয়ে বাতাস ভিজে হোয়ে আছে। বিজলী কাজলকে পিসিমার সঙ্গে ভুবন বাবুর বাড়ী খেল্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছে—কিন্তু নিজে কোনো কাজেই মন দিতে পারছে না—এস্রাজটা নিয়ে একটা হিন্দুস্থানী গান গাইবার চেষ্টা করছে, এমন সময় অর্দ্ধ-আলোকিত ঘরে মানুষের ছায়া দেখা গেল। যে মানুষটি ঘরে ঢুক্‌লে তাকেই যে বিজলী এতক্ষণ মনে মনে চাইছিল তা' বুঝতে দেরী হোল না; বল্‌লে, "এসো মিহির, আমি মনে করেছিলুম—ভুলেই গেছ বুঝি!"

"না ভুলিনি। ভুল্‌তে যে পারিনা তা' তুমি জান না?—"

"কেমন ক'রে জান্‌ব? আমি কি গণক ঠাক্‌রুণ! কিন্তু হঠাৎ আজ কি ক'রে মনে পড়্‌লো বল তো?—"

"আমি বিলেত যাচ্ছি, তাই বিদায় নিতে এসেছি—"

"ওঃ তাই বল! তোমার বাবা আপত্তি করলেন না?—"

"আমার উন্নতির পথে কেন তিনি বাধা দেবেন?"

"তবু, তুমি তাঁর এক ছেলে—সবেধন নীলমণি!"

মিহির কিছু বল্‌লে না—কেবল একটু হাস্‌লে। বিজলী আবার বল্‌লে, "বেশ তো যাও, সুবোধ বাবুর মত বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে নব নব idea ও কল্পনা ধারণ ক'রে সাহেব হোয়ে এসো—"

মিহির বল্‌লে, "তবু আমি জানি এই বিশেষ বাঙালী মেয়েটিই সেইরকম সাহেবের সঙ্গে ভাব করতে দেরী করেন নি—"

"কেন করব? কাজুর জন্মদিনের পর তাঁর সঙ্গে আমার তিনবার দেখা হোয়েছে—এই যে টেবিলে ফুল দেখছ এ তাঁরই দেওয়া! আর তুমি এতদিন পরে আজ বিদায় নিতে এলে—"

"আমি যে কেন দূরে দূরে থাকি সে তুমি বুঝ্‌বে না বিজলী!"

বিজলী উত্তেজিত হোয়ে বল্‌লে, "বুঝ্‌ব না? বেশ ভাল কথা—আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে যে তোমার এতখানি জ্ঞান হোয়েছে তার জন্যেও ধন্যবাদ! কবে যাচ্ছ বিলেত? আজ রাত্রেই?"

শান্ত ভাবে মিহির বল্‌লে "না, আগামী সোমবার,—আরো ছ'দিন দেরী আছে।"

বিজলী হঠাৎ চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো—ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে বন্ধ দরজাগুলো খুলে ফেলে ওর সামনে এগিয়ে এসে বল্‌লে—"জান, সুবোধ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে?"

তবু অপর পক্ষে কোনো উত্তেজনা দেখা গেল না, উত্তর দিলে, "শুনে খুসী হলুম বিজলী! তিনি তোমার যোগ্য-পাত্র সন্দেহ নেই—"

বিজলী জ্ব'লে উঠ্‌লো;—ও মনে করেছিল এই বিয়ের কথা শুনলে মিহির স্থির থাক্‌তে পারবে না—ওর নির্ব্বিকার চিত্ত দুলে উঠ্‌বে—ও যদি একবার বলে "বিজলী, তোমাকে আমি ভালবাসি"—তবেই তো সব সহজ হোয়ে যায়। কিন্তু এ তো বল্‌বে না কিছু;—এ যে ভালবাসে না—হয়তো ভালবাস্‌তে জানেও না—কেবল নিজের ভাবুকতা আর বিদ্যের অহঙ্কার নিয়ে আছে। স্বার্থপর অবুঝ পুরুষ! বিজলীর ইচ্ছে হোল—উঠে যায়, খুব খানিকটা কাঁদে,—নিজের মনের সঙ্গে খুব একটা বিদ্রোহ লাগিয়ে দেয়।

কতক্ষণ কেটে গেল, মিহির বল্‌লে, "এবার আমি যাই তা হ'লে, আবার বৃষ্টি আস্‌বে।"

বিজলী বল্‌লে, "আমি তো তোমায় ধ'রে রাখিনি মিহির!"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ বিজলী?"

"রাগ?—কই, না।"

মনে মনে বল্‌লে, তুমি কি বুঝ্‌বে রাগ আর অনুরাগের কথা? তুমি তো পাথরের মত কঠিন, মাটির মত প্রাণহীন, লেখাপড়া জানা সুবোধ বালক!

হাওয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়ে ঘরে-বাইরে গুমোট অসহনীয় ক'রে তুলেছে; মিহির বল্‌লে, "চল বিজলী, সামনের ছাতটায় যাই—"

"তুমি যাও, আমি পরে যাচ্ছি।"

মিহির চ'লে গেলে বিজলীর বাধাহীন অশ্রু ঝরে পড়লো—জমাট কান্না এতক্ষণ তার বুকে বেধে ছিল। ভাব্‌লে, মেয়েরা কী অসহায়—কী পরাধীন! ইচ্ছে করে ওকে নাড়া দিয়ে ওর মনের বীণার তার ঠিক সুরে বেঁধে দিই—কিন্তু কিছুতেই পারবো না ওকে বল্‌তে—ও কেন নিজে কিছু বোঝে না! ছাতে এসে পাঁচিলের গায়ে মাথা দিয়ে যখন দাঁড়ালে তখনো ওর মন স্থির হয়নি। মিহির ওর খুব কাছে এল; বল্‌লে, "বিজু, আমায় ভুল বুঝোনা; আমার কথা কাউকে বলবার নয়।"

ও ধীরে ধীরে বিজলীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে—অশ্রু আর গোপন রইল না, অঝোরে ঝ'রে পড়লো মিহিরের বাহুর উপরে।

গলার সুর আরো কোমল ক'রে মিহির বল্‌লে, "তুমি দুঃখ কোর'না বিজলী, তুমি আমার বন্ধু,—শুধু এই অধিকারটুকু দিও।"

হায়রে! যাকে রাজত্ব দিতে পারে সে চায় মুষ্টিভিক্ষা! বিজলীর এত দুঃখেও হাসি এল।

কাজলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রদীপ বিজলীকে ডাক দিয়ে বল্‌লে, "বিজলী দি, আমার মাষ্টার এসেছে আমি চল্লুম, কাজল এই রইল!"—ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। মিহির কাজলকে ডাক্‌লে, ও দৌড়ে ছাদে এল—একবার দিদির মুখে একবার মিহিরের মুখে অবাক হোয়ে চাইলে। মিহির ওকে বুকের কাছে টেনে বল্‌লে, "কাজল—"

কাজল ওর গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হোয়ে বল্‌লে, "মিহির দা, তুমি খুব ভাল—"

তারপরে তিনজনে নির্ব্বাক হ'য়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলো,—মেঘ কেটে গিয়ে হঠাৎ দম্‌কা বাতাস উঠ্‌ল—

ভিজে মাটি আর যুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে এল,—তারপরই মেঘনাদের গাড়ীর হর্ণ শুন্‌তে পাওয়া গেল।

১০

পরদিন বিজলী অসুখের ছল্ ক'রে নিজের ঘরে বন্দী হ'য়ে রইল। সে একলা থাক্‌তে চায়—নিজের মনের সঙ্গে খুব একটা বিরোধ বাধাতে চায়। বহুক্ষণ মনের সঙ্গে যুক্তিতর্ক ক'রেও যখন হার মানাতে পারলে না তখন বালিসে মুখ গুঁজে কান্না সুরু ক'রে দিলে।

সন্ধ্যার কিছু আগে দাসী ঘরে একখানা চিঠি রেখে গেল মনের আলস্যে বিজলী চেয়ে দেখ্‌লে না। কিন্তু অন্যমনস্ক চোখ গিয়ে পড়লো তার উপরে,—এতো মিহিরের হাতের লেখা! ত্বরিতে সে চিঠিখানি খুলে ফেলে, জান্‌লার কাছে ব'সে সন্ধ্যার ম্লান আলোকে পড়লে। প্রত্যেকটি অক্ষর ওর বুকে বেদনার বাণ হোয়ে এসে বিঁধ্‌লো।

মিহির লিখেছে—

যেদিন শিবপুর বাগানে তোমাকে প্রথম দেখি, সেদিনই রাত্রে বাবা আমায় ডেকে বল্‌লেন, আমি বাগদত্ত। আমি যখন ছ' বছরের, বাবার বন্ধু কন্যা যখন মাত্র এক বছরের, তখন থেকে তার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক। সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্‌বার নয়।

জীবনে প্রথম যেদিন কোনো মেয়েকে দেখে ভাল লাগলো—সেদিনই এই নিদারুণ বাণী শুনলুম। তুমি জান, বাবা আমায় কত ভালবাসেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই—তাই নিজের মনে যতই দুঃসহ ব্যথা জাগুক, তাঁকে কষ্ট দিতে পারব না। জীবনে যিনি কখনো অন্যায় করেননি, তাঁর একমাত্র পুত্র তাঁকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করতে পারবে না।—আমি আমার ভাবী বধূকে কখনো দেখিনি—জানিনা সে কেমন—তবু সে যে আমারই অপেক্ষায় ব'সে আছে এ কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না।—বিবাহ এইমাসে হবার কথা ছিল, কিন্তু সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—ফিরে এলে হবে।

বিজলী, তুমি ত বুদ্ধিমতী—তুমি ত সমস্তই বুঝতে পারবে—ক্ষণিকের অতিথিকে ভুলে যেও। তুমি সুখী হও। আমার দ্বারা তুমি যদি অশান্তি পাও—তবে যে আমার দুঃখের অবধি থাক্‌বে না। নিজের কথা আজো কিছু বল্‌লাম না—সে আমার মনের গোপন কোণেই লুকোনো থাক্।

মিহির।

বিজলীর কাছে সমস্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো,—কেন যে মিহির এত কাছে এসেও এত দূরে দূরে ছিল তা' এতদিনে বুঝতে পারলে। মনে মনে বল্‌লে—তুমি সুখী হও—আমার জন্যে তোমাকে অপরাধী করব না। আমি ভুলে যেতে পারব কি না জানিনে—কিন্তু তোমাকে ভুলে যেতে দেব। তোমার কাছ থেকে পাবার আর কিছু নেই; শুধু তুমি ভাল থেক'। তক্ষুণি জবাব লিখে পাঠালে—

মিহির,

তুমি সুখী হও।—আমার শুভকামনা তোমার সঙ্গে রইল।

১১

আরো পাঁচ-ছয় বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল—কিন্তু এর ইতিহাস বড় অল্প নয়।

শশাঙ্ক বাবু হঠাৎ কলেরায় মারা গেছেন—মিহিরের আর দ্বিতীয় আত্মীয়-বন্ধু না থাকায় মেঘনাদকেই এই নিদারুণ সংবাদ পাঠাতে হোল। উত্তরে মিহির লিখলে—

কাকা,

বাবা নেই, সংসার আমার কাছে শূন্য হোয়ে গেছে—কিসের জন্যে কার কাছেই বা ফিরব? যতদিন শিক্ষার মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারি তবু একটা আশ্রয় আছে। আপনি বাবার জমিদারীটি অনুগ্রহ ক'রে দেখ্‌বেন। বিজলী ও কাজলীকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

প্রণ মিহির।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুবোধের সঙ্গে বিজলীর বিয়ে হ'য়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে নিতান্ত সহজে হয়নি সেই গোড়ার কথাটা আগে বলি।

বিজলী মিহিরের সম্বন্ধে মনে কোনো চঞ্চলতা না থাকৃতে দিলেও তাকে ভুলতে পারছিল না। তার তরুণ-জীবনের প্রথম ভালবাসা যাকে সে নিবেদন করেছে, সে তো উৎসর্গিত ফুল' তা' আবার ফিরিয়ে নেয় কেমন ক'রে?

তাই সুবোধের বার-বার সরব ও নীরব ভালবাসার নিবেদন সে প্রত্যাখ্যান করলে। এমন কি কালীকিঙ্কর যখন ছেলের হ'য়ে অনুরোধ করতে এলেন, ও মুখ ঘুরিয়ে ব'সে রইল—কথার জবাব দিলে না।

মেঘনাদ জোর করলেন না, বাধা দিলেন না; বল্লেন, "ওর তরী যদি স্রোতের মুখে ভেসে থাকে কালী দা, তাকে তীরে টেনে রাখবার চেষ্টা করা মিথ্যে।"

ফলে কালীকিঙ্করের সঙ্গে মেঘনাদের একটা চিরস্থায়ী মনোমালিন্য বেধে গিয়ে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হোল।

তবু এ অবস্থায় বছর-কতক কাটলো, আরো কেটে যেতে পারতো, যদি না মেঘনাদ পড়তেন কঠিন ব্যারামে। দুরারোগ্য স্নায়বিক অবসন্নতায় তাঁর জীবনের আশা লুপ্ত হ'য়ে এল। বিজলী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলে, দুই কন্যার অসহায় অবস্থা কল্পনা ক'রে মেঘনাদ আরো বিচলিত হোয়ে পড়লেন। শেষে একদিন বিজলীকে ডেকে বল্লেন, "মা, কালী দা'র ওষুধ না হ'লে আমার রোগ সারবে না, তাকে কি ডাক্‌বার কোনও উপায়ই নেই?"

বিজলী চম্‌কে উঠলো। উপায় তো তারই হাতে—সে যদি আজ সুবোধকে বিয়ে করতে রাজী হয় তবে কি কালীকিঙ্কর না এসে পারবেন?

বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে বল্লে, "বাবা, আমি তাঁকে আন্‌বার বন্দোবস্ত করছি।" তারপর নিজের ঘরে উপস্থিত হ'ল।

মিহিরের বিলেত থেকে লেখা কয়েকখানি চিঠি যা' সে বহু...র কৃপণের ধনের মত তুলে রেখেছিল, বাক্স থেকে বার ক'রে বারম্বার পড়লে। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে একটির পর একটি চিঠি তারই শিখার মুখে ধ'রে পোড়াতে পোড়াতে অস্ফুটস্বরে বল্লে, "তোমাকে ভুলব, তোমাকে ভুলব, তোমাকে ভুলব। তুমি আমার কেউ নও, কেউ কোনোদিন ছিলে না। আজ হোতে আমি মুক্ত,—আমার মনের কোণেও তোমার স্থান নেই!"

সোফারকে দিয়ে গাড়ী বার করিয়ে বিজলী একেবারে কালীকিঙ্করের দরজায় উপস্থিত হোল। কালীকিঙ্কর তক্ষুণি বেরোচ্ছিলেন, দরজাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা। বিজলী তাঁর দুই পায়ের উপর প'ড়ে বল্লে, "জ্যাঠামশায় চলুন, বাবাকে একবার দেখতে চলুন—বাবার খুব অসুখ,—আপনি না গেলে তাঁকে বাঁচাতে পারা যাবে না!"

বিষম মর্ম্মাহত হ'য়ে কালীকিঙ্কর বললেন, "মেঘনাদের এত অসুখ আর আমি যাব না? আজ পাঁচ বচ্ছর তাকে না দেখে কত কষ্টে আছি তা তুমি কি বুঝবে বিজু! একটু অপেক্ষা কর মা, আমি দশ মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে মেঘনাদের অসুখের কথা শুনছি।"

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ ক'রে বিজলী একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। পাশের ঘর থেকে সুবোধ সব কথা শুনতে পেয়েছিল, কালীকিঙ্কর প্রস্থান করলে সে এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে বিজলীর মুখটা একবার পাংশু হ'য়ে আবার লাল হ'য়ে গেল। জড়িতস্বরে সে বল্লে, "সুবোধ বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সুবোধ স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে, "তোমার সঙ্গে বাবার যা কথা হ'ল আমি সব শুনেছি। তুমিও আমাকে ক্ষমা কর বিজলী! তুমি উপেক্ষা করেছিলে ব'লে সেই অপমানে বাবাকে তোমাদের বাড়ী যেতে দিই নি;—আজ সেই অপরাধ আমার লাগ্‌লো!"

বিজলী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "অপরাধ সমস্তই আমার, তবুও কি আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন?"

সুবোধের মনে আজো বিজলীর মূর্ত্তি অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে—তাকে ভুলতে পারে নি ব'লে সে বিবাহও করে নি। তবু বল্লে, "ধরা দিতে এসেচ—? কিন্তু তুমি তো আমায় ভালবাসো না বিজলী?"

"আমি চেষ্টা করব। আমাদের বিয়ে হোলে বাবা খুসী হবেন, সেরে উঠ্‌বেন, এই আমার বিশ্বাস।"

সুবোধ তখন সমস্ত কান্না সমস্ত অভিমান ভুলে নত হ'য়ে ব'সে বল্‌লে, "তোমার ভালবাসা আমি পাব—এ আমারও বিশ্বাস। আমি মলিন, আমি কালো—কিন্তু তোমার স্পর্শে আমার যা' কিছু সব আলো হোয়ে উঠবে—এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমা দেবী

প্রেমের রবি

শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকার

যখন মনে প্রেমের রবি ওঠে
নয়ন-পাখী হঠাৎ গাহে গীতি,
ম্লান হৃদয়ের সূর্য্যমুখী ফোটে—
যায় ভুলে শোক অতীতরাতের স্মৃতি!
অশ্রু-শিশির মুক্তা হ'য়ে হাসে
সেই অরুণের করুণ ছোঁয়া লেগে,—
আঁখির পাতা কম্পিত উল্লাসে
নিশাস-বায়ের আন্দোলনে জেগে!

মহিলা

বিচিত্রা

শ্রীযুক্ত অতুল

বোঝা তোলা

চিত্রশালা

বোসের চিত্রাবলী

জীবনের সাথী

বিদেশী বন্ধু

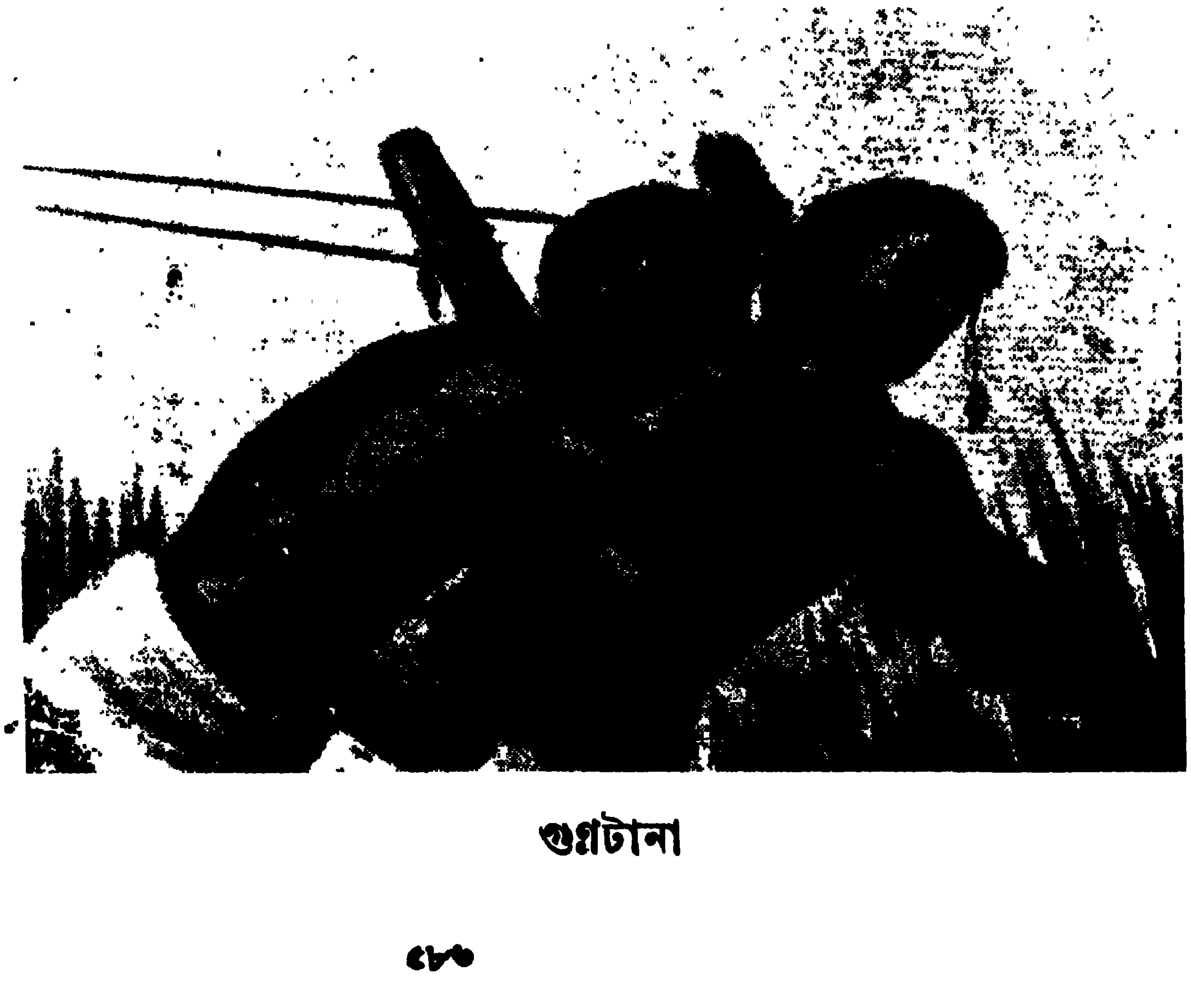

গুণটানা

শ্রীঅতুল বসু

Bengal Tiger

স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

হালের মাঝি

হেঁয়ালি

বুড়ী

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু

শ্রীযুক্ত প্রবোধ বসু এম-এ

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি "Bengal Tiger" দেখেন নাই এবং মুগ্ধ হন নাই শিক্ষিত বাঙালীর ভিতর এরূপ লোক খুব অল্পই আছেন। তাঁহাদের আনন্দের এবং সমগ্র বাংলার গৌরবের বিষয় এই যে, সম্প্রতি ইনি দিল্লীর চিত্র-প্রদর্শনীতে পোর্ট্রেট্ পেইন্টিংয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভাইসরয় কর্ত্তৃক সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ছবি আঁকিবার জন্য লণ্ডনে প্রেরিত হইতেছেন। এবার দিল্লীর শিল্প-প্রদর্শনীর প্রধান ব্যাপারই ছিল—এই শিল্পী মনোনয়ন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট্ পেইন্টারগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন,—এ হিসাবে ইহা খুবই প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রথায় ছবি আঁকিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন ভারতীয়কে মনোনয়ন এই প্রথম এবং আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় এই যে, তিনি একজন বাঙালী। অবশ্য প্রাচ্য প্রথায় ছবি আঁকিয়া অনেক বাঙালী যশস্বী হইয়াছেন,—এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মান লাভও করিয়াছেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক, পাশ্চাত্য প্রথায় ছবি আঁকিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করেন নাই। বাঙালী শিল্পীর এই সম্মানে শিল্প-রসিক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

সাধারণতঃ কোন শিল্পী অথবা কবি কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইতে সম্মান লাভ করিবার আগে আমরা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে চাই না। সাহিত্যে আজকাল তবু আমাদের কুণ্ঠা কিছু ঘুচিয়াছে, কিন্তু শিল্পের অনাদর আমাদের একেবারে মজ্জাগত। বসনে, ভূষণে, গৃহে, আস্বাবে তাহার পরিচয় দিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। সম্প্রতি ভারত-শিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অনেকটা শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কিন্তু সে শ্রদ্ধারও কতটা অংশ প্রকৃত শিল্পরস বোধের আনন্দ হইতে তাহা বলা কঠিন।

শিল্প-সাধনা

শ্রীযুক্ত অতুল বসু চিত্র-শিল্পকে কৈশোর হইতেই জীবনের একমাত্র সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্র-কলায় তাঁহার একটা জন্মগত প্রতিভা স্বীকার করিতে হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার ভিতর আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন মাত্র আড়াই বৎসর,—লিখিতে কিম্বা পড়িতে শিখেন নাই,—সেই সময়েই বাড়ীর দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় করিয়া লেখা—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" কথাটি দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া তিনি প্রথমে স্বর্গীয় রণদা গুপ্তের "জুবিলী এ্যাকাডেমী অফ আর্টসে" ভর্ত্তি হন।

প্রথমেই রণদা বাবুর মত অত বড় শিল্পীর ঐকান্তিক সহায়তা পাওয়াতে তাঁহার শিল্পী মন সহজে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। রণদা বাবুর শিল্প-সাধনার নিষ্ঠা ও তাঁহার শিল্প-প্রতিভা বালক-শিল্পীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্তও তাহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তারপর ইনি ১৯১৬ সনে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে আসিয়া একবারেই life-classএ প্রবেশ করিলেন। দুই বৎসরের ভিতর শেষ পরীক্ষায় first class distinction-এর সহিত পাশ করিয়া বাহির হইলেন। ১৯১৯ সনে "Indian Academy of Arts" নামক ইংরেজী শিল্প-মাসিক বাহির হওয়ার সময় ইনি উহার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আর্ট স্কুলে প্রতি বৎসর যে Fine Arts Exhibition হইত তিনিই তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এইরূপে শিল্প-মাসিক ও এক্‌জিবিশনের সাহায্যে দেশে প্রকৃত শিল্পরসবোধ সঞ্চার করিতে সে সময়ে তিনি প্রাণ-পণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই সময়েই অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁহার অনেকগুলি ছবি বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্প-প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। ১৯২৩ সনে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলার্‌সিপ লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। এ বিষয়েও ইনি সর্ব্বাগ্রণী। ইতিপূর্ব্বে বিদেশে চারুশিল্প শিক্ষার জন্য অন্য কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মিঃ পার্শি ব্রাউনের ইচ্ছা ছিল যে, অতুল বাবু বিলাতে প্রোফেসর রোটেন্‌ষ্টাইনের অধীনে শিল্প-শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া A. R. C. A. ডিগ্রী লইয়া দেশে আসেন। অতুল বাবুও প্রথমে এই ইচ্ছা লইয়াই গিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন ডিগ্রী লাভে চাকুরীর কিছু সুবিধা হইলেও প্রকৃত শিল্প-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে না তখন তিনি ডিগ্রীর মায়া কাটাইয়া বিলাতের শিল্প-শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান রয়াল এ্যাকা-ডেমীতে ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে আমরা বিশুদ্ধ শিল্পের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পাই। যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে তিনি রয়াল এ্যাকাডেমীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে শিল্প-সাধনার উদ্দেশ্য তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছিল। এখানে তিনি স্বর্গীয় চার্লস সিম্‌স্‌, মিঃ মেল্টন ফিসার, মিঃ গ্লিন্ ফিল্‌পট্, মিঃ শিকার্ট প্রভৃতি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের সহায়তায় পাশ্চাত্য-শিল্পের মর্ম্ম স্থানে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রিটীশ মিউজিয়ামের মিঃ আর্থার ওয়েলী কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী লিখিত ভারত-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকখণ্ড গ্রন্থের সমালোচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। তাঁহার প্রবন্ধ Year Book of Oriental Art and Culture 1924-25এ, প্রকাশিত হইয়া ইংলণ্ডের শিল্পী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৬ সনে রয়াল এ্যাকাডমীতে শিক্ষা-সমাপনের পর তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক ও পুরাতন শিল্প ও শিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত ইয়োরোপ ঘুড়িয়া বেড়ান। দেশে ফিরিয়া ইনি চেষ্টা করিতেছেন—পাশ্চাত্য-শিল্পের যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আমাদের দেশের উপযোগী—তাহাদিগকে রঙে রেখায় রূপদান করিতে।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের শিল্পী মহলে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-শিল্প সম্বন্ধে যে অবজ্ঞার ভাব দৃষ্ট হয় প্রকৃত শিল্পের উন্নতির দিক হইতে তাহা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। পাশ্চাত্যের শিল্প-প্রতিভা যে কত নব নব রীতি ও ভঙ্গীর ভিতর দিয়া অনন্ত রূপে সৌন্দর্য্যলোককে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে আমাদের দেশের খুব অল্প শিল্পীই তাহার খবর রাখেন। পাশ্চাত্য শিল্পীর প্রখর দৃষ্টি (to see in terms of light) ও তদনুযায়ী প্রকাশভঙ্গী আমাদের শিল্পে আনা প্রয়োজন—তাহাকে নবজীবনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে। সেই দিক হইতে আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত অতুল বসুর শিল্পের একটা বিশিষ্ট ও স্থায়ী মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়।

শিল্প-প্রতিভা

অতুল বসুর শিল্প-প্রতিভার কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই মনে পড়ে আঁরি বের্গশঁর' কয়েকটি কথা—"So art, whether it be painting or sculpture, poetry or music, has no other object than *to brush aside* the utilitarian symbols, the conventional and

socially accepted generalities, in short, *everything that veils reality from us,* in order to bring us face to face with reality itself. It is from a misunderstanding on this point that the dispute between realism and idealism in art has arisen. *Art is certainly a more direct vision of reality.* But this purity of perception implies a break with utilitarian convention, an innate and specially localised disinterestedness of sense or consciousness, in short, *a certain immateriality of life,* which is what has always been called idealism. So that we might say, without in any way playing upon the meaning of the words, that realism is in the work when idealism is in the soul, and that *it is through ideality that we can resume contact with reality*" (১)

শিল্পীর কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া বাস্তবের স্বরূপটি যে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া ওঠে এ কথার সত্যতা আমরা পাই অতুল বসুর ছবিতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া যাক স্যর আশুতোষের সর্ব্বজনপ্রিয় ছবিখানা। ও ছবি তো স্যর আশুতোষের একেবারে হুবহু প্রতিকৃতি নয়। এমন-কি ও মুখের অনেক জায়গার পরিমাপ আশুতোষের মুখের সঙ্গে হয়তো মিলে না। অথচ আমরা এ কথা জানি যে, আশুতোষের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফটোগ্রাফের চেয়ে এ ছবি তাঁর অনেক বেশী পরিচয় বহন করে। এইখানেই পরিচয় পাই শিল্পীর প্রতিভার—to brush aside everything that veils reality from us। এইখানেই শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি—যা আমাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না—নানা বাধার আবরণে। শিল্পী তাঁহার প্রতিভার বলে এক নিমিষে সমস্ত আবরণ সরাইয়া বাহির করিলেন আশুতোষের স্বরূপটি—যাহা দেখিবামাত্র আমাদের মন বলিয়া উঠিল—হাঁ, যাহা চাহিতেছিলাম তাহা এই। সমস্ত ছবিটা ভরিয়া একটা জীবনের দ্যোতনা (vitality) ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই ব্যঞ্জনা সম্ভব হয় না যদি শিল্পীর বাস্তবের গভীর অনুভূতি (grip of life) না থাকে। আমার মনে হয় শিল্প-প্রতিভার বিশেষত্ব—বাস্তবের এই গভীর অনুভূতি। এই অনুভূতি (grip) আছে বলিয়াই তাঁহার ছবিতে vitality এত বেশী—যা একটা সবেগ শক্তির সাহায্যে আমাদের অন্তরকে আঘাত করিয়া সচেতন করিয়া তোলে। এই জীবনের দ্যোতনার সঙ্গে আরেকটি জিনিষ আমরা এঁর ছবিগুলিতে পাই যা আমাদের মনকে অসীমতার দিকে গভীরতার দিকে লইয়া যায়। চিত্র-পরিভাষায় একে বলা যায় the touch of infinity। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে "বুড়ী"র ছবিটি। ইহাতে vitality ও infinityর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে; কর্ম্মক্লিষ্ট মানবতার যে অপূর্ব্ব নিবেদনের ব্যঞ্জনা ইহার মুখে ও সর্ব্ব অবয়বে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

বিখ্যাত চিত্রকর ও চিত্র-সমালোচক স্যর চার্লস হোম্‌সের মতে *—সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রে অল্পাধিক পরিমাণে চারিটি লক্ষণ প্রকাশিত থাকিবে। (১) সামঞ্জস্য—(unity), সঙ্গীতে symphonyর যে স্থান। (২) জীবনের দ্যোতনা (Vitality) (৩) গভীরতা বা অসীমতা (Infinity) এবং (৪) সমাধি (Repose)—ছবিতে রেখার রঙের চাপল্য-বিহীন যে সমাহিত ভাব।

আমাদের দেশের ছবিতে সাধারণতঃ এই জীবনের দ্যোতনার (vitality) অভাব অনুভব করি। আমাদের শিল্পীদের সাধারণতঃ অসীমতার দিকেই ঝোঁক বেশী। কিন্তু বাস্তবের গভীর অনুভূতি (grip of life) না থাকাতে সে অসীমতার (infinity) স্পর্শ আমাদের চৈতন্যলোকে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। যে ছবিতে জীবনের ব্যঞ্জনা নাই—সেখানে গভীরতার ভাব বেশী আনিতে চেষ্টা করিলে তাহা মনকে মুগ্ধ না করিয়া ক্লিষ্ট করে। অতুল বসুর শিল্পে জীবনের দ্যোতনার দিকে এই বিশেষ বিকাশের জন্য তিনি

(১) LAUGHTER: Henri Bergson—pp. 157.

* Notes on the Science of Picture-making by Sir Charles Homes, Director of the National Gallery, London. Chap IV.

ইয়োরোপীয় শিল্পীদের কাছে—বিশেষতঃ ডাচ শিল্পী রেম-ব্র্যাণ্টের কাছে—ঋণী বলিয়া মনে হয়।

বাংলার শিল্প ও সঙ্গীতে কাব্য বড় বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কি চিত্রে কি সঙ্গীতে কাব্য না হইলে আর বাঙালীর মন ভোলে না। আমরা চিত্র এবং সঙ্গীতকে কাব্যের বাহন নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে চিত্রও উন্নত হইতে পারে নাই এবং কাব্যেরও অপমান ঘটিয়াছে। বিশুদ্ধ রাগিণী এবং শুধু চিত্র-সত্বার (pictorial excellence) যে একটা আবেদন আছে এবং সেইটাই তাহার সত্যকার আবেদন, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অতুল বসুর ছবির ক্রমিক অভিব্যক্তিতে আমরা দেখিতেছি তিনি কাব্যাংশকে (story) ক্রমশ বাদ দিয়া শুধু চিত্র-সত্বার বিকাশের দিকে ঝুঁকিয়াছেন।

অবশ্য ইতিপূর্ব্বে তিনিও যে কাব্যাংশ নিয়া ছবি আঁকেন নাই তাহা নয়। 'বোঝা তোলা', 'জীবনের সাথী' 'গুণটানা', ও 'হালের মাঝি' তাহার প্রমাণ। কিন্তু ইহাতে কাব্যগত সৌন্দর্য্যের কাছে চিত্রগত সৌন্দর্য্যকে খাটো করা হয় নাই। বরং দু'টি মিলিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উপরোক্ত সবগুলি ছবিই শ্রমিকজীবন হইতে নেওয়া। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে শ্রমিক জীবনের সমস্ত কালিমা মলিনতা ঘুচিয়া গিয়া তাহারা আমাদের অন্তরের আনন্দলোকে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। "বোঝা তোলা'তে কুলী ও কুলি কামিনের যে প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি, 'জীবনের সাথী'তে পরস্পরের যে নির্ভরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে হয়তো বাস্তব জীবনে আমরা ইহা খুঁজিয়া পাইব না,—কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে ইহারা ধরা পড়িয়াছে। এখানেও সেই আবরণ সরাইয়া দেখানো। 'গুণটানা' ছবির রেখার সংঘাতের পরিণতি (the art of conflict) অতি চমৎকার ফুটিয়াছে। এখানে মাঝি দু'টির পরিশ্রমের চিহ্ন মুখে ও সর্ব্ব অবয়বে ফুটিয়া উঠিলেও তাহাতে বিষাদ বা অবসাদের ছায়া নাই, বরং একটা আশা এবং উৎসাহের ভাবই পাইতেছি। পরিশ্রমই যেন তাহাদের আনন্দের বিষয়। সমস্ত ছবিতেই মানবজীবনের এই গভীরতর আনন্দের বাণী (optimistic view of life) ফুটাইয়া তোলা অতুল বসুর শিল্প-প্রতিভার একটা বিশেষত্ব। 'হালের মাঝি' ছবিতেও সেই একই বাণী পাইতেছি। ঝড়ের মুখে নৌকা ছাড়িয়া তার ভয়ের লেশমাত্র নাই। বরং আনন্দের সঙ্গে যেন সে ঝড়ের সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহার রেখায় রঙে the art of crisis সুন্দর ফুটিয়াছে। এ ছবিতে এমন একটা সবেগ শক্তি আছে যা দেখামাত্র আমাদের মনকে জাগ্রত করিয়া তোলে। মাঝির মুখ আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু শিল্পী আমাদিগকে যেটুকু দিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা তাহার মুখের আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব কল্পনা করিতে পারি—তাহার কণ্ঠের স্ফীতি হইতে, তাহার দৃঢ় মুষ্টি হইতে, তাহার পা রাখিবার ভঙ্গি হইতে। অতুল বাবু তাঁহার ছবিতে সর্ব্বত্রই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই drama of life। মেলো-ড্রামাটিক toneএর গন্ধও তাঁহার শিল্পে খুঁজিয়া পাই না।

'গুণ টানা' ও 'হালের মাঝি' ছবি দু'টি ১৯২১-২২ সনে আঁকা, সুতরাং ইহাতে তখনকার রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের কিছু ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'গুণটানা'তে দুই মাঝির একজন হিন্দু একজন মুসলমান, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে। 'হালের মাঝি' ছবিতেও আকাশে যে ঘনঘটা তা' তখনকার রাষ্ট্রনৈতিক আকাশের প্রতীক হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

ইহার পরে অতুল বাবু ধীরে ধীরে চিত্রের গল্পাংশের মোহ কাটাইয়া উঠিতেছেন দেখিতে পাই। বিশুদ্ধ চিত্র-সত্বার আবেদনের দিকে তাঁহার মন ঝুঁকিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাইতে পারে 'মহিলা', 'বিদেশী বন্ধু' এবং 'হেঁয়ালি' ছবি কয়েকখানি। এগুলিতে গল্পাংশ অতি সামান্য, কিন্তু চিত্রগত সৌন্দর্য্য অতি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তিনি আঁকিবার পদ্ধতিতে একটু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, যদিও ইহাকে তাঁহার পূর্ব্ব অনুসৃত পন্থার একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলা যাইতে পারে। কারণ, বাস্তবের যে গভীর অনুভূতি হইতে তাঁহার সমস্ত শিল্প-প্রতিভা উৎসারিত তাহাকে রূপদান করিতে উপযোগী এই Impressionist method। শিল্পরসিক মাত্রেই জানেন যে, ফরাসীদেশের এই শিল্প-পন্থা ইতালীয়

academic চিত্র-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ফল। Italian Academic Schoolএর শেষ অবস্থায় ও দলের চিত্রকরদের কেবলি অভিজাত ভাবের ছবি ও প্রাণহীন চাকচিক্য আনিবার চেষ্টায় প্রকৃত শিল্পীদের মন হাঁপাইয়া উঠিল। সেইজন্য impressionist দল ধরিলেন একেবারে উল্টা পন্থা। চিত্ররীতির সমস্ত convention ভাঙিয়া চুরিয়া চিত্রগত বাস্তবকে একেবারে নগ্নমূর্ত্তিতে দাঁড় করানই হইল ইঁহাদের সাধনা। এইদিকে বর্ত্তমান যুগের মূল সুরের সহিত ইহার মিল থাকাতে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় শিল্পের উপর এই দলের প্রভাব অসাধারণ হইয়াছে।

এই শিল্পপন্থার প্রাণ হইতেছে—রঙ। ইঁহাদের মতে এ জগৎটা রঙের সমষ্টি মাত্র। ইহাতে মানুষ, প্রকৃতি, পশু বলিয়া আলাদা কিছুই নাই। শিল্পীর দৃষ্টিতে সমস্তই বিভিন্ন রঙের সমাবেশ মাত্র। সেইজন্য মানুষের ছবি আঁকিতে তাঁহার নিকট নাক, মুখ, চোখের আলাদা কোন মূল্যই নাই। তিনি দেখিতেছেন শুধু খানিকটা জায়গা জুড়িয়া নানা রঙের সমাবেশ। এই রঙের উপর সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া যে বর্ণ-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে পটে ফলাইয়া তুলিতে পারিলেই শিল্পীর কাজ শেষ। এই বর্ণের উপর আলোর প্রভাবের কথাটুকু বুঝিতে পারিলেই এই চিত্র-পন্থার মূল রহস্য ধরা পড়িবে। এই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী—আলোর ভাষায় রঙের খেলা দেখা (to see colour in terms of light)—ইহার মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে বলিয়াই এ পন্থায় প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত ভাবে জানিতে উৎসুক তাঁহাদিগকে হ্যারল্ড স্পীডের বইখানা পড়িতে অনুরোধ করি।

এই দিক হইতে দেখিলে 'হেঁয়ালি'র অর্থ সুবোধ্য হইবে এবং 'মহিলা' ও 'বিদেশী বন্ধু' ছবিতে শিল্পীর প্রতিভা এ পন্থায় কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে বোঝা যাইবে। 'মহিলা'র ক্ষণিকের হাস্যদীপ্ত মুখখানি তুলির কয়েকটি সামান্য স্পর্শে জীবন লাভ করিয়াছে। রঙের উপর কতখানি অধিকার থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে—শিল্পী মাত্রেই তাহা বুঝিবেন।

আমার মনে হয়, Impressionist schoolএর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের শিল্পে আনিবার প্রয়োজন আছে। সবদিক দিয়াই বাস্তবের সহিত আমাদের দেশের শিল্প-কলার যোগ এত অল্প যে, তাহাকে প্রাণশক্তিতে পূর্ণ করিতে হইলে এই প্রখর সত্যদৃষ্টির একান্ত আবশ্যক। এই দিক হইতে আমাদের দেশে অতুল বসুর শিল্পের একটা গৌরবময় সার্থকতা আছে।

শ্রীপ্রবোধ বসু

'বিদেশী বন্ধু' এবং 'হেঁয়ালি' ছবি দুইটি একটু দূরে রাখিয়া দেখিলে স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিবে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জাতি-ভেদ

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ সামসুখা

দুই সহস্র বৎসরের আরও পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণাদি কয়টি জাতি ছিল ও পরস্পর সংযোগে অন্য কয়টি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং জৈন শাস্ত্রকারগণ এই বর্ণসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল বলেন তাহা আমরা জৈন প্রথম-অঙ্গ 'আচারাঙ্গ' সূত্রের "নিজ্জুত্তি" (নির্যুক্তি)-তে প্রাপ্ত হই। এই নির্যুক্তি পঞ্চম-শ্রুত-কেবলী সুবিখ্যাত জৈন আচার্য্য ভদ্রবাহু স্বামীর বিরচিত। ভদ্রবাহু ভগবান মহাবীরের নির্ব্বাণের পর ১৭০ বৎসরে দেবলোক গমন করেন। মহাবীর খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, অতএব ভদ্রবাহু ৩৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন; কাজেই তাঁহার প্রণীত নির্যুক্তি এই সময়ের পূর্ব্বেকার ও প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত এরূপ বলা যাইতে পারে। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অবগতির জন্য নির্যুক্তি অবলম্বনে এই বর্ণোৎপত্তির বিবরণ প্রদান করিতেছি। *

প্রথমতঃ একমাত্র মনুষ্য জাতি ছিল, ইহার কোন বিভাগ ছিল না। প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেব যখন প্রথম রাজা হইলেন তখন ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি হইল। ‡ অতএব প্রথম বর্ণ ক্ষত্রিয় বর্ণ। যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন না তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইলেন। তৎপরে যাঁহারা শিল্পবাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা বৈশ্য নামে অভিহিত হইলেন। ভগবান্ ঋষভদেব রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-অবলম্বন ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার পর যাঁহারা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের 'গৃহী-ধর্ম্ম' গ্রহণ করিয়া শ্রাবক হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ঋষভদেবের পুত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী ভরত 'কাঁকনী' নামক এক প্রকার রত্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেন। এইরূপে চিহ্নিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হন ও এই চিহ্নই পরে উপবীতে পরিণত হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হয়।

এই চারি বর্ণ হইতে পরে সপ্ত বর্ণের ও নয় বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়। সপ্ত বর্ণকে 'বর্ণ' ও নয় বর্ণকে 'বর্ণান্তর' শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সপ্তবর্ণের উৎপত্তি এই প্রকার:—চারি মূল জাতির একের পুরুষ ও অন্যের স্ত্রীর সংযোগে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। যেমন ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সংযোগে সঙ্কর ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রীর সংযোগে সঙ্কর বৈশ্য ও বৈশ্য পুরুষ ও শূদ্রী স্ত্রীর সংযোগে সঙ্কর শূদ্র; এ মতে প্রধান চারি জাতি ও সঙ্কর তিন জাতি লইয়া সপ্তবর্ণ হয়।

ইহার পরে নয়টি জাতির উৎপত্তি হয় যাহাদিগকে 'বর্ণান্তর' বলে:—

(১) ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রীর সংযোগে—অম্বষ্ঠ
(২) ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্রী স্ত্রীর সংযোগে—উগ্র
(৩) ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্রী স্ত্রীর সংযোগে—নিষাদ বা পারাশর
(৪) শূদ্র পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রীর সংযোগে—অযোগব
(৫) বৈশ্য পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সংযোগে—মাগধ
(৬) ক্ষত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সংযোগে—সূত
(৭) শূদ্র পুরুষ ও ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সংযোগে—ক্ষত্তা

* আচারাঙ্গ সূত্রের নির্যুক্তি—১৮ হইতে ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত আছে যে এই সময়ে উগ্রকুল, ভোগকুল, রাজন্যকুল ও ক্ষত্রিয়কুল এই চারিটি ক্ষত্রিয় বংশ স্থাপিত হয়। ভদ্রবাহুর বিরচিত "কল্পসূত্র" নামক অন্য একটি গ্রন্থে উপরোক্ত চারি কুল ও ইক্ষ্বাকুকুল ও হরিবংশকুলকে বিশুদ্ধ-জাতি-কুল-বংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কল্পসূত্র—১৭শ সূত্র।

(৮) বৈশ্য পুরুষ ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সংযোগে—বিদেহ

(৯) শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীর সংযোগে—চণ্ডাল

এইরূপে নয় 'বর্ণান্তরের' উৎপত্তি হয়। আবার বর্ণান্তরের মধ্যে পরস্পরের সংযোগে অন্য বর্ণের উৎপত্তি হয়, যথা:—

(১) উগ্র পুরুষ ও ক্ষত্তা স্ত্রীর সংযোগে—শ্বপাক

(২) বিদেহ পুরুষ ও ক্ষত্তা স্ত্রীর সংযোগে—বৈণব

(৩) নিষাদ পুরুষ ও অম্বষ্ঠী বা শূদ্রী স্ত্রীর সংযোগে —বুক্কস

(৪) সূত পুরুষ ও নিষাদী স্ত্রীর সংযোগে—কুক্কুরক।

এইরূপে চারি মূল জাতি, তিন সঙ্কর জাতি, নয় বর্ণান্তর, ও চারি বর্ণান্তরের সঙ্কর জাতি মিলাইয়া মোট ২০ জাতির বিবরণ আমরা পাইতেছি। বোধ হয় ভদ্রবাহুর সময়ে এই কয়টিই প্রধান জাতি ছিল, অন্য জাতি থাকিলে তাহার উল্লেখও থাকিত বলিয়া মনে হয়। মাগধ ও বিদেহ জাতি হইতেই কি মগধ ও বিদেহ দেশের নামকরণ হইয়াছে? আশা করি ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

নানা কথা

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিবার কৌশল জানেন। সাধারণের সহিত পরিচয় ঘটিবার বিষয়ে তাঁহাদের নিজ ইচ্ছা বা চেষ্টা ত থাকেই না, অপরের দ্বারা সে পরিচয় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনার মধ্যেও তাঁহারা নানা প্রকারে ব্যাঘাত উপস্থিত করিতে পারেন। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু সেই শ্রেণীর মানুষ। চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় যে শক্তি তাঁহার আছে এবং যে সাফল্য তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন তদনুপাতে সাধারণের মধ্যে তাঁহার পরিচয় অতি সামান্যই ঘটিয়াছে। কয়েকটি শিল্পী বন্ধু, ছাত্রমণ্ডলী এবং আত্মীয়-স্বজন লইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। অনাত্মীয় এবং অপরিচিতের রাজ্যে প্রবেশ করিবার বিষয়ে তিনি একেবারে অলস।

সম্প্রতি একটি ঘটনায় সাধারণের দৃষ্টিপথে আসিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বকিংহাম প্রাসাদে রাজা ও রাণীর যে তৈলচিত্র আছে দিল্লীর লাট-প্রাসাদের জন্য তাহার একটি প্রতিকৃতি আবশ্যক। বিলাতে গিয়া উক্ত প্রতিকৃতি আঁকিয়া আনিবার জন্য শিল্পী-নির্ব্বাচনার্থে বড়লাট কর্তৃক সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা স্থাপিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় চিত্র-নমুনা পাঠাইয়া অতুল বাবু শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং তদনুযায়ী আগামী এপ্রিল মাসে তিনি বিলাত যাইতেছেন। নিখিল-ভারত প্রতিযোগিতায় যে বাঙালী শিল্পী বিজয়-মালা অধিকার করিয়া বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রা-চিত্রশালায় আমরা অতুল বাবুর অঙ্কিত চিত্রাবলী হইতে কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গীতে অঙ্কিত চিত্রের অনুলিপি প্রকাশিত করিলাম। এগুলি হইতে অতুল বাবুর চিত্রাঙ্কন-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলেও এগুলি মূল বহুবর্ণ চিত্রের একবর্ণ অনুলিপি, সুতরাং ফটো লওয়া, ব্লক করা এবং মুদ্রিত করার প্রণালীর মধ্যে মূল চিত্রের কত সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অনুলিপি-চিত্রগুলি দেখিয়া যাঁহারা মূল চিত্রগুলি দেখিবার জন্য উৎসুক হইবেন তাঁহাদের জন্য অতুল বাবুর চিত্রশালার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে।

রূপ-নাটিকা

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত স্বপ্ন-মায়া নামক রচনাটির রচনা-পদ্ধতির অভিনবত্ব পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। লেখক শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় বহু একাঙ্ক নাটিকা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার রচিত নাটিকাগুলি শিল্প-নৈপুণ্যের গুণে পাঠক-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে;—নাট্য-শিল্পবিদ্যায় তিনি পারদর্শী। 'স্বপ্ন-মায়া'র কলা-কৌশল কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—তাঁহার অন্যান্য নাটিকাগুলির রচনা-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য তিনি তাঁহার এ রচনাটির নামকরণ করিয়াছেন রূপ-নাটিকা,—অর্থাৎ চিররহস্যময়ী রূপ-কথার নবজাত রহস্যময়ী সহোদরা। একই অক্ষয় রহস্য ও মাধুর্য্যের উৎসে উভয়ের জন্ম—কিন্তু গতি ও ছন্দ উভয়ের পৃথক; রূপ-কথার অঙ্গে প্রভাতের বর্ণবৈভব, রূপ-নাটিকার দেহে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মায়া; রূপ-কথার কণ্ঠে ভৈরবীর প্রসারতা, রূপ-নাটিকার কণ্ঠে পূরবীর অতলতা।

ইয়োরোপীয় কথা-সাহিত্যে রূপ-নাটিকার অনুরূপ বস্তু থাকিতে পারে—কিন্তু বাংলার কথা-সাহিত্যে ইহা একেবারে নূতন। আমরা আশা করি নীরদ বাবু এই শ্রেণীর রচনা আরও রচিত করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবেন।

স্যানাটোজেন পঞ্জিকা

গত বৎসরের মত এ বৎসরও আমরা ১৩৩৭ সালের স্যানাটোজেন পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী কর্ত্তৃক পঞ্জিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জিকার গণনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত রামপদ সিদ্ধান্তভূষণ। পঞ্জিকাটি কিছুমাত্র সংক্ষিপ্ত নহে—এবং ছাপা ঝরঝরে, পড়িতে কোথাও কষ্ট হয় না।

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.

বুদ্ধের জন্ম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

বিচিত্রা

তৃতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কর্ম্মের স্থায়িত্ব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহুকাল আগে নদীতীরের সাহিত্যচর্চ্চা থেকে জানিনে কি আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তারপর ত্রিশ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবী আছে ব'লে মনে করিনে; হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাবো না, অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয় কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে? দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেচি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যু-শোক বহন ক'রে দীর্ঘকাল চলেচি—কেন তা ভেবে পাইনে। ভালো ক'রে বল্‌তে পারিনে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্ম্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনা-পাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সঙ্কল্প ছিল বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়—প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারি সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ ক'রে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাইনি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে; শিশু-বয়স থেকে এই আমার সত্য পরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম ব'লে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেচি—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে-ঐশ্বরিক বহুধা শক্তি যোগাচ্ছে রূপ রস গন্ধ বর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান ক'রে তুলচেন তার থেকে ছিন্ন ক'রে ইস্কুলমাষ্টার বেতের ডগায় নীরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে এ রস বহানো চাই, কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির [illegible] থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হ'লো, এইটুকুকে সত্য ক'রে তুলে আমি নিজেকে সত্য ক'রে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে, স্নেহের যোগে বালকদের সেবা ক'রে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম। কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এই ভাবে কাজ আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েচে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহুদূর পর্য্যন্ত এগোলো; আমার সঙ্কল্প আজ একটা রূপ লাভ করেচে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চল্‌তে হয়েচে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেচি আমার সত্য সঙ্কল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চল্‌তে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েচি তাই বলতে পারচি—এ দুর্ব্বলচিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন? উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারি; অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েচে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে, অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবী যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না—এর বদলে পেলুম কি? আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মান্‌তে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্পকে সার্থক করেচি এ কথা কোন কালেই বলা চলবে না, কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েচি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে এ'কে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা গ্রহণ ক'রে যেতে চাই, যতটুকু পেয়েছি তা করেচি, মনে যা পেয়েচি দুর্ব্বল হ'লেও কর্ম্মে তাকে গ্রহণ করা হ'লো। তারপরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কীভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারিনে। লোভ হ'তে পারে আমি যে ভাবে এর প্রবর্ত্তন করেচি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হ'তে থাকবে। কিন্তু সেই অহঙ্কৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণবেগে ভাবীকালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা আজ কে তা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিতে পারে? এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে এমন কখনো হ'তেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারি জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক্। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে-রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না ব'লেই ধ'রে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ', নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ ক'রো না। যা কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় ব'লে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা ক'রে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্ত্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্ম্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস ক'রে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক, আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে, আদর্শের গম্ভীরতা যেন নিরন্তর সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলোচনার অনুলিখন।

মায়াপুরে ক্ষর

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ

উর্ণনাভ যেমন চারিদিকে জাল ছড়াইয়া ইহার অবগুণ্ঠনে নিবিড়ে বাস করে, ক্ষর-জীবও তেমনি আপনার কর্ম্মজাল চৌদিক বেড়িয়া ইহারই মধ্যে বদ্ধভাবে জীবনের দিন কাটাইতে থাকে। এ কর্ম্মের জাল এড়ানো দুষ্কর। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত কর্ম্মরাশি ভিতরে এমনি জমাটবাঁধা থাকে যে ইহাদের হৃদয়াকাশ-ঘেরা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙাইয়া অন্য কিছু দেখিবার বা জানিবার শক্তি সহসা জাগে না। বুদ্ধদেব ইহাকে 'ভার-বাহী' নামক সংযুক্ত-নিকায়ের একটি ভাষণে অতি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। মানুষ বোঝা বহিয়া চলিয়াছে। জন্মে জন্মে সে বোঝা কাঁধে চাপাইতেছে—বোঝা ফেলিতে চায় না, কামনার ঝোঁকে সে বোঝা আঁকড়াইতেছে। মৃত্যু যদিচ তাহার বোঝা ফেলিয়া দিতেছে, তাহার বোঝার প্রতি মমতা কমিতে কি চায়? বোঝা বহিবার সাধ সে আজীবন পুষিয়াছে, তাহা ত যাইবার নয়। মৃত্যুর সঙ্গে যদিবা তাহার পুরানো বোঝা খসিয়া গিয়া থাকে, আবার নূতন জন্মের লগ্নে নূতন দেখিয়া আর একটি বোঝা আঁটিয়া দেওয়া গেল—ইহাই বহিয়া সে চলিল। সে বোঝা যদি হীরা-জহরতের হইয়া থাকে তথাপি বাহার তৃষ্ণা মিটিতেছে না, আর যদি ছেঁড়া পুঁটুলি হইয়া থাকে তবে হীরা-জহরতের এক টুক্‌রার জন্যে মনে অফুরন্ত সাধ জাগিতেছে—এ তৃষ্ণারও নিবৃত্তি নাই, জীবনে জীবনে নব নব বোঝারও অবধি নাই। মূল কথা, মানুষ আপনার খেলা আপনি খেলিতেছে। নাট্যকার যদি নাটক লিখিয়া স্বয়ং অভিনয় করিতে বসে এবং ইহার অবসানে পুনরায় আর একখানি রচনা করে ও পূর্ব্ববৎ পার্ট প্লে করে, এই ভাবে লেখা ও তাহার অভিনয়-লীলায় আপনাকে রূপরূপান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে করিতে তাহার জীবন চলিতে থাকে—এ যেমন, বুদ্ধদেব যে বোঝার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন সেও তেমনি। তাই বলিতে হয় মানুষ তাহার স্বরচিত কর্ম্ম-নাট্যটিকে জন্মে জন্মে অভিনয় করিয়া আসিতেছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-সংন্যাসযোগে এই বোঝারূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করিতেছেন। কর্ম্ম ত্যাগ করা মুখের কথা নহে—ইহার শিকড় যে কতদূর অবধি ভিতরে মেলিয়াছে তাহা বুঝা সহসা যায় না। যে সব অহৈতুক অভ্যাস আমাদের জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরে তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যেমন-তেমন চেষ্টার ফল নহে। যে-কোন অভ্যাস একবার আমাদের গায়ে বসিয়া গেলে সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিতে বেশ একটু চেষ্টার দরকার। যাহার চিকণ-কাপড় পরা একবার রেওয়াজ হইয়াছে তাহার পক্ষে খদ্দর যে কি সমস্যার বিষয় ইহা ভুক্তভোগীই জানে! যে পাণের সঙ্গে জর্দা মিশাইয়া খায়, জর্দা ছাড়া পাণ তাহার কাছে একেবারে নুনছাড়া ব্যঞ্জনের মত ঠেকিবে। সামান্য একটু অভ্যাসের আসক্তি এত বড়! এখন সহজেই অনুমান করা যায়, বড় বড় বদ্ অভ্যাসের ফলে যে সব বড় বড় কুক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেগুলি যদি আমাদের ভিতরে জন্মে জন্মে সঞ্চিত থাকে তবে উহাদের প্রভাব মানব-চরিত্রকে কতটা বিগ্‌ড়াইয়া দিতে পারে। মানুষের দেহ প্রত্যুত কর্ম্মেরই গৃহ। কর্ম্মময় গৃহে মানুষকে বাস করিতে হয়। গৃহের আকার-প্রকার গৃহীর মনে একটা ছাপ প্রবেশ-মাত্রই লেপিয়া দেয়। আমার পর্ণকুটীরে আমার মন এক সুরে বাঁধা—যদি আমি গাইকোয়ারের লক্ষ্মীবিলাস-সৌধে ঢুকি তবে সে মনে গাইকোয়ারের ঐশ্বর্য্য-বুলসান রাজরূপটি অলক্ষ্যে ফুটিয়া উঠে; আবার সেই-আমি যখন আগ্রার 'সুমাম বুর্জ' কক্ষে ঢুকিয়া তাজমহালের দিকে তাকাই তখনি আমার মনে সাহজাহানের বাদ্‌সাহী ঠাটঠমক ভাসিয়া উঠে।—গৃহের রূপ মনের উপর ফলিবেই ফলিবে, হউক না কেন সে ক্ষণিকের। সেই এক নিয়মেই আমাদের দেহ-গেহে আমরা বাস করিতেছি। দেহ কিন্তু আমাদের

আসল গৃহ নহে, ইহা যেন একটি বহির্বাটি। আসল গৃহই হইতেছে প্রকৃতি—উহাই আমাদের অন্তঃপুর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে 'দেহ' শব্দেই অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকৃতি যে উপাদানে-প্রস্তুত, সেই রূপটি যে আমার মনে ছাপ খাইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? লক্ষ্মীবিলাস-সৌধ যেমন গাইকোয়ারের একটি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ, 'মুমাম বুর্জ্জ'ও তেমনি সাহজাহানের একটি বাদসাহী প্রতীক, এ-কথা যদি সত্য হয় তবে প্রকৃতিও তেমনি মনসিজের একটি গোপন প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ। কামের স্ফুরণে কেমন করিয়া দিব্য-ইন্দ্রিয়ের পতন ও সঙ্গে সঙ্গে কামের উপাদানে প্রকৃতির অভ্যুদয় ইহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাইয়াছি। প্রকৃতি যে প্রত্যুত কর্ম্মেরই রূপান্তর উহা 'কৃ' ধাতুর মধ্যেই রহিয়াছে। ক্তি প্রত্যয় যোগে কৃ ধাতুর বিশেষ্য পদ হয় কৃতি। প্রকৃষ্টরূপে কৃতি বা কর্ম্ম কৃত বলিয়া ইহা প্রকৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমরা যে গৃহের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি তাহা যথার্থতঃ আমাদেরই কর্ম্মগৃহ; ঊর্ণনাভ যেমন তাহার আপন জালে বাস করে, গুটিপোকা যেমন তাহার স্বরচিত কোষের কোষে আবাস রচনা করে, আমরাও তেমনি আমাদেরি স্বরচিত কর্ম্মের মধ্যে জন্মে জন্মে বাস করিতেছি। আমাদেরি কর্ম্মের সমষ্টি দিয়া এক কর্ম্মগৃহ বিরচন করিয়াছি,—বড়লোকের ইমারতের পেছনে যেমন প্রায় সর্ব্বদাই খুঁটিনাটি লইয়া রাজমিস্ত্রি কায করিতেছে আমাদের কর্ম্ম-সৌধেরও অবয়ব আমরা জন্মে জন্মে পুষ্ট রাখিতেছি। প্রকৃতিই আমাদের কর্ম্মগৃহ। কামনা-আসক্তি ঢালিয়া আমরা যে কর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি তাহার পূর্ণ সঞ্চয়ের মধ্যে আমাদের অতীত জীবনসমূহের লালসাময় আকৃতিটিও সঞ্চিত হইয়া আছে ইহা বলাই বাহুল্য—সেই শতজনমের আকৃতিটি কর্ম্ম-গৃহেরই অন্তর্বর্ত্তী রূপ। লক্ষ্মীবিলাস যেমন গাইকোয়ারের, 'মুম্মাম বুর্জ্জ' যেমন বাদসাহ সাহজাহানের, কর্ম্মগৃহ প্রকৃতিও তেমনি লালসাপুরুষের একটি রূপ। এই লালসাপুরুষ ভিতরে থাকিয়া গৃহী জীবকে কতদূর হাতে করিয়া রাখিয়াছে তাহা 'অন্তরে অহমাকারে' স্ফুট হইয়াছে। গৃহের প্রভাব গৃহী এড়াইবে কি করিয়া? তাই সাংখ্যে স্পষ্ট দেখান হইয়াছে মনের উপর ইহার প্রভাব ছাইয়া গিয়া মনকে ইহারই কানমন্ত্রণা দিয়া একেবারে পৃথক 'আমি' বানাইয়া দিয়াছে। এ আমিত্ব ত ঐ লালসাপুরুষের সহিতই অভিন্নত্ব: দেহীর এ গৃহে বাস না করিয়া উপায় কি? স্বরচিত কর্ম্মগৃহে তাহাকে বাস করিতেই হইবে এবং গৃহের প্রভাবও তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেই রাখিবে। এ গৃহে বাসকালে তাহার মনে হইবে—আমি আছি, আমার সমাপ্তি ঠিক আমাতেই, ইহার বাহিরে আমার কিছু নাই কেহ নাই—সকলি আমি। এখন 'আমি' শব্দটা কোন্ কোন্ বিষয় জড়াইয়া দাঁড়াইবে? সাংখ্য দর্শন ইহাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া দেখাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব হইয়া তাহার আমিত্ব প্রখ্যাপিত হইবে, সুতরাং এ আমির প্রাণমাতান জিনিসই হইবে লালসা। যে-কথাটা গোড়ায় বলিতেছিলাম সেই কথাটাই এতক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইল—গৃহের ছাপ গৃহীর মনে লাগিবেই লাগিবে। এ যদি সত্য হয় তবে গীতার কর্ম্মত্যাগ এবং বুদ্ধদেবের প্রস্তাবিত 'বোঝা'-ত্যাগ যে কতদূর কঠিন ব্যাপার ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। কারণ কর্ম্মের শিকড় যে কতদূর অবধি যাইয়া ঠেকিয়াছে তাহা আমরা এতক্ষণে ধারণা করিতে পারিতেছি। শিকড় যে কোথাও থামিয়াছে এমন নয়, কাপড়ের বুনন যেমন warp and woof হইয়া সমস্তটির মধ্যে মিলাইয়া যায়, এ শিকড়ও তেমনি এক মায়াপুরী সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। এ-মায়াপুরীই সেই পূর্ব্বকথিত কর্ম্মগৃহ প্রকৃতি। কর্ম্মের মধ্যে বাস করিয়া কর্ম্মত্যাগ করা ঠিক তেমন, জলের মধ্যে সাঁতার কাটিতে কাটিতে যেমন বিন্দুমাত্রও জলপান না করা। দুঃসাধ্য বটে কিন্তু অসাধ্য নহে। জীবমুক্ত পুরুষদিগের পানে তাকাইলেই ইহার সাধ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। সম্+নি+অস্ ধাতুই সন্ন্যাস শব্দের মূল—কর্ম্মের সম্যক পরিহার ইহার প্রাণের কথা।

কর্ম্মের ত্রিধারা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। সঞ্চিত কর্ম্ম,—ইহা দ্বারাই সেই মায়াপুরী সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার একটি কণাকে পৃথক করিয়া তাহার উপর জীবের জীবন-দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাষ্ঠখণ্ড যতক্ষণ দাহ্য হইবার মত

থাকে ততক্ষণই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইহাকে আশ্রয় করিতে পারে; তেমনি যতক্ষণ পৃথক্‌কৃত কর্ম্মের ভোগান্ত আছে ততক্ষণ জীব বাঁচিয়া থাকে। ইহাই প্রাক্তন বা প্রারব্ধ কর্ম্ম। গৃহের একটুক্‌রা উপাদান খসাইয়া ইহাতে অগ্নি-সংযোগ যেমন, কর্ম্মগৃহেরও তেমনি এককণা কর্ম্ম খসাইয়া উহাতে জীবনদীপ জ্বালিয়া দেওয়া একই কথা। গৃহের যে টুকরাটি দগ্ধ করা হইল সেই ফাঁকা স্থানটি নূতন করিয়া মেরামত করিলেই গৃহের পূর্ণতার অভাব ঘটিল না। তেমনি কর্ম্মগৃহের এককণা খসিয়া আসিল বটে কিন্তু জীব নূতন কর্ম্মদ্বারা সেই শূন্য স্থানটিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং কর্ম্মগৃহের অঙ্গহানিত্ব ঘটিতেছে না। এ কর্ম্মের নাম ক্রিয়মান কর্ম্ম, অর্থাৎ যে কর্ম্ম জীবের বর্ত্তমান জীবনে কৃত হয়। এইরূপে কর্ম্মগৃহরূপা প্রকৃতির ক্ষীণতা সাধিত হইতে পারে না। প্রকৃতি একেবারে কর্ম্মের হাট হইয়া বসিয়া আছে, তাহার বিপণি হইতে জন্মে জন্মে মানুষ একটু কর্ম্ম ধার করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং জন্মাইয়াই নূতন কর্ম্মের উপচয় দ্বারা সে ঋণশোধ করিতেছে। প্রকৃতি আপন মূলধন ছড়াইয়া বিশ্বসংসারে সৃষ্টির হাট বসাইয়াছে—সাধ্য কি তাহার ঋণ ফাঁকি দেয়! সুদে আসলে সে ঋণের উসল-আদায় ঘটিতেছে। সাধারণ মহাজন দেনদারের মৃত্যুতে অনেক সময় আসলেও বঞ্চিত হয়, কিন্তু প্রকৃতির মহাজনীকে মৃত্যুও ফাঁকি দিতে পারে না কারণ মৃত্যুতে জীবের রেহাই নাই, আবার আসিতে হইবে, প্রকৃতির কাছে খৎ রহিয়াছে যে! যেদিন প্রকৃতির মহাজনী বন্ধ হইবে সেদিন বিধাতার সৃষ্টি কুয়াশার ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এ কখনো যুগপৎ হইবার নয়—সার্থকতপা একজনের পক্ষে যদি প্রকৃতির দোকানদারী ফেইল হইয়া যায়, অপর কোটি কোটির জন্য প্রকৃতির মহাজনী-ঠাট বজায় থাকিবে।

কর্ম্মের যে-ধারা উপরে লক্ষ্য করা গেল ইহাকে না এড়াইতে পারিলে জীবের জীবত্ব ঘুচিবে না। কর্ম্মগৃহের লালসা-পুকুরের ইঙ্গিতে চলিলে কর্ম্মের অফুরন্ত পথ কখনও ফুরাইবে না। নদীর দৈর্ঘ্যে সাঁতার কাটিলে যেমন কূলের নাগাল পাওয়া ঘটে না, বরং সমুদ্রে যাইবার পথ পরিষ্কার হয় প্রকৃতির ত্রিগুণ-নদীতে জীবনতরণী ভাসাইলে তেমনি অকূল কর্ম্মসাগরেই জীবন ভাসিয়া চলে, পারের খবর চির-অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। কর্ম্মবিরচিত এই মায়া-পুরে যদিচ ক্ষর-জীব অগণিত কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে, ইহার আসল তথ্য সহসা তাহার নিকট ভাসে না। প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সংখ্যাতীত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মগুলি ধানের গোলায় ধান যেমন জমা থাকে তেমনি জমিয়া আছে। সুতার সহিত বস্ত্রের যেরূপ অভিন্নাত্মক সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত সঞ্চিত কর্ম্মেরও সেই একাত্মক সম্বন্ধ। কাপড়ের সুতা পুড়াইয়া ফেলা যে কথা, তৎসঙ্গেসঙ্গে কাপড়টিকেও পুড়াইয়া ফেলা একই কথা। ঠিক্ তেমনি কর্ম্মের দুর্নিবার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি যখন সূত্র করিলেন,

হেয়ম্ দুঃখমনাগতম্।

তখন মহর্ষি সঞ্চিত কর্ম্মের আত্যন্তিক উচ্ছেদ চাহিয়া প্রকৃতির উচ্ছেদের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন। কর্ম্মগৃহে বাস করিয়া মানুষের ভাগ্যে যে দুঃখভোগ ঘটিয়াছে তাহা ত চুকিয়াই গিয়াছে; যাহা ভবিষ্যতের জন্য তাহার ভাগ্যে এ জন্মের মত লেখা রহিয়াছে তাহা অমোঘ কারণ তাহা প্রাক্তন—ইহা তাহার উপর ফলিবেই ফলিবে। তবে মানুষের কি কর্ত্তব্য? মানুষের জন্য যে রাশি রাশি সঞ্চিত কর্ম্ম তাহার অনাগত জীবনের দিকে মুখ করিয়া আছে, যাহাদের ফল তাহার উপর এখন বর্ত্তিবে না পরন্তু পুনর্জন্মে তাহাকে আক্রমণ করিবে সেই কর্ম্মরাশি দগ্ধ করিয়া ফেলাই তাহার এ জীবনের সর্ব্বোত্তম পুরুষকার। কাপড়টিকে পুড়াইয়া ফেলিলে যেমন সুতাগুলির পোড়ানও সম্পন্ন হইল তেমনি মহর্ষি পতঞ্জলি সঞ্চিত কর্ম্মত্যাগ করিতে যাইয়া একেবারে কর্ম্মপট প্রকৃতিটিকেই পরিহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ॥ সাধনপাদ—১৭।

দৃশ্য শব্দে প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে। ইহার সহিত পুরুষের সংযোগ হইতেই যত দুঃখের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। ইহার সম্যক পরিহার না ঘটা পর্য্যন্ত দ্রষ্টাপুরুষের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইবে না। সুতরাং দুঃখের যেখানে সংযোগ সেখানে ইহাকে উচ্ছেদ করিয়া বিয়োগসাধন করিতে হইবে। সোজা কথা, আমার দৃষ্টিকে যদি কিছু আবৃত করিয়া থাকে

তাহাকে দূর করা না পর্য্যন্ত আমি যেমন পরিষ্কার দেখিতে পারি না, এক্ষেত্রেও তেমনি যে-আবরণ দ্রষ্টাপুরুষকে আবৃত করিয়া আছে সেইটিকে যতক্ষণ না অপসারণ করা যায় ততক্ষণ দ্রষ্টাপুরুষকে জীব দেখিতে পাইবে না। দৃশ্যের যে Screen অক্ষর আত্মন্ এবং ক্ষর-জীবের মধ্যে আড়াল রচিয়া দিয়াছে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।১৩.১৭।

প্রকৃতির কৃষ্ণপটটিকে 'তমস্' শব্দ দ্বারা define করা হইয়াছে, তমসার অতীত হইয়া অক্ষর দেদীপ্যমান। কৃষ্ণ-প্রকৃতির অতীত হইয়া তিনি কি বহুদূরে আছেন?—নহে নহে,

হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।

হৃদয়ে তিনি নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখন পূর্ব্বোক্ত তমস্ শব্দটিকে আরও ভাঙিয়া বলিতেছেন,

'ইতি ক্ষেত্রং', পাঠান্তরে 'এতৎ ক্ষেত্রং।'

'ক্ষেত্র শব্দের ব্যাপকতায় একদিকে যেমন প্রকৃতিও বুঝায় অপরদিকে প্রকৃতির প্রভাবে মালিন্যগ্রস্ত জীবকেও বুঝায়। এখানে অবশ্য প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে এবং ক্ষেত্রের প্রধান অর্থও দৃশ্য বা প্রকৃতি। প্রকৃতির তমোরূপের উল্লেখ প্রচুর রহিয়াছে, পরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। কর্ম্মের সহিত অপৃথগ্‌ভূতা প্রকৃতির সংস্থানকে আমরা দেখাইয়াছি—ইহা অক্ষর আত্মন ও ক্ষর-জীবের মধ্যবর্ত্তী। এতৎ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের 'বিকারবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ' সূত্রের গোবিন্দভাষ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,

ইয়মাবৃত্তির্মেঘমালেব জীবদৃষ্টিগতৈব বোধ্যা ন তু ব্রহ্মগতা।

মেঘ যেমন সূর্য্যকে আমাদের নয়নের আড়াল করিয়া দেয়, এই প্রকৃতিও তেমনি অক্ষরকে জীবদৃষ্টির আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে একটু বিচারসহ বিষয়টিকে অনুধাবন করিতে হইবে। উপমাটি সর্ব্বথা সুপ্রযুক্ত, কারণ মেঘ যেমন সত্য সত্য সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না তদ্রূপ প্রকৃতিও ঠিক ঠিক্ অক্ষর-পুরুষকে ঢাকিতে পারে না। তবে কি? মেঘ প্রভৃতি সূর্য্যনিরীক্ষণকারীর দৃষ্টিকে বাধা দিয়া থাকে যেন সে ব্যক্তি সূর্য্যকে দেখিতে না পায়, এমনি ভাবে প্রকৃতিও জীবদৃষ্টি যাহাতে অক্ষর আত্মনকে না দেখিতে পারে তাহার বাধা জন্মায়, জীবের দৃষ্টিকে চাপিয়া রাখে। এই চাপ্ খাইয়া জীব তাহার কর্ম্ম-গৃহে আটক থাকিয়া যায়, আপনারি স্বরচিত কর্ম্মের মায়াপুরে গুটিপোকার ন্যায় বদ্ধ হইয়া নূতন কর্ম্মের জাল বুনিতে থাকে। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্যক উচ্ছেদ আদেশ করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনেও সেই একই উচ্ছেদ উপদেশ। সাংখ্যের বিস্তৃত প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে যোগসূত্র এই কয়েকটি সূত্রের মধ্যেই অপরূপ স্ফটিকস্বচ্ছতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ।২১।

জীবের ভোগ ও মুক্তির চেষ্টাই হইল দৃশ্য বা প্রকৃতির আত্মা। প্রকৃতির শক্তি—পুরুষ হইতেই আহৃত। যখন কঠোর তপশ্চরণে সঞ্চিত কর্ম্মের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়া যায় তখন

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।

যাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হয় সেই সার্থকতপার পক্ষে প্রকৃতি বা দৃশ্য নষ্ট হইলেও সকলের পক্ষে তাহার ফল সমান নহে, অর্থাৎ তাই বলিয়া ইহা সকলের মধ্য হইতে উঠিয়া যায় না। সিদ্ধতপার ভিতরে যে-প্রকৃতি মেঘমালার ন্যায় থাকিয়া তাঁহার জীবচক্ষুকে ঢাকিয়াছিল উহার সম্যক অপনোদনে অক্ষর আত্মনকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এইরূপে দৃশ্য যদিচ তাঁহার অন্তরাকাশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়া 'সংযোগকে' বিয়োগে পরিণত করিল কিন্তু ইহা ত অপরাপর জীবের পক্ষে এক কথা নহে। একের ফল অন্যে কেন বর্ত্তিবে?—একজন লেখাপড়া করিয়া কৃতবিদ্য হইলে সে বিদ্যার অংশীদার আর সকলে কেন হইবে? একজন বিদ্বান হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গে যেমন তাঁহার দেশশুদ্ধ লোক বিদ্বান হয় না, তদ্রূপ একজন বহু সাধনায় তপস্যার হোমানল জ্বালিয়া যদি তাহার সঞ্চিত কর্ম্মরূপা মায়াপুরীটিকে দগ্ধ করিয়া ফেলে তবে অপর-সকলের কর্ম্মরাশি বিনা চেষ্টায় কেন নষ্ট হইবে? তাই প্রকৃতি অপরাপরের মধ্যে 'অনষ্ট' ভাবেই চলিতে থাকে। সৃষ্টিতে অতি কম সংখ্যকই দৃশ্য হইতে বিযুক্ত হইতে পারেন, তাই প্রকৃতির আদি যেরূপ অপরিজ্ঞাত ইহার অন্তও তেমনি 'অনন্ত'। পতঞ্জলির এই সূত্রটির স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই বেদান্তদর্শনের "অস্মিনস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি" সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে।

তত্র প্রকৃতিবিযুক্তস্ত অভয়মভ্যুপগম্যতে ন তু তৎসংসৃষ্টস্ত।

এখানেও সেই সংযোগ-বিয়োগসাধন। দ্রষ্টাদৃশ্যের সংযোগ যদি বিয়োগে পর্য্যবসিত হয় তবেই চরম সাফল্য ঘটিল। যে তপস্বী প্রকৃতিকে উচ্ছেদ করিয়া ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাঁহারই অভয়-অক্ষর-প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু যাহার অন্তরে প্রকৃতি বিরাজিতা তাহার প্রকৃতিতে সংযুক্ত থাকার দরুন অভয়-প্রাপ্তি ঘটে না। কেন অভয়-প্রাপ্তি ঘটে না ইহার কারণ খুব সুস্পষ্ট

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি কর্ম্মফলে ন মে স্পৃহা।

যাঁহার সহিত কোন কর্ম্মের সংযোগ নাই, যিনি কর্ম্মের ভিতরে শয়ান নহেন, যিনি কর্ম্মের মায়াপুরীতে স্বরচিত কর্ম্মরাশির মধ্যে জীবরূপে বাঁধা পড়েন নাই সেই অভয়-অক্ষরকে কর্ম্মরাহুগ্রস্ত জীব ততক্ষণ কেমন করিয়া পাইবে যতক্ষণ না তাহার কর্ম্মময় যতুগৃহটি একেবারে দগ্ধ হইয়াছে? সুতরাং কর্ম্মরূপা প্রকৃতির সম্যক্ উচ্ছেদ প্রয়োজন। বেদান্তে কর্ম্মত্যাগের জন্তে "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি" (৪. ১. ৩) বলিয়া অক্ষর আত্মনের 'দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো' সাধন যে ভাবে উপস্থাপিত করান হইয়াছে তাহা দ্বারা যে পর্য্যন্ত মনআদি ইন্দ্রিয় হইতেও শ্রেয়ঃ ব্রহ্মসন্দর্শন না হইয়াছে সে পর্য্যন্ত তপস্তার চরম ফুল ফুটিল না বুঝিতে হইবে। 'ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ'। সেই অক্ষর ব্রহ্মকে সহসা বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় একবার দেখিলে চলিবে না, মৃত্যুপর্য্যন্ত সে দেখাকে পাকাপাকি রাখিতে হইবে। অপ্রয়াণাৎ তত্রাপিহি দৃষ্টম্।' যখনি সেই দ্রষ্টা বা অক্ষর আত্মন্ সাধকের নিকট সম্যক দর্শনযোগ্য হইলেন তখনি

তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।

৪. ১. ১৩.

সাধকের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। পতঞ্জলির 'কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি' দ্বারা যে দৃশ্যের বিনাশের কথা পাওয়া যায় এখানে সেই দৃশ্যেরই প্রতিশব্দবোধক পূর্ব্বাঘের 'বিনাশ' পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং দেখা গেল 'হেয়ম্ দুঃখমনাগতম্' বলিয়া যে সঞ্চিত কর্ম্মের প্রদর্শনার্থ মহর্ষি পতঞ্জলি 'দৃশ্যকে' আনিয়া উহার সমূল উচ্ছেদে এতদুভয়ের অভিন্নাত্মকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, বেদান্তের এই সূত্রে আবার সঞ্চিত কর্ম্মকেই 'দৃশ্যের' স্থায় ব্রহ্মদর্শনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া ব্যাসদেব ইহার উপরও পতঞ্জলি-প্রযুক্ত সেই এক নশ্ ধাতুটিরই প্রয়োগ করিয়াছেন। বেদান্তের এই সূত্রটিকে পরিষ্কার বুঝিতে হইলে উপনিষদের মন্ত্রটিকে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মুণ্ডক—৩. ৪৭.

অক্ষর আত্মনকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্যপাপকর্ম্মরাশি পরিহার করিয়া সাধক নিরঞ্জন হয়েন। নিরঞ্জন বাক্যটি দ্বারা কর্ম্মরাশি যে অঞ্জন-বিশেষ তাহাই প্রমাণিত হয়। অঞ্জন অর্থে কালিমা বুঝায়; মায়ী অক্ষরে কর্ম্মোদ্ভূত কালিমার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। নিরঞ্জন শব্দদ্বারা মালিন্যশূন্যতা বুঝায়। সেই অবস্থাকে পরমং সাম্যং বলিয়া মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে এইরূপ লিখিতেছেন,

সাম্যং সমতামদ্বয়লক্ষণং।

দুই হইলেই দ্বৈত, আর এক হইলেই অদ্বৈত। যোগসূত্রে পূর্ব্বেই দেখিয়াছি দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য মিলিয়া দুই হইল অর্থাৎ সাম্যকে অসাম্য করিল, তাই ইহার উচ্ছেদ প্রয়োজন। আর এখানে—পুরুষের সহিত সংযোগ ঘটিল অঞ্জনরূপ কর্ম্মের এবং ইহার অপগমে সাধক পুরুষের সহিত 'সোঽহম' হইয়া সাম্য লাভ করিল। এইরূপে দৃশ্য (বা প্রকৃতি) এবং কর্ম্মরাশি যে অভিন্নার্থক তাহাই প্রতিপাদিত হয়। আর এক কথা। নিরঞ্জন শব্দে প্রত্যুত 'তমসঃ পরস্তাৎ'ই বুঝায়। গীতার 'জ্যোতিষাময়স্য পরম উচ্যতে' প্রয়োগ দ্বারা যে প্রকৃতির colour-definition হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তমসঃ যেমন প্রকৃতির রূপব্যঞ্জক, 'অঞ্জন' শব্দটিও তেমনি কর্ম্মের রূপবিজ্ঞাপক—বর্ণসমন্বয় হইতেও উভয়ে যে একার্থবোধক তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

অক্ষর আত্মনকে উপেক্ষা করিয়া দেহের সহিত অসংযত সম্বন্ধের ফলে কিরূপে প্রথম কর্ম্ম কৃত হইল এবং প্রকৃতিও কিরূপে উদ্ভূতা হইল, ইহা আমরা ক্ষরের পঞ্চপানপাত্রে পাইয়াছি। আমাদের কর্ম্মই যে আমাদিগকে জীবত্বের মধ্যে

বাঁধিয়া রাখিয়াছে ইহা ত নিঃসন্দেহ। ‘কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ’ (সংখ্যদর্শন—৩. ৬৭.)—কর্ম্মেরস হিত যুক্ত হইয়াই জীব সংসারপথে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে। কর্ম্ম জীবকে কি ভাবে আপন জালে জড়াইয়া ফেলিতেছে ইহা নীন্নমনে উদ্ধৃত বাক্যটিকে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে—

ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান স্বস্য বন্ধনাগারং নির্ম্মিমাণঃ কোষের কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ। ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃ সন্ অত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ।

গুটিপোকা যেমন আপনার অঙ্গনিঃসৃত প্রত্যেকটি সূত্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিজেরে বন্ধনাগার নির্ম্মাণ করিতে থাকে তদ্রূপ জীবও প্রত্যেকটি ক্রিয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কর্ম্মগৃহটিকে প্রস্তুত করিয়াছে এবং সেই গৃহেই জন্মজন্মান্তরে জীব বাস করিতেছে। কোষের বাসের ন্যায় এই কর্ম্মগৃহই প্রকৃতি বা মায়া। তাই প্রবন্ধারম্ভে আমরা বলিয়াছি যে মানুষ তাহার স্বরচিত কর্ম্মের মধ্যে বাস করিতেছে। জীবাত্মা স্বচ্ছ হইয়াও অতি অনচ্ছ এই শরীরে কর্ম্মের শক্তিতে বন্দী হইয়া আছে। তাহার বন্ধনদশা কিরূপে ঘুচিবে, তাহার স্বরাজ-লাভের কি উপায়? এই প্রশ্নটিকে মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রথম সূত্রেই সমাধান করিয়াছেন—

ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

পাতঞ্জল দর্শনের হেয়ম্ দুঃখমনাগতম্, ইহারই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। অত্যন্ত পুরুষকার অবলম্বনে কর্ম্মের সঞ্চিত ভাণ্ডার পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়—

অতি বলিষ্ঠা খলু বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি নিরবশেষাণি দহতি
প্রদীপ্ত বহ্নিরিব।

ছান্দোগ্যের একটি মন্ত্রে কিরূপ কবিত্বসুলভ উপমা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের ভস্মীকরণ দেখান হইয়াছে। তুলাযুক্ত কোন কোন তৃণ আমরা দেখিতে পাই, সেই তুলাকে আগুনে পুড়াইয়া ছারখার করা যেরূপ সম্ভব, ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারাও তপস্বী সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্মকে একেবারে ভস্মসাৎ করেন—

তদ্যথৈষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য
সর্ব্বেপাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

ইহার উপর শঙ্করাচার্য্য আপনি ভাষ্য বিরচন করিতেছেন—

“.........বর্ত্তমান-শরীরারম্ভক পাপ্মবর্জ্জম্; লক্ষ্যং প্রতি-মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ তস্য ন দাহঃ।” ভাষ্যকার এইখানে প্রাক্তনকে বাদ দিতেছেন। যে পাপ দ্বারা বর্ত্তমান জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়াছে তাহা যেন নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায়। উহাকে দগ্ধ করিবার ক্ষমতা সাধকের হাতে নাই। যদি প্রাক্তনও দগ্ধ করা যাইত তবে সিদ্ধতপার আত্মলাভ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটিত, কারণ কোন্ কর্ম্ম আর তাহাকে জীবিত রাখিবে? তাই বৈদান্তের সূত্র এইরূপ:—

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ। ৪.২.৮।

পুরুষকার দ্বারা কর্ম্মগৃহ-প্রকৃতির উচ্ছেদসাধন হইলেই তপস্বীর চরম তপস্যা হইল। কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত উপাদান ভস্মীভূত হইল—সাধক জীবন্মুক্ত হইলেন। সাংখ্য-দর্শন প্রথম সূত্রে পুরুষকারের যে দীপক গাহিয়াছেন, শেষ সূত্রে তাহারই জয়জয়ন্তী গাহিয়া দর্শনটিকে আদ্যন্ত একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়াছেন। পুরুষকার প্রয়োগ করিতেছেন কিসের উপর? ‘মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ।’ এই অন্তরায়টি যে কর্ম্মরূপা প্রকৃতি সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ? তাই ৬.৬৭ সূত্রে “কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদির্ব্বী-জাঙ্কুরবৎ” বলিয়া মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকেই যত অনর্থের মূল ধরিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষ সূত্রে “যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ”—ইহার উচ্ছেদসাধনকেই পুরুষার্থের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া আদেশ করিয়া মহর্ষির বীণা থামিয়া গেল। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উচ্ছেদসাধনের কথাই কহিতেছেন—‘ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।’ আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিতেছেন,

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ ভূতানাম্ প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাঽব্যক্তাখ্যা। তস্যা ভূতপ্রকৃতের্ম্মোক্ষণং অভাবগমনং চ যে বিদুঃ.........।

এইরূপে আমরা মহর্ষি পতঞ্জলির “দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ” সূত্রটির পুনরালোচনা পাইলাম। শঙ্করের তৃতীয়-লোচনের বহ্নিতে যেমন ত্রিপুর ধ্বংস হইয়াছিল, পুরুষকারের প্রদীপ্ত বহ্নিতে তেমনি মায়াপুর ধ্বংস করিতেও আমরা আদিষ্ট হইতেছি।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অজগর

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

বোর্ডিংএর একটি বন্ধ দরজার বাহিরে তিনজন ছাত্রের মহা-কলরব সুরু হইয়াছে। একজন দরজার কড়া সশব্দে নাড়িয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—প্রসাদ, এই প্রসাদ, দরজা খোল্ না! অপর দুইজন একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আবার কড়া নড়িয়া উঠিল;—প্রসাদ, এই প্রসাদ,—নাঃ, জ্বালালে দেখ্‌ছি! যাহারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে বলিল, 'রোজ রোজ এমনি, আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! দাঁড়াও দেখ্‌ছি!' তারপর তিনজনে মিলিয়া সবলে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। দু'পাটি দরজার মধ্য হইতে একখানি মাথা বাহির হইল। মাথা বাহির হওয়ার পরই শব্দ হইল, 'অর্ডার প্লীজ!' তাহার পরেই মাথা অদৃশ্য হইল। সে শব্দ মিলাইতে না মিলাইতেই দালানের দুই দিকের পার্টিশন দেওয়া ঘরগুলি হইতে 'অর্ডার প্লীজ' 'অর্ডার প্লীজ' শব্দ উঠিতে লাগিল। বন্ধ ঘরের দরজায় তখনো ধাক্কা চলিতেছে।

ভিতর হইতে কোনো সাড়া নাই। প্রথমে যে কড়া নাড়িয়াছিল, সে বলিল,—'রামহরি, তুই এখানে দাঁড়া; আর কিঙ্কর, তুমি রামহরির পিছনে গিয়ে ওকে ধরো—বেশ ক'রে জাপটে ধ'রো—দেখো।' তারপর সে রামহরির দিকে চাহিয়া বলিল—'আরে গাড়োল, দাঁড়িয়ে রইলি যে, বোস্ বোস্—নইলে আমি উঠব কি ক'রে?' রামহরি বসিল। কিঙ্কর বলিল, 'শশধর, আমি কি করব?'

—আমি কি করব—সব সমান! তুমিও বসো, ব'সে রামহরিকে ধ'রে থাকো। তারপর শশধর রামহরির ঘাড়ের উপর পা' দিয়া পার্টিশনের উপর যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি রামহরি 'উঃ' বলিয়া একটু সরিয়া আসিল। আর বিপুলকায় শশধর একটি বোম্বাই বস্তার মত ধুপ্ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িল—দরজার পাশে স্তূপাকার লেবুর খোসা, শালপাতা, দইএর ছোট ছোট খুপরি—শশধর পড়িল গিয়া তাহার উপর। কিঙ্কর বলিল—'এহে!' রামহরি বলিল, তাইত!

শশধর তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল,—কিছু না, যাও একখানা চেয়ার নিয়ে এস—যাও শীগ্‌গির।

এমন সময়ে বন্ধ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। তিনজনে একসঙ্গে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তিনজনের ধাক্কায় প্রসাদ ছিট্‌কাইয়া তাহার বিছানায় গিয়া পড়িল। শশধর তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে গিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল— আচ্ছা প্রসাদ, ব্যাপার কি তোমার! রোজ রোজ এমনি তুমি আমাদের detain করো কেন বলো ত!

রামহরি বলিল,—কি বাবা ফিলজফার, দরজা বন্ধ ক'রে কি-ফিলজফির চর্চ্চা করো বলো ত শুনি!

কিঙ্কর বলিল—আরে রেখে দাও তোমার ফিলজফি,—রুমটা কি ওঁর একার নাকি? রুমটা যে ফোর-সীটেড, ঘুঘুধনকে সেটা এবার বুঝিয়ে দেব! প্রসাদ শুধু গম্ভীর-ভাবে বলিল—শশধর, তোমার পাঞ্জাবীটা নোংরা হ'য়ে গেছে; বদলে ফেল!

পাশের পার্টিশন-ওয়ালের উপর তিন-চারখানি মুখ দেখা যাইতেছে। শশধর একবার সেদিকে চাহিতেই মুখগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

এলোমেলো বিশৃঙ্খল বোর্ডিংএর জীবন-যাত্রা। বাহিরে নিয়ম-কানুনের অন্ত নাই। নোটিশ-বোর্ডে প্রতিদিন নোটিশ পড়িতেছে—খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া ছেলেরা একবার সেগুলি দেখিয়া যায়। তারপর উপরে উঠিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিবার পর সকালে সে-সব ভুলিয়া যায়। কোনো ছাত্রই কোনো নিয়ম মানে না; দুইবেলা আহারের ঘণ্টা

বাজিয়া উঠিলে, নিয়ম মানিবার তাড়া পড়ে। খড়মের খটাখট, চটির চট্‌পট্‌ শব্দে সিঁড়ি ভাঙিবার উপক্রম হয়।

সেদিন ছিল ফিষ্ট। শশধর সকলের আগে গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। রামহরি এককোণে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন লিখিতেছে। কিঙ্কর বিছানায় লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। প্রসাদ সম্মুখের জানালাটি খুলিয়া দিয়া বাহিরের ধূমাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে।

শশধর ঘরে আসিতেই রামহরি লেখা বন্ধ করিয়া বলিল,—শশু আমাদের ঠিক আছে—সবার আগে গিয়ে খেয়ে আস্‌বে, সবার আগে ঘুমোবে, সবার আগে উঠবে—কিন্তু পরীক্ষার সময়—থাক্‌ আর বল্‌ব না!

শশধর একবার তাহার দিকে কটমট করিয়া চাহিল।

রামহরি শশব্যস্তে বলিল,—দোহাই ভাই, ঘুঁসি খেলে বাঁচব না। শশু আমাদের লক্ষ্মীছেলে! যাও ত চুপ ক'রে বিছানায়, গিয়ে লেপটি টেনে নাও—লক্ষ্মীছেলে!

শশধর সুপারি চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া বিছানায় বসিল। পরিষ্কার বালিশটির দিকে বারে বারে চাহিয়া যেন অত্যন্ত আরাম বোধ করিতে লাগিল। তারপর একবার প্রসাদের দিকে, একবার রামহরির দিকে, শেষে কিঙ্করের দিকে চাহিয়া ধুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তিন-চার মিনিট পরে রামহরি একবার ডাকিল,—শশধর! কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রামহরি কিঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল,—দেখ্‌ছ কিঙ্কর, ও আবার আমাকে গাড়োল বলে!

শুইয়া শুইয়া কিঙ্কর একটু উস্‌খুস করিতে লাগিল—শেষে পাশ ফিরিয়া বলিল, যেতে দাও, যেতে দাও—মরুকগে!

রামহরি আবার লিখিতে লাগিল; শেষে কলমটি রাখিয়া দিয়া বলিল,—ওহে প্রসাদ, তোমার ধ্যান আর কতক্ষণ চল্‌বে? খেতে যাবে না?

প্রসাদ ধীরে ধীরে বলিল,—আমার খাবারটা ভাই উপরে পাঠিয়ে দিতে বলো!

কিঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—রামহরি, আমারটাও তাই!

রামহরি একাই খাইতে গেল; বলিয়া গেল,—আচ্ছা আমি নবীন ঠাকুরকে বল্‌ব, তবে খাবার আসতে বোধ হয় দেরী হবে।

খাওয়া শেষ করিয়া রামহরি যখন ফিরিল, তখন তাহার সঙ্গে আরও দুইটি ছেলে সে ঘরে আসিল।

ঘরের মধ্যে প্রসাদ তখন আলো নিবাইয়া দিয়াছে। তার বিছানাটি ছিল জানালার ধারে—খানিকটা মলিন চাঁদের আলো বিছানায় পড়িয়াছে। রামহরি ও তাহার সঙ্গী দুইজন দেখিল, প্রসাদ স্থিরভাবে তখনও বসিয়া আছে; তাহার চিন্তার বিষয় কি ছিল, তাহা ওরা কেহ বুঝিতে পারিল না।

রামহরি ইসারা করিয়া বলিল,—তোরা এখন কেউ ওর কাছে যাস নে, আমার এখানে বোস। তারপর খাবার এলেই ওর ধ্যান ভাঙবে।

নীরেন ও অমিয় রামহরির বিছানাতেই বসিল।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। পার্টিশন-দেওয়া হলের ঘরগুলির মধ্য হইতে সকালে সন্ধ্যায় একটা অবিশ্রাম কলগুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের মুখেই একটা ক্লান্ত আতঙ্কের ভাব—'কিছু হ'ল না হে এবার', 'কেন নিয়ে টানাটানি হবে', 'অমুক বইখানা এখনো আমার কেনা-ই হয়নি' প্রভৃতি। শশধরের খাওয়া অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে; রামহরি দিবারাত্রি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া থাকে; কিঙ্কর শুইয়া শুইয়া পড়ে।

এমনি সময়ে প্রসাদ ও নীরেন প্রতি সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হয়। অনেক ঘুরিয়া সেদিন একটা পার্কে আসিয়া তাহারা ঘাসের উপর বসিল।

নীরেন বলিল,—ওহে, সেদিন প্রফেসর রায় তোমার কথা বল্‌ছিলেন।

—কি বল্‌ছিলেন?

—বল্‌ছিলেন যে, ও আজকাল বড় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে, পরীক্ষায় কি কর্‌বে বল্‌তে পারিনে।

—তিনি ঠিকই বলেছেন। আমার আজকাল আর কিছু ভালো লাগে না,—সংকীর্ণ বাঁধা জীবনে আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি; তাই বড় একটা কারো সঙ্গে মিশিনে।

—কিন্তু, আসল ব্যাপারটা কি বল্‌লে না? শুধু কি জীবনের ক্লান্তি, না আরো কিছু?

—কিছু না ভাই! এই সহর আমার ভালো লাগে না। এর চারিদিকে এত বিকৃতি, জীবনের গণ্ডী এখানে এত ছোট যে, আমি সব দেখে-শুনে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাই পড়াশুনা আমার কাছে একটা intellectual luxury ভিন্ন আর কিছু নয়। সরলতা এখানে দুর্ল্লভ, তাই চুপচাপ থাকি; পরীক্ষায় খ্যাতি আমার মন যেন চায় না।

—এ নৈরাশ্য ত চিরকাল-ই আছে ভাই! Mental training ব'লে এটাকে নিতে পারছ না কেন? তুমি যে আমাদের মধ্যে best student—

—ও কথা আর বোলো না ভাই! আমি আমার শ্রুতি-স্মৃতি তোমারই উপর সমর্পণ কর্‌লাম। তুমি আমার মুখ রেখো!

—কি যে বলো তুমি?

তারপর আর কোনো কথা হইল না। পার্কের সমস্ত হাসি-কলরব ইহাদের কাছে অন্যরূপ লইয়া দেখা দিল। নীরেন ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। প্রসাদ গম্ভীরভাবে সম্মুখের একটি সরল দীর্ঘ দেবদারুর দিকে চাহিয়া রহিল।

পথে চলিতে চলিতে নীরেন বলিল,—দেখ, তোমার কথা অনেকটা সত্যি ব'লে মনে হয়। এক এক সময় বড় বিরক্তি আসে।

প্রসাদ দ্রুত পথ চলিতে চলিতে বলিল,—বিরক্তি না এসে যায় না। আমি জানি, আমাদের জীবন প্রধানতঃ লক্ষ্যহীন। একটা স্থির লক্ষ্য কারো আছে ব'লে মনে তোমার হয়?

—বর্ত্তমান সময়ে লক্ষ্য স্থির করা বড় কঠিন সমস্যা। বাধা অনেক—মন যেন লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা হবে ব'লে বাপ-মা আমাদের বোর্ডিং-এ পাঠান,—এখানে এসে লেখাপড়ার চর্চ্চাটা হ'য়ে পড়ে গৌণ—মুখ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায় আড্ডা-দেওয়া, গুণ্ডামি, আরও কত কি!

—এর একটা কারণ আছে ভাই! এই যে একটা বে-পরোয়া ভাব, এটাকে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ ব'লে আমার মনে হয়। কোথাও কোনোদিকে আর পথ নেই! যারা মধ্যপন্থী ছেলে, তারা জানে যে, পাশ ক'রে কিছু হবে না। সেজন্য যতদিন তারা পারে, একটু নিশ্চিন্তভাবে ফূর্ত্তি করতে পেলে খুসী হয়।

—অনেকটা সত্যি। তবে এই ধরণের ছাত্রসংখ্যাই বেশী।

'আরে, এই যে প্রসাদ' বলিয়া একটি ভদ্রলোক সম্মুখের জনস্রোত হইতে একটু দূরে সরিয়া আসিয়া প্রসাদ ও নীরেনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

'অনেকদিন দেখা হয় নি' বলিয়া হাসিমুখে প্রসাদ একটি নমস্কার করিল।

—তারপর, কেমন আছ? পরীক্ষা ত এসে পড়ল, তৈরী হ'ল কেমন? প্রসাদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'পরীক্ষা ত দেব না!'

ভদ্রলোক প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেলেন, পরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—সে কি হে, পরীক্ষা দেবে না কেন? শোন' শোন' এদিকে এস, কি ব্যাপার বল ত!

প্রসাদ নীরেনের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল,—আচ্ছা, আর একদিন আপনাকে শোনাব—আজ দেরী হ'য়ে গেছে, আমি এর মধ্যে আপনার ওখানে যাব।

—আচ্ছা, তা হ'লে যেও একদিন; অনেকদিন যাও নি। আসি তবে।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে নীরেন তাঁর পরিচয় জানিয়া বলিল,—

তা হ'লে তুমি সত্যি-সত্যি-ই পরীক্ষা দেবে না? বড় দুঃখিত হ'লাম প্রসাদ,—প্রফেসর রায়ের কথাই সত্যি হ'ল দেখছি!

প্রসাদ কিছু বলিল না; কিন্তু মনে মনে সে একবার তাহার অতীত ছাত্রজীবনের কথা ভাবিয়া লইল। দেখিল, সেখানে তাহার যে প্রতিষ্ঠা, সে প্রতিষ্ঠার গৌরব এখন আর তার থাকিবে না। অত্যন্ত মৃদুস্বরে সে নীরেনকে বলিল,—নানা কারণে ভালো তৈরী হয় নি—কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, পরীক্ষা দিতে আর ইচ্ছে হয় না।

বোর্ডিংএ যখন তাহারা ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে। নীরেন ঘরে আসিয়া দেখিল, খুব বড় একটা আড্ডা

বসিয়াছে। চার-পাঁচটি ছেলে নীরেনের বিছানায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে। শশধরও এ ঘরে আসিয়া জুটিয়াছে। সে সঙ্গীতে তাল দিবার জন্য তব্‌লা বাজাইবার অনুকরণে টেবিল বাজাইতেছে। নীরেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে ঘরে আসিল। বলিল,—আপনারা একটু গান বন্ধ করবেন কি?

ক্ষীণকায় গায়ক পরেশ আরও দ্বিগুণ উৎসাহে গান ধরিল।

নীরেন তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল,—শশধর বাবু, এঁরা না হয় গান গাইতে পারেন, কিন্তু আপনি একজন Examinee; আপনি নিজের রুম ছেড়ে এ ঘরে এসেছেন টেবিল বাজাতে?

শশধর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় রামহরি ঘরে আসিয়া বলিল,—ওহে শশধর, এদিকে এস, দরকার আছে।

শশধরকে লইয়া রামহরি বাহির হইয়া গেল। শশধর চলিয়া যাইতেই গায়ক পরেশ উঠিল; এবং তাহার দেখাদেখি আর সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

এমন সময় অমিয় সে ঘরে আসিল। নীরেন তখন সবেমাত্র জামা-জুতা ছাড়িয়া বিশ্রাম করিতেছে।

অমিয় আসিয়া বলিল,—ওহে শুনেছ, এইমাত্র শশধরের একখান টেলিগ্রাম এল—ওর বাবার খুব অসুখ!

নীরেন তখনও অপ্রসন্ন ও অন্যমনস্ক ছিল; বলিল,—তা অসুখ হবে না! অত আড্ডা—

অমিয় হাসিয়া বলিল,—তোমার আবার মাথা খারাপ হ'ল না কি? শশধরের বাবার অসুখ, শশধরের নয়!

—তাইত হে, ছেলেটা এবারও পরীক্ষা দিতে পারবে না?

—তোমার কাছে দুনিয়ায় পরীক্ষা-ই সব; তোমার বাবার অসুখ হ'লে তুমি বোধ হয় পরীক্ষা শেষ ক'রে বাবার কাছে যেতে?

—এবার নিয়ে তিনবার—তা হ'লে শশধরের পড়াশুনা একরকম শেষ, কি বলো! কবে যাচ্ছে ও?

—বোধ হয় এখনি যাবে।

জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া নীরেন দেখিল, গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শশধরের বিছানা-পত্র, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি গাড়ীর উপরে উঠিয়াছে।

এই মহা দুর্দান্ত, পড়াশুনায় অমনোযোগী ছেলেটির জন্য কি জানি কেন নীরেনের মন কেমন করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই প্রসাদ, রামহরি, কিঙ্কর, এবং আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে শশধর নীরেনের কাছে আসিল।

—চল্লাম নীরেন বাবু, ফিরি ত, দেখা হবে। নমস্কার!

—নমস্কার!

শশধর চলিয়া গেল। যাইবার সময় সকলের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া গেল।

প্রসাদ নীরেনকে বলিল,—ও বাঁচ্‌ল, অন্ততঃ এই দম-বন্ধ-করা পরীক্ষার আব্‌হাওয়া থেকে!

অমিয় বলিল,—প্রসাদ, তুমিও পালাবে নাকি?

নীরেন বলিল,—কম্‌লি ছাড়্‌ছে না, নইলে ও পালাত।

রামহরি বলিল,—কম্‌লি কে?

কিঙ্কর বলিল,—সে এক সাত-সাগর-পারের ঘুমন্ত রাজকন্যা!

সকলে হাসিয়া উঠিল।

সকলে একে একে চলিয়া গেলে, নীরেন বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু মন দিতে পারিল না। প্রসাদের পড়াশুনায় অ-মনোযোগ, শশধরের দুর্ভাবনা, এমনি নানা ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। কয়েকটি দিন যেন ছাত্র-জগতে একটা ঝড় বহিয়া গেল। এ কয়দিন প্রসাদ সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে আপনার পড়াশুনা লইয়া ছিল। পরীক্ষার মানসিক চাঞ্চল্য ও অবসাদ একেবারেই তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু পরীক্ষার শেষদিনে সে আর বোর্ডিংএ থাকিতে পারিল না; বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত ছাত্রদের নিশ্চিন্ত কোলাহল আরম্ভ না হইতেই প্রসাদ পথে বাহির হইল।

সহরের শেষ সীমায় যেখানে ধুলা-কয়লাগুঁড়ার মধ্যে পাট-বোঝাই গরুর গাড়ীগুলি মন্থরগতিতে চলিয়াছে—মাঝে মাঝে উল্কার মত এক-একখানি আরোহীশূন্য ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশী জনতা যেখানে অত্যন্ত বিরল, সহরের সেই অংশে প্রসাদ আসিয়া পড়িল।

রাস্তার ধারে ছোট্ট একখানি একতলা বাড়ী; আশে-পাশে কতকগুলি পশ্চিমার নীড়ন বাড়ীর সম্মুখে নদী নয়,

—একটি খোলা নর্দ্দমা প্রবাহিত। নর্দ্দমার উপরে একখানি লম্বা পাথর আড়াআড়ি ভাবে পড়িয়া আছে। তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া প্রসাদ দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল।

বাড়ীতে বোধ হয় বেশী লোক ছিল না। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিয়া গেল। প্রসাদ ঘরের মধ্যে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চারিদিকে চাহিতেই দরজার পাশ হইতে একটি মেয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—আরে এ যে প্রসাদ! আমি ভেবেছিলাম আর কেউ।

—যদি সত্যি আর কেউ হ'ত; যদি চোর হ'ত দিদি, তুমি কি করতে?

—সত্যি ভাই বড় মুস্কিল! একা থাকতে হয়—ঝিটাও চ'লে যায়, শুধু খুকী আর আমি। কোনো কোনো দিন ও-বাড়ীর মেয়েরা এখানে বেড়াতে আসেন; প্রায়ই তা নইলে আমাকে একা থাকতে হয় দুপুরটা।—ওঃ, তোর মুখচোখের একি অবস্থা হ'য়েছে! রোদ্দুরে সারা পথ হেঁটে এসেছিস্ বুঝি? আয়, আয়, ভেতরে আয়!

প্রসাদ চলিতে চলিতে বলিল,—কিন্তু, দুপুরে কেউ কড়া নাড়লেই তুমি দরজা খুলে দিও না; আগে চেঁচিয়ে বলতে হয়—কে? সব জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে দরজা খোলার দরকার হ'লে খুলতে হয়।

—হয়েছে, তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না! উপদেশের জ্বালায় গেলাম! কড়া নাড়া শুনলেই আমি বুঝতে পারি চেনা লোক কি না—বুঝলি?

ছোট দালানের একটি কোণে দিদি বসিল। দুই ভাই-বোনে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

একটি ছোট পরিষ্কার দোলনায় খুকী ঘুমাইয়া আছে। জানালা দিয়া যেটুকু হাওয়া আসিতেছে, তাহাতেই দোলনাটি সামান্য দুলিতেছে। কথাবার্ত্তার মাঝে মাঝে দুইজনেই এক-একবার দোলনাটির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। দিদির অনেক কাজ; বলিল,—তুই একটু বোস্ প্রসাদ, আমি আসছি এক্ষুণি।

বেলা পড়িতে না পড়িতেই একটি দীর্ঘ ছায়া ঘনাইয়া আসে। শ্রান্তিহীন রুক্ষ তপ্ত হাওয়া কোথা হইতে যেন একটু স্নিগ্ধতা বহিয়া আনে।

জলের কলে অনেকক্ষণ জল আসিয়াছে—ঝর্ ঝর্ ঝির্ ঝির্ করিয়া কলের জল পড়িতে থাকে। আশেপাশের বাড়ীগুলি হইতে আঁচ-দেওয়া কয়লার নীল ধূম-কুণ্ডলী উঠিতে থাকে। বাসন-কোসনের ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঝি-দের কলকণ্ঠ একটু থামিয়া গেলে সেই স্নিগ্ধ মিষ্ট বৈকালের উপর সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসে।

বহুদিন পরে প্রসাদ একটু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। বোর্ডিংএর ছাত্রেরা বোধ হয় এতক্ষণ থিয়েটার-বায়স্কোপ-উৎসবের মধ্যে। প্রসাদের আনন্দ হইল—সে ভাবিল, সত্যকার জীবনের ছবি সে যেন দেখিতেছে!

প্রসাদ দেখিল, দিদি হাসিমুখে সমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

—কিরে, ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

—না দিদি, আমার বড় ভালো লাগ্‌ছে। অনেকদিন তোমার এখানে আসি নি, তাই চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ছে।

—স্নান কর্‌বি, ক্ষিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ দিদি, স্নান কর্‌ব; বেশ ঠাণ্ডা জল, না?

—চমৎকার জল, আমি গা ধুয়ে এলাম; তুই যা না! আমি ততক্ষণ খাবার তৈরী করি।

প্রসাদ অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। স্নান শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, জামাইবাবু।

—এই যে প্রসাদ, কতক্ষণ এসেছ? সেদিন রাস্তায় দেখা না হ'লে বোধ হয় আস্‌তে না, কেমন?

—না, আস্‌তাম বই কি! বাসাটা একটু কাছে হ'লে রোজই আস্‌তে পারি।

রান্নাঘর হইতে দিদির দু'টি আনন্দোজ্জ্বল চোখ দেখা যাইতেছে। দিদি বলিল,—হ্যাঁ, তুমি যে ছেলে! আজ কি খেয়াল হ'য়েছে, তাই এসেছ! তুমি আবার আস্‌বে!

ছোট খোলার রান্না ঘর—মেঝেটি স্যাঁৎসেঁতে। কিন্তু দিদি তাহারই মধ্যে কেমন সব গুছাইয়া লইয়াছে। জামাইবাবু আসিয়া বলিলেন,—প্রসাদ তোমার দিদির প্রতিভা আছে; নইলে জানো ত আমি কত বড় অগোছালো।

একে একে অনেকে আসিয়া পড়িল।—জামাইবাবুর দুই-তিন ভাই; একটি গ্রাম-সম্পর্কের ভাই—নাম লোকেন;

আরো দুই একজন জামাইবাবুর বন্ধু।

প্রসাদ খাবার খাইতে খাইতে দেখিল, দিদি কোমরে সাড়ীখানি জড়াইয়া লইয়াছে। প্রকাণ্ড ডেক্‌চি উনুনের উপরে। অনেক রান্না হইয়া গিয়াছে। আরও হইবে।

—দিদি তোমাকে সাহায্য করব?

—না, না, তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না।

তারপর ডেক্‌চি নামাইয়া বলিল,—একবার তোমার জামাইবাবু সাহায্য করতে এসে যা' কাণ্ড করেছিলেন, এখনও তা' মনে আছে।

প্রসাদ বাহিরের ঘরে আসিল। জামাইবাবুর তামুক-সভা। চৌকির উপর দুই-তিন জন শুইয়া আছে। লোকেন একটি লুঙ্গী পরিয়া চৌকির একদিকে বসিয়া আছে। নীচে সতরঞ্চি পাতা। জামাইবাবু খালি গায়ে তামাক টানিতে টানিতে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছেন। সতরঞ্চের উপর আরো দুই-তিনটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

প্রসাদকে দেখিয়া একজন লোক বলিলেন—এটি কে হে?

অমনি চারিদিকে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকের স্রোত বহিয়া গেল।

আর একজন বলিলেন—কে হে—বড়কুটুম বুঝি? আরে বসো ভায়া!

প্রসাদ বসিল। জামাইবাবু একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—তারপর প্রসাদ, কেমন পরীক্ষা দিলে বল?

—পরীক্ষা দিলাম না।

—তা হ'লে সত্যি পরীক্ষা দিলে না! বড় অন্যায় কর্‌লে ভায়া! বাঙালীর জীবনে তুমি দুটো বছর নষ্ট করলে?

লোকেন বলিল—পরীক্ষা দিয়েই বা কি হবে? এই আপনি ত এত পরীক্ষা দিয়েছেন, কিছু সুবিধা করতে পার্‌লেন কি?

জামাইবাবু বলিলেন—আহা তোমরা বড় ভুল বোঝ; এখানে সুবিধা-অসুবিধার কোন কোশ্চেন আসছে না। পড়তে যখন হ'লই তখন পরীক্ষা দিয়ে ফেলাই ভালো!

লোকেন বলিল—কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পরে কি হবে সেটা ভেবে আর দিতে ইচ্ছা হয় না।

এক ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—কর্ম্মণ্যেব অধিকারস্তে—এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন হে লোকেন?

প্রসাদ বলিল,—পরীক্ষা দেওয়াটা যদি আমি আমার কর্ম্ম ব'লে না নি?

জামাইবাবু বলিলেন,—তা হ'লে তোমার গোড়াতেই ভুল হোয়েছে। যা'ই হোক, এখন কি কর্‌বে? জীবন আজকাল যে কত জটিল হ'য়ে উঠেছে, তা ত তোমরা জান না!

—খুব জানি, এত বেশী জানি যে, আর কিছু কর্‌তে ইচ্ছা করে না।

—এই অল্প বয়সেই তোমরা এত নিশ্চেষ্ট হ'য়ে গেছ হে,—এ যে ভাব্‌তে পারি না। আমরা তবু আর যা'ই হই, নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। এই সহরে আমার এমন এক একদিন গেছে, যেদিন হাতে একটি পয়সা নেই বল্লেও চলে—টিউশনি খুঁজতে বেরিয়েছি, ল্যাম্পপোষ্টের দিকে চাইতে চাইতে চোখ ধ'রে গেল, সমস্তদিন কিছু খাওয়া নেই; অবশেষে এক বন্ধু দু'পয়সার ডাল-মুট খাওয়ালেন; সেই ডাল-মুট, আর জল—কলের জল হে—কলের জল! নগদ পয়সা খরচ হয় না ওতে। ঐরকম ক'রে চালিয়েছি দু'তিন দিন; তারপরে জুটে গেল শ্রীহরির কৃপায় একটা মাষ্টারি। তারপর সকাল-বিকাল টিউশনি-ও পেয়ে গেলাম। এই ক'রে ত চালিয়েছি হে!—আন্তরিক চেষ্টার একটা ফল আছে, বুঝলে?

লোকেন বলিল,—সকলের অত খাট্‌বার ক্ষমতা থাকে না, দাদা। আমরা হ'লে ত হিমসিম খেয়ে একটা-ও কিছু জোটাতে পারতাম না। বেশীর ভাগ ছেলের অদৃষ্টে তাই ঘটে।

এক ভদ্রলোক বলিলেন,—ওহে লোকেন, তোমাদের জীবন-সমস্যা কিছুক্ষণ রাখ'। সমস্যা চিরকাল আছে—থাক্‌বেও; একখানা গান গাও, শোনা যাক্‌।

লোকেন গায় ভালো। অনেক অনুনয়বিনয়ের পর দুই-একখানি গান সে গাহিল। সমস্যা-পীড়িত থম্‌থমে আবহাওয়াটি গানের সুর একটু হাল্‌কা হইয়া গেল।

লোকেন ছেলেটির সঙ্গে প্রসাদের খুব ভাব হইয়া গেল।

সর্ব্বদাই অস্থির,—চলিতে ফিরিতে তুড়ী দেয়, আর গান করে;—রান্নাঘরে গিয়া বলে—বৌদি কি কি রাঁধলেন দেখি! খাইয়া দু' একটা তরকারী চাকিয়া দেখে; বলে—চমৎকার।

প্রসাদকে বলিল,—প্রসাদবাবু, আপনাদের ত মেসে খাওয়া অভ্যাস; দিদির বাড়ী মাঝে মাঝে আস্‌বেন। আমরা দেখুন এইখানেই দাদা-বৌ'দির কাছে প'ড়ে আছি চমৎকার—বৌদি আমাদের এত যত্ন করেন!

দিদি প্রশংসা শুনিলেই রাগিয়া উঠে—বলে, থামো, থামো, ঢের হয়েছে!

প্রসাদের বোর্ডিংএ ফিরিতে রাত্রি হইল। দিদি বলিয়া দিল,—প্রসাদ, মাঝে মাঝে এসো। এবার পরীক্ষা দিলি না ভাই,—শুনে ভালো লাগল না। আস্‌তে ভুলিস্ নে!

রাত্রে বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিয়া প্রসাদ দেখিল, ঘরে তালা দেওয়া। রামহরি আর কিঙ্কর এখনো ফেরে নাই। প্রসাদ নীরনের ঘরে গেল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রসাদ দেখিল, নীরেন খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।

—নীরেন!

নীরেন যেন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। পরে প্রসাদকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—এসো প্রসাদ! রামহরিরা এখনো ফেরে নি বুঝি?

—না, কোথায় গেলো এরা?

—বোধহয় থিয়েটারে; আজ না-ও ফিরতে পারে। তুমি এই ঘরেই থাকো না আজকের মত?

—আচ্ছা, তাই থাকি—বলিয়া প্রসাদ জামাজুতা খুলিয়া ফেলিয়া একখানি খালি চৌকির উপর বসিল।

নীরেন তখনো জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, প্রসাদ, এদিকে এস!

প্রসাদ উঠিয়া আসিয়া নীরনের পাশে দাঁড়াইল। বাহিরে দেবদারু কুঞ্জের মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছে। অনেক রাত্রি। সহরের সমস্ত ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীগুলি গ্যাসের আলো ও চাঁদের আলোর বড় মায়াময় বলিয়া মনে হয়। অনেক দূরে দেবদারুগাছগুলির পিছনে একখানি বাড়ীতে এখনও আলো জ্বলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া সেই আলো গাছগুলির পত্রনিবিষ্ট অন্ধকারের সঙ্গে খেলা করিতেছে।

প্রসাদ আজ নীরেনকে বড় বিষণ্ণ দেখিল। দুজনেই জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে।

প্রসাদ হঠাৎ বলিল,—পরীক্ষা কেমন দিলে?

—পরীক্ষার জন্য ভাবিনে ভাই; ভালোই দিয়েছি।

—তবে, এত ভাবছ কি?

—ভাবছি অনেক কথা ভাই! তোমাকে ব'লেই ফেলি। ঐ যে বাড়ীখানিতে আলো জ্বলছে দেখছ, ওটা আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ী। এ কথা কেউ জানে না। আমি রোজ তাকে দেখতে পাই—আমাকে একটিবার দেখা দেবার জন্য সে রোজ রোজ সামনের বারান্দাটিতে এসে দাঁড়ায় এমনি সময়। কিন্তু আজ তাকে আর দেখতে পাচ্ছিনে।

—ও, এই কথা! একদিন দেখতে পাওনি ব'লে এত ভাবনা!

প্রসাদের হাসি পাইল। ভাবিল—এ আবার কোন্ জগৎ! রোমিও জুলিয়েটের গল্প মনে পড়িল। বলিল,—তুমি এক কাজ কর না ভাই,—এখনি ঐ বাড়ীতে চ'লে যাও। বরাবর পাঁচিল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে ঠিক যে জানালাটির কাছে তোমার প্রিয়তমা ঘুমুচ্ছেন, সেই জানালার ধারে গিয়ে একখানা সেরিনাড্ গেয়ে এস না কেন!

'দূর পাগলা!' বলিয়া নীরেন হাসিয়া উঠিল।

—তোমরা সব বাঙালী নাইট, তোমাদের শিভাল্‌রি শুধু বিষণ্ণতায় আর কান্নায়! অন্য দেশ হ'লে দেখতে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে জয় করতে বেরুত।

প্রসাদ দেখিল, বাড়ীখানির খোলা জানালাটি বন্ধ হইয়া গেল। দেবদারুবনের উপর আর আলো নাই। নীরেনকে বলিল—তোমার বাড়ী ত ঘুমিয়ে প'ল; এস আমরাও ঘুমুই।

পরের দিন সব পরীক্ষার্থীদের বাড়ী যাইবার পালা। প্রখর মধ্যাহ্নে এক একখানি ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়ায়—আর বিছানাপত্রের লটবহর লইয়া এক একজন ছাত্র চলিয়া যায়।

ঠাকুর চাকর দারোয়ান মেথর সব বকসিসের লোভে প্রত্যেক ট্যাক্সির চারিদিকে ভিড় জমায়।

রামহরি বলিল—প্রসাদ,ভাই, তুই ত বেঁচে গেলি! পরীক্ষা দিতে হ'ল না। আমি ত ভাই ডাঁহা ফেল করব—দাঁড়িয়ে।

—আজ বাড়ী যাবে নাকি?

—কে বাড়ী যায় ভাই? দিব্যি আছি এখানে; ভাঙা মাসের ক'টা দিন এখানে একটু ঘুমিয়ে নি।

প্রসাদ ভাবিল, বেশ মজা! এরা প্রকাণ্ড বোর্ডিংএ থাকিয়া এখানকার সুখসুবিধায় বাড়ীর কথা ভুলিয়া যায়। কোথায় কোন্ পল্লীগ্রামের পচা-ডোবার ধারে জীর্ণ কোঠায় এদের বাড়ী। বৃদ্ধ পিতা হয় ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া এদের বোর্ডিংএ মাসহারার ব্যবস্থা করিতেছেন! অমনি নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল—তবু ত এরা পরীক্ষা দিয়াছে; আর সে?

কিছু বলিল না। শুধু শশধরের খালি সিটের দিকে চাহিয়া তাহার কি জানি কেন চোখে জল আসিল। দেখিল, রামহরি কিঙ্করের সিটে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার একটু আগে, রামহরি আর কিঙ্কর ক্ষীণকায় গায়ক পরেশকে ডাকিয়া আনিল। খানিকক্ষণ তারস্বরে নানা নূতন রাগ-রাগিণীর আলাপ হইল। পরে তিনজনে বেশভূষা-প্রসাধন সারিয়া ফরাসী এসেন্সের উগ্রগন্ধ ছাড়িতে ছাড়িতে ছড়ি ঘুরাইয়া বোর্ডিংএর বাহির হইল।

সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ বোর্ডিংএ নিঃসঙ্গ প্রসাদ তাহার সিটে বসিয়া রহিল। নীচে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, অবিশ্রাম জনস্রোত চলিয়াছে—কোথাও কেহ দাঁড়াইয়া নাই। নানা রংএর পোষাক—নানা ভঙ্গী—নানা মানুষ; কিন্তু একটিমাত্র স্রোতোমুখে তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেকেই পৃথক্, তবু পরস্পরের গায়ে গায়ে মিলিয়া তাহারা যেন এক।

প্রসাদের মনে হইল, যদি ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে, দৃষ্টি বোধ হয় আর পার্থক্যকে খোঁজে না। একটি বিচিত্রবর্ণ মানুষের স্রোতকেই দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র—সেই স্রোত হইতে যদি একটি অণু দূরে সরিয়া যায়, সে হারাইয়া গেল। প্রসাদ ভাবিল, সে ও বোধহয় হারাইয়া গিয়াছে। যদি অনেক দূরে এই পৃথিবীর কোনো একটি কোমল প্রাণে সামান্য একটুকু স্মৃতি জাগিয়া থাকে, যদি সে বলে—তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি হারাও নাই,—তাহা হইলে কেমন হয়?

কিন্তু, কেহ নাই। প্রসাদের নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ জীবনের কোনো প্রান্ত হইতে তেমন একখানি মুখ-ও ভাসিয়া উঠিল না। প্রসাদ দেখিল দূরে দেবদারুবনের উপরে একখানি লাল রঙের বারান্দা। সেই বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতে মুখখানি ভালো দেখা যায় না। নিবিড় কালো কেশরাশি সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে যেন মিশিয়া গিয়াছে। আধ আলো আধ ছায়াতে এই ছবিখানি প্রসাদের মনে বড় করুণ হইয়া দেখা দিল।

নীরেনের কথা মনে হইল। ভাবিল, একবার তাহার কাছে যাওয়া যাক। কি মনে করিয়া সে তাহার কাছে আর গেল না।

প্রসাদ ভাবিল, স্নেহ সে অনেক পাইয়াছে। কিন্তু জীবনের কোনো একটি চিন্তাক্লিষ্ট মুহূর্ত্তে ঠিক স্নেহ নয়—আর-ও যেন কি একটা পাইতে ইচ্ছা করে। ভাবিতে ভাবিতে সেই অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে প্রসাদের সমস্ত হৃদয়ে একটা নিঃশব্দ হাহাকার উঠিতে লাগিল।

পরদিন সকালে প্রসাদ উঠিয়া দেখিল, রামহরি ও কিঙ্কর তখনো ঘুমাইতেছে। কতরাত্রে তাহারা ফিরিয়াছে কে জানে? উচ্ছৃঙ্খল বেশভূষা, মুখ নিষ্প্রভ—চোখের চারিদিকে গাঢ় মসীচিহ্ন। গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা ঘুমাইতেছে। দরজা খুলিতেই রামহরি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া একবার প্রসাদের দিকে তাকাইল। প্রসাদ দেখিল, সে চোখ জবাফুলের মত লাল।

—অসুখ করেছে নাকি—রামহরি?

রামহরি একবার পাশ ফিরিয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল,—হ্যাঁ ভাই, যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে যেও।

কিঙ্করের কোনো সাড়া নাই, সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পথে অমিয়'র সঙ্গে দেখা।

—আজ যাচ্ছি ভাই; আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে—

প্রসাদ বলিল,—হাঁ, যাওয়ার পালা-ই দেখ্‌ছি।. দেখা আর কবে হ'তে বলো? না-ও হ'তে পারে!

অমিয় বড় শান্ত; একটু ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল,—নিশ্চয়ই হবে,—একদিন না একদিন দেখা হবেই। তবে বোর্ডিং-লাইফের এবার পূর্ণচ্ছেদ; দেখা যদি হয় ত, অন্য লাইফে!

—জন্মান্তরে না কি হে?—বলিয়া নীরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনজনেই হাসিতে লাগিল।

অমিয় বলিল,—কি নীরু, আজ যে তোমার মুখে এত হাসি দেখ্‌ছি! ব্যাপার কি? লাল বারান্দা থেকে বুঝি টেলিগ্রাম এসেছে?

আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল। যাইবার সময় অমিয় বলিয়া গেল,—দেখো হে, যেন আমাকে ঠকিয়ে মিষ্টান্নগুলো প্রসাদেকই খাইও না!

প্রসাদ দিদির একখানি চিঠি পাইল। আর একবার দেখা করিতে লিখিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় লোকেন আসিয়া হাজির। বলিল,—চলুন প্রসাদ বাবু, দিদি পাঠিয়েছেন। ওঁরা বোধ হয় শীগ্‌গির বাড়ী চ'লে যাচ্ছেন; বাসা থাকবে না।

সে কি?—বলিয়া প্রসাদ তখনি বাহির হইয়া পড়িল।

দিদির মুখ আজ বড় ম্লান।

—প্রসাদ, কাল আমরা চ'লে যাব।

এই নীড়ভাঙার মহোৎসবে প্রসাদের তবু একটা আশ্রয় ছিল।

জামাইবাবু বলিলেন—আর পেরে উঠিনে হে, টিউশনি আর মাষ্টারিতে কল্‌কাতায় থাকা যায় না। যাক্‌ সব দেশে চ'লে,—শেষ পর্য্যন্ত মেস-ই ভরসা।

যে দালানে খুকীর দোল্‌না টাঙানো ছিল, অহারি এককোণে একটি পশ্চিমা মেয়ে খুকীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে।

দিদি বলিল,—ওরই সব চেয়ে কষ্ট প্রসাদ! ওর ছেলে-পিলে নেই,—আমার খুকীকে ত ও-ই মানুষ করল!

প্রসাদ দেখিল,—পশ্চিমা মেয়েটি তাহার আধময়লা কাপড়খানি দিয়া চোখ্‌ মুছিতেছে, আর খুকী তাহার ছোট হাত দুইখানি দিয়া কেবল-ই তাহার আঁচল সরাইয়া দিতেছে।

এক একটি করিয়া মেসের ছেলেরা চলিয়া যায়—সে সহ্য করা যায়; কিন্তু একখানি শান্ত নীড় তার সব আকর্ষণ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈশাখের ঝড়ের বেগে কুটাটির মত ভাসিয়া যায়—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখা শক্ত।

লোকেন ঘরের মধ্য হইতে তুড়ী দিয়া গান ধরিল,—

'পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি,—
ওগো ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই, তারি লাগি—'

এত দুঃখেও দিদির হাসি গেল না। বলিল,—পাগলা গান ধরেছে!

পরে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—কিন্তু বাসা আমি করব প্রসাদ, এ তুমি জেনে রেখো! আজ না হয় হোল না, কিন্তু এমন দিন ত আস্‌বে—

—নিশ্চয়ই আস্‌বে দিদি, বাসা কি তোমার যেতে পারে?

পরদিন ষ্টেশনে আসিবার সময় প্রসাদের যেন কান্না পাইতে লাগিল। কোথায় যাইবে সে? কি করিবে? এতদিন তবু একটা সান্ত্বনার স্থান ছিল। নীরস শুষ্ক নগরীর ধুলাবালিময়লার স্তূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া-ই কি জীবন শেষ হইবে?

দিদিকে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া প্রসাদ আর অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। চাহিয়া দেখিল, দিদির প্রশান্ত মুখের উপর দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে—দু'টি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ জলে টলমল করিতেছে।

—কেঁদোনা দিদি, আবার দেখা হবে।

দিদি মুখ মুছিয়া বলিল,—খুব সাবধানে থাকিস্, চিঠিপত্র দিস্।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। পিছনে কয়েকটি ছেলে বোধহয় ইহাদের বিদায়-দৃশ্য দেখিয়াছিল। প্রসাদ চলিতে চলিতে শুনিতে পাইল,—

With smiles for those who come to meet,
And tears for those who go :

শেষের লাইনটি প্রসাদের কানে বাজিতে লাগিল,—and tears for those who go :

মাস ছয় পরের কথা। প্রসাদ পড়াশুনা ছাড়িয়া একটি মেসে আশ্রয় লইয়াছে। ছাত্র, কেরাণী, মাষ্টার, বেকার প্রভৃতি লইয়া এই মেস্। প্রতিদিন চাকরের সঙ্গে ঝির, ঝির সঙ্গে ঠাকুরের, ঠাকুরের সঙ্গে ম্যানেজারের এবং ম্যানেজারের সঙ্গে মেম্বরদের ঝগড়া লাগিয়াই আছে। মেম্বরদের মধ্যে নানা দল—কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। ট্রেনের কামরায় 'Beware of Pick-pockets' লেখা থাকিলে যেমন পাশের অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী ব্যক্তিকেও 'পিক্-পকেট' বলিয়া সন্দেহ হয়, তেমনি এই মেসে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করে। সাম্‌নাসাম্‌নি বেশ হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্তা হয়; একজন উঠিয়া গেলেই অমনি তাহার কুৎসা আরম্ভ হয়।

প্রসাদের গাম্ভীর্য্য এখানে আর-ও বাড়িয়া গেল। এখানে সে যেন খাপছাড়া,—ছন্দ-যতি-হীন কবিতার মাঝখানে একটি সম্পূর্ণ সুন্দর লাইনের মত। কাজেই কেহ তাহাকে সহ্য করিতে পারিত না।

মধ্যে একদিন নীরেনের বিবাহে প্রসাদ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। নীরেন পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করিয়াছে; বিবাহ-সভায় আলোক-মালার উৎসবের মধ্যে নীরেনের স্মিত-হাসি দেখিয়া প্রসাদ একটু ভাবিল। নীরেন নানা কোলাহল নানা বিকৃতির মধ্যে তাহার কর্ত্তব্য ভুলে নাই। জীবনকে সে সাধারণ চোখে দেখিয়া অন্য দশজনের মত-ই তাহাকে সার্থক করিবার চেষ্টায় আছে। হয় ত বা সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দারিদ্র্যের হাত হইতেও অন্ততঃ নিস্তার পাইবে।

বিবাহে অমিয়-র সঙ্গে দেখা হইল। অমিয় গ্রামে গিয়া চাষ-বাসে মন দিয়াছে। বলিল,—Difficulty অনেক ভাই, তবু চেষ্টা করছি।

প্রসাদ বলিল,—একটা খুব বড় সত্য কথা বলেছ ভাই! 'বাধা অনেক, তবু চেষ্টা করছি'—এটা যেন একটা সত্য বাণীর মত শোনায়।

নীরেন হাসিমুখে বলিল,—এটর্নিসিপ্ পরীক্ষা দেব; তারপর যা' হবার হোক্!

মেসে যে ঘরে প্রসাদ থাকে, সে ঘরে পাঁচটি সিট্। সে ছাড়া বাকী চারজনেরই দু'জন করিয়া বেকার বন্ধু! পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা চাকরীর চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোথাও কোনো সুবিধা হয় না। প্রসাদ-ও বেকারদের মধ্যে একজন। নানা জায়গায় চিঠি-পত্র লিখিয়াও কিছু ফল হয় না। অবশেষে একদিন একখানি চিঠি আসিল। একটি ছাত্র টিউটর্ রাখিতে চায়, দেখা করিতে লিখিয়াছে।

সন্ধ্যার দিকে প্রসাদ ঘুরিতে ঘুরিতে চিঠির ঠিকানায় আসিয়া হাজির হইল। অন্ধকূপের মত একখানি ছোট ঘরে একটি বিপুলকায় ভদ্রলোক একখানি বেতের চেয়ারে বসিয়া আছেন।

প্রসাদকে আসিতে দেখিয়া স-চশমা মুখ তুলিয়া বলিলেন,—কি চাই আপনার?

চিঠি দেখাইলে ভদ্রলোক বলিলেন—বসুন। আমি-ই পড়্‌তে চাই। আপনি পড়াতে পার্‌বেন কি?

—পার্‌ব।

—সকালে দু'ঘণ্টা আমি পড়্‌ব, রবিবারেও। এক বছর continually আমাকে ঐভাবে পড়াতে হবে। একদিনও কামাই কর্‌লে চল্‌বে না। আমি আর-ও চার-পাঁচজন টিউটর রেখেছিলাম—প্রত্যেকেই জোচ্চোর! আগাম টাকা দিয়ে দিতাম, কিন্তু প্রত্যেকেরই মাসের

মধ্যে কামাই হ'ত দশ দিন। আপনার কি বলবার আছে বলুন,—আমার কিন্তু ঐ টার্ম্।

—আপনি কি পড়েন?

—আই-এ।

—কত মাইনে দেবেন?

—পনের টাকা। এক পয়সা বেশী নয়!

—মাপ করবেন, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি কি এই প্রথমবার আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছেন?

—আজ্ঞে না, আমি তিনবার অনিঃসন্দেহে ফেল হয়েছি। This is the fourth time—

প্রসাদ একটু হাসিয়া বলিল—কিছু মনে করবেন না, আপনি এবারেও পারবেন না। আমি আসি তবে।

ভদ্রলোক ঠিক একই সুরে বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার।

প্রসাদ রাস্তায় বাহির হইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল, কলের জল খাইয়া বরং থাকা যায়—তবু এ-রকম ছাত্র যেন না জোটে!

মেসে দু'মাসের টাকা বাকী আছে। হাতে পয়সা নাই বলিলেও চলে। ধীর শান্ত প্রসাদের মাথা ঘুরিতে লাগিল। পার্কের একখানি বেঞ্চে ক্লান্ত শরীর রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রসাদ কোনো জায়গায় কোনো সুবিধা করিতে পারিল না। আপনার উপর যেদিন সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে, সেদিন হঠাৎ নীরেনের কথা মনে হইল। নীরেন এখন বাসায় থাকে।

নীরেন তাহাকে দেখিয়া বলিল,—কিরে এমন চেহারা হ'য়েছে কেন? কি ব্যাপার!

প্রসাদ সব কথাই বলিল। নীরেন অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—তুমি আমাদের এখানে এস, আমার ভাইকে পড়াও।

প্রসাদ বলিল—কিছু আপত্তি নেই; তবে অন্য কোথাও যদি ব্যবস্থা হয়, তা হ'লেই—

—বুঝেছি; আগে এখানে এসো, তারপর সে ব্যবস্থা হবে।

প্রসাদ সেদিন ভাগ্যবিধাতাকে স্মরণ করিয়া দু'টি হাত এক করিয়া কপালে রাখিল। কোথায় সে ভাগ্য-বিধাতা, কি তাঁহার বিধি তাহা সে জানে না,—তবু এক-একটি সঙ্কট-মুহূর্তে বিদ্যুৎ-চমকের মত তাঁহার ইঙ্গিত আসে। প্রসাদ আজ সেই অদৃশ্য শক্তিকে স্মরণ করিল।

প্রসাদ দেখিল, নীরেন মোটের উপর সুখী। প্রসাদ আরও দেখিল, অর্থ থাকিলেই সুখ হয় না; অর্থকে ঠিকমত ব্যবহার করিতে জানিলে অন্ততঃ জীবনের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য আসে। নীরেন স্বচ্ছন্দে আছে। দশ-বারোদিন পরে নীরেন তাহাকে একটি পঁচিশ টাকা মাহিনার টিউশনি জুটাইয়া দিল। সেই টিউশনি সম্বল করিয়া প্রসাদ একরকম নিজের খরচ চালাইতে লাগিল।

অনেকদিন পরে প্রসাদ দিদির একখানি চিঠি পাইল। লিখিয়াছে—বড় কষ্ট প্রসাদ! যদি একবার আসতে পারো ত বড় ভালো হয়।

প্রসাদের যাইবার কোনো উপায় নাই। ছাত্রের পরীক্ষা সম্মুখে। চলিয়া গেলে টিউশনির মায়া কাটাইতে হয়। প্রসাদ লিখিল—দিদি, কিছু মনে ক'রো না। দশ-বারো দিন পরে যাচ্ছি।

পাঁচ-ছয় দিন পরে প্রসাদ জামাই বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তিনি ছাত্র পড়াইতে বাহির হইয়াছেন—দেখা হইল না।

বাসায় আসিয়া দেখিল, লোকেনের একখানি চিঠি আসিয়াছে। লোকেন লিখিয়াছে—'প্রসাদ বাবু, বড় দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, স্নেহময়ী বৌদি' আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন।' প্রসাদ আর পড়িতে পারে না, তবু পড়িতে হয়। '—মেয়েটি যেদিন হ'ল, সেদিন থেকেই জ্বর; তারপর জ্বর বেড়ে উঠল। এখানে ডাক্তার নেই, বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে আপনার দিদির মৃত্যু হ'ল। দাদাকে তার করা হ'ল; দাদা যখন দু'টি বেদানা ও কিছু আঙুর নিয়ে এলেন, তখন সব শেষ হ'য়েছে। দাদার

পয়সাও ছিলো না; মাইনে না পাওয়ায় তিনি ঠিক সময়ে আসতে পারেন নি।'

'দিদি, তুমি যেখানে বাসা করলে, সেখানে আর আমরা যেতে পারব না!'—বলিয়া প্রসাদ কাঁদিতে লাগিল।

আরও কিছুদিন পরের কথা। রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে প্রসাদ দেখিল, একখানি ট্যাক্সি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভিতর হইতে শশধর হাসিতে হাসিতে বাহির হইল,—আরে প্রসাদ, কি খবর? তোমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে গাড়ী দাঁড় করালাম। কেমন আছো, কি করছ বলো দেখি? চেহারা এমন শুক্‌নো কেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া প্রসাদ বলিল—সংগ্রাম! তারপর, তুমি কি করছ?

—এই, ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাই; 'oil' করতে হ'চ্ছে। একটা সাব্‌-ইন্‌স্পেক্‌টরির চেষ্টায় আছি।

—বেশ, বেশ; অনেকদিন পরে দেখা হ'ল। ঠিক তেম্‌নি আছো দেখছি!

—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের দয়ায়!

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শশধর ট্যাক্সিতে উঠিয়া চলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও ঠিকমত জানে না, বা বোঝে না, তবু জনস্রোতের মাঝখানে চেনামুখ দেখিলে ট্যাক্সি দাঁড় করাইতে হয়। দুইটি কুশল প্রশ্ন—আর বিশেষ কিছুই নয়!

দিন চলিয়া যায়। বৃদ্ধ মহাকাল যেন অক্ষ-গুটিকার মালা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বারে বারে সেগুলি গণিয়া চলিয়াছে। প্রসাদ জীবন-সংগ্রামের রুদ্র-দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় পথ চলিতে চলিতে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হইল।

—আর সুখ নেই হে, বেঁচে সুখ নেই!

প্রসাদ নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—তবু সে তার চিহ্ন রেখে গেছে। তারই জন্যে কোনোরকমে টিঁকে থাকতে হবে। হাঁ দেখো, আবার বিয়ে করেছি হে—নইলে বুঝছ ত, ছোট্ট দু'টি মেয়ে,—আমাকে ত জানোই—চিরদিন অগোছালো!

প্রসাদ মাথা-তুলিয়া জামাইবাবুর চোখের দিকে চাহিল।

—তা ভাই, কি করি বলো? যাকে এনেছি, সে অতি বদ্‌খত্‌ মেয়ে। এখন ভাবছি, বিয়ে না করলেই ছিলো ভালো! মেসে-হোটেলে থাকার অভ্যেস কি আর তোমার দিদি আমার রেখেছে? তাইতেই আবার বিয়ে করতে হ'ল!

প্রসাদ কোনো কথা বলিল না।

—তা দেখো, বাসা আবার করেছি। পারো ত যেয়ো একদিন; ভাগ্‌নী দু'টো ত আছে তোমার? দেখে এসো একদিন!

বলিয়া জামাইবাবু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিলেন। প্রসাদ বলিল,—আচ্ছা, যাব একদিন, আজ আসি!—বলিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

অনেক পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্তি আসিল না। রাস্তা দিয়া নক্ষত্রবেগে যান-বাহন ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষ চলিয়াছে অজস্র। সমস্ত পৃথিবী যেন ইহারা পদ-দলিত করিয়া ছুটিতে চায়।

প্রসাদের চোখের সম্মুখে মানুষগুলি যেন সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল—শশধর, রামহরি, কিঙ্কর, অমিয়, পরেশ, নীরেন, লোকেন, জামাইবাবু, দিদি, আরও অনেকে। তাহার পরে যেন আরও আসিতেছে—দীর্ঘ বিসর্পিত দেহ—বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র ভঙ্গী! কেহ উজ্জ্বল, কেহ মলিন, কেহ ছায়াচ্ছন্ন, কেহ বা অস্ফুট!

প্রসাদ আর চলিতে পারে না—ক্লান্তিতে দেহমন ভারাক্রান্ত, অবশ হইয়া আসে!

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

এরিক্ মারিয়া রিমার্ক্

—All quiet on the Western Front.—

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

গ্রাম-প্রান্তের ক্ষুদ্র পাঠশালা। ভবিষ্যতের রঙীন দীপ্তি মুখে নিয়ে উন্মেষ-উন্মুখ কিশোর ছাত্রের দল ছোট্ট ঘরগুলিকে মুখর ক'রে তুলেছে!

কি-যেন্-একটা চাপা আশঙ্কায় স্কুলের কর্তৃপক্ষের দল মৌন মুখে ব'সে আছেন; অনাগত বিপদ্‌পাতের সম্ভাবনায় তারা আজ যেন সন্ত্রস্ত!

পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ বেধেছে! হুকুম এসেছে—সৈন্য চাই!

স্কুল-বাড়ি সেনাসংগ্রহের কুঠিতে পরিণত হয়েছে। পিতামাতার সঙ্গে এসে ছাত্রেরা নাম লিখিয়ে যাচ্ছে। সমরসচিব দ্বিগুণ উৎসাহে বক্তৃতা দিতে থাকেন—জননী জন্মভূমিশ্চ ইত্যাদি। পিতামাতার চোখের উদ্‌গত অশ্রু তাঁর ঘূর্ণ্যমান নয়নের বহ্নি-তেজে বাষ্প হ'য়ে উঠে যায়! খাতার পাতায় শেষ নাম লেখা হ'ল—এরিক্ মারিয়া রিমার্ক্ (Erich Maria Remarque)। বয়স আঠারো! নিবাস রাইন্‌ল্যাণ্ড। সেই স্কুলের ছাত্র।

নবনিযুক্ত সৈনিকের দল সহরের ভিতর দিয়ে কুচ-কাওয়াজ ক'রে চলে। চোখে তাদের তখনো স্বপ্নের ঘোর,—মনের মধ্যে সুদূর গ্রামপ্রান্তের নীরব আহ্বান! অগণিত পুরনারীর সজল দৃষ্টি দেবতার মৌন আশীর্ব্বাদের মতো তাদের মাথায় ঝ'রে পড়ে। কিশোর রিমার্ক-এর মনে তাঁর বিধবা মায়ের শেষ-বিদায়ের আকুল দৃষ্টিখানি ভেসে ওঠে; পা শিথিল হ'য়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের ওপর চাবুকের ঘায়ে তিনি সজাগ হ'য়ে ওঠেন—অব্যক্ত আর্ত্তনাদ বুকের মধ্যেই গুমরে ম'রে যায়! সামরিক অনুশাসন রক্ষা করতে করতে যে ওপরওয়ালা তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে চলেছেন, তাঁর স্বপ্ন দেখা চলে না, এবং অপরকে সেকাজে তিনি প্রশ্রয়ও দিতে পারেন না।

রণক্ষেত্র। উদার মৃত্যুর অবাধ তাণ্ডব-লীলা! এখান-কার অভিধানে স্নেহ-প্রেম, মায়া-মমতা নেই! এখানে আছে শুধু—শত্রুর সাথে গলাগলি, আর মৃত্যুর সাথে মিতালি। কিন্তু শুধুই কি তাই? দেশের বিরাট রাষ্ট্র-তন্ত্র নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কেমন ক'রে তার সন্তান-দের ধীরে ধীরে মানুষ থেকে অমানুষ, দেবতা থেকে দানব ক'রে তোলে,—সৈনিক রিমার্ক্ সে মর্ম্মন্তুদ অভিজ্ঞতাও লাভ করলেন প্রচুর! যে বিপক্ষকে কোন দিন চিনিও-না, যার কাছ থেকে কখনও এতটুকুও অনিষ্ট লাভ করিনি, যে আমারই মতো মানুষ, আমারই মতো হয় ত যার দুঃখিনী মা অন্ধকার কুটীরখানিতে ব'সে পুত্রের কল্যাণ-কামনায় সাশ্রুনয়নে ভগবানের উদ্দেশে অহরহ করুণ কাকুতি জ্ঞাপন করছেন,—তারই বুকে আমার অস্ত্র

হানতে হবে, উল্লাসিত-চিত্তে, নির্ব্বিকারে!—গত মহাযুদ্ধের ভীষণ ধ্বংস-যজ্ঞকে কেন্দ্র ক'রে রিমার্ক গেল-বছর All quiet on the Western Front নামে যে বইখানি লিখেছেন, তাতে লেখকের এই বেদনা-বিদ্ধ আর্ত্ত অভিজ্ঞতাই জাজ্বল্যমান হ'য়ে ফুটে উঠেছে!

যুদ্ধের সময় রিমার্ক-এর মা মারা গেলেন। রণক্ষেত্রের বন্ধুরাও কর্ত্তব্য শেষ ক'রে মাটির আশ্রয় নিলে। সন্ধি হ'ল। জীবিতের দল জনগণের বিপুল অভিনন্দন মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে এল। বীর সন্তান—দেশ-জননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান তারা! কিন্তু তাদের শুষ্ক বিবর্ণ মুখের ওপর উদয়াচলের রক্তলেখা আজ আর এতটুকুও আশার বাণী বহন ক'রে আনে না,—নিজেদের সেই শান্তির নীড়খানি ফিরে পাবার আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না! শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু তাদের ভিতরকার মানুষটি তার সকল কোমল অনুভূতিটুকু আত্মসাৎ ক'রে চিরদিনের মত মরেছে! বয়সে তরুণ, কিন্তু জগতের প্রতি বিদ্বেষে বৃদ্ধ হ'তে অতি-বৃদ্ধ রিমার্ক সবিস্ময়ে ভাবেন—যা আমাদের খোয়া গেছে, সে-ক্ষতি কি আর কোনদিন পূরণ হবে?—লেখকের মনের এই মনোভাবই All quiet on the Western Front-এর মূল সুর।

যুদ্ধ শেষ হ'ল; পৃথিবীর ওপর দিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ব'য়ে গেল। কিন্তু দেশের নবাগত তরুণ বংশধরেরা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল—রুটি চাই, আনন্দ চাই, আলো চাই! কোন সাড়া এল না। সারা দেশ তখন ধুকছে,—মুমূর্ষু, রক্তহীন!

রণশ্রান্ত রিমার্ক শান্তির জন্য পিপাসার্ত্ত হ'য়ে উঠেছেন। —একখানি নিরালা নির্জ্জন কোণ, সকাল-সন্ধ্যায় দু'-টুকরো রুটি,—এইটুকু; ভগবান! শুধু এইটুকু!......

কাজ জুটলো। সুদূর বনান্ত-লেখার পারে যে অখ্যাত-নামা গ্রামটি, তারই পাঠশালার শিক্ষক। চমৎকার! পাঠশালার পিছনে বহুদূরবিস্তৃত জলাভূমির ওপর দিয়ে ডাহুক-ডাহুকী ডেকে যায়, নাম-না-জানা পাখীর কল-কাকলি নিঝুম দ্বিপ্রহরকে মুখর ক'রে তোলে, আকাশ-চুম্বী গাছের পাতায় পাতায় মধ্যাহ্ন-বাতাস ব্যাকুল হ'য়ে ফেরে,—শিশু-ছাত্রদের পাঠন-নিরত রিমার্ক তন্ময় হ'য়ে শোনেন।

কিন্তু তাঁর জীবনে শান্ত-সৌভাগ্যের এ কাক-জ্যোৎস্না বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; দুর্দ্দাম ঘূর্ণীর মতো তাঁর বিচিত্র জীবন দুর্নিবার বেগে ধেয়ে চলে—নিত্য-নব কর্ম্ম-স্রোতে!

অনাথআশ্রমের সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজ থেকে আসে তাঁর ব্যবসায়ের অধ্যক্ষতার পালা,—মোটর-গাড়ীর বিক্রেতা থেকে নাট্য-সমালোচক!

অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবন! তরুণ ছাত্রকে বেহালার ছড়ির প্রতি-টানখানি শেখাতে শেখাতে যে শিক্ষক বিভোর হ'য়ে বিশ্ব-সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হতেন, তিনিই আবার ধনীর কর্ম্মসচিব রূপে ব্যবসায়ের প্রতি অন্ধ্রে-রন্ধ্রে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকে নখদর্পণে রেখে দিলেন! মোটর-গাড়ী বিক্রি করবার জন্যে যে দালাল খরিদ্দারের প্রাসাদের ধারে ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ঘুরে বেড়াতেন, একদিন সহসা তাঁরই লেখনী-নিঃসৃত নির্ভীক সমালোচনায় বার্লিনের নাট্যজগৎ নব চেতনায় স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ল—অদ্বিতীয় নাট্য-সমালোচক এরিক্ মারিয়া রিমার্ক-এর নাম সবার কণ্ঠে!

বর্ত্তমানে রিমার্ক বার্লিনের একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর বয়স বত্রিশ!

গত বৎসরের প্রারম্ভে রিমার্ক তাঁর যুদ্ধ-জীবনের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ ক'রে All quiet on the Western Front রচনা করেন। নিজের সমসাময়িক এই যে অগণ্য দেশবাসী, যারা আজও তরুণ, কিন্তু যাদের তারুণ্য, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ নিষ্পেষিত, যাদের সমস্তটা জীবন আজ রুক্ষ, তিক্ত, মরুময় হ'য়ে গেছে,—তাদের নবীন জীবনের

এই সীমাহীন রিক্ততার জন্ত দায়ী কে?—বইখানির ভিতর দিয়ে জগতের কাছে রিমার্ক এই সুস্পষ্ট প্রশ্নই প্রেরণ করেছেন।

একখানি মাত্র বই লিখে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এর পূর্ব্বে আর কোন লেখকই এতখানি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করতে পারেন নি। ইংরাজীতে অনূদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছ'মাসের মধ্যে তিন-লক্ষ পুস্তক নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

অন্যান্ত প্রায় সকল ভাষাতেই বইখানি ইতিমধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। আস্‌চে-বারের নোবেল-প্রাইজের জয়মাল্য হয় ত এঁর কণ্ঠেই দুলবে। বইখানির এরূপ অপ্রত্যাশিত সমাদর কেউ-ই কল্পনা করতে পারেন নি, —গ্রন্থকার তো নয়ই।

এ কেবল ওদের দেশেই সম্ভব—ভাল লেখার আদর করতে ওরা জানে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্ত্তন

—গল্প—

—শ্রীযুক্তা ইলা দেবী

১

তন্দ্রালস মধ্যাহ্নে নির্জ্জন সোপান বেয়ে দুটি তরুণ-তরুণী কামাখ্যা পাহাড়ে উঠছে। চারিপাশে অথই ঘন অরণ্য, কাঁটাভরা বেত আর চক্রাকৃতিপত্র বন্য-পামের নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ কুঞ্জ হ'তে মণিমাণিক্যের টুকরোর মত প্রজাপতির ঝাঁক শরৎকালের লঘুমেঘের নিঃশব্দ গতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে,—ঘুমের দেশের পরী যেন, গতিভরা কিন্তু বাণীহারা। দূর হ'তে কাঠঠোকরার কর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গীত কোমল হ'য়ে ভেসে আসছে, ঘুঘুর হিল্লোলিত উদাস উচ্ছ্বাস আকাশকে উদাসী ক'রে তুলছে। কোনও খানে এক নাম-না-জানা গাছে একগাছ বনফুল সবুজের বুকে রঙের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুটে আছে। দীর্ঘপত্রের অন্তরালে বন্য-কদলীর গুচ্ছ ভারে ভারে নত হ'য়ে আছে, নিশীথরাতে বনের ঐরাবত নিমন্ত্রণ নিতে আসে সেখানে। কালো পাথরের 'পরে কোথাও শ্যামল শেওলা ভ'রে আছে, কোথাও পার্ব্বত্য সর্প অঙ্গ এলিয়ে পুঞ্জিত ঘৃণার মত জ'মে রয়েছে। বর্ষার বিদায়ের বৃষ্টিচুম্বন তখনও বৃক্ষে পল্লবে শাখায় শাখায় সজল হ'য়ে লেগে আছে। তপঃশীর্ণা অপর্ণার মত বর্ষান্তে ক্ষীণা ঝর্ণার মৃদু রেখা সবুজ আঁধারকে উজ্জ্বল ক'রে এক একবার চমকে উঠছে। এই নিবিড় অরণ্যের ওড়নার আড়ালে পাহাড়টি যেন কোন্ এক রহস্য-জগতে ডুবে রয়েছে। বনের ঘন অন্ধকারে, বিশাল বৃক্ষ-লতায় কী-যেন এক গোপন মন্ত্রের নীরব জপন অহর্নিশি চলছে,—তারই আবেশে সারাদেশ মূর্চ্ছাতুর স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে আছে।

তরুণ তরুণীর হাতে হাত জড়িয়ে নিয়ে বললে—"কী সুন্দর......"

শিপ্রা তার অনুপম চোখের আধেক দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কোন্‌টা অত মন ভোলালো?"

সন্দীপ বললে, "ঘুমজড়ানো দিনের এই দেশটা;—এ সব নিঃশব্দ বনজঙ্গলের সঙ্গে দিনটাও কী আশ্চর্য্য খাপ খেয়েছে দেখ্‌ছ? সবারই একটা ঘুমন্ত ভাব, না?"

"নাঃ, তুমি নেহাৎই কবি হ'য়ে উঠ্‌ছ—"

সন্দীপ বললে, "না হ'য়ে উপায় কি—যে প্রেরণা রয়েছ তুমি সঙ্গে!"

শিপ্রা বললে, "আহা, সত্যের অপলাপ কর' কেন? কবিত্বের খোরাক দিচ্ছে তোমায় এই বিকট জঙ্গল,—আমি নয় গো! আমায় আর ঠাট্টা কেন বাপু?......আচ্ছা, তুমি ছোটবেলায় আর একবার এখানে এসেছিলে, না? তখনও কি এমনই প্রেরণা সব পেয়েছিলে?"

সন্দীপ বললে, "নিশ্চয়, তা আর পাই নি? অনাগত তোমার প্রেরণা থেকে কি আমি ফাঁক পেয়েছিলাম ভাব'?"

শিপ্রা বললে, "ও বাবা, এযে আমায় চোখে দেখার আগে আমার স্বপন চোখে লাগল দেখছি!"

সন্দীপ বললে, "ঠিক বলেছ তুমি!—ওটি আমারই নিজস্ব ভাব। আমি প্রকাশ করব করব করছিলাম এমন সময় দেখি কবি ওটা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন।"

শিপ্রা বললে, "ক'রে ফেলে আমায় বাঁচিয়েছেন। নইলে কবি-সম্রাটের সম্মান লোকে যদি তোমায় দিয়ে ফেলত তা হ'লে গর্ব্বে কি আর তুমি আমার সঙ্গে কথা কইতে, ভাব'?......আচ্ছা তুমি আগেও যখন এসেছিলে, তখনও এ-সব এমনি ছিল না কি?"

সন্দীপ বললে, "হাঁ ঠিক এই রকমই ছিল। পরিবর্ত্তনের কোনও চিহ্ন এর গায়ে দাগ ফেলে না। আর এর একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সেবার মনে আছে যেন একটা প্রচণ্ড শক্তি আমায় কোথায় বনের মাঝে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।"

দুষ্টামির হাসি হেসে শিপ্রা বললে, "ওঃ, তা হ'লে তোমার

একটা প্রচ্ছন্ন অতীত রয়েছে বল? সেই জন্যেই সময় সময় তোমাকে একটু আনমনা দেখি!"

সন্দীপ ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, "ঠাট্টা নয় শিপ্রা,—সে যে কী একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি তা বোঝান যায় না। কোথায় হারিয়ে গেছলাম কিছু মনে নেই—যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষে যখন ঘুম ভাঙলো তখন মানুষের লোক-জন দেখি নি। একটা পাণ্ডা বাড়ী পৌঁছে দেয়।"

শিপ্রা অন্তরে শিউরে উঠল। একটু স'রে এসে উজ্জ্বল চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি সন্দীপের মুখের 'পরে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "সত্যি তুমি হারিয়ে গেছলে এখানে?"

সন্দীপ তার চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে লঘুস্বরে বললে, "হাঁ গো! কিন্তু এবার আর হারাবার জো নেই; তোমার যে কঠিন বন্ধন, তা কাটতে পারে এমন ইন্দ্রজাল ত দেখি নে!"

শুষ্ক হেসে শিপ্রা বললে, "তবু সাবধানে থাকাই ভাল। জান ত কামাখ্যায় এলে মানুষ ভেড়া হ'য়ে যায়। শেষে কি ভেড়া চরাতে চরাতে আমায় হয়রান হ'তে হবে!"

খানিক দূরে যেয়ে একটা সাদা ফুলে ভরা গাছ দেখে সন্দীপ উল্লাসে ব'লে উঠল, "বাঃ, এটি আজও তেমনি রয়েছে, যেমনটি আমি দেখে গেছলাম।"

শিপ্রা তাড়াতাড়ি গোটাকতক ফুল তুলে নিয়ে বললে, "দাঁড়াও, তা হ'লে গাছটাকে ভাল ক'রে চিনে নিই। ওযে আমার 'ভর্ত্তৃমিত্রং'—"

কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। ঘুমপুরীর রাজকন্যার মত নীরব নিথর অরণ্য তার বন-কুন্তল খররৌদ্রে এলায়িত ক'রে নিদ্রামগ্ন হ'য়ে আছে। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ হ'তে দীপ্ত সূর্য্যের রশ্মিধারা ঝ'রে প'ড়ে নিদ্রিতা সুন্দরীর সারা অঙ্গ সন্তর্পণ চুম্বনে ছেয়ে দিয়েছে। মধ্যাহ্নের অলস বাতাস পুষ্পভরা বল্লরীতে দোলা দিয়ে, পল্লবভরা শাখায় কাঁপন লাগিয়ে আপন মনে গোপন বাণী গুঞ্জন ক'রে যাচ্ছে। আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় কলঙ্ক-লেখার মত অতিদূরে দু'একটি শঙ্খচিল আলোর ঝলকে কেঁপে উঠছে। দিনটা যেন রঙীনদেহ কম্পিতপক্ষ মদিরগুঞ্জন-রত ভ্রমরের মত বনে বনান্তে আপনার মূর্চ্ছনার আবেশে উদাস হ'য়ে উড়ে বেড়াচ্ছে!

আলোর প্রশ্রয়ে পাগল প্রকৃতির রূপের লীলায় হ'য়ে শিপ্রাসন্দীপ খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সন্দীপ অতি আদরে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধ'রে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললে, "জীবনটা কি আলোয় ভরা শিপ্রা!"

তার সুন্দর কেশে জ্যোৎস্নাধারার মত আঙুলগুলি একবার ছুঁইয়ে উদাস সুরে শিপ্রা বললে, "কি জানি, আলোর পাশেই ত আঁধারের আভাস।"

সন্দীপ কোমলস্বরে বলল, "কিন্তু অনাগত আঁধারের উদ্দেশে আগত আলোককে উৎসর্গ করার সার্থকতা ত নেই কিছু।"

প্রকৃতির এই উদার সৌন্দর্য্যের সন্ধানে সন্দীপ আজ একেবারে পুলকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। আর কৈশোরের একটুখানি স্মৃতির পরশ লাগা এই স্থানটি এতদিন তার যৌবন-জীবনের কল্পলোকে কুহেলিগড়া অনেক মায়া-স্বপন রচেছে, ভেঙেছে। আজ পুনর্ব্বার শিপ্রাকে সাথে নিয়ে সেই স্থানটিতে আসতে পারায় তার উৎসাহের অন্ত ছিল না, গর্ব্বও যেন খানিকটা ছিল। সামান্য এই পাহাড়টার এতখানি বর্ণনা যে সে করছিল শিপ্রার কাছে, মুগ্ধ হবার মত দৃশ্যও তাতে আছে অনেক।

শিপ্রা কিন্তু তার বিপরীত এক অকারণ অস্বস্তিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ম্লান হ'য়ে পড়ছিল। এই পাহাড়—বনানীর নীরবতা, বাতাসের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস, আলো-আঁধারের আল্পনা সবই তার কাছে অস্বাভাবিক, অনুদার, সৌন্দর্য্যবিহীন লাগছিল। মনে হ'চ্ছিল দিনটা যেন নিতান্তই রুক্ষ রিক্ত শূন্যতায় ধুলিয়ে রয়েছে। অনাগত বিপদদূতের চঞ্চল চরণধ্বনি কি আগে হ'তেই শিপ্রার বুকে বেজেছিল, কে জানে?

আরও খানিক উঠে এসে ক্রমে মন্দির দৃষ্টিগোচর হ'লো—পর্ব্বত-বক্ষে খানিকটা সমতল স্থান, কয়েকখানা নিরালা গৃহ ও প্রস্তর আবাসে মানুষের নিদর্শন বজায় রেখেছে। শুষ্ক কদলীপত্র, পরিত্যক্ত কীটদষ্ট ফলমূলে একটি স্থান ছেয়ে রয়েছে—সেখানে সদ্য হাট ভেঙেছে, মানুষের ভিড় ক'মে গেছে। একটা অস্বচ্ছ জলে ভরা সরোবর;—খানিকটা পাষাণ-আবৃত অঙ্গন-মাঝে অনতিবৃহৎ মন্দির।

পরিচ্ছন্ন দেখে একটা বৃহৎ প্রস্তরের ওপর ব'সে প'ড়ে শিপ্রা জুতো-মোজা খুলতে লাগল। সন্দীপ বললে, "শীঘ্র নাও, ওপরের পাহাড়টা এখনও দেখ্‌তে বাকী।—আমাদের ফিরতে দেরী হ'লে বেবী গোলমাল করবে হয় ত।"

শিপ্রা বললে, "খুব গিন্নী হ'য়েছ গো,—এখন এস মন্দিরে যাওয়া যাক্।"

মন্দির দেখে বাহির হবার সময় শিপ্রার ভক্তির আতিশয্যে ও দর্শনীর মাত্রাধিক্যে পরম পরিতৃপ্ত পুরোহিত শিপ্রার গৌর ললাটে অতিরিক্ত বৃহৎ একটা সিঁদুরের টিপ এঁকে দিলে। পরিত্যক্ত 'গাত্রবর্ণের' মোজা পরতে পরতে সে নানা গল্প জমিয়ে তুললে পুরোহিতের সঙ্গে। বহুকাল আগে সেই কোন্ এক যুগে কে এক না কি রাজা ছিল, তার ছিল দুই রাণী। রূপবতী ছোটরাণীর প্ররোচনায় বড়রাণীকে রাজা দিল নির্ব্বাসন—এই কামাখ্যার পাহাড়ে। মনের খেদে অতৃপ্ত বাসনা বুকে নিয়ে রাণী তার দীর্ঘকেশের ফাঁসি গলায় জড়িয়ে করলে আত্মহত্যা। সেই হ'তে কত দিন কত বর্ষ কত কাল ধ'রে এক অতৃপ্ত অশরীরী আত্মা এই পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরে বেড়ায়, সতেজ সুন্দর মানবকে সে ডাক দিয়ে ফেরে। কেউ স্পষ্ট জানে না, তবে কখনও কখনও না কি অপার্থিব একটা আলো, অপরূপ কী এক ক্ষীণ ঝঙ্কার, অতি মদির তীব্র কি এক গন্ধে না কি বনস্থল দীপ্ত, ঝঙ্কৃত, আমোদিত হ'য়ে ওঠে,—এইটুকুতে তার আভাস মেলে। আর এ পাহাড়ে না কি একটা ভয়াবহ জ্বালাও আছে। গৌরীর বিচ্ছেদে শোকোন্মত্ত শঙ্করের দারুণ ক্ষোভের একটা স্ফুলিঙ্গ বিষ্ণুর সুদর্শনে কর্ত্তিত গৌরী-অঙ্গের সঙ্গেই এর পর্ব্বতশৃঙ্গে এসে পড়েছিল, সেই ক্ষোভ এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে আছে। কামাখ্যা এলে মানুষ ভেড়া হ'য়ে যায় ব'লে যে কিম্বদন্তী আছে তার সাথে এ-সবের একটা যোগসূত্র মেলে।

তিনজনে খানিক নির্ব্বাক হ'য়ে রইল। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ছায়ায় বাতাস যেন ভারী হ'য়ে উঠছিল। জড়তা কাটিয়ে সন্দীপই সব আগে ডাক দিয়ে বললে, "নাও গো শিপ্রা, যতরাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প ত খুব শোনা হ'ল, এবার ওঠো। পুরোহিত মশায়ের কারণের মনমটা আজ জমবে ভাল।—আগে হ'তেই বোধ হয় আমেজ এসেছে তাঁর।"

শিপ্রা অলসভাবে বললে, "বেলা যে গেল।—ওপরে আর নাই বা গেলে। পুরোহিত বললে ওপরে না কি বাঘের ভয়।"

সন্দীপ অধৈর্য্য হ'য়ে শিপ্রার হাত ধ'রে টানাটানি ক'রে বললে, "তুমি কি পাগল হ'লে শিপ্রা? পুরোহিতের কাছে সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার ভয়। যতরাজ্যের ভূতেড়ো গল্পে তোমার বিশ্বাস হ'ল কবে থেকে? কত সাধাসাধি ক'রে এতদিন বাদে যদি বা এলে, অর্দ্ধেক দেখেই ফিরবে? তা কি হয়? ওপরে কত-কি দেখাব চল। ঐ যে প্রকাণ্ড গাছটা—ওর তলায় পাথরে শেওলা কেটে নাম লিখে গেছলাম সেবার, চল গিয়ে দেখি এখনও আছে কি না।"

সন্দীপের আগ্রহ দেখে শিপ্রার আর বাধা দিতে ইচ্ছা হ'ল না। দু'জনে ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করলে। দিনের প্রখরতা-ক্লান্ত আকাশ তখন সায়াহ্নের স্নিগ্ধতার আরতির সূচনা করছিল। দিগন্তে সূর্য্যের শতশিখার নৃত্যসভার প্রদীপ নিভে আসছে। অরণ্যের অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে ক্লান্তির গাঢ় নিদ্রার কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠছে। উর্দ্ধে অরণ্য আরও গভীর হ'য়ে উঠেছে। চারিদিক এত নিস্তব্ধ-নিঃশব্দ—নিঃশ্বাস-গ্রহণেও যেন সঙ্কোচ লাগে। ভ্রূকুটিকুটিল অরণ্যনিবিড় ধ্যানগম্ভীর গিরিরাজ শঙ্করের মত মহা-যোগাসনে সমাসীন,—নন্দীর হেমবেত্রতলে বিশ্বচরাচর যেন স্পন্দনহীন গতিহীন হ'য়ে প'ড়ে আছে। চারিপার্শ্বের এই একান্ত নীরবতার ছোঁয়াচ বোধ হয় পথিক দু'জনার মনেও লেগেছিল, তারাও ভাষা হারিয়ে নীরবে চলেছিল। সহসা দু'জনেই চমকে উঠল অকারণে,—আরও কাছে স'রে এসে পরস্পরের হাতে হাত জড়িয়ে ধরল, নয়নে নয়ন বুলালো একবার।

সন্দীপ শিপ্রার নীরব অস্বস্তি মনে মনে অনুভব ক'রে তাকে সহজ ক'রে তোলার জন্য লঘুসুরের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করল, "এত চুপচাপ কেন গো শিপ্রা, ভূতের ভয়টা মনে জাগছে বুঝি এখনও?"

ঈষৎ হেসে শিপ্রা বললে, "ভূত নয় গো, ভূত নয়—পেত্নী!"

তাকে সস্নেহ আলিঙ্গনে বেঁধে সন্দীপ বললে, "আমি অভয় দিচ্ছি,—মাভৈঃ!"

শিপ্রা কাছে স’রে এসে মৃদুকণ্ঠে ঊর্দ্ধমুখে সন্দীপের চোখের পানে তাকিয়ে বললে, “আমার ভয় কর্চ্ছে...”

সন্দীপ তার সবল বাহু দিয়ে শিপ্রাকে চেপে ধরল, মুখে কিছু বললে না। পৃথিবীর সমস্ত বিপদ হ’তে, সমস্ত অপমান হ’তে শিপ্রাকে রক্ষা করতে পারে এই বাহু-দুটি—সেইটাই সন্দীপ মৌন ভাষায় জানিয়ে দিলে। পরে বললে, “এ যাত্রায় তোমার বুঝি ঐ রূপকথাটাই সবার চেয়ে চিত্তাকর্ষক লাগল ?”

শিপ্রার মনে তখন কিসের একটা দ্বন্দ্ব বেধেছে সে ই জানে। সে বললে, “আচ্ছা নেপলসএ থাকতে ভিসুভিয়াসে ওঠা তোমার মনে আছে ত ?—আমার মনে হয় এই পাহাড়টার সঙ্গে কোথায় তার একটা মিল আছে।”

সন্দীপ বললে, “অবাক করলে তুমি শিপ্রা ! কোথায় সেই ভস্মের স্তূপ—অগ্নিময় ভিসুভিয়াস, আর কোথায় এই শ্যামলসুন্দর কামাখ্যা। তোমার কল্পনাশক্তি যে খুব প্রচণ্ড তাতে সন্দেহ করি না, নইলে তুমি এ দু’য়ে মিল দেখতে পাও ?”

চিন্তিতভাবে শিপ্রা বললে, “কি জানি—ঠিক ধরতে পারছি না। তবে ভিসুয়াস আর কামাখ্যা দুটোই সমান কদর্য্য এটা ঠিক।”

শিপ্রার উপমায় কল্পনাটা সত্যিই যে অতিরিক্ত দূর-বিস্তৃত হ’য়ে গেছল সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ ছিল না। ভিসুভিয়াসের সাগরপারে সরলভাবে দাঁড়ানো রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি—সবুজের শেষ চিহ্নটুকুও তার দেহ হ’তে মলিন হ’য়ে মুছে গেছে,—জ্বলন্ত তরবারির আঘাতে যেন ধরার শ্যামল অঞ্চল উন্মোচিত হ’য়ে গেছে সে দেহ হ’তে। প্রস্তরীভূত খণ্ড খণ্ড গন্ধকে আবৃতগাত্র যেন আদিম কালের অতিকায় অস্পৃশ্য একটা কণ্টকদেহ কঙ্কাল ! সহসা দেখলে মনে হয় শান্ত বুঝি, কিন্তু অতর্কিতে আগুনের বিদ্যুৎ অশুভ উচ্ছ্বাসে যখন বেরিয়ে এসে খানিকটা চূর্ণ প্রস্তর বর্ষণ ক’রে আকাশে মিলিয়ে যায়, তখন বোঝা যায় কত বড় অশান্ত ও, কী অনির্ব্বাণ অগ্নি ওর বুকে দিবারাত্রি ফণা মেলে গ’র্জ্জে উঠছে। তার সাথে কামাখ্যার এই শ্যামল বনানীর কী সাদৃশ্য—ধরা কঠিন।......তবু শিপ্রার আজ কেবলই মনে পড়ছিল সেই মক্ষি-গুঞ্জরিত কমলাকানন পেরিয়ে “ফ্লুগ” রেলওয়ের গ্যালারি দেওয়া ট্রেনে ভিসুভিয়াসের গা বেয়ে ওপরে ওঠা, গন্ধকের গন্ধমন্থর বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্বাস নেওয়া, দগ্ধ-লাভার ঝামা ছড়ানো ঘন ভস্মের প্রলেপ লাগানো অদ্রির ওপর দিয়ে ক্রেটারের কাছে রেলিংএ হেলে ভিসুভিয়াসের বুকের ধক্‌ধকানি শোনা ;—উৎসাহের মাঝে কী আতঙ্ক সেদিনে। বিলুপ্তযুগের বিয়োগব্যথায় সে অদ্রির বুকের ছন্দ নাচে—কত সুন্দরের সমাপ্তি-বেলায়, কত মধুরের ধ্বংস-লীলায় বুকের সে আগুনের স্পন্দ বাজে। রুদ্র যেন র’য়ে র’য়ে অসহ্য রাগে অনল-আঙুলে আপন বক্ষ বিদীর্ণ ক’রে অগ্নিরক্তে রাঙা হ’য়ে উঠছে। শিপ্রার মনে হচ্ছিল সেই অমঙ্গলের রাজা অরণ্য-ঘন আবরণ-আড়ালে এখানেও কোথায় যেন বসে আছে—উপকথার রাক্ষসীর মুখের মত বিষাক্ত রসনা মেলে নির্ব্বাক অচপল হ’য়ে। ভিসুভিয়াসে যে উত্তেজনায় উন্মত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিস্ফুট, এখানে সে-ই ভয়ঙ্কর এখনও আড়ম্বরে গম্ভীর, আয়োজনে অচঞ্চল। ভিসুভিয়াসে যে ক্রোধে পাগল হ’য়ে অগ্নিনৃত্যে অনলশিখায় আত্মপ্রকাশ করছে, আর এখানে কামাখ্যায় সে-ই রুদ্র নির্ব্বিকার যাদুকররূপে তার অনিবার্য্য মায়াজাল গিরিদেহে বনবনান্তরে বিস্তৃত ক’রে একান্ত নিশ্চলতায় সবুজ ছদ্মবেশ প’রে অন্তরালে অপেক্ষা করছে—বনরাজির অন্তঃস্থল সেই সুদূর আগ্নেয়গিরির বুকের মতই রহস্যে আতঙ্কে আসন্ন হ’য়ে আছে।

পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবশেষে তারা উঠল এসে। সন্দীপ বললে, “যাক, অতিকষ্টে তোমায় টেনে আনা গেছে। কী সুন্দর নীচেটা দেখাচ্ছে চেয়ে দেখো ! না এলে এমন দৃশ্যটি ত আর দেখা হ’ত না।” শিপ্রা মৃদু হাসলে শুধু। সন্দীপ বললে, “এ মন্দিরে ত কাউকে দেখছি না। তুমি এখানে দাঁড়াও ত, আমি এগিয়ে একটু ডাক দিয়ে দেখি ; না ব’লে ক’য়ে মন্দিরে ঢুকলে যদি চোর বলে শেষে ?”

শিপ্রা সামনের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আকাশে অরণ্যে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ ব’য়ে যাচ্ছে। নিম্নে পাহাড়ের পাদমূলে গৌহাটি যাবার পথখানি শুকনো পাতার রাশ ঠেলে এঁকে বেঁকে চ’লে গেছে। পথের পাশে

এক এক স্থানে ভীমমূর্ত্তি কিরাতের দল কদাকার শূকরের পাল চরাচ্ছে, দূর হ'তে তাদের কর্দ্দমপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র অথচ বিকট দেখাচ্ছে। দূরে গৌহাটি সহর সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ার স্বপ্নমায়ায় সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। চারিপাশের শ্যাম-লতার সাগর-মাঝে গৃহের চিহ্ন, পথের চিহ্ন শিল্পীর তুলির টানের মত এখানে ওখানে লেগে আছে। আর এক পাশে ব্রহ্মপুত্র শেষবর্ষার আবেগভরা উচ্ছ্বাসে সূর্য্যাস্ত-রাঙা হ'য়ে নৃত্যতালে চলেছে,—দূর হ'তে তার তরঙ্গচাঞ্চল্য অস্পষ্ট হ'য়ে অপ্রগল্‌ভ দেহখানি দেখা যাচ্ছে শুধু।

সন্দীপ তাকিয়ে দেখলে কী মৌন চারিদিক! মন্দিরের দরজা শিকল দিয়ে বন্ধ, কেউ কোথাও নেই। একবার শিপ্রার পানে তাকিয়ে সন্দীপ গাছের অন্তরালে এগিয়ে গেল; শীতের দিনে সিক্ত বসনাবৃত দেহে শীতল হাওয়া যেমন শিহরণ ছড়িয়ে দিয়ে যায়, সহসা একটা অতি-মৃদু সুর অচঞ্চল অরণ্যের বুকে তেমনি ঈষৎ শিহরণ তুলে ভেসে এল বহুদূর দূরান্তর হ'তে,—'আয়, আয়, চ'লে আয়।'

সন্দীপ চমকিত চক্ষু মেলে ঝাপসা বনের অন্ধকার অন্তরে তাকালে...কে ডাকে অমন ক'রে?... এত নেশা কোথা হ'তে এসে পলকে তাকে জড়িয়ে ধরল!...এ কি সেই চিরন্তন সুর যে সুরে ঊষা দিবসকে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়, আয়, আয়'!...যে সুরে গ্রহ উপগ্রহকে ডাকে, মহাসাগর তটিনীকে ডাকে, 'আয়, আয়, আয়!'...ওরে, সে কি এতদিন এই ডাকের অপেক্ষাতেই ঘুরে মরছিল?...এই ডাকেই তার জীবনতরু কি ফুল্ল হ'ল? উদাস আকাশ কি এই সুরে অলস মধ্যাহ্নকে ডাক দিয়ে বলে, 'নীলাগলানো সুধা নিবি আয়!...ওরে, আর কি বন্ধনে থাকা যায়?.. এই রহস্যময় সুরেই অসীম যে যুগে যুগে মানুষকে কবি করেছে, কর্ম্মী করেছে, সন্ন্যাসীর সাজে বাহির ক'রে নিয়ে গেছে!...কী তন্দ্রায় এতদিন তার চিত্ত ডুবে ছিল রে! নিত্যকার সীমাবন্ধনের মাঝে যে অসীমের ডাক বার বার আঘাত জানিয়ে গেছে, 'জাগো, জাগো,' তবু সন্দীপ ত জাগে নি, শুধু স্বপ্নই দেখেছে!...ওরে, এইবার ঐ ডাক শুনে তার পায়ের বেড়ী, হাতের শিকল ঝম্ ঝম্ ক'রে খুলল রে! এতদিনে কি তার আত্মা জেগেছে,—চিত্ত কি তাই সাড়া দিয়ে বলে, বুঝি সময় হ'ল...।

সন্দীপের মনে হল, কালের মালা হ'তে এই অপার্থিব অপূর্ব মুহূর্ত্তটি হঠাৎ যেন খ'সে পড়ল বিকীর্ণজ্যোতি মণির মত; আবেষ্টন নেই, বন্ধন নেই, যুগযুগান্তের পুঞ্জিত সৌন্দর্য্য শুধু মহাশূন্যে উল্কাপ্রদীপের মত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে, এখনি নিভে যাবে নিঃশেষে হয় ত। আনন্দ-লোকের নিশানার এই ত ইসারা জানায়।...এবার তবে ঐ অনাস্বাদিত আনন্দের লেলিহান বহ্নিমাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাক...। সৃষ্টি-বিধ্বংসী এক প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের আলোড়নে সন্দীপের সমস্ত অতীত চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে কোথায় ধ্বংসে পড়ল, বর্ত্তমান কোন্ মহা নিষ্ফলতায় ভেসে গেল,—ভবিষ্যতের রঙীন আকাশ ঘনতিমিরপ্রলেপে কোথায় অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। দানবীয় একটা আকর্ষণশক্তি তাকে প্রবল পরাক্রমে টেনে নিয়ে অরণ্য-মাঝে উদ্দামগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল,—তার চিহ্নের লেশটুকুও অবশিষ্ট রইল না। আফ্রিকার মাংস-ভোজী উদ্ভিদের মত জীবন্ত মানবকে গ্রাস্ ক'রে বিপুল অরণ্য আবার স্থির শান্ত অনুচ্ছ্বাসময় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শিপ্রা অনেকক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে ছিল। দেরী দেখে তার চমক ভাঙল। ফিরে তাকিয়ে সন্দীপকে দেখতে পেলে না। সে উদ্বেগে অধীর হ'য়ে দ্রুত মন্দিরের দিকে ছুটে গেল, চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথায় সন্দীপ...? এই আসন্ন অমঙ্গলের আভাসেই আকুল অন্তর বুঝি তার বারম্বার চমকে উঠেছিল! ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে সে ডেকে উঠল, "ওগো, কোথায় গেলে, কোথায় তুমি?" পর্ব্বতে-কন্দরে সে ধ্বনির কানাকানি উঠল শুধু—'কোথায় তুমি, কোথায় তুমি?'

২

নৃত্যপুলক-গীতিমুখর প্রশস্ত গঙ্গার পারে একখানি শুভ্র দ্বিতল গৃহ। ভাঙনের টানে গঙ্গা ক্রমেই এগিয়ে এসে উদ্যানের সীমাদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তারই তটপ্রান্তে উদ্যান-

মাঝে উন্নত ঝাউ আর অতুল গুপারী গাছের তলে বেত্রাসন পাতা রয়েছে। পদ্মের পাপড়ির মত পঞ্চমীর ক্ষুদ্র এক-টুকরো চাঁদ কুণ্ঠিতচরণে ঝাউ-গাছের ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে ভীরুনয়নে তাকিয়ে আছে। তার মৃদু চুম্বনে নদীতরঙ্গ ঝকমক করছে,—গৃহখানি ও পুষ্পতরুগুলি তার রূপালি স্নেহে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। বেত্রাসন' পরে একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ হেলে ব'সে হস্তস্থিত সিগারে এক একবার টান দিচ্ছেন। তাঁর পাশে পুরু ঘাসের ওপর রঙীন শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে ব'সে এক তন্বঙ্গী তরুণী সেতারে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছে। বৃদ্ধ তার পানে স্নিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু মন তাঁর অজানা কোন্ লোকে উধাও হ'য়ে গেছে,কে জানে।

মাঝ-পথে সেতার সহসা থেমে গেল। বৃদ্ধ বললেন, "থামলে যে" ?

"তরুণী বললে, "আর, ভুল হ'য়ে গেল যে দাদু,—তুমি কিচ্ছু শুনছ না!"

"শুনছি না কিরে? এমন জলজ্যান্ত ব'সে কাঠের মত নির্বাক-বিস্ময়ে শুনছি, তবু তোমার শোনা হ'ল না?"

"সেতার শুনে বুঝি তুমি কাঠ হ'য়ে গেলে দাদু! তুমি নেহাৎ বেরসিক। কোথায় গদগদ-চিত্তে বলবে, 'মৌন ভাঙি গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর,' তা নয়, কাঠ হ'য়ে গেলে। থাকত যদি ওমর খৈয়াম!"

"তোমার ওমর খৈয়ামই ত বৃদ্ধরাজ্য হ'তে সব কবিত্ব লুটে নিয়ে একচেটে ক'রে রেখেছে; আমার জন্যে বাকী রেখেছে কিছু?"

"তা হ'লে আমার এই বেরসিক দাদুটিকে দেখছি বয়কট করতে হ'ল।"

"তরুণী-রাজ্য হ'তে বুড়োরা অনেকদিনই ত বয়কট হ'য়েছে ভাই! তোমাদের স্তাবকতা করতে খৈয়ামের নবীন এডিসন অনেক মিলবে।"

খঞ্জননয়নের চঞ্চল কটাক্ষ হেনে তরুণী লঘুহাস্য-সহ বললে, "আহা, তা হ'লে আমার দাদুর একটি প্রবীণা প্রণয়িনীর অভিযানে আমাকে এখনই যেতে হয়!"

বৃদ্ধ সিগারটার শেষটান দিয়ে যেন গভীর হতাশ-ভরে ফেলে দিয়ে বললেন, "সে আশাও নেই দিদি! সেই রাজপুত্রীর গল্প জান ত?—প্রথম বয়সে বিয়ের জন্ত কত রাজপুত্র তাঁর দুয়ারে লুটালে, তিনি হেঁকে বললেন, 'দেবপুত্র চাই।' আর একটু বয়স হ'ল, রাজপুত্র আর আসে না; মন্ত্রীপুত্র ধন্না দেয়, তখন রাজকুমারী বল্লেন, 'আচ্ছা, রাজপুত্র হ'লেও চলবে।' শেষে রাজপুত্রীর কালো কেশে যখন শারদ মেঘের শুভ্র ছায়া পড়তে সুরু হ'ল, তখন মন্ত্রীপুত্র ত কোন্ ছার, কোটালপুত্রের দলও ধন্না দিয়ে ফিরে গেছে। রাজপুত্রী কিন্তু বলছেন 'কোটালপুত্র হ'লেও চলবে।' এমনি ক'রে তাঁর আর বিয়ে করা হ'ল না। আমাদেরও সেই দশা!—প্রবীণারাও ঘেঁসতে চান না।

"আহা অত হতাশ হ'য়োনা দাদু!"

তাঁর কাশশুভ্র হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন, "হতাশ হব কিরে, প্রণয়িনীর গভীর আহ্বান আমি যে এবার স্পষ্ট ক'রে শুনতে পাচ্ছি; তাই ত আবার বহুকালের ভুলে-যাওয়া কথাগুলো তোর উপর দিয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছি,—বুঝতে পারিস না?"

"আহা দাদু, তাই বল। তোমার পাকাচুল তাই বুঝি দিন দিন এত শ্রী ধারণ কর্চ্ছে? আর তাই বুঝি কাল খবরের কাগজে চুলের কলপের বিজ্ঞাপনটার ওপর অত ক'রে চোখ দিচ্ছিলে? ভয় নেই তোমার,—বিরহিণী নিশ্চয় কোনও মণিহর্ম্ম্যে একাকিনী অশ্রু ঝরাচ্ছেন! তোমার যদি আর ধৈর্য্য না থাকে ত তাঁর সন্ধানে না হয় অভিযান আরম্ভ কর না?"

"অভিযানের দেরী নেই আর। আপাততঃ তুমি যার জন্যে দেহলীদত্তপুষ্পা হ'য়ে আছ তাঁর শুভাগমন হ'লেই, আমি আস্তে আস্তে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে আমার সেই ওপারের প্রণয়িনীর উদ্দেশে মহাযাত্রা করব,—কলপের আর দরকার হবে না, সে দেশে যে জরা নেই!"

"দাদু—"

গভীর অনুযোগভরা ছলছল নেত্রে তরুণী বৃদ্ধের পানে তাকালে। বৃদ্ধ তার পানে হস্ত প্রসারিত ক'রে অতি স্নিগ্ধ-কোমল স্বরে বললেন, "স'রে আয় শুক্লা!"

সেতারটাকে তৃণশয্যায় শায়িত ক'রে শুক্লা স'রে যেয়ে বৃদ্ধের জানুর ওপর মুখ রেখে পায়ের তলে বসল। তিনি

গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। বৃদ্ধের অতীতজীবনের লুপ্ত ইতিহাস সুপ্ত অন্তরের মুক্তদ্বার পথে আবার যেন প্রকাশ পেল। তাঁর একমাত্র পুত্র সন্দীপের অস্বাভাবিক তিরোধানে তিনি হতাশ না হ'য়ে অদম্য উদ্যমে, একান্তপ্রচেষ্টায় ও অজস্র অর্থব্যয়ে তাকে ফিরে পাবার আশা করলেন, কিন্তু কেহ তাঁকে সন্দীপের লেশমাত্র সন্ধানও শোনান না; শোনান কতকগুলি আষাঢ়ে-গল্প। শিপ্রার পানে চেয়ে বৃদ্ধকে শোক সংযত ক'রে দাঁড়াতে হ'ল, কিন্তু সন্দীপের তিরোধানের পর থেকে শিপ্রার মুখে কেউ আর হাসি দেখেনি। সে যেন নিশান্তের মিলনবাসরের ঝ'রে পড়া ফুলদাম,—দীপান্বিতারাত্রি-শেষের ক্ষীণজ্যোতি প্রদীপের মত। বৃদ্ধ জানতেন সংসারের কোনও বাধাই তাকে আর ধরে রাখতে পারবে না, শুক্লাও নয়। তাই একদিন সূর্য্যাস্ত-রঙীন আকাশের তলে শিপ্রার চিতা-অগ্নি যখন ধীরে ধীরে নিভে গেল, বৃদ্ধ গভীর শোকের মাঝেও একটা পরিত্রাণের দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ভাবলেন, আহা হতভাগিনী জুড়িয়ে গেল! তারপর অষ্টাদশবর্ষ কেটে গেছে, শুক্লা বেড়ে উঠেছে তার মায়েরই প্রতিমূর্ত্তির মত,—উপলচুম্বিত ঝর্ণা-ধারার মত অকুণ্ঠ স্বরলহরী ও বাদলদিনের কাজল-মেঘের আঁধারে রচা চোখ দিয়ে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

......আজ সকালের ডাকে কে একজন পুরানো পরিচিত বন্ধু যেন সংবাদ দিয়েছে সন্দীপকে না কি পাওয়া গেছে...সে না কি যেখানে অন্তর্হিত হয়েছিল সেইখানেই ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। এমন সন্ধান ত কতবারই এসেছে। কত নিদ্রাহারা রজনী, কত কর্ম্মভোলা দিন যে এমনি আশায় কেটেছে! বাতাসের নিশ্বাসে বাইরে ছুটে আসা, চ্যুতপত্রের পতনে চমকে কেঁপে ওঠা...তবু সে ত আসেনি। তথাপি থেকে থেকে বৃদ্ধের মনে হ'চ্ছিল যদি আবার সন্দীপ সত্য সত্যই ফিরে আসে? যখন সময় ছিল, যখন এলে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠত, বুকের রক্ত আনন্দে নাচত, তখন সে ত আসে নি! আজ সে যদি আসে স্মৃতির শ্মশানে, যেখানে তার জীবনের সম্পদ নেই, কামনার ধন নেই; শুধু নদীতীরে একটি স্তম্ভের নীচে একমুঠো ভস্ম প'ড়ে আছে!...ওরে, আজ যে শিপ্রা নেই!...

লাল কাঁকর-ঢালা পথে কার শুভ্রবেশের আভাস সহসা দেখা দিল। বৃক্ষের ছায়া-আলিঙ্গন হ'তে মুক্ত হ'য়ে পথখানি যেখানে বেঁকেছে, সেখানে এসে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আগন্তুকের অবয়ব স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। বৃদ্ধ চকিতনয়নে তার দিকে তাকালেন,—ওই গর্ব্বিত ভঙ্গীর পদক্ষেপ, ও যে তাঁর রক্তের সাথে চেনা!

সন্দীপ সোজা এসে বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াল। মৌন-বিস্ময়ে তাঁকে দেখে বললে, 'তুমি!...এত বুড়ো হ'য়ে গেছ!'

বৃদ্ধ ভীতিবিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলেন অষ্টাদশবর্ষের জরাভার তাঁর পুত্রের কেশাগ্রটুকুও স্পর্শ করেনি। কোন্ রুদ্ধজরা ঘুমপুরীর দেশ হ'তে ফিরে এল এ! বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুজল আজ বৃদ্ধের আর বাধা মানল না; দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে তিনি ভগ্নকণ্ঠে ডাকলেন, "সন্দীপ, সন্দীপ..." তারপর মূর্চ্ছিতের মত মাটিতে ব'সে পড়লেন।

সহসা শুক্লাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সন্দীপ এগিয়ে যেয়ে গাঢ় স্নেহে তার হাত ধ'রে ডাকলে—'শিপ্রা!'... কিন্তু এ ত শিপ্রা নয়, অথচ তারই মত! সন্দীপের মনে হ'ল, এ কী প্রহেলিকা-মাঝে ভগবান তাকে ফেলেছেন! শিপ্রা যে ছিল আলো,...এ যেন এখনও আভা; শিপ্রা ছিল বসন্তের মদিরচুম্বনে বৃন্তদ্বার মুক্ত ক'রে সহসা-বিকশিত কুসুম-মঞ্জরী,—আর এ যেন আজিও বৃক্ষের বক্ষের নিহিত কামনা। সন্দীপ অধীর কণ্ঠে ডাকলে, "শিপ্রা কোথায় গেল?...এ কে?"

শুক্লা এতক্ষণ বিপুল বিস্ময়ে, উদ্বেগে, ভয়ে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল; বৃদ্ধের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদু, দাদু, এসব কি!"

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে উঠলেন, আস্তে আস্তে বিমূঢ়তার পাশ হ'তে মনটাকে সবলে মুক্ত করলেন, তারপর মৃদুগম্ভীর স্বরে বললেন, "সন্দীপ, আজ হ'তে আঠারো বছর আগে তুমি জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে গেছলে।...এ শুক্লা, তখন ছিল শিশু, আজ বড় হ'য়েছে। শিপ্রা—নেই।...

সহসা অন্তঃস্থিত অগ্নিআবর্ত্তের ভয়াবহ আলোড়নে আগ্নেয়-গিরির মূল হ'তে গলিত লাভার রাশি যেমন শ্যামল শস্যপূর্ণ ভূমিকে একমুহূর্ত্তে ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত করে, তেমনি

একটা অন্তর্ভেদী ভীষণ আলোড়ন সন্দীপের সতেজ যৌবনশ্রীকে মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলুপ্ত ক'রে অষ্টাদশবর্ষের নিরুদ্ধ জরার প্রস্রবণ যেন তার সকল অঙ্গে ছাপিয়ে দিল।

সেই বিপুল ভারে তার উন্নত দেহ নুয়ে পড়ল, তার মুখ হ'তে রক্তের শেষচিহ্ন মুছে গিয়ে মৃত্যুমলিন পাণ্ডুরতা ধারণ করল, পুঞ্জিত ক্ষোভে, দুঃসহ নিষ্ফলতার অগ্নিদাহে তার সকল দেহ যেন দগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগল। অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধানের ওপর তার চিত্ত বিদ্রোহী হ'ল, তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ ক'রে বিপুল দীর্ঘশ্বাস-সূহ বেরিয়ে এল তার অন্তিম বাণী,—"এ কথা—মিথ্যা...মিথ্যা..."পশ্চিম আকাশে হেলে পঞ্চমীর পাণ্ডুর চাঁদ তার দীর্ঘপ্রসারিত শুভ্র কর শিপ্রার ভস্মসমাধির 'পরে নির্দ্দেশ ক'রে তখন সন্দীপের অন্তিম অবিশ্বাসের মৌন প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

......তারপর বহুদিন গেছে। আজিও সেই গঙ্গার কোলে নিভৃত উদ্যানের মাঝে দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে পঞ্চমীর রাত্রে সেই উদাস ঝাউ পত্রমর্ম্মরচ্ছন্দে এক একবার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায়।

শ্রীইলা দেবী

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(১)

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আপনার বীরবলী প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে যে চিঠি লিখেছেন (১), আর আপনি তার যে জবাব পাঠিয়েছেন (২) তার শেষে এ কথা লিখে দেন নি যে এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ আপনারা শুনতে চান না। সুতরাং ভরসা ক'রে আমিও একখানা খোলা-চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। কারণ, আপনাদের দুই চিঠিতে আপনারা যে বিষয়ের আলোচনা করেছেন ইউরোপের বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক মহলে তা নিয়ে আজকাল খুব বিচার চলেছে। এ সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত যে বহু পুঁথি লিখ্ছেন তা দিলীপকুমারের চিঠির নামের লিষ্ট ও কোটেশনের বহর দেখেই বোঝা যায়। এই সব পুঁথির দু' একখানা পড়্তে পেয়েছি এবং এ বিচারের বিষয়ে দু'চার কথা বলার লোভ মনে জমা ছিল। আপনাদের চিঠি প'ড়ে সে লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হ'ল।

দিলীপকুমার তাঁর চিঠিতে বিলাতী পণ্ডিতদের বহু বচন তুলে প্রমাণ করেছেন যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান জ্ঞানরাজ্যের যেসব জায়গা জবরদখল করেছিল, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা না-দাবী পত্র লিখে দিয়ে সে-সব জায়গা তাদের প্রকৃত অধিকারীদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। পণ্ডিতদের কথার এই যে নির্গলিতার্থ তা আপনিও মেনেছেন। বিজ্ঞান যেসব জায়গায় অনধিকারপ্রবেশ করেছিল এবং এখন যেখান থেকে সাধুসজ্জনের মত বেরিয়ে আসছে তা যে প্রধানতঃ ধর্ম্মের স্বস্থান এইটি দেখানই দিলীপকুমারের চিঠির উদ্দেশ্য। কথাটা একটু খুঁটিয়ে দেখা ভাল। আধুনিক বিজ্ঞানের তার লীলাভূমিতে প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে খুব বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটেছে দুইবার। প্রথম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে, আধুনিক বিজ্ঞানের শৈশবকালে। দ্বিতীয়বার উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি, আধুনিক বিজ্ঞানের যখন পূর্ণযৌবন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পোপের ধর্ম্মতত্ত্বে পরামর্শদাতা আচার্য্যেরা স্থির করলেন যে সূর্য্য জগতের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল অবস্থিত এবং পৃথিবীর একটা আহ্নিক আবর্ত্তনগতি আছে। এর প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্ব হিসাবে হাস্যকর এবং ধর্ম্মের দিক থেকে নাস্তিকতা, কারণ, বাইবেলের বিরোধী; এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি তত্ত্ব হিসাবে প্রথমটিরই সমকক্ষ এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক থেকে অন্ততঃ পক্ষে ভ্রমাত্মক। এর দুইদিন পরে পোপের আদেশে গ্যালিলিওকে আহ্বান ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'ল যেন ঐ নাস্তিক মতবাদ তিনি অতঃপর পোষণ, প্রচার ও সমর্থন না করেন। ৫ই মার্চ্চ তারিখে কোপর্নিকাসের গ্রহ-গতি সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থের প্রচার-বন্ধের ফতোয়া জারী হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে এই পৃথিবী বহু লক্ষ বৎসরের প্রাচীন সৃষ্টি, এবং বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এর জল-স্থল তাদের বর্ত্তমান আকার ও রূপ পেয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যেসব জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা দেখা যায় সে রকমের জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা প্রথমাবধিই পৃথিবীতে ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সব জীব ও উদ্ভিদ পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল, এবং বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সেই সব রকমের জীব ও উদ্ভিদের কতকগুলি থেকে বর্ত্তমান পৃথিবীর নানা জাতীয় জীব ও উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে, এবং মানুষের জন্মেরও এই ইতিহাস। খৃষ্টান ধর্ম্মের আচার্য্যেরা বললেন এ মতবাদ ধর্ম্মের পরিপন্থী, কারণ বাইবেলের

(১) উত্তরা, কার্ত্তিক, ১৩৩৩।
(২) উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয় বানরের সকুল্য এ কথা যে প্রচার করে সে পাষণ্ড, যে বিশ্বাস করে সে মহাপাপী। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কয়েকটি ধর্ম্মপ্রাণ রাজ্য এই মত-প্রচারের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আইন করেছে, এবং সে আইন-ভঙ্গের জন্য লোকের শাস্তি হ'য়েছে। বিংশ শতাব্দীর উদারপ্রাণ বৈজ্ঞানিকেরা যে ধর্ম্মের খাতিরে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যের অনধিকার-প্রবেশ রদ ক'রে সে স্থান পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, এবং বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বই তত্ত্বকথা ব'লে মেনে নিচ্ছেন সে খবর এখনও পাওয়া যায় নি।

(২)

দিলীপকুমার বলবেন এ দু' জায়গায় সম্পূর্ণ পরের জিনিষকে ধর্ম্ম নিজের ব'লে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল, সুতরাং তারা ছুটে গেছে। কথা ঠিক। কিন্তু তা থেকে কি এই প্রমাণ হয় না যে ধর্ম্মের রাজ্য জবরদখল করা দূরে থাক, ধর্ম্মের কবল থেকে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে করতেই বিজ্ঞানকে চলতে হ'য়েছে? আর জ্ঞানের কোনও ক্ষেত্রে একবার কাজ আরম্ভ ক'রে পরস্বাপহরণের ভয়ে বিজ্ঞান সে ক্ষেত্র ছেড়ে গেছে এরও কোনও দৃষ্টান্ত নেই। বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মভীরু বিজ্ঞানেও নেই। মোট কথা বিজ্ঞানের জবরদখল ও দখলত্যাগ এ দুই-ই অমূলক। দিলীপকুমার বিলাতী পণ্ডিতদের পুঁথি থেকে যার বিরুদ্ধে চোখা চোখা 'কোটেশন'-বাণ নিক্ষেপ করেছেন তা বিজ্ঞান নয়, এক শ্রেণীর দর্শন। দর্শনের কাজ প্রধানতঃ দুইটি। 'জ্ঞান' ব্যাপারটিকে পরীক্ষা ক'রে তার স্বরূপ নির্ণয় করা, এবং জ্ঞান ও অনুভূতির যত কিছু বিষয় এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখে তাদের চরম তত্ত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এ দু'কাজের এক কাজও আমরা করি নে। এবং শুধু না ক'রেই কাজ চলে নয়, করি নে ব'লেই কাজ চলে। আমাদের জীবনধারণ ও সামাজিক জীবনের জন্য আমাদের নিজের শরীর, মন ও চার পাশের পৃথিবীকে জানতে হয়। এ জানা কি ক'রে সম্ভব, এবং সে জানার স্বরূপই বা কি, আমাদের ব্যবহারিক মন সে প্রশ্ন কখনও করে না। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এই জানার উপর ভরসা ক'রে আমরা কাজ ক'রে যাই। যদি কখনও ঠেকি তবে নিজের বুদ্ধিচালনার দোষে বা অসাবধানতায় জানাটা ভুল বা অসম্পূর্ণ হ'য়েছিল ধ'রে নিই; এমন সন্দেহ কখনও করি নে যে বুদ্ধি পদার্থ টিই এমন যে তা দিয়ে সব জিনিষের সব সত্য জানা যায় না, বা জিনিষটিই এমন যে সব সময় তাতে সত্য ব'লে কিছু থাকে না। দার্শনিকেরা বিচার ক'রে দেখান জ্ঞান জিনিষটি পরম রহস্যময়। বিচারে এও ধরা পড়ে—যে জ্ঞানের উপর ভরসা ক'রে আমরা সংসার করি তা লাভের যা-সব উপায় তাদের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করা চলে না। আমরা দার্শনিকদের বিচার ও বিশ্লেষণশক্তির তারিফ ক'রে তাঁদের পরম রহস্যময় বস্তুটিকে নিতান্ত ঘরোয়া জিনিষের মত নিত্য ব্যবহার করি, এবং নির্ভরের একান্ত অযোগ্য জ্ঞানের উপায়গুলির উপর পরম নির্ভয়ে ভর ক'রে জোর সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিই। এই অসামঞ্জস্য যে আমাদের কিছু মাত্র কাবু করে না তার একটা কারণ ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের দ্বিতীয় কাজটি করার আমরা চেষ্টা করি নে। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুভূতিগুলিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে রেখেই আমরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। স্বতন্ত্রতার বেড়া ভেঙে তাদের সকলকে মিলিয়ে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় তা আমরা দেখতে চাই নে। এবং এ রকম মিলনের চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও অনুভূতির মধ্যে যেসব মারাত্মক গরমিল প্রকাশ পায়, এবং সে গরমিল মেটাতে গেলে এই সব জ্ঞান ও অনুভূতির রূপ ও দামে যেসব অদলবদল ঘটে, স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে যা প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড, সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে তা যে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হ'তে পারে সেসব সম্ভাবনাকে আমরা দূরে রেখে চলি। বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা যারা করে তারা দার্শনিক। ঘরকন্নার জগতেও এই সব গরমিলের কথা তুলে যারা গোলমাল ঘটাতে চায় তারা 'ক্র্যাঙ্ক' বা উন্মাদ। আমাদের কাজে কর্ম্মে আমরা আমাদের বিভিন্ন রকমের অনুভূতিগুলিকে এক general electorate-এ আনার হাঙ্গামা পোহাতে চাই

নে, তাদের প্রত্যেককে special electorate দিয়ে সহজে কাজ সার্‌তে চাই।

আধুনিক বিজ্ঞান অধুনাতন লোকের চোখে যতই বিস্ময়কর হোক যে-জ্ঞান এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য তা আমাদের নিত্য-ঘরকন্নার জ্ঞানের সমশ্রেণীর জ্ঞান। এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-আহরণের করণ ও ধরণ ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান-প্রচেষ্টারই মাজা-ঘষা রাজসংস্করণ। কারণ, বিজ্ঞানের প্রস্থানভূমি ও সমাবর্ত্তনক্ষেত্র এ দুই-ই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতি। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত সাফল্য, তার যন্ত্রপাতির জটিল কৌশল, তার সারথি গণিতের অব্যবসায়ীর অনধিগম্য রূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের নিকট জ্ঞাতিত্ব অনেকটা ঢেকে রাখলেও, একটু মন দিয়ে দেখলেই এ দুয়ের শরীর ও মনে একবংশের ছাপ ধরা প'ড়ে যায়। ব্যবহারিক জ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও জ্ঞানের স্বরূপ ও সম্ভাবনার কোনও বিচার করে না। নিতান্ত নির্ভয়ে সে জ্ঞানআহরণের কাজে লেগে যায়, জ্ঞানের চরম স্বরূপ কি এবং আছে কি না এ চিন্তা সে কখনও করে না। পরম নির্ভরের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানজগৎকে জান্‌তে চায়। পাছে এরা ভুল করে এজন্য বিজ্ঞানের সাবধানের অন্ত নেই। ইন্দ্রিয়ের ভুলের বিরুদ্ধে সে ইন্দ্রিয়কেই সব সময় সজাগ রেখেছে, তার ত্রুটি ঘুচাতে অদ্ভুত কৌশলী সব যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে ইন্দ্রিয়ের শক্তি সহস্র গুণে লক্ষ গুণে বাড়িয়ে চলেছে। বুদ্ধির ভুলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিকে সে সর্ব্বদা সচেতন রেখেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের কখনও মনে ওঠে না যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মূল গড়নটা এমন কি না যে তা দিয়ে যথার্থই সত্য জানা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জীবনের কাজকর্ম্মে আমরা যেমন নিঃসংশয়, বৈজ্ঞানিক জগতের কাজকর্ম্মে বৈজ্ঞানিকেরাও তেমনি নিঃসংশয়। এবং দুই সংশয়হীনতারই মূল এক—কোনও প্রশ্ন না তোলা।

(৩)

চার্ব্বাক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনও উপায় নেই। অনুমান দিয়ে নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, কারণ এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের জ্ঞান হ'তে হ'লেই দুই বস্তুর নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু এই নিত্যতা-জ্ঞানের কোনও ভিত্তি নেই। আমাদের যা-কিছু অনুভূতি তা বিশিষ্ট দেশকালে বিশিষ্ট বিষয়ের অনুভূতি। এ থেকে কোনও নিত্যসম্বন্ধের নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ওঃ রকম জ্ঞান অমূলক কল্পনা মাত্র। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকের এই যুক্তিকে বলেছেন 'দুশ্ছেদ্য'। কিন্তু কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্য চার্ব্বাককে নিরুত্তর করার এক সোজা উপায় বের করেছেন। উদয়ন জিজ্ঞাসা করেছেন চার্ব্বাক যে তাঁর মত জনসমাজে প্রচার করেছেন সে কেন? নিশ্চয়ই লোকের সংশয় ঘোচাতে। কিন্তু লোকের মনে যে এ বিষয়ে কোনও সংশয় আছে তা চার্ব্বাক জান্‌লেন কি ক'রে? পরের মন ত প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। নিশ্চয়ই লোকের কথা, ব্যবহার, আকার, ইঙ্গিত থেকে তাদের মনের সংশয় অনুমান ক'রে চার্ব্বাক তাঁর মতপ্রচারে রত হয়েছেন। সুতরাং যে মত-প্রচারের মূলেই অনুমান, সে মতের পক্ষে অনুমানের প্রমাণত্বে সন্দেহ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। উদয়নাচার্য্যের এই তর্ক হ'চ্ছে দার্শনিক চার্ব্বাকের বিরুদ্ধে ব্যবহারিক চার্ব্বাকের সাক্ষী দাঁড় করান। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে হিউম যে তর্ক তুলেন তা চার্ব্বাকের তর্কের অনুরূপ তর্ক। সে সম্বন্ধে দিলীপকুমার বারট্রাণ্ড রাসেলের বচন তুলেছেন—'The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both, but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned'। দিলীপকুমার বলেছেন বিজ্ঞানের দুর্দ্দশায় এটা রাসেলের 'প্রকাশ্য অশ্রুপাত'। কিন্তু তাই কি? এ হ'চ্ছে হিউমের তর্কে রাসেলের ছদ্ম উদয়নী বিদ্রূপ। চার্ব্বাকের তর্কে কারও ব্যবহারিক জীবনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটান প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ও তর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে। হিউমের তর্কেও কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে হয়

না। সুতরাং সে তর্ককে পাশ কাটিয়ে গেলেই চলে। কারণ ব্যবহারিক জীবন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে চার্ব্বাকের তর্ক ও হিউমের যুক্তি—

'বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি, অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে তারি মাঝখানে নাহি তার কোন ত্রাস।'

বিজ্ঞান যেমন ব্যবহারিক জীবনের মত জ্ঞানের সম্ভাবনা ও তার উপায়ের সামর্থ্যকে নির্ব্বিচারে মেনে নেয়, তেমনি নানা ক্ষেত্রের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার ক'রে চলে। সমস্ত রকম অনুভূতির একটা সম্মিলিত রূপ আছে কি না বিজ্ঞান সে প্রশ্ন করে না। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুভূতির যে সব জ্ঞানের সংহিতা সে রচনা ক'রে চলেছে তাদের সকল বচনের পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় কি না সে চিন্তা বিজ্ঞানের নেই। প্রতি ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে অসামঞ্জস্য না থাক্‌লেই হ'ল। সমস্ত রকমের জ্ঞান ও অনুভূতিকে এক অখণ্ড ক'রে দেখা বিজ্ঞানের দেখা নয়, যেমন তা ব্যবহারিক জীবনের দেখা নয়। যে জানা 'একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—তা যেমন ব্যবহারিক জীবনের জানা নয়, তেমনি বিজ্ঞানেরও জানা নয়।

(৪)

দিলীপকুমার যে সব বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের অবিরোধ-বাণীর মালা গেঁথেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও নিত্য ব্যবহারিক জ্ঞানের ভ্রাতৃত্ব জিনিষটি হয় ভাল ক'রে ভেবে দেখেন নি, নয় মন খুলে প্রকাশ ক'রে বলেন নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের অভিজ্ঞতায় এমন জিনিষ এনেছে যার ফলে তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার জগতে নূতন সমস্যা উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। তবে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন যে এ সমস্যার সমাধান ক'রে ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এমন কি বিজ্ঞানের নিত্য উপচীয়মান বলে ধর্ম্মকেও বলীয়ান ক'রে তোলা যায়। হোয়াইটহেডের যে Science and the Modern World গ্রন্থের বাণী দিলীপকুমার তাঁর চিঠির 'শ্রীদুর্গাশরণং'' করেছেন সেই গ্রন্থে হোয়াইটহেড লিখ্‌ছেন, "The progress of science must result in the unceasing codification of religious thought, to the great advantage of religion."—অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ধর্ম্মজগতের চিন্তাবলী ক্রমাগত বিশদ ও সংহত হ'তে থাক্‌বে, এবং সেটা ধর্ম্মের পক্ষে মহালাভ। কারণ, "In so far as any religion has any contact with physical facts, it is to be expected that the point of view of those facts must be continually modified as Scientific Knowledge advances. In this way, the exact relevance of these facts for religious thought will grow more and more clear."—"ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনার যখন যোগাযোগ রয়েছে তখন এটা স্বাভাবিক যে বিজ্ঞান যেমন অগ্রসর হ'তে থাক্‌বে, এসব প্রাকৃতিক ঘটনার ধারণাও ক্রমাগত বদ্‌লাতে থাক্‌বে। এবং তার ফলে ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ সব ঘটনার ঠিক সম্পর্কটি ক্রমশঃ পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌বে।" এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের 'অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের' বন্ধন থেকে ধর্ম্মের মুক্তিতে হোয়াইটহেড খুসি আছেন। কারণ হোয়াইটহেডের মতে প্রাচীন সব যুগের কাল্পনিক জগৎ-চিত্রের সাহায্যে নিজের বাণীকে প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে ধর্ম্মের মধ্যে যে সব অবান্তর বিশ্বাস ও ধারণা প্রবেশ করেছে, ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হ'চ্ছে প্রধানতঃ সেইসব ধারণা থেকে ধর্ম্মের স্বকীয় ভাব ও ধারণাকে বিযুক্ত করা। "This evolution of religion is in the main a disengagement of its own proper ideas from the adventitious notions which have crept into it by reason of the expression of its own ideas in terms of the imaginative picture of the world entertained in previous ages. Such a release of religion from the bonds of imperfect science is all to the good." হোয়াইটহেড বেশ ভাল্‌ ক'রেই জানেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের science যেমন imperfect ছিল এ যুগের scienceও তেমনি imperfect এবং চিরযুগই science imperfect থাক্‌বে। সেটা বিজ্ঞানের পক্ষে কিছুমাত্র নিন্দার

কথা নয়। কারণ হোয়াইট্‌হেড যাকে বলেছেন "stubborn facts" তাদের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকে তার 'imaginative picture of the world' ক্রমাগত বদ্‌লাতে হবে। সুতরাং পূর্ব্ব যুগের imperfect science-এর বন্ধন থেকে ধর্ম্মের মুক্তি যদি কাম্য হয় তবে বর্ত্তমান ও ভাবী যুগের imperfect science থেকে ধর্ম্মের মুক্তিও সমান কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা হ'লে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে ধর্ম্মের মহালাভের হিসাবটা অনেক balance sheetএর মতই একেবারে অবোধ্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মের পা ফেলে চলার অর্থ এক 'imaginative picture of the world' ছেড়ে অন্য 'imaginative picture of the world' নিয়ে বারবার আরম্ভ করা, যতক্ষণ না নূতন আর একটা 'imaginative picture of the world' উপস্থিত হয়। এবং ধর্ম্মের কাজই দাঁড়ায় ানিক ধারণার বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করা আর মুক্ত করা, যেমন হোয়াইট্‌হেড কল্পনা করেছেন। আপনার মুখেই শুনেছি কে একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন যে হোয়াইট্‌হেড ধর্ম্মের যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন সে হ'চ্ছে ভারতবর্ষের Native Princeদের স্বাধীনতা; Science-এর political agent সঙ্গে লেগেই আছে। হোয়াইট্‌হেড যে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচার করেছেন সে ধর্ম্ম ইউরোপের গির্জ্জায় উপদিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম হ'তে পারে। দিলীপকুমার যাকে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা ব'লে জানেন তার সঙ্গে ও বিচারের সম্বন্ধ খুব কম।

যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের নিত্যব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে মূলতঃ এক শ্রেণীর, তেমনি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ-অবিরোধের রহস্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ-অবিরোধ-রহস্যের সঙ্গে অভিন্ন, এবং এ রহস্যের মীমাংসাও এক। আধুনিক বিজ্ঞান এ রহস্যের মধ্যে নূতন কোনও মৌলিক সমস্যা আনে নি, এবং এ রহস্যের সমাধানে নূতন কোনও আলোও ফেলে নি। আমাদের দেশের প্রাচীন লোকায়তেরা, এবং প্রাচীন গ্রীসের 'স্কেপটিকেরা' যে সব তর্কের অস্ত্রে মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাকে আক্রমণ করেছিলেন, আধুনিক scientific materialismএর হাতেও ঠিক সেই সব অস্ত্রই রয়েছে। আদিম তীরধনুক এ ক্ষেত্রে 'মেশিন গান্‌' হ'য়ে ওঠে নি। তবে যদি বিজ্ঞানের নামে সেই সব প্রাচীন তর্কের মর্য্যাদাই আধুনিক কালে বেড়ে গিয়ে থাকে, তার কারণ আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। আমাদের খাওয়া পরা, বাঁচা মরা সবই এই বিজ্ঞানের হাতে। সুতরাং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সব মানুষের জীবনের যা প্রধান ক্ষেত্র, এবং অনেক মানুষের জীবনের যা একমাত্র ক্ষেত্র,—সেখানে বিজ্ঞানের 'প্রেষ্টিজের' অন্ত নেই। এবং এই 'প্রেষ্টিজ' যে ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য তা ছাড়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আমরা বিজ্ঞানের প্রাপ্য ব'লে মেনে নিচ্ছি। এটা স্বাভাবিক। ওকালতি বা ভূষিমালের ব্যবসায় যে বড় হ'য়েছে সাহিত্য-সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি।

(৫)

প্রকৃত কথা এই যে আধুনিক বিজ্ঞান বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রকাণ্ড হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবলম্বন ক'রে একটা দর্শন-শাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছিল। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধ বিজ্ঞানের সঙ্গে নয় বিজ্ঞানমুগ্ধ এই দর্শনের সঙ্গে। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র এত বিভিন্ন যে তাদের পরস্পরের সংঘর্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু scientific materialism বিজ্ঞান নয় দর্শন। অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর অনুভূতির বিশিষ্ট রকমের জ্ঞানলাভে সে খুসি নয়, সকল অনুভূতির চরম স্বরূপ কি সেইটি জানাই তার কাজ। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু আছে তার চরম স্বরূপ যে জানা গেছে এ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর এই দর্শন শাস্ত্রটির কোনও সন্দেহ ছিল না। সকল পদার্থের চরম রূপ অর্থাৎ স্বরূপ হ'চ্ছে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা যারা নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে পরস্পরের সম্পর্কে গতিশীল। অর্থাৎ নিউটন বস্তু ও তার গতির যে নিয়ম অবলম্বন ক'রে গ্রহ-উপগ্রহদের গতিবিধির ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই সেই নিয়মের অধীন। "প্রতি পদার্থ, যার প্রকৃত সত্তা আছে, এই গ্রহ-

উপগ্রহদের আণবিক সংস্করণ বস্তুকণার সমষ্টি, এবং তারা ঐ একই নিয়মে স্থিতি ও গতিশীল। পদার্থের যা-কিছু গুণ ও ব্যাপার তা তার এই বাস্তবতা ও গতির ফল। সুতরাং কোনও পদার্থ বা ঘটনাকে এই বস্তুকণা ও তাদের গতিতে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে পারলেই তাদের সম্বন্ধে চরম সত্য জানা গেল। কারণ যা-কিছু আছে বা ঘটে তাদের স্বরূপ হ'চ্ছে গতিশীল বস্তুকণা। সকলেই জানে জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিজ্ঞানে নিউটনপ্রবর্ত্তিত ব্যাখ্যার আশ্চর্য্য সাফল্যে ঐ ব্যাখ্যা সকল বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যার আদর্শ ব'লে গণ্য হ'য়েছিল। অন্য সব বিজ্ঞান যে তাদের বিষয়বস্তুতে নিউটনের গতিবিদ্যার সূত্রগুলি প্রয়োগ কর্‌তে পেরেছিল তা নয়, কিন্তু কি রাসায়নিক কি প্রাণতত্ত্ববিদ্ সকলেই ধ'রে নিয়েছিল যে তাদের বিজ্ঞান যখন চরম জ্ঞানে পৌঁছবে তখন দেখা যাবে যে সেগুলি নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। এখন যে সেরকম দেখান যাচ্ছে না তার একমাত্র কারণ এই সব বিজ্ঞান এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি; আদর্শ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই কল্পিত আদর্শকেই scientific materialism তত্ত্ববিদ্যা-বোধে গ্রহণ করেছিল।

বলা বাহুল্য এ তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মানুষের সমস্ত অনুভূতি, তার মন, তার বুদ্ধি, তার হৃদয়বৃত্তি যদি কতকগুলি বস্তুকণা, যাদের বাস্তবতা ছাড়া আর কোনও ধর্ম্ম নেই, তাদের গতিবৈচিত্র্যের ফলমাত্র হয়, তবে মানুষের জীবনে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বের ত কোনও স্থান থাকে না। বিশেষ রকমের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সামাজিক শান্তি ও সমাজবন্ধন-পরিপুষ্টির সহায় হ'তে পারে, শ্রেণী বিশেষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু এ সব অজ্ঞানীর জন্য। কারণ এদের ভিত্তি অসত্যে প্রতিষ্ঠিত। যে জ্ঞানী সে জানে চঞ্চল বস্তুকণার বাইরে আর কিছুই নেই।

(৬)

'বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞান এই বস্তুকণা ও তাদের গতি-নিয়মের পরিকল্পনাকে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব ব'লে মানতে পারছে না। পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যাকে বস্তুকণা মনে করা হ'য়েছিল তা কতকগুলি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি, যাদের গতিবিধি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সূত্র মেনে ত চলেই না, এমন কি কোনও নিয়মকানুন মেনে চলে কি না সন্দেহের কথা। কারণ, বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখেছেন তাতে এই বিদ্যুৎকণাগুলির দলের আচরণ সম্বন্ধে গড়পড়তা হিসাবে যদিও কতকটা হদিস পাওয়া যায়, প্রতি বিদ্যুৎকণার গতিবিধি কখন যে কি রকম হবে তার কোনও নিয়ম নেই বলেই বোধ হয়। যেমন এ বছর বাঙ্গলাদেশে কলেরায় কত লোক মারা যাবে তার একটা মোটামুটি হিসাব অনুমান করা যায়, কিন্তু কোনও বিশেষ লোক কলেরায় মরবে কি না তা অনুমান করা অসম্ভব। এ থেকে এমন কথাও উঠেছে যে বিজ্ঞান যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে সেগুলি এই রকম 'ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল' খবর ছাড়া আর কিছু নয়। তার পর যে অনন্ত ও অনপেক্ষ দেশ ও কালের ধারণার উপর নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি তা অস্থির হ'য়ে উঠেছে। এমন সব ব্যাপার জানা গেছে যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ও-ধারণা ত্যাগ করতে হ'য়েছে। তাঁরা বলছেন অনপেক্ষ দেশ ও অনপেক্ষ কাল এ দুই-ই কল্পনামাত্র, ওদের কোনও অস্তিত্ব নেই। যা আছে সে হ'চ্ছে দেশখণ্ড ও কালমুহূর্ত্তে মেশান অর্দ্ধ-নারীশ্বর গোছের একটা কিছু, যার সম্বন্ধে আঁক কষা যায়, কিন্তু যাকে ধারণা করা যায় না। সুতরাং 'গতি' ব্যাপারটি, যার সরল ধারণা ছিল পরিমিত কালে বস্তুর দেশ থেকে দেশান্তরে গমন, তার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে কল্পনা করা সহজ নয়। অর্থাৎ যে নিউটনীয় বস্তু ও গতিকে scientific materialism অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব মনে করেছিল আজকের scienceএ সে বস্তুও নেই, সে গতিও নেই।

(৭)

একদল উৎসাহী লোক, যাঁদের কেউ বৈজ্ঞানিক কেউ দার্শনিক, অথবা space-timeএর মত তাঁদের সবাই বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক, এ থেকে প্রচার করছেন যে ধর্ম্মের পথ এবার মুক্ত। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার একান্ত বাধা ছিল

আধুনিক বিজ্ঞানের সব মূলতত্ত্ব। অত্যাধুনিক বিজ্ঞান তাদের দূর ক'রে দিয়ে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথ বাধামুক্ত করেছে। এখন বিজ্ঞান ধর্ম্মের শুধু অপরিপন্থী নয়, সহায় বল্লেই চলে। উৎসাহ যাদের ক্ষীণ এ সব কথায় তাদের কিছু খটকা লাগে। আধুনিক বিজ্ঞান কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্বীকার ক'রে অনেক জাগতিক ব্যাপারের একটা বিশেষ রকমের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হ'য়েছিল। ঐ সব তত্ত্বের একমাত্র মূল্য ও প্রামাণ্য ছিল এই ব্যাখ্যার সামর্থ্য। আজ বৈজ্ঞানিকেরা এমন কতকগুলি ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন ও-সব তত্ত্ব দিয়ে যাদের ও-রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। সুতরাং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান পুরাতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কতক রদ-বদল ক'রে, কতক নূতন পরিকল্পনা ক'রে এমন কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্বীকার করছে যা দিয়ে পূর্ব্বের ব্যাখ্যা ও নবীনআবিষ্কৃত সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। এ সব নবীন তত্ত্বেরও পরমায়ু ততদিন যতদিন জাগতিক ব্যাপারের এই ব্যাখ্যার কাজে এরা লাগসই থাক্‌বে। যেদিন এমন ব্যাপার জানা যাবে যার ব্যাখ্যা এ-সব তত্ত্ব দিয়ে হয় না, সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব যে পথে গিয়েছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বও সেই পথেই যাবে। এই অচিরশীল মূলতত্ত্বের উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তের তত্ত্বগুলি ছিল ধর্ম্মের শত্রু, আর বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বগুলি হ'য়েছে ধর্ম্মের সুহৃদ এ মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। 'এটম্' ছিল ধর্ম্মের পথ বন্ধ ক'রে আর 'ইলেকট্রনে' গুঁড়ো হ'য়েই তারা হ'ল তার পথের সঙ্গী, এক 'Will to believe' ছাড়া এ বিশ্বাসের আর কোনও হেতু নেই। দেশ ও কালের দ্বন্দ্বসমাস যে আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী, আর দেশকালের বহুব্রীহি যে তার সহায় এ তত্ত্ব প্রমাণ করা পাণিনিরও অসাধ্য। আর যদি ধ'রেই নেওয়া যায় যে Quantum theory, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন, general theory of Relativity এরা ধর্ম্মপথের বিঘ্ন দূর ক'রে আধ্যাত্মিকতার সহায় হ'য়েছে তবেই বা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের এ মিতালি টিঁক্‌বে কতদিন? বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি যে নিউটনীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের সমকালও বেঁচে থাক্‌বে এ কথা কোনও বৈজ্ঞানিক জোর ক'রে বল্‌তে পারেন না। এবং আগামী কালে যেসব নূতনতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে তার সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি রকম দাঁড়াবে তা কে জানে? কারণ সে সব তত্ত্বের পরিকল্পনা হবে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মুখ চেয়ে নয়, নূতন আবিষ্কৃত জাগতিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার গরজে। আজকের বিজ্ঞান যদি আধ্যাত্মিকতার হাতে চাঁদ তুলে দিয়ে থাকে, তবে কালকের বিজ্ঞানের সে হাতে দড়ি পরাতে কতক্ষণ?

এ সব আশা ও আশঙ্কার গোড়ায় গলদ হ'চ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য যে মানুষের সমস্ত অনুভূতির সম্যক জ্ঞান নয় আংশিক অনুভূতির ঐকদেশিক জ্ঞান, সে কথা ভুলে থাকা। অথচ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সামনে দাঁড়িয়ে এ ভুল হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য। বিংশ শতাব্দীর এই নব-বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠ্‌ছে খুব উঁচু গণিতের সুবহুল প্রয়োগে। এ বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দশগুণ হ'চ্ছে তার গণিতিক ব্যাখ্যা ও অনুমান! এডিংটন রহস্য ক'রে বলেছেন পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন ইন্‌জিনিয়ার এখন তিনি হ'য়েছেন গণিতবিদ্। এই গণিতশাস্ত্র মানুষের হাতে এক অদ্ভুত-কৌশলী অমিতবলশালী যন্ত্র। কিন্তু আর সব যন্ত্রের মতই যে বিষয়বস্তুতে প্রয়োগের জন্য তার উদ্ভাবনা তার বাইরে তাকে প্রয়োগ করা চলে না। বস্তু বা অনুভূতির যে অংশ গণিতের বিষয় সেটা তার সমগ্রতার একটা দিক মাত্র। সুতরাং শুধু গণিত দিয়ে কোনও বস্তু বা অনুভূতিকে সম্পূর্ণ ক'রে জানা অসম্ভব। এবং যে বিজ্ঞানের প্রধান সহায় গণিত তার পক্ষেও অসম্ভব। জেলের জাল তৈরী হ'য়েছে মাছ ধরার কাজে, তা দিয়ে জল ধরা যায় না। তা থেকে কোনও জেলে এ কথা ভাবে না যে পৃথিবীতে শুধু মাছই আছে জল নেই। কিন্তু অনেক পণ্ডিত লোকের বিশ্বাস যে গণিত-সহায় বিজ্ঞান সৃষ্টির যে জ্ঞান দেয় তার বাইরে আর কিছুই নেই।

Scientific materialism এর গোড়া কাটা যায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানমাত্রের এই স্বরূপ-বিশ্লেষণে। নইলে নিউটনীয় ফিজিক্স বরখাস্ত হ'য়েছে ব'লেই সে কিছু বিদায় হবে না, 'আইনষ্টিনীয় ফিজিক্সকে মুরুব্বী ধ'রে স্বচ্ছন্দে

টি'কে থাক্‌বে। পরমাণুর law and order-মাফিক চলাফেরার জায়গায় ইলেক্‌ট্রনের civil disobedience মুখ-বদলান হিসাবে কিছু মন্দ নয়। আলোর রেখা সূর্য্যের কাছ-বরাবর এক ইঞ্চির কম না বেঁকে পৌনে ছুই ইঞ্চি বেঁক্‌ছে দেখেই ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে বাঁচবে scientific materialism এত বড় নির্ব্বোধ নয়।

(৮)

ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই সমালোচনা সুধু এই প্রমাণ করে যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দাবী অমূলক নাও হ'তে পারে; সে দাবী যে সত্য এ কথা প্রমাণ করে না। শঙ্করের ভাষায় এ সমালোচনা মিথ্যাজ্ঞান নাশ করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করে না। যদি কেউ তর্ক করে যে আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বজগতের এমন নিরেট চেহারা আবিষ্কার করেছে যে তা দিয়ে ধর্ম্মের জল এক বিন্দুও গ'লতে পারে না, তবে সেই তার্কিককে এই সমালোচনার মাইক্রস্‌কোপ দিয়ে দেখান যায় যে তাঁর নিরেট বস্তুটি ফুটোয়-ভরা ঝাঁঝরি বিশেষ। কিন্তু তা দিয়ে গ'লে যাবার জল আছে কি না সে খবর এ মাইক্রস্‌কোপ দেয় না। জলের প্রত্যয় হয় জল দেখে, ফুটো দেখে নয়।

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যাঁরা expert, অর্থাৎ ও বস্তুর কথা যাঁরা দেখে জেনেছেন শুনে শেখেন নি, তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। যে লৌকিক যুক্তি-তর্ক ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাহন তাতে চ'ড়ে এ রাজ্যে পৌছান যায় না। বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা তাদেরি জ্ঞাতি-ভাই বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতাকে উড়িয়ে দিতে চায়। বিজ্ঞানের এই মারণবলের উপর বিশ্বাস আর সৃষ্টিশক্তির উপর ভরসা এক মনোভাবের এপিঠ ওপিঠ। মানুষের অনুভূতির এক শ্রেণীর 'stubborn facts' এর উপর তার বিজ্ঞানের ভিত্তি, আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠাও তার অনুভূতির 'stubborn facts'এর উপর। কিন্তু এ অনুভূতি তার লৌকিক অনুভূতিগুলির এক পর্য্যায়ের নয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় এ stubborn fact কখনও মাথা তোলে না, সুতরাং তাকে অস্বীকার করলেও কোথাও ঠেক্‌তে হয় না।

গোল এইখানেই। এ stubborn fact যার মন অনুভব করেছে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা তার কাছে প্রমাণের বিষয় নয়; তার "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ"; ও বস্তু তার কাছে স্বপ্রকাশ। আর যার মনে সে অনুভূতি কখনও আসে নি তার কাছে ওকে প্রমাণ করা যাবে না। কারণ, লৌকিক অনুভূতি থেকে এ অনুভূতিতে পৌঁছবার কোনও সেতু নেই। শ্রীরাধা যেমন ক'রে বাঁশের ঝাড় ডালেমূলে উপড়াতে চেয়েছিলেন, scientific materialismকে তেমনি আমূল উপড়িয়ে ফেল্‌লেও সংশয়ের বাঁশী তার কানে বাজতেই থাক্‌বে।

আধ্যাত্মিকতার বাধা আধুনিক বিজ্ঞান নয়, সে বাধা হ'চ্ছে মানুষের চিরন্তন লৌকিক জীবন। এ জীবনের বজ্রক্রম ভেদ ক'রে যার প্রাণে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পৌঁছে নি তাকে দোষ দেওয়া বৃথা, তার সংশয়কে উপহাস করা মূর্খতা। হয় ত কোনও শুভ সুযোগে আলোক-লোকের একটিমাত্র রশ্মিপাতে তার সমস্ত মন আলোয় ভ'রে উঠবে, যদি সে মন গতানুগতিক ধর্ম্মের অস্বচ্ছতা ও সেণ্টিমেণ্টাল আধ্যাত্মিকতার কুয়াশামুক্ত হয়।

(৯)

চিঠিটা গভীর না হোক গম্ভীর হ'য়ে উঠছে, অতএব এইখানেই ইতি দেওয়া যাক। লক্ষ্য করেছেন বোধ হয় 'ধর্ম্ম' ও 'আধ্যাত্মিকতা' এ ছুটি বুলি বার বার বলেছি কিন্তু ও-বস্তু যে কি তা বলার ধার দিয়েও যাই নি। কারণ আমি জানিনে, এবং অনুমান করি আপনিও জানেন না। সুতরাং ধ'রে নিয়েছি আর সবাই জানে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

ধ্যান-মুগ্ধ

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভরি',
তাই তো প্রাণের হাসি অশ্রু-যুথি হ'য়ে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি'।

ক্রন্দন—ক্রন্দন নহে আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল ;
চিত্তের পুলক-নীর নেত্র-তীরে করে টলমল !
বেদনা হয়েছে সোনা—দুঃখ হ'ল পরম নির্ম্মল
বক্ষে তারে ধরি'।

জীবন-অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি,
দীর্ঘ পথ বাকী,
'গো মোর পরম-রম্য ! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি,
চলেছি একাকী।

জানি জানি জানি বন্ধু ! দিক্‌হারা এ পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি' বন-পথ 'পরে,—
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম-সমাদরে
গৃহে লবে ডাকি'।

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়
ফুটায়েছে ফুল ;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়
ত্রিলোকে অতুল।

'অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মধু সিঞ্চিয়াছো প্রাণে প্রাণে মোর,
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর,
বেজেছে আলোর বাঁশী ছিন্ন করি' ঘন অমা-ঘোর
প্লাবি' চিত্ত-কূল।

আমার বসন্ত ওগো ! জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে,
মুঞ্জরি' তুলেছো তুমি হিম-শীর্ণ বিশুষ্ক বনানী
দক্ষিণার বেশে।

আনন্দ-পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ-হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি কলকণ্ঠী কপোতীর মত !
নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত
অপার্থিব হেসে।

আমার রিক্ততা মাঝে পরম পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছো ভালো, আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী !

তুমি বাসিয়াছো ভালো—তুমি ভালো বাসিয়াছো বঁধু
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি' উছলি' ওঠে মধু,—
অমৃত-তন্দ্রায় তাই আবিষ্ট হৃদয় আজি শুধু
স্বর্গ-অভিমুখী !

শ্রীরাধারাণী দত্ত

তুর্ক সাধারণতন্ত্রের নূতন বর্ণমালা

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ বি-এ

বাল্যে কোন কিছু অভ্যাসের সময় প্রচুর প্রয়াস ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইলেও আমরা পরিণতবয়সে সেই ক্লেশের কথা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া যাই। তাহার উপরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃতি একটু রক্ষণশীল হইয়া পড়ে, সেই জন্য প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেবল তাহাই নহে সাধারণ মানুষে প্রায়ই ঐরূপ সমালোচনার বিপক্ষতা করিয়া থাকে।

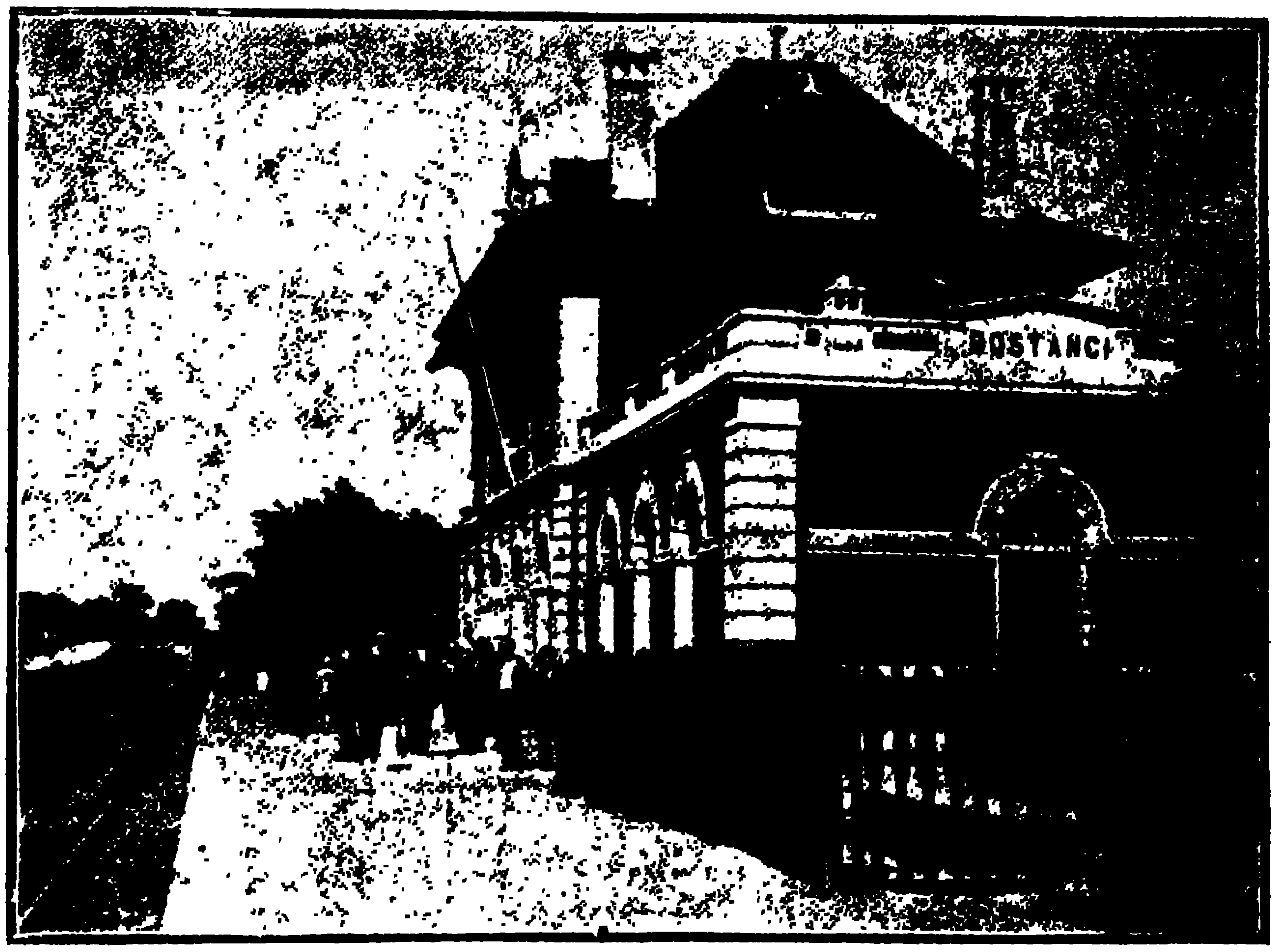

তুর্কীর নবপ্রবর্ত্তিত বর্ণমালায় রেলষ্টেসনের নাম

এরূপ শ্রেণীর লোকেরাই তুর্কীর নব-প্রবর্ত্তিত ল্যাটিন (রোমান) বর্ণমালা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে ও কলাকৌশলপূর্ণ আরবী লিপির উচ্ছেদ দেখিয়া মর্ম্মপীড়া অনুভব করে। আরবী বর্ণমালার দুরূহতার কথায় তারা বলে, 'কই এতকাল ত এই দুরূহ বর্ণমালা শিখিতে লোকের কষ্ট হয় নাই, এই বর্ণমালার বই পড়িয়া অনেকে বিদ্বান্ হইয়াছেন এবং এই বর্ণমালায় অনেকে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানের বই লিখিয়াছেন; মোট কথা, এই আবরী বর্ণমালায়ই ত এতদিন কাজ চলিয়াছে, তবে বিজাতীয় (ল্যাটিন) বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করার কি প্রয়োজন। ইহাতে কি তুর্কীর জাতীয়তাকে হেয় করা হয় নাই ?'

বাস্তবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই আপত্তির মূলে রহিয়াছে বাল্যস্মৃতির অস্পষ্টতা বা অভাব, এবং তুর্ক ইতিহাসে অজ্ঞতা। তুর্কীর আরবী বর্ণমালাতে প্রায় পাঁচশত (৪৮২) সংযুক্ত বর্ণ আছে। নবীন শিক্ষার্থী বালকের পক্ষে ঐ পাঁচশতটি চিহ্ন শিক্ষা করা যে কত কষ্টসাধ্য তাহা পরিণত বয়সের সাধারণ লোকে মনেও আনিতে পারে না। আর, আরবী বর্ণমালা তুর্কীর স্বজাতীয়ও নহে; উহা আরবজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। তুর্কীতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ লিপিও প্রবর্ত্তিত হয়। কাজেই আরবীও প্রকৃত পক্ষে তুর্কীর নিকট বিজাতীয় বর্ণমালা; এজন্য একটি বিজাতীয় বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া আর একটি বিজাতীয় বর্ণমালা গ্রহণ করায় তুর্কীর স্বাজাত্যবোধের দিক হইতেও কোন দোষ হয় নাই। —আর এই বর্ণমালা-নির্ব্বাচন ব্যাপারে স্বাজাত্যবোধের কোন স্থান আছে কি না তাহা বলা দুঃসাধ্য। বর্ণমালা ভাষাশিক্ষার একটি উপায়; আর ভাষাশিক্ষার ফলে বিদ্যার প্রসার ও জাতীয় সংস্কৃতির (culture) পরিপুষ্টি হয়। কাজেই দেখা যায়, বর্ণমালার দুরূহতার জন্য জাতীয় সংস্কৃতিও বাধা পায়। এস্থলে জাতীয়

সংস্কৃতিকে না বাঁচাইয়া জাতীয় বর্ণমালা যে বাঁচাইতে যাইবে তাহাকে সুস্থমস্তিষ্কের লোক বলা যায় কি না সন্দেহ।

নব্য তুর্কীর রাষ্ট্রনায়ক কামাল পাশা ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ নিতান্ত সুস্থমস্তিষ্কের লোক, তাই তাঁহারা প্রায় পঞ্চশত (৪৮২) আরবী যুক্তাক্ষরের বদলে উনত্রিশটি (২৯) ল্যাটিন বর্ণ তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রে চালাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রায় পঞ্চশত (৪৮২) সংযুক্তবর্ণ শিখিতে ভয়

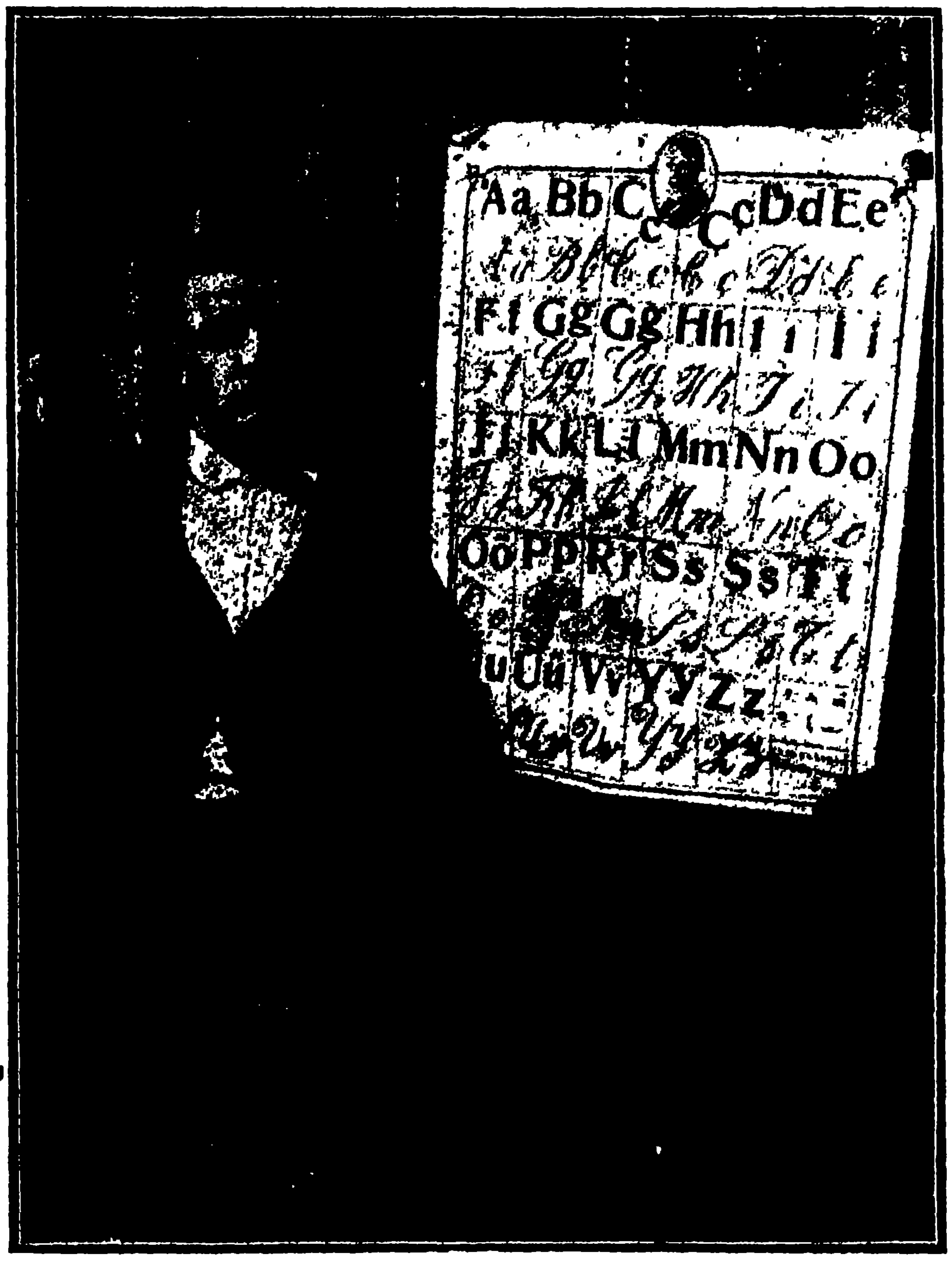

অবসরকালে এই দোকানীটি নূতন বর্ণমালা শিক্ষা করে

পাইয়া যে সব চাষী ও শ্রমজীবী কখনো লেখাপড়া শিখিবার সাহস করিতে পারে নাই এখন বিদ্যালাভ তাহাদের পক্ষে অনেক সুগম হইয়া গিয়াছে। উনত্রিশটি (২৯) অক্ষর শেখা বিশেষ শক্ত কিছুই নহে। এই লিপিপরিবর্ত্তনের ফলে তুর্কীর নিরক্ষরতা, অজ্ঞান ও কুসংস্কার দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইতেছে। তুর্কী অচিরকাল-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতিনিচয়ের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু নবলিপিপ্রবর্ত্তনের বেলায় গোড়াতে তুর্ক জাতিকে কি কি বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং সমগ্র তুর্ক জাতি এই পরিবর্ত্তনকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নয় পরন্তু বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল। তখনই ল্যাটিন লিপিগ্রহণের প্রস্তাবটা উঠিয়াছিল কিন্তু এই লিপিপ্রবর্ত্তনে প্রাথমিক অসুবিধার কথা ছিল বিদ্যালয়ে ও সংবাদপত্রাদিতে। প্রথম অসুবিধা দূর করার জন্য শিক্ষা-বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকগুলি ল্যাটিন বর্ণমালায় ছাপাইয়া ফেলিতে লাগিলেন; দ্বিতীয় অসুবিধা দূর করিলেন মুখ্যতঃ সংবাদপত্র চালকেরা নিজেই। স্থির হইয়াছিল ১লা ডিসেম্বর হইতে সমস্ত সংবাদপত্র ল্যাটিন লিপিতে ছাপিতে হইবে। 'হা-হা-হা' নামক একখানি হাস্যরুচি (humorous) সাপ্তাহিক কাগজ কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর হইতেই নব্য-বর্ণমালায় ছাপা হইয়া বাহির হইল। বাকী সকল কাগজ ১লা ডিসেম্বর হইতে ল্যাটিন লিপিতে ছাপা হইল। যাহারা ল্যাটিন লিপি গ্রহণ করিল না, সরকারী আদেশে তাহাদের কাগজ তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু অর্থাভাবে যাহাদের নূতন টাইপ সংগ্রহে অসুবিধা হইল তুর্কী সরকার তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দান করিলেন। জুলাই মাসেও যাহাকে পাশ্চাত্যরা একটা উদ্দাম কল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আগষ্ট মাসেই তাহা কঠোর সত্যের আকার ধারণ করিয়াছিল। ডিসেম্বর মাস হইতে উহার বাস্তবতা সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

আগষ্ট মাসে কোথাও কোথাও বক্তৃতাকালে কামাল পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীর নূতন বর্ণমালাপ্রবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহার সুবিধা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল নূতন বর্ণমালা গ্রহণ করিলে তুর্কীতে এক নবযুগ আসিবে; তবে সে সম্বন্ধে

তাঁহার কিছু তাড়াতাড়ি ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কামাল পাশার এই বাণী এক যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিল। আগষ্ট মাসের শেষভাগে কয়েকখানি তুর্ক জাহাজের নাম ল্যাটিন অক্ষরে লেখা হইয়া দেখা দিল। কোন কোন রাজপথে নূতন বর্ণমালার আদর্শ বিক্রীত হইতে লাগিল। কিন্তু নূতন বর্ণমালা গ্রহণের যে উৎসাহ তাহাতে মুখ্যতঃ সরকারের কোন হাত ছিল না অর্থাৎ প্রথমে আইন করিয়া উহা জাগ্রত করা হয় নাই। রাষ্ট্রনায়ক কামালের উৎসাহই এ বিষয়ে সকলকে প্রেরণা দিয়াছে। কোন কোন ভোজসভায় বক্তৃতাদানের সময় কামাল তাঁহার ল্যাটিন অক্ষরে লিখিত (তুর্ক ভাষায়) বক্তৃতার প্রতিলিপিটি কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া তাহাকে পাঠার্থে অনুরোধ করিতেন। বলা বাহুল্য কর্ম্মচারীটি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেন। ইহারই ফলে সরকারী কর্ম্মচারী-মহলে ল্যাটিন লিপির প্রবর্ত্তন সুরু হয়। চাকরীর মান রাখিতে হইলে নূতন লিপি না শিখিয়া উপায় কি? দেখিতে দেখিতে একটি মন্ত্রীর দপ্তরের পর আর একটি মন্ত্রীর দপ্তরে নূতন তুর্ক-বর্ণমালা গৃহীত হইতে লাগিল অর্থাৎ সরকারী দলিল ও চিঠিপত্রে ল্যাটিন লিপি ব্যবহৃত হইতে সুরু করিল। কেহই পেছনে পড়িয়া থাকিতে চাহিলেন না।

নূতন বর্ণমালাপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্রাম গাড়িতে পূর্ব্বেকার আরবী অক্ষরের তুর্ক ভাষায় ও ল্যাটিন অক্ষরের ফরাসী ভাষায় লিখিত নামের বদলে কেবলমাত্র নূতন তুর্কী বর্ণমালায় লিখিত তুর্কী ভাষার নাম দেখা গেল। ঐ-সকল নাম পড়িতে বৈদেশিকদের কোন অসুবিধা হইল না। তবে নব্য তুর্কী বর্ণমালায় কোন q, w, এবং x নাই। লিখন-যন্ত্রের (type-writerএর), বাম দিকের হরফ-কয়েকটির উপর দিয়া এক ঝড় বহিয়া গেছে। যদি এখন কেহ Maxim Restaurantএ যাইতে চাহে তবে তাহাকে Maksimএ গিয়া খুসী হইতে হইবে। এই ল্যাটিন লিপি-প্রবর্ত্তনের ফলে অনেক তুর্ক নাম উচ্চারণঅনুযায়ী লিখিত হইতেছে। যে সহরের নাম আগে ফরাসী ভাষায় লেখা হইত ব্রুসা (Broussa) এখন নব্য তুর্কী বর্ণমালায় তাহা বুর্‌সা (Bursa) লিখিত হইতেছে; ঐ বানানই উচ্চারণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

তুর্কার রেলগাড়াতে আদানা ষ্টেসনের নূতন বর্ণমালার নাম

তবে যে-পর্য্যন্ত নূতন অক্ষরে কোন প্রামাণ্য শব্দকোষ ছাপা না হইতেছে ততদিন স্থানীয় উচ্চারণবৈষম্যের জন্য একই নামের বিভিন্ন বানান হইতে পারে। যেমন এক টেলিগ্রাফ-আপিসের নামে লেখা হইয়াছে 'টেল্‌গিরাফ' (Telgiraf), আর তারই পাঁচ মিনিটের রাস্তা দূরে আর-একটি আপিসের নামে লেখা হইয়াছে 'টেল্‌গ্রাফ' (Telgraf)। কিন্তু এই রকমের সামান্য অসুবিধা দূর হইতে বেশী দেরী হইবে না, কারণ তুর্কীর নূতন বর্ণমালায় নাম-লেখা মানচিত্র এতদিনে তৈরী হইয়া গেছে। তাহারি সাহায্যে সমগ্র দেশময় স্থানীয় নামগুলির একরূপ বানান প্রবর্ত্তিত হইবে।

এই নব লিপিপ্রবর্ত্তনের ফলে বৈদেশিকদের খুব সুবিধা হইয়াছে। কারণ ডাকঘরে এখন রেজিষ্ট্রী-রসীদ ল্যাটিন

বর্ণমালায় লেখা হওয়ায় বিদেশীদের বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। আর তুর্ক সাধারণতন্ত্রের আইন অনুসারে বিদেশী বণিকগণকে এতদিন দুই ভাষায় হিসাবপত্র রাখিতে হইত কিন্তু এখন নবপ্রবর্ত্তিত ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত তুর্ক-ভাষায় হিসাব রাখিলেই তাহাদের চলিবে। নিজেদের বুঝিতেও কোন কষ্ট হইবে না পরন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের দাবীও মিটিবে। রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির নামও নব বর্ণমালায় লিখিত হওয়ায়

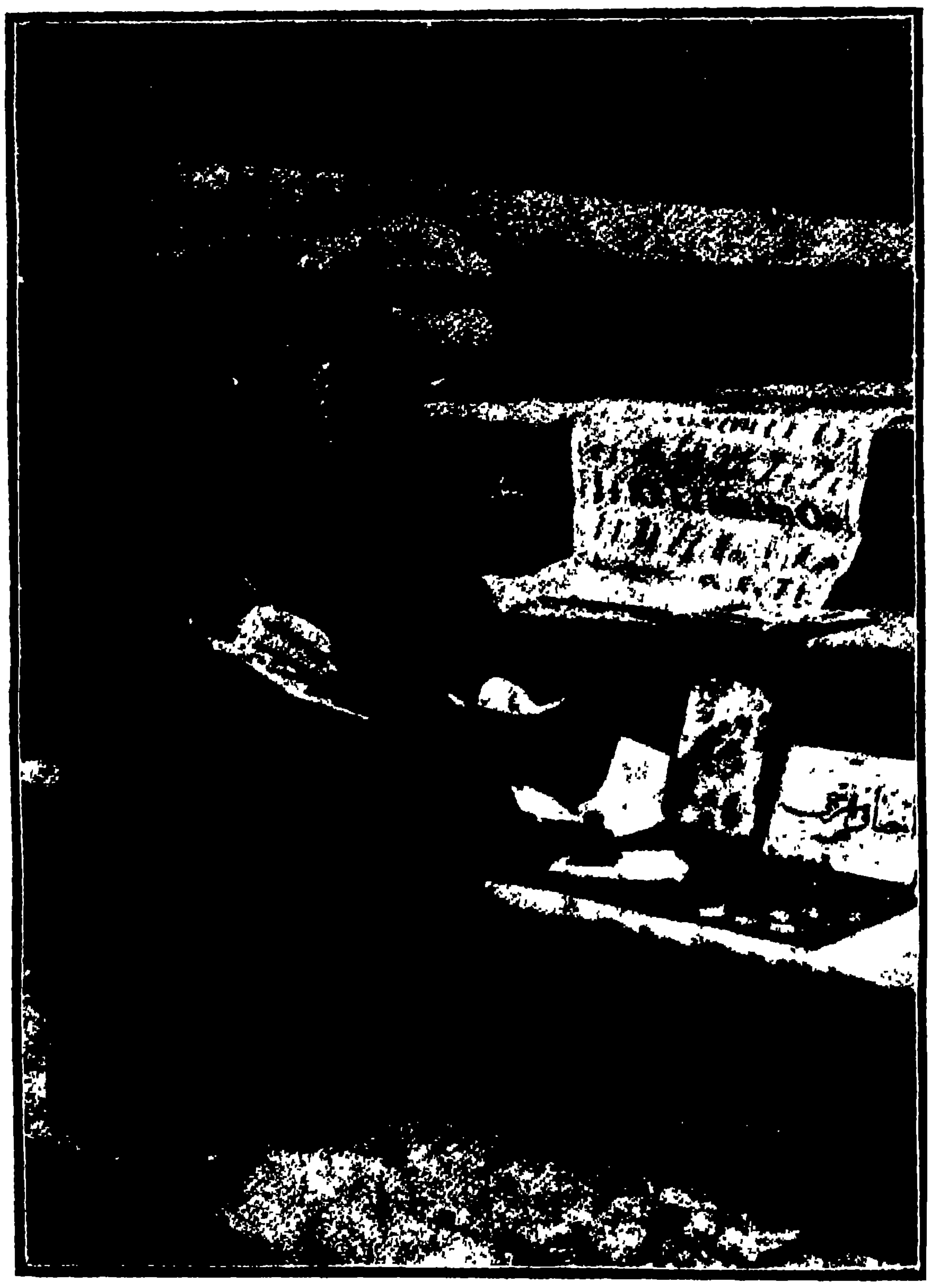

চিরকাল আরবী অক্ষরে শিলমোহর প্রস্তুত করিয়া এই বৃদ্ধ এখন ল্যাটিন অক্ষরে শিলমোহর প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছে

বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের সুবিধা কম হয় নাই। কিন্তু এক-বিষয়ে বিদেশী বণিকদের সাময়িক অসুবিধা খুব হইয়াছিল। এত শীঘ্র যে নব্যবর্ণমালা প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই, কাজেই তাহাদিগকে বহুদিন যাবৎ আরবী অক্ষরে লিখিত বিজ্ঞাপন-পত্রাদি ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তুর্করা কিন্তু খুবই উৎসাহ-সহকারে নব্য বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাষ্ট্র-নায়ক কামালের বাণী প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে লোক সরাইতে, দোকানে, রেলষ্টেশনে, পোষ্টাপিসে নূতন বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যাহাদের ব্যবসা ছিল নকলনবিশী তাহারাও ল্যাটিন বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিল। সাইনবোর্ড-লেখক, শিলমোহর-নির্ম্মাতা ইহারা কেহই পেছনে পড়িয়া রহিল না।

যেসব দেশে এখনো আরবী বর্ণমালা চলিতেছে নূতন বর্ণমালা গ্রহণ করিবার ফলে তুর্কী উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইবে। ভার্সাইর সন্ধিপত্রে আমেরিকাকে তুর্কীর উপর খবরদারির (mandate) ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তুর্কী ফেজ্ পরিত্যাগ, হ্যাট গ্রহণ, ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ ইত্যাদি যেসকল যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন আনিয়াছে সেসব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশও সক্ষম হইত কি না সন্দেহ; বিদেশীরা কোন ভাল করিতে গেলেও লোকে মন্দ বুঝে; আর বিদেশীর ভাল করিবার ইচ্ছাও সচরাচর হয় না, এবং ইচ্ছা থাকিলেও প্রজাদের অসন্তোষের ভয়ে তাহা কাজে পরিণত করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধান লইয়া আজ আমাদের প্রধান সমস্যা। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার কথা হইতেছে। এই রাষ্ট্রভাষা ঐক্য-বন্ধনের একটি উপায়স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এই রাষ্ট্রভাষার পথে কিছু কিছু বাধা আছে, সেসব বাধা কিয়ৎপরিমাণে দূরও করা যাইতে পারে, কিন্তু এমন কথনো আশা করা যায় না যে হিন্দী ভাষার ভিতর দিয়াই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীরা পরস্পরের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা বড় জোর রাষ্ট্রভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে ও রাষ্ট্রভাষা লিখিতে পড়িতে পারিবে; তাহাতে অ-হিন্দীভাষী প্রদেশ—যথা তামিল, তেলেগু, মলয়ালী কানাড়ি ইত্যাদি প্রদেশকে বুঝিবার কোন সুবিধাই হইবে না। কাজেই

ভারতের যথার্থ ঐক্যের পথে বাধা পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু এই বাধা দূর করার এক প্রধান উপায় নিখিল ভারতে এক-লিপির প্রচলন। একই বর্ণমালায় যদি ভারতের সব ভাষার বইগুলি লেখা হয় তবে পরস্পরের ভাষা শিখিবার

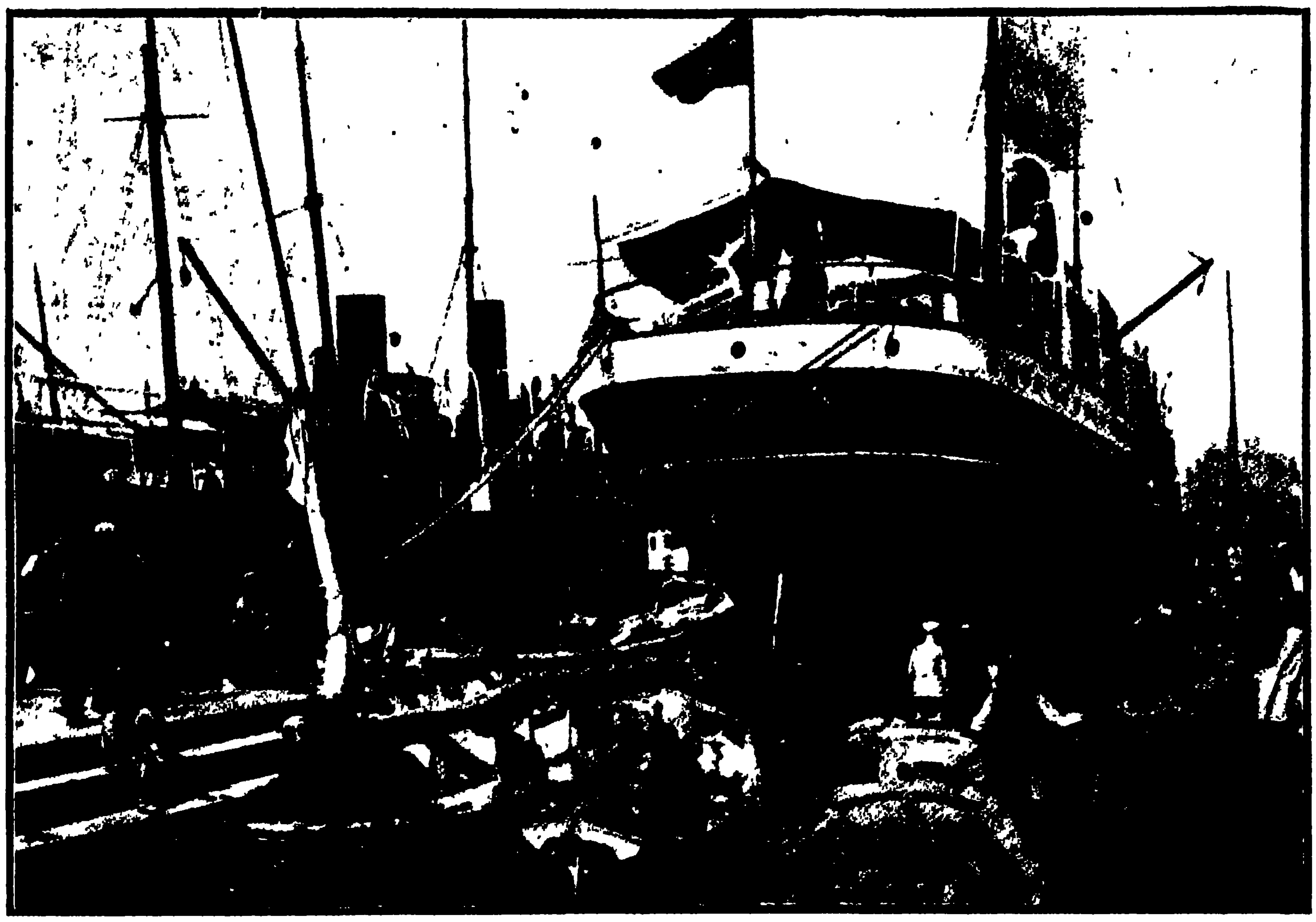

ল্যাটিন অক্ষরে তুর্কী জাহাজের নাম

প্রধান অসুবিধাই দূর হইয়া গেল। অবশ্য ইহা করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশবাসীকে নিজ নিজ প্রচলিত লিপি-মালার প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। আশা করি, ভারতবাসী এ বিষয়ে একদিন নব্যতুর্কীর আদর্শ গ্রহণ করিবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বি-সি-এস্

তৃতীয় খণ্ড

অরণ্যে

প্রথম স্তবক

১

ভেণ্ডির বন

বৃটেনী প্রদেশে তৎকালে সাতটি ভয়সঙ্কুল অরণ্য ছিল। ভেণ্ডির সমর যাজকগণের বিদ্রোহ; বনগুলি ছিল তাহাদের সহকারী। আঁধারের জীবেরা পরস্পরের সহায়তা করে।

একজন বৃটেনীবাসী ভদ্রলোকের উপাধি ছিল "সপ্তার-ণ্যের অধিস্বামী। তিনিই মাৰ্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক, ভাই-কাউন্ট ডি ফন্টেনয়, বৃটেনীপ্রিন্স্। বৃটেনীর প্রিন্স্রা ফ্রান্সের প্রিন্স হইতে পৃথক।

ইতিহাসে সত্য আছে, জনপ্রবাদেও সত্য আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ও জনপ্রবাদমূলক সত্য এক নহে। জন-প্রবাদ কল্পনায় গড়িয়া উঠিলেও পরিণামে তাহাতে সত্যই প্রকাশ পায়। ইতিহাস এবং কাহিনীর উদ্দেশ্য একই—মানুষের বহিঃপ্রকৃতির অঙ্কন।

ভেণ্ডিকে যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সঙ্গে প্রবাদকাহিনীর সংযোজন আবশ্যক। ইহাকে সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য ইতিহাস এবং ইহার খুঁটিনাটি বুঝিবার জন্য প্রবাদকাহিনীর প্রয়োজন।

ভেণ্ডির সমর এক অত্যাশ্চর্য্য অসাধারণ ব্যাপার!

অজ্ঞ কৃষকগণের এই বিবেচনাশূন্য অথচ চমৎকার, হীন অথচ মহিমাময় সংগ্রাম—ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকিলেও ফ্রান্স ইহা লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে। ভেণ্ডি ক্ষতও বটে, গৌরব ও বটে।

মানবসমাজের মহাসন্ধিক্ষণে সময় সময় গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়। জ্ঞানীগণ সেই সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত আলোকে আপনাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ তাহারা ইহাকে বর্ব্বরতা ও অত্যাচারে পরিণত করে। দার্শনিক সহজে কিছুর উপর দোষারোপ করেন না। এইসব সমস্যায় যে আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তৎসম্বন্ধে তিনি ধীর-ভাবে চিন্তা করেন। তিনি জানেন, এইসব জটিল সমস্যার কালবৈশাখী দেশের মধ্যে কিছুকালের জন্য কৃষ্ণছায়া বিস্তার করিবেই।

ভেণ্ডিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এই বিরোধটাকে চিত্রিত করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব; অপরদিকে বৃটেনীপ্রদেশের কৃষক। একদিকে এইসব অভূতপূর্ব্ব ঘটনাপুঞ্জ—সর্ব্ববিধ কল্যাণের মহাসূচনা, পূর্ণ সভ্যতার জন্য বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা,—উন্নতি-প্রচেষ্টার ক্ষিপ্রতা, ধারণা ও বুদ্ধির অতীত সংস্কারসাধনের বিপুল প্রয়াস; অপরদিকে এইসব ঈগলবৎ তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বাবরীচুলওয়ালা বন্য মনুষ্য—গম্ভীর এবং অদ্ভুত। ইহাদের আহার্য্য ফলমূল, পানীয় দুগ্ধ, আবাসগৃহ তৃণনির্ম্মিত এবং মন গৃহচতুঃসীমার বেড়া ও খানার মধ্যে আবদ্ধ, সংকীর্ণ; পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামসমূহের ঘণ্টাধ্বনির পরস্পর পার্থক্য তাহাদের কর্ণে অনায়াসে ধরা পড়ে; মৃত ভাষায় তাহাদের কথোপকথন—এ যেন চিন্তার সমাধিবাস। গরুচরানো, কাস্তে ধার দেওয়া, শস্য ঝাড়িয়া লওয়া, রুটি তৈয়ার করা—এ-ই ইহাদের জীবন। লাঙল ও পিতামহী ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়; ইহারা গির্জ্জায় কুমারী মেরীর পূজা করে, আবার প্রান্তর-মধ্যে প্রোথিত রহস্যময় প্রস্তরখণ্ডের অর্চনা হইতেও তাহারা বিরত নহে। সমতলক্ষেত্রে ইহারা মজুর, সমুদ্রকূলে ইহারা

ধীবর, আবার সুযোগ পাইলে ইহারা বড়লোকের জঙ্গল হইতে রক্ষিত-পশু চুরি করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাজা, ভূস্বামী এবং যাজকসম্প্রদায়ের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি। ইহারা অনেকসময় তন্ময় হইয়া ভাবিতে থাকে; জনহীন বেলাভূমিতে বসিয়া বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে সাগরকল্লোল শুনিতে শুনিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

এইরূপ অন্ধজনের পক্ষে আলোককে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া কি সম্ভব ছিল?

২

কৃষক

এই কৃষকজীবনের নির্ভর স্থল ছিল দুইটি; শস্যক্ষেত্র—যাহা তাহার আহার যোগাইত; এবং বন—যাহা তাহাকে লুকাইয়া রাখিত।

বৃটেনীপ্রদেশের এই অরণ্যগুলির সঠিক ধারণা করা সহজ নহে। এইগুলি বস্তুতঃ নগর। এই সকল কণ্টকাকীর্ণ শাখাপ্রশাখার জটিল সন্নিবেশ নিতান্তই গুপ্ত, স্তব্ধ এবং ভয়ঙ্কর—যেন অচলতা ও নীরবতার চিরভবন। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা সমাধিভূমির মতোই নির্জ্জন। কিন্তু যদি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো এক আঘাতে ইহার সমস্ত বৃক্ষ নির্ম্মূল করিয়া ফেলা সম্ভব হইত তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অগণিত জনসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

প্রস্তর ও বৃক্ষশাখায় আচ্ছাদিত বহু কূপ তথায় ছিল—সেগুলি বস্তুতঃ ভূগর্ভস্থ অসংখ্য অন্ধকার কুঠরীর প্রবেশ-পথ মাত্র। মিশর দেশেও নাকি এরূপ কূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তবে সেগুলি ছিল মরুভূমিতে, এগুলি অরণ্যে; আর মিশর দেশের গুহায় ছিল মৃতদেহ, কিন্তু বৃটেনীর গুহাগুলি জীবিত মনুষ্যে পূর্ণ ছিল। মিস্‌ডনের অরণ্যের একটা খুব নিভৃত অংশে খানিকটা পরিষ্কৃত জায়গা—মৌচাকের মতো সহস্র গর্ত্ত ও গহ্বরে সমাকীর্ণ—অগণিত লোক তথায় গোপনে আনাগোনা করিত—এটার নাম ছিল "মহানগরী"। এই রকম আর একটা জায়গা—উপরে নির্জ্জন, নিম্নে অধ্যুষিত—'রাজভবন' নামে অভিহিত হইত।

স্মরণাতীত কাল হইতে বৃটেনীপ্রদেশে এই ভূগর্ভস্থ-জীবন চলিয়া আসিয়াছে—মানুষ মানুষের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া ওইখানে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। সর্পের বিবরের মতো এই সব গুহা ও গহ্বরের অস্তিত্বের উহাই হেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অভিজাতগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মের নামে সংগ্রাম, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিশসহস্র শিক্ষিত কুক্কুরদ্বারা মানুষের শিকার—এই সব অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে দেশের লোক নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়াছিল। কেল্‌ট্‌দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ট্রগ্‌লোডাইটস্‌রা, রোম্যান্‌দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেল্‌ট্‌রা, নরম্যানদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৃটন্‌রা, রোম্যান ক্যাথলিকদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হ্যুগ্‌নট্‌রা, আবকারী কর্ম্মচারীদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিষিদ্ধ মালের ব্যবসায়ীরা—পর পর প্রথমে অরণ্যে, তারপর ধরিত্রীর জঠরে আশ্রয় লইয়াছে। ইহাই ব্যাধতাড়িত পশুর আত্মরক্ষার অন্তিম উপায়। অত্যাচারে জাতিসমূহের এইরূপ পরিণামই ঘটে। স্বেচ্ছাচার দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বিজিগীষা, সামন্তপ্রথা, ধর্ম্মোন্মাদ, নূতন নূতন কর-স্থাপন প্রভৃতি নানা আকারে হতভাগ্য বৃটেনী প্রদেশকে নির্য্যাতিত করিয়াছে। জনগণ কাজেই ভূগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফরাসী সাধারণতন্ত্র যখন ঘোষিত হইল তখন এই ভূগর্ভের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইল এবং এই জোর-করা মুক্তিতে আপনাদিগকে উৎপীড়িত বোধ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দাসত্বে অভ্যস্ত লোকদের স্বভাবতঃই এইরূপ ভ্রান্তি হয়।

৩

কবরের জীবন

বৃটেনীর অন্ধকারময় অরণ্যগুলি এই বিদ্রোহের সহকারী হইল।

কতকগুলি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায় এই বিপুল কৃষকবিদ্রোহ কিরূপ সুবন্দো-

বস্তের সহিত সংঘটিত হইয়াছিল। প্রিন্স-ডি-ট্যাল্‌মণ্টের আশ্রয়ারণ্যে মানুষের চিহ্ন মাত্র ছিল না, অথচ সেখানে ভূগর্ভে ছয় হাজার লোক সংগৃহীত হইয়াছিল। মিউ-ল্যাকের অরণ্যেও কোনো মনুষ্য নেত্রগোচর হইত না, অথচ সেখানে আট হাজার লোক বাস করিতেছিল। এই অরণ্যপ্রদেশ যেন একটা, সুবৃহৎ কালো স্পঞ্জের মতো, রাষ্ট্রবিপ্লবের গুরুপদভরে তাহা হইতে গৃহযুদ্ধের ধারাপাত আরম্ভ হইল।

এই অদৃশ্য সৈন্যগণ ওৎ পাতিয়া থাকিত। সময় সময় তাহারা মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া সাধারণতন্ত্রের সৈন্য-দলকে আক্রমণ করিত, আবার নিমেষমধ্যে ভূগর্ভে প্রবেশ করিত। তাহারা যেমন সহসা আবির্ভূত হইত, আবার তেমনি সহসা অন্তর্হিত হইতেও পারিত। এক-মুহূর্ত্তে তুষারশৈলের মতো তাহাদের আকস্মিক আগমন, পরমুহূর্ত্তে ধূলিপটলের মতো তাহাদের দ্রুতপ্রস্থান। যুদ্ধে তাহারা দৈত্যের মতো দুর্দ্ধর্ষ, আত্মগোপনে বামনের মতো সুদক্ষ—এ যেন ছুঁচোর বিদ্যায় অভ্যস্ত ব্যাঘ্র।

বিভিন্ন অরণ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের গোলকধাঁধায় পরিবৃত ছিল। প্রাচীন জমিদারভবন—যেগুলি বস্তুতঃ দুর্গ, পল্লী—যেগুলি বস্তুতঃ সৈন্যশিবির, গোলাবাড়ী—যেগুলি বস্তুতঃ ফাঁদ ও গোপন আক্রমণের ঘের—এই বাগুরা-বেষ্টনের মধ্যে সাধারণতন্ত্রের সৈন্যসমূহ ধরা পড়িল।

কোনও কোনও অরণ্যে ভূগর্ভস্থ গ্রামগুলি ছাড়া মাটির উপরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র কুটীরপরিবৃত পল্লী বিশাল বিটপী-সমূহের পত্র-পল্লব-নিবিড় ছায়ান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিত। কুটীরোত্থিত ধূমরাশি দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বহির্জগতে বিজ্ঞাপিত হইত। স্ত্রীলোকেরা এই সব কুটীরে বাস করিত; আর পুরুষগণ থাকিত গুহার ভিতরে।

উপরে আসিতে হইলে তাহাদিগকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। কেন না সেটা অনেক সময় বিপজ্জনক ছিল। হঠাৎ ভূতল হইতে বাহির হইয়া তাহারা হয়তো দেখিল একদল সাধারণতন্ত্রের সৈন্য তাহাদের একে-বারে মাথার উপরে। এই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে ডবল-ফাঁদ বলা যাইতে পারে। 'নীলদলের' লোকেরা ইহাতে প্রবেশ করিতে ভীত হইত, আর 'সাদাদলের' লোকেরা ইহার বাহিরে আসিতে সাহস পাইত না।

সময় সময় ইহারা এই কবরের জীবনে বিরক্ত হইয়া শত বিপদসম্ভাবনা সত্ত্বেও বাহিরে উঠিয়া আসিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে সমবেত হইয়া নৃত্য করিত। অন্যথায় কাল কাটাইবার জন্য তাহারা প্রার্থনায় রত হইত। বুর্দোয়া বলেন, জঁা চোয়া তাহাদিগকে প্রতিদিন মালা-জপ করাইত।

সহসা তাহারা মৃত্যুর সন্ধানে ধাবিত হইত—সমাধির পরিবর্ত্তে কারাগারও বুঝি প্রার্থনীয় হইয়া উঠিত। কখনো কখনো তাহারা গর্ত্ত ও গুহার আবরণ সরাইয়া কান পাতিয়া শুনিত, দূরে যুদ্ধ হইতেছে কি না। শুনিয়া শুনিয়া তাহারা যুদ্ধের গতি ও পরিণাম বুঝিতে পারিত। সাধারণতন্ত্রের গোলাগুলিবর্ষণ ছিল ধারাবাহিক; আর রাজপক্ষীয়দের ছিল থেকে থেকে। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ থামিয়া গেলে সেটা রাজপক্ষীয়দের পরাজয়ের চিহ্ন। আর যদি বন্দুকের আওয়াজ থেকে থেকে হইতে থাকে এবং দিক্‌প্রান্তের দিকে সরিয়া যায়, তবে তাহাদের সুবিধা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সাদার দল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিত; নীলদলের লোকেরা তাহা করিত না—কারণ জনপদগুলি ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে।

বাহিরে কি হইতেছে—তাহারা তাহার সব খবর রাখিত। সমস্ত শকট ও সেতু তাহারা ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল তবু তাহাদের খবরাখবরের কোন বাধা হইত না। আশ্চর্য্য-জনক উপায়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন হইতে বনান্তরে, কুটীর হইতে কুটীরান্তরে অত্যন্ত সত্বরতার সহিত সতর্কীকরণ সংবাদ যথাসময়ে প্রচারিত হইত। বোকার মতো একজন কৃষক চলিয়া গেল—তাহারই ফাঁপা লাঠির ভিতরে সে ডেস্‌প্যাচ্ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

একজন বিশ্বাসঘাতকের মারফতে তাহারা বহুসংখ্যক সাধারণতন্ত্রের ছাড়পত্র যোগাড় করিয়াছিল। নামের জায়গাটা তাহাতে খালি ছিল। তৎসাহায্যেও তাহারা বৃটেনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসেই গমনাগমন করিতে পারিত।

৪

সামরিক জীবন

স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকায় প্রায় পাঁচলক্ষ লোক ভেণ্ডির এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ফেডারেলিষ্ট এবং 'গিরণ্ডি' সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই অনলে ফুৎকার প্রদান করিত।

এই সব লোকের অধিকাংশেরই অস্ত্র ছিল সুধু বর্শা। পাখী-শিকারের বন্দুকও যথেষ্ট ছিল। লক্ষ্যভেদে ইহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব। আর একটা বিশেষত্ব ইহাদের ছিল—ইহারা দৌড়িতে দৌড়িতে বন্দুকে গুলিবারুদ পুরিতে পারিত। নীলদলের লোকদিগকে আক্রমণ করিবার এবং খাদ পার হইবার সুবিধার জন্ম তাহারা দশ হাত লম্বা বর্শা ব্যবহার করিত। এই অস্ত্র, যুদ্ধ এবং পলায়ন উভয়েরই উপযোগী।

সাধারণতন্ত্রের লোকদের সহিত এই কৃষকদের হয় তো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়েও যদি তাহারা ঘটনাক্রমে কোন ক্রশ্‌ বা গির্জ্জা দেখিতে পাইত, তবে অমনি তাহারা জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিত—শত্রুর অগ্নিবর্ষণ গ্রাহ্য করিত না। কত জন সেইখানেই চিরকালের মতো বিশ্রামলাভ করিত। কিন্তু যাহারা জীবিত থাকিত তাহারা মালাজপ শেষ হওয়া মাত্র উঠিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিত। কি বীরত্ব!

তাহাদের দলে অনেক রমণীও ছিল। নেতারা তাহাদিগকে যাহা বলিত তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিত। পাদ্রীরা অপর কতকগুলি পাদ্রীর গলদেশে রজ্জুদ্বারা লাল দাগ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিত, "ইহারা গিলোটিনে নিহত হইয়াছিল—আবার ইহাদিগকে জীবিত করা হইয়াছে।" কৃষকেরা বিনা-দ্বিধায় তাহা বিশ্বাস করিত। কখনো কখনো তাহারা মহানুভবতারও পরিচয় দিত। সাধারণতন্ত্রের একজন পতাকাবাহী তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও পতাকা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা তাহাকে সম্মান দেখাইয়াছিল।

প্রথম প্রথম তাহারা কামানকে ভয় করিত। পরে শুধু লাঠি-হস্তে অগ্রসর হইয়া তাহারা অনেক কামান দখল করিয়া লইয়াছিল। বারুদের অভাব হইলে তাহারা মালা জপিতে জপিতে সাধারণতন্ত্রের অস্ত্রাগার আক্রমণ করিয়া তথা হইতে বারুদ লুটিয়া লইত। স্বপক্ষের আহত লোকদিগকে তাহারা আপাততঃ শস্যক্ষেত্রে কি কোন জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিত; পরে যুদ্ধান্তে আসিয়া খুঁজিয়া লইয়া যাইত।

যুদ্ধোপযোগী বিশেষ পরিচ্ছদ (ইউনিফর্ম) তাহাদের ছিল না। যাহা ছিল, তাহা প্রায়ই জীর্ণ, ছিন্ন। যে-কোন পোষাক হাতের কাছে পাওয়া যাইত তাহারা তাহাই পরিধান করিত। একজনের মাথায় ছিল একটা থিয়েটারের পাগড়ী, আর একজন একটা ব্যারিষ্টারের গাউন পরিয়া এবং স্ত্রীলোকের টুপী মাথায় দিয়া আসিয়াছিল। সাদা কোমরবন্ধ এবং উত্তরীয় সকলেরই। গ্রন্থির সংখ্যা দ্বারা পদমর্য্যাদা সূচিত হইত।

শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময় তাহারা সমস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া বন, জঙ্গল, টিলা, খাদ—সকল স্থান হইতে এককালে লাফাইয়া পড়িত, এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও বিনাশ-কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া যাইত। সাধারণতন্ত্রের অধিকৃত গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহারা "স্বাধীনতা দণ্ডটিকে" অগ্নিসাৎ করিত এবং সেই দহ্যমান দণ্ডের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিত।

অতর্কিত আক্রমণই ছিল ভেণ্ডির পদ্ধতি। ৪০।৪৫ মাইল তাহারা নীরবে কুচ করিয়া যাইত—একটি গাছের পাতা কি একটি ঘাসও নড়িত না। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাহাদের সেনাপতিরা স্থির করিত, সাধারণতন্ত্রীদের কোন্‌ ঘাটি আগামী কল্য আক্রমণ করিতে হইবে। তখন এই জন-বাহিনী তাহাদের বন্দুকে গুলি-বারুদ পুরিয়া, কিঞ্চিৎ প্রার্থনার পর জুতা খুলিয়া নগ্নপদে, নিঃশব্দে বনবিড়ালের মতো কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইত। নিশাচরের মতোই ছিল তাহাদের স্বভাব।

৫

পরিবেষ্টনের প্রভাব

ভেণ্ডির প্রকৃত শক্তি ভেণ্ডিতেই। স্বদেশে তাহারা অজেয়, অটুট, দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু লয়ের নদী পার হইয়া প্যারিস

আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। বোঁচাম্প, লেস্‌কিওয়র, লা রোচে, জ্যাকলিন প্রভৃতি তাহাদের খ্যাতনামা নেতারা এই বিষয়ে ভুল বুঝিয়াছিল। কৃষক-ঝটিকা কর্ত্তৃক প্যারিস আক্রমণ, একদল পশুপালক কর্ত্তৃক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুন্নত মহানগরীর অধিবাসীদিগকে আক্রমণ—বাতুলতা মাত্র! ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল। দুশ্চেষ্টার প্রতিফল পাইতে বিলম্ব হইল না। লয়ের নদী অতিক্রম করাই ভেণ্ডিয়ান্ সৈন্যের অসম্ভব হইল।

ভেণ্ডির বিদ্রোহ সফল হয় নাই। অন্যান্য অনেক বিদ্রোহ সফল হইয়াছে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের বিদ্রোহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্ব্বত্য ও আরণ্য বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কিন্তু একটা প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমোক্তেরা সর্ব্বদাই একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লড়াই করে, শেষোক্তেরা করে কুসংস্কারপ্রণোদিত হইয়া; স্বাধীনতা-লাভই একের উদ্দেশ্য, অপরে চায় নির্জ্জনতা; ইহারা উর্দ্ধাকাশে উড়িয়া বেড়ায়, উহারা ভূতলে হামাগুড়ি দিয়া চলে। পার্ব্বতীয়েরা প্রচণ্ড জলপ্রপাত এবং বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রতিবেশী, আর অরণ্যবাসীদের নিয়ত পরিচয় বদ্ধ জলাভূমির সঙ্গে—যেখানে মহামারীর বিষবীজ লুকায়িত থাকে। একজনের মস্তক মুক্ত সুনীল আকাশে, অপরের মস্তক ঝোপের আওতায়; আলোকোজ্জ্বল গিরিশিখরে একজনের অধিষ্ঠান, অপরের বাস নিম্নে চিরান্ধকারে।

পর্ব্বত ও অরণ্যের শিক্ষা একরূপ নহে। পর্ব্বত হইতেছে সুরক্ষিত দুর্গ, আর অরণ্য হইতেছে গুপ্তাবাস; একে আমাদের সাহস জন্মায়, অপরে শিখায় চাতুরী। পৌরাণিক কাহিনীর মতে দেবতারাই পর্ব্বতের অধিবাসী, আর অপদেবতারা অরণ্যের। আপেনাইন্, আল্‌প্‌স্, পিরেনীজ এবং ওলিম্পাস্ স্বাধীন দেশেরই পর্ব্বত। 'মণ্টব্লাঙ্ক' পর্ব্বত সুইসবীর উইলিয়ম টেলের বিরাট সহকারী। মোহান্ধকারের সঙ্গে যুঝিয়া আত্মার দিব্যালোক-লাভের প্রচেষ্টা—যাহাতে ভারতবর্ষের কাব্যসকল পরিপূর্ণ—তাহাতেও মহান্ হিমাচলের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীস, স্পেন, ইটালী—ইহাদের শক্তির মূল পর্ব্বত। জার্ম্মেনী কি বৃটেনীর শক্তির মূল অরণ্য; অরণ্যেই বর্ব্বরতা।

মানুষের কার্য্যকলাপ তাহার দেশের প্রাকৃতিক গঠনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এ বিষয়ে দেশভূমি যে তাহার কতদূর সহকারী, সে হয় তো তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারে না। বন্য উদ্দাম নৈসর্গিক দৃশ্যের পরিবেষ্টনের মধ্যে লালিত মানবসন্তানের প্রকৃতিতে সেই বন্য ও উদ্দাম ভাবের ছাপ পড়েই। বিবেকের উপর—বিশেষতঃ জ্ঞানালোকবিবর্জ্জিত বিবেকের উপর—মরুভূমির প্রভাব অনেক সময় সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কেনো কোনো বিবেক অমিতবলশালী—তাহা হইতেই সক্রেটিস্ বা খ্রীষ্টের উদ্ভব। কখনো কখনো অতি দুর্ব্বল, সংকীর্ণ বিবেকও দেখা যায়—তাহার ফল জুডাস, যে খ্রীষ্টকে ধরাইয়া দেয়। আলোকহীন বনানী, ঝোপঝাড়-কণ্টক-সমাকীর্ণ সুগুপ্ত জলাভূমি—এই সমস্তই দুর্ব্বল, বদ্ধ বিবেককে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে, এবং উহাতে তাহাদের মন্দ প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়। দৃষ্টিবিভ্রম, দুর্ব্বোধ্য মরীচিকা, সাময়িক এবং পারিপার্শ্বিক বিভীষিকা মানুষের আতঙ্কিত মনকে সাধারণতঃই কুসংস্কারপূর্ণ করিয়া তোলে, আর উত্তেজনার সময়ে উহাকে পাশবিকতায় প্রণোদিত করে। ভ্রমই অস্পষ্টালোকে মানুষকে হত্যার পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক দ্বৈতার্থবিশিষ্ট। মনীষীরা উহা একভাবে বুঝিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হয়; জড়বুদ্ধি অসভ্যেরা অন্যভাবে অনুমান করিয়া আপনাদিগকে কেবল ভ্রান্তিজালে জড়াইতে থাকে। অরণ্যের অস্পষ্টতা, নির্জ্জনতা অজ্ঞজনের অনালোকিত মনকে আরও অন্ধমোহাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। কোনো কোনো পর্ব্বত, কোনো কোনো গহ্বর, কোনো কোনো বৃক্ষসমাচ্ছন্ন অরণ্যের পত্রাবকাশ মানুষকে যেন ক্ষেপাইয়া তুলিয়া নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্ররোচিত করে। এগুলি যেন শয়তানের আবাসস্থলী।

বিশাল মুক্ত আকাশ মানুষের মনকে প্রসারিত করে; আর সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ খণ্ড-আকাশ তাহাকে একদেশদর্শী করে—তাহার মনকে ক্ষুদ্র করে। সংকীর্ণ মন উদার সার্ব্বজনীন ভাবের ধারণা করিতে না পারিয়া তাহাকে বিদ্বেষ করে। এই বিরোধই উন্নতির সংগ্রাম।

গ্রাম্যসমাজ—সমগ্র দেশ। এই দুইটি কথা ভেণ্ডির

সমরেতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার। স্থানীয় ভাব এবং বিশ্বজনীন ভাবের লড়াই; মূর্খ কৃষকের সংকীর্ণ স্বগ্রামপ্রীতি এবং শিক্ষিতের উদার দেশাত্মবোধের বিরোধ—ইহাই ভেণ্ডির সমর।

৬

বিদ্রোহী বৃটেনী

বৃটেনীর বিদ্রোহ নূতন নহে। গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে বৃটেনী অনেকবারই বিদ্রোহী হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদাই ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এই শেষবারের বিদ্রোহে কিন্তু তাহার ভুল হইল। তবুও বৃটেনীর সকল যুদ্ধেরই প্রকৃতি একরূপ—কেন্দ্রশক্তির সঙ্গে স্থানীয় শক্তির সংগ্রাম।

এই প্রাচীন জনপদগুলিকে পুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বদ্ধ-জলাশয়ে প্রবাহ নাই; তাহার উপর দিয়া যে বায়ু বহিয়া যায়, তাহাতে দূষিত বারিরাশি বিশোধিত হয় না, আন্দোলিত ও ক্ষুব্ধ হয় মাত্র।

ফিনিষ্টার ফ্রান্সের স্থলসীমা। মানুষের রাজ্যের ঐখানে শেষ। তথায় সাগর যেন ভূমি, সভ্যতা ও বর্ব্বরতা সকলকে বলিতেছে—"থামো!"

কেন্দ্র হইতে অর্থাৎ প্যারিস হইতে যখনই ধাক্কা আসে,—সে ধাক্কা রাজপক্ষেরই হৌক কি সাধারণতন্ত্রেরই হৌক,—স্বেচ্ছাচারপ্রসূতই হৌক কি স্বাধীনতার জন্যই হৌক,—অমনই বৃটেনী আপনার দলবল লইয়া তাহার বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া উঠে; কেন না, এরূপ ধাক্কা বৃটেনীর পক্ষে সর্ব্বদাই নূতন। আর নূতনের প্রতি অবিশ্বাস—এতো প্রকৃতির নিয়ম। "আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দাও! কি চায় ওরা আমাদের নিকটে?"—বৃটেনীর মনোভাব অনেকটা এই রকমের। বিধিব্যবস্থা, সংস্কারান্দোলন, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষাপরিষৎ—সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রামে গ্রামে সাঙ্কেতিক দামামা বাজিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবকেই আতঙ্কিত করিয়া তোলে!

ভয়ঙ্কর অন্ধতা!

কেবল বুঝিবার ভুলে এই সাংঘাতিক ভেণ্ডির বিদ্রোহ—একটা বিরাট অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা; বিচারহীন, কৌশলহীন, উদ্দেশ্যহীন আত্মহত্যা; আলোকপ্রতিরোধের জন্য প্রাচীর গাঁথিবার ব্যর্থ আয়োজন! আট বৎসর ধরিয়া এই বিভীষিকা ফ্রান্সের বক্ষের উপর চাপিয়া ছিল। ইহার ফলে চতুর্দ্দশটি জেলা জনশূন্য, অগণিত কৃষিক্ষেত্র বিনষ্ট, শস্যভাণ্ডার ও গ্রাম-জনপদ ভস্মীভূত, নগর চূর্ণীকৃত, আবাসভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং কত নারী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। সভ্যতার ভীতিস্থল এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের একমাত্র ভরসা—এই দারুণ গৃহযুদ্ধ। ইহা বাস্তবিকপক্ষে দেশ-দ্রোহীদের একটা ক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা।

পরিণামে ইহাতে উন্নতিরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহা-সঙ্কটেরও একটা শিক্ষা এবং সুফল আছে।

দ্বিতীয় স্তবক

১

অন্তর্বিপ্লব না পারিবারিক যুদ্ধ?

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের নিদাঘকালে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল, আর ১৭৯৩ সালের নিদাঘে একেবারে অনাবৃষ্টি। ভয়ঙ্কর গরম পড়িল। গৃহযুদ্ধের কালে বৃটেনীতে উল্লেখযোগ্য পথঘাট যদিচ আর বড় একটা ছিল না, তবু এই বর্ষণহীন গ্রীষ্মঋতুতে শুষ্ক মাঠের উপর দিয়া চলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

জুলাই মাসের এক মনোরম অপরাহ্নে, সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ-পূর্ব্বে জনৈক অশ্বারোহী পণ্টর্সনের নগর-তোরণ সমীপস্থ এক সরাইখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সারাদিন অত্যন্ত গুমোট করিয়া ছিল, কিন্তু এইমাত্র বাতাস আরম্ভ হইয়াছে।

একটা সুবৃহৎ আলখাল্লায় পথিকের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। এমন কি অশ্বটির পৃষ্ঠদেশও উহাতে কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। তাহার মস্তকে প্রশস্ত-প্রান্তবিশিষ্ট হ্যাট, তাহাতে ত্রিবর্ণের 'রিবন' আটকানো। লোকটা যে দুঃসাহসিক ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের দেশে তৎকালে 'রিবন' মাত্রই বন্দুকের লক্ষ্যস্থল ছিল। হস্তদ্বয়কে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে

গলদেশে আবদ্ধ আলখাল্লাটা পশ্চাদ্দিকে সরানো ছিল। তাহার নীচে স্কন্ধের উপর দিয়া তির্য্যক্‌ভাবে বিলম্বিত একটা তেরঙ্গা বন্ধনী দেখা যাইতেছিল—উহাতে দুইটি পিস্তল নিবদ্ধ। কটিদেশ হইতে একটি তরবারি লম্বমান্।

অশ্বপদশব্দে সরাইর দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সরাইওয়ালা লণ্ঠনহস্তে দেখা দিল। গোধূলিকাল—রাজপথ তখনও আলোকিত ছিল, কিন্তু সরাইখানার ভিতরে অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। 'রিবন'টির দিকে চাহিয়া সরাইওয়ালা বলিল, "সিটিজেন, আপনি কি আজ রাতে এখানেই থাক্‌বেন ?"

"না।"

"তবে কোথায় যাবেন ?"

"ডল—এ।"

"তা হ'লে হয় আভ্‌রাঁশে ফিরে যান, নয় ত পণ্টস্‌নেই থাকুন।"

"কেন ?"

"ডল—এ লড়াই হ'চ্চে।"

"বটে !"—এই বলিয়া অশ্বারোহী ঘোড়াটাকে কিছু দানা দিবার জন্য সরাইওয়ালাকে আদেশ করিলেন। সে একটা গামলাতে কতকগুলি দানা ঢালিয়া ঘোড়ার সম্মুখে রাখিল এবং লাগামটা খুলিয়া লইল। ঘোড়াটা নাকে কৎ-কৎ করিতে করিতে সেগুলি খাইতে আরম্ভ করিল। কথোপকথন চলিতে লাগিল।

"সিটিজেন, এটি কি সামরিক প্রয়োজনে সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত ঘোড়া ?"

"না।"

"তবে ঘোড়াটি কি আপনার নিজের ?"

"হ্যাঁ; আমি ওটা কিনেচি।"

"আপনি কোত্থেকে আস্‌চেন ?"

"প্যারিস থেকে।"

"সোজাসুজি নয় ?"

"না।"

"আমারও তা মনে হয় না! পথ-ঘাট বন্ধ; কিন্তু ডাকগাড়ী এখনও চল্‌ছে।"

"অ্যালেন্‌শন্ পর্য্যন্ত। সেখানেই আমি নেমেছিলুম।"

"শীঘ্রই ফ্রান্সে আর ঘোড়ার ডাক থাক্‌বে না। ঘোড়া মিলে না—তিন ফ্রাঙ্ক মূল্যের ঘোড়া এখন ছয় শ' ফ্রাঙ্কে বিকাচ্ছে। আর ঘাস তো এমন আক্রা যে তা কেনা আর পোষায় না। আমি ছিলুম ডাক-ম্যানেজার, এখন করেচি হোটেল; তের শ' তের জন ডাক ম্যানেজারের মধ্যে দু'শ'ই কাজ ছেড়ে দিয়েচে। সিটিজেন, আপনি নূতন তালিকার হারে ভাড়া দিয়েচেন ?"

"হ্যাঁ; ১লা মে'র তালিকানুসারে।"

"ডাক-গাড়ীতে জন প্রতি ২০ সু, টম্‌টমে ১২ সু, এবং মালগাড়ীতে ৫ সু। ঘোড়াটা আলেন্‌শনেই কিনেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"সারাদিনই ঘোড়া চালিয়ে এসেচেন ?"

"ভোর থেকে।"

"আর, গতকল্যও—?"

"তারও আগের দিন থেকে।"

"দেখাই যাচ্ছে; ডমফ্রণ্ট্‌ আর মর্টেন হ'য়ে আপনি এসেচেন ?"

"আর আভরাঁশে।"

"সিটিজেন, আমার কথা শুনুন। বিশ্রাম ক'রে নিন। আপনি ক্লান্ত, আর ঘোড়াটার তো কথাই নাই।"

"ঘোড়ার ক্লান্ত হওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু মানুষের নেই!"

হোটেলস্বামী আবার পথিকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল,—দেখিল, তাহার ধূসর-কেশ-পরিবৃত বদনমণ্ডল গম্ভীর, প্রশান্ত, কঠোর। তারপর জনহীন রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি এমন একলা-একলাই পথ চলেন ?"

"আমার সাথী আছে।"

"কোথায় সে ?"

"তলোয়ার এবং পিস্তলই আমার সাথী।"

সরাইওয়ালা এক বাল্‌তি জল আনিয়া ঘোড়াটাকে পান করিতে দিল। ইত্যবসরে পথিককে লক্ষ্য করিতে করিতে সে মনে মনে বলিল—"তবুও চেহারাটা কিন্তু পাদ্রীরই মতন।"

পথিক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না বল্‌ছিলে ডল—এ লড়াই হ'চ্চে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে লড়াই কর্‌চে?"

"একজন ভূতপূর্ব্ব আর-একজন ভূতপূর্ব্বের বিরুদ্ধে।"

"মানে?"

"সাধারণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী একজন ভূতপূর্ব্ব সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর লোক লড়াই করচেন রাজার পক্ষের আর-একজন ভূতপূর্ব্ব সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকের সঙ্গে।"

"কিন্তু এখন তো আর রাজা নেই?"

"বাচ্চাটি তো রয়েচে! মজার কথা শুনুন, এই দু'জন ভূতপূর্ব্ব আবার পরস্পরের আত্মীয়।"

অশ্বারোহী মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। সরাই-ওয়ালা বলিতে লাগিল:—"একজন যুবক, আর-একজন বৃদ্ধ। খুল্লপিতামহের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পৌত্রের লড়াই। বুড়োটি রাজপক্ষীয়, ছোঁড়াটি স্বাদেশিক; ঠাকুর্দ্দা 'সাদা' দলের নেতা, নাতি 'নীল'দলের। এদের কেউ কাউকে দয়া করবে না—এ আমি নির্ঘাত ব'লে দিতে পারি। এ যুদ্ধের পরিণাম মৃত্যু।"

"মৃত্যু?"

"হ্যাঁ, সিটিজেন। ভাল কথা, এরা পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্‌চে, দেখবেন? এই দেখুন, বুড়ো একটা ইস্তাহার বাড়ীতে বাড়ীতে, গাছে গাছে, এমন কি আমার সদর দোরে পর্য্যন্ত এঁটে দিয়েচে।"

সরাইওয়ালা লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখাইল, ফটকের দরজার একপাট কপাটের উপর বড়-বড় হরফে লিখিত একখানা চৌকা কাগজ লাগানো আছে—পথিক ঘোড়ার উপর বসিয়া বসিয়া তাহা পাঠ করিল।

"মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র ভাইকাউণ্ট গভেনকে বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যদি মার্কুইস্ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে ধৃত করিতে পারেন, তবে তিনি ভাইকাউণ্টকে সসম্মানে গুলি করিয়া হত্যা করাইবেন।"

"আর তার জবাব এই,"—এই বলিয়া হোটেল-স্বামী তাহার লণ্ঠনের আলো কপাটের অপর পাটের উপর নিক্ষেপ করিল। দ্বিতীয় একখানি ইস্তাহার প্রথমখানার সহিত সমসূত্রে তথায় লাগানো আছে। পথিক পাঠ করিল—

"গভেন ল্যান্টিনেককে সতর্ক করিতেছেন যে, ধরিতে পারিলে তিনি তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করাইবেন।"

সরাইওয়ালা বলিল, "গত কল্য প্রথম ইস্তাহারটি আমার দোরে এঁটে যায়; আজ সকালে দ্বিতীয়টি লাগানো হ'য়েচে। জবাব সঙ্গে সঙ্গেই!"

অর্দ্ধস্ফুটস্বরে, যেন আপন মনেই, পথিক বলিল—"হ্যাঁ; এ যে কেবল দেশের ভেতরে যুদ্ধ তা নয়, এ পরিবারের ভেতরেও যুদ্ধ! ভালই,—ইহারও আবশ্যক আছে। জনশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এরূপ মূল্য দিয়েই ক্রয় করতে হবে।"

সরাইওয়ালা এই কথাগুলি শুনিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিল না।

পথিক হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক মাথার টুপী স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় ইস্তাহারটিকে অভিবাদন করিল। তাহার দৃষ্টি তখনও উহার উপরেই নিবদ্ধ।

সরাইওয়ালা বলিল, "তা হ'লে সিটিজেন, এখন বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়িয়েচে? নগর ও বড় বড় সহরে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে; আর গ্রামবাসীরা এর বিপক্ষে। এ হ'চ্চে সহুরেদের সঙ্গে গ্রাম্য কৃষকদের লড়াই। তারা আমাদের বলে ভাঁড়,—আমরা তাদের বলি চাষা। সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা আর পাদ্রীরা তাদের দলে।"

বাধা দিয়া অশ্বারোহী বলিল, "সকলে নয়।"

"তাতো নয়ই, সিটিজেন, কারণ এখানেই তো একজন ভাইকাউণ্ট একজন মার্কুইসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েচেন, দেখ্‌তে পাচ্চি।"

তার পর সে মনে মনে বলিল, "নিশ্চয়ই এ একজন পাদ্রী।"

অশ্বারোহী বলিল, "তা এ দু'জনের মধ্যে সুবিধে হ'চ্চে কার?"

"এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখ্‌তে পাচ্চি, ভাইকাউণ্টের। কিন্তু তাঁকে খুব বেগ পেতে হ'চ্চে। বুড়ো লোকটি ভারি শক্ত। তাঁরা উভয়েই গভেন-বংশের—এ অঞ্চলেরই অভিজাত-বংশ। এ বংশের দুই শাখা—বড় শাখার প্রধান হ'চ্চেন মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক; আর ছোট শাখার

প্রধান হ'চ্চেন ভাইকাউণ্ট গভেন। আজ এই দুই শাখায় পরস্পর যুদ্ধ হ'চ্চে। গাছের শাখায় শাখায় লড়াই হয় না, কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয়। মার্কুইস্ ডি ল্যাণ্টিনেক বৃটেনীতে সর্ব্বশক্তিমান্; কৃষকেরা তাঁকে রাজার মতন দেখে। যেদিন তিনি বৃটেনীর উপকূলে এসে নাম্‌লেন, সেই দিনই আট হাজার লোক তাঁর দলে যোগ দিল, আর এক সপ্তাহের মধ্যে তিন শ' গ্রাম তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রে বিদ্রোহী হ'ল। উপকূলে দাঁড়াবার একটু জায়গা যদি তিনি পেতেন, তা হ'লেই ইংরেজরা এসে ডাঙায় নাম্‌ত। কিন্তু দেখুন দৈবের চক্র! গভেন—ওঁরই ভ্রাতুষ্পৌত্র—নিকটেই ছিলেন; তিনি হ'চ্চেন সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি, আর তিনি ঠাকুর্দ্দার চালে কিস্তি দিলেন! আরো একটা সৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে, ল্যাণ্টিনেক এসে যখন দলে দলে বন্দীদের হত্যা কর্‌তে লাগল, তখন তাঁর আদেশে দুইটি রমণীকে গুলি ক'রে মারা হয়; এদের একজনের ছিল তিনটি ছেলে-মেয়ে, আর 'লাল পল্‌টন' নামে প্যারিসের এক ব্যাটালিয়ন ওদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল; এখন শিশুদের মা'র হত্যাকাণ্ডে তারা একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ল। এই পল্‌টনের লোক অল্পই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এরা ভয়ঙ্কর সঙীন-বাজ। এদের এখন কমাণ্ডেণ্ট গভেনের সেনাদল-ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েচে—এদের কেউ বাধা দিতে পারে না। সেই রমণী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং ছেলেদের উদ্ধার কর্‌তে তারা বদ্ধপরিকর। বুড়ো সেই বাচ্চাগুলিকে নিয়ে কি করেচে, কেউ জানে না। তাতেই এই প্যারিসের সেনাদল ক্ষেপে উঠেছে। যদি সেই শিশুরা এই ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে না পড়্‌তো তা হ'লে যুদ্ধের এ আকার হ'ত না। ভাইকাউণ্ট বেশ ভাল লোক—সাহসী যুবক; কিন্তু বুড়ো মার্কুইস্‌টি বড়ই ভয়ঙ্কর। কৃষকেরা বলে, তাদের সেনাপতি দেবতা, আর সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি শয়তান। কিন্তু সিটিজেন, যদি শয়তান ব'লে কিছু থাকে তবে সে হ'চ্চে ল্যাণ্টিনেক, আর যদি দেবতা ব'লে কিছু থাকে তবে গভেনই সেই দেবতা। আপনি কিছু খাবেন না, সিটিজেন?"

"একখণ্ড রুটি ও পানীয়পূর্ণ অলাবু আমার সঙ্গেই আছে। কই, ডল্—এ কি হ'চ্চে তা ত' কিছু বল্লে না?"

"বল্‌ছি। উপকূলের তল্লাসী-সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হ'চ্চেন গভেন। ল্যাণ্টিনেকের মতলব ছিল, সর্ব্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রী পিটের রাস্তা খোলসা ক'রে দেওয়া, এবং বিশ হাজার ইংরেজ ও দু'লাখ কৃষক নিয়ে ভেণ্ডির সেনাদল পুষ্ট ক'রে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু গভেন তাঁর এই মতলব সিদ্ধ হ'তে দেননি। উপকূল এখন গভেনেরই হাতে; তিনি ল্যাণ্টিনেককে তাড়িয়েচেন গ্রামের ভেতর, আর ইংরেজদের তাড়িয়েচেন সমুদ্রে। ল্যাণ্টিনেক এখানে এসেছিলেন কিন্তু গভেন তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েচেন—গ্রেনভিলে পৌঁছ্‌তে দেননি। গভেনের এখন চেষ্টা হ'চ্চে ল্যাণ্টিনেককে পুনরায় কুজাসে'র অরণ্যে আট্‌কে তাঁকে ঘিরে ফেলা। কাল পর্য্যন্ত সব ভালই চল্‌ছিল; গভেন তাঁর সৈন্য নিয়ে এইখানে ছিলেন। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, বুড়ো ডল্ দখল কর্‌তে যাচ্ছেন। লোকটা বড্ড সেয়ানা। যদি তিনি ডল্ দখল ক'রে সেখানকার পাহাড়ের উপর কামান পাত্‌তে পারেন, তা হ'লে উপকূলের কতকটা তাঁর হাতে থাক্‌বে এবং ইংরাজরাও এসে অনায়াসেই নাম্‌তে পার্‌বে। আর তা হ'লে তো সবই গেল। এই জন্যই গভেন—একটা মাথাওয়ালা লোক বল্‌তেই হবে—তাড়াতাড়ি, কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, কারও হুকুমের তোয়াক্কা না রেখে, একেবারে সব দলবল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ডল্-এ পড়েচেন। এখন ডল্-এতেই এই দুই বৃটনের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হবে। ধাক্কাটা খুবই লাগ্‌বে। এখনই হয় তো বেধে উঠেছে।"

"ডল-এ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগ্‌বে?"

"কামান-টামান নিয়ে যেতে সৈন্যদের প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগ্‌বার কথা। কিন্তু তারা এতক্ষণ পৌঁছে গেচে।"

পথিক কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, "কামানের গর্জ্জনই তো যেন শোনা যাচ্চে।"

সরাইওয়ালাও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। বলিল, "হ্যাঁ, সিটিজেন। কামানের আওয়াজই বটে। লড়াই আরম্ভ হ'য়েচে। রাতটা এখানে কাটানোই আপনার পক্ষে উচিত হবে। সেখানে গিয়ে কাজটা কি?"

"আমার থাক্‌বার যো নেই; আমাকে যেতেই হবে।"

"আপনি ভুল করুচেন। আপনার কি কাজ, জানিনে; কিন্তু সে কাজের সহিত এ সংসারে যা আপনার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম—অন্তরতম—এমন-কিছু সংশ্লিষ্ট না থাকলে, এই বিপদসাগরে ঝাঁপ দেওয়া—

"অশ্বারোহী বলিলেন, বাস্তবিক পক্ষে আমার কাজের সহিত তেমন বিষয়ই সংশ্লিষ্ট।"

"আপনার পুত্রের সম্বন্ধে কিছু বুঝি?"

"প্রায় তা'ই।"

সরাইওয়ালা মনে মনে বলিল, "তবু ইনি পাদ্রী বলিয়াই আমার ধারণা হয়।" তারপর একটু ভাবিয়া আবার আপন মনেই বলিল, "তা হোক্, পাদ্রীরও ছেলে-পিলে থাক্তে পারে।"

পথিক বলিল, "ওহে, আমার ঘোড়ার লাগামটা আবার পরিয়ে দাও; তোমাকে কত দিতে হবে?"

তিনি সরাইওয়ালার প্রাপ্য শোধ করিয়া দিলেন।

সরাইওয়ালা বাল্তি ও গামলা দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়া রাখিয়া অশ্বারোহীর নিকট ফিরিয়া আসিল।

"আপনি যখন যাবেনই তখন আপনাকে একটা কথা ব'লে দিচ্ছি। দেখাই যাচ্চে, আপনি সেণ্ট মালোর দিকে যাবেন,—তা ডল্ হ'য়ে যাবেন না। দুটো পথ আছে—ডল্-এর পাশ দিয়ে একটা, আর সমুদ্রের ধার দিয়ে একটা। দুটো রাস্তাই প্রায় সমান পথ। ডল্ দক্ষিণে এবং ক্যান্কেল্ উত্তরে রেখে আপনি চ'লে যাবেন। এই সড়কটার মাথায় গিয়েই দেখ্বেন দু'দিকে দুটো পথ গিয়েচে। ডল্-এর পথ হ'চ্চে বাঁ দিকে, আর অপর পথটা ডান দিকে। আমার কথা শুনুন,—ডল্-এর দিকে গেলে আপনি একেবারে জবাইর মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। সুতরাং বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকেই যাবেন।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। তখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। পথিক নৈশান্ধকারে ডুবিয়া গেলেন। সরাইওয়ালা তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

সড়কের প্রান্তে, যেখানে পথ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে, সেখানে আসিয়া পথিক শুনিলেন, সরাইওয়ালা দূর হইতে ডাকিয়া বলিতেছে, "ডাইনে যাবেন, ডাইনে যাবেন।"

পথিক বামদিকের পথে অগ্রসর হইল।

ডল্

ডল্ ফ্রান্সের বৃটেনী প্রদেশের স্পানিয়ার্ডগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি নগরী। বাস্তবিক পক্ষে ইহা সহর নহে,—একটি ষ্ট্রীট মাত্র। একটা সুপ্রাচীন প্রশস্ত সড়ক, আর তাহার উভয় পার্শ্বে স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার সারি। সহরের অবশিষ্টাংশ এই বৃহৎ সড়ক হইতে নির্গত গলি-ঘুঁজির জালে সমাচ্ছন্ন। প্রাচীরবেষ্টিত তোরণযুক্ত নয় বলিয়া সহরটি অবরোধ-সহ ছিল না, কিন্তু দুর্গবৎ অট্টালিকা-শ্রেণীতে সুরক্ষিত-পার্শ্ব সড়কটি এইরূপ আক্রমণপ্রতিরোধে সমর্থ ছিল। বাজারটা ছিল রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায়।

সরাইওয়ালা ঠিকই বলিয়াছিল। ডল্-এ তখন উন্মত্ত সংগ্রাম চলিতেছে। প্রাতঃকালে, 'সাদাদল' আসিয়া পৌঁছে; আর 'নীলদল' আসিয়া পড়িল সন্ধ্যার সময়ে। সহসা এই দুই দলের নৈশ সংগ্রামে সহরটি তোলপাড় হইয়া উঠিল। পক্ষ-দ্বয় সমবল ছিল না। 'সাদাদলে' ছয় হাজার লোক, 'নীলদলে' মোটে পনর শত। কিন্তু জিঘাংসা উভয় দলেরই সমান। আশ্চর্য্যের কথা এই, পনরশতই ছয় হাজারকে আক্রমণ করিয়াছে।

একদিকে অশিক্ষিত জনতা, অপরদিকে বূাহবদ্ধ সৈন্যশ্রেণী। একদিকে ষট্সহস্র কৃষক—তাহাদের চামড়ার খাটো কোর্ত্তার উপরে মন্ত্রপূত পদক আটকানো, মাথায় সাদা ফিতে জড়ানো গোল টুপী, অস্ত্রের মধ্যে সঙীনহীন সেকেলে বন্দুক, এবং তলোয়ার অপেক্ষা কৃষিকার্য্যোপযোগী হাতিয়ারেরই প্রাচুর্য্য। ইহারা অসজ্জিত, অনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু উন্মত্ত—মরিয়া। অপরদিকে ত্রিকোণোষ্ণীষ-শিরস্ক, কটি-লম্বিত-কৃপাণ, দীর্ঘ-সঙীন-পাণি পনর শত সৈনিক। তাহারা শিক্ষিত, সুদক্ষ, আদেশপালনে এবং আদেশদানে সমান সক্ষম—নম্র অথচ দুর্দ্ধর্ষ। পাদুকাহীন, ছিন্নবস্ত্র ভলাণ্টিয়ারগণও তাহাদের মধ্যে ছিল—কিন্তু তাহারা দেশের জন্য স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিক। রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রাচীন নাইটদের অনুরূপ

রাজার জন্য উৎসৃষ্ট-প্রাণ কৃষক যোদ্ধা; রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে পৌরাণিক মহাবীরগণ-তুল্য নগ্নপদ বীরপুরুষসমূহ; আর প্রত্যেক দলের আত্মা হইতেছে তাহাদের নেতা। রাজপক্ষের নেতা একজন বৃদ্ধ; সাধারণতন্ত্রীগণের নেতা একজন যুবক। একদিকে ল্যান্টিনেক, অপরদিকে গভেন।

মূর্ত্তিমান যৌবনের মতো গভেনের দেহশ্রী। হার্কিউলিসের মতো বিশালবক্ষ এই ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবকের চক্ষে ভবিষ্যদ্দর্শীর সুগভীর দৃষ্টি, এবং তাহার হাসিটি শিশু-হাস্যের মতোই শুভ্র, অনাবিল। সে মাদকদ্রব্য ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিল, এমন কি ধূমপান পর্য্যন্ত করিত না। তাহার মুখে কটুকথা উচ্চারিত হইতে কেহ শোনে নাই। তাহার বীর আত্মা কলুষ-সংস্পর্শে কখনো মলিন হয় নাই। সে সযত্নে তাহার নখ, দন্ত ও ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির সংস্কার করিত। এই যুদ্ধ-কালেও তাহার পোষাকের আধারটি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত, এবং কুচ-কাওয়াজ-অভিযানের স্বল্পাবসরেও আপনার ধূলি-ধূসরিত, বন্দুকের গুলিতে সচ্ছিদ্র, মিলিটারী কোটটি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখিতে তাহার কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যেখানে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে সেখানেই সে বিনাদ্বিধায় ঝাঁপাইয়া পড়িত, তবু কোনোদিন সে আহত হয় নাই। তাহার স্বর স্বভাবতঃ অত্যন্ত মিষ্ট, কিন্তু আবশ্যক হইলে তাহাতে সেনাপতির পরুষ কণ্ঠ অনায়াসেই জলদমন্দ্রে গর্জ্জিয়া উঠিত। তাহারই দৃষ্টান্তে সৈন্যগণ বৃষ্টিবাদল, ঝড়ঝাপটা, তুষারপাতের মধ্যেও ওভারকোট মাত্র গায়ে জড়াইয়া প্রস্তর-খণ্ডে মাথা রাখিয়া ভূমিতলে ঘুমাইয়া পড়িতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তরবারি হাতে লইলে তাহার মূর্ত্তি অন্যরূপ হইয়া যাইত। তাহার নারীসুলভ প্রকৃতি তখন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিত।

এতৎসত্ত্বেও সে চিন্তাশীল, দার্শনিক—তরুণ ঋষি। আকৃতিতে কন্দর্প, কিন্তু বাক্যে বৃহস্পতি।

ফরাসী-বিপ্লবের অচিন্তনীয় ঘটনাচক্রে গভেন একেবারে নেতা হইয়া উঠিল।

ল্যান্টিনেকও প্রবীন সৈনিক পুরুষ—চতুর এবং অক্লান্ত-কর্ম্মা। যুবকগণ অপেক্ষা বৃদ্ধগণ অধিকতর ধীরতার সহিত কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে, কারণ জীবন-মধ্যাহ্নের উত্তাপ ও চাঞ্চল্য হইতে তাহারা বহু দূরে। আর মৃত্যুগহ্বরে অন্তৈক-পাদ বৃদ্ধগণের ক্ষতির আশঙ্কাই বা কি আছে? এই জন্য ল্যান্টিনেকের সুকৌশলসম্পন্ন সামরিক কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেও কতকটা বে-পরোয়া ভাব ছিল। কিন্তু মোটের উপর, এবং প্রায় সর্ব্বদাই এই যুবক ও বৃদ্ধের সামনাসামনি সংগ্রামে গভেনই জয়ী হইত। ইহা শুধু গভেনের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলিয়া। বিজয়লক্ষ্মী রমণী—যুবকের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করেন।

গভেনের উপর ল্যান্টিনেকের বিদ্বেষ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণও ছিল। প্রথমতঃ গভেন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, সে তাঁহারই বংশধর হইয়া বৈপ্লবিকদলে যোগ দিয়াছে! অথচ এই দুষ্ট কুকুর তাঁহারই উত্তরাধিকারী (কারণ মার্কুইসের কোনো ছেলেপিলে ছিল না), তাঁহার ভ্রাতার পৌত্র—নিজের পৌত্র বলিলেই হয়! "হুঁ"—খুল্লপিতামহ মনে মনে বলি-লেন, "বাছাধনকে একবার যদি হাতে পাই, তবে তাকে কুকুরের মতোই হত্যা করবো!"

মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেকের জন্য বৈপ্লবিক পক্ষের অতি-মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট হেতু ছিল। ফ্রান্সের উপকূলে তাঁহার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম বিদ্রোহী ভেণ্ডির অরণ্যে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়িল। ল্যান্টিনেক এই বিরুদ্ধ-শক্তির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইলেন। এই বিদ্রোহে ইতি-পূর্ব্বে যেসব সর্দ্দারেরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া নিজ নিজ আড্ডায় স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে কার্য্য করিতেছিল, এই শক্তিমান্ নেতৃপুরুষের আবির্ভাবে তাহারা সকলে আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল, এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল। কেবল একটি লোক তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে হইতেছে গেভার্ড—যে সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। কেন? কারণ, গেভার্ড যেন এতকাল ট্রাষ্টীস্বরূপে গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল; ল্যান্টিনেকের আগমনে তাহার আর কোনও কাজ রহিল না, সে ভেণ্ডির অন্যতম নেতা বৌচাম্পের নিকট ফিরিয়া গেল। গেভার্ড ভেণ্ডির অন্ধিসন্ধি সব জানিত এবং

অন্তর্বিপ্লবের প্রাচীন পদ্ধতি সবই অবলম্বন করিয়াছিল; ল্যাম্টিনেকের তাহা ঠিক মনঃপূত হয় নাই। ট্রাষ্টীর অবলম্বিত পন্থায় সম্পত্তির মালিকগণ কবেই বা চলিয়া থাকে?

সামরিক রীতিতে ল্যাম্টিনেক প্রশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। বড় যুদ্ধের সঙ্গে ছোটখাটো লড়াইর ফলোপধায়কতা তিনি বেশ বুঝিতেন। 'জড়ভরত', বিশৃঙ্খল বৃহৎ সেনাদল তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। আবার ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ও লুক্কায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ এতদ্দ্বারা শত্রুকে উত্যক্ত করা যায় বটে, কিন্তু একেবারে নিপাত করিতে পারা যায় না। এইরূপ গোপন আক্রমণে উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত হয় না। সাধারণতন্ত্রের আক্রমণে যাহার আরম্ভ, তাহার পরিণাম হয় তো ডাকগাড়ী-লুণ্ঠনে।

ল্যাম্টিনেকের অভিপ্রায় ছিল প্রকৃত যুদ্ধ করা। কৃষকদের তিনি কাজে লাগাইবেন, কিন্তু তাঁহার আসল নির্ভর ছিল শিক্ষিত সৈন্যের উপরে। তিনি দেখিলেন, গুপ্ত ও অতর্কিত আক্রমণের পক্ষে এই গ্রাম্য যোদ্ধারা চমৎকার—তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া জুটিতে পারে, আবার নিমিষে অদৃশ্য হইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সংহতি বা ঐক্য নাই। ল্যাম্টিনেকের উদ্দেশ্য হইল, যথারীতি সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যদলকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে কৃষকসৈন্যগণকে খেলাইয়া বেড়ানো। মতলবটি গভীর এবং ভয়ঙ্কর। তদনুসারে কার্য্য হইলে ভেণ্ডি-বিজয় অসম্ভব হইত।

কিন্তু শিক্ষিত সৈন্য কোথায়?—তৈরী সেনাদলের সন্ধান কোথায় মিলিবে?—ইংলণ্ডে। এই জন্যই ল্যাম্টিনেকের দৃঢ় সঙ্কল্প, ইংরাজদিগকে আনিয়া ফ্রান্সের উপকূলে নামানো। এই বিষয়ে বিবেকের সহিত একটু বুঝাপড়া করিয়া লইতে হইল। পরদেশী সৈন্যের লাল উর্দ্দী ল্যাম্টিনেকের চক্ষে সাদা 'বো'তে ঢাকা পড়িয়া গেল। তাঁহার কেবল এক চিন্তা—উপকূলের কোনো একটা জায়গা দখল করিয়া পিটের (Pitt) হাতে তাহা সমর্পণ করা। এই জন্য ডল সহরটিকে অরক্ষিত দেখিয়া তিনি তাহা আক্রমণ করিলেন। ডল দখল করিতে পারিলে তথাকার পাহাড় এবং সমুদ্রতীরও হস্তগত হইবে।

স্থানটি বেশ সুনির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ডল পাহাড়ে সন্নিবেশিত কামান ফরাসী 'ক্রুজার'গুলিকে দূরে রাখিতে পারিবে, এবং রেজ-কুইনন হইতে সেণ্টমেলয়ের পর্য্যন্ত বেলাভূমিতে ইংরাজদের অবতরণ ও আক্রমণের আর কোন বাধা থাকিবে না।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য ল্যাম্টিনেক আপনার সঙ্গে মাত্র বাছা বাছা ৬০০০ সৈন্য, এবং দশটা বড়, একটা মাঝারি ও চারিটি ছোট কামান আনিয়াছিলেন। আভ্রাংশের দিকে ছিল কেবল গভেন ও তাহার পনর শত সৈন্য, এবং দিনানের দিকে লেচেল। সত্য বটে লেচেলের সঙ্গে ২৫০০০ সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহারা প্রায় ৬০ মাইল দূরে। সুতরাং ল্যাম্টিনেকের বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না।

ল্যাম্টিনেক সসৈন্যে ডল সহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দয়াহীনতার কুখ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল, নগরবাসীরা তাঁহার প্রবেশে বাধা দিবার কোনোই চেষ্টা করিল না। ভীত নাগরিকগণ স্ব-স্ব গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। ৬০০০ ভেণ্ডিয়ান অতি সহজেই সহরমধ্যে উপনিবিষ্ট হইল। এ যেন মেলাক্ষেত্র—যাহার যেখানে খুসী বসিয়া পড়িয়া তাহারা মুক্ত আকাশের নীচে রান্নাবান্না আরম্ভ করিয়া দিল। কোনো শিবির-সন্নিবেশ, দলবদ্ধ ভাবে নিশাযাপনের কোনো বিধিব্যবস্থা, কোনো সুশৃঙ্খল সৈন্যবিভাগ—কিছুই হইল না। কৃষক সৈন্যগণ বন্দুক রাখিয়া দিয়া জপমালা লইয়া নামজপে প্রবৃত্ত হইল।

ফিল্ড্ সার্জেণ্ট গুজ-লা-ক্রুয়াণ্টের উপর এখানকার অধ্যক্ষতার ভার দিয়া ল্যাম্টিনেক ডল পাহাড়ের দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ক্রুয়াণ্ট আপনার ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রকৃতির জন্য 'ইমানুস' (অমানুষিক কদর্য্যতা) নামে অভিহিত হইত। স্থানীয় প্রবাদের সহিত ইমানুসের নাম জড়িত। ভেণ্ডির অপরাপর লোকেরা শুধু অসভ্য; এ ছিল বর্ব্বর। যুদ্ধে সে শয়তানের মতন সাহসী—যুদ্ধান্তে রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুর। তাহার অন্তরটিতে জিলিপির প্যাঁচ। সে বিচার

করিয়া কার্য্য করিত বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত বিচার ও যুক্তির প্রণালী ছিল সর্পগতিবৎ—বাঁকা। তাহার যুক্তির ধারা হয় ত আরম্ভ হইল 'বীরত্ব' হইতে, কিন্তু শেষ হইল গিয়া 'নরহত্যায়'। সর্ব্বপ্রকার অভাবিত লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানই তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল। তাহার নিষ্ঠুরতাও ছিল বিরাট।

গুজ্-লা-ক্রয়ান্টের জিঘাংসা-প্রবৃত্তির উপর মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের খুবই আস্থা ছিল। যুদ্ধ-কৌশলে কিন্তু তাহার ততটা নৈপুণ্য ছিল না। তাহাকে ফিল্‌ড সার্জ্জেণ্ট করা মার্কুইসের ভুল হইয়াছিল। যাহা হোক, সব দিকে নজর রাখার জন্ত তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া, তাহার উপরেই সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া মার্কুইস ডল-পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেলেন। ইমানুস গ্রামকে-গ্রামের গলা কাটিতে যতটা পারগ ছিল, নগররক্ষায় তেমন সমর্থ ছিল না। তবুও সে এখানে সেখানে পাহারা বসাইল।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক পাহাড়ের উপর কোথায় কোথায় কামান স্থাপন করিবেন সব ঠিক করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সহসা তোপধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সহরের প্রধান রাস্তা হইতে রক্তবর্ণ ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে—নগর অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে, সেখানে লড়াই চলিতেছে।

মার্কুইস যদিও কিছুতেই আশ্চর্য্য হইবার লোক ছিলেন না, তবুও এইবার তিনি স্তম্ভিত হইলেন। এরূপ ঘটনার জন্ম তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কে এই কার্য্য করিল? গভেন হইতে পারে না। নিজ সৈন্যের চতুর্গুণ সৈন্যদলকে কেহ এরূপভাবে আক্রমণ করে না। লেচেল কি? সে কি এত পথ এরূপ দ্রুত কুচ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে?—বিশ্বাস হয় না। আর গভেন?—একেবারেই অসম্ভব।

ল্যান্টিনেক অশ্বে কশাঘাত করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, নগরবাসীরা পলায়ন করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন। ভয়বিহ্বল জনসমূহ ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "নীলদল!" "নীলদল!"

তিনি যখন আসিয়া নগরে পৌছিলেন, তখন অবস্থা বড়ই শোচনীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চিন্তাশীলতা ও ব্যক্তিস্বরূপে নারী

শ্রীমতী সাহানা দেবী

নারী-স্বাধীনতার সাড়া আজকাল আমাদের দেশে মন্দ শোনা যায় না। এ সম্বন্ধে নারী ও পুরুষের অনেক আলোচনা নানা পত্রিকাতে চোখে পড়ে। এ আলোচনায় বিশেষ ক'রে নারীকে নামতে দেখে ভরসা ও আনন্দ বেশি হয় একথা বলাই বাহুল্য, কেননা—"যার কাজ তারে সাজে"-ই ভাল। নারীর দাবী নারীর কাছ থেকে আসাই দরকার ও বাঞ্ছনীয়।

তবে এ সব আলোচনায় প্রায়ই নারীর পরাধীনতার জন্য নারী পুরুষকে যেন একটু অতিমাত্রায় দায়ী করেছে ব'লে মনে হয়। তার পরাধীনতার জন্য মূলতঃ পুরুষই দায়ী—এ অভিযোগ একটু যেন অতিশয়োক্তি ঠেকে।

আমাদের দেশে নারীর অধীনতার মূলে যে কারণ আজও আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তা বস্তুতঃ তার চিন্তাশীলতা ও পার্সনালিটির অভাব। সে নিজেকে তেমন ক'রে জানতে চায়নি কখনো। নারী নিজেকে তেমন ক'রে চিনতে চায়নি ব'লেই তার অন্তরের প্রকৃত দাবী তার কাছে এতকাল অগোচরেই থাকতে পেরেছে। সে তার ন্যায্য দাবী করবার অধিকার এ পর্য্যন্ত পায়নি ব'লে যে দোষ পুরুষকে দিয়ে এসেছে তা বাস্তবিক পক্ষে যথাযথ কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। পুরুষ যে এ অধিকার নারীকে দেয়নি সে কি সে দিতে চায়নি ব'লে, না নারী কখনো তেমন ভাবে সে দাবী করেনি ব'লে—প্রশ্ন ওঠে এখানেই। মানুষের অন্তরের সত্য ক্ষুধা তার কাছে আত্মগোপন ক'রে বেশিদিন থাকতে পারে কি? পদে পদে নারী হয় ত পরাধীনতার অসুবিধা ভোগ করেছে কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রশ্নের কোনও ক্ষুধা কখনো অনুভব করেছে কি না যে বাস্তবিক তার কি চাই, সত্যকার অভাব তার কোথায়, অসুবিধা তার কি ও কোনখানে—সেই হ'চ্ছে কথা। কাজেই যে দাবীর অধিকার সে পায়নি তা সত্যই দেওয়ার কি চাওয়ার অভাবে এইটেই বিবেচ্য। নিজেকে সে খুঁজতে চেষ্টা করেনি কখনো; বাইরে থেকে যেটুকু বুঝেছে সেটুকু শুধু এই যে সে নারী, এবং পুরুষ হ'তে ভিন্ন। এর বেশি মানুষ হিসেবে যে তার দাবী বা স্থান কি হ'তে পারে সে পরিচয় জানবার প্রয়োজনীয়তা অন্তরে সে তেমন ক'রে বোধ হয় কখনো বোধ করেনি। আর করেনি ব'লেই দাবীর অধিকার সে এতকাল পায়নি। কাজেই এ অধিকার না-পাওয়ার দরুণ সে নিজেই কি অনেকটা দায়ী নয়? সে নারী—এটুকু জেনেই সে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট রয়েছে। কিন্তু তার বেশি সে মানুষ, নারী-পুরুষ পার্থক্যের উপরেও অনেক বড়, একথা সে নিজে ধরতে আগে পারেনি, পেরেছে পরে—পুরুষের কাছে। নারীর নিজের যদি চিন্তার বিস্তার ও ব্যবহার থাকত তো এ তথ্য সে বহুপূর্ব্বেই আবিষ্কার করতে পারত। চিন্তাজগতের সঙ্গে নারীর পরিচয় বড় অল্প, নেই বললেও হয়। আমাদের দেশে আজকাল বিদুষী মহিলার অভাব নেই কিন্তু চিন্তাশীলতার দিকে তাঁদের সহজপ্রবণতা এখনো তেমন দেখা যায়নি বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এর কারণও খুব স্পষ্ট। যা কিছু বড়, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য তার স্বপ্ন (vision) দেখার সন্ধান মানুষ চিন্তাজগতের সংস্পর্শেই পায়। নারী এ জগতের খবর বড় রাখে না। সে বুঝেছে শুধু তার instinct, শুধু তার মাতৃত্ব, শুধু তার সেবা ও গৃহকেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে ছোটখাটো দৈনন্দিন কর্ম্মপটুতা ইত্যাদি। কিন্তু যে instinctএর গৌরবে নারী আপনাকে জানতে চায়নি তার ভিত্তি যে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত না-ও হ'তে পারে একথা তখন হয় ত সে বোঝেনি এখনো তার কানে পৌঁছেছে কি না জানি না। য়ুরোপের মনীষীরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে instinct ব'লে স্থায়ী কিছু থাকতে বাধ্য নয়, কালের গতির সঙ্গে সেও বদলে যেতে পারে। নারীর একটা সহজ-প্রবণতা হয় ত সন্তানবাৎসল্যে, সেবানৈপুণ্যে বা গৃহকেন্দ্রের

দিকে একদিন ছিল, কিন্তু তাই ব'লে চিরকালই তা ঐ একই-মুখী থাকতে বাধ্য হবেই তা ধ'রে নেবার কোনও যুক্তি বা মূলকারণ দেখি না।

শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে স্বাধীনতার যে সাড়া পড়েছে তার মূলে দেখতে পাই পুরুষের সমকক্ষ ও সমপ্রকৃতি হবার বাসনাই প্রবল। পুরুষের সমকক্ষ ও সমপ্রকৃতি হওয়াই নারী-স্বাধীনতা-আদর্শের একমাত্র লক্ষ্য যদি হ'য়ে থাকে তা হ'লে নারীর যথার্থ স্থান নারী কখনো পাবে কি না জানি না। তবে পুরুষের সমকক্ষ বা সমপ্রকৃতি না হ'য়েও যে নারী স্বাধীন হ'তে পারে ও মানুষ হিসেবে পুরুষের চাইতে ছোট না-ও থাকতে পারে এই কথাটি আমি বলতে চাই। পুরুষ যা করছে নারীকে ঠিক তাই করতে হবেই এর মধ্যে একটা বাহাদুরির তৃপ্তি মিলতে পারে বটে কিন্তু এইটেই নারীর স্বাধীনতা-লাভের পক্ষে একমাত্র পথ নাও হ'তে পারে। পুরুষ বা নারীর কথা নয়, কথা হ'চ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও চরিত্রের গঠন। নারী কি চায়?—নারী হিসেবে নিজেকে বড় দেখতে চায়, না মানুষ হিসেবে নিজেকে বড় করতে চায়। শেষেরটা সত্য হ'লে নারীকে 'পুরুষ নারী,' পার্থক্যের অভিমানপূর্ণ ব্যথা ভুলতে হবে। তাকে জানতে হবে সে এ দু'য়ের উপরে,—সে মানুষ। সে পুরুষ কি নারী এইটেই বড় কথা নয়, বড় কথা সে মানুষ। এই মনুষ্যত্বের বিকাশের সাহায্যার্থে স্বাধীনতার প্রয়োজন।

স্বাধীন মানুষ হ'তে হ'লে চিন্তাশীলতার প্রসার ও পার্সনালিটির বড় দরকার। পার্সনালিটি চাই সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ে নিজের দাঁড়াবার জন্যে, ও চিন্তাশীলতা চাই—তাকে বইবার পথ-নির্দ্দেশের জন্যে। এ দুটির সংযোগ হ'লে তবে মানুষের চরিত্র গ'ড়ে ওঠে। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এ দুটিরই বিশেষ অভাব। ঘরে ঘরে নারী শিক্ষিতা হ'লেও তাদের মধ্যে সে চরিত্র গ'ড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত এখনো বড় বিরল। শিক্ষিতা হ'লেও সে সাহসের অভাব এখনো বড় চোখে পড়ে। তাই শিক্ষিতা হ'লেও প্রায়ই দেখা যায়, এদেশে এখনো অনেক ক্ষেত্রে নারী এক-একেকটি জড়পিণ্ডবৎ। এক-পা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখেন না অন্যের সাহায্য ভিন্ন। প্রতি পদে পরের মুখাপেক্ষী,—কি অসহায় এ অবস্থা! নিজেকে বহন করতে ভিতরে-বাইরে কি অসম্ভব অপটুত্ব! এর কারণ আর কিছু নয় মানুষ হিসেবে তার নিজের শক্তিকে সে চেনে না। জানে না তার চলার শক্তি তারই পায়ে আছে—অন্যের হাতে নয়। তাই আসে চিন্তাশীলতার কথা। চিন্তার প্রসার ও প্রয়োগের কথা। এর ব্যবহার ও আস্বাদন এখনো তারা ঠিকমত জানে না। এ না-জানার অভাবে এদিক দিয়ে নারী নিজেকে যে কতটা পঙ্গু ক'রে রেখেছে তার অবধি নেই। তার পরাধীনতার মূলে যে কারণই বর্ত্তমান থাক না কিন্তু এ'ও কি একটা অন্যতম কারণ নয় যে, সে নিজের অন্তরের দাবীকে চেনে না? চিন্তা মানুষকে উদ্দীপ্ত ক'রে প্রেরণা দেয় সৎসাহসের মুখে এগিয়ে যাবার, বড় কিছু গ্রহণ করবার। নারীকে তাই শুধু শিক্ষিতা হ'লেই চলবে না—তাকে হ'তে হবে আরো চিন্তাশীলা, তাকে আসতে হবে চিন্তারাজ্যের সংস্পর্শে আরো বেশি, ও সর্ব্বদা তারই সঙ্গে একটা সহজ যোগ রাখবার চেষ্টা দেখতে হবে। চিন্তাশীলতার দিকে তার একটা সহজ ঔৎসুক্য গ'ড়ে তুলতে হবে। চিন্তাউদ্দীপক আলোচনার দরকার যাতে চিন্তার চর্চ্চা ও স্বাধীন মত গড়তে শিখতে পারে। স্বাধীনতা চাইলে তাকে ভাল ক'রে বুঝতে হবে,—তার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেরই বইতে হবে। শুধু বাইরে নয় আভ্যন্তরীণ ভাল-মন্দ বিচার ও তার উপায়-উদ্ভাবন তাকেই করতে শিখতে হবে। তাকে দেখাতে হবে যে পুরুষের কিছুমাত্র সাহায্য ছাড়াও জীবনের শ্রেষ্ঠ পথে সে চলবার ক্ষমতা রাখে। এবং তার ভিতরকার এই যে ক্ষমতা এর খোঁজ তাকেই অবিরত নিতে ও রাখতে হবে। তার জীবনের স্বপ্ন তাকেই দেখতে শিখতে হবে। পুরুষ হাতের কাছে তাকে স্বাধীনতা যুগিয়ে দেবে না। এর যোগ্যতা তার নিজেকেই অর্জ্জন করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে বল, সে বল তার ভিতর থেকে তাকেই খুঁজে বা'র ক'রে নিয়ে জীবন-যুদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। এবং তা পারা না-পারার সংশয় যতদিন থাকবে ততদিন তার সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নই থেকে যাবে।

পার্সনালিটির তাই বড় প্রয়োজন,—সাহসের তাই বড়

দরকার। পার্সনালিটি গ'ড়ে তুলতে গেলে চাই জীবনের সংস্পর্শে আসা। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের এখনো জীবনকে তার স্বরূপে বরণ করবার সৎসাহস কোথায়? দেশের-কর্ম্ম ইত্যাদির দিক দিয়ে কিছু কিছু সাহসের পরিচয় তাদের আজকাল সবেমাত্র দেখা দিতে সুরু করেছে (এটা অবশ্য খুবই আশার ও আনন্দের কথা সন্দেহ নেই) কিন্তু সাধারণতঃ আজো নারী জীবনকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে পশ্চাৎপদ, ভয়কুণ্ঠ। পার্সনালিটি গ'ড়ে ওঠা সম্ভব নয় যদি জীবনকে গ্রহণ করতে রাজী না হওয়া যায়। পার্সনালিটি গ'ড়ে উঠতে পারে না যদি জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় না ঘটে—যদি জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সে যেতে না পারে। আমাদের দেশের নারীর জীবনে বৈচিত্র্য যে এত কম তার কারণই এই যে, তারা জীবনের সংস্পর্শে আসে না। বৈচিত্র্যের নানা অভিজ্ঞতা জীবনকে সমৃদ্ধ করে। জীবনকে তারা কতটুকুই বা জানতে পারে? শুধু সাংসারিক দিকটুকু ছাড়া জীবন সম্বন্ধে অন্য কোনও ধারণা তাদের বড় সহজে আসে না। কত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে ধারণা-শক্তি তার আবদ্ধ হ'য়ে আছে ভাবলে করুণা না হ'য়ে পারে কি? জীবন বা তার গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তার কত কমই জাগে। অথচ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন যদি তার অন্তরের ভিতর থেকে না ওঠে ত জীবনের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনাই বা তার কোথায়? জীবনকে গ্রহণ করাই বা সম্ভব হয় কি ক'রে যদি নিজের শক্তির উপরে তার সে বিশ্বাস না জন্মে। এরই জন্য বলছিলাম চাই চিন্তাশীলতা ও পার্সনালিটি। অথচ পার্সনালিটি গ'ড়ে ওঠে তখনি যখন মানুষ তার নিজের শক্তির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে জীবনের সম্মুখীন হ'তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকতে রাজী হয়।

কথা হ'চ্ছে, নারী-স্বাধীনতার যে চাঞ্চল্য আজ দেখা দিয়েছে তার মূলে যে কারণ নিহিত আছে তা বাইরের শুধু একটা তাড়না (Impulse), না অন্তরের একান্ত প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ নারী কারো দেখাদেখি বা অন্যের কথায় তার স্বাধীনতা কামনা করে, না জীবনের সত্য প্রয়োজন (true need) হিসেবে তাকে একান্ত ভাবে চায়? প্রথমটা ঠিক হ'লে তার ফল কি এবং কতটা স্থায়ী হবে বলা শক্ত। কেন না স্বাধীনতার প্রশ্ন তার অন্তর থেকে তার জীবনের একান্ত প্রয়োজন হিসেবে যতদিন না উঠবে ততদিন তার স্থায়ী কিছু ফলের আশা বড় ক্ষীণ। তবে যদি এ দাবী তার অন্তরের সত্য দাবী (true need) হয় তবে নারী তা পাবেই আজ না হোক কাল যেমন ক'রে হোক। তখনই একমাত্র সব অসম্ভব সম্ভব হবার সম্ভাবনা আসবে। শুধু চাঞ্চল্যে লাভ হয় না কিছু। চাই ধীর, স্থির, শান্ত সংযত চিন্তা। চাই মনে প্রাণে তার নিজেকে মুক্ত-প্রাণী (free) ভাবতে পারা। নারীর অস্থিমজ্জাগত অবলাত্বের সব সংস্কার ও অন্যান্য বিধিবন্ধনের সব ধারণার উপরে উঠে তাকে বিচরণ করতে শিখতে হবে খোলা মুক্ত আলো-হাওয়ার মাঝে। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা প্রতি গতিবিধির মাঝে নিজেকে প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে যেদিন সে সম্পূর্ণ, যথার্থ মুক্ত অনুভব করতে পারবে, যেদিন সে যথার্থ বুঝবে তার দায়িত্ব শুধু একা তারই আর কারও নয়—এবং এ দায়িত্ববোধ যেদিন তার সত্যানুভূতির মধ্যে স্থান পাবে, সেদিন তার দাবীর যথাযথ মর্য্যাদা পেতে দেরী হবার সম্ভাবনা থাকবে ব'লে মনে হয় না। নারীর সমস্ত অতীতকে তার জীবনের পিছনে রাখতে হবে—সামনে নয়। তার সর্ব্বাগ্রে ভুলতে হবে instinct-এর কথা; ভুলতে হবে সেবানৈপুণ্য ও মাতৃত্বের একান্ত গৌরব-গাথার কথা; ভুলতে হবে সে শুধুই নারী—তাকে স্মরণ রাখতে হবে সে মানুষ, দেবতার অংশ, অমৃতের সন্তান।

শ্রীসাহানা দেবী

আই-সি-এস্

এক অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটিকা

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাত্রীগণ

ইলা

কালিন্দী

পুঁটু

স্থান :—বালিগঞ্জ এভিনিয়ু, ইলাদের ড্রয়িং-রুম্।

সময় :—১৩৭৬এর পনেরোই বৈশাখের মধ্যাহ্ন।

প্রশস্ত ঘর,—সোফায় আকীর্ণ। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা টেবিল, বিলিতি ও দিশি পত্রিকায় ঠাসা। উত্তর-পশ্চিম কোণে লিখিবার একটি ছোট সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল, তাহার উপর একটা পিতলের ফুলদানি। সাম্‌নে একটি চেয়ার। মেঝেতে গালিচা পাতা। জানালায় পর্দা ঝুলিতেছে। ঘরটিকে ইহার চেয়ে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া সাজাইবার দরকার নাই।

একটা লম্বা সোফায় একটি তরুণী বসিয়া আছে—বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে, অর্থাৎ পরনের শাড়িটা ঠিক ততখানি গোছানো নাই। মেয়েটির নাম কালিন্দী—বয়স ঠিক বাইশ, রঙ শ্যামল, ঘসা-মাজায় একটু জৌলুস ফুটিয়াছে। চশমা-পরার দরুন মুখখানিকে একটু বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়। শাড়ির রঙটা ফিরোজা, ব্লাউজও তদ্রূপ। ঘাড়ের ওপর বিশাল খোঁপাটা যেন বিরহীর দীর্ঘনিশ্বাস লাগিয়া ধ্বসিয়া যাইবে—এত আলগা। পিঠ-টা একটু কুঁজো মত। যবনিকা-ওঠার সময় দেখা গেল কালিন্দী দুই পা দিয়া তাহার একপাটি নাগরা-জুতো নিয়া একটু খেলা করিতেছে।

লিখিবার টেবিলের ধারে চেয়ারের উপর দেখা গেল আরেকটি মেয়ে। এই-ই ইলা; এ-বাড়ির বড়ো মেয়ে। বয়স বাইশ পার হইয়াছে, কিন্তু প্রথম চোখে পড়িলে মনে হইবে বত্রিশ। মনে হইবে জননী, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আজো তাহার বিবাহ হয় নাই। মুখে রঙ মাখানো, এখন সেই রঙ ঘামে গলিয়া আসিয়াছে। সাজসজ্জা জ’াকালো নয়, উৎকট—চক্ষু ধ’াধিয়া দেয়। যেন একটা রঙের তুফান। চুল ‘সিঙ্গল্’ করা,—শাড়িটা গায়ের সঙ্গে আঠার মত লেপটানো, শাড়িকে দড়ির মতো করিয়া গায়ে—জড়াইয়াছে নহে, বাঁধিয়াছে। ব্লাউজের হাতা দুইটা কাঁধের প্রান্ত হইতে মাত্র ইঞ্চি দুয়েক নামানো; দুই বাহু প্রখররূপে অনাবৃত। হাতের নখগুলি ত্রিভুজাকারে সূচাগ্র করিয়া কাটা; ধবধবে। দাঁত এখনো দেখা যাইতেছে না। পায়ে গ্রিসিয়ান্ স্যাণ্ডেল। যবনিকা-ওঠার সময় দেখা গেল একটা আধখানা সিগারেট ইলা তাহার জুতোর তলায় পিষিতেছে।

যবনিকা-ওঠার পর এক মিনিট স্তব্ধতা। ইলা একটু পায়চারি করিয়া জানলার পর্দা সরাইয়া বাহিরে একটু মুখ বাড়াইল। তাহার পর বড়ো টেবিলের উপরকার কাগজগুলি একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া কালিন্দীর মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসিল; ডান হাঁটুর উপর বাঁ পা-টা ধীরে উঠাইয়া দিল। তাহার পর আবার উঠিয়া ‘মিটার’-এ পাখার বেগটা আরো একটু বাড়াইয়া ফের আসিয়া আরেকটা সোফায় বসিল; খানিকটা অর্দ্ধশয়নের ভঙ্গীতে। একটু ঘুমাইয়া লইলে ভালো হয়।

কালিন্দী

(পা দিয়া জুতো নিয়া খেলা বন্ধ করিয়া) বোধ হয় হোটেলে গিয়েই উঠেছে।

ইলা

(না নড়িয়া, অর্থাৎ সোফায় তেম্‌নি গা এলাইয়া রাখিয়াই) ইস্!

কালিন্দী

হোটেলে ওঠাটাই ফ্যাশানেবল্। চল্, একবার কণ্টিনেণ্টাল্‌টা ঘুরে’ আসি।

ইলা

ব’য়ে গেছে! এখানে তাকে আস্‌তেই হ’বে।

কালিন্দী

ব'য়ে গেছে! তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ষ্টেশনে পা দিয়েই পাখা গজাবে। এতই যখন গরজ, ষ্টেশনে গিয়ে সেলাম ঠুক্‌লেই পার্‌তিস্‌।

ইলা

(আগের সুরে) ব'য়ে গেছে। তাতে তাকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দে'য়া হ'ত। সে-জন্যেই ত' আমি যাইনি ষ্টেশনে।

কালিন্দী

বটে! (একটু চুপচাপ) তাই তাঁ'র অভিমান হ'য়েছে। দু' বচ্ছর পর বিলেত থেকে আসছে। ষ্টেশনে 'রিসিভ' করবার জন্যে লোক নেই। আমি হ'লে ত' ফির্‌তি-মেলে ফের বিলেত চ'লে যেতুম।

ইলা

তুই গেলি না কেন?

কালিন্দী

ব'য়ে গেছে! সেধে আমি বাড়িতে অতিথি ডাক্‌তে যাই আর কি! আমার ত' খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

ইলা

তাই সে অভিমান ক'রে আর আমাদের কাছে আসেনি। সোজা হোটেলে গিয়ে উঠেছে। চল্‌, গ্র্যাণ্ড হোটেলটা একবার ঘুরে' আসি।

কালিন্দী

(হাসিয়া) তাই হবে। কিন্তু খুঁজে বের করার চেয়ে পথ চেয়ে ব'সে থাকায় সুখ বেশি।

ইলা

তাই বুঝি পথ চেয়ে ব'সে থাকার জন্যে আমার বাড়ি এসেছিস্‌? বাড়ি যা, পোড়ারমুখি!

কালিন্দী

আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে তুমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে খুঁজতে যাবে? বেশ, আমি চল্লাম। (পা বাড়াইয়া জুতো গুছাইতে লাগিল)

ইলা

(হাসিয়া) আর, তুমি বাড়ি যাবার নাম ক'রে এই ফাঁকে সোজা কন্টিনেন্টালে চ'লে যাও আর কি! (ধমক দিয়া) বোস্‌!

কালিন্দী

আমি সত্যিই বাড়ি যাই এবার। (প্রস্তুত হইয়া) গিয়ে হয় ত' দেখ্‌ব আমার বাড়িতেই সে উঠেছে।

ইলা

হাঁ, তাই যাও; তোমার বাড়িতে আবার ফোন্‌ নেই। ইতিমধ্যে সে এখানে এসে পড়ুক, তোমাকে তখন একটা খবরও দিতে পার্‌বো না। শেষকালে আফ্‌শোষ করবি, দু' বছরের অদর্শনের পর প্রথম মিলনের 'থ্রিল্‌' থেকে বঞ্চিত হবি। বোস্‌ চুপ ক'রে।

কালিন্দী

আমার বাড়িতে ফোন্‌ নেই, সে একটা মস্ত অসুবিধে।

ইলা

নিশ্চয়ই।

কালিন্দী

আমার নয়, তোর পক্ষে। গিয়ে দেখ্‌ব সে ব'সে আছে, তখন তোকে একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পার্‌বো না। সন্ধ্যে হ'লে দু'জনে বেড়িয়ে তবে তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বো। ও তখন পুরোনো হ'য়ে গেছে—ওর বিলিতি হাওয়া আমি সব শুষে' নিয়েছি। তোর জন্যে যা থাক্‌বে, 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড্‌'।

ইলা

(হাসিয়া) তাই যদি হবে তবে আমার বাড়ি এলি কেন?

কালিন্দী

(হাসিয়া) প্রথম মিলনের 'থ্রিল্‌' থেকে তোকে বাঁচাতে।...আথ্‌, যাব নাকি চ'লে?

ইলা

(শ্রান্ত) না। পথ চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকায় সুখ বেশি।

কালিন্দী

চুপ ক'রে নয়। রবি-ঠাকুরের একটা কবিতা পড়্ উমুনমুখি!

ইলা

(ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া) কবিতা পড়া!—তার চেয়ে আয় একহাত 'ড্র-ব্রিজ্' খেলি।

কালিন্দী

(ঠোঁট কুঁচ্‌কাইয়া) 'ফ্রাইট্‌ফুল্'! আমার ত' আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে আয় ঘুমুই।

ইলা

আয়! (শরীরটাকে আরো একটু এলাইয়া দিল)

কালিন্দী

আমরা ঘুমিয়ে পড়্‌লে যদি ও আসে! তবে কা'কে আগে জাগাবে বল্ ত?

ইলা

ও এলে আমাকে আর ব'লে দিতে হবে না। ওর আভাস পেলেই আমি জেগে উঠ্‌বো। আমার ঘুম ভারি পাৎলা। (কবিত্ব করিয়া) এত পাৎলা যে, কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রে চাঁদ একটু উঁকি দিলেই আমি জেগে উঠি।

কালিন্দী

তুই বোকার মত আপ্‌নি জেগে উঠ্‌বি, আর ও আমাকে জাগাবে—গায়ে ঠেলা দিয়ে। সেই হবে আমার প্রথম রোমাঞ্চ!

ইলা

আমি ওকে বাধা দেব, ওর হাত ধ'রে ফেল্‌ব। ওকে ঐ কোণে টেনে নিয়ে যাব, একই সোফায় পাশাপাশি ব'সে (কবিত্ব করিয়া) চুপি চুপি, নিঃশব্দে, রাত্রির নিঃশ্বাসপতনের মত মৃদুল—অন্ধকারের মত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গল্প করব।

কালিন্দী

আর, আমার ঘুম এত গভীর যে আমি মড়ার মত অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বো। তবু জাগ্‌বো না, ও আমাকে জাগাবে। আমি আগে ওকে ছোঁব না, ও আমাকে আগে ছোঁবে।

ইলা

(ঈর্ষায়) ইস! আমি তোকে জাগাবো—গায়ে ঠেলা দিয়ে।

কালিন্দী

(ঠোঁট উল্টাইয়া) জাগ্‌বো-ও না।

ইলা

গালে চিম্‌টি কেটে দেব।

কালিন্দী

ক্যাঁক্ ক'রে আঙুল কাম্‌ড়ে দেব।

ইলা

(হাসিয়া) দূর পোড়ারমুখি! (উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল)

কালিন্দী

তা'র চেয়ে এক কাজ করি আয়!

ইলা

আয়!

কালিন্দী

ওর জন্যে সারা সকাল ব'সে যত সব খাবার তৈরি করেছিস্, নিয়ে আয়। দু'জনে মিলে খাই। ভীষণ খিদে পেয়েছে!

ইলা

ভীষণ! খাই, এমন সময় ও আসুক্!

কালিন্দী

বেশ ত'! আসুক্ না।

ইলা

ও কি খাবে?

কালিন্দী

ও এলেই দু'জনে সোজা দাঁড়িয়ে পড়্‌ব। বল্‌ব—তোমার জন্যে কিছু আর নেই।

এম্‌নি সময় রাস্তায় মোটরের হর্ণের আওয়াজ হইল। দুই জনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য দারুণ চোখ-চাওয়াচায়ি হইয়া গেল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ইলা লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে রাস্তার ধারের জানলার

কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কালিন্দীও জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু এক পা-ও নড়িল না। ইলার আনন্দোদ্ভাসিত মুখের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া দুয়ারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

ইলা

(জানলা হইতে ফিরিয়া) কেলেঙ্কারি!

কালিন্দী

(সোফায় বসিয়া পড়িয়া) দাঁড়ালো না? কে গেল মোটরে?

ইলা

একটা মাড়োয়ারি; (কালিন্দীর হাসি) জমি দেখ্‌তে বেরিয়েছে।

কালিন্দী

বেশ ত', ওকেই ডাক্‌লি না কেন? দুপুরটা ব'সে-ব'সে বেশ হিন্দি বলা যেত।

ইলা

(রিষ্ট্-ওয়াচ্ দেখিয়া) সাড়ে-বারোটা। এতক্ষণে পৌঁছনো ছেড়ে—

কালিন্দী

(কথা লুফিয়া নিয়া) বিয়ে হ'য়ে যেত!

ইলা

(সামান্য চটিয়া) ঠাট্টা নয়, কালি'। তোমার ত' কিছু নয়, দু'দিন 'ককেট্রি' ক'রেই খালাস। তোমার জুতোতে ত' আর পেরেক্ ওঠে নি। আমি এর দস্তুরমত প্রতিশোধ নেব। (সোফায় বসিল)

কালিন্দী

কি প্রতিশোধ নিবি?

ইলা

কক্‌খনো ওর সঙ্গে কথা কইবো না।

কালিন্দী

ভারি প্রতিশোধ নেওয়া হবে! তুই না-ই বা কথা কইলি; আমি ওকে ঐ কোণে টেনে নিয়ে যাব, ভারি চুপি-চুপি, অতি নিঃশব্দে, গভীর প্রগাঢ়স্বরে দু'জনে গল্প করব ব'সে-ব'সে।

ইলা

তুই কথা কইবি ওর সঙ্গে?...ওকে শাসন করা উচিত।

কালিন্দী

(হাসিবার চেষ্টায় ঠোঁট একটু কাঁপাইয়া) আমি কেন কইবো না? (একটু বিমর্ষ) আমার ত' আর কিছু নয়! আমার দু'টি দিনের আয়ু,—দু'টি দিন 'ককেট্রি' ক'রেই খালাস!

এক মুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা। রাস্তা দিয়া আরেকটা চলন্ত মোটরের শব্দ শোনা গেল। ইলা আর কালিন্দীতে ক্ষণকালের জন্য আবার চোখ-চাওয়াচায়ি হইল। কিন্তু এইবার কেহ আর উঠিল না, দূরায়মান মোটরের শব্দ শূন্যে মিলাইয়া গেল। দুইজনেরই মুখে স্বল্প হাসি,—কিন্তু বেদনায় বিশীর্ণ।

কালিন্দী

(চশ্‌মা খুলিয়া আঁচল দিয়া কাচ মুছিতে মুছিতে) আজ আস্‌বে ত' ঠিক?

ইলা

(আপন মনে চটিয়া) আস্‌বে না কী? কাল ওর চিঠি পেয়েছি—বম্বে থেকে। একদিন সেখানে হল্ট ক'রে আজ শুক্রবার পৌঁছবে—সকাল বেলা সাতটা ছত্রিশে। গভর্ণরের বাড়ি কাল ওর 'ইন্টার্‌ভিয়ু'র দিন। আস্‌বে না!

কালিন্দী

(চশ্‌মার নাকি-টা ঠিক মত বসাইতে-বসাইতে উদাসীন-স্বরে) চিঠি ত' আমাকেও লিখেছে।

ইলা

(চমকিত ও ব্যথিত) তোকেও লিখেছে? আর কি লিখেছে শুনি?

কালিন্দী

কত! সে আমি তোকে বল্‌তে যাবো কেন? তোর চিঠি আমি দেখ্‌তে চাই?

ইলা

দেখালে ত! (ঘাড় কাৎ করিয়া) হ্যাঁ! আমার চিঠি ওঁকে দেখাবে! আব্‌দার!

কালিন্দী

(উদাসীন হইবার চেষ্টা করিয়া) লিখেছে—কাল শনিবারই জান্‌তে পাবে কোথায় ওর 'পোষ্টিং' হবে। ও বেঙ্গল্-ই বেছে নিয়েছে। ময়মনসিঙে ফার্ষ্ট য়্যাপয়ণ্ট্‌মেণ্ট হ'লে খুব ভালো হয়—কেন না—

ইলা

কেন না!—

কালিন্দী

কেন না, আমি বিদ্যাময়ী-স্কুলে চাক্‌রি পেয়েছি।

ইলা

(গম্ভীর হইয়া) ও-সব প্রাইভেট্ য়্যাফেয়ার্ সম্বন্ধে কিছু আমি বল্‌বো না এখন। যাকে-তাকে আমাদের কথা ব'লে বেড়ানো ও নিশ্চয়ই পছন্দ কর্‌বে না।

কালিন্দী

ওর সম্বন্ধে অত-সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপার জান্‌বার আমার কৌতূহলও নেই, সময়ও কম!

ইলা

(এ-সব কথা যেন গ্রাহ্য করিবার মত নয়) আমাকে লিখেছে—মুগের ডাল ক'রে রেখো, লাউশাকের ডগা দিয়ে। ভারি খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে।

কালিন্দী

আমাকে লিখেছে—পুঁইশাকের চচ্চড়ি ক'রে রেখো; কত দিন খাই নি।

ইলা

উঠবে ত' এসে এখানে। তোর রান্না খাবে কখন্?

কালিন্দী

কেন? রাত্রে।

ইলা

(যেন জিতিয়াছে) রাত্রে! তাই বল্! আমি তখন ওকে এত খাইয়ে দিয়েছি যে রাত্রে ওর খিদেই থাক্‌বে না। তখনো আমার রান্নার ঢেঁকুর তুল্‌ছে!

কালিন্দী

ওর রাত্রে খিদে থাক্‌বে না—সেই ত' হবে মজা। আমার আর 'মাইনাস্-স্কোর্' চোখ নিয়ে কষ্ট ক'রে রাঁধ্‌তে হয় না। বাবাঃ, বাঁচ্‌লাম! এই কাঠফাটা রোদ্দুরে তোর বাড়ি থেকে যা-তা কতগুলি খেয়ে বেচারা শ্রান্ত হ'য়ে আমার বাড়ি আস্‌বে—ঠিক সন্ধ্যার সময়। আমি ছাতে ওর জন্যে শীতলপাটি পেতে রাখব; (মুগ্ধভাবে) দখিন হাওয়া এসে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ইলা

ঘুম না হাতী!

কালিন্দী

যা-তা কতগুলো খেয়ে এসে যদি ওর ঘুম না-ই আসে, এক ফোঁটা পাল্‌সেটিলা থার্টি খাইয়ে দেব। চোঁয়া ঢেঁকুর থেমে যাবে।

ইলা

(একটু গর্ব্বিত) তবু তোর হার, পোড়ারমুখি!

কালিন্দী

কিসে?

ইলা

আগে এসে উঠবে আমারই বাড়ি, আমারই এ-ঘরে। আমারই সঙ্গে ওর প্রথম কথা।

কালিন্দী

হোক্ না প্রথম কথা। সে-কথার 'ভ্যালু' কি? সে কথা ত'—বম্বে মেইল পাঁচ ঘণ্টা লেইট্, গোণ্ডিয়ায় এঞ্জিন্ 'ডিরেইল্‌ড্' হ'য়ে গেল; বিলেত-দেশটা আগাগোড়া মাটির, অনেকটা ডাল্‌হৌসি স্কোয়ারের বর্দ্ধিত সংস্করণ; বিলেতের মেয়েরা হ্যানো করে ত্যানো খায়—এ-জাতীয় কথা-বার্ত্তা। কোথায় বা তাতে রস, আর কী-ই বা তার দাম!

ইলা

তুই ত' তা বল্‌বি-ই। কিন্তু, আমার ভাগে দুধের সর, দধির মাথা!

কালিন্দী

তোর মাথা !···আর, আমার ভাগে ক্ষীর ! তোর ভাগে দুপুর,—ভ্যাপ্‌সা গরম, আঁধি ; আর আমার ভাগে রাত্রি—

ইলা

(কথা লুফিয়া নিয়া) ড্রেনের গন্ধ, মশা, মাকড়, ছারপোকা—

কালিন্দী

(কথা কাড়িয়া নিয়া) অর্থাৎ 'ইন্‌সোম্‌নিয়া' । তাই ত' চাই পোড়ারমুখি ! জেগে জেগে সারারাত কথা কইব—(কবিত্ব করিবার সুরে) সে-কথা বিলেত নিয়ে নয়, আকাশ নিয়ে। পৃথিবীতে জন্ম নেবার আগে কোথায় আমরা ছিলাম—সে-ই কথা ; মর্‌বার পর কোথায় আবার আমরা যাব—সে-ই কথা ।

ইলা

(হাসিয়া) বিয়ের কথা কিন্তু আগেই হ'য়ে গেছে—দুপুর বেলায়ই ।

কালিন্দী

তা কি আর জানি না ? সেই জন্যেই ত' রাত জেগে আমাদের এত পরামর্শ ! (হাসিয়া) বিয়ের কথা হ'য়ে গেছে, অথচ সেই বিয়ে ভেঙে দিতে হবে—কত খেসারৎ দেওয়া উচিত, মোকদ্দমা কর্‌বার রাস্তা না থাক্‌লেও ইলাকে ক্ষতি পূরণস্বরূপ কত টাকার একটা নেকলেস্‌ দেওয়া যায়, এই নিয়েই ত' আমাদের সারা রাত ধ'রে ভাবনা !

ইলা

(বড় টেবিল হইতে একটা কাগজ লইয়া কালিন্দীর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া) দূর রাক্ষুসি !

কালিন্দী

(দার্শনিকের মত) দুপুর বেলার বিয়ের কথা রাত্রে আবার কখন্‌ ভেঙে যায়, ইলা ।

ইলা

ভাঙুক্‌ । (চঞ্চল) কিন্তু এখনো আস্‌ছে না ! (ঘড়ি দেখিল) কি করা-যায় বল্‌ ত ?

কালিন্দী

কি আবার করা যাবে ! এই ত' দিব্যি গল্প করছি দু'টিতে মিলে' । ও এলেই ত' ভীষণ গোলমাল ! দু'জনে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে—লাউশাকে আর পুঁইশাকে ঝগড়া !

ইলা

ঠাট্টা নয়, কালি' । কিছু একটা নিশ্চয়ই হ'য়েছে ।

কালিন্দী

নিশ্চয়ই । হয় ঠিক মতো ষ্টার্ট করেনি, নয় মাঝপথে আপ্‌-ট্রেনের সঙ্গে কলিশন্‌ হ'য়েছে, নয়—

ইলা

(কৌতূহলী) নয় —?

কালিন্দী

নয় মেম্‌ নিয়ে ফিরেছে ।

ইলা

(আকাশ থেকে পড়িয়া) মেম্‌ নিয়ে !

কালিন্দী

কিম্বা, আপাতত, মেম্‌ রেখেই ফিরেছে ।

ইলা

অসম্ভব ! 'প্লেজ' সে ভাঙ্‌বে না ।

কালিন্দী

সে ত' আমারো সান্ত্বনা ।

ইলা

(চমকিত) তোরও ?

কালিন্দী

এ-প্রশ্ন আমিই তোকে কর্‌তে যাচ্ছিলাম। (একটু চুপচাপ) য'াই বলিস্‌ ইলি, অপ্রত্যাশিতের জন্য আশা ক'রে চেয়ে-থাকায় ভয় লাগে বটে, কিন্তু বিস্ময়ও লাগে ! দুঃখ ? তার সংজ্ঞা ঠিক দুঃখ নয় ।

ইলা

(সন্দিগ্ধ) তোর সঙ্গে ওর কদ্দিনের আলাপ ?

কালিন্দী

তোর সঙ্গে ?

ইলা

(যেন একটা বলিবার বিষয় পাইয়াছে) বছর তিনেক আগে, মানে ওর ট্রেনিং নেবার জন্যে বিলেত যাবার এক বছর আগে। আলাপ হ'য়েছিল শিলিগুড়ি ষ্টেসনে ওয়েটিং-রুমে—দু'জনেই দার্জ্জিলিঙ যাচ্ছিলাম। সে ভারি মজার গল্প!

কালিন্দী

(এবার কৌতূহলী) কি রকম?

ইলা

শিলিগুড়ি এসে খবর পেলাম দার্জ্জিলিঙের পথে 'ল্যাণ্ড্-স্লিপ্' হ'য়েছে। মাথার ওপর তখন দারুণ বৃষ্টি। মুখ-খানাকে মেঘলা ক'রে ওয়েটিং-রুমে এসে ঢুক্লাম। ঢুকে দেখি দু'টি ছেলে গলা ছেড়ে খুব হল্লা কর্‌ছে। আমাকে দেখেও থাম্‌লো না, রীতিমত অপমানিত বোধ কর্‌লাম। পরে মনে হ'য়েছিল 'নার্ভাস্‌নেস্'! একটি ছেলে পাশের বন্ধুকে বল্‌ছে—বর্ষাতি মাথায় ফেলে' পায় হেঁটেই চ'লে যাব দার্জ্জিলিঙ; ট্রেনের তোয়াক্কা রাখিনে।...শুনেছিস্, কী দুঃসাহস ছেলে দু'টোর!

কালিন্দী

তক্ষুণিই প্রেমে প'ড়ে গেলি?

ইলা

পাগল! তখন ত' ও সবে হিস্‌ট্রিতে এম-এ পড়্‌ছে। আই-সি-এস্ ও স্বপ্নেও হয়নি।

কালিন্দী

(কিছু না বুঝিয়া) তাতে কি?

ইলা

(ভারিক্কি চালে) খালি-পেটে আর যারই পুজো চলুক, প্রেমের চলে না—অন্ততঃ আমি পারিনে। হিস্‌ট্রিতে এম-এ পাশ ক'রে কি কর্‌ত? হয় ওকালতি পড়তে যেত,—রাসবিহারী না হ'য়ে হ'ত ঘাসবিহারী! কিম্বা বড় জোর মাষ্টারি—তা-ও বি-টি পাশ করতে না পার্‌লে ত' কথাই নেই—খালি ধনুক ভাঙতে পার্‌লেই সীতা পায় না, ব্যাঙ্কে চেক্ ভাঙাবারো মুরোদ থাকা চাই। কি বল্?

কালিন্দী

বুঝ্‌লাম। তার পর?

ইলা

হ্যাঁ; তারপর-ই হ'ল মজা। বেয়ারা ট্রে-তে ক'রে ওদের চা দিয়ে গেল, আমারটা পরে আসছে। আমাদের ভ্যাবা-গঙ্গারাম—এখন অবিশ্যি নয়—'পট' থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে গিয়ে হাত থেকে দিলে ফেলে। ট্রে শুদ্ধ সব মেঝেতে ভূমিসাৎ। পেয়ালাগুলো ভেঙে চৌচির—চা প'ড়ে ওর জামা-কাপড়—

কালিন্দী

(বিরক্ত) আমি 'ষ্ট্যাটিসটিক্‌স' চাই না। তুই করলি কি?

ইলা

হো হো ক'রে হেসে উঠলাম।

কালিন্দী

(ভেঙাইয়া) হো হো ক'রে!

ইলা

পেট ফেটে হাসি!—সোডার বোতলের মুখ ছুটে গেলে যেমন হয়। ছেলেটা ভাই ভীষণ গোঁয়ার। এল আমাকে তেড়ে; বল্লে, হাসছেন যে? পরের 'ডিসকমফিচার'-এ হাসতে লজ্জা করে না?

কালিন্দী

(যেন পুলকিত) বল্লে!

ইলা

আমি-ও ছাড়লুম না। রীতিমত ঝগড়া বাধিয়ে দিলুম। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, সেই ঝগড়া থেকেই গভীর ভাব হ'য়ে গেল। বৃষ্টি থামলে দু' জনে দু' ঘণ্টা প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়ালুম,—ঠাণ্ডা আকাশ, গরম চা, রঙিন গাল—রীতিমত ও আমার প্রেমে প'ড়ে গেল!

কালিন্দী

"রীতিমত"?

ইলা

তা ছাড়া আবার কি? দার্জ্জিলিঙে আমার একা বেড়াতে আসাকে প্রশংসা করলে—আমার ধৈর্য্য, আমার 'গেইট,' এমন কি আমার 'স্মোক' করা পর্য্যন্ত। বল্লে, দার্জ্জিলিঙ ঘুরে এলাহাবাদ যাচ্ছে, আই-সি-এস দেবে। রীতিমত লাফিয়ে উঠলাম।

কালিন্দী

রীতিমত! I see ass!…তা, তুই কবে প্রেমে পড়লি?

ইলা

কলকাতায় ফিরে এসে ও-সব কথা আমার কিছু মনেই ছিল না—

কালিন্দী

(গম্ভীর হইয়া) কলকাতায় ফিরে এসে দার্জ্জিলিঙের কথা আমরা ভুলে'ই থাকি।—পৃথিবীতে এসে অমর্ত্ত্য তারার কথা আমাদের মনেই থাকে না!

ইলা

তা'র মানে?

কালিন্দী

পরে বলছি।…হাঁা, তুই কবে প্রেমে পড়লি?

ইলা

যেদিন গেজেটে দেখলাম ও সব্বাইর মাথায় এসে উঠেছে। ভারি গর্ব্ব বোধ করলাম; মনে হ'ল—আমার জন্যে ও বিশ্বজয় করতে পারে।

কালিন্দী

কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে পারে না।

ইলা

(কথা কানে না তুলিয়া) আট পৃষ্ঠা ভ'রে ওকে চিঠি লিখে ফেল্লাম। কলেজ ছেড়েছি পর আর essay লিখিনি। 'ইনভার্‌টেড কমা'র মধ্যে তোর রবি ঠাকুরের কবিতা 'কোট' ক'রে দিলাম পর্য্যন্ত। জবাব যা এল তা তোকে আর বলবো না। উহুঁহু!

কালিন্দী

সেই তোর প্রথম প্রেম?

ইলা

না, দ্বিতীয়। প্রথম প্রেম হ'য়েছিল যখন ফাস্‌ট্ ইয়ারে পড়ি। সেই ছেলেটির নাম গোবিন্দ কি গণেশ হবে, মনে নেই। ভীষণ পড়ত,—বইয়ের পোকা ছিল। হ'ল-ও তাই, বুকে এসে পোকা বাসা বাঁধলো।

কালিন্দী

(মনোযোগী) কি পড়ত? আই-সি-এস-এর পড়া?

ইলা

মুণ্ডু! তা হ'লে ত' বুঝতাম। সাড়ে চার শ'-র ষ্টার্ট,—কী না হওয়া যায় তার পর? তা ত' নয়, দিন-রাত 'গোগল,' 'গোগল' করত। গোগল যে লোকের নাম তা-ই আমি কোনোদিন সন্দেহ করিনি। 'পুসকিন' শুনে মনে করেছিলাম কোনো নতুন মদের নাম বোধ হয়।…ছেলেটা পড়তে-পড়তেই মারা গেল। (হাসিয়া) আই-সি-এস ত' নয়, থাইসি—স!

কালিন্দী

(আহত) ম'রে গেল! তবু তার নাম গোবিন্দ কি গণেশ, মনে নেই!

ইলা

ব'য়ে গেছে! (হাসিয়া) আমার ত' আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।…এবারে তোর কথা বল্। কদ্দিন আলাপ ওর সঙ্গে?

কালিন্দী

ছিলাম মাণিকগঞ্জ—

ইলা

(থামাইয়া) কদ্দিন আলাপ?

কালিন্দী

তাই ত' বলছি। ছিলাম মাণিকগঞ্জ—

ইলা

(ব্যস্ত হইয়া) কদ্দিনের আলাপ তাই বল্ না। বাজে কথা শুনে কী হবে?

কালিন্দী

আরে মর্! তাই ত' বল্‌ছি। ঢাকা থেকে মাণিকগঞ্জ ষ্টিমার ক'রে—

ইলা

চুলোয় যাক্ তোর মাণিকগঞ্জ।

কালিন্দী

(গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া) তা হ'লে সত্যিই ভীষণ serious হ'য়ে যাব। ব'লে বস্‌ব—আমাদের আলাপ যুগ-যুগ ধ'রে (কবিত্ব করিয়া) আকাশের প্রথম জন্মদিন থেকে। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য নিয়ে দুপুর বেলায় এ-কথাটা কেমন যেন মানায় না।

ইলা

(ঠাট্টার সুরে) সেই তোর প্রথম প্রেম?…কিন্তু, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেলে কি করবি ?

কালিন্দী

সোজা বিদ্যাময়ী-স্কুলে গিয়ে মাষ্টারি নেব। তখন সেই হবে আমার শেষ প্রেম—পরম প্রণতি! (ধীরে) কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে—

এই কথার আর উত্তর দেওয়া হইল না। একটা মোটর আসিয়া নীচে রাস্তায় দাঁড়াইল ও ঘন-ঘন হর্ন বাজিতে লাগিল। ইলা ছুটিয়া জানলায় নীচু হইয়া মুখ বাড়াইল; কালিন্দীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইলা

(জান্‌লা হইতে) থেমেছে,—গাড়িটা আমাদের বাড়িতেই থেমেছে। এসেছে বুঝি!

কালিন্দী

(তাড়াতাড়ি জান্‌লায় গিয়ে ইলাকে টানিয়া ফিরাইয়া) নীচু হ'য়ে আর তীর্থকাকের মত মুখ বাড়িয়ে থাকে না। আসুক সে!…আমার কথার জবাব দে, রাক্ষুসি। আমার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয়,—তা হ'লে—

ইলা

(চঞ্চল) আমার বুক কি রকম কাঁপ্‌ছে! হাত দিয়ে দেখ—

কালিন্দী

পরে দেখ্‌লেও চল্‌বে। আমার কথার জবাব দিয়ে নে। যদি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তা হ'লে কি করবি ? বল্ না।

ইলা

এম্‌নি করবি ত' ভীষণ serious হ'য়ে যাবো।…আয়, দু'জনে চুপ ক'রে চোখ বুজে' ব'সে থাকি,—দেখি কাকে এসে আগে ছোঁয়!—বোস্।

দু'জনে পাশাপাশি লম্বা সোফাটায় বসিল। এক মুহূর্ত্তের নীরবতা।

কালিন্দী

যদি ঘরে ঢুকেই দু'জনের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে আগে!

ইলা

তবু চোখ চাইব না। নিশ্চয়ই ওকে ছুঁতে হবে।

কালিন্দী

তা হ'লে বাপু, তুমি এ-খানটায় বোস। আমি দরজার কাছে থাক্‌বো। (হাসিয়া) যাকে আগে ছোঁবে তা'রই ত'!

ইলা

তা কেন?…আচ্ছা, বেশ, দরজা থেকে সমান দূরত্ব রেখে এই চেয়ার দু'টোয় বসি, আয়। (দু'জনে চেয়ার-দু'টো টানিয়া বসিয়া পড়িল) চোখ বোজ্ এবার। (চোখ বুজিল)

কালিন্দী

(চোখ বুজিয়া ফের মেলিয়া) যদি আমরা ঘুমিয়ে আছি ব'লে—ডাকাডাকি ক'রে সাড়া-শব্দ না পেয়ে চ'লে যায়?…এই, চোখ মেল্‌ছিস্ যে!

ইলা

কি ক'রে তুই টের পেলি যে চোখ মেল্‌লাম! (ফের দু'জনে চোখ বুজিল) যদি চ'লেই যেতে চায়, তখন না হয় চোখ থেকে চোখা চোখা বাণ ছোড়া যাবে।

কালিন্দী

(নিমীলিতচক্ষু) চোখ বুজে' ব'সে ব'সে আমার কথার জবাবটা তৈরি ক'রে নে, পোড়ারমুখি। (আস্তে) যদি আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়—এই আষাঢ়ে, এক মেঘ-মুদ্রিত গোধূলিতে!

ইলা

(খানিকক্ষণ স্তব্ধতার পর, চোখ মেলিয়া) এখনো যে কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না। ব্যাপার কি? চোখ চা,' কালি। (কালিন্দী তবু চোখ মেলিল না) ঘুমিয়ে পড়লি নাকি লো? (তবুও না) মোটরটা কি ভুল ক'রে আমাদের দরজায় থেমেছে? না, নীচে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে? চল্, নীচে যাই।

কালিন্দী

(চোখ বুজিয়াই) Word is word, ইলা। এতক্ষণ প্রতীক্ষার পর ধৈর্য্যের এই পরীক্ষাটুকুও সইবে। জল হ'য়ে নীচে গড়িয়ে পড়িস্ নি।

ইলা

(শশব্যস্ত) সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল!

কালিন্দী

(সুর করিয়া) "খুকু ঘুমুলো, পাড়া জুড়োলো,
বর্গি এলো দেশে!"

ইলা

কথা নয়; চোখ বুজে' থাক্।—ওয়ান্, টু, থ্রি।

দু'জনে চোখ বুজিল। গভীর স্তব্ধতা। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সহসা,—অপর সঙ্গিনীটি চোখ বুজিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য একসঙ্গেই দুইজনে চোখ মেলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কালিন্দী

এই চোর!

ইলা

আচ্ছা, এইবার। Word is word, কালি। ওয়ান্, টু, থ্রি।

দুইজনে ফের চোখ বুজিল। জুতোর শব্দ দরজার নিকটবর্ত্তী হইল। দরজা দিয়া যে ঘরে প্রবেশ করিল, সে পুরুষ নয়—পুঁটু, বছর আঠেরোর একটি পাৎলা, চঞ্চল মেয়ে। পরনে খদ্দর-শাড়িটি, গায়ে খদ্দরের ব্লাউজ—পায়ে একটা শাদা রঙের কটকি চটি। পিঠে বেণী ঝুলিতেছে বলিয়া আরো কম বয়স বলিয়া ভুল হয়। দুটি হাতে মাত্র একগাছি করিয়া চুড়ি, আর্টিষ্ট বটিচেলি সাধারণত যে-সব মেয়ে-মুখ আঁকিয়াছেন, পুঁটুর মুখাবয়ব কতকটা সেই ধরণের একটু চাপ্টা। এককথায়, মেয়েটি ভারি সাদাসিধে।

পুঁটু ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

কালিন্দী

(চোখ বুজিয়াই, তাড়াতাড়ি) শীগ্‌গির আমাকে ছুঁয়ে ফেল্। (হাত বাড়াইয়া) শীগ্‌গির।

ইলা

(চোখ বুজিয়াই, ধমকের সুরে) কক্‌খনো না। Word is word, কালি। (নবাগতের প্রতি) তোমার যাকে ইচ্ছা, তা'কে ছোঁও।

পুঁটু

(একটু বিস্মিত, একটু উদ্বিগ্ন) এসেছেন?

কালিন্দী ও ইলা একসঙ্গে চোখ মেলিয়া বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক, যেন নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এই প্রগাঢ় প্রতীক্ষার পর এই হতাশা দুঃসহ। এক মিনিট সুগভীর নিস্তব্ধতা। কালিন্দী পাথরের মত স্পন্দনহীন; ইলা হতাশার ভঙ্গী করিল।

পুঁটু

আসেন নি এখনো?

কালিন্দী

(প্রকৃতিস্থ হইয়া) এই যে, পুঁটু! তুমি কোত্থেকে? তোমাদের চেনা নেই বুঝি? এস, তোমাদের আলাপ করিয়ে দি। (ইলার প্রতি) ইনি পুঁটু,—ভীষণ খদ্দরিষ্ট্ কল্যাণী দেবীর নাম শুনেছিস্ আশা করি। আর, (পুঁটুর প্রতি) ইনি আমার বন্ধু শ্রীমতী ইলা দেবী,—তোর কি কি কোয়ালিফিকেশন্ বল্ না। (পুঁটু ইলাকে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার করিল; ইলা নড়িল না,—মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। পুনরায় পুঁটুর প্রতি) হঠাৎ, এইখেনে তুমি?

পুঁটু

এখনো আসেন নি বুঝি? কাল বিকেলে চিঠি পেলাম আজ সকালে কল্‌কতা পৌঁছুবেন। সকালে ছাত্রী-সমিতির একটা 'এমারজেন্সি' মিটিং ছিল ব'লে ষ্টেশনে যেতে পারি নি। চিঠিতে আমাকে এ-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এইখেনে দেখা করতে বলেছেন। আসেন নি এখনো?

কালিন্দী

টূ লেট! এসে, ইলার রাঁধা লাউশাক খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তুল্‌তে-তুল্‌তে আমাদের বাড়ী গেছে পাল্‌সেটিলা খেতে।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস।—ফ্যান্‌-এর মিটারটা আরো বাড়িয়ে দে, ইলা। (পুঁটু লম্বা সোফাটার এক-ধারে বসিল।

ইলা

(দারুণ বিরক্ত) আমার বাড়ি কি একটা খোঁয়াড় নাকি যে সবাই এসে এখানে মাথা গলাবে? (রাগ)

কালিন্দী

বেচারার খরচ বেঁচে যায়, পরিশ্রম-ও। তাই এক-জায়গায় সবাইকে জড়ো করতে চেয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ হিসেবে খুব 'শাইন্' কর্‌বে, দেখিস্। পাকা খেলোয়াড়। (পুঁটুর প্রতি) আর কে কে আছে পিছে? পথে আর কাউকে দেখ্‌লে? (হাসি)

ইলা

আপনার যদি ওর সঙ্গে কোনো দরকার থাকে, ব'লে যান; ঠিক সময়ে জানানো হবে।

পুঁটু

ঠিক বল্‌বার মত নয়। দেখা হ'লে—

ইলা

বেশ; বল্‌বার মত না হ'লে একটা 'শ্লিপে' লিখে রেখে যান্।

পুঁটু

আমার দুর্ভাগ্য, তা লেখ্‌বার মত-ও নয়। দেখা হ'লে একটু বাইরে নিয়ে যেতাম। আমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে।...এখনো না আস্‌বার মানে? আজ্‌কে ত' ওঁর আসা চাই-ই। (ব্লাউজের ভিতর হইতে স্বদেশী নিশানওয়ালা খদ্দরের রুমাল বাহির করিয়া কপালের ও ঘাড়ের ঘাম মুছিল।

ইলা

আপনার ফরমাস-মত?

কালিন্দী

(উঠিয়া ফ্যানের মিটারটা আরো বাড়াইয়া দিয়া) আমাদের সব্বাইর ফরমায়েস মত।...(পুঁটুর প্রতি) তুমি ওকে আবার কবে দেখলে? কোথায়?

পুঁটু

(একটু হাসিয়া) আমি ওঁকে আজো দেখি-ই নি।

ইলা

তবে?

কালিন্দী

"খালি বাঁশি শুনেছি?"

পুঁটু

চিঠিতে ওঁর সঙ্গে আলাপ। অক্ষরের মধ্যে দিয়েই দৃষ্টি-বিনিময়।

ইলা

চিঠি? আপনাকেও চিঠি লিখতো না কি? প্রেমপত্র?

পুঁটু

প্রেমপত্র বললে অর্থটা বাজে, বিস্বাদ হ'য়ে যাবে। আমার দেশের কাজের প্রশংসা ক'রে তিনি চিঠি লিখতেন!

ইলা

দেশের কাজ! এ বলে কি, কালি! ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়ে আপনাদের এই হতচ্ছাড়া কাজের প্রশংসা করবে ও!

পুঁটু

(জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়। যদি আমাকে তিনি চান—

কালিন্দী

যদি তোমাকে ও চায়—বেশ বলছ ত'?

পুঁটু

হাঁ, যদি আমাকে তিনি চান,—আমার হাত ধ'রে তাঁকে পথে নেমে আসতে হবে—কণ্টকাকীর্ণ পথে, যে-পথের প্রান্তে আঘাত ও মৃত্যু, অপমান ও অনুশোচনা!

ইলা

(চটিয়া) সংযত হ'য়ে কথা বলুন। আমার বাড়িতে ব'সে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে এ slander আমি সইবো না। তোমার বন্ধুকে ভদ্রতা শিখতে বল, কালি।

কালিন্দী

(সহজ করিবার চেষ্টায়) তোমার সঙ্গে পথে বেরুবে কি পুঁটু,—সে already তার ফিরিঙ্গি-সহচরীকে নিয়ে বেলুনে বেরিয়েছে।···একসঙ্গে তিনজনকেই কলা দেখালো! তিন-ই বা বলি কি ক'রে? হ'তে পারে তিন শো তেত্রিশ! সরদা-বিলের পর বাঙলা দেশে আর কত কুমারী আছে, ইলা?

পুঁটু

অসম্ভব! এ আমি কক্‌খনো বিশ্বাস করিনে।

কালিন্দী

তোমার বিশ্বাসের কতদূর দৌড় শুনি?

পুঁটু

আমি তাঁকে যতদূর চিনি, আপনারা তাঁর একবিন্দুও জানেন না। তিনি স্বাধীন, নির্ভীক, নিদারুণ। তিনি পরপদলেহন করতে শেখেননি।

ইলা

তোমার বন্ধুকে চ'লে যেতে বল, কালি। এখেনে আমরা 'ডেমাগগ'-এর বক্তৃতা শুনতে বসিনি।

কালিন্দী

অর্থাৎ, সে তোমারই হাত ধ'রে পথে নেমে আসবে—জুতো খুলে,' পথের কাঁটা খাবার জন্যে। তোমার আবদারের মৌলিকতা আছে, পুঁটু! (সোফায় বসিল)

ইলা

এর জন্যেই সে এত কষ্ট ক'রে আই-সি-এস হ'য়েছে!

পুঁটু

নিশ্চয়; এরি জন্যে—লোভকে, ক্ষুদ্র স্বার্থকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যে।

কালিন্দী

তোমার ত' 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ' দেখছি। বলি, আমরা কি দোষ করলাম? ইলা কি দোষ করল? এমন চমৎকার যে 'স্‌মোক' করতে পারে, ধোঁয়ায় যে 'কাল' দিতে পারে,—সিগ্রেটের একপ্রান্তে আগুন, অন্যপ্রান্তে যার ঠোঁটের রঙ লাগানো—সেই ইলার অপরাধ কি শুনি? আর আমি—যার সঙ্গে ওর যুগ-যুগ ধ'রে আলাপ, আকাশের প্রথম জন্মদিন থেকে—আমি-ই বা এমন কি ফ্যাল্‌না হ'লাম?···আমার সম্বন্ধে এ-কথাগুলি উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য নিয়ে দুপুর বেলায় ঠিক বলা যায় না!—মুস্কিল!

পুঁটু

আমাকে চ'লে যেতে বল্‌ছেন বটে,—কিন্তু এখুনিই আমি যেতে পার্‌বো না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কর্‌তেই হবে।

ইলা

না। নিজের বাড়িতে ব'সেই প্রতীক্ষা করুন গে।

পুঁটু

প্রতীক্ষা করবার মত আমার অপর্য্যাপ্ত সময় নেই। বেশ, আমি উঠছি। (উঠিয়া) যাঁর এমন সব বন্ধু তাঁর চরিত্রসম্বন্ধে আমার অশ্রদ্ধা হ'চ্ছে।

কালিন্দী

আমাকেও include করছ না কি?

ইলা

(ক্ষিপ্ত) চরিত্র! আপনি চরিত্র তুলে' কথা বল্‌ছেন? কার বাড়িতে ব'সে আছেন, জানেন?

পুঁটু

জেনে আমার কাজ নেই।···সংসর্গ থেকেই লোককে বোঝা যায়। ছি!

কালিন্দী

তেমনি আমাদের ওর সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা উচিত, পুঁটু। তোমার সঙ্গে না মিশলেও পরিচয় রাখছে ত—এবং তোমার দেশের নামে এই গৌয়ার্ত্তুমিকে নিশ্চয়ই

প্রশ্রয় দিচ্ছে। ওর সম্বন্ধে আমাদেরো শ্রদ্ধা হারাবার কি কারণ ঘটেনি ?

ইলা

(সঘৃণ) ছি !

কালিন্দী

সে খাঁটি সাহেব,—ম্যাজিস্ট্রেট্; তোমার এই মোটা খদ্দরকে বরদাস্ত করবে না।

ইলা

পা-পোষ বানাবে।

কালিন্দী

যাও,—দেশের কাজ কর গে।

পুঁটু

তা' তোমাদের আর বল্‌তে হবে না। দেশ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে বক্তৃতা দিতেও আমার লজ্জা করবে। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি—তোমাদের ম্যাজিস্ট্রেট্-সাহেবের সঙ্গে আমার আগেই বিয়ে হ'য়ে গেছে।

ইলা

(চমকিত) এঁ্যা ! এ বলে কি, কালি ?

কালিন্দী

কক্‌খনো না। তার রুচি এত depraved হয় নি। আসুক সে।

পুঁটু

তিনি এসেছেন, এবং আমার বাড়িতেই আছেন। তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। খাঁটি সাহেবকে একবার দেখবে এস। (চলিয়া যাইতে উদ্যত)

ইলা

এ বলে কি, কালি ?···চ'লে যায় যে ? যাবি নাকি ওর সঙ্গে ?

কালিন্দী

(অপস্রিয়মান পুঁটুর প্রতি) দাঁড়াও, একটু 'স্‌মোক্' ক'রে যাও। (পুঁটুর প্রস্থান।) খুব stunt দেখালে যা-হোক্। (ভাল হইয়া বসিয়া) আসুক্ সে।

ইলা

রীতিমত বোঝাপড়া করতে হবে।

কালিন্দী

ফের রীতিমত !···সে আর আস্‌বেই না।

ইলা

ইস্, আসবে না ! চল্, ওর বাড়ি যাই; ঠিকানা জানিস ?

কালিন্দী

তুই ভারি ছোটলোক হ'য়েছিস। Behave করতে পর্য্যন্ত শিখিসনি। ছি ! পুঁটুকে শুধু শুধু চটিয়ে দিলি। ও এলে আমি ওকে সব কথা ব'লে দেব। (আবার একটু নড়িয়া চড়িয়া) আসুক সে।

ইলা

আর, তুই-ই খুব ভদ্রলোক হ'য়েছিস ! তোর কাছ থেকে আমার courtesy শিখতে হবে ? আমার 'স্‌মোক্' করার কথা ওকে বল্‌বার কি দরকার ছিল ?···আবার নালিশ করবার ভয় দেখাচ্ছিস ? তোর নালিশের 'ভ্যালু' কি ?

কালিন্দী

'স্‌মোক্' করতে পারিস, বল্‌তে পারবো না ? একশো-বার বলব !···আমি কি তোর হুকুম তামিল করতে এসেছি না কি যে কি বল্‌বো বা কি বলবো না তোর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আমার মুখে যা আসে তাই বল্‌বো।

ইলা

আমারো মুখ আছে।—আমিও থুতু ছিটোতে পারি।

কালিন্দী

জানি। মুখ আছে বটে,—মাথা নেই। তাই অভ্যাগতকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার বর্ব্বরতা তোর আছে। বলিহারি !

ইলা

মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্, কালি। আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, বেশ করেছি ! একশো-বার দেব। আমার বাড়িতে sedition আমি সইবো না।

কালিন্দী

তাই বুঝি নির্লজ্জের মত মেমসাহেব হ'চ্ছিস! শাড়ির ঝুলটা হাঁটুর ওপর কবে উঠবে?

ইলা

এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে, ব'লে রাখ্‌ছি। আসুক সে!

কালিন্দী

হ্যাঁ, আসুক সে!

ইলা

আচ্ছা, আসুক্ সে!

কালিন্দী

আসুক্ সে!

ইলা

বেশ, নিজের বাড়িতে ব'সেই হা-পিত্যেস্ কর্‌গে! (উঠিয়া ফ্যান্ বন্ধ করিয়া) অনেক হাওয়া খেয়েছিস্।

কালিন্দী

রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে তোর নেমন্তন্ন রইল। বিলেত থেকে আজ ত দেশে ফিরেছে—তাই ওর সম্মানে একটা টি-পার্টি দেব। তুই যাস্,—টেবিল্ সাফ্ করবি! আমাদের বাড়িতে ঝি নেই।

ইলা

মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্, বল্‌ছি!

কালিন্দী

আর, শাড়িটা কিন্তু হাঁটুর ওপর তু'লে যাস্,—নইলে, সেই ঝি আমাদের পছন্দ হবে না।

ইলা

(দারুণ চটিয়া) তুই যা শীগ্‌গির আমার বাড়ি ছেড়ে!

কালিন্দী

যাব না ত'!

ইলা

আচ্ছা আসুক সে।

কালিন্দী

আসুক্ সে!...কি করবি তুই না গেলে? এই ফের বস্‌লাম। (সোফায় বসিল) আসুক সে?—আমাকে ভয় দেখানো হ'চ্ছে!

ইলা

শীগ্‌গির যা বল্‌ছি কালি, নইলে ভয়ানক চ্যাঁচাবো।

কালিন্দী

কী বীরত্ব!..."প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি, খাসা তোর চ্যাঁচানি!" ছি!

ইলা

(মেঝেতে জুতা ঘষিয়া) গেলি?...এটা আমার বাড়ি, মনে থাকে যেন।

কালিন্দী

(উঠিয়া) বেশ, যাচ্ছি। তুইও আয় না আমার সঙ্গে। ও একা-একা দুপুর বেলাটিতে চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে নিশ্চয়ই ঘাম্‌ছে। ওর আবার দুপুর বেলা ফ্যানের হাওয়া পছন্দ হয় না—গরম লাগে। তুই চল্ না, ওর শিয়রে ব'সে ওকে একটু পাখার হাওয়া করবি। আমার ঘুম পেলে আমি যদি ওর পাশে ঘুমিয়ে পড়ি,—তা হ'লে আমাকেও।

ইলা

তার চেয়ে তুই একটুখানি দাঁড়া, আমি ওকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আন্‌ছি। তুই এখানে আসবার আগে কোন্ সকালে ও যে আমার কাছে এসেছে তা ত আর জানিস না? দাঁড়া, ডেকে আন্‌ছি ওকে। ভারতবর্ষে নেমেই ওর পায়ে বাত হ'য়েছে—তুই ওর পায়ের তলায় ব'সে পা টিপে' দিবি। দরকার হ'লে আমারটাও। বকশিস দেব।

কালিন্দী কি বলিতে যাইতেছিল, নীচে রাস্তায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল। ইলা ও কালিন্দী দুইজনেই স্তব্ধ, উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল,—কেহও নড়িল না। আবার হর্ণ শোনা গেল—দুইজনের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হর্ণ আবার! এইবার কালিন্দী ছুটিয়া গিয়া জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

কালিন্দী

এসেছে! ও এসেছে এবার। উলু দে, ইলি!

ইলা

(নির্ব্বিকার) আসুক সে!...তুই আমাকে কী

অপমান করেছিস্, সব বল্‌ব ওকে।

কালিন্দী

আর, আমিও কিছু ছাড়বো না। তুই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিস!

ইলা

তুই আমাকে ঝি বলেছিস্,—প্যাঁচানি বলেছিস্।

[মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

কালিন্দী

(চঞ্চল) আমি যাই ছুটে' নীচে—আগেই ওকে 'রিসিভ্' ক'রে আনি গে।

ইলা

(কালিন্দীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া) না, খবরদার। আমার বাড়ি!

কালিন্দী

আচ্ছা। No handicap! এখানেই আসুক্ সে! ফের চোখ বুজ্‌বি, ইলা?

ইলা

না।

কালিন্দী

(বন্ধুর মত) এখন নাই বা আর ঝগড়া কর্‌লাম। ও আসছে, এক্ষুণি সিঁড়িতে ওর জুতোর শব্দ পাওয়া যাবে। আয়, এই সোফাটায় ফের পাশাপাশি বসি—বন্ধুর মত। দু'জনে একত্র হ'য়ে ওকে শাসন কর্‌ব। সামান্য 'পাঙ্‌চুয়ালিটি' শেখেনি, ম্যাজিস্ট্রেট্ হ'য়েছেন! We're friends, ইলা।

ইলা

(নরম হইয়া) বেশ, আয় তবে আবার চোখ বুজি। ওয়ান্, টু, থ্রি। (দুইজনে চোখ বুজিল)

[অর্দ্ধমিনিট কাল নিস্তব্ধতা]

ইলা

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছিস্, কালি?

কালিন্দী

হ্যাঁ, পাচ্ছি। আর একটু পরেই—

ইলা

পাচ্ছিস্? আমি ত পাচ্ছি না।

কালিন্দী

কান থাকা চাই।

(আরও অর্দ্ধমিনিট কাটিল)

ইলা

জুতোর আওয়াজ পাচ্ছিস, কালি?

কালিন্দী

পাচ্ছি বৈ কি।

ইলা

(আরো উৎকর্ণ) কোথায়?

কালিন্দী

মনে হ'চ্ছে যেন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

ইলা

(চোখ মেলিয়া) এঁ্যা, বলিস কি? নেমে যাচ্ছে! দোর-গোড়ায় এসে নীচে নেমে যাচ্ছে! বলিস্ কি?

কালিন্দী

তাই ত' মনে হ'ল। (একটু গম্ভীর) চ'লে যাচ্ছে—তার আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না?

ইলা

সিঁড়িতে?

কালিন্দী

তোর মাথায়!

ইলা

চল্, নীচে যাই—ওকে ডেকে আনি। ও এত কাছে এসে কেন ফিরে' চ'লে যাবে? (চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল)

কালিন্দী

(ইলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া) No handicap, ইলা। দাঁড়া। আসুক সে।

ইলা

(উদাস) কোথায়?

যবনিকা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

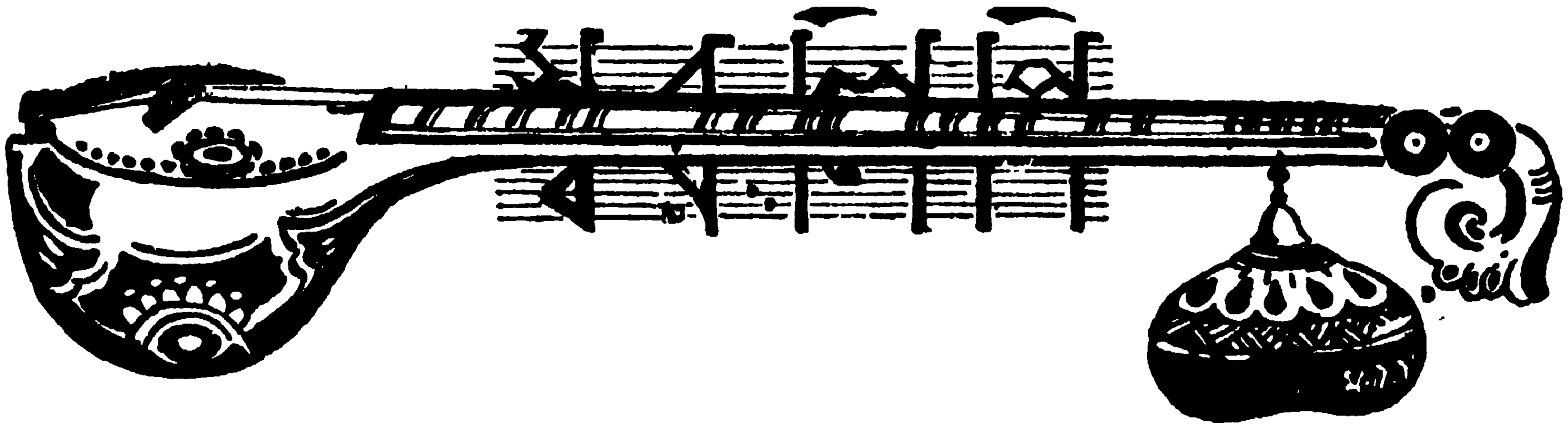

অ = অ ও আ'র মাঝামাঝি, ইংরেজী U, যথা

ঐ = অয়্ ; ঔ = অও

ব্ = ওঅ, ইংরেজী W

য = ইঅ

হমনে চাকর রাখো জী।

চাকর রহসূঁ বাগ লগাসূঁ

নিত উঠি দরসন পাসূঁ।

বৃন্দাবনকী কুংজ গলিন্‌মেঁ

তেরী লীলা গাসূঁ॥

হরে হরে সব বন বনাউঁ

বিচ্ বিচ্ রাখূঁ বারী।

সাবঁলিয়াকে দরসন পাউঁ

পহির কুসুম্মী সারী॥

জোগী আয়া জোগ করনকূঁ

তপ করনে সন্ন্যাসী।

হরি ভজনকূঁ সাধু আয়ে

বৃন্দাবনকে বাসী॥

মীরা কেঁ প্রভু গহির গংভীরা

হৃদয়ে রহোজী ধীরা।

আধীরাত প্রভু দর্শন দৈহেঁ

প্রেমনদীকে তীরা॥

কথা ও স্থর-সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত

স্থরসাগর

মান্দ—কার্ফা (দ্রুতগতি)

মা পা
ন্ধ নে

\+ -া -া
II { গা -া মা -গা । গা -রা সা -রা I সা -া -া -া । -া -া (মা পা) } I
চা • ক র্ রা • খো ০ জী • • • • • ন্ধ নে

I সা -র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা র্রা I র্সনা র্সা না -ধা । ধা -পা পা -ধা I
চা • ক র্ রা • খো ০ চা • ক র্ রা • খো ০

I ধা -র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা -র্রা I র্সনা -র্সা না -ধা । ধা -পা পা -মা I
চা • ক র্ রা • খো • চা ০ ক র্ রা ০ খো •

I পা -ণা ণা -া । ধা -পা পা -মা I মা -পা -ধা -পা । -মা -গা মা পা II
চা • ক র্ রা • খো ০ জী ০ ০ ০ ০ ০ ন্ধ নে

II { সা -রা রা -মা । মা মা মা -া I মা -পা -া পা । পা -া পা -ধা I
চা • ক র্ র হ সূঁ • বা ০ গ্ ল গা • সূঁ •

I ধা র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধা পা I পা -ধা পা -ধা । -ণা -ধা -পা -ধা I
নি ত উ ঠি দ র্ স ন পা • সূঁ • • • • •

পা -া -া -া । -া -া -া -া } I
• • • • • • • • •

I {মপা -ধা ধা -া । ধা ধা ণা -ধা I পা -া পা ধা । পা -ধা পা -মা} I
বৃ ০ ন্ দা ০ ব্ ন কী ০ কু ং ০ জ গ লি ন্ মে ০

I মা -পা পা -ণা । ণা -ধা ধা -পা I পা -মা মা -গা । -া -া মা পা II
তে ০ রী ০ নী ০ লা ০ গা ০ যুঁ ০ ০ ০ ০ স্ব নে

II {সা রা -মা মা । মা -া মা মা I মা -পা -া পা । পা -া পা -ধা I
হ রে ০ হ রে ০ স ব ব ন্ ০ ব না ০ উঁ ০

I ধা র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধা -পা I পা -ধা পা -ধা । -ণা -ধা -পা -ধা I
বি চ বি চ রা ০ খুঁ ০ বা ০ রী ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া -া -া । -া -া -া -া} I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I {মা মপা -ধা ধা । ধা -া ণা -ধা I পা -া পা -ধা । পা -া মা -া} I
সা বঁ ০ ০ লি য়া ০ কে ০ দ র্ স ন পা ০ উঁ ০

I মা পা -ণা ণা । ণা -ধা ধা -পা I পা -মা মা -গা । -া -া মা পা II
প হি র্ কু সু ম্ মী ০ সা ০ রী ০ ০ ০ স্ব নে

II {সা -রা রা -মা । মা -া মা -া I মা -পা -া পা । পা -া পা -ধা I
জো ০ গী ০ আ ০ য়া ০ জো ০ গ্ ক র ন কুঁ ০

I ধা র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধা -পা I পা -ধা পা -ধা । -ণা -ধা -পা -ধা I
ত প ক র নে ০ স ন্ ন্যা ০ সী ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -া -া -া । -া -া -া -া } I
০ ০ ০

I { মা মপা -ধা ধা । ধা -া ণা -ধা I ধপা -া পা -ধা । পা -া মা -া } I
হ রি ০ ০ ভ জ ন্ কুঁ ০ সা ০ ধু ০ আ ০ য়ে ০

I পা ণা ণা -া । ধা -া ণা -ধা I পা -ধা পা -া । -া -া -া -া I
বৃ ন্ দা ০ ব ন্ কী ০ বা ০ সী ০ ০ ০ ০ ০

I { মা -া মা -া । মা -া মা মা I মা মা -পা পা । পা -া পা -ধা I
মী ০ রা ০ কে ০ প্র ভু গ হী র গং ভী ০ রা

I ধা র্সা র্সা র্সা । ণা -া ধা -পা I পা -ধা পা -ধা । -ণা -ধা -পা -ধা I
হৃ দ য়ে র ভো ০ জী ০ ধী ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

-পা -া -া -া । -া -া -া -া } I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I { মপা -ধা ধা -া । ধা -া ধা -ণা I পা -া পা ধা । পা -া মা -া } I
আ ০ ০ ধী ০ রা ত্ প্র ভু দ র্ স ন দৈ ০ হেঁ ০

I মা -পা -ণা ণা । ণা -ধা ধা -পা I পা -মা মা -গা । -া -া মা পা II II
প্রে ০ ম্ ন দী ০ কে ০ তী ০ রা ০ ০ ০ ক্ষ নে

স্মরে জনম মরণকে সাথী।
থাঁনে নহিঁ বিসরূঁ দিনরাতী॥
তুম্ দেখ্যাঁ বিন্ কল ন পড়ত হৈ।
জানত মেরী ছাতী॥
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ।
রোয় রোয় অঁখিয়াঁ রাতী॥
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর।
হরি চরণাঁ চিতরাতী॥
পল-পল তেরা রূপ নিহরূঁ।
নিরখ নিরখ সুখপাতী॥

কথা ও সুর-সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত

সুরসাগর

কেদারা-হাম্বীর—তেতালা (অল্প দ্রুতগতি)

পা পা II
স্ম রে

০ ৩ + ২-া -া -া -া
II { পম্মা পা -া ধা। পম্মা -পা মা -গা I গা -মা ধা -া । (-া -ণা ধণা ধপা) } I
জ ন ম্ ম র ০ ণ্ কে ০ সা ০ থা ০ ০ ০ (স্ম ০ রে ০)

I -া -া ধা -না । ধনা -র্সর্রা -া র্সা I র্সা -না -ধা -া । -া -া ধা ণা I
০ নে ০ ০ ০ ০ ন হিঁ ০ ০ ০ ০ ০ বি স

I ধা -পা -া -া । -া -া ধা পা I মা -গা রসা -া । -া -া সা সমা I
রূঁ ০ ০ ০ ০ ০ দি ন রা ০ তী ০ ০ ০ স্ম রে ০

I মা গা -পা পা । ম্মধা -পা মা -গা I গা -মা ধা -া । -া -ণা ধণা ধপা II
জ ন ম্ ম র ০ ণ্ কে ০ সা ০ থী ০ ০ ০ স্ম ০ রে ০

১১

০ ৩ + ২
II { পা -া ধা -পা । পর্সা -া -র্সা -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্র্সা -নর্সা I
তু ম্ দে ০ খাঁ ০ বি ন্ ক ল ন প ' ড় ত হৈ ০ ০ ০

I ধা -না র্সা র্রা । র্সা -না র্সা না I ধা -ণা ধা -পা । -া -া -া -া } I
জা ০ ন ত মে ০ রী ০ ছা ০ তী ০ ০ ০ ০ ০

I { র্সা -া র্সর্গা -া । র্গা র্গা র্গা র্গা I র্গা -র্মা র্রা -র্রা । র্সনা -র্রা র্সা -া } I
উ ০ চাঁ ০ চ ঢ় চ ঢ় প ং থ নি হা ০ রুঁ ০

I র্সা -া র্সা র্সা । -ধা ধা পা পা I ধপা -হ্মপা মগা -মা । ধা -া ধণা ধা II
রো ০ য় রো ০ য় অঁ খি য়াঁ ০ ০ ০ রা ০ তী ০ হ্ম ০ রে

০ ৩ + ২
II সা -া সা -া । সমা -া মা মা I মপা পা পা পা । হ্মপা ধা পা পা I
মী ০ রা ০ কে ০ প্র ভু প র ম ম নো ০ ০ হ র

০ ৩
I পা পা হ্মা পা । র্সা -নর্সা ধা পা I পগা -মা রা -া । -সন্া -সা -া -া I
হ রি চ র ণাঁ ০ চি ত রা ০ তী

I { সা -া মা -া । মা -া মা -া I মগা -পা পা পা । হ্মপা -ধা হ্মপা -া } I
প ল্ প ল্ তে ০ রা ০ রু ০ প নি হা ০ রুঁ ০

I র্সা র্সা নর্সা র্সা । ধা ধা পহ্মা পা I মগা -মা ধা -া । -া -ণা ধণা ধপা II II
নি র খ ০ নি ০ র খ সু খ ০ পা ০ তী ০ ০ ০ হ্ম ০ রে ০

* উল্লিখিত মীরাবাঈ'এর গানগুলির প্রসঙ্গে গত চৈত্র মাসের 'বিচিত্রা'র ৪৮৩ ও ৪৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—শ্রীহিমাংশু-কুমার দত্ত।

বালিকা বধূ

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কনক শুনিতে পাইয়াছে কে যেন ছাদের 'উপর পায়চারি করিতেছে। আজ সকালে দাড়ি কামাইবার সময় সেই কথা তাহার মনে পড়িল।

মেনকা? ছাদে উঠিবার বাতিক মেনকার আছে বটে, কিন্তু নিশুতি রাত্রে? ভূত? ভূতকে কনক তাচ্ছিল্যের সহিত অবিশ্বাস করে।

কনকের খানসামা রাত্রে নিজের বাড়ী যায়। বেহারা তাহার পত্নী ও কন্যা লইয়া আউট হাউসে থাকে। সহিসটি আস্তাবলে মেনকার পোনী ঘোড়ার প্রতিবেশী।

রাত্রিবেলা, দুটি মানুষের সংসার, ছাদে যদি কেহ উঠিয়া থাকে তো সে মেনকাই। অথবা কনকের অলীক কল্পনা।

কনক যখন বাগানে আসিয়া মেনকার প্রতীক্ষা করিবে ভাবিতেছে তখন দেখিল মেনকা গালে হাত দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়াছে—রাত্রের কাপড় ছাড়ে নাই।

কনকের অবাক হইবার কারণ ছিল। মেনকা শেষ রাত্রে উঠিয়া পোনীতে চড়িয়া ক্যাণ্টার করিয়া আসে, কনক ঘুম হইতে জাগে, দু'জনের মিলন হয় বাগানে। তখন দু'জনে মিলিয়া নদীতে সাঁতার কাটিতে যায়।

"মে, তোমার অসুখ করেছে?"

মেনকা যখন হাসে তখন তাহার চোখের চাঁপার পাপড়িগুলি মুদিয়া আসে। যেন হাসি নয়, আবেশ। মেনকা উত্তর দিল না।

"ওই তোমার এক বদ্ দস্তুর, মে। প্রশ্ন করলে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।"

মেনকা নখ দিয়া মাটিতে নাম কাটিতে লাগিল। লিখিল K. C. তার নীচে M. C.

কনক কহিল, "আজ রাইড কর্‌তে যাওয়া হয় নি?"

মেনকা ঘাড় নাড়িল, মুখ তুলিল না।

"মে, তুমি দিন দিন বড় অনিয়ম কর্‌ছো। কেন যাওনি?"

"ভালো লাগে না একা যেতে।"

কনক ভাবিয়া বলিল, "হুঁ।"

বিয়ের পূর্ব্বের সঙ্গে বিয়ের পরের কত তফাৎ—মামলা বিচার করিবার ফাঁকে ফাঁকে কনক সেই কথা ভাবিতেছিল। মেনকাকে যখন প্রথম দেখে তখন সে তাহার ইস্কুলের সব-কয়টা দৌড়ঝাঁপে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে; সে ছোরা খেলায় অদ্বিতীয়া,—তাহার শরীরের গড়ন এমন সুষম যে ভিনাস ডি মাইলো-কে মনে পড়িয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে কনক ভালো ভালো সম্বন্ধ ফিরাইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে, "ম্যাট্রিক পাশ করা দুগ্ধপোষ্য বালিকা।" কিম্বা "বিশ্রীরকম সেকেলে ব্রীডিং।" কিম্বা "রং নিয়ে কী করবো? আমি চাই গড়নের সিমেট্রি।"

সেই কনক একদিন এক বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া একটি দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে মনে মনে বরণ করিল।

বন্ধু সুনন্দকে লিখিল, "মনে কোরো না আমি প্রেমে প'ড়ে অন্ধ হ'য়েছি। কৃষি-কর্ম্মীদের বিশ্বাস কৃষকদের দোর-গোড়ায় তাদেরি কারো জমিকে demonstration farm এ পরিণত করলে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় কেমন ক'রে সোনা ফলে। আমারও তেমনি বিশ্বাস কোনো একটি বালিকাকে আদর্শ শিক্ষা পেতে দেখলে দেশের বালিকা-সাধারণ বুঝবে আদর্শ শিক্ষা কা'কে বলে। মেনকাকে নির্ব্বাচন করবার কারণ তার শরীর-চর্চ্চার প্রতিভা আছে। আর, আদর্শ শিক্ষার আট আনাই তো শরীর-চর্চ্চা।"

সুনন্দ উত্তর দেয়, "কনক হে! খামখেয়ালিকে যুক্তি-তর্কের মুখোস পরাতে তোমার দ্বিতীয় নেই। তুমি একমেবা-দ্বিতীয়ম্।"

বন্ধুরা যে তাহাকে crank বলিত সেটা অহেতুক নয়। মেনকাকে বিবাহ করিয়া আনিবার প্রথম দিন তাহার নিত্য-কর্ম্মের রুটিন স্থির হইয়া গেল। সে শেষরাত্রে উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইয়া আসিলে কনকের সঙ্গে সাঁতার কাটিতে যাইবে। প্রাতরাশের পর দু'জনে লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িবে। মধ্যাহ্নভোজনের পর কনক আদালতে গেলে মেনকা সারা দুপুর কাঠ-পাথর কুঁদিয়া মূর্ত্তি বানাইবে।

কনক বলিয়াছিল, "একটা অতি সাধারণ Haus frau * হ'য়ে ব্যর্থ হবে, মে? নিজের জীবনটাকে বড়ো স্কেলে নির্ম্মাণ করো। Architectural conception—যেন একটা ক্যাথিড্রল। সেইজন্যে তো তোমাকে ভাস্কর্য্য দিয়ে আরম্ভ করতে বলছি। একদিন তোমাকে দিয়ে সৌধনির্ম্মাণ করাবো, মে।"

মেনকা তাহার কথা বুঝিতে পারে কি পারে না তাহা লইয়া কনক মাথা ঘামায় না। সে তো বুঝাইবার জন্য কথা বলে না, প্রভাবিত করিবার জন্য কথা বলে। মেনকা প্রভাবিত হয়ও।

চায়ের পর টেনিস। অতঃপর দুগ্ধ পান করিয়া দুগ্ধ-পোষ্য বালিকাটি নিজের ঘরে ঘুমাইতে যায় এবং সাপার খাইয়া সরকারী কাগজপত্র লইয়া কনক তাহার আপিস-ঘরে বসে।

এই পর্য্যন্ত কনককে বেগ পাইতে হয় নাই। মেনকা উৎফুল্ল হইয়া রাজি হইয়াছে। সে তো খেলা করিতে পাইলে আর কিছু করিতে স্বভাবত চায় না। তবু ভাস্কর্য্য তাহাকে মাতাল করিয়াছে। কনক বলিয়াছে, "মে, তোমার দেহের গড়নটি sculpturesque, কার সাধ্য কে বলবে 'তনুলতা'? মে, তুমি একখানি জীবন্ত sculpture। তাই শুনিয়া মেন-কার উৎসাহের অবধি নেই। ভগওয়ানদাস বেহারার আট বছরের মেয়ে লছমী হইয়াছে তার মডেল।

মেনকা বাঁকিয়া বসিল যখন কনক বিধান দিল, "দিনের বেলা হাফ্ প্যান্ট্ পরতে হবে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত; রাত্রে তুমি যা খুসি পরো। দ্রৌপদীর মতো দীর্ঘকেশ দ্বাপরযুগে বেশ ছিল, কলিযুগে অচল। বব্ করতে হবে। দৈনিক দু'হাজার দু'শো পঞ্চাশ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য খেতে হবে, তার মধ্যে প্রোটিন, কার্ব্বোহাইড্রেট্স্, ফ্যাট্স্ ইত্যাদির অনুপাত একচুল বেশি-কম হবে না। এবং ভিটামিনের জন্যে কাঁচা সবজি চিবিয়ে খাওয়া চাই-ই।"

এই লইয়া মেনকা এখনো মাঝে মাঝে সত্যাগ্রহ করিতেছে। "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—কেশ সম্বন্ধে কনক পীড়াপীড়ি করিতেছে না।

কনক নিজের মনকে কহিল, হুঁ। মেনকা আর সে মেনকা নাই। বেশির ভাগ সময় অন্যমনস্ক থাকে। তাহার চাপল্যের হ্রাস হইয়াছে। যে ছিল ঝরণা সে হইল পুষ্করিণী। প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন রাগ করিত, জেদ ধরিত, তর্কে হার মানিত না, খিল খিল করিয়া হাসিত, একদণ্ড স্থির থাকিত না, কোদাল ধরিয়া আগাছা উচ্ছেদ করিত, কনককে স্বামী বলিয়া সম্ভ্রম করিত না সাথী বলিয়া কাজ হইতে টানিয়া লইয়া যাইত, বলিত, 'চেকো-স্লোভাকিয়ার গল্প বলো।'

পাছে স্বামীকে ভয় করিতে লজ্জা করিতে কামনা করিতে শেখে, পাছে স্বামী-সচেতন হয়, এই আশঙ্কায় কনক মেনকাকে অধিকবয়সী মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে দিত না। উহারা তাহার বালিকা বধূটিকে অকালে পাকাইয়া তুলিবে ইহাতে তাহার আপত্তি।

তথাপি কেমন করিয়া মেনকা তাহাকে "ওগো" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন বলিতেছিল, "না গো, আমি এত দুধ খেতে পারবো না।" অন্য সময় হইলে কনকের কানে বেসুর বাজিত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা মেনকা শাড়ী পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। তখন তাহার মুখে "ওগো" শুনিতে মিষ্টি লাগিল। কনক মেনকাকে

* জার্ম্মান ভাষায় Haus frau বলিতে বুঝায় গৃহসর্ব্বস্ব নারী।

বাম বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ডান হাতে দুধের গেলাস ধরিয়া কহিল, "হাঁ গো, এটুকু খেতে পারবে। মুখ খোলো।"

কনক মনকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ রাইডিঙে যায় নাই, কাল সাঁতারে যাইবে না, পরশু স্কাল্পচারে ইস্তফা দিবে। কে আমার ছোট্ট পাখীটিকে কুপরামর্শ দিতেছে? এখানে তো কোনো মহিলার সঙ্গে তাকে মিশিতে দিই না। বলি, 'প্রেস্টিজ্ অব্ দি সার্ভিস্। আমি তো কনক চট্টোপাধ্যায় নই, আমি আই-সি-এস্। নিজের সেটের বাইরে মাখামাখি করলে আমার জাত যায়।—তেমনি তোমারো।'

চায়ের সময় কনক কহিল। "মে, কাল রাত্রে ছাদে পায়চারি কর্‌ছিল কে?"

মেনকা কহিল, "কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না।"

কনক রসিকতা করিয়া কহিল, "একলাটি ঘুম আস্‌ছিল না?"

মেনকা কহিল, "ধোৎ!"

কনক ভাবিল, সে-ইঙ্গিতটাও বোঝে! কে তাকে মন্ত্রণা দিল? কোনো বিবাহিতা বালিকার সঙ্গেও তো তাহাকে আলাপ করিতে দিই নাই।

চায়ের পর মেনকা কহিল, "আজ কিন্তু আমি টেনিস্ খেল্‌তে পার্‌বো না।"

কনক কহিল, "কী কর্‌বে সেই সময়টা?"

মেনকা কহিল, "লক্ষ্মীটি, তুমি রাজি হও। আমার সেজ-বৌদিদির বাপের বাড়ী এই সহরে। এতদিন যাইনি ব'লে তাঁরা নিজেরা আজ এখানে আস্‌তে চেয়েছেন।"

"অসম্ভব। টেনিস্ বন্ধ রাখা যায় না। আরেক-দিন চা'তে নিমন্ত্রণ কোরো। আমিও তোমাদের আলাপে যোগ দেবার সুযোগ পাবো।"

প্রস্তাবটা মেনকার মনে ধরিল।

টেনিসের পরে কনক কহিল, "বুঝ্‌লে গো, মে? 'শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' আজ টেনিস্ বন্ধ রাখলে অন্তত একশো ক্যালরি খাবার কমাতে হ'তো। তার ফলে তোমার ওজনের আধটি ছটাক নেমে যেতো।"

মেনকা স্বামীর মুখে চোখ রাখিয়া মিষ্টি হাসিল। বলিল, "মরণ হ'লে বাঁচি। আমার জন্যে এত বেশি ভেবে তোমার নিজের চেহারা কী হ'চ্ছে আয়নার কাছে গিয়ে দেখো।"

সে কথা কনক জানিত। কনকের হৃদয়ের কীট তাহার দেহকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল। ভাবিয়াছিল মেনকাকে বিবাহ করিলেই মে'-কে ভুলিবে। কিন্তু ভুলিতে পারিল কই? কতবার মেনকাকে একটি চুম্বন দিতে সাধ গিয়াছে। কিন্তু মে'র প্রতি লয়াল্‌টি! যে-মুখ দিয়া মে'কে চুম্বন করিয়াছে সেই মুখ দিয়া মেনকাকে! আগে মে'র স্মৃতি মিথ্যা হইয়া যাক্,—আগে মে'র বিবাহসংবাদ আসুক।

কনক কহিল, "আমার কথা আলাদা।"

"কেন আলাদা? বল্‌ছো না কেন? বলো না?"

"ছেলে মানুষ; আগে বড়ো হও।"

"ইস্! নিজে তো ভারি বড়ো! দেখ্‌লে মনে হয় উনিশ-কুড়ির বেশি নয় বয়স।"

কনক হাসিয়া বলে, "আশ্চর্য্য, না? তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে কেউ ভাব্‌বে না যে লোকটার দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পক্ষ চল্‌ছে। অথচ—"

মেনকা কনকের মুখে হাতচাপা দিল। বলিল, "থাক্, আর মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে না।"

কনক অনেকবার আভাসে ইঙ্গিতে বলিয়াছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। মেনকা এত বালিকা যে গভীর সত্য বুঝিতে পারিবে না। কহিবে, "মিথ্যা।" অথবা অবুঝের মতো আত্মনিগ্রহ করিবে। কনক ভাবে, মেনকা যে বেশিবয়সের মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া স্বামীকে সন্দেহ করিতে কিম্বা স্বামীর পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে শিখে নাই এই এক সৌভাগ্য। নতুবা এতদিনে আমাকে জেরা করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিত।

মেনকাকে তাহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া কনক আজ রাত্রে কাজ ফেলিয়া চিঠি লিখিল।

লিখিল :—

ফ্লোরেন্সে মে ডর্‌লিং, বলেছিলে, 'তুমি তো মানুষ নও, Fra Angelicoর ঐ যে Gabriel দেখ্‌ছো তুমি সেই।' মে ডিয়ার, আমাকে এখন দেখ্‌লে কী বল্‌বে? বল্‌বে, 'তুমি তো এঞ্জেল্ নও, তুমি বিষয়ী মানুষ। তোমার বাড়ী হ'য়েছে, গাড়ী হ'য়েছে, স্ত্রী হ'য়েছে। তুমি আদালতে উকীল-মোক্তার হাঁকাও, চাপরাশীকে ফাইন করো, বিচারগর্ব্বে মানুষকে কারাদণ্ড দাও। তুমি দু'বেলা সেলাম লুট্‌ছো। তুমি কি আমার আকাঙ্ক্ষিত Free man?"

মে ডিয়ার, তুমি বলেছিলে, 'তুমি শেলীর মতো ineffectual angel; আগে শক্তিমান হও।' শক্তিমান হ'য়ে উঠ্‌ছি, কিন্তু ভুল পথে, ভুল পথে! মে ডার্‌লিং, তুমি আমার উপর কোনো বৃহৎ আশা রেখো না। আমি কোনো বৃহৎ কীর্ত্তি, কোনো বৃহৎ চিন্তা জগৎকে দিয়ে যেতে পার্‌বো না। বড় জোর আমার জেলার কচুরিপানা ধ্বংস কর্‌বো।

এই সান্ত্বনা আমার থাকবে যে আমি আমার দেশের একটি বালিকাকে free woman হ'য়ে ওঠ্‌বার সুযোগ দিচ্ছি। তোমার মতো তারও নাম 'মে'। একদিন সে Amy johnson এর মতো আকাশে উড়্‌বে, Josephine Bulter এর মতো কঠোরহস্তে পতিতাকে পাঁক হ'তে তুল্‌বে, Emily Hobhouse এর মতো শক্রর প্রতি অবিচার ঘট্‌তে দেবে না। এবং তোমার মতো বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের উপাসনা ক'রেও কল্পিত সৌন্দর্য্যে আত্মনিয়োগ কর্‌বে। সে একদিন সুন্দরী মানসীকে পাষাণে রূপ দেবে—সেই নমুনা দেখে রমণীরা সুন্দরী হবার সাধনা কর্‌বে। সে একদিন সুন্দর কুটীর রচনা কর্‌বে—তারপর থেকে দেশে আর অসুন্দর কুটীর থাকবে না। সে একদিন সুন্দর পল্লী পত্তন কর্‌বে—সেই পল্লীর আদর্শ দেশময় পরিব্যাপ্ত হবে।

মেনকায় মধ্যে তুমি ও আমি বাঁচ্‌বো। তোমার নাম সে শোনে নি, নাই বা শুন্‌ল। আমাকেও সে চেনে না, চেনে একজন খেয়ালী সংস্কারককে, একটি বে-দরদী বুরোক্রাটকে। মে ডার্‌লিং, ক্ষতি কী! সে আমাদের না চিন্‌লেও আমরা তার মধ্যে থাক্‌বো।

*

কনক স্বপ্নে দেখিল, ভেরোনা। ঐ যে ভেরোনার রোমক যুগের Arena। ভেরোনা না হইয়া পারে না।

মে, আমরা ইতালীর এত জায়গা দেখলুম, কিন্তু ভেরোনার মতো ভালো লাগ্‌ল না কোনোটা। জায়গা ভালো না লাগ্‌লে জায়গার দোষ তত নয় যত আমাদের মনের অবস্থার দোষ। তুমিই বলো না, ডিয়ার? ভেরোনায় তুমি ও আমি যত কাছাকাছি আছি তত আর কোথাও ছিলুম কি? মনে পড়্‌ছে না। ইস্! এই পনেরো দিনে আমরা কম্‌সে-কম পনেরোটা জায়গা ঘুরেছি—কত মনে রাখ্‌বো? সব ঘুলিয়ে গেছে, মে। কাল ছিলুম ভেনিসে, পরশু ছিলাম কোথায়? পাডুয়াতে? না, বোলোনাতে?

ভেরোনাতে আমরা পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকি বটে, কিন্তু দুটোর মাঝখানকার দরজাটা খোলা। তুমি বল্‌ছো রোমেও তাই ছিল? হাঁ, তাই তো। কিন্তু রোমে আমার মন ভালো ছিল না। রোজই টাকার ভাবনা ভেবেছি। তুমি দয়া ক'রে আমার খরচা ধার দিয়েছিলে,—এখনো ধন্যবাদ দিই, ডার্‌লিং। Too kind, too kind! ওঃ হাতে টাকা না থাকার কি ঝক্‌মারি! তোমাকে বলিনি, পাছে তুমি ঠাট্টা ক'রে বল materialist। আচ্ছা বলো দেখি, মানুষ কেমন ক'রে materialist না হ'য়েও শক্তিমান হতে পারে? তুমি অবশ্য বই মুখস্থ বল্‌বে, 'A saint is gentle as a dove and clever as a serpent.'

কিছুক্ষণ পরে কনক দেখিল রিভিয়েরার একটা ছোট ষ্টেশনে মে নামিয়া গেছে কনকের জন্য খাবার কিনিয়া আনিতে। ট্রেন চলিল, কিন্তু মে আসিল না। সমস্ত ট্রেন-টার বারান্দা বাহিয়া কনক মে'কে খুঁজিল, কিন্তু পাইল না। 'সাম্‌নে' দু'জন জার্ম্মান যুবক বসিয়া কলহাস্য

করিতেছে, কিন্তু কনকের দৃষ্টি গ্রাস করিয়াছে চরাচরব্যাপী অন্ধকার,—তাহার কানে প্রলয়পয়োধির ঢেউ ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মার্সেল্‌সে জাহাজ ছাড়িবে, কনক দেশে রওয়ানা হইবে কাল, মে'র সঙ্গে শেষ-দেখা হইবে না। মে'র যে আজ রাত্রে কি দশা হইবে ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। মে'র সব টাকা কনকের কাছে,—সব জিনিষ কনকের জিম্মা। মে ফরাসী ভালো বলিতে পারে না; ইংরেজী কেহ বুঝিবে না হয় তো।

Is that you, dear? অবাক কর্‌লে! ছিলে কোথায়? এই ট্রেনের সঙ্গে জোড়া আরেক-সেট্ কামরায়? ভগবান!

*

একটা দমকা হাওয়া আসিয়া শিয়রের জানালটা খুলিয়া দিল। এক অঞ্জলি চাঁদের আলো কনকের মুখে ছড়াইয়া গেল। কনক চোখ চাহিয়া দেখিল—

তাহার একান্ত নিকটে মেনকা শুইয়া আছে। পূর্ণ-চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়ায় এত সুন্দর দেখাইতেছে, যেন সে ও'নীলের শুভ্র মুখ!

কনক নির্নিমেষে অবলোকন করিল, মেনকা আর বালিকা নাই, মেনকা নারী। তার অন্তর্দেশে যে নারী থাকে সুষুপ্তির সুযোগ লইয়া সেই নারী অন্তঃপুর ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছে। ছাদে পায়চারি করিতেছে।

নারী? হাঁ, নারী বৈ কি। বেশিবয়সের বিবাহিতা মেয়েরা এই বালিকাটিকে নারী করিয়া তুলিবে এই ধারণা কনকের ছিল। চাঁদের আলোর মতো তাহার মনকে আবিষ্ট করিল এই সত্য যে পুরুষের সঙ্গ দূরতম হইলেও বালিকাকে নারী করিয়া ছাড়ে।

মেনকা তাহার নারীজনোচিত অধিকার দাবী করিতে আসিয়াছে। তাহাকে বঞ্চিত করিবে, কি করিবে না?

সহসা কনকের মনে পড়িয়া গেল সুনন্দকে লেখা চিঠি। তখন বালিকা-সাধারণের কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখানো যায় এই ভাবিয়া কনক কাপুরুষের মতো ঘর ছাড়িয়া পলাইল।

শ্রীলীলাময় রায়

কালবৈশাখী

শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্ন্যাল এম-এ

বসন্তের আনন্দের অনাহত সঙ্গীতঝঙ্কার
গেছে গেছে থামি',
ধরণীর কেন্দ্র হ'তে অজস্র সে সৌরভসম্ভার
কোথা গেছে নামি' ?
বনে বনে প্রসূনের অপরূপ রূপের উৎসব,
অতন্দ্র রাগিণী
মিলায়েছে ; আজি ধরা নিঃশেষিয়া সকল বৈভব
যেন বিবাগিনী !
ভ্রমরগুঞ্জন ক্ষান্ত, তৃণে পর্ণে বর্ণসমারোহ
আজি তার শেষ !
রোমাঞ্চিত বসুন্ধরা নাহি আনে স্বপ্নের সম্মোহ
সুষুপ্তির লেশ।
রূপে রসে স্বাদে গন্ধে ইন্দ্রিয়ের বিভ্রমবিলাস
লুপ্ত বহুক্ষণ,
নভোঙ্গনে দিগঙ্গনা ভুলিয়াছে নৃত্যের উল্লাস
কটাক্ষ-ঈক্ষণ !
নিঃসীম সে নীলিমার বেণীলগ্ন মাণিক্যের রুচি
মগ্ন মনে হয় ;
জ্যোছনার মঞ্জুহাসি, মধূৎসব সব গেছে মুছি'
এ কি পরিচয় !
জানা হ'তে অজানার রূপ হ'তে অরূপে সঞ্চরি'
কোথা সে ইঙ্গিত ?
সিন্ধুবক্ষে মণিকক্ষে অলক্ষিতে গাহে না সুন্দরী
রহস্য-সঙ্গীত।
নিখিলের মর্ম্মকোষে লীলাপদ্ম আছিল যা' ফুটে'
অপূর্ব্ব সৌরভে,
রেণু তার দিগ্বিদিকে বিস্তারিয়া গেল রন্ধ্র টুটে'
অতি অগৌরবে !

গেছে মায়া আলোছায়া, জাগরণী এসেছে চঞ্চল
উন্মত্ত উল্লাসে,
বিবাগিনী বৈশাখীর ধূলিকীর্ণ গৈরিক অঞ্চল
ভাসে ঘনাকাশে !
ঘন দোলে এলোকেশ ; স্ফুরে নেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ
চকিত চমকে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীররবে জ্বলে হুহু অতৃপ্তির দাহ
ঝলকে ঝলকে !
শুষ্ক পাংশু পুষ্পপত্র, জীর্ণ যাহা পঙ্গু ও ভঙ্গুর
হোক্ অবসান !
যৌবনের জয়গীতে জীবনের নির্ব্বেদ পাণ্ডুর
লভুক নির্ব্বাণ !
বৈরাগিণী বৈশাখীর লীলোদ্বেল নটভূমি 'পরে
এস তুমি নর,
প্রেমের পাবন-শিখা জ্বালাইয়া ধর স্থিরকরে
প্রদীপ্ত ভাস্বর !
আবেশহিল্লোলে আর দুলিও না বিলাসপ্রবাহে
মিথ্যা মায়া সৃজি',
নবনব কর্ম্মমাঝে দ্বিগুণিত নূতন উৎসাহে
সত্যে লহ খুঁজি' !
হৃদয়ের শঙ্খমুখে আঁকি' দাও, হে কালবৈশাখি,
প্রকাণ্ড চুম্বন,
বাজুক অম্বুদরবে ভগ্ন হৃদি-কম্বু থাকি' থাকি'
ঝনন-রণন্ !
মৃত্যুক্ষীণ মিথ্যাদীন জীবনের জড়তার জ্বর
কর কর ক্ষয়,
অমৃতের পাত্রখানি ধর ঊর্দ্ধে—ছায়াভীত নর
লভুক অভয় !

শ্রীবিনায়ক সান্ন্যাল

পাঠরতা

বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

বাঙলার পল্লীগান

মৌলভী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এম-এ

আমরা অতি আগ্রহসহকারে বাঙলার পল্লী হইতে যে গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেন না নিজের জিনিষের প্রতি মমত্ববোধে লোক ন্যায়বিচার করিতে পারে না। কিন্তু তবু এই স্থানে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে এই গানগুলির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি যাহা বাহিরের পাঠক বা দর্শকের অনভ্যস্ত চক্ষে সহজে সহসা ধরা পড়িবে না।

প্রথমে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই গানগুলি সংগ্রহ করিতে সুরু করি। কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে Percy's Reliquesএর খুব প্রশংসাবাদ দেখিতে পাই, এবং রাজসাহী কলেজের পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়, এম-এ, আই-ই-এস মহোদয় একদিন প্রকাশ্য সাহিত্যসভায় আমার প্রচেষ্টার যৎপরোনাস্তি আন্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার ফলে আমার হৃদয়ে বাঙলার পল্লীগান সংগ্রহ করিবার বাসনা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

কর্ত্তব্যসম্পাদনের অবসরকালে যে সময়টুকু আমি পাইতাম তখনই উহা পল্লীগান-সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিতাম। এক কথায় পল্লীগান-সংগ্রহ আমার ভয়ানক রোগের মত দাঁড়াইয়া যায়।

সাধারণতঃ বৈরাগী ও মুসলমান নিরক্ষর চাষীদের নিকট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। রাজসাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতে এই গানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই সংগ্রহে লালন ফকিরের অনেকগুলি গান রহিয়াছে। লালনের বাড়ী নদীয়া জেলায়। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার শিষ্যেরা সূফী দরবেশের মত চক্রাকারে বৈঠকে বসে; তৎপরে তাহারা গান সুরু করে।

গানের নানাপ্রকার ধারা আছে। সাধারণতঃ চক্রাকারে 'ভজন' গান করে। ভজন-গান গাহিতে গাহিতে তাহারা তন্ময় হইয়া যায়। এই গানগুলিকে সাধারণতঃ দেহতত্ব বা 'শব্দ'-গান বলে। কোথাও কোথাও এই গানকে 'মারেফাত' গান কহে। এই সকল গানে অনেক সূফী পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন কোন গানে আবার সূফী ও হিন্দু পারিভাষিক শব্দও পাওয়া যায়। এই সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় এককালে উত্তরভারতের মত আমাদের বাঙলা দেশেও কবীর, দাদুর জন্ম হইয়াছিল। এই ধারাটির সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাই না। উহা হারাইয়া গিয়াছে বা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত লোকসঙ্গীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। লোকসঙ্গীতের মূল্য এই স্থানে অতীব উচ্চে। আমাদের মধ্যে কে এই ছিন্ন যোগ-সূত্রের যোগাযোগ-স্থাপনে অগ্রসর হইবেন?

কবি শশাঙ্কমোহন বলিতেন, "আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকিরের মধ্যে অন্তরঙ্গ মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে।" সত্যই পাগলে পাগলে মিলন ঘটে।

এই সকল গানেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোথাও বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। এগুলি যেন অন্ধকার রাত্রের রজনীগন্ধার ন্যায় রাজনৈতিক পতন ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া আপনার অমল সৌন্দর্য্য বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। উহাতে এতটুকু কলুষ লাগে নাই।

উত্তরভারতের কবীর ও দাদু প্রভৃতি সাধুর হিন্দী রচনাগুলির মধ্যে যে প্রকার উদারতা ও আন্তরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই গানগুলির মধ্যে তাহার অভাব নাই।

ভজন-গান গীতিকবিতা; গীতিকবিতা-জাতীয় গান আবার নানাপ্রকার। বাউল ও ফকিরেরা যখন নূতন দুই-দল একস্থানে সমাগত হয় তখন তাহারা নিজেদের দলের

গুরুকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য গানের উপরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দুর্ব্বোধ্য প্রশ্ন ও হেঁয়ালীচ্ছলে আক্রমণ করে। যাহারা ঐ গানের জওয়াব দিতে পারে তাহাদের সঙ্গে আবার গানের পাল্লা হয়। উত্তরোত্তর ঐ গানের পাল্লা বেশী হইতে থাকে। এমনও শুনা যায় যে সারারাত্রি শুধু উত্তর-প্রত্যুত্তরের গান করিতে শেষ হইয়া যায়। আমাদের নিকট যে-সকল গান দুর্ব্বোধ্য, উহার জোড়া-গান একসঙ্গে শুনিতে পাইলে তদ্রূপ হইত না। প্রত্যেক হেঁয়ালী-গানের জোড়া আছে।

গীতিকবিতা-জাতীয় অন্য গান আছে—তাহার সহিত তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এই গান সাধারণতঃ ধুয়া,-বারোমাসী, জারী, শারী প্রভৃতি নামে অভিহিত। ধুয়া-গানের আবার প্রকারভেদ আছে—রসের ধুয়া, চাপান ধুয়া প্রভৃতি। জারীগান সাধারণতঃ কারবলায় নিহত শহিদকে লইয়া রচিত। এই গান অত্যন্ত করুণ। এই গান শ্রবণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব। জারী পার্সী শব্দ, অর্থ ক্রন্দন করা। শারীগানে অশ্লীলতা রহিয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে রুচিবিকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ধর্ম্মমঙ্গলে যে সামাজিক ধারার পরিচয় পাই শারীগানের মধ্যে তাহার শেষ রেশ রহিয়াছে। শারীগান নৌকা-বাইচের সময় গীত হয়।

জাগগানও গীতিকবিতা-পর্য্যায়ের। জাগগান সাধারণতঃ রাজসাহী, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পৌষ-মাসে গীত হয়। জাগগানের অনুরূপ গান ঢাকা, নোয়াখালীতে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ঐ সকল জেলায় ভ্রমণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

ভাসান-গান এখন উঠিয়া যাইতেছে। বহুদিন হইল কোথাও এইপ্রকার গান কোন পল্লীতে শুনি নাই। যে সকল ভাসান-গান বাঙলার পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলে প্রাচীন মনসামঙ্গলের গানের সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধা হইত।

ভাসানের অনুরূপ গান রঙ্গপুর জেলায় প্রচলিত আছে, উহা বিরা-গান নামে কথিত, খাজা খেজেরকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

কবিগান এককালে বাঙলার খুব প্রিয় ছিল। হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসী একত্রে একভাবে উহার রস উপভোগ করিত। এখন আর সে ভাব নাই। কবিগান আমরা সংগ্রহ করি নাই,—উহা সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ও শ্রম-সাপেক্ষ। কেহ ইহা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিলে যশ পাইবেন নিঃসন্দেহ এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত দিক আলোতে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। জনৈক গ্রন্থকার কবিগানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ।

কবিগান কোন্ সময় উৎপত্তিলাভ করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে আমাদের মনে হয় ইহা মুসলমান কবিদের মুশা'য়ারার অনুকরণে সৃষ্ট। মুশা'য়ারায় পারস্য-কবিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ রচনার পরীক্ষা হয়। সংকীর্ত্তনের অধিক প্রচলনের জন্য কবিগান ও অন্যান্য পল্লীগান উত্তরকালে কোণঠেসা হইয়া পড়ে।

রামায়ণ এক সময়ে পল্লীগান-পর্য্যায়ের সাহিত্য ছিল। কালক্রমে উহা সাহিত্যপদবী লাভ করিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই রামায়ণ-আখ্যায়িকার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রাজসাহী জেলার চলনবিল অঞ্চলে এখনও পদ্মপুরাণ গীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। রঙ্গপুর জেলায় জঙ্গনামা প্রভৃতি কিতাব এখনও গীত হয়। আসামে এখনও রামায়ণ বাউল-পর্য্যায়ের ভিক্ষুকগণ গাহিয়া থাকে এবং ডিব্রুগড় অঞ্চলে ঐ গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

আমাদের প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থগুলিই যে গীত হইত এবং আমার যতদূর মনে হয় যে ঐ-সকল গ্রন্থ পল্লীগান-পর্য্যায়ের। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন বিদ্যাসুন্দরের মাল-মসলা ভারতচন্দ্র পল্লীগাথা বা গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় পল্লীগান কি না তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা কিন্তু বাউলের লক্ষণ বলিতে যাইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন চর্য্যাভাব বাউলের অন্যতম লক্ষণ। চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ের

পর গোপীনাথের গান, ময়নামতীর গান, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; এমন কি বাঙলা সাহিত্যের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। সার গ্রীয়ারসনের কল্যাণে এই ময়নামতীর গান দেশবিদেশে আদৃত হইয়াছে এবং বাঙালীরা উহার যথার্থ মূল্যনিরূপণ সমর্থ হইয়াছেন।

বাঙলার অন্যতম সম্পদ ডাক ও খনার বচন গ্রাম্যগান-পর্য্যায়ের জিনিষ না হইলেও উহা যে ছড়াজাতীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এইসকল হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি পল্লীগান ও ছড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরভারতের কাজরী-জাতীয় গান আমাদের দেশে বোধ হয় নাই। তবে মেয়েরা বিবাহাদির সময় গান গাহিয়া থাকে। ঐ ধরণের কতকগুলি গান এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। কাজরী-গান গাহিয়া হিন্দুস্থানের মেয়েরা যে অনাবিল আনন্দ পাইয়া থাকে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাঁহাদের মেয়েলীগান গাহিয়া তদপেক্ষা কম আনন্দ পান বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রাম্য মেয়েলীগান হিন্দুদের মধ্যে একপ্রকার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। নিরক্ষর মুসলমান চাষী-গৃহস্থের ঘরে এখনও বিবাহের সময় এই গান মাঝে মাঝে শ্রুত হয়। তবে দিনদিন এই প্রচলন রহিত হইয়া যাইতেছে। রঙ্গপুর জেলায় বিবাহের সময় নিরক্ষর মুসলমান চাষী-গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত গান বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে 'ফুরুল' ডুবায়। উহা বড়ই আনন্দজনক।

পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইঁটাকুমারের পূজা হয়। ইহা সাধারণতঃ অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে বালক ও বালিকারা এই পূজা করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লোক-সাহিত্যে এই জাতীয় কতগুলি গান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈবর্ত্ত, জালিক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পাটঠাকুরের পূজার রীতি আছে; উহার সঙ্গে গান গীত হয়। জাগগানে যেমন ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া গান করে এই পাটঠাকুরের গানেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। এই গানে নৃত্যের প্রচলন আছে—উহা সাদাসিধে নাচ। মালদহের গম্ভীরা-গান আমরা শুনি নাই, উহাতে নাচ আছে কিনা জানি না। ইংরাজদের Folk-danceজাতীয় জিনিষ আমাদের বাঙলা দেশে আছে বলিয়া আমার মনে হয়, কিন্তু ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। Folk-dance এবং Folk-song অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

গাজীর গানে আসল গায়েন নৃত্য করে, কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্য প্রচলিত আছে। ধুয়া, বারোমাস্যা প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যের কোন যোগ নাই। শারীগানের সঙ্গে অঙ্গচালনা হয়, তবে উহা নৃত্যপর্য্যায়ের নহে।

ময়মনসিংহের ঘাটুগানে গায়েন বালক নৃত্য করে বলিয়া শুনিয়াছি। আমরা কোন ঘাটুগান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ময়নসিংহে যে গাথাজাতীয় গান গীত হয় উহা গাজীর-গানের অনুরূপ। আমরা নিজেরা ময়মনসিংহের গান গাহিতে শুনিতে পারি নাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাথা-সংগ্রাহক বন্ধুবর কবি জসীমুদ্দিন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং আমার অভিন্নহৃদয় 'জরীন কলম' ঐ গান গাহিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি অতীব মূল্যবান চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের গান গাহিবার রীতির তুলনা-মূলক অধ্যয়নের জন্য উহা অত্যন্ত মূল্যবান।

ময়মনসিংহের গাথাজাতীয় গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াও এই কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে উহার মধ্যে যে রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা আমাদের অত্যুন্নত নাগরিক-সাহিত্যের নীচে নহে। ময়মনসিংহের গাথা-জাতীয় গানে সামাজিক, ধার্ম্মিক নানাবিধ রীতিআচার-অনুষ্ঠানের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। গাথাজাতীয় গানে অধিক লোকের প্রয়োজন। এই জন্য ইহা সমধিক প্রচার-লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যুত গীতিকবিতা-জাতীয় গানে বেশী লোক লাগে না। ভাদ্রের ভরাগাঙে মাঝি নৌকার হাল ধরিয়া আপনার মনে যেমন "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না" গাহিতে পারে, আবার বাউল ঘরের কোণেও উহা অনায়াসে গাহিতে পারে।

উহার আনুষঙ্গিক কোন বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন করে না। বাদ্যযন্ত্র হইলেও চলে না হইলেও চলে। কিন্তু গাথা-জাতীয় গানে বাদ্য বিশেষ প্রয়োজন।

আমার হাতের কাছে কোন বহি নাই, সুদূর মফঃস্বলে পড়িয়া রহিয়াছি। পৃথিবীর অন্যান্যজাতীর পল্লীগান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না; বারান্তরে পারি ত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

অনির্ব্বচনীয়

শ্রীযুক্ত প্রণব রায়

বলেছিনু 'ভালোবাসি'—শুনেছিলে ওই ছোট কথা,
শুনিলে না যা কহিনু মৌনভাষে অন্তরালে তার?
হের নাই মধ্যরাত্রে আকাশের দিগন্ত-বিস্তার,
বাতায়ন-পথে তুমি হেরিয়াছ শুধু সঙ্কীর্ণতা!
দক্ষিণবায়ুর মুখে প্রণয়ের যে-ই মুখরতা
গুঞ্জরে চন্দ্রিকা-রাত্রে কানে কানে মালতীলতার,
বলিতে চাহিনি তাহা,—বিরাজিছে অন্তরে আমার
অমাবস্যা-নিশীথের সুবিস্তীর্ণ বাঙ্ময় স্তব্ধতা!

তোমারে স্থাপিনু আমি মহীয়সী অপরূপ রূপে
মানস-মন্দিরতলে; সুরভিত ধেয়ানের ধূপে
তোমারি প্রতিমা ঘেরি' করি নিত্য পবিত্র অর্চ্চনা!
অতল অন্তরতলে ডুবে' গেছে প্রগল্‌ভতা সব,
মৌন হ'ল তাই মোর শব্দময় পূজার বন্দনা,—
মরম-মুরজে বাজে বাণীহীন প্রেম-মন্ত্রস্তব!

সঙ্গীতের জন্ম-কথা

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন

জগৎ সঙ্গীতময় ; বাতাসের মরমর ধ্বনিতে, নদীর কলকল তানে, পাখীর কূজনে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে ; প্রকৃতি সঙ্গীতময়ী ;—এই সব কিন্তু ভাবুকের কথা। ভাবুকগণ আরও কত-কিছু বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা ভাবুকের কথাই হউক বা কবির ভাবই হউক একটু মনোযোগ-সহকারে যেদিকেই লক্ষ্য করা যায় দেখা যায় যে এই জগৎ বাস্তবিকই গীত, ছন্দ ও তালে পরিপূর্ণ। তাহারই কথা কতক লিখিতে চেষ্টা করিব।

শব্দময় এই জগৎ। মানুষের কথায় ধ্বনি, পাখীর ডাকে ধ্বনি, বাতাসের ধ্বনি, গাড়ী-ঘোড়া চলার ধ্বনি, রেলগাড়ীর ধ্বনি ;—সর্ব্বত্রই ধ্বনি। সুরগুলিও এক একটা ধ্বনি। একটা খাদ-ধ্বনি, একটা বা চড়া-ধ্বনি। খাদ 'সা' একটা খাদ-ধ্বনি, চড়া 'সা' একটা চড়া-ধ্বনি। পৃথিবীতে অসংখ্য অসংখ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে সাতটি সুর বাহির হইয়াছে। এই সাতটি সুরই সঙ্গীতের প্রধান উপাদান। যাহাই হউক, ধ্বনি হইতেই সুরগুলির সৃষ্টি। ধ্বনি যদি না থাকিত আমরা সঙ্গীত পাইতাম না। এইজন্যই ধ্বনি বা নাদই সঙ্গীতের মূল।

ধ্বনি হইতে কথা এবং বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা যে কথা বলি তাহা কি ? মনের ভাব অন্যকে বুঝাইবার জন্য আমরা কতকগুলি ধ্বনিকে নানাভাবে বিন্যাস করিয়া যখন মুখে বলি তখনই তাহাকে আমরা কথা নাম দিয়া থাকি ; অতএব শব্দ-বিন্যাসই কথা। বাঙালী এক-প্রকার শব্দবিন্যাস করিয়া কথা বলে, উড়িষ্যাবাসী অন্য আর-এক প্রকার শব্দবিন্যাস করিয়া কথা বলে, বা ইংরাজ আর-এক প্রকার শব্দবিন্যাস করিয়া কথা বলে। যাহারা যে ধ্বনিবিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত তাহারা তাহা বুঝিতে পারে, অন্যেরা পারে না। 'ক' বলিতে 'ক' ও 'অ' এই দুইটি ধ্বনির সমষ্টিকে বুঝায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ধ্বনি হইতেই বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমে মানুষ কথা বলিতে শিখিয়াছে এবং তাহার অনেক পরে কথাগুলি অক্ষরে লিখিতে সক্ষম হইয়াছে। পাহাড়ী জাতি লিখিতে বা পড়িতে জানে না, কথা বলিয়া মনের ভাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি না থাকিলে একজন আর একজনকে মনের ভাব বুঝাইতে পারে না। দূরদেশে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে শব্দ হইতে উৎপন্ন বর্ণগুলি লিখিয়া পাঠাইতে হয়। প্রথমে মনের ভাব বুঝাইবার জন্য ধ্বনি হইতে কথার সৃষ্টি এবং তাহার অনেক অনেক পরে কথার ধ্বনি হইতে বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ধ্বনি হইতেই কথা ও বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণমালা হইতে ভাষার সৃষ্টি। বই, পুঁথি, পত্রিকা, উপন্যাস, গল্পের বই ইত্যাদি সমস্তই বর্ণমালা ও ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় আমরা যে বই পড়িয়া জ্ঞান অর্জ্জন করি তাহারও মূলে ধ্বনি। ধ্বনিই সব। এইজন্যই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবং
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরিঃ।

অর্থাৎ, নাদ (ধ্বনি বা শব্দ) বিনা জ্ঞান অসম্ভব, নাদ বিনা মঙ্গল অসম্ভব। পরজ্যোতি নাদরূপ, স্বয়ং হরি নাদরূপী।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"গানাৎ পরতরং নহি।" অর্থাৎ, সঙ্গীত হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। দেখা যায় যে সঙ্গীত মানুষের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে—পশুপক্ষীকেও ঠিক তেমনি মুগ্ধ করিতে পারে। আমরা চোখের সম্মুখে দেখি সাপুড়িয়া তাহার বাঁশী বাজাইয়া সাপের মত খল-প্রকৃতির প্রাণীকেও মুগ্ধ করে। পুরাকালে বাঁশী বাজাইয়া হরিণ কাছে আনিয়া তাহাকে বধ করা হইত এবং কিংবদন্তী আছে যে মুনিঋষিগণ তপোবনে গান করিতেন আর বনের পশুপক্ষী এমন কি হিংস্রপশুগুলিও হিংসা ভুলিয়া কাছে আসিয়া গান শুনিত। অনেকে বলিতে পারেন সেইকালের

মুনিঋষিগণ যোগবলে হিংস্রপশু বশ করিতে পারিতেন, এখন তাহা হয় না কারণ সে যোগবল আর নাই। এখানে লণ্ডন চিড়িয়াখানার একটা ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া, কলিকালেও যে হিংস্রজন্তু সুর শুনিয়া মোহিত হয়, তাহা দেখাইতেছি।

"Music has great influence upon the wild animal of the forest too. An Orchestra consisting of two violins, an olive, a flute and a mouth-organ, it is stated, made a tour of the manogerie of London Zoo and the result was illuminating. The Rhinoceros who was found to have no ear for music, attempted to charge the Orchestra. The "moonlight sonota" and "Tea for the two" alike roused his ire. The sea-lions on the otherhand were delighted with everything put before them with the exception of Jazz. They were playing in the pond; but rose to the surface as soon as the Orchestra struck up. They remained standing waist high out of the water until the last strain had died away."

(Amrita Bazar Patrika, Mofussil edition, dated 21. 6. 1929, page 10—A musical soiree.)

মানুষকে সমস্ত কলাবিদ্যাই মুগ্ধ করে, কিন্তু সকল জীব-জন্তু পশু-পক্ষীকে মুগ্ধ করিতে আর কোন কলাবিদ্যাই পারে না। সেইজন্যই সঙ্গীতবিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্যদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে বিশেষ এক স্বর-বিন্যাসে বিশেষ এক রোগ ভাল হয়। ঐ দেশের কয়েকটি হাসপাতালে এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা হইতে এই প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বর-বিন্যাস-বিশেষে যে বিশেষ বিশেষ স্পন্দন-তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা মানুষের স্নায়ু-মণ্ডলীতে এমন এক সূক্ষ্ম আন্দোলনের সৃষ্টি করে যে তাহাতেই রোগের উপশম হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে আমাদের চিন্তাধারা বায়ুমণ্ডলে এক এক প্রকার স্পন্দন-তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং ইহা দ্বারা আমরা কিছু একটা করিতে সক্ষমও হই। যেমন কোন মৃত-ব্যক্তির কথা চিন্তা করিয়া সেই ব্যক্তির প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ আমরা পাই। এইরূপে আমরা যদি একমনে মল্লার রাগিণী গাহিতে থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার কথা চিন্তা করিতে থাকি তবে গীতের সুর-লহরীতে বায়ু-মণ্ডলে যে কম্পন-তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে ও আমাদের বর্ষার চিন্তাধারায় যে স্পন্দন-তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আমরা বৃষ্টি নামাইতে সক্ষম হইতে পারি। ইহা হইতে আরও ধারণা হয় যে রাগ-রাগিণীগুলি গাহিবার যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, যেমন—ললিত উষায়, বেহাগ দ্বিপ্রহর রাত্রে—তাহা ঠিক ঠিক সময়-অনুযায়ী গাহিলে হয়ত আমাদের সেইরূপ সময়-অনুযায়ী ভাব আসিতে পারে; ব্যোমরাজ্যের স্পন্দন-তরঙ্গে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলিতে যে আন্দোলন হইবে তাহাতে আমাদের আন্তরিক সুখ অনুভব হইতে পারে ও সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

সঙ্গীতের চরমলক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম-লাভ। ভাবুকের ভাষায় সঙ্গীতের অর্থ—ঘণ্টারূপ লয়তাল, ধূপধুনা-রূপ সুর ও গীত-অলঙ্কার লইয়া আরতি ও ভগবৎ-প্রেমে আত্মসমর্পণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"Drama and Music are by themselves religion; any song, love song or any song, nevermind, if one's whole soul is in that song he attains salvation just by that; nothing else he has to do. If a man's soul is in that his soul gets salvation."

একবার নাকি সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গুরু হরিদাস গোস্বামীর গান শুনিতে যান। ত্যাগী স্বামীজির গান শুনিয়া সম্রাট আকবর নাকি তন্ময় হইয়া তানসেনকে বলিয়াছিলেন, "তানসেন! তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গান কর, আর স্বামীজি গান করেন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের জন্য; ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য; এই জন্যই তাঁহার গান এত মধুর।" তানপুরার একটা তারের সঙ্গে যদি আর একটা তার একসুরে বাঁধা থাকে তবে একটিতে আঘাত করিলেই যেমন

অপরটি কাঁপিয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের হৃদয়-তার যদি সেই পরমব্রহ্মের সহিত একসুরে বাঁধিতে পারি তবে তাঁহার হৃদয়-তার কাঁপিয়া উঠিবে এবং তাঁহাকে আমরা পাইতে পারিব। আর যদি তাঁহার সহিত একসুরে আমাদের হৃদয়-তার বাঁধিতে না পারি তবে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে না। সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই তাহা করা সহজ এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন সাধক তাহা পারিয়াও ছিলেন। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে "গানাৎ পরতরং নহি।"

বৈদ্যুতিক টেবিল-পাখা যখন জোরে ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় 'সা' সুর একটানা ভাবে বাজিতেছে ও সঙ্গে-সঙ্গে যেন উদারার 'পা' পর্য্যন্ত অবরোহণ করিয়া 'সা' সুরে ফিরিয়া যাইতেছে এবং 'সা' হইতে আবার আরোহণ করিয়া তারার 'সা' সুর পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় তথা হইতে অবরোহণ করিয়া 'সা' সুরে মিশিতেছে। যেন 'সা' সুরের চারিদিকে ঘুরিয়া অন্যান্য সুরগুলি নাচিতেছে বা আরতি করিতেছে। এই পাখার-সুরে কণ্ঠ-সুর মিলাইয়াও গান করা চলে। এই একটা সুর হইলেই সব কয়টা সুর বাহির করা যায়। 'সা'ই মূল সুর। এই 'সা' হইতেই সবগুলি সুরের উৎপত্তি। একতারাতে একটা সুর—সেই মূল 'সা' সুর বাঁধা থাকে। এই জন্যই একতারা নিয়া গান করা যায়। গায়কের কণ্ঠস্বরও এই 'সা'কে প্রদক্ষিণ করিয়া আরতি করে। এই একতারার সঙ্গে কণ্ঠসুর মিলাইয়াই বাউলগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গানের ভাব-সম্পদ ও মন উৎসর্গ করিয়া পরমতৃপ্তি লাভ করেন। একতারার সুর ও ব্রহ্মের সুর একই, সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিলেই তৃপ্তি। শাস্ত্রকারগণ বলেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বং। নাদই ব্রহ্ম। ওঁই ব্রহ্ম। অতএব ওঁই নাদ। নাদের আদিই ওঁ; সঙ্গীতের আদিসুরই ওঁ।

ওঁ শব্দ আমরা সুরে লিখিতে এইরূপ এইরূপ লিখিব। যেমন—প ম্‌া সা। ইহা তানপুরার পঞ্চম সুর হইতে

অ উ ম

গমক-সহকারে মধ্যম স্পর্শ করিয়া মীড় দিয়া 'সা' সুরে অবস্থান করে; 'সা'তেই পূর্ণস্থিতি। যেন এই 'সা' সুরেই সমস্ত সমাপ্তি। ওঁ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত কি তাহা অতিরিক্ত জেলা-মাজিষ্ট্রেট সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয়ের "সরল যোটকবিচার শিক্ষক" নামক পুস্তিকা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"মন্ত্রতত্ত্বের অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের মন্ত্রগুলির ন্যায় অন্য কোন ভাষার মন্ত্রই সজীব ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের উচ্চারিত শব্দগুলির ধ্বনি দ্বারা Etherএ (আকাশে) Vibrations (কম্পন-তরঙ্গ) খেলিতে থাকে এবং সেই সকল তরঙ্গাভিঘাতেই বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়।............আমাদের ওঁ-এর বিশেষ শক্তি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের নিকটও প্রতিভাত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গুহ্যবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিত ষ্টোকার সাহেব (R. Dimsdale Stocker) তাঁহার 'Clairvoyance' (দিব্যচক্ষুঃ) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "Another mode of self-hypnotisation which often brings a little clairvoyance along with it, is the repitition of a certain *Mantram*—such as the sacred word *Om*—over and over again."—ইহার ভাবার্থ এই যে, ওঁ এই পবিত্র মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিলে অনেকসময় তন্ময় অবস্থা ও তৎসঙ্গে স্বল্পপরিমাণে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।" কেবল এক দিব্যদৃষ্টি লাভই সমস্ত নয়। ওঁ সুর বারম্বার উচ্চারণ করিলে আমরা তাঁহার (পরমপিতার) সুরে আমাদের সুর বাঁধিতে পারি ও ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। এইজন্যই ওঁ সঙ্গীতের আদিসুর।

ওঁ সুরও আমার প্রকৃতি হইতেই পাইয়াছি। পৃথিবীর অসংখ্য ধ্বনি হইতে এই ওঁ-এর ধ্বনি কি ভাবে আসিল? ওঁ-এর সুর একটা মীড় প ম্‌া সা। মীড়-গমক না হইলে সঙ্গীত প্রাণমাতান হয় না। দুই কানের উপর হাতে চাপ দিয়া দুই হাত আস্তে আস্তে খুলিলে যে মধুর ধ্বনি হয় তাহাও একটা মীড়—'প ম্‌া সা' র মত। মীড় এইভাবেই প্রকৃতি হইতে আমরা পাইয়াছি। কানের এইরূপ ধ্বনি

করিলে মনে হয় যেন প্রকৃতিদেবী ওঁ সুর উচ্চারণ করিবার জন্য বাতাসের মধ্য হইতে কানে কানে চুপি চুপি বলিয়া যাইতেছেন। ছেলেবেলায় আমরা এইভাবে বালোচিত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অনেক শব্দই আমরা শুনি কিন্তু এইরূপ মধুর ধ্বনির ন্যায় অন্য ধ্বনির অনুকরণ করিতে চাই না কেন? একটা কোকিল কুহু-কুহু করিলে বালক-বালিকাগণ কুহু-কুহু স্বরে চীৎকার করে। তাহাতে কোকিল রাগিয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া থাকে। ছেলে-মেয়েরা কুহু-কুহু করিয়া আনন্দ পায়। অথচ কাকের কা-কা শব্দকে ত কেহ অনুকরণ করিতে চায় না। কাক রাগাইবার কাহারও অনুরাগ দেখা যায় না। কাকের স্বর মিষ্ট নয় বলিয়াই কেহ ইহার সুরের অনুকরণ করে না। মধুর ধ্বনি শুনিলে মানুষ তাহা স্বভাবতঃই অনুকরণ করিতে চায়, কারণ ইহাতে আনন্দ পায়।

আমরা রাগরাগিণীর মধ্যে অনেক স্থানে নানাবিধ পশু-পক্ষীর ধ্বনির ন্যায় অনেক ধ্বনি ব্যবহার করি। তাহার কয়েকটির সম্বন্ধে লিখিতেছি। বিড়ালের ডাকে যেটুকু মিষ্টত্ব আছে তাহাকেও আমরা একটা সুরের স্বর-বিন্যাসে ব্যবহার করিতে পারি। ম্যাঁও ধ্বনি একটা মীড়। সব সময়ে যে বিড়াল একসুরে ডাকে তাহা নয়। বিড়ালের কয়েকটি মীড়ই আছে। সা ঋা সা, জ্ঞা গা বা গা ঋা সা ইত্যাদি মীড় বিড়ালের ডাকে পাওয়া যায়। পুরিয়া, মারওয়া ও জয়ন্ত রাগিণীর সা গা ঋা সা, সা গা জ্ঞা গা, গা ঋা সা ।, গা জ্ঞা ধা র্সা, র্সা না ঋ্ঁা র্সা, র্সা না ধা জ্ঞা গা, গা ঋা সা । ইত্যাদি স্বর-বিন্যাসের মীড়গুলিতে ম্যাঁও উচ্চারণ করিলে বা সেতারে বাজাইলে মনে হইবে যেন বিড়ালঠাকুরাণী গিন্নীমার থালার কাছে পুচ্ছবিস্তার করিয়া বসিয়া মাছভাজার দিকে চাহিয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছে।

দরবারী কানাড়ার খাদের সুর-বিন্যাসে যেমন সা । । ণ্‌ সা রা । সা । ণ্‌ সা রা সা ণ্‌ দ্‌ ণ্‌ ণ্‌ প্‌ ম্‌ প্‌ ণদ্‌ ণদ্‌ ণদ্‌ ণ্‌ সা ।, প্রভৃতি বিন্যাসের চিহ্নিত অংশগুলি যখন গম্ভীর-কণ্ঠযুক্ত ধ্রুপদ-গায়কের মুখে কানাড়ার আলাপে শুনি তখন মনে হয় যেন ক্ষুধায় আত্মহারা হইয়া চিড়িয়াখানার বাঘ করুণস্বরে গোঙাই-তেছে। খেয়ালের তানে আমরা অজের কোমল স্বর শুনিতে পাই। গানের আসরে খেয়াল-গায়কদের পূরবী-রাগিণীর ন্‌সা গা পা । পা জ্ঞা । গা, গা জ্ঞা ধা পা জ্ঞা গা, গা মা গা ঋা । সা-চিহ্নিত স্থানের ধ্বনি ও ছাগের কোমল ধ্বনি প্রায় একপ্রকার। জন্তুদের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিলে আমাদের গানের সুরের সঙ্গে উহাদের ডাকের সুরের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে পাখীর সুরেই খুব বেশী মিল পাওয়া যায়। একটা ঘুঘু যখন ডাকে তখন সেই করুণ সুরে আমরা পাই পাহাড়ী-রাগিণীর আভাষ এবং সুরফাক্তা তালের ঝোঁক। যেমন

১	০	২	৩	
ন্‌া সা	রা ।	গা সা	গা সা	গা সা

ন্‌া সা রা । পা ধা গা । পা মা গা । গা সা । । গা সা । । ইত্যাদি পাহাড়ীর করুণ সুর। নামটি যে কেন পাহাড়ী হইল তাহার সম্বন্ধেও মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ঘুঘুর ডাকের অনুকরণে কোন পাহাড়ী হয় ত একটা স্বর-বিন্যাস সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহা শুনিয়া কোন গায়ক হয় ত তাহাকে কতক মার্জ্জিত করিয়া গীত করেন ও স্বর-বিন্যাসটিকে পাহাড়ী নামে অভিহিত করেন, এইরূপ চিন্তা করা কি অসঙ্গত হইবে?

'বউ কথা কও' পাখী যাহা গান করে তাহা এই—

প । মা	পা মা ।	
বউ ০ ক	থা কও ০	

এইটুকু আমরা সবসময় স্বর-বিন্যাসে ব্যবহার করি। যেমন—র্সনা র্সনা ধা, নধা নধা পা, ধপা ধপা মা, পমা পমা গা, মগা মগা রা, গরা গরা সা প্রভৃতি। প্রথমশিক্ষার্থীকে এইরূপ একটা স্বরসাধনপ্রণালী কণ্ঠের জড়তা নষ্ট হওয়ার জন্য ও সুরগুলি আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বরসাধনপ্রণালীর চিহ্নিত অংশগুলির ধ্বনির সঙ্গে 'বউ কথা কও'এর ধ্বনির সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়।

পাপিয়া শরৎকালের শেষরাত্রে পিউ-পিউ করিয়া ডাকে। ভাবুকগণ বিছানায় শুইয়া থাকিয়াই কত আনন্দ অনুভব করেন, সাধারণ লোক ইহাকে গ্রাহ্যই করে না। 'পিউ' শব্দে আমরা একটা মীড়ের আভাস পাই। তাহা

মা । । সা । ।
পি উ

জলপিপি যেরূপ শব্দ করিয়া ডাকে তাহা সগা সা সগা সা। হিন্দোল রাগের সা । নধা না সা । গা সা, গা হ্মা ধা সা, না ধা হ্মা গা । গা সা নধা না সা গা সা ইত্যাদি স্বরবিন্যাসের গা সা ধ্বনি ও জলপিপির ডাকের ধ্বনি একরূপ। যাঁহারা জলা-জায়গায় বিল-ঝিলের ধারে বাস করিয়াছেন তাঁহারা হয় ত বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ নানা পশুপক্ষীর নানাবিধ ধ্বনির সঙ্গে আমাদের গানের ধ্বনির মিল পাওয়া যায়। খুঁজিলে আরও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত বাহির করা যায়। এই সব মধুর ধ্বনির অংশ গাঁথিয়াই আমাদের সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে।

পাখীর কূজন বাঁশীতে খুব সুন্দর ভাবে বাজান যায়। ওস্তাদ আফ্‌তাবদ্দিন খাঁর বাঁশী যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা হয় ত শুনিয়া থাকিবেন যে তিনি বাঁশীতে অনেক প্রকার পাখীর ডাক নানাভাবে বিন্যাস করিয়া বাঁশীর গতের তান-কর্ত্তবে, ঝালায় বা ঠোকে ব্যবহার করেন। ইহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। তিনি যখন সাধক শ্রীমৎ মনোমোহন স্বামীর আশ্রমে ৺কালীমাতার সাধন করিতেছিলেন তখন পাখীর ডাক শুনিয়া শুনিয়া বাঁশীতে তাহার অনুকরণ করিতে থাকেন। উত্তরকালে এই অনুকরণেই তিনি এক নূতন তান-কর্ত্তবের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে যে সঙ্গীতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা বিশ্বপ্রেমিক বাউল খাঁ সাহেব বাঁশীতে বাজাইয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাঁশীর সৃষ্টি যে কি ভাবে ও কবে হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত নহি। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন। তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে ইহার সৃষ্টি বহু যুগ পূর্ব্বে হইয়াছিল। অসভ্য জাতির কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক স্থানের অসভ্য জাতিরই বাঁশী আছে। অনেক অসভ্য জাতির অন্যপ্রকার যন্ত্রও আছে। কিন্তু অধিকাংশ অসভ্যদেরই বাঁশী ছাড়া অন্য কোন যন্ত্র নাই। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সঙ্গীত-আলোচনা করা ত অন্য যন্ত্র দিয়াও হয়, কিন্তু তাহারা প্রথমেই বাঁশী তৈয়ার করে কেন? অসভ্যগণ বনে-জঙ্গলে সকল সময়ই পশু-পক্ষীর নানাবিধ মধুর ধ্বনি শুনিয়া থাকে। মিষ্ট ধ্বনি শুনিবার প্রকৃতিগত যে একটা আকর্ষণ থাকে সেই আকর্ষণে পশু-পক্ষীর ডাকের অনুকরণ করিবার জন্যই, বোধ হয় অসভ্যগণ প্রথমে বাঁশী তৈয়ার করে। কারণ বাঁশীতে পাখীর ধ্বনি সুন্দর ভাবে বাজান সম্ভব হয়। সাঁওতালীরা বাঁশীতে নানাবিধ প্রাণীর ধ্বনি একত্র করিয়া একটানা একটা সুরের সৃষ্টি করে ও তাহাই অনবরত বাজাইয়া থাকে। সুসভ্য মানবজাতির আদিম পূর্ব্বপুরুষ অসভ্যগণও এইরূপ প্রথমে বাঁশী বাজাইত এবং এইরূপ অস্পষ্ট একটানা একসুরে সারা দিনরাত গান করিত। অসভ্যদের এইরূপ অস্পষ্ট গানের আস্তে-আস্তে পরিবর্ত্তন হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে আমরা বলিতে পারি যে, সব যন্ত্রের পূর্ব্বে বাঁশীর সৃষ্টি হইয়াছে।

তপোবনে মুনিঋষিগণ বেদ-গান করিতেন। প্রাকৃতিক মধুর ধ্বনিগুলি হইতে সেই সময়েই—সাতটি সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। পরে তাহা হইতে গীতের ক্রমবিকাশ হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর হইতে মধুরতর তান-কর্ত্তবের সৃষ্টি হইয়াছে ও এখনো হইতেছে। অসভ্য জাতি যেমন অস্পষ্ট ধ্বনি করিয়া কথা বলে সেইরূপ অস্পষ্ট ধ্বনি হইতেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের শ্রুতিমধুর ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশও এইরূপ।

আনন্দপ্রকাশ আমরা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বা চলিবার ভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি। বালকবালিকাগণ আনন্দিত হইলে লাফালাফি করিয়া তাহা প্রকাশ করে। এই অঙ্গভঙ্গী, চলিবার গতি বা লম্ফঝম্ফ একটা

সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত হইলেই তাহা নৃত্য হয়। অসভ্য-জাতিগণের মধ্যে নৃত্যের খুব প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের নৃত্য হইতে আধুনিক সভ্যজাতির নৃত্য অনেক সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও অধিকতর মনোরম। তাহাও সভ্যতার ফল। গীত বা নৃত্য তাল ছাড়া চলিতে পারে না। সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিকে বুঝায়। গীত, বাদ্য ও নৃত্য সবই আমরা প্রকৃতি হইতে পাইয়াছি। আমরা নিশ্বাস ফেলি তালে-তালে, হাঁটিও তালে-তালে। সূর্য্যের চারিধারে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে—তাহাও একটা নিয়মে, ছন্দে বা লয়ে-তালে। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় তাঁহার "সাকার ও নিরাকার" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমাদের প্রচলিত তালগুলির মধ্যে জীবদেহের গতিগুলি আশ্চর্য্যরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। খরগোসের (শশক) গতির মধ্যে ঝাঁপতালের, ঘুঘুর সুরের মধ্যে সুরফাক্তার, হৃদয়ের মাংসপেশীর মধ্যে ধামারের, মানবের গতির মধ্যে একতালার, হস্তীর গতির মধ্যে ঢিমা-তেতালার, ষট্‌পদ্ জীবের মধ্যে চৌতালের, সৌরজগতের গতির মধ্যে রুদ্রতালের, এইরূপ নানাবিধ তালের মধ্যে নানাবিধ গতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।" (সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা, ১৩৩৬ সন, বৈশাখ)

তাল বাজাইতে আমরা বাঁয়াতবলা বা পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার করি। পাখোয়াজ বা বাঁয়াতবলায় যে ধ্বনি করা হয় তাহাও আমরা এই প্রকৃতি হইতেই পাইয়াছি। পাখোয়াজের আওয়াজ গম্ভীরাত্মক। এবং আকাশের ঘনঘোর মেঘরাশির গুরুগম্ভীর নিনাদ এবং পাখোয়াজের ধ্বনি একপ্রকার।

প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ সাতটি সুর কোন্ কোন্ প্রাণীর কণ্ঠ-ধ্বনি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন—

ময়ূরের কণ্ঠস্বরে	ষড়জ	সা
বৃষের ,, ,,	ঋষভ	রে
ছাগের ,, ,,	গান্ধার	গা
বকের ,, ,,	মধ্যম	মা
কোকিলের,, ,,	পঞ্চম	পা
অশ্বের ,, ,,	ধৈবত	ধা
হস্তীর ,, ,,	নিষাদ	নি

কি হিসাবে যে তাঁহারা এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা জানি না; তবে ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে পশু-পক্ষীর কণ্ঠ-ধ্বনির মধুরতম অংশগুলি হইতেই সুরগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন্ সময়ে প্রথম সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় তাহা জানা যায় নাই, তবে সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ লিখা আছে যে দেবাদিদেব মহাদেবই সঙ্গীত সৃষ্টি করেন এবং তিনি ব্রহ্মাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন; ব্রহ্মা পরে ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তম্বুরু এই পাঁচজনকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ভরত-মুনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে সঙ্গীত প্রচার করেন এবং তিনিই নাটকের জন্মদাতা। যে ভাবেই সঙ্গীত প্রচার হউক, আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ মধুর ধ্বনি উপলব্ধি করিবার প্রাকৃতিক বা ঈশ্বর-দত্ত শক্তি দ্বারা পশুপক্ষীর ডাক হইতে মধুর অংশগুলির অনুকরণ করিয়া করিয়া প্রথমে কয়েকটি একটানা সুর-বিন্যাসের সৃষ্টি করেন। তাহার অনেক পরে সাতটি সুরের সৃষ্টি হয় এবং তাহারও পরে কড়ি-কোমল সুরের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে অনেক যুগ পরে পরিবর্ত্তনের ফলে নানাবিধ স্বর-বিন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং একটা সুর হইতে আর একটা সুর কতটুকু দূরে বা তাহাদের মধ্যে কত অনুপাত বা ধ্বনির সৃষ্টি যে কম্পনে তাহাও অনেক অনেক পরে জানা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক মধুর ধ্বনি হইতে সুর, রাগরাগিণী, গান; প্রাকৃতিক গতি হইতে তাল, ছন্দ, লয়; ও প্রকৃতিগত আনন্দ-উল্লাস হইতে নৃত্য আমরা পাইয়াছি। সবই এই প্রকৃতি হইতে। এই জগতে সবই রহিয়াছে। আমাদের হাঁটিবার মধ্যে তাল, আমাদের কথায় সুর, আমাদের অঙ্গ-চালনায় নৃত্য-ছন্দ; ভাবিলে দেখা যায় এই জগতের সর্ব্বত্রই সঙ্গীত। "তাই জগৎ সঙ্গীতময়"—ভাবুকের এই উক্তি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।

শ্রীমণিলাল সেন

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপের পুরাতত্ত্ব

আসামপর্য্যটক—শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ এতদুভয়ের নামকরণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। এই

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামকরণ

জনপদ অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সম্পদসম্ভারে পরিপূরিত। মহাভারত, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ আদি কয়েকখানি পুরাণে, রাজতরঙ্গিণীতে * 'প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু কামরূপের কোন উল্লেখ নাই। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামকরণ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থান করতঃ নক্ষত্র সৃষ্টি করায় উহা ইন্দ্রপুরীসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্য উক্ত নামে আখ্যাত :—

"অত্র মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্ নক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা 'অমূর্ত্তরজা' পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপের ধর্ম্মারণ্য-সমীপে

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য স্থাপন

প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে একটি আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন। এই 'ধর্ম্মারণ্য' দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থান হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বলিয়া তত্রত্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিগত ১৯২০ সালে দৃঢ়তার সহিত লেখককে বলিয়াছিলেন। এখন ইহার নাম হইয়াছে "বুড়া গোঁহাই জরণী"।

রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়—ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সমসময়ে নরক নামে জনৈক দানবরাজ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে

রামায়ণোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য

রাজত্ব করিত। দুরাত্মা রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলে কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার অন্বেষণার্থ নানাস্থানে বানর প্রেরণান্তর সুষেণ ও মারীচ প্রভৃতি বানরগণকে পশ্চিমাভিমুখে প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন—অতলস্পর্শ বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে বরাহ নামক মহাপর্ব্বত দেখিতে পাইবে, তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক কাঞ্চননির্ম্মিত পুরী বর্ত্তমান আছে। তথায় নরক নামক দুরাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে :—

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহোনাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন বসতি দুষ্টাত্মা নরকোনাম দানবঃ॥৩১

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২ সর্গ

উক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক পুরীটি পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে আমেরিকার নিকটই যে ছিল ইহা অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ আমরা দেখি না। বরুণের নামে পশ্চিম দিকের এক নামও 'বারুণী'। বরুণও সমুদ্র-দেবতা। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে বরুণের আলয় পাতালে ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠাই পাতাল বলিয়া কথিত হইত। বর্ত্তমানে এই দেশ আমেরিকা নামে পরিচিত। সুতরাং রামায়ণোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরীটি পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে আমেরিকার নিকটই যে ছিল তৎসম্বন্ধে লেখক নিঃসন্দেহ। রামায়ণেও রাবণের দিগ্বিজয়যাত্রার বিবরণে বরুণালয়ের পরই বালির ভবনে যাওয়ার উল্লেখ আছে। বালির ভবন যে পাতালেই ছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণাভাব নাই।

পুরাণের মতে ত্রেতাযুগে জামদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় যে কুঠার দ্বারা মাতৃবধ করিয়াছিলেন, তাহা

আর্য্যজাতির ভ্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন

স্খলন না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তার্থ তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন; অবশেষে বর্ত্তমান আসাম নামে অভিহিত প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত মিশমি পাহাড়স্থ 'ব্রহ্মকুণ্ডে' অবগাহন দ্বারা ঐ কুঠার তাঁহার হস্তচ্যুত হয়।

---

* রাজতরঙ্গিণী-পাঠে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে মুসব্বরের (aloes) প্রকাণ্ড অরণ্যের কথা অবগত হওয়া যায়।

উহা 'পরশুরাম কুণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছে। নানা তীর্থ পরিভ্রমণকালে তিনি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন, সহজেই তাহা প্রতীতি হয়। এই আখ্যান দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও তৎপ্রত্যন্ত অনার্য্য-দেশে আর্য্যজাতির ভ্রমণ ও উপনিবেশস্থাপন সূচনা করিতেছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষের পরবর্ত্তী নাম কামরূপ

Mr. F. A. Sachse মৈমনসিংহের Gazetteer-(পৃঃ ২২) এ লিখিয়াছেন—"At the time of Mahavarat Mymensing formed part of Pragjyotish which 3000 years later in Buddhist times was known as Kamrup." কামরূপের শিক্ষিত অসমীয়ারা বলেন—ব্রহ্মপুত্র-নদের তটবর্ত্তী বর্ত্তমান গৌহাটী নগরীর অতি প্রাচীনতম নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।

কুণ্ডিনের রাজা ছিলেন ভীষ্মক

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অংশ-বিশেষের নাম ছিল 'কুণ্ডিন' নগরী। কেহ কেহ বলেন যে, উহা মহাভারতোল্লিখিত বিদর্ভ দেশ। কুণ্ডিন আসামের লখিমপুর জেলাস্থ শদীয়া নগরী হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দিক্রাং (দিকরবাসিনী) ও দিবাং-নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঐ নগরীর নামানুসারে তথায় অদ্যাবধি প্রবাহিত একটি নদীর নাম 'কুণ্ডনপাণি'। দ্বাপর যুগে মহারাজ ভীষ্মক যখন কুণ্ডিন নগরের অধীশ্বর ছিলেন, তখন জরাসন্ধ মগধে রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গয়ার নিকটবর্ত্তী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ তাঁহার রাজধানী ছিল। এখন সেই রাজগৃহ 'রাজগির' নামে অভিহিত। মগধাধিপতি জরাসন্ধের প্রস্তাবানুসারে চেদিরাজ শিশুপালের সহিত কুণ্ডিনাধিপতি ভীষ্মকের অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যা 'রুক্মিণী দেবী'র পরিণয়-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে

শিশুপালের কুণ্ডিন নগরে আগমন

শিশুপাল কুণ্ডিন নগরে গমন করেন। যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সেখান হইতে তাঁহাকে হরণ করতঃ গান্ধর্ব্বপ্রথানুযায়ী পত্নী-স্বরূপে গ্রহণ করেন।

ভগদত্ত—কালিকাপুরাণের মতে "মহারাজ নরকের' ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান ও সুমালী নামে চারি পুত্র ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে :—

ঋতুমত্যাস্তু জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগরত্ত মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্ ॥
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ। ১

—চত্বারিংশোঽধ্যায়

মহারাজ ভগদত্তের নাম ও তৎসঙ্গে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম মহাভারতের বহু স্থানে উল্লেখ আছে। মহাভারতের পাঠকেরা অবগত আছেন, "দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন প্রাগ্‌-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় এই পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র এবং লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র 'শাম্ব' দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর কালে তাঁহাকে হরণ করিলে কৌরবগণ ইঁহাকে পরাস্ত করতঃ বন্দী করেন। অনন্তর লক্ষ্মণার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। উক্ত পুস্তকের অশ্বমেধ-পর্ব্বের ৫৭শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়,—"ভগদত্ত নামে এক অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যশালী নরপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরকালে" তিনি কুরুকুলপতি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া চীন ও কিরাত সৈন্য দ্বারা তাঁহার সহায়তা করেন।" ইহাতে অনুমান হয়—উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত ও চীনদেশ পর্য্যন্ত ভগদত্তের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অর্জ্জুনকে তাঁহার সহিত অষ্টাহকাল যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে লিখিত আছে—"ইনি ১৮ দিন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধকালে তাঁহাকে নিধন করিবার জন্য পিতৃপ্রদত্ত অমোঘ 'বৈষ্ণবাস্ত্র' প্রয়োগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। মহারাজ ভগদত্তের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে যবনাদি ম্লেচ্ছশ্রেণীর লোকের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্‌সম্বন্ধে

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫১ অধ্যায়ের এক স্থানে উল্লেখ আছে :—

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানামাধিপো বলী।
যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্ত মহারথঃ ॥ ১৪

গোবলে দালবাইয়ে (Goblet d' Alviell) নামক জনৈক ফরাসীদেশীয় ঐতিহাসিক "সেকলান্দ দোয়াতালা গ্রেস" (Ceque l' Inde doit a' la Grace) নামক পুস্তকের একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"গ্রীকদিগের এপোলো-ডোটস (Apallodotos) ও সংস্কৃতে ভগদত্ত একই ব্যক্তি। তিনি একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যবনরাজ ছিলেন।"

ভগদত্ত ও গ্রীসের এপোলোডোটস

এক্ষণে এপোলোডোটসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি আবশ্যক। তিনি একজন ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক ছিলেন এবং খ্রীঃ পূঃ ১৫৬ সাল হইতে ১৮০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় সীমান্তপ্রদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ইউক্র্যাটিডিস (Eucratides)। Cataloge of the coins in the India Museuem (Vol I. P. 18) নামক পুস্তকে প্রকাশিত এপোলোডোটসের মুদ্রা ভারতসীমান্তে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এই ভগদত্ত ও ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক এপোলোডোটস (১) যে একই ব্যক্তি, অন্যত্র ইহার কিন্তু কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক গোবলে দালবাইয়ে এ বিষয়ে কোন প্রমাণও দেখান নাই—প্রসঙ্গক্রমে তদীয় পুস্তকে উহা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। গ্রীকদিগকে একসময়ে যবন বলা হইত। চীন, কিরাত ও যবন-সৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনকে ভগদত্তের সাহায্য প্রদান করিবার কথা এবং তিনি ম্লেচ্ছজাতির রাজা ছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও চীনদেশ ভারতসীমান্তে অবস্থিত। এপোলোডোটসের মুদ্রা ভারতের প্রত্যন্তস্থানে আবিষ্কৃত হওয়ায়, চীনদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। ভগদত্ত ও এপোলো-ডোটস একই ব্যক্তি কি না, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞদিগের তাহা সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ।

বজ্রদত্ত—ভগদত্তের মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্র সমরান্তে তৎপুত্র বজ্রদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে-সঙ্গে অর্জ্জুনকে নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। অশ্বমেধের ঘোড়া যে নরপতির রাজ্যে যাইবে, তিনি সেই অশ্ব আটকাইবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিবেন; অশ্বরক্ষীর সহিত তিনিই যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাকে সেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপই অশ্বমেধের নিয়ম। যজ্ঞাশ্ব কামচারী। অর্জ্জুনকেও সেই কামচারী অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল। অশ্ব চারিদিক ঘুরিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বিজিত হইয়া বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অশ্বমেধে আমন্ত্রিত হইলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে অশ্ব মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অর্জ্জুনের ঔরসজাত চিত্রাঙ্গদাপুত্র বভ্রুবাহন সপত্নী-মাতা উলুপীর উত্তেজনায় যজ্ঞাশ্ব লইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের মতে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত :—

প্রাগ্‌জ্যোতিষম্ অথাভ্যেত্য ব্যচরৎস হয়োত্তমঃ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ॥
স হয়ম্ পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তম্ উপাগতম্।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ॥
সোঽভিনির্য্যায় নগরাদ্ ভগদত্তসুতো নৃপঃ।
অশ্বম্ আয়ান্তম্ উন্মথ্য নগরাভিমুখো যযৌ॥

—অশ্বমেধপর্ব্ব, ৭৫ সর্গ, ১ শ্লোক

কালিকাপুরাণের যে ইহাই মত, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুত এডোয়ার্ড গেইট তাঁহার আসামের ইতিহাসে (পৃঃ ১৪) লিখিয়াছেন, "ভগদত্তের পরে তদীয় ভ্রাতা বজ্রদত্ত উত্তরাধিকার-সূত্রে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বজ্রদত্তের মৃত্যু

---

(১) এপোলোডোটস—G K. Apollon and dotos. Apollon প্রাচীন গ্রীকদিগের উপাস্যদেবতা 'সূর্য্য' এবং dotos অর্থে প্রদত্ত। Lat. Apollo (Sungod, a representative of youthful manly beauty—ভগ), সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য—এই ছয়টি 'ভগ' নামে অভিহিত। Dotos (given) দত্ত।

হইলে তৎপুত্র বজ্রপাণি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তেজপুরের রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া উহা আবৃত্তি করতঃ তাঁহার "আসাম-বুরঞ্জী"তে লিখিয়াছেন—"ভগদত্তর মৃত্যুর পাচত ভায়েক বজ্রদত্ত রজা হয়।" গেইট মহোদয় ভগদত্তের ভ্রাতা বজ্রদত্ত ও তৎপুত্র বজ্রপাণি কোথা হইতে পাইলেন অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি বনবর্ম্মা দেবের "নগাঁও তাম্রশাসন" দৃষ্টে এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ১৮৯৫ সালে ইহা গেইট (E. A. Gait) মহোদয়ের হস্তগত হইয়াছিল।

ভগদত্ত-বংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হইলে পর পুষ্য বর্ম্মা আবির্ভূত হন। বিগত ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত নিধানপুর গ্রামে আবিষ্কৃত ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, ভগদত্তের তিরোধানের ৩০০০ বৎসর পরে এই বংশে পুষ্য বর্ম্মা, সমুদ্র বর্ম্মা, বন বর্ম্মা, কল্যাণ বর্ম্মা, গণপতি বর্ম্মা, মহেন্দ্র বর্ম্মা, নারায়ণ বর্ম্মা, মহাভূত বর্ম্মা, চন্দ্রমুখ বর্ম্মা, (২) স্থিতি বর্ম্মা, সুস্থিত বর্ম্মা ও ভাস্কর বর্ম্মার আবির্ভাব হয়। তন্মধ্যে, শেষ পাঁচ জনের নাম বাণভট্টের হর্ষচরিত কাব্যে পাওয়া যায়। হর্ষচরিতে ভাস্কর বর্ম্মার উর্দ্ধতন চারি পুরুষের নামের সহিত উক্ত তাম্রশাসনোক্ত চারি পুরুষের নামে যে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়, বাণভট্টের শুনিবার দোষেই তাহা ঘটিয়া থাকিবে। নিম্নে এই বৈলক্ষণ্য দেখান হইল :—

পুষ্যবর্ম্মা আদি রাজগণ

হর্ষচরিতে লিখিত—	তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ—
ভূতি বর্ম্মা	মহাভূত বর্ম্মা—বিজ্ঞানবতী
চন্দ্রমুখ বর্ম্মা	চন্দ্রমুখ বর্ম্মা—ভোগবতী
স্থিতি বর্ম্মা	স্থিতি বর্ম্মা—নয়ন দেবী
সুস্থির বর্ম্মা	সুস্থিত বর্ম্মা—শ্যামা দেবী (বা মৃগাঙ্ক)
ভাস্কর বর্ম্মা	সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা, ভাস্কর বর্ম্মা

সুস্থির বর্ম্মা—মগধের দামোদর গুপ্তের পুত্র মহাসেন গুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিত বর্ম্মার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লৌহিত্যতীরে (ব্রহ্মপুত্রতটে) সুস্থিত বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন :—

শ্রীমৎসুস্থিত বর্ম্মঃ যুদ্ধবিজয়শ্লাঘা পদাঙ্কং মুহু-
র্যস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধ কুন্দকুমুদ কুন্নাৎচ্ছহার [৺] তং।
লোহিতস্য তটেষু শীতলতলেষুৎফুল্ল নাগক্রম-
চ্ছায়াসুপ্ত বিবুদ্ধ সিদ্ধ মিথুনৈঃ স্ফীতং যশো গীয়তে॥

—Fleet's Corpus Ins. India Vol III, P. 8.

[কুন্নাৎচ্ছহারের পরবর্ত্তী লিপি অবুদ্ধ থাকায় উক্ত স্থানে বন্ধনীসমন্বিত এক চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হইল]

মগধের এই গুপ্তবংশ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় 'চন্দ্র গুপ্তের' কনিষ্ঠপুত্র 'গোবিন্দ গুপ্ত' হইতে উৎপন্ন।

ভাস্কর বর্ম্মা—ইঁহার সময়ে শশাঙ্ক নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেন। শশাঙ্ক মগধ আক্রমণ করিয়া গয়ার বৌদ্ধ কীর্ত্তিসমূহের বিলোপসাধনে সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য ইঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ভাস্কর বর্ম্মার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন মগধ আক্রমণ করিলে ভাস্কর বর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া—[সেইস্থানে হইতে] —জনৈক ব্রাহ্মণকে পুর্ণ্যার্জ্জনার্থ যে তাম্রফলক প্রদান করেন, তাহা ১৯১২ সালে শ্রীহট্টের নিধানপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সেই ফলকে লিখিত আছে—"মহানৌ হস্ত্যাশ্বপত্তি সংম্পত্ত্যাপত্তি জয়শব্দানর্থ স্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণ বাসকাৎ।" অনুমান হয়, সেই সময় সমতট, শ্রীহট্ট এবং কর্ণসুবর্ণ ভাস্কর বর্ম্মার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ—তিনি আধুনিক বঙ্গদেশের অংশবিশেষের অধীশ্বর ছিলেন।

বড়গাঁও মৌজায় আবিষ্কৃত রত্নপালের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়—"ভাস্কর বর্ম্মার পর ম্লেচ্ছরাজ শালস্তম্ভ, বিগ্রহস্তম্ভ, পলকস্তম্ভ, বিজয়স্তম্ভ···হরিষ এবং তৎপরে ভগদত্তবংশীয় প্রলম্ব, হর্জ্জর, বনমালদেব*, জয়মলদেব (বীরবাহু) ও বলবর্ম্মাদেব কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রলম্ব স্তম্ভনবংশীয় শেষ নৃপতি হরিষের নিকট হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য অধিকার করিয়া লন।

* বনমল দেব—Vide J. A. S. B., 1840, Page 766.

(২) চন্দ্রমুখ বর্ম্মা—মালবরাজ যশোধর্ম্মন কামরূপ রাজা আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাস্ত করেন।

নির্ব্বাসিত

রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী

নির্ব্বাসিত আমি, সখি, যুগ যুগ ধরি'
ধরণীর কারাগারে। আকাশের গ্রহ
আজো করে মোর সাথে অনন্ত বিদ্রোহ
করাল মূর্ত্তিতে হায় দিবা-বিভাবরী!
অভিশাপ-মরুজ্বালা দু'নয়নে ভরি'
বিশ্ব চাহে মোর পানে সে কি ভয়াবহ!
অন্তর বিদগ্ধ করে তোমারি বিরহ-
স্মৃতির পীড়ন, হায়, কেমনে পাশরি।
মুক্তি মোর তব কাছে জানি, হে কল্যাণী
তুলি এসে খুলে' যাবে মোর কারা-দ্বার।
এ বুকে জাগিবে পুনঃ অবরুদ্ধ বাণী,
সুন্দরের দূত এসে ফিরিবেনা আর।
যদি তোমা নাহি পাই মুক্তিতে কি লাভ,
অনন্ত বন্ধন মোর এই পরিতাপ!

মুগ্ধ

মৌলভী মোতাহের হোসেন বি এ

এখনো রচিনি কিছু, এখনো যে পড়ি
বিশ্বময় সৌন্দর্য্যের অমর কবিতা;
এখনো পরাণ-পাত্রে চন্দ্রমা সবিতা
অফুরন্ত কাব্যরস দেয় যেগো ভরি'।
প্রভাতে চোখের আগে হাসে ঊষা-পরী
ঝ'রে পড়ে লাবণ্যের রক্ত মাদকতা;
পরাণ রাঙায়ে দেয় সে রস-মত্ততা
নৃত্য-তালে নিত্য যাহা পড়ে ঝরি'ঝরি'।
হাতে হাত ধরি' চলে রস আর রূপ—
যেন দুই সখী চলে পুষ্পিত-যৌবনা;
তা'ই হেরে সুখাবেগে হ'য়ে থাকি চুপ,
কোন গান গাহি নাকো, কিছুই কহি না।
বিশ্ব-রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আছি চিরদিন,
কি গান গাহিব আমি, কি বাজাব বীণ্!

সীমানা

শ্রীমতী নীলিমা দাস

পৃথিবীর যে-ঠাঁইটুকু জুড়ে' আমরা বাস করি, সাধারণতঃ সেখানকার সকলেই 'ভালো মানুষ'। অর্থাৎ, সকলেই যাতে ও-রকম হ'তে পারে, তার উপায় এখানে ক'রে রাখা হ'য়েছে—অন্য কিছু হবার যো নেই।

মানুষের জীবনে যেটিকে সব চাইতে অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস করি, সে হ'চ্ছে তেজ বা spirit। ও-টাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিইনে। ভাবি, ভালো মানুষ হওয়ার পক্ষে, ও একটা প্রধান ব্যাঘাত। তাই আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দৌলতে তেজ জিনিষটাকে সর্ব্বপ্রযত্নে উহ্য রাখি।

আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি কোনোপ্রকারে ও জিনিষটি বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায়, তা হ'লে তাদের দেহের ওপর 'পাঁচন-বড়ি' আর মনের ওপর 'মোহমুদ্গর' প্রয়োগের ভার গুরুমশায়দের হাতে আমরা দিয়ে রেখেছি—যাকে বলে power of attorney!

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দেহের আকারটা যে-রকমই হোক, তাদের মুখের ভাবটা অন্ততঃ যদি গুরুমশায়দের সঙ্গে মিলে যায়, তা হ'লে সেটাকে আমরা মস্ত বড়ো সুলক্ষণ ব'লে মনে করি, আর সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্ব ক'রে বলি—বয়সে ও এত ছোট, কিন্তু তবু দ্যাখো কেমন শান্ত ধীর গম্ভীর! এতটুকু চাঞ্চল্য নেই,—একেবারে গোপাল! মানব-মনের আসল বিকাশের ও-ই তো লক্ষণ!...ইত্যাদি।

আমরা চাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা শুকদেবের মতো হোক। জন্ম থেকেই তত্ত্বকথা কইতে শিখবে। মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে যদি কিছু প্রার্থনা করে তো, সেটা না কি অপূর্ণ থাকে না কোনোদিন; তাই একেবারে শুকদেব না হ'লেও তাঁর চিহ্ন একটু-আধটু আমাদের সব ছেলেমেয়েদের দেহে মনে স্থান পেয়েছে,—একথা জোর ক'রে বলা চলে!

তবু এত সাবধানতা, এত তৎপরতা সত্ত্বেও দেখি আমাদের এই 'ভালো মানুষের' ভিড়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা স্বভাব-চরিত্রের ছেলেমেয়ে মাথা তুলে' দাঁড়িয়ে উঠছে। গতানুগতিক কোনো নিয়ম-কানুন-প্রথারই সে পক্ষপাতী নয়। পথ-নির্দ্দেশ ক'রে দিলেও চট্ ক'রে সে সেটাকে মেনে নিতে চায় না। শুধু আদেশ-বাণীকেই শিরোধার্য্য না ক'রে সব জিনিষেরই পরীক্ষা ক'রে দেখা তার স্বভাব। বাধা পেলেও পিছিয়ে যায় না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে চলে কাজের মুখে, আপন খেয়ালে। 'ভালো মানুষের' কোনো লক্ষণ তার ভেতর খুঁজতে গেলে নিরাশ হ'তে হয়।

একে যদি 'বুঝিয়ে বলা যায়, তোমার অনেক আগে থেকে যাঁরা পৃথিবীতে ঝড়-তুফানের ধাক্কা খেয়ে পথ তৈরী ক'রে রেখেছেন, তাঁদের নির্দ্দেশমত চলো না কেন?

সে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়—সব গোরুকেই যে এক গোয়ালে ধরবে, তার কি মানে আছে? একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না, এ-ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি না।—

এই কথার মধ্যে শুধুই যে সনাতন-প্রথার ওপর অশ্রদ্ধা আছে, তা ঠিক নয়। নতুনের ওপর আকর্ষণ-টাই বেশি জ্বল্‌জ্বলে। একটানা স্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্য আন্‌বার ইচ্ছেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নতুনের ওপর আকর্ষণ যতই থাক্, তার সম্বন্ধে সংশয়ও ততই। কারণ, সেটা নতুন, পুরাতন নয়। তার সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানিনে, তাই মানিনে। এই জন্যেই প্রচলিত বিধান এবং নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে যারা এগিয়ে যায়, তাদের প্রতি আমরা খুব প্রসন্ন নই। কিন্তু এ-যুক্তির দাম কতটুকু?

আমাদের দেশে এক সময় এসেছিল, যখন সকলেই ভাব্‌তো এবং শুন্‌তো—পৃথিবীটাই সব চেয়ে বেশি মিথ্যা, একটা অলীক স্বপ্ন, মানুষগুলো সেই স্বপ্নের বিলাসে ম'জে আছে।

তাই তখন সব কাজের ভেতরেই বিশেষ ক'রে জাগ্রত থাকতো পরলোকের এবং পরমার্থের চিন্তা। যে দিন এসেচে, এর মধ্যে দেখি—সেই মিথ্যা, সেই স্বপ্নবিলাসই বেশি সত্য, বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেচে।

আমাদের কবি বলেচেন—

শান্তি হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে
রেখনা মা দিনের বেলায়,
বিশ্বভরা লোকের সাথে
মাত্‌বো আমি ধূলোখেলায়।
তোমারই যে হাতে গড়া
খাঁটি তাই এ মাটির ধরা,
আমাদেরো স্নেহপ্রীতি—
রচেছ তো মাটির ঢেলায়।

এ গানের কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। পৃথিবীটা খাঁটি; আর এ-গানের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে সব দিক দিয়ে দেখবার এবং অনুভব করবার ছাড়পত্র বা passport রয়েচে।

তবু মানবো না। কি জানি যদি পাপ হয়, যদি অন্যায় হয়, যদি অকল্যাণ হয়, যদি ভুল করি, যদি অনর্থপাত হয়! এ রকমের শত-সহস্র 'যদি'র ভয়ে আট-ঘাট বন্ধ ক'রে ব'সে থাকি। কেবল তাই নয়, ওই সমস্ত 'যদি'র ভয় আমাদের ছেলেমেয়েদের চোখের সাম্‌নে দিনরাত ফুটিয়ে রাখি—জ্ঞান-হওয়ার পূর্ব্ব থেকেই তারা দেখ্‌তে শেখে ওই 'যদি'কে। অন্যায়, অকল্যাণ, অনর্থপাত না-ক'রেই—তার কোনো পরিচয় না-পেয়েও ওসব সম্বন্ধে একেবারে অভিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে।

আমাদের সাম্‌নে প'ড়ে রয়েচে পথ, তার সহস্র বিপুলতা, তার সমস্ত রহস্য নিয়ে সবারি জন্যে উন্মুক্ত; আমরা নিই তাকে ভাগ ক'রে। সীমানা কেটে বলি—এই পথটি হ'চ্ছে আমার পথ; এ-পথে যদি এসো, তা হ'লে তুমিও আমার। ও-পথটি আমার নয়; ও-পথে যদি যাও তো তুমি আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গেলে।

মানুষের চলার পথে ওই রকমের সীমানা-নির্দ্দেশ হ'লো,—একটা স্বার্থমিশ্রিত ভয়-দেখানো উপায়ে। কিন্তু জীবনের গতিটি যে নদীস্রোতের মতো,—আপনার খুশীমতই ব'য়ে যাওয়া তার ধর্ম্ম। তার সেই সহজ গতিটির মধ্যে যখন আমাদের প্রভাবকে এনে মিলিয়ে দিই, তখনি তাকে মেরে ফেলি। তাকে কিছু করতে দেবো না, কিন্তু তাকে 'করাবো'। এই কথাটি প্রাণ যখন বুঝতে পারে যে তার কিছুই করবার নেই, সে একটা যন্ত্রমাত্র, তখন থেকেই তার মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই বিদ্রোহের অপরাধ তার একার ওপরেই পড়ে। সমস্তের জন্য সে-ই দায়ী; কিন্তু সব চাইতে সমস্যার কথা হ'ল তার নালিশ শোন্‌বার কেউ নেই।

এই সমস্যা নিয়ে যদি কবির শরণাপন্ন হওয়া যায়, তিনি বল্‌বেন, গান-গাওয়াই আমার পেশা, আমার গান যদি তোমাদের প্রাণে লেগে থাকে, কাজ দিয়ে তার পরিচয় দাও।

আর এর উত্তর যদি দেওয়া যায়,—তাতে বাধা দেয় যে?

কবি বল্‌বেন, বাধা দিলে বাধবে লড়াই…

এখন এই যদি সত্য হয়, বাধা দিলে বাধবে লড়াই… তা হ'লে প্রমাণ পাওয়া গেল—সংগ্রাম আছে সর্ব্বস্থানে এবং সেইটেই সবচেয়ে বড়ো।

বাঁচতে হ'লে সংগ্রাম চাই। বাধাকে ভয় ক'রে দূরে স'রে থাকা নয়, বাধার সাম্‌নে বুক পেতে দাঁড়াতে হবে।—বাধাকে নড়াতে হবে, সরাতে হবে।

আমি নির্ব্বিবাদী, আমি যেটুকু পাই—অন্যের কাছ থেকে, আমার লোভ নেই, আমার অভাব নেই!…এইসব মিষ্টি কথার সাহায্যে খুব সহজে মানুষের মন জয় করা যায়। কিন্তু আসলে এগুলো অত্যন্ত খেলো কথা, ঝুটা বাৎ—যাকে বলে একেবারেই ফাঁকি। তার প্রমাণ, মানুষ

জন্মায় অভাবের কান্না কাঁদতে কাঁদতে, বেড়ে ওঠে অভাব মেটাতে মেটাতে,—সে শক্তিলাভ করে অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে। কোনো অসুবিধে থাকবে না, এই হ'লো তার একান্ত কামনা, একমাত্র ইচ্ছে। এই অভাব মেটাবার স্পৃহার সাহায্যে মানুষ কত অসম্ভবকে সম্ভব করেচে, কল্পনাকে আকার দিয়েছে, স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেচে। অভাব মানুষের জীবনের একটা মস্ত অবলম্বন। এই অভাবের তাড়নায় সে যখন চীৎকার ক'রে ওঠে, আমার চাই···সেই কথাটাকে যত বড়ো দার্শনিক-যুক্তি দিয়েই ছোট প্রমাণ করা হোক্ না কেন, সে ছোট নয়। এই কথাটা মানুষের স্থবির হওয়ার ইচ্ছাটাকে নাড়া দেয়—তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় অজানা লোকে ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে, সহস্র দিকে সহস্র কাজের ভেতর দিয়ে।

দৈন্য যদি আসে আসুক্, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধ'রে থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্;
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে—
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।
চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ
যেন না শোনে
মাকে যখন ডাকিস্,
তাঁরই দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে
মুখখানি তোর ঢাকিস্।

বাধাই বড়ো নয়, বড়ো হ'লো জীবন। এই জীবনকে রাখ্‌তে হবে মুক্ত। তার গতিকে করতে হবে সহজ এবং স্বাভাবিক।

যে মাটি-মায়ের কোলে তার জন্ম, সে মাটি-মায়ের সব ঠাঁইটুকুর ওপর তার অধিকার আছে।—তাকে কাজে লাগাতে, তার ধুলো-কাদা গায়ে মাখাতে পাপ নেই, লজ্জা নেই।

কিন্তু ওই কথাগুলো যত জোরেই বলা হোক্ না কেন, বিশ্বাস করিনে একটুও। ওই সহজ এবং স্বাভাবিক জীবনকে ভাবি উচ্ছৃঙ্খল এবং অনাচারী। সে যে কাজ করে তা অকাজ, যে-পথে চলে তা বিপথ। ওর ওই অভাবটা হ'চ্ছে 'লোভ',—আর ওর 'চাই' উক্তিটি হচ্ছে জুলুম।

এই কথার পর নতুনের অভিযাত্রীদের তরফ থেকে আর কিছুই বলা চলে না। বলা গেলেও তার দরকার নেই; কারণ, সহায় এবং সহানুভূতি তারা পাবে না কোনোদিন। এবং তাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে—কথা নয় কাজ, শান্তি নয় সংগ্রাম, বন্ধন নয় মুক্তি। কবি তাদের উদ্দেশে বলচেন লক্ষ্যপথে চলতে :—

এ উপদেশ নয়, আশীর্ব্বাদও নয়,—এটা সেই মহাশক্তি-সম্পন্ন আত্মার কথা, যার পথে বাধা ব'লে কিছু নাই, সমস্ত কথা, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কাজ যার সহজ হয়ে গ্যাচে। কিন্তু কবির ওই কথাগুলি হয় তো সবাই মানিনে; ওই কথার মধ্যে যে তেজ আছে, নির্ভীকতা আছে, তার সঙ্গে আমাদের জাতীয়-জীবনের সুর ঠিক মেলে না। মেলবার উপায় নেই বা রাখিনি। কারণ, আমরা 'ভিক্ষা' এবং 'নালিশ'—এই দু'টো জিনিষকে খুব নিরাপদ এবং দরকারী মনে করি।

হাতে গ'ড়ে কিছু নেব না, ভিক্ষে ক'রে নেব, এবং আঘাত পেলে, অসুবিধা হ'লে, তার প্রতিকার নিজের হাতে না নিয়ে নালিশ করব। এমনি ক'রে পদেপদে মানুষের ক্ষমতাকে বেঁধে তাকে পঙ্গু ক'রে রাখাটাকে খুব উঁচু-রকমের জীবন-যাপন ব'লে মনে করি। তাই মান্ধাতার আমলে আমাদের দেশের ঢেঁকিটির অবস্থা বা আকার যেমন ছিল, আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঠিক তেমনটি আছে। তেমনি ক'রেই সে ধান ভানচে, কোনোদিক্ দিয়ে তার এতটুকু বদল হয়নি। বদলের

দরকার আছে ব'লেও মনে করিনে—বরং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, স্বর্গে গিয়েও অমনি ক'রেই সে যেন ধান ভানে; আর আমরা 'যেন তেন প্রকারেণ' এই ক'টা দিন কাটিয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের ওই সনাতন ঢেঁকিটির পাশে ঠাঁই পাওয়ার তপস্যা করচি। বেশ জোর গলা ক'রেই বলতে পারবো, ভগবন, আমরা অত্যন্ত ভালমানুষ! কিছুই করিনি; এমন কি, পাছে কোনো অন্যায় হয় ব'লে তোমার জগতের দিকেও তাকাইনি। মায়া মোহ-স্বার্থ দিয়ে তুমি যে আমাদের মন ভোলাবার জন্যে চেষ্টা করেচ, আমরা সে-চেষ্টা তোমার ধ'রে ফেলেছি!

শুনে' খুশী হবেন কি তিনি?

কিন্তু দিকে দিকেই কান্না উঠে' আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ফেলচে, ওগো সর্ব্বত্যাগী মানুষ, ওগো সাধু, আমি নারী—তোমার জননী। আমি আজ বুভুক্ষু, অত্যাচারনিপীড়িতা। আমার মুখের দিকে একবার তাকাও। হে আমার সন্তান, আমার দেহের নগ্নতা, মনের অশান্তি ঘুচাও—আমায় বাঁচাও···

এ কি শুধুই নশ্বর দেহের কান্না?—না, ভগবানের আদেশ? এই কথা যদি আমাদের সহজবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, সহজবুদ্ধি বলবে—আমার চাইতেও বড়ো হ'ল তত্ত্বজ্ঞান, তাকে শুধোও। তত্ত্বজ্ঞান বলেন, বাঁচাও!—এ কি প্রলাপ-বাক্য? আমরা তো বাঁচতে আসিনি এ জগতে!···দুঃখকষ্ট যে তাঁরই হাতের স্পর্শ···ভাল ক'রে গায়ে মেখে নাও···

হিসেব-নিকেশের দিন সওদাগর-আপিসের বড়সাহেব যখন তাঁর হিসেব-রক্ষকটিকে শুধোন, দেখি কি করেচ?··· তার উত্তরে হিসেব-রক্ষক যদি বলেন, সাহেব, তোমায় আমি বড্ড ভালোবাসি; হিসেবের খাতার প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে তোমার শ্রীমুখের ছবি দেখতে পাই, তা'ই ব'সে-ব'সে কেবল ধ্যান করি,—হিসেব ভুল হ'য়ে যায়, তোমার কাজ কিছু করতে পারিনে; কিন্তু আমার বুকের ভিতর ভরা আছে অসীম ভালবাসা, তাই নিয়ে খুসী হও।

এর উত্তরে সাহেব কি বলবেন বা ব্যবস্থা করবেন, তা কল্পনা ক'রে নেওয়া বিশেষ শক্ত নয়।

অলস স্তুতি-গানে ভগবানের মন টলে না। খোসামোদ-প্রিয় বড়লোকের স্বভাব তাঁর নয়। যে-শক্তি তিনি আমাদের দিয়েচেন, তাকে কাজে লাগাতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে। দুঃখ-সাগর মন্থন ক'রে কল্যাণ-লক্ষ্মীকে বরণ ক'রে ঘরে আনতে হবে। জীবনের গতিটিকে নিয়ে চলতে হবে—কর্ম্মের দিকে, উন্নতির দিকে। সমস্ত বন্ধনকে ছিঁড়ে, সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙে চুরমার ক'রে—মুক্তির দিকে।

সে-মুক্তি শুধু বৈরাগ্য-সাধনে নয়, সর্ব্বত্যাগে নয়, কৃচ্ছ্র-সাধনে নয়; ঐ সমস্তের মধ্যেই ধর্ম্মকে পাওয়া যায় না, মুক্তি নেই। কারণ, ওগুলো শুধু অনুষ্ঠান মাত্র। অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম আলাদা।

মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বটাই বড়ো, কল্যাণকর। বিশ্বের হাসি-কান্না, তার প্রত্যেকটি ধূলিকণার সঙ্গে প্রাণের যোগ থাকা চাই।

মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা ক'রে দেবত্ব পাওয়ার চেষ্টা একটা প্রচণ্ড ফাঁকি—ধাপ্পাবাজি। ও-ফাঁকিতে সাধারণ মানুষের মন ভুলতে বা গলতে পারে, কিন্তু বিধাতা-পুরুষ নাকি একটু 'অসাধারণ', তাই তিনি ভুলবেন না।

শ্রীনীলিমা দাস

পথ ও পাথেয়

—গল্প—

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

১

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দীনেশ ডাকিল—"দিদি"—

ঘন ঘন হাতের মালাটাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া ত্রিনয়নী একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দীনেশ প্রশ্ন করিল "এখন কি করবো?"

ত্রিনয়নীর 'মালা-ঘুরান' থামিয়া গেল, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন "কিসের কি করবি?" দীনেশ উত্তর দিল—"সেই মেয়েটি,—যেটাকে নিয়ে এসেছি"—কথাটা শুনিবামাত্র ত্রিনয়নীর সমস্ত মুখের উপরে এমন একটা ছায়া ভাসিয়া উঠিল, যাহার দিকে মুখ তুলিয়া দীনেশ আর চাহিতে পারিল না। বিরক্তিপূর্ণ একটা বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ত্রিনয়নী কহিলেন—"তার আর আমি কি করবো বল! দয়া দেখাতে পথ থেকে যাকে কুড়িয়ে আনলে, তার ব্যবস্থা এখন তুমি নিজেই কর, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবারই বা কি দরকার—"

একবার হাঁফ লইয়া আবার বলিলেন—"কার যে ও আঁতের কুটুম তারই বা ঠিকানা কে জানে! ছিল পথের ধারে শুয়ে প'ড়ে, তাকে তুলে বাড়ীতে আনবার কি দরকারটা ছিল তোর? কেন গা! তোর মত আর পাঁচজনও তো সেই পথ দিয়ে তার দিকেই তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু কই, তারা তো কেউ ওকে কুড়িয়ে বাড়ী নিয়ে গেল না। তবে?—"

কথার শেষের দিকে তাঁহার কণ্ঠস্বরে যে প্রশ্নের সুর বাজিয়া উঠিল তাহার জবাব কেহ দিল না, তিনিও আর কোনও কথা বলিলেন না।

অদূরে একটা টুলের উপরে একটা হ্যারিকেন জ্বলিয়া চারিদিকে আলোকবিতরণ করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে চারিদিককার অন্ধকার দূর হইতেছিল না, বরং যেন তাহার ভীষণতা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

সহসা মুখ ফিরাইয়া, কণ্ঠস্বর কড়ি হইতে কোমলে নামাইয়া ত্রিনয়নী ডাকিলেন—"দীনু!"

দীনেশ চমকিয়া চাহিল।

ত্রিনয়নী কহিলেন—"থাক্, 'হিল্লে' ওর যখন একটা করতেই হবে, এখন এক কাজ কর্, ওকে আমার নিমুর বাড়ী পাঠিয়ে দে, সেখানে থাকবে, খাটবে, খাবে।—"

নিমু ত্রিনয়নীর কন্যা। তাহার সংসারের ভারী কাজের কথা মনে পড়িতেই দীনেশ যেন থমকিয়া গেল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল—"কিন্তু ওর এখন শরীরের যা অবস্থা তাতে যে ও বেশি খাটতে পারবে, তা বলে তো মনে হয় না, দিদি।—"

একমুহূর্ত্তে বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ত্রিনয়নী সপ্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বটে, এত?—বলি হাঁারে, এত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন বল্ 'চটু' বগলে? তবে তোর যা-খুশী কর্‌গে যা, ওর বিষয়ে আর আমার কোনও কথা বলবার নেই, আর আমায় জিজ্ঞেসও করতে আসিস্ নে।—"

হাতের মালাটাকে একবার ললাট স্পর্শ করাইয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আর সেইস্থানে একাকী বসিয়া রহিল দীনেশ। চিন্তার রাশি তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যেন ইহার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

অদূরে রন্ধনগৃহ হইতে কড়া ও খুন্তির ঠন্ ঠন্ শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত ভাসিয়া আসিতেছিল সুগন্ধ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এইসময়ে পার্শ্বের কক্ষ হইতে স্ত্রীকণ্ঠের যন্ত্রণা-কাতর স্বর ভাসিয়া আসিল—"উঃ, মাগো—"

দীনেশ চমকিয়া সে কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু অন্ধকারের জাল ঠেলিয়া তাহার দৃষ্টি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল না।

২

পথ হইতে লইয়া আসিয়া দীনেশ যাহাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিল, সে বিধবা। বয়স সতেরো হইতে কুড়ির মধ্যে; দেখিতে খুব ভালো না হইলেও নেহাৎ মন্দ নয়, নাম বৈদেহী। অনেক প্রশ্নের পরে সে আপনার এই নামটুকুই প্রকাশ করিয়াছিল, অন্য কোনও পরিচয় দেয় নাই।

কিন্তু সে যে নীচ-ঘরের মেয়ে নয় ও কোনও দিন যে তেমন অবস্থার মধ্যেও বাস করে নাই, তাহা তাহার আচারব্যবহারেই বেশ জানা যাইতেছিল। তাই যখন ত্রিনয়নী তাহাকে কন্যার বাড়ীতে দাসীরূপে পাঠাইবার কথা দীনেশের সম্মুখেই তাহাকে আর-একবার বলিলেন তখন তাঁহার কথায় সে বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিলেও দীনেশ করিল। দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, সে 'হয় না। কারণ, তোমার শরীর এখন খুব খারাপ,—ভাল হ'য়ে তুমি যেখানে খুসি যেও, আমি আপত্তি করবো না।"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল এবং ইহার পরে মুখ টিপিয়া হাসিরও ঢেউ বহিল, কিন্তু দীনেশ সে সকল ইচ্ছা করিয়াই লক্ষ্য করিল না, দ্রুতপদে আপনার কক্ষমধ্যে আসিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

মুখ ফিরাইলে দেখিতে পাইত, আর সকলের দৃষ্টির মধ্যে তীব্র পরিহাস লুকাইয়া থাকিলেও একজনের দৃষ্টির মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়াছিল শুধু কৃতজ্ঞতার ছায়া, যাহার মধ্যে কৃত্রিমতার রেখাও ছিল না।

বাঙলার শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বই জনের ভাগ্যফল যেমন দাঁড়ায় দীনেশেরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নি; সেও বি-এ ফেল করিয়া অতিকষ্টে ত্রিশ টাকা মাহিনার যে চাকুরীটা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সংসার চালাইতে হইত।

কিন্তু দীনেশের সৌভাগ্য এইটুকু ছিল যে, ইহাতে তাহার ছোট সংসারটিতে খরচের অনাটন পড়িত না, কারণ সংসার ছিল তাহাদেরই দুইটি মানুষকে লইয়া, একজন ত্রিনয়নী এবং অপরজন সে নিজে।

আপনার বলিতে তাহার আর কেহই ছিল না, কারণ অর্থের অনাটনের কথা ভাবিয়াই সে ত্রিনয়নীর অনেক অনুরোধ ও আদেশসত্ত্বেও বিবাহ করে নাই। কিন্তু যেদিন সামান্য একটা কারণে রাগ করিয়া, ত্রিনয়নী সংসারের সমস্ত ভার নামাইয়া রাখিয়া কন্যার নিকটে চলিয়া গেলেন, সেদিন দীনেশের হঠাৎ মনে হইল—এত বড় পৃথিবীর মধ্যে সে যেন আজ একা। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সে বেশ বুঝিল, ত্রিনয়নীর ক্রোধ ঐ সামান্য কারণটাকে ধরিয়াই হয় নাই, হইয়াছে ঐ হতভাগিনী বৈদেহীকে লইয়াই।

কথাটা মনে হইতেই গভীর বিরক্তিতে দীনেশের সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইল; সে দুই হাত মুখের উপরে চাপা দিয়া নীরবে শয্যায় শুইয়া রহিল।

অফিসে যাইবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু দীনেশ শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না, কারণ, সকালেই ত্রিনয়নী চলিয়া গিয়াছেন,—রাঁধিবে কে? সে নিজে কোনও দিন রাঁধে নাই, জানেও না, অথচ ভাত না খাইয়া অফিসে যায় কেমনকরিয়া?

দীনেশ স্তব্ধভাবে পড়িয়াছিল এমন সময় কক্ষের ভেজান দুয়ার খুলিয়া গেল।

"আজ আর উঠ্‌বেন না? অফিসের সময় হয়েচে; ভাত খাবেন চলুন।"

দীনেশ চমকিয়া হাত সরাইয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, দ্বারের দুই পার্শ্বের কপাটের উপরে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে বৈদেহী, লালপাড় শাড়ীর পাশ বহিয়া সিক্ত চুলের গোছ মুখের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে—পরিপূর্ণ করুণার ছবি। দীনেশের মনে হইল তাহার এ মূর্ত্তি যেন সেদিনকার সেই ভিখারিণীর মূর্ত্তি নয়, আজ তাহার সমস্ত মুখে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিয়াছে নারীত্বের মাধুর্য্য, জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দীনেশ বলিল, "ভাত কে রাঁধলে, তুমি?"

তাহার কথার মধ্যে প্রশ্নের যে সুরটা ভাসিয়া উঠিল, তাহার উত্তরে একটু হাসিয়া স্পষ্টস্বরে বৈদেহী জবাব দিল, "হ্যাঁ; কিন্তু—"

হাত নাড়িয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে কহিল, "থাক্,—তোমার কৈফিয়ৎ আমি শুনতে চাইনি, চাচ্ছিওনে। ভাত দেবে চল—।"

আর একটা কথাও না বলিয়া বৈদেহী ধীরে ধীরে রন্ধন-গৃহের দিকে অগ্রসর হইল, আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল দীনেশ। খাওয়াদাওয়ার পরে অর্দ্ধমলিন চাদর-খানাকে স্কন্ধের উপরে ফেলিয়া, ছাতা লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে দীনেশ যখন বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার মনের মধ্যে কোথাও যেন আর একটুও অশান্তির দাগ ছিল না।

কিন্তু একজন যেন তার সেই শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া স্বস্তি পাইল না, সে বৈদেহী।

দীনেশেরই আহারের থালার নিকট বসিয়া পড়িয়া সে একবার শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের প্রতি চাহিল।

৩

প্রতিদিনকার নাওয়া-খাওয়া কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে যে একটা বড় শান্তির, বড় তৃপ্তির ঢেউ আসিয়া পৌঁছাইতে-ছিল তাহা দীনেশের বুঝিতে বাকী ছিল না, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না এ শান্তি, এ তৃপ্তি কোথা হইতে আসে!

দিদিও যেমন যত্ন করিতেন, বৈদেহীও তো তেমনিই করে, তবে? এই 'তবে'র উত্তর সে মনের মধ্যে বারম্বার অনুসন্ধান করিয়াও পায় না। মনের মধ্যে একটা সমস্যা জাগে—"কিন্তু—"

সার্ট, কোর্ট, চাদর কাপড় ধোবার বাড়ী যায় না, কিন্তু কোনও দিনই তাহাতে আর ধূলা লাগে না, ময়লাও হয় না। বইয়ের শেল্ফ গুছান থাকে, বিছানা সকলসময়ে পরিষ্কার থাকে; মনে হয় যেন কোন কল্যাণ-স্পর্শ তাহাকে সকল-সময়ে বেষ্টন করিয়া আছে—সে বেষ্টনীর মধ্যে এক তিল-প্রমাণও ফাঁক নাই।

দীনেশ পত্র দেয় ত্রিনয়নীকে আসিবার জন্য, কিন্তু তাহার কোনও উত্তর আসে না; তাই একদিন সে নিজেই গিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—"তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি, দিদি।"

ত্রিনয়নী তখনি কোনও জবাব দিলেন না, দিলেন একটু পরে। কহিলেন—"নিয়ে যাবার তো কোনও দরকার নেই ভাই, যে সেখানে আছে সে তো কোনও কাজেই আমার অভাব তোর মনকে জানতে দেয় না দীনু!—"

তিনি যেদিক দিয়া এই কথাকয়টি বলিলেন, দীনেশ তাহার ঠিক উল্টা বুঝিল; ঝাঁঝের স্বরে উত্তর দিল—"সে কথা নিতান্ত মিথ্যে নয়, দিদি।"

বড় দুঃখেই ত্রিনয়নীর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন—"সুখের কথা!"

দীনেশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেইদিনই সে যখন অনেকটা পথ আসিয়া বাড়ি পৌঁছাইল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

একবার কড়া নাড়িতেই দুয়ার খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বৈদেহী পথ ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু দীনেশ তাহার দিকে লক্ষ্যও করিল না, বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে আপনার কক্ষদ্বারে পৌঁছাইয়া দীনেশ হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"বৈদেহী।—"

তাহার এ কণ্ঠস্বর বৈদেহীর নিকট যেন নূতন বলিয়া বোধ হইল, সে শুধু চমকিয়া একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কোনও কথা কহিল না।

দীনেশ একমুহূর্ত্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে প্রশ্ন করিল—"এখন তোমার শরীর বোধ হয় অসুস্থ নয়, কেমন?—"

বৈদেহীর হস্তস্থিত কেরোসিনের ডিবাটি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবিরত ধূমোদগার করিতেছিল, সে সেইদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"না—"

"তা হ'লে—"

মধ্যপথে থামিয়া দীনেশ কি একটা কথা ভাবিয়া লইল, পরে সহজ স্বরে কহিল—"তা হ'লে এখানে আর তোমার

"এখন থাকবার তো বিশেষ কিছু দরকার নেই। এখন তুমি তোমার যা-হোক একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে নিতে পার বৈদেহী!—"

কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৈদেহীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু আলো-অন্ধকারের মধ্যে ভাল করিয়া কিছু দেখিতে পাইল না; শুধু মনে হইল ক্ষণিকের জন্ত যেন তাহার সমস্ত মুখখানা গভীর যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া উঠিল।

হাতের জ্বলন্ত ডিবার দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে বৈদেহী কহিল—"কোথায় আমি যাব, বাবু? আমার যে আর কেউ নেই!"

নিমেষের জন্ত দীনেশের সমস্ত কঠিনতা যেন গলিয়া আসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে সংযত করিয়া, অপেক্ষাকৃত কঠিন স্বরে কহিল—"যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে তখন তো কারও সাহায্যের আশা ক'রে আসনি বৈদেহী! আমি তখন না হয় তোমায় দয়া করে এনেছিলাম,—কিন্তু এখন তো আর তুমি দয়ার পাত্রী নও! এখন তুমি যেখানে খুসী যেতে পার, যা খুসী করতেও পার, আমার তাতে কিছু আপত্তি নেই।"

কথাকয়টা বলা শেষ করিয়া সে একটা দমকা হাওয়ার মত গিয়া আপনার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল,—বৈদেহীর দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বহুক্ষণ পরে সে যখন পুনর্ব্বার বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, তখনও সেই কেরোসিনের ডিবাটাকে হাতে লইয়া বৈদেহী সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর শ্রাবণের সজল বাতাস মাঝে মাঝে আলোটাকে কাঁপাইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কোন অচেনা পথের খোঁজে।

৪

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই অদূরে পতিত একখানি পত্র দীনেশ দেখিতে পাইল। কুড়াইয়া লইয়া দেখিল বৈদেহী তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছে—

"হয় তো অনেক দুঃখ, অনেক কষ্টই আপনাকে দিয়ে গেলাম, কিন্তু আশা করছি তার জন্তে ক্ষমা পাব।

আমি আজ চল্লাম, কোথায় যাব তার ঠিকানা নেই; আর হয় তো কোনও দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন আপনার উপকার ভুলতে পারবো না।—ইতি

বৈদেহী।"

সামান্ত এই কয়েকছত্র লেখা,—একখানা ছিন্ন কাগজের পৃষ্ঠায় আঁকা-বাঁকা লেখা, বানানের ভুলে ভরা।

দীনেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আর তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিল সেই কাগজখানি।

লোকের মুখে ভাইয়ের খাওয়াদাওয়ার কষ্ট শুনিয়া জামাইবাড়ী হইতে নিস্তারিণী আবার দেড় বৎসর পরে ভাইয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, আবার আপনার পরিত্যক্ত কাজগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু সকল কাজের মধ্যেই যেন একটা শূন্যতা দীনেশের দৃষ্টির সম্মুখে ধরা পড়িয়া যাইতে লাগিল।

দিদির সকল কাজই সে অন্তরের শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে, কিন্তু কোথায় যেন বেদনা বাজে।

যেন তৃপ্তি আর কোথাও নাই,—শান্তিও যেন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। বৈদেহীর চলিয়া যাইবার পরে ধীরে ধীরে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

দীনেশ আজিও অফিসে যায়; কাজের অবসরে বিশ্রাম করে, সঙ্গে সঙ্গে নীরবে কি একটা পুরাতন কথা ভাবে।

ত্রিনয়নী তাহাকে বিবাহের জন্ত কত অনুরোধ করিয়াছেন, কত আশার চিত্রও সম্মুখে ধরিয়াছেন, কিন্তু দীনেশ টলে নাই। সে নীরবে আপনার জেদ বজায় রাখিয়াছে।

প্রতিদিন দৃষ্টি যেন কাহার খোঁজ করে, মনের কোণে কে যেন কাঁদিয়া অন্ধকারেই কাহার স্পর্শ পাইতে চায়—কিন্তু পায় না!…সে যেন ধীরে ধীরে সরিয়া যায় আরও দূরে।

দিন চলিয়া যায়, রাত্রের অন্ধকার ধরণীর বুকের উপরে অঞ্চল বিছাইয়া দেয়।…

শ্রাবণের অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা…।

জলের ঝাপটার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাতাস উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিতেছিল।

কি একটা কাজে আজ অফিসের বাহির হইতে দীনেশের বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরে কয়েকটা পথ ঘুরিতেও দেরী হইয়াছিল। কাঁধের উপরে ছাতা লইয়া সে ধীরে ধীরে পথ চলিয়াছিল। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পরে যেন আর চলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সরু পথ। পথে লোক প্রায় ছিল না, শুধু অদূরে গলির মোড়ে যে একখানা মোটর দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই আলোদুইটা যেন দৈত্যের দুইটা জলন্ত চক্ষের মত বোধ হইতেছিল।

দীনেশ সেই দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইতেছিল। মোটরের নিকটে আসিয়া হঠাৎ তাহার চলা থামিয়া গেল। মনে হইল, মোটরের দুয়ারের নিকটে দাঁড়াইয়া যে নারী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে সে যেন তাহার পরিচিতা। দীনেশ দাঁড়াইল; একটা নাম তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অস্ফুট'বাহির হইয়া আসিল—"বৈদেহী—।"

নারী ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

নিকটস্থ উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে দীনেশ দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ মূল্যবান অলঙ্কারে পূর্ণ, শাড়ীর অঞ্চল পথের উপরে লুটাইতেছে,—মুখে হাসি, চোখে তীব্র দৃষ্টি।

সে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, কহিল—"চিনতে পেরেছেন তা হ'লে! আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

তাহার এ-কথার উত্তর দীনেশ দিল না, সে শুধু তীব্র-দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

বৈদেহী তেমনি হাসিয়া কহিল—"অনেক দিন পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল। চলুন না মোটরে, থিয়েটার থেকে একসঙ্গে ফিরবার পথে আপনাকে আপনার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আসবো এখন।"

দন্তে ওষ্ঠ 'চাপিয়া' ধরিয়া দীনেশ গর্জ্জিয়া উঠিল—"শয়তানী!—"

বৈদেহী নীরবে হাসিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিল না। দীনেশও আর সেস্থানে দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল;—পশ্চাৎ হইতে রুদ্ধস্বরের ডাক আসিল—"দীনেশ বাবু—"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

কাশ্মীরের পথে

শ্রীমতী সান্ত্বনা নিয়োগী

লাহোরে আসিয়া অবধি কাশ্মীরে বেড়াইবার ইচ্ছা খুবই প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু সুযোগ হইয়া ওঠে না। আমরা ১লা জুলাই অবশেষে একদিন সত্যসত্যই কাশ্মীরের জন্য লাহোর হইতে রওনা হইলাম।

আমরা লাহোর হইতে ট্রেনে উঠিয়া কোনরকমে গুছাইয়া বসিলাম কিন্তু সে Passanger ট্রেন তো চলিতেই চায় না; মনে হইতে লাগিল যে হাঁটিয়া আসিলে বোধ হয় এর চেয়ে আগে আসিতে পারিতাম। রাত্রিটা একরকমে কাটিল। ভোর হইতেই দেখি পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে;

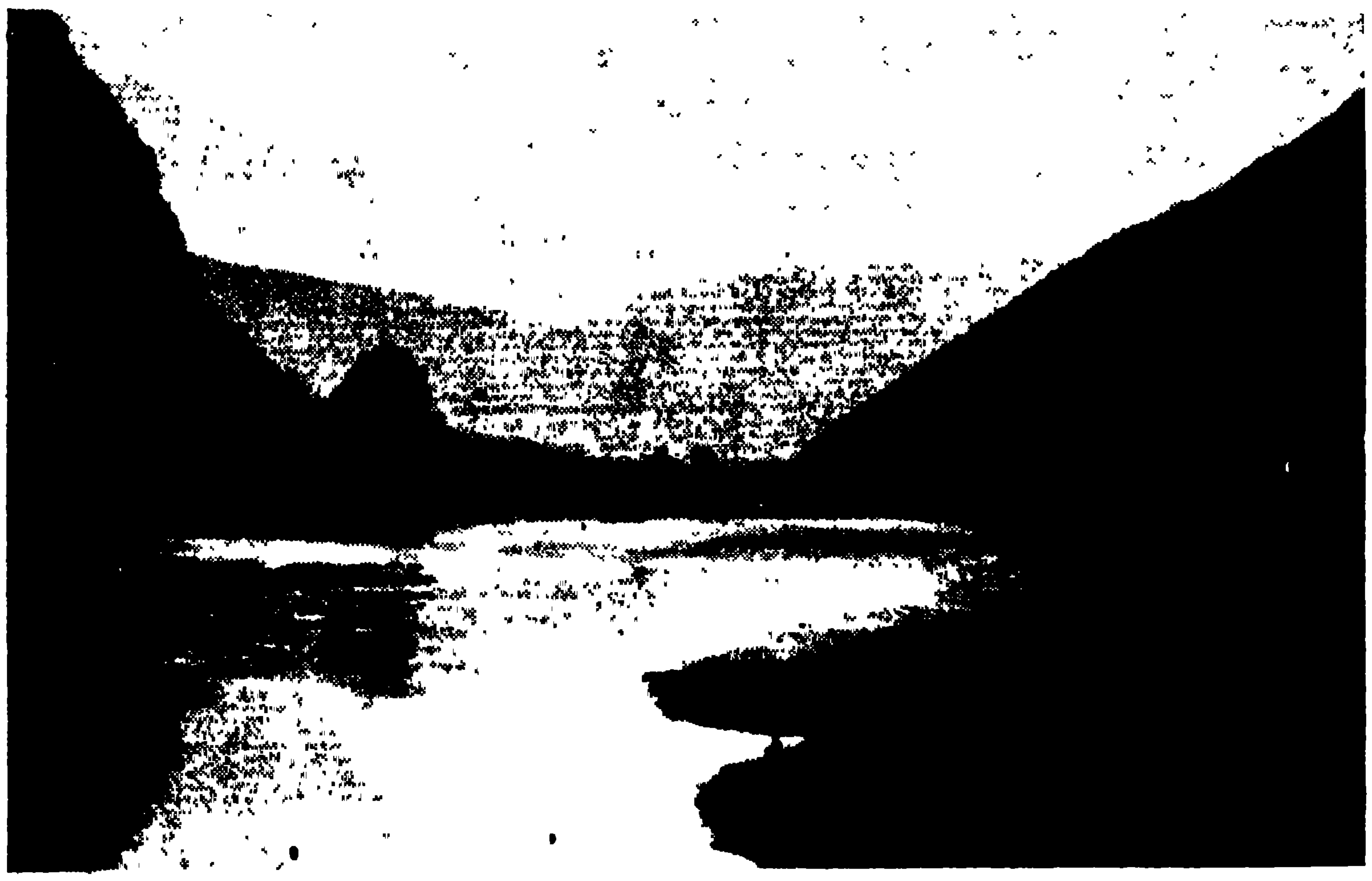

শ্রীনগরের পথে—ঝিলাম নদী

ছোট-বড় উঁচু-নীচু নানারকমের পাহাড়ের মধ্য দিয়া ট্রেন চলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে আবার কাটা সুড়ঙ্গের মধ্যে চলে। বেলা ৯টার সময়ে আমরা রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিতেই দলে দলে মোটারওয়ালারা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল; প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে তার মোটরে যাই। কোনরকমে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ডাক-বাঙ্গালায় আসা গেল। সেদিনটা আমরা ডাক-বাঙ্গালাতে কাটাইলাম।

পরদিন বেলা ১টার সময় আমরা মোটরে করিয়া কাশ্মীরের অভিমুখে রওনা হইলাম। মোটর খানিক দূর পর্য্যন্ত বেশ সমানভাবে চলিল, তাহার পরই পাহাড় আরম্ভ হইল—প্রথমে নীচু নীচু পাহাড়, পরে ক্রমেই বড় বড়। এক-এক জায়গায় এমন খাড়া উঠিতে হইতেছিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল মোটরখানা পিছনদিকে বুঝি গড়াইয়া পড়ে। একপাশে উঁচু পাহাড় অন্যপাশে গভীর খাদ; মোটর-চালক যদি সামান্য একটু অসাবধান হয় তাহা হইলে মোটর-খানা সবশুদ্ধ সেই গভীর খাদের মধ্যে পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। এমনি করিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া মোটরখানা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। যতই উপরে উঠিতে লাগিল ততই পাহাড়ের গায়ে পাইন গাছের জঙ্গল দেখিতে লাগিলাম। উপরে-নীচে চারি-দিকে কেবল পাহাড় আর পাইন গাছ। দৃশ্য খুবই সুন্দর তবে যাঁরা দার্জ্জিলিং দেখিয়াছেন তাঁহাদের কাছে নূতন নয়। ক্রমে আমাদের মোটর 'মরি' (Murrie) আসিয়া পৌঁছিল। আমরা সেখানে না থামিয়া সোজা চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গায়ে ঝরণার জল দিয়া চাষারা থাকে থাকে ক্ষেত করিয়াছে,—দেখিতে বড় সুন্দর। Murrie পার হইবার পর মোটর নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। এইবার কখনো উপরে কখনো নীচে পাহাড়ের গা বাহিয়া মোটর চলিতে লাগিল Murrie পার হইবার খানিক পরেই নীচে সরু নালার মত জল দেখিতে পাওয়া গেল। সেইটাই ঝিলাম নদী। ইহার পর হইতে মোটর অনেক উঁচুতে সেই ঝিলাম নদীর ধার

দিয়াই চলিতে লাগিল। এই রকমে যাইতে যাইতে আমাদের মোটর কোহালা (Kohala) নামে এক জায়গায় আসিয়া থামিল। এইখানেই বৃটিশ রাজত্বের শেষ। এখানে ঝিলাম-নদীর উপর একটি পোল আছে, তাহার ওপার হইতে কাশ্মীররাজত্বের আরম্ভ।

ভূ-স্বর্গে

ঝিলাম নদীর পুল পার হইয়া মোটর আবার পাহাড়ের গা দিয়া চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, ডাক-বাঙ্গালা আসিতে এখনও দেরী আছে, সেইজন্য মোটর থামিতে

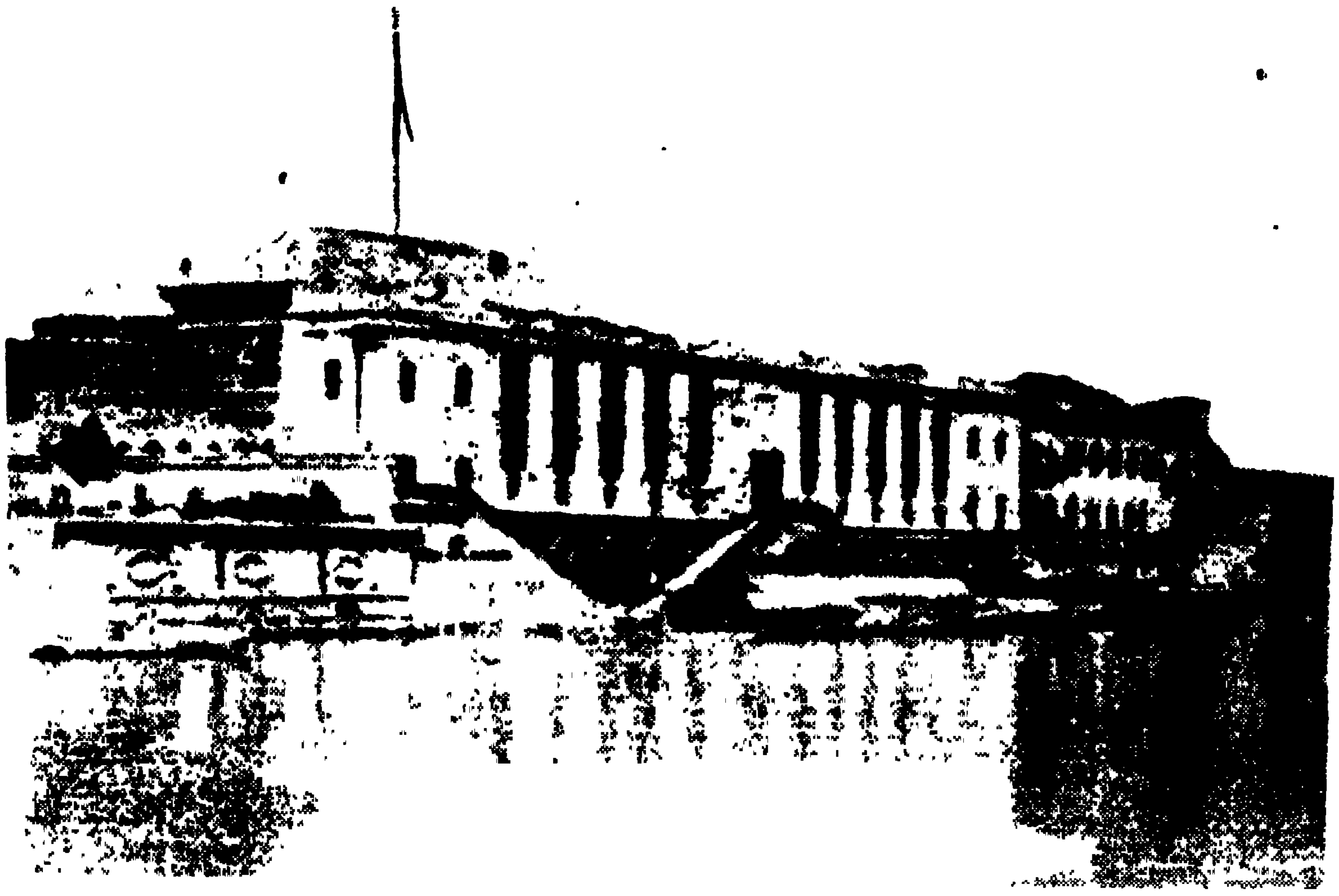

রাজপ্রাসাদ—শ্রীনগর

পারিল না। অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের গা দিয়া যাইতে বেশ একটু ভয় করিতেছিল। কোহালা অবধি রাস্তা ভাল ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতেই রাস্তা দুর্গম হইয়াছে। স্থানে-স্থানে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িয়াছে; কোনখানে দুইটি বড় পাহাড় সামান্য একটি কাঠের পুল দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পথে অনেক পাহাড়-কাটা সুড়ঙ্গ আছে। আমাদের মোটর সন্ধ্যার অন্ধকারে এই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিকে তাকাই প্রকাণ্ড পাহাড় এবং নীচে ঝিলাম নদী। ক্রমে আমরা দোমেল (Domal) নামক এক ডাক-বাঙ্গালায় আসিয়া পৌছিলাম।

সে রাত্রিতে ডাক-বাঙ্গালায় রহিলাম। এখানে ঝিলাম-নদী ও কৃষ্ণগঙ্গা নামে আর একটি নদী একত্রে মিলিয়াছে বলিয়া ইহার নাম "দোমেল" হইয়াছে। এই ডাক-বাঙ্গালাটি ঝিলাম নদীর ঠিক উপরেই; সমস্ত রাত্রি ঝিলাম-নদীর গর্জ্জন শুনিলাম। ভোরে উঠিয়া নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিলাম।

বেলা হইলে মোটর করিয়া রওনা হইলাম। আবার সেই পথ বাহিয়া মোটর চলিতে লাগিল। এইবার আমরা সামনে বরফের পাহাড় দেখিতে পাইলাম। এই পথে অনেক পরিষ্কার ঝরণার জল পাওয়া গেল। এই সব জল খুব ঠাণ্ডা। ক্রমে ক্রমে আমরা বরফের পাহাড়ও পার হইয়া গেলাম। এখনও সেই ঝিলাম নদী আমাদের পাশে চলিয়াছে। পথে রামপুর নামক স্থানে Power-House দেখিতে পাইলাম। অনেক উপরে ঝিলাম-নদী হইতে নালা করিয়া জল পাহাড়ের উপর দিয়া আনিয়া Power-House চালানো হইতেছে। ক্রমে আমরা বারামুলা নামক স্থানে আসিলাম। ইহা সমতলভূমি। এ স্থান হইতে রাস্তা সোজা শ্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে পপলার বৃক্ষের শ্রেণী। আমরা এইবার ঝিলাম নদী বাঁ-দিকে রাখিয়া শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

শ্রীনগরে

এইরূপে চলিতে চলিতে বেলা প্রায় ৫টার সময় আমরা শ্রীনগরে পৌছিলাম। শ্রীনগরে "মোতিমে দরবার" নামে একটি আপিস আছে; এই আপিসে চিঠি লিখিলে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। আমাদেরও সেখানে চিঠি লেখা হইয়াছিল। শ্রীনগরে পৌছিয়া আমরা

"মোতিমে দরবারের" খোঁজ করিলাম। সেখানে যাইয়া খবর পাইলাম যে আমাদের জন্য হাউস-বোট ঠিক করা হইয়াছে। আমরা মোটর হইতে হাউস-বোটে গিয়া উঠিলাম। এই হাউস-বোটগুলি নানারূপ আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত থাকে। একটি হাউস-বোট, একটি রান্নার জন্য বড় নৌকা এবং বেড়াইবার জন্য একটি শিকারা একসঙ্গে ভাড়া পাওয়া যায়। প্রতি হাউস-বোটের সঙ্গে একজন মাঝি সপরিবারে ঐ রান্নার নৌকায় বাস করে। আমরা একদিনেই সব গুছাইয়া লইলাম। পরদিনই শ্রীনগরের বাঙালীদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এখানকার বাঙালীরা আমাদের পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন। এবং আমাদের সকল বিষয়ে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

নদীবক্ষে—শিকারা

শ্রীনগরে সহরের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী চলিয়া গিয়াছে। পর পর সাতটি পুল দিয়া দুই তীরে যাতায়াত করা যায়। এখানে পুলকে কদল বলে। এই সাতটি পুলের স্বতন্ত্র নাম আছে, যথা আমিরা কদল, ফতে কদল ইত্যাদি। শ্রীনগরে অনেক দোকান আছে। ঝিলাম নদীর তীরে বড় বড় দোকান; এইসব দোকানে শিকারা করিয়া যাইতে হয়। ফিরিওয়ালাগণ শিকারা করিয়া হাউস-বোটে আসিয়া সমস্তক্ষণ বড়ই বিরক্ত করে। আমরা দুই দিন সহর বেড়াইয়া আসিলাম। একদিন এখানকার Power-House ও Silk Factory দেখিতে গেলাম। এই Factory পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় Silk Factory বলিয়া শুনিলাম। এখানে গুটিপোকা হইতে রেশম বাহির করা হয়; সেইসব রেশম ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানাদেশে চালান যায়।

আমরা একদিন শিকারা করিয়া নিষাদবাগ, Dal Lake, শালাবাগ, নসিমবাগ দেখিয়া আসিলাম। Dal Lake একটি প্রকাণ্ড হ্রদ; চারিদিক হইতে পাহাড়ের ঝরণার জল আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে। ইহার মাঝে একরকম ঘাস জন্মায়, সে ঘাসের গোড়া খুব শক্ত। এই ঘাসের উপর মাটি ফেলিয়া চাষারা নানারকম তরি-তরকারি উৎপন্ন করে। এইসব ক্ষেত সরাইয়া লওয়া যায়। এ-রকম ভাসমান ক্ষেত্র আর কোথাও দেখি নাই। Dal Lake-এর এক পাশে পাহাড়ের গায়ে "উপকার" নামক স্থানে যুবরাজ হরিসিংহের প্রাসাদ। ইহার একটু দূরেই পাহাড়ের গায়েই একটি ঝরণা ও বাগান আছে, তাহার নাম "চশমাসাহি"। এখানে ঝরণার নাম "চশমা"। পাতিয়ালার মহারাজার তাঁবু এখানে পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের দেখিবার সুবিধা হইল না।

ইহার পর নিষাদবাগ, এটাও একটা পাহাড়ের গায়ে বাগান এবং একটা ঝরণাকে স্তরে স্তরে বাঁধিয়া আনিয়াছে। এই জল ক্রমে ক্রমে পনেরটি তালা অতিক্রম করিয়া Dal Lakeএ আসিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন তালায় পুকুরের মত, কোথাও বা চৌবাচ্চার মত হইয়াছে; ইহাতে অনেক ফোয়ারাও আছে। এখানে যে দিকে চাই কেবলই ফুল! কাশ্মীরে সর্ব্বত্রই খুব ফুল; —ফুলে ফুলে দেশটি ছাইয়া আছে।

নিষাদবাগ দেখিয়া আমরা "শালাবাগ" দেখিতে গেলাম। আবার "ডাল লেকের" মধ্য দিয়া শিকারা চলিতে লাগিল। "ডাল লেক" পদ্মফুলে ভরিয়া আছে; এই পদ্ম তুলিবার হুকুম নাই; আমরা পদ্মের পাতা তুলিয়া আনিয়াছিলাম। শালাবাগও নিষাদবাগের মত একটি বাগান; এখানেও সেই রকম ফুল ও ঝরণা—তবে এখানে ফোয়ারার সংখ্যা বেশী। এখানে ফোয়ারার মধ্যস্থলে ঝরণার উপর একটি পাথরের

প্রাসাদ আছে; এই পাথর এত চকচকে যে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের মুখ দেখিতে পাইলাম। নিষাদবাগেও এইরূপ বাড়ি আছে, তবে তাহাতে এরূপ চকচকে পাথর নাই।

শালাবাগ দেখিয়া আমরা "নসিমবাগ" দেখিতে গেলাম। এখানে শুধু চিনার গাছ। স্থানটি বড় সুন্দর; অনেক ইংরাজ এখানে তাঁবু ফেলিয়া রহিয়াছে। এখান থেকে Dal Lake এর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।

পূর্ব্ব দিকে যাইতে লাগিলাম। পথে একস্থানে একটি পাথরের মন্দির দেখিলাম; ইহার নাম "পাণ্ড্রথান"। প্রবাদ আছে, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের সময় এইস্থানে আসিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আরো কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা অবন্তীপুর নামক স্থানে আসিলাম। এখানেও অতিপ্রাচীন একটি মন্দির রহিয়াছে। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে একটি দীঘি। দীঘির মাঝখানে মন্দিরটি বড়ই

ডাল লেকের একটি দৃশ্য

পথে চিনারবাগ দেখিয়া আমরা নৌ-গৃহে (House-Boat) ফিরিয়া আসিলাম। আমরা প্রথমে যে হাউস্-বোটে আসিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা ছাড়িয়া দিয়া সুবিধামত অন্য একটি হাউস্-বোট ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। এইবার আমরা ইসলামাবাদ দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

আমরা হাউস্-বোট লইয়া ঝিলাম নদী দিয়া আরো

সুন্দর দেখায়; দীঘিতে এখন এক-ফোঁটাও জল নাই। ইহা একেবারে মাটির নীচে পুঁতিয়া গিয়াছিল, মাটি খুঁড়িয়া ইহাকে বাহির করা হইয়াছে।

ইহার পর সঙ্গম নামে একটি জায়গায় আসিলাম। এই স্থানে ঝিলাম নদীর দুইটি শাখা একত্রে মিশিয়াছে, তাই ইহার নাম "সঙ্গম" হইয়াছে। এখানে একটি পুল আছে। কিছু পরে একটি চিনার গাছ দেখিলাম। সমস্ত কাশ্মীরের

মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিনার গাছ। ইহার গুঁড়ির বেড় ৫৪ ফিট; গাছের তলা খানিকটা বাঁধাইয়া রাখা

ডাল লেক—শ্রীনগর

হইয়াছে। ইহার পরে আমরা "খানাবলে" আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার পরে আর নৌকা যাইতে পারে না; কাজেই আমাদের এখানে থামিতে হইল। ইহার এক মাইল উত্তরে ইসলামাবাদ সহর।

ইসলামাবাদে

আমরা ঝিলাম নদীতে হাউস্-বোটে রহিয়াছি। কাল রাত্রে পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; আজ বেলা ৭টা হইতে নদীর জল বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জলের কি স্রোত! স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে কত কাঠ, কাঠের কুচি, ব্যাং, বিছা, পোকামাকড়, পাখীর ছানা ভাসিয়া আসিতেছে। এখন বেলা ১২টা, এখনও সে খরস্রোত কমে নাই।

এখানে আসিয়া আমরা প্রথমে মোগল নন্দন-কানন "আচ্ছাবল" দেখিতে যাই। এই বাগান নূরজাহান বেগমের অতি আদরের স্থান ছিল। ইহা একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের গায়ে তৈরী; ইহাতে অনেক ঝরণা আছে। বাগানটি খুবই সুন্দর।

ইসলামাবাদে একটি গন্ধকের ঝরণা আছে। এই ঝরণার পাথর ফুঁড়িয়া জল বাহির হইতেছে; এই জলে গন্ধকের উগ্র গন্ধ—লোকে বলে এই জলে স্নান করিলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়, পান করিলে অজীর্ণদোষ ভাল হয়।

ইসলামাবাদে আর একটি ঝরণা আছে, তাহার নাম "অনন্তনাগ"। এটি একটি তীর্থস্থান; এখানে অসংখ্য মাছ দেখিলাম। আমরা এক একটি রুটি ফেলিতে লাগিলাম, আর হাজার হাজার মাছ আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল। তীর্থস্থান বলিয়া এখানকার মাছ ধরিবার হুকুম নাই।

সেদিন এখান হইতে আট মাইল উত্তরে একটা বড় পাহাড়ে গিয়াছিলাম। এটি একটি বড় তীর্থস্থান, ইহার নাম "মার্ত্তণ্ড"। এখানেও একটি বড় ঝরণা বহিতেছে এবং "অনন্তনাগের"। মত মাছ দেখিলাম। এখানে অনেক গুহা দেখা যায়; এই সব গুহায় পূর্ব্বকালে সাধুসন্ন্যাসীরা তপস্যা করিতেন। পাহাড়ের অনেক উপরে একটি প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে পাথরের কারুকার্য্য করা শিবমন্দির। প্রবাদ যে এটি পাণ্ডবদের সময়ের, ৫০০০ হাজার বছরেরও আগেকার। এটি একটি বিশেষ দেখিবার জিনিষ। নীচেই লম্বোদরী নদী (লিড্ডর) বহিয়া যাইতেছে—প্রকাণ্ড নদী, আর কি ভয়ানক তাহার স্রোত! এই পথ দিয়া অমরনাথ যাইতে হয়। সারাদিন আমরা এখানে কাটাইয়া সন্ধ্যার

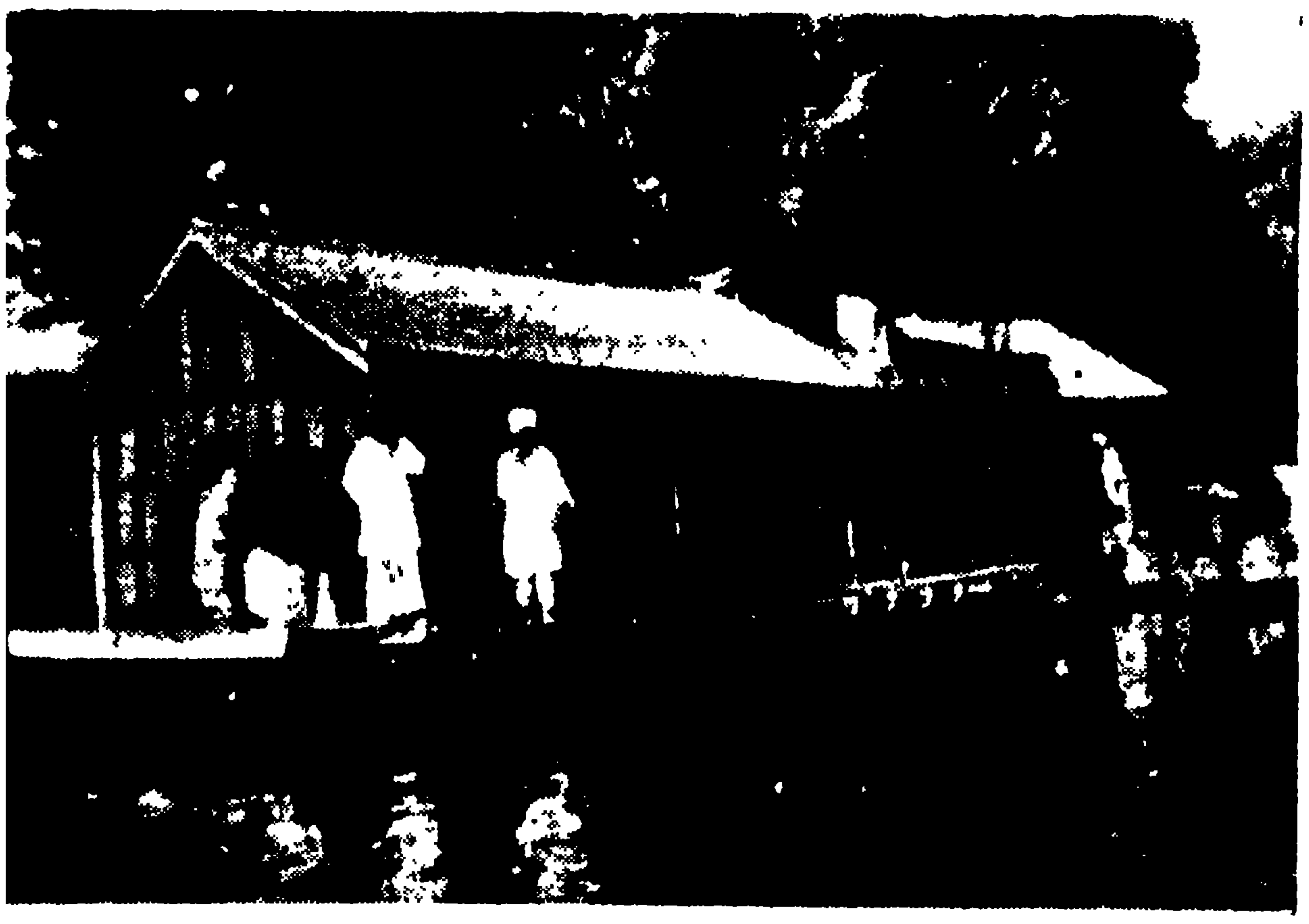

হাউস্-বোট

পর হাউস-বোটে ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর একদিন আমরা ঝিলাম নদীর উৎপত্তিস্থল

(ভেরিনাগ) দেখিবার জন্য টাঙ্গা করিয়া রওনা হইলাম। সতেরো মাইল যাইবার পর শুনিলাম রাস্তা মেরামত হইতেছে, পথ বন্ধ, তখনও তিন মাইল পথ বাকী। ছোট ছোট ছেলেপুলে লইয়া পাহাড়ের তিন মাইল পথ হাঁটিয়া চড়া-নামা সোজা কথা নয়, কাজেই আমাদের ওখান থেকেই ফিরিয়া আসিতে হইল। আরো যে কয়েকটি দেখিবার জায়গা ছিল সবই শুনিলাম, তিন-চারি মাইল হাঁটিতে হইবে, থাকিতাম। এখানে অনেকগুলি ফলের বাগান আছে; ফলের গাছগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। বাগানে গিয়া যে-দিকে তাকান যায়, দেখা যায় যে কেবল গাছভরা আপেল আর নাসপাতি; গাছের পাতা দেখা যায় না, কেবল ফল ঝুলিতেছে। আমরা খুব ফল কিনিতাম। সস্তাও খুব; এক পয়সায় ৬টা নাসপাতি,—এক পয়সায় ছয়টা আপেল। আঙ্গুর এখনও পাকে নাই। অন্যান্য নানারকম ফলও

সিন্ধু উপত্যকায় বরফের নদী

—অগত্যা সে গুলির দেখিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। খানাবলে কয়েকদিন থাকিয়া আমরা আবার শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীনগরে দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা হাউস্-বোট লইয়া নসিমবাগে গিয়া সেখানে কয়েকদিন রহিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থানটি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। এখানে সারাদিন চিনার গাছের নীচে বসিয়া আছে; সবই খুব সস্তা। এখানে খুব মাছ পাওয়া যায়। সন্ধ্যা হইলেই দলে দলে জেলেরা নৌকা লইয়া Dal Lakeএ মাছ ধরিতে আসে। এখানে কয়েকদিন থাকিয়া আমরা আবার শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলাম এবং পরদিন "গুলমার্গ" রওনা হইলাম। গুলমার্গ যাইতে হইলে ৩০ মাইল মোটরে যাইতে হয়, তারপর ঘোড়া অথবা ডাণ্ডি করিয়া ৩ মাইল

চড়াই উঠিতে হয়। পাহাড়ের উপরে বড় ময়দান আছে, উহারই নাম গুলমার্গ। গুলমার্গ সমুদ্রস্তর হইতে ৮০০০ হাজার ফিট উঁচু; জায়গা ভয়ানক ঠাণ্ডা। আমরা মোটরে করিয়া 'গুলমার্গ' নামক স্থানে আসিয়া নামিলাম। এখান হইতে আমি ও আমার ছোট মেয়ে ডাণ্ডিতে এবং অন্য সকলে ঘোড়ায় "গুলমার্গে" আসিলাম।

ঘোড়ায় চড়িয়া আরো উঁচুতে উঠিতে লাগিলাম। গুলমার্গ হইতে খেলানমার্গ পাঁচ মাইল চড়ায়ের রাস্তা। এক এক স্থানে এমন খাড়া চড়াই যে ভয়ানক ভয় করিতেছিল; কিন্তু এই ঘোড়াগুলি পাহাড়ের রাস্তায় এত ভাল চলিতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। চার মাইল পথ পার হইয়া আসিবার পর আমরা ময়দানের মত এক স্থানে

শ্রীনগর—কাশ্মীর

গুলমার্গে

গুলমার্গে আসিয়া সেইদিনই ময়দানে বেড়াইয়া আসিলাম। এত উঁচুতে এতবড় ময়দান আর কোথাও নাই। কাছেই বরফের পাহাড় দেখা গেল। পরদিন আমরা "খেলানমার্গ" দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গুলমার্গ হইতে যে বরফের পাহাড় দেখা যায়, তাহারই নাম "খেলানমার্গ"। আমরা সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া এবং খাবার সঙ্গে লইয়া

আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম; এখানে একটা ঝরণার ধারে সকলে বসিয়া খাইয়া লইলাম। সুখের বিষয় সেদিন একটুও বৃষ্টি হয় নাই। নতুবা এসব স্থানে প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোড়ায় চড়িয়া আরো এক-মাইল উপরে উঠিলাম। ইহার পর আর ঘোড়া যায় না, সুতরাং আমাদের ঘোড়া হইতে নামিয়া হাঁটিয়া উপরে উঠিতে হইল। খানিক দূর অগ্রসর হইবার পর আমরা বরফ দেখিতে পাইলাম। আমরা একটু পথ চলি, আর

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, এই ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আমরা বরফের উপর

শা-উদ্দিনের মস্‌জিদ্‌—শ্রীনগর

আসিয়া পড়িলাম; বরফ দেখিয়া পথের সকল কষ্ট সার্থক মনে হইল। এখানে এত ঠাণ্ডা যে ২০শে আগষ্টও বরফ জমিয়া রহিয়াছে। এ জায়গা সমুদ্রস্তর হইতে দশ হাজার ফিট উঁচু। একটা ঝরণার উপর বরফ জমিয়া রহিয়াছে—নীচে সরু হইয়া একস্থানে জল পড়িতেছে। আমরা খানিকক্ষণ বরফের উপর হাঁটিয়া বেড়াইলাম, আমাদের জুতা একেবারে ভিজিয়া গেল। সকলেই বরফ ভাঙিয়া এ উহার গায়ে ছুঁড়িতে লাগিল। যেখানে জল পড়িতেছে সে যায়গাটা বড় মজার; উপরের বরফ-তলা দিয়া জল পড়িতেছে। আমরা পাথর দিয়া উপরের বরফ ভাঙিয়া ফেলিলাম এবং সেখানে সকলে গিয়া নামিলাম। যেখান হইতে জল আসিতেছে সেখানে মাথা বাড়াইয়া দিয়া দেখিলাম যে ভয়ানক ঠাণ্ডা ভাপ আসিতেছে। এক মিনিটের বেশী কেহ মাথা রাখিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ সেখানে উপভোগ করিয়া আমরা ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। একজন পাঞ্জাবী বন্ধু আন্দাজ ১৫ সের ওজনের একটুকরা বরফের চাপ কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। খানিকদূর নামিবার পর যেখানে আমাদের ঘোড়া অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। চড়াই উঠিতে কষ্ট,—নামিতে বিশ্রাম নিতে হয় না। আমরা আবার সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলাম—এবার উৎরাইয়ের পালা। আমরা খুব সাবধানে নামিতে লাগিলাম; অবশ্য আমাদের কিছুই করিতে হয় নাই, ঘোড়াগুলিই বেশ সাবধানে আসিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে সকলে গুলমার্গে ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন যে রকম আমোদ পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিবার নয়। খেলানমার্গ দেখিয়া আমাদের কাশ্মীরে আসা সার্থক মনে হইতে লাগিল। আমাদের পাঞ্জাবী বন্ধুটি যে বরফের চাপ আনিয়াছিলেন, তাহা গলিতে গলিতে দুই দিন পর্য্যন্ত ছিল। পরদিন সকলেই গৃহে বদ্ধ থাকিয়া বিশ্রাম করিলাম,—কারণ দশ মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের সর্ব্বশরীরে ব্যথা হইয়াছিল।

গুলমার্গে অনেক সাহেব-মেম আসিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংএর মত বাড়ী-ঘর ক্লাব-হোটেল-দোকান ইত্যাদি

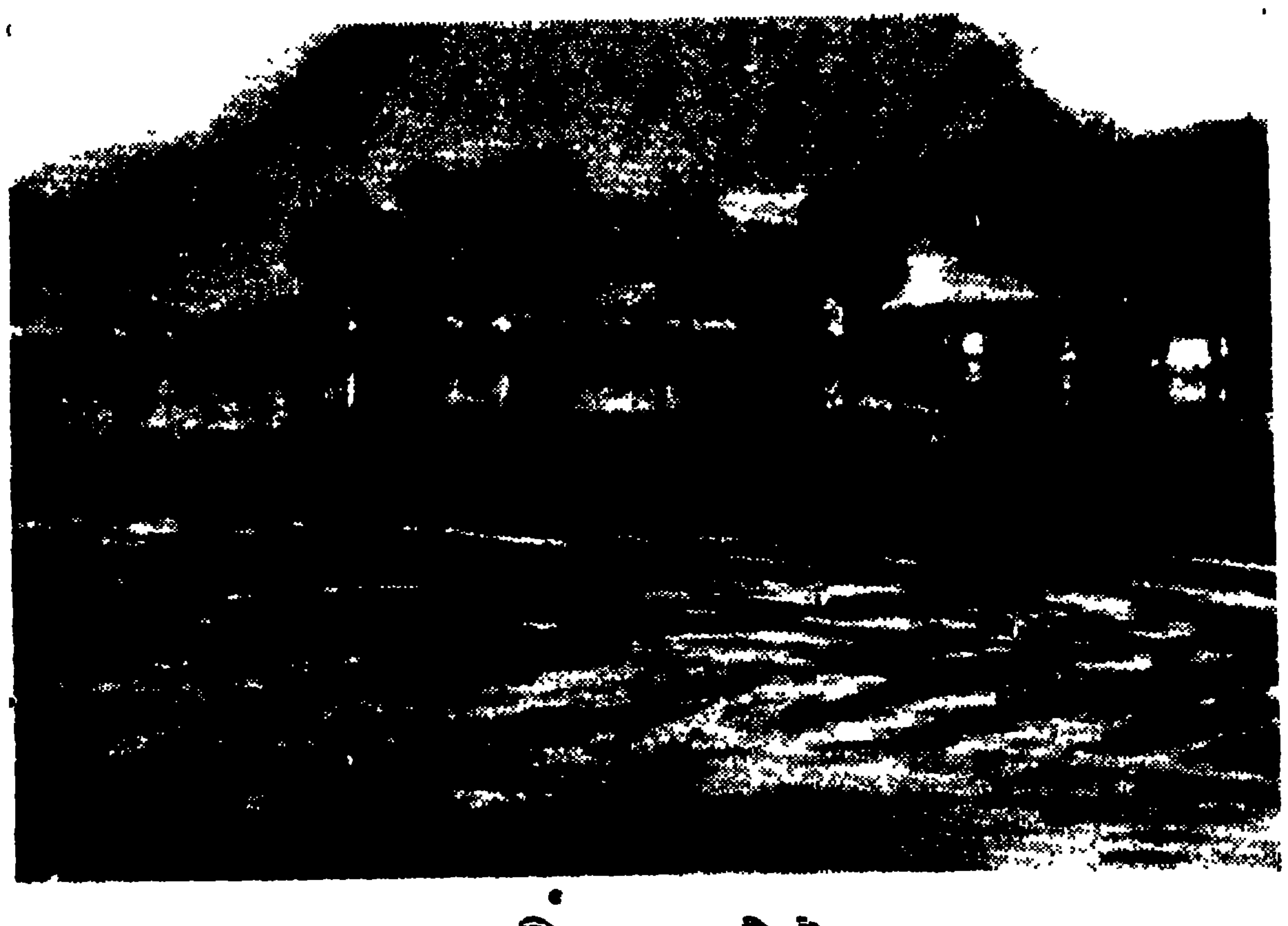

শ্রীনগর—নদীতীর

সব আছে। গুলমার্গের চারিদিকে পাহাড়, সেই পাহাড়ের পিছনে একটা রাস্তা সমস্ত সহরকে ঘুরিয়া আসিয়াছে—ইহার নাম আউটসার্কুলার রোড নয়, ডাণ্ডিসড়ক। এই রাস্তাটি পনেরো মাইল লম্বা।

আমরা যে-কয়দিন ছিলাম খানিক খানিক করিয়া এই ডাণ্ডিসড়কে বেড়াইতাম। এই পথটি খুবই সুন্দর—একপাশে পাহাড় অন্য পাশে গভীর খাদ। এই রাস্তার চারিদিক হইতে সমস্ত কাশ্মীর দেখা যায়। সমস্ত কাশ্মীরের মধ্যে আমাদের গুলমার্গই বেশী ভাল লাগিল। দশ দিন গুলমার্গে

ঝাউ-বীথি

থাকিয়া আমরা আবার শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলাম এবং পরদিনই গান্ধর্ব্বল রওনা হইলাম।

গান্ধর্ব্বলে

শ্রীনগর হইতে সকালে রওনা হইয়া আমরা সন্ধ্যাবেলা সাদিপুর নামক স্থানে বোট লাগাইলাম। এখানে সিন্ধু নদ ও ঝিলাম নদী একত্রে মিলিয়াছে, সেইজন্য ইহার নাম সাদিপুর হইয়াছে। এই দুই নদ ও নদীর মিলনস্থানে জলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা চিনার গাছ রহিয়াছে, ইহার গোড়া বাঁধান। এই গাছের নীচে একটি শিবলিঙ্গ আছে। আমরা শিকারা করিয়া গিয়া দেখিয়া আসিলাম। পরদিন ভোরেই আমাদের বোট ছাড়া হইল। এবার আমরা সিন্ধু নদ দিয়া যাইতে লাগিলাম; সিন্ধু নদের জল—জলমিশান দুধের মত রং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বেলা চারটার সময় আমরা গান্ধর্ব্বল আসিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে নদের মাঝখানে খানিকটা চড়া পড়িয়াছে; এ যায়গাটা দেখিতে খুব সুন্দর। এইখানে ছায়া দেখিয়া আমাদের বোট বাঁধা হইল। পরদিন ঘোড়ায় করিয়া আমরা "আঙ্গুরীবাগ" ও "মানসবল" হ্রদ দেখিতে যাইব ঠিক হইল। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করিয়া খাবার সঙ্গে লইয়া আমরা প্রথমে ছয় মাইল দূরে আঙ্গুরীবাগ দেখিতে গেলাম। ছোট ছোট আঙ্গুরের মাচা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে থরে থরে আঙ্গুর ফলিয়া রহিয়াছে। এই বাগানের কর্ত্তা আমাদের একথোকা আঙ্গুর উপহার দিলেন; এই থোকাটি ওজনে ৴২॥ সের ৴৩ সেরের কম হইবে না। এই বাগান দেখিয়া আরো তিন মাইল দূরে আর একটি আঙ্গুরীবাগ দেখিতে গেলাম। এটাও পূর্ব্বের মত—তবে বাগানটি আরো বড়।

আঙ্গুরীবাগ দেখিয়া আমরা "মানসবল" হ্রদ দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সামনেই প্রকাণ্ড পাহাড়; সেই পাহাড় পার হইলে তবে হ্রদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পথটাও বড় খারাপ। পাহাড়ের উপর পৌঁছিলে হ্রদের নীল জল দেখিতে পাওয়া গেল। পাহাড়ের উপর হইতে হ্রদটি বড় সুন্দর দেখায়। আমরা ক্রমে পাহাড় পার হইয়া নীচে নামিলাম। হ্রদের ধারে একটি চিনার গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি পাতিয়া সকলে বসিলাম; কিছু জলযোগ করা হইল। তারপর শিকারা করিয়া হ্রদে বেড়াইতে গেলাম। হ্রদের ধারে কয়েকটি ফলের বাগান। আমরা বাগানে যাইতেই বাগানের মালী বলিল যে আমরা নিজেরা ইচ্ছামত গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইতে পারি। আমরা পেট ভরিয়া ফল খাইয়া মালীকে কিছু বকশিস দিয়া একটি পুরানো কেল্লা দেখিতে গেলাম। এই কেল্লার মাটির নীচে কয়েকটা ঘর রহিয়াছে, আর সব ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ হ্রদে বেড়াইয়া আবার হ্রদের ধারে গাছতলায় আসিয়া

বসিলাম। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা কাঠকুটা জ্বালিয়া আগুন করিল, টিফিন-কেরিয়ারের বাটী করিয়া চায়ের জল গরম করা হইল এবং পাহাড়ের উপর যাহারা গরু চরাইতেছিল তাহাদের কাছ থেকে দুধ কিনিয়া আনিল। আমরা চা খাইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া আবার সেই পাহাড় পার হইয়া আসিতে লাগিলাম। পাহাড় পার হইতে না হইতেই সূর্য্য অস্ত গেল। আমরা যখন বোটে ফিরিয়া আসিমাম তখন রাত্রি নয়টা।

ইহার পর দুইদিন আমরা গায়ের ব্যাথায় বাহির হইতে পারি নাই। তাহার পর আবার "ক্ষীরভবানী" দেখিতে গেলাম। ক্ষীরভবানী একটি কুণ্ড,—ইহার মাঝখানে একটি দেবীর মূর্ত্তি আছে। এটি হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এই কুণ্ডের জলের রং বদলায়—কখন লাল, কখনো হলদে, কখনো নীল, কখনো সবুজ হয়। আমরা যে-সময়ে গিয়াছিলাম তখন লালচে ছিল।

ইহার দুইদিন পরে আমরা গান্ধর্ব্বল হইতে ফিরিয়া 'উলার লেক' দেখিতে গেলাম। আমরা হাউস-বোট লইয়া আবার সাদিপুর আসিলাম। সেখান হইতে পরদিন রাত্রি ৪টার সময় শিকারা করিয়া সারাদিনের খাবার ও জল লইয়া উলার লেক রওনা হইলাম। বেলা ১২টার সময় আমরা উলার লেকে পৌঁছিলাম। এই হ্রদটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে গভীর। ইহার পার্শ্বেই পাহাড়—মনে হয় যেন জলের মধ্য হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। ইহার কাছেই গিলিগিটের রাস্তা; এই পাহাড় পার হইলেই চীনসাম্রাজ্য। উলার লেকে যে দিকে তাকাই সেইদিকেই কেবল জল, একদিকে একটু পাহাড়। আমাদের শিকারা বেশীক্ষণ সেখানে রাখিল না, কারণ ২টার পর হইতেই সেখানে প্রতিদিন ঝড় আরম্ভ হয়। ফিরিয়া বোটে শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলাম।

শঙ্করাচার্য্যে

শ্রীনগর সহরের কাছেই একটি পাহাড় আছে তাহার নাম শঙ্করাচার্য্য; এই পাহাড়টি ৮০০০ ফিট উঁচু। ইহার উপর উঠিলে সমস্ত কাশ্মীর দেখা যায়। এখান হইতে ঝিলাম নদী বড় সুন্দর দেখায়। এক জায়গায় এই ঝিলাম-নদী ঠিক কল্কার মত বাঁকিয়া গিয়াছে; নদটি এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে যে তার মাঝের জমী ঠিক যেন একটা শালের কল্কা। শুনিলাম যে এই দৃশ্য হইতেই শালের

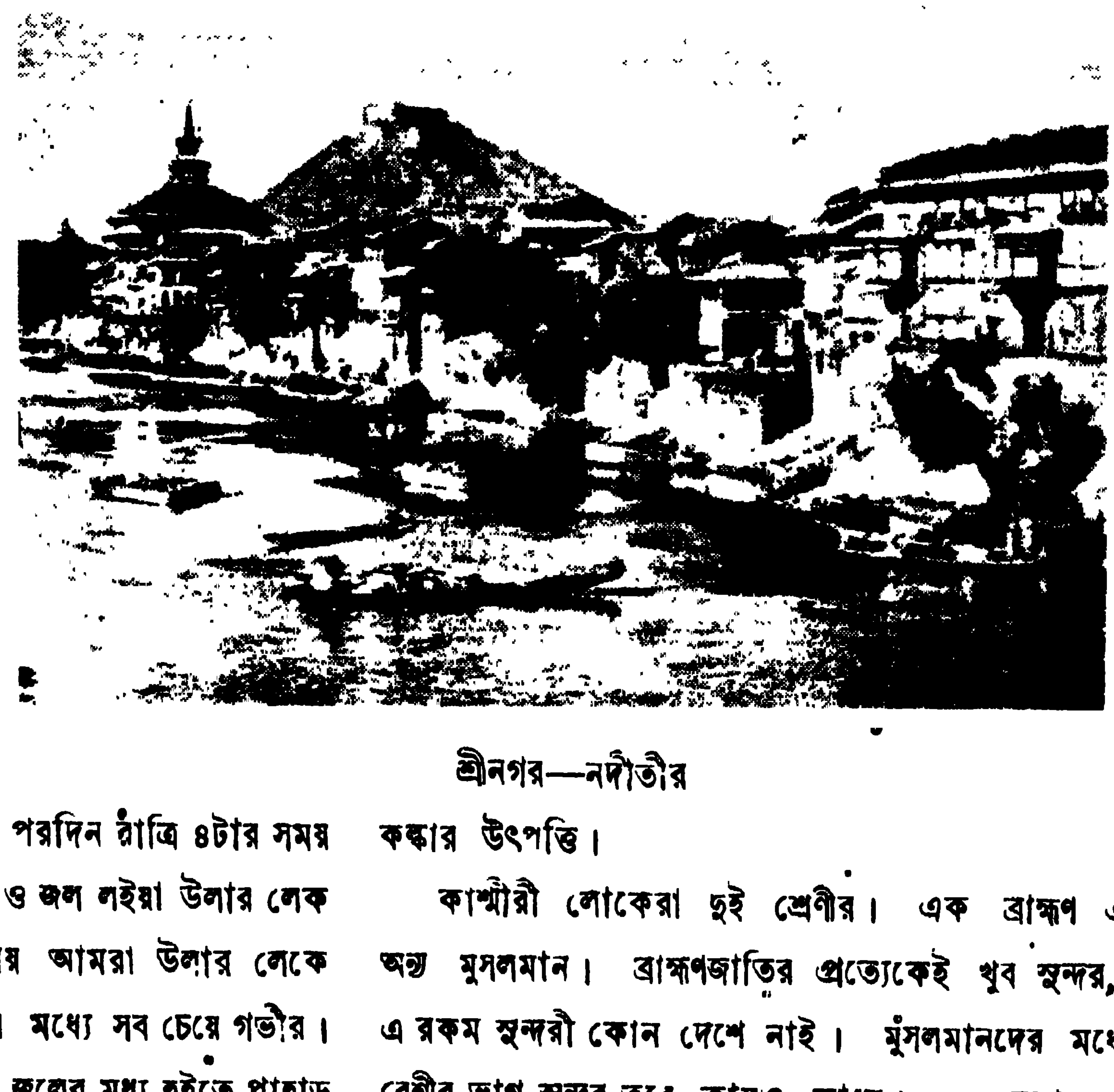

শ্রীনগর—নদীতীর

কল্কার উৎপত্তি।

কাশ্মীরী লোকেরা দুই শ্রেণীর। এক ব্রাহ্মণ এবং অন্য মুসলমান। ব্রাহ্মণজাতির প্রত্যেকেই খুব সুন্দর,—এ রকম সুন্দরী কোন দেশে নাই। মুসলমানদের মধ্যেও বেশীর ভাগ সুন্দর তবে কালও আছে। এ দেশের মত ঠগ ও জুয়াচোর আর কোথাও দেখি নাই। মিথ্যাবাদী এবং চোর এখানে অত্যন্ত বেশি। এখানকার স্বাস্থ্য একটুও ভাল নয়, সর্ব্বদাই টাইফয়েড ও কলেরা হইতেছে। ঝিলাম নদীর জল টাইফয়েড ও কলেরার বীজে পূর্ণ। আমরা প্রত্যেক কাজে কলের জল ব্যবহার করিতাম,—ঝিলাম নদীর

কাশ্মীরীরা বড় গরীব। ইহারা রুটি-লুচি কিছু খায় না; শুধু ভাত-তরকারি মাছ-মাংস খায়। ইহারা বাসন জল দিয়া ধোয় না, ছাই দিয়া মাজিয়া কাপড় দিয়া মুছিয়া রাখিয়া দেয়। এখানকার শালের কাজ সকলেই দেখিয়াছেন। এখানকার রূপার কাজও খুব সুন্দর। নানারকম চামড়ার বাক্স, জুতা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়; দামও সস্তা। এখানকার তরিতরকারী ফলমূল জিনিষপত্র সবই সস্তা। প্রায় তিন মাস কাশ্মীরে থাকিয়া আমরা লাহোরে ফিরিয়া আসিলাম। এই অল্প সময়ে সেখানকার প্রবাসী বাঙালীদের সহিত খুবই হৃদ্যতা হইয়াছিল। আসিবার সময় তাঁহাদের জন্য মন বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা অনেকেই আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং আসিবার সময় অমাদের অনেক উপহার দিয়াছেন। বাঙলা দেশ হইতে এতদূরে আসিয়া বাঙালীদের একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে হইত।

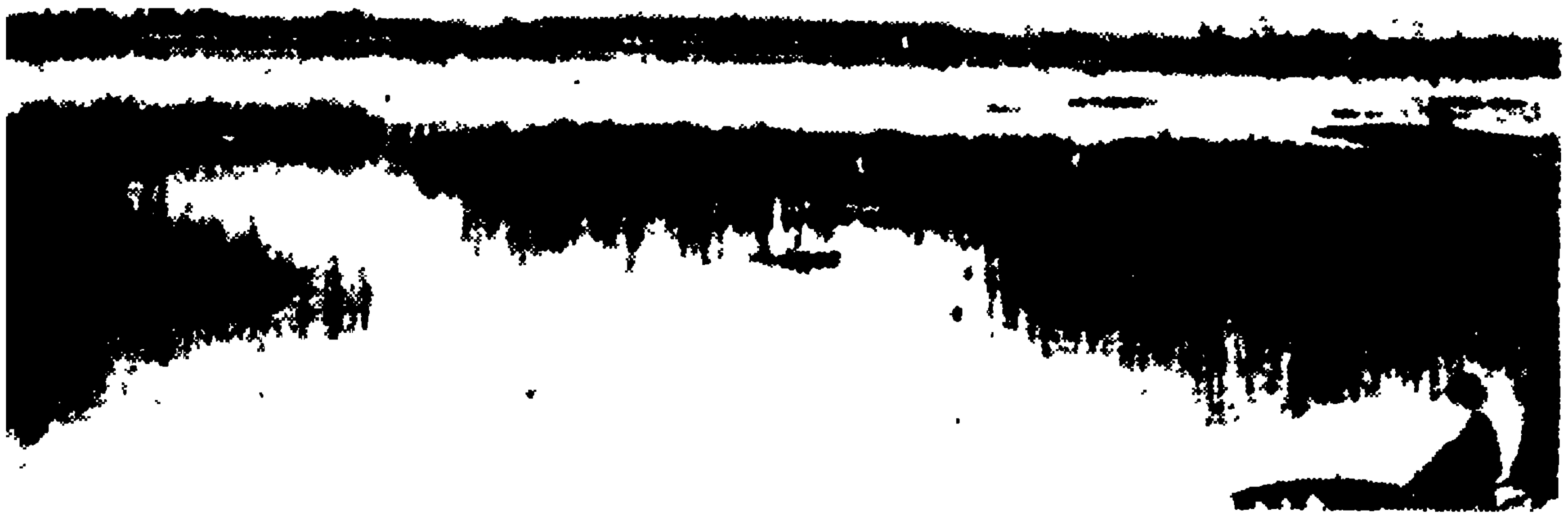

ডাল লেকে সূর্য্যাস্ত

শ্রীসান্ত্বনা নিয়োগী

কাজলী

শ্রীমতী উমা দেবী

১৬

কলকাতা পৌঁছে কাজল শঙ্করকে দিয়ে ওদের নীচের একটা ঘর খুলিয়ে নিলে। তারপর একটা ধূলিমলিন চৌকির ওপর ক্লান্ত ভাবে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "যাও প্রদীপ, বাড়ী থেকে স্নান ক'রে কিছু খেয়ে এসো,—আমি শঙ্করকে বাজারে পাঠিয়ে রান্নার জোগাড় করছি—"

প্রদীপ বল্‌লে, "তবে তুমিও এসো কাজলী, কিছু খেয়ে যাও, কাল রাত থেকে খাওনি—"

"না, খাবার আমার কিছু দরকার নেই—আমি একটু বিশ্রাম না ক'রে বাঁচব না।"

দ্বিতীয় অনুরোধ বৃথা জেনে প্রদীপ চ'লে গেল।

ঘণ্টখানেক পরে স্নান ক'রে খেয়ে কাজলের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসে প্রদীপ দেখ্‌লে—সে চৌকিতে ধূলোর 'পরে হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা রাত্রের ক্লান্তিতে তার বড় বড় চোখের তলে কালিমা দেখা দিয়েছে; তবু ওর ঘুমন্ত মুখখানি এমন করুণ সুন্দর—যে, প্রদীপ নির্নিমেষনেত্রে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

কাজল ঠিক ঘুময়নি—এতই শ্রান্ত হোয়েছিল যে চোখ বুজে প'ড়ে ছিল। জানলা দিয়ে রোদ এসে তার গায়ে লাগ্‌ছিল—প্রদীপ সেটি বন্ধ করতে যাওয়ার মৃদু শব্দেই সে উঠে বস্‌ল।

পাশে ব'সে তার নরম হাতটি নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে প্রদীপ বল্‌লে, "বড্ড ক্লান্ত হোয়েছ না?"

"তুমি বুঝি কিছু কম?"

"না, আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি কাজলী, আমার ভারী ভাল লাগ্‌ছে—ইচ্ছে করছে তোমায় ছোট বেলার মত আদর করি—"

যে কখনো চঞ্চল হয় না, দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে না, তার মুখে এমন কথা শুন্‌লে মনটা কেমন করে। কাজল হাত ছাড়িয়ে নিলে। কিছুক্ষণ পরে বল্‌লে, "আমি ঠিক করলাম, শঙ্করের সঙ্গেই শিলিগুড়ি অবধি যাব—তারপর জামাইবাবু এসে নিয়ে যাবেন। এখুনি একটা তার করতে হবে; টাকা শঙ্করই দিতে পারবে—তোমাকে আর ব্যস্ত হোতে হবে না।"

কি অপরাধে যে প্রদীপের এত বড় দণ্ডবিধান হোল তা প্রদীপ বুঝ্‌তে পারলে না তবে তাই নিয়ে সে অনুযোগও করলে না;—ভালো জিনিষকে পরিপূর্ণ উপভোগ না ক'রেও আপন অন্তরে তার কল্পনার লীলায় সে বিভোর হোয়ে থাক্‌তো। মুখে বল্‌লে, "বেশ তাই হবে।"

১৭

কাজল দারজিলিং এসে কাউকে কিছু বল্‌তে চাইলেনা। বিজলীর অসংখ্য প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্যে শুধু বললে, "এসেছি ব'লে বুঝি খুসী হোস্‌নি দিদি? তাই, কেন চ'লে এসেছি কেবলি জিজ্ঞেস করছিস্?"

বিজলী কাজলকে আদর ক'রে বল্‌লে "খুসী হইনি? তুই কি বলিস কাজু? এখানে এমন আমোদ-আহ্লাদ, আর তুই রইলি সেই পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে—এতে কি কারো ভাল লাগে?" তারপর একটু হেসে বল্‌লে, "তোর বর ঠিক করেছি কাজল, আমার মাস্‌তুতো দেওর অনিল, এমন চমৎকার ছেলে কি বলব ভাই,—তোর খুব পছন্দ হবে। আজ বিকেলে তাকে আস্‌তে বলেছি, দেখিস—"

সর্ব্বনাশ! এখানেও সেই বর? কাজল মনে মনে বিষম চ'টে উঠ্‌লো—বিয়ে আর বর শুন্‌লেই ও অস্থির হোয়ে ওঠে—মনে হয় যেন ওকে কেউ অত্যন্ত কটু ওষুধ খেতে বলছে! বল্‌লে, "তোর দেওরের জন্ম-জন্ম সুপাত্রী জুটুক দিদি, কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই!"

বিজলী ভাবলে—এটা কাজলের মনের কথা নয়, ছলনা মাত্র। তাই সে মেঘনাদের কাছে প্রস্তাবটা তুলতে গেল।

মেঘনাদ সবিস্ময়ে বললেন, "মা, ও যে নিতান্ত ছেলেমানুষ—"

বিজলী রাগ ক'রে বললে, "চোদ্দ-বছরের মেয়েকে ছেলেমানুষ বোল না বাবা, এই ঠিক বিয়ের বয়েস। তা ছাড়া, ওর বিয়ে দিলেই তো তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে মেঘনাদের চিন্তা কতখানি তা বলা কঠিন। তাঁর কেবল মনে হোল, 'এই তো সেদিনের কাজল—শৈল ওঁর হাতে দিয়ে চোখ বুজলে—এখুনি কি তাকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে!—বললেন, "ছেলেটি কেমন?"

"সে তুমি পছন্দ না ক'রে পারবেনা বাবা—"

"বেশ,—কাজলের মত নেও তা হ'লে।"

"সে সব ঠিক আছে।"

মেঘনাদ হাসলেন, কিছু বললেন না।

যথা সময়ে অনিল এসে পৌঁছলো। বিজলী কাজলকে যতটা পারলে সাজিয়ে-গুজিয়ে টেনে আনলে বসবার ঘরে। পাছে কাজল লজ্জা বোধ করে তাই মেঘনাদ আর সুবোধকে আগেই বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কাজল অনিলের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে একটা ছবির বই খুলে বসলো। অনিল সেটিকে কিশোরী-হৃদয়ের লজ্জা কল্পনা ক'রে উপভোগ করলে—যথাসম্ভব বিনয় ক'রে বললে, "স্বীকার করি আপনার চোখ দুটি খুব সুন্দর—আমার এ বিশ্রী মূর্ত্তি দেখবার অনেক ওপরে; তবু যদি একটু দয়া ক'রে হাতের বইটা রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করেন তা হ'লে বুঝব বিধাতা আপনাকে শুধু সৌন্দর্য্যই দেন নি, উদারতাও যথেষ্ট দিয়েছেন।"

বিজলী দেওরের আলাপের ভূমিকার বহর দেখে মুগ্ধ হোল,—কাজল কিন্তু বইটা চোখের কাছে ধ'রে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের সঙ্গে ছবি দেখতে লাগলো—কোনো জবাব দিলে না।

অনিল তাতে দমলনা;—বললে, "যতই মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখুন কাজলী দেবী, ঘরে যে আমি রোয়েছি তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।"

কাজলী এবার উত্তর দিলে; বললে, "অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই, এতই গোলযোগ আপনি করছেন।"

বিজলী বোনের কথায় অপ্রতিভ হ'ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তবে একটু জলযোগের ব্যবস্থা করি—" ব'লে খাবার আনতে চ'লে গেল। কাজলী তেমনি-ভাবে ছবি দেখতে লাগলো। অনিল বললে, "আপনি ছবি দেখতে এত ভালবাসেন কাজলী দেবী, বৌঠান যদি আগে একথা বলতেন আমি খানকতক আজকালকার শিল্পীদের আঁকা নতুন ছবি নিয়ে আসতুম।"

কোনো উত্তর, এমন কি মৌখিক একটা ধন্যবাদও না দিয়ে কাজলী তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতা উল্টে গেল।

"দেখুন আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখছি—কি রকম ধরণের আলাপ করলে আপনি খুসী হন, আমায় যদি একটু আভাস দেন কৃতার্থ হব।"—

কাজলের ইচ্ছে হোল বলে, "আপনি একটু চুপ ক'রে থাকলেই খুসী হই।"—মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে রইল, কোনো উত্তর দিলে না।

বিজলী খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি গো, আলাপ-টালাপ হোল?—"

অনিল মৃদু হেসে বললে, "হ্যাঁ বৌঠান, আলাপ খুব হোয়েচে! সেই আপনার সাক্ষাতে একবার যদি কথা না কইতেন, তা হ'লে ব'লে যেতাম—আপনার বোনকে বিধাতা আর সবই দিয়েচেন কিন্তু কথা কইতে শক্তি দেন নি।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা আজ চল্লাম, কিন্তু যাবার আগে আপনার বোনকে এই গোলাপটি উপহার দিতে চাই।" ব'লে জামার ভিতর থেকে একটি বড় টকটকে গোলাপ ফুল বার করলে।

বিজলী বললে, "এটা যে বিদ্রোহের রং হ'ল ভাই!"

"সেই জন্যেই ওঁর কালো চুলে খুব বেশি মানাবে।"—ব'লে ফুলটি কাজলের হাতে দিলে।

কাজলকে গ্রহণ করতে হোল। কিন্তু একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হোয়ে থেকে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে—তারপর ফুলটি

বিজলীর খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিজলী বোনের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হোল।

অনিলও কিছু অপ্রতিভ হোয়ে বল্লে, "আজ আলাপের প্রথম পর্ব্ব এখানেই শেষ হোক্। চলুন, বায়োস্কোপে যাওয়া যাক্—"

বিজলী কাজলকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছে—অভিমানে আর কিছু বল্লেনা—নিজের বড় কোটটি নিয়ে অনিলের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বন্ধ-ঘরে কাজলের চোখ ফেটে জল এল। দিদি এ-সবের প্রশ্রয় দেয় কি ক'রে? সুবর্ণলতার শিক্ষার বাহাদুরি আছে যে এই ক'মাসে এত পরিবর্ত্তন!

হঠাৎ কি মনে ক'রে প্রদীপকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌লো। হঠাৎ মনে হ'ল এই সময় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এইটিই তার সব চেয়ে দরকারী কাজ। লিখ্‌লে—

'প্রদীপ'

আসবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম; আশা করি তুমি রাগ করনি, আমায় মাপ কোর'। কাজলী।

১৮

বিজলী মেঘনাদের কাছে গিয়ে বল্লে, "বাবা, কাজল এমনি কুনো আর অসভ্য হোয়েচে—কারো সঙ্গে কথা বল্‌তেই জানে না। আজ অনিলের সঙ্গে এমন rude ব্যবহার করেছে,—সে খুব ভালো ছেলে ব'লেই কিছু মনে করেনি।"

মেঘনাদ কিছুমাত্র চিন্তিত না হোয়ে বল্লেন, "তাই তো মা কি হবে!"

"তোমার আদরেই ও প্রশ্রয় পায়। দাও ওকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে—দিনকতক সেখানে থেকে সভ্যতা শিখুক।"

বিজলী এখন ইঙ্গবঙ্গ সমাজে একজন প্রধানা আলোকপ্রাপ্তা মহিলা;—তার নব্য মত এখন সকল সংস্কার ছাড়িয়ে উঠেছে—তাই ওর বোনকেও ঘ'ষে-মেজে নিজের মত ক'রে নিতে চায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শিক্ষকতা চলে—কাজল মুখ গম্ভীর ক'রে দিদির উপদেশ শোনে—কলের পুতুলের মত চলা-ফেরা করে। বিজলী মনে মনে ঠিক করেছে—আরো দিন-পনেরো পরে অনিলকে আবার ডাকবার সময় হবে। কিন্তু ওর হিসেবে ভুল হোয়েছিল। এমনি সময় এল প্রদীপের এক চিঠি। কাজল আশা করেনি তাই বিরক্ত হোল। প্রদীপ লিখেছে—

'কাজলী'

ভাগ্যে তোমার ধন্যবাদের কথা মনে পড়্‌লো—তাই ত তোমার চিঠি পেলুম।—আমার সমস্ত মন আলোয় ভ'রে উঠ্‌লো। তুমি বড় কচি—ফুলের মত নরম তোমার মন,—তোমাকে সব কথা বলা সাজেনা—বলা উচিতও নয়।

তবু পাছে বিলম্বে কিছু অঘটন ঘ'টে যায়—তাই ব'লে রাখি—তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে কাজলী—তুমি কি কোনোদিন আমার হবে—? আমি চিরজীবন তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব—মৃত্যুর পরেও। প্রদীপ।

কাজল অবাক হোয়ে গেল—তবে কি প্রদীপেরও ভালবাসা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ স্বার্থের গন্ধে ভরা? ও কেন এ ভাবে পেতে চায়? বন্ধুর মত, ভাইএর মত কি পাওয়া যায় না? ওর সমস্ত মন বিষিয়ে তিতো হোয়ে উঠ্‌লো—চিঠিখানা কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে সে মেঘনাদের কাছে গেল। "বাবা, কোলকাতা যাই চল।"—মুখোমুখি প্রদীপকে খুব একটা বকুনি দেয় এই তার ইচ্ছে।

বিজলী বল্লে, "সে কি ক'রে হবে? ডাক্তারের হুকুম, বাবাকে আরো তিন মাস থাক্‌তে হবে।"

কাজল বল্লে, "তবে আমায় বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দাও। এখানে পড়ার বড্ড ক্ষতি হ'চ্ছে।" কাজল কখনো আবদার করে না ব'লে মেঘনাদ তার মনের ক্ষীণতম ইচ্ছেটুকুও পূর্ণ করতে ব্যস্ত হ'তেন; বল্লেন, "পরীক্ষা যখন নিকটে, তখন থাক্ না কিছু দিন বোর্ডিংএ। বিজলী কি বলিস্?"

বিজলী অভিমান ক'রে ভাব্‌লে, সেই ছোট্ট আদরের বোনটি—সে দু'দিন দিদির কাছে থাক্‌তে চায় না এত পর হ'য়ে গেছে! বল্‌লে, "আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা? যা তুমি ভাল বোঝ, কর।"—বিজলীর চোখে জল এল।

কাজল বিজলীকে জড়িয়ে ধ'রে চুপি চুপি বল্‌লে, "আচ্ছা দিদি, জামাই বাবুর চেয়ে আমায় এখন কতটা কম ভালবাসিস?"

বিজলী রাগ ক'রে চ'লে গেল।

কাজল বাপের সম্মতি পেয়ে যাত্রার আয়োজনে লেগে গেল। পিসিমাকেও সে কথা জানানো হোল। তিনি লিখ্‌লেন, "এ তোরা কি করছিস্? প্রদীপের সঙ্গে কাজলের বিয়ের সবই তো ঠিক, দুই-হাত এক হোলেই হয়, এখন বোর্ডিং যাওয়া কেন? আমি কলকাতা যাই, শুভদিন দেখে বিবাহ হোয়ে যাক্।"

বিজলী সেচিঠি কাজলকে পড়তে দিলে। কাজলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়লো—"দিদি, আমি কি তোমাদের পথের কাঁটা? আমার কোথাও কি একটু স্বস্তির জায়গা নেই—চারদিকে আমায় বন্ধনের জাল দিয়ে ঘিরে না দিলে কি তোমরা নিশ্চিন্ত হবে না?"

বিজলী তো অবাক! বল্‌লে, "থাক্ ভাই,—থাক্। তোর বিয়ে ক'রে কাজ নেই—এম্‌নি একা একাই ভাল থাক্।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমা দেবী

পাখী

শ্রীযুক্ত সত্যেন সেন

মুগ্ধপক্ষ মেলি' দিয়া সুদূর দিগন্ততলে,
শূন্য সিন্ধু সন্তরিয়া ঊর্দ্ধে পাখী ছুটে' চলে।
আকাশ ডাকিয়া বলে—চলে আয় চলে আয়,
বিন্দুর সমান নিম্নে ধরণী মিলায়ে যায়।
হৃদয় উচ্ছ্বসি' ওঠে তনু প'ড়ে থাকে পিছে,
শতধা হইয়া আত্মা আপনারে বিস্তারিছে।
ঊর্দ্ধে ধেয়ে চলে ঊর্দ্ধে নীলাকাশে সীমাহীন,
কি সুখ তাহার মাঝে নিজের করিতে লীন।
গোধূলি ঘনায়ে এলো পাখী ফিরে' আসে ফিরে,
ঘনপত্র পাদপের অন্তরালে নিজ নীড়ে।
প্রিয়া আসি' সমাদরে করে মধু সম্ভাষণ,
শাবকের কিচিমিচি অর্দ্ধস্ফুট আলাপন।
কুলায়ের প্রতিতৃণ আঁকড়িয়া ধরে তায়,
নিজ হাতে রচা এযে-মায়া কি কাটান যায়।
প্রিয়ার মুখর-সনে মিলাইয়া নিজ মুখ,
বিমুগ্ধ বিহঙ্গ ভাবে এই বুঝি স্বর্গসুখ!

আধুনিক ইংরাজী কবিতা

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগের ইংরাজী কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই বল্‌তে হয়, আধুনিক ইংরাজ-কবিদের সহজ, স্বাভাবিক এবং সংক্ষিপ্ত ভঙ্গীর কথা। নিজের জীবনকে দেখার যে-ভঙ্গী, তার পেছনে যেন সমস্ত পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত স্পন্দিত হ'চ্চে। কাজেই ভঙ্গী যতই নূতনতম হোক্, বক্তব্যটা চিরন্তন। পুরাতন একটি বহুকালের দেখা জিনিষকে নিজের নিজের বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখা।

যে কাব্য আধুনিক তা আমরা চিনব কি ক'রে? আজকালকার যুগে যে কাব্য রচিত হবে, তাকেই আমরা আধুনিক বল্‌তে পারি না। আধুনিক কাব্য বলতে আমরা এই কথাই বুঝবো যে, বিগত যুগের কাব্যসাহিত্যের (যা Classic আখ্যা পেয়েছে) যে বাইরেকার রূপ, তার সঙ্গে আজকের দিনের কাব্যসাহিত্যের বাইরের রূপের বিশেষ যোগ থাক্‌বে না। শুধু একটিমাত্র মিল থাক্‌বে—সে শুধু প্রপৌত্রের সঙ্গে প্রপিতামহের মিলের মতো। আর একটি যোগসূত্র থাক্‌বে—সেটি সাহিত্য-বিচারের। কারণ, নতুন যে দেখা দিল, তার থাক্‌বে নতুন সাজ! তার এই নতুন সাজই আমাদের সাহিত্যের অনুভূতি এবং বিচারের দরবারে নিয়ে যাবার রাস্তা ব'লে দেবে।

বর্ত্তমান ইংরাজ-কবিদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা,—তাঁরা মানুষের মনকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। তাঁরা ভাবেন, পাঠকের মনে একটি সামান্য আনন্দ বা বেদনার সুর ধরিয়ে দিতে পারলেই, তারই ইঙ্গিতে কাব্য-রসিকের মন তরঙ্গিত হ'তে থাক্‌বে।

বড় বড় কথা নয়,—অত্যন্ত সাধারণ মানব-জীবনের ছোটখাট দৈনন্দিন আনন্দ-বেদনা যে একটি সামান্য অথচ গভীর রেখায় ফুটে' উঠেচে—তারই সঙ্গে যোগ আছে এই পর্ব্বত-কুন্তলা, সাগর-মেখলা পৃথিবীর! সেই সুরে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে একটি কবি-মন উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু পর্য্যন্ত, পূর্ব্বাশার প্রান্ত-সীমা থেকে পশ্চিম-প্রান্তের সীমানার কাছাকাছি!

ইংরাজ-কবিদের এক একটি কবিতা ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্রের মতো। যাকে আঘাত করতে হবে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার দিকে ছুটে যাবে, এবং পর-মুহূর্ত্তেই নিজের জায়গায় ফিরে' আস্‌বে!

মানুষের মনকে আমরা মানের প্রশ্ন দিয়ে সঙ্কীর্ণ ক'রে ফেলেছি। কাজেই একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যারা মানেটা পেলেই সন্তুষ্ট, মানের বাহিরে তাদের ভাবনা যেন আর এগোতে চায় না। জল মানে বারি, কাপড় মানে বসন, আজকের দিনে হয় ত একটু বাহুল্য মনে হ'চ্চে, কিন্তু কিছুদিন আগেও এইরকম প্রশ্ন সম্ভব ছিল।

কবিতাকে একটি রূপসী তরুণীর সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে। তাকে যদি বলা যায়,—তোমার দেহের অন্তরালে কঙ্কাল আছে, স্নায়ু,-শিরা প্রভৃতি আছে এবং বাইরে রক্তমাংসের একটা সুন্দর আবরণ আছে। তাতে মানেটা ঠিক হ'ল বটে, কিন্তু সে কি খুসী হবে? সে বল্‌বে—তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানোনা দেখছি। কাজেই কোটালের পুত্রকে তার মানে নিয়ে মানে-মানে স'রে পড়তে হয়, রাজপুত্রের জন্যে সসম্মানে জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

কবিতা জিনিষটা সূক্ষ্ম অনুভূতির,—কাজেই আপামর-সাধারণের জন্য নয়। মনের আকাশকে যথেষ্ট উদার অবকাশ দিয়ে, একটি সহানুভূতিতে স্পন্দমান কবি-মন নিয়ে কাব্যবিচার করতে হবে। এ কথা বলছি না, কাব্য-

বোধ থাক্‌লেই কাব্য-বিচার সম্ভব। কাব্য-বোধটাই গোড়ার কথা। কাব্য-রসিকের আত্মা কবির কাব্যে তার বাণীরূপ দেখ্‌তে পায়।

এই কথাগুলি বল্‌বার প্রয়োজন হ'ল, কারণ আধুনিক ইংরাজ-কবিদের কবিতা,—অত্যন্ত সাধারণ যার বাইরের রূপ, তার ভেতর মানে খোঁজা চলে না। কারণ তারা এত পরিচিত, সহজ এবং স্বচ্ছন্দ, আর ভঙ্গীটা এত diret, যে, মানেকে ঘিরে' থাক্‌লে অনুভূতিকে অবকাশ দেওয়া চলেনা। ছোট ছোট কথাগুলি পাঠকের মনে সুর ধরিয়ে দেবার ইঙ্গিত; এবং এই কথাগুলিরই পিছনে একটি সামান্য জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর উদার মানব-জীবনের অলক্ষ্য পরিচয়-সাধনের যোগসূত্র। মানুষের মনন-শক্তির সঙ্গে হৃদয়-বৃত্তির ভাবাবেগের পরিপূর্ণ মিলন। Criticism of life বা জীবন-দীপিকা এই কথাগুলিরই পিছনে গভীর নিঃশব্দ অন্ধকারে থর্‌থর্ করচে। যুগ-যুগান্তর ধ'রে মানুষের জীবনের ধ্যান যে কত রূপে-রূপে দেখা দিল!—জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশই ত' রূপাতীত অখণ্ড আনন্দ-রসের পরিবাহ।

আধুনিক যুগের ইংরাজ-কবিরা মানুষের মনকে আর মানের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে চান না। তাঁরা মনে করেন, 'মানে করা'র ক্লাস থেকে তাঁরা প্রমোশন পেয়েছেন। কামনা-বাসনার আনন্দ-বেদনার দুরন্ত রথচক্রে তাঁরা একটা বিপুল গতিবেগ সঞ্চার ক'রে দিতে চান।

কিন্তু ইংরাজদের দেশে যেটা সত্য, বাংলা দেশে সেটা সত্য হবার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। রবীন্দ্র-কাব্য যাঁরা বোঝেন, তাদের সংখ্যা বোধ-করি আঙুলে গোণা যায়।

কিন্তু, তবু যেন মনে হয়,—ফেনিল সমুদ্রের উদ্বেল গর্জ্জনোচ্ছ্বাস প্রতিটি তরঙ্গ-চূড়ায় বারবার উদ্দাম ক্রন্দনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে! আর তারি ওপর দিয়ে একদল সমুদ্র-পাখী তাদের অক্লান্ত ডানায় সেই বেদনাকে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে—ওই বনরাজিনীলা পৃথিবীর একটি কোণে যেখানে অরণ্যের আনন্দ মর্ম্মরিত হ'চ্ছে, মানুষের ভাবনা তরঙ্গিত হ'চ্ছে

—আধুনিক ইংরাজ-কবিরা সেই সমুদ্র-পক্ষীর দল!

কয়েকটি আধুনিক ইংরাজ-কবিতার আমরা এই সঙ্গে ভাবানুবাদ ক'রে দিলাম।

চন্দ্রমা

— W. H. Davies —

সমস্ত অন্তরে মোর তোমার অপূর্ব্বরূপ ফিরিছে কাঁদিয়া,
হে সুন্দরী ইন্দুলেখা,—অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী, অদূর-বর্ত্তিনী।
তোমার সৌন্দর্য্য মোরে নিয়ে যায় হারানো সে শিশুর
জীবনে—
যে-শিশু কাঁদিছে আলো স্পর্শাতুর, তব তরে—
আলোক-নন্দিনী।
যে-রূপকুমার ওই মেলি' ধরে উর্দ্ধাকাশে ক্ষুদ্র বাহু দু'টি—
কোমল বক্ষের তলে পেষণে বাঁধিতে চাহে শুভ্র দুই মুঠি।

দূরে আজো গাহে গান বিহঙ্গেরা, রৌপ্যশুভ্র হিমরজনীতে
তব রূপ-জ্যোৎস্নাধারা কণ্ঠ বেয়ে তাহাদের ঝরে অবিরাম!
দারুণ স্তব্ধতা আজি—মোরে চাহি' এরা যেন কহে
ক'টি কথা,
বিহঙ্গের তরে নহে; তারা যে গাহিছে বসি' গান অভিরাম।
মোর গান রুদ্ধ হ'ল!—পরাণ হারায়ে গেছে চাহি'
তব পানে;
মোর মত রিক্ততায় স্তব্ধ হ'তে পাপিয়া সে কভু
নাহি জানে!

—•—

এরা নহে দীর্ঘদিন

— Ernest Dowson —

দীর্ঘকাল-তরে এরা নহে—প্রভাতের হাসি আর
রাত্রির ক্রন্দন,
বাসনার বহ্নিরাগ, দারুণ ঘৃণা ও দূর মৃদু ভালোবাসা;

মনে হয়, এরা কোনো ছায়া নাহি রাখে,—এরা নহে
মনের বন্ধন,
নিমিষে মিলায় দূরে ক্ষণবৃষ্টিসম হায়,—নাহি
বাঁধে বাসা।

এ শুধু ক্ষণিক মোহ-জাল, ফেনোচ্ছল সুরা আর
গোলাপের দিন—
আবিষ্ট অম্বরে নীল আবছায়া, কুয়াশার মায়া-স্বপ্ন হ'তে
পথ শুধু ডাকে দূরে চুপি-ইসারায়—তারপর হ'য়ে যায় লীন
চকিতে হারায়ে সুর, অকস্মাৎ, আর কোন্ নবস্বপ্নস্রোতে।

—•—

একটি জাহাজ, দ্বীপের রেখা, চাঁদের সরু ফালি

—J. F. Flecker—

একটি জাহাজ, দ্বীপের রেখা, চাঁদের সরু ফালি—
চমৎকার ঐ মণির মত কয়েকটি যে তারা,
সাগরজলের আয়নাতে হায় কাঁপছে তারা খালি,
রূপার মতন সাদা সে ঐ ছায়াপথেই হারা!

° • °

দ্বীপের পাশেই একটি যে দ্বীপ, সেইখানে সে হায়
ব'সেই আছে,—ধূসর জাহাজ ভাসছে মোহানায়!
নতুন চাঁদের স্বপন জাগে বন্দর-তীর পানে'
তারার তরী উজান চলে—আয়নারি মাঝখানে!
—স্থির-নিথরের গভীর আলো বেড়ায় ঘুরে'-ফিরে',
ছায়ার হারা সাগরমাঝে শুক্লারাতির তীরে!

তবু যে ঐ একটি জাহাজ সাগরজলের' পর,
এগিয়ে চলে,—সঙ্গে চলে দ্বীপের বালুচর!
চলার ভারে ক্লান্তি জাগে,—পাল যে ছিঁড়ে' যায়,
তাহার সুরেই জাগছে গতি পাণ্ডু চাঁদের পায়,
পাল-হারানো মলিন জাহাজ অকূল দরিয়ায়!

রূপ

—John Masefield—

উদয়াস্ত বর্ণরঙ্গ হেরিয়াছি সমুদ্রের বুকে,
হেরিয়াছি সমীর-মুখর কত পর্ব্বতে পর্ব্বতে।
গম্ভীর সৌন্দর্য্য যেন চুপি-চুপি এলো মোর কাছে,
অতিদূর পুরাতন মৃদুসুর—উজ্জয়িনী হ'তে।
বসন্তের বনলক্ষ্মী দিলো দেখা আঁখির সম্মুখে,
কোকিল-কাকলী কত পশিয়াছে মুগ্ধ দুটি কানে,
শিশির-সজল তৃণ শিহরিয়া জাগিয়াছে গানে।
চৈত্রের বৈকালে মাঠে নামিয়াছে মৃদুল বর্ষণ,
কর্ণে মোর শুনিয়াছি কোরকের স্ফুটন-সঙ্গীত,
দূর-সিন্ধুকলধ্বনি উতরোল কানে আসিয়াছে।

ধনুসম সুবঙ্কিম তরণীর হংসশুভ্র পাল —
সেথা হ'তে হেরিয়াছি অজানা অপূর্ব্ব কত দেশ!
রূপের মধুরতম মূর্ত্তি—বিধাতা সে
দেখায়েছে যাহা মোরে উদার আকাশে—
সে তাহারি কণ্ঠস্বর, কালো এলোকেশ,
রক্তিম অধরপ্রান্তে মায়াস্বপ্নজাল,
বঙ্কিম নয়ন-ভঙ্গী,—পরম ইঙ্গিত!

বুনো হাঁস

—John Masefield—

কুয়াশায় ঘেরা সন্ধ্যা-গোধূলি, পশ্চিমে রক্তিমা,
মন্থর প্রাণ,—বনের মাথায় মরণ-আলোর ছায়া।
ফিরে' আসে ঘরে বিশ্রাম-কামীদল
সন্ধ্যায়,—মাঠে ফিরে এলো বুনো হাঁসেরা সব।
ওগো পথচারী আত্মার ভিখারীরা,
আজিও অজানা তোমাদেরি প্রাণ কাঁদে,
গভীর আঁধারে হাওয়ায় নিভেছে প্রাণের প্রদীপ-শিখা

কাজল-দীঘির তীর হ'তে আসে কার যেন ক্রন্দন!—
কী দেখেছে দূরে যাযাবর হংসেরা?

মথিয়া ফিরিছে সারামাঠ তাই উতরোল ক্রন্দনে।
যে-সব পরাণ চ'লে যায় দূরে—মুছে' যায়,
অধীর, অথির—উড়িছে ব্যাকুল ডানা!
চাঁদের মলিন কঙ্কণ ঘিরে' অকারণে মরে ঘুরে';
রক্ত-আগুন-লেখায় উজল অরণ্য-শিরে হায়,
পাখা ভেরে' আসে; পাখীর গ্রীবায়, কণ্ঠে মরণ-জ্বালা!
ডানা-ঝাপটের খস্ খস্ ধ্বনি—আর হা-হা ক্রন্দন,
বহুদিন কার ব্যথায় ধূসর পাখা...
সঞ্চিত অবরুদ্ধ বেদনা দূরে কোথা উড়ে' যায়,
কালো-আকাশের তারা-কণ্টকে-ঘেরা পথ চেয়ে চেয়ে
কোথা কোন্‌খানে আঁধারে মিশায়,
কেহ নাহি জানে হায়!

অনুবাদে তাদের চিন্তার ধারাকে কতকটা পাওয়া যায়, কিন্তু সব নয়—ভাষান্তরিত করলে কাজেই চেহারারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করতে হয়।

ছোট ছোট কয়েকটি কথার ভেতর দিয়ে তাদের এই যে কল্পনার সম্পূর্ণ নূতনতম প্রকাশ আকাশ-সীমানা-চুম্বিত কল্পনার বিপুল প্রসার, এবং তারই সঙ্গে জীবনের বিচিত্র লীলার সুন্দর সামঞ্জস্য শুধু তাদের মতিরমান কাব্য-জগৎকে আরো বেশী গতিবেগ দেয়নি, মানুষের অনুভূতিকে অভিভূত করেছে, তাকে অনাগত যুগের রহস্যলোকের সন্ধ্যানী-আলোর মতো পথ দেখিয়ে চলেছে! অবান্তর কথার কল্পিত ধূম-শিখা তাদের কাব্য-গগনকে আবিষ্ট করে নি, তাদের ভাবনাকে সার্থক করেছে।

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তুমি নহ

শ্রীযুক্ত প্রণব রায়

তুমি তো সুন্দরী নহ,—সর্ব্ব অঙ্গে কলঙ্ক-কুশ্রীতা,
সামান্যা রমণী তুমি, মূল্যহীন মাটির প্রতিমা!
লেলিহান্ লালসায় দগ্ধদেহ, কলুষ-কুৎসিত,
পঙ্কিল পল্বল তুমি,—অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তব সীমা!
আমিই লিখিনু তব ওষ্ঠাধরে ধূসর প্রভাতে
তারার রহস্যলিপি, দিনু ওই লোচনযুগলে
মেদুর মেদুর মায়া; আমারি সুন্দর দৃষ্টিপাতে
ফুটিল সৌন্দর্য্যপদ্ম কলঙ্কিত ও-দেহপল্বলে!
তোমারে দিই নি কভু আমার এ-প্রেম উৎসর্গিয়া;
নিখিলের যত রূপ, অনুপম সৌন্দর্য্যসুষমা
নিঃশেষে হরণ করি' যে-অনিন্দ্য স্বপ্ন-তিলোত্তমা
দেহের দেউলে তব সঙ্গোপনে রেখেছি রচিয়া,
তাহারি উদ্দেশে আজি তোমার ও-দুটি পদ'পরে
প্রেমের প্রণতি মোর শ্লথবৃন্ত পুষ্প হ'য়ে ঝরে!

বিষ্যুতের শেষ ও শুক্রের সুরু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

এক বিষ্যুৎবারের বারবেলায় এই গল্পের আরম্ভ, এবং শুক্রের সকালে ইহার শেষ।

পরিশ্রান্ত বিনোদ অফিস হইতে বাহির হইয়া ফুট-পাথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে মেসের দিকে চলিতেছিল—সারাটি পথ আপনার অভাব-অনটনের কথা একটানা ভাবিতে ভাবিতে। নিজের স্বভাব-দারিদ্র্য ত ছিলই, তা-ছাড়া যে অফিসে সে কাজ করে, সে অফিসে আজ-কাল ফি মাসেই নিয়মিত বেতন-লাভের অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। মাসের শেষ দিক হইতে ধার সুরু হইয়া পরের মাসের প্রথম পক্ষ পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলে। ধারধোর করিয়া কোনপ্রকারে মান বাঁচাইয়া চলিতে হয়। কিন্তু দেশের বাড়ীর লোকদের প্রাণ-বাঁচান কঠিন হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ পিতা স্কুলমাষ্টারি করিয়া বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে অক্ষম। সক্ষম পুত্রের উপার্জ্জনের প্রতি এক-বাড়ী লোক সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য সে, আপনার-জনের দুঃখ দূর করিতে পারিল না।

আজ মাসের তের দিন—আজও বাড়ীতে টাকা পাঠান হইল না। বিনোদ সেদিন বড়বাবুর সঙ্গে এক-পশলা বচসা-বৃষ্টি করিয়াই আসিয়াছে। পিতা পত্রের পর পত্র লিখিয়া উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন,—পত্নীর উৎকণ্ঠা-প্রকাশের বিরাম নাই। কিন্তু উপায় নাস্তি!

জ্যৈষ্ঠের বেলা-শেষ। সাড়ে-পাঁচটা বাজিয়া গেলেও কলিকাতার রাস্তায় তখনও প্রখর রোদ। রোদ বাঁচাইবার জন্য সে বাঁ ফুটপাথ ছাড়িয়া গাড়ীর রাস্তা পার হইয়া অপর ফুটপাথে পৌঁছিল। উঃ! অন্যমনস্ক বিনোদ একখানা বে-পরোয়া মোটর গাড়ীর ধাক্কা হইতে একটুকুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে! তখনও তাহার বুকের ধক্‌ধকানি থামে নাই।

ক্লান্ত-মন্থর কেরাণীর দল গৃহপ্রত্যাগমন করিতেছে; স্কুল-কলেজের ছেলেরা বেড়াইতে, কেহ রেস্তর্‌াঁয় আড্ডা জমাইতে চলিয়াছে; ফিরিওয়ালারা নানারূপ উৎকট রবে ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ভীড় ঠেলিয়া চলিতে গিয়া বিনোদ আর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। অফিসের দরোয়ানের নিকট দু'আনা সুদে ধার করিয়া যে তিনটি টাকা লইয়াছিল আজ, পকেটমার কখন তাহা পকেট কাটিয়া সাবাড় করিয়া দিয়াছে, সে টেরও পায় নাই। অত্যাবশ্যক কি একটা জিনিষ কিনিবার জন্য একটা মণিহারী দোকানে ঢুকিবার মুখেই পকেটে হাত দিয়া সে বেকুব বনিয়া গেল।

অদৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কার দিতে দিতে বিনোদ মেসের সাম্‌নের গলিটার মোড়ে আসিয়া পড়িল। মোড় ফিরিয়া দেখিল—মেসের ভৃত্য কানাই চলিয়াছে বড়-রাস্তার বাজারের দিকে। কানাই অন্যমনে বিনোদকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। বিনোদ ডাকিল—কানাই!

কানাই ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিনোদ পকেটমার-কাটা পকেটের মধ্যে হাত দিয়া হাতের কনুই পর্য্যন্ত বাহির করিয়া কানাইকে দেখাইয়া বলিল—তিন্‌-তিনটে টাকা গেল গুণ্ডার হাতে!—আর কিছু না হোক্, ওয়ালল্যাম্পের চিমনী একটা না কিন্‌তে পার্‌লে আঁধারেই রাত কাটাতে হবে আর কি! থান-দুই চিঠিও যে আজ না লিখ্‌লেই নয়। তুই বাপু পারিস যদি—

কথাটা শেষ না করিয়াই বিনোদ থামিয়া গেল। ইতিমধ্যেই এটা-ওটা-সেটায় কানাই তাহার টাকা-দুইয়ের উপর খরচ চালাইয়া দিয়াছে। আজ দিব, কাল দিব করিয়া এখনও সে উহা দিয়া উঠিতে পারে নাই। দারুণ লজ্জায় তাহার ম্লান মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

"গরীব মানুষ আমরা—টাকাকড়ি অত পাই কোথায় বলুন? আপনাদেরও ত কথা ঠিক থাকে না মশাই! তা যান, চিমনী এনে দিচ্ছি আপনার, কিন্তু কালই সব মিটিয়ে দিবেন আমার দেনাপাওনা!"—মুখ ভার করিয়া কানাই গলি পার হইয়া গেল।

একটা নিরক্ষর ভৃত্যের নিকট ইহার অধিক কি

আশা করা যাইতে পারে? এ-ই বরং যথেষ্ট করিয়াছে,—রুম-মেট শম্ভুবাবুর হাতে যথেষ্ট টাকা থাকিতেও চারআনা পয়সা সেদিন সে অত করিয়া চাহিয়াও পায় নাই।

বিনোদ মেসে না ঢুকিয়া মেসের সীমানা পার হইয়া খানিকটা পথ গিয়া একটা বাই-লেনে ঢুকিয়া পড়িল তাহার এক বন্ধুর নিকট টাকার চেষ্টায় যাইবার জন্য। একগ্রামে বাড়ী—বাল্যকালের এক-বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু। অবশ্য, একবার বহু চেষ্টায় বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া—তাঁহাকে বাসায় পাওয়াই কঠিন—বিশেষ প্রয়োজনে একটাকা কয়েক আনা পয়সা তাঁহার নিকট চাহিয়া পাওয়া যায় নাই। তবু মনে করিল, হাতে-পায়ে ধরিয়া—বাল্যবন্ধু সে, তাহার কাছে আবার মান-অপমান কি?—যেমন করিয়াই হোক্ কয়েকটি টাকা লইয়াই আসিবে সে!

বন্ধু সপরিবারে একটা বাসা করিয়া থাকেন। সমবয়সী কয়েকটি বালকের সঙ্গে বন্ধুপুত্র 'খোকা' বাসার সম্মুখে দুয়ারে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল। বিনোদ খোকাকে জিজ্ঞাসা করিল—খোকা, তোমার বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন?

খোকা বলিল, মিনিট কয়েক হইল তাহার বাবা বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিনোদ বলিল—তাঁকে ডেকে দাও ত বাবা, একবার!

খোকা দৌড়াইয়া ভিতরে গেল। বিনোদ আশ্বস্ত হইল—বন্ধুর নাগাল যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন এবার একটা উপায় হইবেই হইবে। খোকা দ্বিতলের বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া উত্তর দিল—বাবা এক্ষুণি কোথায় বেরিয়ে গেলেন মা বল্লেন, ফিরতে রাত হবে।

বিনোদ একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তারপর বিষণ্ণ মুখে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া মেসের দিকে পা বাড়াইল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, বন্ধু বাসাতে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছাবশতঃ খোকাকে দিয়া শেখানো বুলি আওড়াইয়া তাহাকে ভাগাইয়া দিলেন। হাঁ,—বন্ধুই বটে!

অন্যমনস্কতার দরুন মেসের দরজায় ঢুকিতেই চৌকাঠের সঙ্গে আচমকা এক বিষম ধাক্কা লাগিয়া মাথার খানিকটা কাটিয়া গেল—বাঁ হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। শম্ভুবাবু সুগন্ধি সাবান-সহযোগে সান্ধ্যস্নান উপভোগ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—চোখ বুজে ধ্যান করা কি আর চল্‌তে চলে মশাই!...বড্ড লেগেছে বুঝি?...ওদিকে যে আপনার দেশ থেকে কে একজন এসে বসে' আছেন আপনার—কৃপা করিয়া দেখুন গে'।

দেশ হইতে হঠাৎ আসিলেন আবার কে? বিনোদ ভাবিল, বাড়ীতে কোন বিপদ-আপদ ঘটিল না কি? সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল। রুমের সম্মুখে আসিতেই একটা বিশ্রী কড়া গন্ধ তাহার নাকে ঢুকিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, একজন গেরুয়াধারী দাড়ি-গোঁফ-মাথা-কামানো ব্যক্তি হাতের ছোট্ট হুঁকাটি দেয়ালের গায় ঠেকাইয়া রাখিতেছেন—দেশী দা-কাটা তামাকের তীব্রতা যাঁহাকে তাঁহার মুখবিবর দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিয়াছে! অত দুঃখেও বিনোদের হাসি পাইল।

বার-দুয়েক কাসিয়া উদ্গত কাসির বেগ সামলাইয়া গেরুয়াধারী ডাকিলেন—বিনোদ, ও বিনুদা, আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছিস্ নে? আমি যে—

কণ্ঠস্বরে বিনোদের চমক ভাঙিল। তাহাদের গ্রামের গোঁসাইপাড়ার গণেশ-খুড়ো না কি? তা' অমন গৈরিক-বাস পরিধানে কেন,—ওরূপ মুণ্ডিতশীর্ষ? তখনও তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না লোকটি সত্যই যে গণেশ-খুড়ো।

সঠিক কি প্রয়োজনে খুড়ো সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন জানা গেল না; কিন্তু জানা গেল যে, সম্প্রতি তিনি বৈরাগ্যসাধনে তৎপর হইয়াছেন, এবং ভাগীরথী-নীরে পুণ্যাবগাহন তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সেই বারোয়ারী-তলার থিয়েটারের পাণ্ডা,—নেশাখোর, অনাচারী গণেশ-খুড়োর বৈরাগ্যসাধন! বিনোদ অত্যন্ত বিস্মিত হইল—কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু সেই-সঙ্গে তাহার বুকটা আবার দমিয়াও গেল অনেকখানি। এই ভাগীরথী-স্নান উপলক্ষে না জানি তিনি অতিথিরূপে

ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া থাকিবেন কতদিন!··· ট্রেরেন্টের জন্ম কয়দিন হইতে সদাশিববাবু ক্রমাগত তাগিদ দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন,—আগের মিলের দরুন বাকী কয়েকটি টাকা এখনও সে উঠিতে পারে নাই। যাঁহাদের দ্বারা এক কানা-ও উপকার পাওয়া যায় নাই কোন দিন, 'গ্রামবাসী' অধিকারে, প্রবাসে আসিয়া আত্মীয়তার ভার্ণে কাঁধে চড়িতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কি লজ্জার খাতিরে সেইচার্জ্জ চাহিয়া লওয়াও কঠিন হইয়া পড়ে। বিনোদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিনোদের রুম-মেট শম্ভুবাবু একজন দস্তুরমত কলিকাতার বাবু—পোষাক-পরিচ্ছদ চাল-চলন সব বিষয়ে। সীটটিও তাঁহার বেশ ফিট্‌ফাট পরিপাটী—টেবিলে-শেল্‌ফে, আয়নায়-আলনায় সাজান-গোছান ছিমছাম। খাসা গদী-পাশবালিস-ঝালর-ওয়ালা ধব্‌ধবে সাদা বিছানায় তিনি শয়ন করিয়া থাকেন; ময়লা পরিধেয় কদাপি তাঁহার পরিধানে দেখা যায় না। মনটিতে কিন্তু ময়লার অভাব নাই—সাদা নয়। নিজের স্বার্থপরতা লইয়া সাধারণ ছোট-খাট বিষয়েও এমন অসাধারণ সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচার করিয়া চলেন তিনি, যে, অপরের পক্ষে তাহা প্রায়শঃই অপমানকর ও পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। বাড়ীটাতে ইলিকট্রিক লাইটের বন্দোবস্ত নাই। রাতে সকলেই যে যাহার মত আলো জ্বালিয়া আপন আপন করণীয় কাজ করিয়া থাকেন। শম্ভুবাবুর টেবিল-ল্যাম্পটা অকারণে অনেক সময় জ্বলিতে থাকিলেও, তৈলাভাব বা অন্য কারণে বিনোদ যদি কোনদিন আলো জ্বালিতে না পারিয়া তাঁহার বাতির আলোয় চিঠিপত্র লেখা বা অন্য কিছু করিতে অভিলাষ করে, শম্ভুবাবু তখনই তাঁহার বাতিটা নিভাইয়া দিবেন—কারণ চোখে তাঁহার কয়েক দিন হইতে কি যেন হইয়াছে, বাতির আলো সহ্য হয় না! বিনোদের কুঁজোয় জল না থাকিলেও পিপাসার সময় শম্ভুবাবুর কুঁজোয় হাত দিবার অধিকার তাহার নাই—কাহারও নাই। কোন কোন বিষয়ে আবার বিশেষ দুর্ব্বলতাও ছিল তাঁহার, আর সময়ে সময়ে সেজন্য তিনি নির্বুদ্ধিতারও পরিচয় দিতেন। ফুটপাথের সুলভ করকোষ্ঠী-বিচারক হইতে তথাকথিত জ্যোতির্বার্ণব, জ্যোতিঃ-বাচস্পতি, মাদ্রাজী পরিব্রাজক-ভবিষ্যবিদ্ পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি আনিটা-সিকিটা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুলিটা-টাকাটার উর্দ্ধে উঠিয়াও আপ্যায়িত করিতে আপত্তি করিতেন না।

বিনোদের সহিত স্বগ্রামসম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা সংক্ষেপে শেষ করিয়া, গণেশ শম্ভুর কি এক কথায় তাঁহার অদৃষ্ট-সন্ধানী দুর্ব্বলতার ফাঁক দেখিতে পাইয়া সেই ফাঁকে তাঁহার ঘাড়ে ভর করিয়া বসিলেন চমৎকার। বোধ্য, দুর্বোধ্য শ্লোক ও বচন কপ্‌চাইয়া, অপক্ষপাতে দক্ষিণ ও বাম করের পিতৃ-মাতৃ-উর্দ্ধরেখা আলোড়ন করিয়া, ললাট, নাসিকাগ্রভাগ, অক্ষিকোণ, ওষ্ঠবর্ণ, কণ্ঠতিল প্রভৃতি সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া শম্ভুর অ-দৃষ্ট অদৃষ্টের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন গণেশ; এবং শম্ভু নির্ব্বাক-বিস্ময়ে গণেশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—গণেশের গবেষণা বুঝি বা অতলান্ত-মহাসমুদ্র হইতেও অধিকতর গভীর!

বিনোদ পিতা ও পত্নীকে দুইখানি পত্র লিখিতে বসিয়া জ্যোতিষচর্চ্চার তরঙ্গাভিঘাতে বার বার আহত হইতে লাগিল। কি বিপদ!—মনস্থির করিয়া যে বাড়ীতে খান-দুই পত্র লিখিবে, তাহারও উপায় নাই। কোনপ্রকারে পিতার পত্রখানি শেষ করিয়া সে দোয়াত-কলম উঠাইয়া রাখিল। আর, দুইখানি পত্র লিখিয়াই বা ফল কি হইবে! একখানি পত্র ডাকে পাঠাইতে হইলেও একআনার ষ্ট্যাম্প চাই—তাহারই যোগাড় তাহার নাই। বিনোদের মাথা গরম হইয়া উঠিতে লাগিল!

গণেশের গবেষণায় শম্ভু তাঁহার অদূরবর্ত্তী উজ্জ্বল সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিলেন, এবং মনে করিলেন অর্থ-বিনিময়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু গণেশ যখন সংহিতাবিশেষের অশুদ্ধোচ্চারিত (শম্ভুর সংস্কৃত-জ্ঞান উপ-ক্রমণিকারও এক পৈঠা নীচে) বিভিন্ন বাক্যাংশদ্বারা নিস্পৃহ ও নির্লোভ ব্রাহ্মণত্বের শাশ্বত মহিমা কীর্ত্তিত ও প্রমাণিত করিয়া শম্ভুকে সস্নেহ-তিরস্কারে জানাইলেন, যে—প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় জীবনে কাহারও নিকটে এক কানাকড়িরও প্রত্যাশী হন নাই কখনও, হইবেনও না; এবং শম্ভু ব্যতীত

অন্য কেহ এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে উত্থাপিত করিলে নিঃসন্দেহ তিনি তাহাতে অপমানিত জ্ঞান করিতেন; তখন শম্ভু তাঁহার অটুট ব্রাহ্মণত্বের নিকট নতশিরে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কানাইকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য রাবড়ি, রসগোল্লা, কজলী প্রভৃতি বিবিধ সাত্ত্বিক রাজভোগের প্রচুর আয়োজন করিতে আদেশ দিয়া মানিব্যাগ হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন। বিনোদ একবার নোটখানির দিকে, একবার খুড়োর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল,. ভাবিল—বিদেশে, অপরিচিত প্রতিবেশের মধ্যে, অজানা মানুষের হাত দিয়া অযাচিতভাবে কোথা হইতে আসিল এই অপদার্থটার জন্য আকস্মিক অর্থদান-প্রসঙ্গ, রাজভোগ্য আহার্য্য; আর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও সে এক সাধু নিরীহ ভদ্রপরিবারের ক্ষুধার অন্ন জুটাইবার জন্য, দান নহে—ঋণ স্বরূপ সামান্য অর্থানুকূল্যও পাইল না! ভাবিল, কিন্তু বুঝিতে পারিল না এই বৈষম্যের কারণ কি! এই একচক্ষু অবিচারকেই কি ভগবানের বিচার বলিতে হইবে?

রাত্রে আহারের সময় শম্ভুবাবু বিনোদকে রাবড়ি-রসগোল্লার অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বদান্যতা প্রকাশ করিলেও, সে 'শরীর ভালো নয়' বলিয়া কিছুই লইল না। মেসের প্রাত্যহিক বরাদ্দ থোড়-বড়ি-খাড়া যাহা ছিল তাহাই সে ভালো করিয়া খাইতে পারিল না; নানারূপ দুশ্চিন্তায় মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও তাহার অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। খুড়ো অন্নাহারের পরিবর্ত্তে উত্তম ফলাহারে পরিতৃপ্ত হইলেন।

ইহার পর শুইবার পালা। বিনোদের খাটখানি খুব ছোট—একজন ছাড়া দুইজনের স্থান কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। খুড়োকে সেই খাট ছাড়িয়া দিলে বিনোদকে শুইতে হয় মেঝেতে। কিন্তু এই সময় বাড়ীটাতে এতই কাঁকড়া-বিছের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে মেঝেতে শুইতে কেহই সাহস করে না। এই ত সেদিন পাশের রুমের রমেশবাবু ছারপোকার অত্যাচার বাঁচাইতে গিয়া মেঝেয় শুইয়া বিছের কামড়ে আধমরা হইয়া তিন দিন শয্যাশায়ী অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এক, শম্ভুবাবুর শয্যায় যথেষ্ট স্থান আছে—কিন্তু বিনোদকে তিনি স্থান দিবেন কি না সন্দেহ।

শম্ভুবাবুর মেজাজ সেদিন ভালো ছিল বলিয়াই বোধ হয় বিনোদকে তিনি অতি সহজেই শয়ন-সঙ্কটে পরিত্রাণ করিবার জন্য স্বশয্যায় আহ্বান করিলেন। বিনোদ শম্ভুবাবুর শয্যার এক টেরে কোনপ্রকারে নিজেকে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করিয়া শুইয়া পড়িল।

শম্ভুবাবু অল্প ক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। সুখী মানুষ—নিদ্রার জন্য কোনদিনই তাঁহাকে সাধ্য-সাধনা করিতে হয় না, নিদ্রাই তাঁহাকে সাধিয়া লয়। গণেশ-খুড়ো বাহিরের বাঁরান্দা হইতে বহুক্ষণব্যাপী তামাক-পর্ব্ব—দেশে খুড়োর গঞ্জিকা-ভক্তিরও বিলক্ষণ খ্যাতি আছে—শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন বাতি নিভাইয়া শয়নের পরিবর্ত্তে ঘোমটার আকারে আপাদমস্তক গৈরিক-উত্তরীয় মুড়ি দিয়া, গলদেশে লম্বমান জপের থলিটির ভিতর দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন, তখন বিনোদ বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল। খুড়ো মৃদু হাসিয়া বলিলেন-আমি যে এখন জপে বস্‌ব, বাবা!

তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। সত্যই বা কি অসাধারণ জপ হইবে ইহা!...বিনোদ প্রমাদ গণিল—কি সর্ব্বনাশ! এই দারুণ গ্রীষ্মের রাতে বদ্ধ ঘরে আজ বুঝি এমনই একদিকে চলিতে থাকিবে শম্ভুর ভৈরব ভীষণ নাসিকামন্ত্র, অন্যদিকে ওয়ালল্যাম্প হোমানল প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া গণেশের অত্যাশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যা!, তথাপি সে আশা করিতে লাগিল যে খুড়োর এই তপস্যার হয় ত শীঘ্রই সমাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট দশ মিনিট করিয়া দুই ঘণ্টারও অধিক হইয়া গেল, এবং দীপ-নির্ব্বাণের জন্য যখন সবিনয়ে অনুনয় জ্ঞাপন করিয়া বিনিময়ে পাওয়া গেল বিরক্তিপূর্ণ নিষেধের তর্জ্জনী-তাড়ন ও অটল অসম্মতির শিরঃসঞ্চালন, তখন তাহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে গণেশের অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা অ-শেষের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে—আর রক্ষা নাই!...হায়! ওয়ালল্যাম্পের চিমনী ত গিয়াছিলই ভাঙিয়া, কেন সে আজ কানাইয়ের হাতে-পায়ে ধরিয়া অমন করিয়া উহা আনাইল?

একে একে ১টা, ২টা, ৩টা বাজিয়া গেল—খুড়োর জপ

তখনও চলিয়াছে সমভাবে। নানা চিন্তায়, নানা অসুবিধায় ছটফট করিয়া ক্লান্তকলেবর বিনোদের রাত্রিশেষে একটু তন্দ্রার মত হইল—কিন্তু সে তন্দ্রাও ভীষণ দুঃস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। নানাপ্রকার বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে যখন অদ্ভুত এক হিংস্র শ্বাপদের তাড়া খাইয়া দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া স্খলিত হইয়া এক উঁচু স্থান হইতে গড়াইয়া সবেগে নীচের দিকে পড়িয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটা উচ্চ চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠিল—সমস্ত শরীর তাহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

বিনোদের চীৎকারে নিদ্রিত শম্ভু চমকাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিনোদ চাহিয়া দেখিল—বাহির হইতে স্পষ্ট দিনের আভাস আসিতেছে, এবং দেয়ালের বাতিটা তৈলহীন অবস্থায় কখন নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে কার ডাক কানে আসায় বুঝিতে পারা গেল, জপ শেষ করিয়া খুড়ো বাহিরে বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন।—দেয়ালের হুকে তাঁহার জপের থলিটি ঝুলিতেছে।

শম্ভুর প্রাত্যহিক নিয়মই হইতেছে, নিদ্রা-ভঙ্গেই তিনি কলতলা হইতে একবার মাত্র কুলকুচি করিয়া ও দুই আঙুলের ডগা ভিজাইয়া দুই-চোখে একবার বুলাইয়া লইয়া ত বাহির হইয়া যান,—শেভিংসেলুনে দাড়ি-কামানো ও রেষ্টুরান্টে চা-খাওয়া সারিয়া একখানি দৈনিক কিনিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসেন। সেদিনও তিনি নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়াই জামা গায়ে দিয়া বাহির হইলেন। সিঁড়ির মুখ হইতে হঠাৎ তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল—আবার ফিরলেন যে শম্ভুবাবু?

—আরে মশাই, মানিব্যাগটা পকেটে নেই দেখছি। কাল রাত্তিরে জামার পকেটে রেখেছিলাম বলে'ই মনে হ'চ্ছে—হয় ত রাখি নি; দেখি।

শম্ভু দেরাজ খুলিয়া, বিছানা-বালিস উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একাকার করিয়াও মানিব্যাগের সন্ধান পাইলেন না। বিনোদ বলিল—কোথায় রেখেছেন ভাল করে' মনে ক'রে দেখুন। যাবে আর কোথায়? দরজাও খোলা ছিল না, ঘরেও আসে নি বাইরের কোন লোক; দেখুন।

তাঁহার এরূপ কিছু হঠাৎ হারাইয়া ফেলা নূতন নয়। সামান্য চাবির রিং হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কিছুই তিনি এমনই কতদিন হারাইয়া ফেলিয়াছেন, খুঁজিয়া-পাতিয়া হন্যমুন্ধ হইয়াও পান নাই; আবার পাইয়াছেন হয় ত অতি সহজ স্থান হইতেই—চাবির রিং পাওয়া গেল কোমরের কাপড়ের ভাঁজে, কলমটা ছিল কানে গোঁজা অবস্থায়, এই-প্রকার আর কি!

শম্ভু ভাবিলেন যে কোথায় বা তিনিই রাখিয়া থাকিবেন তাঁহার মানিব্যাগটা। খোয়া যাইবার কথা তাঁহার মনেও হইল না। বাহিরের কেহ ঘরে আসে নাই; বিনোদের চরিত্র তিনি ভালোই জানেন—দীন হইলেও হীন নহে সে; গোস্বামী ঠাকুর ত দেবতাতুল্য! একটা খালি সিগারেটের কৌটার মধ্যে কয়েক আনা পয়সা ছিল,—তিনি তাহাই লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গণেশ-খুড়ো কলতলা হইতে ফিরিয়া আসিলেন—হয় ত' ভিতরের ব্যাপার কিছুই তাঁহার গোচরে আসে নাই। চৌকাঠের উপর হইতেই তিনি বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন—বাবা বিনোদ! আমি এখনি যাচ্ছি,—গঙ্গায় স্নান সেরে আমাকে আবার দৌড়তে হবে হাওড়া ষ্টেশনে গয়ার ট্রেন ধরতে। একটা দিন তোমাদের কষ্ট দিয়ে গেলাম!…জয় তীর্থেশ্বর!

তিনি চোখ বুজিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইলেন।

খুড়ো বিদায় হইলে বিনোদও বাঁচে। সে সৌজন্য দেখাইয়া বলিল—কেন, দু'একদিন আরো থেকে গেলেই পারতেন। আমাদের আর কষ্ট কি! কষ্ট হ'ল আপনারই,—কিছু মনে করবেন না।

ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়া পায়ে দিয়া, গৈরিক উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হুকে-ঝুলানো জপের থলিটির জন্য হাত বাড়াইয়াও খুড়োর যাওয়া হইল না—থলিটি হুকেই ঝুলান রহিল, কাঁধের উত্তরীয় কাঁধ হইতে নামাইয়া বিছানার উপর রাখিলেন, জুতা খুলিয়া রাখিয়া তিনি নীচের কলতলার দিকে দ্বিতীয়বার প্রস্থান করিলেন।

বিনোদের হাসি পাইল—রাত্রে খুড়োর উত্তম ফলাহারের কথা স্মরণ করিয়া। কিন্তু তখনই হঠাৎ বিনোদ আশ্চর্য্য-

রকম গম্ভীর হইয়া গেল। আবছা মতন তাহার মনে পড়িল—গত রাত্রে কানাই মিঠাইয়ের দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া খুচরা টাকা-পয়সা ফিরাইয়া দিলে শম্ভুবাবু মানিব্যাগটি ত তাঁহার ঐ ডোরাকাটা কামিজটার পকেটেই রাখিয়াছিলেন। আজ না পাইবার কারণ কি? ঘরেও ত' কেউ আসেনি অন্য লোক! তবে কি·····? বিনোদের অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না। একবার তাহাদের গ্রামের এক বিয়েবাড়ীতে এইরূপই একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়াছিল গণেশ-খুড়োকে লইয়া। বিনোদ চোখ তুলিতেই দেখিল—হুকের গায়ে ঝুলিতেছে খুড়োর জপের থলিটি। বিনোদ উঠিয়া গিয়া জপের থলিটির সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল, অপরের অজ্ঞাতসারে গুপ্তচরের মত তাঁহার জিনিষে হস্তার্পণ—বোধ হয় অন্যায় হইতেছে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ত অসাধু নয়।

সে থলির ভিতর হাত প্রবিষ্ট করাইয়াই চম্‌কাইয়া উঠিল—হরি! হরি! যাহা ভাবিয়াছে সে তাহাই ঠিক! কি ভয়ানক! ক্রোধে ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—আকর্ণ মুখ-চোখ রাঙা হইয়া গেল। উনি ত এখনই দিব্যি চলিয়া যাইতেন,—শম্ভু বিনোদের স্বভাব সবিশেষ জানিলেও, মানিব্যাগটি যদি সত্যই একেবারে না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সমস্ত দোষ পড়িত তাহারই ঘাড়ে কারণ তাহার অভাবের কথা কাহারও অবিদিত নাই; এবং শ্রাদ্ধ আরও কতদূর গড়াইত তাহা কে বলিতে পারে!

সে থলিটি হাতে লইয়া ভালো করিয়া খুলিয়া দেখিল—তাহার ভিতর কাঠের মালা একটি আছে অবশ্য ভণ্ডামির নিদর্শন স্বরূপ,—কিন্তু সেই সঙ্গে আরও আছে গঞ্জিকার সোপকরণ সেবাসজ্জা, শম্ভুর মানিব্যাগ,—আর একটি টাকার বাটুয়া', হয় ত গণেশের নিজেরই, অথবা—

বিনোদ শম্ভুর ব্যাগ ও অপর 'বাটুয়া'টি উঠাইয়া লইয়া লিটি যথাস্থানে রাখিল। তারপর উভয় জিনিষ তাহার লিসের তলায় রাখিয়া তাহার উপর উবু হইয়া পড়িয়া, ত্রে-লেখা পিতার পত্রখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া, অন্য কখানি সাদা চিঠির কাগজে ঠিকানা ও তারিখ লিখিতে রু করিল।

খুড়ো ফিরিয়া আসিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিনোদকে পুনরায় বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া হুক হইতে থলিটি হাতে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার হাতে উহা কেমন হাল্‌কা বলিয়া বোধ হইল যেন—টিপিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দুয়ারের বাহির হইয়াই তিনি উহার ভিতর হাত ঢকাইয়া দিলেন। সর্ব্বনাশ!—চুরির উপর বাটপাড়ি করিল কে রে!

গণেশ একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার ফিরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। করুণ স্বরে ডাকিলেন—বিনোদ!

বিনোদ চোখ তুলিয়া, যেন বিস্মিত হইয়াছে এইরূপ ভাবে বলিল—কি খুড়ো, আবার ফিরে' এলেন যে?

খুড়ো বলিলেন—বিনোদ, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, বাবা! এই থলির ভিতর আমার টাকা-পয়সা যা ছিল কিচ্ছু নেই!···

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর আসিয়া বালিসের নীচে হাত দিয়া এক হাতে শম্ভুর মানিব্যাগ ও অপর হাতে সেই 'বাটুয়া'টি লইয়া রূঢ় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—এর মধ্যে কোন্‌টি আপনার বল্‌তে পারেন, খুড়ো!

গণেশের চক্ষু কপালে উঠিল—একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন তিনি!—মুখে কথা জুটিল না, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল।

বিনোদ খুড়োর উভয়হস্তের মণিবন্ধ সজোরে দুই-হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—থানায় খবর দিই? শম্ভুবাবুকে বলি?

খুড়ো কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিনোদের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে বাঁচাও বিনোদ!—রক্ষা কর!

বিনোদ পা হইতে খুড়োর হাত ছাড়াইয়া লইয়া, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিল। তারপর 'বাটুয়া'টি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—এটি কি আপনার, না শম্ভুবাবুর ব্যাগের মতনই—

—না বাবা, সত্যি বল্‌ছি, ও আমার নিজের—আর কারুর নয়—বাড়ী থেকে এনেছি।

একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদ কহিল—এতে আপনার কত আছে ?

—নিরানব্বই টাকা, আর কয়েক আনা পয়সা।

বিনোদ 'বাটুয়া' খুলিয়া ফেলিয়া তন্মধ্য হইতে দশ টাকার চারিখানি নোট বাহির করিয়া লইয়া উহা খুড়ার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—আপনার 'বাটুয়া' নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে যান শীগ্‌গির! খবরদার—এ-মুখো আর হবেন না! চারখানা নোট নিয়েছি বের ক'রে; ভয় নেই, গাপ্ করব না; আপনার বাড়ীর ঠিকানায় প্রতি-মাসে চার টাকা ক'রে মানিঅর্ডার হবে আপনার নামে। মাস-দশেকেই সব টাকা আপনি পেয়ে যাবে[illegible] গ্রস্ত বলে'ই এমন করতে হ'ল—আপনার ম[illegible] নই! যান,—আর কথা নেই!

খুড়ো লগুড়াহত কুকুরের মত দুয়ার খুলি[illegible] ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

শম্ভুবাবু ফিরিয়া আসিয়া শেল্‌ফের উপরক[illegible] কাগজপত্রের মধ্য হইতে তাঁহার মানিব্যা[illegible] করিলেন।

শ্রীরাধাচরণ

কীট

কুমারী মমতা মিত্র

স্বপ্ন দেখলেম যেন আমরা কুড়িজন ব'সে আছি একটা খুব বড় ঘরে, সব জান্‌লা তার খোলা।

আমাদের মধ্যে ছিল শিশু, নারী ও বৃদ্ধ।

আমরা একটি পরিচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেম—জোরে অথচ অস্পষ্টভাবে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর খুব জোরে ডানার শব্দ করতে করতে উড়ে' এল একটা দু'ইঞ্চি লম্বা বড় পোকা। চারদিক প্রদক্ষিণ ক'রে শেষে দেয়ালের গায়ে স্থির হ'য়ে বস্‌লো।

দেখ্‌তে ঠিক মাছি বা বোল্‌তার মত। গায়ের রঙ ময়লা, চ্যাপ্টা কঠিন পাখাও এই রঙের; ছড়ানো পাখার মত নখ; পতঙ্গের মত কোণাবিশিষ্ট মোটা মাথা; নখ ও মাথা উজ্জ্বল লাল, যেন রক্তে ভিজে গেছে।

এই অদ্ভুত পোকা ক্রমাগত তার মাথা ফেরাচ্ছে [illegible] তারপর নখ নাড়লে কিছুক্ষণ; পরে হঠাৎ দেয়াল ছেড়ে ঘরে [illegible] লাগ্‌লো ডানার ফরফর্ শব্দ করতে ক[illegible] স্থির হ'য়ে বসলো। জায়গা থেকে না স[illegible] এমন ক'রে নাড়তে লাগ্‌লো যাতে মনে[illegible] উদয় হয়।

এটা আমাদের সকলকে ভীষণ ভী[illegible] তুললে। আমাদের মধ্যে কেউ কখনো[illegible] জিনিস দেখেনি। আম্‌রা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেম [illegible] দাও ঐ রাক্ষুসে জিনিসটাকে।'

দূর থেকে ওটার দিকে রুমাল নাড়[illegible] কেউ সাহস করলে না ওর সাম্‌নে যেতে[illegible] উড়তে আরম্ভ করলে, আপনা-আপ্‌নি [illegible] গেল। কেবল আমাদের দলের একজন [illegible] মুখ, গভীর বিস্ময়ে অনিমেষ নয়নে চে[illegible] দিকে। সে ঘাড় নাড়তে লাগলো, [illegible]

বুঝ্‌তে পারলে না কি হ'য়েছে আমাদের, কেনই বা আমরা এমন উত্তেজিত হ'য়েছি। পোকাটিকে সে একেবারেই দেখতে পায়নি, তার ডানার অশুভ শব্দও শোনেনি।

হঠাৎ মনে হ'ল পোকাটি একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই দিকে। হঠাৎ উড়ে গিয়ে পড়লো তার মাথায়... চোখের উপরে কপালে দিলে হুল ফুটিয়ে।

ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ক'রে যুবক লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ধীরে ধীরে শেষনিশ্বাস তার অন্তরদেশ থেকে উত্থিত হ'য়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর মাছি তখনই ঘর ছেড়ে উড়ে' গেল...তখন আমরা বুঝ্‌লেম আমাদের দেখা দিয়ে গেল কে। *

টুর্গেনিভ

পুস্তক সমালোচনা

"অমাবস্যা"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার আই-সি-এস্

বত্রিশটি প্রেম-কবিতায় সম্পূর্ণ একখানি কাব্যগ্রন্থ। যে চপলা প্রিয়া তাঁর প্রথম-প্রেমাস্পদকে ত্যাগ ক'রে অন্যের অন্তঃপুরিকা হ'য়েছেন, সেই "অসূর্য্যম্পশ্যাকে" লক্ষ্য ক'রে কবিতা-কয়টি রচিত। কাব্যের কেন্দ্রগত বিচ্ছেদের সুরটি বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়; কিন্তু সুরের ব্যঞ্জনায় ও ভাবের ক্রমবিকাশে একটা নূতনত্ব আছে। সেইখানেই অচিন্ত্যকুমারের বৈশিষ্ট্য। "তুমি-আমি" বা "তোমায়-আমায়" ধরণের নেহাৎ ধোঁয়াটে, মামুলী ধরণের প্রেম-কবিতার আর-একটি অনাবশ্যক নমুনা যে তাঁর লেখনী থেকে বেরোয় নি, সেজন্যে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করছি।

চণ্ডীদাসের আমল থেকে সুরু ক'রে এযুগের তরুণ কবিরা সকলেই কাব্যে প্রেমের চর্চ্চা করেছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের পর থেকে প্রেমকে নিছক ব্যক্তি-সম্বন্ধ ব'লে প্রচার করবার সাহস কোনো বাঙালী কবির কি না সন্দেহ। আলগা কবিতার কথা বল্‌তে পারি নে, কিন্তু সমগ্র-কাব্যে প্রেমের এই সহজ ও অকৃত্রিম রূপটি আর কোনো কবির রচনায় দেখ্‌তে পেয়েছি ব'লে স্মরণ হ'চ্ছে না। যাঁরাই প্রেমের কাব্য লিখেছেন, তাঁদের সকলের সৃষ্টিতেই একটা না একটা ভেজাল এসে জুটেছে—কখনো আধ্যাত্মিক মতবাদ, কখনো দার্শনিক তত্ত্ব, আর কখনো বা মিস্‌টিসিজ্‌ম্। কাব্যে যে এই-ধরণের নীতি, তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতার কোনো স্থান নেই সে কথা বললে বাতুলতা হবে; কিন্তু তাদের দোহাই দিয়ে প্রেমের কবিতাকে sublimate করবার বৃথা চেষ্টা করলে, যে-জিনিষটি তৈরি হবে, সেটি উঁচুদরের আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা মিস্‌টিক কবিতা হ'তে পারে, কিন্তু সেটিকে পুরোদস্তুর প্রেমের কবিতা বলা চলবে না। বস্তুজগতের নারী বা পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়, সেইটেই একমাত্র প্রেম-কবিতার উপাদান। আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা মিস্‌টিক রসের

---

* কবিতার বই। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। ৪৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—সুশীল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভিয়ানে ফেলে সেই অনুভূতিকে কৃত্রিম গভীরতা দান করবার প্রলোভন স্বাভাবিক। অচিন্ত্যকুমার যে সেই প্রলোভনের হাত এড়াতে পেরেছেন, তাতে তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পেলুম। বিচ্ছেদ-বেদনাকে যেমন ভাবে অনুভব করেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন, কোনো রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নি। শুধু তাই নয়, প্রিয়ার কাছে দুঃখ-নিবেদন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত নন। "প্রিয়ার 'ঘরের" বর্ত্তমান "অতিথিটিকে" আহ্বান ক'রে তাঁর কাছেও নিজের মনোব্যথা জ্ঞাপন করতে কসুর করেন নি!

তখনও তুমি আস নাই ভাই, ছিলাম অদ্বিতীয়,
কবিতার বাতি জ্বালায়ে তাহারে রেখেছিনু রমণীয়।

• • •

তোমার প্রিয়ার এত যে আদর চোখের চাহনি বেচি,'
জান কি বন্ধু, সে চোখের মায়া আমি তারে শিখায়েছি!

প্রিয়ার ঘরের অতিথিকে স্মরণ করলেও, অধিকাংশ কবিতাই কিন্তু প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রেই রচিত। শুধু একটি হা-হুতাশের একঘেঁয়ে সুরের ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে কবির হৃদয়-লাঞ্ছিত হয় নি—কখনও অনুযোগ, কখনও শ্লেষ আর কখনও বা মিনতির সুরের ভেতর দিয়ে তাঁর মনোব্যথা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। অনুযোগের সুর পাতায় পাতায়,—বিশেষ ক'রে নমুনা দেখাবার প্রয়োজন নেই। তবে অনুযোগের ধরণটি দেখাবার জন্যে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

রজনীতে আর জীবনে বিরাজে বিস্তৃত স্তব্ধতা
শুধু মনে পড়ে তোমার মুখের মধুর মিথ্যা কথা।

• • •

আজি রজনীতে জানালার ধারে ফুটেছে আমার হেনা,
ওর পানে চেয়ে মনে পড়ে সেই বলেছিলে—ভুলিবেনা!
আছ কি নিদ্রাগত
চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে কি আমার স্নেহের মত?

এ অনুযোগে শুধু ব্যথা আছে, ভৎর্সনা নেই। 'Sorrow's crown of sorrow' সম্বন্ধে ইংরেজ কবি যা বলেছিলেন, কবি যন সেইটেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছেন। তাই ব'লে তাঁর দুঃখকে কিন্তু কবি উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নি—নিখিলেশ তাঁর আদর্শ নয়। শ্লেষের নমুনা থেকেই বুঝতে পারা যাবে:—

হেথায় ফটিক-জল,
বাহুবন্ধন তপ্ত ওপারে, চুম্বন—সুশীতল।

• • •

হেথায় জীবন জুড়ায়ে এসেছে,—নীরব নিরর্থক,
তাই ভেবে শিরে সিন্দুর দিয়ো, চরণে অলক্তক!

• • •

হেথায় ঝরিছে ঘনবর্ষণ ডাকিছে নিদয় দেয়া,
ওপারে তোমার ফুটিল কি তাই কোমল কদম, কেয়া?

• • •

হেথায় জ্বলিছে চিতা,
সেই আলোতেই তোমার রাত্রি হয়েছে দীপান্বিতা॥

শেষের দুটো লাইন অনেকটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লেও, এই কবিতাটিতে যে তীব্র হৃদয়-জ্বালা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটাকে যদি কবি সংযত ক'রে না রাখ্‌তেন, তা হ'লে এই কাব্যটির স্বরূপ কেমন হ'ত, কল্পনা ক'রে দেখ্‌তে ভারী আমোদ হ'চ্ছে! কিন্তু শ্লেষের সুরটি জোরালো হ'লেও মিনতির সুরটি এই কাব্যে যতখানি পূর্ণতা পেয়েছে, আর-দুটো সুরের কোনোটিই ততখানি বিকাশলাভ করতে পারে নি। বাংলার প্রেম-কবিতায় এই একটি সুরই বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। কারণ খুঁজে দেখতে গিয়ে আমার ত অনেক সময়েই মনে হ'য়েছে যে বাঙালীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই একটি সুরই যেন সহজভাবে খাপ খায়। অচিন্ত্যকুমারের কবিতা প'ড়ে আমার সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'লো। নীচে যে কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, সেটি যে বাংলার অত্যাধুনিক কাব্যসাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন, তা বল্‌তে আমার একটুও দ্বিধাবোধ হ'চ্ছে না।

যদি কোনোদিন বেদনার মত বাদল ঘনায়ে আসে,
কাজল-আকাশে আমার আঁখির সজল কাকুতি ভাসে,
বসিয়া তাহার বামে
একবার শুধু ভুল ক'রে তারে ডাকিয়ো আমার নামে।
.........ইত্যাদি

এই তিনটি সুরে প্রিয়ার কাছে হৃদয়-বেদনা নিঃশেষ ক'রেই যদি কবি নিরস্ত হ'তেন, তা হ'লে সাহিত্যের গুরু-মশাইদের কাছে তাঁকে দুঃখবাদীর বদ্‌নাম কিন্‌তে হ'ত বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যটি ইউনিটি (unity) পেত। তা' না ক'রে, কবি তাঁর কাব্য-বীণার শেষের দিকে একটা নতুন তার জুড়ে' দিয়েছেন। যে দুঃখ তাঁর কাছে কিছু আগেও দুঃসহ মনে হ'য়েছিলো, এখন সেইজন্যেই প্রিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন! শুধু তাই নয়, দুঃখেই তাঁর কাব্যের পরিসমাপ্তি নয়। তাঁর নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করবার জন্যে "যমুনার ঢেউ ঠেলে" কোন্ এক অন্তশ্চারিণী অপরিচিতা তাঁর সঙ্গ কামনা করলেন!

নয়ন করিয়া গাঢ়
কে যেন সুমুখে আসিয়া শুধালো,
মোরে কি চিনিতে পারো?

অপরের অন্তরঙ্গতায় কবি সান্ত্বনা পেলেন বটে, কিন্তু শান্তি পেলেন না। অতীতের স্মৃতি তাঁর মনকে এমন আবিষ্ট ক'রে রেখেছে, যে, তিনি তাঁর নবলব্ধা প্রিয়াকে প্রশ্ন কর্‌ছেন—

ওগো মোর নবাগতা
শুনিতে এলে কি গোপনে তাহারে বলেছিনু সে কি কথা!
অধরে ধরিয়া এনেছ কাহার রাঙা চুমা উন্মুখ,
স্খলদঞ্চলা! চঞ্চল কার স্নিগ্ধ স্তনাংশুক!

তাই যদি হয়, তবে শান্তি পাবার জন্যে এ বৃথা প্রয়াস কেন? কবি যেন সেই কথাটাই বুঝতে পেরে হঠাৎ তাঁর সব দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে ব'লে উঠলেন—

সঙ্কেতময়ী! প্রার্থনা করি হোয়ো না আবিষ্কৃত,
তোমার মাঝারে যেন অনুভবি—জীবন অপরিমিত!

সাধু! এতেই যদি কবি সন্তুষ্ট হন, তবে তাঁর আগেকার এত হা-হুতাশের অর্থ কি? কাব্যের এই অসঙ্গত পরিসমাপ্তি কবির রসবোধকে পীড়িত করল না কেন, বুঝতে পারছি নে।

অমাবস্যা সুখপাঠ্য কাব্য নয়। একাধিকবার না প'ড়েও যিনি এই কয়টি কবিতার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারবেন, তিনি ভাগ্যবান। কিন্তু দুষ্পাঠ্য ব'লে সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করলে অনেক সাহিত্যিক-মহারথীকেই অগ্রাহ্য করতে হয়। সম্প্রতি Robert Bridges এর Testament of Beauty পড়তে গিয়ে টানা-পাখার নীচে ব'সেও হাঁপিয়ে উঠতে হ'চ্ছে; কিন্তু তাই ব'লে কি বল্‌ব বইখানি অপাঠ্য? গতযুগের সাহিত্যরসিক Walter Pater একবার জটিলকে সহজ ক'রে তোলার আনন্দের কথা বলেছিলেন; সাহিত্যচর্চ্চার সে আনন্দটা আমরা প্রায়ই ভুলে' যাই। আমাদের অনেকেরই ছেলেবেলা থেকে একটা ধারণা আছে যে যে-সাহিত্যের রস-গ্রহণ করতে হ'লে মাথা ঘামাতে হয়, সেটা বুঝি কখনও সাহিত্যপদবাচ্য হ'তে পারে না। সাহিত্যচর্চ্চার আনন্দকে সন্দেশ খাওয়ার আনন্দের সামিল ক'রে তুল্‌লে সন্দেশের মর্য্যাদা বাড়তে পারে, কিন্তু সাহিত্যের মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হয়!

তাই ব'লে, আমি বল্‌তে চাই নে যে কাব্যকে সুখপাঠ্য করবার কোনো দায়িত্বই কবির নেই। বিলাতের অনেক "আধুনিক" (modernist) তরুণ কবিকে এ দায়িত্ব অস্বীকার করতে শুনেছি বটে, কিন্তু মডার্নিষ্টদের (modern[illegible] মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁরা এ দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও, একেবারে অস্বীকার করেন নি। T. S. [illegible] Edith Sitwallএর কবিতায় চিন্তাশীল পাঠকের জন্যে যে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে, একথা এখন সকলেই স্বীকার করছেন। অচিন্ত্যকুমারও এ দায়িত্ব অগ্রাহ্য করেন নি—তাঁর কাব্য দুরূহ হ'লেও অবোধ্য নয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে—তিনি তাঁর কবিতাগুলিকে মেজে-ঘসে সুখপাঠ্য ক'রে তোল্‌বার জন্যে আদৌ সচেষ্ট হন নি, কাব্যখনি থেকে তুলে' নিয়েই যেন সদ্য পাঠকদের পরিবেশন করেছেন। শুধু তাই নয়, পাঠকদের ওপর তাঁর গভীর ঔদাসীন্যের পরিচয় আরও অনেক-ভাবে পেয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ছত্র তুলে' দিচ্ছি—

আমার চুমার মতন জোছনা নয়ন ছোঁয় কি হেসে,
তোমার বেড়ার ঝুম্‌কো লতাটি—কত বড় হ'য়েছে সে?
• • • • •
পাশের ছাতের আলিসা হইতে কাপড়টি নিতে আসা,
পথে যেতে যেতে দুটি বুঝর দরদী দরাজ হাসা;

মাকড়সাগুলি জাল বিছায়েছে দেয়ালে ও কড়িকাঠে;

• • • •

আমার মেঘনা নদী

শুকাইত, ওর সাথে মোর আঁখিজল না মিশিত যদি!

অম্লানভাবে এইধরণের নিছক গদ্যের অবতারণা ক'রে, 'অমাবস্যা'র কাব্যগৌরব ক্ষুন্ন করতে আচিন্ত্যকুমারের দ্বিধা বোধ হ'ল না? এ ছাড়া একাধিকবার শুধু অর্থহীন শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি ক'রেই অচিন্ত্যকুমার নিরস্ত হ'য়েছেন।

যেমন—গৃহচূড়ে জলে আকাশপ্রদীপ সন্ধ্যাতারার লাগি,'

বন্ধুর দেশে বন্ধু-র মত বন্ধূলি আছে জাগি'।

এই দু'ছত্রে প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের যে কি সম্বন্ধ বা সঙ্গতি আছে, আবিষ্কার করা সহজ নয়। আর সম্বন্ধ না থাকলে এই অহেতুক অনুপ্রাসের সার্থকতাই বা কোথায়? এই ধরণের আরও কয়েক[illegible] চোখে পড়ে। একটু সচেষ্ট হ'লেই এসব বি[illegible] নিখুঁত করা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল। তিনি [illegible] অগ্রাহ্য ক'রে পাঠকদের ক্ষুণ্ণ করেছেন।

বইখানির বাঁধাই ও ছাপার শ্রীলতা প্রশং[illegible] দিন আগে কাব্যগ্রন্থকে সালঙ্কারা ক'রে [illegible] যে বর্ব্বর রীতি কয়েকজন সাহিত্যিক আ[illegible] আমদানী করেছিলেন, সেটা ক্রমশঃই আবা[illegible] দেখে রুচিমান্ পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হ[illegible] মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী' বেরুবার দিন যাবত 'অমাবস্যা'র মত সংযত ও [illegible] বাঁধাই কোনও কাব্যের বইএ দেখছি ব'লে [illegible] না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল ম[illegible]

আশ্বাস

শ্রীযুক্ত সুবোধ দাসগুপ্ত

সকালে কলেজে আইন পড়িয়া দুপুরে অফিসে যাই,
তোমার কথা যে ভাবিব এমন ফুরসৎ কোথা পাই।
ঘুমভরা চোখে ঝিমায়ে ঝিমায়ে কলেজে বসিয়া থাকি—
কাল রজনীতে হয় নাই ঘুম তন্দ্রালু তাই আঁখি;
প্রফেসর সে তো বকিয়া চলেছে কিছুই পশে না কানে,—
শ্রবণের পথে যদি কিছু আসে বুঝিনাকো তার মানে;
ক্লান্ত হৃদয়, ক্লান্ত নয়ন, ক্লান্ত সকল দেহ,—
আমার লাগিয়া তোমার হৃদয়ে একটু নাহি কি স্নেহ?
যদি স্নেহ থাকে তা হ'লে বন্ধু, আমারে করিও ক্ষমা—
বড় দুঃখেই তোমারে ভুলেছি, হে আমার মনোরমা।

তারপরে শোন পৌনে-দশেতে কলেজ হইলে শেষ
ঠেলি-ঠুলি ভীড় তাড়াতাড়ি করি' কোন মতে আসি মেস;
দুটি ভাত মুখে গুঁজিতে হইবে, করিতে হবে তো স্নান—
সাড়ে-দশটায় দেরী হ'য়ে গেলে অফিসেতে যাবে জান্।

একদিন মোর দেরী হ'য়েছিল, মিনিট সাতে[illegible]
তাই নিয়ে সারা দিবস চলিল কোলাহল মহ[illegible]
সেই থেকে মোর শঙ্কা জেগেছে বুঝি বা চাব[illegible]
মেসে ফিরি তাই তাড়াতাড়ি করি'—সময় [illegible]
স্নান যদি করি আহারের পালা কিছুটা বাকি[illegible]
সাড়ে দশটায় অফিস আমার, একথা বলি বা[illegible]

সারা দিবসের খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যায় ফিরে' [illegible]
পথের প্রান্তে হঠাৎ শুনি যে কোথা যেন বাজে[illegible]
তখন বসিয়া তব স্মৃতিটুকু ভাবিতে চাহে না [illegible]
শুধু মনে হয় পায়দল চলি' মেসে ফিরি কতক্ষণ
শুধু মনে হয় আরাম চেয়ারে আরামে বসি[illegible]
দিবসের শেষ সন্ধ্যা-আলোকে সন্ধ্যার ছবি অ[illegible]
মশা ভন-ভন করে জ্বালাতন, ছাদেও রক্ষা [illegible]
আরাম ছাড়িয়া বিশ্রাম ছাড়ি' বল দেখি কো[illegible]

এর পরে যদি বসিয়া বসিয়া তোমারে জপিতে হয়,
তার চেয়ে বড় দুঃখ জানি না কি তাহার পরিচয় !

রবিবার বটে-আসে একদিনই ছুটির বারতা ল'য়ে,
ক'রে, কা... কে এক-ফোঁটা জল বাদল এনেছে ব'য়ে,
কত আশা দিয়ে তাহারে ঘিরিয়া থাকি;
একটি দিনের বৈভব মোর—একখানি রাঙা রাখী !
তবুও বন্ধু, একথা তোমারে বলিতে লজ্জা হয়,
একটি দিনের বিলাসের স্মৃতি মিথ্যা বিফলময় ।
সাড়ে-দশটায় ঘুম থেকে জাগি শয্যা ছাড়িয়া চাই;
মেসের বামুন পলাতক শুনি, ভৃত্যেরও কথা তাই ।
রুক্ষ মেজাজে সূক্ষ্ম আত্মা বিদায় করিয়া দিয়া
মেসের দাদারে সেদিনের মত করিনু মোদের প্রিয়া ।
তারপরে আছে হিসাব-নিকাশ —ধোপা-নাপিতের বিল,
তোমারে ভাবিব নাহিক এমন ফুরসৎ একতিল,
কবিতার খাতা হারায়ে গিয়াছে, নতুবা তাহারি বলে
আমার প্রিয়ার চন্দ্রবদন স্মরিতাম কৌশলে ।
কিন্তু তবুও ভাবিও না সখি, ভোরের আলোর মত
আকাশের আলো নয়নে জাগিবে, এদিন হইবে গত ;
তখন জীবনে অবসর শুধু, করিবার কিছু নাই,—
তব প্রিয় নাম করিব ধেয়ান বসিয়া কেবলি তাই ।
উকিল হইয়া বাতিল করিব জীবনের যত কাজ,
কাছারিতে বসি' নিদ্রার সাথে গড়িব প্রেমের তাজ ;—
চুপি-চুপি শুধু গোটাদুই কথা তোমারে বলিয়া রাখি—
"তোমার বাবার ব্যাঙ্ক-ভরা টাকা দিবে নাতো
মোরে ফাঁকি ?"
কিসের চিন্তা, কিসের দুঃখ, কিসের বিরহ তবে ?—
দুটি বৎসর বেশী কিছু নয়, প্রেমেরি বিজয় হবে ;
তাই বলি প্রিয়ে, সন্দ কোরো না, তোমারেই ভালবাসি,
দু'বছর পরে দেখা হবে ঠিক,—আপাতত আজ আসি !

শ্রীসুবোধ দাসগুপ্ত

নানাকথা

জয়শ্রী

বর্ত্তমান বৎসরের আষাঢ় মাস হইতে ঢাকা হইতে 'জয়শ্রী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কথা, সে সংবাদ বিচিত্রার গত সংখ্যার 'নানাকথায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্রী শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী আমাদের জানাইয়াছেন যে, Press Ordinanceজনিত নানাপ্রকার অসুবিধার জন্য এবং ঢাকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার গোলযোগে তাঁহারা কিছুতেই আষাঢ় মাসে কাগজ বাহির করিতে পারিলেন না, যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত করিবেন।

* * *

সঙ্গীতে সম্মান-লাভ

বিচিত্রার সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট শ্রীমান হিমাংশুকুমার দত্তের নাম সুপরিচিত। গত দুই-তিন মাস ধরিয়া বিচিত্রায় মীরা-বাঈ-এর ষট্-কমল গীতি-গুলির স্বরলিপি রচিত করিয়া ইনি প্রকাশিত করিতেছেন। তৎপূর্ব্বেও ইঁহার স্বরলিপি বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিমাংশুকুমার একজন প্রতিভাবান সঙ্গীতবিদ্; ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমধুর, তান-লয় সহকারে উচ্চাঙ্গের গান গাহিবার শক্তি ইনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন, সুরের মধ্যে ভাবাভি-ব্যক্তি উৎপন্ন করিবার কৌশল ইনি অবগত। বয়সে হিমাংশুকুমার তরুণ—কিন্তু বয়সের হিসাবে তাঁহার অধিকার অল্প নহে। সম্প্রতি শোভাবাজারের রাজা শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সারস্বত মহামণ্ডলের পঞ্চম-বার্ষিক অধিবেশনে হিমাংশুকুমার সঙ্গীতপাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ 'সুর-সাগর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। সারস্বত মহামণ্ডল সুযোগ্য পাত্রে এই সম্মান অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা হিমাংশুবাবুর এই সম্মান-লাভে আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি।

ব্যাঙ্কে মহিলাবিভাগ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কলিকাতা অফিসে শীঘ্রই একটি মহিলাবিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশের শিক্ষিতা এবং ধনবতী মহিলাগণ যাহাতে নিজেরাই ব্যাঙ্কের সহিত প্রচলিত সকল-প্রকার কার-কারবার করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই বিভাগটি খোলা হইতেছে। বিভাগটি মহিলাগণের ব্যবহারের জন্য বলিয়া একটি উচ্চ-শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলার অধীনে কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে; সুতরাং যে-সকল মহিলাগণ সাধারণতঃ সর্ব্বসমক্ষে বাহির হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন, অথবা বাহির হন না, তাঁহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে আসিয়া নিজেদের কাজ-কর্ম্ম সারিবার আ অসুবিধা থাকিবে না।

বছর দশেক পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের বম্বে আ মহিলার কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি মহিলাবিভাগ খো অতি অল্পসময়ের মধ্যে উক্ত বিভাগের কার্য্য এ উঠে যে বিভাগটি পরিচালনার জন্য কর্ম্মচারিণীর সং ভাবে বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের উপর সাধারণের বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ় কলিকাতার মহিলাবিভাগটিও যে বোম্বাই মহিল অনুরূপ সাফল্যলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিবেদন

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে বিচিত্রাপত্রিকার স্বত্বহস্তান্তর ব্যাপারে স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় দলিল-দস্তাবেজ সম্পাদনে প্রায় দুই-সপ্তাহকাল লাগিয়াছিল। উক্ত সময় উভয়পক্ষের মর্য্যাদানুযায়ী বিচিত্রার মুদ্রণকার্য্য একেবারে বন্ধ ছিল। সেইজন্য জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে এত বিলম্ব হইল। আষাঢ় সংখ্যা অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরের প্রথম সংখ্যা দশ-বারো দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। তৎপরে প্রতিসংখ্যা বিচিত্রা নিয়মিতকালে ঠিক-মত প্রকাশিত হইবে। আশা করি আমাদের সহৃদয় পাঠক এবং গ্রাহকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

বিচিত্রার স্বত্ব হস্তান্তরিত হইলেও বিচিত্রার সম্পাদন ও পরিচালন-বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না; অধিকন্তু বিচিত্রার নূতন স্বত্বাধিকারিগণ বিচিত্রার অধিকতর উন্নতি-সাধনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। পাঠকগণ ত চতুর্থ বর্ষের প্রারম্ভ হইতে পাইবেন।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী বার্ষিক মূ আগামী আষাঢ় সংখ্যা পুরাতন গ্রাহকব ভি-পি ডাকে প্রেরিত হইবে। গ্রাহ গ্রহণপূর্ব্বক অনুগৃহীত করিবেন। যাঁহ শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবেন, নতুবা অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখো

৪৮নং পটলডাঙ্গা স্ট্রী

Printed at the Susil Printing Works, 48, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, C